বুনো সুর

শিল্পী—শ্রী নেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী

PRINTED BY C. H. ABEL & CO., C.

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ [১ম সংখ্যা

নর-নারী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

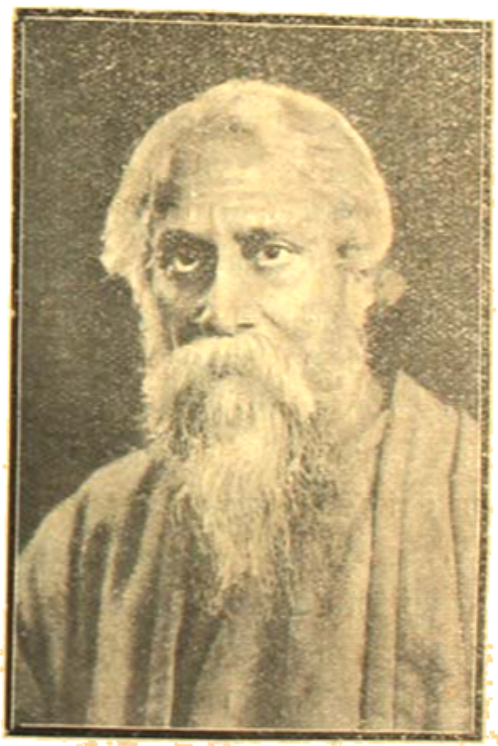

পুরুষেরা স্বভাবতই একক, মেয়েরা আপন স্বভাবসিদ্ধগুণে সঙ্গদায়িনী। পুরুষেরা দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে বেরিয়ে পড়তে চায় কারণ তাদের শক্তি আছে, মেয়েরা আপন চারিপাশের আনুকূল্য করে কেন না তারা ভালোবাসতে পারে। পুরুষেরা জয়-গৌরবের শ্লাঘায় অট্টহাস্যমুখর, মেয়েরা স্মিতহাসিনী, কেন না তারা খুসি করে এবং খুসি করে' খুসি হয়।

মেয়েরা একদা ঘরছাড়া উদাসীকে ভুলিয়ে ঘরে এনেছে, এই ঘর নারীশক্তির নিজকৃত সৃষ্টি। নারী-শক্তি উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিগুলিকে সেবাপরায়ণ সুষমায় সংযত করে' আনে; ইচ্ছাপূর্ব্বক দায়িত্বগ্রহণ এবং ত্যাগস্বীকার করে কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধার জন্য নয়, আপনার চরম চরিতার্থতার জন্যই।

এই নারীরচিত ঘর পুরুষরচিত সভাতার ভিত্তি। এই ঘরই সেই বীজপালনক্ষেত্র যেখান-

কার সীমার মধ্যে মানবসম্বন্ধের প্রাণবান অন্তর্বৃত্তিগুলি পোষণলাভ করে, লোকব্যবহারের রীতিগুলি রস পেয়ে সমস্ত বিরোধ বিপ্লবকে নিয়ত সৌন্দর্য্যে পরিণত করে' তোলে।

বাংলার সামরিক ক্রীড়া

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

নৃত্য একটি ক্রীড়া-বিশেষ। সুতরাং ভারতীয় নৃত্যকলার প্রকৃতি ও রূপ বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় ক্রীড়াপদ্ধতির, এবং বিশেষ ভাবে বাংলার ক্রীড়াপদ্ধতির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ব্যক্তির এবং জাতির গভীর প্রকৃতির পরিচয় তাহার ক্রীড়াপদ্ধতি হইতে পাওয়া যায়। কারণ, নৃত্যের শক্তি ও প্রবৃত্তির মতই ক্রীড়ার শক্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের এবং জাতির জীবনপ্রবাহের সহজ ও স্বাস্থ্যবান গতির একটি স্বাভাবিক লক্ষণ। তাই আমরা দেখিতে পাই, জাতির অথবা ব্যক্তির জীবনের মূলধারা যখন ধর্ম্ম বা শিক্ষার কৃত্রিম ও ভ্রান্ত আদর্শ দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, তখন সেই ব্যক্তি এবং জাতির জীবন হইতে যেমন নৃত্যের শক্তি ও প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ ক্রীড়ার শক্তি ও প্রবৃত্তিও লুপ্ত হয়। শিক্ষার ভ্রান্ত আদর্শে ক্রীড়ার শক্তি এবং প্রবৃত্তির লুপ্তির বীভৎস উদাহরণ আমরা বাংলার ছাত্র এবং শিক্ষকদের জীবনে ১৯২০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। আজকাল আমাদের দেশে নৃত্য যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণতঃ দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িয়াছে, ১৯২০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রীড়াও এইরূপ অনেকটা দূষণীয় জিনিষ বলিয়া গণ্য হইত। এবং এই ভ্রান্ত আদর্শের ফলে, বাংলার জীবনে শক্তির এবং আনন্দের যে কত হানি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

ক্রীড়ার দিক হইতে এই ভ্রান্ত আদর্শ আমাদের ভাসিয়া দিয়াছে ইংরাজ জাতির উদাহরণ। ইহাদের জাতীয় জীবনে ক্রীড়ার চর্চ্চা যেমন ব্যাপক, ইহাদের ক্রীড়ার পদ্ধতিগুলিও তদনুরূপ আনন্দময় ও মঙ্গলকর। তাই ইংরাজ জাতির নিকট হইতে তাহাদের ক্রীড়াপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন আনন্দ এবং শক্তি-সঞ্চয়ের যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছে। এবং ইউরোপীয় ক্রীড়াপদ্ধতিতে ভারতীয় যুবকগণও যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদান করিতে পারে, তাহার প্রমাণ ভারতবর্ষে এবং ইউরোপের নানা দেশে আজকাল দেখানো হইতেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি বিচারবিহীন অনুরাগের আতিশয্যে যেমন ভারতের মানুষ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল, ইউরোপীয় ক্রীড়াপদ্ধতির প্রতি অনুরাগের আতিশয্যে ভারতীয় ক্রীড়াপদ্ধতির সম্বন্ধেও আমাদের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যে সেইরূপ অশ্রদ্ধা ও অজ্ঞতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ইংরাজদের মধ্যে দুই প্রকার ফুটবল ক্রীড়ার প্রচলন আছে। ইহাদের একটিকে "এসোসিয়েশন" (Association) ফুটবল অথবা "সকার" (Soccer) বলা হয়। এই খেলাতে যে চামড়ার বল ব্যবহৃত হয় তাহা গোলাকার। ইহার পদ্ধতি—পায়ের লাথি দ্বারা বলকে চালিত করা। ইহাতে খেলোয়াড়দের পরস্পরের মধ্যে হাতাহাতি, টানাটানি, ঠেলাঠেলি, অথবা বলপূর্ব্বক কাড়াকাড়ি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই "এসোসিয়েশন" ফুটবল খেলাতে ভারতীয় যুবকগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গালী যুবকগণ যে ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারে, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ইংরাজদের মধ্যে অপর প্রণালীর যে ফুটবল খেলার প্রচলন আছে তাহার নাম "রাগ্‌বী" (Rugby) ফুটবল, অথবা "রাগার" (Rugger)। এই খেলাতে যে ফুটবল ব্যবহৃত হয় তাহা গোলাকার নয়, অণ্ডাকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত ভারী। এই খেলাতে দুই দলের মধ্যে বল-কাড়াকাড়ি লইয়া ভীষণ ধস্তাধস্তি, টানাটানি, ধাক্কাধাক্কি ও রীতিমত কুস্তীর প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। মোট কথা, "এসোসিয়ে-

শন" ফুটবল খেলা একদিকে যেমন প্রধানতঃ ক্ষিপ্রতার ও লক্ষ্যভেদের পরিচয়-পরীক্ষার ক্ষেত্র, "রাগ্‌বী" ফুটবল অপরদিকে সেইরূপ শক্তি, সাহস ও শারীরিক ক্ষমতের প্রতি সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীনতার পরিচয় ও পরীক্ষার স্থল। কলিকাতার খেলার মাঠে এই বীরোচিত "রাগ্‌বী" ফুটবল কেবল ইংরাজদিগকেই খেলিতে দেখা যায়। বাঙ্গালী ছাত্রগণ এখনও এই "রাগ্‌বী" ফুটবলের ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতরণ করিবার মত সাহস প্রদর্শন করে নাই বলিলেই চলে। ইহা হইতে স্বভাবতঃই ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে, "রাগ্‌বী" খেলিতে যে শক্তি, সাহস ও শারীরিক ক্ষমতের প্রতি সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীনতার প্রয়োজন, জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর তাহা নাই।

শক্তিশালী ঘোড়ার জাতি ছিল। বাংলার প্রতি ছেলে এবং মেয়ে যদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারিত যে, যে-বাঙ্গালীকে আজকাল লোকে চির-কাপুরুষ জাত বলিয়া বিদ্রূপ এবং অবজ্ঞা করিয়া থাকে, সেই বাঙ্গালী বাহুবলে সিংহলে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল,—সুদূর দ্বীপময় প্রশান্ত মহাসাগরে বাংলার বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিস্তার করিয়াছিল; গঙ্গারাঢ় যুগে সেই বাঙ্গালীর শৌর্য্য-গরিমা বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দারের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়া ভারতের পূর্ব্বাংশ বিজয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, এবং পাল যুগে সেই বাঙ্গালী ভারতের অধিকাংশ স্থলে বাংলার বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল; —তাহা হইলে বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর মনে এই

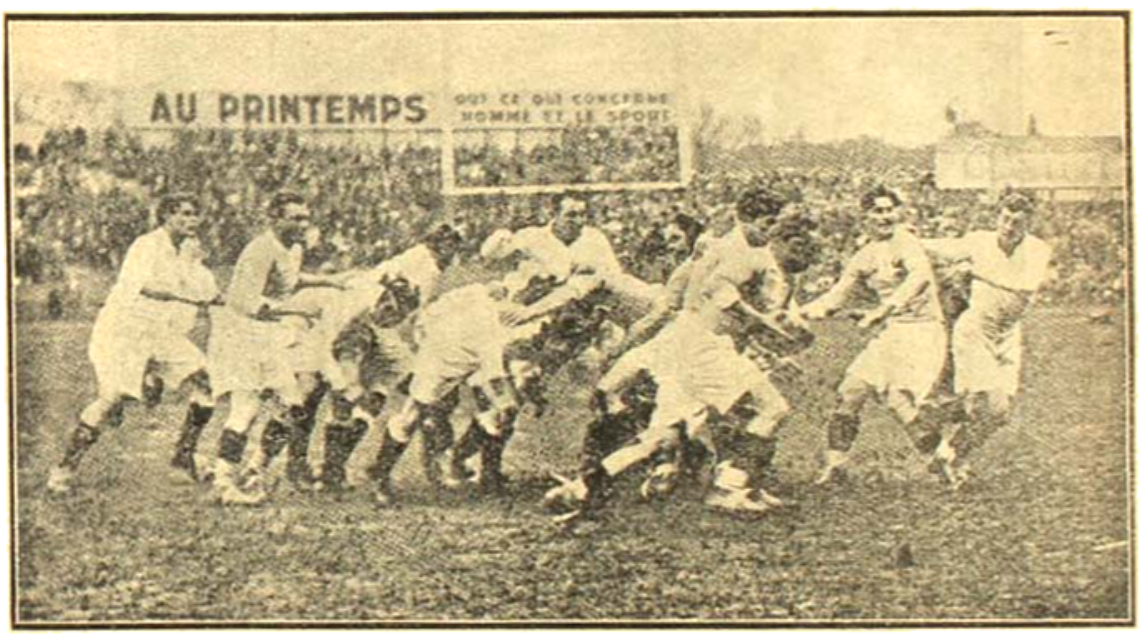

রাগ্‌বী ফুটবল খেলা

বাঙ্গালীর জাতিগত প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে উপরোক্ত অনুমানটি যে সম্পূর্ণ মিল খায় তাহা বলা বাহুল্য। কেন না, বাঙ্গালী যে একটি যুদ্ধে অনভ্যস্ত, ভীরু এবং কাপুরুষ জাতি ইহা কেবল বিদেশীয়দের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের মধ্যে নয়, বাঙ্গালীদের নিজেদের মধ্যেও একটা স্বতঃসিদ্ধের মত পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। অথচ ইতিহাসে আজ আমরা অকাট্য প্রমাণ পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব বহু যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী কি জলে কি স্থলে একটি উপলব্ধি জাগিয়া উঠিত যে, ভারত-ইতিহাসের লীলাময় পরিবর্ত্তনের বিচিত্র কারণাবলীর দুর্ভাগ্যময় সংযোগে আজ তাহাদের যে দশাই হউক, মূলতঃ তাহারা ভীরুর জাত নয়।

আজকাল আমরা সাধারণতঃ বাঙ্গালী বলিতে আমাদেরই মত আধুনিক শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাংলার যে সব অধিবাসীকে বুঝিয়া থাকি, ইহারা যে সেই প্রাচীন বাংলার গৌরবময় যুগের খাঁটি বাঙ্গালীর বংশধর নয়, ইহা আমরা যতদিন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি না করিব, ততদিন বাংলার প্রকৃত সত্তাকে বুঝিবার শক্তি

আমাদের হইবে না। বাংলার প্রকৃত সত্তার সঙ্গে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাংলার বর্ত্তমান জীবনের যে বাহুস্তর আমাদের আধুনিক শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রেণীর স্বল্পনামা "ভদ্র" সমাজ দ্বারা গঠিত, প্রাচীন গৌরবময় বাংলার প্রকৃত সত্তা সেখানে পাওয়া যায় না; তাহা খুঁজিতে হইলে এই আধুনিক শিক্ষা, ধন ও আভিজাত্যের কলঙ্ক-রঞ্জিত বাহুস্তরের অনেক নিম্নে আমাদের অনুসন্ধানদৃষ্টি নিবেশিত করিতে হইবে। এবং তাহা করিতে পারিলে যাহাদিগকে আমরা চলার ও অবজ্ঞার সমাজের নিম্নস্তরে রাখিয়া দিয়াছি, তাহারাই যে তাহাদের উন্নতির ক্ষেত্রে অধিকাংশে চেষ্টার মতই ফলপ্রসূ ও সার্থকতা-হীন হইয়াছে। বাংলার গৌরবময় পঞ্চদশ ও পাল যুগের অমিতবীর্য্য যোদ্ধাদের নির্য্যাতিত বংশধরগণ যে এখনও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং সমাজের শত অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও এবং আধুনিক শিক্ষার আলোক হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও, তাহারা যে তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের সামরিক প্রকৃতির কিয়দংশ এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং প্রাচীন বাংলার গৌরবময় রায়বেঁশে বীর নৃত্যের ও রায়বেঁশে ব্যায়াম-ক্রীড়ার পৌরুষময় প্রণালী বংশানুক্রমে চর্চ্চা করিয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়া রাখিতে

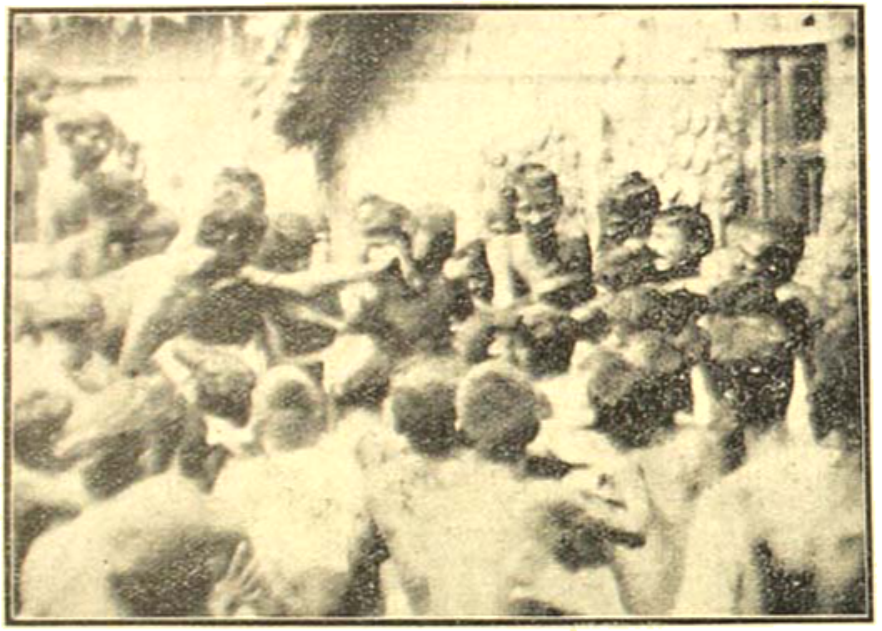

বাইসিকল-কাড়াকাড়ি খেলা

সমাজের বহুস্তরব্যাপী ভ্রান্ত বিধানপ্রসূত হীনতা সত্ত্বেও বাংলার আদিম সংস্কৃতির কিয়দংশ রক্ষা করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার ক্রমোপলব্ধির সন্ধান আমরা পাইব।

বাংলার পল্লীগ্রামে সাধারণ প্রচলিত হাডু ডু ডু খেলাটা যে খেলার মধ্যে ঘৃণ্যজাতীয় নয়, পরন্তু ইহা যে সামরিক প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, ইহার উপলব্ধি সম্প্রতি আমাদের দেশে কেহ কেহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এবং তাহার ফলে দেশের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই খেলার পুনঃপ্রচলন করিবার কিছু কিছু চেষ্টা দেখা গিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই চেষ্টা আমাদের দেশের সামাজিক সমর্থ হইয়াছে,—কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার আবিষ্কার করিবার এবং বাংলার সাধারণের সমক্ষে তাহা প্রচার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। 'কাঠি-নাচ' নামক আর একটি প্রাচীন বাংলার সামরিক বীরোচিত নৃত্যও যে ইহারা চর্চ্চা করিয়া রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও আবিষ্কার করিবার এবং প্রচার করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। এবং—তাহার ফলে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মধ্যেও যে এই সকল বীরোচিত নৃত্যের পুনঃপ্রচলনের আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে আশা হইতেছে যে, এই প্রণালী অবলম্বন

করিয়া আমরা প্রাচীন বাংলার পৌরুষধারার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিব।

সম্প্রতি ক্রীড়ার ক্ষেত্রে এই প্রণালীর আরও একটি আবিষ্কার করিবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে, যাহা হইতে আমরা বুঝিব, বাঙ্গালী যে ইউরোপীয় "রাগ্‌বী" ফুটবল ক্রীড়া করিতে অপটু, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কেবল তাহাই নহে, বাংলার নিভৃত পল্লীগ্রামে এখনও বাঙ্গালী—আমাদের স্বদেশবাসী "ভদ্র" বাঙ্গালী নয়, বাংলার পল্লীগ্রামের খাঁটি বাঙ্গালী চাষারা আধুনিক শিক্ষার কৃত্রিম বলক্ প্রাপ্ত হয় নাই—এমনই একটা খেলা খেলিয়া থাকে যাহার সহিত বিলাতী "রাগ্‌বী" ফুটবল খেলার অভাবনীয় সাদৃশ্য আছে।

এই খেলার নাম নারিকেল কাড়াকাড়ি। ভাদ্র মাসে নন্দোৎসব এবং রাধাষ্টমী এই দুইটি উৎসব উপলক্ষে পল্লী-বাসীরা ইহা সাধারণতঃ খেলিয়া থাকে। গ্রামের দুই পাড়ার লোক অথবা দুই বিভিন্ন গ্রামের লোক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া এই খেলা খেলিয়া থাকে। খেলার প্রারম্ভে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়। একজন কেহ মধ্যস্থ হইয়া এই দুই দলের মধ্যস্থলে একটি নারিকেল শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ এই নারিকেলের অধিকার লইয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে তুমুল কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। প্রত্যেক দলের উদ্দেশ্য হয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বাধা পরাভব করিয়া নিজের পাড়াতে অথবা নিজের গ্রামে নারিকেলটি লইয়া যাওয়া; অথবা যে পাড়ার অথবা যে গ্রামের দল নিজের পাড়ায় অথবা গ্রামে নারিকেলটি লইয়া যাইতে পারে তাহারাই জয় হয়। এই কাড়াকাড়ি ব্যাপারে যে শারীরিক বলপ্রয়োগের প্রতি সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন নির্ম্মম ধ্বস্তাধ্বস্তি, ঠেলাঠেলি ও কুস্তি প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহা প্রকৃত যুদ্ধেরই অনুরূপ।

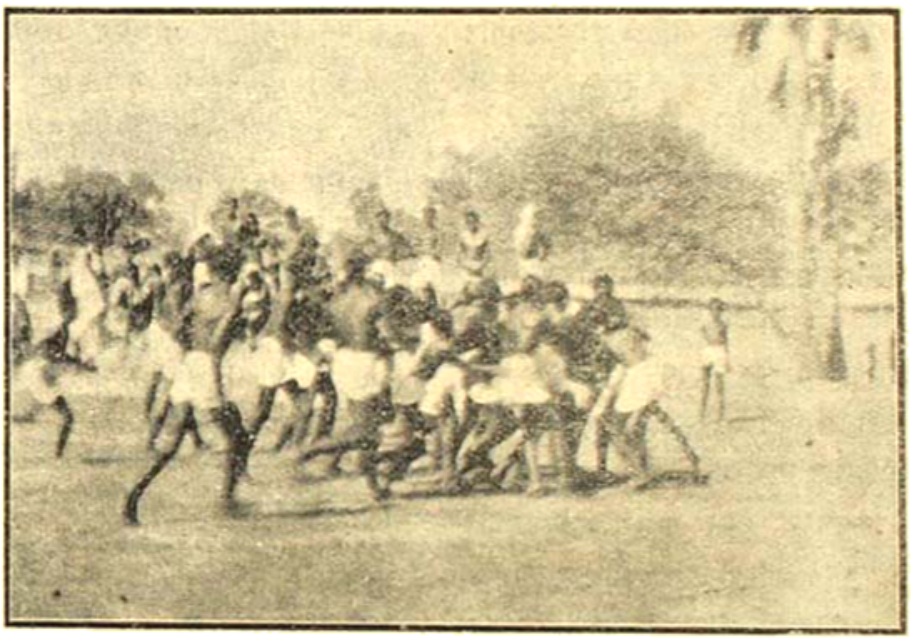

নারিকেল-কাড়াকাড়ি খেলা

এবং—ইহা যে একটি সামরিক ক্রীড়া, ও যে জাতির মধ্যে এই ক্রীড়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা যে একটি বাস্তব যোদ্ধার জাতি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দুইটি হিন্দু উৎসবের সঙ্গে এই ক্রীড়ার সম্বন্ধ থাকিলেও ইহার চর্চ্চা কোন জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে, এবং পল্লীগ্রামের সকল জাতির হিন্দু এবং মুসলমানগণ ইহাতে অবাধে যোগ দিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে বিলাতী "রাগ্‌বী" ক্রীড়ার বর্ণনা করা হইয়াছে, এই ক্রীড়া তাহা হইতে কোন ক্রমেই কম পৌরুষাত্মক ও তেজাত্মক নহে,

বরং বেশী পৌরুষব্যঞ্জক ও তেজোদৃপ্ত। কলিকাতায় এবং অন্যান্য সহরে আজকাল বাঙ্গালী ছাত্রগণ যে প্রণালীর ফুটবল ক্রীড়া করিয়া থাকেন,—সেই "এসোসিয়েশন" জাতীয় ফুটবল ক্রীড়া হইতে এই ক্রীড়া অনেক অধিক তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা-মূলক। ইহার একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, রবারের ফুটবল অথবা ব্লাডার এর ব্যয়সাপেক্ষ কোনও উপাদানের বালাই নাই বলিয়া ইহা আমাদের গরীব বাংলা দেশের মত দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাহার ফলে এই খেলার চর্চ্চা ফুটবল ক্রীড়ার মত গুটিকতক ছাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হইয়া দেশের সমগ্র বালক ও প্রৌঢ় শ্রেণীর মধ্যে একসঙ্গে বিনাব্যয়ে প্রচলিত হইতে পারে। এই খেলাটির প্রণালী এত সহজ যে এই খেলার দল বাঁধিতে ফুটবল খেলার এগারো জন খেলোয়াড়ের সংখ্যার মত কোন অপরিবর্ত্তনীয় সংখ্যাতে ইহাকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না। অবস্থানুসারে যে কোন সংখ্যার খেলোয়াড় প্রতি দলে যোগ দিতে পারে।

বীরভূম জেলার বোলপুর অঞ্চলের পল্লীগ্রামে এই খেলার এখনও প্রচলন আছে। এই অঞ্চলে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন বিদ্যালয়েরই কর্ত্তৃপক্ষগণ যে বাংলার এই প্রাচীন নিজস্ব সামরিক ক্রীড়াকে লক্ষ্য করিয়া এতদিন সাদরে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ করেন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি শুনিয়াছি যে বীরভূম ব্যতীত আরও কোন কোন জেলার পল্লীগ্রামে এই ক্রীড়া এখনও প্রচলিত আছে। এই খেলার পুনঃপ্রচলন করিতে পারিলে বাঙ্গালী ছেলেদের শক্তি, সাহস ও নির্ভীকতা-বিকাশের প্রকৃষ্ট সহায়তা হইবে,—এবং অনতিবিলম্বে বাংলার সকল বিদ্যালয়ে ইহার প্রবর্ত্তন করা উচিত বলিয়া মনে হয়।

ইহা সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমান লেখকের ক্ষুদ্র চেষ্টা ও আগ্রহের ফলে এই খেলার প্রচলন বীরভূমের অনেক বিদ্যালয়েই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

পল্লীবাসীরা বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে এই খেলা খেলিয়া থাকে, তাহার মধ্যে নিছক ঠেলাঠেলি, টানাটানি, কাড়াকাড়ি ও ধস্তাধস্তি ছাড়া আর কোন নিয়মের বালাই নাই। কিন্তু ইহাতে সহজ কয়টি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং ফুটবল খেলার মাঠের মত একটি নির্দ্দিষ্ট মাঠে এই ক্রীড়াকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একজন মধ্যস্থ (Referee) নিযুক্ত করিয়া এই খেলাটিকে বিদ্যালয়ের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে খেলিবার উপযোগী করিয়া সহজেই লওয়া যাইতে পারে।

সম্প্রতি বাংলার শাসীর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জেম্‌স্ বিউক্যানেন (Mr. James Buchanan) বর্ত্তমান লেখকের নিকট হইতে এই নারিকেল-কাড়াকাড়ি ক্রীড়ার কথা অবগত হইয়া উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সাগ্রহে সমর্থন করিয়াছেন। এবং, তাঁহার নিকট হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে, ঠিক হুবহু এই নারিকেল-কাড়াকাড়ির মতই একটি ক্রীড়া স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা একটা নিরেট রবারের বল লইয়া এখনও খেলিয়া থাকে। মিঃ বিউক্যানেন অনুমান করেন যে, এই খেলা হইতেই বর্ত্তমান "রাগ্‌বী" খেলার উৎপত্তি হইয়াছে।

বাংলার যাবতীয় শিক্ষালয়ের শিক্ষকগণ কি তাঁহাদের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে আমাদের বাংলার নিজস্ব এই নারিকেল-কাড়াকাড়ি ক্রীড়ার প্রবর্ত্তন করিবেন? জাতীয় সংস্কৃতি-প্রসূত ক্রীড়া প্রচলন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশে ভয়ের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এবং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ের ইহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। শাসীর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বিউক্যানেন আমাকে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে সেই জাতির সংস্কৃতিমূলক ক্রীড়া প্রচলনের মূল্য যে বিশেষ ফলপ্রদ ও মঙ্গলজনক তাহা তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করেন; এবং সেইজন্য বাংলার গ্রামে গ্রামে যে সকল খাঁটি বাঙ্গালী ক্রীড়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহার সন্ধান করিয়া সেই-গুলির চর্চ্চা বাংলার শিশু ও যুবকদের মধ্যে করিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি আমাদের অজ্ঞ অবজ্ঞা ও অজ্ঞতার ফলে জাতীয় সংস্কৃতিপ্রসূত ক্রীড়াগুলি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা জাতির পক্ষে একটি মহা দুর্ভাগ্যের কথা।

শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত র‍্যামসবটম (Mr. Ramesbotham) মহাশয় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে* বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক দেশের শিক্ষালয়গুলি সে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির এক একটি বাহ্যিক মূর্ত্তিমান অভিব্যক্তি স্বরূপ, এবং এই ক্ষেত্রে স্বদেশীভাবের সম্যক প্রয়োগ পরম মঙ্গলকর। আমরা এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

* Teachers' Journal (Sept. 1931).

চির-সুহৃদ্

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

তুমি গেছ বহু দূরে আমার জানার পরপারে,
তবু মনে হয় যেন, আছো তুমি কাছে একেবারে!
আমার কিশোর আঁখি পুরুষের অপূর্ব্ব স্বরূপ
দেখেছিল তোমার মাঝারে।—কত-ভাবী, কেহ চুপ,
কেহ বীর, ভীরু কেহ, কত কে যে এল তার পরে;
ফুলদোলে আবীরের মত, স্মৃতি পড়ে' গেছে ঝরে'
চিহ্নহীন, আঁকে নাই কোন ছবি নয়নে কি মনে।
তাই আজ নিরালায়, পথ চেয়ে, পরশন গ'ণে,
কেঁদে কাটে নাক দিন; কাঙাল যে নিয়ে গেছে দান,
লোভী সাথী, হিসাবের দেনা-লেনা পাওনা সমান।
তোমারে দেবার ছিল আমার যে অনেক সঞ্চয়,
আশা-ভালবাসা ভরা একখানি সমগ্র হৃদয়।
চাও নাই, লও নাই, তাই মোর ভরা মনোমাঝে
হে চির-সুহৃদ্ তব অধিকার অচল বিরাজে।

উর্ব্বশী

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মধ্যে "উর্ব্বশী" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ছন্দে, ভাবে, ভাষায় অতুলনীয়। উর্ব্বশীর উৎপত্তি কবি সমুদ্রমন্থন কালে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মথিত সাগরে।"

আর একটি কবিতায় কবি উর্ব্বশী ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।
একজনা উর্ব্বশী সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।"

লক্ষ্মী যে সমুদ্রমন্থনের সময় ক্ষুব্ধ সলিলরাশি হইতে উঠিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। উর্ব্বশীর উৎপত্তি সম্বন্ধে সমুদ্রমন্থনের বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

কলিকাতার কোন সভায় এই কবিতা আলোচনা করিয়া আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। উর্ব্বশীর আবির্ভাব কবি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই স্বীকার করিয়া রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে দেখাইয়াছিলাম যে ঋগ্বেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে, রামায়ণে, মহাভারতে ও অপর গ্রন্থাদিতে উর্ব্বশীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সভাস্থলে এই মতের প্রতিবাদ হয়। বক্তা বলেন কবি যাহা ইচ্ছা কল্পনা করিতে পারেন কিন্তু আমি, সমালোচক, কেমন করিয়া বলি যে সমুদ্রমন্থন কালে উর্ব্বশীর উৎপত্তি হয়? পুরাণে লিখিত আছে নারায়ণের উরুদেশ হইতে উর্ব্বশী নির্গত হইয়াছিলেন। আমি কেমন করিয়া এই পৌরাণিক তথ্যের অপলাপ করি? প্রতিবাদের অর্থ এই যে কবিকল্পিত মতের অনুসরণ করা আমার পক্ষে গুরুতর

অপরাধ। কবির মার্জ্জনা থাকিতে পারে কিন্তু আলোচকের মার্জ্জনা নাই।

প্রতিবাদী আমার প্রবন্ধ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না কিন্তু তিনি কৃতবিদ্য ও সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার ন্যায় অনেকেই মনে করিতে পারেন যে সমুদ্রমন্থনে উর্ব্বশীর আবির্ভাব কল্পনা করা ভ্রমাত্মক। প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক কল্পনাই উচ্চ এবং রবীন্দ্রনাথের কল্পনা দুর্ব্বোধ ও ব্যর্থব্যঞ্জিত। সেই কথা বুঝাই।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে পুরূরবা ও উর্ব্বশীতে কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। পুরূরবা বলিতেছেন, তুমি সলিলরাশি হইতে পতনোন্মুখ বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল রূপে আগমন করিয়াছ, এবং পুরূরবার জন্য উপাদেয় উপহার আনয়ন করিয়াছ। উর্ব্বশী বলিতেছেন, আমি প্রথম প্রভাতের ন্যায় তোমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছি··· ধনুর ন্যায় আমাকে দৃঢ় করা-করিন। ইহা হইতে উর্ব্বশীর জল হইতে উত্থান অথবা আবির্ভাব সূচিত হইতেছে। ঋগ্বেদে নারায়ণের নাম কোথাও নাই, নারায়ণের উল্লেখ হইতে উর্ব্বশীর উৎপত্তির কথা ত দূরে থাকুক। উর্ব্বশী যে অপ্সরা এ কথাও বেদে কোথাও পাওয়া যায় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে উর্ব্বশীর বিস্তারিত বিবরণ আছে, নারায়ণের নামগন্ধ নাই।

সমুদ্রমন্থনের বিবরণ ভাগবত ও অপর গ্রন্থে আছে। রামায়ণের অপেক্ষা ভাগবতের বৃত্তান্ত বড় কিন্তু রামায়ণ অধিক প্রাচীন। উভয় গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে যে মথিত সমুদ্র হইতে অপ্সরাগণ উত্থিত হইয়াছিলেন। কোন গ্রন্থে কোন অপ্সরার নাম নাই। তিলোত্তমা, রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতি নাম পরের কল্পনা। অপ্ ধাতুর অর্থ জল। যাহারা জলবিহার করিতে ভালবাসে তাহারা অপ্সরা। রামায়ণের মতে সলিলের সারভূত রস হইতে উত্থিত হওয়াতে ইহাদের নাম অপ্সরা। মহাভারতে উর্ব্বশী-অর্জ্জুন সংবাদ বিবৃত হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে কালিদাস পুরূরবার এবং উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত চিত্রিত করিয়াছেন। পুরাণের অনুসরণ করিয়া উর্ব্বশীকে নারায়ণের উরুসম্ভবা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে অপ্সরাদিগের সহিত উর্ব্বশীর কোন সাদৃশ্য নাই। উর্ব্বশী বৈদিক যুগের বা তাহার পূর্ব্বের কল্পিত মূর্ত্তি। যে ভাবে ঋগ্বেদে লিখিত আছে তাহাতে মনে হয় বহু প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য ঋষিরা উর্ব্বশীর নাম জানিতেন, এবং উর্ব্বশী নিসর্গের কোন লীলার মূর্ত্তি। বৈদিক কল্পনা অনেক স্থলে নিসর্গের অনুগামিনী। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর কথা রূপক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। পুরূরবা সূর্য্য, উর্ব্বশী প্রভাত ও প্রদোষের সন্ধ্যা। আর এক উপাখ্যানে কথিত আছে উর্ব্বশীর দুইটি মেষশাবক ছিল, একটি শ্বেত অপরটি কৃষ্ণবর্ণ। এই দুই মেষশিশু দিবা ও রাত্রি। উর্ব্বশী বলিতেছেন, আমি প্রথম প্রভাতের ন্যায় চলিয়া গিয়াছি। কবি রবীন্দ্রনাথ উর্ব্বশীকে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা বলিয়া আবাহন করিয়াছেন।

সাগরসম্ভবা এই সুন্দরী বিশ্বজগতের কামনার মহীয়সী মূর্ত্তি—দেবমানববন্দিতা, মুনিমানসমথনকারিণী, কবির আরা-

ধনার সাধনী। সুরসভায় নৃত্যকালে তাঁহার বক্ষবাসচ্যুত যদি উত্তরীয় রূপে দৃষ্ট হয়, তাঁহার নৃত্যছন্দে সমুদ্রতরঙ্গ বিক্ষোভিত হয়, সসংকোচপূর্ণ বয়সীর অঞ্চল কাঁপিয়া উঠে, পুরুষ আত্মহারা হয়। আকাশপ্রান্তে বিদ্যুৎ উর্বশীর ছিন্ন মেখলা। প্রকৃতির সাহসৌন্দর্য্য উর্বশীতে মিলিত হইয়াছে। আধুনিক কবি বৈদিক ও পৌরাণিক রূপকের বিচিত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, অথচ অপসরার কুৎসিত প্রকৃতি পরিহার করিয়াছেন। যে পুরাণকার উর্বশীকে নারায়ণের উরুসম্ভবা বলিয়াছেন তিনি বৈদিক-পরম্পরা বিস্মৃত হইয়াছেন। বেদে উর্বশীর নাম আছে, নারায়ণের নাম নাই। বৈদিক ঈশ্বরের উপাধি অজ। সকল অপসরাই সমুদ্রমন্থন কালে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, উর্বশীরই বা অন্যরূপ উৎপত্তি হইবে কেন? বেদে সমুদ্রমন্থনের বিবরণ না থাকিলেও উর্বশীর সলিল হইতে উত্থানের উল্লেখ আছে। অতএব রবীন্দ্রনাথের কল্পিত উর্বশীর উৎপত্তি বেদানুমোদিত এবং সমালোচক নিঃসংশয়ে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

স্বত্ববাদের উৎপত্তি ও পরিণতি

ডাঃ শ্রী নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্-এ, ডি-এল্

মানুষ জন্মে তার দেহ লইয়া—দেহের ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া। আর সে জন্মে তার চিত্ত লইয়া—চিত্ত বা আত্মার ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া। দেহের ক্ষুধা বড় প্রবল, ইহার তাড়া বড় বেশী—তাই মানবের আদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের কর্ম্মজীবনের একটা প্রকাণ্ড অংশ তার দেহের এই বিরাট ক্ষুধা মিটাইবার আয়োজনে অশ্রান্ত ভাবে নিযুক্ত আছে। কিন্তু যত বড়ই হোক্ দেহের ক্ষুধা, আত্মার ক্ষুধাও তার মিটাইতেই হয়। সে ক্ষুধা দেহের ক্ষুধার মত এত তীব্র নয়, কিন্তু দেহের ক্ষুধার চেয়ে তাহা অনেক বড় এই হিসাবে যে দেহের ক্ষুধার একটা সীমা আছে, আত্মার ক্ষুধার সীমা নাই। অনন্ত অসীম সে ক্ষুধা—যত দিন যায়, যত তৃপ্তি পায়, ততই সে বাড়িয়া যায়! তার আকাঙ্ক্ষার কোনও সীমা নাই, কোনও বাধাকেই সে চরম বলিয়া স্বীকার করে না, সব বাধা ভেদ করিয়া তার তৃপ্তির সন্ধান করে—এবং সেই সন্ধানে কত না অসাধ্যসাধন করিয়াছে মানব, আর কত অসাধ্যসাধন সে করিবে!

মানবের ইতিহাসের আদি যুগে তার আকাঙ্ক্ষার পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্যই তাহার করিতে হইত অশেষ পরিশ্রম, অশ্রান্ত চেষ্টা। যে ক্ষুধার অন্ন আমাদের সম্মুখে আজ অনায়াসে রাঁধা বাড়া হইয়া আসে তাই দিনের পর দিন সংগ্রহ করিতে তাহাকে হইত সংগ্রামে। শিকার করিয়া আনিতে হইত কত পশু, কাড়িয়া আনিতে হইত তার জীবনের সহচরী, সংগ্রাম করিয়া রাখিতে হইত আহৃত সম্পদ।

ক্রমে সমাজবন্ধনের বেষ্টনী প্রসারিত হইল। মানুষ দিনের পর দিন নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক লোকের পক্ষে বিনাযুদ্ধে একত্র বাস করা সম্ভব করিয়া তুলিল। গড়িয়া উঠিল বিবিধ সমাজব্যবস্থা, যার ফলে ছোট ছোট গোষ্ঠী বা পরিবার একসঙ্গে পরস্পরের সহিত শৃঙ্খলার সহিত ব্যবহার করিয়া বিনাযুদ্ধে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে এই সমাজবন্ধন গোষ্ঠী বা পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িল, দুই বা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বন্ধন বাঁধিয়া ক্রমে জাতি গড়িয়া উঠিল—আরও কত না সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ক্রমে বড় বড় রাষ্ট্র গঠিত হইয়া বিস্তীর্ণ দেশে বহুসংখ্যক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ সম্ভব হইয়া উঠিল—বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠিল।

নানা জটিল সম্বন্ধবন্ধনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক

নিয়মিত হইল। অনেক অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। তার মধ্যে একটি বস্তু কালক্রমে সব চেয়ে বড় এবং শক্তিমান হইয়া উঠিল—সেটি স্বত্বস্থ Property

এই বাড়ীখানা আমার সম্পত্তি বলিতে আমি বুঝি যে ইহা আমার যথেচ্ছ ব্যবহার ও বিনিয়োগ করিবার অধিকার আছে, আমার বিনা অনুমতিতে কারও ইহা ব্যবহারের অধিকার নাই। কেহ যদি আমার এ অধিকারের ব্যতিক্রম করিয়া ইহা অধিকার করিতে আসে তবে আমি শুধু আমার নিজের শারীরিক বলে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি বা না পারি, সমাজের সংহত শক্তির উদ্বোধন করিয়া আইনের সহায়তায় তাকে আমি নিরস্ত করিতে পারিব। আর এই আইনের সহায়তায় আমি যাহা রক্ষা করিতে পারি সে শুধু আমার দখলের সম্পত্তি নয়—যাহা কিছু আমার স্বত্বের বিষয়ীভূত সে সব। মানবের অতি আদি যুগে এমনি বিশিষ্ট বিধির কারও এমনি সমাজরক্ষিত অধিকার ছিল না। যদি কেহ কোনও বস্তু শিকার করিয়া বা অন্য উপায়ে সংগ্রহ করিত, তবে তাহা রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ছিল তার নিজের শক্তি। তার শক্তি যতটুকু রক্ষা করিতে পারে ততটুকুই তার ভোগ করিবার অবসর ছিল।

আদিম সমাজ যখন গড়িয়া উঠিল তখন সমাজবাসী মানুষের পরস্পর সম্পর্ক নিয়মিত করিবার জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং লোকে অভ্যাস, আচার ও সামাজিক নিয়মের বশে পরস্পরের কতকগুলি অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অতি আদিম যুগে এই সব নিয়ম বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বত্ববাদ ছিল না। প্রাচীন টিউটনদের ব্যবহার আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাদের ভিতর স্বত্বের ধারণা গড়িয়া উঠিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল কিন্তু ভুক্তির (Possession) অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল।

মানুষের ক্ষুধা ও অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির উপাদান আসে প্রকৃতি হইতে। ভূমিতে যে ফল মূল বা ফসল জন্মে, খনিতে যে খনিজ পাওয়া যায়, শিকারে যে বন্য পশুপক্ষী পাওয়া যায় তাহা হইতেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়, —কতক প্রত্যক্ষ ভাবে কতক পরোক্ষ ভাবে। কতক জিনিষ আমরা জগতে যেমন ভাবে পাই তেমনি লইয়া ব্যবহার করি, আর কতক সেই উপাদান লইয়া তাহা নিজের পরিশ্রম দ্বারা গড়িয়া পিটিয়া আপনার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির উপযোগী করিয়া তুলি। মোটরকার বা এরোপ্লেনের মত জটিল যন্ত্রপাতিই হউক বা ডাল পাতের মত সাধারণ বস্তুই হউক, সবই প্রকৃতিদত্ত উপাদানমূলক।

আদিকাল হইতে মানব চেষ্টা করিয়া আসিতেছে প্রকৃতি হইতে আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং তাহা রূপান্তরিত করিয়া তাহার দ্বারা আপনার তৃপ্তি ও সুখ সম্পাদন করিবার। যখন কোনও আইন ছিল না, প্রত্যেকের আপনার শক্তিই ছিল আহৃত উপকরণের উপভোগাধিকারের একমাত্র নিয়ামক, তখন প্রকৃতির দেওয়া উপাদানকে উপযুক্ত পরিমাণে আপন প্রয়োজনে নিযুক্ত করিবার সম্ভাবনা ছিল অতি সঙ্কীর্ণ। যখন ক্রমে লোকে অভ্যাসবশে পরস্পরের দখল বা ভুক্তির অধিকার স্বীকার করিল তখন প্রভূত সম্পদের উপভোগ ও তাহা হইতে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের অবসর অনেকটা প্রসারিত হইয়া গেল। তখন কোনও বস্তু সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিলে লোকে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ভাবিতে পারিত যে সেটা তার ভোগে আসিবে।

এই যে দখলের অধিকার,ইহা হইতে অগ্রিম ক্রমে স্বত্বের অধিকার। স্বত্বটা ভুক্তির চেয়ে অনেক বেশী প্রসর। দখলের অধিকারটা শুধু সেই জিনিষেই থাকে যেটা নিজের দখলে থাকে। কিন্তু স্বত্বের যে অধিকার তাহা দখল ছাড়াও থাকে। দখল করা যায় অপেক্ষাকৃত কম জিনিষ, স্বত্ব অর্জ্জন করা যায় অনেক জিনিষে। একটা বস্তু জন্তু ধরিলে আমার তাতে অধিকার জন্মে। আমি যদি সেই জন্তুটা ধরিয়া একটা গাছে বাঁধিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাই তবে তাতে আমার দখল থাকিবে না। সুতরাং ভুক্তিবাদ যতদিন ছিল ততদিন সে অবস্থায় আর কেহ সে জন্তুটা খুলিয়া লইয়া গেলে আমার ফিরিয়া আসিয়া তাহা উদ্ধারের কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু যখন স্বত্ববাদ স্বীকৃত হইল তখন আমার দখল থাক্ বা না থাক্, স্বত্ব আমারই থাকিল। সুতরাং তখন যদি কেউ আমার অধিকৃত জন্তু খুলিয়া লইয়া যায় তখন তাহার নিকট হইতে তাহা উদ্ধার করিবার অধিকার আমার জন্মিল।

সুতরাং স্বত্ববাদ স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি-লব্ধ বা রূপান্তরিত দ্রব্যের উপভোগের সুযোগ অনেক বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় এবং পরে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্ভব হওয়ায় স্বত্ববাদের উপকারিতা আরও বাড়িয়া গেল।

প্রকৃতি হইতে বস্তু আহরণ করিয়া তাহাকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির মত বিনিয়োগ সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। এবং সেই বিনিয়োগের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সভ্যতার বৃদ্ধি হইয়াছে। স্বত্ববাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে কাজেই মানুষের সভ্যতা খুব বেগের সহিত অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই। স্বত্ববাদের মূলে হয় দ্রব্য-বিনিময় ও বিক্রয়। তাহার দ্বারা মানুষের উপভোগের শক্তি কেবল নিজের শক্তির দ্বারা আহৃত বস্তুতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া প্রসারিত হয় অপরের শক্তি দ্বারা আহৃত বা গঠিত বস্তুর উপর। আমার নিজের প্রয়োজনীয় সব জিনিষ যদি নিজেই জোগাড় করিয়া ও গড়িয়া লইতে হয় তবে অল্প জিনিষই আমরা উপভোগ করিতে পারি। কিন্তু বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা আমাদের পক্ষে এমন অনেক জিনিষ উপভোগ করা সম্ভব হইয়াছে যাহা আমরা নিজে সৃষ্টি করিতে পারি না। এমনি নানা উপায়ে স্বত্ববাদের সৃষ্টির পরে মানুষের উপভোগের শক্তি, তার ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির শক্তি অশেষ পরিমাণে বাড়িয়া গেল। অল্প চেষ্টায় অধিক ফললাভ করা সম্ভব হইল, অবসর বাড়িয়া গেল, এবং তার ফলে মানসিক উন্নতিসাধন করা বুদ্ধি-বৃত্তির স্ফুরণ করা, আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাধন প্রভৃতি সকলই সম্ভব হইল।

স্বত্ববাদের অভিব্যক্তির ইতিহাস এক হিসাবে সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস। প্রথমে যে সব বস্তুতে স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল তার সংখ্যা ছিল অল্প। সেকালের জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যে সব জিনিষের দরকার হইত, যাহার আদানপ্রদান বিনিময় বা বিক্রয় হইত তাহাতেই স্বত্ব হইত। অন্য বহু পদার্থ ছিল যার সম্বন্ধে স্বত্ব থাকিবার কথা কেহ কল্পনা করিত না। আজও কোনও দেশেই আকাশ বা বাতাসে কারও স্বত্ব নাই, সাগরের জলে কারও স্বত্ব কোনও ব্যবহারশাস্ত্র কল্পনা করে না। কেন না এ-সব বস্তু বিনিয়োগের অযোগ্য, ইহা লইয়া কেনা-বেচা চলে না। তেমনি অনেক স্থানেই এমন সব জিনিষ আছে যাহা লইয়া কারবার চলে না, তাতে সে স্থানে স্বত্বের সম্ভাবনা কল্পনা করে না। কলিকাতায় এক মুঠি মাটি বা এক আঁটি ঘাস একটা সম্পত্তি—তার কেনা-বেচা চলে, পাড়া-গাঁয় তাহা সম্পত্তি বলিয়া কেহ মনে করে না। বর্ব্বর জাতিদের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে তারা সম্পত্তি বলিয়া মনে করে খুব অল্প জিনিষ। যারা শুধু শিকার করিয়া খায়, দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় তাদের ভিতর ভূমিকে কেহ কখনও সম্পত্তি বলিয়া মনে করে না, গাছ পাথরকে সম্পত্তি মনে করে না, সোনা বা হীরকের খনিকেও তারা সম্পত্তির মধ্যে গণনা করে না। তেমনি সুদূর অতীত যুগে সকল দেশেই সম্পত্তির গণ্ডী অল্পবিস্তর সঙ্কীর্ণ ছিল।

অতি প্রাচীন রোমে যাহা সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত, যাহা লইয়া ধরিদ-বিক্রী (Mancipation) চলিত তার একটা পরিচয় পরবর্ত্তী রোমক ব্যবহারে টিকিয়া আছে। পরবর্ত্তী কালে যখন আরও অনেক নূতনপ্রকার বস্তুতে স্বত্ববাদ সম্প্রসারিত হইল তখন দ্রব্যের দুই প্রকার ভাগ করা হইয়াছিল, Res mancipi, এবং Res nec mancipi. Res mancipi ছিল সেই সব বস্তু যাহা অতি আদিম যুগে সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। সে বস্তুর সংখ্যা খুব বিস্তীর্ণ নয়। তার ভিতর ছিল গরু ঘোড়া দাস দাসী, চাষবাসের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কয়েকটি বস্তু। ভূমি তার ভিতর আগে ছিল না, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ভূমিও Res mancipi বলিয়া পরিগণিত হয়।

সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যখন যে বস্তুর প্রয়োজনীয়তা পরিজ্ঞাত ও স্বীকৃত হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে স্বত্ববাদ তাহার উপর প্রসারিত হইল; এমনি করিয়া স্বত্বের বিষয়বস্তু ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। এখন সম্পত্তি বলিতে আমরা বুঝি শুধু ঘোড়া গরু মহিষ বা নিজের ঘরবাড়ী ক্ষেত বা ফসল নয়, এমন অনেক সব বস্তু যেগুলি বস্তুই নয়, যেমন কপিরাইট, পেটেণ্ট—ট্রেড্ মার্ক ও গুড্ উইল সম্পত্তি হইবার অর্দ্ধপথে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কালক্রমে এই স্বত্ববাদের বৃদ্ধি ও পরিণতির ফলে এমন

একটা অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্ভাবনার মধ্যে কোনও সীমা রহিল না। স্বত্ববাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল সামান্য সম্পত্তি লইয়া। শ্রমের দ্বারা প্রকৃতির গর্ভ হইতে যে বস্তু আহরণ করা হইল তাহার উপভোগের পথে বিঘ্ন দূর করিয়া উপভোগের নিশ্চয়তা সম্পাদনই ছিল স্বত্ববাদের প্রয়োজন। যথেষ্ট বিনিয়োগ করিবার শক্তি আদিম ব্যবহারে কখনই সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয় নাই। বরং বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের অন্ত ছিল না। কিন্তু স্বত্ববাদের পরিণতি-মুখে সেই সব বিধি-নিষেধ করিয়া পড়িল—স্বয় ও যথেষ্ট বিনিয়োগিতা সমার্থক হইয়া দাঁড়াইল। তারপর সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যবহারে এমন কতকগুলি বিধি দেখিতে পাই যাহাতে মনে হয় যে সম্পত্তির অতিবৃদ্ধি হওয়া সেকালে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে সব বাধাও ক্রমে নিঃশেষ হইয়া গেল। এখনকার যা আইন তাহাতে সমস্ত পৃথিবী যদি কেহ কিনিয়া লইতে পারে তবে পৃথিবীর সর্বস্ব তার সম্পত্তি হইতে কোনও বাধা নাই।

নানা কারণে ক্রমে স্বত্ববাদ হইতে গুরুতর অসাম্যের উদ্ভব হইতে লাগিল। মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ সাম্য কোনও যুগেই ছিল না। সুদূর অতীতে এই অসাম্যের ভিত্তি ছিল শক্তির তারতম্য। যার বাহুবল বা সাহস বেশী ছিল, যে দল পাকাইয়া নেতৃত্ব করিতে পারিত সে হইত বড়, যারা শক্তিতে খাটো তারা হইত ছোট। আবার বাহুবলে না থাকিলেও বিদ্যা বা সাধনাবলে যারা দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইত তাহাদেরও প্রাধান্য ছিল। কালক্রমে শক্তির প্রাধান্য বংশগত হইয়া জাতিভেদে পরিণত হইয়াছিল।

স্বত্ববাদের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গুরুতর অসাম্যের সৃষ্টি হইয়াছে সেটা ধনের অসাম্য। মানুষের আদিম যুগে যার যত প্রয়োজন ততটুকু বস্তু সে প্রকৃতির গর্ভ হইতে সংগ্রহ করিত, উপভোগ করিত যথাশক্তি। স্বত্ববাদের উৎপত্তির ফলে লোকের পক্ষে আবশ্যকের অতিরিক্ত বহু সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইল। আর শারীরিক শক্তি না থাকিলেও সম্পদের শক্তি দিয়া অনেক বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব হইল। কালক্রমে যে শক্তিহীন হইয়াও ধনবান, সে ধনহীনের শক্তি কেনা দিয়া ব্যবহার করিয়া সম্পদ আহরণ করিতে লাগিল। আর যে যাহা আহরণ করিল তাহা বংশানুক্রমে তাহারই রহিল।

তাই ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়া গিয়াছে পৃথিবীতে যে, নিজের শক্তি প্রয়োগে ভূমির ব্যবহার করিবার যার শক্তি নাই এমন এক শ্রেণীর লোক রাশি রাশি ভূমি দখল করিয়া বসিয়া আছে, আর যার যে ভূমি চাষ করিবার শক্তি আছে, তার ভূমি নাই। যার ভূমি সে অনুমতি না দিলে সে চাষ করিতে পারে না। তেমনি যে শিল্পী সে তার শ্রমের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে না ধনিকের অনুমতি ছাড়া।

এই প্রক্রিয়াটা Industrial Revolutionএর পর হইতে পাশ্চাত্য জগতে এত প্রবল বেগে চলিয়াছে যে এখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, দেশের সমস্ত সম্পদ আসিয়া জুটিয়াছে মুষ্টিমেয় বৃহৎ ধনিকের হাতে, আর দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে সেই ধনিকের কাছে কাজ করিয়া মজুরী পাওয়া ছাড়া অন্য জীবনোপায় নাই।

ইহাতে সে সব দেশে অসাম্য, দুর্গতি ও অসন্তোষ এত বেশী হইয়া উঠিয়াছে যে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকের দল আজ এই গোটা সমাজব্যবস্থাটাই ওলট-পালট করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

যে স্বত্ববাদ মানবসমাজের আদি যুগে সমাজের অভ্যুদয়ের হেতু হইয়াছিল, তাহারই অতিবৃদ্ধির ফলে এমন একটা গুরুতর অসাম্য জন্মিয়াছে যার জন্য পৃথিবীর যা সম্পদ উৎপন্ন হয় তার ফল ভোগ করে মুষ্টিমেয় ধনিক, না খাইয়া মরে তারা যারা সেই সম্পদ গায় খাটিয়া উৎপন্ন করে।

তাই আজ পাশ্চাত্য জগতে স্বত্ববাদের আমূল সংস্কারের জন্য একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা চলিতেছে। কেবল মাত্র রাশিয়ায় একটা বিপ্লবের ফলে এই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। আর কোনও দেশে সে চেষ্টা এখনও সফলতা লাভ করে নাই। কিন্তু বর্তমান অভাব ও দৈন্যের দিনে স্বত্ববাদের এই অতি প্রসক্তির উপর শ্রমিক সমাজের রুষ্ট দৃষ্টি সব দেশেই পড়িয়াছে।

এইটাই পাশ্চাত্য জগতের আজকার প্রধান সমস্যা। স্বত্ববাদের অতিপ্রসক্তির প্রতিরোধের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে শ্রমিক, আর ধনিক তার কাঞ্চনশক্তির বলে সে চেষ্টার প্রতিরোধ করিতেছে। এই যে বিরোধ ইহার ফল শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়াইবে ইহাই আজ জগতের সুধী-সমাজের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাব্‌লার ফুল

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেবার বজ্‌রা বেঁধেছিলুম খালের মধ্যে, একটা কত-কালের পুরোনো ভাঙা ঘাটের ধারে। পাড় থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ আর আম গাছ জলের উপর ঝুঁকে পড়ে' একটি সুনিবিড় ছায়ার সৃষ্টি কোরেছে, তাদের শিকড় নেমে গেছে জলের মধ্যে কতদূর কে জানে।

সে সময়টা ছিল আমার ছুটির সময়; কাছারির কাজ তাড়াতাড়ি সেরে বেরিয়ে পড়েছিলুম দিনগুলিকে যতদূর সম্ভব আলস্যে কাটাবার জন্যে। ছিলুম বড় নদীর উপর; অনুরক্ত জলের ঘোলাটে রং ক্রমশঃই মনের উপর আধিপত্য বিস্তার কোরছিল। মাঝে মাঝে চোখে পড়তো জনহীন বালির চর; তার গেরুয়া রং মনটাকে যেন আরও উদাস করে' তুলত।

সন্ধ্যাবেলা একদিন বজরার ছাদে বসে' আছি, নদীর উপরে এপার হোতে অদূর ওপারের মাথে গেরুয়া মেঘের পাৎলা আবরণ বিছানো রোয়েছে। এমন সময় ধূসর আকাশের গায়ে হঠাৎ উড়ে গেল বকের পাঁতি—যেন স্বর্গের কোন অপ্সরার গলা হোতে খসে' পড়া কুন্দফুলের মালা।

মনটা চঞ্চল হোয়ে উঠলো ফিরে আসবার জন্যে সবুজ মাটির কাছে; তাই তো বোট বেঁধেছি এইখানটায়।

ভাঙা ঘাট থেকে একটা সরু পথ চলে' গেছে বাঁশ-ঝাড়ের ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে দিয়ে; কিছুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, তারপর আর তাকে চোখে পড়ে না। যেন সে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে এই মর্ম্মরিত শুরুচ্ছায়ার সবুজ অন্ধকারে।

এই জলের ঘরে স্রোতের সঙ্গে সারাদিনের কাজগুলি অলস গতিতে চলেছে; ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে বসে' আছি।

সেদিন দুপুরে বোটের খোলা জানলার ধারে চৌকি নিয়ে বসেছি; জলের উপর গাছের ফাঁকে রোদ এসে পড়ে' বিচিত্র ছবির সৃষ্টি কোরেছে; সেই আলোছায়ার মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা ভোম্‌রা, তারই একটানা গুঞ্জনধ্বনি চার-পাশের হাওয়ায় একটি অনির্ব্বচনীয় কম্পনের সৃষ্টি কোরেছে। দুপুরের আতপ্ত হাওয়ায় না-দেখা কোন্ ফুলের গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

সেই সরু পথটি দিয়ে ভাঙা ঘাটের কিনারায় এল একটি মেয়ে। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে এসে যেন সে থেমে আছে; ছিপ্‌ছিপে গড়নটি; একটি লাল সাড়ি তার দেহটিকে ঘিরে' আছে; কাঁখে কল্‌সী; তার চোখে অসঙ্কোচ চাহনি।

জলে কল্‌সী ভাসিয়ে অনেকক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল। তারপর ডেকে বল্লে, "তুমি তো দেশের রাজা,—আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে পার না?"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় গেছে সে?"

শুনলুম তার বিয়ে হোয়েছিল ছোট বয়সে; কোন্ দূর থেকে তাকে এরা নিয়ে এসেছিল; তার খেলা ঘর থেকে তাকে ছিনিয়ে এনে এ কোন্ কারাগারে বন্দী কোরে রেখেছে···স্বামী তার ক'দিনই বা কাছে ছিল! সে চলে' গেল কোন্ সাহেবের জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে কোন্ দূর দেশে--আর ফেরেনি। শ্বশুর-বাড়িতে গঞ্জনার আর শেষ নেই; অকল্যাণ সাথে কোরে এনেছে; নীরবে সবই সহ্য কোরে যায়।

দিনের আলোয় চোখের জল ফেলবার সাহস নেই; রাত্রির অন্ধকারে ছেঁড়া কাঁথায় মুখ লুকিয়ে কতদিন কেঁদেছে — বুক ভাসা কোরেছে। মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলেছে, 'ঠাকুর তাকে ফিরিয়ে দাও,—আমার নিষ্কৃতি হোক!' তার আশা অপূর্ণই র'য়ে গেছে।

জীবনের কৈশোর-আকাশে যৌবনের রক্তিমাভা পাঢ়

ঘোরে এসেছে। প্রতিবেশিনীদের কাছে শোনে তাদের দুঃখ-সুখের কথা, তাদের স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত আনন্দের গোপন কাহিনী—আর তার বিকাশোন্মুখ যৌবনলতায় স্বপ্নের রঙিন ফুল ফুটে ওঠে। সমস্ত মন কোন্ একটি অজানা কল্পনাকে আশ্রয় কোরে কত রূপকথারই সৃষ্টি করে। কর্ম-ক্লান্ত দুপুরে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি তার মেলে দেয় দিগন্তব্যাপী শস্যক্ষেতের দিকে। আমন্থর গতিতে নৌকা চলে' যায় দূরে: তাদের সাদা লাল গেরুয়া পালে হাওয়া লেগেছে; তারই সাথে তার মন উধাও হয়, কোন্ দেশে তার ঠিক নেই।

বছরের পর বছর কেটে গেছে অর্ঘ্য সাজিয়ে বসে'। যার জন্যে এই আয়োজন সে তো এল না। অবহেলার নৈবেদ্য আজ বুঝি আর কেউ কুড়িয়ে নেয়!

তার কথা শুনতে শুনতে মনে হোচ্ছিল, কেমন কোরে এ সম্ভব হয়? এই ধ্যানের অপরিসীম সংযম ও কেমন কোরে এতদিন আপনার মাঝে স্থির ধৈর্য্যে বহন কোরে এসেছে? কি সংজ্ঞ ওর বলার ভঙ্গী! ও বল্লে, "যে দেবতাকে এতদিন পূজো কোরেছি সে তো মুখ তুলে' চায় নি। আজ যদি এই মাটির মানুষই আমার কাছে হাত পেতে দাঁড়ায়, তাকে ফেরাতে না পারি যদি, তো উল্লাসীকে দোষ দিও না।"

সে কল্সীতে জল ভরে' উঠে দাঁড়ালো; তার নিটোল দেহটি জলের ভারে নুয়ে পড়লো যেন ফুলের ভারে একটি লতা। পাকের আলোছায়ার মাঝে ক্ষণিক স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। দূরের দিকে চেয়ে কান পেতে যেন কি শুনছে; পেলে; অপরিসীম আনন্দের দীপ্তিতে তার মুখখানি উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো। দেখে মনে হোল যেন সে শৈশবের গণ্ডী এখনও পার হোতে পারে নি; খেলা-ঘরের হাওয়া যেন ওর জীবনে এখনও থেকে থেকে বয়। ওর ধ্যানের মাঝে পুতুল-খেলার সঙ্গী কে ফুটেছে। সে যেন ওর ছেলে খেলার দুরন্ত মনটিকে আবার জাগিয়ে দিতে চায়।

উল্লাসী বল্লে, "গান শুনতে পাচ্ছ না? মধু আসছে।"

কান পেতে শুনলুম কে গান করছে—

"আমার মন ভরে না
প্রাণ ভরে না যে···
তারে কেমনে যাই ছেড়ে।"

তারই সঙ্গে তালে তালে জলে লগি ফেলার শব্দ শুনতে পেলুম।

মধু এল আর গেলো। যেন নিত্যকালের কোন দুরন্ত শিশু দেবতার মাঝখানে হঠাৎ বড় হোয়ে উঠেছে। উল্লাসীকে দেখে ডেকে বলে গেল, "ওরে উল্লাসী, ভাল খবর আছে। আমার বাব্‌লা গাছে ফুল ধরেছে।"

উল্লাসী তার কালো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখতে চাইলে। মনে হোল তার সারা দেহে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল খেলে গেল, যেন শরতের প্রভাত-হাওয়ায় বেণুবনের কম্পন।

মধু চাইলে চকিতের মত তার পানে, তার আয়ত দুই চোখে আসন্ন সুখের পরিস্ফুট আশা ও আনন্দের আভাস নিয়ে। তার পরেই খালের বাঁকে তার নৌকো অদৃশ্য হোয়ে গেল।

উল্লাসী একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "ও সখ কোরে বাব্‌লা গাছের চারা এনে পুতেছিল; আজ তাতে ফুল হোয়েছে, তাই আমায় জানিয়ে গেল। আমাকে ও ডাকে বাব্‌লা কনে বলে'। কি জানি কেন ওকে দেখলে, ওর গলার আওয়াজ পেলে আমার মনের মধ্যে কেমন করে, শরীর যেন পাথর হোয়ে যায়। ওকে তাড়াতেও পারি না আবার আসতে দিতেও ভয় করে। ও যেন দুরন্ত ডাকাত, আমাকে কেড়ে নিতে চায়! ভয়ে মরি—আবার দেখা না হোলেও কেঁদে ভাসাই। ওকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারি না, যা হবে তা হবে; নিজেকে আর ফাঁকি দিতে পারি-না।" এই বলে' সে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর অন্যমনস্কভাবে ঘাটের পথ ধরে' ফিরে গেল ঘরের দিকে।

আজ আমার পেয়ে উল্লাসীর মন যেন আরামের নিশ্বাস ফেল্লে। আমাকে সে যাচাই বলে' মনে কখনোই পারলে না। অসঙ্কোচে সে মুক্ত কোরে দিয়ে গেল তার বিরহ মিলনে দোল খাওয়া মনটিকে। সমস্ত দিন মনের মধ্যে কেবলই বাজতে লাগলো তার শেষ কথাগুলি "নিজেকে আর ফাঁকি দিতে পারি না।"

সেইদিন রাত্রেই বন্ধুরা খুলে দিলুম উন্নাসীদের ভাঙা ঘাট থেকে।

আবার সেই সহর, সেই বর্ষামুখর সহরের জীবন তার দ্রুততালে তুলিয়ে দিলে ক'দিনের পাওয়া সেই নিরালা দিন-গুলির স্মৃতিকে। মধু আর উন্নাসীর সেই দুঃখ-সুখে জড়ানো জীবনের একেলার স্মৃতিখানি ক্রমশঃই ঝাপ্‌সা হোয়ে হাজারো কাজের তলায় বিলীন হোয়ে গেল।

তিন বৎসর পরে ফিরে এসেছি আবার আমার জমিদারির কুঠি বাড়িতে।

এবার শীতের শেষ। নদীর জল নেমে গেছে। দুদিকের পাড় অনেকটা উঁচু। যেখানে বর্ষায় ছিল জল সেখানে হোয়েছে পায়ে-চলার পথ।

গ্রামগুলির উপরে একটি কাঁচা সবুজের আমেজ বিস্তার হোয়েছে; ঘনবিবিড় তরুশ্রেণী থেকে মাঝে মাঝে হাওয়ায় মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আনন্দের শান্তিপূর্ণ আবেশে সমস্ত প্রকৃতি যেন স্থির হোয়ে আছে।

মধ্যাহ্নের স্নিগ্ধ রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। নিজেকে এই পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি; সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছি।

এমন সময় ঘরে একটি মেয়ে এসে ঢুকলো। শ্যামল রং, মাথার উপর অল্প একটু ঘোমটা টানা। পরিস্ফুট যৌবনের পুষ্পভারে তার দেহলতাটি ঈষৎ আনত। তাকে ঘিরে একটি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বিরাজ কোরছে। জীবনের পূর্ণতার মধ্যে সে যেন একটি নির্দিষ্ট স্থান পেয়েছে। তার কোলে একটি নবীন শিশু, আমার দিকে দুই ডাগর চোখ মেলে চেয়ে আছে।

মেয়েটি ছেলেকে আমার পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে নত হোয়ে প্রণাম কোরে একধারে বসে' পড়লো।

আমার দিকে চেয়ে ক্ষণেক স্থির হোয়ে রইল, তারপর বল্লে, "আমায় চিনতে পারলে না? আমি যে উন্নাসী।"

উন্নাসী! এযে আমার ভুলে-যাওয়া অপরাজিতার কুঁড়ি, ফুল হোয়ে ফুটেছে। তিন বছর আগেকার একটি বিরহ-মিলনে জড়িত, আলোছায়ায় বোনা, বর্ষণক্লান্ত দিনের ছবি চোখের সামনে পরিস্ফুট হোয়ে উঠলো।

উন্নাসী হেসে বল্লে, "কেমন, মনে পড়েছে? কত লোকে তো আসে তোমার কাছে দরবার কোরতে; আমার নালিশ তো জানিয়েছিলুম আমার রাজার কাছে। বিচারের অপেক্ষা কোরে তো কতদিন কেটে গিয়েছিল, তারপর পেলুম আমার বাছাকে।" এই বলে' সে ছেলেকে কোলে টেনে নিলে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "কার ছেলে উন্নাসী?"

সে হেসে বল্লে, "আমারই ছেলে; আবার কার? স্বামী লিখলে বর্ম্মা থেকে, কোন্ বর্ম্মী মেয়েকে সে বিয়ে কোরে সেখানে সংসার পেতেছে আর ফিরবে না। শ্বশুর-বাড়িতে পেতে লাগলুম যন্ত্রণা। অকল্যাণ বহন কোরে এনেছি সংসারে, ঘরের ছেলে তাদের পর হোয়ে গেল। যন্ত্রণা পেতে লাগলুম; তাতে আমার কষ্ট দিতে পারলে না। মধু এসে আমায় বাঁচালে। মন আমার তৈরিই ছিল; সে ডাক দিতেই সাড়া দিলে। স্বামী আমাকে নিজেই ছুটি দিয়েছে। পাখী এতদিন খাঁচায় ছিল; বনের ডাক মনকে উতলা কোরে দিত, ছাড়া পেত না। খাঁচার দরজা আজ খোলা পেয়ে বনের ডাকের অপেক্ষা করছিলুম। মধু এল যেন বনের স্নিগ্ধ আঁধার ছায়া; তারই মাঝে নিজেকে হারালুম। আমায় সে ডাকতো বাবলা-কাঁটা বলে', আর এই তারই ফুল।" এই বলে' সে ছেলেকে চেপে ধরলে কোলের মধ্যে।

রোদ পড়ে' এসেছে, গাছের সারি শুকনো জমির উপর দীর্ঘ ছায়া বিস্তার কোরে দক্ষিণে হাওয়ায় কম্পমান। বাগানের আউগাছের শাখায় শাখায় অবনীর অস্পষ্ট আওয়াজ সুরু হোয়েছে।

উন্নাসী ছেলে-কোলে উঠে দাঁড়ালো। আমার দিকে শান্তদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে, "ভগবানের কাছে দোষ করিনি জানি, তাহ'লে আমার বাছাকে কোলে দিতেন না তিনি। রাজার

কাছে নালিশ অনেক দিনই করেছি; এতদিনে বোধ হয় মাপ পেয়েছি।"

সে আস্তে আস্তে ছেলে-কোলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সারাহ্নের ম্লান আলোয় বসে' রইলুম চুপ করে'। অস্তগামী সূর্য্যের আলোয় দেখি সমস্ত আকাশ লাল হোয়ে উঠেছে, যেন নববধূর রক্তিম অবগুণ্ঠন।

অঞ্জলি

("কুঞ্জে কুঞ্জে মালতীর...দেওলিব্ হাঁহি"—আসামীরা)

শ্রী বিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কুঞ্জে কুঞ্জে মালতীর মধু সমারোহ,প্রাণভরা শেফালির হাসি,
চন্দনের গন্ধরেণু বহি' মধুময় বায়ু চলে দিগন্তরে ভাসি'।
নিত্য চক্রবাল জুড়ে' ইন্দ্রধনুখানি রচেছে কি অপূর্ব্ব তোরণ,
আলোক-সুন্দরী সব পুষ্পপাত্র ল'য়ে প্রকৃতিরে করিছে বরণ।
পদ্মগন্ধা সরসীতে ধীর সমীরণ নেচে নেচে যায় ঢেউ খেলি',
মৃণাল উপাড়ি' ল'য়ে রাজহংসযূথ
আনন্দেতে করে কত কেলি।
প্রভাতের রাগরেখা প্রকৃতির বুকে,—
কিবা রূপ বিশ্ববিমোহন!
আলোকিত সুশ্যামল ধান্যক্ষেত্র, মাঠ,
আলোকিত বন-উপবন।
বিন্দু বিন্দু হিমকণা শ্যামল ঘাসেতে
জ্যোতির্ম্ময় রূপে আছে জলি,'
বিচিত্র মাণিক-কণা উষাদেবী যেন প্রকৃতিরে দেছে করাঞ্জলি।
সৌন্দর্য্যের মহাবেলা—বিশ্বমন্দিরেতে জ্বলে গন্ধপুষ্পদীপ, ধূপ,
দেখা চাও সেথা দেখ, সত্য-সুন্দরের
বিশ্বভোলা প্রেমানন্দ-রূপ।
প্রেমময়, দাও মোর হৃদয়-বীণাতে ছন্দতরঙ্গ কল্পনার সুর,
নিভৃত মানসখানি হোক্ মুখরিত,—প্রীতিগন্ধে হোক্ ভরপুর!

বৃত্তাকার আল্‌পনার প্রাণ-বস্তু

শ্রী সুধাংশুকুমার রায়

বৃত্তাকার আল্‌পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে উহার সমস্ত কলাকৌশলের ধারাটি মূল কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে। এবং ঐ কারণে কুঁড়ে ঘরে হউক রাজপ্রাসাদে হউক পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের কোন ধার না ধারিয়া আপন সৌন্দর্য্যে আপনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে। বস্তুতঃ উহা আপন ক্রমবিকাশটিকে আপনি সীমাবদ্ধ করিয়া আনে; কিন্তু লতা বা চৌকা আল্‌পনা শিল্পীর মনের অভিপ্রায় অনুযায়ী চলিতে বাধ্য। তাই বলিয়া এমন নহে যে বৃত্তাকার আল্‌পনার অঙ্কনে শিল্পীর স্বাধীন চিন্তার কোনই স্থান নাই।

যেমন একটি ঘড়ির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে খুলিয়া দেখা চলে এবং পরে আবার একটি একটি করিয়া জুড়িয়া পূর্ণাঙ্গ ঘড়ি প্রস্তুত করা হয় তেমনি 'ক্রমপুষ্ট' আল্‌পনার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভক্ত করিয়া দেখা চলে। আল্‌পনাটিকে জুড়িয়া গড়িয়া পূর্ণাঙ্গ করিবার উপরেই শিল্পীর স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজন। নানা প্রকারের মূলপদ্ম, নানা ভঙ্গীর লতা ও তাহার অলঙ্কার, নানা পর্য্যায়ের কলসী প্রভৃতিকে পর্য্যায়-ক্রমে সংযত ও সুসম্বদ্ধ রূপে সাজাইয়া তোলাই শিল্পীর কাজ। বস্তুতঃ ইহা বড়ই কঠিন, কারণ যাহাতে সমগ্র আল্‌পনাটি বে-খাপ্পা, বে-মানান, ও ভারি-খাপ্পা না হইয়া উঠে তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। কিন্তু ক্রম-বর্দ্ধিত আল্‌পনার বিষয়ে অনেকটা নিরাপদ হওয়া চলে, কারণ গোটা আল্‌পনাটিই একটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ের অধিকারী। সুতরাং ক্রমবর্দ্ধিত আল্‌পনার প্রত্যেক অংশকে পরবর্ত্তী অংশের সহিত মিলিত করিতে কোনই ভাবনার দরকার হয় না। কিন্তু ক্রম-পুষ্ট আল্‌পনার প্রত্যেক অংশকে পরবর্ত্তী অংশের সহিত সংযোজিত করিতে বিচক্ষণতার দরকার। ইহা সত্য যে বাংলা দেশের বৃত্তাকার আল্‌পনা একটি সুসম্বদ্ধ প্রণালী ও সুন্দর গতিপ্রকৃতির উপর যেমন নির্ভর করে, অন্য কোনও প্রদেশের আল্‌পনাই তাহা করে না। অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে ইহাও দেখা যায় যে বাংলা দেশের, বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গের আল্‌পনার পূজা বা উৎসবের সহিত সম্বন্ধ বেশী। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের, এমন কি বাংলা দেশেরও কোন কোন স্থলের আল্‌পনার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ব্যক্তিগত লাভালাভ বা আপন ঘরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি। কিন্তু যেমন পুরাকালের অজন্তা, ইলোরা, বাগওয়া প্রভৃতির চিত্রাবলী ও ভাস্কর্য্য, ভক্ত শিল্পীর দেবতার প্রতি অকপট সশ্রদ্ধ আরাধনার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি; তেমনি বঙ্গপল্লীর নিভৃত অঙ্গনে বঙ্গনারীর দেবোদ্দেশে অর্পিত অকপট ভক্তিঅর্ঘ্য স্বরূপ আমরা বৃত্তাকার আল্‌পনাকে পাইয়াছি। বাস্তবিক মানুষের বিলাসের ভোগ্য হইতে দেবতার ভক্তিঅর্ঘ্যে যে তফাৎ তাহা যেন এই সমস্ত বৃত্তাকার আল্‌পনায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুদূরকালের পল্লীনিবাসিনী মহিলারা এক একটি বিশিষ্ট পূজা বা উৎসবের দিনে আল্‌পনা দিতে বসিয়া ঐ দিনের পূজা বা উৎসবের বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন নাই। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটি আল্‌পনার আলোচনা করিলে তাহা দেখা যাইবে।

আল্‌পনা অঙ্কনের নানা পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহা অনুমিত হয় যে পূর্ব্বে চাউলের গুঁড়া বা অনুরূপ অন্য কোন প্রকার সাদা গুঁড়া বিছাইয়া তাহার উপর রাগ্‌ কাটিয়াই আল্‌পনা অঙ্কিত হইত। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ পদ্ধতির অসুবিধাগুলিকে কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টায় গোলা অঙ্কনের প্রচলন হইয়াছে, যদিও এখনও হোম প্রভৃতির সময়ে অনুরূপ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু খুলনা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঠিক ইহার উল্টা পদ্ধতির ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তথাকার মহিলারা গুঁড়া ছড়াইয়া আল্‌পনা দেন। * একখানি পাতলা বাঁশের 'চাঁছাড়ী' দিয়া প্রত্যেক ঠাঁটের পাশ

* এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের আল্‌পনা সম্বন্ধে পরে লিখিতে ইচ্ছা করিব।

(outline) সমান করিয়া দেওয়া হয়। ইহা বড়ই কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ ; বস্তুতঃ ইহা আদিম পদ্ধতি। মনে হয় প্রথমে গুঁড়ার উপর দাগ কাটিয়া, পরে গুঁড়া ছড়াইয়া, ও তাহা হইতে ক্রমশঃ 'গোলা' গুলিয়া আল্‌পনা দেওয়ার রীতি বিকাশ লাভ করিয়াছে। এখনও যে দেয়ালে ও বাস্তুটীতে আল্‌পনা দেওয়ার অভিপ্রায় হইতেই 'গোলা' গুলিয়া আল্‌পনা দেওয়ার আবশ্যকতা লোকে প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিল।

একটি ক্রমপুষ্ট আল্‌পনা

গোলা গুলিয়া আল্‌পনার প্রচলন হইলেও সর্ব্বপ্রথমেই বৃত্তাকার আল্‌পনার জন্ম ঘটে নাই। প্রথম প্রথম নিশ্চয়ই লতা, গাছ ও চৌকা আল্‌পনাই দেওয়া হইত। পরে বৃত্তাকার আল্‌পনার প্রচলন হইয়া থাকিবে। তবে বহুদিনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা বৃত্তাকার আল্‌পনাকে পূর্ণাঙ্গ প্রণালী-গত অবস্থায় আনিতে বৃত্তকালের নারী-শিল্পীর কম কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। ক্রমপুষ্ট আল্‌পনার যে তিনটি বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগে সুন্দর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ 'লতা' এবং অপূর্ব্ব সুষমাময় 'কলসী' প্রভৃতির 'ঠাট' দেখিতে পাই, তাহা যেমন তখনকার নারী শিল্পীদের অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়, তেমনি পরবর্ত্তী কালের ক্রমবর্দ্ধিত আল্‌পনায় তখনকার নারী-শিল্পীর এক একটি অখণ্ড বৃত্তাকার আল্‌পনার ঠাট সৃষ্টির (Tip) প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ফল কথা পূর্ব্ববর্ত্তী আল্‌পনাগুলি হইতে পরবর্ত্তী আল্‌পনাগুলির ধারা—পর্যায়ক্রমে ফাঁকা, পাতলা 'চরিত্র' হইতে ক্রমশঃ জমাট ঘনীভূত চরিত্রের দিকেই প্রসার লাভ করিয়াছে।

বাংলা দেশের আল্‌পনার চৌকা প্রভৃতির ঠাট খুব কমই আছে। কিন্তু মধ্যভঙ্গ বা উড়িষ্যার অন্যান্য স্থানের আল্‌পনার প্রকৃতি প্রায়শঃ চৌকা ও তাহাতে জ্যামিতিক অঙ্কনরীতির (geometrical drawing) বাঁজটাই বেশী। অর্থাৎ উহা কতকগুলি ক্রমিক রেখা বা কতকগুলি ক্রমিক কক্ষ দ্বারা এবং কখন কখন উভয় দিকে সমান সমান টান, সমান সমান বেষ্টনী, অথবা রেখা বা কুণ্ডলীর উভয় দিকে সমান সমান পরিণতির দ্বারাই ঐ সমস্ত আল্‌পনার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে শিল্পীর স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ বহুলাংশে খর্ব্ব হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে নিয়মের পদ্ধতি বলিতে পারি। কিন্তু বাংলা দেশের আল্‌পনায় জ্যামিতিক অঙ্কনরীতির (geometrical drawing) যে প্রভাব দেখিতে পাই তাহা শিল্পীর স্বাধীন চিন্তার প্রকাশকে খর্ব্ব করে নাই ; পরন্তু বৃত্তাকার আল্‌পনার সুষমাকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এবং ইহা সত্য কথা যে, বাংলার নারী-শিল্পী আল্‌পনা দিতে বসিয়া রেখার সাবলীল লীলা-ভঙ্গীকে কোনরূপেই বাধাবাধকতার দ্বারা ব্যাহত করেন নাই।

অন্য অনেক প্রদেশের আল্‌পনায় রঙের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা দেশের আল্‌পনায় উহার প্রচলন খুব কম। কেবল বিবাহের সময় পিঁড়ির উপর যে চিত্র অঙ্কিত হয় তাহাই রঙের সর্ব্বাপেক্ষা সৃষ্টি। তাই বলিয়া বাংলা দেশের আল্‌পনা রঙকে নির্ব্বাসিত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, বরং তাহার অনুপম রেখাঙ্কনের—অপূর্ব্ব কলা-কৌশলের সৃষ্টির সুযোগ পাইয়াছে।

মূল-পদ্ম *

অন্য অনেক প্রদেশের আল্‌পনার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে বাংলা দেশের বৃত্তাকার আল্‌পনা যেন প্রথম হইতেই একটি মূলপদ্মকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে, অন্য

* মূল-পদ্ম সম্বন্ধে গত জৈষ্ঠ মাসের বঙ্গলক্ষ্মীতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

আর কোনও প্রদেশের আলপনায় তাহা দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহা বৃত্তাকার আলপনাকে যেমন সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে এমন আর কিছুতে নহে। সর্বাপেক্ষা আরও আশ্চর্যের বিষয় অতঃপর ওহাদের বৃত্তাকার চিত্রের ১ নং গুহা) মূল অবলম্বন স্বরূপেও একটি পদ্মকেই দেখিতে পাই, এবং ঐ মূলপদ্মটি প্রথম হইতেই পাপড়ি কাটিয়া অঙ্কিত হয় নাই। কেন্দ্রস্থলে সর্বপ্রথমেই কিঞ্চিৎ স্থান বর্তুলাকার রেখাদ্বারা পূর্ণিত হইয়া পরে ঐ রেখার উপর হইতেই পাপড়িগুলির বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। আলপনায়ও

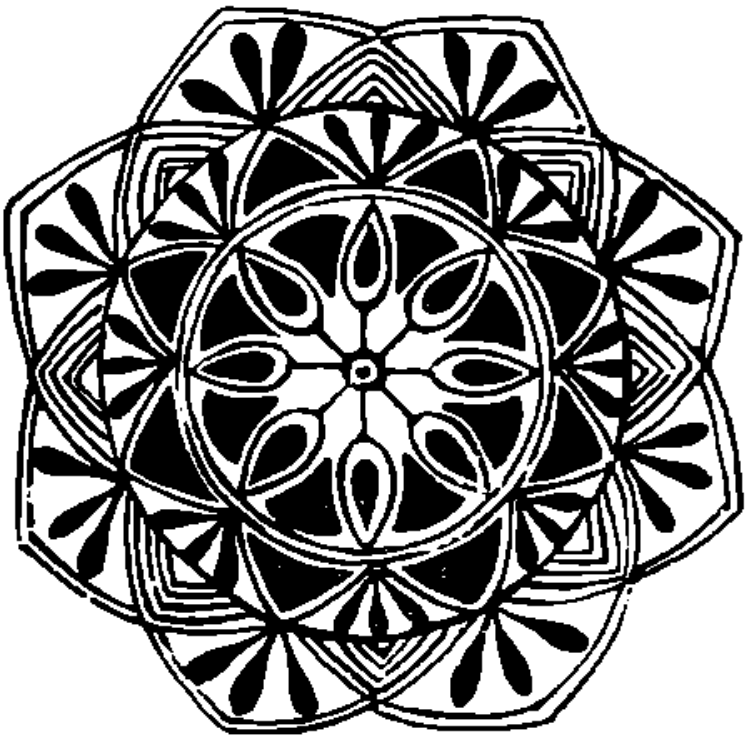

অলঙ্কৃত ছাদের হাতের কাজের একটি মূলপদ্ম

মূলপদ্মগুলি অবিকল ঐ রূপেই অঙ্কিত হইয়া থাকে। পাপড়িগুলি গোড়া হইতে না অঙ্কিত হইয়া কয়েকটি বক্র রেখার উপর হইতেই অঙ্কিত হয়। যাহা হউক এতদ্বারা আমি কেবল এই কথাটিই প্রকাশ করিতে চাহি যে সেই প্রাচীনকালের দক্ষ শিল্পীরা তাঁহাদের পরিপুষ্ট চিন্তার দ্বারা যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমাদের পল্লীনিবাসিনী নারীদের তাহাতে যোগাযোগ থাক্ বা না থাক্, তাঁহারা তাঁহাদের সহজ সরল চিন্তার দ্বারা সেই একই পন্থা করিয়াছিলেন।

ক্রমপুষ্ট আলপনার মূলপদ্ম সাধারণতঃ একটি রেখার বেষ্টনী দ্বারা পরবর্তী অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু ক্রম-বর্দ্ধিত আলপনার মূলপদ্মের সহিত উহার পরবর্তী অংশের ক্ষীণ যোগাযোগ থাকিলেও উহার অধিকাংশ আলপনা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা স্পষ্ট চিহ্নিত হয়। উহার পরবর্তী আলপনার মূল-পদ্মের ইহাও একটি বিশেষ গুণ যে সমস্ত আলপনার অন্যান্য অংশ হইতে উহা অপেক্ষাকৃত 'জমাট' বাধিয়া। এক একটি বিশিষ্ট উৎসব উপলক্ষে যে সকল আলপনা দেওয়া হয় তাহার বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ উপর পড়িয়াছে। লক্ষ্মীপূজার মূলপদ্ম কেবল

সাতেরটি কুণ্ডলী ও তৎপরে একটি
হই। ঐ রূপ নিশ্চিষ্ট উৎসবের আলপনার
ও নামক আলপনার
যোগা। যৌ ছুতের মূলপদ্মের
পরে উহা হইতে আড়াআড়ি ভাবে উভয় দিকে সমান সমান অংশে প্রসারিত চারিটি ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত হয়। এবং উহাতে মূলপদ্মের চারি পাশে ও ঐ সমস্ত রেখার প্রত্যেক ফাঁকে ফাঁকে এক একটি দল, গোড়া সরু, বস্তুলাকার পাপড়ি অঙ্কিত করা হয়। সাধারণতঃ ৬মাট গোলাপ হইয়া থাকে।

অনেক সময় অনেকগুলো রেখার বেষ্টনী কয়েকটি পরস্পর ভিতরে ভিতরে স্থাপিত করিয়া মূলপদ্মটির বৈশিষ্ট্য কিন্তু বৌ-ছত্রের ভিন্ন অন্য আর-আর আল্পনাতেও ঐ প্রকার মূলপদ্ম দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহার পাপ্‌ড়িগুলি কখনই রেখাপাতের দ্বারা বিভক্ত নহে। 'ঘটলাক্ষ' আল্পনার মূলপদ্মটির পাপ্‌ড়ি রেখা দ্বারা বিভক্ত কিন্তু উহার পাপ্‌ড়িগুলির প্রত্যেকটি একটি রেখা দ্বারা বেষ্টিত। এবং ঐ রেখাগুলি মূল কুণ্ডলীর সহিত সংলগ্ন থাকে কিন্তু ঐ খণ্ডীকৃত পাপ্‌ড়িগুলি আদপেই মূল কুণ্ডলীর সহিত সংলগ্ন অবস্থান করে। 'বৌ-ছত্রের' মূলপদ্মে, পাপ্‌ড়ি-

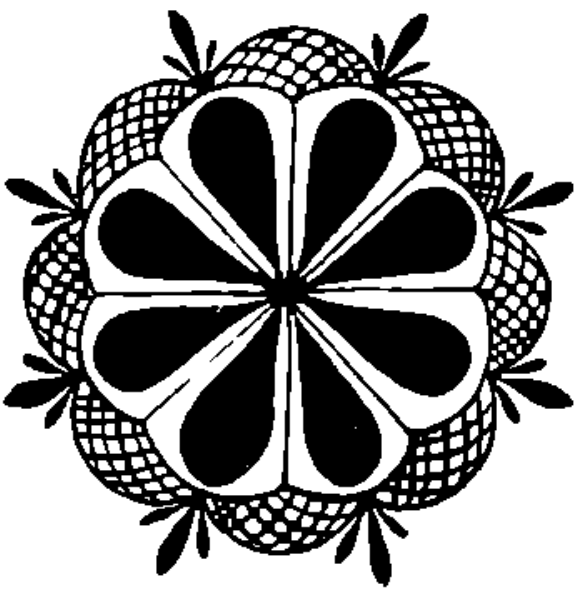

মূলপদ্ম—'বৌ-ছত্র'

গুলির বাহিরে ও শেষ রেখার বেষ্টনীর মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে যে কয়েকটি ত্রিকোণাকার ফাঁকা স্থান থাকে তাহা কয়েকটি সমকোণ 'রেখা-পরিপূরক' দ্বারা পূর্ণ করা হয়। কিন্তু ঘটলাক্ষ মূলপদ্মে ঐ ঐ স্থলে এক একটি ত্রিকোণাকার জমাট পরিপূরক অঙ্কিত হয়। বৌ-ছত্রের মূলপদ্মের ইহা আরও একটি বৈশিষ্ট্য যে উহাতে মূল কুণ্ডলী অঙ্কিত না করিলেও চলে কিন্তু অন্য আর সমস্ত মূলপদ্মে উহার একান্ত আয়োজন থাকে। ঘটলাক্ষের মূলপদ্মে সাধারণতঃ দুইটি মূল কুণ্ডলী অঙ্কিত করা হয়।

একটি শত-দল-পদ্ম অঙ্কিত মূলপদ্মের ঠাট পাওয়া যায়। তাহার পাপ্‌ড়িগুলির দুই মুখই সরু, মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত স্থূল। পাপ্‌ড়িগুলি একটির পর একটি সাজাইয়া তোলা হয়। অধিকল ঐ পদ্ধতির একটি ছবি অজন্তার ১ নং গুহার ছাদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঠাটটির মূলে কোনই কুণ্ডলী নাই এবং শেষ-বেষ্টনী ও পাপ্‌ড়িগুলির ভিতরে কোনও ফাঁক না থাকায় পরিপূরকেরও দরকার করে না।

মূলনা জেলার গ্রাম একটি লক্ষ্মীপূজার আল্পনার মূলপদ্ম কেবল মাত্র আটটি জমাট পাপ্‌ড়ি লইয়া অঙ্কিত। তৎপরে একটি বৃত্তাকার বেষ্টনী, এবং ঐ বেষ্টনী হইতে দুই সারি বক্র রেখা টানিয়া ভিতরের ফাঁক বন্ধ করা হইয়াছে। ভিতরে একটি মাত্র মূল কুণ্ডলী। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ইহার নূতনত্ব এই যে উহার শেষ-বেষ্টনীর উপর হইতেই পরবর্ত্তী লতার অংশ আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণতঃ ক্রমপুষ্ট আল্পনার মূলপদ্মের শেষ-রেখার সহিত মূলপদ্মের সংযোগ থাকিলেও পরবর্ত্তী অংশের কোনই যোগ থাকে না। কিন্তু এই আল্পনাটির মূলপদ্মের শেষ-বেষ্টনীর সহিত পরবর্ত্তী লতার সংযোগে, এবং সমগ্র আল্পনাটি ক্রমপুষ্ট পর্য্যায়ের হওয়াতে, উহার মূলপদ্ম ও তৎসংলগ্ন পরবর্ত্তী অংশ—এই সমগ্র বস্তুটিকেই একটি মূলপদ্ম বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ইহা ঠিক নহে; কারণ এই মূলপদ্মটির পরবর্ত্তী অংশ সাধারণ লতা নহে। উহার প্রকৃতি অন্য প্রকার। পরে তাহার আলোচনা করিব।

এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার মূলপদ্মের প্রচলন আছে যাহা কেবলমাত্র কয়েকটি অপ্রস্ফুটিত পদ্মের ঠাটের সংযোগে সৃষ্ট। প্রথমে একটি কুণ্ডলী, তাহা হইতে আটটি মৃণাল বাহির হইয়াছে। পরে উহাতে আটটি পদ্মের সংযোগ করা হয়। অন্যান্য ঠাটে সাধারণতঃ উপরের বেষ্টনী ও পাপ্‌ড়ির মধ্যে সংযোগ থাকে না। ইহাতে কিন্তু পদ্মের কুঁড়িগুলির অগ্রভাগ শেষ-রেখার সহিত সংযুক্ত। এবং শেষ-রেখার ও কুঁড়িগুলির মধ্যে যে ফাঁক, তাহা সম্পূর্ণ জমাট পদ্ধতিতে অঙ্কিত কয়েকটি ত্রিকোণাকার পরিপূরক দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ঠাটটি কোন-প্রকার হিজিবিজি কলাকৌশলের ধার না ধারিয়াও সরল, পরিষ্কার ও অল্প কলাকৌশলের দ্বারাই অপূর্ব্ব সুষমা-

অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবর্দ্ধিত আল্‌পনারও কয়েকটি মূলপত্র আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। ঐ গুলির সৌন্দর্য্য ক্রম-পুষ্ট আল্‌পনার মূলপত্রের অপেক্ষা ন্যূন নহে। উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটি সুন্দর, তাহার মূল কুণ্ডলী হইতে ছয়টি পাপ্‌ড়ি উঠিয়াছে কিন্তু পাপ্‌ড়িগুলির দুইটি করিয়া মস্তক। এবং উহার দুই মস্তকের ফাঁকে ফাঁকে যে কোণ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া ছোড়া জমাট-পর্য্যায়ের পাপ্‌ড়ি অঙ্কিত হয়। দুই সম্পূর্ণ পাপ্‌ড়ির মধ্যে ত্রিকোণার 'জমাট' পূরক অঙ্কিত করাও হয়। অন্য আরও একটি মূলপত্র আছে যাহা কেবল মাত্র ছয়টি কোরকের সমাবেশে সৃষ্ট। বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য আরও বহু মূলপত্রের আলোচনায় বিরত হইলাম।

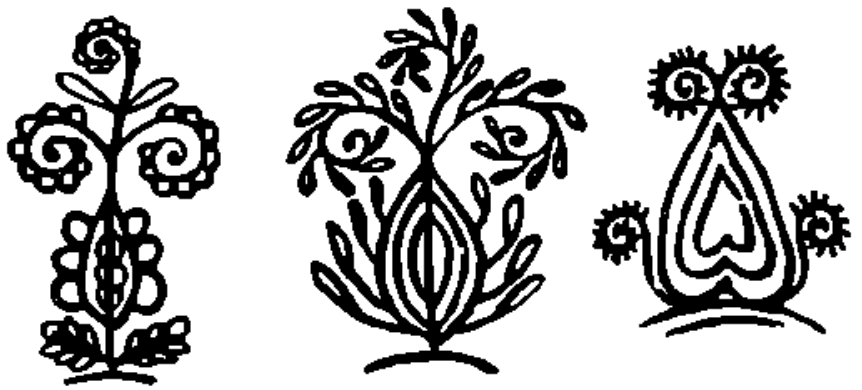

তিনটি কল্কা

সংক্ষিপ্ত আল্‌পনা

ক্রম-পুষ্ট ও ক্রম-বর্দ্ধিত আল্‌পনাদ্বয় ভিন্ন বৃত্তাকার আল্‌পনার মধ্যে আর একটি সংক্ষিপ্ত পর্য্যায়ের আল্‌পনার প্রচলন আছে। বস্তুতঃ ইহা ক্রমবর্দ্ধিত ও ক্রমপুষ্ট আল্‌পনার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বই আর কিছু নহে। কেবলমাত্র কোন কোন সাময়িক প্রয়োজনেই এই সংক্ষিপ্ত আল্‌পনা দেওয়া হয়। তবে লক্ষ্মীপূজা, বিবাহ প্রভৃতি সমারোহপূর্ণ উৎসবে প্রায়ই এইরূপ সংক্ষিপ্ত আল্‌পনা দেওয়া হয় না। তবে সময়াভাবে অথবা উৎসবের গুরুত্বের অনধিকতায় অনেক সময় সংক্ষিপ্ত আল্‌পনাই দেওয়া হয়।

সংক্ষিপ্ত আল্‌পনার বিস্তার সাধারণ আল্‌পনা হইতে অনেক কম। মূলপত্র ও তাহার উপর লতা ও কলমীর সমাবেশ—সংক্ষিপ্ত আল্‌পনায় কেবল মাত্র এই দুইটি অংশই দৃষ্ট হয়। আমি কেবল মাত্র তিনটি ঐ প্রকার সংক্ষিপ্ত আল্‌পনার ঠাট দেখিতে পাইয়াছি। ঐ তিনটি আল্‌পনাই বৃত্ত-ছত্র আল্‌পনার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। উহাদের প্রথম দুইটি অনেকটা একই প্রকৃতির কিন্তু তৃতীয়টির প্রকৃতি অনেকটা ভিন্ন। ঐ ঠাটটির মূলপত্র ও তৎসংলগ্ন অংশের পরেও একটি রেখার বেষ্টনীর উপর কয়েকটি ত্রিকোণ ও কয়েকটি চতুষ্কোণ পদকের মত অঙ্কন পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত দেখা যায়। তবে ঐ দুইটি ঠাটেরই ও তাহার পরবর্ত্তী অংশের মধ্যে কোন প্রকারেই বিচ্ছেদের আকার রাখা হয় না। ক্রমবর্দ্ধিত আল্‌পনায় অবশ্য মূলপত্র ও তাহার পরবর্ত্তী অংশের মধ্যে স্বতঃই সংযোগ থাকে, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র আংশিক; পরন্তু এই সকল সংক্ষিপ্ত আল্‌পনায় ঐ সংযোগ বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ।

P30195

(ক্রমশঃ)

কুমারসম্ভব

(উমা-প্রধান *)

৺বিহারীলাল গোস্বামী

গৌরী তখন বিস্ময়ে কন সহচর-সখী দিয়া—
"মোরে ত্বিষবান্ করিবেন দান, বিধান করুন ইহা।"
"তবে তাই করি!" কহি' পরিচরি' উমারে কথঞ্চিৎ
দীপ্তি-শর ব সপ্ত-ঋষির অস্ত্রিলেন পরক্ষিৎ।

মণ্ডলে নভ চলচলে,—নহা মহিমা যে
অরুন্ধতীর সহিত হরিত প্রভু-পুরে আসি' রাজে।
ধরি' হেম-ঢীর, মাল্য মণির, পৈতা সে মৃকুতাবি,
আসে যেন সব কল্প-পাদপ সাজিয়া ব্রহ্মচারী।
পতির চরণে নমিত নয়নে সাধ্বী অরুন্ধতী
ঋষিগণ-মাঝে যেন গো বিরাজে সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী!
দেবীরেও মান দিলা ভগবান সপ্ত ঋষির মনে,—
ওগেরি পূজন করেন সুজন, স্ত্রীপুরুষ নাহি গণে!

গণ-মহাদেবে প্রণমিয়া এবে সবে সবিনয়ে কয়—
আনন্দ-ভরে সারা কলেবরে বন রোমাঞ্চ হয়!
"সকল মোদের অস্ত্র বেদের যতেক অধ্যয়ন,
করেছিনু যত যাগ বিধিমত তপশ্চর্য্যা-আচরণ—
সারা জগতের পতি আমাদের তুমি যদি এক্ষণে
আরোপিলে হেথো ও তব মনেরো অনধিগম্য মনে!
নয়নে নেহারি, না জানি তোমারি স্বরূপ কেমন তবু—
জানাতীত ওহে, দাও তুমি কহে' আপনি আজি সে, প্রভু!
নহে সম্প্রতি এ কথা মহতী থাকুক, শম্ভু আজ—
চিন্তিত বড় আসিয়াছি, কর আদেশ, সাধি কি কাজ?"

বিরঞ্চা: তখন বিশদ দশন-কিরণে শিরসিগত
শশি-কলা-কর বাড়ায়ে উত্তর প্রদানিলা এই মত,—
জানেন সকলে, আপনার বলে' নাহিক কোন'ই আশ,
আমার এ আট মূরতি বিরাট করিছে তা' পরকাশ!
তৃষিত চাতক সলিলযাচক যেমন সুশীল মেঘে,—
অরাতি আতুর এসেছিল সুর সুত তিতে মোর মেঃ
সে আমি এখন পুত্র-কারণ উমারে গ্রহিব তথা,
বাঞ্ছিকরে বহ্নির তরে অরণি আহরে যথা!
গিরীন্দ্রে ছেরে' গৌরীরে চেয়ে' মন মোর করি' নাম;—
যদি পরিণয় সাধে সাধু, হয় শুভ তার পরিণাম!
হিম-সাগ্রবান্ সুধীর মহান্, ধরেন ধরার ভার;—
তাঁহারি বংশে পাণি পীড়ন, সে নিন্দার কি আমার?
কনে' লাগি' লগে বলুন হেন গে'—উপদেশ দিব যিছে।
ভবৎ-প্রণীত যত বিধানই ত জগৎ দম্মানিছে।
যান ত্বরা করি' নগেশ-নগরী "ওষধিপ্রস্থে" তবে,—
মহাকোশী* খ্যাত জলপ্রপাতে পুন' সাক্ষাৎ হবে!"

'যে আজ্ঞা' বলি' সবে যান চলি' আর বিলম্ব নাই;—
প্রভুও নিমেষে পহছিলা এসে' পূর্ব্ব-কথিত ঠাঁই।
বনী ঋষিকুল অসি-সমকুল ভাষল আকাশ পথে
আসিলা ব্যস্তে ঋষিপ্রস্থে চড়ি' যেন মনোরথে!
সে নগ নগরী যেন গো, আ মরি, 'অলকা' তুলিয়া পোঁতা;
নহে দেবতারা নহে ঠাঁই হারা নীড় নিশ্মিল হোথা!

সুর-ঋষিগণ করি' দরশন হেন নগেন্দ্রপুর
মানিলা, স্বর্গ লাগি' যে যজ্ঞ করে লোকে—সব দূর!

---

* ইহা কবির অপ্রকাশিতপূর্ব্ব রচনা।

চিত্রিতানল-সম নিশ্চল কটা ছটা-জুট-ধারী
বেগে রাজধানী আসিলেন নামি'—ঊর্দ্ধে চাহিল যারী।
দূরে সাড়মান্ হল আগুয়ান, হস্তে অর্ঘ্য ভরা
শঙ্কিতের ভরে,—গুরু পদ ভরে কাঁপায়ে বসুন্ধরা!
পথ-উপচার করি' সংকার, আপনি দেখায়ে' পথি,
লয়ে' যান শেষে শুদ্ধান্তে সে শুদ্ধ সত্ত্ব মতি।
বেত্র-আসনে স্থাপি' ঋষিগণে, আপনি আসনে লুটে',
নরেশ তখন কহেন বচন কৃত-অঞ্জলি-পুটে ;—

"বিনা মেঘে জল, ফুল বিনা ফল,—তুলায় যেমন ধারা,
তাহারি মতন মোরে দরশন দিলেন যে আপনারা!
তবৎ-কৃপায়, আজি মনে ভায়, জ্ঞানী হ'নু, দ্বিজ মূঢ় ;
লোহ ছিলেম, হইলাম হেম ; মর্ত্ত, স্বর্গারূঢ়!
আজি হ'তে জীবে শুদ্ধি লভিবে আসি' মোর এইখানে,
সাধুরা যে ঠাঁই থাকে, লোকে তাই তীর্থ বলিয়া মানে।
দ্বিজ সত্তম, এ আত্মা মম পবিত্র হ'ল তুয়ে—
শিরে সুরধুনী ; আর মহামুনি-চরণ-পদ্ম ধুয়ে'!
স্থাবর অঙ্গ শ্রীচরণাঙ্কে, জঙ্গম চর্য্যায়—
কৃতকৃতার্থ এ মোর গাত্র হইল দু'পর্য্যায়।
মহর্ষিদিগে পূজিয়া আজিকে কত যে হর্ষি চিতে,
দ্বিগম্বরার অঙ্গ আমার নারে তা' সংবরিতে
দরশে শুধু রে যাহি যার দূরে দরীর অন্ধকার—
জ্বরেরো মদ ভঙ্গ' আর' তব' ঘুচিল যে এইবার!
কাজ কৈ দেখি! থাকিলেও সে কি অসম্পন্ন তবে?
শুধু, মনে ভায়, আসিলা আমায় ধন্য করিতে সবে!
তবু কোন' কাজ এ দাসের আজ আদেশ হউক দিতে—
প্রভুর নিয়োগ পেলেই সেবক প্রফুল্ল হয় চিতে।
এই আমি নিজে, ওই পৃথিবী যে, এ কুল-জীবন মেয়ে!
কহ এর মাঝ কারে হবে কাজ, আর সমস্ত চেয়ে'?"

'অঙ্গিরা' মুনি, অগ্রণী উনি, —তাঁরে তপস্বিগণ
ইঙ্গিত করে,—তিনিই তখন প্রতি-উত্তরে কন :—
"বলিলে যত সবি অবিতথ! ওগো বুঝি কত আর
উদার ও মন,—শিখর যেমন উচ্চ আপনকার!
ও হেন পাষাণে 'বিষ্ণু' বাখানে,—সত্য সে, ধরার!
তব কন্দরে যে কারণ ধরে এ বিশ্ব চরাচর!
নদী শত, আর কীর্ত্তি তোমার, সদা সুবিমল ধারে
ভুবন পাবনি' ঊর্দ্ধি না গণি' ধায় সমুদ্রপারে!
বিষ্ণু-চরণে জনম লাভিলে গঙ্গার মান যত—
দ্বিতীয় পিতাই তুমি, তিনি তাই মাতৃও পান তত।
পাষাণেরি দেহে পূরিয়াছ যে হে তব যত কঠোরতা,—
ভক্তি-নমিত এই জনেই ত শুধু সাধু-সেবা-রতা!
যে লাগিয়া সবে আসিলাম, তবে শোন' ওহে নগাধিপ,
তোমারি ত কাজ, মোরা শুধু আজ সুপরামর্শ দিব ;—

অণিমাদি গুণ যাঁহে অধিগুণ ; 'ঈশ' নাম যাঁর তবে—
যা' কোন' পুরুষে আর না পরশে ; শর্ব্ব যাঁর শিরে শোভে,
মুনিগণ যাঁরে মনের মাঝারে সতত ধেয়ান করে ;
যাঁহার চরণ, মনীষীরা কন, পুনর্জ্জনি হরে ;
সেই সাক্ষাৎ জগৎসাক্ষী সিদ্ধির ভগবান্
মোদের প্রেরণে,—তিনি তব কনে' বিবাহ করিতে চান!
কথা মনে দথা সঙ্গর্ব, তথা সাধ' এ মিলন তাঁর ;
যদি সাধু বরে কন্যাটি পরে, কি দুঃখ জনিতার?
উমা বধূ, তার দাতা তুমি, আর যাচক আমরা যত্তো,
পাত্র সে তব ;—বংশে যে তব সমূহ সমুন্নতি!
পূজে না যে কারে, সবে পূজে যাঁরে হরি হ'তে করি' সুরু—
তুমি সেই ভবে মেয়ে দিয়ে হবে বিশ্বগুরুর গুরু!"

ঋষি যবে কন, পিতার নয়ন উমা অধোমুখে রাজে,
বলিয়া কেবল বিলাস-কমল-দলগুলি গণিলা যে!
পূরে চির আশ, তবু গিরিরাজ স্ত্রীর মুখপানে চায়,—
মেয়ের ক্ষেত্রে গৃহিণী-নেত্রে চাহে গৃহস্থে প্রায়।
মেনকা রাণীও নিলেন মানি' ও স্বামীর সকল রীত,—
কখনো সতীর প্রকৃতি পতির চলে নাকো বিপরীত।
'এই উত্তর সেই সত্বর' ভাবিয়া আপন মনে,
কহিলা রাজা এ কন্যা সাজায়ে' মঙ্গল বিভূষণে,—
"আয়, বাছা! তোরে ঈশ্বর তরে ভিক্ষায় সপিলাম ;—
ভরিয়া ভিখারী! পূরী সে আমারি পূরিল মনস্কাম!"

হেন মতে কহি চহিতারে, মহীধর মুনিগণে কয়,—
"নিবেদন হই—শিবানী যে অই চরণে প্রণত হয় !"
গিরির অমন বাসনা-পূরণ উমার বচনে গলে'
সপ্ত-ঋষি সে উমারে আশিসে—"সকলি ফলিস" বলে' !
অরুন্ধতীরে প্রণমিতে ফিরে হেম-কুণ্ডল দুলে—
আশা অচিরে লজ্জাবতীরে অঙ্কে লইবা তুলে' !

তনয়ার স্নেহে দু'নয়ান বেয়ে' মাতার অশ্রু ঝরে,
তাপসী বুঝান,—"এর ভগবান্, আর বধূ নাই ঘরে !"
শিবের শ্বশুর পুছিলা প্রভুর শুভ বিবাহের তিথি ;
"তিন দিবা পরে" কহি' সবা করে তথা হ'তে প্রস্থিতি।
বিদায় মাগিয়া, পুনরায় গিরা শিবের সন্নিকটে,
কহি' নিবেদন কার্য্য সাধন, উঠিলা গগন-পটে !

পাথেয়

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কপোতাক্ষ নদীর তীরে তিলে-শিবানীপুর গ্রামের মুখুজ্যেদের অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া এখনও তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব অনুমান করা যায়। এই অট্টালিকার ভিতর বাটিতে কোনপ্রকারে মনুষ্য-বাসোপযোগী দুইখানি মাত্র ঘরে এই পরিবারের দুই বিধবা বধূ ভবতারা ও গিরিবালা বাস করে ; ভবতারা নিঃসন্তান, গিরিবালার একমাত্র অনূঢ়া কন্যা শক্তি, বয়স আঠার।

এককালে এই মুখুজ্যে পরিবার যথেষ্ট বিত্তশালী ছিল, কিন্তু কমলার কৃপাস্রোত কমিতে কমিতে ভবতারার স্বামী দুর্গাপদর আমলে নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার উপর দুর্গাপদর আলস্য ও ঔদাসিন্যের অন্তরালে পুরাতন গোমস্তা বরদা যখন অবশিষ্ট সম্পত্তিটুকু কপর্দ্দকে জড়ীভূত করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি-শেষে একদিন সরিয়া পড়িল, তখন ভ্রাতৃবিমুখ দুর্গাপদর ছোট ভাইকে "ঘরে ব'সে অন্ন ধ্বংস করছো" বলিয়া ভর্ৎসনা করা ছাড়া আর উপায় রহিল না।

ছোট ভাই হরিপদ নীরবে ভর্ৎসনা সহ্য না করিয়া নববিবাহিতা পত্নী গিরিবালার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিল ও নিজের অনলস কর্ম্মশক্তি এবং ব্যবসায়বুদ্ধি-বলে খেজুর-গুড়ের কারবার করিয়া বেশ কিছু টাকা লাভ করিল। গুড়ের মরসুম উত্তীর্ণ হইলে দাদাকে লাভের টাকা হইতে সংসার-খরচের জন্য কিছু দিয়া হরিপদ কলিকাতা আসিয়া কাঠের কারবার আরম্ভ করিল এবং পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তার বলে অচিরে কমলার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিল। দুর্গাপদ গৃহে বসিয়া হরিপদর নিকট হইতে নিয়মিত সংসার-খরচের টাকা পাইত। এইরূপে ষোল-সতের বৎসর কারবার চলিবার পর একদিন দৈবদুর্য্যোগে কাঠের গোলায় আগুন লাগিয়া হরিপদর সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। ইহার অল্পদিন পরেই সর্ব্বস্বহারা ভগ্নস্বাস্থ্য হরিপদ চিরতরে চক্ষু বুজিলে সামান্য নগদ টাকা ও দেহচ্যুত কয়েকখানি গহনা মাত্র সম্বল করিয়া এবং স্কুল হইতে কন্যা শক্তির নাম কাটাইয়া গিরিবালা দেশের বাটিতে যেদিন ফিরিয়া আসিল তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে দুর্গাপদর মৃত্যু হইয়াছে।

গিরিবালার পূর্ব্বসৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা এবং অধুনা হরিপদর মৃত্যুতে মাসোহারা বন্ধের জন্য ক্ষুব্ধা ভবতারা গিরিবালাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। গিরিবালা সমস্ত বুঝিয়াও নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু ভবতারা চুপ করিল না। যদিও হরিপদর কারবার স্বীয় পত্নীর গহনা বিক্রয়ের টাকা হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং হরিপদ নিয়মিত দাদাকে সংসার-খরচের টাকা পাঠাইত, তথাপি ভবতারা হরিপদর কারবারকে 'এজমালি কারবার' বলিয়া দাবি করিতে ও 'হরিপদ একাই সমস্ত ভোগ করিয়াছে তাই কারবার পুড়িয়া গেল' বলিয়া গিরিবালাকে গঞ্জনা দিতে লাগিল। এই জন্য

কারণে অকারণে এবং সময়ে অসময়ে গিরিবালা বা শক্তির সহিত কলহ বাধাইয়া ভবতারা তাহাদিগকে জ্বালাতন করিতে লাগিল।

একেই তো দুঃখে ও দুর্ভাবনায় গিরিবালার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর এই নূতন বিপত্তিতে কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। যদি হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয় তবে ভবতারার হাতে শক্তির দুর্দশার অবধি থাকিবে না।

তবুও সমস্ত দুঃখই সহিয়া যাইতেছিল; কিন্তু বিপদ হইল ভবতারার বোনপো নবগোপালকে লইয়া। কুদর্শন এবং অশিক্ষিত নবগোপাল একদিন শক্তির সুগঠিত যৌবনমাধুর্য্য-মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাহাকে অবিবাহিত জানিয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য মামীর নিকট আব্দার জুড়িয়া দিল; প্রশ্রয়ও পাইল যথেষ্ট। ভবতারা নবগোপালের সহিত শক্তির বিবাহ দিবার জন্য গিরিবালাকে অবিরাম বিরক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু নবগোপালের কুদর্শন রূপ ও ইতরজনোচিত রসিকতা শিক্ষিতা মাজ্জিতরুচি শক্তির দুই চক্ষের বিষ। একমাত্র সন্তানকে এরূপ একটা অপদার্থের হস্তে অর্পণ করিবার ইচ্ছা গিরিবালারও ছিল না। কিন্তু ভবতারা নবগোপালের নানা সদ্‌গুণ আবিষ্কার করিয়া ক্রমাগত গিরিবালাকে বিবাহ দিবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। প্রথমে ব্যাপারটা গিরিবালা ও শক্তির নিকট একটু কৌতুকজনকই হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ যখন ইহা নবগোপালের শক্তিকে উপহার দেওয়া ও পাড়াপ্রতিবেশীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে ভয়াবহ হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালা একদিন ভবতারাকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে নবগোপালের সহিত শক্তির বিবাহ অসম্ভব। ইহা হইতেই আসল বিপদের উৎপত্তি।

হিলে-শিবানীপুর গ্রামে অজয় চাটুজ্যে এবং পঞ্চানন গোঁসাই, ইঁহাদের মধ্যে কে সমাজপতি ইহা লইয়া একটা বিরোধ বর্ত্তমান ছিল। অজয় চাটুজ্যের নিকট গ্রামের প্রায় সকলেই ঋণদায়ে আবদ্ধ। দুর্গাপদ ভিন্নগ্রামের মহাজনের নিকট ঋণ করিত বলিয়া মুখুজ্যে বাড়ীই এখনও অজয়ের করায়ত্ত হয় নাই। কিন্তু মুখুজ্যেদের নানা বৈদ্যুর্ব্বিপাক বেশিয়া অজয়ের আশা হইয়াছিল যে অন্ততঃ শক্তির বিবাহের সময় ভবতারা ও গিরিবালাকে তাহার নিকট আসিতে হইবে।

গিরিবালার নিকট হইতে জবাব পাইয়া ভবতারা রোষক্ষুব্ধ অন্তরে অজয় চাটুজ্যের নিকট গিয়া তাহাকে নবগোপাল সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার জানাইল ও সাহায্য প্রার্থনা করিল। অজয় ইহাই চাহিতেছিল। উভয়ে ষড়যন্ত্র করার পর অজয় পরদিন আসিয়া গিরিবালা ও শক্তিকে কপট আন্তরিকতার সহিত মিষ্ট ভাষায় জানাইয়া গেল যে শ্রাবণী শ্রাবণ মাসের মধ্যে শক্তির বিবাহ না দিলে গ্রামের সমাজ তাহাদিগকে পতিত করিবে। এতবড় মেয়ে গ্রামে অবিবাহিত থাকিতে পারে না। অজয়ই বহু কষ্টে সমাজের নিকট হইতে গিরিবালার জন্য আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস সময় চাহিয়া লইয়াছে; ইহারই মধ্যে শক্তির বিবাহ না দিলে গিরিবালার গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অতএব আশু ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ভবতারা নবগোপালের কথা উত্থাপন করিয়া জানাইল যে এখানে খুব কম খরচে বিবাহ হইলেও ছেলেটি তত ভাল নয় বলিয়া তাহাদের মত নাই। ইহাতে অজয় নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়া গেল যে নবগোপাল নিশ্চয়ই খুব সৎপাত্র; যাহা হউক নবর সহিতই বিবাহ দিবার জন্য তিনি গিরিবালাকে জোর করিতে পারেন না, তবে যাহারই সহিত হউক শ্রাবণ মাসের মধ্যে শক্তির বিবাহ দিতেই হইবে, নতুবা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজপতিত্বের মর্য্যাদা রক্ষার্থে অজয়কে গিরিবালার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।

অজয়ের প্রস্থানের পর ভবতারাও গিরিবালাকে জানাইয়া গেল যে শক্তির বিবাহ না দিয়া সমাজে পতিত হইলে সেও নিশ্চয়ই গিরিবালার সহিত একত্র বাস করিয়া মুখুজ্যেবংশের অপমান সহ্য করিবে না। মাতাপুত্রীর চক্ষের সম্মুখে সমস্ত ব্যাপারটা ক্রমশঃ বিভীষিকায় পরিণত হইয়া উঠিল।]

কয়েকদিন পরে একদিন মধ্যাহ্নে শক্তি বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ইংরাজি বাঙলা কতকগুলা বই লইয়া পড়িতেছিল। সকাল হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে, কিছু পূর্বে অল্পক্ষণের জন্য একবার ছাড়িয়াছিল, সেই সুযোগে গিরি-বালা কোনো নিকটবর্তী প্রতিবেশিনীর পীড়িত পুত্রকে দেখিতে গিয়াছে,—তাহার পরেই চাপিয়া জল আসিয়াছে, হয়ত সেজন্য আসিতে কিছু বিলম্ব হইবে। ভবতারার ঘর ভিতর হইতে অর্গল দেওয়া,—গত রাত্রি হইতে হাঁটুতে বাতের ব্যথা বাড়িয়া জ্বরভাব হইয়াছে,—জল-বৃষ্টির ভয়ে সে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে।

ইতিহাসোক্ত কোনও ব্যক্তির অপরিসীম অত্যাচার কাহিনী পড়িয়া শক্তির সমস্ত দেহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে চড়বড় শব্দে চাহিয়া দেখিল উঠান দিয়া তাহার দিকে একটি ছাতি অগ্রসর হইতেছে। বৃষ্টির ঝাট হইতে দেহের উর্দ্ধাংশকে বাঁচাইবার জন্য ছাতি বাঁকাভাবে ধরায় ছত্রাধারীর মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখা যাইতেছিল তাহাতেই শক্তি বুঝিল নবগোপাল। একবার মনে করিল তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়,—কিন্তু শত্রুর সম্মুখে ভীতি প্রকাশ করিলে শত্রুর সাহস বাড়িয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বইয়ের পাতায় উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

নবগোপাল সটাং আসিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল, তাহার পর ছাতিটা মুড়িয়া ঘামের গায়ে ফেলাইয়া রাখিয়া ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, "কি দুর্যুগ রে বাবা? দেবতা যেন ক্ষেপে গেছে!" তাহার পর মাথার উপর হাত বুলাইয়া বলিল, "ইস্! ছাতিটার ছেঁদা ছিল, সমস্ত মাথাটা একেবারে ভিজে গিয়েছে! দাও ত, দাও ত গো শক্তি, ঐ গামছা খানা দাও ত, মাথাটা মুছে ফেলি।"

দস্যির আননায় যে গামছাটা শুকাইতেছিল সেটা শক্তিরই। নিজের ব্যবহারের গামছাখানা নবগোপালের ব্যবহারে দিতে তাহার মন ঘৃণায় ও বিরক্তিতে কঠিন হইয়া উঠিল, কিন্তু উপায় কি? ভিজা মাথায় কোনো ব্যক্তি গামছা ভিক্ষা করিলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করাও কঠিন, তা সে বিবাহের পক্ষে যত অপাত্রেই হোক্ না কেন।

শক্তির হাত হইতে গামছা লইয়া নবগোপাল প্রথমে মাথা মুছিল—তাহার পর হাত এবং পা ভাল করিয়া মুছিয়া গামছাটা শক্তির দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও, ভাল ক'রে মেলে দাও।"

নবগোপালের ব্যবহৃত গামছা হাতে লইতে শক্তির ঘৃণা করিতেছিল; কোনও রূপে তাহার এক প্রান্ত ধরিয়া সে সেটাকে আলনায় ঝুলাইয়া দিল। নবগোপালের প্রতি তাহার এই ঘৃণা নবগোপাল দেখিতে কদাকার, সাজ সজ্জায় অপরিচ্ছন্ন, অথবা অশিক্ষিত অমার্জ্জিত ব্যক্তি বলিয়াই ঠিক নহে; মনের মধ্যে নবগোপালের প্রতি তাহার যে একটা অপরিমেয় বৈরূপ্য সৃষ্টি লাভ করিয়াছিল এ তাহারই একটা প্রকাশ। নবগোপাল তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অভিশাপ রূপে দেখা দিয়াছে, নবগোপাল তাহার বর্ত্তমান জীবনের সঙ্কট হইয়া উঠিয়াছে—সুতরাং নবগোপালের প্রতি তাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অন্ত ছিল না।

বইগুলা গুছাইতে গুছাইতে শক্তি বলিল, "জেঠাইমা বোধহয় এখনো ঘুমোননি। আপনি যান না, দোর ঠেলুন—খুলে দেবেন এখন। আমি ডেকে দোবো?"

শক্তির সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া নিম্নকণ্ঠে নব-গোপাল বলিল, "জোরে কথা কোয়োনা—জেগে থাকলে শুনতে পাবে।" তারপর নিঃশব্দে একমুখ হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার জেঠাইমার জন্যে আমার ত' ঘুম হচ্ছেনা! এই দুর্যুগে আমি এসেচি তার জন্যে জান?—তোমার জন্যে।"

কঠিন স্বরে শক্তি বলিল, "আমার জন্যে এসেচেন?"

নবগোপাল বলিল, "কেন এসেচি দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে—দেখাচ্ছি; কিন্তু আগে বলত' গিন্নিমাসী কোথায়? তিনিও ঘুমিয়েছেন না কি?"

শক্তি বলিল, "না, তিনি ঘুমোন নি।"

"তবে? ঘরে রয়েছেন?"

সত্য কথাটা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা শক্তির ছিল না,

কিন্তু মিথ্যা কথা বলিবার অভ্যাসও তাহার নাই। বলিল, "তিনি বেরিয়েছেন,—এখনি আসবেন।"

"যখন আসবেন তখন আসবেন, এখন ত তোমাকে জিনিষটা দেখাই। দুষ্টুগ্রহ হলে কি হয়, বেছিয়েছিলাম মাহেন্দ্রিক ক্ষণে দেখচি!" বলিয়া নবগোপাল কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রোধে এবং বিরক্তিতে শক্তির মাথার মধ্যে রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল। যে বিসদৃশ অভিনয় তাহার জেঠাইমা বন্ধ করিল না এবং তাহার মা বন্ধ করিতে পারিল না সে স্বয়ং আজ তাহার যবনিকা পাত করিবে বলিয়া অন্তরের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "ও আপনি খুলবেন না, আমি আপনার জিনিষ দেখতে চাইনে!"

সবিস্ময়ে শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নবগোপাল বলিল, "কেন? দেখতে চাও না কেন?"

সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া শক্তি বলিল, "ও-সব বই আমি পড়ি নে,—আপনার সে দুখানা বই-ও আমি পড়ি নি—আপনি আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।"

হৃদয়ের দুর্দ্ধমনীয় আবেগ প্রবর্ত্তিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সে অমূল্য বই দুখানি শক্তি পড়ে নাই শুনিয়া নবগোপাল তীব্র আঘাত পাইল। হতাশাক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে বলিল, "পড় নি! পড়লে দেখতে বই দুখানা ভাল। আমার শ্যালকীরের এক বন্ধুকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছিলুম।" তাহার পর অর্দ্ধ-উন্মোচিত পুঁটুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ বইখানা কিন্তু খুব ভাল—পড়ে দেখো না?"

বই আর কিছুতেই লইবেনা সে বিষয়ে শক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে; বলিল, "না, ও বই-ও ভাল নয়।"

শক্তির কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া নবগোপাল বলিল, "কি বই বল দেখি?"

নাম ধরিয়া নিন্দা করিলে অগত্যা নবগোপালকে নিরস্ত হইতেই হইবে মনে করিয়া শক্তি বলিল, "আমি জানি,—দিনে ডাকাতি।"

নিমেষের মধ্যে নবগোপালের মুখ হইতে উদ্বেগের কালিমা অপসৃত হইয়া গেল; উল্লসিত কণ্ঠে বলিল, "ঘোটেই না! কলির মেয়ে কমলকুমারী!"

আরক্তমুখে শক্তি বলিল, "তা সে যে কুমারীই হোক ও আমি কিছুতেই নোবো না!" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা নবগোপালবাবু, আপনি কোন্ অধিকারে এমন ক'রে আমাকে উপহার দিতে আসেন?"

অদূর ভবিষ্যতে যে ব্যক্তি স্বামীপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাকে নাম ধরিয়া এবং নামের সহিত 'বাবু' সংযুক্ত করিয়া ডাকিতে শুনিয়া নবগোপাল আহত হইল; কিন্তু সে বিষয়ে উপস্থিত কোনও প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "কোন্ অধিকারে কি বলছ গো? এই সেরাবোন মাসের তেসরা তারিখে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'বে, আর বলছ—কোন্ অধিকারে?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে?—তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই জানবেন!"

নবগোপালের মুখে নিশ্চিন্ততার হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তুমি জাননা ব'লে বলছ নেই,—আছে; খুব আছে। তোমাদের গাঁয়ের অজয় চাটুয্যে আমার বাবাকে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের জন্যে লিখেছিল। বাবা আর মা পোনেরো আনা তিন পাই রাজি হয়েছে। আসছে শুক্রবারে তোমাকে দেখতে আসবে আর সেই দিনই আমাদের দুজনের আশীর্ব্বাদ হয়ে যাবে। তবে বলছ অধিকার নেই?"

শক্তি কঠোরস্বরে বলিল, "আপনার বাবাকে আসতে মানা ক'রে দেবেন। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না!"

নবগোপালের মুখে আবার উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল; বলিল, "আমার বাপ-মাকে যখন রাজি করিয়েচি তখন আর বাধা কি?"

"তবু বাধা আছে।"

"কি বাধা?"

যে বাধার কথা বলিলে নবগোপালের আর প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিবে না তেমন কোনো বাধার কথা মনে না পড়ায় শক্তি চুপ করিয়া রহিল।

মৌন লজ্জার লক্ষণ মনে করিয়া নবগোপাল বলিল, "বলতে লজ্জা করচে?"

উত্তরে 'না' এবং 'হ্যাঁ'র কোন্‌টা বলিলে পরে কথা-বার্ত্তার অসুবিধা হইবেনা বুঝিতে না পারিয়া শক্তি বইগুলা লইয়া নীরবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

নবগোপালের সংশয় বাড়িয়া উঠিল। সে কলির মেয়ে কমলকুমারীতে পড়িয়াছে লেখা-পড়া জানা মেয়েরা অনেক সময় নিজেদের বিবাহ নিজেরা ঠিক করে। বলিল, "তুমি কোথাও তোমার বিয়ে ঠিক করেছ না কি?"

নবগোপালের প্রশ্ন হইতে আত্মরক্ষার একটা দিক পাইয়া মৃদুস্বরে শক্তি বলিল, "করেচি।"

"করেচ? কোথায়?"

"কলকাতায়।"

ব্যস্ত হইয়া নবগোপাল বলিল, "আচ্ছা বা, তা বলচিনে। কার সঙ্গে?"

একটু চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "তাঁকে আপনি চিন্‌বেন না।"

"পাশ করা পাত্তোর?"

"পাশ-করা।"

"ক টা পাশ।"

"চারটে।"

"বাবা!"

ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া নবগোপাল বলিল, "পাত্তোর দেখ্‌তে কেমন? ভাল?"

"ভাল।"

"বড়মানুষ?"

"জমিদার!"

"কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে?"

"একরকম পাকাপাকিই।"

"সত্যি বলছ? আচ্ছা, গা ছুঁয়ে দিব্যি কর!" বলিয়া নবগোপাল শক্তির হাতের দিকে নিজের হাত বাড়াইয়া দিল।

হাত সরাইয়া লইয়া শক্তি বলিল, "আমি দিব্যি করিনে।"

প্রতিযোগিতায় জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নবগোপালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। যে-দিকটা সে পরীক্ষা করিতে যায় সেই দিকটাই অপরাজেয়! বিদ্যার দিকটা ত' একেবারে যেন অথই সাগর! একটা পাশের গভীরতা যাহাকে ডুবাইয়া মারে, চারটা পাশ ত' তাহার পক্ষে বিভীষিকা! তাহার পর, অর্থের দিকটাই কি সামান্য? যে জমিদারীর গৌরবে তাহারা পাঁচজনের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়া বেড়ায়, এক একটা জমিদারি হেলন কত-শত জমি-জমা গিলিয়া খায় তাহার ধারণাই তাহার নাই! তাহার পিতা মাসে মাসে তিন কম তিন কুড়ি টাকা 'পেনসোন্' পাইয়াও যে জমিদার-বাড়িকে সসম্ভ্রমে 'বাবুদের বাড়ি' বলিয়া উল্লেখ করে সেই জমিদারি কি সহজ কথা!

নবগোপালের নীরব নিস্তেজ ভাব দেখিয়া মনে মনে সাহস পাইয়া শক্তি বলিল, "সব কথা ত' শুন্‌লেন, এখন বলুন ত', আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে?"

তালুর সহিত জিহ্বার যোগে অনুযোদন সূচক এক প্রকার শব্দ বাহির করিয়া নবগোপাল বলিল, "রাম-চন্দোর! তাই কি হয়! বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়া ত একরকম বিয়ে হওয়াই,—কি বল?"

মৃদুস্বরে শক্তি বলিল, "তা ই ত।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিষণ্ণ স্বরে নবগোপাল বলিল, "কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে গেল শক্তিরাণী! সব যেন উদাস উদাস লাগ্‌ছে!"

নবগোপালের অন্তরের বেদনার পরিচয় পাইয়া শক্তি মনে মনে একটু ব্যথিত হইয়া বলিল, "এর জন্যে আর দুঃখ কি! আপনার কত ভাল বউ হবে।"

অপ্রত্যয়ের মৃদু হাসি হাসিয়া নবগোপাল বলিল, "দুর্! তাই কি হয়! শুন্‌লে হয় ত' পেত্যয় যাবে না শক্তি, তোমার মত সোন্দোর মেয়ে, সাতক্ষীরে ত' সাত-ক্ষীরে, সমস্ত খুল্‌নে জেলায় আর একটা আছে কি না সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, ছিল বটে একটা মেয়ে রাউলপিণ্ডিতে—তবে তোমার মতন কি না—আচ্ছা, একবার চেয়ে দেখত' আমার দিকে?"

সমবেদনার এবং কৃতজ্ঞতার শক্তির মন দ্রবীভূত হইয়া-ছিল, সে ধীরে ধীরে নবগোপালের দিকে চাহিয়া দেখিল। শক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "রামচন্দোর! তোমার চোখ দুটোর বাহার কি চমৎকার! তার চোখদুটো একটু কুৎকুতে।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে একটা কথা তোমাকে বলি, কাউকে যেন বোলোনা,—তোমার

সঙ্গে বিয়ের কথার লোভও হোত তারও করত। বেশী লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়েরা সোয়ামীকে তুকোতাছিল্যে করে। কলির মেয়ে কমলকুমারী তাই করত। বইখানা তুমি প'ড়ে দেখ্‌লেনা, ভালো বই,—অনেক শিখে হোতো।"

উপস্থিত সঙ্কির মৈত্র অবস্থাকে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ করিতে শক্তির প্রবৃত্তি হইল না; বলিল, "আচ্ছা দিন, প'ড়ে দেখব!"

সোৎসাহে বইখানা পুঁটলির ভিতর হইতে বাহির করি। নবগোপাল একটা পাতা খুলিয়া শক্তির সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এই ছবিখানা দেখ। কমল-কুমারীর সোয়ামী কমলকুমারীর জুতোয় ফিতে বেঁধে দিচ্ছে। কমলকুমারী মেয়ে-স্কুলে পড়াতে যাবে। আচ্ছা, বিয়ে হ'লে তুমি বোধহয় এরকম আচরণ করতে না। না?"

মাথা নাড়িয়া শক্তি জানাইল কমলকুমারীর মত অবৈধ আচরণ সে করিত না।

নবগোপাল বলিল, "তা আমি জানি। তুমি ইংরিজি পড়েছ—কিন্তু লোক ত' খারাপ নও। ভালো লোক!"

নবগোপালের দিকে একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি বলিল, "আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে নবগোপাল দাদা" তাহার পর অনুরোধের কথাটা উপস্থিত বন্ধ রাখিয়া বলিল, "আপনাকে এখন থেকে আমি নবগোপাল দাদা ব'লে ডাক্‌ব। কেমন?"

একটু ক্ষুব্ধভাবে নবগোপাল বলিল, "সে ওঢ়ে যখন বলি তখন কি আর করবে, দাদা ব'লেই ডেকো। কিন্তু দেখ, বাবু ব'লে ডেকোনা। একটু আগে যখন বাবু ব'লে ডেকেছিলে পেজায় খারাপ লেগেছিল তুমি কি বাটাছেলে যে আমাকে বাবু ব'লে ডাকবে?"

এ যুক্তির সারবত্তা কিছুমাত্র উপলব্ধি না করিলেও শক্তি কোনোপ্রকার তর্ক না তুলিয়া বলিল, "না, বাবু ব'লে ডাকব না।" তাহার পর মুখের মধ্যে পুনরায় অতি করুণ ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "দেখুন, আপনার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ আমার যে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে সে কথা কাউকে বলবেন না।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "সর্বনাশ! সে কথা কখনও বলে? তোমাদের ঐ যে ভবতারা জেঠি—মনে কোরোনা খুব সুখিয়ের লোক। ভয়ানক দজ্জাল মেয়েমানুষ! জানতে পারলে তোমাদের কিছু না জানিয়ে একদিন জোর ক'রে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিইয়ে দেবে। আমি যে সব জানি—অজয় চাটুয্যের সঙ্গে ওর মড়্। হঠাৎ একদিন দেখ্‌বে সকাল বেলা তোমার গায়ে-হলুদ হ'য়ে গেল—সন্ধ্যেবেলায় বিয়ে। এই নির্ঝঞ্ঝাট ঘুরে তোমরা দুজনে কি করবে বল?"

নবগোপালের কথা শুনিয়া শক্তি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; বলিল, "এখন ত' আর সে রকম কিছু করতে পারবেনা?"

নবগোপাল সদর্পে বলিল, "ক্ষেপেছ? আমি যাজি না হ'লে কার সাধ্যি বিয়ে দেয়! আমি কি অজয় চাটুয্যের খাতক, না প্রজা?" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

"কিন্তু যদি অন্য পাত্রের সন্ধ চেষ্টা করে?"

"জানাকে জানিয়ে, আমি এমন ভাংচি দিয়ে দেবো যে, ও তল্লাটে কেউ তোমাকে বিয়ে করা ত দূরের কথা, ছোঁবেও না। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাব।"

বর্ষা বাদলের দিন, পথে সন্ধ্যা হইয়া গেলে অন্ধকারে পথ চলিতে কষ্ট হইবে বলিয়া নবগোপাল উঠিতে চাহিল।

শক্তি বলিল, "কখন্ বেরিয়েছেন—একটু জল খেয়ে যান নবগোপাল দাদা।"

নবগোপাল আপত্তি করিল কিন্তু শক্তি কিছুতেই শুনিল না। বারান্দায় আসন পাতিয়া জল দিয়া জলখাবার আনিতে গেল।

নবগোপাল বলিল, "আবার ঠাঁই করছ কেন? হাতেই একটু কিছু দাও না।" শক্তি সে কথা শুনিল না—একটা কাঁসার রেকাবে চারখান পরোটা এবং গোটা চারেক নারকেল নাড়ু আনিয়া আসনের সম্মুখে ধরিয়া দিল।

নবগোপাল আসনে বসিয়া আহার করিতেছে এবং নিকটে বসিয়া একখানা পাখা লইয়া শক্তি মাছি তাড়াইতেছে এমন সময়ে অঙ্গনে প্রবেশ করিল গিরিবালা। ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া একটু দাঁড়াইল। তাহার পর শক্তির আকৃতি ও আচরণ হইতে এ কথা বুঝিল

যে, ব্যাপারটার মধ্যে বিস্ময়ের কারণ যত বেশিই থাকুক না কেন চিন্তার কারণ নাই। নিকটে আসিয়া সুরের সহিত সুর মিলাইয়া বলিল, "এই যে নবগোপাল। কতক্ষণ এসেছ বাবা?"

নবগোপাল হাসিয়া বলিল, "তা অনেকক্ষণ। এই দেখ মাসিমা, শক্তি কিছুতেই ছাড়লে না—এত জল-খাবার খাইয়ে দিলে

গিরিবালা স্মিত মুখে বলিল, "সে ত ভালই করেছে। তুমি ঘরের ছেলে, একটু জল খাবে না?"

শক্তি বলিল, "জেঠাইমার শরীর খারাপ শুনে তাঁকে মুখ ফেকে না তুলেই নবগোপাল দাদা বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। তাতে ওঁকে জল না খাইয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি?"

গিরিবালা বলিল, "তাই কি হয়। আচ্ছা, তোমরা বোস, কাপড়টা বদলে আমি আসচি।"

গিরিবালা প্রস্থান করিলে নবগোপাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সব কথা আমি গিরিমাসিমাকে বলব না কি শক্তি?"

শক্তি বলিল, "কথাবার্ত্তা কইতে গেলে আপনার দেরি হয়ে যাবে। আমি পরে সুবিধা মত সব বলব অখন।"

নারিকেল নাড়ু খাইতে খাইতে নবগোপাল বলিল, "এমন সুন্দর নারকেল নাড়ু করেচ, কিন্তু খেতে তেমন মিষ্টি লাগচে না।"

সকৌতূহলে শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

নবগোপাল বলিল, "মনটা কেমন উদাস লাগচে! আজ যদি এমন না হয়ে অন্য রকম হোত তা হ'লে কত মিষ্টি লাগত এই নারকেল নাড়ু, বল দেখি নি!"

শক্তি দেখিল নবগোপালের চক্ষু চক্ চক্ করিতেছে। ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে নবগোপালও দেখিত শক্তির চক্ষুও ঈষৎ চক্‌চকে হইয়া উঠিয়াছে।

গিরিবালা আসিলে নবগোপাল আহার শেষ করিয়া অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রস্থান করিল।

ঔৎসুক্য-স্মিত মুখে গিরিবালা বলিল, "নবগোপালকে খাবার খাওয়াচ্ছিল, দাদা ব'লে ডাকছিল, ব্যাপার কি রে শক্তি?"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "সে অনেক কথা মা, পরে সব তোমাকে বলব।"

"ও বইখানা কি বই?"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "কলির মেয়ে কমলকুমারী।"

"কে দিয়েছে? নবো?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এবার থেকে আর নবো বোলোনা মা। তুমি বলবে নবগোপাল আর আমি বলব নবগোপাল দাদা।" বলিয়া শক্তি হাসিতে লাগিল।

গিরিবালা বলিল, "কি জানি বাপু, তোদের কাণ্ড-কারখানা কিছুই বুঝতে পারিনে। আমি চল্লুম একটু শুতে, শরীরটা তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না।"

"কেন মা জ্বর আসচে না কি?"

"না, জ্বর নয়—মাথাটা একটু ঘুরচে।"

"যেখেনে-সেখেনে কষ্ট করে শুয়ো না, চল আমি তোমার বিছানা ক'রে দিইগে।" বলিয়া শক্তি তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

ভজন

(যৎ—ত্রিতালী)

নজরুল ইসলাম

হে বিধাতা !
দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে,
কাঁদায়ে জননী প্রায় কোলে কর পুনরায়,
শান্তি-দাতা !
হে বিধাতা ॥
সুখ-দিনে যবে নাথ ভুলে' থাকি তোমারে
স্মরণ করাও হাও আঘাতের মাঝারে,
দুঃখের মাঝে তাই হরি হে, তোমারে পাই
দুঃখ-ত্রাতা !
হে বিধাতা ॥
দারা-সুত পরিজন ভুলে, হরি অনুক্ষণ
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে স্বজন।
তুমি যবে চাও মোরে লও হে তাদের হ'রে,
ছিঁড়ে দিয়ে মায়-ডোর ক্রোড়ে কর আপন !
সব যবে ছেড়ে যায়, দেখি তব বুকে হায়
আসন পাতা।
হে বিধাতা ॥

খেয়ালী

শ্রী অসিতকুমার হালদার

কল্পনার মুক্তি যেখানে সেখানেই খেয়াল অবাধে খেলে। এই খেয়ালের খেলা নিয়ে যিনি থাকেন তিনিই কবি বা শিল্পী আখ্যা নিয়ে লোকসমাজের একটা বিশেষ পংক্তিতে গিয়ে বসেন। খেয়াল কেবল মানুষেরই একচেটে ব্যবসা নয়। এই সৃষ্টির ভিতর খেয়াললীলা যে কত রঙে কত গন্ধে কত আকারে ছড়িয়ে আছে তার তুলনায় ক'টি মানুষ আছে যে সেই বিরাট খেয়ালীর খেয়ালের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চলতে পারে? খেয়ালের নাচের ছন্দ ধরবার কারবার করার তার মানুষের ভিতর তাই কবি ও শিল্পীরাই নেন। মনে রঙ ধরান এবং জগতকে রঙিন ক'রে তোলাই তাঁদের কাজ। মানুষ দুনিয়ার আসে তারপর আসার পথ ভুলে যায়, তাই তার নেশা লাগে এখানে এসে এখানকার নিজের পুঁজি বাড়াবার—ভাবে 'অনন্তকাল ধ'রে সে এসেছে এবং চিরকাল তার ধনঘড়াটি এঁটে ধ'রে কেটে যাবে। এদিকে আপন-ভোলা খেয়াল-খোলা কবি-শিল্পী এই দুনিয়ার ভিতরকার খেয়ালের সুরটিকে প্রত্যক্ষ-বোধের দ্বারা পরখ ক'রে আপনার আনন্দরচনায় গা ঢেলে দিয়ে চলেন।—আনন্দের বন্যায় রাত-দিন বছর-বয়স সব কোথায় ভেসে যায়—জীবন-মরণ তার কাছে তখন কথা কয় খেয়ালের সুরে—তাকে ধ'রে রাখে এমন কেউ নেই। তাকে হিসাবের খাতা লিখতে দিলে তার পাতায় অঙ্কর স্থলে অঙ্কন বেরয়। গুমশুমারিগিরি করতে গেলে তার কলমের খোঁচায় কারিগরি বেরিয়ে পড়ে। দুনিয়ার সবাই তাকে ধামাচাপা দিতে চাইলেও তার জয়ঢাক ঘুরে দেশান্তে বেজে উঠবেই উঠবে।

তাই আজও মিশর চীন ভারত ও রোমের খেয়ালীদের খেয়াল-রচনা জগৎকে মুগ্ধ করছে। এই হ'ল শিল্পীর পরিচয় এবং এইখানেই হ'ল তার জয়। ঘুমায় ত সকলেই কিন্তু ঘুমের স্বপনলোকের সৃষ্টি কে করতে পারে? মায়ের মত জগতের সবাইকে সর্বাগ্রগ্রত আত্মবিস্মৃতির ভিতর সৃষ্টির স্বপনতন্ত্রা বপন ক'রে তোলার শিল্পী ও কবি।

দেখা যায়, প্রতিনিতে সৃষ্টির ভিতর—পর্ব্বতকন্দরে, গাছের শাখাপ্রশাখার ভিতর, নদ নদী তটের ভাঙনের মধ্যে, মেঘের মধ্যে কত খেয়ালীর রূপলোকের সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার আলো-আঁধারের তারতম্যে নব নব রূপ ধারণ করছে। যদি এই সৃষ্টি কোনো আপিসিক নিয়মে ঠিক এক একটি বিশেষরূপ নিয়েই চিরকাল ব'সে থাকত ত আমরা দেখ তুম পাহাড়পর্ব্বত কতকগুলি শাকবাজির সমষ্টি এবং গাছপালা জনমনুষ্য সব একছাঁচে ঢালা চিবি বিশেষ। তাহলে আর কবি- শিল্পীর বিচিত্র কল্পনার প্রয়োজন থাকত না। বেশ সব কুচ-কাওয়াজের বাঁধি নিয়মে সোজাসুজি চ'লে যেতো। কিন্তু আঁকা বাঁকা গতিই হ'ল ছন্দ-গতি। তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বলাকার সাথে, গাছপালার সহজ ভঙ্গীতে আমরা পাই বটে কিন্তু দেখেও দেখি না। তাই কবি সেটা খেয়ালী চরণা চোখে দিয়ে দেখতে পান এবং সবাইকে তার রস পরিবেষণ করেন।

নদীর সচকল গতির ভিতর, আগুনের স্ফুলিঙ্গের ভিতর, গাছপালার ফুল ও পত্রসজ্জার ভিতর যে প্রতিছন্দ খুঁজে বার করেছেন প্রাচীন প্রাচ্য-শিল্পীরা তার ভিতরও ঐ বিরাট খেয়ালীর ছন্দ খেয়ালী শিল্পরাই ধরতে পেরেছেন। ক্যামেরার কলের সাধ্য নেই সেই কলাকৌশলের রূপ ধ'রে দেয়। আলোছায়ার জড়ানো একটি ছাপ যা ক্যামেরা ধ'রে দেয় তার ভিতর সে লীলা-ছন্দ কখনো ধরা পড়ে না। এইখানে শিল্পীর সাধনা চির-কাল কলকব্জাকে জয় করেছে।

যেখানে জড়তা সেখানে তম সেখানেই দানব রাজত্ব করে। যেখানে চিত্তের মুক্তি সেখানেই সৃষ্টি এবং তা' শ্রেষ্ঠত্বদানে অধিকার করে। কবিচিত্তের ভিতর জড়তার বাধা যখনই বাঁধনে তখনই কাব্যসরস্বতী তাঁর নিকট বিদায় নেবেন। উৎস থেকে উৎসারিত জল যেমন সতেজ স্বচ্ছমূর্ত্তি ধারণ করে, কল্পনার মধ্যেও সেই প্রীতি-উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজ ভাব যদি না থাকে তবে তা ভয়ে ভয়ে রঙ চাপিয়ে আঁকা ছবির মত আড়ষ্ট ও অনাসৃষ্ট হয়। কবি ও শিল্পীর ভিতরকার এই সহজ রসানুভূতির পরিচয় যে খুব বেশী পাওয়া যায় তা নয়। তাই আমরা বাণীর বরপুত্রের কাব্যের ভিতর সহজ সুস্পষ্টতা যখন দেখতে পাই তখন মুগ্ধ হ'য়ে যাই। কবি সোজাসুজি ভাবে গেয়েছেন—

"লাগ্‌ল ভাল মন ভোলালো
এই কথাটিই গেয়ে বেড়াই—
দিনে রাতে সময় তোমা
কাজের কথা তাই ত এড়াই।
বলেছে মন মজ্‌লো আঁখি
মিথ্যে আমার ডাকাডাকি
ওদের আছে অনেক আশা
ওরা করুক্ আরো বড়
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই
চাই না হ'তে আরো বড়।"

আকাশের রবি তার বর্ণিকায় প্রতিদিন উদয়-অস্ত কত বর্ণের ছবি যে এঁকে চলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেগুলিকে পটে ধ'রে রাখবার পট মানুষের কাছে নেই। তবে তার বৈচিত্র্যের রসসন্ধানের খবর কবি ওঁর খেয়ালী কাব্যকলায় যা আজীবন পরিবেষণ ক'রে চলেছেন তারও তুলনা করা সাধ্যাতীত।

বাহিরের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

লিভারপুল

মাসী ফিরে গেছে লণ্ডনে। গুপ্ত ও মাধু ফিরে যাবার যত্নের করছে ম্যাঞ্চেষ্টারে—সেখানে গুপ্তর কিছু কাজ বাকি আছে। আমাদের মধ্যে এই কথা হ'ল যে কাজ-কর্ম্ম সেরে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে শেষ-বিদায় নিয়ে গুপ্ত ও মাধু চলে' যাবে লণ্ডনে, আর আমরা ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের গুটিকয়েক সহর দেখে লণ্ডনে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলব—তারপর তথা হ'তে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব কন্টিনেন্ট (Continent) ভ্রমণে।

গুপ্তরা সেদিন বেলা দশটার ট্রেনে এডিনবরা ছাড়ল আমরাও সেই দিনই টপ্ করে' সব গুছিয়ে নিয়ে (খানিক গোছান আগেই হয়েছিল) বেলা ১২টার ট্রেনে রওনা হলাম লিভারপুলের দিকে।

লিভারপুল সহরটা সমুদ্র থেকে তিন মাইল ভূমে। বিসে যেন পড়েছিলাম যে আমদানি-রপ্তানি মালের পরিমাণ হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বন্দর লণ্ডন—আর ঐ হিসাবে লিভারপুলের স্থান দ্বিতীয়। তাই খেয়াল হ'ল সহর ছেড়ে আগে বন্দরে গিয়ে দেখতে হবে তথাকার দৃশ্য ও বিধিব্যবস্থা। যা মনে করা কাজেও তাই—উভয়ে বেরিয়ে পড়লাম বন্দরে যাবার পথে। খানিকটা ট্রামে গিয়ে 'ওভারহেড্' (overhead) রেলে উঠা গেল। ওভারহেড্ রেলগাড়ী তাড়িত শক্তিতে চলে—সহরের ভেতর থেকে চলতে সুরু করে' বন্দরে গিয়ে বরাবর ডকের ধারে ধারে চলেছে। শ্রমিকরা কাজ করে বন্দরে, বাস করে সহরের বাড়িতে—সেখান হ'তে এতিদিন বাসে (Bus) করে' সহরে এসে এই 'ওভারহেড্' রেল চড়ে' যার যার কার্য্যস্থলে হাজির হয়। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত ঠিক ট্রামের মতনই এই 'ওভারহেড্' গাড়ীগুলি অনবরত যাতায়াত করছে।

সঙ্কীর্ণ স্থান—মাটিতে রেল লাইন পাতা হ'লে রাস্তার অনেকটা ফুরে' থাকে, লোকজন গাড়ীঘোড়া চলাচলের ব্যাঘাত হয়—তাই,—নীচে যেমন রাস্তা দোকান বাজার আছে তেমনি রেখে দিয়ে এবং যেমন গাড়ী মোটর লোকজন চলছে তেমনি চলতে দিয়ে—বুদ্ধি খাটিয়ে এ-সবার উপরে উঁচু উঁচু দাঁকোর মতন তৈরী করে' তার ওপর রেল লাইন পেতে গাড়ী চলার ব্যবস্থা করে' নিয়েছে। নীচে রাস্তা উপরে রেল লাইন—এই দোতলা বন্দোবস্তে নীচে গাড়ী-ঘোড়া লোকজন চলাচল আর উপরে রেলগাড়ী চলাচল উভয় কাজই একই সময়ে অবাধে সুশৃঙ্খলায় চলছে।

সবার মাথার উপর দিয়ে যায় বলেই নাম দিয়েছে "ওভারহেড্ লাইন।" এ লাইন এক মাইল আধ মাইল দিয়েই শেষ হয় নি—মাইলের পর মাইল চলছে এই শূন্যে ঝোলান লাইন, আর প্রতি মিনিটে তার উপর চাপ পড়ছে লক্ষ লক্ষ মণ জিনিষের। এ রকম লাইন তৈরী করার ইঞ্জিনিয়ারিং বাহাদুরি যে খুবই আছে সে কথা বুঝতেই পার। এ জাতটা কি রকম কৌশলী ও অধ্যবসায়ী দেখলে ত? একটু সময় নষ্ট, একটু অসুবিধা ভোগ করতে রাজী নয়। সময়ের মূল্য বোঝে বলেও ওদের এত উন্নতি।

যথাসময়ে বন্দরে পৌঁছে তথাকার বিরাট ব্যাপার দেখে বাস্তবিকই চোখে তাক্ লেগে গেল। স্তব্ধ হ'য়ে কিছুক্ষণ চারদিকে দেখে নিলাম।

মার্সি নদীর খাড়ি (পাড়ি না বলে' উপসাগর বললেই ভাল হয় ; মার্সি সাগরসঙ্গম থেকে উপরে অনেক দূর পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত সুগভীর। বড় বড় জাহাজ অবাধে যাতায়াত করে। এই মার্সি খাড়ির এক পারে লিভারপুল, অপর

পারে বার্কেন্‌হেড্‌। উভয়ে মিলে' এক প্রকাণ্ড বন্দর। মার্সির উভয় পারে ছোট-বড় অনেকগুলি ডক (Docks) —প্রায় ৯ মাইল জুড়ে'; এবং জেটি প্রায় ৩৬ মাইল। ক'বছর আগে (১৯২৭ সালে) গ্লেডষ্টোন ডক (Gladstone Docks) নামে যে ডক খোলা হয়েছে তার মত আধুনিক বহুপাতি ও সাজ সরঞ্জামওয়ালা ডক পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

টিক ও টেলিফোন সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের জাহাজই লিভারপুলে যাতায়াত করে এবং পৃথিবীর সব জাহাজ কোম্পানীর আপিসই এখানে আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সে সব আপিস। গুদাম ঘরের বারো মাইলের পর মাইল জুড়ে'! একটা তামাকের মাল-গুদাম কত বড় শুনবে? গল্প নয়, খাঁটি কথা। ষ্ট্যান্‌লি তামাক-গুদামের (Stanly tobacco ware house)

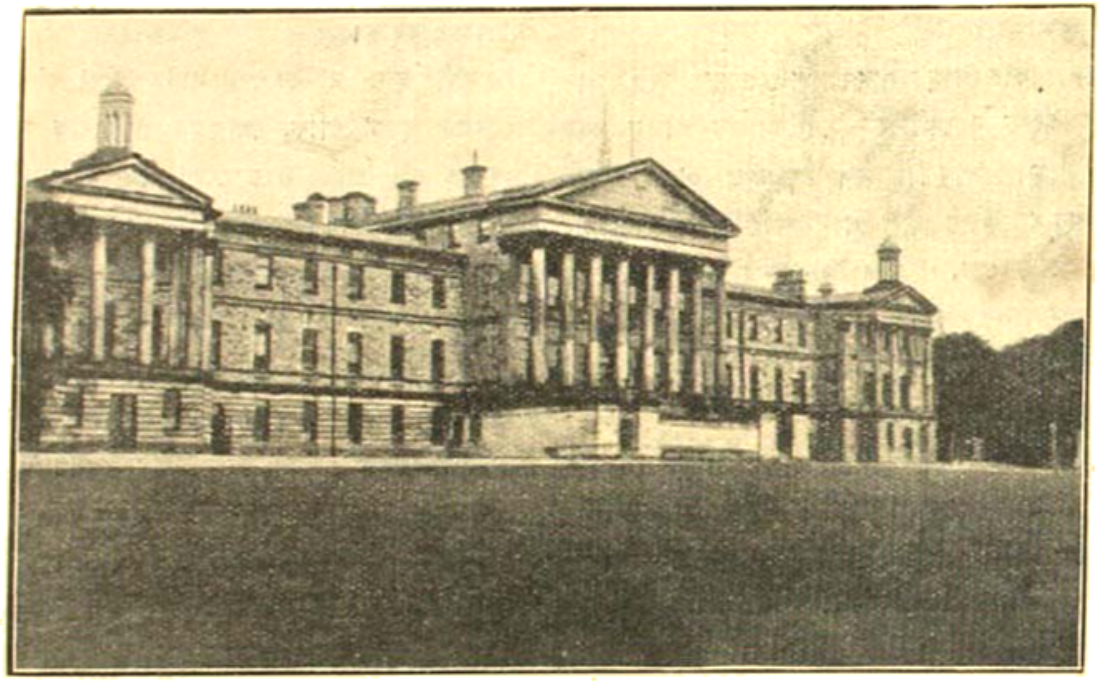

লিভারপুলের একটি পুল

মার্সির ডকে জাহাজ প্রস্তুত হয়। মার্সি খাড়িতে একখানা শিক্ষা-জাহাজ (Training Ship) আছে—তাতে অনাথ বালক ও নাবিকদিগের ছেলেদিগকে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

লিভারপুলে সব চেয়ে বড় কারবার তুলার—তারপর পশমের কারবারও কম নয়। ম্যাঞ্চেস্টারে ছোট বড় অসংখ্য সুতা ও কাপড়ের কল-কারখানা—আশপাশে কয়লার খনি ও লোহার কারখানা; এবং ইয়র্কসায়ারে পশম ও পশ্‌মি বস্ত্রের কারখানা। এই সমস্ত কল-কারখানার অধিকাংশ মালপত্র আমদানি-রপ্তানি হয় লিভারপুল পোর্টের মারফতে। এ ছাড়া লিভারপুলে নানের কারখানা,—কাচ, সাবান, দেশলাই, তামাক, সিমেন্ট, ইলেক্‌-

চৌদ্দ তলার মেজের পরিমাণ—এক শত বিঘারও অধিক। পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও এতবড় তামাকের গুদাম নাই। একটা তামাকের গুদামই যেখানে এতবড় সেখানকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরাটত্ব একবার অনুমান করে' দেখ দেখি।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—লিভারপুল প্রভৃতি বড় বড় বন্দর না দেখ্‌লে ইংরেজী বাণিজ্যের বহর একবারেই অনুমান করা যায় না। কীই যে সব জগৎ-ব্যাপী বিরাট কারবার! দেখ্‌লে অবাক ও স্তব্ধ হ'য়ে যেতে হয়! কত দেশ-বিদেশেরই না পণ্যসম্ভার ওরা অধিকার করে' বসে' আছে। আমাদের দেশেরই কত জিনিষ নিয়ে এসে এবং আমাদের দেশে কত জিনিষ চালান দিয়ে ওরা ধনী হ'চ্ছে—আর

আমরা তুলে' দিয়ে কাজ আছি

সব ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে ফেরা গেল। ফেরবার পথে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই যেন কানে এল চাটগাঁ নোয়াখালী অঞ্চলের খালাসীর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য্য হ'য়ে জানালা দিয়ে মুখ বে'র করে' দেখি—সত্যি সত্যিই একদল খালাসী তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে গাড়ী লক্ষ্যে। আমরা যে গাড়ীখানায় ছিলাম তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের একজন হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গীদলকে চীৎকার করে' ডেকে বল্লে—"ও ওরা তোরা ইইক্কা আয়, আঁ আমার দেশর মাইয়া পোলা এডে আছে।" (তোমরা এদিকে এস, আমাদের দেশের মেয়ে-ছেলে এখানে আছে।)

ভিক্টোরিয়ার একটি রাস্তা

এদিকে গাড়ী দিল ছেড়ে—তবু গোটা কুড়ি লোক হুড়মুড় করে' কোনরকমে উঠে পড়ল আমাদের গাড়ীখানায়। ওদের সবাই চাটগাঁর লোক, পরণে খালাসীর পোষাক, কেবলমাত্র দুজনার পরণে ছিল লালকোচা দিয়ে ধুতি। কিছুকাল আগে একটা জাহাজ এসে বন্দরে লেগেছে—এরা তারই খালাসী। প্রতি বন্দরেই খালাসীরা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিনের ছুটী পায়—তাই বন্দরে বন্দরে এরা নানে ও যাকিছু উপার্জ্জন করে তার বেশীর ভাগই নষ্ট খেয়ে ও মেয়ে মানুষের পেছনে খুয়ে উড়িয়ে দেয়।

তখন সন্ধ্যা হয়—শ্রমিকদের ছুটী হ'য়ে গেছে। যদিও সময়ে বেশ গাড়ী ছুড়ে দেয়, তবু সেদিন ছিল সব গাড়ীই একবারে ভর্ত্তি। মোটা-কুড়ি খালাসী ঠেলাঠেলি করে' কোনরকমে আমাদের গাড়ীতেই উঠে দাঁড়াল এবং পরের ষ্টেশনে আমাদের সাম্নে একটা বেঞ্চ খালি হ'তে কয়েকজন তা দখল করে' নিয়ে বসে গেল।

ওদের কথাবার্ত্তায় যতটা বুঝলাম ওরা অনেকদিন দেশ ছাড়া—এ বন্দরে কখনও বাঙ্গালী মেয়ে দেখে নাই—তাই আমাকে দেখে ওদের বড়ই আনন্দ হয়েছে কিন্তু আমি বাঙ্গালী মেয়ে কিনা তা ঠিক বুঝতে না পেরে কিছু বলতে ইতস্তত: করছে।

একজন বল্লে—"ইতারা আঁ আমার দেশের ন।" (অর্থাৎ এঁরা আমাদের দেশের নয়।)

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রস্তাব কর্লে—"আঁ আরো পুছার

লইউম কোত্তে দুন আইলো ?" (আমরা জিজ্ঞাসা করি না কেন কোথা থেকে এসেছে ?)

অপরে বল্‌লে—"ন জিগ্যা, গোসসা হইত পারে সাহেবর দেখে আইলো। হুদা চাই থাক্।" (না, জিজ্ঞাসা করে' কাজ নেই। সাহেবের দেখে আস্‌ছে রাগ কর্‌তে পারে। কেন্না চেয়ে থাক্ বা দেখে যা।)

আর একজন বল্‌লে—"তারা এংরাজি কয়। তারা বুঝত না।" (এরা ইংরেজিতে কথা কয়, এরা ত আমাদের কথা বুঝ্‌বে না।)

অপরে উত্তর দিল—"চাচারে ডাকিদ্‌তে ত এংরাজি কইত্ পারে। ও চাচা, ও চাচা এডে আইও।" (কাকাকে ডাকা যাউক। কাকা ত ইংরেজি কইতে পারে। কাকা, ও কাকা, এখানে এস।)

একটু দূরে চাচা দাঁড়াইয়া ছিল—মোটা, বেঁটে বর্ণা-মতন লোক। ওদের ডাকে চাচা আস্‌ছে, ঠিক এমন সময়ে মনে হ'ল গাড়ীর গতি যেন মন্দ হ'য়ে আস্‌ছে। একটু পরেই একটা ষ্টেশন দেখা গেল।

সাধারণতঃ বিদেশে ভারতের লোক দেখ্‌লেই আমরা পরস্পর আগ্রহের সহিত আলাপ-পরিচয় করি—বাংলার লোক পেলে ত কথাই নাই। খালাসীরা গাড়ীতে উঠ্‌তেই ইচ্ছা হয়েছিল ওদের সঙ্গে আলাপ করি; কিন্তু ওদের রকম সকম দেখে—বিশেষতঃ ওরা মদ খেয়ে প্রকৃতিস্থ না থাকায় আলাপ করা দূরে থাকুক্, কিসে ওদের সঙ্গ ত্যাগ করা যায় সেই চেষ্টাই হ'ল বেশী।

সমস্তটা গাড়ী এই খালাসী ও সাহেব কুলীতে ভর্ত্তি—তার ভেতর সন্ধ্যা বেলার একমাত্র বাঙ্গালী মেয়ে আমি—একটি মেম কুলীও ছিল না। আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল—তাই ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই ভোম্বার জামাই-বাবুকে বল্লাম—"এস নেমে পড়ি।" কিন্তু খালাসীরা এখানকার ঘুমু নাম্‌তে নাম্‌তেই কানে গেল বল্‌ছে—"তারা এডে কেন্না নামে ? তারা এডে কোডে আইছে ? তারা কোডে যাইব।" (এখানে ত থাকার কোন স্থান নাই, এরা এখানে নামে কেন ?)

ওদের কথা কানে যেতে না যেতেই আমরা পড়্‌লাম নেমে, আর গাড়ীখানা দিল ছেড়ে! আমার কথায় বিনা বাক্যব্যয়েই ডাক্তার নেমে পড়্‌লেন বটে, কিন্তু নেমেই উত্তরের হুঁস হুঁস এখি করা গেল! লিভারপুলে ফিরে যাবার গাড়ী মিল্‌বে ত ? যদি না মেলে এবং খালাসীদের কথাই সত্যি হয় যে এখানে থাকার জায়গা নেই তবে কি উপায় হবে! এ সমস্ত ভাবনা হ'লেও অতগুলি চোখের দৃষ্টি হ'তে রক্ষা পেয়ে যেন ইঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম।

গাড় খানা রওনা করে' দিয়ে এক সাহেব বের হ'য়ে এলেন ছোট একটি কাঠের ঘর থেকে। তাঁর কাছে জানা গেল এটা একটি ছোট ষ্টেশন। লিভারপুল থেকে হ'লে আমাদের এখানে নামা উচিত হয় নাই। আরো জানা গেল আমরা নেমেছি উল্টা প্ল্যাটফর্ম্মে—লিভারপুল যাবার গাড়ী আস্‌বে অপর পারের প্ল্যাটফর্ম্মে। যা হোক্ সাহেবটি ওপারের আপিসে ফোন করে' জেনে নিয়ে বল্‌লেন যে এখনি যে গাড়ীখানা আস্‌ছে তাতে করে' পরের ষ্টেশনে নেমে গাড়ী বদল করে' তবে লিভারপুলে যেতে হবে। কথা শেষ হ'তে না হতেই ট্রেন এসে হাজির। সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উদ্বিগ্নচিত্তে গাড়ীতে উঠ্‌ে বস্‌লাম—অনেকবার নামা-উঠা এবং গাড়ী অদল-বদল করে' অবশেষে 'সহর ষ্টেশনে' পৌঁছে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এ ট্রেনটা ধর্‌তে না পার্‌লে সে রাত্রে বিদেশে বিপাকে আমাদের দুর্গতির পরিসীমা ছিল না।

পরদিন সহর দেখার পালা। প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় দেখা গেল। শুনা গেল—গত দশ বৎসরে অর্থাৎ যুদ্ধের পর হ'তে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা প্রকার উন্নতি অতি দ্রুতগতিতে হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্র-শিল্প বিষয়ক বিদ্যা (Mechanics), ব্যবসা-বাণিজ্য (Commerce) শ্রমশিল্প সংশ্লিষ্ট রসায়ন বিদ্যা (Industrial Chemistry), স্থপতি বিদ্যা এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশোপযোগী ভেষজ বিদ্যা (Tropical Medicine) শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত এখানে আছে। ২-কাজারের উপর ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছে আর শিক্ষকও আছে প্রায় সাড়ে তিন শত।

তারপর দেখা গেল হাস্পাতাল। যন্ত্র নয়। পিতৃ-মাতৃহীন বালক-বালিকাদের চিকিৎসার্থ হাসপাতালটি (নাম—Blue coat Hospital) উল্লেখযোগ্য। ২০০টি

বালক এবং ১০০টি বালিকার থাকিবার স্থান আছে। বন্দোবস্ত ভালই মনে হ'ল। এখানকার কেরিয়ন্সটি নূতন প্রস্তুত হয়েছে—এটি দেখবার মত।

সহরের ভিতর একস্থানে সারি সারি বিপুলকায় পাথরের বাড়ী দেখে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেগুলি ব্যবসায়ীদের আপিস। ব্যাঙ্ক এবং ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বিল্ডিংগুলিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সব চেয়ে বেশী।

ঘুরে ফিরে সব দেখে শুনে মাঞ্চেষ্টার দর্শনে ইতি হওয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

খোলো দ্বার

শ্রী অবনীনাথ রায়

পশ্চিম আমাদের দেশে যে বাণী পাঠালে তাকে এক-কথায় বলা যায়, খোলো দ্বার। আমরা এ দেশে সতর্কু-পহিক ভাবে দ্বার বন্ধ ক'রে চিত্তরে বাস করছিলুম—খোলা দ্বার দিয়ে বড়ো হাওয়া প্রবেশ করতে দিইনি। ভয় ছিল পাছে উন্মুক্ত হাওয়ার মাতনে আমাদের সব খুঁটি নুড়ি ওলোট্ পালোট্ হ'য়ে যায়। ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করে' চলাই আমাদের জীবনের রীতি ছিল—পাছে আমাদের পুরাতন সংস্কারের গোড়ায় আঘাত লেগে সমাজজীবন লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যায়।

এ সনাতন ব্যবস্থা যতদিন নিজেদের দেশ নিজেদের দ্বারা শাসিত হয় ততদিন হয়ত বা চলতে পারে—অন্য জাতির, ভিন্ন সভ্যতার, পৃথক চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে এ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হ'তে বাধ্য। জগতের যা'কিছু সত্য এবং শিব আমাদের সমাজ-পদ্ধতির মধ্যেই পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে, এ কথা আত্মরক্তির বশে আমরা মনে করলেও জগৎ মনে করবে না। জগৎ তাকে নিক্তির ওজনে তৌল করে' নেবে। সেই পরিবর্তিত চিন্তাপ্রণালীর কষ্টিপাথরে যে সত্য সোনা বলে' প্রতিফলিত হবে সেই চিরকালের অম্লান সত্য—সে কেবল জাতি বা ধর্মবিশেষের সত্য নয়, সে বিশ্বজগতের নীত সত্য।

হ'লও তাই। পশ্চিমের সমুগ্র সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের সভ্যতার যা' প্রাণবান তাই বেঁচে রইল,—যা' স্বাস্থ্য, যা' সংস্কারগত প্রথা, যা' mechanical আচার, তা' যুক্তির কাছে নত হ'য়ে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। তারা একবারে ম'রে গেল এ কথা বলতে পারি নে, কেন না এখনো কোন কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে তাদেরকে সযত্নে প্রতিপালন করা হ'চ্ছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের conservative mind তাদের একেবারে ত্যাগ করতে পারে নি।

যে সব প্রথা পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে লোপ পেয়েছে স্ত্রীজাতির অশিক্ষা তাদের মধ্যে একটি। খুব বেশি দিনের কথা নয় যখনো আমাদের দেশে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে লেখাপড়া শিখে স্ত্রীলোক বিধবা হয়। এর মধ্যে যে কোনই যুক্তি নেই, বরঞ্চ শিক্ষাকে প্রকারান্তরে বাধা দেওয়াই এ একটি কৌশলমাত্র, এ কথা বুঝতেও আমাদের দেরি হয়নি। এ কথা বোঝার পরও আর একটি কথা প্রায় শুনতে পেতুম। সেটি হ'চ্ছে এই যে গরীবের ঘরে মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর সময় এবং সুবিধা নেই—কারণ সে মেয়ে তার মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। অথচ সেই সংসারের ছেলেটির স্কুলে যাওয়ার কোন প্রতিবন্ধক নেই। এর পেছনে আছে এই মনোভাব যে ছেলের শিক্ষা তার পক্ষে যেমন একান্ত—তার জীবিকা নির্ব্বাহের সহায়, মেয়ের পক্ষে তা' নয়। খরচের কথা উঠ্‌লেও অনেক ক্ষেত্রে শুনেছি অর্থাৎ ছেলের শিক্ষার ব্যয় যদি বা কায়ক্লেশে সংগ্রহ হয়, মেয়ের শিক্ষার ব্যয় সংকুলান হওয়া দুরূহ। এর অর্থ হ'চ্ছে এই যে প্রাথমিক শিক্ষা ছেলের পক্ষে যেমন অত্যাবশ্যক

মেয়ের পক্ষেও যে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, এ সত্য আমাদের মনোজগতে পরিব্যাপ্ত হতেও সময় লেগেছে।

এখন বোধ হয় এ সব তর্ক চুকে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন আমরা নিঃসন্দেহ। এটা আমরা দেখে নিয়েছি। শিক্ষার ফলে মেয়েদের মন যে পদ্মের পাপড়ির মত বিকশিত হ'য়ে উঠেছে এ আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অনেক দিন পর্য্যন্ত এ সন্দেহও ছিল যে শিক্ষালাভের ফলে তারা অহঙ্কৃত হ'য়ে উঠবে। এর উল্টা প্রমাণ দিয়েই মেয়েরা শিক্ষাকে রক্ষা করেছেন অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরাও যে দুর্ব্বিনীতা নন এর অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে'ই আমরা এখন আর তাদের শিক্ষা দিতে ভয় পাইনে।

শুধু শিক্ষার বেলায়ই নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের দেশে এই বিরুদ্ধতা ছিল। মেয়েদের কিছুতেই আমরা পুরুষদের সমান আসন দিতে পারিনি বা এখনো পারিনে। মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে আমাদের দেশে চিরকালই মানা। তারা কিছু জানবে না, কিছু শুনবে না, কিছু দেখবে না, কিছু শিখবে না—তারা শুধু মানবে, আর পুরুষদের অবলম্বন করে' পরগাছার মত বাঁচবে। মেয়েদের এই পরগাছা জীবন না তাদের পক্ষে সম্মানের, না পুরুষের পক্ষে গৌরবের, না সমাজের পক্ষে শক্তি-লাভের। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের প্রাধান্য আমাদের চোখ খুলে দিলে। আমরা দেখলুম মেয়েরাও পুরুষদের মত মানুষ—তাদেরও সাধ আহ্লাদ আছে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে, ভাল-মন্দ নিরূপণের ক্ষমতা আছে। মেয়েরা দেখলে তারা পুরুষদের ক্রীতদাস খাটবার মত নয় অন্যায় অত্যাচার সহ্য করবার পুতুল নয়। তারা দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল যে পশ্চিমের স্ত্রীজাতির দ্বারে পুরুষজাতি কেমন চিরকালই প্রসাদভিক্ষু। প্রাচ্যে তাদের এ অধিকার থেকে কে তাদের বঞ্চিত করলে তারা ভাবতে লাগল। এ অধিকার পুনরায় লাভ করার চেষ্টাও হয়েছে। এইখানে পুরুষ তার বাধা ছাড়তে কড়াকড়িও করেছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাখতে পারেনি।

বলা বাহুল্য মেয়েদের এবং পুরুষদের অধিকার যে এক নয় এ কথা এখন সকলেই বুঝেছে। এটি প্রকৃত শিক্ষার প্রসাদেই হ'তে পারে। স্ত্রীজাতি তার নিজের আভিজাত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু উদ্ধত হবে না, সতেজ দৃঢ় হবে কিন্তু যুক্তিহীন একগুঁয়ে হবে না, সুকুমার এবং সরল হবে কিন্তু পরুষ এবং কঠিন হবে না। এই হৃদয়-বৃত্তিগুলি এতই কাছাকাছি যে প্রকৃত শিক্ষা না থাকলে একটিকে আর একটি বলে' ভুল করা সম্ভব। এই জন্যই গোড়া থেকে শিক্ষার কথা এত করে' বলছিলুম

কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার কেমন সেখানেই উদ্ভূল দেখানে মেয়েরা পর্দ্দা ফেলে রাস্তার ধারে দেশের কাজে নেমে দাঁড়ালেন। সনাতন পদ্ধতি আজ বাধা দিতে পারল না। দেশের ডাক তাঁদের প্রাণে যে কল্লোল জাগিয়ে তুলে সহস্র বর্ষের আবরণ তার সাম্নে তৃণের মত ভেসে গেল। দীপ্ত সূর্য্যের নীচে মহিমময়ী নারী এসে দাঁড়ালেন। যে পুরুষ একদিন বলেছিল, গৃহকোণই তোমার উপযুক্ত বাসস্থান, সেই পুরুষই সাদরে তার ভগিনীর, তার জননীর, তার কন্যার হাত ধরে' বহিঃক্ষেত্রের মাঝখানে বরণ করে' নিলে। আর লজ্জা নয়, ভয় নয়, কোন প্রলোভনেই পেছন ফেরা নয়;—আজ পুরুষ এবং স্ত্রীজাতি মিলে' তাদের সম্বেত এবং সম্মিলিত শক্তি দিয়ে সম্মুখের দিকে জয়যাত্রা! নিষ্কলঙ্ক গ্লানি পেছনে পড়ে' রইল, সন্দিগ্ধের অবিশ্বাস অন্ধকার বিবরে মুখ লুকিয়ে নিলে! পূর্ব্বাচার অভিমুখে আজ বিশ্বানীর অকম্পিত অভিযান—দৃঢ়সংকল্পের আজ স্থির ত্যাগদিপ্ত উদয়াচল-যাত্রা!

প্রাচ আর পাশ্চাত্যের সমন্বয়ই এ যুগের বিশেষ ধর্ম্ম—প্রাচ্যের বনিয়াদ, আর পাশ্চাত্যের কর্ম্মশক্তি—প্রাচ্যের লক্ষ্য দিব্যদৃষ্টি আর পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণমূলক জড়বিজ্ঞান, এ দু'য়ে মিলে' পরমাশ্চর্য্য এক শক্তি সৃজিত হবে। সেই শক্তি-সমবায়ে প্রাচ্যের নর-নারী মহা মহীয়সী মূর্ত্তিতে দেখা দেবে।

সম্পাদিকার জল্পনা

আনন্দ-সংবাদ

দেশের কাজ নিয়ে আজকাল টানাটানি পড়ে' গেছে চারদিকে—সকলের মধ্যে। সকলেই দেশের কাজ করতে চান; হড়াহড়িতে একটা কাজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দশ জনে। তাতে নিজের শক্তিও ভালো করে' খাটানো যায় না, অন্যের কাজেও বিঘ্ন ঘটে। সময় এসেছে—এখন নিজেদের মধ্যে কাজ বিভাগ করে' নিতে হবে। অন্তরের সঙ্গে যিনি যে কাজটি করতে পারেন তিনি সেইটিই করুন। সকলের কাজের ওপর সকলে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা রাখুন। সেজন্য যতটুকু সংযমের দরকার ততটুকু সংযত সবাই হোন্। তবেই কাজ সুন্দর হ'য়ে উঠে' দেশকে আনন্দিত করবে।

দেশকে একটি বৃহৎ মানুষ বলে' কল্পনা করা যাক্। আমরা সকলে যেন তার ছোট ছোট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। দেশের কাজে দোষ দেওয়া যায় না কাউকেও। দেশ সকলের—দেশের কাজে অধিকার সকলের সমান। কথা-মালার সূত্রে উদর ও অন্যান্য অবয়বের দৃষ্টান্ত মনে রেখে "আমি সব হব" বা "সব করব" এই রকম অ-বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে, "যে যা হ'তে পারি তাই হব"—এই সুবুদ্ধির শরণাগত হওয়াই দরকার।

দেশ জেগেছে—সে আর ঘুমোবে না। তার অন্তরে একটি ঐশ্বরিক প্রেরণা এসেছে, যাতে সে আজ প্রবুদ্ধ। সকল মানুষ নিজের অন্তরে সেই প্রেরণা অনুভব করছেন—আনন্দের সংবাদ।

"আনন্দ জেগেছে প্রাণে—
দেশে তারি জয়গান;
মানুষ—মানুষ হবে,
মুক্ত হবে বদ্ধ-প্রাণ।"

নারীর মুক্তি,—ব্রাহ্মণেতর জাতির মুক্তি এর ফলে সুনিশ্চিত।

কথোপকথন

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর ষ্টেশনে সেদিনে চলন্তি ট্রেনে তাড়াতাড়ি একটি ভদ্রমহিলা উঠে পড়লেন—সঙ্গে একটি তরুণী। কামরায় সকলেই তখন স্তব্ধ। তাঁরা দুজনে উঠে বেঞ্চের এক কোণে বসলেন—সাড়াশব্দ নেই কারু মুখে। ক্রমে আকাশ ফরসা হ'য়ে আসতে লাগল; যে যার জায়গায় উঠে বসল। কেউ কেউ জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল—হাওড়া আর কতদূর দেখবার জন্য। মনে হ'ল ভদ্রমহিলাটি যেন কথা কবার জন্য উসখুস করছেন। হঠাৎ বললেন,—"আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি; চিনি-চিনি মনে হ'চ্ছে। কয়েক বৎসর আগে কি আপনি বেলুড় সমিতিতে গিয়েছিলেন?" বলুম,—'হাঁ'। তিনি বললেন,—"আমাকে আপনার মনে থাকবে না অত লোকের মধ্যে; আমি কিন্তু আপনাকে চিনে রেখেছি। আপনিই বুঝি পুরীতে বিদ্যাশ্রম করেছেন?" বলুম,—'না আমি নই—বসন্তকুমারী দেবী করেছেন। তাঁর অবর্তমানে আমি সেখানকার কাজকর্ম দেখি মাত্র।'—"যা' হোক্, এখন আপনার উপরেই ত সেখানকার ভার…"

—'হ'তে পারে।'

—"আপনার সঙ্গে পরিচয় করে' রাখা ভাল; কখন কি দরকার হয়, বলা ত যায় না। এই দেখুন না, ১৮ বছরের আইবুড়ো মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। চাকরী ছাড়া উপায় কি! বিয়ে—সে ত আজকাল অসম্ভব! স্বদেশীর হাঙ্গামে ছেলেগুলো ত বিয়ে করতেই চায় না—মেয়েরাও তা'ই। আমি বাপু ছোট থেকে মেয়ের কানে তুলে রেখেছি—বিয়ে নয়, চাকরী। সেই ভাবেই সে মানুষ হয়েছে। মামা বলেন,—'মেয়ের বিয়ে দে, বিয়ে দে।' মামার কাছে খড়্গপুর গিয়েছিলুম, তিন মাস রইলুম,—কই মামা ত একটাও বর জোটাতে পারলেন না। ফিরে চলেছি—হাওড়ায় নেমে চেংলা যাব। চেংলায় বাড়ী।"

মহিলাটি অনর্গল বলেই চলেন—"আজকাল আবার

লোকে বলে, বিধবার বিয়ে দাও। কুমারীরাই যে বর জোটে না।—তা' আবার বিধবার বর! ছেড়ে দাও ওসব কথা;—চাকরী করুক—ভাত খাক্—সোজা ব্যবস্থা।'

মেয়েটির সুপাত্রে বিবাহ দিতে না পারার যে মনে একটি বেদনা আছে। তারই জোরে তিনি এত কথা বলে গেলেন, মনে হ'ল। বন্ধুর—'ঈশ্বরের ইচ্ছায় সুপাত্র পেয়ে যাবেন, হ'য়ে যাবে আপনার মেয়ের বিয়ে—বিধবা হওয়াই মঙ্গল। তবে চাকরীর চেষ্টা রাখা ভাল।'

গাড়ী হাওড়ায় এসে পৌঁছল। নামবার সময় মহিলাটি বলে' গেলেন—"মনে রাখবেন আমাদের কথা; প্রয়োজন জানালে অনুগ্রহে বঞ্চিত না হই।"

ঘটনাটা এক বৎসর আগের। এদের কথা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। হঠাৎ আজ সকালের ডাকে একখানা চিঠি পেলুম। চিঠিতে লেখা—

"আমার মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে। জামাই বি-এ পাশ—চাকরী নাই, বাড়ী নাই, শ্বশুরের ব্যবসা। চেৎলার বাড়ীতে ও ঘর বেঁধে আমি চাকরীতে যেতে চাই। পুরী আশ্রমে আমাকে একটি চাকরী দিতে পারেন কি? আপনাকে খুব ভালোবাসি, তাই সহজে সকল কথা আপনাকে জানাতে পারলুম। ইতি—"

চিঠিখানা পড়ে' ভাবতে লাগলুম, তাই ত! উপার্জন দেখছি মেয়েদের সব সময়েই দরকার—কুমারীজীবনে, বৈধব্যে,—সময়ে সময়ে সধবা থেকেও।

*

* *

গ্রামের কাজে নারীর হাত

রব উঠেছে চারদিকে—সহরে বাস আর চলবে না—পালাতে হ'ল গ্রামে এবার সবাইকে। সকলের মুখে একই বুলি—টাকা ছাড়িয়ে খাওয়ার দিন ফুরিয়ে গেছে। টাকাই নেই, বাক্সের ফাঁকিতে নস্যি হ'য়ে উকোগুলো সব উড়ে গেছে সূক্ষ্ম,—তাহাবে এখন কি? যাও গ্রামে,—মাটিতে দুটী শাক-সব্জী মূলা-বেগুন ফলাও,—পুকুরে মাছ ধরো,—খেয়ে বাঁচা সংসার মিলে'। এই সোজা কথাটিকে আজ আর কারো অস্বীকার করার যো নাই, যেতে হ'বে গ্রামে,—বাধ্যতে হল বাসা সহর ছেড়ে।—আজ আমের স্বামীদের গ্রীষ্ম সঙ্গিনীরূপে সহরে মিলি হ'য়ে, স্বামীদি'কে আজ গ্রামের বাসে সাহায্য করুন সর্ব্বতোভাবে। ভয় নাই, গ্রামে গেলে গ্রাম্যতা দোষে স্পর্শ করবে না,—গ্রামগুলি এখন সহর হ'তে চলেছে দিনে দিনে। সহরের মেয়েরা ও বাবুরা গ্রামে গিয়ে গ্রামগুলিকে শিক্ষায় সহরে ও বিলাসিতায় বেলহরে করে' তুলুন নিজগুণে। তবেই সকলে সুখে থাকবেন সপরিবারে।

সহরে মেয়েরা গ্রামে যেতে নিতান্ত নারাজ বাবুরা তাই সাগর পান না গ্রামে যাওয়ার কথাটা তাদের কানে তুলতে। মেয়েরা এখন মেহনায় সহর ছাড়তে প্রস্তুত হোন্,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিন,—সুখের সংসার সৃষ্টি করুন গ্রামে গ্রামে। শিক্ষিতারা নিজের ও গ্রামের ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন গ্রামে গিয়ে। শিল্প-বিশ্ববীরা শিল্পচর্চ্চার নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করুন গ্রামের ঘরে ঘরে—নিজের মনের মত করে' গড়ে' নিন গ্রামের চারপাশটাকে। অধিকাংশ যুবক বিবি বৌয়ের ভয়ে বিবাহে বিমুখ। যুবকদের মন থেকে বিবাহের বিভীষিকা দূর করে' দিন নিজেদের কাজ দেখিয়ে।

সহরে স্বামী নিয়ে সময়ে সময়ে মেয়েদের দুঃখও কিছু কম হয় না—ভেবে দেখুন তাঁরা নিজের মনে। যাকে কাজে বাহিরে-ঘোরা স্বামীদি'কে ঘরে পাবেন তাঁরা গ্রামে গেলে বেশী সময়।

অস্বচ্ছলতার ফলে আজ বহু সংসার বিপন্ন—দুশ্চিন্তায় মানুষের মন বিকৃত।

"অস্বচ্ছলের অট্টালিকা ভোক্ না ভূমিদাৎ,
স্বচ্ছলতার মাটির-কোঠা গড়ুক্ নারায়ণ।"

*

সহনার আদর

মেয়েরা সাধারণতঃ গহনা পরতে ভালোবাসে। সুন্দর নমুনার সুগঠন গহনাগুলি তাঁদের অঙ্গে মানায়ও বেশ। গরীব গৃহস্থ ঘরেও নূতন বৌ ঘরে এলে গায়ে দু'চারখানা সোনার গহনা থাকলে দেখায় ভালো লোকসমাজে—বৌকেও সুশ্রী

করে' তুলে গহনার গুণে। শিল্পীর হাতেও সোনার কাঁকণ সবখানি সুলক্ষণটি প্রকাশ করে সুন্দর ভাবে।

কাজের দিক থেকে মেয়েদের গায়ের গহনারূপী এই সোনাটুকু গৃহস্থের সম্পত্তিও বটে। বিপদে আপদে বন্ধক দাও, বিক্রী কর, তৎক্ষণাৎ কিছু পাওয়া যায়। ধারে ঠেকলে সেটি কম সাহায্য নয়।

গৃহস্থ-ঘরের লোকদি'কে প্রায়ই গহনা বন্ধক দিতে দেখা যায়। সুদে আসলে টাকা সময়ে সময়ে এত বেড়ে উঠে যে অনেকে সে গহনা আর ছাড়িয়ে আনতে পারে না। গহনা-বন্ধকের কারবার করে অনেক ধনী লোকেও। সহজে কেউ এক পয়সা সুদ ছাড়তে চায় না। ফলে গহনাগুলি বিকিয়ে যায় সুদের দায়ে।

আমাদের প্রস্তাব,—স্থানীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি যদি গহনা বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন, ও সামান্য সুদ নেন, তবে গরীব গৃহস্থের যথেষ্ট উপকার হয়। কায় ক্লেশে সুদটি মাসে মাসে দিয়ে যেতে পারলে কোন এক সময় আসল টাকা চুকিয়ে দিয়ে গহনা ক'খানি ফিরিয়ে আনার আশা থাকে। ঘরের বৌ মেয়েরাও তাদের অনেক সাধের গহনাগুলি ফিরে পেয়ে সুখী হয়।

দেশের বড় বড় প্রয়োজনের কথা বড় বড় চিন্তাশীল লোকেরা ভাবেন ও বলে' থাকেন। সে সব কথার মূল্য খুব বেশী,—সকলেই সে কথা কান পেতে শোনে। কিন্তু ছোট ছোট প্রয়োজনীয় কথাগুলিরও আলোচনার দরকার আছে। সাধারণ বুদ্ধির ও অবস্থার মানুষ দেশে হাজার হাজার। সহজে তাদের জীবনযাত্রার সুব্যবস্থা না হ'লে ঠেলেঠুলে তারা মাথা তুলতে পারে না কোন দিনও। তাদের প্রতিদিনের ছোট ছোট অভাব-অসুবিধাগুলি দূর করতে পারলেও দেশের অনেকখানি কাজ করা হয়। কারণ, সংখ্যায় দেশের মধ্যে তারাই খুব বেশী। এর জন্য সাধারণ ব্যবস্থার দরকার।

"হাজার মানুষ ছোট কথাই কয়,—
ছোট ঘরের দুঃখ তারা
অনেকটুকুই সয়।"

গরীব গৃহস্থ ভদ্রলোকদি'কে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতায় মজবুত করে' তুলতে না পারলে দেশ সহজে এগোতে পারবে না, আমাদের স্থির ধারণা। তাই নিজের নিজের পরিধির মধ্যে সকল মানুষকে সুখী ও সুন্দর হ'য়ে ওঠার জন্য আমরা আগ্রহ জানাচ্ছি।

স্ত্রীধনের পরিণাম

সকলেই জানেন ও বলে' থাকেন, স্ত্রীধন মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তি। তা থেকে মেয়েদি'কে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না—দেশের আইন। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা—যাদের স্ত্রীধন গায়ের সামান্য ক'খানি গহনা মাত্র—বিধবা হ'লে কি ভাবে যে তারা সেই বসনাবাস্ত গহনা ক'খানি থেকে ফাঁকি পড়ে, কেউ তার খবর রাখেন কি?

জানেন ও দেখেন অনেকেই, কিন্তু কাগজে কলমে এবং লোকমুখে তার আন্দোলন শোনা যায় না আদৌ। অর্ধাভাবে বিধবারা মরে মুহূর্তে মুহূর্তে, দাসীর স্বীকার করে পদে পদে,—তাদের শেষ সম্বল স্ত্রীধনরূপা গায়ের গহনাগুলি বিয়োরে খোয়া যায় লোকচক্ষে পড়ে'—দুটো কথা বলার কেউ থাকে না।

গরীব ভদ্রলোক দেশে খুব বেশী। বিধবা নিয়ে কারবার করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভদ্র গরীব ঘরের প্রায় প্রত্যেক বিধবাই স্ত্রীধনে বঞ্চিত। বলতে গিয়ে তারা চোখের জল ফেলে, কিন্তু সে জলে দেশের মাটি ভেজে না এতটুকু—জল গড়াতে পায় না মাটি পর্যন্ত বলে'। অতি-হিতৈষী আত্মীয়েরা বিধবার চোখের সেই শুধু জলটুকু মাপ করে' ফেলেন গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে। সব গেল,—কথাটি কওয়ার জো নাই, ধনী-ঘরে এমনতরটি ঘটে কম। কারণ তাদের মামলা করার টাকা থাকে এবং পৃষ্ঠপোষক লোক পায় তারা টাকার জোরে। বিপদ যত মধ্যবিত্ত ও গরীব ঘরের। বিধবা হওয়া মাত্র সেই যে তারা গায়ের গহনা খোলে আর সে গহনা হাতে ফিরে পায় না কোনদিন। তাদের ঠকানো, তাড়ানো সবই সহজ সকলের পক্ষে। দেওর ভাসুর তাড়ান, শ্বশুর শাশুড়ী তাড়ান;—গহনা চাইতে যাও,—অগ্নিমূর্তি! সহায় তখন বাপ ভাই। তাঁরা সাহস পান না শ্বশুর ভাসুরকে জোর

দেখাতে বা তাঁদের সঙ্গে মামলা করতে। তিনশো টাকার জিনিষ আদায় করতে চারশো টাকা মামলা-খরচ ' ফলে বিধবা বঞ্চিত হয় স্ত্রীধনে। অপব্যয়ী অবিবেচক বাপ-ভাই-দের হাতেও স্ত্রীধন মারা পড়তে দেখা গেছে সময়ে সময়ে।

স্ত্রীর অন্যভাবের গুর্গতি কেউ যদি না দেখতে চান, তবে সে একমাত্র স্বামী।—

"স্বামীর সমান বন্ধু ত্রিজগতে নাই।
দুঃখ যদি দেন তবু রক্ষক সদাই॥"

স্বামীরা এ সম্বন্ধে এখন সচেতন হোন্,—সতর্ক হোন্। নিজের গরীব সংসারে কোন একটি অর্থকরী বিদ্যা জানা মেয়ে ছাড়া বিয়ে করে' আনবেন না, দুচ পণ চাপুন নিজের মনে দুশ' টাকা পণ না নিয়ে শিল্প বিভাগের সার্টিফিকেট পাওয়া মেয়ে দেখে নিন বিশেষ করে'। ঘরে এনে নূতন বৌয়ের শিক্ষাটুকু কাজে লাগান নৈতিক। বাজারে তার যাহাতে শিল্প বেচে' যা পারেন দু'চার টাকা সংগ্রহ করে' আনুন। সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলি জমা দিন বৌয়ের নামে। বাপ-মায়েরা এ বিষয়ে উৎসাহ দিন ছেলেকে নিরুৎসাহ না করে'। মা-বাপ থাকতে ছেলে যদি স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবেন, তবে অবুঝি বাপ-মা মনে করেন, ছেলে আমার পর হ'য়েছে —পরের মেয়ে ঘরে এসে ঘরের ছেলেকে পর করেছে। সুবুদ্ধি বাপ-মা বিবাহিত ছেলেকে স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবতে শেখান, জড়িয়ে রাখার জটিল বুদ্ধি ত্যাগ করে' সকলকে স্বাধীন হ'তে শিক্ষা দেন গোড়া থেকে,—ফলে স্বরাজ আসে ঘরের মধ্যে। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে যিনি ঐক্য বেঁধে তুলতে পারেন, সমাজ ও জাতি-গঠনে তিনিই শ্রেষ্ঠ কারিগর। অন্য কথায়, তিনিই সত্যকার মানুষ। দেশের সব লোক মানুষ হোন্, শোকের জলে ধোওয়া বিধবার স্ত্রীধনগুলি ফিরিয়ে দিন তাদের হাতে ধর্ম্ম ভেবে'। এবং, স্ত্রীধনের পরিণাম দেখে গৃহস্থ বাপ-মা ছোট থেকে কুমারী মেয়েকে, ও স্বামী নিজের কন্যা স্ত্রীকে এমন একটি ধন দিতে চেষ্টা করুন,—

"যে ধন কখনো কেহ কাড়িতে না পারে।
সাথে থাকি' সদা রক্ষা করে আপনারে॥"

গৃহস্থ ঘরে প্রত্যেক মেয়ের অর্থকরী বিদ্যা শেখা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীরও কর্ত্তব্য স্ত্রীর কিছু সম্বল করে' দেওয়া প্রথম থেকে। উভয় দিকে বলটুকু থাকলে অসময়ে মেয়েরা বিপন্ন হ'য়ে পড়বে না অত বেশী।

একজন ভদ্র ইংরাজকে বলতে শুনেছিলুম, "বিবাহের দিন স্ত্রীর নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখে দিয়ে তবে বিবাহ করব। যেমন করে' পারি বিবাহের পূর্ব্বে ঐ টাকা সংগ্রহ করে' আনবো। নিজের স্ত্রীকে নিঃসম্বল রাখা মনুষ্যত্বের দিক থেকে আমাদের জাতের লোকেরা অপরাধ মনে করে।"

এ দেশে মেয়েদের আশা কেউ নয়। ভদ্র গরীব ঘরে নগদে গহনায় এক হাজার, ও মধ্যবিত্ত ঘরে তিন হাজার সম্বল থাকলে বৈধব্যে মেয়েরা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। পুরুষ অভিভাবকদের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রাধানগরে নারীউন্নতির প্রচেষ্টা

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে "রামমোহন স্মৃতিসৌধ" নির্ম্মাণ সুরু হয়েছে অনেকদিন হ'ল। কার্য্যটি সুসম্পন্ন হয় নি এতদিন, এবার হ'তে চলেছে। এরি সঙ্গে স্মৃতিসৌধ পরিচালকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদনাথ পাল মহাশয় একটি মধ্য-ইংরাজী বালিকাবিদ্যালয় ও বয়স্কাদের জন্য সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির একটি শাখা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। সঙ্কল্পটি শীঘ্রই কাজে পরিণত হবে।

নিজ রাধানগর ও তার আশপাশের গ্রামে অনেকগুলি নূতন নল-কূপ সম্প্রতি তৈরী হয়েছে, ফলে ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা কমে' গেছে বহু পরিমাণে। কলিকাতা থেকে একটি টানা রাস্তা তৈরীরও প্রস্তাব হচ্ছে। অল্প দিনেই রাস্তা প্রস্তুত হ'য়ে মোটর যাতায়াত সুরু হবে, আশা করা যায়।

আমরা অক্লান্ত কর্ম্মী পাল মহাশয়কে এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আর্য্য সমাজের বদান্যতা

আর্য্য সমাজের ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিচাঁদ লালাজী সম্প্রতি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন আর্য্য সমাজের তরফ থেকে। বিধবাদের কল্যাণচেষ্টা তাঁদের কাজের একটি বিশেষ অঙ্গ। অনেকগুলি বিধবার তাঁরা

ভার নিয়েছেন ও তাদের সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন। আর্য্য সমাজের বাইরেও যে সব বিধবা প্রতিষ্ঠান আছে তাদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি যথেষ্ট। এ বিষয়ে তাঁরা যথার্থই উদার। বিধবাদের জন্যে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে তাঁকে জানাতে বললেন। তিনি নানা বিষয়ের ব্যবসা করেন—সাশুদানার ব্যবসা তার মধ্যে একটি। চিরশ্রী বিধবা শিল্পাশ্রম ও বিদ্যাসাগর বাণীভবনে যত সাশুদানার প্রয়োজন তিনি যোগান;—পুরী বিধবাশ্রমেও পাঠাবেন বলে' গেলেন। অসহায় বিধবাদের দরিদ্র আত্মীয়েরা বিধবাদের জন্যে তাঁর কাছে আবেদন জানালে আনুকূল্য পাবেন। ঠিকানা—১২৮, লাগুলটাউন রোড, কলিকাতা।

বাংলার হাট

ডাঃ শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি-লিট্

হাটে ঘাটে

গোমস্তামুখো গোউর ওঝা
ঘোমটাতোলা বামুন-বৌ
উলনাপাড়ার হাটে
রোলা কেনে পয়লা জোড়া
খোদাক্কীর ছেড় পোরা
চুড়ি কেনে রাংজড়া পাতিকাটা
কৌটা কেনে নক্সাতোলা জোবোড়া
সাড়ি নেয় মাছি-বুটি ভোমরা-পাড় চৌতারা!
ওঝা নেয় চৌদ্দ পোয়া এক বিঘত
এক লাঠি বেউড় বাঁশের!
মৌলালী মিঞা তৌশিলদার তোলা ওঘান্
মোট বাঁধেন্ লোক ডাকেন্ এ ঐ ও ঐ!
মহুয়া তলার কাবুলিওয়ালা
তোলা মহুয়াকে করেন্ সোনার
ওয়াশিল্ ওয়াকিবে মৌকা উতার বেহাল!
মৌলুবি সাহেব দাড়ি মোচড়ান ঘোড়ার বসে
রোদ সরে হাট ভাঙে গোলেমালে খালধারে!
মাঝি মাল্লা ডাক পাড়ে ওরে ও রোদ গেল নৌকা খোল!
পাল্লা দিয়ে বাচ খেলে সবে নৌকো সারি সারি
গাঙের পাগলা হরি গান ধরে তখনি বাঁধা—

—আকাশে রৌদ্র সরে
ওপার চরে আখের গাঁয়ে ধূলুমাখা
যেন সে বৌ-কথা-কও মেলানো পাখা
কাজলদাঁড়া সোনাতে মাখা
বাতাসে চলা ঢেউ লাগিল তাদনে
আহা রে বহতা নদী
জলের মৌচ চোখের আড়
ডেকে যেন মিহি সুতার সরু মাঁজী—
চর ওপার!
পৌর্ণমাসী জোয়ার ঢেলে বাতাসে!

বাটে

মওল ওমেশের ছৈতাদা বইল-গাড়ি
ছেটে রাস্তায় চলে ইষ্টিশান্
কৌশল নাপিত গরু তাড়ায় রে ও রে ও
কৈলেস গোসাই গাড়িতে ঢেলেই
গান ধরেন জোর গলায়—
ও ও কইরে মাঝি লৌকো বাও
কৈলে ডাঙা এড়িয়ে চল এলেমপুরে!

নদী-পথে

ভূষামিদের বড় বজরা ঝিলমিল্ বন্ধ,
ভিতরে তারা দেখা যায় না!
চলেছে পাল তুলে বুক ফুলিয়ে—
বেরিয়েছে যেন রাজহাঁস হাওয়া খেতে,
চলেছে কি না চলেছে বোঝাই যায় না
বজরাটা না হেলোন্ না দোলন্
জলে ভাসছে মরা যেন পেটটা ফোলা
কোথা গিয়ে যে ঠেকবে
তার ঠিক ঠিকানা নেই!

কৃষায় কৃষি-কলেজের ছাত্রী

কৃষি কলেজের তিনটি ছাত্রী চলিয়াছেন—হাতে-কলমে শিক্ষার ফলে।

বিদেশে

লাভ্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি "কেপল" উপাধি লাভ করিয়াছেন এই পি-এম্ বেদরওয়া

ব্রিটিশ নারী-তীরন্দাজ

এসেক্সের একটি নারী ধানুকী সঙ্ঘের কয়েকজন সভ্যা ব্রেন্ট্‌উডের একটি সম্মিলনে ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দান করিতেছেন।

টেনিসে ক্যালিফোর্ণিয়ান বালিকা

ইনি কুমারী হেলেন এন্ উইলস্—টেনিস্ ক্রীড়ায় ওধু দেশ-বিদেশে বিখ্যাত। ইনি বার্কলে, ক্যালিফোর্ণিয়ার অধিবাসিনী।

সেল্‌মা লেগার্লোফ্‌

শ্রী বীরেন্দ্রলাল ধর

নোবেল্‌ প্রাইজের জীবন তিরিশ বছর হ'ল। বিশ্ব-সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ সম্মান আজ পর্য্যন্ত দুটি মাত্র নারীকে বশম্বিনী করেছে—সেল্‌মা লেগার্লোফ্‌ ও গ্রেৎসিয়া দেলেদ্দা। লেগার্লোফ্‌ এই পুরস্কার লাভ করে' বিশ্ব-প্রতিভায় নারী-মনস্বিতার যোগ্যতা স্থিরীকৃত করে' দিয়েছেন। ইনি এই পুরস্কার লাভ করেন উনিশ-শো-নয় সালে। ইনিই সর্ব্বপ্রথম লেখিকা যিনি এই পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করেন।

বৈচিত্র্যময়ী ধরিত্রীর সঙ্গে এঁর প্রথম পরিচয় ঘটে নভেম্বরের এক কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে, আঠারো-শো-আঠার সালে স্ক্যাণ্ডেনের বুকে। এর পিতা ছিলেন লেফ্‌টেনাণ্ট আর মা ছিলেন পাদ্রীর মেয়ে। সৈনিকের গাম্ভীর্য্য আর যাজিকের সৌম্যভাব এঁর চিত্তবৃত্তির বিকাশ ঘটায় কঠোরতা এবং কোমলতার মধ্য দিয়ে।

শৈশবের সীমা অতিক্রম করবার আগেই জীবনের নিগূঢ় ব্যথার সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে – পঙ্গুব্যাধিতে ব্যথাতুরিনী হ'য়ে। তখন এঁর বয়স তিন বছরও পার হয় নি। তখন থেকেই শিশুসুলভ গল্প শোনা আর কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করাই এঁর অখণ্ড অবসর-বিনোদনের একমাত্র সাধনা হোল।

ক্রমে ইনি সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লেন বটে কিন্তু পূর্ব্বের শক্তি ফিরে পেতে এঁর সময় নিল অনেক দিন—খেলাধূলায় যোগ-দান করবার ইনি হলেন অযোগ্য। কিন্তু এই শারীরিক অক্ষমতা এঁর মনোবিকাশের সহায়তা করলো বিশেষ ভাবে; কল্পনাই হোল এঁর অবসরের অবলম্বন—ইচ্ছাকৃত সৃষ্টিই হোল এঁর শৈশবের সাথী!

পিতামাতার স্নেহ-আবেষ্টনের মধ্যে, বাহিরের আবেষ্টন হ'তে পরিত্যক্তা শক্তিহীনা এই মেয়েটি একান্ত নিজস্ব ভাবেই গড়ে' ওঠে।

পিতা এঁকে ভালবাসতেন নিবিড় ভাবে, তাঁর কাছ থেকেই শুরু হয় তাঁর শৈশবের শিক্ষা। পিতার একান্ত চেষ্টায় সাহিত্যের প্রতিও এঁর অনুরাগ জন্মে ঐকান্তিক.—এই সাহিত্য-অনুরাগই এঁর মনে জাগায় লিখ্‌বার আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষাই পরে রূপ পায় এঁর রচনার শতদলে। এঁর পিতার কাছ থেকে ইনি যে শুধু মাতৃভাষাই শেখেন তা নয়, অধ্যয়নের প্রতি এঁর অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ একে আরও ছয়টি ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে' তোলে।

বিচ্ছেদের নিগূঢ়তম শোকে ইনি বিচলিত হ'য়ে পড়েন এঁর পিতার মৃত্যুতে—তখন এঁর বয়স পঁচিশ বছরও পার হয় নি। মুহ্যমান শোকাবেগের সঙ্গে এল দারিদ্র্য—আর্থিক অনাটনের জন্য পৈতৃক ভিটাটুকুও বিক্রী হ'য়ে গেল। জীবনের পারিশ্রমিক অর্জ্জন করবার চেষ্টায় সেল্‌মার পড়া-শুনার সমাপ্তি ঘটলো,—তিনি হলেন একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

এখন থেকে এঁর বিশ্রাম-বিনোদনের একমাত্র অবলম্বন হোল কবিতা লেখা। এঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সেই সময়েরই লেখা। তখনকার কবিতাগুলিতে পিতৃবিয়োগ-ব্যথার সকরুণ উচ্ছ্বাস খুব বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পিতৃ-বিয়োগের অনুপ্রেরণাই এঁর বুকে জাগায় কাব্যসৃষ্টির অনুভূতি। এবং সে অনুপ্রেরণা ক্রমে সংকীর্ণ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে মহত্তর ও বৃহত্তর রসবোধ জাগালো এঁর মনে—শোকো-চ্ছ্বাসের পর্য্যায় ছাড়িয়ে এঁর কবিতা হ'য়ে উঠ্‌লো সুগভীর ভাবগর্ভ। সমসাময়িক মাসিকের পৃষ্ঠায় এঁর সেই নবতম শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবিতা সম্বন্ধীয় সাধারণের উদাসীন দৃষ্টি এ কবিতাগুলির উপর পড়ে নি। কবিতার প্রতি সাধারণের এই হতাদর এঁর মনকে ক্ষুণ্ণ করে' তোলে প্রথমে খুবই; তবে প্রতিভার স্ফুরণ কেউ রোধ করতে পারে না—এঁর অনাদৃত প্রতিভা আত্ম-বিকাশের প্রচেষ্টায় ভিন্নমুখী হোল।

সেল্‌মা সুরু করলেন গল্প এবং উপন্যাস লিখ্‌তে।

এই সময়ে একখানি স্ক্যাণ্ডিশ পত্রিকায় একখানি ছোট উপন্যাসের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেল্‌মা

তখন তাঁর সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস 'গোস্টা বার্লিং' লিখ্‌ছেন। আত্মশক্তির উপর তখনও তিনি বিশেষ আস্থা স্থাপন কর্‌তে পারেন নি। তা হোক্, তাঁর বোন ছিলেন তাঁর গল্প ও কবিতার একজন সমঝ্‌দার পাঠিকা, তাঁর অনুরোধে এই উপন্যাসখানি তিনি পাঠান সেই প্রতিযোগিতায়।

বিচারে 'তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠ। উপন্যাসখানি পড়ে' বিচারকরা রচনার বৈশিষ্ট্য ও তার সম্পদে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা নিঃসংশয়ে বলেন—লেখিকা অদূর-ভবিষ্যতে রচনাগৌরবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন কর্‌বেনই। কিন্তু উপন্যাসখানি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার সময় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌লো না মোটেই,—সমালোচকরাও বিশেষ ভালো বল্‌লেন না কেউই। তথাপি লেখিকা বিচলিত হলেন না একটুও: বইয়ের আকারে প্রকাশ কর্‌লেন সেই উপন্যাসখানিকে। ঠিক এই সময়ে অনেক বিখ্যাত সমালোচকের সমালোচনায় একেবারে আকস্মিক ভাবেই তিনি খ্যাতি অর্জ্জন কর্‌লেন স্যুইডিশ্ সাহিত্যে। কিছু-দিনের মধ্যেই তাঁর উপন্যাসের দু-তিনটি সংস্করণ নিঃশেষ হ'য়ে গেল। তাঁর উপন্যাসের রচনা-সৌন্দর্য্যে দেশবাসী এতদূর মুগ্ধ হ'য়ে পড়লেন যে স্যুইডিশ নরপতিরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল এই উদীয়মানা লেখিকার প্রতিভার উপর। ফলে তিনি নরপতির কাছ থেকে পেলেন প্রচুর অর্থ, যার উপর নির্ভর করে' তিনি ভ্রমণ করেন জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড, ইতালী, টার্কী, ডেনমার্ক, স্যাক্সনী, বেলজিয়াম্, গ্রীস্, প্যালেষ্টাইন, মিশর প্রভৃতি য়ুরোপ্, আফ্রিকা এবং এশিয়ার নানাস্থানে।

তারপর উনিশ-শো-চার সালে স্যুইডেনের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে' তিনি খ্যাতি পান 'যারুশালেম' নামক উপন্যাসখানি লিখে'। মনস্তত্ত্ব, অপূর্ব্ব পর্য্যবেক্ষণ, সৌন্দর্য্যচিত্রণে বইখানি স্যুইডেনের সকল মনীষীকেই মুগ্ধ করে' তোলে। স্যুইডিশ একাডেমি থেকে সেই বছরেই তিনি স্বর্ণ-পদক পান তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা-মুগ্ধ মনীষীদের কাছ থেকে;—'ডক্টর' উপাধিও পান স্যুইডেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয় 'উপ্‌শাল' য়্যুনিভার্সিটি থেকে।

তারপর ইনি একে একে অনেকগুলি উপন্যাস লেখেন—তার মধ্যে 'এল্যাগির অফ পর্টুগ্যালিয়া' (পর্ত্তুগালের সম্রাট) ও 'দি আউটকাষ্ট' (জাতিচ্যুত) উপন্যাস দু'খানিই সর্ব্ববাদি-সম্মতক্রমে এঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অপূর্ব্ব পিতৃস্নেহের উজ্জ্বল চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন 'পর্ত্তুগালের সম্রাটে'—স্যুইডিশরা বলেন এ বইখানি স্যুইডেনের পিতৃস্নেহমূলক উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তারপর 'জাতিচ্যুত'। এর চরিত্রসৃষ্টি অনবদ্য, ঘটনা-সংস্থাপন সুন্দর। মৌলিকতা ও অনুভূতি-সৌন্দর্য্যে এমন বই স্যুইডিশ ভাষায় দ্বিতীয় নাই।—এ বইখানি ইনি লেখেন উনিশ-শো-আঠারো সালে নোবেল পুরস্কার পাবার পর।

উনিশ-শো-সাত সালে ইনি 'লরেল' মুকুট পান—সাহিত্যে নোবেল্ পুরস্কারের নিম্নতর শ্রেষ্ঠ সম্মান এটি!

উনিশ্-শো-আট সালে এঁর জন্মতিথিতে স্যুইডিশরা জয়ন্তী উৎসব করে।

উনিশ-শো-নয় সালে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়্‌লো এঁর শিরে,—সাহিত্যিকদের বহু-ঈপ্সিত সুমহান সম্মান ইনি লাভ কর্‌লেন নোবেল পুরস্কার পেয়ে! সারা স্যুইডেন আগে থেকেই এঁর ভক্তমুগ্ধ হয়েছিল, এখন সারা বিশ্ব মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো এঁর সম্মানে—কন্টিনেন্টাল সাহিত্য নব গৌরব লাভ কর্‌লো এঁর রচনার বৈশিষ্ট্যে। এঁর সমুজ্জ্বল চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনা-সংস্থাপনের সৌকর্য্য ও অপূর্ব্ব মনোবৃত্তিবিশ্লেষণ সার্ব্বজনীন—সর্ব্ব দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিচারে। য়ুরোপীয় সকল ভাষাতেই তাঁর উপন্যাসের অনুবাদ আছে। এঁর 'গোষ্টা বার্লিং' চলচ্চিত্রে য়ুরোপের সকল দেশেই দেখানো হয়েছে।

উনিশ শো-এগারো সালে আন্তর্জ্জাতিক মহিলা কংগ্রেসে ইনি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় সারগর্ভ অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন—বিভিন্ন ভাষার মহিলা পত্রিকায় সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'য়ে গেছে।

উনিশ-শো চোদ্দ সালে স্যুইডিশ একাডেমির ইনি সদস্যা নির্ব্বাচিতা হন। ইতিপূর্ব্বে এ গৌরব আর কোন মহিলা লাভ করেন নি। নিজ প্রতিভায় এবং মনস্বিতার জোরে বিশ্বসাহিত্যের বুকে নারীর স্বাধিকার ইনি প্রতিষ্ঠা করেন এমনি ভাবেই। বহুমুখী এঁর প্রতিভা—ইনি একাধারে বক্তা, কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। আজও ইনি বিবাহ করেন নি। আত্মগরিমা নাই এঁর একটুও। এমন বিদুষী মনস্বিনী ও নিরহঙ্কারী সরলহৃদয়া মহিলা বিশ্বমহিলা সমাজের গৌরব। কিন্তু শুধু গৌরবই তো সব নয়, উন্নতকামী মহিলা সমাজকে এই আদর্শনারীকে কেন্দ্র করে' অগ্রসর হওয়া চাই—তবেই তো সে গৌরব মহিমান্বিত হ'য়ে উঠ্‌বে সার্থকতার সমারোহে।

মাটির প্রদীপ

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

মাটির প্রদীপ আমার হাতে,—
আমার সাথে
কেউ ছিল না একটি সাথী।
হাতের বাতি
হাঁটতে কাঁপে,—আঁচল ঢাকি'
হতই রাখি,
তাইতে হাওয়া ততই মাতে॥

মাটির প্রদীপ আমার হাতে,—
আঁধার রাতে
একলা আমি,—পাইনি আভাস
পাঠিয়েছিল আকুল উদাস
বাঁশী আকাশ
প্রদীপকে দূত হাওয়ার সাথে॥

মাটির প্রদীপ আমার হাতে,—
এক নিমিষে
হাওয়ায় মিশে'
উধাও—আকাশ পাওয়ার সাথে
আমি ভাবি, নিভূল বাতি
জানিনি—তার বাসর-রাতি
আকাশ-কবি
ছুটায় এঁকে রূপের ছবি
মেঘের ফাঁকে নীলের পাতে॥

মাটির প্রদীপ আমার হাতে,—
নিভূল বাতে।
শিখাবিহীন সূক্ষ্ম বাতি—
নীরব কাঁদি'
তিতিয়ে দিলাম অশ্রুপাতে।
নয়ন মুছে' চাইতে—দেখি,
শতেক তারার সেই ত'···একি!
আমার প্রদীপ—মাটির প্রদীপ—
মাতীয় প্রদীপ--
মোতির প্রদীপ—
জ্যোতির প্রদীপ
ত্রিদিব-বাটে,
সুধার হাটে

যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি

শ্রী পরিমল গোস্বামী এম্-এ

বহুদিনের অনুশাসন ভেদ করিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা নারী উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আমরা তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিব, কি বল বাঁধিয়া তাড়া করিব ইহাই সমস্যা

আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে, এবং অন্যান্য দেশে অল্প-বিস্তর, পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক হইয়াই রহিয়াছে। পুরুষ বাহিরের ক্ষেত্রে কর্ত্তা, নারী গৃহাভ্যন্তরে সেবিকা। ইহা প্রকৃতির অভিপ্রেত ব্যবস্থা। ইহাতে পুরুষ নারীকে কখনো বলে নাই তুমি কেবল ঘরেই থাকিবে আর আমি খাটিয়া মরিব, ইহা হইবে না। নারীও কখনো বলে নাই—একমাত্র আমাকেই সন্তান ধারণ এবং সন্তান পালন করিতে হইবে, এ কেমন ব্যবস্থা? কেন না ইহার যতখানি প্রকৃতির ব্যবস্থা ততখানিতে এরূপ অনুযোগের কোনো সুযোগ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে প্রকৃতির বিধানকে শিরোধার্য্য করিতে গিয়া পুরুষ যেদিন একথা ভুলিল যে নারীর দৈহিক স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত কম থাকা সত্ত্বেও মনের স্বাধীনতা সেই পরিমাণে কম নয়, সেই দিন হইতে নারীর মননশক্তিকে পঙ্গু করিবার কাজে সে তাহার অনেকখানি ক্ষমতা অপব্যয় করিয়া আসিতেছে।

পুরুষ তাহার স্বাধীন স্বার্থ-সম্পদ লইয়া চিরদিন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার ফলে তাহার চিন্তাশক্তিও এতদূর বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পাইয়াছে যে, সে নিজের সর্ব্বতোমুখী উদ্ভাবনী শক্তির সম্মুখে আপন শির নত করিয়া তাহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়াছে। সে তাহার শক্তির প্রাচুর্য্যে ইহা বিশ্বাস করিয়াছে যে, কর্ম্মক্ষেত্রে, চিন্তাক্ষেত্রে, নারীর কোনো প্রয়োজনই নাই। সে থাক্ তাহার গৃহস্থালীর মধ্যে আপন মাতৃত্বকে একটি সুসম্পূর্ণ সুষমায় বিকশিত করিয়া; সে থাক্ গৃহলক্ষ্মী রূপে আপন পরিপূর্ণ মহিমায় সংসার-মন্দিরটির উপর চরণযুগল ন্যস্ত করিয়া। অসম্পূর্ণতা, বিরোধ, বিদ্রোহ, অসংযম, অশান্তি, হিংসা, দ্বেষের ক্ষেত্র থাক্ পুরুষের,—নারীর সীমায় হোক্ সকল বিরোধের পরিসমাপ্তি।

কিন্তু যতখানি ধ্যানী পুরুষ বিশ্বাস করে, সংসারী পুরুষ যদি তার এতটুকুও বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে অশান্তির কোনো হেতু ছিল না। লক্ষ্মী নারীও যদি পুরুষের পূজা পাইয়া নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিত, তাহা হইলেও দুঃখ করিবার কিছু ছিল না। পুরুষ নারীমূর্ত্তিতে গঠিত মাটির দেবতাকে পূজা করিয়াছে—নারীকে করে নাই। নারীও দেবী হইয়া পদ্মের উপর পা দিয়া বসিয়া নাই। উভয় পক্ষেই দেখা যাইতেছে মানুষই আছে,—মানুষের দোষগুণ, ভালমন্দ লইয়াই তাহাদের সংসার চলিতেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই পক্ষের যে সহজাত সহযোগিতা পুরুষ-নারী উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর ছিল, যাহা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিত, পুরুষ তাহার জন্য অপেক্ষা করে নাই। সে আইন করিয়া নারীকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, তাহার নিকট হইতে সহযোগিতা আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহাতে সফলও হইয়াছে।

একথা সত্য, পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন পার্থক্যে নারী কিছু পরিমাণে পুরুষের অধীন। পুরুষ এবং নারী একটি সম্পূর্ণ মানুষের দুইটি অংশ মাত্র। কিন্তু আমার হাত কিংবা আমার পা যেমন আমার অংশ, ইহা সেরূপ নহে। দুই জনের মধ্যেই স্বাধীন মন রহিয়াছে, আমার হাত-পায়ের মধ্যে স্বাধীন মন নাই। কিন্তু বাধাহীন স্বাধীনতা পাইয়া পুরুষ ইহা মনে করিতে ইতস্ততঃ করে নাই যে নারীর চিন্তা-শক্তি নগণ্য, এবং জগতের কল্যাণে তাহা অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ সে হাত-পায়ের মতই একটা জড় অংশ মাত্র। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়ায় যে নারীর পক্ষে কোনো বিষয়ে কিছু চিন্তা করিবার আবশ্যকতাই নাই। একথা মিথ্যা নহে যে পুরুষ দৈহিক এবং মানসিক শক্তিতে নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু সেই কারণে নারীকে স্বাধীন চিন্তার

অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা সদিচ্ছা নহে।

কাহাকেও স্বাধীন চিন্তা হইতে বঞ্চিত করিব অথবা কাহাকেও উহার সুযোগ দিব, এরূপ প্রশ্নও আর উঠে না। অজ্ঞানের তিমিরাবরণ এ যুগের মন হইতে আপনা আপনি ঘুচিয়া গেল। সকলেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল অবাধে খাইতেছে, ইহাতে সুখ আসিবে কি দুঃখ আসিবে তাহা কেউ জানে না। সংসারে নারী তাহার প্রতিষ্ঠা চাহে। সে বুঝিতেছে এতকাল তাহাকে যে অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহা তাহার পক্ষে সম্মানজনক নহে। সে এখন নিজের শক্তিতে নিজের জন্য বিশেষ অধিকার দাবী করিতেছে। পুরুষ তাহাকে অনেকখানি ফাঁকি দিয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুত্রসন্তান জন্মিলে আমাদের দেশে আনন্দ করে, কিন্তু কন্যার জন্ম সুখের পক্ষে অমঙ্গলজনক। বিবাহ উপলক্ষে ক'নে-পরীক্ষা হাটে পশু কেনা-বেচার মতই একটা বাণিজ্য-ব্যাপার মাত্র। যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া বাল্যবিবাহের সমর্থন করা হয়, সেই একান্নবর্ত্তী পরিবারে অধিকাংশ বধূর অবস্থা ক্রীতদাসীর অবস্থা হইতে কিছুমাত্র উন্নত নহে। নববধূদের উপর শাশুড়ীকুলের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী শুধু গল্পে লেখা থাকে না- হাজার হাজার গৃহে অতি বাস্তব রূপে, অতি নির্ম্মম সত্য রূপেই তাহা প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইতেছে। শাশুড়ী এবং বধূ উভয়েই নারী, তবু জানি নারীত্বের এই বিকৃতি পুরুষের অনুশাসনের ফলেই সম্ভব হইল।

পীড়িত অপমানিত মনুষ্যত্বের সর্ব্বনিম্ন স্তরের এই কদর্য্য মূর্ত্তিটি সত্য করিয়া দেখিতে পাইলে স্বাধীনতাকামী নারীকে হিতোপদেশ শুনাইবার লোভ আর থাকে না, তাহার শিক্ষার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লজ্জা বোধ হয়।

মনুসংহিতার যুগে বলা হইল, নারী তোমার চলাফেরা করিবার গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম, সাবধান, ইহার বাহিরে এক-পা যাইবে কি অনন্ত নরক! আর আজ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের গলায় মুক্তিস্নান করিয়া উঠিয়াও ঐ একই কথা উচ্চারণ করিতেছি—নারী তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করিতেছ, এই দেখ না আমরা গবেষণা করিয়া দেখাইয়া দিতেছি—তোমরা কখনো কোনো মহৎ কাজ কর নাই, এই পৃথিবীটাই পুরুষের গড়া পৃথিবী, ইত্যাদি।

নারীর কত হৃদয় কাঁদিয়া বলে, তোমার প্রমাণ লইয়া তুমি থাক, পুরুষ হইবার সাধনা আমরা করিব না। আমরা চাই আমাদের আপনার স্বাদটি আবিষ্কার করিতে। মুক্ত জ্ঞানের আনন্দে আমরা যে শক্তি নিজেদের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি, তাহারই অনুপ্রেরণায় আমরা বহুদিনের জীর্ণ অর্থহীন পণ্ডী ভাঙিয়া দিয়াছি। তোমাদের সঙ্গে বিরোধ নয়, তোমাদের সঙ্গে বিরোধ ভাঙিবার কাজই আমাদের কাজ।

তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করিয়া জানিবে, নইলে তোমারও মুক্তি নাই, আমারও মুক্তি নাই। অজ্ঞানের যুগে আমাকে প্রয়োজনসিদ্ধির যন্ত্ররূপে, কিংবা তোমার ভৃত্যরূপে দেখিয়াছিলে,—আর আজ বৈজ্ঞানিক যুগে আমাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছ আমি কেবলই ফাঁকি,—কেবলই খানিকটা নাইট্রোজেন কার্ব্বন ইত্যাদির সমষ্টি! প্রকৃতির বিধানে নারী কিংবা পুরুষের সমস্ত কর্ম্মপ্রেরণার মূলে কোন্ বাসনা লুকাইয়া আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া আবিষ্কার করাটাই ত চরম কথা নয়। আদিম আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে প্রাণীমাত্রেই এক, মানুষ তার বেশি কতখানি ইহাই আবিষ্কার করিবার কাজই মানবসভ্যতার কাজ। মানুষের মননশক্তির ত সীমা নাই, তা' সে শক্তি নারীরই হউক বা পুরুষেরই হউক। কিন্তু যদি এমন ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যায় যে কতকগুলি লোক কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া আর কিছু চিন্তা করিতে পারিবে না, তবে দশজনের বড়যন্ত্রে কিছুদিন তাহা তাহারা মানিবার ভাণ করিতে পারে, এবং বহুদিনের অভ্যাসে নিজেরা বিশ্বাস করিতেও পারে যে উহার বেশি চিন্তা করা তাহাদের প্রথা নয়। কিন্তু কখন কাহার স্পর্শে সেই ভুল ভাঙিয়া গিয়া সেই প্রবঞ্চিত মনসমষ্টি সমস্ত প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিবে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। মানুষের মন যদি নিজের ক্ষমতার সন্ধান পায় তবে তাহার প্রকাশ কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা কেউ জানে না। জ্ঞানের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে যদি তাহারা একবার আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তবে হিতোপদেশ দিয়া, অথবা দাঁত খিঁচাইয়া তাহাদিগকে

নিরস্ত করা সম্ভব নয়। নারী যদি মনে করিয়া থাকে যে তাহারা পুরুষের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছে তবে তাহারা হয় ত সম্পূর্ণ সত্যটি দেখিতে না পাইতে পারে, কিন্তু পুরুষ ত জোর করিয়া বলিতে পারিতেছে না যে আমরা তোমাদের প্রতি কোনো অন্যায়ই করি নাই। অন্যায় অনেকখানিই হউক বা অল্পই হউক, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

সুতরাং আজ এই জাগরণের দিনে নারীর কোলাহল যদি আর সকল ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে তবে তাহা লইয়া মন খারাপ করিয়া লাভ নাই। আজ প্রাণের প্রচণ্ড আবেগে যাহা বিক্ষিপ্ত এবং এলোমেলো মনে হইতেছে তাহা কালক্রমেই শান্ত এবং সুসংযত হইবে। এ জগতে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তাহা ত চিরদিনের মত স্থির হইয়া যায় নাই। যুগে যুগে পরীক্ষা চলিতেছে—কোনো দিন এ পরীক্ষা শেষ হইবে না। মানুষ নব নব ক্ষেত্রে আপনাকে আবিষ্কার করিতেছে, ভালমন্দের প্রশ্ন সেখানে একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আজ লক্ষ বৎসর পরেও যদি নারী মনে করিয়া থাকে চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বরাজ পাওয়াই তাহার পক্ষে কল্যাণকর, তবে ঐ লক্ষ বৎসরের পরাধীনতার নজীর দেখাইয়া তাহাকে চাপিয়া রাখা যাইবে না। হয় ত নারী-প্রতিভা বিকাশলাভের জন্য লক্ষ বৎসরই অপেক্ষা করিয়াছে, আজ সে কথা স্বীকার করিবার মত সৌজন্য থাকা চাই। হইতে পারে ইহা তাহাদিগকে জীবনের পথে না পৌঁছাইয়া ধ্বংসের পথেই পৌঁছাইয়া দিবে,—কিন্তু তাহার বিচার আজ কে করিবে?

নারী সত্য করিয়া কি চায়, তাহা হয় ত সেও জানে না, কিন্তু সে এটুকু বুঝিয়াছে যে তাহার স্বাধীনতা চাই। সে স্বাধীনতা কিসের স্বাধীনতা? তাহা অবরোধ ঘুচাইয়া পথে বাহির হইবার স্বাধীনতা নহে—বাড়ির দাসীরও সে স্বাধীনতা আছে। ইহা তাহার চেয়ে বৃহৎ। ইহা কঠোর তপস্যার পথে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার স্বাধীনতা। নারীর তাহা নাই। সে কেরোসিনে পুড়িয়া মরিয়া যে মুক্তিলাভ করে তাহাও স্বাধীনতার মুক্তি নহে—তাহা নিষ্কারের মুক্তি। নারী তাহার অবস্থাকে বিনা প্রতিবাদে এতকাল মানিয়া লইয়াছে এবং উহারই মধ্যে আনন্দের ব্যর্থ সন্ধানও করিয়াছে।—কিন্তু আজ তাহারা সে মিথ্যা আনন্দে তৃপ্তি পাইতেছে না, স্বাধীনতা লাভের জন্য যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

গৃহ-সংসারের ভিতরে এবং বাহিরে উভয়তঃই নারীর স্থান সঙ্কীর্ণ। সে স্বেচ্ছায় গৃহকে আপন করিবার স্বাধীনতা চায়, আইনে আবদ্ধ হইয়া নহে। এবং গৃহের বাহিরেও তাহার যে স্থান আছে তাহাও সে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চায়।—আমরা ইহার প্রতিবাদ করিব কোন্ অধিকারে?

আচারের অত্যাচার হইতে শিক্ষিত হিন্দু যেদিন মুক্তি চাহিয়াছিল, সেদিন খৃষ্টান হইয়া যাওয়াকেই একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। সেদিন শুধু গতির আবেগটাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, লক্ষ্য স্থির করিবার ধৈর্য্য ছিল না। কৃত্রিমতার বন্ধন যতই পাকা হইতে থাকে, সে বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তিও ভিতর হইতে ততই জমিয়া উঠে। বাঁধন যখন একবার খসিতে আরম্ভ করে তখন কোথায় তার শেষ হইবে তাহা কেউ জানে না। সুতরাং আজ যদি কোন নারী বলিয়া থাকে আমরা পুরুষের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না, তবে সেই কথাটাই চরম বলিয়া মানিলে ভুল করা হইবে। উহাকে স্পর্দ্ধাবাক্য বলিয়া প্রতিশোধ লইতে যাওয়াও ঠিক হইবে না।

আমরা শুধু এই কথাই বলিতে চাই, পুরুষ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া নারীকে লইয়া যে সংসার গড়িতে চাহিয়াছিল,—তাহাতে যদি সে ব্যর্থকাম হইয়া থাকে, তাহা যদি নারীকে আনন্দ না দিয়া পীড়া দিয়া থাকে, তবে নারী তাহার মনের মত করিয়া সংসার গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করুক। যুগযুগান্ত ধরিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলিতেছে,—পরীক্ষা চলিতে থাক্, শাশ্বত কল্যাণের পথ কবে কাহার হাতে আবিষ্কৃত হইবে তাহা আজই কেমন করিয়া বলা যাইবে?

উদাসীর মাঠ—শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

'উদাসীর মাঠ' গল্পের বই—ছয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। কয়েকটি গল্পের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। গল্পগুলি যখন একটির পর একটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল, তখনই আমরা সাগ্রহে ঐগুলির বৈশিষ্ট্য ও সহজ সৌকর্য্য লক্ষ্য করি। ইহার প্রথম ও প্রধান গল্প "উদাসীর মাঠে" বাংলার একটি কঠোর কিন্তু সত্য সমাজসমস্যাকে বিস্ময়কর শিল্পকুশলতার সহিত করুণ ভাবে পাঠকসমক্ষে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। একদেশদর্শী সমাজবিধান একটি অবোধ বালিকাকে কি দুর্গতিময় মৃত্যুর পথে পরিচালিত করিয়াছিল—পড়িয়া অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন। তৃতীয় গল্প "হোঁদল-কুৎকুতে" একটি পল্লীবাসী গল্পের কাঠামো লইয়া রচিত হইলেও আড়ষ্ট ও রসহীন নহে।

কথাসাহিত্যানুরাগী পাঠকগণের নিকট এই গল্পগ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে।

পাঁচমিশেলি—শ্রী অবনীনাথ রায়। প্রকাশক—ডি, এম্, লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲।

ছোট-বড় দশটি নিবন্ধ মিলাইয়া এই 'পাঁচমিশেলি' রচনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুইটি ও শরৎ-সাহিত্যের কয়েকটি বিষয় লইয়া ইহাতে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। শেষ তিনটি প্রবন্ধিকা অন্য বিষয়ক। এরূপ আলোচনা বাংলা সাহিত্যে নূতন না হইলেও বেশী নাই। প্রবন্ধকারের বিশেষত্ব এই যে তিনি মনন করিয়াছেন, বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন বিষয়ে 'রায়' প্রকাশ করেন নাই। প্রবন্ধগুলির মাঝে মাঝে ইংরাজী বাক্যাংশ প্রয়োগ না করিলে ঐগুলি অধিকতর মনোজ্ঞ হইত বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রথম ও চতুর্থ প্রবন্ধ পূর্ব্বে আমাদেরই 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধকার চিন্তাশীল। পাঠকগণ ইহাতে নূতন চিন্তার খোরাক পাইবেন।

সাঁঝের প্রদীপ—শ্রী কালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত। প্রাপ্তি স্থান—দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্, ৪,বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১৷৹।

কবির কবিতাবধূ সাঁঝের প্রদীপ লইয়া একাকে অবতীর্ণ হইলেও সন্ধ্যাসমারোহে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে—তারা-দীপান্বিতা সন্ধ্যা সুন্দরীর মতই ঐশ্বর্য্যময়ী সে। এই সাঁঝের প্রদীপ মণিদীপের মতই উজ্জ্বলসুন্দর।

পড়িয়া কবি হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কাব্যে মস্তিষ্কের প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইলেও হৃদয়কে চাই গভীর এবং মুখ্য ভাবে। শাক্তমান মস্তিষ্ক কৃত্রিম হৃদয় সৃষ্টি করিয়া অবশ্য আমাদিগকে সময়ে সময়ে অভিভূত করিয়া থাকে; কিন্তু হৃদয়ে স্থায়ী রস সঞ্চারিত করিতে হইলে মূল হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শ চাই। ইহাতে তাহা আছে।

দুরূহ শব্দচয়ন কোন কোন কবিতাকে ভারাক্রান্ত

করিয়াছে এবং দুই এক স্থলে দুর্বল মিল ও ত্রুটিভঙ্গ পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু এতগুলি সুন্দর কবিতার মধ্যে এই যৎসামান্য ত্রুটি কিছুই নহে—যদিও শক্তিমান কবি আর একটু সতর্ক হইলে অনায়াসেই সর্ব্ববিচ্যুতি হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন।

সাঁঝের প্রদীপের আলো বাঙালী পাঠককে প্রসন্ন করিবেই।

পূর্ব্বাপর—শ্রী অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—নাথ ব্রাদার্স, ২৩, সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২।০।

আজকাল বাংলা কথাসাহিত্যে একাধিক কুশলী তরুণ সাহিত্যিকের দেখা পাওয়া যাইতেছে। অমরেন্দ্রনাথ ইঁহাদের অন্যতম। ইনি শক্তিমান; এবং সুখের বিষয়, সে শক্তির অপপ্রয়োগ করেন নাই। ইহাতে চারিটি গল্প আছে। প্রারম্ভিক বড় গল্প "পূর্ব্বাপর" শিল্পসৃষ্টিতে অন্যগুলি হইতে শ্রেষ্ঠ। শৈলেশের মনস্তত্ত্ব অসাধারণ না হইলেও নূতনতর এবং মূল্যবান। কিন্তু সাবধানী শৈলেশ হইতে সুনন্দাই আমাদিগকে অধিকতর মুগ্ধ এবং বিস্মিত করিয়াছে। জটিলতার উপলব্যহল গিরিসঙ্কটে অন্ধকার গুহার ন্যায় দেখিয়া গিয়াছে কিন্তু অক্ষতভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছে সে। মাধবীর মনোবিকাশে বেদনার রঙ্গিমা লাগিয়াছে কিন্তু বিপর্য্যয়ের কাঁটা নাই। সুরথকে 'নিখিলেশের' প্রচ্ছন্ন সংস্করণ বলিয়া প্রথমতঃ মনে হইলেও, তাহার নিরীহ ভদ্রতা পরীক্ষিত অধ্যাপকের সৌজন্যসরল চরিত্র ছাড়াইয়া দার্শনিকতার পর্য্যায়ে পা বাড়ায় নাই। দ্বিতীয় গল্প "অপরাজিতা" সত্যানুগতিক পংক্তির হইলেও রঞ্জন ও মায়ার তরঙ্গিত মিলনযাত্রা আমাদিগের ভালোই লাগে; বিশেষতঃ মধ্যবর্ত্তী সেতুস্বরূপ নরেন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৃতীয় গল্প "পূর্ব্বরাগ" একটি বিখ্যাত বিদেশী গল্পের অনুবাদ, কিন্তু গ্রন্থকার তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। শেষ গল্প "চিরাচরিতে" 'শেষের কবিতা'র 'অমিত' আসিয়া উহাকে কিঞ্চিৎ কাব্যভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। পরিবেষকের দিক দিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হিসাবে মন্দ হয় নাই বলিতে হইবে।

অমরেন্দ্রনাথ ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরূপে সম্মানিত হইবেন সন্দেহ নাই।

—বঃ সঃ

কিশোরী—কিশোরীদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা—শ্রী সুধা দেবী। মূল্য—দুই টাকা।

সমুজ্জ্বল ললাট সোনালী কলঙ্কহীন কিশোরীদের এই অপরূপ মাসিক পত্রখানি দেখিয়া হিংসা হয়। মনে মনে ভাবি, আজ যাহারা কিশোরবয়সী তাহারাই জিতিয়া গেল, আমরা ফাঁকি পড়িয়াছি। আমাদের আমলে পূজার সময় কেউ ত বুদ্ধি করিয়া এমন একটি জিনিষ বাহির করে নাই। বইখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখি, কেবল বহিরঙ্গ নয়—ভিতরেও রূপের বাহার। পাতায় পাতায় ছবি, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ হইতে সুরু করিয়া। নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলাম; হায় রে, আর একবার সেই বয়সটা ফিরিয়া পাওয়া যায় না! তাহা হইলে কল্পনারঙ্গীন মন ও চোখ লইয়া জিনিষটাকে উপভোগ করিয়া দেখিতাম।

পড়িতে পড়িতে কখন যে বসন্তশুল হইয়া পড়িয়াছি, কিছু বুঝিতে পারি নাই। বেলা পড়িয়া গিয়া চোখে যখন আর নজর চলে না তখনই জ্ঞান হইল। অবাক কাণ্ড! এই বয়সে কোথায় ধর্ম্মতত্ত্বের বই পড়িয়া নিষ্পলকে নাসাগ্রে তাকাইয়া ঈশ্বরোপলব্ধি করিব, তা নয় ছেলেমানুষি বই পড়িয়া ছেলেমানুষ হইয়া গেলাম যে! কথাটা অতিশয়োক্তি নয়। বইখানা পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছিল যেন হারানো কৈশোর ফিরিয়া পাইলাম।

রচনা প্রায় পঞ্চাশটির কাছাকাছি। বিষয়ও বিভিন্ন। গল্প কবিতা জীবনচরিত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মেয়েদের ব্যায়াম খেলাধূলা সেলাই মজার প্রশ্নোত্তর যার 'টাকের মহৌষধ' পর্য্যন্ত। অর্থাৎ ১৯৬টি পৃষ্ঠার মধ্যে ইস্তক চণ্ডীপাঠ নাগাদ মালপোয়া গল্প কোন কিছু সম্পাদিকার নজর এড়ায় নাই। সমস্ত লেখা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তাহা বলিব না এবং তাহা হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু এত বিচিত্র ধরণের এতগুলি রচনা সাজাইবার গুণে অপূর্ব্ব সমগ্রতা লাভ করিয়াছে। অথচ এ বিষয়ে সম্পাদিকার এই প্রথম প্রচেষ্টা।

কিন্তু এই উৎকৃষ্ট পুস্তকের কলঙ্ক অনেকগুলি ছাপার

ভুল। 'কিয়দেব্ অত্র ইব' আমরা এ অপরাধ মনে রাখিতেছি না। তবে আগামী বর্ষের পত্রিকা একেবারে নিষ্কলঙ্ক দেখিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া রহিলাম।

বিস্মৃতি—কাব্যগ্রন্থ। শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মূল্য—আট আনা।

বাঙ্গলী প্রেম-বিরহের কবিতার জ্বালায় কবিতাতঙ্ক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই সতীশ বাবুর 'বিস্মৃতি' কাব্যখানি অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই খুলিয়াছিলাম। গোড়াতেই কালিদাস রায় মহাশয়ের 'পরিচায়িকা' পড়িয়া ভয় ভাঙ্গিল। এই কাব্যের বিষয়বস্তু 'শকুন্তলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক। সতীশ বাবু যে প্রেমের হা-হুতাশ না করিয়া সংস্কৃত কাব্যমঞ্জুষা উদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ। অ-সংস্কৃতজ্ঞের নিকট কালিদাসের বিচিত্র কবিত্বরসের কিঞ্চিৎ পরিবেষণ করিতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কবির স্বকীয়তাও আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে। অতঃপর সম্পূর্ণ 'শকুন্তলা'র ছন্দোবদ্ধ বাংলা-রূপ দেখিবার জন্য উৎসুক রহিল।

—কৃত্তিবাস

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিমচন্দ্র—মৌলভী একরামদ্দিন প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত তুষার আয়্সার। কুলিয়া, বর্ত্তীয়, বর্দ্ধমান। মূল্য—আট আনা।

'রবীন্দ্র-প্রতিভা' রচনা করিয়া গ্রন্থকার যেরূপ সমালোচনা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এবং সঙ্গেই খ্যাতিঅর্জ্জন করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, এই বইখানি লিখিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব যশ অক্ষুণ্ণ রাখিলেন ও বর্দ্ধিত করিলেন। মৌলভী সাহেবের ভাষা, ঘটনা ও চরিত্র-বিশ্লেষণ, বিচার-পটুতা, নিরপেক্ষ সমালোচনা-নীতি সত্যই উচ্চ প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত। আমাদের সব চাইতে আনন্দের কথা হইতেছে এই যে, একজন মুসলমান পণ্ডিত সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ উদার মত পোষণ করেন। ইহা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই।

তাঁহার পরিশ্রম এবং উদ্যম সার্থক হইবে আমরা আশা করি।

মুদ্রণ-পারিপাট্যও বইখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য।

—কঃ

মৃত্যু

—বনফুল

মৃত্যু ? সে ত আসবে জানি—
সব যে সেদিন ফুরিয়ে যাবে !
শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত
থাকবে না আর, জুড়িয়ে যাবে।
শ্রাবণ মাসে ফুটবে কেয়া,
আসবে ভেসে মেঘের খেয়া,
ফাগুন এসে আগুন-রঙা
আঁচলখানি ঘুরিয়ে যাবে !

আশা এবং আশঙ্কা তাই
পরস্পরে জড়ায় যে গো,—
সুখের দিনে শেষের কথা
হঠাৎ মনে পড়ায় যে গো !

যতই ভাবি ভাবনা মিছে
ভাবনা তত ফেরেই পিছে,
রঙীন আলো মলিন করে'
ছায়া তাহার ছড়ায় যে গো···

দাঁড়ি যেদিন চলেই যাবে
এই জীবনের গতির সাথে,
কেমন করে' বন্ধু সখি
থাকব কি না প্রতীক্ষাতে ?
সেই ওপারে সেই আঁধারে
খুঁজবে কি গো আর আমারে,—
হারিয়ে যাব হয় ত কোথা
মৌন মহা অতীত সাথে !

হাল-ফ্যাসান

পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ. বি-টি

মিসেস্ স্কটের ফ্যান্সি ড্রেস্ পার্টির পর লেখা

মিসেস্ স্কটের বাড়ী খুব আমোদ করা গেল, শেষের দিকটা কিন্তু ভাল লাগ্‌ল না। প্রথম যেতেই মিসেস্ স্কটের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি ছদ্মবেশ ছিলেন না বটে তবে উৎসবে যোগ দেবার দরুণ হাতে একটা বেলুন বেঁধেছিলেন আর কোমরে অনেক রকম রঙের ফিতে ঝুলিয়েছিলেন। যে হলটায় নাচ হচ্ছিল সেটাও নানা রঙের বেলুন, ফিতে, ফুল, আলো, জাপানী কাগুস ইত্যাদি দিয়ে সাজান হয়েছিল। মেম, সাহেবরা মিলে' বেশ নাচ আরম্ভ ক'রে দিলে.—মন্দ দেখাচ্ছিল না। এক জোড়া নিগ্রো ছেলে-মেয়েকে এমন মজার লাগ্‌ছিল—তারা দুজনে খুব নাচ্‌লে যা-হোক্, ক্লান্ত হবার নাম নেই। আমরা দিব্যি লোকে মিলে' সব দূরে দূরে ব'সে রইলাম,—কি মজাই লাগ্‌ছিল ! কেউ কাউকে চিন্‌তে পার্‌ছে না, কে যে এসে কথা ক'য়ে গেল তারও ঠিক নেই.—কি অদ্ভুতই লাগ্‌ছিল ! সকলেরই চোখ ঢাকা তাই নিঃসঙ্কোচে আলাপ কর্‌তে কারু বাধ্‌ছিল না। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানে দেখি একজন মোগল বাদ্‌শা'র বেশী লোক এসে দাঁড়ালে,—রংটা দেখে মনে হ'ল সাহেব। এখানে

সকলেই ইংরেজিতে কথা কয়, বাংলা তো মোটে চলেই না, আর আমার উর্দু আর হিন্দির যা' বিদ্যে ইংরেজি ভিন্ন উপায়ই নেই। যা' হোক্ লোকটি এসে আমায় বল্লেন—"নূরজাহান, জাহাঙ্গীরের সঙ্গে 'ফক্স ট্রট্' কর্‌তে আপত্তি আছে?" আমি একটু হেসে বল্লেম—"নূরজাহানের সময় তো 'ফক্স ট্রট্' আরম্ভ হয় নি, তাই সে এ বিষয়ে অনভ্যস্ত।" লোকটি তখন বল্লে—"বেগম বিনা বাদ্‌শা তো নাচ্‌তে পারেন না, অতএব এখানে বসা যাক্।"

নাচ থাম্‌তে মিসেস বট এক প্যাকেট তাস ছেলেদের দিলেন আর এক প্যাকেট মেয়েদের বিতরণ করলেন, যার তাসের সঙ্গে মিল্‌বে তারা দু'জনে পার্টনার হ'য়ে 'সাপার' খেতে যেতে হবে। আমার ভাগ্যে পড়্‌ল একখানা হরতনের সাহেব, কিন্তু আমার পাশে যিনি ছিলেন তিনি পেলেন একখানা চিঁড়ের বিবি,—তিনি একটু দুঃখিত হ'য়ে বল্লেন—"এ কি নিষ্ঠুরতা, জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানকে কি এমন ভাবে আলাদা করা উচিত? আমারই মন্দ ভাগ্য, যাই পার্টনারের অন্বেষণে, আপনার 'কিং অব্ হার্টস্' নিয়েই আপনাকে খুঁজে বের কর্‌বেন।" সে চ'লে গেল, এদিকে আস্তে আস্তে হল্ খালি হ'য়ে এল, তখন দেখি এক-জন পাঞ্জাবী কিম্বা কাশ্মীরী লোক আরব দেশের পোষাক প'রে আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে—লোকটাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল, অনেকটা শেখের বেশে কতকটা ভ্যালেনটিনোর মতন···সত্যি সত্যি, পশ্চিমের লোকদের পড়ন বড় চমৎকার! লোকটি কাছে এসে বল্লে—"আপনি আমার পার্টনার?" লোকটি বেশ ভদ্র, আমাকে কেমন যত্ন ক'রে সাবধানে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলেন। খাবার ঘরে এসে দেখি টেবলগুলো প্রায় সবই ভ'রে এসেছে, অনেক ঘুরে একটা ছোট টেবিল খালি দেখে আমরা সেইটেই দখল ক'রে নিলাম। অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল—লোকটা অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরেছে, বেশ লাগ্‌ছিল শুন্‌তে।

এক একজন লোক আছে যাদের একটু চিন্‌লেই মনে হয় যেন তার সঙ্গে কতদিনের আলাপ। এ লোকটি সেই রকম। বেশ ছিলাম, হঠাৎ একজন বাঙালী পোষাক পরা লোককে দেখে আমার মনটা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেল, বাড়ীর বিষয় মনে হ'তে লাগ্‌ল, উৎসবটা আর ভাল লাগ্‌ল না; মা'র কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা কর্‌ছিল, মনে হচ্ছিলো এতগুলো লোকের মধ্যে আমি যেন একেবারে একা··· একটা ব্যর্থতার ব্যথা জেগে উঠ্‌ল,—আমি যাতে হাত দিয়েছিলুম সবই ভেঙে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে! সুধীর আমায় পরিত্যাগ করেছে,—তাঁহারেরই জিৎ, আর একজন যাকে অপমান কর্‌ব ভেবেছিলাম তার তো কিছু হ'ল না, সব আঁচটাই আমারই গায়ে পড়্‌ল,—সব অপবাদটা আমিই কুড়ালাম, পরাজয়ের মালা আমারই গলায় চিরকালের জন্যে হ'য়ে গেল! হঠাৎ আমার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে পড়্‌ল। আমার সঙ্গী একটু ঝুঁকে বল্লেন—"কি হয়েছে?" এমন ভাবে ধরা পড়াতে বড় লজ্জা হ'ল; সে কিন্তু আবার বল্লে—"আমি কি কাজে আস্‌তে পারি?" আমার হঠাৎ মনে হ'ল, মন্দ কি? এ লোকটাকে সব বল্লে হয় না? দেখি না ওর কিছারে আমার কতটা দোষ,—স্বদেশের লোকেরা তো আমায় দোষী করেছে, এই বিদেশী লোকটা কি বলে দেখা যাক্, এর পর এর সঙ্গে তো আমার আর কখনও দেখা হবে না, দুদিন পর আমি তো কোল্‌কাতা চ'লে যাব। তাই আমি একটু লজ্জিত ভাবে বল্লাম—"আমি অনেক দোষ করেছি যার জন্যে মাঝে মাঝে আমার অনুতাপ হয়—" সে তাড়াতাড়ি বললে—"কৈ আপনাকে দেখ্‌লে তো মনে হয় না যে আপনি সত্যি সত্যি কোন অন্যায় কাজ কর্‌তে পারেন?" একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লাম—"সব লোকে তো আমাকেই দোষী ব'লে ঠিক করেছে, যদিও আমি সেগুলো অন্যায় মনে ক'রে করিনি—" সে একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—"যদি আপত্তি না থাকে তা' হ'লে ব্যাপারটা আমায় বলে আমিও বিচার ক'রে বল্‌তে পারি সত্যি আপ-নার দোষ হয়েছে কিনা।" আমি তো এ-ই চেয়েছিলাম; তাই বল্লাম—"এ মন্দ নয়; আপনি আমায় স্পষ্ট জবাব দেবেন তো? ভদ্রতার খাতিরে কিছু লুকোতে পারবেন না।" সত্যি চোখ ঢাকা ছিল বলেই এমন ভাবে কথা কইতে পার্‌লাম!···আমার সঙ্গী কেবল বল্লেন—"আচ্ছা।" বিদেশী পোষাক-পরা লোকটিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্লাম—

"আমি একজনকে বন্ধুর মত ভালবাস্‌তাম, সে কিন্তু আমার কাছ থেকে আরও কিছু দাবী করত,—" বাধা দিয়ে আমার সঙ্গী বল্লেন—"তার মানে সে আপনাকে বিয়ে করতে চায়?" আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লাম—"হ্যাঁ ঐ রকম, আমি কিন্তু বরাবর জান্‌তাম যে সে যা চায় তা' দিতে পারব না, তবুও তার বন্ধুত্ব পাবার জন্যে স্পষ্ট জবাব না দিয়ে তাকে আমার কাছে আট্‌কে রেখেছিলাম। আচ্ছা, এই রকম ক'রে একজনকে প্রতারণা করাটা কি অন্যায় হয়নি?" সে খানিকক্ষণ কিছু বল্লে না, তারপর ধীরে ধীরে বল্ল—"সে তো আর আপনার মত ছেলেমানুষ নয়? তার এটা বুঝে নিয়ে আগে থেকে স'রে পড়া উচিত ছিল—" আমি একটু হেসে বল্লাম—"আপনি পুরুষ কিনা, তাই মেয়েমানুষের দোষ না দিয়ে পুরুষেরই দোষ দিচ্ছেন। আচ্ছা, ওটা যাক্, এবার বলুন তো এতেও আমার দোষ আছে কিনা? আমি একজনের বিষয় শুনেছিলাম যে তিনি স্ত্রীলোকদের বড় ঘৃণা করেন, আমার সেটা সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতি অপমান ব'লে মনে হয়, তাই প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঠিক করেছিলাম এই চেহারার জোরেই তাকে বশ করব, তারপর যেদিন সে তার পরাজয় স্বীকার করবে সেইদিনই তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে যাব—তার আগেই কিন্তু—" কথা আর শেষ হ'ল না, ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ১২টা বাজ্‌ল, আর অমনি "মাস্ক খোল, মাস্ক খোল" একটা রব উঠ্‌ল,—হাসি চীৎকার গোলমালের মাঝখানে আমি যখন ব্যস্ত ভাবে চোখের কাপড়টা খুলে ফেল্লাম, তখন দেখি আমার আরব বেশের সাজে বিদেশী সঙ্গীর স্থানে দেবকুমার বাবু দাঁড়িয়ে আছেন! আমার দিকে একবার চাইলেন, তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন—

পূর্ণিমার রাত্রে তাজ দেখ্‌বার পর লেখা—

রাত আটটা;—মিসেস্ হটের পার্টির পর আমি কিছু দিন বাড়ী থেকে বেরই হইনি। সেদিনকার ব্যাপারটা ভাব্‌লে এখনও আমার গায়ে জ্বর আসে! দেবকুমারের মত অসভ্য লোক যদি দুনিয়ায় দুটো থাকে,—চুরি ক'রে একজন মেয়ের প্রাইভেট কথাগুলো জেনে নিতে তার একটুও লজ্জা হ'ল না? কেমন বিচারক! সুধীরের বেলা সেটা তার দোষ, আর যখন তাঁতে ঘা পড়্‌ল তখন কেমন অন্তর্মূর্তি! অত বড় মস্ত লোকটা কি যে একটা ছোট ছেলের মত 'হাড়ি'-মুখ ক'রে চ'লে গেল,—সহ্য আর কি! ওতে এতই বা রাগ করবার কি আছে? ওরই ত জিৎ, ওতো আর আমার ঘাড়ে পড়ে নি,—না আমার মত ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে? আমারই তো রাগ করবার কথা! আচ্ছা, সেদিন আমি অমন ক'রে বাজে কথাগুলো বল্লাম কেন? যার তার কাছে অমন কথা কি বল্‌তে আছে? কবে যে আমার বুদ্ধি বিবেচনা হবে তা' তো জানি না। আমার এতদিন একটা অহঙ্কার ছিল যে আমি নিজেকে বেশ চালাতে পারি, এখন দেখ্‌ছি প্রতি পদেই ঠক্‌ছি। আর কাজ নেই বাপু স্বাধীনতায়, মা'র কাছে পালাই। তারপর একেবারে পর্দার ভিতর ঢুক্‌ব, পর্দার মধ্যে সুবিধা আছে, এ সব সমস্যায় পড়্‌তে হয় না। আমার আর তাজ দেখ্‌বার ইচ্ছে নেই, মা'র কাছে পালাতে পার্‌লে বাঁচি! প্রমথদা' কি ছাড়্‌বে? ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। ঐ যে এরই মধ্যে তো চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে···লেখাটাও শেষ কর্‌তে দিলে না, ফিরে এসে শেষ করা যাবে—

রাত বারোটার পর —

পূর্ণিমার আলোতে তাজ দেখ্‌লাম; পিসিমা, পিসেমশায় আর রাত্রে বেরুলেন না; প্রমথদা' আর আমি গেলাম, সঙ্গে গেল একটা বাস্কেট-ভর্ত্তি "কোল্ড সাপার।" প্রমথদা' খাবার না হ'লে এক পা-ও নোড়্‌বে না, এদিকে খেতেও তো তেমন পারে না, বোধ হয় খাবার দেখ্‌লেই ওর তৃপ্তি হয়।

পূর্ণিমার রাতে তাজ, সে যে কি একম সুন্দর জিনিষ তা' যে দেখে নি সে বুঝ্‌বে না। এক মিনিটের জন্যে যদি আমি কবি হ'তে পার্‌তাম তা' হ'লে ঐ একটা কবিতার জোরেই আমি নোবেল প্রাইজটা পেয়ে যেতাম! - যাক্ বৃথা বর্ণনা করবার চেষ্টা ক'রে তাজের অপমান ক'রে কাজ নেই। লোকে দেখি তাজের কারুকার্য্য দেখ্‌তেই ব্যস্ত হয়, আমার কিন্তু অমন খুঁটিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না,—আমার কাছে তাজটা কেবল একটি অনন্ত ভালবাসার বেদনার স্মৃতিচিহ্ন।

আচ্ছা, লোকে কেন অন্তরের গভীরতার পরিচয় দিতে লজ্জা পায়? প্রমথদা'র মুখ দেখে মনে হ'ল তাজ দেখে ওঁর বেশ একটু ভাব লেগেছে। সেটা ধরিয়ে দিতে বল কি না - "দূর ছাই, সাজাহানের বেগমের কবর দেখে আমার

প্রাণে বেদনার উচ্ছ্বাস উঠ্‌তে যাবে কেন? বরং কোল্ড চিকেনের কথা মনে প'ড়ে পেটের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব কর্‌ছি।"—সব বাজে কথা।

সামনে থেকে মেঘা সেরে যমুনার উপর থেকে দেখ্‌বার জন্যে মুখ যাচ্ছি এমন সময় প্রমথদা' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌লে —"এই যে দেবকুমার পালাবার চেষ্টা কর্‌ছ কেন হে? এস না আমাদের সঙ্গে, বাবার এক আলাপীর এখানে একটা বোট বাঁধা আছে, সেখানে ব'সে আমরা তাস দেখ্‌ব আর রঙ্গিণ জলেরও সদ্ব্যবহার কর্‌ব ঠিক করেছি।" দেবকুমার বাবুকে প্রমথদা' এক রকম গ্রেপ্তার করেই নিয়ে এল। তারপর বল্লে—"দেবকুমার, আমার এই বোন্‌টার চার্জ্জ তোমায় নিতে হবে, ও যে রকম দুষ্টু, শেষে ঐ সব সাহেব 'টুরিষ্ট'দের সঙ্গে ফ্লার্ট না কর্‌তে আরম্ভ ক'রে দেয়।"

আহাঃ, কি কথার ছিরি, এই লোকের সাম্‌নে আর আমার পরিচয় দিতে হবে না, সে নিজে যথেষ্ট জানে। আর ওর সঙ্গে কথা বলা হবে না, আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। প্রমথদা' চাদর বিছিয়ে তার উপর খাবার সাজাতে আরম্ভ ক'রে দিলে.—আমি হাত গুটিয়ে ব'সে রইলাম। আমায় এমন ভাবে নিষ্কর্ম্মার মত ব'সে থাক্‌তে দেখে বিরক্ত হ'য়ে প্রমথদা' বল্লে—"আচ্ছা, চাঁদের আলো খেয়েই থাক, এ সবে হাত দিতে পাবে না।" এত বড় শাস্তির ভয়েও যখন আমি কিছুমাত্র বিচলিত হলাম না তখন প্রমথদা' হঠাৎ বল্লে—"ওহে দেবকুমার, আজ কোন্ দিকে সূর্য্য উঠেছিল বল্‌তে পার?" দেবকুমার বাবু শুধু বল্লেন—"কেন?" প্রমথদা' যেন কত আশ্চর্য্য হয়েছেন এমন ভাবে বল্লেন— "'কেন' জিজ্ঞেস কর্‌ছ? একটা কিছু অদ্ভুত না হ'লে আমার এই বোনটির মুখে কথা বন্ধ হয়?" দেবকুমার আবার সেই আগের মত মৌন হ'য়ে ব'সে রইল। কি জানি কেন, ওকে দেখ্‌লে আমার রাগ হয়, ইচ্ছা কর্‌ছিল হাতের সাম্‌নে যে নুনদা'নটা ছিল সেটা তুলে ওকে ছুঁড়ে মারি, —ওর ঐ অটল গাম্ভীর্য্যটা যদি তাতে ভাঙে।

সত্যি, যমুনার উপর থেকে তাজটাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল—যেন বিশ্বের মধ্যে একটা মুক্তা হাস্‌ছে! আঃ! প্রমথদা'র আর খাওয়াই শেষ হয় না, এটা সেটা নাড়্‌তে চাড়্‌তে আমার কোলের উপর খানিকটা ফেলিই দিলে ফেলে—আলাদিন! আজ আমার আমি সেই চাঁপা রঙের পরদখানা পরেছিলাম। কি ভাগ্যিস, দেবকুমার বাবু একটু সভ্যতা শিখেছেন, তাড়াতাড়ি রুমালটা বের ক'রে বাদ্যগাটা মুছে ফেল্‌লেন। গোড়াতে কিন্তু একটা সুন্দর লেস্ দেওয়া রুমাল বেরিয়ে পড়েছিল, উনি সেটা তাড়াতাড়ি পকেটের মধ্যে পুরে' ফেলে একটা টেবিল ক্লথের মত মস্ত বড় রুমাল বের কর্‌লেন:—উনি যত শীঘ্রই রুমালটা লুকে ফেলুন না আমার চোখ কিন্তু এড়াতে পারে নি। দেবকুমার বাবুর ব্যবহারের মানে এবার বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কোন মেয়ে ওঁকে প্রতারণা করেছে যাকে তিনি এখনও ভুলতে পারেন নি, তাই তার দেওয়া রুমালটা সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখেন। বাবা, এমন মার্ব্বেল পাথরের মধ্যেও কবিত্ব আছে? আহাঃ, বেচারাকে না জেনে কত যা' তা' বলেছি, ওর যে জীবনে এত বড় একটা ট্র্যাজেডি আছে সেটা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব বল? রুমালটা অনেকটা আমার মত দেখ্‌তে, তাই সুধীর ভুল করেছিল। আচ্ছা, দেবকুমার বাবু কি চালাক লোক, রুমালটা নিয়ে যখন অত গোলমাল হচ্ছিল তখন তিনি অনায়াসে অন্য রুমালটা বেরিয়ে দিয়ে সব সন্দেহ ভেঙে দিতে পার্‌তেন, কিন্তু লোকের কাছে নিজের দুর্ব্বলতা ধরা প'ড়ে যায় তাই সব দোষটা নিজের ঘাড়ে নিলে,—এমন কি পয়সা খরচ ক'রে নতুন একখানা রুমাল পর্য্যন্ত কিনে পাঠিয়ে দিলেন। আশ্চর্য্য লোক যা' হোক! তার নারীবিদ্বেষী হবার কারণ এখন বুঝতে পারছি! আচ্ছা, কে সে ভাগ্যবতী মেয়ে যে এমন একজন মহাপুরুষের ভালবাসা পেয়েছিল? ছিল কেন? এখনও যে পাচ্ছে! এত কম কথা নয়, সে মেয়ে তাকে ছেড়েছে, সে কিন্তু এখনও তাকে ভুলতে পারে নি। ভাগ্যের জোর চাই! এই আমায় দশা দেখ না, একবার সুধীরকে বল্লাম তাকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না, ও চিরকাল অপেক্ষা করা দূরে থাক্ একটু সবুর করেও বিয়ে কর্‌তে পার্‌লে না।

চাঁদটা এতক্ষণে একটু হেলে পড়েছিল, আলোটা একটু বাঁকা ভাবে তাজের উপর পড়্‌ছিল, আমি সেই দিক থেকে তাজটা দেখ্‌ব ভেবে প্রমথদা'কে বল্লাম, "প্রমথদা', চল না ঐ ডান কোণ থেকে তাজটা দেখিগে' যাই।" প্রমথদা' জোরে হাই তুলতে তুলতে বল্লে—"ডানই বল আর

বাঁ'ই বল, আমার এখন নড়া অসম্ভব, যে মুরগীর বাচ্চা পেটে পুরেছি সেটা আগে হজম হোক্।" আমি আর কিছু বলাম না দেখে প্রমথদা' বল্লে—"উঁহু, অমনি মুখ ভার করা হ'ল? ওহে দেবকুমার, যাও না ভাই ওকে একবার দেখিয়ে আন, আমি যে এখন পাশ ফিরতেই পারছি না—" আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—"আমার ভারটা অমন ক'রে আর একজনের উপর চাপাবার তো কোন দরকার নেই, আমি নিজের উপায় ক'রে নিতে পারি।" ব'লে আমি চট্ ক'রে বোট্ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়্লাম, যদিও রাত্রে একা বনের মধ্যে দিয়ে যেতে ভয় হচ্ছিল তবুও সাহস ক'রে এগিয়ে পড়্লাম। খানিক পর মনে হ'ল কে যেন আমার পিছন পিছন আস্ছে,—কি বাবা, মুসলমান নয় ত? ওরা সব যে ভণ্ড, আমায় না ধ'রে ফেলে! দূর ছাই, যে হ'ক্ না কেন একবার ফিরে দেখি—ওমা! ভণ্ড কুণ্ডা কেউ নয়, দেবকুমার বাবু আমার পিছন পিছন আস্ছেন। আমার রাগ হ'ল, আমি বল্লাম—"আপনার আসবার কোন দরোজন ছিল না, আমি নিজেকে বেশ সাম্লাতে জানি।" দেবকুমার বাবু বিরক্ত না হ'য়ে বল্লেন—"আমার নিজেরও কি দেখ্বার সখ্ হ'তে পারে না?" আমি মুখ ঘুরিয়ে বল্লাম—"সে আলাদা কথা।" এ রকম ভাবে দেবকুমার বাবুর সঙ্গে কথা বল্বার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি জানি কেন ওঁকে দেখ্লেই আমার মনে যা কিছু খারাপ সেগুলো জেগে ওঠে;—এবার কিন্তু নিজেকে সাম্লে নিতে হবে। খানিক পর আমি বল্লাম—"আপনার বিষয় সব না জেনে গোড়ায় আমি আপনার সঙ্গে বড়ই অসদ্ব্যবহার করেছি—"দেবকুমার বাবু একটু চম্কে উঠে বল্লেন—"কি রকম?" আমার মধ্যে যতটা মিষ্টতা ছিল সবটা আমার স্বরে ঢেলে দিয়ে বল্লাম—"আমি ভাব্তাম আপনি শুধু শুধু আমাদের জাতটাকে ঘৃণা কর্তেন, এখন জানি আপনি কেন আমার প্রতি বিমুখ—" সে শুধু বল্লে—"কেন?" আমি একটু থেমে বল্লাম—"আপনি অত যত্ন ক'রে যার রুমালখানা রেখে দিয়েছেন সেটা আমি দেখেছি—" মেঘগর্জ্জনের মত দেবকুমার বাবু ব'লে উঠ্লেন—"কার রুমাল?" আমি হেসে বল্লাম—"কার রুমাল তা' আমি কেমন ক'রে জান্ব, তবে সেটা যে মেয়েদের রুমাল সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই—" বিদ্রূপভাবে সে প্রশ্ন কর্লে—"যদিই বা তা' হয়, তাতে কি হয়েছে?" উঁহু—মেজাজ দেখাবার আর যায়গা পেলেন না! আমি একটু রাগ করেই বল্লাম "কি আমার হবে? তবে আমার মনে হয়েছিল তার সঙ্গে মিট্মাট্ ক'রে গেলে আপনি সুখী হ'তেন—" এবার সপ্তম থেকে সুর নাম্ল। একটু হেসে বল্লেন—"আপনি যে আমার বিষয় এতটা মনযোগ দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।"

কথা বল্বার ধরণটা আমার ভাল লাগ্ল না, তবুও রাগ সাম্লে নিয়ে বল্লাম—"না, ধন্যবাদ দেবার মত কিছু নয়, তবে প্রথমে আপনাকে অবিচার করেছিলাম তাই ভাব্ছিলাম এবার যদি আপনার কোন উপকারে আস্তে পারি—" বাধা দিয়ে সে বল্লে—"কি রকম?" বাবা, ঢের ঢের লোকের সঙ্গে কথা কয়েছি, এর সঙ্গে কথা কওয়া যেমন শক্ত এমন আর কারু সঙ্গে নয়! তবুও যখন কথা একবার পেড়েছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত বলাই ভাল, তাই আমি বল্লাম—"ভাব্ছিলাম যদি কোন রকমে আপনার সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দিতে পারি তা' হ'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে—"চাঁদের আলোতে মানুষে এমন ভুল দেখে, আমার ঠিক মনে হ'ল দেবকুমার বাবু হাসি চাপ্বার চেষ্টা কর্ছেন, কিন্তু ওটা হতেই পারে না, এতে তো হাস্বার কিছু নেই? সে কোন উত্তর দিল না দেখে আমি বল্লাম— "আপনি সেদিন অন্যায় ভাবে আমার কাছ থেকে যে সব কথা শুনে নিয়েছিলেন, সে কথাগুলো যদি আপনি ভুলতে স্বীকৃত হন, তা' হ'লে আমি আপনার এই উপকারটা কর্তে পারি—" আনন্দের চোটে মানুষের মাথা যে খারাপ হ'য়ে যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেবকুমার বাবু হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর অনেকটা এগিয়ে এসে আমার হাত ধ'রে বল্লেন—"আমি অন্যায় ভাবে যে কথাগুলো শুনেছিলাম, সত্যি তুমি চাও যে আমি সেগুলো ভুলে যাব?" মানুষের গলার স্বর যে এমন ভাবে বদ্লাতে পারে তা' আমি জান্তাম না। দেবকুমার বাবু প্রিয়তমার সঙ্গে আসন্ন মিলনের বিষয় ভেবে এতই উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলেন যে ওঁর এই অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য ওঁর উপর খুব বেশী রাগ না ক'রে আমি তাড়াতাড়ি একটু স'রে গিয়ে বল্লাম— "একেবারেই অত

অনধিকার হ'য়ে পড়বেন না, আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা কর্‌ব—" দেবকুমার বাবু যেন আর সে লোকই ন'ন, তাড়াতাড়ি বল্লেন—"ঠিক তো?" আমি আর কি বলি? শুধু বল্লাম—"হ্যাঁ।" তারপর ডাক্তারেরা যেমন রোগীদের প্রশ্ন ক'রে রোগের বিবরণ জেনে নেয়, আমিও সেই রকম ভাবে এই স্নেহ-রোগে আক্রান্ত লোকটিকে প্রশ্ন কর্‌তে লাগ্‌লাম —"আচ্ছা, আপনি ঐ মেয়েটিকে খুব ভালবাসেন তো?" "হ্যাঁ—" ইষ্‌ অত জোর ক'রে না বল্লেও চলে। তারপর বল্লাম—"তাকে কি আমি চিনি?"

"হ্যাঁ, বেশ ভাল করেই চেনেন।" আমি তাড়াতাড়ি বল্লাম—"তার নামটা কি বল্‌তে পার্‌বেন—" সে বেশ গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—"পরে বল্‌ব।" আমি একটু নিরাশ হ'য়ে গেলাম. তাও আবার প্রশ্ন কর্‌লাম—"আচ্ছা, তার চেহারা কেমন, বল্‌তে পারেন কি?" দেবকুমার বাবু আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্‌লেন—"তার মুখ চোখ নাক খুঁটিয়ে বল্‌তে পার্‌ব না, তবে তাকে দেখ্‌তে ঠিক একটা ছোট্ট ফুলের মতন—"বাঃ, কবিত্ব হ'চ্ছে! আমি ছাড়্‌বার মেয়ে নই আমি আবার বল্‌লাম—"তার নামের গোড়াটা বল্‌তে পারেন? না তাতেও আপনার আপত্তি আছে?" দেবকুমার বাবু একটু ভেবে বল্লেন—"তার নামের আগের অক্ষর হ'ল 'এল্'।" আমি চট্ ক'রে বল্লাম—"'লেকালিকা' না কি?" লেকালিকা ব'লে আমি একজন মেয়েকে চিনি, তবে তার চেহারাটা ঠিক একটা ছোট্ট ফুলের মত কিনা বল্‌তে পারি না,—সকলের চোখ তো আর সমান নয়! দেবকুমার বাবু হয় ত তার মুখের সঙ্গে কোন ফুলের সাদৃশ্য পেয়ে থাক্‌বেন। নাম শুনে তিনি বল্লেন—"নামটা তাকে বেশ মানায় তবে সেটা তার আসল নাম নয়—"বা রে, বেশ মজা! যেম্‌নি একটা ভাল নাম কর্‌লাম অম্‌নি সেটা তাকে বেশ মানায়? যা কিছু সুন্দর সবই ওঁর প্রিয়তমাকে মানায়! ভেবেছিলাম দু' চারটা সুন্দর নাম বল্‌ব, তা' উনি যে রকম আগ্রহ দেখালেন আমি আর কিছু বল্লাম না। এদিকে তো মশায়ের মুখ দিয়ে কথা বের হয় না; আর "তার" বিষয় কথা হ'চ্ছে কিনা, তাই একেবারে কথা ফুরোতেই চায় না। আচ্ছা, একবার জিজ্ঞাসা করা যাক্ মেয়েটি কেমন,—দেখি তার কি রকম অপরূপ বর্ণনা করেন? নিশ্চয় বল্‌বেন, ধীর, শান্ত, চুপচাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি—। তাঁর জবাব শুনে আমি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম! গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"সে বেশ বড় দুষ্টু, জেদী, রাগী, লোককে কষ্ট দিয়ে কথা কয়, আরও অনেক দোষ আছে, তবুও সে যে কি ক'রে লোকের মনটা একেবারে দখল ক'রে নেয় আমি তাই ভাবি —" আচ্ছা কথা বল্‌তে শিখেছে যা' হোক্। সে মেয়ের খুব আশ্চর্য্য রকম ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তা' না হ'লে দেবকুমার বাবুর মত প্রাচীর-ঘেরা নিখুঁত তর্কী মেসিনগান ইত্যাদি দ্বারা সুরক্ষিত হৃদয়ের মধ্যেও সে প্রবেশ কর্‌তে পেরেছে?

আর বাপু এই 'প্রেম-পাগলা' লোকটির সঙ্গে কথা ব'লে লাভ নেই—ও সারা রাত দাঁড়িয়ে 'প্রেয়তমার' গুণগান করুক আর আমার এদিকে ঘুমের চোটে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়। না হয় আমি আরম্ভই করেছিলাম, ওর কি উচিত ছিল না সময়টার দিকে লক্ষ্য রাখা? তা' ওর কাছে এসব আশা করাও অন্যায়,—ওর কি বাহ্য জ্ঞানটা ছিল? এমন ভাবে আমার দিকে শেষ পর্য্যন্ত চেয়ে ছিল, যেন আমি একটা গাছ বা পাথর বা ঐরকমই একটা নির্জ্জীব পদার্থ। গোড়ায় ভাব্‌লাম ওর একটু উপকার ক'রে দিই, তা' হ'লে ও ভাব্‌বে —বাঃ, বেশ উদার মন তো এর, পরম শত্রুরও উপকার কর্‌তে চায়;—ওমা, তা' নয় আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছে! যাবার সময় কেমন ব'লে গেল—"দেখ্‌বেন আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলবেন না—" ব'য়ে গেছে আমার প্রতিজ্ঞা মনে রাখ্‌তে, আমি তো আর প্রতিজ্ঞা করি নি, খেয়ালের মাথায় একটা কথা ব'লে ফেলেছি, আর তা' ছাড়া এ কাজে এখনও ঢের দেরী হবে। আগে তো কোলকাতা যাই, তারপর সে নামটা শুনি, তারপর দেখা যাবে। ওর কিন্তু এটা আমার কাছ থেকে আশা করাই অন্যায়; নিজে ঝগড়া কর্‌ছে, তার করুক্‌গে যাক্ না, আমি ওর মধ্যে যাই কেন! আমি 'রেফারি'ও হ'তে চাই না, 'পিস্‌মেকার'ও হ'তে চাই না, কে কুজন মান-অভিমানের পালা কর্‌ছে, আমি তাদের মিলন ঘটাব? আর তো আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! সাধে আমি দেবকুমারকে দেখ্‌তে পারি না? ও যখন ঐ ৪০ ইঞ্চি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় তখন মনে হয় যা মেরে বুকটা

ছেড়ে দিই! আর ঐ যে মাথা স্বর্গে তোলা, সে আর নামতেই চায় না,—এমন অহঙ্কারীর মত চেহারা, পা অবধি যায় দেখা যায়। উঃ, রাগের চোটে যে চোখে জল এসে গেল, —এখানটা ঝুট হ'য়ে গেল! আর ঐ লোকটার বিষয় ভুলেও ভাব না, কোলকাতা গিয়ে মাকে ব'লে দেব যেন দেবকুমার বাবুকে আর না আসতে দেওয়া হয়। শেষে কি একদিন হাতাহাতি হ'য়ে যাবে? দেবকুমার বাবুর ঐ পরীর খোঁজ আমি কেন করতে যাব? আবার দেখ সেই এক কথা লিখে ফেললাম! আসল কথা, আমার ঘুম পেয়েছে, তাই এত সব বাজে কথা লিখলাম। তা', দেবকুমার বাবু বিয়ে করতে চলেছেন, তাতে আমার কি?

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গলা দেশের শিশু মরে কেন?

শ্রী আমোদিনী ঘোষ

এ সম্বন্ধে দেশের সুচিকিৎসকগণকে মাঝে মাঝে দুই একটি প্রবন্ধাদি লিখিতে দেখা যায়। সভায় আলোচিত কাজের অকাজের সহস্র প্রস্তাবনার মত কথাটা মিলাইয়া যায় বলার সঙ্গেই। বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে-মেয়ে জন্মায় যেন ক্ষেতের ফসল, কতক হাসিয়া মজিয়া যায়, কতক চাষে দাঁড়িয়া থাকিতে পারে না, কতক যায় কতক থাকে। হয়ও অর্দ্ধাস্ত মরেও অর্দ্ধাস্ত। তাহাতে দুর্ভাবনা নাই কাহারও। এক ছেলে মরিলে তাহার জায়গায় সাত ছেলে হইবে—লোকে ভরসার কথা বলে। কিন্তু এক ছেলে যে পথে যায়—সাত ছেলেও সেই পথে যাত্রা করে, ঘরে কান্নার রোলের সঙ্গে বিলাপ শুনিতে হয়—তা অদৃষ্ট! তাহার পর বাপ থাকেন ব্যবসায় অর্থোপার্জ্জন চেষ্টায় ব্যাপৃত, মা থাকেন তাহাদের ঘরকন্নায় ব্যস্ত—দিন যায় যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্। সকলেই মনে করেন, ঝড়-তুফান ভূমিকম্প জলপ্লাবনের মত এও এক প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ অথবা উপদ্রব, মানুষের তাহা সহিয়া থাকা ছাড়া পথ নাই।

কিন্তু পথ যে আছে, এবং সে পথ খুঁজিতে দূরে কাহাকেও ধাবিত হইতে হয় না—আয়ুর্বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মানুষের জাগ্রত কর্ম্মচেষ্টা ও পরম প্রযত্নের ভিতর দিয়া তাহারই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেদিকে দৃষ্টি উন্মীলিত হইল অতি অল্প লোকেরই।

সভ্যতার বিকাশ হইতে সুরু হইয়াছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রভুত্বের দ্বন্দ্ব। মানুষ যতদিন প্রকৃতির পদানত ছিল ততদিন তাহার রোগ দুর্গতির অন্ত ছিল না। দিন কাটিয়াছে তাহার কোটরে বিবরে গহ্বরে, খুঁড়িয়াছে বন্য ফল ও নিহত পশুর অর্দ্ধদগ্ধ মাংসে, নিরাবরণ দেহের উপর দিয়া গেছে বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা-শিলা, শীতাতপ পর্য্যায়ক্রমে বহিয়া গিয়াছে। ব্যাধি জরা মৃত্যু অপ্রতিহত ক্ষমতায় তাহার উপর প্রভুত্ব করিয়াছে।

তাহার পর এমন এক দিন আসিল যেদিন মানুষ এই সর্ব্বশক্তিসম্পন্না অপরাজেয়া প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া তাহার পরাধীন করিল, সঙ্গে সঙ্গে শীতাতপাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব ও আধিভৌতিক সকল ক্লেশ দুর্ব্বিপাক দুঃখ মোচনের পন্থা নিরূপণ করিল। মানুষের জীবনেতিহাসে এক নবযুগ প্রারব্ধ হইল।

শিশুমৃত্যুর হার প্রতীচ্য দেশ সমূহে শতকরা পঁচিশ, আমাদের দেশে নব্বই পঁচানব্বই। তত্রাচ কেহ জানিতে বা বুঝিতে ইচ্ছা করেন না এ তারতম্য বৈষম্যের হেতু কি। মূঢ়তা মানবের বিধাতৃ-রোষ। ইহার এক সীমায় মানুষের ইহকাল, অন্য সীমায় পরকাল—এক অবিমোচনীয় তুলাদণ্ডে অঙ্গেশ্বরূপে আবদ্ধ। চক্ষু বুজিয়া মালা জপিয়া তাহা পাওয়ার বস্তু নহে। প্রকৃতির প্রতিশোধ অনিবার্য্য, অমোঘ।

যার যায়, ব্যথা তারই। সুতরাং প্রতীকারের চেষ্টা

তাহারই হওয়া উচিত। কিন্তু এ দেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔদাস্য ও অবজ্ঞার সীমা নাই। অনিয়ম ও অত্যাচারকে পরম বন্ধুর মত আঁকড়িয়া থাকিয়া যমদুয়ারের পথ প্রশস্ত করার দিকে লোকে যতটা স্বতঃ উন্মুখ, এতটা আর কিছুর অভিমুখে নয়। অনর্থের প্রতীকার ততক্ষণ সুদূরপরাহত, যতক্ষণ অনর্থকে অনর্থ বলিয়া উপলব্ধি না ঘটে।

গোড়ায় গোল ঐখানেই। সস্তা বিলাসদ্রব্য ও নভেল-নাটক ঘরে ঘরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ঢেলো জলের মত—স্বাস্থ্যনীতি শিশুমঙ্গল মাতৃমঙ্গলের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা যায় না। দেশে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, নানাপ্রকার সভাসমিতি সঙ্ঘ ইত্যাদি গঠিত হইতেছে, মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমভাবে বাহিরের কাজে যোগদান করিতেছেন, কিন্তু তবু এ দেশ যে তিমিরে সে তিমিরেই নিমগ্ন রহিয়া গেল! যাদুমন্ত্রী ভাবনার যত—সিদ্ধিও ঘটিতেছে তাদৃশী। অবান্তর বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া মেয়েদের চেষ্টা ও উদ্যোগ অবান্তর দিকে যতটা ধাবিত হইতেছে, আসল কাজের দিকে ততটা নয়।

স্বাস্থ্যনীতি গার্হস্থ্যনীতির ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া এ পর্য্যন্ত কয়জন শিক্ষিত পুরুষ ও নারী উপলব্ধি করিয়াছেন? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যত বড় উপাধিই যিনি অর্জ্জন করুন না কেন, এ সম্বন্ধে জ্ঞানবত্তায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ একই স্থানে অবস্থিতমান। মেয়েরা মা হইতেছেন ঘরে ঘরেই, কিন্তু শিশু-পালন ও শিশু-চিকিৎসার কয়টি কথা কয়জনে জানেন?

বাঙ্গালা দেশের শিশু মরে বাঙ্গালার মা-বাপের নীতি-হীনতার জন্য, কুসংস্কারের জন্য, কদাচারের জন্য, মূর্খতার জন্য, অপবুদ্ধির জন্য। দরিদ্রের ঘরে ঘরে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, পরিধের অভাবে, বাসস্থানের অভাবে, যত্নের অভাবে, চিকিৎসার অভাবে,—ধনীর ঘরে ঘরে অত্যুপচারে, অতি ভোগে, অতি যত্নে, অতি চিকিৎসায়,—এ দুয়ের মাঝখানে মানুষের সুখ-দুঃখের পরিমাণ যতই থাক্ ফল তাহার একই।

এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন লোকই দুঃস্থ। যেখানে একটি ছেলেকে খাওয়াইবার সামর্থ্য নাই, সেখানে প্রতি বৎসর একটি করিয়া নূতন অতিথির আগমন হইতে থাকে। এক জনের মুখের অন্ন দশ জনে লয় বণ্টন করিয়া। অভাব-অনটন ঘরের ভিতর দিয়া দিন কাটে এক দুঃশান্তিকর দুর্ভোগে। ব্যাধি হয় নিত্যসঙ্গী, মৃত্যু থাকে দুয়ারে হানা দিয়া বসিয়া।

মধ্যবিত্তের ঘরেও অবস্থা ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু উন্নত নয়। একজন সঙ্গতিপন্ন হইলে দশ জন তাহার স্কন্ধে ভারোহণ করিয়া তাহার সঙ্গতি নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা কালব্যাজ করে না। অর্থী-প্রত্যর্থী আশ্রিত-অভ্যাগত এবং তথাকথিত অতিথির দলে ব্যয়ের পরিমাণ আয় ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া যায়। জননী ষষ্ঠী দেবীর কৃপায় ঘরে পরিবার-সংখ্যাও নিত্য বাড়িতে থাকে। এক একটি ছোট বাড়ীতে বিশ-পঞ্চাশ জন বাস করে, রৌদ্র-বাতাস সঙ্কুচিত হইয়া দূরে পলায়ন করে, এক ঘরে এক শয্যায় ঠাসাঠাসি করিয়া শুইয়া বসতে করিয়া তোলে অন্ধকূপ, নড়িবার কাহারও স্থান নাই, ক্রীড়াকৌতুক ব্যায়ামের অবকাশ নাই, মানসিক বা দৈহিক কোনো নীতির বালাই নাই। হাঁটিতে শিখিলে ছেলে-মেয়েদের দিন কাটে পাড়ায়, নয় ত রাস্তায় অপসঙ্গে অপশিক্ষায়। বাপেরা থাকেন কর্ম্মস্থলে, মায়েরা থাকেন গৃহকর্ম্মে বিব্রত। দ্বিপ্রহরে ক্লান্ত শ্রমথিন্ন দেহে কেহ বা বিশ্রামোৎকণ্ঠিত, কেহ বা নিদ্রা বা আলস্যে অভিভূত। ঘরের ভিতর শিশুদের প্রচণ্ড চীৎকার দাপাদাপি সংস্কৃতার সীমা ছাড়াইয়া ওঠে—মুখের আধ ভাত না ঘুচিতে ঘুচিতে কেহ বা যেন স্কুলে পাঠাইয়া কেহ বা যেন পাঠশালায়, সেখানে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর তাড়নায় ও সুশিক্ষায় শিশুর স্বাস্থ্য ও ঘরের শান্তি অদূর-রূপে দিন দিন বাড়িয়া চলিতে থাকে!

বীজ-বপনের আগে মাটি তৈয়ারি করিতে হয়, সন্তান-জন্মের পূর্ব্বে জননী। মাতার দৈহিক অসুস্থতা, ব্যাধি, দুর্ব্বলতা ও অকালমাতৃত্বের ফলে কত শিশু ও জননী যে কালকবলিত হয় তাহা কে বলিবে। উপযুক্ত কালেও যাহারা সন্তানের জননী হয়, বৎসরান্তে পুনঃপ্রসবে অকালে তাহাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে। দেহে শক্তি নাই, ধমনীতে রক্ত নাই, চক্ষে জ্যোতি নাই, শীর্ণকায় হৃদ্‌যন্ত্র বিকল—তবু সন্তান জন্মের বিরতি নাই। অভাগিনী জননী একটিকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আরেকটিকে ঘরের ডালি সাজাইয়া দিতে থাকেন।

অনেক অসভ্য জাতির ভিতর ভূতপ্রেত রাক্ষসাদির পূজা প্রচলিত আছে। সমস্ত প্রাচ্য দেশের অন্তঃপুর জুড়িয়া যে দেবতা সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূজিত—তিনি হইতেছেন গ্রাম্য কুসংস্কার। মুসলমানের মূর্খতার ও অজ্ঞতার পরিবর্জনায় তাঁহার মূর্তি গঠিত। প্রতাপ তাঁহার অপরিসীম, প্রভাব অপরাহত, নির্দেশ অবিসম্বাদিত। নবপ্রসূত ও প্রসূতির উপর তাঁহার বিধান কঠোর ও অনুলঙ্ঘনীয়। একজন সুস্থ লোক যে অনিয়ম-অত্যাচার সহিতে পারে না, নবপ্রসূতির অবস্থা অনেক জায়গায় তদপেক্ষা শতগুণ শোচনীয় দেখা যায়। পুরুষের এখানে কোনো কথা বলিবার অধিকারই নাই, মেয়েদের এই শাস্ত্রের কাছে তাঁহারা নতশির। বাড়ীর প্রাচীনারা যখন বলেন প্রসূতিকে দর্শন করা নিষেধ, স্পর্শ করা নিষেধ, ডাক্তার-কবিরাজ দেখানো নিষেধ, ঘরে রাখা বা আনা নিষেধ, উপযুক্ত পরিষ্কার এবং শয্যাদি দেওয়া নিষেধ,—তখন বহু বিদ্যার উৎকলে এমন পুরুষ নাই যিনি সেই মতামতে উন্নয়ন করিতে সাহসী হন। প্রসূতি অল্প-বিকারে বা রক্তপাতে অচেতন, ছেঁড়া কাঁথা ও ছেঁড়া কাপড়ে তাহাকে বাড়ীর এক প্রত্যন্তদেশে মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সব আসা বহিয়া বসিয়াছেন, পল্লীগ্রামে এ দৃশ্য বিরল নহে। শুধু পল্লীপ্রদেশে নয়—সহরের উপরেও সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে, ব্যবসায়ীদের ঘরে, নিম্নশ্রেণীর ঘরে অবস্থা একই। ট্রাডিশানটা শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসায় ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রাম্য ও সহরের সমাজে সমভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া হিন্দুর সনাতন ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছে। শ্রুতি স্মৃতি মনু পরাশর সকলের উপরে তাহার আসন,—মানবতার সকল দাবীর উপর তাহার দাবী।

সুরাসুরে যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানে অসুর বধ না হওয়া পর্য্যন্ত মহেন্দ্রের আসন নিষ্কণ্টক হয় না। শিশুমৃত্যু ততদিন নিবারিত হইবে না যতদিন জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতি ও শিশুপালনের জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে প্রচারিত না হইবে, অজ্ঞতা কুসংস্কার বিদূরিত না হইবে, তরুণ জনকজননীরা সন্তান সম্বন্ধে আপনাদের গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি না করিবেন। বিষবৃক্ষের মূল যেখানে, সংহারের কুঠার সেইখানে সর্ব্বাগ্রে নিপতিত হওয়া প্রয়োজন।

সর্ব্ববঙ্গ মুসলিম্ ছাত্রসম্মিলনীর প্রতি সম্বোধন

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েছে। তাই অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আত্মের আশায় অন্যায় যা কিছু গ'ড়ে তুলি তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভচেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হ'য়ে দেশকে আহত করচে। আত্মীয়কে আঘাত করার আত্মঘাত যে কি সর্ব্বনেশে সে কথা বুঝেও বুঝিনে। যে-শিক্ষা লাভ করচি ভাগ্য-দোষে সেই শিক্ষাই বিকৃত হ'য়ে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের অস্ত্র জোগাচ্চে।

এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তা'র নিঃশ্বাস রোধ ক'রতে প্রবৃত্ত এ পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্দ্ধক্য যাবার সময় হ'ল। তা'র প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েচে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখ পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হ'য়ে যাক্ নিঃশেষে ভস্মসাৎ। বহু যুগের পুঞ্জীকৃত অপরাধ যখন আপন প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করে তখন তা'র রূপ অতি কঠোর,—এই দুঃখের দ্বারাই অপরাধ আপন বীভৎসতার পরিচয় দিয়ে উদাসীন চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। একান্ত মনে কামনা করি এই দুঃসহ পরিচয়ের কাল যেন এখনি শেষ হয়, দেশ যেন আত্মকৃত অপঘাতে না মরে, বিশ্বজগতের কাছে বার বার যেন উপহসিত না হই।

আজ অন্ধ অন্ধরাত্রির অবসান হোক্ তরুণদের নব-জীবনের মধ্যে। আচার-ভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্ম্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরত্বের উত্তীর্ণ হ'য়ে তারা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক্। যে দুর্ব্বল সে-ই ক্ষমা ক'রতে পারে না, তাকেই বলিষ্ঠ উদার্য্য সকল প্রকার কলুষের নীলতাকে নিঃস্ব ক'রে দিক্, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সর্ব্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।

—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৮

তরুণ

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

বাংলা মা'র দুর্নিবার
আমরা তরুণ-দল।
ভ্রান্তি-হীন ক্লান্তি-হীন
সঙ্কটে অটল!

গঙ্গা-রাঢ়
বীর্য্য-গরিমা—
চণ্ডীদাস অবধেবের
ছন্দ-মহিমা—
ঢেউ তাদের মেঘ মোদের
চিত্তে অবিরল!

নিঃস্বতার দৈন্য-ভার
করুব উৎসাদন ;
সংঘের পৌরুষের
পাবে প্রেরণা ;
অজ্ঞতার অন্ধকার
করুব নির্কাসন ;—
ভ্রম যোগের উদ্‌যোগের
সাধ্‌ব সাধনা।
ঘোর নিশার দুখ-নাশার
আন্‌ব দীপ উজল !
বাংলা মা'র দুর্দ্দশার
মুছ্‌ব অশ্রুজল !

ফাঁকি

শ্রী আশীষ গুপ্ত

আজ সারাদিন ধরিয়া মনটা খুসী আছে,—পরোপকারের গুণই এই,—আজ দশদ্দ দিন ধরিয়া কত পরের উপকারই যে করিলাম ! মনে হইতেছে, আমার আশপাশের লোকদের চেয়ে আমি কত বড়,—ইহাদের অপেক্ষা আমি কত ভালো ! মনটা বড় খুসী আছে ;—আমি কস্‌ কস্‌ করিয়া ইংরেজীতে সাহেবের সঙ্গে কথা বলিতে পারি, কিন্তু—ব্যাপারটা কি হইয়াছিল তাহাই বরঞ্চ আগে বলিব।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠিয়া, মুখহাত ধুইয়া রোজই প্রাতর্ভ্রমণ করিতে যাই,—শুনিয়াছি, স্বাস্থ্য না কি তাহাতে ভালো থাকে। পৃথিবীতে বেশীর ভাগ কথাই ত শোনা কথা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গোচরীভূত ব্যাপার আর কয়টা ? লোকে বলে, বৈকালে বেড়াইলে মন প্রফুল্ল থাকে, সকালে ভ্রমণ করিলে স্বাস্থ্যসঞ্চয় হয়,—আমি বলি, হইবেও বা, এত লোকে যখন বলেন। সকাল বেলা লাঠিহাতে বালাপোষ গায়ে হন্‌ হন্‌ করিয়া বেড়াইতে বাহির হই, অপরাহ্নেও আবার লাঠি ও বালাপোষের বোঝা বহিয়া মরি ! কল্পনা করিতে চেষ্টা করি, সকালবেলা আমার স্বাস্থ্য সঞ্চিত হইতেছে, এবং বিকালবেলা আমার মন প্রফুল্ল হইতেছে !—এক একদিন অবশ্য বাড়ী ফিরিয়া মনে হয়, কল্পনাশক্তি বেশ পাকিয়া উঠিল, এবার শেষ কথাগুলায় কোনপ্রকারে মিল করাইতে পারিলেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিব।

এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে প্রত্যেক মানুষেই অল্পাধিক পরিমাণে কবি। আমাদের ভিতর বেশীর ভাগ লোকের ভালোলাগা মন্দলাগার মধ্যে সত্যের চেয়ে মিথ্যার পরিমাণ বেশী,—এসব ক্ষেত্রে অপরের উক্তি আমাদের মনে সম্মোহনের কাজ করে। আজ যদি বাসী লুচি খাওয়া আভিজাত্যের নিদর্শন স্বরূপ গৃহীত হয়, কিংবা বাসী ইলিসমাছ ভাজা আহার করা ধনীর লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে কাল শুনিব, বাসী লুচি লাগ্‌লি, এবং বাসী ইলিসমাছ ভাজা টপিং। অথচ দুইটা জিনিষই বেমালুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু প্রাতে ও অপরাহ্নে বায়ুসেবন করিতে যাইতেছি, এবং লোকমতের মর্য্যাদায় খাতিরে আমার স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা দুইই সমান পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছে।

সকালের ভ্রমণ সারিবার জন্য কাপড়-জামা বদ্‌লাইয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছি, এমন সময় রাস্তায় সাক্ষাৎ মিলিল একটি নয় কদাকার শিশুর। মসীকৃষ্ণ তাহার গায়ের রং, মুখখানা ফুলিয়া গোল হইয়া উঠিয়াছে, পেটটা জয়ঢাকের মত—যেন তিনটা ভুবন গ্রাস করিয়া ছেলেটা বসিয়া আছে।

উলঙ্গ শিশু একবার অত্যন্ত ধীরে ডাকিল, "মা—"

মনে হইল, ওই ছেলেটা অনেক দূরের যাত্রী, বহুদূর হইতে ও আসিয়াছে, বহুদূরে ও যাইবে, তাহারই মাঝে এ যেন ওর ক্ষণিকের বিশ্রাম ! সে আবার ডাকিল, "মা—"

কত শ্রান্ত ওর মুখ, কত ক্ষীণ, কত মৃদু! যেন ভরসা করিতে পারিতেছে না,—এ ডাকে সাড়া মিলিবে কি না ও বোধ হয় জানে না, তাই ওর কণ্ঠ দ্বিধাবিজড়িত,—কিছু বিশ্বাস করা চলে না। ভাবিলাম, পাশের বাড়ীর দাসীর সন্তান হয়ত ও। ওর মা ও বাড়ীতে কাজ করিতে ঢুকিয়াছে, রাস্তায় বসিয়া ছেলেটা হয়ত তাহাকেই ডাকিতেছে। ফিরিয়া আসিয়া কয়েকটা পয়সা লইয়া গিয়া বলিলাম, "নাও—"

সে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, হাত বাড়াইল না, শুধু কিছুক্ষণ পরে ডাকিল, "মা—"

এবার শব্দ ক্ষীণতর। বুঝিলাম, যে ধাত্রী বহুদূর হইতে আসিয়াছে, এবং বহুদূরে যাহার নিশানা, তাহার ক্ষণকালের বিশ্রামশেষে সে আবার তাহার যাত্রা সুরু করিয়াছে।

পুনর্ব্বার কহিলাম, "নাও—"

এবার সে হাত পাতিল, পয়সা কয়টা তাহার প্রসারিত হাতের উপর ফেলিয়া দিলাম। সে খুসী হইল কিনা, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না।—আমি কিন্তু আত্ম-প্রসাদে পূর্ণ হইয়া উঠিলাম,—আহা আমি কত মহৎ, পরের দুঃখে আমার প্রাণ কাঁদে, সকালবেলা উঠিয়াই আমি পরোপকারে ব্রতী হই! লাঠিটা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা লইবার জন্য পুনরায় গৃহপ্রবেশ করিলাম। অত সকালেই জ্যেষ্ঠ ভাগিনের অঙ্ক কষিতে বসিয়াছিল। কাল দ্বিপ্রহরে অঙ্ক ভুল করার জন্য আমার কাছ হইতে একটু গুরুতর মাত্রায় প্রহার লাভ হইয়াছে; সেকথা সম্ভবতঃ স্মরণ ছিল, আজ দ্বিপ্রহরেও যাহাতে সেরূপ কোনও অঘটন না ঘটে, তাহারই জন্য শ্রীমান অত প্রত্যূষে অঙ্ক লইয়া বসিয়াছিলেন! —দেখিয়া শুনিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে, আমি অঙ্ক কিছুমাত্র জানি না, বিশেষ করিয়া ভাগ্নের ফ্র্যাক্‌শান্ কিছুমাত্র বুঝি না, এবং কি করিয়া অঙ্ক দেখিতে হয় ও ছাত্র পড়াইতে হয় সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই। অপর পক্ষে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, এই ছেলেটি একটি উচ্চ-শ্রেণীর গর্দ্দভ, এবং ইহাকে দিয়া ভারবহন কার্য্যও ঠিকমত চলিতে পারে কিনা, তাহাও চিন্তার বিষয়।

আমাকে দেখিয়াই শ্রীমান বলিলেন, "বড়মামা, দেখ দিকিনি এই অঙ্কটা একবার।"

অঙ্ক দেখিতে করেক মিনিট বিলম্ব হইল, এবং যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল, অর্থাৎ অঙ্ক ঠিক হইল না! বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

দরজার কাছে রাস্তার উপর সেই শিশু শুইয়া আছে,—মরণার সঙ্গে কাছে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! নিজের চতুষ্পার্শ্বে একটা কদর্য্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া সে যেন নিরুদ্বিগ্ন হইয়া আছে, যে আর কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না! তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে কিনা তাহা বুঝিলাম না,—হাতের পয়সা সে মুঠা করিয়াও ধরে নাই,—খোলা হাতের মধ্যে পয়সা কয়টা পড়িয়া আছে মাত্র।

তাহার কাছ হইতে অত্যন্ত নিরাপদ দূরে আমাদের পাড়ার ভদ্র ব্যক্তিরা জড়ো হইয়াছেন। একজন কহিলেন, "মরে' গিয়েছে বোধ হয়—"

শ্যামলাল কহিলেন, "গলার কাছটা একটু নড়ছে,—মরে নি, কিন্তু হ'য়ে এল—"

মুখুয্যে মশাই বলিলেন, "আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীর সাম্নে সেদিন এক ভিখারী ছোঁড়াকে এম্‌নিতর মরে' থাকতে দেখেছিলাম—"

ঘতীন কহিলেন, "কিন্তু বেশীক্ষণ এরকম অবস্থায় থাকলে পাড়ায় এপিডেমিক লাগবে—"

মুখুয্যে মশাই বলিলেন, "ধাঙড় ডাক্‌বার বন্দোবস্ত কর, টেনে নিয়ে যাক্, নইলে ক্যালাদ বাধ্‌বে—"

আমার মনে হইল, ইহারা অত্যন্ত ছোটশ্রেণীর জীব—ইহাদের ক্ষুদ্র গৃহে, ক্ষুদ্রতর অন্তঃকরণ লইয়া এই মানবকুল বাস করে। পরের দুঃখে বেদনাবোধের ক্ষমতা যাহার যত প্রচুর এবং আন্তরিক, মানুষ হিসাবে সে যে ঠিক তত খানি বড়, এই কথা যদি ইহাদের শুনাইতে যাই, তাহা হইলে আমার ভাগিনেয়কে ভাগ্নের ফ্র্যাক্‌শান শিখানর চেষ্টার মতই সেটা একান্তভাবে ব্যর্থ হইবে। ইহারা মনে করিবে আমি একটা অর্ব্বাচীন, এবং আমি মনে করিব ইহারা অমানুষ। আমাদের দরজার সাম্নে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।—ছেলেটার চতুর্দ্দিকে ভিড় জমিতে লাগিল, নাকে কাপড় দিয়া খোনা খোনা সুরে তুমুল আলোচনা চলিতে লাগিল। পূর্ব্বাচলের সূর্য্য আমাদের

বাড়ীর সম্মুখের বড় মাঠের নারিকেল গাছগুলার ফাঁক দিয়া হঠাৎ চোখে আসিয়া পড়িল,—ভিড়ের মাঝে আসিয়া বলিলাম, "গ্র্যাম্‌বিউলান্স অফিসে খবর দিন—"

সমস্বরে সকলে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, সেই সবচেয়ে ভালো, ধাঙড় আস্‌তে দেরী হ'তে পারে—"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে কাদের বাড়ী কোন্ আছে ?"

মুখুয্যে মশাই আমাদের পাড়ার মাতব্বর বাসিন্দা,—এই উল্লাটের সমস্ত সংবাদ তাঁহার নখদর্পণে। লোকের বিপদে আপদে বুক দিয়া পড়িয়া সাহায্য করিতে তাঁহার জুড়ি নাই। আমি তাঁহাকে কোমর বাঁধিয়া বারোয়ারী পূজার চাঁদা সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি ;—সেবার পূজার সময় তিনি যে রকম অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার ন্যায় মহৎ পরহিতব্রতী মহাজনের পক্ষেই সম্ভব! আমি চাঁদা দিয়াছিলাম মাত্র দুই টাকা,—শুনিয়াছি সেইজন্য তিনি আমার অসাক্ষাতে আমাকে ধিক্কার করিয়াছিলেন যে, আমি আড়াইশ' টাকা দামের খাল গায়ে দিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাই, অথচ চাঁদার বেলায় দুই টাকার উপরে উঠি না! আমাকে ধিক্কার করিয়াছেন বলিয়াই যে মুখুয্যে মহাশয় লোক মন্দ, একথা বলিব না। তাঁহার নিজের যথেষ্ট টাকা আছে, আমাদের এই পাড়াতেই খান তিনেক বাড়ী আছে, এবং মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় সম্পত্তি—মহৎ, দরদী হৃদয়—তাহা তাঁহার আছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে মুখুয্যে মশাই বলিলেন, "কলুপাড়ার কাঠের গোলা থেকে কোন্ কথা যেতে পারে—"

তাঁহার সহিত কলুপাড়ায় চলিলাম,—আমাদের বাড়ী হইতে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। কাঠের গোলার সম্মুখে পৌঁছাইতেই দেখি শ্রীমান সন্তোষ ডাইনে বাঁয়ে, সম্মুখে পিছনে, মাটির দিকে এবং আকাশের পানে তাকাইতে তাকাইতে আসিতেছে। কহিলাম,—"সন্তোষ, এতকাল পরে যদি বা এলে, এত বড় একটা রোগ নিয়ে এলে ভাই ?"

অকস্মাৎ এরূপভাবে সম্বোধিত হইয়া সন্তোষ চমকাইয়া উঠিল, পরে আমাকে দেখিয়া উল্লাসের সুরে কহিল, 'কাল এসে একচোট বাড়ী খোঁজার পালা হ'য়ে গিয়েছে বেলা একটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত,—আর একেবারে সকাল থেকেই দেখেছি,—আজ আমগায় এসে বাড়ী করেছেন কিন্তু জামাইবাবু—বা-চ-ক, কালঘাম ছুটিয়ে ছেড়েছে—"

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় বলিল, "কিন্তু অসুখের কথা কি বল্‌ছিলেন ?"

কহিলাম, "তুমি তোমার ঘাড়টা যে রকম ঘন ঘন চারদিকে ঘোরাচ্ছিলে, তাতে মনে হচ্ছিল যে, অন্য কারও ধারকরা গলা নিয়ে কাজ চালাচ্ছ, ও জিনিষটা কি তোমারই ?"

সন্তোষ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "চলুন, চলুন, বাড়ী চলুন—"

কাঠগোলার দরজার সাম্নে দাঁড়াইয়া মুখুয্যে মহাশয়কে বলিলাম, "আপনি ফোন্‌টা করে আসুন মুখুয্যে মশাই, আমি ততক্ষণ ওর সঙ্গে একটু কথা কই—"একটু হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "বুঝ্‌তেই ত পার্‌ছেন, প্রথমতঃ বড়কুটুম, দ্বিতীয়তঃ অনেককাল পরে দেখা—"

মুখুয্যে মহাশয় ফোন্ করিতে গেলেন ; রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমি সন্তোষের সঙ্গে কত কথা যে আরম্ভ করিলাম। সকলের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাহাদের বেশীর ভাগকেই আমি দেখি নাই,—নাম শোনা আছে মাত্র, যদিচ সে নামও আবার সকল সময়ে মনে থাকে না! সন্তোষ কহিল, তাহার দাদার শ্বশুরের ভালক পীড়িত হইয়া আল্‌মোড়া গিয়াছেন—। শুনিয়া,সেই ভদ্রলোকের স্বাস্থ্যের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা রহিল না। মুখ কাতর করিয়া, কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া কহিলাম, "ভারী দুঃখের ব্যাপার!—অসুখটা কি ?" সন্তোষ কি যেন জবাব দিল। পথের ধারের নূতন বাড়ীর সম্মুখটা ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শ অনুসারে তৈরী হইতেছে ; —ভারতীয় স্থাপত্য যে কাহাকে বলে, এবং কি তাহার বিশেষত্ব,আমি তাহার কিছুই অবগত নই,কিন্তু তথাপি বাড়ীটা দেখিয়া আমার মনে হইল ভারতীয় স্থাপত্য নিশ্চয়ই এই ধরণের হইবে ;—আমি সেই বাড়ীর দিকে তাকাইয়াছিলাম,

সন্তোষের উত্তর আমার কানে প্রবেশ করিল না। কিন্তু সংসারের সবার জন্য আমার ভাবনা,—আমি সকলেরই মঙ্গলকামনা করি ;—অকস্মাৎ মনে হইল,আমি কত ভালো ! মুখুয্যে মহাশয়ের কোন কন্যিতে যাওয়ার কথা আমার স্মরণ ছিল না ; মনচিত্তে সন্তোষের সহিত গল্প করিতে করিতে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিয়াছিলাম,—মুখুয্যে মশাই পিছন হইতে আসিয়া নীরস ভাবে হাসিয়া টানিয়া টানিয়া বলিলেন, "ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছি,—কোন কম্মতে লাগ্‌ল চার আনা, র‍্যাম্‌বিউল্যান্সের কোন আছে ছুটো,—প্রথমে যেটার খবর দিলাম, তারা বল্‌ল অন্যটাতে খবর দিন—" আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেই জন্যেই লাগ্‌ল চার আনা, পয়সাটা আপনি আমায় দেবেন কিন্তু- "

পরে একটু ভাবিয়া তাঁহার বাবীটাকে পাকা করিবার জন্যই বোধ হয় বলিলেন, "কোন্নের কথা আপনিই প্রথমে বলেছিলেন কিনা—" বলিয়া একটু হাসিলেন।

কহিলাম, "চলুন, বাড়ী গিয়ে দিচ্ছি।"

সন্তোষকে লইয়া বাড়ীতে পৌঁছাইলাম।—ছেলেটার চারপাশের ভিড় তখনও সেই রকমই রহিয়াছে। মুখুয্যে মহাশয় আসিয়া আমাদের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমাকে বলিলেন, "পয়সা চার আনা এখুনি দিলে বড্ড ভালো হয়,—আমি আবার বাজারে যাব কিনা—"

র‍্যাম্‌বিউল্যান্স আসিল,—ছেলেটাকে গাড়ীতে তোলা হইলে পর ড্রাইভারকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একে কোথায় নিয়ে যাবে ?"

ড্রাইভার পরা কালো সাহেব জবাব দিল, "কানপুর, — রাস্তার ডিস্পেন্সারীর আলো সেইখানেই নিয়ে যাই।"

র‍্যাম্‌বিউল্যান্স চলিয়া গেল।—আমার প্রাতর্ভ্রমণ আর আর হইল না,—কিন্তু তবুও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, —আমাদের পাড়ার সকল লোকের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ ! আমি একটি পথের কুকুরের জন্য চার আনা খরচ করিয়াছি, তাহাকে দুই আনা দান করিয়াছি, তাহার জন্য একটা সকাল বায়ুসেবন করিতে যাই নাই। উদ্যোগ আয়োজন করিয়া আমিই তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইলাম, যদি বাঁচে তবে আমার কৃপাতেই বাঁচিবে। বারংবার ভাবিতেছি, আর কেহ হইলে এতটা করিত না, কিন্তু আমি করিয়াছি ! আমি কত ভালো !—আমি সাহেবের সঙ্গে কষ্ ফট্ করিয়া ইংরেজীতে কথা কহিতে পারি,—সেই জন্যই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া মন অত্যন্ত খুসী আছে ;—পরোপকারের গুণই ওই ! অথচ সন্তোষ বলিতেছে, সহানুভূতির অভাবে, সহানুভূতির অভাবে ফাঁকির ছুটা দিয়া মানুষের চরিত্রগত মাধুর্য্য নিঃশেষিত হইয়া গেছে,—পৃথিবীতে তাই আজ কলরব, তাই বাদ-বিসংবাদ, তাই এত মিথ্যাচরণ। কথাটা সন্তোষ আমাকে বলে নাই,—আমার, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুজ্ঞর সহিত তাহার একটা গুরুতর আলোচনা চলিতেছে, —সেই সূত্রে সে টেবিলের উপর এক ঘুসি মারিয়া অনেক কথা বলিল, তাহারই কিছু কিছু আমার কানে আসিয়াছে, —সেই জন্যই ভাবিতেছি—।

বিরাটের ক্ষুদ্রতা

শ্রী প্রমথনাথ কুণ্ডার

হে বিরাট, বক্ষে তব, ক্ষুদ্র – তার সাড়া
বাজিবে না কভু ? ক্ষুদ্র—সে কি, হরষারা
নানা ছেঁড়া ফুল সম লুটাবে ধূলায় ?
কোন ক্ষণে কেহ আসি' যদি করুণায়
লয় তুলে', তাই ভাবি' নিচুপ চাহিয়া
ধূলা কি গণিবে দিন ?

—ভাবিছ বসিয়া,
কে তারে কুড়ায়ে লবে ? তুমি জানো ভালো,—
অমন ধূলায় ফুল কত-যে শুকালো
যুগ-যুগান্তর ধরে'।

দেহের পরিধি
মাপিতে চাহে না মন। ভিন্ন তার বিধি!
ইন্দ্রিয়ের-দুই ল'য়ে দেখে শুধু এসে
কতটুকু ছিল প্রাণ অন্তরের দেশে।
সত্যের সে বীজমন্ত্র আকাশে বাতাসে
সতত ধ্বনিয়া উঠে,—"বহো যাত্রী আসে
রেখাকার খেয়াঘাটে, তাহাদের সনে
আপনারে যুক্ত কর নিবিড় বন্ধনে,
'অমৃত-সন্তান' সবে নাহি ব্যবধান,—
প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে সবাই সমান।"

হে বিরাট, হে সঙ্কীর্ণ, এ ধরায় যাও
যে-যত বৃহৎ—তার তত বড় কাজ।
আজি তুমি ক্ষুদ্র ভাবি' দূরে রাখো যারে
ধরণী জাগিবে তার কালের প্রবাহে
বিশাল বিপুল হ'য়ে। সেই সঙ্কিক্ষণে
সে বিস্ময় সহিবে কি তোমার নয়নে ?
তোমার সকল গর্ব্ব, সব স্ফীতি, বল,
সব কিছু সেদিন কি হবে না বিফল,
মিলাবে না ধূলিসাথে— বিধাতার বরে
বিন্দু-বিন্দু বারিপাত পর্ব্বত-শিখরে
যেমন মিলায়ে দেছে ? সেদিন তোমারে
গড়ায়ে ধরিতে হবে অই ক্ষুদ্র—তারে !

নাহি দেখা দিতে নব প্রভাতের রবি,
দিবার কাহিনী পুনঃ না রচিতে কবি,
যেমন রয়েছে বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা,
ঊর্দ্ধপানে চেয়ে দেখ,—অই সীমাহারা
অনন্ত আকাশ। ক্ষুদ্রে না করিয়া পর,
সেই মতো হে বিরাট, হও বৃহত্তর।

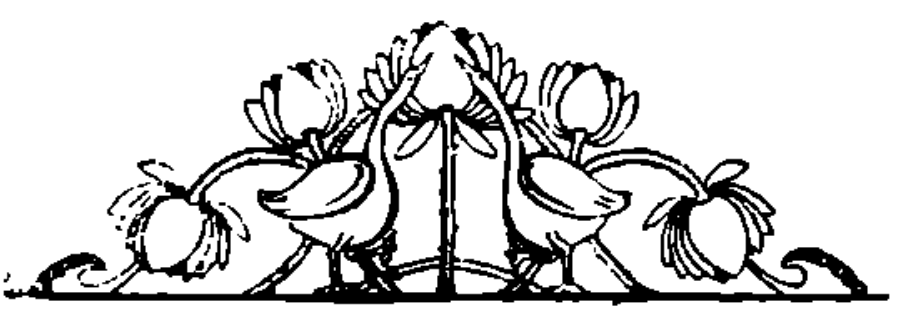

সিমলা টুটিকাণ্ডি আর্য্যনারী সমিতি

এই সমিতি ১৯২৩ সালের ১৭ই জুন শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে সরোজনলিনী কেন্দ্র সমিতির সহিত যুক্ত হইয়াছে।

সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য পরস্পর মেলামেশা, নানা বিষয়ের আলোচনা, নানারূপ জীবনী পাঠ এবং সকলের মিলিত চেষ্টায় সাধ্যমত কাজ করা। সমিতির অর্থভাণ্ডার হইতে বিধবা, অনাথ ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করা, ইত্যাদি।

সমিতির বর্ত্তমানে সভ্যাসংখ্যা ১৯ জন, এবং এই সমিতির দ্বারা পরিচালিত "বালকা-বালিকা সমিতি"র সভ্য-সংখ্যা ২০ জন। মন্ত্রণাসভার সভ্যা ৫ জন। সম্পাদিকা শ্রীমতী নলিনীবালা সেন। সহকারী সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলিমা দাসগুপ্ত, শ্রীমতী পঙ্কজিনী বসু, শ্রীমতী রাধারাণী বিশ্বাস, এবং শ্রীমতী ললিতা মজুমদার।

জনসেবার কার্য্যে সমিতি বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। পাড়ায় কেহ অসুস্থ হইলে সমিতির সভ্যাগণ একটা সময় ঠিক করিয়া রোগীর পরিচর্য্যার ভার লেন। প্রসব-সময়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন।

পরস্পর মেলামেশা করা সমিতির উদ্দেশ্য এবং ইহার উপকারিতা বুঝাইয়া নারীদিগকে যোগদান করিতে বিশেষ চেষ্টা করা হয়, এবং অন্যান্য পল্লীতে যাহাতে সমিতি স্থাপন করা হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা হয়।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে কোন মৌখিক উপদেশ দিবার লোক আমরা পাই না। পুস্তকাদি পাঠ করিয়া যতটুকু বুঝি, সাধ্যমত সকলেই তাহা পালন করিয়া থাকি। আগামী বৎসর হইতে স্থানীয় ডাক্তার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে মাসে একবার করিয়া উপদেশ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গৃহশিল্প শিক্ষা দিবার জন্য কোন শিক্ষয়িত্রী নাই। পরস্পরের মধ্যে যিনি যাহা জানেন সকলকে শিখান।

মাটির পুতুল, কাগজের ফুল, কাপড়ের বালা, এম্‌ব্রডারী, উলের কাজ, চটের আসন, সুতলীর আসন, কাঁথা, বাহুর ঝাঁপের কাজ, ছবিতে কাপড় পরান এবং কিছু কিছু ছবি আঁকা শিখান হয়। "বালক-বালিকা সমিতি"কে বিশেষ করিয়া এগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়, এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। ২।৩ জন সভ্যা চরকা কাটিতে পারেন। অল্প মূল্যে তেড়ার লোম কিনিয়া তকলীতে সূতা কাটিয়া বুনাইয়া লইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ লাভ হয়।

সভ্যারা ব্যবহারোপযোগী কাপড়—ধুতি সার্ট, পাঞ্জাবী, সেমিজ, পেটীকোট, বডিস, ব্লাউজ, পাজামা, বেনিয়ান, ফ্রক এবং পশমের সোয়েটার, জার্সি, মোজা, কোট, গলাবন্ধ, টুপী, সবই স্বহস্তে প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক সভ্যাই গড়ে মাসে ৫।৬ টাকা দর্জ্জির খরচ বাঁচাইয়া থাকেন। সমিতিতে বৎসরে একবার সেলাই বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে, লভ্যাংশ ১ ভাগ সমিতির অর্থভাণ্ডারে জমা হয়, ২ ভাগ প্রস্তুত-কারিণী পাইয়া থাকেন। ইহাতে ৪।৫ টাকা হইতে কেহ কেহ ১৫।২০ টাকা লাভ পাইয়া থাকেন। সেলাই বিক্রয়ের তেমন সুবিধা নাই। সেলাইয়ের জন্য সমিতি হইতে অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়, পরে কাটিয়া লওয়া হয়।

এ বৎসর সিমলাতে যে শিল্পপ্রদর্শনী হইয়াছে তাহাতে সমিতির সভ্যাগণ নিম্নলিখিত ভাবে পুরস্কার পাইয়াছেন—(১) কুমারী রেণু রায়, বয়স ১১ বৎসর, ওয়াটার পেন্টিংএ প্রথম পুরস্কার সোনার মেডেল, বালিকা বিভাগে সেলাইএর দ্বিতীয় পুরস্কার রূপার মেডেল, এবং মাছের আঁশের সাজি ও ছবিতে কাপড় পরাইবার জন্য প্রশংসাপত্র; (২) কুমারী রেণু সেন, মাটির কাজ এবং মসপেন্টিংএ প্রশংসাপত্র; (৩) কুমারী কমলা সেন, বয়স ১০ বৎসর, বালিকা বিভাগে এম্ব্রয়ডারীর জন্য প্রশংসাপত্র; কুমারী ছবি ঘোষ, বয়স ১০ বৎসর, সুতলীর আসনে প্রশংসাপত্র; (৫) শ্রীমতী সুধাময়ী সেন, ছাটকাটের জন্য প্রশংসাপত্র; (৬) শ্রীমতী নীলিমা দাস গুপ্তা, ছাটকাটের জন্য প্রশংসাপত্র; (৭) শ্রীমতী নীরজনলিনী ঘোষ, সূতা দ্বারা প্রস্তুত পাখার প্রশংসাপত্র; ৮) শ্রীমতী রাধারাণী বিশ্বাস, এম্ব্রয়ডারীর জন্য প্রশংসাপত্র; (৯) শ্রীমতী পদ্মাজনী ধর, তাঁবার সোনার মেডেল; (১০) শ্রীমতী নলিনীবালা সেন, এম্ব্রয়ডারীর প্রথম পুরস্কার সোনার মেডেল এবং দ্বিতীয় পুরস্কার রূপার মেডেল এবং ৩ খানা প্রশংসাপত্র।

সমিতির অধিবেশনে দেশের কথা, কি করিয়া সমিতিকে উন্নত করা যায়, শিশুপালন, ব্যায়াম, কিছু ধাত্রী-বিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা এবং পাঠ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নানারূপ জীবনী পাঠ হয়া থাকে। সমিতির স্থায়ী কোন গৃহ নাই এবং করাও অসম্ভব। প্রতি সপ্তাহে এক একজন সভ্যার গৃহে অধিবেশন হয়। যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন হয় না, সকলেই হাঁটিয়া যাওয়া-আসা করেন।

সমিতিকে উন্নত করিবার জন্য আমরা উৎসাহ পাইয়া থাকি। যাঁরা বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয়া লেডী বি,এল,মিত্র মহাশয়া, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী এবং শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। মহারাণী ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ২০৲ টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং 'সরোজনলিনী' পুস্তকখানি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন সভ্যার মাতা বা ভগিনী বেড়াইতে আসিয়া ২৲ টাকা ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কৃষি বা গোপালন সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, এবং এদব দেশে তাহা সম্ভবপর হয় না।

ব্রাহ্ম, হিন্দু, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের মহিলাগণ এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রী নলিনীবালা সেন,
সম্পাদিকা

রাজবালা মহিলাসমিতি

সমিতি স্থাপনের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভূষিভূষণ দত্ত মহাশয় ও কয়েকজন ভদ্রমহোদয়ের চেষ্টায় ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসের শেষভাগে স্থানীয় ভদ্রমহিলাদিগকে লইয়া ৩৯নং গিরিশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত গিরিশভবনে স্বর্গীয় গিরিশ মুখার্জ্জি মহাশয়ের পৌত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসবাটীতে একটি সভার অধিবেশন হয়। সরোজ-নলিনী নারীশিক্ষা সমিতির সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী উক্ত সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি বিশদ বক্তৃতা করিয়া সকলকে উক্ত সমিতিতে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মহিলাগণ যাহাতে সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আত্মীয়স্বজনকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যৎকিঞ্চিত জ্ঞানলাভ করতঃ নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারেন, ইহাই মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য, তাহা তিনি ভালরূপে বুঝাইয়া দেন।

১৩৩৮ সালের চৈত্র মাসের শেষে ৩৯নং গিরিশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে এই সমিতির প্রথম উদ্বোধন করা হয়,কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাস হইতেই সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়। তখন প্রায় ২৩।২৪ জন মহিলা এই সমিতির সভ্যা হন এবং তাঁহাদের মাসিক চাঁদা ১৲ করিয়া ধার্য্য হয়। এই সময় ইহাকে কেন্দ্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রকৃতি দেবী ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুরভি দেবী,এবং শ্রীযুক্তা মমতা দেবী ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুজাতা দেবী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া সমিতির সাহায্য করেন। অতঃপর ১০৲ টাকা বেতনে একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। ঐ বেতনের

টাকা অনেকদিন পর্য্যন্ত কেন্দ্র সমিতি দিয়া এই সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন। সমিতি হইতে মাত্র শিক্ষয়িত্রীর মাসোহারার ব্যয়ভার বহন করা হইত। বর্ত্তমানে সেই শিক্ষয়িত্রীকে ১০৲ টাকা বেতন ও গাড়ীভাড়া ২৲ টাকা দেওয়া হয় এবং লেখাপড়া শিখাইবার জন্য অন্য একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাকে ১৫৲ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া হয়।

সমিতির সভ্যাদিগকে লেখাপড়া, সূচিকর্ম্ম, টেলরিং, কাটছাঁট, পালার কাজ এবং তাঁতের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

মধ্যে কোন কারণে সমিতির সভ্যাসংখ্যা কম হইয়াছিল, সমিতির বর্ত্তমান সভ্যাসংখ্যা ৪৫ জন।

১৯১১ সালের ১লা আগষ্ট তারিখ সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন গিরিশভবনস্থিত পূর্ব্বোক্ত ওস্তমহোদয়ের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে মাননীয়া শ্রীযুক্তা নীরদা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। তিনি নারীর কর্ত্তব্য ও সমিতির উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং প্রত্যেককে সমিতিতে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন।

এ স্থলে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে কালীঘাটের শ্রীমতী লতিকা রায় ১৫ জন মহিলাকে আমাদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের গাড়ী ভাড়ার বাবদ ১৫৲ টাকা ও শিক্ষয়িত্রীর বেতন বাবদ ১৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক ৩০৲ টাকা সাহায্য করিতেছেন।

পরিশেষে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে সরোজনলিনী কেন্দ্র সমিতির সম্পাদিকা বাঙ্গালার নারীসমাজের আদর্শস্থানীয়া অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীমতী হেমলতা দেবীর অনুকম্পায় এই নারীমঙ্গল সমিতিটি জন্মলাভ করিয়া তাঁহারই স্নেহরসে দিনে দিনে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার প্রতি আমার ও এই মহিলাসমিতির সভ্যাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

শ্রী রাজবালা মিত্র,
সম্পাদিকা

খ্রীষ্ট মহিলাসমিতি

মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় খ্রীষ্ট মহিলাসমিতি আর একটি বৎসর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পর্য্যায় ৬ষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ করিল।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত বৎসর খ্রীষ্ট মহিলাসমিতি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহিলা-সমিতি সমূহের মধ্যে যাহার কার্য্য উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাকেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

উদ্দেশ্য:—সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য নারীজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিসাধনে সমবেত চেষ্টা। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখিয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এইবারও সমিতি নিম্নলিখিত বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন—১। জ্ঞানোন্নতি ও শিক্ষা, ২। শিল্পচর্চ্চা, ৩। প্রসূতিকল্যাণ ও শিশুমঙ্গল, ৪। সেবা, ৫। মহিলাসমিতির বিস্তৃতির জন্য চেষ্টা।

সমিতির প্রতিমাসে অন্যূন একটি অধিবেশন হইয়াছে। উপস্থিতি-সংখ্যা গড়ে ২০।২৫ জন। স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়-গৃহেই ইহার অধিবেশন হইয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ও বিশেষ বক্তৃতাদি উপলক্ষে অধিবেশন হইয়াছে।

জ্ঞানোন্নতি ও শিক্ষা

সভ্যাগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। সাময়িক পত্রিকা—বিশেষতঃ বঙ্গলক্ষ্মী হইতে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করা হয়।

আসাম প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্ট্রেস্ শ্রীযুক্তা সুশীলা সেন ২ বৎসর বিলাতে শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলে সমিতি তাঁহাকে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। মিস্ সেন মহোদয়া ঐ দেশের নারীশিক্ষার পার্থক্য ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে অতি শিক্ষাপ্রদ চিত্তাকর্ষক ৩টি বক্তৃতা করেন। সমিতির অন্যতম সভ্যা শ্রীযুক্তা প্রাণসুন্দরী দাস শারীরিক অসুস্থতার জন্য অধিকাংশ সময়ই স্থানান্তরে বাস করিয়াছেন, সমিতি তাঁহার সাহায্যার্থে

রক্ষিত হইয়াছেন ; মঙ্গলময় প্রভু পরমেশ্বর তাঁহাকে নিরাময় করুন এই প্রার্থনা। তিনি প্রবন্ধাদি পাঠ ও নানাভাবে সমিতির কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা বিজনবাসিনী দত্ত নারীদের বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়াতে সমিতির ক্ষতি হইল। বিগত বৎসর আসাম প্রদেশের হাসপাতাল সমূহের অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের পত্নী শ্রীযুক্তা রিচি মহোদয়া শ্রীহট্টে আসিলে এখানে কোন মহিলাসমিতি আছে কিনা অনুসন্ধান করেন এবং সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও সমিতির একটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাহার কার্য্য দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আমেরিকাবাসিনী মহিলা আসাম ডেপুটেশনে বহু বৎসর বাস করিয়া তথাকার মহিলাসমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক অমায়িকতা ও সেবাপরায়ণতার জন্য ডেপুটেশনবাসীর নিকট বিশেষ ভাবে আদৃত। তিনি এই মহিলাসমিতির কাজকর্ম্ম দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলেন। সমিতি হইতে একটি শিল্পদ্রব্য তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়। তিনিও সমিতিতে দশ টাকা দান করেন। খৃষ্টীয় মিশনের মিসেস্ ব্রুয়ার্টস মহোদয়া এক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া একটি বক্তৃতা করেন ও নানা বিষয় আলোচনা করেন।

সম্পাদিকা নানা স্থান হইতে বালিকাবিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যের আবেদন প্রাপ্ত হন কিন্তু অর্থাভাবে সমিতি সদস্যরূপে বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছেন না। এই বৎসর দক্ষিণ শ্রীহট্টের রাজনগরস্থ একটি বালিকাবিদ্যালয়ে মাসিক অর্থসাহায্য করা হইয়াছে।

২। শিল্পচর্চ্চা

বিগত বৎসরের বন্যায় দেশের ভীষণ ক্ষতি করিলে. লোকদিগকে সাময়িক ভাবে অর্থাদি দান করা হয় ; কিন্তু নারীদিগকে অর্থকরী শিল্প শিক্ষা দিলে তাহা দ্বারা বিশেষ ফললাভ হইবে বিবেচনায় মহিলাসমিতি সেই দিকে সচেষ্ট হন।

শ্রীহট্ট কাছাড় বন্যাসমিতি নানাভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। মহিলাসমিতির সম্পাদিকা উক্ত বন্যাসমিতির অন্যতম সভ্যা। শ্রীহট্ট বন্যা সাহায্যসমিতির অর্থানুকূল্যে মহিলাসমিতি একজন শিল্পশিক্ষয়িত্রী দ্বারা গ্রামে গ্রামে নারীদিগের শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের শিক্ষালয়ে শিক্ষিতা একজন শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ করেন। এই শিক্ষয়িত্রী চারি মাসাধিক কাল শ্রীহট্ট ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া নারীদিগকে শিক্ষাদান করেন। বিশেষ ভাবে তিনটি গ্রামেই তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। প্রত্যেক গ্রামে মাসাধিক কাল থাকিয়া শিক্ষা দেন ; তাহার ফলে ১৫।১৬টি শিক্ষার্থিনীকে বিশেষ ভাবে ছাটকাট ও সেলাই শিক্ষা দিয়াছেন। উক্ত গ্রাম সমূহ হইতে ভদ্রমহিলাগণ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়া সম্পাদিকাকে জানাইয়াছেন। আরও কয়েকটি মাস তাঁহাকে রাখার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু হঠাৎ শিক্ষয়িত্রীকে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হইল। সেজন্য কাজটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

উক্ত বন্যা সাহায্যসমিতি বন্যাপীড়িত নরনারীর মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন,এবং মহিলাসমিতির সভ্যাগণ প্রায় দুই শতাধিক জামা প্রস্তুত করিয়া দেন।

বর্ত্তমান বৎসর পূজাবকাশের পূর্ব্বে মহিলাসমিতি স্থানীয় উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়-গৃহে একটি মেলার ব্যবস্থা করেন ; ইহাতে নারীদিগের হস্তনির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। জামা, ফ্রক, সার্ট, সেমিজ, পুতুল ও নানাপ্রকার মিষ্ট দ্রব্যই প্রধান।

গ্রামবাসিনী বহু মহিলা শিল্পশিক্ষার জন্য আবেদন করেন ; কেহ কেহ শ্রীহট্ট সহরে আসিয়া সেজন্য কিছুদিন অতিবাহিত করেন। সম্পাদিকা তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

সেবা

বিগত বৎসর সমিতির প্রধান কার্য্য ছিল বন্যাপীড়িত নরনারীর সাহায্য করা। এই দুর্ঘটনা ঘটিবা মাত্র সম্পাদিকা শ্রীহট্টবাসিনী মহিলাদিগকে লইয়া একটি বন্যা-কমিটি গঠন করেন। সকলে গৃহে গৃহে গিয়া অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করেন। একখানি আবেদনপত্র মুদ্রিত করিয়া নানা স্থানে প্রেরণ করেন এবং তাহাতে আশা-

স্থানীয় জন লাভ করেন। স্থানীয় পত্রিকাসমূহে আবেদন-পত্র মুদ্রিত করেন।

সমিতি প্রায় পাঁচশত টাকা ও সেই পরিমাণ বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্র সমিতির হস্তে প্রদান করেন। যে সব মহিলাসমিতি এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভগিনীগণ অনুগ্রহ করিয়া অর্থসাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শ্রীহট্ট মহিলা-সমিতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল মল্লিক মহাশয় বিলাত হইতে বন্যা-সাহায্যের জন্য ৫০৲ টাকা সমিতির সম্পাদিকার নিকট প্রেরণ করেন। তৎকালে তিনি বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য মহিলাসমিতিতে রোগী-দিগের আবশ্যকীয় কতকগুলি যন্ত্রাদি রাখা হয়—যথা বেড্‌প্যান, ডুস, নানা প্রকার পিচকারী, রবারের থলিয়া, থার্মোমিটার ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলি দ্বারা বহু রোগীর প্রভূত উপকার হইতেছে।

৫। প্রসূতিকল্যাণ ও শিশুমঙ্গল

বিগত দুই বৎসরে অনেকগুলি প্রসূতির সেবা করা হয়। সম্পাদিকা স্বয়ং প্রায় ২০টি প্রসবকার্য্য নিজ হাতে সম্পন্ন করেন। অনেক রোগীর শুশ্রূষা করা হয়। প্রসূতি-কল্যাণ ব্যাগ—সমিতির সভ্যাগণ প্রসূতি ও নবজাত শিশুর ব্যবহারের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যপূর্ণ অনেকগুলি ব্যাগ প্রস্তুত করেন এবং গ্রামে গ্রামে বিতরণ করেন। সম্পাদিকা নিজে নিকটস্থ গ্রামে ঐ ব্যাগ বিতরণ করেন এবং দ্রব্য-ব্যবহারের প্রণালী শিক্ষা দেন। ব্যাগের ভিতরে প্রসূতির জন্য ব্যাণ্ডেজ, শিশুর নাড়ী বাঁধিবার সূতা, বোরিক এসিড, বোরিক তুলা, সাবান, কাঁচি, জামা প্রভৃতি থাকে।

সমিতি যে বিধবা মহিলাকে স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠের সাহায্য করিতেছিলেন, তাঁহাকে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সহায়তায় কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে ধাত্রীবিদ্যা ও নার্সের কার্য্য শিখিবার জন্য পাঠান হইয়াছে। তিনি সেখানে উৎসাহের সহিত শিক্ষালাভ করিতেছেন।

শ্রী নলিনীবালা চৌধুরী,
সম্পাদিকা

বাকাই মহিলাসমিতি

সম্প্রতি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগে সমিতির কার্য্য চলিতেছে—

১। বিদ্যালয় বিভাগ :—স্থানীয় বালিকাদিগের শিক্ষার অভাব দূরীকরণার্থ সমিতির সম্পাদিকার বাড়ীতে একটি অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সম্পাদিকা বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ও উহার সম্পূর্ণ কর্ম্মপরি-চালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষালাভের সহিত বালিকাদিগের চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ছাত্রীগণ যাহাতে সত্যনিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। ছাত্রীদিগের শারীরিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাঙ্গণে নানা প্রকার খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের মানসিক প্রফুল্লতাবিধানের জন্য গান, আবৃত্তি, নাটকাভিনয় প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদজনক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সমিতির কর্ম্মীগণ ও সভ্যগণ অতি আনন্দের সহিত এই বিদ্যালয়ে মেয়েদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। মাসিক বেতন-ভোগী কোন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নাই। বিদ্যালয়টি সুব্যবস্থার গুণে সাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধালাভ করিয়াছে।

জ্ঞানপ্রচার বিভাগ : জ্ঞানানুশীলন ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কার্য্যে যথাযথ সাহায্য করিতে পারে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া সমিতি হইতে মহিলা-দিগকে জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা প্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে। সমিতিগৃহে প্রায় প্রত্যহই শিক্ষার্থিনীগণের নিকট দৈনিকপত্র ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা হয়। প্রতিমাসে সমিতির অন্ততঃ দুইটি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হয় ও দেশ-বিদেশের নারীপ্রগতির সংবাদ সমবেত মহিলাদিগকে জ্ঞাপন করা হয়। শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগকে সমিতি হইতে নানাপ্রকার সৎগ্রন্থ ও দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিবার জন্য দেওয়া হয়। স্থানীয় "সিদ্ধেশ্বরী পাঠভবন" নামক শিক্ষাকেন্দ্র এই সকল পুস্তকাদি সরবরাহ করিয়া সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে। সমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত

এই সকল সুবিধা জ্ঞানপিপাসু মহিলাদিগের চিত্তের জ্ঞানচর্চ্চার জন্য একটী ব্যাকুল আগ্রহ আনয়ন করিয়াছে।

শিল্পবিভাগ :—সমিতি মৃতপ্রায় ও সমবোপযোগী গৃহশিল্প, যথা, চিত্রাঙ্কণ, আল্‌পনা, কাঁথা সেলাই, সূচিশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ, সতরঞ্চ ও তোরালে বুনন, কাটছাঁটের কাজ, জামা তৈয়ারী ইত্যাদি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। যাহাতে দুঃস্থা ভদ্রমহিলাগণ এই সকল শিল্পবিদ্যা সাহায্যে পরের গলগ্রহ না হইয়া নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন তজ্জন্য সমিতি যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছে। শিল্পজাত দ্রব্যাদি সমিতি হইতে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চরকা ও তকলীতে সূতা কাটা প্রায় প্রতি গৃহেই বিশেষ উদ্যমের সহিত চলিতেছে। কয়েকজন মহিলা সূতা কাটায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; অনেকেই ৬০ ও ৭০ নম্বর সূতা কাটিতে পারেন। সমিতির অন্যতম কর্ম্মী অশীতিপর বৃদ্ধা এইরূপ সূক্ষ্ম সূতা চরকা ও তকলীতে কাটিয়া থাকেন যাহা অতি বিরল। তাঁহার এই সূক্ষ্ম সূতা দেখিয়া ঢাকার সেই বিশ্ববিখ্যাত মসলিনের কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। সম্প্রতি সমিতি হইতে বস্ত্রবয়নের জন্য একটি তাঁত বসাইবার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ এই চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। সুযোগ্যা শিল্পশিক্ষয়িত্রীর অভাবে সমিতি শিল্পশিক্ষা কার্য্যে যথাযথ সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে না।

সেবাবিভাগ :—সমিতি রোগীর শুশ্রূষা ও প্রসূতি-পরিচর্য্যার দিকেও যথাসাধ্য কার্য্য করিতেছে। সমিতির সহঃ-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা বসু ধাত্রী-বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি বহু সন্তান সুচারুরূপে প্রসব করাইয়া গ্রামের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। গ্রামের কোন প্রসূতির বেদনা উপস্থিত হইলেই ইঁহাকে খবর দেওয়া হয়, তিনি তথায় গিয়া যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও সুশৃঙ্খলায় প্রসব হয় তাহা করিয়া থাকেন।

অকালে শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিমৃত্যু আমাদের দেশের একটি ভয়ানক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান বহুলাংশে মহিলাদিগের উপর নির্ভর করে। স্থানীয় মহিলাদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা প্রদানের জন্য এখানে একটি ধাত্রীশিক্ষা কেন্দ্র খুলিবার আমার পল্লীসঙ্ঘের সম্পাদক Director of Public Healthএর নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া এখানে ধাত্রী শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শীঘ্রই এখানে ধাত্রীশিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইবে। ডাইরেক্টার মহোদয় গ্রামবাসী নরনারীর চিত্তের স্বাস্থ্য, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল ও নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচারের জন্য পল্লীসঙ্ঘকে নানা প্রকার বহু শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী চার্ট ও পুস্তিকা দান করিয়া গ্রামবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মহিলাদিগের চিত্তের উক্ত বিষয়গুলি প্রচারের সুবিধার জন্য পল্লীসঙ্ঘ মাঝে মাঝে ঐ সকল চার্ট ও পুস্তিকা সমিতিকে দিয়া থাকেন।

গত ১লা কার্ত্তিক, সমিতির উদ্যোগে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত এক জনসভার অধিবেশন হয়। বহু নরনারী এই সভায় যোগদান করেন। ঢাকার প্রবীণ উকীল সুবিজ্ঞ দেশপ্রেমিক ভদ্রের শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী এম-এ, বি-এল্ মহাশয় এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ইনি সমিতির একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। এই সভায় কেন্দ্র সমিতির প্রচারক ভদ্রের শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় ছায়াচিত্র যোগে "নারীজাগরণ" বিষয়ে বিশেষ প্রেরণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তিনি সমিতির কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন ও সমিতির উন্নতি কামনা করেন। তিনি সম্পাদিকা ও অন্যান্য কর্ম্মীদিগকে মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করিয়া যথেষ্ট উপকৃত করেন। তাঁহার সহৃদয়তা ও চরিত্রমাধুর্য্যে গ্রামবাসী নরনারীগণ বিশেষ আকৃষ্ট হয়েন।

শ্রী সুরবালা বসু,
সম্পাদিকা

কেন্দ্রসমিতির কথা

বাগবাজার শিল্পপ্রদর্শনীতে বক্তৃতা

গত ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাগবাজার স্বাস্থ্য ও শিল্প প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভূপত্রনাথ বসুর উদ্যোগে একটি বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ পাত্রী আলোকচিত্র সাহায্যে কুটীরশিল্প ও তাহার উদ্ধারের উপায়—এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তাঁহারা বলেন যে শিল্পের উদ্ধারের দ্বারাই জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সম্পদ সম্ভব হইবে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক বক্তৃতা

গত ১১ই নভেম্বর বুধবার দর্জিপাড়া ব্যায়াম-সমিতির উদ্যোগে মল্লিকবাড়ী ষ্টেটের শিল্পপ্রদর্শনী-ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সম্প্রতি নিউইয়র্ক হইতে আগত শিক্ষা প্রচারিকা ও সমাজসেবিকা কুমারী গার্ট্রুড জেকব বি-এস্‌সি আলোকচিত্র সাহায্যে সমাজে নারীর স্থান বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ কুমারী জেকবের বক্তৃতার অনুবাদ করেন এবং নারীমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

আলোকচিত্রে বিদেশের কথা

গত ১৩ই নভেম্বর কল্যা মহিলাসমিতির উদ্যোগে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পরমচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বাটীতে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। বহু পুরুষ ও মহিলা এই সভায় যোগদান করেন।

একটি সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য আরম্ভ হয়। গার্ট্রুড জেকব বি-এস্‌সি আলোকচিত্র সাহায্যে বিদেশের কথা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। নিউজিল্যাণ্ড সম্বন্ধে অতি চিত্তাকর্ষক ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ বক্তৃতা বাংলায় বুঝাইয়া দেন। উপস্থিত মহিলারা অতি উৎসাহের সহিত এই বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

সরোজনলিনী শিক্ষালয়ে দান

আলমবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিশ্ব মহাশয় সরোজনলিনী নারী-শিল্প-শিক্ষালয়ে ৭ শত বাংলা ও ইংরাজি পুস্তক এবং কয়েকখানি সুন্দর চৈলচিত্র প্রদান করিয়াছেন। স্কুলে বাংলা ইংরাজি অভিধানের অভাব জানিতে পারিয়া তিনি ৩ খানি নূতন সংস্করণের বাংলা ও ইংরাজি অভিধান ও একখানি সুন্দর গ্লোব প্রদান করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তি বিরল। যখনই তিনি স্কুলে পদার্পণ করেন সেই সময়েই পুস্তক অথবা কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করিয়া যান।

"চিত্রা"র অভিনয়

গত ১৩ই অক্টোবর সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যার্থে "চিত্রা"র সুবিখ্যাত ছায়াচিত্র "ট্রেডার হর্ণে" অভিনয় হইয়াছিল। "চিত্রা"র অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ সমিতির অর্থ-ভাণ্ডারে দান করিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। "ট্রেডার হর্ণে" অধিকারী মেট্রোগোল্ডউইন মেয়ার কোম্পানী এবং তাঁহাদের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নীতিশ-চন্দ্র লাহিড়ী কোম্পানীর বিক্রয়লব্ধ অর্থের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন নাই। সেজন্য ঐ কোম্পানীকে ও নীতিশবাবুকে আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই বাবদ প্রায় বার শত টাকা সমিতির তহবিলে জমা হইয়াছে।

ম্যাডান থিয়েটারে অভিনয়

গত ২৫শে নভেম্বর বিখ্যাত মেসার্স জে, এফ, ম্যাডান কোম্পানীর সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় ম্যাডান থিয়েটার ও

প্যালেস অফ ভ্যারাইটিতে একটি সবাক ছায়াচিত্রের অভিনয় হইয়াছিল। সমিতির পৃষ্ঠপোষিকা মাননীয়া লেডী জাকসন এই অভিনয় দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভিনয় চিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রায় এক হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হয়। এই সাহায্যের জন্য ম্যাডান কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী মিঃ বারোয় জি ম্যাডান ও ম্যাডান থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মহিলাসমিতি কর্ত্তৃক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়া মহিলাসমিতি বহুদিন ধরিয়া একটি বালিকাবিদ্যালয় পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের শিক্ষানৈপুণ্য ও পরিচালনকুশলতায় এবং সাধারণের সহানুভূতিতে বর্ত্তমানে উক্ত বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। মেয়েরা এখান হইতেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারিবে। ইতিপূর্ব্বে কোন মহিলাসমিতিই এইরূপ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আমরা আশা করি, অন্যান্য মহিলাসমিতিও কালিয়ার এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া গ্রামে গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার উপযোগী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট ও যত্নপরায়ণ হইবেন।

কসবা মহিলাসমিতিতে গৃহিণী ও গৃহস্থালী বিষয়ে বক্তৃতা

গত ২৪শে নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় কসবা মহিলাসমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। মহিলাসমিতির সভ্যা ভিন্ন বহু স্কুলের ছাত্রীরা এই সভায় যোগদান করেন। সর্ব্বপ্রথমে একটি সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপরে সমবেত মহিলা ও নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি এ আলোকচিত্র সাহায্যে পল্লী ও তাহার সংস্কার বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে শতকরা ৯০ জন পল্লীবাসীর অন্নসমস্যার

প্রাপ্তি-স্বীকার

কলিকাতার (৬৩।২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট) মণিহারী দ্রব্য বিক্রেতা ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোরস্ – সিভ্যালরী কেমিক্যাল ওয়ার্কসের দ্রব্যাদির একমাত্র বিক্রেতা। ইঁহাদের প্রস্তুত 'শ্রী' স্নো, অলকা হেয়ার অয়েল প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া আমরা দেখিয়াছি - ঐগুলি নির্দ্দোষ উপাদানে প্রস্তুত এবং প্রসাধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এমন কি উৎকৃষ্টতর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

•

কলিকাতার প্রসিদ্ধ মণিকার মেসার্স ধর ব্রাদার্সের রুবি কেমিক্যাল ওয়ার্কস হইতে এক শিশি "রুবি" স্নো এবং এক শিশি চম্পক এসেন্স পাইয়া ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি - ইহা বিশুদ্ধ উপাদানে এবং স্বদেশী জিনিষে প্রস্তুত। বাজারে যত দেশীয় উপাদানে তৈয়ারী স্নো ও এসেন্স বাহির হইয়াছে, আমাদের মতে রুবি কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রস্তুত রুবি স্নো এবং এসেন্সই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সমাধান করে কৃষির উন্নতি, শিল্পের পুনরুদ্ধার ও শিক্ষা-পালন এবং পশুপালন বিশেষ প্রয়োজন ; মহিলাসমিতিগুলি এই পল্লীসংস্কার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। এই সভায় ইংরাজ মহিলা মিসেস ম্যাথনার গৃহস্থালী ও গৃহিণী-পনা বিষয়ে একটি অতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি ইংরাজ পরিবারে গৃহিণীর স্থান, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেন এবং বলেন গৃহপরিচালনে নৈপুণ্যে ই নারীর যথার্থ যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ এই গৃহিণীপনার ধৈর্য্য, দূরদৃষ্টি ও সাহসের একান্ত প্রয়োজন। গৃহিণীগণের তিনটি বিষয়ের কথা মনে রাখিতে হইবে সুশৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও মিতব্যয়িতা। এই প্রবন্ধ অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী এম-এ, বি-টি'র অদম্য উৎসাহে সভার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পরলোকে রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মী এবং সমাজসেবক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, আই, এস, ও, মহাশয় গত ২৪শে নভেম্বর ৭১ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় নীরব কর্ম্মী বঙ্গসমাজে নিতান্ত বিরল। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তাঁহার সময় লোকহিতসাধনের কার্য্যে ব্যয়িত হইত। বয়স অধিক হইলেও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এরূপ অতর্কিতভাবে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিবেন তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। গত ২৩শে নবেম্বর মাডান থিয়েটারে সংযোজনিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যার্থে যে অভিনয় হইয়াছিল তিনি তাহাতেও উপস্থিত ছিলেন। সংযোজনিনী নারীমঙ্গল সমিতি প্রথম স্থাপনের সময় হইতেই তিনি ইহার পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন এবং নানাভাবে সমিতি পরিচালনের কার্য্যে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন উপযুক্ত কর্ম্মীকে হারাইলাম।

রায় বাহাদুর লক্ষ্ণৌ কলেজ হইতে বি এ পাশ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সময় সংযুক্ত প্রদেশের কলেজগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি প্রথমে কিছুদিন মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া এলাহাবাদ সাহেব যখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান

রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

হন, সেই সময় মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী হন। অতঃপর তিনি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন পদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত এই কাজ করেন।

বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বোবাজার রিফিউজের এবং কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের অনারারি সেক্রেটারি, যাদবপুর কলেজ অব্

ইণ্ডিয়ান্স এণ্ড টেক্সটাইলের কোষাধ্যক্ষ এবং কলিকাতা ইউ: সোসাইটীর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

তিনি বড় বিনয়ী একজন হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় হিতদর্শন ও প্রিয়ভাষ লোক বিরল।

মাদারহাটী মহিলাসমিতি

গত ২রা কার্ত্তিক সোমবার খুলনা জেলার অন্তর্গত মাদারহাটী মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলাবতী বিশ্বাস মহাশয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে এই সমিতি একজন উপযুক্তা মহিলা কর্ম্মী হারাইল। তিনি মাদারহাটী গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ইঁহারা স্বামীস্ত্রীতে স্কুলের কার্য্য করিতেন। স্বর্গীয়া লীলাবতী দেবী ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন স্বামীর বালিকাবিদ্যালয় ও নমঃশূদ্র মহিলাসমিতি স্থাপিত হয়। ৺লীলাবতী দেবীর পরদুঃখকাতরতা, দান-শীলতা, অমায়িকতা ও স্বভাবসুলভ সৌজন্যে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মুগ্ধ ছিল এবং কর্ম্মকুশলতায় নমঃ-শূদ্রমহিলাসমিতির মধ্যে অতুলনীয়া ও আদর্শস্থ নীয়া ছিলেন। গত ভাদ্রমাসে প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস শ্রীযুক্তা মনীষা রায় এম্‌ এ মহোদয়া আমাদের বালিকাবিদ্যালয়টি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টা হন এবং মহিলা-সমিতির কার্য্য আরও সুচারুরূপে চালাইবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিয়া যান।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমতী কুমুদিনী বিশ্বাস মহাশয়া মহিলাসমিতির সম্পাদিকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহাদ্বারা ৺ লীলাবতী দেবীর অভাব পূরণ হইবে এবং সমিতির কার্য্য দিন দিন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

শারদোৎসবে——

হিমানী কাফ্‌ফ্‌ট

আধুনিক অঙ্গরাগের পাঁচটি উৎকৃষ্ট উপকরণ সম্বলিত সৌষ্ঠিকা—সুদৃশ্য রেশমী কাপড় মোড়া—বাক্সটি মজবুত ও রুচিসঙ্গত মূল্য দশ টাকা মাত্র এ দামে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাফ্‌ফ্‌ট অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বাজারের অন্য কাফ্‌ফ্‌টে ইহার তুলনায় নিতান্তই সেকেলে মনে হইবে, কিনিবার আগে হিমানীর কাফ্‌ফ্‌টগুলি দেখিতে অনুরোধ করি।

অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে

নিরুপমা কাফ্‌ফ্‌ট

ক্ষুদ্রম কাফ্‌ফ্‌ট

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমানীর নানা প্রসাধন দ্রব্য ও

উপহারে অতুলনীয়।

অতুলনীয়

উপহার

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি

সাহিত্যরসিকদিগের জন্য প্রতি বৎসরের অপূর্ব্ব আয়োজন। গল্পে ও চিত্রে সম্ভারে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এবারে কথাবস্তু রচনার ভার লইয়াছেন শ্রীকেশব গুপ্ত, বিজয়রত্ন মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ দাশগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবিনাশ ঘোষাল, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী প্রভৃতি। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী-দিগের তুলিকায় এবারেও ইহা সমুজ্জ্বল হইবে। মূল্য পূর্ব্বৎ ১৷৷০—১৫ হিমানী পুরস্কার কুপনের পরিবর্ত্তে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ও

শর্ম্মা চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং

৪৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press, 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

ঘরকন্না

শিল্পী—শ্রী মণিমালা দেবী

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' বাচি।"

৭ম বর্ষ] পৌষ, ১৩৩৮ [২য় সংখ্যা

তোমার আলো

আমার হিয়ার ঘরে কে জ্বেলেছে
সোনার প্রদীপখানি,—
সোনার রঙে আকাশ ছাওয়া
বাতাস বহে সোনার বাণী।
অন্তরালে আলোক জ্বলে,
সুর ভেসে যায় চিত্ততলে,
জলে-স্থলে কে ছড়ালে
সেই অফুরান সোনা আনি'।

পূজার ঘরে পাইনি সাথী,
কাট্‌ল একা দিবস-রাতি :
তোমার হাতের জ্বালো শিখা
আন্‌ল সেথা সবায় টানি।
তোমার আলো—তোমার আলো
সোনার ধারে হেথায় ঢালো,
তোমার দেওয়া ঐ আলোটি
পেয়ে জীবন ধন্য মানি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—রাষ্ট্র-স্বাধীনতা

শ্রী বলাই দেবশর্মা

মানবীয় সভ্যতার যত কিছু প্রচেষ্টা, তাহা ব্যক্তিমানবকে কেন্দ্র করিয়া। প্রত্যেকটি মনুষ্যজীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে, সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতেই যাহা কিছুর প্রয়োজন। কতকগুলি বেশী লোক সুখ ভোগ করিব, উন্নত হইয়া উঠিব অথবা অধিকার ভোগ করিব, এমন হইলে মানবসভ্যতা একটা দস্যু-সভ্যতায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ সভ্যতার এমন উদ্দেশ্য নহে; যেখানে এরূপ আছে, বুঝিতে হইবে সেখানে সভ্যতার উন্মেষ ঘটে নাই। একটিমাত্র মনুষ্যও পড়িয়া থাকিবে না, সকলে এবং প্রত্যেকে সভ্যতার আশীর্বাদ ভোগ করিবে। আর এই মহত্তর আদর্শ ও উদ্দেশ্য থাকিলেই তবে তাহাকে সভ্যতা বলিব। সভ্যতার মর্মকথা মিত্রতা, সমতা এবং তাহার সহিত স্বাধীনতা, বুদ্ধি ও বীর্যবত্তা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাহার পরের বস্তু।

মৈত্রী—দলের জন্য নহে, শ্রেণীর জন্যও নহে; প্রত্যেকের ও সকলের জন্য। সেইজন্য সমাজে অথবা রাষ্ট্রে যতগুলি মানুষ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ও সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানে বা রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানে এইরূপ আদর্শের অনুমোদন নাই, সেই রাষ্ট্র ও সমাজ একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা; তাহা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই সৃষ্টি করে। ভারতীয় পল্লীসমাজ অথবা বর্ণাশ্রম-বিধান সর্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। এবং তাহারই ফলে ভারতীয় জীবনে সুবৃহৎ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান অপেক্ষা স্বপ্রতিষ্ঠ পল্লীসমাজই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

স্বাতন্ত্র্য—স্বৈরাচার নহে, পরন্তু একটা নিয়মানুগ আত্ম কর্তৃত্ব। পল্লীর ব্যক্তিস্বাধীনতা সমাজশৃঙ্খলাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অথবা নীতিনিয়মকে অবজ্ঞা করিয়া যাহা খুসি তাহা করিত না। একটা সার্বজনীন বিধি-বিধানের বশবর্তী থাকিয়া নিজস্বতার আপূর্তিতে স্বকর্তৃত্বে ও স্বইচ্ছায় যাহা করিত ও ভাবিত, তাহা ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গলজনক। এইরূপ মঙ্গলপূর্ণ হইবার বিধিব্যবস্থাই আর্যসভ্যতার রীতিনীতি। ব্যক্তি যাহা করিত ও করে, তাহা সমষ্টির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত; আবার সমষ্টির যাহা অনুশাসনের, তাহাও ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে না।

আধুনিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্র—পরিচালক; আর ব্যক্তিমানব—পরিচালিত। রাষ্ট্রই সর্ব ব্যাপারে উদ্যোক্তা। রাষ্ট্র বলিতে বুঝি কতকগুলি মানুষের সমষ্টি এবং কর্তৃত্ব সকলের সেখানে জাগ্রত সম্মতি নাই। কিন্তু পল্লীসমাজের প্রকৃতি অন্যবিধ। এখানে ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও সম্মতিই সর্বস্ব। ব্যক্তি যাহা করে, তাহা তাহার নিজস্ব চৈতন্যে কর্তব্যবুদ্ধিতেই করিয়া থাকে—রাষ্ট্রের অপেক্ষা রাখে না, স্মরণ করিবার প্রয়োজনই হয় না। অর্থ যদি কাহারো সংগৃহীত হয়, সে ধর্মবুদ্ধির প্রেরণায় জলাশয় খনন করাইয়া দেয়। এই কার্য করিতে কাহার ও শাসনের অপেক্ষা নাই, প্রশংসারও প্রলোভন নাই।

বাংলার পল্লীসমাজে অসংখ্য দেবদেউল, পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতি যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্যক্তিমানবের স্বেচ্ছাকৃত অবদান। এমনে জনগণের শিক্ষার আক্ষরিক শিক্ষার বাহুল্য ছিল না। গণশিক্ষা চলিত কীর্তন-কথকতায়। আর এই গণশিক্ষাপদ্ধতি প্রতিপালিত হইত সমষ্টিবুদ্ধির প্রচেষ্টায় নয়ে, ব্যক্তিমানবের কর্তব্যবুদ্ধিতে। গ্রামের বিত্তবান ব্যক্তি অথবা ব্রতচারিণী মহিলা কীর্তন-কথকতা দিতেন, উহাতেই একটি পল্লীর সমগ্র নরনারীর শিক্ষাকার্য সুসম্পাদিত হইত। এইরূপ প্রত্যেক ব্যাপারে—শিক্ষায়, সমাজপালনে ও শাসনে, পূর্তকার্যে ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে।

প্রত্যেক মনুষ্যেরই একটা বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। মহামনীষী হইতে একটি শ্রমিক মানুষ পর্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। প্রত্যেকের জীবনের মূল্য সমান। কেহ ও কোন মানবই অবজ্ঞার এবং অবহেলার নহে। কবি, শিল্পী, দার্শনিক, রাজনীতিক আর তাঁহাদের সহিত মুটে-মজুর, পথের দীনভিক্ষুক প্রত্যেকের জীবনের যে তাত্ত্বিক, সত্তা, তাহা এক ও

অভিন্ন। কাজেই প্রত্যেককেই তাহার পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে সমভাবে সাহায্য করিতে হয়। আত্মিক প্রস্ফুটন—যাহার নাম মনুষ্যত্বের বিকাশ, তাহাতে পাত্রভেদ নাই, ইতরবিশেষ নাই। তেমন থাকিলে মানবসভ্যতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

সমাজের প্রত্যেক মনুষ্যের মনুষ্যত্বের প্রস্ফুটন প্রয়োজন। এই দিক দিয়া কাহাকেও বঞ্চিত করিতে নাই বা আত্মিক বিকাশ ব্যাপারে অন্ধ থাকিতে দিতে নাই। মানবতার উন্মেষ ব্যাপারে সাহায্য করিতে হয়, আবার ঐ দিকে অনুরাগ জাগাইয়া দিতে হয়। যে সমাজবিজ্ঞানে এই প্রকার রীতিপদ্ধতি আছে, সেই সমাজই যথার্থ নরকল্যাণকামী। বাঙলার সমাজবিজ্ঞান প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত সত্তাকে বিকশিত করিবার রীতি গ্রহণ করিয়াছিল। সেই রীতি বর্ণাশ্রমধর্মের বিজ্ঞানানুমোদিত,—মনুষ্যকে কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন করা এবং পুণ্যপ্রবণ করা। অহং ব্রহ্মাস্মি ন চাত্মোস্মি ব্রহ্মৈবাহং—এই ব্রহ্মবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি-মানবকে তাহার স্বকীয়তায় পরিপুষ্ট করিয়া তোলা, ইহাই আর্য্য আদর্শ। এই আদর্শই সমাজ এবং ব্যক্তিজীবনে অনুস্যূত হইয়া বিশ্বভুবনে একটা বরেণ্য মানবতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

স্বকীয় কথাটা অনেকবার ব্যবহার করিয়াছি। এইবার ইহার অর্থ অনুসন্ধান করিব। করিলে বুঝিব প্রকৃত স্বাধীনতাই স্বকীয়তা। আমি—আমিই। আমার ইচ্ছাও আমার, আমার আদর্শও আমার। আবার আমার জীবনযাত্রার গতির যে নিয়ন্ত্রণ, তাহাও আমারই নিয়ন্ত্রণে। আমি সম্পূর্ণ আমারই হইলে, আমি রাজ্যেশ্বর হইতেও মহীয়ান হইব।

ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা—আমার নিজের হইতে পারে। আর তাহার একটা প্রেরণাও থাকে। মনুষ্যের সামান্য গতি সেই প্রেরণাবশেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই চলা-ফেরা, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, ইহার উপরও একটা ঊর্দ্ধগতি আছে। তাহাতেও স্বনিয়ন্ত্রিত হইতে পারিলে সম্পূর্ণই স্বকীয়তা আসে। সর্ব্বম্ আত্মবশম্ সুখম্ তদু নহে—স্বাধীনতাও নহে। আবার নিরঙ্কুশের আত্মনিয়ন্ত্রণ, নিজস্ব গতি—স্বাধীনতা নহে, পরন্তু স্বৈরাচার। উহা পরাধীনতার রূপান্তর। তাই স্বাধীনতার দিকে গতি ফিরাইয়া দিয়াও মানবের আচার-আচরণে কতকগুলা বিধি-নিষেধ বিধান করা হইয়াছে। কারণ বিধি ও বিধান মাত্রেই বন্ধন নহে। আত্মাপুত যাহা, তাহা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। আত্মার ধর্ম—উন্মার্গ আচরণ নহে। তাই মানবকে বুদ্ধি দিতে গিয়া প্রথমিক নির্দ্দেশ—অহং ব্রহ্মো ন চান্যোস্মি। দ্বিতীয় লক্ষ্য—যদা নিমুক্তোস্মি তদা ব্রহ্মৈবাস্মি। আর এইখানেই মানবতার যথার্থ মুক্তি।

বন্ধনের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে যদি সারাজীবন আবদ্ধই রহিলাম, তবে কি হইবে আমার সামাজিক কল্যাণে?—কি হইবে জাতীয় উন্নতিতে? তোমার ক্ষতি করিতে না পারি, তাই বলিয়া আমার অকল্যাণও করিতে পারি না। ব্যষ্টিতে এবং সমষ্টিতে এইরূপ একটা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ইহার নিরসন করিতে হয়। নহিলে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। ব্যক্তি সমাজ ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। সমাজ বহু খণ্ডদলে বিভক্ত হয়। ফলে একটা দুর্নিবার বিপ্লবের সম্ভাবনা অহরহ রহিতে থাকে। অদ্যকার প্রতীচ্য ভুবনে এইরূপ হইয়াছে। এই অসম ব্যবস্থার কিন্তু প্রতিকার আছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গলে একটা সামঞ্জস্যবিধান করা যায়। এই সামঞ্জস্য কষ্ট-কল্পিত নহে, পরন্তু একান্ত স্বাভাবিক। প্রকৃত যাহা ব্যক্তি-কল্যাণ, তাহা সমষ্টিমঙ্গলের কখনই বিরোধী নহে। যেখানে এমন বিরোধ দেখা যায়, সেখানে বুঝিতে হইবে, মঙ্গলের নামে যাহা দেখা দিয়াছে তাহা ছদ্ম অমঙ্গল। স্বাধীনতা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। আত্মসত্তা যেখানে পরিপুষ্ট হইতে চাহিতেছে, সেখানে একের বা অনেকের অমঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই।

বাঙলার সমাজবিধানে শাস্ত্রের অনুশাসন আছে। শাস্ত্র কিন্তু মানবশাসন নহে—ব্যক্তির আজ্ঞা বা কর্তৃত্ব নহে; শাস্ত্র ভগবদ্দীপ্তি। আত্মাই ভগবান বা ভগবানই আত্মা। কাজেই ভগবদ্বাক্য বা শাস্ত্রবাক্য সর্ব্বকল্যাণকর। শাস্ত্রের অনুশাসনে যে সব বিধিবিধান বিহিত রহিয়াছে, তাহার অনুষ্ঠানে একের সহিত দশের কল্যাণও সমকালে সম্পাদিত হয়। আর এই যে শাস্ত্রশাসন, ইহা বাহিরের হইলেও প্রকৃত পক্ষে বাহিরের নহে। আত্মবশ্য এক বলিয়া শাস্ত্র-বাক্য প্রত্যেকেরই নিজস্ব বস্তু। প্রথমতঃ উহাকে বাহিরের বলিয়া মনে হইলেও নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত মানিতে

মানিতে উহার স্বকীয়তা অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়। অনুশাসনকে ক্রমশঃ আত্মশাসন বলিয়াই জ্ঞান হয়।

সকল জ্ঞান সকলের পক্ষে প্রত্যক্ষ নহে। ক যে ক, তাহা মানিয়া লইতে হয়। মকরধ্বজের সঞ্জীবনীশক্তি আছে, ইহা আমরা সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। দেখিবার অবকাশ নাই তাহা নহে, দেখিবার মত মনোবৃত্তি ও শক্তি নাই। অথচ ব্যাধির সঙ্কটমুহূর্ত্তে অসঙ্কোচে উক্ত ঔষধকে ব্যবহার করি। শাস্ত্র ব্যাপারেও পরীক্ষা চলে না। সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া উহার আনুগত্য করিতে হয়; এবং তাহার ফলে জ্ঞান সমুদ্ভাসিত হয়। তখন আর শাস্ত্রবিধানকে অপরের অনুশাসন বলিয়া মনে হয় না, একান্ত আপনার বস্তু বলিয়াই ধারণা

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পুরুষানুক্রমে বাস্তু করিতে করিতে ভারতের ব্যষ্টিজীবন একান্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিহিত কার্য্যে কাহাকেও অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। বাঙালী যখন পূজাপার্ব্বণ করে, তখন তাহাকে উহার অনুষ্ঠান করিতে কেহ আদেশ দেয় না। করিতে হয়, করা উচিত জ্ঞানেই করিয়া চলে। ইহা সাধারণে করে, উন্নত স্তরের লোকেও করে। বিত্তবান ঘটাঘটি করিয়া দুর্গোৎসব করেন; দরিদ্র যে বাটিয়া খায়, সে সামর্থ্যমত একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির চরিতার্থসাধন করে। এমনি করিয়া বাঙলার পল্লীসমাজে প্রত্যেকেই শুচি কর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্বকীয় বুদ্ধির নির্দ্দেশেই করিয়া চলে। এই করিয়া চলা হয়তো সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রযুক্ত নহে; তাহা না হউক, কিন্তু এই কর্ত্তব্যসম্পাদনের স্বভাব মানুষকে আত্মোন্নতির ক্ষেত্রে প্রবুদ্ধ হইবার সহায়তা করে। জনমানবের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

স্বাতন্ত্র্য—যাহা খুসি তাহা নহে। স্বাধীনতার আনুগত্য আছে, শৃঙ্খলা আছে, এবং নীতিনিয়মও আছে। পূর্ণ মুক্তি কি, তাহা তুমি-আমি জানি না। এমন ক্ষেত্রে যিনি মুক্ত, স্বাধীনতার স্বাদ যিনি সমগ্র জীবন মনে আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার দুই সত্য মানিতে হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা এইরূপই মানিয়া থাকি। জল খাইলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় এই যে জ্ঞান, ইহা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফল। আমরা পিপাসা পাইলে যে জল পান করিতে যাই তাহা নিজেরা বিচার করিয়া নহে, অপরের অভিজ্ঞতার নিকট ঋণ লইয়া। স্বাধীনতার ব্যাপারেও ঠিক এই নীতি। যাহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন এবং মুক্ত জীবনে যে ব্যবহার অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যে সকল অনুশাসন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিপালন করাই মুক্তিসাধনার অব্যর্থ নির্দ্দেশ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—বিধিবদ্ধতা, সুশৃঙ্খলা, সনাতনের শ্রদ্ধালু আনুগত্য,—সনাতন মুক্তির সিদ্ধমূর্ত্তি। কাজেই বাঙলার ব্যষ্টিমানব এবং সমষ্টিমানব শাস্ত্রশাসনের অনুরক্ত ও অনুগত রহিয়া যাহা করিয়া চলেন, তাহা মুক্ত মানবেরই করণীয় কার্য্য। আর এই অনুগত্য ক্রমশঃই মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

দূর ও নিকট

শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধনীর ছাদে আঁধার রাতে জ্বল্‌ছে দীপের সারি :
একটি তারা উঁকি মারে পিছন হ'তে তারি।
নীচের থেকে বেশ্‌লে হঠাৎ যায় না তফাৎ বোঝা,—
পথের পথিক প্রদীপ ব'লেই স্থির করে তার সোজা।
দীপের মালা হাওয়ায় কেঁপে অন্ধকারের তলে
একে একে নিভ্‌তে থাকে : রাতের তারা জ্বলে।
কিম্বৃতি পথে অবাক্ হ'য়ে পথিক তখন কয়—
"ভুল করেছি, পাঁচটা দীপের একটা ও-তো নয়!
লক্ষ-কোটি যোজন দূরে— অসীম শূন্য মাঝে
ও যে আর-এক বিরাট বিশ্ব!"—ভাবে তখন লাজে।

ধরার ধূলায় পাঁচটা ছেলে বেড়ায় যখন নাচি'
কে বল্‌বে তার কোন্‌টা দূরে কোন্‌টা কাছাকাছি?
এক নিমেষে কল্পনা বিচার পথের দৃষ্টি ঘিরে
দু'দিন পরেই হয় তো তোমায় ঠক্‌তে হবে গিরে।
কার যে প্রাণের কোথায় বাসা,—কার পরিমাণ কি যে
বাইরে থেকে কি বুঝ্‌বে ভাই? জানে না সে-ই নিজে।

প্রকৃতি-বর্ণনায় চণ্ডীদাস

শ্রী কালীপদ জানা

বাঙ্গলার আদিকবি বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া যে সমস্ত বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করিয়া গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই প্রকৃতি-বর্ণনার অসামান্য ক্ষমতাই সেই গীতি-রচনাকে অবিনশ্বর করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার নদী, বাঙ্গলার শস্যশ্যামল প্রান্তর যে একদিন তাহাদের অপূর্ব্ব প্রাণতন্ত্রে এই স্বভাবকবিগণের হৃদয় তরঙ্গায়িত করিয়াছিল, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের ভাষার রঙ্গ-রঙ্গীন তুলিকাস্পর্শে ছত্রে ছত্রে নিবিড়ভাবে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, দেখিতে পাই। এবং সেইজন্যই তাঁহাদের এই অমূল্য গীতিকাব্য চিরকাল আমরা বৈচিত্র্যময়, জীবন্ত এবং নূতন অবস্থায় পাইয়া থাকি। এই সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলীর আসল অনুভূতি এই প্রকৃতি-বর্ণনার ভিতর দিয়াই চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি-বর্ণনাই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রকৃত সম্পদ।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী কবি। একমাত্র চণ্ডীদাস ব্যতীত বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব কবিগণ প্রকৃতি-বর্ণনায় তাঁহারই নব নব সংস্করণ বাহির করিয়া গিয়াছেন মাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু চণ্ডীদাস এই বিষয়ে বিদ্যাপতি হইতে একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এবং তাহা যে অনেক স্থলে কেবলমাত্র প্রকৃতি-বর্ণনাতে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে তাহা নহে, তাহা

তাঁহার সমস্ত পদাবলীর আসল ভাবৰিচিত্রতাকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। সুতরাং চণ্ডীদাসকে সমগ্র বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে প্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে।

অন্যান্য বৈষ্ণবকবিগণের মত বৃন্দাবনেই চণ্ডীদাসের নায়ক-নায়িকার প্রেমময় লীলাভূমি এবং প্রধান বর্ণনাস্থল। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কল্পনার এই মানস ক্ষেত্রকে চির সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া পরিগণিত করিয়া তাহাতে চির-বসন্তের ছাপ লাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে একমাত্র তাঁহার বর্ণনাতেই বৃন্দাবনের চিরবসন্তের কল্পনা চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। অবশ্য বিদ্যাপতি এ বিষয়ে কম উচ্চমের পরিচয় দেন নাই।

অসীম সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার লইয়া একদিন চণ্ডীদাসের মনে প্রকৃতি যে গভীরভাবে সাড়া দিয়াছিল, তাহার সেই চিরপ্রবহমান সকল আনন্দ-অনুভূতির প্রতিটি স্পন্দন তিনি তাঁহার ভাষার তুলিতে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রকৃতি-বর্ণনাকালে বিভিন্ন স্থানে একই জিনিষ এমন বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যাহা তাঁহার ভাষার নিপুণতাই নির্দ্দেশ করাইয়া দেয়। ভাষার নৈপুণ্য স্বীকার করিলেও অনেক তাঁহার কাব্যকে এখানে 'পুনরুক্তি' দোষে দুষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমার এ স্থলে কিছু বলিবার আছে। গানের বৈঠকে গায়ক পর পর নূতন নূতন সুরের অবতারণা করিয়া বিভিন্নরুচি শ্রোতাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহা কোনো শ্রোতারই মনে স্থায়ী ভাবের অবতারণা করিতে পারে না। এবং এক শ্রোতার একটি সুর ভাল লাগিল, তার পর অপর একটি গানের অপর সুর গাহিবার কালে অনেক সময় রসভঙ্গ হয়। বিশেষ করিয়া চণ্ডীদাসের যুগ তখনকার যুগ যখন প্রত্যেক গায়ককে বাউল গায়কদিগের মত ভাবের সাথে ভাব মিলাইয়া গাহিতে হইত; এবং সে যুগ বহুজনের মনে অল্প অল্প ভাবের বিস্তার অপেক্ষা একজনের হৃদয়ে গভীর রেখাপাতের মূল্য বেশী করিয়া দিত। কাজে কাজেই প্রকৃতি-বর্ণনাকালে চণ্ডীদাসেরও ভিন্ন ভিন্নস্থানে আমরা প্রায় এক ভাবের সাড়া শুনিতে পাই, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদিগের বিচিত্রতা আমাদিগকে স্পর্শ করে।

প্রথমেই আমরা কবির ঈপ্সিতের প্রেমলীলাভূমি বৃন্দাবনের একটি চিত্র পাই। ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট আনন্দময় চিরসুন্দর বৃন্দাবন যে কি পবিত্র বৈচিত্র্যময় চিত্র তাহা এই কবির সার্থক লেখনীতে কি সুন্দরভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে—

যমুনা নিকট
অতি সে সুন্দর থল।
নানা পক্ষিগণ তরুগণ তাতে
ধরে নানা ফুল ফল॥
নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে
কেতকী চামেলি কুন্দ।
নাগেশ্বর আদি নানা সে কুসুম
চাঁপা পারলির গন্ধ॥
গুলাল দুলাল ঝাঁটি গন্ধরাজ
কিংশুক আমলা কত।
কদম্ব দোসারি শোভা অতি বড়ি
সাথে সাথে ফুল যত॥
হংস হংসিনী চক্রবাক তথি
চকোর চকোরী ডাকে।
কতেক চামরী ভ্রমরা ভ্রমরী
গুঞ্জরিছে সাথে সাথে॥

এমনি হংস-চকোর-কলহিত, ভ্রমরা-ভ্রমরী-গুঞ্জরিত, প্রস্ফুটিত এক মাধবী-তরুতলায় মোহনমূরতি নাগর কালিয়ার কুঞ্জকানন—

তরু লতা আর লবঙ্গলতায়
বেষ্টিত মাধবী তরু।
সেইখানে নব নাগর কালিয়া
মোহন মূরতি ধরু॥

ইহা কবির অনন্ত কল্পনার উৎস হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রতিভাবান লেখক যেমন ধীরে ধীরে বাস্তবতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনুরক্ত কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করেন, তেমনি চণ্ডীদাসের প্রতিভার চরম বিকাশ এই idelismএর মধ্যে দেখিতে পাই। বিদ্যাপতি realistic কবি এবং

realismএর ভিতরেই তাঁহার সমগ্র কাব্যের শক্তির বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাস সেই realismএর মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। এই idealism জিনিষটার কিন্তু তখনকার যুগের কবিদিগের মধ্যে একান্ত অভাব ছিল। হয়ত তখনকার যুগের লোক idealism অপেক্ষা realismএর অধিক ভক্ত ছিল। সুতরাং লোকের অভিরুচানিবন্ধন কবিদিগের কল্পনার সাহায্যে ভাববিশেষণের ক্ষমতা থাকিলেও এরূপ উচ্চ হইতে বিরত থাকিতে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের সমাক্ স্ফূর্ত্তি ইহাতেই হইয়াছে দেখিতে পাই।

সম্ভোগ-মিলনের প্রথমেই যে একটি শারদ পূর্ণিমা কবি আমাদের উপহার দিয়াছেন তাহার তুলনা আমরা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে খুঁজিয়া পাই না। এই অনবদ্য সুন্দর ছত্র কয়টি তাঁহার সম্ভোগ-মিলনের চরম সার্থকতা—

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ।
তরুকুল ডাল ফুল ভরি ডাল
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা মনমথ লোভী
ভুলিল নাগর রায়॥

সম্ভোগ-মিলনের ভিতর যমুনাতটের আর একটি পরিপূর্ণ রূপ এমন নিবিড়ভাবে আমাদিগকে স্পর্শ করে যাহাতে আমাদের শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়াই থাকিতে হয়।

নিভৃত যমুনাতটে শরৎপূর্ণিমা যদি তার সমস্ত সম্পদ লইয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর আকর্ষণ আমরা উপলব্ধি না করিয়া পারি না এবং সেই বাঁশীর ডাকে যে গোপরমণীগণ আকুল হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে এবং যমুনা-পবন স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?—

টল টল টল অতি মনোহর
শরৎ পূর্ণিমা শশী।
নটবর কানু মুরলী বদনে
সদলে কুটীরে বসি॥
কদম্বের কত ফুটিয়াছে যত পাখিগণ
মধুর মধুরী নাদে।
ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কার শবদে
ডাহুক ডাহুকী সাধে।
ইহাতে গোপরমণীগণও
শুনিতে মুরলী মোহিত পাগলী
মনের চঞ্চল প্রাণ।
ব্যাধের বাণ খেয়ে ধাওন ছুটয়া
চারিদিকে যেন চায়॥
যমুনা-পবন স্তম্ভিত গমন
ভুবন মোহিত গানে।

এবং কবির অমৃতলেখনীর মহত্ত্বময় সম্পাতে আমাদের কর্ণে সেই ধ্বনি চিরন্তন হইয়া রহিল।

এমনি এক যমুনাতটে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যের ভিতরে রাসকক্ষের রচনা করিয়া কুরকুটীরে প্রোষিতভর্তৃকা রাধিকাকে অবস্থান করিতে দেখিতে পাই। এবং সেখানে বসন্তের দূত কোকিলকে কুজের দ্বারী-রূপে, মদনকে প্রহরী-রূপে ও মলয়পবন সহ মত্ত ভ্রমরকে গুঞ্জন করিতে দেখিতে পাই। কবির এই সুন্দর উৎপ্রেক্ষাটি ভাষার তুলিতে কি মোহন রূপেই না আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

শুক পিক দ্বারী মদন প্রহরী
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু যত সহিত বসন্ত
মলয়পবন বয়॥
উজোরল রাতি মণিময় বাতি
কর্পূর তাম্বুল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে রাধি স্থানে স্থানে
শয়ন করিল গোরী॥

এবং আশায়ও বুক ভরিয়া রহিল কিন্তু তাহার নাগর আসিয়া পৌঁছিল না। কাজে কাজেই নাগর অভাবে বসন্তের এই রূপ-রস-গন্ধ তাহাকে সমূহ দুঃখই দিল—

চন্দ্রকিরণ তাহে বৈরী মোর ভেল।
মলিন পবন মোর সমূহ দুঃখ দেল॥

এত আয়োজন এত আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ব্যর্থ হইয়া গেল দেখিয়া বিরহিণীর অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করিয়া যে

কয়টি কথা ভাসিয়া আসে তাহার গভীরতা অনুভব করিয়া আমরা বিস্মিত হই –

ভাতী কটহু, বুধি কইহু
কটহু গন্ধমালতী।
ফুলের বাসে নিদ নাহি আসে
পুরুষ নিঠুর জাতি।
ঘরে আগে ফুলের বাগে
কি সুখ লাগিয়া কইহু।
মধু খাইতে খাইতে ভ্রমরা মাতল
বিরহ আলাতে মৈহু।
সুতরাং— উজল চাঁদিনী রাতি
মন্দিরে কনক বাতি
সব তেল আন।

এমনি বর্ষের পর বর্ষ নিষ্ফলে কাটিয়া যাইতে লাগিল। এমনি বর্ষের পর বর্ষ বসন্ত তাহার সমস্ত সম্পদ লইয়া বিরহিণীর শূন্য হৃদয়ে নিষ্ফল আঘাত দিয়া হাহাকার করিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল—কিন্তু মাধব আসিল না। কাজে কাজেই রাধিকার দুঃখ চিরবিরহের কান্নার মত আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং মনে হয় যেন মাধবকে না পাওয়া অবধি সেই ক্রন্দনের অবসান নাই! সুতরাং আজও আমরা তাহাকে মাধবীতলায় তেমনি আক্ষেপ করিতে দেখিতে পাই—

সখিরে, বরষ বহিয়া গেল বসন্ত আওল
কুটিল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা॥
আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন পসরা রতন ধন
কাঁচের সমান ভেল॥

কবি তাহার নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্বের উপর প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা নিখুঁত হইয়াছে। সমগ্র বিরহ 'পালা'র অনুভূতি আমরা এই প্রকৃতির ভিতর দিয়াই পাইয়া থাকি এবং এই প্রকৃতির ভিতর দিয়াই আমরা নায়িকার দুঃখ বেশী করিয়া অনুভব করি ও তাহা আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করিতে সমর্থ হয়।

যাহা হউক, তার পর বসন্তের এক শুভ মুহূর্ত্তে বিরহিণীর এই দীর্ঘ বিরহজ্বালার অবসান হইল। প্রেমিকা প্রেমিকের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া উল্লসিত হইল –

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তর উল্লাস।
• •
রতন পালঙ্ক পর বৈঠল দুঁহুজন
দুঁহু মুখ হেরই দুঁহু আনন্দে।
• • • •
আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।

এতদিন মাধবের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীমতী রাধিকার অন্তরে মলয়ানিল এবং নির্ম্মল চন্দ্র কোন সুখের উৎপাদন করিতে পারে নাই। আজ তাহার আগমনে রাধিকাকে আনন্দ দিবার নিমিত্তই যেন মলয়ানিল এবং নির্ম্মল চন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। এই বসন্তই প্রণয়ীর সম্পদ এবং বিরহীর সম্যক বিষাদের কারণ। আজ রাধিকার অন্তরে কোন দুঃখ নাই, কারণ সে আজ বিরহিণী নহে—সে তার হৃদয়-বল্লভকে পাইয়াছে এবং আজ ফুলশেল আর তাহাকে কাঁটার মত বিঁধে না। তাই তাকে উদ্ভসিত হইয়া বলিতে দেখি—

এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা গুঞ্জুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥

অতএব বিরহের 'পালা'র মতন মিলনেরও সমগ্র অনুভূতি আমরা এই প্রকৃতির ভিতর দিয়াই সম্যক্ উপলব্ধি করি।

বর্ষার অন্যান্য কবিগণ হইতে এই কবিকে আমরা একটু স্বতন্ত্রভাবে পাই। অন্যান্য কবিদিগের মত তিনি বর্ষার

প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া আঁকিয়া রাখিয়া যান নাই। বর্ষার সময় সৌন্দর্য্যভাণ্ডার তিনি তাঁহার নায়ক-নায়িকার পরিচ্ছদ এবং অন্য প্রাত্যহিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার খরচ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য তিনি বর্ষা ছাড়া অন্যেরও সাহায্য লইয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও বর্ষার রূপ বর্ণনাকালে কবির উৎসাহ আমরা বেশী করিয়াই পাই—

নব জলধর রূপ যুবতির মন মোহে গো
সেহি জলে যেতে করি মানা।

বৃষভবিজয়ী বালা মেঘে সৌদামিনী কলা
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে।

নবীন কিশোরী মেঘের বিজয়ী
চমকি চলিয়া যায়।

ভাব-সম্মিলনের মধ্যে চণ্ডীদাসের কাব্যের যেখানে শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করা যায় তাহা আমরা এই বস্তুবার রূপের ভিতর দিয়াই সম্যক্ উপলব্ধি করি—

কিবে শুভ বরিষন উলসিত লোচনে
দুঁহু দোঁহা হেরি মুখছান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলন
দুঁখিল চকোর চাকে॥

ভক্ত বৈষ্ণব প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যেরূপ নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহা এই প্রকৃতির সার্থক সন্তান স্বভাবকবিগণের দ্বারাই সম্ভব। এই অমর কবিগণ প্রকৃতির সহিত এমনভাবে বিজড়িত ছিলেন যে তাহা তাঁহাদের হৃদয়ে যাহাই রেখাপাত করিয়াছে তাহাই অনবদ্য সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাসের ভিতরেও আমরা প্রকৃতিকে রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার রচনাতে ধরা দিতে দেখিলাম; ইহাই তাঁহার কাব্যমন্দাকিনীর উৎসমূল—এবং ইহা আমাদের হৃদয়ে চিরন্তন হইয়া থাকিবে।

বৃত্তাকার আল্‌পনার প্রাণবস্তু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুধাংশুকুমার রায়

বাংলা দেশের প্রাচীন চিত্রশিল্পে সাধারণতঃ রেখাঙ্কনের প্রাধান্যই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। স্পষ্ট ও নির্ভীক রেখাপাত বাংলা পটুয়াদের ছবিতে যেমন দেখিতে পাই এমন আর কোথাও নহে। সেই বাংলা দেশের মহিলারাও যে আল্‌পনা দিতে বসিয়া রেখাঙ্কনে অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছন্দতাকে মূর্ত্তীভূত করিতে পারিয়াছেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আল্‌পনায় রেখাপাতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ—সংহতি। আল্‌পনার 'লতা' ও 'পটী'গুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে যদিও ইহারা নিশ্চিতভাবে বৃত্তাকারে বর্ত্তমান থাকে, এবং শেষ সংস্থিতি (stoppage) বলিয়া কিছু না থাকায় শিল্পীকে রেখার শেষ সংস্থিতির জন্য কোনই প্রচেষ্টা করিতে হয় না; তথাপি কখন কখন 'লতা', মধ্যস্থিত মূলরেখার ঢেউখেলান ছন্দের উভয় পার্শ্বস্থিত 'রেখা-পরিপূরক', কুণ্ডলী, অপরা ফুল ইত্যাদির এবং 'পটী'গুলির ক্রমিক ঠাটের পার্শ্বস্থিত বেষ্টনী প্রভৃতির অঙ্কনে অপূর্ব্বরূপে সংহতি দান করা হইয়া থাকে। কোনও প্রকারে এলোমেলো ভাবে অঙ্কিত না করিয়া প্রত্যেকটিকেই বৃত্তাকারে ক্রমে ক্রমে ভিতরে কুণ্ডলী টানিয়া, অবশ্য প্রত্যেক ঠাটের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া, স্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্থিতির উপরেই 'লতা' ও 'পটী'র সৌন্দর্য্য অনেকখানি নির্ভর

করে। আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

এই সমস্ত রেখ-ঠাটের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আরও দেখা যায় যে, ইহা সর্ব্বদাই চাপ্টা (flat) প্রকৃতির। আদর্শ বস্তুর (model) আকৃতির অনুসরণ করিলেও উহা কখনও আদর্শ বস্তুর খুঁটিনাটি (details of form) দেখাইতে চেষ্টা করে না।

'লতা'

পূর্ব্ববর্ত্তী এক প্রবন্ধে ইহা বলিয়াছি যে, 'ক্রমপুষ্ট' আলপনার রিতির অংশ যাহা 'লতা'র সমাবেশে সৃষ্ট তাহা দুইটি ধারায় বিভক্ত। এবং ঐ দুই ধারাকে গ্রাম্য ভাষায় 'লতা' ও 'পতী' বলে। লতার প্রকৃতির মূল কথা এই যে উহার সকল অঙ্গ একটিমাত্র মূলরেখার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হয়। কখন কখন ঐ মূলরেখাটি বক্র ঢেউ-খেলান ও কখন কখন সমান হইলেও উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতঃই একমাত্র মূলপথের দিকে ভাবকেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া

[illegible]

চলে। এবং কখনও উহার কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে মূল-রেখা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অঙ্কিত করা হয় না। তবে এমনও কোন কোন লতা আছে যাহার মূল ভিত্তি আদপেই কোন প্রকার মূলরেখার উপর নির্ভর করে না। তাহা কেবলমাত্র কোন এক বিশেষ ঠাটের অগ্রপশ্চাৎ পরস্পর সংযোজনার দ্বারা সৃষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়ের 'লতা' যাহার বিকাশ মূলরেখার উপর নির্ভর করে, কখনও কখনও দেখা যায় উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ একমুখী কিন্তু উহার বিস্তৃতির ধারা বহির্মুখী। ধানের শীষের ঠাটটির বহিরঙ্গের বিস্তৃতি মূল-রেখার উভয় পার্শ্বে সমভাবে বর্ত্তমান। কিন্তু সচরাচর ঐ-প্রকার 'লতা' দেখা যায় না। তবে উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত 'লতা' আরও দুই একটি চোখে পড়ে কিন্তু তাহার বহিরঙ্গের বিস্তৃতিই বৃথা ও বড়, এবং নিরাঙ্গের বিস্তৃতি অপ্রধান ও ছোট। এই ধরণের লতা প্রায়শঃ ঢেউখেলান হইয়া থাকে। এবং ঐ ঢেউয়ের ক্রম-বক্রতার দ্বারা যে রঙ্গ সৃষ্ট হয়, তাহার বাহিরে ও নীচে ক্রমান্বয়ে উহার অনুসরণ ফুলের, পাতার বা কুঁড়ির নানাবিধ ঠাট সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় মূলরেখা একটি না হইয়া পাশা-পাশি দুইটি থাকে। 'ধানের শীষ' লতার যে দুইটি ঠাট দেখা যায়, তাহার দুইটিতেই মূলরেখা একটি নহে দুইটি।

এক পার্শ্বে বিস্তৃত 'লতা'র মধ্যে একটি হেলান (slanting) ক্রম-সজ্জিত শঙ্খলতার ঠাট দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অনেকগুলি নানা ধাঁজের শঙ্খলতার মধ্যে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঠাট। * একটি সহজ রেখার উপর ইহার ভিত্তি। শঙ্খলতার আর যে কয়টি ঠাট আছে তাহাদের কিন্তু কোন মূলরেখার উপর ভিত্তি নাই। এক-প্রকার শঙ্খলতা কয়েকটি 'লতা কুণ্ডলী'র ভিত্তির উপর সৃষ্ট। প্রত্যেক কুণ্ডলীর উপর-নীচে উভয় দিকেই জমাট করিয়া শঙ্খাকারে গোলা টানিয়া দেওয়া হয়।

একটি পুরাতন ধরণের লতার প্রচলন আছে যাহার মূলরেখা দুইটিও ঢেউখেলান হইলেও উভয় পার্শ্বের অঙ্গের বিস্তৃতি সমান; কিন্তু উভয় পার্শ্বে যে চারিটি করিয়া পাতা অঙ্কিত হয় তাহার 'ধরণ' উভয় দিকেই সমান নহে। বহিরা-ভিমুখের পাতা চারিটির মূল একই স্থানে ও মূলরেখার সহিত অসংলগ্ন, কিন্তু নিরাভিমুখের পাতা কয়টির মূল ভিন্ন ভিন্ন

* দ্রষ্টব্য, ১৩৩৮ সালের বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত 'শঙ্খলতা'র আলপনার দ্বিতীয় লতা প্রভৃতি।

ও প্রথম মূলরেখার সহিত সংলগ্ন। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার লতা আছে যাহার মূলরেখাও নাই অথবা লতার অংশগুলিও পরস্পর সংলগ্ন নহে। উদাহরণ স্বরূপ কুণ্ডলী-লতার নাম করা যাইতে পারে। কয়েকটি কুণ্ডলী দিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি ঘনাট ছোট কুণ্ডলী পর পর সজ্জিত করিয়াই ইহার সৃষ্টি। অজন্তার ছাদ-চিত্রে এক প্রকার লতা দেখা যায়। যাহার প্রত্যেকটি 'ঠাট' কয়েকটি আড়া আড়ি রেখা দ্বারা বিভক্ত। আল্‌পনায়ও অবিকল অনুরূপ ঠাট দেখিতে পাওয়া যায়। (চিত্রে দ্রষ্টব্য)

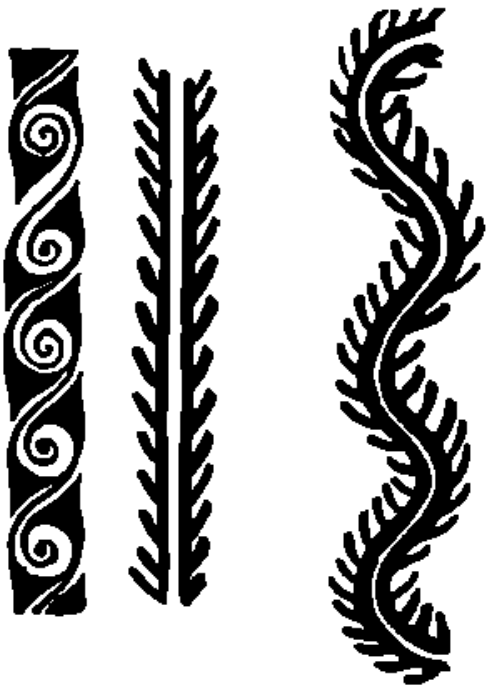

১। পদ্মলতা, ২। ঢেউ খেলান লতা; ৩ বাঁকা ধনের লতা

'পাট' লতার ঠাটটি বেশ মজার। একই রেখাকে উপরে টানিয়া কুণ্ডলী দিয়া পরে আবার নীচে টানিয়া কুণ্ডলী দিয়া এই সুন্দর লতাটিকে প্রকাশ করা হয়। অন্য আরও দুইটি লতার বিষয় বলিয়া লতার প্রসঙ্গ শেষ করিব। প্রথমটি একটি ঢেউখেলান রেখার ফাঁকে ফাঁকে একটি মাত্র ঘনাট ত্রিকোণাকার পরিপূরক অঙ্কিত করিয়া শেষ করা হয়। অন্য কোন প্রকার অভিরণসুক্ত হইয়াও এই লতাটিকে ভালই দেখায়। অনেক সময় এই লতাটির মূলরেখার ঢেউয়ের আকৃতি ত্রিকোণাকারও হইয়া থাকে। অন্য লতাটি একটু অলঙ্কারবহুল। উহার মূলরেখা 'সরল' ও নহে, ঢেউ-খেলানও নহে। উহাতে চারিটি রেখা। অন্তর্বর্তী দুইটি রেখা পরস্পর সমান্তরাল ভাবে কাটাকাটি করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এবং ঐ পরবর্তী রেখাদ্বয়ের উপর হইতে উভয় পার্শ্বেই তিনটি পত্রযুক্ত পরিপূরক অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। ভিতরে কুইনের টেক্কার মত যে সকল ফুল হয় তাহাতেও অনুরূপ আকৃতির ছোট 'ঘনাট' অঙ্কিত করা হয়। অনেক সময় ত্রিকোণাকার পরিপূরকের বদলে চারিটি করিয়া 'কোঁট' দেওয়ার রীতির প্রচলন আছে। এইরূপ বহু লতার প্রচলন আছে তাহাদের বিষয় আলোচনা করা এস্থলে অসম্ভব।

'পটা'

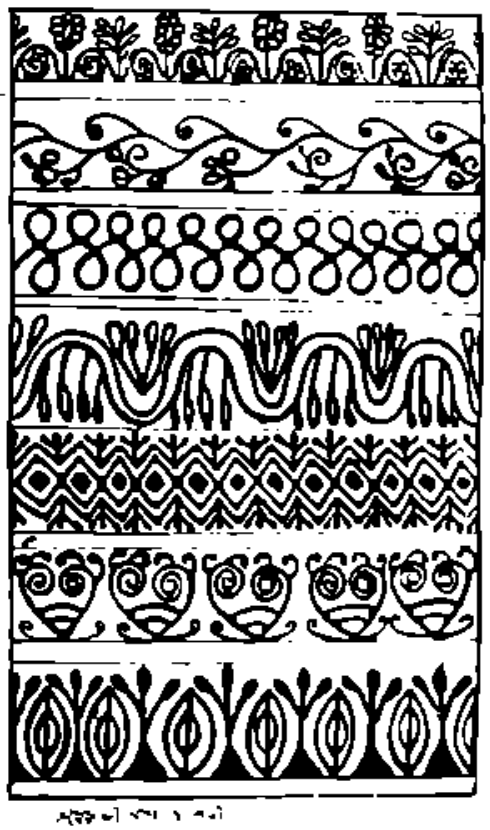

গতি-ছন্দের উপর নির্ভর করিয়া পটীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্তৃতির আরম্ভ হয় না অথবা কোনও মূলরেখার উপর

শার্থে ইহা প্রসার লাভ করে না। কেবল মাত্র যে সাধারণ বেষ্টনী মূল-পত্রকে আপনার অন্যান্য অঙ্গ হইতে পৃথক করিয়াছে, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া পটীর ঠাটগুলি প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা কেবল মাত্র তাহার অবলম্বন বা পাদ-রেখা—'মেরুদণ্ড' নহে। অনেক সময় পটীকে দুই থাকে বিভক্ত দেখা যায়। তবে ঐ দুই থাক পরস্পর রেখার অনুরূপ গতিতে ও ভাবের সঙ্গত-তালে অঙ্কিত হয়। ঐ-সমস্ত পটীর উপর ও নিম্ন দুইটি রেখা দ্বারা বেষ্টনী দেওয়া থাকে, তাহাতে পরবর্ত্তী অংশ ও পটীর বিস্তৃতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়।

এক প্রকার পটী (গত শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) মূল-পত্রের পরে ছেদ রেখার উপর হইতে অঙ্কিত হয়। মূলরেখার উপরে ত্রিকোণাকার ঠাট সকল উপর-নীচে করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত। সাধারণতঃ নিম্নদিকে যেমন একটি মূলরেখা থাকে এই পটীটির উপর দিকেও তেমনি একটি রেখা অঙ্কিত করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রাভিমুখের রেখাটিই এই পটীর মূল-অবলম্বন (platform)। পটীর মধ্যস্থ যে দুইটি রেখা এবং মূল-অবলম্বন রেখা মিলিয়া এক একটি 'ত্রিকোণ' সৃষ্টি করিয়াছে, ঐ পার্শ্ব-রেখাদ্বয়ের মধ্য ভাগে জমাট-পূরক অঙ্কিত করা হয়। এবং নিম্ন দিকে মূলরেখা হইতেও প্রত্যেক ঠাটের ছন্দানুযায়ী এক একটি জমাট-পূরক অঙ্কিত হয়। পূর্ণ দুইটি ঠাটের মধ্যে যে ত্রিকোণাকার স্থান থাকে—তাহা কয়েকটি জমাট পাতা দিয়া পূরণ করা হয়। এই পটীটি খুব ভাল ও পুরাতন ধরণের। এতদ্ব্যতীত আলপনার অন্য-পটী ও অনুরূপ আরও কয়েকটি পটীর প্রচলন আছে।

শিমূল তুলা যে ফলের ভিতর জন্মে তাহাকে গ্রাম্য ভাষায় 'পাকড়া' বলে। ঐ পাকড়া ফলের আকৃতি অনুসারে অঙ্কিত একপ্রকার 'পটী'র প্রচলন আছে তাহাকে 'পাকড়-পটী' বলে। মূল-অবলম্বন-রেখার (platform) উপর হইতে পরপর 'পাকড়া'গুলি অঙ্কিত হয় (চিত্রে দ্রষ্টব্য)। তৎপরে প্রত্যেক দুইটি 'পাকড়া'র ভিতরে এক একটি 'ঝাড়' অঙ্কিত করিয়া পটীটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলা হয়।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গলক্ষ্মীর রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

বঙ্গলক্ষ্মী তব করিবে অর্চ্চনা
আলিম্পনে লক্ষ্মীর চরণপদ্ম আঁকি',
উটজ শিল্পের করিয়া রচনা
দর্শকের মুগ্ধ করি' আঁখি॥

যা-কিছু বাড়ায় প্রাচ্যের মহিমা,
লুপ্ত স্মৃতি,অতীত দিনের বন্দ মান,
নৃত্য-গীতসুর, বীরত্বগরিমা,
সাধকের সহজিয়া গান॥

তা দিয়ে সাজায়ে বরণের ডালা,
জেলে নিয়ে মঙ্গলপ্রদীপে দীপাবলী,
শতদলে ভরি' পূজা-পুষ্পথালা
আরাধনা করিবে কেবলি॥

তব শুভ শাঁখি' তুলসীর তলে
সলজ্জে করিবে প্রণতি সন্ধ্যালোকে,
শূন্যার নির্ম্মালা পাখিরা কুতুলে,
ওঙ্কিমার স্নিগ্ধ কালো চোখে।

মালয়ের নরনারী

শ্রী সুবিমল সরকার বি-এস্‌সি

প্রাচ্য-সভ্যতার গ্রাম গ্রামে। মালয়ের পক্ষে একথা বিশেষভাবে সত্য। এরা সহরের হট্টগোল ও আধুনিক জীবনের টানা-হেঁচ্‌ড়া পছন্দ করে না। এরা যে অতি শান্তিপ্রিয়, তা মালয়ীর 'কাম্পোং'-জীবন প্রমাণ করবে।

মালয়ীরা বড় রাস্তার ধারে ঘর বাঁধতে রাজী নয়। একটু তফাতে—লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালার ভিতর মালয়ী গ্রাম। মালয়ী 'কাম্পোং'এ আমাদের দেশের গ্রামের মত স্থানের জন্য মারামারি নেই। ঘরগুলি বেশ ফাঁকা ফাঁকা—এজন্য মরলা ফেলা বা সীমানা নিয়ে কোনো কলহ নেই।

মালয়ীরা ঘর বাঁধে পাহাড়ের নীচে, কখনও বা সমুদ্রের উপর। এদের জলে বাস করতে ভারী আনন্দ। ঘরগুলো সেজন্য খুঁটীর উপর, মেঝে মাটি থেকে হাত দুই উঁচুতে।

মালয় এখনও অরণ্যসঙ্কুল, নানাপ্রকার জীবজন্তুর রাজ্য। মালয়ীরা কিন্তু জঙ্গলে বাস করতে ভয় পায় না। বোধ হয় এরা নিরীহ বলে' জীবজন্তুরাও আক্রমণ করে না।

মালয়ের জাতীয়তার প্রতীক হ'চ্ছে ক্রিস (কিরীচ ?)। ক্রিস তাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র মাত্র। অনেকে মনে করেন, মালয়ীরা অত্যন্ত হিংস্রস্বভাব। এটা একটা প্রকাণ্ড ভুল। ক্রিস যে কি ভাবে জাতীয় প্রতীক হ'ল আশ্চর্য্য।

অল্পে তুষ্টি মালয়ী স্বভাবের বিশেষত্ব। এরা বাজারে জিনিষপত্রের দরাদরি পছন্দ করে না; বাজারে জিনিষ কিনতে গেলে, যে দাম যে দিতে পারবে তাই বলবে। তাতে যদি না পার বলবে 'টিডাপা'—অর্থাৎ মাপ করবেন, মনে কিছু করবেন না। এই 'টিডাপা' শব্দটা মালয়ী প্রকৃতির আসল পরিচয়। মালয়ী সভ্যতা বোঝবার চাবি হ'চ্ছে এই শব্দ।

অবশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে এর অর্থ হ'চ্ছে তাদের আলস্য, শ্রমবিমুখতা, প্রচেষ্টার অভাব ইত্যাদি। কিন্তু এদের স্বভাবের নিষ্ঠতা, সহজতৃপ্তা দৃষ্টি শুধু অভাবের পরিচয় নয়, অন্তরের ঐশ্বর্য্যেরই নিদর্শন।

মালয়ীরা বেশ ধর্ম্মপরায়ণ। এরা মুসলমানধর্ম্মী হ'লেও এদের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু-কৃষ্টির বিশেষত্বগুলি লোপ পায়নি। মুসলমান ধর্ম্মের সাময়িকতা এদের জীবন-দর্শনে স্থান পায়নি।

মালয়ীর জীবনের আদর্শ হ'চ্ছে 'সেনাং' হওয়া—অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হওয়া, কর্ম্মমুক্ত হওয়া। কর্ম্ম এদের মতে শুধু জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। দেহের প্রয়োজন মিটলে কর্ম্মের আবশ্যকতা কি? অনর্থক বিষয়বাসনা দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ এরা নেহাৎ বেকুবি মনে করে।

মালয়েসিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বোধ হয় এই দর্শনের মূল নিহিত। যেটুকু কাজ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজন সেটুকু শেষ করে' ঘরের দাওয়ায় বসে' প্রকৃতি-রাণীর রূপসুধা পান করে' এরা জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করে। তাদের চিরসবুজ দেশের উপর মেঘের বিচিত্র বিন্যাস দেখে এরা সময় কাটিয়ে দেয়।

মালয় দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিকেতন। পাহাড়-গুলির উদ্ভাসিত অবয়বের উপর সবুজের পোঁচ একটু গভীর ভাবেই টেনে দেওয়া। তার উপর যখন সূর্য্যের আলো মেঘের বুহ্য ভেদ করে' সোনালী রং ঢেলে দেয় তখন ধরিত্রী যেন অপূর্ব্ব আনন্দে স্নান করে' উঠ্‌লেন মনে হয়। পাহাড়ের গায়ে ঘনসংবদ্ধ গাছগুলি আর একটু আলো আর একটু বাতাসের জন্য কী আগ্রহভরে মুখ হ'য়ে রয়েছে! অনেকদিন সকালে সূর্য্য উঠ্‌তেই প্রায় ৯টা বেজে যায়, কোনোদিন বা ওঠে না। সারা রাত্রি বাতাসের আলোড়নে প্রান্ত হ'য়ে ভোরে মেঘগুলি পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে। সূর্য্যদেব এসে এদের খুব তাড়িয়ে যখন আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করেন, তখন বাধে যুদ্ধ। সে

রঙের পরিবর্ত্তন হয় কোনোদিন মেঘের জন্যে কোনোদিন বা পরাজয়ে।

মালয়ে বৃষ্টি সাধারণতঃ বিকাল বেলা হয়। স্তরে স্তরে ঘন-কুণ্ডলিত মেঘদাম যখন মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হয়, তা দর্শকের চোখে নীল অঞ্জন লাগিয়ে দেয়। এই স্তরবিন্যস্ত মেঘ কোনোদিন অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরে' অনন্ত রাগিণীর সৃষ্টি করে; কোনোদিন বা পুঞ্জীভূত মেঘদাম ভেদ করে' অস্তগামী সূর্য্য পর্ব্বতশৃঙ্গে গৌরবময় স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেয়। আর মেঘগুলি পর্ব্বতরাজের সেই রাজরূপ দেখে দুঃসহ হর্ষে বিচিত্র বর্ণলীলায় ফেটে পড়ে। কখনও বা বিরাট ইন্দ্রধনু উদার আকাশের তলে বৃহৎ তোরণ সাজিয়ে পর্ব্বতরাজের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত হয়।

এই আয়োজনের মধ্যে মালয়ী যে কেন অনাবশ্যক কর্ম্ম ত্যাগ করে' 'সেনাড' হ'তে উৎসাহী—তা কল্পনা করা কঠিন নয়।

মালয়ীর জীবনযাত্রা অতি সাদাসিধা। বাড়ীর পাশেই ধানের ক্ষেত—এই ক্ষেতে স্ত্রীপুরুষ মিলে কাজ করে। জমি অতি উর্ব্বর, একটু পায়ে হাত দিলেই অজস্রশিহরণ জেগে উঠে। এরা ক্ষেতে জল বেঁধে বা ঘাস হয় তাই দিয়ে পচান করে। এরা গরু বা কোনো জানোয়ার চাষের জন্য ব্যবহার করে না; মাটিকে বেশ নরম করে' নিয়ে ওর ভিতর ধানের চারা বসিয়ে চলে' আসে। বাড়ীতে কয়েকটা নারকেল গাছ, আর নিকটের নদীতে নৌকা। নদীর মাছ, ক্ষেতের ধান ও নারকেল এদের প্রায় সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। বাড়ীতে অনেকে মুর্গি পোষে। অনেকের একফালি জমিতে কয়েকটা রবার গাছ আছে। রবারের আঠা থেকে সীট্ তৈরী করে' নিয়ে অথবা মুর্গি নিয়ে এরা দোকানে যায়—এর বদলে কাপড়, লবণ, দেশলাই প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিষ কিনতে।

মালয়ী নারীরা পুরুষের সকল বিষয়েই সাহায্যকারিণী। ক্ষেতের কাজ, এমন কি নৌকা চালাতেও এরা বেশ তৎপর। নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশী কর্ম্মঠ মনে হয়, ঠিক ব্রহ্মদেশের মত। মেয়েরা এই জন্যই বোধ হয় তামাক খায়—সিগারেটের মত করে' পাতায় জড়িয়ে—একে ওরা বলে 'রোকো'।

মালয়ে নারী পর্দ্দাপাশ মুক্ত। এজন্য স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অনেক সাবলীল। এরা 'কাইন তোয়োং' বা ঘোমটা পরে অবশ্য সে মুখশ্রী বাড়াবার জন্য।

সকল মুসলমানবঙ্গী দেশেই বহুবিবাহ প্রচলিত—এক নবীন তুরস্ক ছাড়া। মালয়ে মুসলমান ধর্ম্মের সাথে বহুবিবাহ আমদানী হয়েছে। তবে আর্থিক কারণে বহুবিবাহ ক্রমেই কমে' যাচ্ছে। মালয়ী নারীর বিবাহের বয়স ১২ থেকে ১৬ বৎসরের ভিতর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য ১৮ বৎসরের মধ্যে এরা বাগ্‌দত্তা হ'য়ে থাকে।

মালয়ী কাম্পোংএ গেলে প্রথমে যা চোখে পড়ে তা হ'চ্ছে পরিচ্ছন্নতা এবং বাড়ীর চারিধারে সুন্দর ফুলের বাগান। আর দেখা যাবে বাঁশের মাচার ওপর নানা রঙের মালয়ী নারীর পরবার সারোঙকুবায়া রোদে দেওয়া। মালয়ী নারীরা গভীর রঙ বড় ভালবাসে। সরোঙের উপর নানা-প্রকার নক্সা কাটা এবং জীব-পক্ষী প্রভৃতি নানা অবয়ব জীব আঁকা। সব চেয়ে ভালো কাপড়—কাইন বাটীক্—পহঙ্গ থেকে আসে। কাপড়ের গভীর রঙ মালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনে বেশ মানিয়ে যায়।

মালয়ে প্রকৃতি কখনও বিনয়-নম্র বেশে দেখা দেয় না। আকাশের গভীর নীল, গাছপালার সতেজ সবুজ, দূরের পাহাড়ের ঘোঁয়ার মতো কালো রঙ, পরিবেষ্টন হ'চ্ছে এই। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—সে যেন কালো পর্দ্দার মত হঠাৎ পৃথিবীকে অবগুণ্ঠিত করে' ফেলে। আবার যখন মেঘ কেটে রোদ বের হয় তখন চারদিককার সবুজের ওপর সোনালী মলমলের ওড়না উড়িয়ে বিচিত্র উৎসব চলতে থাকে।

মালয়ী নারীরা চুলের বেণী ঘর বেঁধে না। এরা এলো-খোঁপা বাঁধতেই ভালবাসে। এরা সাধারণতঃ পায়ে সোনার মল পরে এবং তার তলে থাকে ট্রোম্পক বা ঘুঙুর। চলবার সময় ট্রোম্পকের শব্দের সাথে মলের শব্দ মিশে যে রাগিণী সৃষ্টি করে তা মালয়ীর কানে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে।

রূপার গহনা পরা এরা লজ্জার বিষয় মনে করে, নেহাৎ দরিদ্র হ'লেও সামর্থ্য-মত এরা কম ওজনের জিনিষ পরবে—তবু রূপা ব্যবহার করবে না। মালয়ী গহনার প্যাটার্ণের নিজস্বতা আছে। যেমন, হার দেখতে সাধারণতঃ স্বর্ণমুদ্রার

মালায় মত। হাতের গহনা (হেলাং) খুব সরু সোনার চেনের, যেন দেহের কোমলতার সাথে মিশ খায়।

গ্রাম্য মালয়ী নারীরা প্রসাধনের বেশী প্রিয় নয়। এরা মুখে যে 'বুডা' (পাউডার) মাখে তা চালের গুঁড়া ছাড়া কিছু নয়। ধানের ক্ষেতের উপর নত হ'য়ে অনেক ক্ষণ কাজ করছে মুখে 'বুডা' মেখে—এ একটা সাধারণ দৃশ্য।

মালয়ের গল্প-উপকথার মধ্যে দৈত্য-পরী এই সবের খুব প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সেই রাজপুত্র, বন্ধু, বন্দিনী রাজকন্যা এই সবই এদের বালকবালিকাকে আনন্দ দেয়। তা ছাড়া বশীকরণ, যাদুবিদ্যা, জলপড়া প্রভৃতিতে এদের অগাধ বিশ্বাস।

মালয়ীরা পুরানো আচার ব্যবহারের বড় ভক্ত। কোন শুভ কাজ আরম্ভ করতে গেলে, একটা বড় জলের পাত্র নিয়ে এসে তাকে মন্ত্রপূত করে' নিয়ে, পরিবারের, গ্রামের বা রাজসভার সকলে সেই পাত্রে দুহাত ডুবিয়ে নিজেদের পবিত্র করে' নিয়ে কাজে যোগ দেবে। এই প্রথাকে এরা বলে 'তোলোক আয়ার বোনা'। গ্রামে মড়ক, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হ'লেও এ প্রথার অনুষ্ঠান করে' থাকে।

মালয়ের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস খুবই আধুনিক, তবু এদিকে যে খুব দ্রুত প্রসার হ'চ্ছে একথা স্বীকার করতেই হবে। মালয়ের প্রতি একশত ছেলে পিছু ২৭টি মেয়ে স্কুলে যায়। বাংলা দেশে এ তুলনায় ২৪টি মাত্র। তবুও বাংলা দেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস বৎসরের কাছাকাছি হ'তে চল্‌ল। এ বিষয়ে যবদ্বীপ খুবই অগ্রসর, মহীয়সী মহিলা 'কার্ত্তিনী'র প্রচেষ্টার ফলে। যবদ্বীপের দৃষ্টান্ত মালয়ীদের স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে কুসংস্কার তা অনেকটা দূর করেছে। তবু সংস্কারের বাঁধ ত সহজে নষ্ট হয় না—১৯৩০ সালের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট থেকে নিয়ে একটু তুলে দিলাম—

"Malay parents viewed with much suspicion the one or two schools established by the Government. They thought a knowledge of reading and writing would promote love-letters and intriguing, they were nervous about allowing their girls to traverse streets unaccompanied, the mothers disliked losing the services of their daughters and self-satisfied parents thought they could pick up cookery and needle-work as well at home as at school."

অর্থাৎ "গভর্ণমেণ্ট যখন স্কুল খুললেন, মালয়ী বাপ-মা'র মনে সন্দেহ জাগ্‌ল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লে প্রেমপত্র আর ষড়যন্ত্র চারদিক ছেয়ে যাবে। মেয়েরা একলা রাস্তায় যাতায়াত করবে এ চিন্তা বাপের মনে জাগাল শঙ্কা, মেয়েরা স্কুলে গেলে ঘরের কাজে তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না মায়েদের এটা ভাল লাগ্‌ল না—আত্মতৃপ্ত বাপ না ভাব্‌লেন রান্না আর সেলাইএর কাজ বাড়ীতে ইস্কুলের চেয়ে এমন কিছু খারাপ শেখা যায় না।"

প্রথমে গ্রামের মণ্ডল আর শিক্ষক তাদের মেয়েদের দু' এক বছরের জন্য ছেলেদের স্কুলে পাঠান সুরু করলে। দেখাদেখি আরও অনেকে ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে। এখন মালয়ে ৮০টা মেয়ে-স্কুল ও ৫০০০ ছাত্রী আছে।

মালয়ের শিক্ষাপ্রচারের হার দ্রুত। এর ফলে জীবন-দর্শনের খুব দ্রুত পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। মালয়ে এখনো জাতীয়তার কোনো সাড়া নেই। ইংরাজী আদর্শানুযায়ী এদের শিক্ষাপদ্ধতি গড়া। ভবিষ্যতে এদের কাল্পোৎ-জীবন কি আকার ধারণ করবে তা বলা বড় মুস্কিল। আশা করা যায় এরা নিজেদের শিক্ষার দুষ্টুক সব কালক্রমে সংশোধন করে' নিয়ে মালয়ী কৃষ্টির বা নিজস্বতা তা বজায় রেখে বহির্জগতের সাথে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে।

বাহিরের পথে

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ম্যাঞ্চেষ্টার

সময় বাঁচাতে গিয়ে দেখি যে, যে ট্রেনে ম্যাঞ্চেষ্টার পৌঁছলাম তাতে অনেক রাত হ'য়ে গেল। বিদেশে অজানা-অচেনা জায়গায় বেশী রাতে পৌঁছলে হোটেলে ঘর পেতে অসুবিধা হয়—বিশেষতঃ আমাদের দেশী মেয়ে সঙ্গে থাকলে আরো মুস্কিল।

ষ্টেশনে নেমে নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিষপত্রে ভর্ত্তি একটি ছোট সুটকেস (যা অনায়াসে হাতে নিয়ে চলা যায়) ছাড়া বাকি সব জিনিষই লাগেজ-রুমে রেখে দিয়েছি। তাতে কিছু বেশী পয়সা লাগে বটে, কিন্তু অনেক হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচা যায়।

ষ্টেশনের বাইরে এসে দেখি দোকানপাট সব বন্ধ—পথে লোকচলাচলও যেন কমে' আসছে। তখন ছ'সা ছ'টা ঘড়ি দেখতে—দেখি রাত এগারটা বেজে গেছে। উত্তরেই শুনেছি শুনি পাছে হোটেলের দরজা সব বন্ধ হ'য়ে যায়। তাড়াতাড়িতে আমরা আগে থেকে কোন হোটেলেই ঘর 'বুক' করে' রাখিনি, কাজেই স্থান পেতে মুস্কিল হ'তে পারে। তা ছাড়া, অনেক হোটেলে ঘর থাকলেও কালো চামড়ার জন্য স্থান নেই। শীতের দেশে হোটেলে জায়গা না পেলে রাত কাটাই কোথায়? মনে মনে ভয়ের সঙ্গে বিরক্তিও এসে গেল। ডাক্তারকে বললাম—"আচ্ছা, কোথাও জায়গা না মিলে, ওভারকোট মুড়ি দিয়ে রাতটা কোনরকমে ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমেই না হয় কাটিয়ে দেব। বাইরের দোকানপাট ত সব বন্ধ দেখছি, ষ্টেশনের ভিতরেই না হয় চল—সেখানে যদি দু'চারটা খাবারের দোকান খোলা থাকে, কটী একখানা কিনে নিয়ে চা হয় ভালই—নতুবা, একটু জলের যোগাড় করে' খেয়ে নেওয়া যাবে।"

ডাক্তার বল্‌লেন—"খাবার চিন্তাটা আজকার মত বন্ধ রেখে থাকার চিন্তাটাই কর। এ আমাদের দেশ নয় যে সারারাত ওয়েটিংরুমে কাটাবে—এখানে ওয়েটিং রুমে রাত কাটানোর ব্যবস্থা নেই—একখানি করে' ট্রেন পাশ করবে আর ওয়েটিংরুম হ'তে লোক বিদায় করে' দেবে। এখানে শুধু ট্রেন ধরার জন্যই লোক ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করে—রাত কাটাবার জন্য নয়। এ দেশের লোক সময়ের মূল্য জানে; ঠিক ট্রেনের সময়টিতে এসে ট্রেনে চড়ে' চলে' যায়—বেশীক্ষণ ওয়েটিংরুমে বসে' থেকে সময় নষ্ট করার সময় তাদের নেই। তা ছাড়া, এ শীতের দেশ—বেশীক্ষণ চুপ করে' বসে' থাকলে যে জমে' যেতে হবে! চল, একটা হোটেল বের করাই চাই।"

একটা কুলীকে বল্‌লাম—কাছের যে কোন হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য। সে অতি নিকটেই একটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দোরে ঘা দিতেই বেরিয়ে এল এক বুড়ী। আমরা একটু আড়ালে ছিলাম—অন্ধকারে বুড়ী আমাদি'কে দেখতে পায়নি। বুড়ী, কুলীর প্রশ্নের উত্তরে জানাল, "ঘর খালি আছে।" একথা বল্‌তেই আমরা উত্তরে সেই এগিয়ে গিয়েছি, অমনি বুড়ী আমাদের দেখে যেন চম্‌কে উঠ্‌ল—(কালো রং সুতরাং আমাদের জন্য স্থান নেই)—কিন্তু একবার বলে' ফেলেছে 'ঘর খালি আছে', তাই আমাদি'কে অন্য উপায়ে তাড়াবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"এখানে থাকবার মত খরচ দিতে পারবে ত?"

বুড়ীর চার্জ অসম্ভব বোধ হ'লেও আমরা অগত্যা তাতেই রাজী হ'য়ে জান্‌তে চাইলাম, ঘরের সঙ্গে বাথরুম ও পাইখানা আছে কিনা। বুড়ী উত্তর কর্‌লে, "সে সব ব্যবস্থা নেই, শুধু ঘর পাবে।" পাইখানার ব্যবস্থা না থাকলে কোনমতেই থাকা চলে না—তাই মনের রাগ মনেই চেপে রেখে আমি বুড়ীর কাছে গিয়ে মিষ্টিকথায় ওর মন গলাতে

চেষ্টা কর্‌লাম। নানারকম কথাবার্ত্তার পর—বিশেষ আমার সাড়ীখানা দেখে—যেন বুড়ী নরম হ'ল এবং আমার সাড়ীর প্রশংসা কর্‌তে কর্‌তে বল্‌ল—"দেখ, কিছু টাকা বেশী দিতে পার? চারতলায় একখানা ঘর আছে, তার লোক এখনো আসেনি (খাঁটি মিথ্যা কথা!)—তোমরা যখন এসে পড়েছ, তখন ঐ ঘরখানাই উপস্থিত ব্যবহার কর—বেশ ঘর—পাশেই W.C.র (পাইখানার) ব্যবস্থা আছে।"

আসল কথা—ভাবী দুর্ব্বার নয়! বুড়ী নানা কৌশলে আমাদের তাড়াতে চায় অথবা যত বেশী পারে আমায় বিশেষতঃ ঘরের দোর বন্ধ করার কোন উপায় নাই দেখে আমার ভয় হ'ল। ডাক্তারকে বল্‌লাম—"দোরে খিল বা ছিট্‌কানি নাই—শেষে কোন দাতার বা বদমাস যদি রাতে ঘরে ঢুকে পড়ে?" ডাক্তারের মনেও খট্‌কা লেগেছিল; কিন্তু মুখে বল্‌লেন—"রাতে বিশেষ সাবধানে থাক্‌তে হবে—একজন ঘুমাব একজন জেগে থাক্‌ব—এই রাতটুকু [illegible]মতে কাটিয়ে দিয়ে কাল যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে—চল নীচে গিয়ে বুড়ীর টাকা মিটিয়ে দিয়ে আসি।"

উদ্বিগ্ন চিত্তে উভয়ে নীচে নেমে এলাম। দেখি, বুড়ী খাতাপত্র নিয়ে আমাদের জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছে। আমরা

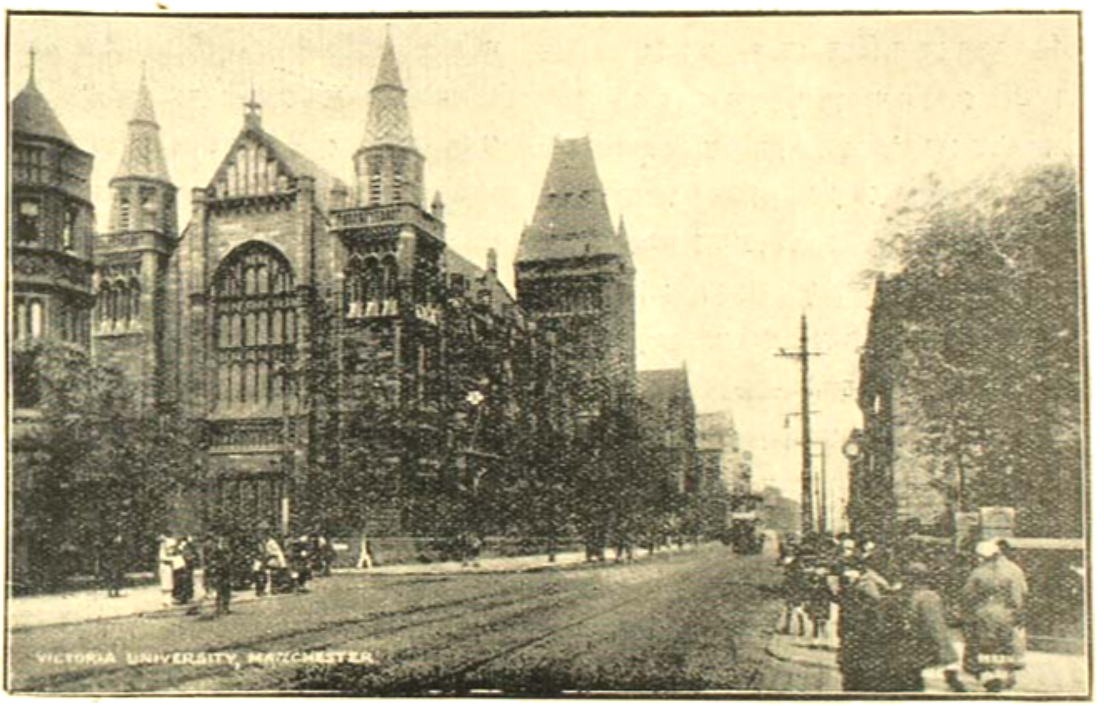

ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—ম্যাঞ্চেষ্টার

কর্‌তে চায়। আমরাও গত্যন্তরাভাবে বুড়ীর সব দাবীই স্বীকার করে' যাই।

চারতলার ঘর দেখ্‌তে গিয়ে বাড়ীটার যেটুকু চোখে পড়্‌ল তাতেই মনে হ'ল যেন ছোট লোকের আড্ডা। দেখি, ছোট একখানা ঘর—একজনের মত বিছানা—আলো যা আছে মান্‌তে দিবে না—তবে দয়া করে' একটুকরা মোমবাতি দিতে পারে—কিন্তু ঘর বিছানা একজনের হ'লেও ভাড়া দিতে হবে পুরা দুজনার। এই সমস্ত কারণে, যেতেই বল্‌লে—"টাকা দাও, আর এই খাতায় তোমাদের নাম-ধাম ইত্যাদি লেখ।" বুড়ীর দাবী অনুযায়ী হিসাব করে' সে-রাত ও পরদিনের এক বেলার জন্য টাকা বের কর্‌তেই বুড়ী বলে' উঠ্‌ল—"না, তা হবে না, তোমাদের পুরা এক সপ্তাহের টাকা দিতে হবে।"

এই অন্যায় দাবী এবং আর কি কি কথা নিয়ে ডাক্তার ও বুড়ীর বাদানুবাদ চল্‌ছে, এমন সময় পাশের ঘর হ'তে—নীচে নাম্‌বার কালে চোখে পড়েছিল যেন ঠিক ঐ ঘরটাতেই

কতকগুলি মেয়ে পুরুষ একত্রে ব'সে আড্ডা দিচ্ছিল—একটা হল্লার শব্দ কানে যেতেই ডাক্তার স্থির করে' ফেল্‌লেন যে এ-রকম কুয়াশে কোনমতেই থাকা হবে না। বুড়ীকে সম্বোধন করে' বল্‌লেন—"মাডাম, তোমার ঘর চাই না।" এবং এই কথা ব'লেই আমার হাত ধরে' রাস্তায় বের হ'য়ে পড়্‌লেন।

আমরা ধরাধর ট্রেনে চ'ড়ে এসে অনুসন্ধান নিয়ে জান্‌লাম যে "সেক্সিন্ড" যাবার অনেক গাড়ী আছে বটে, কিন্তু তথায় গিয়ে কোন সুবিধা নাই। কেন না যে গাড়ী-খানা তখনি ছাড়্‌বে সেখানা "সেক্সিন্ডে" পৌঁছবে ভোর ৫টা পরে। ম্যাঞ্চেষ্টারের এই অভিজ্ঞতার পর অত রাত্রে অজ্ঞাত গিয়ে নূতন কোন বিপদ ডেকে আনার চাইতে যেখানে আছি সেখানে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল।

ট্রেশন হ'তে বের হ'য়ে এসে আমি প্রস্তাব কর্‌লাম বাকি রাতটুকু রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক্। ডাক্তার বল্‌লেন—"হেঁটে বেড়ান যে তোমার ক্ষমতায় হ'চ্ছে না তা তোমার মুখ দেখেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। আর হ'লেও এত রাত্রে মেয়ে মানুষ সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান একেবারেই নিরাপদ নয়। চল, অন্য চেষ্টা দেখা যাক্।"

গত কয়টী দিনই আমাদের আহার ও নিদ্রার অনিয়ম চল্‌ছিল। নানা স্থান ঘুরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঠিক খাবার বা ঘুমাবার সময়ে হোটেলে পৌঁছতে পারি নি। অসময়ে এসে যা-হয়-তা খেয়ে শুয়ে পড়্‌তাম, আবার ভোর বেলা উঠেই বেড়াতে বের হতাম। অবসাদ ও ক্লান্তিতে আর এক-পা নড়্‌তেও ইচ্ছা হচ্ছিল না—তা ছাড়া, সেদিন এক রকম কিছুই পেটে পড়ে নি বল্‌লেই হয়—কিন্তু ক্ষুধায় যত না হোক্, মুখে যেন দুশ্চোখ বুজে আস্‌ছিল—ডাক্তারের অবস্থাও তদ্রূপ। আমরা বের হয়েছি দীর্ঘ দেশভ্রমণে—তার সুরুতেই দেখ কি সব বিভ্রাট! ইংরেজ মুলুকেই এই—এর পর যে দেশের আদব-কায়দা, বিশেষতঃ ভাষা জানা নেই সে সব দেশে কি হবে? একবার মনে হ'ল—কাজ নাই কোথাও গিয়ে—এডিনবরাতেই ফিরে যাওয়া যাক্।

কিন্তু মুখে ফিরে যাই বল্‌লেই ত মন তাতে সায় দেয় না। বরং তিরস্কার করে' বলে—"ছি বাঙ্গালীর দুলালী, এতটুকু কষ্ট, এতটুকু অসুবিধা সহ্য কর্‌তে পার না? চাও একাধারে সমস্ত সুখ-সুবিধা! কষ্ট না কর্‌লে কি কেউ মিলে? দেখ্‌তে পাচ্ছ ত কত কষ্টসহিষ্ণু, কত শ্রমসহিষ্ণু এ দেশের মেয়েরা! চাও কেবল ওদের মস্তটাই অনুকরণ কর্‌তে—ভালটার নয়?"

এ দেশে এসে প্রায় সকল শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেশা-মেশার এবং তাদের ঘরের ভিতরের ঘরোয়া ব্যাপার লক্ষ্য কর্‌বার সুযোগ পেয়ে আমার এই ধারণা হয়েছে যে ভালমন্দ বিচার না করে' আমরা এদের সমাজের অনেক কুপ্রথার এবং কুঅভ্যাসের অনুকরণের চেষ্টাই বেশী কর্‌ছি: কিন্তু গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে যে এদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখে নিতে পারি সে বিষয়ে লক্ষ্য করি না।

আমাদের দেশে মেয়েদের দেখে মনে হ'ত ওরা যেন পুতুল—সর্ব্বদা সেজেগুজে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়—সূর্য্যের তাপে মূর্চ্ছা যায়—কোন কাজকর্ম্ম করে না—এতটুকু কষ্টও সইতে পারে না। এ দেশে এসে দেখি যে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ঘরের মেয়েরাও একেবারেই অলস, অক্ষম বা অকর্ম্মণ্য নয়। তাদের কাজকর্ম্মে তৎপরতা, নিপুণতা, সুশৃঙ্খলা ও অধ্যবসায় দেখে স্বতঃই বিস্ময়ে ও লজ্জায় মস্তক অবনত হয়। এখানে আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা সাধারণতঃ সকাল হ'তে সুরু করে' শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে সংসার-চালনা, সৌকিকতা, কুটুম্বিতা রক্ষা, সন্তান-প্রতিপালন ও রুগ্নাবেক্ষণ প্রভৃতি ঘরসংসারের দৈনন্দিন যাবতীয় কার্য্যে হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করে'ও কিরূপে সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ওর মধ্যেই আবার খেলাধূলা এবং আমোদ-প্রমোদের অবকাশও করে' নেয় তা বাস্তবিকই বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখ্‌বার ও শিখ্‌বার বিষয়। এখানকার ঘরবাড়ীও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মনে ক'রো না আমি সব বিষয়েই এদের আচার-ব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষার পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাস-বিভ্রমের আজ অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে আমাদের অনেক শিক্ষিতা ভগিনীর অধঃপতন ও শোচনীয় পরিণাম দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। অন্য জাতির যা-কিছু ভাল গ্রহণ কর্‌তে ক্ষতি নাই; কিন্তু তাই ব'লে হিন্দু সভ্যতার, হিন্দু সমাজের যা ভাল তা ছাড় কেন? আমার মনে হয়,

ভারতের নরনারীর শিক্ষা, ভারতের সনাতন আদর্শ একেবারে বর্জ্জন না করে' যথাসম্ভব বজায় রেখেই হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের যা বৈশিষ্ট্য, আমাদের যা স্বভাব, তা ত্যাগ কর্‌লে যে আমাদের অস্তিত্বই লোপ পাবে! অধিকন্তু আমরা তা পারি কি? তার পর যা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ তা আমাদের জানায় না; বরং বিসদৃশ আচরণে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়।—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।"

ডাক্তার তাকিয়ে পাশের গলিতে প্রবেশ কর্‌ছে। ডাক্তার তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, নিকট কোন হোটেল আছে কিনা। সে একটু ভেবে কয়েকটা হোটেলের নাম করে' বল্‌লে—সে সব এতক্ষণ বন্ধ হ'য়ে গিয়ে থাক্‌বে; আজ রাত্রের মতন আমাদের পক্ষে "আমেরিকান এসোসিয়েশনে" থাকাই ভাল। এই বলে' এসোসিয়েশনের বাড়ীর পথ বলে' দিল। আমরা সে পথ ভালরূপে বুঝ্‌তে না পেরে

টাউন হল—ম্যাঞ্চেষ্টার

অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা এসে পড়্‌ল। এ সম্বন্ধে আমার অনেক জানবার ও জানাবার আছে। সময়ান্তরে আলোচনা করা যাবে।

কথায় কথায় আমরা ষ্টেশন ছেড়ে অনেক দূর এসে পড়েছি। অন্ধকার রাত্রি-রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাক্‌লেও কুয়াসায় আচ্ছন্ন বলে' বেশীদূর চোখে পড়ে না। অপরিচিত স্থানে রাত্রে হোটেল খুঁজে বের করাও সহজ নয়। ভাব্‌ছি একটা পাহারাওয়ালার দেখা পেলে হ'ত—এমন সময়ে আমাদের পিছনেই পায়ের শব্দ কানে গেল। আমরা ফিরে দেখি, ছোটলোকের মত একটা লোক ত্বরিতে-অগ্রসর হ'য়ে একবার আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের সঙ্গ নিলাম। সে একটা সরু গলির ভিতর ঢুক্‌তেই কল্‌কাতা ও কাশীর গুণ্ডাদের কথা হঠাৎ মনে হ'য়ে ভয়ে ডাক্তারের হাত চেপে ধর্‌লাম। লোকটি খানিকটা যায় এবং পিছনে তাকিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে—আমরা এগিয়ে যেতেই আবার চল্‌তে থাকে। সারা রাস্তায় সে একটি কথাও বল্‌লে না—যেন

নেশায় বিভোর। অবশেষে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে আঙুল দিয়ে একটি বাড়ী দেখিয়ে বল্‌লে—"ঐখানে যাও।" কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি দ্রুতপদে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তাকে ধন্যবাদ দেবার অবসরও আমাদের দিলে না।

উপদেষ্টার মত আমরা এতক্ষণ লোকটির অনুসরণ ক'রে এসেছি—সে চলে' যেতে আমরা আমাদের চতুর্দ্দিক ভাল করে' দেখে নিলাম। বুড়ীর বাড়ীর কথা মনে হ'ল। পোষাকপরিচ্ছদে ও চালচলনে অনুমান করে' নিয়েছিলাম আমাদের পথপ্রদর্শকটি নেশা-খোর, তাই—যদিও লোকটি আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছিল—যে বাড়ীটা সে দেখিয়ে দিয়ে গেল, তাতে ঢুকতে আমার কেমন শঙ্কা হ'ছিল। ডাক্তারকে আমি বল্‌লাম—"লোকটির ত কোন কুমতিসন্ধি নেই? যদি ভেতরে ঢুকে দেখি—এটা একটা ওড়ার আড্ডা, তবে?"

ডাক্তার বল্‌লেন—"তা হ'লে ও বাটা গলির ভিতরই আমাদের পকেট মারত। এমন প্রকাণ্ড স্থানে এত বড় বাড়ী ওড়ার আড্ডা হ'তে পারে না। চল, ভেতরে গিয়ে দেখি।"

কে টিপ্‌তেই দোর খুলে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখি—প্রকাণ্ড বাড়ী; কিন্তু নিঝুম পুরী। দারোয়ানের মত একটা লোক আঙুল দিয়ে একটি ঘর দেখিয়ে দিল—নিকটে গিয়ে দেখি টিকেট-ঘরের মতন একটি ছোট ঘর, সামনে ছোট একটি বাগান; আর ঘরের ভেতর বসে' কিমুচ্ছে একটি মেয়ে। জানালায় শব্দ করতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ঘর আছে?" উত্তর হ'ল—"হাঁ আছে।" আমি খরচের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে মেয়েটি উঁকি মেরে আমায় দেখে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে' জানাল যে ওখানে শুধু পুরুষের থাকার ব্যবস্থাই আছে—মেয়েদের থাকা নিষেধ। বুঝতেই পারছ এ সংবাদে মনটা কেমন বসে' গেল। এত রাত্রে আবার যাই কোথায়—পা দুটো যেন আর দেহের ভার বইতে পারছে না।

তথাপি আমি এগিয়ে গিয়ে বল্‌লাম—"মিস্, সত্যই কি এ বাড়ীতে মেয়েদের থাকা নিষেধ? না, ভারতীয় বলে' আমায় থাকতে দিতে চাও না?"

মেয়েটি হেসে উত্তর কর্‌ল—"ম্যাডাম, এ বাড়ী ও আফিস আমেরিকানরা রেখেছে শুধু বিদেশী পুরুষ পথিকদের সুখ-সুবিধার জন্য। রাত নাই, দিন নাই,—সময়-অসময় নাই—যখন খুসি যে কেউ এসে এখানে উঠ্‌তে পার এবং থাকতে পারে, যে ক' দিন না তার অন্যত্র থাকার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু কাউকে স্থায়ীভাবে এখানে থাকতে দেওয়া হয় না এবং মেয়েদের এখানে থাকা সম্পূর্ণ নিষেধ। ম্যাডাম, এত ক্লান্তিতেও তোমার হাসি-হাসি মুখখানা এবং তোমার সুন্দর সাড়ীখানা দেখে আমি বড়ই আকৃষ্ট হয়েছি। (আমার পরণে তেমন মূল্যবান কোন সাড়ী ছিল না; কিন্তু এদেশের অনেকেই এ সাড়ীখানার প্রশংসা করেছে। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে এরা এ নমুনার সাড়ী দেখে নি।) আমার ক্ষমতা থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার রাত্রির ব্যবস্থা করতাম; কিন্তু আমি নিরুপায়।"

বিরক্ত ও ক্লান্ত হ'য়ে আমি একখানা চেয়ার টেনে বসে' পড়্‌লাম। মেয়েটিকে ডাক্তার পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আর কোন ভাল হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে' দিতে পারে কিনা। মেয়েটি কোনগাইড খুলে নানা হোটেলের নম্বর দেখে ফোন কর্‌তে লাগ্‌ল আর আমি চেয়ারে বসে' ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—যে, যদি কোথাও স্থান পাওয়া না যায় মেয়েটিকে বলে' বাকি রাতটুকু এই চেয়ারে বসে'ই কাটিয়ে দেব।

ইত্যবসরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মনে হ'ল কে যেন আস্তে আস্তে ডাক্‌ছে—সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে কোমল হস্তের কাঁকুনি অনুভব করে' চোখ মেলে দেখি—সেই মেয়েটি আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চোখ মেল্‌তেই সে হেসে বল্‌লে—"ম্যাডাম, তুমি বড়ই ক্লান্ত, তোমাদের ঘর ঠিক হ'য়ে গেছে, যাও ঘুমিয়ে পড় গিয়ে।"

মেয়েটির রং সাদা—চুল কোঁকড়ান—মুখখানি বেশ সদাসহাস্য—ঘুমের চোখে মনে হ'ল যেন উপকথার পরী। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ডাক্তারের হাত ধরে' আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। মেয়েটি একটু এগিয়ে এসে পথ দেখিয়ে দিল। বেশী দূর নয়, হোটেল পেতে কোন কষ্ট হ'ল না। বেল টিপ্‌তেই

ফিটফাট পোষাক পরা একটি লোক দোর খুলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল। মেয়েটি ফোন করে' পূর্ব্বেই সব ঠিক করে' রেখেছে—তাই লোকটি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

প্রকাণ্ড বাড়ী—ভেতরে সুন্দর সাজান ঘর। তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ডাক্তার মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। আঃ কি তৃপ্তি—এ যে আশাতীত। লোকটি ভারী ভদ্র, বল্‌লে—"তোমাদের পড়ই ক্লান্ত দেখ্‌ছি—এখন গিয়ে শুয়ে পড়। সকাল বেলা উঠে খাতায় সব লিখে দিও। নিয়েছে—এখন অন্য কিছু পাবার যো নেই।" আমরা চা-রুটী পাব জেনেই কৃতার্থ হলাম রাত দুপুরে সেই ত আশাতীত। খাবার আন্‌ছে জানিয়ে দিয়ে লোকটি "গুড নাইট" করে' চলে' গেল।

পাশেই বাথরুম—সাবান, তোয়ালে, গরম জল সবই প্রস্তুত। হাতমুখ ধুয়ে বের হতেই দেখি একটি ট্রেতে করে' চা, দুধ, চিনি, রুটী, বিস্কুট, কেক্ মাখন ও কয়েক রকমের ফল নিয়ে একটি চাকর হাজির। জিনিষগুলি একটি টিপয়ে রেখে, খবরদার দিয়ে চাকরকে বিদায় দিলাম। তৃপ্তির

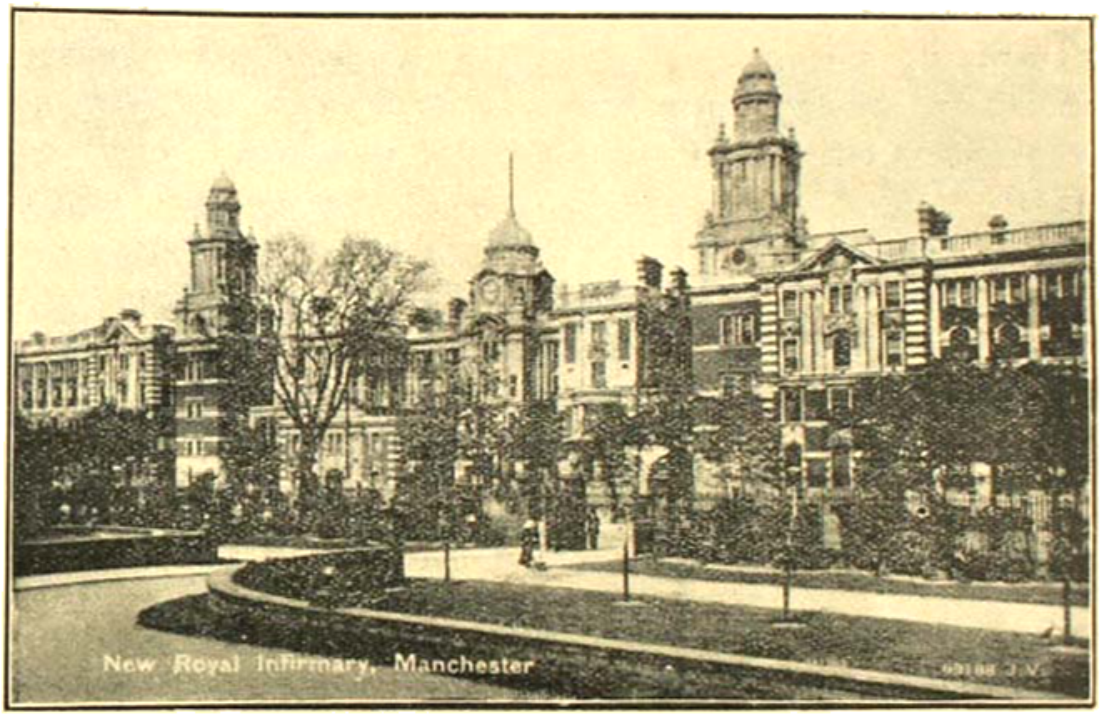

ইন্‌ফারমারী (হাসপাতাল)—ম্যাঞ্চেষ্টার

(যেখানে যখনই যাও না কেন,যে বাড়ীতে বা হোটেলে উঠ্‌বে তার খাতায় সর্ব্বাগ্রে নাম ধাম পেশা ধর্ম্ম ইত্যাদি সব লিখে দিতে হয়।) টাকার হিসাবও কালই হবে, কোন অতিরিক্ত চার্জ করব না।"—এই বলে' যে একটা অঙ্কের নাম করলে তা বৃদ্ধী যা চেয়েছিল তার চাইতে ঢের কম। আমাদের তখন টাকার বিষয়ে নজর দেবার অবস্থা ছিল না, কাজেই ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন কিছু খাদ্য মিল্‌বে কি না। লোকটি বল্‌লে—"এত রাত্রে চা-রুটী খাও ত দিতে পারি—রান্নাঘর বন্ধ করে' রান্নার লোক ছুটী সাইত খেয়ে নিয়ে শয্যাশায়ী হওয়া গেল।। আঃ—যাকে বলে হগ্‌ফেদনিভ শয্যা—যেমনি নরম, তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘড়ীতে তখন দেড়টা। ১১টায় পৌঁছে এই আড়াই ঘণ্টা যেমনই অশান্তিতে কেটেছিল এখন তেমনই, অত্যধিক আরাম পাওয়া গেল। কে জান্‌ত, ভগবান আমাদের জন্য এমন পরিপাটী শয্যা এবং এমন উপায়ের আহার্য্য রেখে দিয়েছেন! উভয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে ভগবানের নাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম,—আর সে ঘুম ভাঙল পরদিন বেলা ১১টায়।

এত কেরীতে ওঠাতে নিজেদের ভেতরই কেমন লজ্জা বোধ হ'তে লাগ্‌ল। তাড়াতাড়ি কোন রকমে হাতমুখ ধুয়ে ড্রেস করে' নীচে নেমে এলাম। ম্যানেজার (রাত্রের সেই লোকটি) হাসিমুখে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করে' বল্‌লেন—"যদিও সকালের ব্রেকফাষ্ট শেষ হ'য়ে গেছে তবু তোমাদের জন্ত সব ব্যবস্থা রাখ্‌তে বলে' দিয়েছি—যা খাবে অর্ডার দাও। রাত্রে তোমাদের খুব শ্রান্ত দেখে চাকরদের বারণ করে' দিয়েছিলাম যেন সকালে তোমাদের ঘরে নক্ না করে, এবং তাদের সাবধান করে' দিয়েছিলাম ব্রেকফাষ্টের জন্তও যাতে তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে।"

লোকটি ভারী ভদ্র, আদব-কায়দা ও ব্যবহার অতি সুন্দর—তাঁর জন্ত আমাদের কোন বিষয়েই কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি।

লিভারপুল থেকে ম্যাঞ্চেষ্টারে পূর্ব্ব দিকে ৩ মাইল। নানা রকমের যানবাহনে ম্যাঞ্চেষ্টার যাতায়াতের যেমন সুবিধা, তেমন সুবিধা অতি কম সহরেই দেখা যায়। জল-পথে ৪টি বড় রেল কোম্পানীর এবং অনেক সহকারী লাইনের ষ্টেশন; তা ছাড়া আশপাশের সমস্ত বড় সহর থেকেই ট্রাম ও বাস যাতায়াত করছে। জলপথে—যাতায়াতের জন্ত ছোট বড় খালের অন্ত নাই—ছোট নৌকা থেকে বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

একশ' বছর আগে ম্যাঞ্চেষ্টারে সমস্ত মালপত্র আমদানি রপ্তানি হ'ত লিভারপুল পোর্টের মারফতে। এ বন্দোবস্তে খরচ বেশী লাগ্‌ত, সময় বেশী লাগ্‌ত, আরো নানা বিষয়ে অসুবিধা ঘট্‌ত। তাই ব্যবসায়ী ও ধনীরা মিলে একটি কোম্পানী গঠিত করে' বহু কোটি টাকা ব্যয়ে মার্সি খাড়ী হ'তে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করতে পারে এমন এক খাল কেটেছে। এই কোম্পানীর নাম—"The Ship Canal Company."

এই কোম্পানী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে খাল কাটা আরম্ভ করে। তিন বৎসর কাজ করার পর হঠাৎ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল ঝড়, জলপ্লাবন ও তুষার পড়ে' এক রাত্রের মধ্যে নূতন কাটা ৬ মাইল খাল একবারে ধ্বসে' যায়—জলের স্রোতে অস্থায়ী বাড়ী-ঘর ও পোল ইত্যাদি ভেঙে নিয়ে যায় এবং মজুত মালমসলা ও যন্ত্রপাতি সব জলে ডুবে যায়। কিন্তু এই আকস্মিক দৈবোৎপাতে দমে' না গিয়ে, কোম্পানীর পরিচালকরা পুনরায় অদম্য উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করে। এবং সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে' ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে খাল শেষ করে। খাল খোলার সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

খালটি লম্বায় ৩৬ মাইল—গভীর ৩০ ফুট—তলদেশের পরিসর ১২৫ ফুট। খালের উপর ২০ থেকে ৩৬ ফুট পরিসর ১৯টি লোহার পোল আছে। তার উপর দিয়ে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা গেছে। একটা নদীও এই খালের নীচ দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে আর খালের জল যাচ্ছে নদীর উপর দিয়ে। কয়ুকি থাকা কালে দেখেছি গঙ্গার খাল এক জায়গায় পোলের উপর দিয়ে চলেছে নীচ দিয়ে নদী প্রবাহিত—আর এক জায়গায় গঙ্গার খাল চলেছে নদীর নীচ দিয়ে উপরে নদী; তৃতীয় স্থানে নদী ও খাল একই লেভেলে—লোহার গেট দিয়ে জল রেগুলেট করা হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার পোর্টে ডক আছে ৮টি। এই ডকগুলি ২৮০ বিঘা স্থান অধিকার করে' আছে। জেটি আছে ৫ মাইলের বেশী।

এই খাল কাটতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে, তা আমি সঠিক সংগ্রহ করতে পারিনি—তবে এই পর্য্যন্ত জেনেছি যে সতের হাজার লোক এই খালের কাজে নিযুক্ত ছিল—জায়গা ক্রয় করা হয়েছিল আড়াই কোটি টাকায় —এবং যে সমস্ত যন্ত্রপাতি খাল কাটতে ব্যবহৃত হয়েছিল তার দাম দেড় কোটি টাকা। খাল কোম্পানীর বর্ত্তমান বাড়ীটাও প্রকাণ্ড—ম্যাঞ্চেষ্টার সহরের সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু বাড়ী। এই সব হ'তে অনুমান করে' নিতে পার কত কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এই জাহাজী খালে। যেমন ব্যয় হয়েছে লাভও হয়েছে তেমনি। শুনে আশ্চর্য্য হবে যে এই খাল কাটার পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে কলিকাতা কোন মাল পাঠাতে যদি বোট ২০৲ টাকা লাগ্‌ত—তার ১২৲ টাকাই খরচ হ'ত ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে লিভারপুল পর্য্যন্ত ৩০ মাইল অপেক্ষাও কম পথের জন্ত—আর মাত্র ৮৲ টাকা

লাগ্‌ত লিভারপুল থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত জাহাজে সাত হাজার মাইলেরও উর্দ্ধ পথের জল।

ম্যাঞ্চেস্টারের প্রসিদ্ধ কয়লার খনিগুলির চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য কল-কারখানা। কাপড়ের কলই অধিকাংশ। দূর থেকে চিমনীই চোখে পড়ে। নিছক বাঙ্গালীর বাস বলে' যেমন কাশীধামের কতকটা স্থানের নাম হয়েছে "বাঙ্গালী টোলা," তেমনি ম্যাঞ্চেষ্টারে ও তার আশেপাশে চিমনীময় স্থানগুলিকে "চিমনী-টোলা" নাম দিলেই মানাত ভাল। কোন রকম চাষ-আবাদ চোখে পড়ে না

রয়েল এক্সচেঞ্জ—ম্যাঞ্চেষ্টার

—কেবল চিমনী, কেবল চিমনী। আমেরিকা, মিশর, ভারত থেকে তুলা নিয়ে এই সকল চিমনীর নীচের অধিকাংশ কলেই তৈরী হ'চ্ছে কাপড়—এবং আমাদের লজ্জা-নিবারণ হ'চ্ছে সেই কাপড়ে। সুতরাং এই স্থানটা ভাল করে' দেখ্‌তে হবে এ-সফর আগে থেকেই ছিল।

কার্পাসসূত্র ও কার্পাসবস্ত্র বয়নশিল্পে ম্যাঞ্চেষ্টারই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র—এবং ভারতই তার প্রধান ক্ষেত্র। সব দেখে শুনে মনে কত কথাই না জেগে উঠ্‌ল। পরাধীনা ভারত—সব থেকেও সব দিয়ে কাঙালিনী। ভারতের টাকাতেই এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নগর তৈরী কর্‌ছে—স্বাস্থ্যপূর্ণ সুখের জীবন যাপন কর্‌ছে—আর আমরা এতই অপদার্থ যে সেই ভারতে লাখে লাখে লোক দুবেলা পেট পুরে খেতে না পেয়েও শিল্পের উপর কেতাবটী শিক্ষাকে স্থান দিয়েছি।

আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারে যাই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে। তখন ম্যাঞ্চেষ্টারের অবস্থা ছিল খুবই ভাল। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন এবং বিদেশী বস্ত্র-

রয়েল এক্সচেঞ্জের ভিতর—ম্যাঞ্চেষ্টার

কিং ষ্ট্রীট—ম্যাঞ্চেষ্টার টাউন হল মার্কেট ষ্ট্রীট—ম্যাঞ্চেষ্টার

বর্জ্জন তখনও আরম্ভ হয় নাই—পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্গতিও তখন প্রকাশ পায় নি।

বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার জন্যও ম্যাঞ্চেষ্টার প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত কারখানায় ছোট-বড় সব রকম মেসিনারি—কাপড়ের ও সুতার কল, রেল গাড়ীর কল ও সাজসরঞ্জাম, মোটর, এরোপ্লেন এবং ইলেকট্রিক মেসিনারি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। রাসায়নিক দ্রব্য এবং রং প্রস্তুতের জন্যও ম্যাঞ্চেষ্টার প্রসিদ্ধ।

ম্যাঞ্চেষ্টার সহর ছোট থেকে ক্রমশঃ বড় হয়েছে তাই পুনঃ পুনঃ রাস্তার পরিসর বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও রাস্তাগুলি অপেক্ষাকৃত সরু। কলকাতার বড়বাজারে যেমন ট্রাম, বাস, মোটর, গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়ে সময়ে সময়ে রাস্তায় চলাচল একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায় এখানেও তাই হয়।

সহর ও বন্দরে যে সমস্ত লোক কাজ করে তাদের অনেকেই সহরের বাহিরে বাস করে এবং প্রত্যহ রেল, বাস বা ট্রামে যাতায়াত করে। অনতিদূরে চেসার নামে একটি পল্লী আছে— বেশ ফাঁকা স্বাস্থ্যকর জায়গা। চিমনীর উৎপাত নেই, গাছপালা বাগান রয়েছে—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনোরম স্থান। অবস্থাপন্ন অনেকের বাড়ী এখানে। শুপ্ত ও মাধুও এখানেই থাকেন এবং প্রত্যহ শুপ্ত বাসে ক'রে সহরে এসে কলেজ করেন। বাইরে এত লোক পাকা সত্ত্বেও ম্যাঞ্চেষ্টারে বাড়ী-ঘরের সমস্যা খুবই বেশী। ১৯১৯ হ'তে ১৯২৮ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে এক মিউনিসিপ্যালিটীই বার হাজার বাড়ী নির্ম্মাণ করেছে তবু এ সমস্যা দূর হয় নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ধোঁয়ার সমস্যাও আছে। নদী ও খালের জল ময়লা। অনেক চেষ্টা ক'রেও তার প্রতিকার করতে পারছে না। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেল। লণ্ডন, এডিনবরা, গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানে এতদিন অধিকাংশ পাথরের তৈরী পুরোনো বাড়ী দেখেই চোখ অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিল—তুলনায় ম্যাঞ্চেষ্টারের বাড়ী-ঘর নূতন এবং অনেক ইটের বাড়ী দেখা গেল।

আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করা গেল—পার্ক। সহরটি যেমন জনাকীর্ণ তেমনি পার্কের সংখ্যাও যথেষ্ট—ছোটবড় ১০।১৭টি কম নয়। কোন কোন পার্ক খুব বড়। একটি পার্কে ২৫০ বিঘা জমি আছে। প্রায় সব পার্কেই নানা প্রকার খেলাধূলার ব্যবস্থা এবং গান-বাজনার ব্যবস্থা আছে।

ম্যাঞ্চেষ্টারে সাঁতার কাটা এবং স্নানের সুব্যবস্থাও অনেকগুলি জায়গায় আছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় কেবল মাত্র Owen কলেজ নামক একটি কলেজ নিয়ে। কলেজটি খুবই বড়। নানা বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র এবং আড়াই শতের অধিক শিক্ষক। মিউনিসিপ্যালিটির শিল্পবিদ্যালয়টিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেও নানাপ্রকার শিল্পশিক্ষার জন্য বড় বড় স্কুল আছে। এ ছাড়া আর্ট স্কুল, সঙ্গীত-বিদ্যালয়, টেক্সটাইল কলেজ, বুক-বাইণ্ডিং বিদ্যালয়, অন্ধাশ্রম প্রভৃতিও আছে। প্রাথমিক শিক্ষা, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম শিক্ষা, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের উপযোগী শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাও অতি সুন্দর। এখানে লাইব্রেরীর সংখ্যা খুবই বেশী। মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীটিতে সাড়ে পাঁচ লক্ষ পুস্তক আছে। গান বাজনা বিষয়েও স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে।

টাউন হল, অবাধ বাণিজ্যমন্দির (The Free Trade Hall)— এই হলে ৪০০০ লোক ধরে—,রয়েল একচেঞ্জ, হাসপাতাল, ডাকঘর এবং ব্যবসায়ীদের অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে।

সহরে অনেক মনুমেণ্টও আছে—তন্মধ্যে ওলিভার ক্রমওয়েলের পিত্তলনির্ম্মিত মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

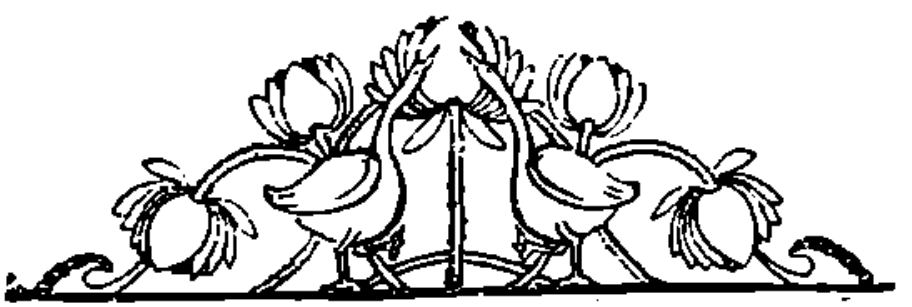

'হেথা ইউসুফ্ কাঁদে হোথা কাঁদে জুলেখা!'

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বৌদিদি তাহার নামের বানান লিখিতে ভুল করে। রেণু লিখিতে মূর্দ্ধন্য 'ণ'-এ হ্রস্বই না লিখিয়া দন্ত্য 'ন'-এ হ্রস্বই লেখে। ইহার জন্য ঠাকুরপো বিমলের আক্ষেপের আর অন্ত নাই। বলে, 'ছি বৌদি, দাদা এম-এ পাশ, ইস্কুলের মাষ্টার, আর তুমি কিনা তার বৌ হ'য়ে...ছি!'

রেণু লজ্জায় রাঙা হইয়া ওঠে। হাসিয়া বলে, 'বেশ ভাই বেশ, আমি মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ, আমি বানান ভুল করি। তোমরা ত' বিদ্বান, তাহ'লেই হ'লো।'

তবু বিমল খুনসুটি করিতে ছাড়ে না। বলিবার মত কিছু না পাইলে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোষ বাহির করে। তাহাতেও না হয় ত' শেষে রেণুর ছেলেটিকে লইয়া এমন-সব কথা সে বলিতে থাকে যে, রেণু কাঁদিয়া ফেলে। বলে, 'দাঁড়াও, খুড়ি-মাকে এবার যদি আমি না বলি ত' কী—!'

বিমলের মা তাহাদের এই হাসি-রহস্য দেখিয়া নিজেও হাসেন। মনে মনে খুশী হইয়া বলেন, 'তা পুজোর ছুটিটা এবার বিমলের ভালই কাটলো, না কি-বল্? বৌদিদিটিকে পেয়ে?'

রেণু বলে, 'হাঁ তা বই-কি খুড়ি-মা! আমায় কাঁদিয়ে ...নাকানোবুদ্ ক'রে···ভাল আমার কাটবে না! বাপ্‌রে বাপ্! ঠাকুরপো যে এত দুষ্টু তা আমি জান্‌তাম না মা।'

বিমল বলে, 'বটে! আমি হ'লাম দুষ্টু! আচ্ছা—।' বলিয়া সে তাহার বৌদিদির মুখের পানে তাকাইয়া দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলে, 'দাঁড়াও।'

এমনি করিয়া দিনের পর দিন বৌদিদির সঙ্গে এই ঠাকুরপোটির পক্ষিয় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে।

পূজার ছুটি দেড়মাস। এবং এই দেড়মাসের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা তাহাদের কেমন করিয়া যে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহার পরিচয় হয়ত' চিরদিন অবগুণ্ঠনাবৃতই থাকিত, কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্য থাকিলেই ত' আর বুদ্ধি সকলের থাকে না,—কেহ নির্দ্দোষ; এবং তাহার এই নির্বুদ্ধিতার জন্যই বোধ করি একদিন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

প্রকাশ হইল বড় বিশ্রীভাবে।

বিমলের ছুটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কলেজ খুলিবার আগেই তাহাকে কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইবে। তাই যাইবার আগে রেণুকে সে কয়েকটি চিঠি লিখিয়াছে। আদর বিরহব্যথাতুর বুকের কতকগুলি অসংবদ্ধ প্রলাপ!

হতভাগী রেণু তাহার এই চিঠিগুলিকেই জীবনের সম্পদ ভাবিয়াছিল কিনা তাই বা কে জানে। বাক্সের মধ্যে সযত্নে তাহাদের তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইতেছিল।

কিন্তু বিধাতার করুণাও যেমনি প্রচুর, নিষ্ঠুরতারও তেমনি সীমা নাই।

পুকুরের ঘাটে যাইবার সময় কাপড় ছাড়িতে গিয়া রেণু সেদিন তাহার চাবির গোছা ফেলিয়া গেল। বিভূতির ছিল সেই বাক্সের মধ্যে পোষ্টাপিসের পাশ-বই। কয়েকদিন হইতেই চাহিয়া রেণুর কাছ হইতে তাহা সে পায় নাই। নিজেই বাক্স খুলিয়া সেদিন সেটা বাহির করিয়া লইতে গিয়া বিভূতির হাতে পড়িল বিমলের সেই কয়খানি চিঠি।

প্রথমে সে তাহার মানে ভাল বুঝিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিল, হয়ত' বা অন্য কাহারও। কিন্তু পাঁচখানি চিঠির মধ্যে একখানির বাক্যবিন্যাস অত্যন্ত সহজ;—না বুঝিবার মত মোটেই নয়।

—আজ আর তোমার বৌদি বলে ভাবতে বড় লজ্জা করে। আজ তুমি আমার রেণু। তুমি আমার বাঁশী! এত আনন্দ যে পাব তা আমি সত্যিই কোনোদিন ভাবিনি। তুমি অমূল্য, তুমি অদ্ভুত! দাদার অনেক প্রশংসা সেদিন তুমি আমার কাছে করেছ, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে-সব তোমার অন্তরের কথা নয়। এখন মনে হচ্ছে, লাল নীরস ইস্কুল-মাষ্টার। তোমার কবর তিনি বুঝেন না। আমি তোমার সে-অভাব পূরণ করব বাণী, তুমি ভেবো না। তোমার খুসির

হয়ে আমার চিরকালের সখন। বিয়ে আমি ঈশ্বরে কোনো দিনই ভরসা ক'রে ...আর সন্তোষকুমার যখন আইনেই পড়াতে যাবেন, তখন যেন তুমি সে-দিনের মত আমার ওপরের ঘরে এসো। অতিথাকিকা বাবার মত এসো। বাকুল আগ্রহে আমি তোমারই প্রতীক্ষা করব। ইতি তোমারই বিনু—'

পাশ-বই ও চিঠি কয়খানি বাহির করিয়া লইয়া বাক্সটা আবার তেমনি বন্ধ করিয়া দিয়া বিভূতি বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রে বিভূতি বলিল, 'রেণু, তুমি তোমার মা'র কাছে যাও।'

অজানা আতঙ্কে রেণুর বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, তবু সে মুখে বলিল, 'কেন? হঠাৎ মা'র কাছে যাবার কথা উঠ্‌লো যে?'

বিভূতি বলিল, 'শরীরটে তোমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না। যাও, কিছুদিনের জন্য সেরে এসো।'

অনেকদিন রেণু তাহার মা'র কাছে যায় নাই। বলিল, 'হঠাৎ এ সুমতি তোমার হ'লো কেমন ক'রে?'

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া মাথার কাছের লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিয়া বিভূতি বলিল, 'হ্যাঁ, হ'লো।'

রেণু জিজ্ঞাসা করিল, 'মাকে বলেছ?'

'বলেছি। কালকেই ভাল দিন আছে, কালই যাও।'

এই বলিয়া একরকম জোর করিয়াই বিভূতি তাহাকে তাহার মা'র কাছে পাঠাইবার সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়া দিল।

এবং তাহার পরের দিন দুপুরে গরুর গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতেই স্বামীর কাছে আসিয়া বিদায় লইয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া রেণু গাড়ীতে গিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, সকলেরই মুখ কেমন যেন ভার-ভার, ভাল করিয়া কথা তাহার সঙ্গে কেহই কহিল না।

ছেলেটা ছিল বিভূতির কোলে। উপর হইতে ছেলে লইয়া সে আর নামে না। অথচ ছেলের অপেক্ষায় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। রেণুর সঙ্গে যাইতেছিল—বিমলের ছোট ভাই কমল। বিমল বাড়ী ছিল না। ছুটি ফুরাইয়া যাইতেছে বলিয়া মা তাহাকে জোর করিয়া মামার বাড়ী পাঠাইয়াছেন। কাল সকালেই ফিরিবে।

কমল আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইতে লাগিল, 'বড় দা! খোকাকে নিয়ে আসুন। ট্রেনের আর দেরি নেই।'

বিভূতি বলিল, 'তোরা চল্ না! ষ্টেশনে যাচ্ছি আমি খোকাকে নিয়ে।'

কাছেই ষ্টেশন। গরুর গাড়ী পৌঁছিবার আগেই খোকাকে বুকে লইয়া চোখের জল মুছিয়া বিভূতি ষ্টেশনে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ট্রেন আসিল। কমল চড়িল, রেণু চড়িল। খোকার গালে মুখে মাথায় চুমা খাইয়া অতিকষ্টে তাহাকে রেণুর কোলে তুলিয়া দিয়া জানালার বাহিরে বিভূতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একবার কি যেন ভাবিল, তাহার পর পকেট হইতে বিমলের চিঠি পাঁচখানি বাহির করিয়া রেণুকে দেখাইয়া বলিল, 'এগুলি কার রেণু?'

রেণুর মুখের চেহারা হঠাৎ বদ্‌লাইয়া গেল। বিবর্ণ পাংশুমুখে তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া চিঠিগুলি সে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিভূতি তখন গম্ভীরমুখে হাতখানা তাহার সরাইয়া লইয়াছে। বলিল, 'থাক্, আর ঢাক্‌বার চেষ্টা কোরো না রেণু। এই যাওয়াই তোমার যেন শেষ যাওয়া হয়। তুমি আর এসো না।'

বলিতে বলিতে গলার আওয়াজ তাহার ভারি হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

* * *

এ কলঙ্কের কাহিনী হয়ত' তাহাদের কয়জনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারিত, কিন্তু রেণুর মা আবার রেণুর চেয়েও নির্ব্বোধ। কাহাকেও কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া হঠাৎ একদিন সে তাহার মেয়েকে সঙ্গে লইয়া সরকারী আদালতের শরণাপন্ন হইল। কলঙ্কটাকে ঢাকিতে গিয়া আরও ভাল করিয়া ঢাক পিটাইয়া প্রচার করিয়া দিল।

রেণু নালিশ রুজু করিল বিভূতির নামে।

এই বলিয়া নালিশ করিল যে, স্বামী তাহার নামে অথথা এক বিশ্রী কলঙ্কের অপবাদ দিয়া বাড়ী হইতে তাহাকে

তাড়াইয়া দিয়াছে; না বিধবা, গৃহে আহারের স্থান নাই সুতরাং হয় তাহাকে আবার তাহার স্বামীর গৃহেই স্থান দেওয়া হোক্, কিম্বা স্বামী তাহার মাসহারার বন্দোবস্ত করুক্।

নালিশ করিল বটে, কিন্তু মনের ভয় তখনও ঘুচিল না। মাকে বলিল, 'কিন্তু মা, চিঠিগুলো যে ওর হাতে? তার কি হবে?'

মা বলিল, 'বলবি—ও-সব কিছু আমি জানিনে। তাইকে দিয়ে লিখিয়েছে হয়ত'।

তাহাই হইল।

শহরের আদালতে মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল।

বিচার যেদিন হয়ে, আদালতগৃহ সেদিন একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া ওঠে। এমন মোকর্দ্দমা বছরে কদাচিৎ দু'একটা ছাড়া আসে না।

কিন্তু মজা হইল এই যে, বিচারের সময় বিমলের চিঠির কথা বিভূতি উল্লেখ পর্য্যন্ত করিল না। উকিল-ছোকরাটি চীৎকার করিয়া সেকথা প্রচার করিতে গেলে বরং তাহাকে সে জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, 'চুপ্!'

হাকিম বলিলেন, 'স্ত্রীকে নিয়ে যান তাহ'লে!'

বিভূতি তাহার জামার পকেটে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একটা ঢোঁক গিলিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

হাকিম তখন 'রায়' লিখিলেন।

লিখিলেন,—বেণুর যাবজ্জীবন বিভূতিকে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া মাসহারা দিতে হইবে। এবং ছেলে থাকিবে তার মা'র কাছে।

তা কুড়িটি করিয়া টাকা বিভূতির পক্ষে এমন বেশি কিছু নয়। ইস্কুলে মাষ্টারী করিয়া পায় একশ', প্রাইভেট পড়াইয়া পায়—পঁচিশ। তৎক্ষণাৎ সে তাহাতেই সায় দিয়া বিষণ্ণ-মুখে আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বেণুর বিধবা মা, পরনে সাদা খান কাপড়। বিভূতিকে হাতের কাছে পাইয়া তাহাকে দু'কথা শুনাইয়া দিবার জন্যই বোধ করি মেয়েকে লইয়া তাড়াতাড়ি সেও বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, 'আ মর্ মুখপোড়া! বিদ্বান দেখে জামাই করতে গিয়েছিলাম আমি! ও হরি! শেষে কিনা তোমার পেটে এত গুণ! সাদার গায়ে কালা! হে হরি! হে ভগবান! মেয়ের যদি আমার সতীলক্ষ্মীর গর্ভে জন্ম হয় ত' এর পিণ্ডিদেল তুমি কোরো।'

বিভূতি কথাগুলো শুনিয়াও শুনিল না। উকিল-ছোকরাটি তখনও তাহার পিছু ছাড়ে নাই। বলিতেছিল, 'ছি ছি ছি ছি! এ আপনি করলেন কি বলুন ত? মাসে মাসে কুড়িটে ক'রে টাকা—ছি ছি ছি ছি! চিঠিগুলো দেখালেই—ব্যস্, দুশ্চরিত্রা প্রমাণ হ'য়ে যেতো। বড় জোর আপনার ভাইকে একবার ডেকে···নিষেধ করা আপনার উচিত হ'লো না।'

কথার জবাব না দিয়া বিভূতি ম্লান একটুখানি হাসিল মাত্র। নিষেধ সে যে কেন করিয়াছে সেকথা জানেন একমাত্র তাহার অন্তর্যামী। উকিলটি আবার বলিল, 'লজ্জা কেলেঙ্কারীর ভয়: তা নাহয় বুঝলাম, কিন্তু যে স্ত্রী আদালতে এসে দাঁড়াতে পারলো তার আর কেলেঙ্কারীর কি বাকি রইল বলুন! তাকে কি আর কোনোদিন আপনি—'

কথাটা বিভূতি তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না। হাতদুইটি কপালে ঠেকাইয়া তাহাকে একটি নমস্কার করিয়া বলিল, 'নমস্কার!' বলিয়া সে হাতের ইসারায় তাড়াটে একটা ঘোড়ার গাড়ীর কোচ্‌ম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া তাহাতেই চড়িয়া বসিল।

কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হইয়া গেছে। বেণুর বদনামের আর বাকি কিছু নাই।

বিভূতিদের গ্রামে বেণুর কথা উঠিলে সহজে আর কেহ থামিতে চায় না। সবাই বলে, 'ছি, ছি, অমন স্বামী··· হারামজাদীর মতিচ্ছন্ন ধরেছিল।'

বিভূতির দূর-সম্পর্কের খুড়তুতো ভাই বিমল, কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়িতেছিল। ছুটির পর সেই যে সে কলিকাতায় গেছে, তাহার পর আর না আছে চিঠি, না আছে খবর। মা তাহার ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইয়া সেদিন কমলকে পাঠাইয়াছিলেন খোঁজ লইতে। কমল

ফিরিয়া আসিয়াছে। বিনয় হোষ্টেলেও নাই, কলেজেও যায় না। একরকম নিরুদ্দেশ।

মা ত' সেই অবধি শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। পড়িয়া পড়িয়া দিবারাত্রি কাঁদেন আর যে আসে তাহাকেই শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন, 'বেউশে হারামজাদী আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তেই এসেছিল মা, আমি আগে জান্‌তাম না। বিভূর নাহয় আজ বাদ কাল বৌ আস্‌বে, কিন্তু আমার ছেলে যে গৃহত্যাগী হ'য়ে গেল বাছা, তার আমি কি করি বল।'

যাহারা না জানে তাহারাও এবার সঠিক খবর ভাল করিয়া জানিয়া যায়।

ওদিকে রেণুদের গ্রামেও ঠিক তাই। প্রথম প্রথম রেণুর দুঃখে সহানুভূতি জানাইতে কসুর কেহ করে নাই। সবাই বলিত, 'আহা মা, দ্যাখো দেখি মেয়ের অদেষ্ট! তাও ভাগ্যিস্ ছেলেটা হয়েছিল। না গো মা, অমন লেখা-পড়া-জানা বিদ্বান জামাইএর মুখে আগুন!'

কেহ-বা বলিত, 'ভেবো না মা, নিখোর জয় হয় না কখনও। ওই মেয়েকে জামাই আবার নিয়ে যাবে দেখো। ছেলে রয়েছে যে!'

কিন্তু লইয়া যাওয়া দূরে থাক্, মাসে মাসে টাকা পাঠানো ছাড়া জামাই যখন একটা চিঠির সম্বন্ধও রাখিল না, তখন ধীরে-ধীরে সে সহানুভূতিও লোকের গেল। তাহারাই আবার উল্টা কথা বলিতে লাগিল, 'না মা, যা ভেবেছিলাম তা নয়। মেয়েটা হয়ত' সত্যিই বজ্জাৎ।'

কথাটা ধীরে ধীরে রেণুর কানে গিয়াও যে ওঠে না তাহা নয়। শুনিয়া রেণু হয়ত' খানিকটা কাঁদে, ছেলেটাকে অনর্থক মারিয়া মারিয়া কাঁদায়, তাহার উপর মা একটি কথা বলিলে বকিয়া-ঝকিয়া রাগ করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

এক-একদিন ভাবে সে তাহার স্বামীকে একখানি চিঠি লিখিবে। নিজের সমস্ত অপরাধ অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে হয়ত' ওই একটি দিনের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা তিনি নিশ্চয়ই করিবেন। পুরুষ ত' জীবনে তাহার কত অপরাধ করে কিন্তু কই, এমন করিয়া তাহাকে ত' কোনোদিন শাস্তি পাইতে হয় না, আর নারী কি এত ঘৃণ্য! ...এমনি করিয়া নানান্ দিক হইতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রেণু তাহার অপরাধের কথাটাকে ভাবিয়া দেখে। স্বামীকে কি বলিয়া কেমন করিয়া চিঠিখানি লিখিবে তাহার প্রত্যেকটি লাইন মনে মনে আওড়াইতে থাকে। শেষে একদিন কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসেও। কিন্তু দু'চার লাইন লিখিবার পরেই কলম যেন আর চলিতে চায় না, হাত কাঁপে, মাথা ঘোরে, বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে, লেখা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় এবং এতক্ষণে বুঝিতে পারে—নারীর পক্ষে এ অপরাধ বড় সামান্য অপরাধ নয়।

স্বামীকে চিঠি লেখা তার হইয়া ওঠে না।

* * *

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্ত যোগসূত্রই ছিঁড়িয়া গেছে।

মাসের প্রথমে একবার করিয়া শুধু বুড়া পিওন আসিয়া রেণুদের দরজায় দাঁড়ায়। হাসিতে হাসিতে রেণু ছুটিয়া আসিয়া হাত পাতিয়া বলে, 'দাও।'

মনি-অর্ডারের ফর্ম্মের উপর নিজের হাতে তাহাকে সহি করিয়া দিতে হয়। তাহার পর একটি একটি করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া শুকনো কুড়িটি টাকা সে আঁচলের খুঁটে বেশ করিয়া গেরো দিয়া বাঁধে, তাহার পর কাগজের এতটুকু ছেঁড়া কুপনখানি বারে-বারে দেখিতে দেখিতে সে তাহার খোকাকে কোলে লইয়া চলিয়া যায়। কুপনে বিভূতি শুধু তাহার নাম ছাড়া আর-কিছু লেখে না।

কাগজের টুকরাটি হাত বাড়াইয়া লইবার জন্য ছেলেটা বড় বিরক্ত করে। রেণু তাহার পিঠে এক চড় বসাইয়া তাহাকে কাঁদাইয়া কোল হইতে টিপ্ করিয়া মাটিতে নামাইয়া দেয়। তাহার পর বাক্স খুলিয়া একধারে টাকা ও একধারে কুপনগুলি সাজাইয়া রাখে। গুনিয়া দেখে, অনেকগুলি কুপন জড়ো হইয়াছে।

মা হয়ত' জিজ্ঞাসা করে, 'ওকে কাঁদাচ্ছিস কেন লা?'

'দ্যাখো না শুধু জ্বালাচ্ছে।' বলিয়া ছেলেকে সে আবার কোলে তুলিয়া লইয়া একটুখানি ঘুরে গিয়া চুমা খাইয়া চুপি চুপি বলে, 'ও বোমার বাবার লেখা বাণিক, ও কি নষ্ট কর্‌তে আছে বোকা? ছি!' বলিতে বলিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া ওঠে, একাগ্র

মুগ্ধদৃষ্টিতে সে ওই বালকের মুখের পানে তাকাইতে গিয়া কাহাকে যেন চকিতে একবার দেখিতে পায়; দেখিতে পায় তাহার জন্মদাতা পিতাকে। তাহার সেই দুটি ফটিকের মত স্বচ্ছ সুগভীর ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতারকার, আরক্তিম গণ্ডে এবং সুকোমল ওষ্ঠাধরে তাহারই স্বামীর সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি যেন বিদ্যুৎলেখার মত চোখের সুমুখে একবার ঝিলিক্ হানিয়াই আবার তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। রেণু তখন আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, কোলের শিশুকে সে তখন যেন আরও নিবিড়ভাবে তাহার দুই বাহু ব্যাকুল বাহু দিয়া বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরে এবং মুনিবিড় চুম্বনধারায় ছেলেকে একেবারে অস্থির করিয়া দিয়া নিজেও শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদিনীর মত ঘরময় ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে।

* *

বিভূতি আজকাল বড় দেরি করিয়া টাকা পাঠায়।

দিনের পর দিন পার হইয়া যায়, টাকা তবু আসে না।

স্বামীর সঙ্গে রেণুর মাত্র ওই একটি দিনের সম্বন্ধ। এই দিনটির জন্য সমস্ত মাস ধরিয়া তাহার ব্যাকুলতার আর সীমা থাকে না। ব্যাকুলতা তাহার টাকার জন্য নয়, নাম-লেখা সেই কুপনখানির জন্যও নয়; ব্যাকুলতা শুধু ইহাই জানিবার জন্য যে, স্বামী তাহাকে এখনও ভুলিয়া যায় নাই।

কিন্তু প্রতিমাসেই দেরি হইতেছে দেখিয়া এইবার তাহার মনে বড় আশঙ্কা হয়—টাকা পাঠাইয়া পাঠাইয়া এইবার হয়ত' সে নিশ্চয়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, একটা স্ত্রী এবং একটা ছেলে যে আছে সেকথা এখন আর হয়ত' তাহার মনেই থাকে না, আদালতের হুকুম অমান্য করা চলে না বলিয়াই হয়ত' শেষে তাহার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেলাফেলা করিয়া টাকা কয়টা পাঠাইয়া দেয়।

রেণু আজকাল তাহার সান্ত্বনার আর কোথাও কিছুই খুঁজিয়া পায় না। মাও আজকাল মাঝে মাঝে তাহাকে তাহার এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করিয়া খোঁটা দিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাড়া-পড়শী মেয়েদের ত' কথাই নাই। ভাল করিয়া কেহই তাহার সঙ্গে কথা বলে না।

পাড়ায় তাহাদের কমলপুরের বৌএর নামে বদনাম রটিয়াছে। এই মেয়েটা মাঝে মাঝে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসে, কাছাকাছি দেখা হইলে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সেদিন পুকুরের ঘাটে গিয়া দেখে, কেহ কোথাও নাই, কমলপুরের বৌ শুধু একটা পিতলের কলসী লইয়া একা একা জল তুলিতে আসিয়াছে। রেণুকে দেখিয়া জল তুলা তাহার আর হইল না, হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'তোকে একটা কথা আমি শুধোব শুধোব ভাবি, কিন্তু একলাটি দেখা আর কোনোদিন হয় না। বলি তুই এত মন-মরা হ'য়ে ঘুরে বেড়াস্ কেন লা? তোর ওই বদনামের জন্যে?—আস, বলি তোকে, ভাল পরামর্শ দিই, ইদিকে আয়।'

বলিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কমলপুরের বৌ বলিল, 'তুই কি ভেবেছিস এ কলঙ্ক তোর ঘুচবে কোনোদিন? ও একবার যখন হয়েছিস ভাই, তখন আর নয়। এবার তুই বয়া কুষ্টি ক'রে তোর বা খুশী তাই ক'রে নে, নইলে···'

এই বলিয়া আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পাড়ার আর একটা মেয়ে ঘাটে আসিয়া পড়িতেই বলা তাহার আর শেষ হইল না, কথাটাকে পাল্টাইয়া লইয়া বলিল, 'নে ভাই, কাপড় কাচ্‌বি ত' তাই কেচে নে, তারপর আমি জল তুলিয়ে নিয়ে যাব।'

বাড়ী ফিরিয়া রেণুর মন সেদিন আরও খারাপ হইয়া গেল। সারারাত ধরিয়া শুধু কমলপুরের বৌএর কথাটাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাবিতে লাগিল,—একবার কলঙ্ক যখন রটিয়াছে তখন সে কলঙ্ক আর জীবনেও ঘুচিবার নয়, চিরদিন তাহাকে এম্‌নি ঘৃণিতা পরিত্যক্তা হইয়াই থাকিতে হইবে। ওই ছেলে বড় হইবে, বড় হইয়া শুনিবে তাহার মা কলঙ্কিনী। ছি, ছি, তাহার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

মাস ফুরাইয়া দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িয়াছে। টাকা পাঠাইতে আজকাল দেরি হয় বটে, কিন্তু এত দেরি কখনও হয় না। স্বামীর বিশ্বাস এবার সে সম্পূর্ণরূপেই হারাইয়াছে ভাবিয়া মন তাহার আজ কতেকদিন হইতেই খারাপ, তাহার উপর মনে-মনে যদিই বা সে আশা করিতেছিল স্বামী একদিন তাহাকে ক্ষমা করিয়া নিশ্চয়ই

তাহার কাছে লইয়া যাইবে, কমলপুরের বৌএর কথা শুনিয়া এবার সে আশাও গেল। রেণু কি যে করিবে, কোথায় কোন্‌দিকে তাহার পথ, কোন্‌দিকে গেলে সে একটুখানি শান্তি পাইবে—ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া শেষে সে বিমলকেই একখানি চিঠি লিখিতে বসিল।

লিখিতে গিয়া বিমলের উপর তাহার রাগ হইতেছিল, তবু সে লিখিল—

'একি সর্ব্বনাশ তুমি আমার করিলে বন্ধুবর। আশা করি সবই শুনিয়াছ এবং শুনিয়াও বেশ সুখে আছ। তুমি আমার আর জগতের সম্মুখে দুখিয়া করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলে। এখন আমার জীবন একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে যে শ্রদ্ধা হারাইয়াছি তাহা আর কোনোদিনই ফিরিয়া পাইব না, যা আমাকে এখন আমার নিজ্‌চিন্তার জন্য যখন তখন তিরস্কার করে, পাড়া-পড়শী সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখে। এখন আমার মনে হইতেছে, আত্মহত্যা ছাড়া আর আমার উপায় নাই। কিন্তু ছেলেটার জন্য তাহাও পারি না। কি যে করিব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তোমায় এই চিঠি লিখিলাম। তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, এখন আমার কি কর্ত্তব্য তুমিই বলিয়া দাও। ইতি রেণু'

চিঠি লিখিয়া খামে পুরিয়া কলিকাতার হোষ্টেলের ঠিকানা দিয়া আবার সে চিঠিখানি একবার বাহির করিল, দেখিল, রেণু বানানটা ঠিক হইয়াছে কি না, তাহার পর আগাগোড়া আর-একবার পড়িয়া আবার সেখানি খামে পুরিয়া খামটা বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন পিওনের হাতে চিঠিখানি দিবার জন্য সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় পিওন আসিল। চিঠিখানি সে হাত বাড়াইয়া তাহার হাতে দিতেই পিওন সেটি তাহার ব্যাগে পুরিয়া বলিল, 'যাও একবার দোয়াত-কলমটা নিয়ে এসো মা!'

'টাকা এসেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ মা, এসেছে।' বলিয়া বুড়া পিওন তাহাদের দাওয়ার পাশে ছাতাটি বন্ধ করিয়া ব্যাগ্‌ নামাইয়া বসিল। সহি করাইয়া টাকা দিয়া পিওন উঠিয়া যাইতেছিল, রেণু বলিল, 'আমার সে চিঠিখানা তুমি দিয়ে যাও পিওন, ও আর পাঠাবার দরকার নেই।'

খামসমেত চিঠিখানি সে ফিরিয়া লইয়া সেইখানেই দু'হাত দিয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

*

কিন্তু টাকা পাঠাইতে দেরি শুধু এক আধ মাসের জন্য নয়, প্রতিমাসেই এম্‌নি।

আবার টাকা আসিতে দেরি হয়, আবার পিওনের অপেক্ষায় রেণুবালা দাঁড়াইয়া থাকে।

এক-একদিন দেখা যায়, রেণু তাহাদের দরজা ছাড়িয়া পথে নামিয়া আসিয়াছে এবং একটু একটু করিয়া আগাইয়া গিয়া শিবমন্দিরের পাশে অশথ্‌গাছের তলায় ছেলে কোলে লইয়া সে পিওনের পথ চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রেণুরই সমবয়সী পাড়ার একটি মেয়ে সেদিন সেই পথ দিয়া কলসী কাঁখে পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল, পথের মাঝে তাহাকে অমন উদগ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি লা? দাঁড়িয়ে রয়েছিস, টাকার জন্যে বুঝি?'

রেণু একটু হাসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না ভাই, টাকা কবে এসে গেছে। আজকাল আবার চিঠি ক'রে চিঠি লেখা হ'চ্ছে মিন্‌সের!'

বলিয়া সে একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া মেয়েটার সঙ্গেই বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। বলিল, 'মরণ আর-কি! চিঠি কে চাচ্ছে তোর! চিঠি লেখা কেন?...সে এই এম্‌নি এম্‌নি লম্বা লম্বা চিঠি...ঘিনিয়ে-বিনিয়ে...চিঠি প'ড়ে আমি ত' আর হেসে বাঁচিনে! বলে, টাকা আর আমি পাঠাব না, এবার একদিন চুপি চুপি গিয়ে তোমায় নিয়ে আস্‌ব, আর আমি থাকতে পারছিনে। কিন্তু যেতে লজ্জা করে।'

মেয়েটা বলে, 'লজ্জা ত' করবেই ভাই।' বলিয়া সে ঈষৎ হাসিয়া পুকুরের দিকে চলিয়া যায়।

রেণু বলে, 'আসিস্‌ কিন্তু বেলা, অনেক কথা আছে পাপি, বল্‌ব তোকে।'

পাপি ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'আস্‌ব।'

রেণু আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খোকার মুখের পানে একবার তাকায়, গালে একটি চুমু খাইয়া গলার নীচে কাতুকুতু দিয়া তাহাকে খানিকটা হাসায়, তাহার পর হঠাৎ একসময় অন্যমনস্ক হইয়া গিয়া সুমুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। বৈশাখের প্রথম। বসন্ত চলিয়া গেছে। পাতা ঝরিয়া বুড়া অশথগাছটা একেবারে ন্যাড়া হইয়া গিয়াছিল,

আবার তাহার মাথার প্রশস্ত সিঁথায় কটি কটি পাতা গজাইয়াছে। তাহারও যেন নব যৌবন ফিরিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু পিওন ত' কই আসিল না ?

* *

বিভূতিদের পোষ্টাপিস তাহাদের গ্রামে নেই।

আহারাদির পর স্কুলে যাইবার পথে কি জানি কেন বিভূতি বোধ করি অন্যমনে কি যেন ভাবিতে ভাবিতে পোষ্টাপিসটির পাশ দিয়া একটুখানি ঘুরিয়াই ইস্কুলে যায়।

পোষ্টমাষ্টার তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া ওঠে, 'যাদ যে কাবার হ'য়ে গেল বিভূতিবাবু, মনি-অর্ডার ত' কই এবার আর গেল না ?'

কথাটাকে বিভূতি যেন গ্রাহ্যই করে না। বলে, পাঠাব। আমার নামে চিঠিপত্র কিছু আছে ?'

এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই যেন তাহার আসা।

মাষ্টার ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না।—রোজই ত' জিজ্ঞেস্ করেন! কারও চিঠির বুঝি অপেক্ষা করছেন ?'

জবাব না দিয়াই বিভূতি চলিয়া যায়। আমবাগানের মাঝখান দিয়া ইস্কুলে যাইবার পথ। অন্যমনস্কের মত ধীরে-ধীরে সেই পথ দিয়া চলিতে চলিতে এই প্রশ্নই শুধু তাহার মনের মধ্যে জাগিতে থাকে যে, রেণু কি তাহার কথা একবারটি ভাবেও না ? এই যে টাকা পাঠাইতে ক্রমাগত সে দেরি করিতেছে,—কেন দেরি করিতেছে, চাকরি তাহার আছে কি নাই, মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে, কঠিন কোনও অসুখ করিয়াছে কিনা—এ-সব কথা যদি তাহার মনে হইত ত' অন্ততঃ একখানা চিঠিও সে না লিখিয়া থাকিতে পারিত না।

বিভূতি ভাবিল এবার সে দু'মাস পর পর করিয়া দু'মাসের একসঙ্গে পাঠাইবে।

রেণুকে টাকা পাঠাইবার জন্যই বিভূতি বোধ করি সেদিন তাহার হাতবাক্সটা খুলিল।

খুলিয়াই দেখে, সহি-করা যে রসিদগুলি রেণুর কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেগুলিও কম জমে নাই। প্রত্যেকটিই আছে। কোনও মাসে সে টাকা পাঠায় নাই বলিয়া আদালতে তাহার আর নালিশ করা চলিবে না। তৎক্ষণাৎ এই রসিদগুলি দাখিল করিয়া দিলেই—ব্যস্, সহি করিয়া টাকা লইয়াছে, বলিবার পথ বন্ধ।

রেণুর নিজের হাতের সহি কিনা দেখিবার জন্য খান-কয়েক রসিদ তুলিয়া লইয়া বিভূতি তাহার চোখের কাছে আনিয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।

দেখা যেন তাহার আর শেষই হয় না! একবার এ-দিকে ঘুরাইয়া, একবার ওদিকে ফিরাইয়া, একবার চোখের কাছে আনিয়া, একবার মুখের কাছে ধরিয়া—কেমন করিয়া যে দেখিতে চায় কে জানে! কাজ কি বাপু, ভাল করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া রাখাই ভাল।

নিশ্চয়ই রেণুর লেখা। নামের বানান সে চিরকালই ভুল করিত, এখন বোধ হয় তাহা সে শোধরাইয়া লইয়াছে।

একটা রসিদে হাতের লেখা দেখিল অত্যন্ত খারাপ। প্রত্যেকটি অক্ষর যেন বাঁকিয়া বাঁকিয়া গেছে। এক জায়গায় কেমন করিয়া বোধ হয় খানিকটা জল লাগিয়াছিল, সেই জল শুকাও' হাত দিয়া মুছিতে গিয়া নামের শেষে 'দেবী' কথাটাও মুছিয়া ফেলিয়াছে।

কেন এমন হইল ভাবিয়া বিভূতি চোখ বুজিল। ভাবিতে আজকাল তাহার বেশ লাগে।

দেখিল তাহার চোখের সম্মুখে রেণু যেন দোয়াত কলম লইয়া বসিয়া বসিয়া মনি-অর্ডারের রসিদ সহি করিতেছে। ভ্রমরের মত কালো একপিঠ চুল এলাইয়া দিয়া, দোয়াত-খানি মাটিতে রাখিয়া, পিছনের দিকে পা দুইটি ছড়াইয়া, বসিবার সে ভঙ্গীটি বড় অপরূপ! সাপের মত বাঁকা-বাঁকা কয়েকটি অলকগুচ্ছ তাহার সে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত সুন্দর মুখে একটুখানি ছায়া ফেলিয়া বামে হস্তের উপর দিয়া মাটিতে লুটাইতেছে। আলতায় রাঙা শুভ্র সুকোমল দুইখানি পা এবং নীলাম্বরী শাড়ীর প্রান্তভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিভূতি কবি হইলে ইহাকে হয়ত' বনতিমিরাবৃতা রজনীশেষে নবোদিত অরুণালোকের সঙ্গে তুলনা করিত। কিন্তু রেণুর দুর্ভাগ্য,

বিভূতি কবি নয়। সে ভাবিতে লাগিল—নামের অক্ষরগুলি তাহার কাঁপিল কেন? একবার ভাবিল, সে অমনি করিয়া বসিয়া বসিয়া সহি করিতেছিল, ছেলেটা হয়ত' হামাগুড়ি দিয়া তাহার পিছনে আসিয়া পিঠে চড়িয়া বসিয়াছে, কিম্বা হয়ত' পিঠের উপর কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা চাবির গোছাটা ধরিয়া টানাটানি করিয়াছে, কিম্বা হয়ত' তাহাও নয়, হয়ত' অনেকদিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর টাকা গিয়া পৌঁছিয়াছে, কুপনে নিজের নামটি সহি করিতে গিয়া আনন্দে তাই তাহার হাত কাঁপিয়াছে। আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। খোকা বড় হইয়াছে, হামাগুড়ি হয়ত' সে আজকাল আর দেয় না, এতদিনে হয়ত' সে হাঁটিতে শিখিয়াছে, হয়ত' রোজ সে অনেকখানি করিয়া দুধ খায়, মাসে হয়ত' দুধের দাম বেণুর দশ পনেরো টাকা করিয়া লাগে। ছি ছি, একখানি চিঠির প্রত্যাশায় টাকা একদিন না পাঠানো তাহার উচিত হয় নাই। খোকার এই দুধের দাম লইয়া বেণুকে হয়ত' কত গঞ্জনাই না সহিতে হইয়াছে।

খোকার কথা মনে লইতেই বিভূতির হাতখানি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, এবং তাহার বুকের ভিতর হইতে কেমন যেন প্রাণান্তকারী এক দুঃসহ বেদনার অদৃশ্য বস্তুপিণ্ড ক্রমাগত ঠেলিয়া ঠেলিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। প্রাণপণে তাহাই রোধ করিবার জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উন্মাদের মত ঘরময় পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—খোকার যে পুরানো মোজা জোড়াটা সেদিন সে তুলিয়া রাখিয়াছিল, ঘরের ঘাঁটি দেওয়া জঞ্জালের মধ্যে তাহারই একটা পড়িয়া রহিয়াছে, আর-একটা যে কোথায় গেল তাহার কোনও সন্ধান নাই। তৎক্ষণাৎ মোজাটা সে হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া ধূলা ঝাড়িয়া ডাকিল, 'মা!'

বিভূতির মা সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—বলিলেন, 'কি বলছিস্ বিভু?'

রাখিয়া সে মোজাটা দেখাইয়া মাকে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া লজ্জায় সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল, 'না কিছু বলিনি মা, তুমি যাও।'

বলিয়া সে মোজাটা তাহার কাপড়ের আলনায় তুলিয়া রাখিয়া বাক্স বন্ধ করিতে গিয়া দেখিল, চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে এবং তাহার সেই অশ্রুসজল অবরুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে শুধুই তাহার মনে হইতে লাগিল—রেণুবালার স্বহস্তলিখিত সেই নাম আর তাহারই নিম্নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি রৌদ্রযুদ্ধ ছাড়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন আর কোথাও কিছুই নাই!

বাঁকা অক্ষরের কুপনখানি তখনও তাহার বাক্সের উপরেই পড়িয়া ছিল। বিভূতির চোখ হইতে একফোঁটা অশ্রু যে কখন্ তাহার উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। হাত দিয়া মুছিয়া সেটি সে আবার সযত্নে বাক্সে তুলিতে গিয়া দেখে, রেণুবালার নামের যে অর্দ্ধাংশ তখনও বিলুপ্ত হইতে বাকি ছিল, নিজের চোখের জলে তাহা সে মুছিয়া ফেলিল।

বিভূতি ভাবিয়াছিল, রেণুর নামের শেষে 'দেবী' কথাটি জল পড়িয়া হয়ত' মুছিয়া গেছে, কিন্তু এতক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত' জল তাহা নাও হইতে পারে, হয়ত'-বা সে নির্ব্বাসিতা বেদনাবিধুরা বিরহিণীর একফোঁটা লবণাক্ত অশ্রুজল!—আনমিত নয়নপল্লব সিক্ত করিয়া অজ্ঞাতে আজ ঠিক তাহারই মত নিতান্ত সঙ্গোপনে তাহার সে নিবিড় কেশচ্ছায়াচ্ছন্ন আরক্তিম গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে তাই-বা কে বলিতে পারে!…

টাকা লইয়া মনি-অর্ডার করিবার জন্য বিভূতি বোধ করি পোষ্টাপিসেই যাইতেছিল, পিছন হইতে বৃদ্ধা মাতা ডাকিলেন, 'বিভু, শোন্!'

বিভূতি মা'র কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা বলিলেন, 'এমন ক'রে কতদিন আর চল্‌বে বাবা?"

বিভূতি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ প্রশ্ন তাহার কাছে আজ নূতন নয়।

মা একবার তাহার মুখের পানে তাকাইলেন। বলিলেন, 'বৌমাকেই নাহয় তুই একবার নিজে গিয়ে—'

কথাটা তাঁহাকে শেষ করিতে হইল না। বিষাদলেশহীন স্নিগ্ধ সহজকণ্ঠে বিভূতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'না। সে হয় না মা!'

বলিয়াই সে আর মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিল।

নারী ব্যবহারাজীব

শ্রীমতী রোজা জিন্‌বার্গ প্যালেস্টাইনের প্রথিতা মহিলা ব্যবহারাজীব—যিনি সুদীর্ঘ ৭ বৎসর কাল প্যালেস্টাইনের বিচারালয় সমূহে ব্যবহারাজীব ব্যবসায়ে নারীর অধিকারের জন্য লড়িয়া বিজয়িনী হইয়াছেন। ইনি জনৈক জিন্স বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পত্নী।

শিক্ষার্থিনী শিক্ষয়িত্রী

কুমারী অমিতা দত্ত বি-এ, বি-টি "কলিকাতা ভিক্টোরিয়া বালিকাবিদ্যালয়ের" একজন শিক্ষয়িত্রী। "নিখিল ভারত নারী সম্মিলনী" দ্বারা নির্বাচিতা হইয়া ইনি সম্প্রতি ইংলণ্ডে "লেডী গ্রে ট্রেনিং কলেজে" অধ্যয়নের জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

হকি ক্রীড়া

কলিকাতা ময়দানে প্রতিযোগিনীরা হকি-ক্রীড়া করিতেছেন।

নারী ধানুকী

শ্রীমতী এস্, এইচ্, আর্মিটেজ- ইংলণ্ডের হিথ্রফোর্ডে তাঁহার ধনুর্বিদ্যার জন্য "বিজয়িনী" আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

রশির উপর বল খেলা

এই প্রকার দু'ইদিকে দুটি দড়ির উপর পোলা হাতে দাঁড়াইয়া বল খেলা ইয়াঙ্কি বালিকাদের একটি প্রিয় খেলা।

সাঁতারে বালিকা

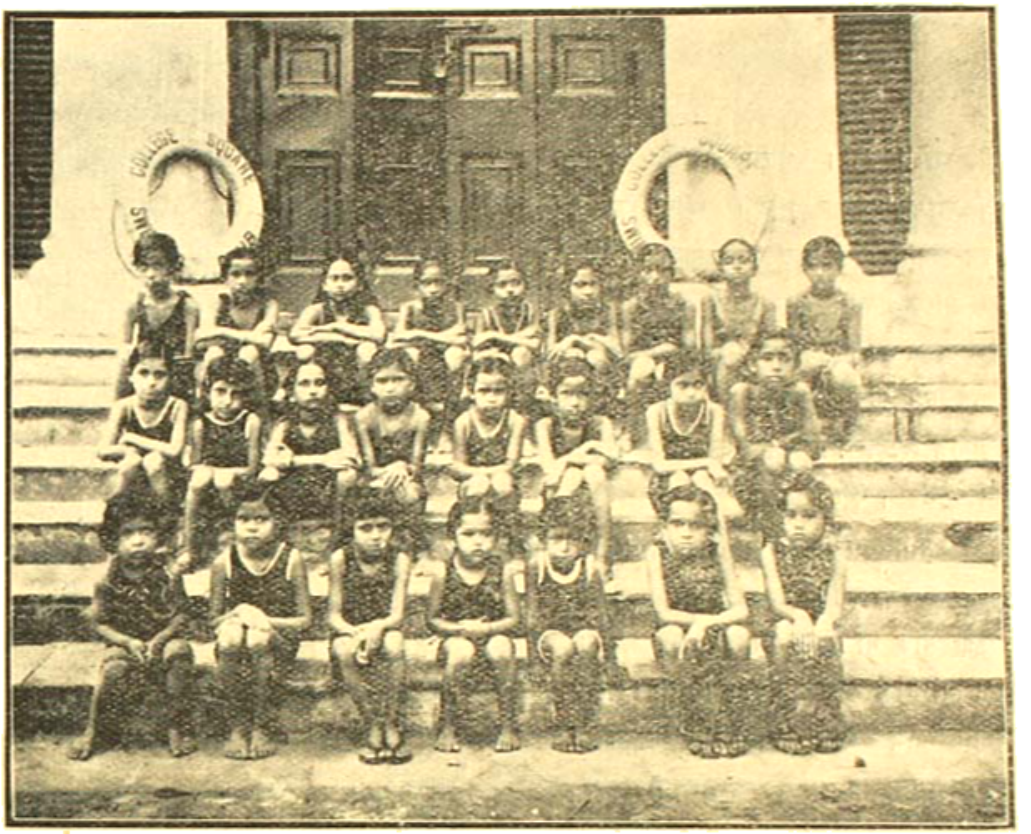

এই বালিকাগুলি "কলেজ স্কোয়ার সন্তরণ সমিতি"র শিক্ষার্থিনী সাঁতারে বালিকা। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিশেষ সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া বিভিন্ন পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সব অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে সন্তরণ শিখাইবার জন্য "কলেজ স্কোয়ার সন্তরণ সমিতি" আমাদের ধন্যবাদার্হ। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০ শত বালিকাকে বিনা পারিশ্রমিকে এইরূপ সন্তরণ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

গীতরচয়িতা রবীন্দ্রনাথ

শ্রী সতীশ রায়

গান গাওয়াই কবির ধর্ম। গানের ভিতর দিয়েই কবির প্রাণের স্পর্শ আমরা সহজে পাই। কারণ সুরের দ্বারা অন্তরের আনন্দ-বেদনাকে,—তার রহস্যময় অনির্বচনীয় মাধুর্য্যকে যেমনভাবে প্রকাশ করা চলে এমন আর কোনো আর্টের দ্বারা সম্ভব নয়। গানের কথায় যতখানি পাওয়া যায়, সুর তার চেয়ে ঢের বেশী পাওয়ার ইঙ্গিত করে, তা' সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অতলস্পর্শ গভীরতার দিকে আকৃষ্ট ক'রে আমাদের মনকে উদাস ক'রে দেয়।

সৌন্দর্য্যের কাজ আমাদের মনে মাধুর্য্য জাগানো। আর্টের কাজ মাধুর্য্যকে রূপ দেওয়া। অন্তরের যে মাধুর্য্যকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না সেই অনির্বচনীয় মাধুর্য্য সঙ্গীতের সুরের মধ্যে আপন প্রকাশভাষা খুঁজে পায় ব'লে আর্টের যা' বিশ্বজনীন কাজ—গানের দ্বারা তা' সবচেয়ে বেশী সিদ্ধ হয়। তাই আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, "গানাৎ বিদ্যা পরতরং নহি"—গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর নেই।

এই গানের ভিতর দিয়ে কবি যে জগৎকে দেখেন সেই দেখাই সত্যের সুন্দর রূপ দেখা—সুন্দরের সত্যরূপের স্পর্শ পাওয়া! তাই ত তিনি গেয়েছেন,

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তোমায় চিনি, আমি তখন তোমায় জানি!"

ধর্ম্মগ্রন্থে ভগবান বলেছেন,

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি, নারদ!"

আমাদের দেশের তত্ত্বান্বেষীরা এই জন্যে বলেন যে "সুর ব্রহ্ম।"

বিশ্বপতি নানাজনকে নানান কাজের ভার দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কবি, যিনি সংসারের বিচারে অকেজো, তাকে তাঁর আনন্দযজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে কি কোনো ভার দেননি? এই কাজের-পৃথিবীতে কবির কি কোনো কাজ নেই? কবি বলেন,

"হে রাজন! তুমি আমারে
বাঁশী বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহদ্বারে!
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই
মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই
কোথা হ'তে যাই কোথা রে!"

কিংবা, "তোমার বিপুল ভুবন মাঝে
লাগিনি নাথ কোনো কাজে
শুধু কেবল সুরে বাজে
অকাজের এই প্রাণ!"

কবি তাঁর মহৎ দায়িত্বের কথা সব সময়ে ঠিক মনে রাখতে পারেন না; সংসারের অবজ্ঞা তাঁকে অসহিষ্ণু ক'রে তোলে; তিনি নানান কাজে জড়িয়ে পড়েন। নিজের মহৎ কর্ম্মভারের কথা কবির কখনো মনে থাকে কখনো থাকে না। তাইত কবিকে আক্ষেপ ক'রে গাইতে শুনি,

"হে বীণাপাণি! তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি কখনো শুনি না যে!"

সূর্য্যের আলো আমাদের এত আনন্দ দেয় কেন?—তার উজ্জ্বল রূপ আমাদের চোখে লাগে, তার মধুর উত্তাপ অঙ্গে অনুভব করি। বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যকে আলো ধ'রে দেখিয়ে দেয় ব'লেই কি সূর্য্য আমাদের আনন্দের?—হাঁ, এ সবই সত্য, কিন্তু এ সব বাইরের জিনিষ। কিন্তু সে যে ঐক্যকে স্বীকার করে, সাত রংয়ের সমাবেশেই যে সে শুভ্র-সুন্দর-উজ্জ্বল, অসংখ্য গ্রহতারা-ভরা বিশ্ববৈচিত্র্যের ভেতরে সে যে এক, সে যে কেন্দ্রস্থল—মন আপনার অজ্ঞাতে তা' বোঝে সেই জন্যেই সূর্য্যের আলো আনন্দের।

তেমনি আমাদের কান সঙ্গীত অবহিত হ'য়ে শোনে, তা'তে আনন্দ পায়, কি জন্যে? তার মধ্যে সুরের মধুর

খেলা আছে ব'লে কি? না, সপ্তসুরের ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মধ্যে সে ঐক্যকে স্বীকার করে ব'লে?

এক আমাদের আনন্দ দেয়,—পৃথিবীর বৈচিত্র্যের ভিতর একেকে আবিষ্কার করতে পারলে আমরা আনন্দিত হ'য়ে পড়ি। সঙ্গীতে শুধু মধুর ধ্বনির আনন্দ নেই, তা' এই ঐক্য-আবিষ্কারের আনন্দ। ভগবানের ভিতরে যে সাধকেরা আনন্দ পান তার কারণও তাই—বৈচিত্র্যাক্রান্ত মন একের আশ্রয় খুঁজে পায় ব'লেই! প্রেমের ভিতর যে এত আনন্দ—যাতে ক'রে আমাদের জীবনের সমস্ত শূন্য এক মুহূর্তে পূর্ণ হ'য়ে যায়, সমস্ত ব্যর্থতা সার্থকতায় ভ'রে ওঠে,—সে কেন? সেখানেও বহুর ভিতর সেই "এক"কে পাই ব'লে আনন্দ অনুভব করি। এত লোক পৃথিবীতে আছে, সকলকে ভালবাসবার মত শক্তি আমাদের নেই; কিন্তু ইচ্ছা আছে; তাই একের মধ্যে যখন আমরা সকলকে পাই, বৈচিত্র্যকে অনুভব করি, তখনই আমরা আনন্দ পাই,—তখনি আমরা ভালবাসি। বলি, তুমি আমার আবিষ্কার, তুমি আমার আপনার, তাই তোমাতে এত আনন্দ! তোমাকে পেলেই সকলকে পাওয়া হ'ল,—তোমার ভিতরে আমি পূর্ণতাকে পেলাম।

বহুর পিছনে ঘুরে-মরা ক্লান্ত মন একের মধ্যে আশ্রয় পায় ব'লেই প্রেমে এত আনন্দ।

সঙ্গীতের ভিতর harmony আছে তা'তে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের ভিতর এই ঐক্যকে স্বীকার করি, সেই জন্যেই সঙ্গীত আমাদের আনন্দ দেয়—সঙ্গীত প্রেমেরই কণ্ঠস্বর। তাই যে কবি সে গীতরচয়িতা সে প্রেমিক। সেই জন্যে রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার" কবিতায় আছে—

"সুখীরা কেঁদেছে সুখীরা হেসেছে
প্রেমিক যেমন সে ভালবেসেছে
আমি আমাদের মত।"

বিশ্বস্তর মধ্যে, বিশ্বভাবের বৈচিত্র্যের মধ্যে যে পরম এক আছে কবির কাব্য ও সঙ্গীত তারি অনুসন্ধানের ইতিহাস।

Skylark কবিতায় কবি শেলি এক জায়গায় বলছেন —"Such harmonious madness
from my lips would flow."

এই harmonious madness বা সুরপূর্ণ উন্মাদনা —এতে মাঝে মাঝে কবিরা মেতে যান, তখন আর না-ওয়া-খাওয়ার কথা মনে থাকে না; সাধারণ লোকের মত-আলাপ-আচরণের অবসর ঘটে না, তখন—

"...তখন ঘরে বন্ধ হ'য়ে কবি
দিনের পরে দিন, লাগাও দিন!
কথার সাথে গাঁথ কথার মালা
দিনের সাথে মিল, মিলাও মিল!"

তখন তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কাজে পদে পদে ত্রুটি হ'তে থাকে, বাড়া ভাত ছড়িয়ে যায়, ওদিকে রাত্রি গভীর হ'তে গভীরতর হ'তে থাকে, মেহশীলা আত্মীয়ার অনুযোগ ব্যর্থ হ'য়ে পড়ে—কবি মধুমত্ত ভ্রমরের মত গুন্ গুন্ শব্দে আপনার সুরের ইন্দ্রজাল-রচিত স্বপ্নলোকে বিচরণ করতে থাকেন। এই ভাবের ভূতে-পাওয়া গানে-পাগল কবিকে, এই harmonious madnessকে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভিতর প্রত্যক্ষ করেছি।

গানের সুর তাঁকে মাতিয়ে দেয় প্রথমে, তার পর আসে কথা, সেইজন্য কথাগুলি হয় মধুমাখা—সুরের মাধুর্য্যরসে মনটা সিক্ত হ'য়ে থাকে কি না! অনেক অননুভূতপূর্ব্ব বেদনা তিনি অনুভব করেন, অনেক অভাবিতপূর্ব্ব কথা তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে ব'লে ফেলেন। কবি বলেন, এর কারণ গানের বেগ—

"সঙ্গীতস্রোতে কোথা ভেসে যাই
নাহি পাই নিজ কূল!"

তাই পৃথিবীর কাজের ডাক, কর্ত্তব্যের আহ্বানও কবির কাছে সময় সময় ব্যর্থ হয়। তাইত কবি বেদনাভরে গেয়ে ওঠেন—

"কেন তোমরা আমায় ডাকো,
আমার মন না মানে
পাইনে সময় গানে গানে!"

পৃথিবীর সীমাবেরা সমস্ত বাস্তবতার বেড়াকে ডিঙিয়ে যান কবি এই গানের মধ্য দিয়ে। আমাদের মনকে সুরের পাখায় ক'রে তিনি উড়িয়ে নিয়ে চলেন ঐন্দ্রজালিকের মত কল্পনার স্বপ্নলোকে। বিধাতা যেমন এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, কবিও তেমনি ছন্দে—

"বেদনার গীত গীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন !"

পাখীরাও গান গায়। কোকিল যে এমন মধুর সুর-তরঙ্গে আকাশ ভাসিয়ে দেয়, পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌রা ব'লে থাকেন তা' নাকি কোকিলার মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে। কপোতের কলকূজনের উদ্দেশ্যও তাই। কবিরা এই গানকারী পাখীর জাতি। তাই দেখি জগতের সকল গানের মূলে আছে প্রেম। পৃথিবীর যত কবি যত কবিতা লিখেছেন তা' যদি বিষয়বস্তু আলাদা ক'রে ওজন করা হয়ত দেখা যাবে যে প্রেমের কবিতার ওজনই সব চেয়ে বেশী। কবিদের স্বতঃস্ফূর্ত কবিতাই ভালবাসার কবিতা।

প্রেমই তাঁদের দৃষ্টি—যেমন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি বুদ্ধি বা যুক্তিতর্ক।

প্রাণে প্রেম জাগ্‌লেই কণ্ঠে গান জাগে, কানের ভিতর দিয়ে অন্যের গান মনে প্রবেশ করে। তাইত কবিকে গাইতে শুনি—

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে
এমন গানে গানে।"

তুমি প্রাণে প্রেম দিয়েছ তাই ভোরের আকাশ ভ'রে পাখীর গান শুন্‌তে পাই, নইলে পেতাম না।

"গানভঙ্গ" কবিতাটি আপনারা সকলে পড়েছেন, তার শেষ ক'টি লাইন মনে কর্‌তে বলি—

"একাকী গায়কের নহেত গান, নিখিলে যবে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আর একজন গাবে মনে!
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি' কাঁপে তবে সে মর্ম্মর ফুটে,
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে,
সেখানে প্রেম নাই বোঝার সভা, সেখানে গান
নাহি জাগে।"

"যুগল" না মিল্‌লে, গায়ক এবং শ্রোতার মধ্যে প্রেম না থাক্‌লে "গানভঙ্গ" হয়, সঙ্গীতের উদ্দেশ্য যে মিলন তাই ব্যর্থ হয়।

সকল গানের উৎস যে এই প্রেম, একে আমরা যে নামে রুচি হয় সেই নামে অভিহিত কর্‌তে পারি—পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেম কিংবা নরনারীর হৃদয়ের আকর্ষণ!

কারণ, "...আর পাব কোথা—
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!"

সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব শ্রেষ্ঠ গানই প্রেমের গান। এই গান আধ্যাত্মিক ও মানবিক দুই সম্বন্ধেই সত্য। কবির এ গান দুই সম্বন্ধেই চলে—

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে,
আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমার।"

কিংবা "মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই
গান দিয়ে তার চরণ ছুঁয়ে যাই।"

কবির "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে যে মদন বল্‌ছেন—

"আমি সেই মনসিজ, টেনে আনি
নিখিলের নরনারী-হিয়া বেদনাবন্ধনে.
আমি মানসের সকল রহস্য জানি।"

ইহা কবির নিজেরেই কথা। কবি মানব-মনের সমস্ত রহস্য অবগত আছেন।

আমরা বাতাস নইলে বাঁচ্‌তে পারি না। গান না এলে কবির অস্তিত্ব ব্যর্থ হয়। কবি শেলি বলেছেন—

"I pant for the music
which is divine."

আমাদের কবিও তাঁর প্রাণে গানের অভাবের জন্যে এমনি আকুলতা প্রকাশ করেছেন—

"চিত্ত পিপাসিত রে
গীত-সুধার তরে!"

কেন পিপাসিত?—

"তাপিত তরুলতা, বর্ষণ যাচে যথা—"
"Like a herbless plain for the gentle
rain!"—Shelley

কবিরা আমাদের মন ভোলান গান দিয়ে। ঐ যে কবির "কাণ্ডারী"তে পাই, "মন ভোলাবার মন্ত্র আমরা জানি—" সে সত্যি কথা। এই মন ভোলাবার মন্ত্রটি ভুলে গেলে, প্রাণে গান না এলে কবিরা যে কত ব্যথিত কত হতাশ হ'য়ে পড়েন, গানের অভাবে কবির প্রাণের সেই আকুলতা শেলির এই কবিতাটিতে প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে—

"Rarely rarely comest Thou
Spirit of delight !
Wherefore hast Thou left me now
Many a day and night !"

কবির ভাষা হ'য়ে পড়েছে—

"How shall every one like me
Win Thee back again ?"

প্রাণের উদ্বোধন হয় গান দিয়ে। আমরা গানের জন্যেই কবিকে চাই আমাদের প্রাণকে নাচাতে, মাতাতে, দোলাতে,—আমাদের মনের মধ্যে যে ভাবগুলো সুপ্ত অবস্থায় আছে তাদের জাগাতে, আকার দিতে,—প্রাণের অনির্বচনীয় আনন্দ-উৎসকে সুরের ঝঙ্কারে প্রকাশ করতে। আর কবিও প্রকাশধর্মী। মনকে খোলসা করাই তাঁর কাজ—ভাবকে রূপ দিয়ে। আমরা ভাবকে মনে গোপন ক'রে রাখি—প্রকাশ করি না। কিন্তু কবির কোনো কিছু গোপন করবার ক্ষমতা নেই ; তিনি বলেন—

"আমার কোলের আমার বীণাটি
গীত-ঝঙ্কার ছলে,
যখনি যে কথা করিব গোপন
তখনি সে কথা বলে।"

তাই যখনই কবির মনে যে ভাব জেগেছে, কবি বলেন—

"গেয়েছি তা' গানে
ধরিনি তা' মনের বেড়া-ঘেরা প্রাণে !"

আর আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতেই পারি না ভাল ক'রে ; কারণ,

"মধুর মোহন মন্ত্র জানি না মোরা
আপন প্রকাশ করিব কেমন ক'রে ?"

"মধুর মোহন মন্ত্র," আর "মন ভোলাবার মন্ত্র" একই, তা' গান।

তাই কবিকে স্মরণ নিতে হয় গানের, সংসারের লোকের ভীড় আর কাজের গণ্ডগোলকে এড়িয়ে। পৃথিবীর এই বেনাবেচার হাটে, এই মানপ্রতিদানের দরদস্তুরে ত্যক্ত-বিরক্ত কবিকে গাইতে শুনি—

"হাটের ধূলা সয় না যে আর কাতর করে প্রাণ—
(তোমার) সুরের সুরধুনীর ধারায় এবার করাও স্নান !
জাগাও তোমার মৃদঙ্গ-রোল
বক্ষে তোল তরঙ্গ-দোল
অঙ্গ হ'তে ফেলুক মুছে সকল অবসান !"

তখন কবি চান, যে পদ্মবনে সঙ্গীতের স্বরস্বতী বিরাজ করেন, সেই পদ্মবনের মৃদুসুরভিবীজিত, স্নিগ্ধীকরসিক্ত হাওয়া ! বীণার ঝঙ্কারের মধ্যে তিনি চান সংসারের সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্তি,—সমস্ত অনাবশ্যক অসার্থক কর্মকলরোল তিনি ভুলতে চান ; আমাদের ভোলাতে চান গান গেয়ে ! তিনি নিজের জীবনকে এবং আমাদের সকলের জীবনকে সৌন্দর্য্যের সরল সঙ্গীতে বেঁধে নিতে এবং বেঁধে দিতে চান।

ঐ যে শেলি আকুল হ'য়ে বলছেন, "Let me drink of that sweet sound more o' more, I am thirsting yet."—এ কবিতা আমাদের কবির সঙ্গীতের জন্য আকুল প্রার্থনার সুরের সঙ্গে মিলছে,

"হাটের ধূলা সয় না যে আর কাতর করে প্রাণ—
(তোমার) সুরের সুরধুনীর ধারায় এবার করাও স্নান !"

কবির মনে সময় সময় এমন অবসাদের কাল, এমন শীতের দিন এসে পড়তে দেখি যখন তাঁর মানস-মালঞ্চে আর সুরের ফুল ফোটে না, গানের ফলল ফলে না। একটা পরিত্যক্ত বাগান-বাড়ীর সঙ্গে উপমা দিয়ে সেই সময়কার অবস্থাটিকে কবি বর্ণনা করেছেন—

প্রথমে ঘর থেকে বেরিয়ে, ক্রমে ফুলবাগান পেরিয়ে আমরা পুকুরে পৌঁছব—বর্ণনাটা মিলিয়ে নিন—

"জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায় ;
ফুলের বাগান ঘন-ঘাসের পদ্মবে সন্ধ্যা বনবাসের
শেওলা এসে ঘিরবে দীঘির ধারগুলায় !"

কিন্তু এই সাময়িক মানসিক অবসাদ কবিকে কাটিয়ে উঠতে দেখি গান দিয়ে,—যেমন শীতকে তাড়িয়ে দেয় বসন্ত ফুলবাস মেখে।

কবি প্রায় ভাবেন,

"বারে বারে চাইব না আর মিথ্যা টানে
ভাঙন-ধরা আঁধার-করা পিছন পানে !"

এবং মনকে বলেন—

"চন্দ্রে সোনা বাঁধার আগে যা' দিয়ে
সামনে-পিছে দৃষ্টি তোমার না দিয়ে!"

আর নিত্য নূতন সুরের ফুল-ফোটানোয় আত্মতৃপ্ত হ'য়ে পরিপূর্ণ আনন্দাবেগে গেয়ে ওঠেন—

"এমনি ক'রে যায় যদি দিন যাকনা
মেঘে দিয়ে গানের পাখ্না!"

কিন্তু মাঝে মাঝে ওঁর মনে গীতঝরিতার মহান্ সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ এবং নিরাশা এসে পড়তে দেখি। যখন সংসারের নিপীড়িত, নিরন্ন, নিঃসহায়ের করুণ ক্রন্দন ওঁর কানে গিয়ে বাজে, ওঁর কোমল মনে বেদনা দেয় এবং কবি যখন তাদের অভাব-অভিযোগ পূরণে নিজের শক্তির ক্ষুদ্রতা এবং অক্ষমতা বুঝতে পারেন, তখন ওঁকে নিরাশ কেঁদে বলতে শুনি—

"যে দিন জগতে চ'লে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি
শুধু এই খেলাঘর বাঁশী!"

হাল-ফ্যাশান

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীদীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

কোলকাতায় আস্বার পর লেখা—

বাড়ী ফিরে এসে বাঁচ্লুম। বেশীদিন কি বাড়ী ছেড়ে থাকা যায়? আমার সমালোচনাটা খেয়ে গিয়েছে দেখ্ছি; কতদিন আর ঐ এক বিষয় নিয়ে মানুষে কট্ কাট্ করবে? নীহার কিন্তু কি মেয়ে! আমায় দেখে কথা কইলে না। সুধীরের কথা ত ছেড়েই দাও, সে ত আমায় দেখ্লে সাত-হাত দূরে স'রে যায়! কেন যে এমন করে তাও ত জানি না। বিধাহিত পুরুষের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করা আমার অভ্যাস নয়। সুধীর আর নীহারের কম পাবার কিছু নেই।

এবার কিন্তু মা'র সঙ্গে একচোট ঝগ্ড়া হ'য়ে গেল, সে আবার ঐ দেবকুমারকে নিয়ে। সত্যি, ঐ লোকটার জন্য আমার কত লোকের সঙ্গেই না গোল বাধ্ল। কি কুক্ষণে ওর নাম শুনেছিলাম! মা যে এমন ক'রে দেবকুমারের সঙ্গে সদ্ভাব রাখ্বে সেটা আমার কিছুতেই সহ্য হয় না। একদিন এ বিষয় মাকে বলেছিলাম; মা তার উত্তরে বলেন—সে ত আমার সঙ্গে কোন অভদ্রতা করে নি, তাকে শুধু শুধু বাড়ীতে আস্তে মানা করব কেন? আহা! বাড়ীতে ত কত আসে!—আমি এসে অবধি একদিনের তরেও ত তার চেহারা দেখিনি। মা'র কথা শুনে আমার আরও রাগ হ'ল, আমি রেগে বল্লাম—"তোমার সঙ্গে অভদ্রতা না করুক তোমার মেয়ের সঙ্গে ত করেছে, সে কি একথা নয়? মা হাস্তে লাগ্লেন। আমি ত এর মধ্যে হাস্বার কিছু দেখ্লাম না। দুদিন বাড়ী ছিলাম না এরই মধ্যে মা কিরকম বদ্লে গিয়েছেন। না, এ সব সেই দেবকুমারের কীর্তি! মা'র সাম্নে দেখার বেন কত ভাল লোক··মা হেসে বলেন—"তোর দেবকুমার কি অভদ্রতা করেছে?" আচ্ছা প্রশ্ন!—কি অভদ্রতা করেছে তা কি আমি মনে ক'রে রেখেছি? ভাল ক'রে কোন জবাবই দিতে পার্লাম না;—মা আরও হাস্তে লাগ্লেন। আমি এবার সত্যি রেগে বল্লাম—"বেশ ত, তাকে বাড়ীতে আন, আমি কিন্তু ব'লে রাখ্ছি, ও একদিক দিয়ে ঢুক্বে আমি অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যাব—"ব'লেই আমি নিজের ঘরে জোর দিলাম। এমন ভাবে নিজের যাও কি কারু পিছনে লাগে! চোখে জল আসাটা কিছু আশ্চর্য নয়।

বিকেলে চায়ের সময় মা বলেন—"শুনু, আজ

থেকে এসে যে তোর মেজাজটা বড় গরম হ'য়ে গিয়েছে…" আমি মুখ ভার ক'রে ব'সে রইলাম। মা আমার ছোট মেয়ের মতই আদর করতে লাগ্‌লেন। এ সময় আবার চোখে জল আস্‌ল কেন? মা অম্‌নি বল্লেন—"আমার মেয়ের মুখের হাসি কে কেড়ে নিলে? তাকে খুব জব্দ করতে হবে…" আমি চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লাম—"কি যে মা তুমি সব সময় ঠাট্টা কর?" মা এবার হেসে বল্লেন—"দেবকুমার নাকি?" দেবকুমারের নাম শুনে আমার এত রাগ হ'ল, আমি চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে চ'লে গেলাম।

গল্পের শেষ কথা…

আমার যে কি হয়েছে তা ত বুঝ্‌তে পারি না; একটুতেই রাগ হয়। আয়নাটা ত আমার কাছেই আসে না ভয়ে! একটা কোন কাজেও ছাই মন দিতে পারি না। সেদিন ভাব্‌লাম পিয়ানোটা বাজাই; একটু বাজালাম, কিন্তু মা যেম্‌নি বল্লেন আর একটা কিছু বাজা, অম্‌নি আমি উঠে প'ড়ে বল্লাম পিয়ানোটার সুর ঠিক নেই।… বড় মাসিমা'র মেয়ে ডলির জন্যে একটা কোট বুন্‌ছিলাম তার পাঁচ ছ'টা ঘর প'ড়ে যেতে সেটা টান মেরে ফেলে দিলাম। ব্রিজ খেল্‌তে ব'সে এমন ভুল করি যে যেচারা বাবা পর্য্যন্ত আমায় পার্টনার করতে চান না। এই কোল্‌কাতা আস্‌বার জন্যে প্রাণ হাঁপাচ্ছিল, আর আজ এরই মধ্যে মনে হ'চ্ছে কোথাও পালাই। আর মা হয়েছেন ঘরের শত্রু বিভীষণ—সব তাতে কেন যে হাসেন তা ত জানি না। সেদিন হঠাৎ ড্রয়িংরুমে ডেকে পাঠালেন; আমি যেমন ছিলাম তেম্‌নি ভাবে ঘরে ঢুক্‌লাম। ওমা! ঢুকে দেখি দেবকুমার ব'সে আছে।… আচ্ছা, এ-রকম করাটা কি মা'র উচিত হয়েছিল? আমি মাকে কতবার ব'লে রেখেছিলাম দেবকুমারের সঙ্গে ম'রে গেলেও দেখা করব না, তাই মা এম্‌ন ভাবে না ব'লে আমায় ডেকে আনালেন? তারপর মা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"দেবকুমারের কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছ, সে-বিষয় ও জান্‌তে এসেছে।" কথাগুলো ব'লেই মা বেরিয়ে গেলেন। আমার তখন এমন রাগ হয়েছিল যে আমার জ্ঞান ছিল না। দেবকুমার বাবুকে দেখেই বল্লাম—"আমি ওসব পার্‌ব না, দুজন প্রেমিকের মধ্যে আমি কেন তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত হ'তে যাব?" সে বেশ হেসেই বল্লে—"অত চোট্‌ছ কেন? আমি তো তোমায় ঐ কাজের ভার দিই নি—" রেগে বল্লাম—"তবে কেন এসেছেন? কি চাই আপনার?" কথার জবাব না দিয়ে ও কেবল হাস্‌তে লাগ্‌ল।

মা আর দেবকুমার বাবুর কেন যে সব কথায় হাসি পায় তা' আমি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। যখন-তখন হাসিটা কি মানুষের ভাল লাগে? দেবকুমার বাবু কথা না ব'লে পকেট থেকে কি একটা বের করবার চেষ্টা করলেন, আমি অম্‌নি ব'লে বস্‌লাম—"সিগারেট যদি চান ত ঐ টেবিলের উপর বাবার টিন্‌টা রয়েছে—" সে সেদিকে ফিরেও চাইলে না। তারপর গম্ভীর ভাবে ওর সেই প্রিয়তমার রুমালটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"এটা যার জিনিষ—" লোকটার আস্পর্দ্ধার যে শেষ নেই—গোড়াতেই ত স্পষ্ট বলেছিলাম আমার দ্বারা ওসব হবে না; তবুও আমার হাতে রুমাল দেওয়া? আমি একটানে রুমালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লাম—"আমায় দেখ্‌তে ব'লে গিয়েছে, আপনি ঐ রুমাল নিয়ে ব'সে ব'সে ধ্যান করুন, আমি আসি—"

ওমা! লোকটি কিছু মাত্র লজ্জিত না হ'য়ে রুমালটা কুড়িয়ে নিয়ে এল। তারপর—তারপর আস্পর্দ্ধা দেখ, ছোট ছেলের মত আমাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে রুমালের এক কোণ আমার সাম্‌নে ধ'রে কা.ন কানে বল্লে—"দুষ্টু বদ্‌রাগী মেয়ে, ভাল ক'রে এখানটা চেয়ে দেখ ত? শুধু শুধু অত চোট না, মেজাজে যে সদাই সপ্তমে চড়া—"

তাকে আর বেশী বল্‌তে না দিয়ে রাগ ক'রে রুমালখানা টেনে নিতেই লিলি অব্ দি ভ্যালির মৃদু গন্ধ ভেসে এল. —তারপর ভাল ক'রে কোণটি দেখ্‌লাম, ওমা! সত্যিই ত সেখানে আমারই হাতে তোলা সিল্কের সুতোয় একটা ছোট্ট "এস্" লেখা আছে যে

সম্পূর্ণ

বাংলার জীবনে নৃত্য ও ক্রীড়ার স্থান

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

নৃত্য ও ক্রীড়ার পরস্পর সম্বন্ধ

আমরা দেখিয়াছি যে জাতির গভীর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার ক্রীড়াপদ্ধতিতে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে প্রত্যেক জাতির রসকলা-পদ্ধতি সেই জাতির গভীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও লক্ষ্যের লীলাময় অভিব্যক্তি। সকল রসকলা হইতে নৃত্যকলার মূলে সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক। সুতরাং একদিকে যেমন জাতির ক্রীড়া-পদ্ধতি হইতে তাহার প্রকৃতির পরিচয় অতি সহজ ও সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়, সেইরূপ জাতির নৃত্যকলাও তাহার প্রকৃতির পরিচয় সহজ ও সুস্পষ্ট ভাবে আমাদিগকে দিতে সহায়তা করে।

ক্রীড়া এবং রসকলার—বিশেষতঃ নৃত্যরসকলার—মধ্যে উপরোক্ত বিষয়ে এই যে পরস্পর সমতা, ইহা হইতে ইহাদের প্রকৃতিগত কয়েকটি মূল্যবান সত্যের আভাস আমরা পাই। ক্রীড়া এবং রসকলা (বিশেষতঃ নৃত্য-রসকলা) উভয়ই এক-শ্রেণীর প্রক্রিয়া, অর্থাৎ উভয়ই জাতির প্রকৃতির লীলাময় আত্মপ্রকাশ অথবা অভিব্যক্তি। এবং রসকলাকে এই অর্থে মানবপ্রকৃতির একটি ছন্দাত্মক ক্রীড়া-বিশেষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। মানুষ যখন দৈনন্দিন বাধ্যতামূলক অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ হইতে অবসর পায়, তখনই সে ক্রীড়ার চর্চ্চা করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। দৈনন্দিন জীবনের অন্ন-বস্ত্রসংস্থান, উদরপূর্ত্তি ইত্যাদি জড়দেহের অনিবার্য্য প্রয়োজন-মূলক ব্যাপারের সম্পাদনের ব্যবস্থা কোন রকমে সারিতে পারিলেই সে ক্রীড়ার লীলাময় আনন্দে নিজেকে ঢালিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হয়; অর্থাৎ, ক্রীড়া জড়দেহ-ধারণের বাধ্যতামূলক বেগার-খাটুনির ভাবনা হইতে মানুষের প্রাণের মুক্তির একটি অভিব্যক্তি স্বরূপ। মানুষ যখন জড়দেহের ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রয়োচনামূলক প্রবৃত্তি হইতে আপনাকে উচ্চতরে উত্তোলিত করিয়া আত্মার গভীর ও বিশুদ্ধ আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও লক্ষ্যের অভিব্যক্তি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তখনই তাহার প্রক্রিয়াগুলি রসকলার রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রসকলা মানুষের আত্মার মুক্তভাবেরই একটি লক্ষণ এবং মানুষের আত্মার মুক্তভাব হইতেই ইহার উদ্ভব।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে জাতির জীবনে খেলাধূলার চর্চ্চা জাতির এবং তাহার ব্যক্তিসমূহের প্রাণের মুক্তভাবের পরিচায়ক। এবং বর্ত্তমান কালে যে-সকল জাতি জগতে প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতেও আমরা ইহারই সমর্থন পাই। পক্ষান্তরে, যে সকল দেশে মানুষের প্রাণ নানা বিধিবিধানের বন্ধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মুক্তভাব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই সকল দেশে ক্রীড়া এবং নৃত্যকলার সার্ব্বজনীন চর্চ্চার অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ক্রীড়া এবং নৃত্যকলা মানুষের প্রাণের এবং আত্মার মুক্তভাবের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের সহজ ও অনিবার্য্য অভিব্যক্তি। মানুষের প্রাণ ও আত্মা যেখানে পরিবারে, সমাজে, ধর্ম্মজীবনে অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে নানা-প্রকার ভ্রান্ত বিধিবিধান-মূলক দণ্ডমুণ্ডের ভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত, সেইখানেই তাহার আত্মা পঙ্গু হইয়া পড়ে, এবং তাহার প্রাণের সেই ভীতির বন্ধনে তাহার খেলাধূলা ও নৃত্যের প্রবৃত্তির উৎসমুখ নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

প্রাচীন বাংলার জীবনে মুক্তভাব

একদিন ছিল যখন বাংলার প্রাণ ও আত্মা ছিল মুক্ত এবং তাহার ফলে তাহার জীবন ছিল গৌরবময়, পৌরুষময় এবং আনন্দময়। বাংলার মানুষের প্রাণের তেজ তাহার সাহস ও বাহুবলে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়া তখন বাংলাকে প্রাচীন ভারতে একটি অত্যুচ্চ গৌরবময় স্থান দিয়াছিল। সেই যুগে গঙ্গারাষ্ট্রীয় বাঙ্গালীর পরাক্রম দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের

মনেও ভীতি সঞ্চার করিয়াছিল। সেই যুগে বাঙ্গালী কি স্থলযুদ্ধে কি নৌযুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। সেই যুগে সে কি স্থলে কি জলে বাণিজ্যে অগ্রণী ছিল। তাহার নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল,—সিংহলে, যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল,—তখন সে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ ও দ্বীপময় ভারত মহাসাগরে ধর্মপ্রচার করিতে ছুটিয়াছিল। তাহার মস্‌লিন ও অন্যান্য সূক্ষ্ম শিল্পদ্রব্যের প্রসিদ্ধি মহাদেশ অতিক্রম

প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্ট-বিস্মৃত আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের কাছে এসব কথা একটি প্রহেলিকার মতই বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা সত্য। প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় পাইবার চেষ্টা যতই আমরা করিতে পারিব ততই আমরা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব,—এবং ততই আমরা বুঝিতে পারিব যে প্রাচীন বাংলার নরনারীর প্রাণে একদিন

পল্লিগ্রাম অবস্থায় কাঠি-যুদ্ধক্রীড়া (মুক্তাগাছার হাইস্কুল)

করিয়া ইউরোপের নানা দেশে খ্যাতিলাভ করিয়া সেই সকল দেশের লোকের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তখনও বাঙ্গালী তাহার নৌবাহিনী এবং বাণিজ্যপোতে অবলীলায় সমুদ্রযাত্রা করিত,—তাহাতে তাহার ভয় হইত না, আতঙ্কও হইত না। প্রাচীন বাংলার প্রাণের মুক্তির এই যে বৈচিত্র্যময় পরিস্ফুরণ, ইহা যেমন নানা দেশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তেমনই আবার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মুক্তভাবের ছড়াছড়ি আনিয়া তাহাদিগকে ক্রীড়ায় ও নৃত্যের আনন্দে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছিল।

মুক্তভাব ও পৌরুষভাবের ছড়াছড়ি ছিল, এবং ইতিহাসের দুর্ভাগ্যময় পরিবর্তনের ফলে সামাজিক জীবনে, ধর্মে ও শিক্ষাক্ষেত্রে ভ্রান্ত আদর্শে অন্ধতামূঢ় আমরা আজ সেই মুক্তভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। হাডু-ডু-ডু, নারিকেল-কাড়াকাড়ি ক্রীড়া ইত্যাদি পৌরুষ-ক্রীড়ার বহুল প্রচলন যে বাংলার জীবনে এককালে ছিল, এবং আমাদের অজ্ঞতা ও মূঢ় অবজ্ঞার ফলে যে সেগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। আরও যে কত পৌরুষময় ও আনন্দময় ক্রীড়াপদ্ধতি আমাদের দেশ হইতে এই অজ্ঞতা

ও অজ্ঞতার ফলে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

বাংলা দেশে ক্রীড়া ও নৃত্যের সুমধুর সমন্বয়

ক্রীড়া এবং নৃত্যের মধ্যে বাঙ্গালী যেমন একটি অপূর্ব্ব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে সেরূপ ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপনের দৃষ্টান্ত অন্য কোন দেশে হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহার তিনটি জীবন্ত উদাহরণ আমরা এখনও পাই—রাঢ়দেশে ব্যায়াম নৃত্যে, কাঠি-নৃত্যে, লাঠি-খেলা নৃত্যে এবং পূর্ব্ববঙ্গের লুপ্তপ্রায় 'লোকা-বাচ' খেলায়। ব্যায়ামাচার্য্যদের ব্যায়াম-বিষয়ক বাক্যবহুল প্রস্তাবলী পাঠ করিতে এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামপ্রণালী আমদানি করিয়া অনুসরণ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছি। রাঢ়বেশে নৃত্যের আনন্দময় প্রণালীকে অবজ্ঞা করিয়া ড্রিলের নিরানন্দময় যান্ত্রিক প্রণালীর অনুসরণ করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের পৌরুষময় কাঠি-নৃত্য, ক্রীড়া ও নৃত্যের পূর্ণ-সমন্বয়ের আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহা যেমন এক-দিকে নৃত্যের সৌন্দর্য্য ও ছন্দোবদ্ধতা-পূর্ণ রসকলা, তেমনি আবার অন্যদিক দিয়া ইহা নানা ভঙ্গীতে অসিযুদ্ধের একটি উদ্দীপনাময় অভিনয় ও পৌরুষময় ব্যায়ামক্রীড়া।

রাঢ়দেশে ব্যায়াম-নৃত্যক্রীড়া (হলতাবপুর বাইপুর)

রাঢ়বেশে পৌরুষ-নৃত্যের সঙ্গে ঢোল ও কাঁসির উদ্দীপনাময় সঙ্গতের সহযোগে যে ব্যায়ামকলার প্রথা পশ্চিমবঙ্গের অবজ্ঞাত পল্লীজীবনে এখনও প্রচলিত আছে, তাহাতে নৃত্য এবং ক্রীড়ার এই অপূর্ব্ব সমাবেশের একটি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। জাতির জীবনে আবালবৃদ্ধের শরীরগঠনের উপযোগী এইরূপ পৌরুষময় ব্যায়াম-নৃত্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দুর্লভ। তথাপি মূঢ় আমরা অবজ্ঞাভরে ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের এই অমূল্য প্রণালীকে গ্রহণ না করিয়া স্যাণ্ডো, মূলার ইত্যাদি বিদেশীয় নৃত্য ও ক্রীড়ার চমৎকার সমন্বয় ও সংযোগের আর একটি যে দৃষ্টান্ত বাংলা দিয়াছে, তাহা আমরা পাই বাংলার লাঠিখেলা-নৃত্যে। লাঠিখেলাকে নৃত্যসংজ্ঞাভুক্ত করাতে অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবেন, কিন্তু বাংলার পল্লীতে এখনও লাঠিখেলার যে অতুলনীয় পদ্ধতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে নৃত্যের সঙ্গে পৌরুষময় খেলার একটি বিচিত্র সমন্বয় পাওয়া যায়। এবং আমার বিশ্বাস যে ভারতের অন্য-কোন প্রদেশে অথবা পৃথিবীর অন্যকোন দেশে নৃত্যের সঙ্গে খেলার পূর্ণ-সমন্বয়মণ্ডিত এমন সুন্দর প্রণালীর প্রচ-

নন নাই। অথচ মূঢ়তাবশতঃ আমরা এই মূল্যবান প্রণালীকে এখনও দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, এবং আমাদের শিক্ষিত সমাজের উপেক্ষার ফলে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতিজাত এই সৌন্দর্য্য-নৃত্য-ক্রীড়া লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িতেছে।

বাংলার পৌরুষ-ক্রীড়াপদ্ধতি

আমরা দেখিয়াছি যে যোদ্ধার জাতির ক্রীড়া-প্রণালী যুদ্ধেরই অনুরূপ হইয়া থাকে; এবং বাঙ্গালী যে একদিন একটি তেজস্বী যোদ্ধার জাতি ছিল তাহার অকাট্য পরিচয় প্রাচীন বাংলার লুপ্তপ্রায় নারিকেল কাড়াকাড়ি খেলায়, রায়বেশে নৃত্যকলা ও ব্যায়ামক্রীড়ার, কাঠি-নৃত্যের এবং লাঠিখেলা-নৃত্যের মুরুৎসা-পূর্ণ পদ্ধতিগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও আমরা পাই। তেমনই বাঙ্গালী যে একদিন নৌযুদ্ধে এবং নৌবাণিজ্য-বিহারে একটি অগ্রণী জাতি ছিল, তাহার পরিচয়চিহ্ন পূর্ব্ববঙ্গের লুপ্তপ্রায় নৌকা বাচ প্রণালীতে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজকাল আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও কোথাও অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের বিখ্যাত বাৎসরিক নৌকা বাচ প্রতিযোগিতার অনুকরণে নৌকা-বাচ খেলার প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাংলার পৌরুষময় নারিকেল-কাড়াকাড়ি খেলার কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা যেন কেবল মাত্র বিদেশীয় 'এসোসিয়েশন' ফুটবল খেলার চর্চ্চাতেই মনঃসংযোগ করিয়াছি, সেইরূপ নৌকা-বাচের বেলাও আমাদের দেশীয় প্রাচীন নৌকা-বাচ প্রণালী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চেষ্টা চলিতেছে হুবহু বিলাতী প্রথায় ছোট ছোট নৌকায় আট নয় জন করিয়া লোক বসাইয়া দাঁড় টানিয়া নৌকা-বাচ প্রবর্ত্তনের।

পূর্ব্ববঙ্গের নৌকা-বাচ ক্রীড়া

ইহা যে কি মূঢ়তার পরিচায়ক তাহা, যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যময় নৌকা-বাচ ক্রীড়া দেখিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। আমার বাল্যজীবনে আমাদের গ্রামের নদীতে প্রতিবৎসর বিজয়া-দশমীর দিন এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যমণ্ডিত নৌকা-বাচ পদ্ধতি দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, এবং ইহার অনির্ব্বাচনীয় ছবি স্বর্গলোকের একটি আনন্দময় স্বপ্নের মতই তখন হইতে আমার মানসপটে চিরকালের জন্য চিত্রিত হইয়া রহি-

রায়বেশে ব্যায়াম-নৃত্যক্রীড়া (পাঙ্গুড়ি গ্রাম)

য়াছে। ধন্য আমি, যে, বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের এই অনুপম দৃশ্য দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। বর্ত্তমান বাংলার কয়জন বালক বা প্রৌঢ়ের ইহা দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে? আবার কি আমরা বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির এই অতুলনীয় অনুষ্ঠানকে তার পূর্ণ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব?

বাংলার নৌকা-বাচের অনুপম দৃশ্য

কল্পনা করুন, একশত হস্ত দীর্ঘ সঙ্কীর্ণপরিসর উন্মাতরঙ্গা ক্ষিপ্রগতি দীর্ঘকায় ফণিনীর মতই যেন জীবন্ত এক-

একটি খোলা নৌকা,—বেগবত্তা, বিদ্যুৎশিখা ও তেজস্বিতার তীব্রতার মূর্ত-প্রতীক-স্বরূপ অতিদীর্ঘ অতিসঙ্কীর্ণ ক্রমোন্নত শব্দমান সূচ্যগ্রাকার গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ তাহার গলুই,—প্রতি নৌকায় দুই সারি করিয়া প্রতি সারিতে পঁচিশ জন ছোট ছোট বৈঠাধারী সবল মাল্লা,—নৌকার মধ্যভাগে ঢুলী ও করতালবাদক,—গগনারোহী গলুইয়ের উপর সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান পাঁচ জন দীর্ঘ বৈঠাধারী দীর্ঘকায় শুভ্র পরিচ্ছদ-পরিহিত অগ্রচালক,—তাহাদিগের গলদেশ হইতে লম্বমান দীর্ঘ উত্তরীয় বাতাসে উড়িতেছে,—নৌকার মধ্যভাগে মঞ্চিয়াকৃতি মণ্ডপের উপর উচ্চ-ধ্বজের নিশান,—নৌকার পশ্চাদ্ভাগে শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত কর্ণধারের পিছনেও আর একটি নিশান বাতাসে উড়িতেছে,—নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত সেই অতি-দীর্ঘকায় নৌকার পশ্চাদ্ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া গলুই পর্য্যন্ত আগাগোড়া কৃষ্ণ কাঠের উপর শুভ্র আলিপনার বিচিত্র শোভায় অঙ্কিত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! নৌকার মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া ঢুলী ঢোল বাজাইতেছে, সারিওয়ালা সারি-গান গাহিতেছে,—পঞ্চাশ জন মাল্লা সারির গানের তালে তালে ক্ষিপ্রগতিতে জলে সজোরে বৈঠা টানিতেছে,—প্রতি টানের পর নৌকার পার্শ্বদেশে বৈঠার গোড়া দিয়া আঘাত করিতেছে এবং সারির ধুয়া আবৃত্তি করিতেছে,—বৈঠা-বিক্ষেপের ও বৈঠার আঘাতের তালে তালে ঢোল ও করতালের শব্দ সারির সুরের সঙ্গে মিশিয়া এক অনির্ব্বচনীয় মধুর ঐক্যতানের সৃষ্টি করিতেছে! সারি-গানের ও বৈঠা-বিক্ষেপের তালে তালে হালে মাঝি নাচিতেছে, মধ্যভাগে ঢুলী নাচিতেছে, করতালবাদক নাচিতেছে এবং সারিওয়ালা নাচিতেছে,—গলুইতে দীর্ঘকায় অগ্রচালকদের পশ্চাতের তিন জন নাচিয়া নাচিয়া দীর্ঘ বৈঠা লম্বাটানে টানিতেছে এবং পুরোভাগের দুই জন লম্বা বৈঠা আকাশে উত্তোলন করিয়া নাচিয়া নাচিয়া সারির পুনরাবৃত্তি করিতেছে—এবং থাকিয়া থাকিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকারোহীদের প্রতি আস্ফালন-বাণী নিক্ষেপ করিতেছে! ছোট বৈঠাগুলির মুহুর্মুহু সমতাল দ্রুত টানের, দীর্ঘ বৈঠাগুলির লম্বা-টানের এবং পঞ্চাশোর্দ্ধ লোকের মুহুর্মুহু সমতালে অগ্রঝোঁকের বেগে প্রধাবিত হইয়া প্রত্যেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকা যেন বিদ্যুৎশিখার উল্লাসে কাঁপিতে কাঁপিতে জীবন্ত তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। আর, নদীর উভয় তীরে লক্ষ লক্ষ লোক নিজ নিজ দলের নৌকাকে উত্তেজিত-স্বরে চীৎকার করিয়া উৎসাহিত করিতেছে। সেই উদ্দীপনা-ময়, গৌরবময় দৃশ্য জীবনে একবার দেখিলে ভুলিবার নয়। একাধারে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যময়, নৃত্যময়, আনন্দময় ও বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য-জলকেলির এই দৃশ্য জগতে অদ্বিতীয়!

বাংলার বিলুপ্ত নৃত্য ও ক্রীড়া-সম্পদ

যে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির ইহা একটি লুপ্তপ্রায় অংশাবশেষ মাত্র, সেই বাংলার পল্লীর বিশুদ্ধ সুন্দর জীবনের এইরকম যে কত অমূল্য, অতুলনীয় নৃত্যময় ও আনন্দময় ক্রীড়া-প্রণালী বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ফলে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইহাদের উপরোক্ত যে অল্প কয়টি সুদূর নিভৃত পল্লীগ্রামে এখনও কোন প্রকারে বাংলার আধুনিক শিক্ষার ও শিক্ষিত সমাজের প্রাণবিধ্বংসী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া রহিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে নৃত্যের সঙ্গে ক্রীড়ার—বিশেষতঃ সৌন্দর্য্যাত্মক ক্রীড়ার—কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় সমাবেশ প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতিতে হইয়াছিল।

স্বরলিপি

ভাটিয়াল—কাহার্‌বা (মধ্যগতি)

ওই চরে বাঁধি' ঘর
ফুলের বিছানা পাতিও বন্ধু
উড়ানো বালুর 'পর।

বনের বাহুর পরশ লাগিয়া
সুশীতল ছায়া রবে জড়াইয়া,
তারি তলে তলে ফুল কুড়াইয়া
করিও হাওয়ায় ভর।

এপারে ওপারে নদী-মুকুরের
রচিও আড়ালখানি,
হেলাইও তারে দোলাইও তারে
বাঁকা তটরেখা টানি'।

পথিক মাঝির ভাটিয়াল সুরে
বাঁশীখানি তব দিয়ো দিয়ো পুরে',
কাঁদিবে সে বাঁশী পারাপার ঘুরে'
আমার বুকের 'পর ॥*

কথা—জসীম উদ্দীন্। সুর—শ্রী সুশীলকুমার বসু। স্বরলিপি—শ্রী অনিলভূষণ বাগ্‌চী।

II গা-মা -া গা | রা -া সা না I সা -া -া -া | -া -া -া -া
ওই ০ ০ চ রে ০ বাঁ ধি ঘ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র
I | সা রা -মা মা | মা মা মা -া I মা পা - ধা ধা | পা - ধা মা - পা
ফু লে ০ র বি ছা না ০ পা তি ০ ও ব ন্ ধু ০
I (-গা - া মা -গা | -রা - সা -া -া) | I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

* কলম, বাঁড় ও সমক এই ধারবাহির প্রাণস্বরূপ ; অতএব শিক্ষার্থীগণ ইহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

I গা মা -পা না | না -া না -া I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
উ ড়া ০ নো বা ০ ল্ ব প ০ ০ ০ ০ ০ ০ র

I গা-পা -া মা | গা মা রা গা I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
ঐ ০ ০ চ রে ০ বাঁ ধি ঘ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র

II গা -া গা মা | পা-না না -া I না -র্সা র্সা -া | র্রর্গা -র্রা র্সনা -া I
ব ০ নে র বা ০ হু র প ০ র শ লা ০ গি ০

I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I
য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I না না-র্রা র্সা | র্সা -া র্সা- র্রা I না -া -া -া | -া
সু শী ০ ত ল ০ ছা ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I না না -র্রা র্সা | না -র্সা -ধা -না | সা া -া -ধা -মা -পা -মা -গা
র বে ০ জ ড়া ০ ই ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ক্ষা -া ক্ষা ক্ষা | ক্ষা -া ক্ষা -পা I পা -া -া -া -া -া -া -া
তা ০ রি ত লে ০ ত ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ধা পা পা | মা া মা -পা | গা -া -া -া | -া -া -া -া
কু ০ ল কু ড়া ০ ই ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা -মা পা না | না -া -না -া I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া
ক ০ রি ও হা ০ ওয়া য় ভ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র

I গা -পা -া মা | গা -মা রা গা I সা -া -া -া | -া -া -া -া
ওই ০ ০ চ রে ০ বাঁ ধি ঘ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র

I সা -গা গা -গা | সা -া গা -মা I গা -পা -মা -া | গা -া -া -া
এ ০ পা ০ রে ০ ও ০ পা ০ ০ ০ রে ০ ০ ০

I পা -া পা -া | -ধপা -া মগা রগা I -মা গা -া -া | গা -া -া -া
ন ০ দী ০ ০ ০ মু কু ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ র

I ক্ষা -া ক্ষা ক্ষা | ক্ষা -া ক্ষা -া I ক্ষা -া পা -া -া | -া -া -া -া
র ০ চি ও ক্ষা ০ ডা ল খা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০

I পা -না না- -া | না -া না র্সা I র্সা -া -া -া -া -া -া -া
হে ০ লা ই ও ০ তা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I না -র্সা না ধা | পা -ক্ষা ক্ষা -পা I পা -া -া -া -া -া -া -া
দো ০ লা ই ও ০ তা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা পা -া মা | গা -মা রা গা I সরা -গা সা -া -া -া -া -া
বাঁ কা ০ ত ট ০ রে খা টা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০

I গা -া গা মা | পা -না না -া I না র্সা -া -া র্রর্গা -রা র্সনা -া
প ০ থি ক মা ০ ঝি র ভা ০ টি ০ য়া ল্ সু ০

I র্সা -া -া -া -া -া -া -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
I না না - র্রা র্সা র্সা - া র্সা র্রা I না
বাঁ শী ০ ধা নি ০ ত ০ ব ০ ০ ০ ০ ০ ০
I না না - র্রা র্সা না - র্সা ধা পা I পা -া -া -ধা -মা পা -মা
দি ও ০ দি ০ পু ০ রে ০ ০ ০
I ক্সা -া - ক্সা ক্সা ক্স -া ক্সা -পা I পা -া -া
কা দি ০ বে সে ০ বা ০ ণী ০ ০ ০
I পা - ধা - পা পা। মা - া মা - পা I গা -া -া -া
পা রা ০ পা র ০ ঘু ০ রে ০ ০ ০
I গা - মা পা না না -া না -া I র্সা -া -া -া
আ ০ মা র বৃ ০ কে র প ০ ০ ০
I গা - পা -া না । গা মা রা গা I সা -া -া -া
ওই ০ ০ চ রে বাঁ ধি ঘ ০ ০ ০

রুষ সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের সঙ্গে য়ুরোপের তদানীন্তন সাহিত্যের মিল খুঁজে পাওয়া দায় না একটুও। সমসাময়িক সাহিত্যের আড়ম্বর আর মন্তব্যের উপরেও যে মানবাত্মা বেঁচে আছে,—তারই খাতিরে-রূপ সৃষ্টিতে তোলেন উনবিংশ শতাব্দীর রুষ লেখকেরা ;—তাই সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবেই বিশ্বসাহিত্যের আসরে রুশ সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করল উনবিংশ শতাব্দীতে।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও রুশ সাহিত্য ছিল—যেমন সব দেশেই থাকে; কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ছিল না, ছিল একটানা একঘেয়েমি আর অনুকরণপ্রিয়তা। সেই সাহিত্য অষ্টাদশতাব্দীর মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের আসরে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানালো তার স্পষ্টবাদিতায়, সরলতায়;—বিশ্বমানবের প্রতি অসীমরূপ সহানুভূতি সেই সাহিত্যের বুকে একটা বিশ্বজনীন সজীবতা বহিয়ে দিয়েছিল। রুষ লেখকদের মধ্যে দেখা যায়, সাধারণ অনুভূতি বাকিছু তাঁরা অনুভব করতেন অন্তরে, তাই তাঁরা রূপ দিতেন ভাষায়—নীতি ও সংস্কারের ভয় না করে'। এই সত্য অনুভূতি প্রচারের উপরেই এঁদের নীতিজ্ঞান দৃঢ় হয়েছে, এঁদের মনকে সুস্থ করে' তুলেছে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হ'তে নিজেকে মুক্ত করে' নিয়ে। তার উপর, এঁদের ছিল সার্ব্বজনীন সহানুভূতি। স্বেচ্ছাচারীর অস্বাভাবিক বিধানতন্ত্রে নিষ্পেষিত মানবাত্মার ক্রন্দন তখন এঁদের বুকে এসে বাজ্‌তো অহরহ ;—সেই ক্রন্দন,সেই ব্যথা-বেদনার সমুদ্র-মন্থন করে' সে অমৃত আহরণ তাঁরা করেন, তাই তাঁদের লেখনীর

মুখে প্রকাশ লাভ করে—এইখানেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব।

রুষ সাহিত্যের নবযুগের সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক ছিলেন 'গগল্'। রুষ সাহিত্যের গল্প এবং উপন্যাস যা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, গগল্‌ই ছিলেন তার সর্ব্বপ্রথম রূপস্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রধানতঃ প্রচ্ছন্ন রসেরই আভাষ জাগে,—তাঁর সজীবতার মধ্যে, তাঁর চরিত্র-সৃষ্টির পূর্ণতার মধ্যে চোখে পড়ে অস্ফুট অথচ তীব্র ব্যঙ্গ। তারপর পুষ্‌কিনের নাম করা যেতে পারে এঁর রচনার ধারা 'বায়রণ,' 'স্কট্,' 'শেলীর' মত রোমান্টিক্। তাই সে যুগের সারা য়ুরোপে তাঁর লেখা আদৃত হয়েছিল; সে যুগের জনপ্রিয়তার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর ছোট গল্পগুলির চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে।

গগল্ সম্বন্ধে রুষিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখক ডষ্টোইভ্‌স্কী বলেন—"গগলের 'ওভার্‌' (একটি বিখ্যাত গল্পের নাম) থেকেই আধুনিক রুষ সাহিত্যের প্রেরণা।" গগল্ সত্যিকারেরই একজন স্রষ্টা। রুষ সাহিত্যে যে বৈশিষ্ট্য তিনি দেন, তাই রূপ পেয়েছে ডষ্টোইভ্‌স্কী থেকে গর্কী পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে। রুষিয়ার নিপীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনই রুষ সাহিত্যের বুকে অতখানি দরদ, রুষ লেখকদের মনে অতখানি করুণার রসধারা প্রবাহিত করেছে। শক্তিশালী সাহিত্যস্রষ্টা তুর্গেনেভ্ এবং শেখভ্ও তাঁদের উপন্যাস এবং গল্পের মধ্যে এই দরদই ফুটিয়ে তুলেছেন বিশেষ ভাবে। নিপীড়িত পশুর মধ্যেও মানবাত্মা জেগে আছে, পদদলিতেরও মানুষের দাবী আছে;—ভগবানের সত্তা পেতে হ'লে সত্যকে জান্‌তে হবে, নিপীড়িত পদদলিতদের বুঝ্‌তে হবে তবেই মানবাত্মার সার্থক বিকাশ ঘটবে:—জীবনের এই সব সত্যিকারের সংজ্ঞা রূপ পায় এঁদের সাহিত্যে অনন্য-সাধারণ দরদ আর সহানুভূতির মধ্য দিয়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রুষ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান আদর্শ ছিল যুগযুগের সঞ্চিত অন্ধ সংস্কারকে সত্যের আলোকের মধ্যে প্রকাশ করে' তার কুৎসিত রূপ শুধরে নেবার চেষ্টা। সাহিত্যের এই আদর্শকে সাহিত্যে সত্য করে' তুল্‌তে, টলষ্টয়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সত্যকে গোপন করে' নীতিকে বড় বলে' তিনি স্বীকার করেন নি কখনো; তাঁর বিশ্বাস ছিল মিথ্যাকে আশ্রয় করে' সার্থকতা লাভ করা যায় না—তা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়,—সত্য গোপন করাই হ'চ্ছে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া।

কোন সাহিত্যই অতগুলি বৈশিষ্ট্যশালী শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীর গর্ব্ব করতে পারেন না, গত শতাব্দীর রুষ সাহিত্যের মত। প্রায় প্রত্যেক রুষ লেখকই অনন্যসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন, আর তাঁদের প্রতিভার বিকাশলাভ ঘটেছে ছোট ছোট গল্পের মধ্যে;—লেখভ্, কুপ্রিন ও গর্কী এইজন্যই বিশেষ বিখ্যাত। ছোট গল্পই বিগত শতাব্দীর রুষ সাহি-ত্যের বৈশিষ্ট্য এবং তথাকথিত বিশ্বসাহিত্যের রূপস্বরূপ।

লেখভ্‌ই বিগত শতাব্দীর রুষ সাহিত্যকে একেবারে অতিআধুনিক করে' তোলেন তাঁর গল্পের চরম উৎকর্ষতায়। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য তাঁর পরবর্ত্তী লেখকদের রচনার মধ্য দিয়ে অতিআধুনিক সাহিত্যের পূর্ণতা সাধন করে।

রুষ সাহিত্যের মধ্যে এই যে আন্তরিক দরদ আমরা দেখ্‌তে পাই, এ শুধু বিজ্ঞান অনুভূতি ও দৃষ্টিশক্তির ফল নয়—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও বটে। রুষ সাহিত্যিকগণের জীবনী আলোচনা করলেই দেখা যাবে নিপীড়িত মানবাত্মার যে চিরন্তন ক্রন্দন তাঁরা শুনতে পেয়েছেন তার মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের স্পন্দনও মিলিত হয়েছে। তাঁদের লেখার মধ্যে কম-বেশী ব্যক্তিগত জীবনেরই ছায়া এসে পড়েছে, তাই অতখানি ঐকান্তিক দরদ তাঁরা সৃষ্টি করতে পেরেছেন তাঁদের লেখনীর উৎস মুখে।

এখানে আমরা কয়েকজন বিখ্যাত রুষ সাহিত্যিকের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো সংক্ষেপে।

এই সম্পর্কে কবি **এলেক্‌স্যাণ্ডার পুষ্‌কিনের** নামই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এঁর আগে রুষ সাহিত্য ফরাসী সাহিত্যের আনুকরণিক প্রেরণা লাভ করেছিল যদিও, রুষিয়ার দৈনন্দিন জীবন, তার সংস্কার, তার শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সে সাহিত্যের কিন্তু ঐক্য ছিল না মোটেই। ঠিক এমন সময় কবি পুষ্‌কিন্ মানবাত্মার মুক্তির বাণী নিয়ে এলেন রুষ সাহিত্যে। যদিও এঁর কবিতা এবং ছোট গল্পের মধ্যে ইংরাজ কবি বায়রণের প্রভাব অল্প-বিস্তর দেখা যায়,তা হ'লেও রুষিয়া এঁর প্রতিভাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

গলে' গর্ব্ব করতে পারে। মাত্র আটত্রিশ বছর (১৭৯৯—১৮৩৭) জীবনের মধ্যে ইনি রুষ সাহিত্যকে যে বৈশিষ্ট্য, যে স্বাতন্ত্র্য দেন তা বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করবে। এঁর "গড়" নামক গল্পটি বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করেছে।

তারপর বিশেষ বৈশিষ্ট্যশালী হচ্ছেন **নিকোলাই গগল্**। এক কথায় ইনিই আধুনিক রুষ সাহিত্যের প্রকৃত জনক। এঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য আর তেজস্বিতা তদানীন্তন রুষ সাহিত্যকে বিশেষভাবেই গড়ে' তোলে। এঁর লেখার মধ্যে ইংরাজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের প্রভাব আছে। এঁর সৃষ্টিতে হাসি-হুল্লোড় আর ব্যঙ্গের মধ্যে করুণ অনুভূতি আর সহৃদয়তার সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন অকৃত নিষ্কাম সাধক; তাই এঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এঁর রচনাকে মহীয়ান করে' তোলে।

আঠারো শো ন' সালে রুষিয়ার 'আক্রেইন' প্রদেশে এঁর জন্ম হয়। উনিশ বছর বয়সে গাঁ ছেড়ে চলে' আসেন সেণ্ট পিটার্সবার্গে। সেখানে একটা চাকরীও পান—সরকারী আফিসের কেরাণীগিরি। তারপর হঠাৎ একদিন উঠে বসলেন আমেরিকা-যাত্রী জাহাজে। কিন্তু সেখানে গিয়েও কোন ফল হোল না, ফিরতে হোল। তারপর সখ হোল অভিনেতা হবার; কিন্তু কণ্ঠস্বর দুর্ব্বল—অভিনয় করা চলল না। তখন কবিতা লেখা সুরু হোল, আর তার জন্য সুরু হোল প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘোরা। তবু ফল হোল না কিছুই, প্রশংসা করলো না কেউই,—অবশেষে সে কবিতা-গুলি গেল আগুনের গর্ভে। তারপর অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন, কিন্তু সেখানেও হোতে হোল অকৃতকার্য্য। আবার সুরু করলেন লিখতে—এইটিই হোল যেন তাঁর জীবনধারণের পেশা। তারপর হঠাৎ লেখা ছেড়ে দিলেন। ছন্নছাড়ার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন—যেন পাগল। কোনদিন আহার জুটতো কোনদিন জুটতো না, যেদিন জুটতো সেদিন অনাপ আতুরদেরও সে প্রাচুর্য্য থেকে বাদ যেত না—এই ছিল তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব। এমনি ধারা দুঃখ ও মহত্ত্বের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনের যবনিকা পড়ে' গেল আঠারো শো বাহান্নর পৃষ্ঠাঙ্কে।

তারপর জন্মগ্রহণ করেন **তুর্গেনেভ্**। এঁর লেখার মধ্যে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়—এঁর অনন্য-সাধারণ সুস্পষ্টতায়, লেখনভঙ্গীর সরসতায়, মাত্রাজ্ঞানে আর বাহুল্যের অভাবে। তা হ'লেও এঁর লেখা একেবারে রুষিয়ার নিজস্ব সাহিত্য, রুষদিগের প্রকৃতিগত পরিচয় পাওয়া যায় এঁর লেখার মধ্যে। এঁকে রুষ লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি আসলে ছিলেন একজন সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন কবি—সেক্সপীয়র, দান্তে, শেলী, চণ্ডীদাসের স্বগোত্র। এঁর লেখার মধ্যে সুস্পষ্ট আরও চোখে পড়ে এঁর মনীষা আর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি।

তুর্গেনেভ্ রুষিয়ার ওরেল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন আঠারো শো আঠারো খৃষ্টাব্দে। স্বদেশে বিদ্যাশিক্ষা করে' ইনি যান প্যারীতে। সেখানেই এঁর জীবনের বেশীর ভাগ কেটে যায়। কিন্তু সেই বিদেশী আবহাওয়ার মধ্যে ইনি লিখতেন রুষিয়ার সমাজ, আচার-ব্যবহার, তার ব্যক্তি-জীবনের কথা। ভাষা এবং প্রকাশ-ভঙ্গীতে ইনি অতুলনীয়। 'গাঁয়ের চাষারা' এঁর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প—বিশ্ব সাহিত্যে বিশেষ ভাবে সমাদৃত।

•

তারপর হচ্ছেন **ডষ্টোইভ্স্কী**। এঁর রচনার মধ্যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি আছে কিন্তু বিচারিতের প্রতি দৃষ্টি নেই মোটেই। সেই জন্যই সৃষ্ট সৌন্দর্য্য আহত হয়নি কোথাও। ইনিই সর্ব্বপ্রথম রুষ সাহিত্যে বিশেষভাবে গণবাদ প্রচার করেন—যে মতবাদ আজ রুষ সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করেছে।

ইনি আঠারো শো একুশ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রথম ধাপে পা ফেলেই ইনি ধরা পড়েন স্বেচ্ছাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে'। বিচারে গুলি করে' মারবার আদেশ হ'ল। সকলকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে ...একে একে তিনজনকে গুলি করা হয়েছে...ঠিক এমনি সময় এল সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনের আজ্ঞা। জীবনের সেই দুর্দ্দৈব এঁর প্রত্যেকখানি উপন্যাসে রূপ পেয়েছে হত্যাকাণ্ড এবং পাপের মধ্য দিয়ে। ঐকান্তিক কারুণ্যের মধ্য দিয়ে ইনি সৃষ্টি করেছেন সেই পাপের চিত্র—যার পরিণতির মধ্যে আছে মানবাত্মার মুক্তি। এঁর রচনা—

বিশেষতঃ "পাপ এবং শাস্তি" (Crime and Punishment) বইখানা পড়লে পাপের জন্যে তাঁর অন্তর্ভাবী সমবেদনার সৌন্দর্য্যে মানবাত্মার আভিজাত্য বিশেষ ভাবেই মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে। এঁকে ভিক্টর হিউগোর সঙ্গে তুলনা করেন রুষিয়ানরা।

লিও টলষ্টয় অমর কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতর লেখক। ইনি পুরুষত্বব্যঞ্জক চরিত্র অঙ্কন করতেই ভালবাসতেন, তাই এঁর রচনার মধ্যে লড়াই, শিকারকাহিনী প্রভৃতি কর্ম্মবহুল সবলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইনি মানবীয় আসক্তিকে পাশবৃত্তি বলে'ই প্রচার করেছেন; নারীচরিত্রকে মহিমান্বিত করে' তুলতে শৈথিল্য করেছেন—নারী মানুষকে পাপের মধ্যে টেনে নিয়ে যায় এই ছিল যেন তাঁর বিষাদ। পাপের প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক ঘৃণা আর বিদ্বেষ—তার পরিচয় পাওয়া যায় অল্প-বিস্তর তাঁর সব বইয়েই।

ইনি আঠারো শো আটাশ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন রুষিয়ায়। প্রথম-জীবনটা কাটে এঁর উচ্ছৃঙ্খল ভাবে সৈনিকের কাজে। তারপর ইনি সুরু করেন লিখতে—ধর্ম্ম এবং সমাজতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেন বিশেষ ভাবে। এর সঙ্গে তুর্গেনেভের একবার বিরোধ বাধে—রুষিয়ার দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যস্থতায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ আর ঘটে নি, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিতও হয় নি কখনও।

•

ভ্লাডিমির কোরোলেঙ্কো ও ইউক্রাইভনীর মত সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। জীবনের অধিকাংশই কেটে যায় সাইবেরিয়ার বুকে, কিন্তু সাইবেরিয়ার ভয়াবহ দুর্ব্বিষহ জীবন এঁর জীবনকে বিষাদ করে' তুলতে পারে নি। সেখানকার ছোট খাটো ঘটনাগুলি সংগ্রহ করে' নিজের নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রাকে ইনি সরস করে' তোলেন কল্পনার সাহায্যে। প্রকাশভঙ্গী সহজ অনবদ্য এবং চরিত্রচিত্রণ আড়ম্বরবর্জ্জিত সুন্দর। কিন্তু নিজ জীবনের নির্ম্মমতা অন্তরিত্র প্রকাশ পেয়েছে এঁর রচনার কঙ্কণতার মধ্যেও।

•

সেমেভাল্ড গার্শিন—জীবনের কাঙ্কণতা লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। এঁর প্রথম জীবন কেটে যায় সাভিয়ান এবং টার্কিশ যুদ্ধে সৈনিক হ'য়ে। তারপর নানারকম শারীরিক কষ্ট এবং শোকদুঃখ সহ্য করতে করতে ইনি দুনিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণা করেন আত্মহত্যা করে'। এঁর নিঃসঙ্গ দুর্ব্বিষহ জীবনের করুণ চিত্র অনবদ্য সহানুভূতি আর দরদ নিয়ে ফুটেছে এঁর ছোট গল্পগুলিতে। রুষ সাহিত্যে এঁর প্রতিভার স্থান একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

ছোট-গল্পলেখক হিসাবে **আন্টন চেখভ্** বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ইনি ডাক্তারি পাশ করলেও ডাক্তার হিসাবে প্র্যাক্‌টিস্ করা এঁর ঘটে ওঠে নি। সাহিত্যের দিকেই ছিল এঁর জন্মগত আকর্ষণ; তাই বিজ্ঞান এঁকে নিজস্বভাবে গড়ে' তুলতে পারে নি। মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এঁর জ্ঞান এবং এঁর রচনার মধ্যে সংযত ভাষা, অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতাবর্জ্জিত প্রকাশ, চিত্তাকর্ষক চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি অতুলনীয়। "ব্যাঙ" নামক এঁর গল্পটি বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করেছে অভিনব বিশিষ্টতার জন্য।

মাক্সিম গর্কির আসল নাম এলেক্সি মাক্সিমোভিচ পেশকভ্। নিজ্‌নি নভ্‌গোরডে ইনি জন্মগ্রহণ করেন আঠারো শো আটষট্টি খৃষ্টাব্দে। ন'বছর বয়সের পিতৃহীন বালক এক মুচির কাছে শিক্ষানবিশী করে। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে সারা রুষিয়াটা ইনি ঘুরে বেড়ান নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করে' ভবঘুরের মধ্য দিয়ে। এই সময়ে ইনি পড়াশুনাও করেন অনেক। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর সুরু হয় গল্প লেখা। তাই এঁর রচনার মধ্যে দুঃখ কষ্ট-দারিদ্র্যের প্রতি একটা আন্তরিক সহানুভূতি আছে। জীবনের তিক্ততার মধ্যেও এঁর কাছে পাই অসম্ভব দরদ। এঁকে পরে নির্ব্বাসিত হ'তে হয় মাতৃভূমি থেকে। এখন ইনি আছেন ইটালীতে।

•

লিওনিড্ আন্দ্রেয়েভ্ ওরেল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ওকালতি করে' জীবিকা-অর্জ্জনের চেষ্টা করেন খুবই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন ফল না হওয়ায় লেখা সুরু

করেন গভীর সহানুভূতির। এঁর বিয়োগান্ত এবং অদৃষ্টবাদী নাটক ও উপন্যাসগুলিতে অপূর্ব্ব মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট গল্পও ইনি লেখেন অনেক, কিন্তু নাটকগুলিই এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। এঁর খ্যাতি-অর্জ্জনের সহায়তা করেছে—এইগুলিই। উনবিংশ শতাব্দীর রুষ সাহিত্যের শেষ বৈশিষ্ট্যশালী লেখক হচ্ছেন আন্দ্রেয়েভ্। এঁর পরবর্ত্তীগণকে বিংশ শতাব্দীর পর্য্যায়ে ফেলা চলবে বলে' আমরা এই প্রবন্ধের এখানেই উপসংহার করলাম।

সম্পাদিকার জল্পনা

বিবাহ কিসে সুখের হয়

পৃথিবী জুড়ে' রব উঠেছে বিবাহ আজকাল একটি সমস্যার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ লোক বিবাহের ফলে সুখী হ'তে পারছে না—শোনাও যায়, দেখাও যায় কতক কতক। পৃথিবীর বড় বড় চিন্তাশীল লোকরা এখন ভাবতে সুরু করেছেন বিবাহ কিসে সুখের হয়। বিবাহ ব্যাপারটি ছোট-বড় নানা সমস্যায় জটিল। বড় দিকগুলি ভাববার জন্য বড় লোকরা আছেন; ছোট চিন্তার ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যেও কথাটিকে টেনে এনে আমাদি'কে নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে। কারণ, বিবাহ করবে ছোট-বড় সবাই—কেউ প্রায় বাদ যাবে না তা' থেকে। অ-সুখের বিবাহে দেশ, সমাজ, পরিবার ও মানুষ ছারখার হয়,—এক-কথায় সর্ব্বনাশ ঘটে—কে না জানে? নানা কারণে বিবাহ অ-সুখের হয়। প্রথম—অভাব-অনটন। অনটনের সংসারে মানুষ সুখী হ'তে পারে না কোনমতে—হাজার বলো, হাজার বোঝাও, বিবাহের হাজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শোনাও। তাই বিবাহ করতে গেলে সংসার স্বচ্ছল করা চাই সকলের আগে। শুধু মনে স্বচ্ছলতা আনে না। দৃষ্টান্ত—

সোনা চাঁদি চক্‌মকিয়ে ধনীর মেয়ে ঘরে এল—চমক লাগল শ্বশুর-শাশুড়ী পাড়া-প্রতিবেশী সবার চোখে। দুদিন বাদে ধনটা যখন খাপ খেয়ে গেল ঘরের সঙ্গে, খুঁৎ বের হ'ল বৌয়ের তখন অলসতা-বিলাসিতার। কথা উঠল, ধনীর মেয়ে একগুণ আনে ত দশগুণ খরচা বাড়ায়। এ কি বাপু পোষায় গৃহস্থ-ঘরে! প্রতিবেশীরা ছড়া কেটে বলতে লাগল—"ধনীর কি ধনে মানায়, নির্ধনের কি পতর খাটায়।' পতর খাটানোটাই বাপু চিরদিনের। 'শুধু ধনে ক'দিন বাঁচে, হাঁড়ি জোটে কেইবা খায়।' দেখ না ও-বাড়ীর বৌয়েদের বউ—পরিপাটি কাজের গুণে বাড়ীখানিকে করে' রেখেছে কেমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে আপাগোড়া। সেদিকে চাও—লক্ষ্মীশ্রী! দু'চার টাকায় ওছিয়ে কেমন সংসার চালায়, অভাব জানতে দেয় না কাউকেও···"

এমনতর পরিশ্রমী গুণের বউ আজও আছে অনেক ঘরে। স্বাধীন উপার্জ্জনশক্তির অভাবে, স্বামীর অবহেলায় ও অনেক সময় শাশুড়ীর অন্যায় জুলুমে তারা দিয়ে যায় দিনে দিনে। দজ্জাল শাশুড়ী, দুশ্চরিত্র স্বামী ও উদ্ভা যুবরা বউ এ দেশের পারিবারিক জীবনকে কতখানি অ-সুখের করে' তুলে, সবাই জানে। স্বামী সচ্চরিত্র, শাশুড়ী সদাশয় ও বউ গুণের হ'লে তবেই সংসার সুখের হয় সকল দিকে। তিনের একটির অভাবে 'সংসার নষ্ট, সকলের কষ্ট।' তিনটির যোগাযোগ হয় কিসে?—সকল মানুষ শিক্ষিত হ'লে, নিজের ভালো সবাই বুঝতে শিখলে।

পশ্চিমের উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদ এনে ফেলে সংসার সুখের হবে, এ ধারণা আমাদের নাই। এ দেশের ধাতে ওটি সহ্য না, সমাজেও মানায় না—আপাগোড়া বেখাপ্ হ'য়ে দাঁড়ায় শেষে। অনেক সাহেব-সাজা বড় লোককে জীবনের শেষে বলতে শোনা গেছে—"ভুল করেছি দেশের ব্যবস্থা ছেড়ে'।"

পশ্চিমী বড় লোকদের খবর আমাদের ভালো জানা নাই। এবং ইংরাজ ছাড়া পাশ্চাত্যের অন্য জাতি সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ জ্ঞান নাই। ইংরাজ পাদ্রী-প্রফেসার-জাতীয় অনেকগুলি খাঁটি ভদ্র পরিবার দেখা আছে যাদের

সংসার একান্ত সুখের। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাই তার কারণ। কিন্তু ঐ সকল পরিবারের উৎপত্তিকারিণী মা'দিকে যখন বাহ্যিক ও বৈধব্যে একাকী নির্জ্জনে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করতে দেখা যায়, তখন প্রাচ্য সংস্কার মনকে পীড়িত করে। ছেলে-বৌয়ের নিত্য সেবা পাওয়া চাই বিধবা জননীর শেষ-দশায়। এটিই সুন্দর,—এটিই সুখের। এবং লোকধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্ম হিসেবে এটিই কল্যাণকর!

সকলের জীবন সত্য হোক্, সকল সংসার সুখের হোক্, —মানুষ জন্মাক্ দেশের ঘরে।

বড় হওয়ার লোভ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী যুবকরা ছাত্র-জীবনে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করেন। এটা ভাল। এখানকার শিক্ষা শেষ করে' উচ্চতর শিক্ষা ও বড়ঘরের ডিগ্রী পাওয়ার জন্য বিদেশগমনে একান্ত ইচ্ছুক হন; এটাও ভাল। উচ্চতর শিক্ষা সুসম্পন্ন হ'য়ে ওঠা যাঁদের জীবনে সহজ হয় তাঁরা ভাগ্যবান। অনেকে প্রতিভার বলে বৃত্তি-লাভ করে' বিদেশ যান, সেটা গৌরবের বিষয়। নানা-প্রকার চেষ্টা-উদ্যোগের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করে' যাঁরা বিদেশ-গমনে সমর্থ হন, তাঁরাও প্রশংসার পাত্র। মাঝে মাঝে শোনা যায়, কোন কোন কৃতী ছাত্র বাঁকা-পথে কৃতকার্য্য হওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন—বাপকে না জানিয়ে ও ভিন্ন কারণ দেখিয়ে মা'র কাছ থেকে টাকা বের করে' নিয়ে লুকিয়ে পালানো। কেউ বা মা-বাপ উভয়কে না জানিয়ে স্ত্রীর গায়ের গহনা নিয়ে বেচে' চলে' যান; পৌঁছে বাপ মাকে খবর দিয়ে টাকা চেয়ে পাঠান। একাজগুলি অশোভন হ'লেও তবু সহনীয়। কিন্তু কেউ কেউ বিবেকবুদ্ধিকে বলিদান দিয়ে নিজের প্রথম-জীবনের গ্রামের বিবাহ গোপন করে' সহরে ধনী গৃহে পুনরায় কৌশলে বিবাহ করে' শ্বশুরের টাকায় বিদেশযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ ও বাসস্থলাভের চেষ্টায় থাকেন। এরূপ কয়েকটি ঘটনাই আমাদের কানে এসেছে। বেশীর ভাগ সময় তাঁরা অকৃতকার্য্য হয়েছেন—সময়মত কৌশলটি ফেঁসে গেছে, লজ্জার সঙ্গে সরে' পড়তে হয়েছে, —এটা চোখে দেখা। দুর্ভাগ্যক্রমে দু'একটি জায়গায় বিপদ ঘটেই গেছে। এরূপ একটি দৃষ্টান্ত এখানে আলোচনা করা যাচ্ছে।

ধনী বাপ উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন সুপাত্র দেখে' মেয়ের বিবাহ স্থির করলেন। বিয়ে দিয়েই বিলাত পাঠাবেন—সব ঠিক। মেয়ে নাবালিকা—তাকে মানুষ করেন এক বিধবা পিসীমা। তিনি মৃত্যুশয্যায় একান্ত ইচ্ছুক—কন্যাদায় ভাইঝির বিবাহ দেখে' যাবেন। কন্যার বাবা সেজন্য বিনা-ঘটায় বিবাহের আয়োজন করেছেন। সদ্য বিবাহ,—দেরী করার উপায় নাই,—একদিকে পিসীমা মৃত্যুমুখে, আর একদিকে টার্ম্ চলে' যায় ভর্ত্তি হবার। পাত্রী সুশিক্ষিতা আই-এ পাশ—পাত্র এম্-এ। রাত্রিতে বিবাহ শেষ। পরদিন ভোরেই কুশণ্ডিকার পূর্ব্বে কন্যার বাবা একটি বাঁকা-বাঁকা হাতের লেখা পত্র পেলেন—

"বাবা, যাঁর সঙ্গে আপনাদের কন্যার বিবাহ দিচ্ছেন, তিনি আমার ধর্ম্মতঃ স্বামী—তিন বৎসর পূর্ব্বে আমায় বিবাহ করেছেন। আমি গ্রাম্য অশিক্ষিতা; তাই আপনার সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহের চেষ্টায় আছেন। বাবা, আমি অশিক্ষিতা হ'লেও নিদারুণ মর্ম্মপীড়া পাচ্ছি। আপনি বিবাহ দিবেন না। ইতি—"

পত্র পড়ে' কন্যার পিতা স্তম্ভিত—হতবুদ্ধি। মুখখানা তাঁর কালো হ'য়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে' পড়লেন—কি দৈবদুর্ব্বিপাক! কিছুক্ষণ পরে তিনি কাউকে কিছু না বলে' কন্যার কাছে গেলেন। বললেন,—'মা, সর্ব্বনাশ!' চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলেন। চিঠি পড়ে' দুঃখে লজ্জায় অপমানে মেয়েটির মুখ হঠাৎ শুষ্কমুখ হ'য়ে পড়ল। সামলে নিয়ে বাপকে বললে—'বলুন গিয়ে তাঁকে তাঁর সাধ্বী স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে। জানিয়ে দিন বিবাহ অসম্পূর্ণ—এখানে তাঁর কোন দাবী দাওয়া নাই। চিঠির উত্তরে লিখে দিন—তাঁর স্বামীর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ হয় নি। চিঠিখানা ঐ লোকের হাতে না পড়ে—তা হ'লে স্ত্রীকে বিষম নির্য্যাতিত হ'তে হবে।'

নববিবাহিত জামাই তৎক্ষণাৎ বাড়ী হ'তে বহিষ্কৃত হলেন—বিলাত যাওয়ার আশা ভূমিসাৎ হ'ল একদণ্ডে।

নারায়ণপুর অমৃত-সমাজ

কলিকাতার কাছে দমদমা,—দমদমার কাছেই নারায়ণপুর গ্রাম। নামটি গ্রামের পুরানো হ'লেও গ্রামটিতে একটি নূতন পত্তন সুরু হয়েছে কিছুকাল থেকে। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী শীল-পরিবারের সুযোগ্য মানেজার শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার নারায়ণপুরে বিস্তর জমি-জমা কিনে নিজেও বাড়ী-ঘর তৈরী করে' বসবাস করছেন,লোক-বসতও করিয়েছেন অনেকগুলি। ছেলেদের জন্য উচ্চ ইংরেজী স্কুল, বয়স্থা মহিলাদের জন্য সমিতি, ছোট একটি বালিকাবিদ্যালয়—তা ছাড়া লোহা কাঠের কাজ শেখানো, তাঁত, আসন বোনা প্রভৃতি আধুনিক সকল রকম শিক্ষারই অল্প-বিস্তর ব্যবস্থা হয়েছে গ্রামটির মধ্যে। দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে গ্রামবাসী গরীবদের জন্যে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় দেখা যায়—আশে পাশে এখনও বিস্তর খালি জমি পড়ে', বসত নাই। হঠাৎ মনে হয়, গ্রামে যেন লোক নাই মোটে। কিন্তু কাজের সময়ে দুই-একবার সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, ডাক দিলে লোক জড় হয় কিছু কম নয়।

এবার দেখা গেল, ঐ সবের সঙ্গে আরও বড় দরের একটি ভাব গ্রামের লোকগুলির মনের উপর কাজ করে' তাদি'কে উচ্চ ধারণায় সজ্ঞবদ্ধ করে' তুলছে আর এক দিক থেকে। গ্রামের মাঝখানে সাদা-সিধা ছোটখাট পরিচ্ছন্ন একটি ভজনগৃহ তৈরী হয়েছে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বীর ভজনের জন্যে। ঘরটির গায়ে লেখা আছে—"সকল ধর্মে এক ভগবান।" ঐ বড় ভাবটিকে আশ্রয় করে' তাদের মধ্যে অনেকগুলি মানুষ একজোট হ'য়ে 'অমৃত সমাজ' নাম দিয়ে একটি নূতন সমাজ খাড়া করে' তুলেছেন নিজেদের জন্যে। অমৃত-সমাজের সভ্যগণের মত, ধারণা ও ব্যবহারের কয়েকটি লক্ষণ এখানে উল্লিখিত হ'ল। তাঁরা বলেন, হিন্দু সমাজ এক বিরাট অমৃত-সমাজে পরিণত হবে, এবং কাজ ফুরোলে অবশেষে সেটি বিশাল হিন্দু সমাজেরই অঙ্গে বিলীন হ'য়ে যাবে। তাঁদের মতের অন্তরবাণী—"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" ভগবানের ওঙ্কার নামের তাঁরা জয়ধ্বনি করে' থাকেন। উপনিষদ তাঁহাকে সত্যের উৎস বলে' স্বীকার করেন। সুতরাং ধর্ম্ম শ্রদ্ধাবান যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ও যে কোন দেবতার উপাসক নিজের ধর্ম্ম ও উপাসনাপদ্ধতিতে নিষ্ঠাবান থেকেও অমৃত-সমাজের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারেন। পবিত্রতা ও দৃঢ় সংকল্পের চিহ্ন স্বরূপ শক্ত ইস্পাতের তৈরী একটি 'ও' তাঁরা সর্ব্বদা কাছে রাখেন। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অমৃত-সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করে' প্রতি রবিবার সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রচার করা তাঁদের একটি কাজ। খাওয়া-দাওয়া বিবাহাদি ব্যাপারে জাতিগত ভেদবৈষম্য দূর করা তাঁদের আর একটি কাজ। অস্পৃশ্যতা ও কুলকৌলীন্যের আদৌ স্থান নাই অমৃত-সমাজে। পাত্র-পাত্রী যোগ্য বিবেচিত হ'লেই বিবাহ প্রশস্ত। সামাজিক অন্য কোন বাধা থাকবে না তার মধ্যে। সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অধিকার সমান ও পুরুষদের শিক্ষা সমান বাধ্যতামূলক তাঁদের মতে। বিধবা, বিপত্নীক উভয়ের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই আদর্শ; প্রয়োজন বোধ হ'লে পুনর্বিবাহ প্রশস্ত। পুরুষের ন্যায় নারীও চিরকুমারী থাকার অধিকারিণী। শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও অন্যান্য সংস্কারাদি বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে যে আকারে অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

নারায়ণপুরে অমৃত-সমাজ-উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। পাতিপুকুরে অমৃত-সমাজের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে একটি অনাথআশ্রম-গৃহ নির্ম্মিত হ'চ্ছে। শীঘ্রই হিন্দু অনাথ-আশ্রমও খোলা হবে।

আমরা সসম্মানে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দু সমাজের এই অভ্যুদয়কে ভগবানের আশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ করছি।

পাথেয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধ্যার পর গিরিবালার কম্প দিয়া জ্বর আসিল এবং মাঝে মাঝে সেই বুকের অসুখটা দেখা দিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও তাহার নিদ্রা হইল না; শক্তিও সমস্ত ক্ষণ যন্ত্রণাকাতর জননীর শিয়রে বসিয়া জাগিয়া কাটাইল। প্রত্যূষের দিকে সম্ভবতঃ যন্ত্রণার উপশমের সহিত গিরিবালা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শক্তি পাড়ার এক-জন কৃষক-রমণীর গৃহে উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "হরির মা, ও হরির মা, বাড়ি আছ?"

গৃহাভ্যন্তর হইতে উত্তর আসিল, "আছি। কে? শক্তি দিদিমণি না-কি?"

শক্তি বলিল, "হাঁ, একবার বেরিয়ে এসো, বড় দরকার।"

দ্বার খুলিয়া হরির মা বাহিরে আসিয়া শক্তির অনিদ্রা-মলিন উৎকণ্ঠিত মূর্ত্তি দেখিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "কি দিদি-মণি? ছোটো মা ভাল আছেন ত?"

শক্তি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মার বড় অসুখ। তুমি এখনি একবার কবরেজ মশাইকে ডেকে দিতে পারবে হরির মা?"

হরির মা ব্যস্তভাবে বলিল, "তা আর পারব না দিদি-মণি? এখুনি দিচ্ছি। আমরা তোমাদের দাস-দাসী, তোমাদের আশ্রয়ে আছি—যা হুকুম করবে তাই করব। কিন্তু কি অসুখ দিদিমণি? জ্বর?"

শক্তি বলিল, "জ্বর ত' বটেই, তার উপর বুকের অসুখ।"

হরির মা বলিল, "আচ্ছা, আমি এখুনি ডেকে আন্‌ছি।" তাহার পর গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হাঁ দিদিমণি, কাল রাতে একেবারে ঘুমোও নি বুঝি?"

শক্তি কোনো কথা বলিল না, শুধু তাহার ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাস্যরেখা স্ফুরিত হইল।

হরির মা বলিল, "দেখ দেখি অমন চাঁদপানা মুখে একেবারে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে! আমাকে কেন ডাক্‌লে না দিদিমণি, আমি ছোটো মার সেবা করতুম।"

শক্তি বলিল, "তুমি সারাদিন খেটেখুটে আবার রাত্রি জাগ্‌বে কেমন ক'রে হরির মা?"

হরির মা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "ওমা শোনো একবার দিদিমণির কথা! দিনে খাটি ব'লে দরকার পড়্‌লে তোমাদের সেবায় রাত্তির জাগ্‌বো না! তোমার মা ত' দেবতা মনিষ্যি দিদিমণি, পুণ্যি থাক্‌লে সেবা করতে পাবো। আর যদি দরকার হয় নিশ্চয় ডেকো।"

কৃতজ্ঞতায় শক্তির চক্ষু ভিজিয়া আসিয়াছিল। জননীর বিষয়ে কোনো প্রশংসা শুনিলে তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে। "আচ্ছা, দরকার হ'লে তোমাকে ডাক্‌ব হরির মা।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কবিরাজ যখন আসিল তখন গিরিবালার নিদ্রা ভাঙি-য়াছে। কবিরাজ আসিয়াছে শুনিয়া গিরিবালা অসন্তুষ্ট হইল। শক্তির প্রতি অপ্রসন্নচক্ষে চাহিয়া বলিল, "এই রকম ক'রে অনর্থক টাকাগুলো নষ্ট করলে সংসার কেমন ক'রে চল্‌বে বল্ দেখি?"

শক্তি গিরিবালার শয্যা গুছাইয়া দিতে দিতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "অনর্থক কেন মা? তুমি এ রকম ক'রে অসুখে প'ড়ে থাক্‌লেই বা সংসার কেমন ক'রে চল্‌বে বল?"

বিরক্তিভরে গিরিবালা গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল—শক্তি কবিরাজকে ভিতরে ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রস্থান করিল।

কবিরাজ আসিয়া শক্তির দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, "আমার ভিজিটটে মা-লক্ষ্মী?"

কবিরাজের অর্থগৃধ্নুতা এবং চক্ষুলজ্জাহীনতা দেখিয়া শক্তি বিরক্তি বোধ করিল, কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া আলমারী খুলিয়া কৌটা হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া

কবিরাজের হস্তে দিল। কবিরাজ টাকাটা লইয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া উহার দিক পরীক্ষা করিল, নখ দিয়া রেখাঙ্কিত দিকটার রেখাগুলা অনুভব করিয়া দেখিল,তাহার পরে মেজের উপর টাকাটা ফেলিয়া শব্দ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "তোমাদের মতন ঘরে ভিজিট পরে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই মা—কিন্তু সেই যে শীতাম্বর সা'র বাড়িতে বড় ঠকানটা ঠ'কে এসেছি, তারপর থেকে ভিজিট আদায় না ক'রে বাড়ি ছুঁই নে। বাড়ি যেতে যেতে শীতাম্বর সা'র পাওনাদার দুবার ধাক্কা খেয়ে চোখ বুজলো, ব্যস্—আর ভিজিট দেবে না! তবে কি না, দানই যখন হোলো না তখন দক্ষিণে কি ক'রে নি! মরা গরু কি দুধ দেয়? শোনো কথা! বাবার নিয়ে যেতে যেতে চিলে চোঁ মারলে মরা পয়সা ছেড়ে দেয় না-কি? সেই দিন সেইখেনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞে করেছি—এবার থেকে আগে কড়ি তারপর নাড়ি।" বলিয়া কবিরাজ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।

কবিরাজের কাহিনী শুনিয়া শক্তির মনের মধ্যে বিরক্তি বাড়িয়াই উঠিল,—সে নীরবে গম্ভীরমুখে মাতার শয্যাপার্শ্বে কবিরাজের জন্য একটা কাঠের টুল স্থাপন করিল। টুলের উপর বসিয়া গিরিবালার নাড়িতে হাত দিয়া কবিরাজেরও মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল—কিছুক্ষণ মনোযোগ-সহকারে নাড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কদিন জ্বর হয়েছে?"

শক্তি বলিল, "কাল সন্ধ্যে থেকে।"

"এক রাত্রেই নাড়ির অবস্থা এ রকম?" তাহার পর রোগ সম্বন্ধে কতকগুলা প্রশ্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া কবিরাজ শক্তিকে বলিল, "তোমার মার ব্যাধি কঠিন—প্রাণের আশঙ্কা আছে।"

শুনিয়া সন্ত্রাসে শক্তির হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। বাঁ হাতে একটা থাম ধরিয়া কম্পিত দেহটাকে স্থির রাখিয়া ভীত ত্রিপাংশু মুখে কবিরাজের মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনি ভাল ক'রে চিকিৎসা করুন কবিরাজ মশায়,—যা খরচ লাগে আমরা দেবো। মাকে ভাল ক'রে দিতেই হবে।" শক্তির চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কবিরাজ বলিল, "চেষ্টা ত প্রাণপণে করব—তারপর তোমার মার অদৃষ্ট আর কবিরাজের হাতযশ।"

শুনিয়া উপরে বিধাতাপুরুষের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল! গিরিবালার আরোগ্যলাভ ব্যাপারে তাঁহার মহিমার এতটুকু অংশ নাই!

প্রস্থানোদ্যত হইয়া কবিরাজ বলিল, "উপস্থিত ওষুধে সাড়ে তিন টাকা পড়বে; সব দামী ওষুধ। দামটা একটু শীগ্‌গির পাঠিয়ে দিয়ো মা-লক্ষ্মী, ওষুধ তৈরী করতে সময় লাগবে।"

কবিরাজের কথা হইতে শক্তি বুঝিল যতক্ষণ কবিরাজের হাতে ঔষধের দাম না পৌঁছাইতেছে ততক্ষণ ঔষধ তৈরী করা আরম্ভ হইবে না। সে বলিল, "আমি ওষুধের দামটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি কবিরাজ মশায়, আপনি গিয়েই ওষুধ করতে আরম্ভ ক'রে দিন। আমি একটু পরে কাউকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে দোবো।"

কয়েক পদ ফিরিয়া আসিয়া কবিরাজ বলিল, "আচ্ছা তাই ভাল। আধ ঘণ্টাটাক পরে লোক পাঠিয়ো।"

শক্তি চারটা টাকা আনিয়া কবিরাজের হাতে দিয়া বলিল, "আপনার কাছে আট আনা পয়সা হবে কি?"

কবিরাজ হাসিয়া বলিল, "তোমাদের বাড়িই ত' প্রথম এসেছি মা, পয়সা সঙ্গে নেই। আচ্ছা, ওষুধের অনুপান তোমরা সংগ্রহ করবে, না আমিই পাঠিয়ে দোবো? একটু গোলমেলে অনুপান আছে।"

অনুপান সংগ্রহ করিতে গেলে ঔষধ খাওয়াইতে বিলম্ব হইয়া যাইবে; তা ছাড়া, সব অনুপান ঠিকমত জোগাড় করিতে পারিবে কি-না এই সব মনে করিয়া শক্তি বলিল, "অনুপান আপনিই পাঠিয়ে দেবেন।"

কবিরাজ বলিল, "তা হ'লে ঠিকই হয়েছে—ও আট আনা অনুপানের চার্জে কাটান যাবে। কি বল?"

সুবিধা পাইলেই, কবিরাজ ভিজিট, চার্জ প্রভৃতি কয়েকটি সহরে সংগ্রহ করা ইংরাজি কথা ব্যবহার করিত। সে জানিত এই কথাগুলি ব্যবহার করিলে অশিক্ষিত গ্রাম-বাসীর মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করা যায়।

শক্তি দেখিল অনুপানের ওষুধটাতে যে আট আনা পয়সা কবিরাজ গলাধঃকরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাকে মক্ষা

কথা আর কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। বলিল, "আচ্ছা, তাই করবেন। টাকাগুলি পূর্ববৎ পরীক্ষা করিয়া লইয়া "তুলা শ্রীহরি" বলিয়া টাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে কবিরাজ প্রস্থান করিল।

শক্তি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কবরেজ কি বললে রে শক্তি? বললে অসুখ শক্ত, আমি বাঁচব না, না?"

শক্তি যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "তা কেন মা? ভাল ক'রে চিকিৎসা হ'লে তুমি শীঘ্রই ভাল হ'য়ে উঠবে। উনি ভাল ওষুধ দেবেন বলেচেন।"

শক্তি যে প্রশ্নের যথোচিত উত্তর এড়াইয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিয়া গিরিবালা বুঝিল তাহার অসুখ কঠিন। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না—কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা অন্যদিকে দুই চক্ষুর পাশ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শক্তি দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিয়া আর্তকণ্ঠে বলিল, "মা, তুমি কাঁদচ?"

গিরিবালা কন্যার মস্তকে সস্নেহে হাত রাখিয়া বলিল, "কাঁদচি নে, ভাবচি। নিজের জন্যে ভাবচি নে শক্তি, তোর জন্যেই ভাবচি। মরণ ত' আছেই একদিন, সে জন্যে ভাবি নে। আমি না থাকলে তোর কি দুরবস্থা হবে সে ভাবনায় আমার যেটেও সুখ নেই!"

শক্তি দুই হাত দিয়া জননীকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, "না মা, তুমি ওসব কথা বোলো না; ওসব কথা তুমি ভেবোও না মা! তুমি দেখো, আমি নিশ্চয় তোমাকে ভাল ক'রে তুলব। তা যদি না পারি তা হ'লে—"

তাহা হইলে কি হইবে সে কথা ভাবিতে এবং বলিতে না পারিয়া শক্তি নিঃশব্দে গিরিবালাকে আরও একটু দৃঢ় ভাবে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু গিরিবালা সেই কথা ভাবিয়াই বলিল, "হ্যাঁ রে শক্তি, অশোককে যে চিঠি দিয়েছিলি সে আজ কদিন হ'ল?"

একটু ভাবিয়া শক্তি বলিল, "তা, দশ বারো দিন হবে।"

"সে চিঠি ঠিক পেছল ত'? সে একটা তার উত্তর পর্য্যন্ত দেবে না—এ কি সম্ভব? কে চিঠি ডাকঘরে নিয়ে গেছল?"

শক্তি বলিল, "তা'ও বলতে পারিনে মা, যোগমায়াকে দিয়েছিলাম, সে কাকে দিয়েছিল তা'ত জানি নে।"

মনে মনে একটু কি ভাবিয়া গিরিবালা বলিল, "অশোককে আর একখানা চিঠি দে শক্তি। যদি পারে ত' একবার যেন এসে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যায়।"

শক্তি বলিল, "আরও দু-চার দিন দেখে তারপর দিলেও হবে মা। এ পাড়াগাঁ থেকে চিঠি যেতে আসতেই ত' পাঁচ-সাত দিন লাগে, তারপর অশোকদা চিঠি পেয়েই যে উত্তর দেবেন তা না হ'তেও ত' পারে।"

একটু ভাবিয়া গিরিবালা বলিল, "আচ্ছা, তাই না হয় দিস্—দু-চার দিন পরেই দিস্।" মনে মনে বলিল, কিন্তু বেশি বিলম্ব সইবে কি-না কে জানে!

এ চিঠি অবশ্য সেই চিঠি যাহা ভবতারার হাতে পড়িয়া যথাস্থানে পৌঁছাইতে পারে নাই তাহা বলা বাহুল্য।

শক্তি বলিল, "মা তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাক, উঠো না। আমি হরির মাকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েই আসচি।" বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

বড় ধীরে ধীরে কথা কয়

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

ক্ষেতকে পাখীটা দুপুর থেকেই
উড়ে উড়ে পড়ে বারবার,—
বেলা গেল সেটা চুঁড়ে করে' যায়
খেজুরের রস হাঁড়িটার।
বহু হতোমের বাড়ীর খোপায়'
কোন পড়িয়াছে গাছের খোপায়,
ওদিকে চাহিয়া ভালই লাগিল—
হাতে কিছু নাই কাজ ও আস।
ক্ষেতকে পাখীটা ভর্ত্তা করিয়া
উড়ে উড়ে ফিরে মাঝবার।

চারাণ ঠাকুর যায় ফিরে আজে
এখান হইতে দেখা যায়
ছয় ন'ল ক'টা দইচোরা পাখী
বেউড় বাঁশের কোপ্‌টায়।
খোড়ো ক্ষেতটাতে খেলা করে সব,
কাহারে কে ডাকে—চীৎকার-রব,—
বোঝা নিয়ে চলে আমন ধানের
কলাবাতর একজায়
চারাণ ঠাকুর বুড়ি-সুড়ি আসে
এখান হইতে দেখা যায়।

কাঁচাল গাছের আখ্‌ড়া বাড়ীর
ছনের তৈরী গোল-ঘর;
সর্ব্বত্তরার ফুলের কেয়ারী
একটির পরে পর-পর
পপ্পারের পারে গাঁদা করে কাড়,
লাল দিয়ে গাছ রাই-সরিষার,—
বেড়-কোপ্‌টার কানাচ ঘেঁষিয়া
সোনপা-সজের এক সার
ঘরের নিকানো পোছানো
ছনের তৈরী গোল-ঘর।

আঁধার ঘনালে ক্ষেত যাওয়াইয়ে,—
গাই নিয়ে ও কে যা'য় ঘর
মাঠের দৈব ঠাট্টকা-সঙ্গে,
নীরবে ভিজে ছে মনুষ্য।
ওই একখানে বসে' পড়ে মন,
গাঢ় হ'য়ে আসে বুকের স্পন্দন,
দীঘের সন্ধ্যা দাঁড়াল—একাকী
বড় ধীরে ধীরে কথা কয়...
রাতের আঁধারে মাঠের ওপারে
চুপি চুপি ও কে যা'ন ঘর।

তোমায় করি গো নমস্কার

শ্রী পরিমল গোস্বামী এম্-এ

বৈজ্ঞানিক এতকাল যে অবিভাজ্য অ্যাটমে আটকাইয়া ছিলেন, এবং বলিতেছিলেন বস্তু মাত্রেই এক বা একাধিক বিভিন্নজাতীয় মূল-পদার্থে গড়া, এখন সে অ্যাটম ভাঙিয়া গিয়াছে, এবং বস্তুর বিভেদও আর নাই। বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছেন, একই পদার্থ-শক্তি অনন্ত বস্তু-বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে।

আবার বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যখন আত্মার পৌঁছিতেছি, তখন বৈজ্ঞানিকের কথা থামিয়া গেল। আত্মিক জগৎ সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন কবি। বৈজ্ঞানিক, সত্যকে যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করেন, কবি সত্যকে দেখেন।

সত্যদ্রষ্টা বলিলেন, এই যে প্রাণিজগতে লক্ষকোটি জীবের মেলা বসিয়াছে, ইহাদের আত্মীয়তা শুধুমাত্র রূপে, আত্মার দিক দিয়া ইহারা এক। সৃষ্টির আদিতে সব একাকার ছিল, তারপর কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে ইহারা পৃথক রূপ লইয়া জগতের বুকে জীবলীলা সুরু করিয়াছে তাহা কেউ জানে না।

সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ এই একাত্মতার সত্যটি অতি গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তিনি প্রকৃতির প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে নিজেকে এমন নিবিড় ভাবে যুক্ত করিয়া দিতে পারিয়াছেন। অনন্ত আত্মা নিখিল-বিশ্বের মধ্যে আপনাকে অনন্ত রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের আত্মার সঙ্গে তাঁহার সত্যকার বিচ্ছেদ নাই,—ছন্দ-সুরের ছবিতে ছবিতে তিনি এই কথাটাই বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান গাওয়া, ইহার মূলে শুধুমাত্র কল্পনা নহে, ইহার মূলে রহিয়াছে সত্যকার উপলব্ধি। একাত্মতার অনুভূতিটি অতিমাত্র সত্য বলিয়াই কবি একদিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা অতি নিষ্ঠার সহিত করিয়া থাকেন, তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার গোষ্ঠী, সমাজ, দেশ, তাহার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সমস্তের সঙ্গে তিনি আন্তরিক ভাবে যুক্ত থাকিতে পারেন।

অর্থাৎ যিনি সকলের মূলে পৌঁছিয়াছেন, বিশেষ তোলো বস্তু বা বস্তু-সমষ্টি তাঁহার দৃষ্টিকে আর বাধা দিতে পারে না। রজনীগন্ধি যেমন সমস্ত বস্তুকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, কবির সহানুভূতি তেমনি সমস্ত বস্তুকে ভেদ করিয়া চলে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র দ্রষ্টা নহেন, তিনি শিল্পী। বিশ্বশিল্পী যেমন আনন্দ হইতে বিশ্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁহার অনুভূতির আনন্দ হইতে রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইহাকে বলিয়াছেন রস-বেদনা। এই রস বেদনায় দ্রষ্টা স্রষ্টার আসনে বসেন। দার্শনিক তখন হ'ন শিল্পী। তখন তিনি যে রস উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা ছন্দ এবং সুরের সুষমায় রূপায়িত করিয়া তোলেন। যে ভাব, যে আনন্দ, আমাদের মনকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া যায়, অথচ যাহাকে ধরা যায় না, তিনি তাহার একটি সুসম্পূর্ণ মূর্ত্তি গড়িয়া আমাদের স্পর্শের যোগ্য করিয়া তোলেন। অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির সঙ্গে কবির সৃষ্টির যোগ না হইলে জগতের অধিকাংশ সৌন্দর্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচরই হইত না।

অসীম নিরন্তর আপনাকে সীমার মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, এবং সীমা নিরন্তর অসীমের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।—নর-নারীর মিলন বিরহে কবি এই অসীম এবং সীমার বিরহ-মিলনের ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। সেই জন্যই কবি মানবহৃদয়ের ক্ষুদ্রতম অনুভূতিটিও মহৎ করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলিতে আলোছায়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্যও প্রতিফলিত হইয়াছে। কবির কাব্য পাঠ করিবার সময় প্রতিপদে কল্পনা ও ভাবের বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মন যাহার জন্য প্রস্তুত থাকে না, তাহাই মনকে বারবার সচকিত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিস্ময়েই ইহার শেষ নহে। ইহা মনকে পবিত্র করে, স্নিগ্ধ করে, মুহূর্তের মধ্যে তাহাকে এমন এক মহিমার রত্নরাজ্যে লইয়া যায়, যেখানে গ্লানি নাই, পঙ্কিলতা নাই, ধরণীর ধূলি যে স্থান স্পর্শ করিতে পারে না। সে এক ভাব-রসের অপূর্ব মহাসমুদ্র—মন তাহার গহন গভীরতায় নিমজ্জিত হইয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়।

অদৃষ্টপূর্ব ভাব-জগতের লক্ষ প্রকার অজ্ঞাত পথ তাঁহার অনুকম্পার আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কবি সেই পথ আমাদিগকে পৌঁছাইয়া না দিলে আমরা তাহার সন্ধান পাইতাম না। আমাদের কল্পনাকে তিনি অসীমে বিস্তার করিয়া দিয়াছেন,—আমরা তাঁহার চোখে সুন্দরকে চিনিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমরা যুগে যুগে লাভ করিব। বিশ্বের রহস্যের মতোই তাঁহার সৃষ্টির রহস্য আমাদিগকে চিরদিন মুগ্ধ করিবে।

কিন্তু ইহা গেল হৃদয়ের পথে, সৌন্দর্যের পথে আনাগোনার কথা,—সত্য-দৃষ্টিতে তথ্যদৃষ্টির কথা। এখানে কবি নিজেকে বিশেষ করিয়া ধরা দেন নাই। শিল্পের আড়ালে শিল্পী লুকাইয়া আছেন। কিন্তু মানব-জাতি এবং পূর্ণ মনুষ্যত্বের জন্য কবির যে অনুকম্পা, সমবেদনা এবং দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি সেইখানেই নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া ধরা দিয়াছেন। সমস্ত মানব-জাতিকে তিনি অখণ্ডরূপে দেখিয়াছেন। যিনি দ্রষ্টা তিনি সত্যের বিশেষ রূপের মধ্যে সত্যের বিশ্বরূপকে উপলব্ধি করেন। ব্যক্ত এবং অব্যক্তকে তিনি সমান ভাবে দর্শন করেন। যে সত্য ভবিষ্যতে বিশেষরূপে প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে সে সত্যকেও তিনি দেখেন। সেই জন্য যে কাল আমাদের কাছে অনাগত, দ্রষ্টার কাছে তাহা অনাগত নহে। তিনি অনুভূতি এবং অনুকম্পার পথে দেশ এবং কালকে অতিক্রম করিয়া বিচরণ করেন। এবং এই কারণেই দ্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথের আদর্শের উদার মহিমায় আমরা অভিভূত হই। প্রয়োজনের মাপে তিনি আদর্শকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সঙ্কীর্ণ করিতে পারেন না। অখণ্ড মিলনকে খণ্ড করিলে অসীমের সঙ্গে তাহার মিলন বাধাহত হয়।

এই বিশ্বছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলাইয়া চলিবার জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে। সেইজন্য মানবজাতি এবং মানবতার জন্য তাঁহার যে অনুকম্পা ও দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কোনো বিশেষ জাতি বা মানবে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। তাহা কোনো বিশেষ কাল বা ক্ষেত্রের মধ্যেও নাই। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যে প্রাণের ঐশ্বর্য আছে তাহার বিকাশ যেখানেই দেখিয়াছেন, সেখানেই তিনি তীব্রতম বেদনা অনুভব করিয়াছেন। কি স্বদেশে কি বিদেশে, তিনি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং বাধামুক্ত আনন্দের পথটি আবিষ্কার করিয়া, মনুষ্যত্বের পূর্ণ-উদ্বোধনের কাজে লাগিবার জন্য দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়াছেন। দীনতার লজ্জা তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছে। ভারতবর্ষ একদিন দারিদ্র্যকে ভূষণ করিতে পারিয়াছিল, কেননা অন্তরের ঐশ্বর্যে সে ধনী ছিল। কিন্তু আজ তাহার সে ঐশ্বর্য নাই তাই সে দারিদ্র্যের জন্য লজ্জিত।

এই লজ্জার বন্ধন হইতে, এই দীনতা হইতে মুক্তি চাই। পশ্চিমদেশ আজ দানবের সঙ্গে মানব সাজিতে বসিয়াছে। সে দুরন্ত লোভ এবং হিংসার বশে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারও এই লোভের বন্ধন হইতে মুক্তি চাই। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সত্যদ্রষ্টা দরদী কবি ব্যথিত-কণ্ঠে সমস্ত মানবজাতিকে মুক্তির পথে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি সমস্ত অশিবের উর্ধ্বে কল্যাণের, সমস্ত অবিশ্বাসের উর্ধ্বে বিশ্বাসের এবং সমস্ত নিরাশার উর্ধ্বে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। সমস্ত জগৎ আজ তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে।

হে কবি, হে মহামানব, তোমাকে কি দিয়া অভিনন্দিত করিব তাহা জানি না। তুমি আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে, দেশের হাওয়ায় হাওয়ায়, আলোয় আলোয়, ফুলে ফুলে, ওষধি-বনস্পতিতে তোমার যে দান রাখিয়া গেলে তাহা কখনো ম্লান হইবে না। আজ হয়ত সমস্ত জগৎ তোমার বাণী শ্রবণ করিয়া বিমূঢ় হইয়া রহিল, কিন্তু তুমি যে অমূল্য মুক্তারাশি তোমার সীমাহীন ভাব-সমুদ্রের বুকে রাখিয়া গেলে, যুগে যুগে আমরা তাহা আহরণ করিয়া ঐশ্বর্যশালী

হইবে। বিনিময়ে তোমাকে আজ কেহ কিছু দিল না, কিন্তু তোমার দানের দীপ্তিতে পৃথিবী সুন্দরতর হইবে, তাহার সমস্ত গ্লানির ভার খসিয়া পড়িবে, এবং সমস্ত জগৎ একদিন তোমারই পুণ্যে মুক্তিলাভ করিবে।

টমাস এ্যাল্‌ভা এডিসন

শ্রী শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

আজ হইতে ৭৪ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার এক ক্ষুদ্র নগরে এডিসন ছিলেন বিদ্যালয়ের এক ছাত্র। তাঁহার শিক্ষক বলিয়াছিলেন—"এটা অপদার্থ।"

কিন্তু সেই 'অপদার্থ' ছাত্র এডিসন আজ (১৮ই অক্টোবর, ১৯৩১) পাকা ৮৪ বছর বয়সে যশের দীপ্তিতে দশ-দিক আলোকিত করিয়া যখন পরলোকগত হইলেন তখন এই বিপুলা পৃথ্বীর কয়জন নরনারী মিলিয়া তাঁহার অসংখ্য দানের হিসাবনিকাশই বা যথাযথ ভাবে করিতে পারিতেছে? ৭৪ বছর আগে বালক এডিসন নিজের পাঠ্যপুস্তকের দিকে চাহিয়া যেমন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, আজ এই বেডশত কোটি মানবের বাসভূমি বর্ত্তমান জগৎ এডিসনের আবিষ্কৃতিগুলির দিকে চাহিয়া তেমনই স্তম্ভিত!

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হুভার এডিসনের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"A precious asset to the world."—বিশ্বের মহামূল্য ধনরত্ন তিনি। সত্যই তাই।

তেতার আবিষ্কারক মার্কনি সাহেব বলিয়াছেন—"One of the world's greatest benefactors."—জগতের মহোপকারী মহাত্মাদের মধ্যে একজন তিনি।

এডিসনের বন্ধু বন্ধুবর কর্ণধীর হেন্‌রী ফোর্ড সাহেব বলেন—"He changed the face of the world in his lifetime and everything he achieved was beneficial to mankind." অর্থাৎ এডিসন তাঁর জীবদ্দশাতেই এই জগৎকে নবরূপে সজ্জিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার আবিষ্কৃত সমস্ত বস্তুই মানবের হিতকর।

এই রকমের দশ সহস্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বাণী জগতের বিখ্যাত গুণীজ্ঞানীদের কাছ হইতে এডিসনের মৃত্যুর পর তাঁহার 'গ্রা জার্সি'র New Jersy) 'লিউলিয়ান পার্ক' নামক বাড়ীতে গত ১৮ই অক্টোবর গিয়া পৌঁছিয়াছিল। যে মানুষটি জগতের সমস্ত অন্ধকার তাঁর বিদ্যুদালোক-প্রভায় চিরতরে বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন, সেই অতিমানবের কাছে সভ্যজগতের প্রতিটি প্রাণই যে ঋণী! আজ বিস্মৃতির কোন্ অতলতলে এডিসনের সেই অজ্ঞাতনামা শিক্ষক—যিনি ভবিষ্যতের এই অভিমানবের উন্নতির পথ নিরুদ্ধভাবে রুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন? বিধাতার সৌভাগ্যের জোরেই সেই addled child এডিসন তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া আজ যশলক্ষ্মীর বরপুত্র!

তাঁহার আবিষ্কারগুলিকে আর্থিক হিসাবনিকাশে করিলে দেখিতে পাই যে সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া আজ ১০০০,০০০০০০ এগার হাজার কোটি টাকার ব্যবসায় চলিতেছে। বিগত ১৯১৮ অব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাকে Congressional gold medal দেন। তিনি এযা পেটেণ্টই লইয়াছিলেন সংখ্যায় ১১৪০-এর অধিক। হিসাবে—পক্ষে প্রতি পক্ষে (৬ই সপ্তাহে) তিনি একটি করিয়া পেটেণ্ট লইয়াছিলেন—এবং এ ব্যাপার শুধু ২।৪ বৎসর নয়, ৫২ বৎসর! আবিষ্কৃতির যুগে এডিসনের নাম সর্ব্বোচ্চ স্তরে দীপ্যমান তিনি সভ্যদেশে প্রতিটি মানবের ঘরের লোক। তাঁর মৃত্যুতে আমেরিকার তথা জগতেরই যেন একটা যুগান্ত হইয়া গেল। অজ্ঞাত-জগতের অন্তর্নিহিত মণিকোঠার যে ভাণ্ডার রত্নরাজি এতদিন বিকল হইয়াই ছিল, তাহার প্রজ্ঞা কর্ণধার যুগাবতার এডিসনের প্রচেষ্টায় আজ বিশ্বের প্রতিটি মানবই উপভোগ করিতে সমর্থ। তাই এডিসনের জীবনী মানবের কল্যাণের ইতিহাস!

তাঁহার অসংখ্য আবিষ্কারের মধ্যে যে প্রধান তিনটি সগৌরবে মানবসভ্যতাকে বিকাশের পথে বহুদূর আগাইয়া দিয়াছে তাহা এই—(১) বিজলী-বাতি, (২) ফোনোগ্রাফ এবং (৩) চলচ্চিত্র প্রদর্শনের যন্ত্র। যদিও রেডিও, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার প্রতিভার মূল্যবান দানের যে কোন একটিই তাঁহাকে যশের সর্বোচ্চ আসন দিতে সমর্থ, তবু তাঁহার বিশেষ দান ঐ পূর্বোল্লিখিত তিনটি বস্তু। মনীষী এডিসন পরলোকগত হইয়াছেন ৮৪ বৎসর বয়সে; কিন্তু এই দীর্ঘজীবন তাঁর পত্নীর সেবানিপুণ দুইখানি করেরই কল্যাণে,—এ কথা আমরা অনেকের মুখেই শুনি। কোনও গভীর সমস্যার সমাধানে তাঁর নিবিড় একাগ্রতার, এবং নিদ্রালেশহীন শরীরে দিনের পর দিন তাঁর পরিশ্রমের কথা আমেরিকায় আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। শরীরের প্রতি এডিসনের নিজের এতটুকু যত্নও ছিল না। মিসেস্ এডিসনই তাঁর বহুদিনের রোগেরাগ্র প্রাণধর্মটিকে সযত্নে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

এডিসন সাহেবের একজন সহকর্মী, নাম তাঁহার নিকোলা টেস্‌লা (Nikola Tesla)। এডিসনের কি অদ্ভুত কর্মশক্তি ছিল তাহা তাঁহার উক্তি হইতে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি বলেন—"আমরা পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকতাম দিন্‌রাত ধ'রে, অবকাশ ব'লে কোনও বস্তু আমাদের ছিল না। এডিসনের জীবন কাটত পরীক্ষাগারেই; কাজ ও নিদ্রা এই দুটির একটিই প্রধানতঃ তাঁকে সেখানে বাস্ত রাখত। তাঁর এর বেশী আর কোনও খেয়ালই ছিল না। খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ তাঁর জীবন হ'তে বহুদিন নির্বাসিত হ'য়ে গেছ্‌ল। স্বাস্থ্য-অর্জনের অতিসাধারণ সুপরিচিত বিধিবিধান তিনি পালন করতে কখনো মনোযোগী হননি। একথা তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, যে, বিবাহিত জীবনে যদি তিনি মিসেস্ এডিসনের মত তীক্ষ্ণধী'হুশিয়ালিনী কোন নারীকে না পত্নীরূপে পেতেন, তাহ'লে তাঁর ঐ স্বাস্থ্যনাশী অদম্য কর্মস্পৃহাই তাঁকে বহুদিন আগে এ পৃথিবী হ'তে সরিয়ে দিত।"

জগতের বুকে কত শিশু-এডিসনই নিত্য আসে, কিন্তু প্রতীচ্য পরিধিত এডিসন এ জগতে বিরল;—বোধ হয় অঙ্গুলিতেই তাঁহাদের সংখ্যা গণনা শেষ হয়। আমেরিকার মিলান্ গ্রামে ওহিও নগরে এই বীর শিশুর প্রথম আবির্ভাব হয়। সেটা ছিল ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী—প্রকৃতির বুকে সেদিনকার চঞ্চল কম্পনের তত্ত্ব আজ কে হিসাব করে? বাল্যকালে বিদ্যালয়ের সর্দ্দারির স্বরের ছায় ছিলেন এডিসন। শিক্ষক বলাধর ছাত্রের উন্নতির আশা ত্যাগ করিলেন—প্রতিবেশীরা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"ছেলেটা অপদার্থ!" কিন্তু সর্বংসহা ধরিত্রীর বুকে তাঁহার স্থানের অধিকার এবং অফুরন্ত ভালবাসার রাজধানী মাতৃহৃদয় তাঁহার সিংহাসন এতটুকুও টলিল না। শিক্ষা আরম্ভ হইল মাতারই কাছে। সুকোমল দশ বছর বয়সে এডিসনের রসায়ন বিদ্যায় মন গেল। মা ও ছেলে সহজ সহজ রাসায়নিক পরীক্ষায় লাগিয়া গেলেন। সেই বীজেরই পরিণতি আজ ফলে, ফুলে, ছায়ায়, পাতায় জগতে ঘুগান্তর আনিয়াছে।

যখন এডিসনের বয়স ১২ কি ১৩ তখন রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য অর্থ উপার্জন করিতে মনস্থ করিয়া তিনি এক কাজ নিলেন, রেলে সংবাদপত্র ফেরী করার। সে রেল চলিত ডারেন ও ডেট্রয়েট এই দুই সহরের মধ্যে। সেই রেলগাড়ীরই একটি মালের কামরায় এক কোণে তাঁর পরীক্ষাগার (laboratory) স্থাপিত হইল। তিনি একটি মুদ্রাযন্ত্রও কিনিলেন ছোট রকমের, আর নিজেই সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর রূপে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সে কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা নাকি পরে ৪০০০-তে দাঁড়াইয়াছিল। এই রকমে কয়েক বছর কাটিবার পর, একদিন দৈবাৎ এক বোতল ফস্‌ফরাস গাড়ীতে পড়িয়া যায় এবং গাড়ীতে আগুন লাগে। এডিসনেরই পরীক্ষাগারে এই ব্যাপার ঘটিল। কাজেই রেলের কণ্ডাক্টার মহাশয় এ জন্য এডিসনকে গাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন—অবশ্য বিনা শাস্তিতে নয়, তাঁর কানের উপর তারী হাতে এমন দুটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন যে পরে এডিসন আমরণ বধির হইয়া ছিলেন।

এর পর এডিসনের বন্ধু এক ষ্টেশনের এজেন্ট তাঁকে

টেলিগ্রাফ শিখাইতে চাহেন। এডিসন তখনি রাজী হইলেন। সেই সুবাদে টেলিগ্রাফার হিসাবে তাঁর নাম বাহির হইল, কিন্তু পরে এ কাজও তাঁর গেল। কারণ, শ্রমের লাঘব করিবার জন্য তিনি একটি কল আবিষ্কার করিয়াছিলেন—। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এইরূপ—প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর এডিসনকে একটি সংবাদ প্রেরণ করিতে হইত, সে একটা সঙ্কেত মাত্র। তিনি টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সহিত একটি চাকা যোগ করিয়া দিয়া কলের সাহায্যে মন দিয়া সেই সঙ্কেত দিয়া পাঠাইতে লাগিলেন নিয়মিত ভাবে—অথচ সে সময়ে নিবিষ্টচিত্তে অন্য কাজে মন দিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহার এ চাতুরী দেখিয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করিলেন।

তারপর ঘুরিয়া ফিরিয়া 'ন্যু ইয়র্ক' সহরে এডিসন আসিয়া পড়িলেন এবং সেখানকার Stock Exchange Telegraph Companyর একটি কল মেরামতের ভার নিলেন। এই কলটির এত সুচারুভাবে তিনি নবকলেবর দিয়াছিলেন যে তাঁর মাসিক মাহিনা হইয়া গেল ৩০০ ডলার। তখন তাঁহার বয়স প্রায় বাইশ বছর। এই সময় হইতেই ভাগ্যদেবীর সুদৃষ্টি তাঁর উপর পড়িল। এই আফিসে তিনি টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের অনেক উন্নতিসাধন করিলেন এবং একটি নূতন সংবাদপ্রেরক যন্ত্র আবিষ্কৃতির ফলে ঐ সময় তিনি ৪০,০০০ ডলার পান।

এইবার, অধ্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরীক্ষাগারে নব নব যন্ত্রেরও আবির্ভাব হইল—তিনি আহার-নিদ্রা ভুলিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কর্মই হইয়া দাঁড়াইল তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান ও অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু। ক্রমশঃ তিনি টেলিগ্রাফ যন্ত্রের শক্তি অদ্ভুতরূপে ৮ গুণ বর্দ্ধিত করিলেন। তারপর কার্বন টেলিফোন প্রেরক-যন্ত্র, তাপদান যন্ত্র, মাইক্রোটেলিগ্রাফিটার,মেগাফোন, বিজলী বাতি, ফোনোগ্রাফ, কাইনেটোস্কোপ প্রভৃতি বিজ্ঞানজগতের অত্যদ্ভুত আবিষ্কৃতিগুলিকে জগতের সম্মুখে প্রচার করিলেন। স্তম্ভিত বিশ্বয়ে বিশ্ববাসী দেখিল—"হাঁ, সেই বিদ্যালয় হ'তে বিতাড়িত অপদার্থ ছেলেটারই এই কাণ্ড!"

এডিসন ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার করেন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে একটা খেলনা মনে করিয়া তিনি ইহাকে যোগ্য শ্রদ্ধা দেন নাই। পরে ১,০০০,০০০ ডলারে ঐ ফোনোগ্রাফ তিনি বিক্রয় করেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তিনি বিজলী-বাতি আবিষ্কৃতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া জগতে প্রচার করেন। সে জগতে ও আজিকার জগতে তাই আজ এত প্রভেদ! সে আজ ৫২ বৎসর আগের কথা।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি চলচ্চিত্রের কল আবিষ্কার করেন।

এডিসন আজ নিখিল-লোকের আনন্দ-স্বর্গে। তিনি অমর! জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁর জয়যাত্রা আমাদের এ হতভাগ্য দুঃসময় দেশের প্রত্যেককে প্রেরণা দিক,—এই কামনা। প্রতি সৌধশিরে, প্রতি রাজপথে, প্রতি কক্ষে তাঁহার যশোভাতি আজ বিশ্বে বিকীর্ণ। তাঁহাকে প্রণাম। তাঁহার আত্মার কল্যাণে বিশ্ব-আত্মার কল্যাণ,—তা'ই আজ আমাদের কাম্য।

রবীন্দ্রনাথ *

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো। বিধাতার এই আশীর্ব্বাদ শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য করেছে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল কোরে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু তাদের দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যেই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কানে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধার ঘিরে বস্‌বার ভাগ্য আমাদের ঘটেচে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।

সেই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ আজকের এই সাহিত্য-সভা। সাহিত্যের সম্মিলন আরও অনেক বন্ধুর, আয়োজনে প্রয়োজনে তাদের গৌরবও কম হবে না, কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তারা পাবে না। এ'তো সচরাচরের নয়, এ বিশেষ একদিনের, তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আসরে সভানায়কের কাজ আরও কয়বার ডাক ইতিপূর্ব্বে আমার এসেছে, আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে পারি নি, নিজের অযোগ্যতা স্মরণ ক'রেও সসঙ্কোচে কর্ত্তব্য সমাপন ক'রে এসেছি; কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আজ লজ্জা বোধ কর্‌চি। আমি নিঃসংশয় যে এ গৌরব আমার প্রাপ্য নয়, এ ভারবহনে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয়বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা।

তথাপি আমন্ত্রণ অস্বীকার করিনি। কেন যে করিনি আমি সেইটুকুই শুধু ব্যক্ত কোর্‌বো।

আমি জানি বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিচার, এর জাতিকুল-নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে এ পরিষদ আহূত হয়নি,—তার প্রয়োজন যথাস্থানে—আমরা সবাই হয়েছি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিতে। তাঁকে সহজভাবে বল্‌তে—কবি, তুমি অনেক দিয়েছো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর সরল সর্ব্ব-সিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়ে তুমি দিয়েছো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েছো জগতের কাছে বাংলার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়; আর দিয়েছো যা' সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েছো বড় ক'রে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। প্রজ্ঞাবান যাঁরা যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা কর্‌বেন; কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি সেই কথাটাই ছোট ক'রে জানাবো ব'লেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

ভাষার কারুকার্য্য আমার নাই। ওতে যে পরিমাণ বিদ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজন, সে আমি পাইনি, তাই মনের ভাব প্রচলিত সহজ কথায় বলাই আমার অভ্যাস—এবং এমনি কোরেই বল্‌তে চেয়েছিলাম। কিন্তু হুগ্রহ এসে

* রবীন্দ্র-জয়ন্তী—সাহিত্যসভায় সভাপতির অভিভাষণ।

বিয় ঘটালে। এরে আমি বিখ্যাত ক'রে, তাতে বাদ সিয়ে কর আমি আমুষ্ঠানিক চরের দল একযোগে কুপিত হ'য়ে আমাকে শত্রুপক্ষীয় ক'রে দিলে। এমন তরসা ছিল না যে নড়তে পারবো। কিন্তু একটা বিশ্বাস এই যে, চিরকাল লেখে আসছি আমার অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করে না, ভালই করেছি। এই না আসতে পারার দুঃখ আমার আজও ঘুচ্‌ল না। কিন্তু, যা লিখে আনবার ইচ্ছে ছিল, সে হ'য়ে উঠলো না। একটা কারণ পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, তার চেয়েও বড় কৈফিয়ৎ আছে। মানুষের অল্পস্বল্প পাওয়ার কথাই মনে থাকে, তাই লিখতে গিয়ে দেখলাম কবির কাছ থেকে পাওয়ার হিসেব দিতে যাওয়া বৃথা। দফাওয়ারি কর্দ্দ মেলে না।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

ছেলে বেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে। বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাকরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠে, তখন গামছা-কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রার বার হই, —ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে, নিজ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে, অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর একদফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর, আবার বোধোদয় পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টা সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাকরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা—আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা। এমনি বোধোদয় পদ্যপাঠ ও বাংলা জীবনের এক অধ্যায় শেষ হ'ল। এলাম সহরে। একমাত্র বোধোদয়ের ওজরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি করেছিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু প'ড়ে যাওয়া নয়, মাসিক সাপ্তাহিক সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং সঙ্কোচ বলা চলে যে সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তারপর বহু

যেন ও আমার হ'তে নাই। কল্পনার স্পষ্ট দেখতে পেলাম সবাই ঘাড় নেড়ে সিদ্ধান্ত করছেন, উনি আসবেন না তো, এ আমরা জানতাম! সেই বাক্যবাণের ভয়েই আমি কোনমতে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন দেখছি

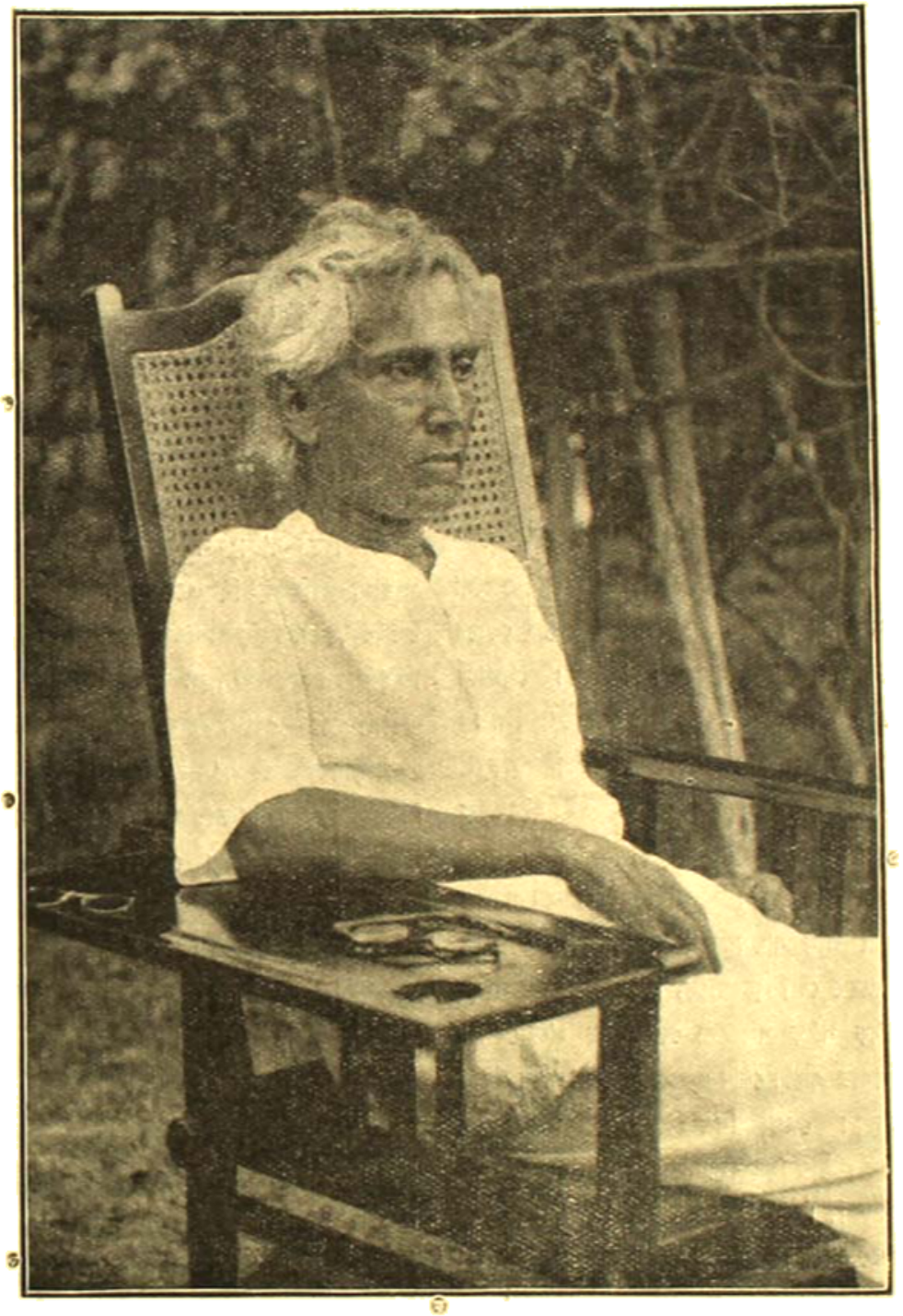

সাহিত্যিকা শ্রীমতী

দুঃখে আর একদিন সে দিনটিও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুনীতির নামান্তর,—সঙ্গীত অস্পৃশ্য। সেখানে সবাই চায় পাশ করতে এবং উকীল হ'তে। এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে. তিনি

ওদের বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের ডেকে তিনি একদিন প'ড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ।" কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর ও আমার চোখে জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম সত্য পরিচয়। এর পরে এ-বাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইলো না,—আবার ফিরতে হ'লো আমাদের সেই পুরানো পল্লী ভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা।" আর বেরোলো "ভবানী পাঠক।" গুরু-জনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বড়-ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই কোরে নিতে হোলো আমাদের বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে। এক ইস্কুলে বেশীদিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহভরে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হোল সহরে। ভালা ভাল, এর পর আর ইস্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সফল মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'চ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সে দিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের বর্ণনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়,এর পূর্ব্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটু পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হ'লো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনও দিন লিখেছি; দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে যে নবীন বাংলা সাহিত্য ক্রতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো,আমি তার কোনও খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনও দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হ'লো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গী ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথাসাহিত্য—এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বইই বার বার ক'রে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, ক'টা তার অক্ষর, কাকে বলে art, কি তার সজ্জা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কিনা—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথাসাহিত্যে আমার 'ছল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে বেরিয়ে এসেছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। বাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম—ভয়ের কথা মনেই হ'লো না। আর কোথাও না হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে।

পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তাতে ভুল যদি থাকে তো থাক্, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হ'য়ে আছে।

জানি রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনায় এ সকল অবান্তর, হয়তো বা অর্থহীন, কিন্তু গোড়াতেই আমি বলেছি যে, আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সপ্রশ্ন ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত, আমি এসেছিলাম শুধু আমার যা ক্ষণিক গোটা কয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসব-সভায় নিবেদন ক'রে দিতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যেভাবে লাভ করেছি, তা' জানালাম। মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেছি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেননি; তার একটা হেতু এই দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরও বলেছিলেন যে, তোমরা যদি এ কাজ কর, কখনো ভুলো না যে অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। তাই, সাহিত্য-বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখতো।

কিন্তু, এই সভার অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি, আর না। অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করার এটা দণ্ড। এ আপনাদের সইতেই হবে। সে যাই হোক্, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত। তাই সকৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদিগকে নমস্কার জানাই।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ই পৌষ, ১৩৩৮।

গল্প

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

…সাহিত্যের লক্ষণ নিয়ে কলহ হয়। এর কারণ কেহ সাহিত্য শব্দের সংকুচিত অর্থ ধরেন, কেহ "সাহিত্য দর্পণ" অনুসরেন, কেহ ইংরেজী literature শব্দের এক বিশেষ অর্থ বরণ করেন। কোন্ পথে চলেছেন ব'লবে, গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে না। আমি সাহিত্য শব্দের মূলার্থ ভাবছি, কারণ সে অর্থ ধ'রলে বর্ত্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 'সহিতে'র ভাব, সাহিত্য। 'সহিত' শব্দের দুই অর্থ আছে। (১) সমভিব্যাহৃত (company, association)। পূর্ব্বে বলা হ'ত, 'লোকের সমভিব্যাহারে,' (গ্রাম্য) 'সমিভ্যারে'। আমরা এখন বলি লোকের সহিত। 'সহিতে,' সঙ্গে; পূর্ব্ববঙ্গে বলে সাথে। 'সহিত' সখী, সেথো। "সূক্তপুরাণে" "সহিতর দানপতি" সেথোর কর্ত্তা। অর্থাৎ, সহিত, সমাজ গোষ্ঠী। সাহিত্য, মাঠে ঘাটে জন্মে না। কতকগুলি সমধর্ম্মী লোকের গোষ্ঠী নিমিত্ত সাহিত্য। এরা অবশ্য নিজের হিতেচ্ছায় 'সহিত', সংযুক্ত হয়। সে হিত যে কি, তারাই জানে; কেহ মিছামিছি দল বাঁধে না। দৈবাৎ 'সহিত' শব্দ হ'তে এ অর্থও আসে। স-হিত, সহ-হিত, হিতযুক্ত। অতএব ব'লতে পারি, জ্ঞানীর জ্ঞান-সাহিত্য, রসিকের রস-সাহিত্য, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম-সাহিত্য, তরুণের তরুণ-সাহিত্য, গণিতজ্ঞের গণিত-সাহিত্য, ইত্যাদি। সাহিত্য শব্দের বিশেষ অর্থে কাব্য-সাহিত্য। কিন্তু কবি না হ'লেও সাহিত্যিকে আখ্যা লাভ হ'তে পারে। সমাজে যাঁর রচনা আদৃত, তিনি সাহিত্যিক। কবি-সমাজে যিনি সাহিত্যিক, তিনি অন্য সমাজে অ-সাহিত্যিক হ'তে পারেন।

…এক গল্প-কীট ব'লতেন, "গল্প চারি প্রকার। যথা, কোনটি দৈবাৎ ঘন আবর্ত্তিত দুগ্ধ; খেলে বুঝতে পারি, হাঁ, কিছু খেয়েছি, অনেক দিন মনে থাকে। কোনটা জলো দুধ, পানসে ঠেকে, এ বেলা খেলে ও বেলাতে মনে থাকে না। কোনটা পিঠালীর গোলা, দুধের গন্ধও নাই, কেবল দেখতে শাদা। কোনটা পচা ছেনার জল, গন্ধেই বমি উঠে।" গল্পের সমালোচনা হ'লে গল্পকার রোষ-ক্ষুব্ধ

বুঝতে পারতেন। "সাহিত্যে" অন্ন স্বল্প সমালোচনা থাকত, লেখক ও পাঠকের উপকার হ'ত। সমালোচক, বিচারক। অর্থী লেখক; প্রত্যর্থী পাঠক। স্বীয় রচনার প্রতি সকলের মমতা থাকে, বন্ধুজনের প্রতি বিচারকেরও মমতা হয়। কিন্তু উভয়েই মমতা ত্যাগ ক'রতে না পারলে পাঠকের প্রতি অবিচার হয়। দেখি কোনটার আরম্ভ বেশ, বন্ধও বেশ, কিন্তু শেষে হত-ইতি গজঃ। মনে হয় যেন লেখক পাতা গুণছিলেন, হঠাৎ দেখলেন পাতা ফুরিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি সমাপ্তি বসিয়ে ফেলেন। এর ফলে ভাব-ভঙ্গ ঘটে। দ্বিতীয় দোষ, গল্পের অনাবশ্যক বাহুল্য। স্বল্পোক্তি অল্প হ'লেই ফলোৎপাদক হয়। মনের বিতর্ক দীর্ঘ হ'লে পাঠকের ধৈর্য্য লোপ হয়। পদ্যকাব্যে অলঙ্কার-বাহুল্য ঘটে, গদ্যকাব্যেও ঘটে। তখন প্রতিমার রূপ দেখতে পাই না, কিঙ্কিণীর টুন্‌-টুন্‌ ধ্বনি মাত্র কর্ণগোচর হয়। তৃতীয় দোষ, অশিষ্টেরা বলে, "বিদ্যা ফলানো"। বিদ্যার পরিপাক না হ'লে, উদ্গার ওঠে। পাঠক এ দোষ সইতে পারেন না। দৃষ্টান্ত ও উপমার নিমিত্ত বাঙ্গালী পাঠককে বিলাতে যেতে হ'লে তিনি পর্য্যাকুল হ'য়ে পড়েন। চতুর্থ দোষ, 'ধান ভানতে শিবের গীত।' প্রসঙ্গ-বাহুল্য। বঙ্কিম-চন্দ্র "ইন্দিরা"র শেষে এই দোষ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এ পরিচ্ছেদটি না লিখলেও লিখতে পারতাম।" তাঁকে বরের বাসরঘরের একটি চিত্র দিবার বাসনা ভ্রান্ত করেছিল। তিনি এ বাসনা অক্লেশে মিটাতে পারতেন।

তিনি রসিক ছিলেন কিন্তু কুত্রাপি অশ্লীলতা করেন নাই। যে বাক্যে শ্রী শোভা লজ্জা নাই,সেটা অশ্লীল, অশ্লীল। যে বাক্য শুনলে লজ্জা ও ঘৃণা হয়, সেটা সমাজের অবমল-জনক। 'সাহিত্য' শব্দের অর্থেই প্রকাশ, এতে অ-সামাজিকতা থাকবে না। প্রত্যেক সমাজেই ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, সুপ্রবৃত্তি-কুপ্রবৃত্তির ভেদ আছে। গল্পে সে ভেদ না মানলে গল্পটা সমাজবিদ্বেষী হয়; পাঠকের অন্তঃ-করণ ক্ষুব্ধ হয়। গল্প পড়ে ঘুম্‌পাড়ার উদ্যম হ'লে গল্প নিষ্ফল। সে গল্পে রসনাশক্তি থাকলে পাঠক ভাবতে থাকেন, লেখকটি কে, তাঁর চরিত্রই বা কিরূপ। পদ্য-কাব্যে ও গদ্যকাব্যে এমন কি কুদ্র গল্পেও লেখক স্বচিত্রই প্রকাশ করেন, তাঁকে চিনতে কষ্ট হয় না। কলার জন্যে কলা চর্চ্চা,—এটা আত্ম-বঞ্চনা।

…এত যে গল্প লেখা হ'চ্ছে, পড়ে কে? বৃদ্ধ বৃদ্ধা পড়েন না, প্রৌঢ় প্রৌঢ়াও পড়েন না। তাঁরা সংসারে অনেক সত্য গল্প দেখেছেন, শুনেছেন, মিথ্যা গল্পের প্রয়োজন পান না। পড়ে, যুবা বয়সের নরনারী।

এর কারণ আছে। গল্পে মানব চিত্তচাতুর্য্য বর্ণিত হয়। দক্ষতা, নিপুণতা চাতুর্য্য বটে, চারুতা রমণীয়তাও চাতুর্য্য। যৌবনের ধর্ম্মে মানুষ পরচিত্ত-চকোর হয়, সুখের রস অন্বেষণ করে। সংসার-জ্ঞান নাই, গল্প পড়ে জ্ঞান পিপাসাও তৃপ্ত করে। বুক্কাস্থ-রস সর্ব্বদেহে চ'য়লেও হৃদয় তার স্থান। চিত্ত-রসের স্থানও হৃদয়। তরুণের হৃদয় আছে; কাব্য সহৃদয় পাঠকের নিমিত্ত রচিত হয়। তরুণ অপেক্ষা তরুণী কাব্যরসে অধিক আকৃষ্ট হয়। কারণ, তার জ্ঞান-বৃত্ত ক্ষুদ্র, বাইরের লোকের সঙ্গে মেশা-মেশা ক'রতে পায় না। এদের নিমিত্ত গল্প লিখতে হ'লে সবিশেষ ভাবতে হয়। যে গল্প প'ড়লে চিত্তের প্রসাদ ও প্রসার হয়; ক্ষণিক উদ্দীপনা নয়, পবিত্রভাব স্থায়ী হয়; অবসাদ নয়, উৎসাহ হয়; সে গল্পের অসংখ্য ক্ষেত্র আছে।

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রী যতীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকাশক—যুগান্তর বাণী ভবন, ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০ টাকা।

প্রধানতঃ গ্রন্থকারের স্বীয় স্মৃতিসংগৃহীত উপাদান হইতে এই গ্রন্থখানি বিরচিত। গ্রন্থকার একদা স্বর্গীয় স্বামীজির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন (ইনি স্বামীজির সহোদর ভ্রাতা); সেদিক দিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষ করিয়া, স্বামীজির জীবনের সমাজলৌকিক দিকে ইহা অভিনব আলোকপাত করিয়াছে। গ্রন্থখানি কল্পিত কাহিনী শ্রেণীর না হইলেও উপন্যাসের মতই হৃদয়গ্রাহী। যাঁহারা স্বামীজিকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ইহা পাঠ করিতে হইবে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া স্বামীজির সম্বন্ধে নূতন অনেক-কিছু জানিতে পারিলাম।

রজনীগন্ধা—শ্রী ভক্তিসুধা রায়। প্রকাশক—বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য—৸৹ আনা।

কবিতাগুলি পাঠ করিলে, বহিঃপ্রকৃতির সূত্রে অন্তর্লীলার কমল-মাল্য গাঁথিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভাবপ্রাণ রস ছন্দবৈচিত্র্যে রূপে সুষ্ঠু-সম্বদ্ধ। অধিকাংশ কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব পরিস্ফুটতর হইলেও লেখিকার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও অন্তরালবর্তী নহে। রজনী-গন্ধার গন্ধ আমোদিগকে সত্যই আনন্দিত করিয়াছে।

—বঃ সঃ

বাগেরহাট মহিলা শিল্প-শিক্ষালয়

স্থানীয় মহিলা ও বালিকাগণকে অল্প সময়ের মধ্যে কিছু অর্থকরী এবং সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গত জুন মাসে এখানে একটি অন্তঃপুর শিল্প-শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। উক্ত শিক্ষালয়টি বর্তমানে স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ছাত্রী-সংখ্যা বর্তমানে ৩১। গত জুন মাসে স্কুল আরম্ভ করার সময়ে সরোজনলিনী নারী শিল্প-শিক্ষালয়ের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মহিলা হাওড়া জেলার বাঁটরা স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা আশালতা দাসগুপ্ত এই স্কুলে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহার শিক্ষাদানকৌশলে স্কুলটির উপর স্থানীয় ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণের দৃষ্টি পতিত হয়। তৎপরে জুলাই মাসের শেষে তাঁহার পারিবারিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্কুলের কাজ তিনি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত শিক্ষয়িত্রীর কার্যকালের মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুদাস নাগ এম্-এস্ সি, খালেলর রহমান, রসিকলাল চক্রবর্তী রায়সাহেব ও আবদুল গনি পরিদর্শনে আসেন এবং স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রীদের হাতের নানারূপ সুন্দর সুন্দর ছাঁটকাট-সমন্বিত জামা সেলাই দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। পেনি হইতে আরম্ভ করিয়া সাজাবী ও দার্ট পর্যন্ত এবং সুন্দর সূচিকার্য-সমন্বিত রুমাল ও টেবিল-ক্লথ, টিপয়-কভার প্রভৃতি দেখান হয়। তাঁহারা এই স্কুলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্রীগণই সমান যত্নে শিক্ষা পাইবার অধিকারিণী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। স্কুলটি প্রধানতঃ জেলা বোর্ডের সাহায্য ও সহানুভূতিতে লালিত-পালিত হইতেছে। এজন্য জেলা বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুরকে স্কুল কর্তৃপক্ষ অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্যদান ব্যতিরেকে এই প্রতিষ্ঠানটি কোনরূপেই যে চলিত না ইহাও নিঃসন্দেহ।

পরে গত আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির কর্তৃপক্ষদের অনুগ্রহে আমরা আর একজন ঐ স্থানের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মহিলা শ্রীযুক্তা হরিদাসী শ্রীবানীকে শিক্ষয়িত্রীরূপে আনিতে সক্ষম হই এবং তাঁহারও শিক্ষাদানকৌশল প্রশংসনীয় এবং তাঁহার মিষ্ট ব্যবহার ছাত্রীগণকে মুগ্ধ করিয়াছে।

গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর স্বয়ং শিল্পশিক্ষালয়টি পরিদর্শনে আসেন। স্কুলের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাদান প্রভৃতি দেখিয়া ও জানিয়া তিনি বিশেষ পরিতুষ্ট হন এবং অবিলম্বে স্কুলের নিজস্ব একটি সেলাইয়ের কলের প্রয়োজন হইবে বিশেষরূপে উপলব্ধ করেন। স্কুল-গৃহটি ছোট, এটা তিনিও লক্ষ্য করেন। স্কুলের মাসিক ব্যয় বর্তমানে ৫০৲ টাকা, কিন্তু জেলা বোর্ড হইতে বর্তমানে মাসিক ৩০৲ টাকা হারে আমরা সাহায্য পাইতেছি এবং আর ২০৲ কুড়ি টাকা বর্তমানে স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করিয়া ও মহিলা কর্মী সংঘের তহবিল হইতে পূরণ করা হইতেছে। চেয়ারম্যান বাহাদুর

বলিয়াছেন, "প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ সহানুভূতির যোগ্য।" যথা-সম্ভব শীঘ্র শিক্ষালয়ে তাঁত বসান হইবে।

প্রচারকার্য্য।—জেলা বোর্ডের সাহায্যে স্থানীয় মহিলাদের লইয়া খুলনা জেলার প্রতি গ্রামে মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল ও সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য একটি প্রচারিকা সঙ্ঘ আমরা খুলিতেছি। এই সঙ্ঘের প্রচারিকাগণ অবসর এবং ইচ্ছা অনুসারে পাথেয় এবং পারিশ্রমিক পাইতে পারিবেন। আমরা খুলনা জেলার যে কোন শ্রেণীর শিক্ষিত মহিলাগণকে এই প্রচারিকা-সঙ্ঘভুক্ত হইবার জন্য নিবেদন করিতেছি। জাতির স্বাস্থ্য প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ মায়েদের হাতে, তাই আজ জাতির উন্নতিকামনায় এই প্রচারিকা-সঙ্ঘ গঠন করিতে অভিলাষী হইয়া জননী ও ভগিনীগণকে আহ্বান করিতেছি। বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য সম্পাদিকা, মহিলাকর্ম্মী সংসদ, বাগেরহাট, এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। এই সঙ্ঘের জন্য, নারীজাতির উন্নতিকামনায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ দেশ-প্রেমিক শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গকান্ত রায় চৌধুরী এম-এ মহোদয় একটি ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ দান করিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। জেলা বোর্ড স্কাইডের জন্য ১২৫৲ টাকা দিয়া আমাদের অশীম উপকার করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর ও হেল্থ অফিসার মহোদয়ের কাছ অপরিশোধ্য।

ইহা ব্যতীত শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল ও বিভিন্ন দেশের ও কালের নারীপ্রগতি এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটি মিউজিয়মও আমরা শীঘ্রই খুলিব স্থির করিয়াছি। এজন্যও আমরা জেলা বোর্ডের নিকট আশা পাইয়া বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পাঠাগার।—বাংলার গৌরব ও খুলনার মুকুটমণি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কৃপায় মহিলাগণের জন্য একটি পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য ৫০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক পাইয়াছি।

খুলনার অন্যতম দেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র 'কমলা বুক ডিপো'র স্বত্বাধিকারী মহাশয় অত্র পাঠাগারের জন্য ২০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক দান করিয়া আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রমেশ চাটার্জ্জি মহাশয়ও আমাদের এই পাঠাগারের জন্য ১০।১২৲ মূল্যের পুস্তক প্রদান করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আমরা অবিলম্বে "কল্যাণী পাঠাগার" নাম দিয়া একটি পাঠাগার সাধারণের গোচরে আনিবার ইচ্ছা ঘোষণা করিতেছি। এজন্য চাই সমগ্র খুলনাবাসী নরনারীর ঐকান্তিক সহৃদয়তা। বর্ত্তমানে আমরা যে কয়টি মহিলাদের গঠনমূলক কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা কখনই ২।৪ জনের চেষ্টায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। তাই বাগেরহাট ও খুলনার সমস্ত সহৃদয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন। পরিশেষে ইহাও জ্ঞাতব্য যে জেলা বোর্ড হইতে মাসিক পনের টাকা অর্থসাহায্য লইয়া বাগেরহাট মহকুমার তিনটি বিধবা মহিলা কলিকাতায় অর্থকরী বিদ্যা-শিক্ষার্থে গিয়াছেন। সমগ্র খুলনা জেলার নয়টি মহিলা এই বৎসর এই অর্থসাহায্য পাইলেন; তন্মধ্যে একজন মুসলমান মহিলাও আছেন। খুলনা জেলা বোর্ডের এইরূপ সৎকার্য্য প্রতি জেলা বোর্ডের অনুকরণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রী উষাসতী দেবী,
শ্রী লীলা মিত্র;
সম্পাদিকাদ্বয়

আমারিয়া মহিলাসমিতির ষোড়শ বার্ষিক বিবরণী

আমাদের এই মহিলাসমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য, পরস্পরের সহিত মেলা-মেশা, ভাবের আদান-প্রদান, নিজেদের মানসিক নৈতিক উন্নতি বিষয়ে আলোচনা, শিক্ষার প্রচার, স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে চেষ্টা, দুঃস্থদের সাহায্য ও সামাজিক কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করা ইত্যাদি। আজ ১৬ বৎসর যাবৎ এই সমিতি যত্নের সহিত দূরে একটি বাঙ্গালী মহিলার দ্বারা চালিত। নিজেদের মধ্যে প্রীতিস্থাপনের জন্য এই সমিতি স্থাপন করা হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যিনি ইহার প্রাণ ছিলেন তিনি (স্বর্গীয়া সরযূ দেবী) এখন পরলোকে।

তাঁহাকে সরাইয়া সমিতি মাত্রে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। আর তিনজন—শ্রীযুক্তা নলিনী দেবী, মেহলতা দেবী ও অনুপমা দেবী এখন স্থানান্তরে আছেন। শ্রীযুক্তা সুবর্ণ দেবী ও বিনোদিনী দেবী এই ১৬ বৎসর যাবৎ সমিতির ঘর করিয়া আসিতেছেন। গত পনের বৎসর শ্রীযুক্তা নলিনী দেবী ইহার প্রেসিডেন্ট ও সুবর্ণ দেবী সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নলিনী দেবী স্থানান্তরে যাওয়াতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার স্থানায় সমিতির অন্যতমা সভ্যা বিনোদিনী দেবী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুবর্ণ দেবীই এ পর্য্যন্ত সেক্রেটারী আছেন। কি করিয়া সমিতিটি উন্নতি করিতে পারে, মেয়েদিগের মনে প্রেরণা আনিতে পারে, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। তিনি এই উদ্দেশ্যেই এই সমিতিকে সরোজনলিনী সমিতির সহিত যুক্ত করিয়াছেন। সমিতির গত পনের বৎসরের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে দেখা যায়, সমিতি বন্যার সময়ে সাহায্যদান, শিক্ষার জন্য স্কুল-স্থাপনের চেষ্টা, লাইব্রেরী স্থাপন, পরস্পর মেলামেশার জন্য সম্মিলন, শিল্পপ্রদর্শনী এই সব কাজ করিয়া আসিয়াছে। সরোজনলিনী সমিতির সহিত যুক্ত হওয়ার ফলে এই বছর তাঁহাদের মাসিক সাহায্য ১৫৲ টাকা ও তাঁহাদেরই নির্ব্বাচিতা শ্রীযুক্তা অমলা দেবীকে শিক্ষয়িত্রী পাইয়া সমিতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এইবার সমৎসরব্যাপী সেলাইয়ের ক্লাসে ২৪।২৫টি করিয়া ছাত্রী সেলাই শিক্ষা করিয়াছে; ইহার ফলে অনেকেরই দর্জ্জির খরচ কমিয়া যাইতেছে। এই বছর দুই বার প্রদর্শনী হইয়াছিল। দুইবারই প্রদর্শনী বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। পাখার, রুমাল, জামা ইত্যাদি বেশ বিক্রী হইয়াছিল। সকলেই মেয়েদের কাজ দেখিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছেন। এখানে যাঁহারা নিজেদের শিল্প বিক্রয় করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে চাহেন তাহার ব্যবস্থা আছে। আমরা তাহাতে উৎসাহ দিয়া দিয়া থাকি। ঘরে ঘরে সকলেই নানা-রূপ কারুশিল্প করেন। তবে সমিতি হইতে নিয়মিত ভাবে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। একজন বিধবা ভদ্র মহিলা সমিতিতে বাসের ও তাঁতের কাজ শিক্ষা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। দ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য সমিতি হইতে জিনিষ সরবরাহ করা হয়। সমিতির একটি স্থায়ী ঘর না থাকাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। সেলাইয়ের ক্লাসটি আমাদের রাখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এ বৎসর গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ক্লাস স্থগিত রাখিয়াছি। সমিতি বলিতে আমরা কাহাকেও কিছু দেখাইতে পারি না। একটি স্থায়ী ঘর হইলে মহিলা-স্কুল স্থাপন করিয়া শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেওয়া, একটি লাইব্রেরী করিয়া স্থানীয় মহিলা-দের পড়িবার সুবিধা করিয়া দেওয়া, গৃহসংলগ্ন জমিতে বাগিচা করা ইহাই এখন আমাদের কামনা। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

মাঝে মাঝে আমোদের ব্যবস্থাও করা হয় প্রায় প্রতি অধিবেশনেই বালিকাগণ সঙ্গীত আবৃত্তি দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করে। এবার শারদীয় উৎসবে বালিকাগণ "অন্নপূর্ণার মন্দির" অভিনয় করিয়াছিল। সমিতিতে ভারতবর্ষ ও বঙ্গলক্ষ্মী এই দুই খানা মাসিক পত্রিকা রাখা হয়। প্রতি অধিবেশনে এই সব পত্রিকা হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিষয় সব পাঠ ও আলোচনা হইয়া থাকে।

বাহিরের সাহায্যের মধ্যে এ বছর শ্রীযুক্তা জাদিনা খাতুন, এখানকার ভূতপূর্ব্ব সাবডিভিসনাল্ অফিসার মহাশয়ের পত্নী, ইঁহার সাহায্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এ বৎসর মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য না করিলে আমরা শিক্ষয়িত্রী রাখিতে পারিতাম না। তিনি ধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়াও, আমাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির অন্ত নাই। শ্রীযুক্তা নলিনী দেবী ৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারা আমরা সেলাইয়ের ক্লাসে তিনটি উপযুক্ত মেয়েকে তাহাদের কার্য্যের জন্য পুরস্কার বিতরণ করিয়াছি। স্থানীয় সাব-ডিভিসনাল অফিসার মহাশয় charity fund হইতে শিল্পপ্রদর্শনীর জন্য আমাদিগকে ২০৲ টাকা সাহায্য করিয়া বাধিত করিয়াছেন।

নিম্নে সমিতির বার্ষিক আয়ব্যয়ের তালিকা দেওয়া হইল। মাঝে মাঝে আমরা যে উৎসবাদি করিয়া থাকি, তাহার জন্য আলাদা চাঁদা ধরা হইয়া থাকে এবং সেই অর্থ দ্বারা সেই কাজ হয়।

১৯৩১ সন

জমা		
সেবাশ্রমিদের চাঁদা		
ছাত্রী-বেতন		
আমিনা খাতুনের সাহায্য		
S. D. O.র সাহায্য		
নলিনী দেবী		৫৲
অমলা দেবী		২৲
		২১৩।০
প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ		
পূর্ব্ব জমা		৩০৲
	মোট জমা	২৪৩।০
	খরচ	২৪৬৲
		৭।০
খরচ		
শিক্ষয়িত্রীর বেতন		
শিক্ষয়িত্রীর যাওয়া আসার খরচ		৩৮৲০
শিক্ষয়িত্রীর জন্য চাকরের মাহিয়ানা		১৬।০
কাটা তোলার খরচ		১৲
ভারতবর্ষ ও বঙ্গলক্ষ্মী		১০৲
অধিবেশনের গাড়ী ভাড়া		৪৲
সমিতির কাজের কাগজপত্র ও টিকিট		১।০
অভিনয় ও প্রদর্শনীতে খরচ		৩।০
মাসিক সেবা		২৲
		২৪৬৲

বৎসরান্তে সমিতির তহবিলে এই সামান্য জমা আছে, তাই অর্থাভাবে সেলাইয়ের ক্লাসটি এখন চালাইতে পারিলাম না। পর বৎসর গৃহনির্ম্মাণের আশায় কাজে অগ্রসর হইব। শুভ ইচ্ছায় ভগবান সহায় হইবেন।

শ্রী সুবর্ণবালা দাসগুপ্তা,
সম্পাদিকা

ব্যাটরা মহিলাসমিতি (হাওড়া)

অক্টোবর মাসে সমিতিতে ২জন সভ্যা ভর্ত্তি হইয়াছেন এবং সমিতিতে একটি প্রসূতি-পরিচর্য্যা ক্লাস খোলা হইয়াছে। প্রত্যেক শুক্রবারে সমস্ত মহিলা একত্র হন। এখানকার স্থানীয় ধাত্রী শ্রীমতী সুরবালা দেবী শিশুপালন ও প্রসূতি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে মহিলাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। ১৩ই অক্টোবর এখানকার সমিতির ৮টা মেয়ে কাটিং ও সীবন পরীক্ষা দিয়াছেন এবং নিয়মিতরূপে প্রত্যহ ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ক্লাস হয়। কাটিং, সীবন, এমব্রয়ডারী, উলের কাজ, ঝাঁপের কাজ, নেকড়ার ঢুড়া তৈয়ারী প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং মেয়েদের নিয়মিত রূপে ১ ঘণ্টা করিয়া পড়ান হয়।

শ্রী নন্দরাণী ঘোষ,
সম্পাদিকা

ভ্রম-সংশোধন

"আহরণ" বিভাগে উদ্ধৃত "গল্প" নামক প্রবন্ধাংশটি "প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মায়ামোহিনী

শ্রী কালীপদ ঘটক

কে তুমি অপরিচিতা !
শুধু কি ভ্রান্তি, ওগো মায়াময়ি—
স্বপ্নাবগুণ্ঠিতা ?
তোমার ও কর-কমল-পরশে
মুঞ্জরি' সারা গহন-মন,
মরুত্ব-শুষ্ক অন্তরে মম
সাজালে প্রেমের কুঞ্জবন।
নবীন উষার রঙীন আলোকে
বিকচ-বধূ-বেশে কে তুমি বালা
দাঁড়ালে আমার হৃদয়-দুয়ারে
অঙ্কে পরিয়া বিজয়-মালা ?
বিজয়িনি ! তব নয়ন-দিঠির
খর-শরাহত বন্দী জনে
নিয়ে যেতে চাও কোন্ মায়াপুরে,—
কোন্ স্বপনের বিশ্বরণে ?
একি পরিহাস - একি বিভ্রম !
একি উজ্জ্বল বহ্নিশিখা !
অয়ি নিষ্ঠুরে, কি ছল দেখারে
অস্তি-অবলুপ্ত এ মরীচিকা !
চ'লে যাও চিরবাঞ্ছিত লোক
সাজিতে বাধা দিয়ো না আর,—
মর্ম নিঙাড়ি' নিয়ে যাও শুধু
অনিকের পূজা—অঞ্জহার !
মিলনের গান না হইতে সুরু
বিরহের পালা কহগো শেষ,
ধূলি-নিকুঞ্জ-মর্মরে মম
দিয়ে যাও তারি একটু রেশ।
ফাঁকাটুকু ছেয়ে থাক শুধু
পাতায় পাতায় পুষ্পে তার,
যদি কোনদিন দেখার মাঝে গো—
ক্ষমা ক'রো, দিয়ে চেয়োনা আর।

বিদায়ের বেলা ব'য়ে যায়,—ওকি !
ছলছল কেন অনিত আঁখি !
পথভোলা তুমি কে পথচারিণী ?—
কি চাও ? - এখনো অনেক বাকী !
এতকাল ধ'রে চেয়েছিনু যারে
তারি সাথে একি প্রথম-দেখা ?
এঁকে দিলে তাই গোপন হিয়ায়
পাষাণ-ফলকে কনক-রেখা ?
এসো তবে ওগো অতিন অতিথি—
এসো প্রাণভরা আশার আলো,—
নিঃশেষে মোরে সঁপিনু তোমায়,
জীবনে মরণে বাসিনু ভালো।
ভেঙে যায় যদি সোনার স্বপন,
ঝ'রে যায় যদি ফুলের ফুল,—
তবু এসো মোর সকল-ভুলানো
মায়া-ভটিনীর বিথার কূল।

কেন্দ্রসমিতির কথা

শ্রীযুক্ত মুকুল দে

গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয় 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহার অফুরন্ত কলা-ভাণ্ডার হইতে অনেকদিন যাবৎ আমাদিগকে নিয়মিত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। 'বঙ্গলক্ষ্মী'র ভিতরে এবং উপরে যে সকল চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই তাঁহার সংগৃহীত। তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞ ও গুণী ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া চিত্রের দিক দিয়া 'বঙ্গলক্ষ্মী'র অনেক সুবিধা হইয়াছে। তাঁহাকে আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন।

ম্যাডান থিয়েটারে অভিনয়

গত ২৭শে নভেম্বর সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সাহায্যার্থে কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ ম্যাডান থিয়েটার ও প্যালেস অফ ভ্যারাইটিস্ রঙ্গমঞ্চে একটি ছায়াচিত্রের অভিনয় হইয়াছিল। সমিতির পৃষ্ঠপোষিকা লাটপত্নী মাননীয়া লেডী জ্যাকসন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমিতির কর্ম্মীগণের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অভিনয়ের টিকিট বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিদধিক ১০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ম্যাডান কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ প্রতি বৎসর আমাদের এই প্রকার সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার জন্য কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মেসার্স ম্যাডান ব্রাতৃদ্বয়কে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত মহাশয়ার জীবন অবলম্বন করিয়া "নারীত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখিকাকে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয় একটি ৫০৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধ ১৫ পৃষ্ঠের অধিক হওয়া আবিশ্যক। তাহা বাংলাভাষায় এবং মহিলাদের লিখিত হওয়া চাই। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে চান, তাঁহারা আগামী ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রবন্ধটি সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর নামে ৪৪ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। উপযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী এই সকল প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়া যাহা স্থির করিবেন, তাহাই গৃহীত হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ রচয়িত্রীর চিত্রসমেত সমিতির মুখপত্র "বঙ্গলক্ষ্মী"তে প্রকাশিত হইবে। আগামী ১২শে জানুয়ারী কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক উৎসব সভায় প্রবন্ধ-রচয়িত্রী বা তাঁহার কোন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।

বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব

আগামী ১২ই জানুয়ারী কলিকাতা এলবার্ট হলে স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত মহোদয়ার বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইবে। প্রতিবৎসর সকল শ্রেণীর এবং সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিয়া তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং তাঁহার সংকল্পপ্রসূত নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যের বিষয় আলোচনা করেন। বিভিন্ন মহিলাসমিতি এবং কলিকাতা ও মফঃস্বলের মহিলা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিগণকে এই সভায় যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি। গত বৎসরের স্মৃতিসভায় বিরাট জনসমাগম, উপস্থিত মহিলা-গণের উন্নতির বিষয়ে প্রবল উৎসাহ, সুদূর মফঃস্বল হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহাদের শুভাগমন দেখিয়া আমাদের মহিলাসমিতিগুলির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আমাদের মনে নবীন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। আগামী স্মৃতিসভার অধিবেশনে ভগবান সুনিশ্চিত স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর অশরীরী আত্মার সাহায্যে বাংলার নির্য্যাতিতা ভগিনীগণের মধ্যে আরও প্রবলভাবে জাগরণের জন্য এক অনির্ব্বচনীয় মন্ত্রশক্তি প্রদান করিবেন।

শিল্পপ্রদর্শনী

প্রতি বৎসর কেন্দ্রসমিতি বিভিন্ন মহিলাসমিতির প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি লইয়া কলিকাতায় একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। এবার আগামী ১৩ই জানুয়ারী ৪৪নং বেনিয়াটোলা লেনে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে এবং ৭ দিন খোলা থাকিবে।

মহিলা-সভা

আগামী ২০শে জানুয়ারী স্মৃতিউৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলাসমিতির প্রতিনিধি, বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মহিলা কর্ম্মীবৃন্দ, এবং কলিকাতা ও মফঃস্বলের বহুসংখ্যক ভদ্রমহিলা এই সভায় যোগদান করিয়া, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে নারীজাতির প্রকৃত উন্নতিবিধান হইতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করিবেন। মফঃস্বল মহিলা-সমিতিসমূহের যে-সকল প্রতিনিধি আসিবেন, তাঁহারা যদি এই সভায় কোন প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে পত্র লিখিয়া জানাইতে হইবে। যদি প্রতিনিধিগণের মধ্যে কেহ কোন উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করিতে চান, তাহাও পূর্ব্ব হইতে জানান আবশ্যক, নচেৎ উহা সভার আলোচ্য বিষয়সমূহের তালিকাভুক্ত করিতে পারা যাইবে না। নারীমঙ্গলকামী প্রত্যেক মহিলাকে আমরা এই সভায় যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

মহিলাসমিতির কার্য্যবিবরণী

কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক উৎসবের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু আমরা এখনও অনেক মহিলাসমিতির নিকট হইতে তাঁহাদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাই নাই। মফঃস্বলের মহিলাসমিতিগুলির কার্য্যের সফলতার উপরই কেন্দ্রসমিতির সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। অতএব যাঁহারা কার্য্যবিবরণী পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রেরণ করিবার জন্য আমরা বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি।

বার্ষিক উৎসবের প্রোগ্রাম

১৩ই জানুয়ারী ৪৪ নং বেনিয়াটোলা লেনে মহিলাসমিতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির ৭ম বার্ষিক স্মৃতিসভা।

২০শে জানুয়ারী ৪৪ নং বেনিয়াটোলা লেনে ৪ ঘটিকার সময় মহিলাসম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

২২শে জানুয়ারী প্রীতিসম্মিলন, গলষ্টন পার্ক, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা।

শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণের বনভোজন

গত ১৭ই ডিসেম্বর সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী ঘোষ মহোদয়ার নেতৃত্বে স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের উদ্যান বাটিকায় ছাত্রীগণের বার্ষিক বনভোজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, স্যার হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুক্তা যমুনা দেবী, ডাঃ হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সভ্যগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ছাত্রীগণ প্রত্যূষে স্কুলের মোটর 'বাসে' দমদম গমন করিয়া সমুদয় রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সুশীলা দেবী, শ্রীমতী সুপ্রভা সেন এবং কয়েকজন ছাত্রী অতি সুনিপুণভাবে অল্প সময়ের মধ্যে রন্ধনকার্য্য শেষ করেন। ছাত্রীগণ সমস্ত দিন খোলা হাওয়ায় আমোদ-প্রমোদ করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বার্ষিক পরীক্ষার পরে উন্মুক্ত স্থানে এইরূপ স্বচ্ছন্দভাবে ছাত্রীগণের সম্মেলন কার্য্য এবং তৎসঙ্গে আমোদ-প্রমোদ তাহাদের মনে নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিয়াছে। স্কুলের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমতী প্রতিভা সেন বি-এ নিপুণা গৃহিণীর ন্যায় অতিথি-অভ্যাগত এবং ছাত্রীগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান।

মহিলাদের সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

গত তিন বৎসর হইতে বাগেরহাটের অন্তর্গত দশানী গ্রামে মহিলা ও বালিকাদের লইয়া একটি সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হইয়া আসিতেছে। গত কার্ত্তিক মাসে ৪০ জন বালিকা ও মহিলা এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। বাগেরহাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রেবতী-

নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই জন্য অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং উপযুক্ত মহিলা ও বালিকাগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবলাল দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি প্রতিবৎসর সাফল্যমণ্ডিত হইয়া আসিতেছে।

মাণিকগঞ্জে মহিলাদের বন্যার্ত্তের সেবা

গত বৎসরের আর্থিক অভাবের পরই এবারকার ভীষণ বন্যাতে মাণিকগঞ্জ মহকুমা-বাসীগণ একান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় মহিলাসমিতি ইতিমধ্যেই ১২ মণ চাউল ও ৫০৲ টাকা বিতরণ করিয়াছেন। বহু ভদ্র ঘরের মহিলা নীরবে অনাহারে কাটাইতেছেন। মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা ও সভ্যাগণ ঘরে ঘরে নিজে যাইয়া চাউল ও অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চ্যাটার্জ্জি, রায় সাহেব হতাশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায়, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষগুপ্ত ও বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় মহিলাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন। লোকের অভাবের তুলনায় এই দান অকিঞ্চিৎকর হইলেও বস্তার্ত্তের সেবায় মহিলাদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গলক্ষ্মীর সহৃদয়া পাঠিকাগণ মাণিকগঞ্জের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন এই প্রার্থনা।

সা-নগর বালিকাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা

গত ২৮শে নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যাকালে কালীঘাটে সা-নগর বালিকাবিদ্যালয়ে লেক এরিয়া মহিলাসমিতির উদ্যোগে পুরুষ ও মহিলাদিগের একটি সভার অধিবেশন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ও পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী আলোকচিত্র সাহায্যে নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিশুসাধনা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বহু মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা

গত ২৯শে নভেম্বর লেক রোড বালিকাবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে লেক এরিয়া মহিলাসমিতির উদ্যোগে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। বালীগঞ্জের বহু ভদ্র মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ. আলোকচিত্র সাহায্যে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চ্চা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

মহিলাসমিতির কাজ বিষয়ে বক্তৃতা

গত ২রা ডিসেম্বর বুধবার রাত্রে মিস্ গার্ট্রুড জেকব বি-এস্ সি আলোকচিত্র সাহায্যে ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ-তে বিশেষভাবে বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন নারীমঙ্গল সমিতির বিভিন্ন কর্ম্মধারা বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

কসবা মহিলাসমিতি

গত ১২ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণে কসবা মহিলাসমিতির উদ্যোগে একটি সভার অধিবেশন হয়। আমেরিকান মহিলা কুমারী গার্ট্রুড জেকব বি-এস্. সি "খাদ্য ও খাদ্যবিজ্ঞান" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ এই বক্তৃতার অনুবাদ করিয়া দেন।

চাকুরিয়া মহিলাসমিতি

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে গত ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যাকালে চাকুরিয়া পাব্লিক লাইব্রেরী হলে পুরুষ ও মহিলাদিগের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। কুমারী গার্ট্রুড জেকব ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন আলোকচিত্রে দেশ-বিদেশের কথা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সেণ্ট মার্গারেট্ স্কুলে নারীমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা

গত ১৩ই ডিসেম্বর সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ ও অন্ধতা-নিবারণী সমিতির কর্ম্মী মিসেস্ ম্যাকনার আলোকচিত্র সাহায্যে সেণ্ট মার্গারেট স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের এক সভায় নারীমঙ্গল এবং অন্ধতা ও তাহার প্রতিকার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস্ গ্রাহে সভানেত্রীর কার্য্য করেন।

সরিষায় বিরাট মহিলাসভা

গত ১৯শে ডিসেম্বর উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত সরিষা গ্রামে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের বালিকাবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলাদের একটি বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। প্রায় ৪০০ শত মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক স্বামী গোপানন্দ এই সভায় সভাপতির কার্য্য করেন। কুমারী গার্টুড জেকব বিদেশের কথা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথচন্দ্র সেন বি-এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী আলোকচিত্র সাহায্যে সংযোজনিনী সভা নারীমঙ্গল সমিতির বিভিন্ন কর্ম্মধারার বর্ণনা করিয়া জাতিগঠনে নারীর স্থান বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সভাপতি অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় উপস্থিত মহিলাদিগকে একটি সমিতি গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পুরুষ এবং মহিলারা এই বক্তৃতায় এত উৎসাহ প্রকাশ করেন যে উপস্থিত লোকদের অনুরোধে দ্বিতীয়বার পুরুষ বাহিরে এই সভার অধিবেশন হয়। মিস্ গার্টুড জেকব সাধারণ ব্যাপার-চর্চ্চায় কৌশল প্রদর্শন করেন এবং স্থানীয় মহিলাদিগকে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক উপহার দেন।

মেয়েদের গৃহ-শিল্প

গত ৯ই ডিসেম্বর সোমবার হাওড়া বেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউটের উদ্যোগে ইন্‌স্টিটিউটের হলে সভ্যদের একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথচন্দ্র সেন আলোকচিত্র সাহায্যে গৃহশিল্প বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

রাজবল্লভ-পাড়ায় বক্তৃতা

গত ৭ই ডিসেম্বর সোমবার রাজবল্লভ পাড়ায় শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ'র উদ্যোগে স্থানীয় লোকদের একটি সভা হয়। সংযোজনিনী সভা নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিকলণ্ঠন সহযোগে মহিলাসমিতি ও তাহার কর্ম্মধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু মহিলা ও পুরুষ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শারদোৎসবে——

হিমানী কাফেউ

আধুনিক অলঙ্করণের পাঁচটি উৎকৃষ্ট উপকরণ লাঞ্ছিত লেটিকা—সুদৃশ্য রেশমী কাপড় মোড়া—যাহাই মজবুত ও রুচিসঙ্গত মূল্য দশ টাকা যায় এ দামে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাফেউ অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বাজারের অন্য কাফেউ ইহার তুলনায় নিতান্তই সেকেলে মনে হইবে, কিনিবার আগে হিমানীর কাফেউগুলি দেখিতে অনুরোধ করি।

অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে

নিরুপমা কাফেউ

ক্ষুরুম কাফেউ

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমানীর নানা প্রসাধন দ্রব্য ও

উপহারে অতুলনীয়।

অতুলনীয়

উপহার

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি

সাহিত্যরসিকদিগের জন্য প্রতি বৎসরের অপূর্ব্ব আয়োজন। গল্প ও চিত্র সম্ভারে যাহা একান্ত অনুকরণীয়। এবারে কথাবস্তু রচনার ভার লইয়াছেন শ্রীকেশব গুপ্ত, বিজয়রত্ন মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবিনাশ ঘোষাল, শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী প্রভৃতি। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী-দিগের তুলিকায় এবারেও ছবি সমৃদ্ধ হইবে। মূল্য পূর্ব্বৎ ১৷৷০—১৫ হিমানী সুরভির মূল্যের পরিবর্ত্তে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান

এস. সি. সরকার এণ্ড সন্স

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ও

শর্ম্মা চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং

৪৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

Printed by A. C. Sirkar at the Classicas, 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

দার্জিলিংয়ের পথে

শিল্পী— লেডী মুখার্জি (স্যার আর, এন, মুখার্জির পত্নী)

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৮ [৩য় সংখ্যা

তোমার কথা *

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

সকল কাজে সকাল-সাঁঝে
তোমার কথা কহিব ;
তোমায় ভালবেসে হেসে
সকল ব্যথা সহিব।
তোমার ধ্যানে দিবস-যামী
তোমার যোগ্য হব আমি,
মনের মলিনতা তোমার
প্রেমের শিখায় দহিব ॥

অনুসরি' তোমার স্বভাব
আপন-পরের ঘুচাব ভাব,
সমাদরে মাথার 'পরে
সবার বোঝা বহিব ;
তোমার প্রিয় কর্ম্ম সাধন
করব ভেলে আমার জীবন,
তোমার আগমনীর আশায়
আসন পেতে রহিব ॥

* সরোজদর্শিনীর উদ্দেশে লিখিত।

বঙ্গে খিদ্দরী সম্প্রদায়

মোহাম্মদ এনামুল হক এম-এ

বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে, মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রোপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ নদীজলে সমাকীর্ণ ভূভাগে খিদর যেরূপ প্রবল, আর কোথায়ও তেমনটি নহে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশপরগণা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ও হিন্দুর নিকট হইতে, মুসলমানদের পর্য্যবেক্ষণ খিদর প্রচুর সম্মান ও আন্তরিক শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়গুলির অতি-আধুনিক সংস্কার-প্রচেষ্টার ফলে, উপরোক্ত স্থানগুলির কোন কোন স্থান হইতে খিদর পূজা একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছে। তবু সাধারণ লোকের আন্তরিক বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সমুদ্র ও নদীগামী অগুণতি মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ, এখনও যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে খিদরকে দেখিয়া থাকে, এবং জলসংক্রান্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে, পূর্ব্বার প্রতিও তাহারা তদ্রূপ করে না।

অগুণতি বঙ্গীয় মুসলমান এখনও উপরোক্ত অনেক স্থানে শুধু জলসংক্রান্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই "বেরা-ভাসান" নামক একটি মহোৎসব, প্রতি বাংলা বৎসরের ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে মহা ঘটাসহকারে সম্পন্ন করিয়া থাকে। হিন্দুগণও এই উৎসবে দর্শক এবং আর্থিক ও মানসিক সাহায্যদাতা রূপে যোগ দিয়া থাকে। এই "বেরা-ভাসান" উৎসবটি বেশ চমৎকার ও উপভোগ্য বটে। "অগ্রপশ্চাৎ" নৌকার আকারে ছোট করিয়া বেশ কারু ও শিল্পকার্য্য-খচিত এক একটি কাগজের নৌকা প্রস্তুত করা হয়; ইহারই নাম "বেরা"। নৌকার অগ্রভাগটিকে মযূরের গলার ন্যায় বেশ উচ্চ করিয়া, তাহার উচ্চভাগে একটি সুন্দরী রমণীর মুণ্ড ও তাহার মাথায় একটি কাগজে চিত্রিত মুকুট পরাইয়া দেওয়া হয়। পশ্চাতে খানিকটা দোলায়মান পুচ্ছও শোভা পাইতে থাকে। নৌকাটির মাস্তুল, অগ্র-পশ্চাতের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকায় এবং টাঙ্গান রশিতে নানাবর্ণের কাগজ বায়ুভরে দুলিবার জন্য ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। নৌকাটির ঠিক মাঝখানে কতটুকু স্থান খোলা রাখা হয় যেন তাহাতে একটি মৃন্ময়পাত্র দ্বিজোড়-সংখ্যক (তাহা তিন হইতে উর্দ্ধসংখ্যার হইয়া থাকে) ডাঁটাসহ পান, সুপারী, কলা, খানকয়েক মৃদু প্রস্তুত আটার রুটি ও তদুপরি সামান্য শীর্ণি এবং কয়েকটি পয়সা লইয়া স্থান পাইতে পারে। যে-সকল লোক "বেরা" ভাসায়,তাহারা হাতে দ্বিজোড় সংখ্যক মৃন্ময়প্রদীপ ঠিক জ্বালাইবার উপযুক্ত করিয়া লইয়া আসে। "বেরা" ভাসাইবার দিন, সন্ধ্যাকাল হইতে নদীতীরে কতক-গুলি 'ব্রাহ্মণ'শ্রেণীয় মুন্নাহ্ পৌরোহিত্য করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। সূর্য্যাস্তের পর হইতে "বেরা-ভাসান" উৎসব আরম্ভ হয়। এক একদল লোক, একটি বেরা, নানা অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে, কোথাও কোথাও নীরবে, নদীতীরে লইয়া আসে, এবং যে মুন্নাহ্ তাহাদের শ্রদ্ধার্জ্জন করে, তাহাকে ভাসান-ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিবার জন্য ডাকা হয়। মুন্নাহ্ নদীতীরে বসিয়া সমস্ত সরঞ্জাম সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে মন্ত্রপূত করিতে থাকে এবং ইত্যবসরে

প্রমাণ-পঞ্জী :—

The Holy Quran—Muhammad Ali.

2. Encyclopaedia of Islam—Vol. II. pp. 861-63.

3. Encyclopaedia of Religion and Ethics—Vol. VII. pp. 693-95.

4. Primitive Semitic Religion To-day (German Edition, Leipsig)—1903. S. I. Curtis.

5. Siyarul Mutakherin—Tr. Haji Mustafa.

6. History of Bengal—Charles Stewart.

Religion and Folklore of Northern India—William Crook.

8. J. A. S. B.—Vol. LXIII. Part III. No. 1. 1894.

9. District Gazetteers of Bengal.

চতুর্দ্দিকের উদ্‌গ্রীব দর্শকগণ 'হলিডে'র যাত্রাসার ন্যায় মৃৎপাত্রস্থিত দ্রব্যগুলি আত্মসাৎ করিতে উৎসুকতা প্রকাশ করিতে থাকে। বরাবর দুই তিন মিনিটের মধ্যেই পৌরোহিত্য সমাধা করিতে করিতে, মৃৎপাত্রস্থিত পয়সা ক'টা পকেটে পুরিয়া ফেলে, এবং যেই খিজরের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবার জন্য উর্দ্ধমুখ হইয়া হাত উঠায় অমনি চতুর্দ্দিকের দর্শকগণ তাহার সমস্ত দ্রব্যের উপর লাফাইয়া পড়িয়া আত্মসাৎ করিয়া লয়। তারপর মৃৎপাত্র ও "বেরা"টি বরাবরের সম্মুখে শূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে। সে অতঃপর নিজ হাতে এক একটি করিয়া প্রদীপগুলিতে আগুন দিয়া শূন্য মৃৎপাত্রটির উপর রাখিয়া, তাহাকেই "বেরা"র মধ্যস্থলের সূক্ষ্ম স্থানটিতে স্থাপনপূর্ব্বক চতুষ্পার্শ্বের লুটতরাজকারীদের কাহাকেও ডাকিয়া "বেরা"টিকে নদীতে ভাসাইয়া দিতে অনুরোধ করে। যাহাকে অনুরোধ করা হয়, সে নীরবেই বরাবরের অনুজ্ঞা পালন করে। এইরূপেই, সন্ধ্যার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অসংখ্য ভাসমান "বেরা"র প্রদীপালোকে সমস্ত নদীটি আলোকিত হইয়া উঠে। নদীর দুই ধারেই এই উৎসব দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক সমবেত হয়, এবং "বেরা"গুলি যখন আলোকমালা বক্ষে ধারণ করিয়া স্রোতোমুখে ভাসিয়া যাইতে থাকে, তখন তাহারা আনন্দধ্বনি করিতে থাকে।

অধুনা বঙ্গের "বেরা-ভাসান" উৎসব বা খিজর-প্রসাদ অনুষ্ঠান প্রধানতঃ এইরূপ ভাবেই বঙ্গের নদীতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানভেদে এবং লোকের অভিরুচি ও স্থানীয় জলসরবরাহের সুলভতা অথবা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি-হেতু যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না তেমন নহে; তবে সন্ধ্যার পর দীপালোকিত নৌকা-ভাসান ব্যাপার সর্ব্বত্রই সমান ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই যে বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে দেশ জুড়িয়া "বেরা-ভাসান" উৎসব বা খিজর-প্রসাদ অনুষ্ঠান এ যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, এস্থলে তাহার একটু ইতিহাস জানা আবশ্যক। বঙ্গীয় মুসলমানদের এই উৎসবটিকে একটি প্রাচীন উৎসব বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। তুর্কী বিজয়ের পর অর্থাৎ পাঠান যুগ হইতে দেশে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বঙ্গে পাঠান যুগের বিস্তৃত ইতিহাস নাই; সুতরাং এই উৎসবেরও প্রাচীন প্রমাণযোগ্য ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তবু, মুঘল যুগে আসিয়া, কয়েক বৎসরের মধ্যেই, এই উৎসবটি দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মনে হয়, পাঠান যুগে বঙ্গে ইস্‌লাম-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, মুসলমানী জলদেবতা খিজর এদেশে প্রবেশ করেন, এবং তিনি ধীরে ধীরে নদীজলে সর্ব্বাকীর্ণ বঙ্গের জলের অধিকার করিতে থাকেন। মুঘল যুগে আসিয়া তিনি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্গের নবদীক্ষিত মুসলমানগণ, এই ব্যাপারে স্বীয় প্রাণের সুপ্তায়িত বিশ্বাসের সন্ধান পাইয়া, ঘটাসহকারে ইহার সম্পাদনে মাতিয়া উঠে। দেশ এখন এমনই খিজর-ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, জাহাঙ্গীরের বঙ্গ-শাসনকর্ত্তা মুকর্‌রম্ খাঁ (১৬২৮-২৭) ঢাকায় স্বয়ং বাস করিয়াও তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না; এবং পরিশেষে বাধ্য হইয়াই এই লৌকিক বিশ্বাসমূলক খিজর-প্রসাদ অনুষ্ঠানটিকে স্বীকার করিলেন; এমন কি তিনি স্বয়ং ইহাতে যোগ দিলেন; তাঁহার লৌকিক বিশ্বাস স্বীকারের ফলে, ঢাকায় প্রতিবৎসর এই উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতে লাগিল (১)। হতভাগা মুঘল শাসনকর্ত্তা বাধ্য হইয়া খিজরকে স্বীকার করা সত্ত্বেও, খিজর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন না। মাত্র ছয়টি মাস রাজা শাসন করিয়া, তিনি যখন সম্রাটের কোন কর্ম্মচারী গ্রহণের জন্য, নৌকাযোগে কীর্ত্তিনাশা বাহিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, নদীর ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া খিজরের হাতেই ডুবিয়া মরিলেন (২)। মুর্শিদাবাদের শাসনকর্ত্তা মুর্শিদ্ কুলী খাঁ (১৭০৪-১৭২৫) প্রজার সন্তুষ্টির জন্য, প্রতিবৎসর সমারোহে "বেরা-ভাসান" উৎসব সম্পন্ন করিতেন (৩)। এইরূপে বঙ্গদেশের মুঘল শাসনকর্ত্তৃগণ এই উৎসবকে জাতীয় উৎসবে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহা এই সময় হইতেই দেশের সর্ব্বত্র জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইতে

(১) History of Bengal (1847)—Charles Stewart. p. 150.

(২) Ibid. p. 150.

(৩) Ibid. p. 254.

লাগিল। মুহর্রম্ হইতে আরম্ভ করিয়া বোধ হয় মুঘল শাসনকর্ত্তা ইহাকে বাধা দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই সেদিন নবাব সিরাজ্-উদ্-দৌলহ্কেও "বেরা-ভাসান" উৎসব সম্পন্ন করিতে দেখিতে পাই (১)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহা মুঘল আমলে সরকারী মঞ্জুরী (official recognition) লাভ করিবার পূর্ব্ব হইতে দেশে প্রচলিত ছিল।

বঙ্গদেশের মুসলমানেরা—তৎসূত্রে হিন্দুরাও—বিশ্বাস করে, খিজর অমর পুরুষ; তিনি ঘটনাক্রমে সঞ্জীবনীসুধা (আব্-ই-হয়বাত্) পান করিয়া অমরত্ব লাভ করায়, আল্লা তাঁহাকে জলেশ্বর পদ দান করেন। সেই হইতেই তিনি পৃথিবীর যাবতীয় নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরের উপর একাধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। জলসংক্রান্ত যত আপদ-বিপদ নাকি নর উপর পতিত হয়, তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি মানুষ হইলেও অমর-পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র উপস্থিত থাকিতে পারেন, এবং তাই পৃথিবীর জলভাগে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহার খবর রাখেন; আবশ্যকমত ভক্তজনকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার ভক্তেরা বিশ্বাস করে, চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি, যদি কেহ নদী বা সমুদ্রতীরে অবিরত অনিদ্রায় থাকিয়া কেবল খিজরকে সন্ধান করে, তবে এই নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে একদিন তাঁহার দর্শনলাভ করে। (কিন্তু দুঃখের বিষয়, রক্ত মাংসের দেহধারী মানুষের পক্ষে, এ পর্য্যন্ত ইহা সম্ভবপর হয় নাই; হয়ত তাই, এ যাবৎ কেহ তাঁহাকে জাগ্রত ও সচৈতন্য অবস্থায় দেখিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।)

এই যে জলেশ্বর খিজরে বিশ্বাস, ইহা বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে কোথা হইতে আসিল, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। আরববাসী মুসলমানও খিজর নামক কোন অনৈতিহাসিক অমর ব্যক্তিতে বিশ্বাস রাখে। গ্রীস দেশীয় একটি পৌরাণিক অমর-দেবতা কি ভাবে আরবীয় মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্যদের, বিশেষতঃ প্রাচীন কুর্‌আন্-ভাষ্যকারদের কৃপায়, কুর্‌আনের ছায়া অবলম্বন করিয়া ইস্‌লাম জগতে খিজর নামে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা বৈজ্ঞানিক মনীষা-সম্পন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশদভাবে প্রমাণ করিয়াছেন (১)। নতুবা কুর্‌আনের কোথাও খিজরের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্যেরা ধর্ম্মদ্রোহিতার ভয়ে, প্রাথমিক যুগের কুর্‌আন্-ভাষ্যকারদের খিজর আমদানীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় নাই বলিয়া মনে হয়; নতুবা হজ্‌রত মূসার সমসাময়িক "কতা" বা যুবক (২) কখনও মুসলমান-জগতে খিজর নামে চলিয়া যাইতেন কি না সন্দেহ।

সে যাহা হউক, যেরূপই হউক, খিজর নামক কোন অমর-পুরুষে বিশ্বাস স্থাপন করা, প্রাথমিক যুগের মুসলমান হইতে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মুসলমান পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। এই অমর-পুরুষে বিশ্বাস একাদশ শতাব্দীর ভারতবিজয়ী তুর্কীদের সহিত ভারতেও প্রবেশ করে। তখন কি তিনি ঠিক অমর-পুরুষ হিসাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, না জলেশ্বর হিসাবে ভারতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয়,—তাহা এখন নির্ণয় করিতে পারা কঠিন। খিজরকে আরব ও পারস্যের সর্ব্বত্র জলেশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হয় না; কেননা, 'অব্দুল্-কাদির্ গীলানী বা জীলানী (১০৭৮-১১৬৬) ও 'অবূ সুলয়্মান্ আরব সাগরের কতকাংশের অধীশ্বর; মাম সম্মদ্ নাম্নী দেবী অম্মূজ্ প্রণালীর (পারস্য ও আরব সাগরের সংযোজক জলবাহ) অধীশ্বরী (৩); 'অবূ ইস্হাক্' অল্-কর্‌কনী (মৃঃ ১০৩৪ খ্রীঃ) সিরাজের নিকটবর্ত্তী জলভাগের অধীশ্বর (৪)। ইহা হইতে দেখা যাইবে, সিরিয়ার কোথাও কোথাও খিজরকে "খব্‌বাদ্-স্-বুহ্‌র্" বা জলেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও

(১) Siyarul Mutakherin. Tr. Haji Mustafa. vol. II. p. 533.

(১) Vide Encyclopaedia of Islam. vol. II. pp. 861-863.

Encyclopaedia of Religion and Ethics. vol VII. pp. 693-695.

২। কুর্‌আন্—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, ৫০-৬৩ শ্লোক।

(৩) J. A. S. B. Vol. LXIII. Part. III. No. I. 1894. P. 39.

(৪) Ibid. P. 40.

(১ তিনি আরবের সর্ব্বত্র জলেশ্বর বলিয়া স্বীকৃত নহেন। আরববাসীদের মধ্যে কিরূপে জলদেবতার বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে, তাহা এস্থানে উল্লেখ করিয়া কাজ নাই।

সে যাহা হউক, খিজর মুসলমানদের সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তখনও তিনি আরব-সাহিত্যের সর্ব্বত্র জলেশ্বর রূপে সম্মান লাভ করুন বা না করুন, তাঁহার অমর নামের চতুর্দ্দিকে, ধীরে ধীরে জলাধিপত্যের কাহিনী একটুকুও যে জুড়িয়া বসিতেছিল না, তেমন নহে। তবে তখনও তিনি ভারতীয় রূপ বা জলদেবতার আসন গ্রহণ করেন নাই। ভারতের সর্ব্বত্র খিজর জলাধিপতি হিসাবে সম্মানলাভ করেন না। কমুমণ্ডল উপকূলে, নাবিক ও জলবিহারীরা কাদিরুবলী বা হুবু নামক কোন সাধু-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকে; কাথেবাসীরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শয়খ্ 'অলী হুয়দরুকেই জলেশ্বররূপে ভক্তি করিত (২), এবং চট্টগ্রাম ও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলে এখনও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সাধক পীর বদরুকেই মাঝিমাল্লারা জলেশ্বর বলিয়া সম্মান করে। ইহা হইতে দেখা যাইবে স্থানীয় দরবীশ্‌দের অনেকেই ভারতে জলেশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহার কারণ কি?

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ব্বরজাতি তুর্কীদের সহিত জলাধিপত্যের আবছায়া ঢাকা অমর-পুরুষ খিজর বঙ্গদেশেও প্রবেশ করিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই, ভারতীয় তুর্কীরা বঙ্গদেশকে পঙ্গপালের ন্যায় ছাইয়া ফেলিলেন। ভারতীয় তুর্কীদের চতুর্দ্দশ ও তৎবহির্ভূত মণ্ডলী-(খয়ানুয়াদহ্) গুলির যে সকল মণ্ডলী বঙ্গদেশে এই সময়ে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে 'অদ্‌হমীয়হ্ মণ্ডলীও একটি। এই মণ্ডলীর একটি শাখার নাম "খিজরীয়হ্"। ভারতীয় দরবীশ্‌দের জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায়, কতকগুলি দরবীশ্, সকল সময় খিজরের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে বা কোন দিকে যাত্রায় মনস্থ করেন। হিন্দু মুনি ঋষিদিগকে নারদ যেমন দেবলোকের সংবাদ জ্ঞাত করান, এই দরবীশ্‌দিগকেও, খিজর তেমনই অদৃশ্য জগতের ('আলম্-ই-খয়ব্) সংবাদ দেন। খিজরীয়হ্ শাখামণ্ডলীর দরবীশ্‌দের বিষয় সাক্ষাৎভাবে আমরা কিছু জানিতে না পারিলেও, মনে হয়, যে সকল সাধকের জীবনে খিজর এবম্বিধ ক্রিয়া করিয়াছে তাঁহারা খিজরীয়হ্ শাখামণ্ডলী। খিজরীয়হ্ শাখা ভারতীয় তুর্কীদের সহিত বঙ্গদেশে অত্যধিকভাবে প্রবেশ করিয়া থাকিবে, নতুবা বঙ্গে খিজরীয়হ্ মতের এত আধিপত্য হইবার কারণ নাই।

এইরূপে খিজরীয়হ্ মণ্ডলী যখন বঙ্গদেশে প্রবেশ করে, তখন আরবীয় মুসলমানদের অমর-পুরুষ খিজর জলাধিপত্যের আবছায়া ও নারবীয় ভাবে আবৃত হইয়া পড়িয়াছেন। খিজর তখন প্রকৃতই বঙ্গীয় নবদীক্ষিত মুসলমানের নিকট একরূপ পৌরাণিক দেবতায় পরিণত। সুতরাং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন নূতন গল্প ও বিশ্বাসসৃষ্টির ভিত্তি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়া গেল। অচিরেই বাঙ্গালী মুসলমান তাহাকে কাজে লাগাইয়া তুলিতে লাগিল।

এখানে বঙ্গে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। বঙ্গীয় মুসলমানদের অধিকাংশই নবদীক্ষিত মুসলমান। যে সকল কারণে খ্রীঃ ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে, বঙ্গবাসীরা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, বলা বাহুল্য যে, তন্মধ্যে তুর্কীদের প্রচেষ্টাই অন্যতম। কাজে কাজেই বঙ্গে খিজরীয়হ্ সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায়, এদেশবাসীর হৃদয়ে, খিজরের পৌরাণিক মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে আরও স্মরণ রাখা আবশ্যক, বঙ্গে প্রকৃত আর্য্যবংশসম্ভূত হিন্দুর সংখ্যাও জনসংখ্যা হিসাবে নিতান্ত বেশী নয়। বঙ্গাধিপতি আদিশূর ৯৫৪ শকাব্দে (১০৩২ খ্রীঃ) যখন কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও কতিপয় কায়স্থ আমদানী করিয়াছিলেন, তখনও বঙ্গে প্রকৃত আর্য্যজাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল; নতুবা বঙ্গদেশের বাহির হইতে, আর্য্য আমদানী করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য বাড়াইবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। বঙ্গে যে অল্পসংখ্যক আর্য্য ছিলেন, তাঁহারা এদেশীয় অসংখ্য অনার্য্যের সংস্রবে আসিয়া যাহাতে বর্ণ-

(১) Primitive Semitic Religion To-day. P. XVI. and P. III.

(২) J. A. S. B. Vol. LXIII. Part III. No. 1. 1894. P. 40.

সম্ভবতার দোষে দুষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাহা বরাল সেন "কৌলিন্য প্রথা"র সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন; নতুবা তাঁহার "কৌলিন্য প্রথা" সম্বন্ধের কোনই মূল্য থাকে না। ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সমাজ ও সভ্যতায় উন্নত এবং বিজয়ী সম্প্রদায়ভুক্ত আর্য্যেরা, এদেশে ধীরে ধীরে অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। বিজিত ও সর্ব্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ অনার্য্যগণ সংখ্যায় বহু হইলেও বিজিত জাতিসুলভ স্বাভাবিক কারণে, আর্য্য-সভ্যতা, সমাজ ও ধর্ম্মকে ঝাঁকড়িয়া ধরিয়া, কালক্রমে আর্য্যদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে থাকে। এই জন্যই, এখনও এদেশীয় হিন্দুর মধ্যে অনেকগুলি অনার্য্য আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর, এদেশে আর্য্য ও অনার্য্য মিলিয়া (তাহা ভারতের সর্ব্বত্রই ঘটিয়াছিল) বিরাট হিন্দু সমাজটি গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিলেন, তখন এই আর্য্যানার্য্য-ভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের কতকাংশ ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পরও, এদেশীয় নবদীক্ষিত মুসলমানদের হৃদয়গত বিশ্বাস সহসা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল না; কারণ, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া, অসম্ভব। ফল, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যেও, কতক আর্য্য এবং কতক অনার্য্য বিশ্বাস ও আচারও প্রবেশ করিল। ওলাবিবি জলদেবতার প্রতি বিশ্বাস একটি।

আর্য্যেরা বরুণদেব বা জলদেবতায় বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাসের সহিত অনার্য্যদের স্থানীয় জলদেবতাগুলি মিশিয়া গিয়াছিল। নদী যেমন উপনদীর জলধারা লইয়া বৃহদাকার হইয়া পড়ে, আর্য্যদের সর্ব্বজলাধিপতি বরুণদেবও, এখন অনার্য্যদের স্থানীয় জলদেবতার সংমিশ্রণে বেশ একটু বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিভিন্ন বিশ্বাস-পরিপুষ্ট বরুণ-বিশ্বাস নবদীক্ষিতদের ভিতর দিয়া, মুসলমানদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার পর, নবদীক্ষিত মুসলমানগণ, ইস্‌লামের ভিতর জলাধিপতির আবছায়া ও নামহীন ভাবাবৃত বিষয় ব্যতীত, অন্য কাহারও ভিতর দিয়া, তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাসের বহির্বিকাশ সাধন করিতে পারিল না। সুতরাং অচিরেই, বিষয় পূর্ণরূপে ভারতীয় ভাবে ভরপুর হইয়া আর্য্যানার্য্য-বিশ্বাসপরিপুষ্ট বরুণদেবতার আসন গ্রহণ করিলেন।

ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্যদের মধ্যে জলদেবতার মনস্তুষ্টি-বিধানের প্রথা, স্থানভেদে নানাভাবে এখনও প্রচলিত আছে। নদীতে নৌকা ভাসাইয়া জলদেবতার প্রসাদলাভ করিবার বিধানটিও নিতান্ত বিরল নহে। নর্ম্মদা নদীতে এখনও কালো পাল দিয়া নৌকা ভাসাইয়া জলদেবতাকে সন্তুষ্ট করা হয় (১)। লোহ্‌টানাগাদের (Lhota Nagas) মধ্যেও ক্ষুদ্র ভেলায় একটি ডিম, সামান্য কার্পাস ও একটি জীবন্ত পক্ষী বাঁধিয়া দিয়া ভেলা ভাসাইবার প্রথা প্রচলিত আছে (২)। মধ্য প্রদেশের খেরাঘাটের "বাটুরিয়া দেও"কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ধীবরগণ নৌকার মুরদ্দার বাচ্চা রাখে, এবং বিপদে পড়িলে, তাহা "বাটুরিয়া দেও"কে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয় (৩)। বাঙ্গালাদেশেও প্রাচীনকালে ভেলা ভাসাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই ভেলা ভাসাইবার প্রথাটি, পরবর্ত্তীকালে "ভাসান-যাত্রায়" পর্য্যবসিত হইয়া, বেহুলা উপাখ্যান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, নৌকার "বাচ্" সেসাপ্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, এইরূপ ভাবে ভেলা ভাসাইয়া জলদেবতার প্রসাদলাভের অনুষ্ঠানটি, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে "খেয়া-ভাসান" অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস।

উপরে আমরা যে তথ্যসংগ্রহ ও সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে, আরবদেশবাসীদের অবশ্যপূজ্য পিয়র, কি ভাবে বঙ্গদেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্যই, বঙ্গীয় মুসলমান তাঁহাকে জলাধিপতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই বিশ্বাসের মূলে, কতটুকু ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক বিশ্বাস ক্রিয়া করিয়াছে, এস্থলে তাহার একটি ধারা আবিষ্কারের চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

(১) Religion and Folklore of Northern India p. 62.
(২) Ibid.
(৩) Ibid. p. 60.

পাগ্‌লামির কথা

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

যা স্বাভাবিক এবং সাধারণ, তাতে মানুষের পরিতৃপ্তি নেই, তাতে কৌতূহল জাগে না। যে মিরীহ রাম-বাবুটি নিত্য সাড়ে দশ ঘটিকায় ছাতা মাথায় দিয়ে অফিস্ যান তাঁর প্রতি লোকে ফিরেও তাকায় না, আর যে সব তরুণের ঘরছাড়ার দল পায়ে হেঁটে দিল্লী ডিগ্রি জয় করতে বেরিয়ে গেল তাদের দিকে সারা দেশটার লোক তাকিয়ে আছে। সাধারণ হ'তে পৃথক হলেই, তা সে ভালর দিকেই হোক্ আর মন্দের দিকেই হোক্, আমরা বলি মাথা-পাগল। পাগ্‌লামির মধ্যে আবার বিভিন্ন পর্য্যায় আছে, কোনোটা হ'ল বাহ্যিক, কোনোটা হ'ল ছিট, এই রকম কত-কি। এর চরম অবস্থা হ'চ্ছে উন্মত্ততা। যাকে আমরা উন্মাদ-পাগল বলি তার মধ্যেও অনেক সময় পাগ্‌লামির শুধু যে এই চরম অবস্থাটা দেখতে পাই তা নয়, পাগলামির সকল অবস্থাগুলাই তার মধ্যে কম-বেশী পরিমাণে আছে উপলব্ধি করা যায়। এ রকম পাগলের একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একবার রাঁচীর কাছে কোন একটা ছোট্ট ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিতে বাধ্য হই বৃষ্টির জন্যে। সেখায় দেখি এক ভদ্রলোক আরাম-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে অবিশ্রান্ত নিবিষ্টমনে চেয়ারের হাতলে আঙুল ঠুকে যাচ্ছেন, যেন টাইপ করছেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—"কি মশায়, গ্রীষ্মের দিনে বৃষ্টি কেমন লাগ্‌ছে?" ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হবার ভয়টা তখন এত আসন্ন যে বৃষ্টিটা আমার ভাল লাগ্‌বার কথা নয়, তবুও ভদ্রতা ক'রে বল্লাম, "বেশ লাগ্‌ছে।" ভদ্রলোক খুসী হ'য়ে বল্লেন, "শুনে সুখী হলাম, কারণ আমার হুকুমেই বৃষ্টি হ'চ্ছে কি-না।" আমি আর কি করব, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছি দেখে ভদ্রলোক হেসে বল্লেন, "ওঃ, আপনি জানেন না বুঝি আমি কে, আর কি করছি? আরে মশাই, আমার কি আর এখন এক মুহূর্ত্তেরও ফুরসৎ আছে? আমি আঙুল ঠুকে ঠুকে সুইচ্ টিপ্‌ছি আর ওদিকে কাশ্মের ব্যাট্‌লফিল্ডে মেশিন গান কামার গ'র্জে যাচ্ছে। কান পেতে থাকুন, আওয়াজ শুনতে পাবেন। আমি চলাম সময় মত বিজয়ী, জার্ম্মেনীর সেই একমেবাদ্বিতীয়ং—কমাণ্ডার ভন্ হিণ্ডেনবার্গ।" শুনেই আমি ত আঁতকে উঠি! তাড়াতাড়ি 'কাকে'র অতিসন্নিহিত এই ডাকবাংলোটায় উঠে সুবুদ্ধির কাজ করিনি; তখনই হিণ্ডেনবার্গ মশায়কে মিলিটারি কায়দায় সেলাম ক'রে চোঁ চোঁ দৌড় দিলাম আবার সেই বৃষ্টির মধ্যে।

পাগ্‌লামির কথা নিয়ে অনেক পণ্ডিত অনেক গবেষণা করেছেন। সে সব বহুচিন্তায় সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার এক-দিকে যেমন বিস্ময়কর অন্যদিকে তেমনি তা মনোবিজ্ঞানের একটা অপরিহার্য্য অংশ। মোটামুটি পাগ্‌লামি বস্তুটাকে আমরা দুটো পর্য্যায়ে ফেলতে পারি, এক যেটা সুস্থ অবস্থায়, আর দ্বিতীয় যেটাকে আমরা বলি মানসিক ব্যাধি। মনের বিশৃঙ্খলতা একটু একটু ক'রে বেড়ে গেলে মনের ব্যাধির সৃজন করে এটা জানা কথা। কিন্তু পাগ্‌লামির মধ্যে কোন্ অবস্থাটাকে মানসিক ব্যাধি বলব আর কোন্‌টাকে বলব না এর একটা সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। এই দুই অবস্থার মাঝে একটা সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানা সহজ নয়।

আমরা ভাবি বুঝি মাথাপাগ্‌লা লোক মাত্রেরই মাথা খারাপ, অর্থাৎ যাকে বলি 'মগজ', সেটার গঠনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে। কিন্তু আসলে সকল সময় তা নয়। অনেক স্থলেই অবশ্য মৃত পাগলের মগজ পরীক্ষার ফলে রক্তাধিক্য বা অন্য কোনও রকম দোষ দেখা গেছে যাতে ক'রে তার চিন্তাশক্তি ব্যাহত হ'য়ে ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ মাথাপাগল হলেই যে তার মগজের দোষ থাকবে এমন কোনো কথা নেই। তার কারণ হ'ল পাগ্‌লামিটা যে সকল সময় চিন্তাশক্তির প্রভাবে হয় তা নয়, কখনো

কখনো চিন্তাশক্তির অ-সমন্বয়ে বা অ-সামঞ্জস্যেও হ'তে পারে। এই কথাটা বুঝ্‌তে হবে।

মানুষের মন হ'ল বৈচিত্র্যময়,—সেটা চিন্তার নাটশালা। একটা মানুষের মনেরই নানা বিভিন্ন রূপ আছে, একটা জীবনই বহু জীবনের সমন্বয়। মানুষের নিত্যকার আবেষ্টনের উপরই তার চিন্তার ধারা অনেকটা নির্ভর করে। কখনো বা মানুষ দুঃখে ম্রিয়মান হ'য়ে আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ সবই হারিয়ে ফেলে, আবার কখনো সেই মানুষই সাফল্যের আনন্দে পৃথিবীর কোনো বাধা কোনো বিপত্তিকেই গ্রাহ্য করে না। তেমনি আবার একই সময়ে এই মানুষের মন বিভিন্ন চিন্তার পথ বেয়ে বিভিন্ন ধারায় নেমে যায়। দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই এটা বোঝা যাবে। ধরুন ভণ্ডতপস্বী। তার মনের এক ধারা তার জিহ্বাকে বলছে, "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং", আর মনের অপর একটা ধারা ঐ সময়েই তাকে ভাবাচ্ছে চলন্ত পথিকের পকেটটা কি ক'রে কাটা যায়। আবার ধরুন মৌখিক শিষ্টাচার। পাওনাদার বাড়ীতে এলে তাকে শিষ্টাচার ক'রে বলি—"আসুন, ভাল আছেন ত?" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মন বলে, 'আপদ এসে জুট্‌ল।'

সুস্থ মনের এই বিভিন্ন চিন্তার ধারাগুলি অনিয়ন্ত্রিত নয়, অর্থাৎ এদের মধ্যে বেশ একটা সংযম আছে যার প্রভাবে কোনো চিন্তাটা হ'ল ব্যক্ত, আর কোনোটা রইল অব্যক্ত। উপরের ভণ্ডতপস্বীর উদাহরণে চলন্ত পথিকের পকেট কাটার চিন্তাটা তার অব্যক্ত রয়েছে। যদি সে সেটা কথায় ব্যক্ত করত তা'হলে তাকে ভণ্ডতপস্বী না ব'লে বল্‌তাম পাগল, কেন না স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওরকম বলে না। এই মানসিক সংযমের অভাব ঘট্‌লেই মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হ'ল।

সুস্থ মনকে একটা নদীর সাথে তুলনা করলে এ কথাটা আরও পরিষ্কার হয়। নদীতে নিয়ত তরঙ্গ উঠ্‌ছে, নানা ভঙ্গীতে, নানা বিচিত্ররূপে। মানুষের মনেও তেমনি নিয়ত চিন্তার তরঙ্গ উঠ্‌ছে, তার কারো সাথে কারো যোগ আছে, কোনোগুলা বা স্বতন্ত্র। কিন্তু নদীতরঙ্গের কম্পন যতই কেন বিভিন্নমুখ হোক্ না, নদীর স্রোত সেই তরঙ্গগুলাকে একমুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোতের কাজ হ'ল এই সব তরঙ্গগুলাকে নিয়ে নদীকে একমুখে বহান'। এই স্রোতের গতিই করছে তার তরঙ্গগুলিকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত। তেমনি সুস্থ মনের সংযম তার বিভিন্ন চিন্তা-তরঙ্গগুলিকে একাগ্র করছে, নিয়ন্ত্রিত করছে।

অসুস্থ মন হ'ল বর্ষার প্লাবনের মত। বর্ষার প্লাবনে জলের অগণিত ধারা অগণিত দিকে ছুটে চলে,—তাদের মধ্যে কোনও একানুবর্ত্তিতা নেই, সামঞ্জস্য নেই। অসুস্থ মনেও চিন্তার ধারাগুলি স্ব-স্ব-প্রধান, তাদের নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি মন হারিয়ে ফেলেছে, তাই অসুস্থ মনকে বিভিন্ন চিন্তা একই সময়ে প্রবলবেগে তোলপাড় করছে।

এই রকম বিভিন্ন ভাব যখন ক্ষণে ক্ষণে মানুষকে পেয়ে বসে তখন ক্ষণে ক্ষণে তার ব্যক্তিত্বও বদ্‌লে যায়। কখনো সে রাজার মত হুকুম করে আবার কখনো ভিখারীর মত ভিক্ষা করে। এই কথাটা মনে রাখ্‌লে আমরা যাকে বলি 'ভূতে পাওয়া' সেটার প্রকৃত কারণ বুঝ্‌তে কষ্ট হয় না। লোককে 'ভূতগ্রস্ত' তখনই বলি যখন তার ব্যবহার দেখে সন্দেহ হয় যে সে তার নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে অন্য এক জ্ঞাত বা অজ্ঞাত লোকের মত ব্যবহার করছে। মনের ব্যাধির জন্যে নিজের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব হারিয়ে রোগী যখন আপনার মধ্যে অপরের ব্যক্তিত্ব আরোপ করে তখন তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটে। এই রকম অবস্থায় কোনো কোনো রোগীকে ছয় মাস বা দীর্ঘ এক বৎসর কালও থাকতে দেখা গিয়েছে। তারপর হঠাৎ সে যেন জেগে ওঠে, এবং তার নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পায়।

এই যে বিশ্লেষণের কথা বল্‌লাম এটা হ'ল বিশেষ ক'রে ফরাসী পণ্ডিতদের মত্। তাঁদের মধ্যে Professor Janet হলেন অগ্রণী। এ বিশ্লেষণের মূল কথা হ'ল মানসিক ব্যাধিগুলা বুদ্ধিবৃত্তির কোনোরকম গণ্ডগোলের ফল। কিন্তু ভিয়েনার পণ্ডিত ফ্রয়েড (Freud)—যাঁর নাম আজকাল খুবই সুপরিচিত,—তিনি বলেন শুধু বুদ্ধিবৃত্তির গণ্ডগোলের দরুণই যে মানসিক ব্যাধির, বিশেষ ক'রে হিষ্টিরিয়ার উদ্ভব, তা নয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও কামনা, এবং সেগুলার নিষ্পেষণ (repression) হতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি হ'য়ে থাকে। ফ্রয়েডের বিশ্লেষণের মূল কথা হ'চ্ছে, আমাদের মনের অসংখ্য কামনাগুলা মনের

মধ্যে ছটফটানি পাকিয়ে কখনো কখনো পরস্পরের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ায় এবং তারই ফলে মনের মধ্যে নৈতিক দ্বন্দ্ব জেগে উঠে হয়। মানুষ মাত্রেরই মনে সময়ে সময়ে কত রকম প্রলোভন আসে। এটাতে দোষের কিছু নেই, কেন না এটাই হ'ল স্বাভাবিক। সুস্থ সবল মনে যখন এ রকম একটা প্রলোভন আসে, মন বুঝতে পারে যে এটা হচ্ছে যাকে আমরা চলিত কথায় 'কুমতি' বলি তারই প্ররোচনা। তখন সেই প্রলোভনটাকে লুকিয়ে না ফেলে সুস্থ মনের সুবুদ্ধির সুমতি ও কুমতিতে লড়াই বাধে এবং মনের নৈতিক ভিত্তি যদি দৃঢ় থাকে তা'হলে কুমতির পরাভব ঘটে। তখনকার মত প্রলোভনটা দূরে স'রে যায়। এখানেই যে প্রলোভনটার সম্পূর্ণ পরাভব ঘটল তা নয়। সুমতি ও কুমতিতে এই নিয়ে আরও অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়, তারপর ধীরে ধীরে প্রলোভনটা চেতনার সীমানা হ'তে অপসারিত হয়। এই হ'ল সুস্থ সবল মনের লক্ষণ। কিন্তু মন যেখানে আচার, নিষ্ঠা, অথবা অত্যুগ্র সত্যতার চোখ-রাঙানীতে পঙ্গু, সেখানে প্রলোভনের লীলা হয় অন্যরূপ। এই রকম মনে প্রলোভন এলে সুমতি প্রথম মাত্রেই চাইবে না যে তার অমন নির্মল নিষ্পাপ চিত্তক্ষেত্রে অমন একটা কুৎসিত প্রলোভনের জন্মলাভ একেবারেই সম্ভব। খোলাখুলি ভাবে সেটাকে সমুখযুদ্ধে আহ্বান না ক'রে, সুমতি লজ্জায় ম্রিয়মান হ'য়ে সেই প্রলোভনটার গলা টিপে মারতে চাইবে, যেন প্রলোভনটাকে আপনার কাছ হ'তে লুকিয়ে ফেলতে পারলেই সে বেঁচে যায়। পূর্বেই বলেছি চিন্তা হ'চ্ছে তরঙ্গের মত। তরঙ্গের মাথায় যদি লাঠির আঘাত করা যায় তা'হলে তরঙ্গ সমতল হ'য়ে যায় না, আর এক জায়গায় আবার মাথা তুলে জেগে উঠবেই উঠবে। তরঙ্গকে বিরত করতে হ'লে উল্টা তরঙ্গের সৃজন করতে হয়। যেমন দুই উল্টা আলোকের তরঙ্গ মিলে হয় অন্ধকার, দুই উল্টা শব্দের তরঙ্গ মিলে হয় নিস্তব্ধতা। এ ক্ষেত্রে প্রলোভনের চিন্তা-তরঙ্গের মাথাটা দাবিয়ে দিলে সেটা তখনকার মত সেখানে নেমে গেল বটে কিন্তু হঠাৎ আর এক সময়ে আবার মাথা তুলে চেতনার দ্বারে উঁকি দেবে। কিন্তু অত্যুগ্র সত্য কিম্বা অত্যুগ্র আচারনিষ্ঠ মন ক্রমাগতই প্রলোভনটাকে দুহাত দিয়ে ঠেলে চেতনারাজ্যের বাইরে সরিয়ে দিতে চাইবে।—অর্থাৎ মনের পাহারাওয়ালার সামান্য একটু অসাবধানতা দেখতে পেলেই প্রলোভনটা মাথা তুলতে চেষ্টা করবে। হয়ত বা স্বপ্নে, হয়ত বা দিবাস্বপ্নে মনকে অধিকার ক'রে বসবে। প্রলোভনটা তখন যে ঠিক নিজ মূর্তিতেই এসে উপস্থিত হবে তারও কোনও মানে নেই। হয়ত বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনও একটা ঘটনার রূপ ধ'রে, হয়ত বা কোনও একটা রূপক বা প্রতীকের বেশে এসে মনে উদয় হ'তে পারে। ক্রমাগত এই রকম ক'রে মানসিক দ্বন্দ্ব ও অবসাদের ফলে শেষে মানসিক ব্যাধি দাঁড়িয়ে যেতে পারে, এবং বিশেষ ক'রে নারীর বেলা রোগিণী হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হ'য়ে পড়তে পারেন।

এ কথাটা বিশেষ ক'রে স্মরণ রাখতে হবে যে ফ্রয়েডের এই থিওরি আজও সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ব'লে গৃহীত হয় নি, তার কারণ এই যে এ সমস্ত ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণের ভিত্তিটা নিছক কল্পনা ছাড়া ত অন্য কিছু নয়। অবশ্য ফ্রয়েডের চেলারা খুব জোর গলায় বলবেন এ থিওরি হ'ল অভ্রান্ত সত্য, কারণ এ কথা ত মানতেই হবে যে থিওরি মাত্রেই হ'ল কম-বেশী কল্পনার উপর ভিত্তি ক'রে, তবে থিওরির সত্যতা প্রমাণ হয় তার প্রয়োগে। অনেক ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মতে চিকিৎসা ক'রে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে, এমন কি হিষ্টিরিয়া একবারে সেরে গেছে। এটি হ'ল থিওরির সত্যতার একটি প্রধান প্রমাণ।

ফ্রয়েড এবং তাঁর শিষ্যেরা—'নিরুদ্ধ বাসনা'কে ভিত্তি ক'রে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন; তাঁদের মতে অস্বাভাবিক লৌল্য, অসামান্য কাব্য-প্রতিভা প্রভৃতি সমস্তই হ'ল কোনো না কোনো নিরুদ্ধ বাসনার রূপান্তর বিকাশ। অনেকের মতে এ হ'চ্ছে পাণ্ডিত্যের সেই একটা অতি-সাধারণ দুর্বলতা,—যা একটা থিওরি খাড়া ক'রে নিয়ে সকল বিষয়ের উপরই সেই থিওরি খাটাতে যায়। এ বিষয় নিয়ে এখনও অনেক তর্কাতর্কি চলছে। সুতরাং এ মতটাকে চরম মত ব'লে গ্রাহ্য না করাই হ'ল যুক্তিযুক্ত।

মানসিক রোগের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে যে দুটা মতবাদের উল্লেখ করেছি তাদের দুয়েরই মূল কথা হ'ল মানসিক ব্যাধি জিনিষটা মনচেতন মনের অস্বাভাবিক আলোড়নের

ফল। মানুষের এই মনশ্চেতন মন সম্বন্ধে এত অনেক কথা বলা যায় যার স্থান সংকুলান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব।

মানুষের মনের যে অংশ আধা-ঘুমন্ত আধা-জাগ্রত, যার দিশা আমরা সব সময়ে টের পাই না, শুধু কখনও বা স্বপ্নে কখনও বা রোগে যার স্ফুরণ হ'তে দেখি,—সেই কুহেলিকা-ময় মনোরাজ্যে যে সব অবর্ণনীয় রহস্য নিহিত আছে আজও তার বার্তা সম্পূর্ণরূপে মানুষের হস্তগত হয় নি। এ সেই রূপকথার জ্যোৎস্না ছা ওয়া মায়াপুরীর রাজপ্রাসাদের মত, বাইরে যার বিনিদ্র প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে ক'রে কালো পর্দা ফেলে ব'সে আছে, ভিতরে যার সোনার গাছে হীরের ফুল ফোটে; যার সন্ধান আজও মানুষ ভাল ক'রে পায় নি, শুধু যখন নিশীথরাতে মনের প্রহরীর ঘুমে ঢোলা চোখ একটু একটু বুজে আসে, সেই অন্দর-মহলের কালো পর্দা একটু একটু স'রে যায়,—ভিতরকার মায়ারাজ্য আভাসে যার দেখা যায় তখন।

মানবমনের এই যে কুহেলিকাময় অংশ এ শুধু যে আমাদের স্বপ্নে বা রোগেই আত্মপ্রকাশ করে তা নয়,—এর প্রভাব সুস্থ জাগ্রত মনেও রয়েছে। একথা বল্লে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে জাগ্রত মনের সীমানার পারে যে অর্দ্ধচেতন মনের রাজ্য আছে হ'ল তার বিস্তার বহুগুণ। জাগ্রত মনের চারিদিকে গণ্ডী দেওয়া সম্ভবপর, কিন্তু অর্দ্ধচেতন মনের রাজ্যের সীমা-পরিসীমা নেই।

স্বপ্নাদ্য মানুলি অথবা যোগবলে লব্ধ কয়েকের উপর বিশ্বাস না করলেও অনেকে হয়ত একথা জানেন যে কোনও কোনও কবি তাঁদের কবিতার প্রেরণা পেয়েছেন স্বপ্নের ঘোরে। তন্দ্রার ঘোরে কোনও কবি এমন কবিতা লিখে গেছেন যা তাঁকে অমর ক'রে রেখেছে। অনেক দার্শনিক তাঁদের জটিল দর্শন শাস্ত্রের সমস্যার মীমাংসা পেয়েছেন নিদ্রার তন্দ্রাচ্ছায়ায়। এই সব ক্ষেত্রে তাঁদের সচেতন মন যখন মীমাংসার চিন্তায় কাতর হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অর্দ্ধচেতন মন তখন তাঁদের সাহায্যে ছুটে এসেছে স্বপ্নের ত্রিমিতালোকে, নিজ রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত ক'রে।

কিন্তু এইখানে প্রশ্ন ওঠে, সচেতন মন যে সমস্যাটার সমাধান করতে পারল না, অচেতন মনের এমন কি ক্ষমতা হ'ল যে সে তা পারল? যে কাব্যপ্রতিভা সচেতন মন সৃজন করতে পারল না, অচেতন মন তা পারল কিসের জোরে? যে দিব্যদৃষ্টি মানুষ অনেক সাধনাতেও পায় না, তা আমাদের মতই সাধারণ একজন হঠাৎ একদিন ধ্যানযোগে পেয়ে গেল কোন্ উপায়ে? এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সোজা নয়। আজও মানুষের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ।

সমস্ত মানবজাতির এ একটা প্রাচীনতম বিশ্বাস যে বাহেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও মনের সাথে মনের সংযোগ-সাধন হ'য়ে থাকে। এটা বিশ্বাস মাত্র; এর স্বপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কি না জান্‌বার জন্যে Psychical Research Society আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধ'রে পরীক্ষা করছেন। ব্যাপারটা গুরুতর না হ'লে ওঁরা যে সমস্ত প্রমাণ পেয়েছেন তারই উপর নির্ভর ক'রে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারত যে telepathy জিনিষটা সম্ভবপর। কথাটা এখনো পাকা-পাকি ঠিক হয়নি, তাই এটাকে চরম সত্য ব'লে না ধ'রে শুধু জেনে নেওয়া যাক্।

Telepathy জেনে নিলে একের প্রেরণা, একের জ্ঞান অন্যের মনে সঞ্চারিত হওয়াটা কিছুই বিচিত্র ব'লে মনে হয় না। তবে সোজা ভাষায় আমার, যদি একের মধ্যে এমন অমানুষিক প্রতিভার বিকাশ দেখি যা বর্ত্তমান জগতে আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে নেই। তাহ'লে একথাও জেনে নিতে হবে যে telepathy জিনিষটা শুধু যে জীবন্ত মনের সাথে জীবন্ত মনেরই ঘ'টে থাকে তা নয়, মৃত্যুর ধ্বনিকাও এক মন ও আর এক মনের মধ্যে অন্তরাল রচনা ক'রে দাঁড়াতে পারে না; অর্থাৎ মন হ'ল অবিনশ্বর। মৃত্যুর ব্যবধানে মনের ব্যবধান ঘটন করে না। এই মনকেই যোগ-গুরু ভারতীয় দর্শন বলেছেন আত্মা।

সত্য মানুষের এটিও হ'ল এক প্রাচীনতম বিশ্বাস। শুধু আমরা নই, সকল সভ্য মানুষই অন্তরের সাথে বিশ্বাস করে,—শুধু আজ নয়, বহু শতাব্দী ধ'রে,—যে, এ জীবনে যে তার একমাত্র প্রিয় ছিল, একমাত্র কামনার ধন ছিল, মৃত্যুর গণ্ডী পার হ'য়ে গেলেও সে হারায় না; মৃত্যুর পরপার হতেও সে প্রেরণা পাঠায়, উদ্বাবনা দেয়। সে-ই দেয় সাধনায় উৎসাহ, সে-ই দেয় সিদ্ধির পথ। মনোবিজ্ঞানও আজ আমাদের সেই সত্যের আভাস দিল; আমরা যাকে

আমাদের আদিম বিশ্বাস ব'লে জানতাম, আজ মনে হয় তা বুঝি শুধু বিশ্বাস নয়, সত্যও বটে।

যুগে যুগে নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এ হ'ল হিন্দুর চিরন্তন বিশ্বাস। তিনিই বুদ্ধ, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই খৃষ্ট, তিনিই মহম্মদ,—এই যে বিশ্বাস উদারনৈতিকদের ছিল, আজ মনে হয় এ বিশ্বাস সত্যমূলক ;—যুগের ব্যবধান না মেনে একই বিরাট মানসিক সত্তা একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মূর্তিতে নেমে এসেছে।

সকল ধর্মের চরম অভিজ্ঞতাই হ'চ্ছে কোনও এক ক্ষুদ্রতর সত্তার অপর এক বৃহত্তর সত্তার মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া, যেমন বৌদ্ধের নির্বাণ, হিন্দুর মোক্ষ, ক্রিশ্চিয়ানের salvation ; এই অভিজ্ঞতা যখন সকল ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ সাধকরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন তখন একে অবজ্ঞার হাসি হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত মূর্খতা আর নেই। এক মানবীর মন আর এক মানবীর মনে যেমন সংক্রমিত হ'তে পারে,—কালের ব্যবধান, ভূগোল যবনিকা মানে না,—তেমনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে কোনো কোনো মানবীর মনও এক বিরাট মনের সাথে এক হ'য়ে যেতে পারে, যে অবস্থার নাম নির্বাণ বা মোক্ষ বা salvation। এই যে বিরাট মন,—যে মন সীমা-পরিসীমার বাইরে, যে মনের সাথে এক হ'য়ে গেছেন সকল যুগের, সকল ধর্মের মহাসাধকরা,—সে মন ভগবান।

এইখানে ইউরোপের মনোবিজ্ঞান আর ভারতের দর্শনোপনিষদে মিলন ঘটল।

যেমন সমস্ত নদী-নির্ঝর-ঝরণার সেই একই মহাসাগরের অংশ, যেমন সমস্ত অগ্নি-আলোক-বিদ্যুৎ সেই একই বিরাট সূর্যের অংশ, তেমনি সমস্ত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মনও সেই একই বিপুল ঐশ্বরিক মনের অংশ। তার চতুষ্পার্শ্বের আবেষ্টন, তার স্থান ও কালের সমন্বয়, তার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার আবরণ মনকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তাকে বিভিন্ন মূর্তি দান করেছে ;—যেমন শৈবাল, পদ্মবন এবং তটভূমির সমন্বয়ে জল হয় সরোবর, আবার শুভ্রফেণাঙ্কুর ক্ষিপ্রগতিতায় কলরবময় আবেষ্টনে সেই জলই হয় নির্ঝরিণী। বিভিন্ন মনের ধারাকে পৃথক ক'রে রাখে তার চারিদিকের নিগড়, তার স্থান-কাল-পাত্রের নিগড়।

বর্ষার পরিপূর্ণ প্লাবনে যখন দেখি আমাদের গ্রামের সেই চিরপরিচিত পুষ্করিণী তার তটের বাধা অতিক্রম ক'রে বর্ষণ-স্ফীত নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মহাসাগরের দিকে ছুটে যায়, তখন মনে পড়ে যাকে আমরা এতদিন পল্লীজননীর স্নেহ-কোমল পল্লীবধূটির মতই ভাবতাম, সে এক বিপুল মহা-সাগরের অংশ ;—যে বাধা এতদিন তাকে পৃথক ক'রে রেখেছিল আজ তা চূর্ণ হ'ল, আজ সে মহাসাগরের সাথে এক হ'য়ে গেল। তেমনি যখন স্তম্ভিত হ'য়ে দেখি অতি-সাধারণ এক মানবমনে এমন অসামান্য শক্তির বিকাশ হয়েছে যার কাছে পূর্ব ও পশ্চিম মাথা নত ক'রে দাঁড়াল, যখন শুনি বিনা প্রচেষ্টায় এক গ্রাম্য মূর্খের রসনায় মহা-সরস্বতীর আবির্ভাব হয়েছিল, যখন অনুভব করি ধ্যানমগ্ন এক সাধকের বুকে ভগবৎ-সঙ্গমের অপূর্ব রশ্মিচ্ছটা,—তখনই বুঝি মনে হয়, ঐ বর্ষণপ্লাবিত পুষ্করিণীর মত সেই সব বাধন শ্লথ হ'য়ে গেল যা ক্ষুদ্রকে বিরাট থেকে পৃথক ক'রে রেখেছিল।

মনোরাজ্য আজও আমাদের কাছে অজানা জগৎ। কত সহস্র বৎসর ধ'রে মানুষ এ রাজ্যের বার্তা জানতে চেয়েছে, কিন্তু আজও কৃতকার্য হয়নি। সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—'কঃ, কুতঃ, কুত্র ?'—কে আমি, কোথা হ'তে এলাম, কোথায় যাব ?—এ প্রশ্নের আজও মীমাংসা মেলেনি। যা কিছু পেয়েছি তা অস্পষ্ট আভাসে—'কিছু বা পাই অনুমানে, কিছু তাহার বুঝি না বা।'

সৎমা

রাণী শ্রী সুরুচিবালা চৌধুরাণী

সোনাগাঁয়ের বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ অক্ষয় বাবুর বেশ জমিজমা, অবস্থা ভাল, এবং একটি কি চাকরীও তিনি করেন। তাঁহারই ষোল বছরের মেয়ে সুজাতা, সারাদিন পাড়ার পাঁচার ঘুরিয়া বেড়ায়, এক-আধটু ঘরের কাজকর্ম করে, আর কৌতূকভরে চাহিয়া দেখে মায়ের দিকে। নিজের মা নয়—মা সৎ।

লোকে বলিত, মা রামায়ণ মহাভারতের সমস্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, নিজ নামের খ্যাতি পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া নিজে চলে ও সেই ভাবে চালায় সৎমেয়ে সুজাতাকেও। তিন বছরের মেয়ে মরিয়া পড়িয়া গেল কেন? আর ও বিধি মেয়েটি রাতদিন বসিয়া আছে! কেনো, একটু দেখিতে পারে না? ওমা! বেড়ালে দুধটা খাইয়া গেল, সুজিটা কি চোখের মাথা খাইয়াছে? নাঃ, এমন হাড়জ্বালানে মেয়েটাকে লইয়া আর পারা যায় না। কাপড়গুলা মাটিতে পড়িয়া আছে, আজ বাঁদুনীর অসুখ করিয়াছে, কাল কি আসিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি, সব দোষ সুজির। সুজাতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া এক একদিন বলে, "মা যেমন রাতদিন সুজি সুজি কর, আমার নামটা না হয় বদলে একটি ঠাকুর-দেবতার নাম দিয়ে দাও।" মা রাগ করিয়া বলে, "পোড়ার-মুখি আমার আমার হাড় জ্বালাতে এসেছিস্ কেনো বল্ তো?" সুজাতা বলে, "আমি এসেছি বুঝি?"

আরো হাসিয়া মা বলে, "তাই নাকি রে সুজি, আমায় ঠেস দিয়ে কথা বলা হচ্ছে, আমি আসিনি, উল্টে তুমিই এসেছ। বেশ তো, থাক্ না তুই, আমি আজকেই চ'লে যাচ্ছি, পোড়া-কপাল আমার কেনো যে মরতে এলুম!" সুজাতা আরো হাসে, বলে, "তা যাবে যাও মণিকে নেবো না কিন্তু, দুই বোনে আমরা সংসার দেখ বো না রে মণু?" মা রাগে কাঁদা কাঁদো হইয়া বলে—"বল্‌বি, তো বল্‌বি; এসে দেখেছিলুম এইটুকুখানি মেয়ে, কোলে ক'রে মানুষ করলুম! সৎমেয়ে বইতো নয়, তা আমার দুধু বুঝবে কেনো!—"

সুজাতা অন্যদিকে মণিকে লইয়া চলিয়া যায়, একটু পরে আসিয়া আবার বলে—"মা, আজ আর নাইবে না? বেলা যে একটা বাজে! রাগ করেছ—ও মা!" মা কেরকে কোলের কাছে টানিয়া লয়, হাসে, "ওরে, মায়ে না রাগ করবে কেনো?"

পাড়া প্রতিবেশী কিন্তু সকলে বলে, মা নয়তো খাওয়াবি, রাতদিন সৎমেয়েটাকে কি গালিগালাজ, কি খোঁটা দেওয়া, ও মা, ছি ছি!

যদিও বিরজাসুন্দরী মাতৃত্বের দাবী করিয়া প্রায় বলে, সে সুজাতাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, মূলে কিন্তু তা নয়। যখন বিরজা নূতন বউ হইয়া এই বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিল তখন তাহার বয়স ছিল ষোল আর সুজাতার ন'। তখন হইতে বিরজা তাহার এই সৎমেয়েটিকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিল। সে এই নির্জ্জন পুরীতে এই ছোট্ট মেয়েটিকে একান্ত তাহারই সঙ্গিনী করিয়া লইল এবং ক্রমে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিল প্রাণের সহিত। সুজাতাও প্রথম হইতে শুনিয়া শুনিয়া প্রথমটা সৎমাকে আতঙ্ক-জনক একটা কিছু ভাবিলেও কিন্তু পরে দেখিল সেরূপ ভয় পাইবার এমন কিছুই সে নয়, তাই ক্রমে সেও একান্ত নির্ভরতায় মায়ের কাছে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বিরজা তাবিল সৎমা হইলেই কি সুরুচি বা কৈকেয়ী হইতে হইবে? কৈ তাহার মনে হিংসা হয় না তো! ছোট্ট এই-টুকু রুচি মেয়ে, সে তাহাকে তাহার কোন্ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে? কোন্ অপকারপ্রয়াসী হইয়া সে কি শত্রুতা সাধিবে? কেনো মিছামিছি লোকে এমন পবিত্র নামের অন্তরালে বিষময় একটা সম্বন্ধ পাতিয়া রাখিয়াছে?

সুজাতাকে সে খানিকক্ষণ না দেখিলে কেমন

অস্থির হইয়া উঠে, তার পরেই রাগ হয়। সে ভাবে মেয়েটাকে কিছুতেই কাছে রাখা যায় না। কোথায় কোথায় যৌতাইয়া বেড়ায়। কোথায় কুল-কয়লা খাইয়া মুখ বাধাইয়া মরিবে, একেই সংসারের কত বদনাম, শেষে কি তাহাকেও সেই কলঙ্ক গায়ে মাখিতে হইবে? তা ছাড়া মেয়েটি কাছে না থাকিলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, কোন কাজেই মন বসে না। সেই জন্যই সে না একটু পর-পরই ডাকিয়া উঠে—"ওরে হতচ্ছাড়ী সুষ্মি! না! লক্ষীছাড়ী মেয়েটাকে নিয়ে হাড় ভাজা ভাজা হ'য়ে গেল,আর পারি না! খেয়ে খেয়ে হাতী হ'চ্ছে আর কুটোটুকু নাড়তে পারে না।" সুজাতা হাসিয়া মায়ের পিঠে ছোট একটি কীল বসাইয়া বলে—"একটু না দেখলে চেঁচিয়ে ঘর, কেলো মা? তোমার যন্ত্রণায় একটু সইয়ের বাড়ী যেতে পাবো না?" মা অভিমান করিয়া বলে—"যা না, বেড়িয়েই দিন কেটে থাক্ তোর, আর আমি খাটতে এসেছি শুধু এই সংসারে, আমার আর বেড়াবার সখ নেই, নয়?" সুজাতা একটা বঁটি আনিয়া পাতিয়া বলে, "তবে দাও কুটনোগুলো কুটে ফেলি তাড়াতাড়ি।" মা হাত হইতে বঁটি কাড়িয়া লইয়া বলে, "থাক্ থাক্, এখুনি হাত কেটে দুখানা হবে। বলি, এতদিন কর্‌লিনি আর আজ দুটি কুটনো কুটে সংসারটি তুলে বস্‌বি একেবারে! চিরকেলে কুনখাবু তুই, হয়েছে, সর্—সর্।" সুজাতা কটার দিয়া উঠে, "তুমিই বা কোন্ কাজকর্ম শেখালে আমাকে? ছেলেলে গেলে ঘরের পুড়ে মর্‌লি, কাজ করতে গেলে বল্‌বে নষ্ট ক'রে ফেল্‌লি, এদিকে বলা হয় কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করা হয়েছে, আর দোষ দেবার বেলা ষোলআনা আমার—" দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলাইয়া সুজাতা চলিয়া যায়। মা রাগিয়া বলে, "নাও এখন মেয়েকে সাধ্যিসাধনা কর, খাওয়াও! বাবা! আমারি হাড় জ্বালাতে সতীনে এক মেয়ে রেখে মরেছে—থাকুগে, নিজেই না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে এখন, আমার কি! আমি আর ডাকছি না, ঐ বুঝি বিছানায় শুলো?" খানিক পরেই মেয়ের কাছে গিয়া বলে—"ভাত যে শুকিয়ে কড় কড়ে হ'য়ে গেল। অ-মা! সুষ্মি, ওঠ্ বাপু! ঘাট হয়েছে, রক্ষে কর্—চল্ খাবি।" মুখ ফিরাইয়া সুজাতা বলে, "না—"।

অধীর হইয়া মা বলে, "কিসে পেয়েছে আমারো সুষ্মি, ওঠ্ নইলে এইখানে মাথা খুঁড়ে মর্‌বো, তখন দেখিস্—।" আস্তে আস্তে সুজাতা উঠিয়া মায়ের হাত ধরিয়া তোলে, বলে, "যা চল, ভাত খাবো।"

পাড়া-প্রতিবেশী প্রবীনারা বলে অতবড় মেয়ে এখনো আইবুড়ো!—নিজের মা থাকলে কি আর চুপ ক'রে ব'সে থাকতো? নব্যরা বলে, ও বাড়ীর বৌ মেয়েটাকে তাড়াবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে—এই তো সবে ষোল, এখনি কিসে কি! নিজের মা তো নেই—!

সব কথাই বিরজার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সত্যই তো অত বড় মেয়ে হইয়াছে, বিবাহ না দিলে কেমন করিয়া চলে? আবার মেয়েটা চলিয়া যাইবে, বাড়ীটা অত্যন্ত ফাঁকা লাগিবে যে। এ বাড়ীর একমাত্র আনন্দই সুজাতা, সে ছাড়া তাহার যে একটি দিনও চলে না। না, না, থাকুক্ আরো কিছুদিন। নিজের মনে মনে সে যুক্তি আনে, লেখাপড়া শিখুক্—আজকাল অত শীগ্‌গির বিবাহ দিলে লোকেই বা কি বলিবে?

মা এই যুক্তি খাটাইলেও কিন্তু পিতা অক্ষয় বাবু সে কথা মানিলেন না। তিনি একটি পাত্র ঠিক করিয়া একদিন গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো শুন্‌ছ সুজার বিয়ে দিতে হয় যে?" বিরজার বুকটি ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বলিল,"এতো শীগ্‌গির?" কর্তা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "শীগ্‌গির? বলো কি? মেয়ে ষোলয় পড়্‌লো, তবুও শীগ্‌গির? বলি, আমি বুড়ো হয়েছি ব'লে কি সঙ্গে সঙ্গে তোমারও ভীমরথি ধর্‌লো?" "না গো না, ভীমরথি ধরবে কেন? তা, আজকালকার দিনে তো সকলেই বড় সড় ক'রে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, ও পড়ছে পড়ুক্ না। এই সেদিন মেয়েরা বল্‌ছিল ওর না কি মাথা খুব, অল্পদিনেই অনেকটা শিখে ফেলেছে। ও মিশনারী মেয়েগুলো কিন্তু বড্ড ভালো গো!" কর্তা একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, "আরে রাখো তোমার লেখাপড়া! লেখাপড়া শিখে তো মেয়ে জজ হবে—আর কি! ও সব বদখেয়াল মাথায় ঢুকিয়ে মেয়েটার মাথাটি খেও না। তা ছাড়া ওর মায়ের ইচ্ছে

একেবারে অন্যরকম ছিল, অন্ততঃ তার মেয়েকে তার মতের বিরুদ্ধে চল্‌তে দেবো না, ইচ্ছে হয় তোমার মেয়ে মণিকে মেমসাহেব বনিও!" সংসারের অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথায় যেন কি একটা ব্যথা বাজিয়া উঠিল। মনে হইল—সত্যই তো, সে তাহার কে? সামান্য আত্মীয়ের দাবীটুকুও যে তাহার নাই। বহুযুগ-বর্দ্ধিত শত্রুতার সম্বন্ধসূত্রে সে মাত্র আবদ্ধ, তাহার সঙ্গে তার যদি অন্যথা-চরণ সে করিয়া বসে, তবে কি কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে? না তাহার প্রত্যেকটি কাজ অতি সূক্ষ্ম কুমাপত্রে মাপ করিয়া বিচার করিয়া লইবে সকলে? তাহাতে তাহার অন্যায়, অপরাধ, অপবাদের দিকটাই সর্ব্বত্র ভারী হইয়া পড়িবে—ইহা যে অবশ্যম্ভাবী। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিরজা জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কে? কোথায় বাড়ী? কে-কে আছে?" কর্ত্তা বলিলেন, "থামো, একসঙ্গে অত প্রশ্ন ক'রো না। ছেলেটি খুব ভাল, অনেক টাকাপয়সা তুলসম্পত্তি সবই আছে, বাড়ী এই কাছেই, তবে—" ব্যস্ত হইয়া বিরজা বলিল, "তবে ব'লে থাম্‌লে কেন?" কর্ত্তা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তবে—বয়সটি একটু হয়েছে, আবার একটি ছেলেও আছে।" বিরজা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "ও পোড়া-কপাল আমার! সাগর ছেঁচে এই মাণিক বের করেছ তুমি মেয়ের জন্য? বাপ হ'য়ে পার্‌বে দিতে এমন ঘরে মেয়েটাকে?" কর্ত্তা বলিলেন, "দেখো বাড়াবাড়ি ক'রো না। তাতে হয়েছে কি? তোমার বাপও তোমাকে আমার হাতে দিতে পেছ্‌পা হননি, আর তুমিও বোধহয় আজ বল্‌তে পার্‌বে না যে তুমি অসুখী হয়েছ কোনমতে?—তবে? শোন, এমনটি আর পাওয়া যাবে না কিছুতেই। আজকাল বয়সটাকে কেউ হিসেব করে না—তুমি গোলমাল ক'রো না, বিয়ে দিতেই হবে যেমন ক'রে হোক্ এই ফাল্গুনেই।"

বিরজার তখন চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছে। সে আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

চৈত্রের সন্ধ্যা জড়িতপদে নামিয়া আসিয়া ছিমের ঘাঁচলখানি ছোট গ্রামটির উপর পাতিয়া বসিয়াছে। বিরহিণী ব্যথিতা বিরহিণীর মতই কেন সে ঘুমন্ত বিজনতার প্রাণ। বিষাদ-স্মৃতির ব্যথাভরা অন্ধকার শিশির হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, সারা পৃথিবীর বুকে যেন অতি গোপনে,—অজানায়।

আজ প্রায় চবিবশ ঘণ্টা পরে সুজাতা ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিল—"মা!"

বিরজা মণিকে কোলে করিয়া খুব পাড়াইতেছিল, ডাকিল—"আয়, এদিকে।"

সশব্দে প্রবেশ করিয়াই সুজাতা ধপ্ করিয়া বসিয়া ভীত-স্বরে বলিল—"মা, তুমি আমাকে বিয়ে দেবে একটি কুড়োর সঙ্গে?—তা দেবে না কেন? ঠিকই বলে সকলে, সংমা কিনা। তাই যাকে-তাকে ধ'রে বিয়ে দিয়ে আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পার্‌লে বাঁচো। পার্‌তে তোমার নিজের মেয়েকে এমন ক'রে বিয়ে দিতে?"

বিরজা খানিকক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। তাহার বুকের ভিতর হইতে কি যেন একটা ক্রন্দনরাশি ঠেলিয়া উপরের দিকে উঠিয়া তাহার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিতেছিল। সুজাতা কথাগুলা বলিয়াই যেমন আসিয়াছিল তেমনি ভাবে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বিরজা অনেকক্ষণ সেইভাবেই বসিয়া ছিল, তারপরে মণিকে বিছানায় শোয়াইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া সুজাতার ঘরে গিয়া বিছানার উপর লুটানো তাহার মাথাটি নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ, তার পরে আস্তে আস্তে কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"তুইও শেষে এ কথা বল্‌লি সুজা? বল্ কি কর্‌বো, আমি যে সৎমা, তোর ভাল যে আমার দেখ্‌তে নেই,—তোর সুখে যে আমার বুকে শেল বাজে,—তোকে সুখ দেওয়াই যে আমার ধর্ম্ম, আমার কাজ! জগতের চোখে সব চেয়ে দোষী আমি,—কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, ভগবান জানেন—" আর কথা বাহির হইল না, অন্তরের বেদনা ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া সুজাতার চোখের জলের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

পরদিন বিরজা স্বামীকে আবার ধরিয়া বসিল—"দেখো এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে দেবো না, পরস্পর-কুলুজি-বয়স তার খুব বেশী। তুমি আজই গিয়ে বিয়ে ভেঙে দাও।"

স্বামী বলিলেন—"তোমার মত মেয়েমানুষ পেলে আমাকে? বিয়ে ঠিক ক'রে আবার নিজে বিয়ে ভেঙে দেবো? না, তুমি পাগল হ'লে?"

"সে আমি যাই হই ওখানে বিয়ে দিও না—"

এবারে নেহাৎ বিরক্ত হইয়াই কর্ত্তা বলিলেন—"দেখো, তোমার চেয়ে আমি ওর ভালোর দিকটা বেশী দেখি, এ কথাও কি বার বার ব'লে দিতে হবে? মেয়েটি সোনার বাঁধের মুক্তোয় জড়িয়ে ব'সে থাকে, এই তেবেই তোমার মত দাদা নয়? সংসার আর কাকে বলে?"

সংসার নিঃশব্দে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ সে শুনিল রান্না-ঘরের ওপাশের দাওয়ায় বসিয়া ঝিয়েরা কথা কহিতেছে। সে খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া শুনিল তাহার ঝি ক্ষমার মা আর ওপাড়ার হরগিন্নি একমনে আলাপ করিতেছে। ক্ষমার মা বলিতেছিল—"পাত্তরটির বয়স হয়েছে—তা কি কর্‌বেন কর্ত্তাবাবু, বিয়ে না দিলে মন্দ, মেয়ে সোমত্ত হয়েছে—নিজেই উদ্‌গুস-আয়োজন ক'রে একা মানুষ সব কর্‌ছেন, সংসারের সংসার কিনা—" তার পরে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,"কি কর্‌বো মা—মা-মরা মেয়েটাকে দুটি চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না গিন্নিমা!" হরগিন্নি অত্যন্ত বিজ্ঞের প্রকাশ করিয়া বলিল—"ওমা, তাতো বটেই—কথায় বলে সতীন চেয়ে সতীনকাঁটা বড়। সে সতীনকাঁটা যেমন কপ্পে হোক্ না সরালে দাসীর সংসার করা হ'ছে না যে—" হঠাৎ ঝিয়েকে সামনে দেখিয়া হরগিন্নি একগাল হাসিয়া বলিল—"ও মা, এই যে বৌমা, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ, পাত্তরটিও নাকি খুব ভাল, হবে না কেন? সংসার হলেও বৌমা আমার নিজের পেটের মেয়ের চেয়েও বেশী দেখে সুজিকে, একথা শত্রুরেও বলে।"

ক্ষমার মা তাড়াতাড়ি বলিল—"গিন্নিমার শরীরে বড্ড দয়া গো মা! যাই ওদিকে, বেলাই কাজ প'ড়ে আছে—" বলিয়া ক্ষমার মা পলাইয়া বাঁচিল। ঝিয়েরা ও-সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া অন্য কথা পাড়িল।

বিবাহের বাকি আর ৮।৯ দিন বাকি। অমল বাবুর অভিপ্রায়ের মেয়ের বিবাহ—সমস্ত গ্রামসুদ্ধ লোক যাইবে, আয়োজন করিবে। সারা বাড়ী জুড়িয়া উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আয়োজনের কোন কিছুই ত্রুটি নাই। শুধু বাড়ীর গৃহিণী নির্লিপ্ত ভাবেই যেন বসিয়া ছিল। সকলে একবাক্যে বলিল—"তা আর থাক্‌বে না? মাওড়া মেয়েটায় বিয়ে হ'চ্ছে, আর তার মা থাক্‌লে কত আহ্লাদই না কর্‌তো, অমন্তে আর কাকে বলে?"

সেদিন সন্ধ্যার পরে সংসারের বুকে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিল বিধবা মেয়েটা। মা ধীরে ধীরে চুলগুলির উপর হাত বুলাইয়া দিতেছিল। অনেকক্ষণ পর মেয়ে বলিল—"মা, আমার তার চেয়ে মেরে ফেলে দাও, আপদ শান্তি হোক্।"

মা তাড়াতাড়ি জিব কাটিয়া বলিল—"ষাট্, ষাট্, ও-কথা বল্‌তে আছে, একমনে ভগবানকে ডাক্, তিনিই বিপদের সহায়।"

সুজি মুখ ঘুরাইয়া বলিল—হুঁ, ভগবান ভগবান, বুড়ো, অকর্ম্মণ্য, অলস লোকদের কথাই হ'চ্ছে ভগবান, ওসবে কোন ফল হয় না।"

মেয়ের মুখে হাতচাপা দিয়া মা বলিল—"ছি ছি, চুপ কর্ সুজি, অমন কথা বল্‌তে আছে? কে তোকে এ সব শিখিয়েছে—মেয়েরা বুঝি? ভগবানকে ডাক্‌লে সব হয়, তুই বিশ্বাস ক'রে একমনে ডাক্।"

হাত সরাইয়া দিয়া মেয়ে বলিল—"ছাই ডাক্‌বে, এ-কথা মেয়েরা শেখাতে যাবে কেন? ওরা তো রাতদিনই ভগবানকে ডাক্‌ছে! আচ্ছা মা, অনেকে তো বিয়ে না ক'রে থাকে,—তবে আমি তোমাদের কি এমন তার বোঝা হয়েছি বল' তো?"

"কি কর্‌বো মা! তোমার আমার ইচ্ছায় নয়—"

বেশ কাঁদোকাঁদো সুরে সুজাতা বলিল—"ঐ তো তোমার দোষ, কি কর্‌বো, কি কর্‌বো বলো, আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলো, ঐ কর্‌তেই তো জানো। কেনো তুমি হাত-পা দাপাওয়ালা অত বড় জলজ্যান্ত মানুষটা কি কর্‌তে আছ? —তুমি কিছু কর্‌তে পারো না?—"

ধীরে ধীরে মা বলিল—"পারি না মা,—এ যে দাবী-দাওয়ার কারবার তা কি ভুলে যাস্ সুজাতা? তোমার

উপর আমার কোন অধিকার নেই এই কথাই যে পুরাকাল থেকে সকলে শাস্ত্রবাক্যে লিখে এসেছে। তবুও আমি চুপ ক'রে আছি ব'লে আমায় দোষ দেবার তোর কি কিছু আছে?"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুজাতা বলিল, "আছে বই কি! তুমি ওসব সেকেলে কথাগুলো ভুলে যাও না? কৈকেয়ী, সুরুচি ছিল ব'লে তুমিও তাদের মত হবে, এমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম মেনে চলবার দরকার আছে ব'লে তো মনে হয় না—"

মা বলিল "আমার যে সব দিকেই দোষ! এ দিকে তুই বলবি—আমার ওদিকে সমস্ত সংসারও দোষ দেবে। বল আমি কোন্ দিকে যাই?"

"তোমার অকৃতের ডাকে সাড়া দেও না কেন? বাজে লোকের বাজে কথাগুলোই যেন চ'লে আমার সারা জীবনটা মাটি ক'রে যাও,—তোমার সুনাম রক্ষা কর তবে! এ যে আমার জীবনমরণ সমস্যা—তা কেবে দেখছো না? ভালোর দিথো আবহণে সকলে আমায় খারাপ করতে চলেছে। আর তুমি সমস্ত জেনে শুনেও চুপ ক'রে থাকো—তাই তো তোমাকে গালাগাল দিতে ইচ্ছে করে। যদি ছোট হ'তে তাহ'লে হয় তো মার্তুম—"

তার পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেদিন মায়ে মেয়ের অনেক কথা বলিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকাল হইতেই বিরজা প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিল। ক্ষণে বাসন আছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়, পরক্ষণে খানিকটা চাল ছড়াইয়া দেয়। কথায় কথায় ঝঙ্কার দিয়া ওঠে। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে কর্কশস্বরে বকিয়া দেয়। সকলে বলিল, "ও মা, আজ গিন্নির এমন মেজাজ কেনো গো?" সব কথার আজ তাহার রাগ হইতেছিল—সে বলিতেছিল—"সতীনঝিয়ের বিয়ে, আমার তাতে কি? আমি খেটে মরি কেন? তোমাদের যা ইচ্ছে করু গে, কর্ত্তাবাবুকে ডাকো তিনি করুন কর্ম্মান, ও আমার কর্ম্ম নয়।" পাড়া-প্রতিবেশী নির্ব্বাক হইয়া মুখের দিকে চাহিতেছিল শুধু। সে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল মাঝে মাঝে—"ঘরদোর সব নোংরা হ'য়ে গেল,—কি অদৃষ্টের ভোগ বাবা! ঐ বারান্দাটায় অত ক'রে চাল-ডাল ছড়ালে কে?"

বাড়ীতে সেদিন কর্ত্তা আসিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, তারপরে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমার মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে? অত ক'রে বকছ কেনো?" ঝঙ্কার দিয়া উঠিল বিরজা—"বকবো না? আমার কি এমন গরজ, কেনো লাজমা পোয়াই বল'? তোমাদের মেয়ের বিয়ে, আমার ঘরদোর কেনো নোংরা করা বাবা! অত লোকজন গোলমাল আমার সহ্য হয় না। সকাল থেকে মাথা ঘুরছে, বুক ধড়ফড় করছে। বলি, সতীনঝিয়ের বিয়ে হবে ব'লে আমি তো মরতে পারিনে! তার চেয়ে ছেড়ে দাও আমাকে, বাপের বাড়ী চ'লে যাই। তোমরা বিয়ে-থা দাও, গণ্ডগোল চুকলে আসবো পরে।" কর্ত্তা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বলিলেন—"কি বলছ তুমি বিরজা? মেয়েটা যদি তোমায় এ কথাগুলো শোনে, কি মনে করবে? তোমারি শুধু ঘরদোর কি? তার কি এ বাড়ীঘর নয়? তুমি এসব বলবার কে?" আগুনে কে যেন ঘি ঢালিয়া দিল। জ্বলিয়া উঠিয়া বিরজা বলিল—"বটে? তবে থাক্ তোমার সব। তোমার মেয়েরই সব,—আমি গেলুম।" তারপরেই কান্না···কর্ত্তা বিব্রত অস্থির হইয়া পলাইয়া বাঁচিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সত্য সত্যই বিরজা মণিকে কোলে করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। সকলে পুরামাত্রায় বিস্ময়ে সপত্নীবিদ্বেষের আলোচনা করিয়া ছি-ছি করিতে লাগিল। শুধু আড়ালে বসিয়া সুজাতা মুখ টিপিয়া হাসিল।

বিবাহের বর নরহরি মিত্র অনেক টাকার অধিকারী সত্য, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটি টাকা সুপ্রদায়িনী ও সুন্দরী ভার্য্যার মত অসূর্য্যম্পশ্যা ও সযত্নরক্ষিতা। তাহারা লোহার সিন্দুকে থরে থরে সাজান থাকে সাতটি তালার ঘুঘুর ভিতর। মাঝে মাঝে তাহারা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে বটে কিন্তু আদিন-স্বরূপ দিয়া যায় সোনা, রূপা, হীরা, মোতি, মাটি-ঘর-বাড়ী। নিজের বা কারো জন্য মনুষ্যে

মিত্র একটি পয়সা অপব্যয় করে এমন দোষারোপ তাহার টাকা-প্রেয়সীরা কখনো করিতে পারে না। বিবাহ হইয়াছিল একবার বহুদিন পূর্বে, কিন্তু স্ত্রী একটি পুত্র রাখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল স্বামীকে নিষ্কৃতি দিতে কিছুদিন পরেই। তারপরে এই সুদীর্ঘ জীবন একেলা কাটাইয়া প্রৌঢ়ত্বের শেষধাপে আসিয়া কেন যে তাহার খোকলা হইবার দুর্মতি হইল তাহাও তাহারা কেহই বুঝিতে পারিল না। ছেলেটা মরিয়া না হউক বাঁচিয়াও নিষ্কৃতি দিয়াছিল তাহাকে বহুদিন হইতেই—ছোটবেলা হইতে মামার বাড়ীতে মানুষ হইয়া সে এখন কোনোখানে চাকরী করিতেছিল। মিত্র মহাশয় ছেলেকে কোনদিন ডাকেন নাই, দেখেনও নাই, কারণ তিনি বলিতেন পুত্রকে দেখিলেই নাকি তাঁহার মৃতা পত্নীর স্মৃতির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

যাহা হউক লোকে বলে অক্ষয় ঘোষের বাড়ীঘর মিত্র মশায়ের কাছে বন্ধক আছে কয়েক বৎসর হইতে। একদিন কার্যোপলক্ষে অক্ষয় বাবুর বাড়ী গিয়া তাহার তরুণী কন্যা সন্দর্শনের দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহার, সেই হইতে তরুণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া টাকা-প্রেয়সীদের মোহপাশ ছাড়াইয়া মিত্র মহাশয় তাহিয়া চিন্তিয়া সাহস করিয়া অক্ষয় ঘোষের কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিয়া বসিলেন। ফলে এই বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন।

বিবাহের পূর্বদিন প্রাতে একটি ছোট ষ্টেশনে বর মিত্র মহাশয় বসিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সঙ্গে বরযাত্রীর বালাই নাই, কি হইবে লোকজন লইয়া—ট্রেনের ভাড়া কে দিবে? গাড়ীতে যদি কোন পরিচিত সহযাত্রী পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেই হইবে, আর যদি কেহ না-ই যায় ওখানে, গিয়া বলিলেই চলিবে তাহারা গাড়ী ধরিতে পারে নাই। বর ছোট বিছানাটির উপর বসিয়া লাঠি ভর দিয়া একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন রেলের লাইনের দিকে। এমন সময় একটি সুদর্শন যুবক আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। তাহার একহাতে একটি সুটকেস, আর একহাতে একটি ছোট "হোল্ডল।" সে উৎসুক হইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ষ্টেশনঘরে গিয়া দুইখানি ফার্ষ্টক্লাস টিকিট কিনিয়া আনিল। তাহার ভাবভঙ্গীতে মনে হইতেছিল—সে যেন কাহারো অপেক্ষা করিতেছে। ক্রমে ট্রেনের সময় হইয়া আসিল, কিন্তু—যুবকটি মিত্র মহাশয়কেই অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ নয়হরি মিত্র মহাশয়ের সোনাগাঁয়ে যাবার কথা আছে না? কাল তাঁর বিয়ে—" শুষ্কমুখে একখানা হাসিয়া মিত্রমা বলিলেন, "হ্যাঁ, এই যে আমিই—আপনি? কোত্থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?" যুবকটি আশ্চর্য্য ভাব দমন করিয়া বলিল—"আমি, এই যে এখান থেকেই, আমি যাবো আরো আগে, তা বরযাত্রীটার সঙ্গে দেখা হচ্ছিলো যে?"

মিত্রমা বেশ সহজ ভাবেই বলিলেন, "আসবার তো কথা ছিল; তা না এসে পড়লে কি আর করবো? একাই যেতে হবে দেখছি। আপনার যদি অসুবিধে না হয় তবে নেবস্থর করছি, আমার সঙ্গে সোনাগাঁয়ে যদি আসেন—" যুবকটি আনন্দ গোপন করিয়া বলিল—"না, বাপ করবেন, আমার দরকার খুব বেশী, তা নইলে আপনার অনুরোধ রক্ষা করতুম।" গাড়ী আসিয়া পড়িল। মিত্র মহাশয় থার্ড-ক্লাস একটি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেই, যুবকটি বলিল—"আমার সঙ্গে আসুন না—এক গাড়ীতে—" মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কোন্ ক্লাস?" যুবক বলিল—"কার্ট।" "ওরে বাপ্‌রে—" বৃদ্ধ কপালে চোখ তুলিয়া আর্তনাদ করিলেন। যুবক বলিল, "চলুন, চলুন যদি কিছু মনে না করেন, বাড়তি ভাড়াটা আমিই দিয়ে দেবো; আসুন।" বলিয়া মিত্রমাকে একরকম টানিয়াই যুবক একটি খালি ফার্ষ্টক্লাসে উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সোনাগাঁ ষ্টেশনে পৌঁছিবার আর দুই ষ্টেশন বাকি। মিত্র মহাশয় যুবক সঙ্গীটির সঙ্গে বেশ স্ফূর্তিতেই এতক্ষণ যাইতেছিলেন। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর এক ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে যুবকটি বলিল, "মিত্তিরমশাই একটু লেমনেড্ খাবেন?" আপ্যায়িত হইয়া মিত্রমা বলিলেন—"তা বাপু, কখনো তো খাইনি—" যুবক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"খাননি? খান—খেতে চমৎকার জিনিস—শাস্ত্রে বলেছে 'বোতলস্থা মধ্যবর্তী জলং পেয়ং নাস্তি'; দাঁড়ান, আমি দুটো বোতল নিয়ে আসছি—।" মিত্র বলিলেন, "তা বাপু, হিন্দুর কাছ থেকে এনো।" "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়"—বলিয়া যুবকটি দুই বোতল লেমনেড্ আনিয়া দুইটি গ্লাসে ঢালিল।

তার পরে পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া অনেক কি করিল। মিত্র মহাশয় লেমনেড্ খাইয়া খুব তারিফ করিলেন; কিন্তু খানিক পরেই সজোরে হাই তুলিতে লাগিলেন—তখন গাড়ীও সজোরে ছুটিয়া চলিয়াছে। একটু পরে মিহজা বলিলেন—"শরীরটে কেমন ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে, নেশাটেশা ছিল নাকি লেমনেডে?"

যুবক আশ্চর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল—"কৈ না তো, ও কখনো খাননি কিনা,—তাই বোধ হয় একটু ঘুম পাচ্ছে, তা ঘুমোন না একটু। সোনাগাছে গাড়ী গেলে ডেকে দেবো এখন।"—যুবক নিজেই বিছানা করিয়া দিল, মিত্র মহাশয় বিছানায় শুইবামাত্র গভীর ঘুমে অচেতন হইলেন। যুবকটি গাড়ীর সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

সোনাগাছি ষ্টেশন। তখন রাত্রি ৮টা। যুবকটি সুটকেস ও বিছানা লইয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, ওদিকে মেয়েদের গাড়ী হইতে নামিল একটি মেয়ে। কন্যার বাড়ী হইতে বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেকে ষ্টেশনে আসিয়াছিল। সকলে বর ও বরযাত্রীদের খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কেহ কোথাও নাই। ইষ্টার, সেকেণ্ড, থার্ড, কোন গাড়ী দেখিতে বাকি রহিল না—কিন্তু কোথাও কাহারও চিহ্নও নাই। গাড়ী বেশীক্ষণ থামে না, সকলের মুখে কালি মাখাইয়া সকলের বুকের উপর দিয়াই যেন প্রকাণ্ড গাড়ীটা সকলকে উপহাস করিয়া সদর্পে চলিয়া গেল। কন্যাপক্ষ হায় হায় করিয়া উঠিল।

অক্ষয় বাবু স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া বলিলেন—"কে, বিরজা? তুমি কি আজকের দিনে ঠাট্টা করতে ফিরে এলে?"

হাসি চাপিয়া বিরজা বলিল—"না গো, আমি থাকতে পারিনি, সুজির বিয়ে দেখ্‌তে ফিরে এসেছি।"

চারিদিক হইতে নানারকম মন্তব্য উঠিতে লাগিল। কেহ বলিল—"ছোট লোক"; কেহ বলিল—"কৃপণ চামার, ও কন্যের বিয়ে?" কেহ বলিল—"ফার্ষ্ট ক্লাসগুলো তো দেখা হয়নি।" কে একজন উত্তর দিল—"হুঁঃ, নরহরি মিত্র ফার্ষ্ট ক্লাসে, সেদিন আকাশের সূর্য্য পৃথিবীতে নেমে আসবে।"

সকলে হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেখানে আনন্দ-কোলাহল থামিয়া কান্নার রোল উঠিয়াছে। অক্ষয় বোস কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"উপায়?"

সকলে বলিল—"মাথাটাথা হ'য়ে গেছে—গায়ে গয়না হ'য়ে গেছে,—উপায়?"

বিরজা স্বামীর কাছে গিয়া বলিল—"উপায়?"

স্বামী বলিলেন—"উপায় কি গিন্নি, এই দেখ্‌তেই তুমি ফিরে এলে? এখন যে জাত যায়, কি করি, কোথায় আজ রাত্রেই ভালো পাত্র পাই?"

বিরজা বলিল—"পাত্র আমার সঙ্গেই আছে, তাকে আমি বল্‌লে সে না বল্‌বে না।"

ব্যগ্রভাবে অক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে সে?"

বিরজা বলিল—"ঐ তো সুরেশ, আমার বৌদির বড়দা'র ছেলে, সবে এম্-এস্ সি পাশ দিয়েছে, আর জানো তো তাদের অবস্থাও বেশ ভালো—"

অক্ষয় বাবুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—শুধু আনন্দের অশ্রু দুই ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল নীরবে।

আবার বাজনা বাজিয়া উঠিল। সোনার কাঠির স্পর্শে যেন অভিশপ্ত ঘুমন্ত-পুরী জাগিয়া উঠিল।

সুজাতা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া, বুকে মাথা রাখিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিল—"মা—"

মা চোখের জল মুছিয়া বলিল—"সংমা, না—?"

মেয়ের চোখের জল বাধা মানিল না, চাপাস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বলিল—"মা, মা, মা—!"

আমরা শুনিয়াছি গাড়ীখানা সোজা কলিকাতা অভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল। সেখানে গভীর নিশা পুলিশ কর্ত্তৃক ভঙ্গ হইবার পর, মিত্র মহাশয় সেখানে বহু দুর্ভোগ ও দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া,—জরিমানা, ট্রেনের ভাড়া ইত্যাদি ও বুকের রক্তের মত কতকগুলি টাকা অপব্যয় করিয়া, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় যুবকটির উর্দ্ধতন বিংশতি পুরুষকে ও নিজের বুদ্ধিকে গালি পাড়িতে পাড়িতে পরদিন বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সুন্দরী কন্যার হারাইয়া যত না হউক্—তার শতগুণ বেশী ক্ষোভ দুঃখ আপশোষ হইয়াছিল তাঁহার কয়েকটি টাকা খোয়াইয়া—যাহার শোক তিনি বাকি জীবনে একবারও ভুলিতে পারেন নাই।

ডাব্‌লিনে বড়দিন

ডাঃ শ্রী রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ডি-এস্ সি, এম্-বি, এম্-আর-সি-পি

বারবরা কার্থেলসঙ্কে গ্লাসগো, এবং একবার বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে 'লেডী অব্ দি লেক'এর দেশ ছাড়া, সুদীর্ঘ পোনের মাস কাল আর কোথাও যাবার ফুরসৎ ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। কাজকর্মও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল, আর সাম্‌নেই ছিল বড়দিনের ছুটী। তার উপর আরও একটা সুবর্ণসুযোগ এসে যোগ মিল, সেটা হ'চ্ছে, ডাঃ দত্ত—তদীয় পত্নী (স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত মহাশয়ার ভগ্নী) ও শিশুপুত্রসহ কোন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রেটব্রিটেন ও উত্তর-আয়র্লণ্ড ছাড়া কোথাও, অর্থাৎ আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের রাজধানী ডাব্‌লিনে বেড়াতে যাবেন। সুযোগ ও সুবিধার, এবম্বিধ সাহচর্য্য জীবনে খুবই কম পাওয়া যায়, সুতরাং এ অবস্থায় বুদ্ধিমানের মতই সপরিবার ডাঃ দত্তের সঙ্গী হওয়া গেল। যেটুকু অল্প কাজ বাকী ছিল, তাড়াতাড়ি ক'রে শেষ ক'রে, গত ২২শে ডিসেম্বর, বেলা প্রায় দেড়টায়, ডাব্‌লিনের পথে, এড্রিনবরার প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে চাপা গেল।

প্রায় সাড়ে তিনটায় গাড়ী এসে গ্লাসগো ষ্টেশনে থাম্‌লো। এখানে আমাদের গ্রাণকের গাড়ীতে উঠ্‌তে

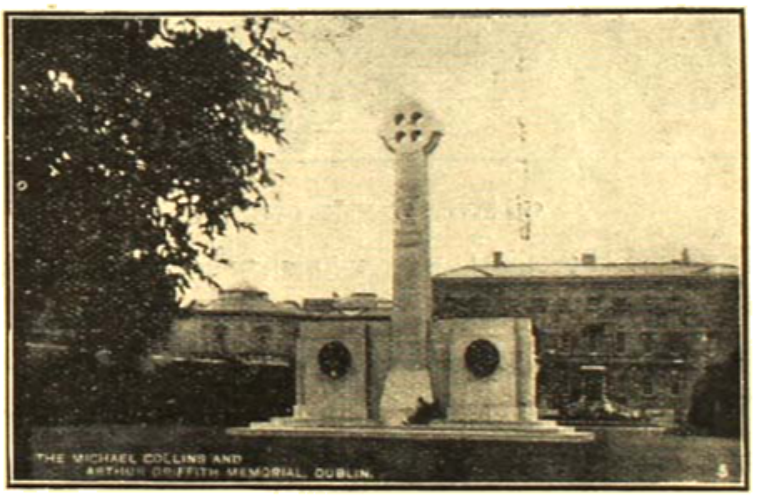

মাইকেল কলিন্স ও গ্রিফিথ স্মৃতিস্তম্ভ

হবে, কিন্তু তার তখনো দেরী ছিল প্রায় ঘণ্টা আড়াই, আর মিসেস্ দত্ত আগে কখনো গ্লাসগোতে আসেন নি, তাই আমাদের লটবহরগুলি ক্লোক্‌রুমের হেপাজতে রেখে, আমরা ষ্টেশন পেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় পড়্‌লুম। এক ঘণ্টারও কিছু অধিক সময়, খানিক এদিক খানিক ওদিক ঘুরে, একটা কাফেতে ঢুকে, কেক ও মিষ্টি সহযোগে আপরাহ্নিক চা যোগ পর্ব্ব শেষ করা গেল। দেড় ঘণ্টায় যতদূর সম্ভব, মিসেস্ দত্ত গ্লাসগো দেখে চক্ষুলাভ ক'রে গ্রীণকের গাড়ীতে উঠ্‌লেন। প্রায় দুটোয় এসে গাড়ী গ্রীণকে পৌঁছলো ; চকটি অল্প দূরে, তাই পোর্টারের হাতে মালপত্রগুলি সঁ'পে দিয়ে আমরা একটু এগিয়ে জাহাজে চড়্‌লুম।

গ্রীণক-ডাব্‌লিন যাত্রীজাহাজ অতি ছোট, একশো যাত্রীর বেশী বন্দোবস্ত প্রায়ই থাকে না। তাই ডাঃ দত্ত আগেই তাঁদের জন্য একখানা তিনটি বার্থ-যুক্ত, ও আমার জন্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' একখানা কেবিন রিজার্ভ ক'রে

রেখেছিলেন।—সারারাত্রির জন্য একরকম নিশ্চিন্ত হ'য়েই জাহাজে উঠা গেল বলতে হবে। জাহাজ যখন চলতে আরম্ভ করে, তখন আমরা লাউঞ্জে ব'সে গল্প কচ্ছিলুম, কিন্তু মিনিট দশ পরেই মিসেস্ দত্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে পড়লেন! জাহাজে চড়লেই নাকি তাঁর ওরকম হয়,—সুতরাং সঙ্গী দুজন ডাক্তারের কনসালটেশনে স্থির হ'লো, কেবিনে গিয়ে তাঁর শুয়ে পড়াই উচিত। মিসেস্ দত্তও দেখলুম, বলতে না বলতেই 'মেডিক্যাল এড্‌ভাইস্' অনুযায়ী কেবিনের পথ ধরলেন, তবে জানিয়ে দিয়ে গেলেন এখনো sick হননি, পাছে হ'য়ে পড়েন, এই ভয়েই আগে সাবধান হচ্ছেন। অগত্যা রণুও তার মা'র সঙ্গে কেবিনে ঘুমুতে গেল। ডাঃ দত্ত এক একবার উঠে গিয়ে কেবিনের তত্ত্বাবধান ক'রে, আবার এসে লাউঞ্জে বসতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, মিসেস্ দত্ত রাত্রিতে নিরম্বু উপবাসই করেন, রণু দুধ খেয়ে ঘুমুতে গেল। ডাঃ দত্ত ও আমি যথোপযুক্ত পূর্ণ-ডিনারই সদ্ব্যবহার করলুম।

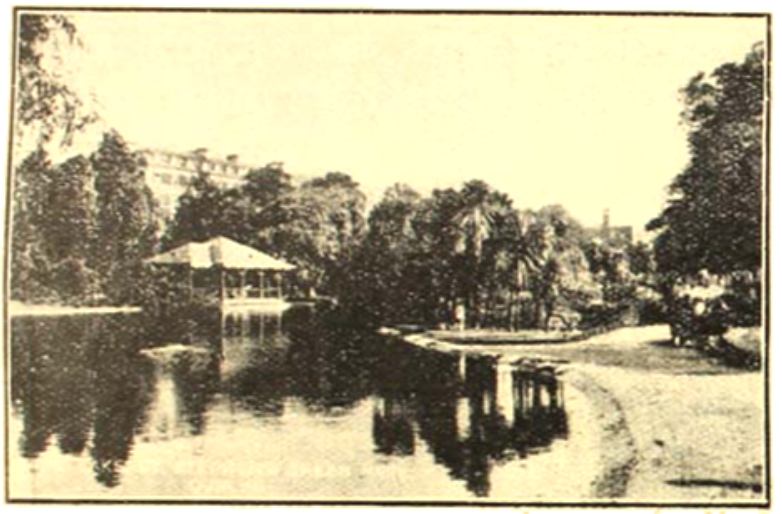

মেট ব্রিজের গ্রীনের অন্তরাল হতে

রাত্রিটা কতটা শান্তিতে কাটবে ভেবেছিলুম, তা' কাটলো না, কারণ আমার বাঁ ও ডান দিকের কেবিন্ দুটি হ'তে উপর্য্যুপরি না' খট্‌খট্ আওয়াজ হচ্ছিল তাতে চোখের দুপাতা এক করে কার সাধ্য! শুধু তাই নয়, ডিসেম্বর মাসের রাত্রিতে আইরিশ সমুদ্র বেশ কন্‌কনে শীতে ভর্ত্তি বলেই বোধ হয় কেবিনের গবাক্ষসদৃশ পোর্টহোল্‌গুলি দৃঢ়রূপে বন্ধ ক'রে চ'লে গেছিল, কিছুক্ষণ বিছানার শুয়েই মনে হ'ল—ঘামতে আরম্ভ করেছি! অনেক কষ্টেও গবাক্ষের সে দৃঢ় অর্গল কিছুতেই খুলতে পারুমনা,—সুতরাং বর্ণাক্ত-কলেবরে সে রাত্রিতে অনেকক্ষণ বিনিদ্রভাবে যাপন কর্ত্তে হয়েছিল,—শুধু ভোরের দিকে ঘণ্টাখানেক একটু অনিদ্রার হাত থেকে বেঁচেছিলুম। সারারাত্রিই, চিরচঞ্চল আইরিশ সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে ছোট জাহাজের নাচন বেশ অনুভব করেছিলুম, কিন্তু ভোরের দিকে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে বেশ বুঝতে পারা গেল, সে অবিরাম দোলার শেষ হয়েছে, অর্থাৎ জাহাজ এসে লিফি নদীতে ঢুকেছে। তাড়াতাড়ি, বাতি জেলে প্রাতঃকৃত্য অর্থাৎ, মুখ ধোওয়া, ক্ষৌরকর্ম্ম ও পোষাক পরিধান ক'রে, বাইরে এসে দেখি জাহাজ ডাব লিনে নোঙ্গর কর্চ্ছে। ডাঃ দত্ত, মিসেস্ দত্ত ও রণু আগেই উঠেছেন, সুতরাং প্রভাতের অনেক পূর্ব্বেই, শীতের শেষ-রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েই, পরস্পরকে 'সুপ্রভাত' ইচ্ছা করা গেল।

আমার মনে ভয় ছিল, যে, 'কাষ্টম' কর্ম্মচারীদের হাতে বোধ হয় বেশ কিছু জ্বালাতন হ'তে হবে। কিন্তু দেখা গেল, কর্ম্মচারীরা বেশ ভদ্রলোক, অর্থাৎ আমরা কি ষ্টেটে বেড়াতে যাচ্ছি জেনে, আর কোনরকম জিনিষপত্র ওলট-পালট ক'রে ব্যতিব্যস্ত না ক'রে, হলদে রংএর খড়ি দিয়ে, যীশুখৃষ্টের ক্রুশচিহ্ন অর্থাৎ আমাদের অস্ত্রশাস্ত্রের গুপ্তচিহ্ন এঁকে দিলেন নিরাপত্তিতে। সুতরাং অনতিবিলম্বে এক-খানা ট্যাক্সি ক'রে আমাদের গন্তব্যস্থান অভিমুখে রওনা

হলাম। আমাদের গন্তব্যস্থান হ'ল সুবিখ্যাত 'রটাণ্ডা হাসপাতালের' বাঁয়ের রাস্তার উপর 'ঈগান হোটেল'। ডাঃ দত্ত আগেই হোটেলের স্বত্বাধিকারিণীর সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে, আমাদের চারজনের জন্য কামরা ঠিক ক'রে রেখেছিলেন।

শীতকালের ঘন কুয়াসাসমাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল—তখনো পথঘাটগুলি জনবিরল। এত সময়ে আমরা এসে হোটেলের দ্বারে পৌঁছলুম। একবার, দুবার, তিনবার সুইচ টেপা গেল, কিন্তু কারো সাড়া নেই! আমরা নিরুপায়ভাবে এ ওর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি কচ্ছি,—আর একবার রিং করো কি না, এমনি একটা জিজ্ঞাসু ভাব। এমন সময় আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা হোটেলের চাকর এসে দোর খুলে "সুপ্রভাত" জানালে। কয় মিনিটের মধ্যেই বিপুলকায়া হোটেলের স্বত্বাধিকারিণী কুমারী ঈগান এসে আমাদের সম্বর্দ্ধনা করলেন। তারপর কুশলপ্রশ্ন,—জাহাজে কেমন কাটলো, সমুদ্র কেমন ছিল, ডাব্‌লিন কেমন লাগছে ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বত্বাধিকারিণীর নির্দ্দেশমত তিনিসপত্রগুলি গেল উপরে, আর আমরা গিয়ে ঢুকলুম ডাইনিং হলে। ঘরে দিব্যি আগুন জ্বলছিল, সুতরাং আগুনের কাছে ব'সে

ট্রিনিটি কলেজ, ডাব্‌লিন

শরীরটা বেশ তাতিয়ে নেওয়া গেল। অত ভোরেই প্রাতরাশের জন্য আরও একটি ভদ্রমহিলা উঠে এসে টেবিলে বসেছিলেন। তিনি কোনরকম ইংরেজসুলভ পরস্পর পরিচয়ের অপেক্ষা না রেখেই আমাদের সঙ্গে একথা ওকথা আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। পোষের মাস সে দেশে থেকে এভাবে ঠিক আমাদের দেশের মতই আলাপটা সত্যি একটু নূতন ব'লে মনে হ'ল। কিছুক্ষণ পরেই এল একটি ছোকরা,—সে কোনও কেমিষ্টের দোকানে কাজ করে, সাতটায় তাকে দোকানে যেতে হবে তাই। খাবার টেবিলে ব'সে সেও দিব্যি আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে,—যেন আমরা কতদিনের পরিচিত! এদিকের ছোট টেবিলখানা বোধ করি বা কাজাআদমিদের জন্যই নূতন পাতা হয়েছিল। টেবিলের উপর তখন প্রাতরাশ এসে হাজির হয়েছে; অমনি আমরা চারজন আর কালবিলম্ব না ক'রে তার সদ্ব্যবহারে নিজেকে নিযুক্ত কর্লুম। ওদিকের বড় টেবিল-খানার চারদিকের চেয়ারগুলিও তখন একে একে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছিল। সকলেরই কাজে যাওয়ার তাড়া, কিন্তু লক্ষ্য কর্লুম অবিশ্রান্ত ভাবে বক্‌বক্ কর্ত্তে কি ছেলে কি মেয়ে সকলেই ওস্তাদ! খাবার সময় মিস্ ঈগান এসে একবার তদারক ক'রে গেলেন—পরিচারক আমাদের ঠিক পরিবেষণ কর্চ্ছে কিনা। তার সঙ্গে তাঁর মুখের অদ্ভুত হাসিরও খানিকটা উপহার দিতে ভুল্‌লেন না। খাওয়ার পর সবাই যে যার কাজে চ'লে গেল। রইলুম শুধু আমরা নবাগতক চারজন আর হোটেলকর্ত্রীর বোনঝি—সে কোন কাজকর্ম্ম করে না, বড়দিনের সময় মাসীর কাছে বেড়াতে এসেছে। প্রাতরাশের পর সেদিনের কাগজ পড়্‌তে

পড়তে কথা
গেল।

প্রায় ন'টার সময় চারজনে একসঙ্গে বেড়াতে বের হওয়া গেল। ডাব্‌লিন ডাঃ দত্তের পূর্বপরিচিত স্থান, কারণ তিনি আইরিশ ফ্রি ষ্টেট হওয়ার পূর্বেই আর একবার সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সুপরিচিত স্থানে তিনিই আমাদের গাইড্ হলেন। ডাব্‌লিনে যদিও ভারতীয় ভদ্র লোকের অভাব নাই তবু স্বদেশীয় ভদ্রমহিলার দর্শন সেখানে খুবই বিরল তাই মিসেস্ দত্ত সঙ্গে থাকাতে আমরা নানাস্থান অনেক পথিক ও পথিকারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিলুম। হটাৎ হাসপাতাল হ'য়ে দিয়ে আমরা ও'কনেল ষ্ট্রীটে পড়লুম। এই রাস্তাটি ডাব্‌লিনের একটি প্রসিদ্ধ রাজপথ। নাট্যশালা, চিত্রশালা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের অধিকাংশ স্থানই এ অঞ্চলে অবস্থিত। পথটিও দিন-রাত্রি সর্বক্ষণই লোকের জনতায় পূর্ণ। সকলেই যে গতিশীল তা' নয়, অনেকে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েই গল্প ও জটলা কর্চ্ছে। দেখে মনে হয়, যেন তাদের কাজকর্মের একান্তই অভাব, এবং গল্পগুজবই জীবনের একমাত্র অবলম্বন! ইংলণ্ড বা স্কটলণ্ডের সর্বত্রই এরকম দৃশ্য একান্ত বিরল, পথে ঘাটে সকলেই যেন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে ট্রেন ধরতে হবে ব'লে; এটি তাদের ব্যস্ততা। তাই এরকম নিশ্চিন্ত বাগুতাশূন্য ভাবটা অত্যন্ত নূতন ও বিসদৃশ ভাবে চোখে ঠেকছিল। রাস্তাটি বেশ চওড়া, দুদিকে দুটি ও মাঝখানে একটি ফুটপাথ, তারি বাম দিয়ে দুদিকে গাড়ী-ঘোড়া মোটর প্রভৃতির যাতায়াতের পথ। মাঝের ফুট-পাথের উপর স্থানে স্থানে নানাবিধ গাছ আছে। দুইধারের

ষ্টে প্রমিনেড্

সময় বলেই বোধ হয়, অনেকগুলিতেই দেখ্‌তে পেলুম যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তি রয়েছে, আর তারি নীচে মোমবাতি সারি সারি জেলে রাখা হয়েছে - যেমনটি আমাদের দেশে লোকে পীরের দরগায় বাতি দেয়! আইরিশরা রোমান ক্যাথলিক্ কিনা, কাজেই, এরকম বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ উপাসনা অনেক-স্থলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়েই, সুপ্রসিদ্ধ "নেলসন্ স্তম্ভ"—ডাব্‌লিনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই স্থান হতেই সব ট্রাম লাইনগুলি আরম্ভ হয়েছে, এবং ডাব্‌লিনের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করা হয়। স্তম্ভটি অনেকটা আমাদের কলিকাতার অষ্টাঙ্গলোনি মনুমেণ্টেরই মত, তবে অতটা উঁচু নয় এবং উপরে সুপ্রসিদ্ধ নৌযোদ্ধা নেলসনের মূর্ত্তি আছে। এর উপর হ'তে, সাগর, পাহাড়-নদী-পার্ক সমন্বিত ডাব্‌লিন সহরকে অতি চমৎকার দেখায়। আর একটু এগিয়েই ও'কনেল ব্রিজ, সেখান হ'তে গ্রাফ্‌টন ষ্ট্রীটের দিকে যেতে হয়েছে, আয়র্লণ্ডের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সন্তানদের প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে সেখানে স্থাপিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গ্রে, ও'কনেল, স্মিথ, ও'ব্রায়েন, মুর, বার্ক প্রভৃতির নামই উল্লেখযোগ্য। কলেজ গ্রীণে, প্রসিদ্ধ শিল্পী ফলির নির্ম্মিত হেনরী গ্রাফ্‌টনের মূর্ত্তি অবস্থিত।

এগুলি পার হ'য়ে, গ্রাফ্‌টন ষ্ট্রীটে পড়া গেল। ডাঃ দত্তের মুখে শুনতে পেলুম, এটাই নাকি ডাব্‌লিনের চৌরঙ্গী, এডিনবরার প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট বা লণ্ডনের পিকাডিলি সার্কাসের সমতুল্য। যদি তাই হয়, তবে বড় দরিদ্র অনুকরণ বলেই মনে হ'ল। কারণ রাস্তাটি খুবই সরু এবং এঁকে বেঁকে গেছে; রাস্তাটি এত অপরিসর যে ট্রাম অথবা বাসের পর্য্যন্ত চলাচল নাই। তবে রাস্তার দুপাশে অনেকগুলি সুরুচিসঙ্গত ভাবে সুসজ্জিত দোকানপাট আছে এবং যখন তখনই অনেক সুবেশ ও সুবেশিনী ভদ্রলোক ও মহিলাদের দর্শন পাওয়া যায়। ডাঃ দত্তের বর্ণিত ডাব্‌লিনের চৌরঙ্গী দেখে কিন্তু মোটেই তৃপ্ত হলুম না, একথা স্পষ্টবাক্যে বলতে পারি—।

গ্রাফ্‌টন ষ্ট্রীটের মোড়েই, 'সেণ্ট্ ষ্টিফেন্স্ গ্রীণ' নামক প্রকাণ্ড পার্ক। আমরা এসে তার অভ্যন্তরে ঢুকলুম। পার্কটি সুন্দর বলেই মনে হ'ল। তার অভ্যন্তরে নানাবিধ ফুলের বাগান ও কৃত্রিম হ্রদগুলি,—তাতে সঞ্চরমান নানাবিধ জলচর পক্ষীদের অবাধ ক্রীড়া বেশ ভাল লাগ্‌লো। কারো কারো মতে এই বাগানটি, প্যারিসের সুবিখ্যাত লুক্সেমবার্গ গার্ডেন অথবা লণ্ডনের সেণ্ট জেমস্ পার্কেরই অনুরূপ। কিন্তু এক হিসাবে বোধহয় এই পার্কটি, শেষোক্ত দুটিকেও ছাড়িয়ে যায়,তা হ'চ্ছে, একটি সমাকীর্ণ নগরীর কেন্দ্রস্থলে, এরকম প্রকাণ্ড, নয়নাভিরাম একটি পার্ক বাস্তবিকই খুব বিরল। পার্কের কৃত্রিম হ্রদগুলিকে হঠাৎ দেখলে প্রাকৃতিক হ্রদ বলেই মনে হয়। তার মধ্যবর্ত্তী ছোট ছোট দ্বীপগুলি ও নানাপ্রকার হাঁস ও জলচর পাখীর কলকণ্ঠ, পার্কের সজীবতা যেন আরও বাড়িয়ে তুলে। বাস্তবিকই সহরের

ডাব্‌লিন বন্দর

কেন্দ্রস্থলে এরকম একটি পার্ক থাকা সহরের গৌরবের বিষয়! একটি ভদ্রলোক আমাদের বলছিলেন, "জনবহুল সহরে ঘুরে ঘুরে যখন আপনার মন ও শ্রবণ ক্লান্তিতে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে,ঠিক সেই সময় যদি আপনি অজ্ঞাতসারে একবার এসে এই গ্রীণের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেন, আপনার ক্লান্তি ও অবসাদ তদ্দণ্ডে দূর হবেই, বরং মনখানা আরো 'সবুজ' আরো 'সবুজ' আরো 'কাঁচা' হ'য়ে উঠ্‌বে। আমরা ডাব্‌লিনবাসীগণ, যখনই ক্লান্ত হই, ষ্টিফেন্স গ্রীণ এসি আমাদের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে!"

ষ্টিফেন্সগ্রীণ হ'তে আমরা ট্রামে চ'ড়ে হোটেলে ফিরে এলুম প্রায় দুটায়,—কারণ হোটেলওয়ালী মিস্ ইগান ব'লে দিয়েছিলেন ওর চেয়ে বেশী বেলা লাঞ্চের জন্য দেরী না হয়—। তখন 'লাঞ্চ' তৈরীই ছিল, ক্ষিদেও লেগেছিল বেশ, সুতরাং উদরপূর্ত্তি করেই তাহার করা গেল। আগের রাত্রিতে ঘুম অতি অল্পই হয়েছিল, তাতে পথশ্রমের ক্লান্তি, তার উপর প্রায় চারঘণ্টা অনবরত ভ্রমণ: সুতরাং খাওয়ার পর একটু আগুনের কাছে বসেছিলুম, আর চোখদুটি আপনি ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। অগত্যা, বসতে

অক্ষমতা জানিয়ে আমি ডক্টরসাহেব ও তৎপত্নীর নিকট বিদায় নিয়ে উঠ্‌লুম। ঘরে ঢুকে কাপড়-চোপড় ছাড়্‌বার মতনও অবস্থা ছিল না আমার—। কখন যে শুলুম, আর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কিছুই জানি না! মিস্ ইগান্‌ের করাঘাত শুনে যখন ঘুম ভাঙলো, অবাক্ হ'য়ে দেখি, ঘড়ীতে আটটা বাজ্‌ছে। মিস্ ইগান্, একপাল হেসে বল্লেন, "ভাল মোর কপাল! (My goodness!) — ডাঃ পাল ত দেখ্‌ছি ঘুমের রাজা!" রসিকতা কর্ব্বার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লুম না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বল্লুম, "রাজা নই, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্, কেন না এখনো কুমার—!" সপরিবার ডাঃ দত্ত আগেই এসে টেবিলে বসেছিলেন, তাই এই অনিচ্ছাকৃত দেরী করার জন্য তাঁদের কাছে মাপ চেয়ে টেবিলে নিজের শূন্য আসনে ব'সে পড়্‌লুম।

খাওয়ার পরেই ডাঃ দত্ত সপরিবারে গিয়ে রাত্রির জন্য ঘরে ঢুক্‌লেন। ডিনার টেবিলের কাছেই আগুনের চারদিকে ব'সে তখন বেশ গল্পগুজব চল্‌ছিল। রাত্রির জন্য ঘুমের কাজ অনেকটা সারা হ'য়ে আছে, সুতরাং দুটি কর্ত্তব্যের একটি বেছে নিতে হয়, অর্থাৎ হয় সান্ধ্যপোষাক ক'রে ডাব্‌লিনের রাস্তায় বেরিয়ে পড়া, আর নয় আগুনের কাছে মজ্‌লিসে যোগ দেওয়া। মিস্ ইগান্, তাঁর বোনঝি, ভোরবেলার ভদ্রমহিলাটি, কেমিষ্ট ছোকরাটি, এবং আরো দু'চারজন ভদ্রলোক, সকলেই আগ্রহভরে, যাঁর যাঁর কাছে আমাকে বস্‌বার জন্য স্থান দিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ কর্লেন। আমিও তাই তাঁদের সাদর নিমন্ত্রণটা গ্রহণ ক'রে, শেষোক্ত পথই বেছে নিয়ে একপাশে ব'সে পড়্‌লুম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জান্‌বার ঔৎসুক্য সকলেরই। একটা-দুটো ক'রে তাঁদের

ও'কনেল ষ্ট্রীট, ডাব্‌লিন—মধ্যে নেলসন পিলার

কথার জবাব দিতে দিতে, কখন্ আমিই একমাত্র বক্তা এবং আর সব ক'জন শ্রোতা ও শ্রোত্রীতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তা জানি না। সে রাত্রিতে এঁর গল্পগুজবে রাত্রি প্রায় একটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে, প্রত্যেককে শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে ওঠা গেল।

২৪শে তারিখে সকালবেলা ঘুম হ'তে উঠে দেখি, ঝর-ঝর অবিরলধারে বৃষ্টি হ'চ্ছে। অবিরত ভাবে সারাদিন তা' চল্লো। জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তার যা অবস্থা দেখ্‌তে পেলুম, সে কর্দ্দমাক্ত নোংরা পথে বেরুতে আমাদের মধ্যে কেউই উৎসাহী ছিলুম না। তাই লাইব্রেরীতে আগুনের কাছে ব'সে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া গেল। অল্প কিছু কাজ ছিল, তা হ'চ্ছে, এডিনবরাতে ক'খানা খৃষ্ট-কার্ড পাঠানো এবং দেশে ও বাড়ীতে চিঠি লেখা; সেই কাজটাই অগত্যা সেরে নেওয়া গেল। ডাঃ দত্ত আগেই পোষ্টের ষ্ট্যাম্প কিনে এনেছিলেন, আয়র্লণ্ডের ছবি ও ছুরিকার ছবি সম্বলিত টিকেটগুলি এঁটে দিয়ে পরি-চারকের হাতে তার যথাবিহিতের ভার দেওয়া গেল। টিকিটের উপর ছুরিকার ছবি দেখে আমার গত রাত্রির বন্ধুদের কথা মনে জাগ্‌লো, বুঝ্‌তে পার্‌লুম লোককে হত্যার জন্য অস্ত্র, স্বাধীনতার যুদ্ধে এত বেশী আইরিশদের ধর্ম্মে হাত-

ছিল যে, তারা স্বাধীনতা লাভের পর তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য ডাকটিকিটের উপরও ছুরিকার স্থান দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মুদ্রার উপর পর্য্যন্ত চিরাচরিত সরকারী চিহ্নকে বর্জ্জন ক'রে তার স্থলে তারা আয়র্লণ্ডের নানাবিধ জীবজন্তু—ক্যাঙারু, বাঁড়, পশুপক্ষী প্রভৃতির ছবি মুদ্রিত করেছে। এ কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—নব্য আয়র্লণ্ড কতটা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অন্যান্য ডোমিনিয়নগুলি এতদিনের লব্ধ স্বাধীনতার জোরেও যতটা এগোতে সাহস করে নি, ফ্রি ষ্টেট এই আট বছরেই তাদের অনেক ছাড়িয়ে গেছে!

সন্ধ্যা বেলাটা, ডাব্‌লিনের বিখ্যাত 'কেপিটল সিনেমা'তে ব'সে কাটিয়ে দেওয়া গেল প্রায় ঘণ্টা তিন। তারপর ডিনার খাওয়ার পর, সবাই মিলে আবার বেরিয়ে পড়্‌লুম ডাব্‌লিনে 'খৃষ্টমাস্ ইভ্' দেখ্‌তে। পথে পথে সুবেশে সজ্জিত, নরনারীদের জনতা ভেদ ক'রে আমরা একটার পর একটা কতকগুলি ক্যাসেনেধ্‌স্ কোয়াটার ঘুরে এলুম। ফির্‌বার মুখে পথের উপরই গ্রাফ্‌টন ষ্ট্রীটে, প্রসিদ্ধ উলওয়ার্থ'স্ তিন পেনি ছ' পেনির দোকান, দেখি অত রাত্রিতেও একেবারে লোকে লোকারণ্য! সকলেই অল্প মূল্যে, খৃষ্টমাস্‌ডে'র জন্য, প্রিয়জনদের দিতে এটা ওটা কিন্‌ছে। মিসেস্ দত্তও সেখানে একবার ঢুক্‌তে ইচ্ছা করেন, সুতরাং তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী, সেখানে ঢুক্‌তে হ'লো। রেণুর জন্য কিছু চকোলেট ও অন্যান্য মিষ্টি এবং অল্প বাজারসাজা কিনে, লোকের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সেখান হ'তে কোনরকমে বেরিয়ে আসা গেল।

২৬শে, খৃষ্টমাস্‌ডে, সকাল বেলাটা আগের দিনের চেয়ে অনেকটা ভাল ছিল। তাই প্রাতরাশের সময়ই স্থির হ'লো, কাছেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী আয়র্লণ্ডের কোন ভাল স্থানে যেতে হবে। অনেকদিন হ'তেই, আয়র্লণ্ডের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলি অতি চমৎকার শুনে আস্‌ছিলুম, তাই ডাঃ দত্তের এ প্রস্তাবে খুবই আগ্রহভরে সম্মতি প্রকাশ কর্লুম। সুতরাং সজ্ঞবাধীসম্মতিক্রমে, প্রায় ন'টার সময় বেরিয়ে পড়া গেল অনির্দ্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে—ব্রে, হাউথ, কিংস্‌টাউন, অর্থাৎ যে কোন স্থানে! বাস্‌ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ব্রে'র বাস্ এসে দাঁড়াল, সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না ক'রে, বাসের কটি স্থান অধিকার ক'রে বস্‌লুম।

প্রায় দশটায় আমাদের বাস্‌খানা চল্‌তে আরম্ভ কর্লে, সুবিখ্যাত কাউন্টি উইক্‌লোর মধ্য দিয়ে।—উইক্‌লোতে চারিদিকে কতকগুলি পাহাড় আছে, আর তারই মাঝে মাঝে কতকগুলি উপত্যকা, এই রকম নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যে উইক্‌লো কাউন্টি বাস্তবিকই চমৎকার ব'লে মনে হ'লো! এই উইক্‌লোর উত্তরাংশেই, সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ ব্রে অবস্থিত। সেখানে পৌঁছতে আমাদের প্রায় বারোটা বেজে গেল। বাস্ হ'তে নেমে আমরা সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রকাণ্ড পার্কে ও বাঁধানো প্রমিনেডে বেড়াতে লাগ্‌লুম। শীতের সময় ব'লে সেখানে দু'চারজন লোকজন ছাড়া বেশী কেউ ছিল না, কিন্তু তবু অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের কোলে গিয়ে, সেখানে সমুদ্র আছড়ে পড়্‌ছে, সে স্থানটি অতি চমৎকার লাগ্‌লো! দেখ্‌লুম, বাঁধানো পোস্তার উপর অসংখ্য বেঞ্চ পাতা আছে, তাতে প্রায় ৩।৪ হাজার লোকের বস্‌বার মত স্থান। তাতেই বুঝ্‌তে পারা যায় গ্রীষ্মের সময় এ স্থানে ডাব্‌লিনবাসী ও বিদেশী কত দর্শকের আগমন হয়! ডাঃ দত্তও বল্লেন, গ্রীষ্মের সময় এ পথে লোকের ধাক্কা না খেয়ে চলা দুষ্কর। সমুদ্রতীরের বাঁধানো পোস্তায় ও সমুদ্রের উপর বাঁধানো প্রমিনেডে আমরা কতক্ষণ বেড়ালুম। শেষোক্ত স্থানে জনকত লোক মাছ ধর্ছিল, তাই দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখা গেল, এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করা গেল। কালা-আদমি দেখে, তারাও আগ্রহভরে অথচ সসম্ভ্রমে আমাদের সঙ্গে আলাপ কর্লে। মিস্ ঈগান ব'লে দিয়েছিলেন, তিনটার আগে খৃষ্টমাস্‌ডের লাঞ্চ তৈরী হবে না। সুতরাং প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমরা ব্রে'র সৌন্দর্য্য উপলব্ধি কর্ব্বার সময় পেয়েছিলুম। ফির্‌বার পথে পার্কের মধ্যে কতকগুলি ছেলেমেয়ে খেলা কর্ছিল, আমাদের দেখে হাসি-মুখে এগিয়ে এল। আমরা তাদের 'হেপ্পি ক্রীষ্টমাস্' জানালুম; সেই অতটুকু ছেলেমেয়েগুলিই মুখভরা হাসি নিয়ে আমাদের 'মেনি এ হেপ্পি রিটার্ণ' জানালে! একটার সময় রওয়ানা হ'য়ে, যখন এসে হোটেলের দরজায় পৌঁছলুম

তখন তিনটা বেজে গেছে। লাঞ্চ তৈরী হ'য়ে গেছে, অথচ, হোটেলের আগন্তুকদের এবং নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই অনুপস্থিত। সুতরাং বেচারী মিস্ ঈগান তাঁর বিশাল বপু নিয়ে একবার এ ঘরে আবার ও ঘরে, এবং শেষেই দ্বারের কাছে ছুটাছুটি ক'রে হাঁপিয়ে প'ড়ে ব্যস্ততার একশেষ দেখাচ্ছিলেন। এদি সময় দরজার আমাদের সাড়া পেয়ে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন, বুঝা গেল, কারণ তাঁর পক্ষে ছিল বিশেষ আমরা নিশ্চয়ই ডাব্‌লিনের মত সহরে পথ হারিয়ে ফেলেছি, তা না হ'লে অত দেরী হয় কেন, ইত্যাদি।

মিস্ ঈগান হোটেলের স্বত্বাধিকারিণী হলেও বেশ সামাজিক, তার প্রমাণ পাওয়া গেল মধ্যাহ্নভোজনের সময় তাঁর নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা দেখে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাই (অবশ্য আমাদের দেশের মতে ; সে দেশের পক্ষে মধ্যবয়স্ক) বেশী। ক'জন ছোট ছেলেমেয়েও ছিল। আমোদের সরঞ্জামও বাদ ছিল না। আমাদের মনে আছে, ডাঃ দত্ত ও আমার দুজনেরই পাতে সেদিন টার্কির বড় বড় দুখানা ঠ্যাং পড়েছিল, সাধারণ খাবার টেবিলে, কাউল বা টার্কি বিলাতে একান্তই বিরল। নানারকম শাকসব্জী কাঁচা সিদ্ধ, তার উপর ক্রীস্মাস কেক্ ও পুডিং ছিল। তা' ছাড়া নানারকম পানীয় ছিল। মিসেস্ দত্ত একটু আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু মিস্ ঈগান বল্লেন, খৃষ্টমাস্‌ডেতে খান না খান অন্ত একটু ছুঁতে হয়। অগত্যা আমরা অন্ত একটু পোর্ট টেনে নিলুম। মিস্ ঈগান যখন সমবেত নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতদের স্বাস্থ্যপান কর্লেন, তখন অভ্যাগতদের সঙ্গে অন্ত একটু পোর্ট দিয়েই নিজের রক্ষা কর্লুম! নানাবিধ হাস্য-পরিহাস ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে অপরাহ্ণ-ভোজন শেষ হ'লো।

'বড়-দিন' হলেও শীতের দিন, সুতরাং খেতে খেতেই প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এলো! খাওয়ার পরেই বড় ড্রয়িংরুমে গিয়ে আগুনের কাছে ভিড়্‌লেন সকলে। নানাবিধ গল্পগুজবও চল্লো। একে একে, আরও একদল এলেন, তাঁদের বেশীর ভাগই যুবক ও যুবতী,—একটু অপরূপ বেশ! মাথায় কাগজ দিয়ে তৈরী লাল নীল রংএর টুপী পরা—তাদের কতকগুলি আমাদের ছেলেবেলাকার পাথার টুপীর অনুরূপ, কতকগুলি টার্কিশ ক্যাপের মত, কতকগুলি বা মিলিটারী গুখালি টুপীর মত! সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই, মিস্ ঈগান দুই হাত আড়াই হাত লম্বা কতকগুলি মোমবাতি এনে, চিমনীর উপরকার তাকে বসিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন, —একখানা বড় যীশুখৃষ্টের ছবিও বড় আয়নার উপর ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখ্‌লেন। তার উপর একসঙ্গে দশক'টি বাতি জ্ব'লে উঠ্‌লো। অভ্যাগতদের কলহাস্যে ঘরখানি মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো!—দেখ্‌লুম বুড়োবুড়ীরা একটু স'রে ওপাশে গিয়ে বস্‌লেন ; সপরিবারে ডাঃ দত্ত ও আর সবাই, এমন কি মিস্ ঈগান পর্য্যন্ত এসে ছোটদের দলেই বস্‌লেন! বলা বাহুল্য অল্প পরিচয়-প্রসঙ্গান্তর আমিও এই দলেরই একজন হ'য়ে গিয়েছিলুম, এবং জনৈক বন্ধু পকেট হ'তে খুলে আর একটা বড় হল্‌দে রংএর কাগজের টুপী আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে আমাকেও দলভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন।—মেয়েরা শুদ্ধ ঐ টুপী প'রে বসেছিলেন, দেখ্‌তে সে বেশ লাগ্‌ছিল! অতঃপর তাদের আজ্ঞা বস্‌লো, আর এল বাক্স ভ'রে ভ'রে চকোলেট, নানারকমের বিস্কুট, সিগারেট, ও ক' বোতল পানীয়। কারা তাস নিয়ে বস্‌বেন, তারই জন্ত লটারী হ'ল। আমি আপত্তি করেছিলুম, কিন্তু আইরিশ বন্ধুবান্ধবীরা কিছুতেই ছাড়্‌বেন না ; অগত্যা নাম দিতে হ'লো। কিন্তু দেখা গেল, চারজনের মধ্যে ডাঃ পালও একটি স্থান পেয়েছেন! ব্রিজ খেলা, বাজি রেখে,—আগে বুঝি নি, তাহ'লে বস্‌তুম না, কিন্তু ব'সে এরকম উঠে আসা চলে না। এবারও আমাদেরই জয় হ'লো। সুতরাং প্রায় তিন শিলিং জিতে উঠে আসা যায় না, এজন্ত দ্বিতীয়বারও নাম দিতে হ'লো। এবার পার্টনার হলেন মিস্ ঈগান, তিনি ত ভারী খুসী, একে কালা-আদ্‌মির সঙ্গে বসেছেন, তাতে আবার আমার আগের বারের খেলা দেখেও খুসী হয়েছিলেন। এবারও প্রায় দেড় শিলিং জেতা গেল। তারপর আবার তৃতীয়বারও নাম উঠ্‌লো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্লুম, এবারই শেষ। সেবার হারতে হ'লো প্রায় আড়াই শিলিং। সুতরাং তার পরের বার নাম দিতে আপত্তি ক'রে বসুম, তিন বারই আমার নাম উঠেছে, এবং অনেকেই একবারও খেলবার সুযোগ পান নি, এবার আমার নাম বাদ দেওয়া হোক্। অনেক কথার পর তাঁরা

যাওয়া হলেন। কিন্তু নিজে তাস হাতে না নিলেও, আমাকে পরোক্ষভাবে খেলতে হ'লো অনেকক্ষণ—অর্থাৎ মিস্ উগানের বোনকি তত্তটা ভাল খেলে না, সেই তার পালা এল অমি আমাকে কাছে ডাকলে তার তাস দেখ্‌বার জন্ত। এরকম ক'বার তার হ'য়ে খেলা গেল। বার দু'তিন মিস্ উগানও অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা ও সমাদরের জন্ত তাস রেখে উঠে যাচ্ছিলেন, সুতরাং তাঁর অনুরোধে কাজে-আদ্‌মিকেই তাঁর হ'য়ে খেলতে হয়েছিল। খেলার মাঝে নানারকম গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা চল্‌ছিল। সেদিন একমাত্র ভারতীয় আমিই তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম একেবারে খোলাখুলি ভাবে। না দিয়ে উপায় ছিল না,—প্রাণখোলা সরলতাময় এই আইরিশদের মন, সেটা অনেকটা আমাদের ভারতীয়দের সঙ্গে খাপ খায়। আবার যদি কারো প্রতি বিরক্ত হয়, তবে তাদের ঘৃণাও সেই রকমই অভিব্যক্তি প্রকাশ করে! আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে দেখলুম আমাদের বাঙালীর সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে এদের, তা' হ'চ্ছে শারীরিক গঠন ও ভাবপ্রবণতা। মনে হয় এই সব কারণেই সম্পূর্ণ বিদেশী হয়েও তাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে পেরেছিলুম, যতটুকু ইংলণ্ড বা স্কটলণ্ডে দেড় বছর থেকেও খোলাখুলি ভাবে মিশতে পারি নি। চকোলেট, বিস্কুট, সিগারেট ও পানীয় খেলার সঙ্গে সমান তালে চলেছিল। প্রথম দুটি নিয়ে বাকী দুটার জন্ত 'No, thanks' বলেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হচ্ছিল। রাত যতই বাড়ছিল ততই বুড়োবুড়ীরা একে একে বিদায় হচ্ছিলেন। ডাঃ দত্ত ও মিসেস্ দত্ত যে কখন্ নিজে বাড়ী ঢুকেছেন জানতেই পারি নি! রাত একটা পর্য্যন্ত সমানভাবে আড্ডা চল্‌ছে দেখে আমি আর বসবার অক্ষমতা জ্ঞাপন ক'রে, বন্ধু ও বান্ধবীদের "গুডনাইট" জানিয়ে সে রাত্রির মত বিদায় নিলুম।

২৬শে তারিখ, সকালে খাওয়ার পর ডাব্‌লিনের অন্যতম বিখ্যাত পার্ক 'ফিনিক্স পার্কে' বেড়াতে গেলুম। প্রকাণ্ড পার্ক—মুক্ত হাওয়ার রাজত্ব করেও চলে! দেখলুম এমি লিংএর সঙ্গেও পার্কে অনেক লোক বেড়াচ্ছে। রিজেন্ট পার্কের মত এরও মধ্যে সেই রকম কতকগুলি হ্রদ আছে, তাতে অনেক রকম পাখী দেখতে পাওয়া যায়। হ্রদগুলির চারদিকে এঁকে বেঁকে অনেকগুলি বেড়াবার পথ আছে। উপরে আবার সুপ্রশস্ত অনেকগুলি রাস্তা। পার্কের মধ্যেই ক'টা ফুটবল খেলার মাঠ আছে,—পার্কের একাংশে চিড়িয়াখানা, লণ্ডনের রিজেন্ট পার্কের সুবিখ্যাত চিড়িয়াখানার চেয়েও অবস্থান অনেক ভাল বলতে হবে। চিড়িয়াখানার মধ্যেও একটি প্রকাণ্ড বাগানের কেন্দ্রস্থলে একটি হ্রদ! তারই চারিদিকে, উঁচুনীচু জায়গায় অনেকগুলি খোপ ও নানারকম জীব-জন্তু, পশু-পক্ষীর আবাসস্থান, যতদূর সম্ভব প্রকৃতির অনুযায়ী ক'রে রাখা হয়েছে। এক এক সময় ভয় হয়, হয়ত বা জঙ্গলেই পশু-পাখী দেখ্‌ছি! পার্কে ঢুকেই একদিকে আয়র্লণ্ডের গবর্ণরের প্রকাণ্ড আবাস-নিকেতন এবং নানাদেশের দূতাবাস। হাতের কাছেই একটা বৃহৎ বাড়ী দেখে, আমরা বাঁদিকে যাওয়ামান পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলুম, ওটা কি? আইরিশ পাহারাওয়ালা, মিলিটারী ভাবে সেলাম ক'রে বল্লে—"ওটা আমেরিকান দূতাবাস।" পাহারাওয়ালার সঙ্গে তার ছোট বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে ছিল। আমরা পাহারাওয়ালাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরতে উদ্যত, এমন সময় সেই ছোট্ট মেয়েটি বাপেরই অনুরূপ মিলিটারী কায়দায় আমাদের সেলাম করে। বাস্তবিক মেয়েটির সেই মিলিটারী সেলাম আমাদের কাছে অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। হাসিমুখে তার হাত ধ'রে একটু আদর ক'রে আমরা বিদায় নিলুম। তার পর খানিকক্ষণ ওপাশের ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘুরে প্রায় দুটার সময় হোটেলে ফিরে এলুম।

অপরাহ্ণে বেড়াতে গিয়ে শুনি কাগজওয়ালা হাঁকছে, "আবার ভারতবর্ষে ইংরাজ খুন!—'রক্ত ভারত' আবার জেগেছে", ইত্যাদি; শুনে ভারী কৌতূহল হ'ল, একখানা আয়র্লণ্ডের জাতীয়তার মুখপত্র "ফরলেই" (সাধারণতন্ত্র কেনা গেল। দেখলুম, রাইটার্স বিল্ডিংএ ঢুকে ক'জন বাঙালী শিখদল মিলে মহারাসের সকার করেছিল, এবং কে কর্ণেল সিমসনকে খুন করেছে। আবার খুনোখুনি কাণ্ড! ভাবলুম দেখে এ হ'লো কি? দুঃখ হ'ল কেন যে দেশের ছেলেগুলি এভাবে পরের প্রাণ নিচ্ছে—নিজের প্রাণ দিচ্ছে! কিন্তু "ফরলেই" দেখলুম তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এবং বাহবা দিয়ে লিখেছে যে "এইত চাই, এ না হ'লে

কি স্বাধীনতা-লাভ চলে? ভারতবর্ষ এভাবে আয়র্লণ্ডকে অনুসরণ করুক, তাদের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী!"—এবং এই রকম অনেক কিছু। আমার দুঃখ হ'ল এবং মন বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠল। পাশ্চাত্যের কি ভ্রান্ত আদর্শ!

রাত্রিতে শীত একটু বেশীই পড়েছিল বোধ হয়; ডাঃ বসু ও মিসেস্ বসু খাওয়ার পরই ঘরে ঢুকলেন। গায়ে প্রকাণ্ড ওভার-কোটটা চাপিয়ে, পায় হাঁটু-তিন ডাব লিনের রাস্তায় একাই বেড়িয়ে এলুম। একটা জিনিষ দিনের বেলা অতটা লক্ষ্য করিনি, তা হ'চ্ছে, ডাব লিনের প্রত্যেক রাস্তায় সন্ধ্যাতেই মদের দোকান! আরও দেখলুম এবং দেখে অবাক হ'য়ে গেলুম যে কি মেয়ে কি পুরুষ সকলেই গিয়ে ঢুকছে, আর একেবারে লাল হ'য়ে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়িয়ে গল্প করছে! একজন বন্ধুর মুখে পরে শুনেছিলুম, মদটুকু না হ'লে আয়র্লণ্ডের সাধারণ লোকের চলে না। মদ খাবার পয়সা নাই, অথচ তা' খাওয়া চাই-ই চাই! সুতরাং তার জন্য কি মেয়ে কি পুরুষ ছাড়েনি, এক শিলিংএর জন্যও যে-কোন রকম হীনতা প্রকাশ করে! অতরাত্রিতে মদের দোকানের সাম্নে ওটা দেখে, সে কথাটা বোধ হয় অতি-রঞ্জিত নয়, মনে হ'ল।

২৭শে ডিসেম্বর সকালবেলা, ডাব্‌লিনের পার্শ্ববর্তী আর একটি সমুদ্রতীরবর্তী স্থান দেখতে গেলুম। তার নাম হ'চ্ছে হাউথ। ডাব্‌লিন উপসাগরে ৪০০ হ'তে ৫০০ ফিট উঁচু পাহাড়ো স্থান এই হাউথ, একেবারে সমুদ্রের ভিতরেই যেন গিয়ে ঢুকেছে! ট্রাম সমুদ্রের ধারে ধারে যায় এবং 'সুটান' হ'তে একেবারে গিয়ে হাউথের পাহাড়ের উপর উঠে। যেতে যেতে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন শোনা যায় ও তরঙ্গের পর তরঙ্গ ফুলে যেন আকুলিবিকুলি ভাবে আছড়ে পড়ছে, তাই দেখা যায়। বাস্তবিকই তা' এক অভিনব দৃশ্য! পাহাড়ের নীচেই প্রায় একমাইল, "আয়র্লণ্ডের আই" (চক্ষু) সমুদ্রের মধ্যে ঢুকেছে! ডাঃ ও মিসেস্ বসুকে সেখানে রেখেই আমি একা পাহাড়ের উপর চলুম। সেখান হ'তে সাধারণ দৃশ্য যা' দেখা যায়, খুবই চমৎকার! উত্তরের দিকে ফিন্‌গ্লাস সমতলভূমি গিয়ে দূরান্ত মূর্ণ পাহাড়ের গায়ে ঠেকেছে এবং দক্ষিণে শান্‌গানাথ্ উপত্যকা ও উঁচুলো হেড্‌এর নিকটবর্ত্তী সমুদ্র পর্য্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছায়। সেখান হ'তে প্রায় আধঘণ্টা পরে নীচে প্রমিনেডে যেখানে সঙ্গীরা অপেক্ষা করছিল, সেখানে নেমে এলুম। সেখানে এত বাতাস যে মাথায় টুপী রাখা অসম্ভব এবং প্রমিনেডের উপর চলতে গিয়ে মনে হয় যেন বাতাস একেবারে সমুদ্রে ফেলে ফেলে দিচ্ছে! তাই আমরা আর উপরে না গিয়ে নীচে নেমে এলুম। "আয়র্লণ্ডের আই"তে একটি পুরাতন গীর্জ্জার ধ্বংসাবশেষ আছে, কথিত আছে যে গীর্জ্জাটি সপ্তম শতাব্দীতে "সেলানের" পুত্রগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অষ্টাদশীকার উপরই পুনর্নির্ম্মিত হয়েছিল। শুনেছি গ্রীষ্মের সময় হাউথ ঘরে ঘরে 'রডোড্রেনডন'গুচ্ছ বুকে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে এবং তার জলহাওয়া ও সূর্য্যাস্ত উপভোগের জন্য অসংখ্য দর্শকের এখানে সমাগম হয়। হাউথের পাশেই, সুটান নামক স্থান—সমুদ্রস্নানের জন্য প্রসিদ্ধ।

সন্ধ্যায় ডাব্‌লিনের আর একটি বিখ্যাত সিনেমা "কেভেন্ডে" যাওয়া গেল। সেখানে সেদিন 'ফলি-ডে' নামক ফিল্ম হ'চ্ছিল। মন্দ লাগলো না। তবে তার চাইতে অনেক ভাল লাগলো 'সাণ্টা ক্লজ'এর আগমন ও মেয়েদের নানাবিধ নৃত্য। চারিদিকে বরফ পড়ছে, ঘরের উপর গাছগুলি পর্য্যন্ত একেবারে শাদা হ'য়ে গেছে, আর আকাশ হ'তে 'আদিকালের বদ্ধি'-বুড়ো নামছে ওনে,—সে এক অভিনব দৃশ্য! ডাব্‌লিনের সিনেমা-হলের তত্ত্বাবধানকারিণীদের বেশ নূতন ধরণের ও একটু অদ্ভুত। সেদিনই তা' লক্ষ্য হ'ল। ঢিলা শাদা পায়জামা, তার উপর লম্বা গায়ের জামা, মাথায় একটা অদ্ভুত ধরণের টুপী,—এমনি পোষাক যে অন্ধকারেও নজরে পড়ে! পোষাকটা অনেকটা মেয়েদের স্লিপিং ড্রেসের অনুকরণে তৈরী।

সেদিন রাত্রিতেও আবার একা বেরিয়েছিলুম—ডাব লিন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সে রাত্রেও কিছু যে না বেড়েছিল তা' বলতে পারি না। প্রায় রাত্রি এগারোটার সময় ফিরে দেখি মিস্ ঈগান আগুনের কাছে একা ব'সে আছেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রে প্রায় সাড়ে বারোটায় ঘুমুতে গেলাম।

২৮শে তারিখ রবিবার, সকালবেলা হ'তে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল, তবু ট্রামে চ'ড়ে বেরিয়ে পড়া গেল মিউজিয়মের উদ্দেশে। মিউজিয়মটি কিলডেয়ার ষ্ট্রীটে অবস্থিত এবং

আইরিশ সৌরাদিক নানাবিধ বস্তু-সংগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ। সোনা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের নানাবিধ অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্র অতি চমৎকার ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যাতে দৃষ্টিপাত মাত্র তাদের ক্রমোন্নতির আভাস পাওয়া যায়। উদ্ভিদবিভাগও অতি সুচারুরূপে সাজানো আছে, এবং প্রাগৈতিহাসিক কাল হ'তে এখন পর্য্যন্ত আয়র্লণ্ডের সর্ব্বত্র যে সব জন্তুর পাওয়া যায় তাদেরও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাবেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

তা ছাড়া যেখিয়ন স্কোয়ারের আর্ট গ্যালারিটিও দেখ্‌লুম। এটি ইউরোপের আর্ট গ্যালারিগুলির মধ্যে হয়ত অনেক নীচের স্থান অধিকার করে, তবু এর নিজের একটু বিশেষত্ব আছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ গ্যালারির পরই, গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সকল চিত্রকরের এত ছবি এখানে আছে যে অন্যত্র তার একত্র সমাবেশ এত বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। হলাণ্ড স্কুলের ছবিগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তার পরেই ইটালিয়ান্ ও ব্রিটিশ স্কুলের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ 'শল্পী ম্যাডোনাস্', ফ্রা এঞ্জেলিকো, পলিনি, টিশিয়ান, এস্ প্রেকো, গয়া, রুবিনো, পুসিন, গেইনস্‌বরা ও রেনল্ডস্‌এর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আইরিশ শিল্পীদের মধ্যে হোন্, ওস্‌বোর্ণ, মালরেডি, ডিকি ও ও'কনরএর ছবিই অধিকাংশ।

শুনেছি এ ছাড়াও হারকট ষ্ট্রীটে, ষ্টার হিউলেনের বাগানে মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারি স্থাপিত আছে। আধুনিক ব্রিটিশ স্কুলের অনেক চিত্রকরের চিত্র এখানে সন্নিবেশিত আছে; অনেক ফরাসী চিত্রকরেরও আধুনিক ছবি আছে। ফেরিংটন হাউসে, মিউনিসিপ্যাল গ্যালারির জন্য নাকি স্থান বরাদ্দ হয়েছে, শীঘ্রই সেখানে অনেকগুলি চিত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু সময়াভাবে, সে স্থানে যাওয়া আমাদের ভাগ্যে ঘ'টে উঠে নি।

বিকেলবেলার দিকটা বেশী বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই আর বেরুনো গেল না। অপরাহ্ণে আগুনের কাছে ব'সে অনেকক্ষণ নিজেরাই গল্প কর্‌লুম। রাত্রিতে আবার আইরিশ বন্ধু ও বান্ধবীদের মজলিস্ বস্‌লো। তারা সকলেই আমার নিজের রাজনৈতিক মতামত জান্‌তে চাইলে। অনেক পীড়াপীড়িতে বল্‌তে হ'লো, আমি ডাক্তার মানুষ, লোকের নাড়ী টিপে খাই, রাজনীতির বিশেষ কিছু বুঝি না।

১৯শে সকাল বেলা, দিনটা মন্দ ছিল না। তাই আমাদের গন্তব্যস্থান হ'ল, সমুদ্রতীরবর্ত্তী আর একটি সুন্দর স্থান—"ডুন লাগয়ে।" আগে এর নাম ছিল "কিংস্ টাউন"; আইরিশ সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরই বোধ হয় পুরাতন নামটা পরিবর্ত্তন ক'রে নূতন নামকরণ হয়েছে। স্থানটি ডাব লিনেরই দক্ষিণতটীতে অবস্থিত, ডাব লিন হ'তে প্রায় ছ'মাইল দূরে, দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলে। আয়র্লণ্ডে প্রবেশের এই স্থানটি একটি প্রধান দ্বার বল্লেও চলে। এর স্বাস্থ্যকর ও উপাদেয় জল হাওয়ার জন্য অনেক দূরস্থান হতেও অসংখ্য দর্শক এখানে 'হলিডে' যাপনের জন্য আসেন।

সন্ধ্যায় আবার 'কেল্টিক সিনেমা'র ছবি ও নৃত্য দেখ্‌তে গিয়ে প্রায় ঘণ্টা তিন কাটিয়ে আসা গেল।

২০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার, সারাদিনই ঝাপ্‌সা বরিষণ চল্‌ছিল ও সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়ছিল। পথঘাটের অবস্থাও অতি শোচনীয়, সুতরাং বেরোবার মত প্রবৃত্তি কারো ছিল না। যে ক'টি দিন ছিলুম ডাব লিনে, এ দিনটিই সব চেয়ে নিষ্ক্রিয় যাপন কর্ত্তে হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মিস্ ঈগানের নিকট হ'তে,—তার বান্ধাতার আমলের একটা আলমারির ভিতরে অনেকগুলি পুরাতন বই ছিল, তা থেকে একখানা সচিত্র সেক্‌সপীয়রের ১৮১০ সালের ইংরেজী সংস্করণ এবং বায়রণের গ্রন্থাবলীর জীর্ণজীর্ণ একখণ্ড প্রথম সংস্করণ বই পাওয়া গেল। ঐ দুখানি চেয়ে নিয়ে ঘ-ঘণ্টা সময় বেশ কাটিয়ে দেওয়া গেল। মনে আছে, সেদিন রাত্রিতে খানিকক্ষণ ডাঃ দত্তের ঘরে গল্পগুজব ক'রে, একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

১৯৩০ ইংরেজী বছরের শেষ দিন, আজও সকালবেলা ফিনিক্স পার্কে বেড়াতে গেলুম। দুপুর বেলা —ফেট্রোপলিস্ থিয়েটারে। সন্ধ্যার পর আবার নূতন বর্ষের অভিনন্দনের জন্য হোটেলে ক'জন বন্ধুবান্ধবীর সমাগম হয়েছিল, এবং তাস ও তার আনুসঙ্গিক খাদ্য ও পানীয় চল্‌ছিল। সুখে-দুঃখে একটি বছর কেটে গেল, না জানি নূতন বছর কেমনটি হবে, এ কথাই আলাপ হচ্ছিল। ১২টা বাজ্‌বার পাঁচমিনিট

আগে, একজন উঠে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা কর্লেন! তার একটু পরেই কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজ্‌লো; যাঁরা গ্লাস হাতে ব'সে ছিলেন, তাঁরা নববর্ষের স্বাস্থ্য কামনা কর্লেন! তারপর সমস্বরে পুরুষ ও বামাকণ্ঠে মিলিত স্বর উঠ্‌লো, "Happy new year for everybody"। কলের বাশিগুলিও তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে যেন চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো! অদূরবর্ত্তী গির্জ্জার ঘড়ি ঢং ঢং ক'রে বারোটা বেজে নূতন বৎসরকে অভিবাদন কর্লে! বন্ধু-বান্ধবীরা গ্লাস শেষ ক'রে দু'চারজন বন্ধুবান্ধবীদের ওষ্ঠাধর স্পর্শ কর্লেন! এমন সময় 'Happy new year to you all' ব'লে মিস্ উগান ছুটে এসে বল্লেন, "ঈগলির এস, মজা দেখ্‌বে ত এস।" তাঁর নির্দ্দেশমত আমরা ছুটে গিয়ে উপরের জানালা হ'তে মুখ বাড়িয়ে দেখি, দুটি অশীতিপর বৃদ্ধ পরস্পরের গলা জড়িয়ে আমাদেরই হোটেলের দ্বারে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখচুম্বন ক'রে নূতন বছরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কর্চ্ছে! – তাদের আবার দুজনেরই লম্বা পাকা দাড়ি! দৃশ্যটা না দেখলে তার গুরুত্ব উপলব্ধি কর্ত্তে পার্‌বে না,—চাক্ষুষ দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের অনেকেরই পেটে খিল ধ'রে আস্‌ছিল। ১২টা ১০ মিনিটের সময় আমি সকলকে নূতন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লুম। আপনাকে প্রসুপ্তির ক্রোড়ে ছেড়ে দেওয়ার আগের মুহূর্ত্তে যুক্তকরে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে বল্লুম, "হে ভগবান্, সুখে-দুঃখে জীবনের আর একটি বছর শেষ হ'লো। আজ তুমি নূতন বৎসর নিয়ে এসেছ, তুমিই দশ হাজার মাইল দূরে, আমার পিতামাতা, ভাই-বোন-বন্ধু ও অন্যান্য প্রিয়জন যাঁরা, তাঁদের সকলের নূতন বৎসর স্বাস্থ্যে, ধনে, মানে ও সুখশান্তিতে পূর্ণ কর! আমার নূতন বর্ষ সুফলিত কর্ব্বার ভারও তুমিই নাও!" বছরের মধ্যে বোধ হয় এই একটি মুহূর্ত্তই, স্বার্থপরের মত, ভগবানের কাছে অনেক কিছু চেয়ে প্রার্থনা জানালুম।

১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী, নূতন বৎসরের প্রথম দিন, আমাদের ডাব্‌লিন ছেড়ে আসার কথা। সকালবেলা ডাঃ দত্ত বল্লেন, 'সিন্‌নেসের' কারখানা দেখ্‌তে যেতে হবে। তথাস্তু, ট্রামে ক'রে ও শেষে পায়ে হেঁটে অনেকগুলি বস্তী পার হ'য়ে, জনকয়েক ছোট ছেলের মুখে "গ্লাকি" মূর্ত্তি সম্বোধনে আপ্যায়িত হ'য়ে গিয়ে পৌঁছলুম, সুবিখ্যাত মদের কারখানায়। কিন্তু ভৈষজ্যবিপাকে আর ভিতরে যাওয়া হ'লো না। ম্যানেজার বাইরে এসে খুব ভদ্রতা ক'রে ভিতরে নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু বয়েস ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিতরে যাওয়া নিষেধ। তাই, রুকে বাইরে রেখে যেতে হবে, সে ব্যবস্থায় আমরা কেউ সম্মত হলুম না। অগত্যা ভিতরে না ঢুকেই, কতকগুলি ছবি ও বই নিয়ে ফিরলুম সেখান হ'তে, সুপ্রসিদ্ধ 'ট্রিনিটি কলেজের অভিমুখে!

ট্রিনিটি কলেজ, ডাব্‌লিনের একটি মস্ত বড় গৌরব। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বার্কলি, সুইফট্, বার্ক, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি লোক একসময় এরই ছাত্র ছিলেন। শেষোক্ত দুজনের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি কলেজের বাহিরের দ্বারের সম্মুখে স্থাপিত আছে। কলেজের লাইব্রেরীর অট্টালিকাটি একটি প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্যস্থান। ১৭১২ হ'তে ৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এর নির্ম্মাণকার্য্য চলেছিল, এবং এর পুস্তকসংগ্রহ বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ এবং মহামূল্যবান্। লণ্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়ম, কেমব্রিজ্ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী ও এডিনবরা লাইব্রেরীর মতই এটিও একটি কপিরাইট লাইব্রেরী: গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডে যত বই প্রকাশিত হয়, তার প্রত্যেকটির এক একখানি এখানে পাঠাতে হয়। লাইব্রেরীর বইএর সংখ্যা প্রায় পাঁচলক্ষ! তবে সব চেয়ে বেশী গৌরবের জিনিষ, বাইবেলের 'বুক অব কেলস্' পুস্তকের বিশ্ববিখ্যাত হস্তলিখিত সংস্করণ। শুধু এখানি দেখ্‌বার জন্যই অনেক দূরদেশ হ'তে জ্ঞানপিপাসীগণ ট্রিনিটি কলেজের পুস্তকালয়ে আসেন। বেরিয়ে আসবার সময়, আমাদের প্রত্যেককেই দর্শকদের তালিকা পুস্তকে নামসই ক'রে আস্‌তে হ'লো।

অপরাহ্ণ প্রায় প্রায় পাঁচটার সময় আমাদের জাহাজ ছাড়্‌বার কথা। তাই প্রায় সাড়ে চারটার সময়, হোটেলস্থিত দর্শকদের বন্ধু ও বান্ধবীদের নিকট বিদায় গ্রহণ কর্লুম। মনে অল্প দুঃখও হচ্ছিল, বাস্তবিকই এ ক'টা দিন খুব স্ফূর্ত্তিতে ও মনের আনন্দে কাটিয়েছিলুম অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে। মিস্ উগান ও আর দু'তিনজন বন্ধু আমাদের হোটেলের দ্বার পর্য্যন্ত বিদায় দিতে এসেছিলেন। সকলের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে, মিস্ উগানের

দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লুম, "বিদায় মিস্ ইগান!"

তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ অদ্ভুত হাসি হেসে বল্লেন, "হাঁ, মিঃ পাল, যে পর্য্যন্ত না আবার সাক্ষাৎ হয় ততদিনের জন্য বিদায়!"

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বল্লুম, "হাঁ মিস্ ইগান, ততদিন যদি বেঁচে থাকি!"

মিস্ ইগান গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "হাঁ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমরা আমাদের বন্ধুকে শীঘ্রই আবার সুস্থ শরীরে আমাদের মধ্যে দেখ্‌তে পাব।"

ধন্যবাদ দিয়ে এসে গাড়ীতে চড়্‌লুম। ডাঃ ও মিসেস্ দত্ত পুত্রসহ আগেই গাড়ীতে উঠে বসেছিলেন। চালক গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলে, গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লুম, দরজায় দাঁড়িয়ে দশদিনের প্রবাসের বন্ধু ও বান্ধবীরা হাত নেড়ে বিদায়সম্ভাষণ জানাচ্ছেন; এমন কি বেয়ারা পরিচারক আর্দ্দেলী পর্য্যন্ত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে আছে—।

দুঃস্বপ্ন

শ্রী অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন দেখি—'প্রিয়া মোর নাই,
সে যেন মরিয়া গেছে,
শ্মশানে পুড়িয়া দেহ ছাই!'

এ যে স্বপ্ন, এত' মিথ্যা জানি;
তবু এ দেয় যে ব্যথা,
মরি যদি—ভালো ব'লে মানি!

আমারে জাগায়ো ঘুম থেকে,
ওগো প্রিয়া কানে-কানে ডেকে।

স্বপ্ন দেখি—'আমি চ'লে যাই
আমার প্রিয়ারে ছাড়ি',
কাঁদিয়া আকুল সে যে তাই!'

এ যে স্বপ্ন, এত' সত্য নয়;
তবু এ দেয় যে ব্যথা,
মরি যদি—ভালো মনে হয়!

আমারে জাগায়ো ঘুম থেকে,
দেহ পরশিয়া দিও ডেকে।

আয়ুর্বেদে নারী

শ্রীযুতী কে, সুভদ্রা আম্মা হইতেছেন প্রথম ত্রিবাঙ্কুর-মহিলা যিনি প্রথম বিভাগে প্রসিদ্ধ আয়ুর্বৈদিক বৈদ্যকলা-নিধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইঁহার কৃতিত্বের জন্য ইনি স্বয়ং ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণীর হাতে স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন। ত্রিবন্দ্রমে "সরস্বতী-বিলাস ঔষধালয়" নামে ইঁহার একটি প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান আছে।

বাঙ্গো-বাদন

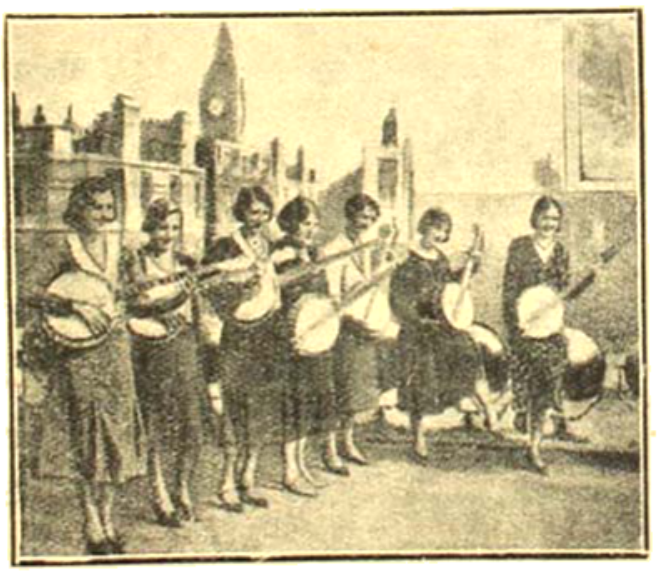

লণ্ডন, 'সেন্ট্রাল হল'-এর উন্মুক্ত ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় বাঙ্গো-বাদিনীরা দশ ব্যাঙ্গো বাজাইতেছেন।

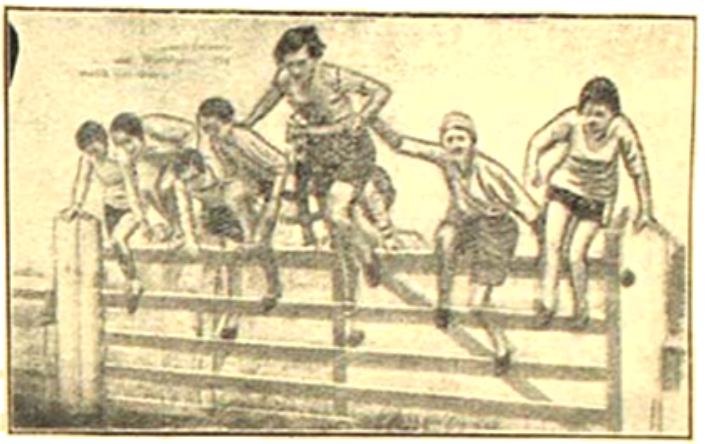

দৌড়-প্রতিযোগিতা

ইংলণ্ড, মিডলসেক্সের একটি দৌড়-প্রতিযোগিতায় বালিকা প্রতিযোগিনীরা বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন।

হাফেজ ও রবীন্দ্রনাথ

কাদের নওয়াজ বি-এ

আজ আমরা দুজন বিশ্বকবির বিষয় সসঙ্কোচে বর্ণন করতে যাচ্ছি, তাঁদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করতে চাইনে, উভয় কবির বিভিন্ন কবিতা প'ড়ে সে সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে কিছু আলোচনা করব ব'লে ঠিক করেছি। অবশ্য, বিশদভাবে সমালোচনা সম্ভব হবে না, তাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

আলোচ্য দুজন কবির মধ্যে একজন আসর কবি হাফেজ, তাঁর জন্ম পারস্য দেশের সিরাজ নগরে, যেখানে দিন-রজনী ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে, আর "চাহ্" "চাহ্" রবে গুলিস্তানে বুলবুল্ ডাকে। আর একজন হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর জন্ম আমাদেরি বাংলা দেশে, যেখানে "উতলা কলাপী কেকা-কলরবে" ডাকে, আর "কৃষ্ণপক্ষে রজতবর্ণ চাঁদ" দেখা দেয় নীল নীরদের ফাঁকে।

হাফেজের শ্রেষ্ঠ কাব্য তাঁর 'দীওয়ানে-হাফেজ'; রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য তাঁর গীতাঞ্জলি (অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে উভয় কবির কবিতাতেই সঙ্গীত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। হাফেজের গজলের খ্যাতি গান হিসাবে দেশ-বিদেশে খুব বেশী; রবীন্দ্রনাথেরও তাই। তবে এক কথা – এক শ্রেণীর গান আছে তাতে ভাবের গভীরতা কিছুমাত্র নেই, আছে শুধু কথার মায়াজাল রচনা, আর আছে abnormal sensuality। গান হিসাবে সেগুলি জনপ্রিয় হ'লেও কবিতা হিসাবে তাদের মূল্য অকিঞ্চিৎকর, তাই একজন পাশ্চাত্য কবি বলেছেন, "They are like prodigious helmet containing a head as small as the size of a walnut." সুখের বিষয়, আমাদের আলোচ্য দুজন কবিই উল্লিখিত দোষের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করছেন। হাফেজের গজলের অধিকাংশই মনে বৈরাগ্য ভাবের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথের গানও ঠিক তাই; যখন শুনি,—

"আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী,
আমি উৎসুক উদাসী।"

তখন মনে হয় দেহের সসীম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে আত্মা আর কোন রকমেই থাকতে চায় না। সে বলতে চায়—"ওগো সুদূর, তুমি যে বাজাও বাঁশরী মনের বনের হরিণ সেই বাঁশীর রব শুনে উদাও হ'য়ে যেতে চায়।

হাফেজের কবিতাও প্রাণে ঠিক এই একই ভাবের উদ্বোধনার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ দীওয়ানে-হাফেজের

২১৫ পৃষ্ঠায় "হিজাব্ চেহ্রায়ে তা' মিশওয়াদ" ইত্যাদি, এই পংক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাহার অর্থ—"আমার এ পঞ্চভূতের শরীর আত্মারূপ খোসটা-স্বরূপ; কী সুখের সময় হবে যখন এ খোসটা খ'সে যাবে! আমার মত সুফীর বিশ্বপ্রেম এ পিঞ্জর উপযুক্ত নয়। আমি সেই বেহেস্তের বাগানের বুলবুল, সেখানেই আমি যাব। কোথায় ছিলেম আর কেন এসেছি এ রহস্যের উদ্ঘাটন আজ পর্য্যন্ত হয় নি। দুঃখের বিষয়, যে কাজের জন্য এসেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভুলে থাকলুম। কী ক'রে আমার প্রিয়ার মুখের চতুর্দ্দিক আমি প্রদক্ষিণ করব? জড় দেহের শতবন্ধনে আবদ্ধ আমি। আমার হৃদয়-রক্ত থেকে যদি প্রেমের গন্ধ পাও তবে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হ'য়ো না। বলতে কি আমার বাসস্থান হুরীদের দেখার উপযোগী, কেন আমি এ আস্তাকুঁড়ের ঘর বেঁধে থাকব। তুমি এস, আর হাফেজের অস্তিত্ব মুছে ফেলে দাও তার সামনে থেকে। আমি যে কে তা আমার কাছে তুমি ভিন্ন আর কেউ শুনবার নাই।" এর চাইতে সংসারবিরাগী ভাব আর কী হ'তে পারে?

এবার আমরা "দীওয়ানে-হাফেজ," "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতি থেকে কবিতা উদ্ধৃত ক'রে উভয় কবির স্বরূপ দেখাতে চেষ্টা করব। 'দীওয়ানে-হাফেজে'র সর্ব্বপ্রথম কবিতার প্রথম দুচরণ, যথা—

"আলাস্তা আই ওয়াস্ সাকী আজের কাসান্
অনাভিস্ দা,
কে এসক্ আসাঁ নমুদ আউওল্ ওলে উফ্তাদ
মুশ্কিল দা।"

(অনুবাদ)

দাও সাকী দাও আঙুর-সুরা
ঘুচিয়ে তোমার লাল পেয়ালা,
প্রেম যে প্রথম বড়ই মধুর
কিন্তু শেষে বিষের জ্বালা!

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সর্ব্বপ্রথম কবিতার দুটির দুচরণ, যথা—

"আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে উভয় কবিরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। হাফেজ বলতে চান, প্রেম আপাত-মধুর, সেখানে শেষরক্ষা করা বড় কঠিন। তাই বাহ্যিক কবিজন যাতনায় অস্থির হ'য়ে শান্তি পাবার জন্য সাকীর শরণাপন্ন হ'য়ে পড়েছে। এস্থলে সাকীর অর্থ কেউ বলবেন, মুর্শিদ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের পথপ্রদর্শক, আবার কেউ হয় ত অন্য কিছু বলবেন। সে নিয়ে পণ্ডশ্রমের দরকার নেই, 'সাকী'র মানে এখা না যা'ই হোক্ না কেন তাতে কবিতা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে—" ইত্যাদি।

এস্থলে কবি বলতে চান—প্রথম জীবনে তিনি সংসারেই মন দিয়েছিলেন কিন্তু নিজেকে "গৌরব দান" করতে গিয়ে পদে পদে অপমানই বরণ করতে হয়েছে, নিজের "আমিত্বে"র উপর যে বিশ্বাস ছিল তা চূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে তাই শেষ-আশ্রয় গ্রহণ করছেন সাকীর নয়, তাঁর আরাধ্য দেবতার চরণতলে। এস্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে যাত্রা সুরু করেছেন হাফেজ অনেক আগেই সে স্থান পেরিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সংসারের বাহ্যজাল থেকে মুক্ত হ'য়ে সবেমাত্র যাঁর পায়ে "মাথা নত" করছেন হাফেজ আগেই তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত হ'য়ে তাঁর আরাধনা শেষ ক'রে ফেলেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে প্রেমের পথ প্রথম কুসুমাস্তীর্ণ মনে হলেও শেষরক্ষা করা বড়ই কঠিন। তাই বহু বাধা-বেদনা ভোগ ক'রে কবি শেষ-আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁর আরাধ্যজনকে বাদ দিয়ে অন্য এক জনের অর্থাৎ 'সাকী'র।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে একটু লক্ষ্য করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে কবি সব সময়েই বলছেন, "তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে।" তাঁর ইষ্টদেবতাকে যে তিনি পেয়েছেন একথা গীতাঞ্জলির কোন কবিতাতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি একস্থলে বলছেন—

"নয়নে ঘুম নিল কেড়ে
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে
দেখে আঁখি চেয়ে দেখি
পাইনে দেখা তায়।"

আবার বল্‌ছেন—"আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা—"

"সে যে পাশে এসে বসেছিল"—কবিতার শেষ ভাগে বল্‌ছেন—

"কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়েও কাছে না পায়—"

অন্য একটি কবিতায়—

"কেন আমায় নাম ধরে আর
ডেকে রাখো,
চিরজনম এমন ক'রে
ভুলিয়ো নাকো।"

আর একস্থলে বল্‌ছেন—"প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে
দেখা নাহি পাই
পথ চাই—"

এম্‌নি বহু কবিতায় এই একই সুর ধ্বনিতে হ'চ্ছে—"তোমাকে আমি পাই নি।"

"দীওয়ানে-হাফেজ" কিন্তু অন্য রকমের। সেখানে অনেক কবিতা আছে যা থেকে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে "কবি তাঁর চির-আরাধ্যা ও চির-বাঞ্ছিতার দেখা পেয়েছেন।"

"বয়খিজ্‌ তাতরিক্‌ তাকানুদ্‌ কিফাকুনেম্‌" ইত্যাদি, এই কবিতায় একস্থলে হাফেজ বল্‌তে চান—প্রণয়িনী আমার কাছেই ছিলেন, কিন্তু এখন আমাকে ছেড়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুর কাছে গিয়েছেন। এস আমরা আমাদের সহ্য করার বসন ছিন্ন ক'রে ফেলি। এই কবিতার আর একস্থলে বল্‌ছেন—আমি একবার যখন আমার প্রণয়িনীর "দামন" অর্থাৎ কাপড়ের খুঁট ধর্‌তে পেরেছি তখন আমার হাত থেকে আর ছাড়ায় কে? আর একস্থলে বল্‌ছেন—প্রণয়িনীকে বল্লাম, এখনও তোমার ঠোঁট্‌ থেকে আমার যে উদ্দেশ্য তা পূর্ণ হয় নি; সে বল্ল, কিছুক্ষণ সবুর কর, আমি তোমার আশা পূর্ণ কর্‌ব।

'ইয়ারব্‌ সাবাবে সাজ্‌কে ইয়ারম্‌ বদ্‌লামাং" ইত্যাদি, এই কবিতার একস্থলে কবি বল্‌ছেন—হায় আমি নাই কোথায়, আমার ছয় দিক বন্ধ কর্‌ছে আমার প্রিয়ার ছয়টি জিনিষ, যথা—তিল্‌, খত্‌, জুল্‌ফ্‌, মুখমণ্ডল, বাহুদ্বয় আর সুঠাম দেহ।

এই সব উদাহরণ থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে কবি তাঁর আরাধ্যা প্রিয়ার দেখা পেয়েছেন যা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কোন কবিতাতেই ব্যক্ত নয়। এস্থলে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। হাফেজের প্রেমের পরিণতি কোথায়? "দীওয়ানে-হাফেজের" গজলে ছত্রে ছত্রে যে আকুল আহ্বান, ব্যথার হাহুতাশ, তা থাকে লাভ কর্‌লেই কি তার পূর্ণ শান্তি হ'য়ে যায়? কখনই নয়। হাফেজ নিজেই একটি গজলে এর উত্তর দিয়েছেন, যথা—"বোল্‌বোলে বাগ্‌মে গোলে খোশ্‌ রঙ্গে দার্‌ মেনকার দস্ত্‌", ইত্যাদি। অর্থাৎ একটি বুল্‌বুল্‌ পাখা সমেত একটি গোলাপকে মুখে ক'রে কাঁদ্‌ছিল। আমি প্রশ্ন কর্‌লুম, তুমি যার জন্য কাঁদ্‌ছিলে তাকে পেয়েছ, সে তোমার কাছেই আছে, তবু আবার কাঁদ্‌ছ কেন? বুল্‌বুল্‌ উত্তর দিল, আমার প্রিয়া আমার জন্য এই কাঁটাই নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে। অর্থাৎ প্রিয়াকে পেয়েও পাইনি, যত দেখি তত চেয়ে থাকি, যেন সাধ মিটে না আরও দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়—একেবারে আত্মা তার সাথে মিশে এক হ'য়ে যেতে চায়! এই ত' প্রেমের চরম পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বল্‌ছেন—

"চাব না কিছু কব না কথা
চাহিয়া রব বদনে হে!"

চির-আরাধ্য দেবতার দেখা পেলে যে অবস্থা হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথ ঠিক্‌ সেই কথাই বল্‌তে পেরেছেন এখানে। নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে উৎসর্গ ক'রে দেওয়াই হ'চ্ছে এস্থলে প্রেমের চরম উদ্দেশ্য—তখন মনে কোন বাসনা-কামনাই থাক্‌বে না, কেবল প্রাণে জাগ্‌বে সেই একই ছবি একই সুরের প্রতিধ্বনি। সে যা'ই হোক্‌, তবে এ কথা স্বীকার না ক'রে পার্‌ছিনে যে প্রেমের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন একদিক দিয়ে যেন হাফেজের অনুর্দ্ধে স্থরে। কবি নিজেই গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় বলেছেন—

"দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে
আপন জেনে আদর করিনে,
পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে
বন্ধু ব'লে দুহাত ধরিনে।"

এখানে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কবি যাঁকে "অন্তরতর" রূপে উপলব্ধি করেছেন তাঁকে এখনও সম্পূর্ণ আপনার ক'রে নিতে পারেন নি,যেন অনেকটা সঙ্কোচ র'য়ে গি ছে; তাই কবি কখনও তাঁকে দেবতা বল্‌ছেন, কখনও তাঁকে পিতা ব'লে প্রণাম কর্‌ছেন, কিন্তু বন্ধু বল্‌তে যেন সঙ্কোচ বোধ হ'চ্ছে। অবশ্য একটু পরেই গীতাঞ্জলির আর একটি কবিতায় কবি সে সঙ্কোচটুকু দূর ক'রে ফেলেছেন, যথা—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।"

অতঃপর আর একটি কবিতায় বল্‌ছেন—

"সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি,
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!"

কিন্তু কবি যা'ই বলুন, হাফেজের মত অতটা নিকটে তিনি একবারেই যেতে পারেন নি। স্বামী-রূপে কল্পনা কর্‌লে যেন নিজেকে কল্পিতের কাছে ছোট হ'য়ে থাকতে হয়, তাঁর সেবিকা হ'য়ে থাকতে হয়। তাই হাফেজ সব চেয়ে নিকটতম সম্বন্ধ যাঁর সাথে, অর্থাৎ প্রিয়া, "মাশুক," তাই ব'লে কল্পনা করেছেন তাঁর আরাধ্যা ও বাঞ্ছিতাকে। এ সম্বন্ধে কবি বল্‌ছেন তাঁর একটি গজলে—

"বয়িদ্ তাতবিক্ তা কাললুক্ রিয়াকুনেম্।"

অর্থাৎ এস আমরা সঙ্কোচ ও কুণ্ঠার পথ ছেড়ে দিই, প্রিয়াকে চেনার অমূল্য রত্ন সকলের জন্য সস্তা ক'রে দিই।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা আর একটি বিষয় দেখ্‌তে পাই যে বাহ্যিক সৌজন্য দেখাবার জন্য কবি সব সময়েই ব্যস্ত, সব সময়েই তিনি সতর্ক—যেন আরাধ্যের আত্ম-সম্মানে ভুল করেও আঘাত না করেন। তাই বল্‌ছেন—

"জানি আমার কঠিন হৃদয় চরণ রাখার যোগ্য সে নয়;"

আবার বল্‌ছেন—"ব্যথা দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধূতে,
নইলে কি আর পায়ব তোমার
চরণ ছুঁতে?"

শুধু তা'ই নয়, বাহ্যিক উপকরণ অর্থাৎ সাজ-সরঞ্জামের প্রতিও কবির দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ; কখনও বল্‌ছেন—

"ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি,
দেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি'।"

আবার কখনও বল্‌ছেন—"এ মলিন বস্ত্র ছাড়্‌তে হবে
হবে গো এইবার—"

হাফেজ কিন্তু ওসব বাহ্যিক সৌজন্য, লৌকিকতা ও সাজ-সরঞ্জামকে ছাড়িয়ে দূরে চ'লে গিয়েছেন। প্রিয়া তাঁর কাছে আস্‌বেন, সেজন্য কমলাসন কিম্বা পারস্য দেশের মণিমুক্তার আসন, কোন আসনই তিনি পাতেন নাই, বরং এই সমস্তকে তাঁর পথের অন্তরায় ব'লে মনে করেছেন; তাই বল্‌ছেন একটি গজলে—

(অনুবাদ)

"বার্ষিকেরি সঙ্গে কবু
ভাব রেখ'না প্রেমের লাগি',
ভালবাসার ধার ধারে না
মূর্খ ওরা ঘুমায় জাগি'।
প্রেম যদি চাও জ্ঞানের তালাস্
ব্রহ্মেও কবু কর্‌বে নাক,
টিপ্‌বে না কেউ তস্‌বি হাতে
আল্‌খেল্লা পর্‌বে নাক;
পথ ভুলাতে প্রেমের পথে
আলেম্‌রা সব ঘুমুচ্ছে নিতি,—
প্রেম যদি চাও সাকীর সাথে
গাও প্রেয়সী সুরার প্রীতি!"

শুধু তাই নয়, কবি স্পর্দ্ধা ক'রে বলেছেন—"বার্ষিকেরি পেশ্‌বাকে আজ আগুন শিখা ধরিয়েছে!—" অতঃপর মূল ফার্সি দীওয়ানে-হাফেজের ১৮২ পৃঃর শেষভাগে কবি লিখ্‌ছেন—

"হাফেজের গায়ে ফকিরীর উপযোগী যে পোষাক আছে তার কোন মূল্যই নাই, একে মদে রঞ্জিত ক'রে আনো,তার-পর কাওজ্ঞানহীন মত অবস্থায় তাকে কেনা রাখো।"

আরাধ্যা প্রিয়ার প্রতি হাফেজের যে কত বেশী আকর্ষণ তা বেশ বুঝতে পারা যায় যখন কবি বলেন—

"সত্যি প্রিয়ে তোর কথাতে
মস্‌জিদের ঐ পুণ্য-ঠাঁয়ে
সারাব চালি' নিত্য উলাড়
করতে পারি মনের জ্বালা!"

আবার একটি কবিতায়, যথা—"ইয়ারাব সাবাবে সাজকে ইয়ারম্" ইত্যাদির শেষভাগে হাফেজ লিখছেন—"আমি কি তোমার অত্যাচারে কখনও যাতনাব্যঞ্জক চীৎকার করতে পারি? তোমার অত্যাচার যে আমার পক্ষে অনুগ্রহ স্বরূপ। হাফেজ কি তোমার ভ্রূকুটির আলোচনা ত্যাগ করতে পারে! এই আলোচনা কিয়ামতের দিন পর্য্যন্ত চলতে থাকবে।"

আর একস্থলে কবি লিখছেন—

"সত্যি প্রিয়ে, আমায় যদি আপনাতে চাও এবার
পুড়িয়ে দিতে অনল-মাঝে, দেখবে তবে যন্ত্রণায়
অশ্রুশীতল কর্ণা পানে ফিরেও কভু একটিবার
চাইব নাক, সইব হেসে তোমার দেওয়া সব ব্যথায়!"

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পাই—

"সেই চরণ পাইলে মরণ মাঝির
সাধিয়া সাধিয়া রে"!

এখানে যুগপৎ ভক্তি ও প্রেম যথেষ্ট আছে কিন্তু হাফেজের মত কবি কোথাও বলেন নি যে তাঁর আরাধ্য ও বাঞ্ছিতের জন্য তিনি অসাধ্যও সাধন করতে পারেন, এমন কি কঠোর সমাজ বন্ধনও ভেঙে চুরমার ক'রে দিতে পারেন।

গীতাঞ্জলির একস্থলে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"আমার এ প্রেম নয় ত ভীরু
নয় ত হীনবল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হ'য়ে
ফেলবে অশ্রুজল!"

প্রিয়তমার বিরহে অশ্রু করা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু হাফেজের কবিতায় এই অশ্রু বড় দেখা যায় না। কারণ যে অবস্থায় পড়লে প্রেমিকের অশ্রুপাত হয় হাফেজ সে অবস্থা আগেই পেরিয়ে গিয়েছেন। তাই "আজ খুন্ দিল্ নতাজম্ নজ্‌দিক্ ইয়ারনাবা" (বক্ষ চিরি' রক্ত দিয়ে লিখ্‌ছি চিঠি প্রিয়ার সম) এই কবিতার ৪র্থ লাইনে হাফেজ বলছেন—

(অনুবাদ)

"মোর নয়নে তোর বিরহের
চিহ্ন কতই রয় প্রেয়সী,
নেই শুধু হায় অশ্রুকণা,—
চিহ্ন এ যে ভীষণতম!"

সে যা'ই হোক্ একদিক দিয়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কিংবা আর কেউ আছেন ব'লে মনে হয় না। এদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। সত্যই প্রকৃতির ভিতর দিয়ে নিজের আরাধ্য জনের অস্তিত্ব উপলব্ধি এমন ক'রে কোন কবিই করতে পারেন নি। ইহা রবীন্দ্রনাথ—একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব সৃষ্টি। মিলটন, কীটস্, শেলি থেকে সুরু ক'রে আধুনিক "ওয়ালটার ডি লা-মায়ার", রুপার্ট ব্রিজেস প্রভৃতি কোন পাশ্চাত্য কবির কবিতাতেই উপরোক্ত ভাবের অভিব্যক্তি নাই। বহুদূর জানা যায় হাফেজের কাব্যেও ঠিক এ ভাব কোথাও ব্যক্ত হয় নাই। অথচ গীতাঞ্জলির অধিকাংশ কবিতাই এই ভাবের অনুপ্রেরণায় রচিত। যথা—শ্রাবণের বৃষ্টি-পতনের শব্দে কবি সচকিত হ'য়ে বলছেন—

"শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে,
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ালে এলে।"

আবার শরৎকালের শিশিরসিক্ত মাঠের পানে চেয়ে কবি বলছেন—

"শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে,
আনন্দ-গান গা'রে হৃদয় আনন্দ-গান গা'রে।"

কবি আর একটি কবিতায় বলছেন—

"দিবস-রজনী আমি যেন কার
আসার আশায় থাকি...
কে এসেছে ব'লে চমকিয়া চাই
কাননে ডাকিলে পাখী!"

শুধু পাখীর ডাকে না বসন্তের সঙ্গীতেও কবি সেই আরাধ্য জনের আভাস পেয়েছেন যাকে তিনি খুঁজছেন জীবন ধ'রে,—তাই কবি বলছেন—

"এস হে গিরিশিখর চুমি'
ছায়ায় ঘিরি' কানন-ভূমি
সপন ছেয়ে এস হে তুমি
গভীর গহনে!"

এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত গীতাঞ্জলি থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেখানো যেতে পারে। Mathew Arnoldএর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় উল্লিখিত যে-কোন কবিতা আরব দেশের মরুভূমিতে গিয়ে পাঠ করলেও বলতে পারা যায়, "এ রবীন্দ্রনাথের।"

এবার আমাদের উভয় কবির কবিত্বশক্তি ও যশোবিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। কিন্তু আপাততঃ তা থেকে আমাদের নিরস্ত হ'তে হ'ল, তার দুটি কারণ—

প্রথম—প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়।

দ্বিতীয়—রবীন্দ্রনাথ আজো জীবিত। কবি আরো-আরো দীর্ঘায়ু হ'ন্। কেবল আমরা বলতে চাই যে কবির কবিতার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা যায় না তাঁর জীবদ্দশায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথেরও নয়। তবে হাফেজ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে কষ্টকল্পনায় ও স্বভাবের বিপরীত ভাব বর্ণনায় তাঁর লেখনী কখনও পরিচালিত হয়নি। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভা তাঁর নয়। উপসংহারে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ ও হাফেজের কাব্য-সমালোচনার যোগ্যতা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু যে-কোন বিষয়ে স্বাধীন ভাবে মতামত দেওয়ার অধিকার সকলেরই থাকে,—সুতরাং আমারও আছে।

বাংলা-মেয়ের চিঠি

শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অনেক দূরে এইছি চ'লে ওমা,
পুরানো সব দিনের কথা চিত্তে আছে জমা।
মনে পড়ে কতদিনের পুরানো সব কথা,
সে দিনগুলো মনের মাঝে জাগায় শুধু ব্যথা।
আমায় মা তুই গেছিস্ ভুলে, পড়ে না আর মনে,
তুই যে ওমা জেগে আমার মনে রাত্রি দিনে!
দিন ও রাত্তি যায়—
তোর কোলেতে কবে মাগো, ফিরব পুনরায়?
ওমা, আমায় কোন্ সে দিনে কাহার হাতে দিলি,
এমনি ক'রে আমায় 'পরেই শোধটা মা তুই নিলি?
পাঠিয়ে দিলি আমায় দেখায়, ভাব্‌লিনে মোর কথা,
জান্‌লিনে মা পরের কাছে পাচ্ছি কত ব্যথা।

সকাল বেলা বিছনা হ'তে উঠি,
সারাদিনটা খাটছি শুধু, নেইকো তিলেক ছুটি।
এবা যে মা দেয় না ধরা, অনেক দূরেই থাকে,
তোমার কথাই আমার মনে জাগে কাজের ফাঁকে!
কেউ তো গো মা মিষ্টি কথা দেয় না ঢেলে কানে,
বোঝে না মা ব্যথা কতই জাগ্‌ছে আমার প্রাণে।
ওমা, তোমার মেয়ে
পত্র তোমার পাওয়ার আশায় থাকে যে পথ চেয়ে!
লিখন যখন দেয় মা চিঠি, মনটা আমার ছোটে,
পাওয়া যখন যায় না কিছুই, কেঁদে তখন লোটে।
ওমা, আমায় এমনি ক'রে সবাই ভুলে গেলি,—
পেটের মেয়ে দূর ক'রে মা, সুখটা কি তুই পেলি?

সকাল বেলায় চাই যে আকাশ পানে,
মনে ভাবি—তোমরা কোথায়, হায়রে কে তা জানে ?
এরা জানে খাটিয়ে নিতে, চায় না মুখের দিকে,
ওমা, আমার যন্ত্রণা যা, কি জানাব লিখে ?
সেদিন ওমা, জ্বর যে এল, উঠ্‌তে পারি নাই,
কত কথাই এরা আমায় শুনিয়ে দিলে তাই।
মাঝে মাঝে মোরে—
দূর ক'রে দেয়, উঠ্‌তে না দেয় তাদের ঘরে দোরে।
সইব কত বল্ দেখি মা, সইতে নাহি পারি,
বুক ভেঙে যায়, কষ্টে কত ঢালি নয়নবারি !
সবাই বলে—"মা কি কিছু শিখায় নি ছি তোরে ?
হতচ্ছাড়ি, হাড় জ্বালালি এমনি ক'রে ক'রে !"

দিন যে কত এল, গেল চ'লে—
কোথায় তুমি, কেমন আছ, কেই বা আমায় বলে ?
ছোট্ট গাঁয়ের সবই কি মা, তেমনি আজও আছে,
এখনও কি তেমনি পাখী শিষ্ দিয়ে গান গাছে ?
আজও কি মা, নদীর ঘাটে তেমনি সবাই আসে,
গল্প করে,—কাপড় কাচে, তেমনি করেই হাসে ?
আজও নদীর জলে,
তেমনিতর ঢেউ তুলে কি নৌকাগুলো চলে ?
দাঁড়ি মাঝি তেমনি ক'রে আজও গাহে গান—
তেমনি ঘুরে বাজে বাঁশী, তোরা কি দিস্ কান ?
তেমনি রাতে শিউলি ফোটে, সকাল বেলায় ঝরে,—
ছেলে মেয়ে কুড়ায় কি মা, তেমনি যতন-ভরে ?

তেমনিতর বকুল ফোটে গাছে—
মালা গেঁথে গলায় প'রে তেমনি সবাই নাচে ?
হ্যাঁ মা, আমার সোনা ভাইটি এখন কতবড়,
এখনও কি তেমনি ক'রে পীড়ন তারে কর ?
কাজের বেলায় দুইপনা করত যখন সোনা,
রাখ্‌তে বেঁধে—বল্‌ত কেঁদে—'করব না আর, ওমা !'

কেমন বাড়ী গাই—
কতখানি দিচ্ছে সে দুধ, শুধাই যে আজ তাই।
ভুলিনি মা কারও কথা, ভুলতে নাহি পারি,
ছোট্ট গাঁয়ের স্মৃতি এ মন যায়নি আজও ছাড়ি'।
সেদিন আমি ভাবিনিকো, ছোটখাট কথা
এমনি ক'রে ভবিষ্যতে দেবে আমায় ব্যথা !

ওমা, আজি লুকিয়ে এই ঘরে,
আমার মনের গোপন কথায় দিচ্ছি কাগজ ভ'রে।
ভাবছ তুমি—বড্ড সুখে আছে তোমার রাণী,
বড়-লোকের ঘরের সে বউ, অনেক ভাগ্য মানি।
বড়-ঘরে নেইকো মা সুখ, বদ্ধ আঁটা ঘর,
পাইনে আমি দিনের আলো, সূর্য্য-চাঁদের কর।
অন্ধকারেই থাকি—
বাঘ হ'য়ে অতীত পানে রাখি সজল আঁখি।
বড়-ঘরে গাঁয়ের মেয়ে পায় না কোন সুখ,
এখানে যে উছ্‌লে পড়ে হৃদয়ভরা দুখ।
মন যে আমার ছুটছে আবার মোদের ভাঙা ঘরে,
ওমা আমায় ডাক দিয়ে নে,—ডাক দিয়ে নে মোরে।

এখানেতে থাকলে পরে, ওমা,
মেয়ে তোমার মরবে জেনো, কোর' আমায় ক্ষমা !
বাপ-মা তুলে' নিত্য গালি সয় না আমার আর,
উপায় কিছু করব এবার, তাই জেনো মা সার।
গয়না-পরা চাইনে আমি, চাইনে কোঠাঘর,
এ যাতনা সয় না আমার, ছোসনে মা তুই পর।
তোর সে সাধের রাণী
কঙ্কালসার হয়েছে মা, মরবে এবার জানি।
মাংসগুলো দেছি ডালি, চামড়া ও হাড় আছে,
তারেই নে মা বুকে টেনে, ডাক্ মা আমায় কাছে !
মায়ের বিমল বরে মেয়ে আবার বেঁচে উঠি ;—
নইলে জেনো, রাণী মেয়ে চিরতরেই ছুটি !

প্রাচীন বাংলার নারী-জীবনে আনন্দের স্থান

শ্রী শুকসদয় দত্ত আই-সি-এস্

প্রাচীন বাংলার মানুষের জীবনে ক্রীড়ার এবং ব্রতের যে অনিন্দ্যসুন্দর বিকাশ ও সমন্বয় হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রাচীন বাংলার প্রাণে মুক্তভাব ছিল বলিয়াই ব্রতের ও ক্রীড়ার এই অনুপম বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। এই মুক্তভাব যে কেবল প্রাচীন বাংলার পুরুষদের জীবনে নয়, মেয়েদের জীবনেও ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অ-ভারতীয় বর্বর অবরোধ-প্রথা তখন বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপ্ত হয় নাই; এবং যাঁহাদের অন্তরের পবিত্র আনন্দ-উৎসের প্লাবনে পরিবার ও সমাজ সৌন্দর্য্যময় ও আনন্দময় হইয়া উঠিবে, সেই কল্যাণী রমণীকুলের জীবন তখন এখনকার মত নানা বিধিবিধানের সীমাহীন নিগড়ে শৃঙ্খলিত হইয়া নিরানন্দতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল না। ব্রতোপলক্ষে, পূজাপার্ব্বণে ও বিবাহাদি উৎসবে, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘরে ঘরে বালিকা-প্রৌঢ়া-নির্ব্বিশেষে রমণীগণ তাঁহাদের মুক্ত-জীবনের সহজ আনন্দের পরিস্ফূরিত নির্ম্মল নৃত্যগীতে বাংলার গৃহ ও সমাজকে তখন আনন্দময় করিয়া তুলিতেন;—তাহাতে কেহ কখনও কোন কুৎসিত ভাব মনে স্বপ্নেও আনিত না, এবং ঘরে ঘরে মৃন্ময়ীদের আকার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য ও আনন্দব্যঞ্জক আলিম্পন-কলায় সুমধুর ও সুন্দর চিত্রণ বাংলার পল্লীজীবনকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া রাখিত। অনেকে হয়ত বলিবেন যে এসব মান্ধাতার আমলের কথা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। বাংলার পল্লীজীবনের সঙ্গে যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে আধুনিক সামাজিক আদর্শের ও শিক্ষার বিষময় প্রভাবের ফলে বাংলার পুরুষদের জীবনে প্রাণহীনতার ও কৃত্রিমতার আবির্ভাবের বহুকাল পর পর্য্যন্তও, পল্লীতে পল্লীতে বাংলার রমণীদের জীবনে নির্ম্মল নৃত্যগীতের আনন্দধারা প্রবাহিত ছিল, এবং পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বাংলার গ্রামে গ্রামে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হইত। বিজাতীয় অবরোধপ্রথার বিষময় প্রভাব তখনও সকল পল্লীতে ব্যাপ্ত হইয়া বাংলার ভদ্রসমাজের রমণীগণের সহজ মুক্তভাব সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আমদানি ঘেমটা ও বাই-নাচের প্রচলন ও তদানুষঙ্গিক দুর্নীতিময় আচরণাবলী এবং আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর প্রাণহীন এবং কৃত্রিম আদর্শ তখনও নৃত্যগীতে অধঃপতি আনিয়া বাংলার পল্লীর রমণী-গণের জীবন হইতে তাঁহাদের চিরন্তন সহজ ও আনন্দময় নৃত্যগীতের ধারাকে সঙ্কোচে ও ভয়ে বিলুপ্ত করিয়া দেয় নাই। এখনও বাংলার সুদূর অতিনিভৃত কোণে কোথাও কোথাও ভদ্রমহিলাদের মধ্যে বিবাহ-উৎসব এবং ব্রতাদি উপলক্ষে সহজ ও নির্ম্মল নৃত্যগীতের প্রথা আড়ালে আবডালে অতি-সঙ্কোচে আত্মরক্ষা করিয়া রহিতে সমর্থ হইয়াছে। জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজে ও ধর্ম্মজীবনে বর্ত্তমান প্রাপ্ত আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তন যদি অনতিবিলম্বে না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার আড়ালে আবডালে ভদ্ররমণীদের জীবনের যে আনন্দ ও মুক্তভাবটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাও অচিরে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

বাংলার মেয়েদের গতি-লাবণ্য

আমার ছেলেবেলায় আমি দেখিয়াছি আমাদের গ্রামের সকল ভদ্রমহিলারা বিবাহিতা-অবিবাহিতা-নির্ব্বি-শেষে এবং বালিকা-প্রৌঢ়া-নির্ব্বিশেষে নানা উৎসব ও ব্রত উপলক্ষে মিলিত হইয়া গান গাহিয়া গাহিয়া বর্ত্তনী করিয়া অতি শোভন ভাবে হাততালি দিয়া অবাধ ও নির্ম্মল ভাবে প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য করিতেন। তাঁহারা এইরূপ নৃত্য করিতেন অপরের মনোরঞ্জন-বিধানের জন্য নয়, নিজের প্রাণের নির্ম্মল আনন্দের সহজ ও স্বাভাবিক পরিস্ফূর্ত্তি-বিধায়ক সামাজিক মাঙ্গলিক প্রথার অনুষ্ঠানে; কিন্তু গ্রামের

হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক ইহা দেখিবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ইহার সহিত কেহ কখনও কোন কুৎসিত ভাবের সংস্রব স্বপ্নেও আনে নাই। বলা বাহুল্য যে, এই নৃত্যের প্রণালীও ছিল সহজ ও নির্মল। পশ্চিমাঞ্চলের আমদানি দুর্নীতিমূলক খেমটা ও বাই-নাচের অশ্লীল প্রণালীর আভাষ মাত্রও ইহাতে ছিল না। জল-ভরা, আরতি, বরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও বাংলার পল্লীগ্রামের ভদ্রমহিলারা এই সুসংযত প্রণালীর নৃত্যধারায় আপন আপন প্রাণের নির্মল আনন্দের সুষমাকে অভিব্যক্তি করিয়া, আপন আপন শরীরকে স্বাস্থ্যময় ও শক্তিময়, এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে অনাবিল আনন্দময় ও সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিতেন। অসংখ্য ব্রত ও উৎসবের অনুষ্ঠানে নৃত্যের ছন্দোবদ্ধ অঙ্গসঞ্চালনের এই যে সুপ্রাচীন ধারা, ইহার অভ্যাসের ফলে বাংলার মেয়েরা এমনি একটা স্বচ্ছন্দ মাধুরীময় অঙ্গচালন-সুষমা ও গতি-সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছেন যাহা আজও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঈর্ষার বস্তু বলিয়া পরিগণিত এবং যাহা বাংলার জীবনের একটি গৌরবময় বিশিষ্টতা ও সম্পদ। তার ফলে আমরা আজ বাংলার সামাজিক জীবনের এই চরম অবনতি ও দুর্ভাগ্যের দিনেও বিবাহের বরণ উপলক্ষে, ভাইফোঁটার বরণ উপলক্ষে, আরতি-অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষে, বাংলার মেয়েদের অঙ্গুলি, হস্ত, বাহু ও অঙ্গ-সঞ্চালনের সুষমাময় ছন্দোবদ্ধ গতিবিন্যাসে প্রাচীন বাংলার ভদ্রনারীদের জীবনের সেই ব্যাপক বিশুদ্ধ আনন্দময় নৃত্যপ্রথার লুপ্তাবশেষ দেখিতে পাই।

বাংলার ব্রত-নৃত্য

ব্রত উপলক্ষে বিশুদ্ধ ও নির্মল আনন্দময় নৃত্যগীতের চর্চা যে প্রাচীন বাংলার ভদ্রনারীদের জীবনে ব্যাপক ভাবে ছিল, তাহা শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "বাংলার ব্রত" নামক গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন।

চৈত্রমাসের অশ্বত্থ-পাতার ব্রতের বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন:—"বসন্তের দিনে নদীর ধারে চাপা কুরুলতা অশথ গাছের একটা উৎসব চলেছে—সমুজ পাতাগুলি নতুন-ফুটে-ওঠা থেকে আস্তে ঝরে-পড়ায়; দলে দলে কুড়ো-বুড়ি ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী এই উৎসব দেখতে আসছে—কেউ দেখতে দুলতে, কেউ নাচতে নাচতে।"

সেঁজুতী ব্রতটিকে তিনি "পুরো একটি নাটিকা" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

অবনীন্দ্র বাবু সত্যই বলিয়াছেন—"ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আল্পনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাটে,নৃত্যে;—এক কথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা।...নাট্য, নাচ, গান এবং ছবি আঁকা বলতে মানুষের স্বাধীন চেষ্টা বলে' আমরা এখন বুঝি; তখন কিন্তু সেগুলো ব্রতের অঙ্গ বলেই ধরা হতো। ব্রতের ছড়াগুলি যেখানে ছোটো ছোটো যাত্রার পালার মতো গাঁথা হয়েছে সেখানে নাট্য,নৃত্য ও গীতকলার যথেষ্ট অবসর রয়েছে দেখি।...তাদুলী ব্রতের ছড়াগুলিতেও গীত, নাট্য দুইই রয়েছে,—এগুলি মন্ত্রের মতো করে বলা হতো না,—অভিনীত হতো।"

শস্পাতার ব্রত অথবা "ভাঁজো"

"শস্পাতা"র ব্রতের বর্ণনা করিতে গিয়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন:—

"সেখানে আমরা দেখি, ফসল ফলাবার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এমনি নানা ক্রিয়ায় প্রকাশ করছে। বর্দ্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্পাতার ব্রত বা ভাঁজো ভাদ্রমাসের মনসা-ষষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে পরবর্ত্তী তমা-ষোড়শীতে শেষ হয়।

"মনসা-ষষ্ঠীর পূর্ব্বদিন পাকাটি তিনিটে পাঁচ রকমের শস্য—মটর, মুগ, অরহর, কলাই, ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়; পরদিন ষষ্ঠী পূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সমস্ত এবং ইঁদুর-মাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয়; বাদশী পর্য্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে; চার-পাঁচ দিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ বৎসর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য-

উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্র-বাদশাহে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান! নিকানো বেদীর উপর ইন্দ্রের বস্ত্রচিহ্ন দেওয়া আল্পনা; কোথাও মাটির ইন্দ্র-মূর্ত্তিও থাকে। এই বেদীর চারিদিকে, পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন আপন শস্যাধার সরাগুলি সাজিয়ে নেয়, তারপর সাত-আট থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত-ধরাধরি করে বেদীর চারিদিক ঘিরে নাচ গান শুরু করে। উঠানের এক অংশে পর্দ্দার আড়ালে বাদকরা তাল দিতে থাকে;—এর পর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে মুখে ছড়া-কাটাকাটি করে।

"সমস্ত রাত্রি দুই দলের নাচ-গান, ছড়া-কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিক্‌মিক্;—এর পরে রাত্রি শেষ; মেয়েরা আপন-আপন শস্যাধার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে কিম্বা নদীতে বিসর্জ্জন দিয়ে ঘরে আসে। এখানে শস্যের উন্নয়নের কামনা সরাতে শুরু-বপন-ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হল এবং শেষ হল উৎসবের নৃত্যগীতে।"

আধুনিক বাংলার শিক্ষার ও সমাজের আনন্দধ্বংসী প্রভাব হইতে কোনপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া ভাঁজো ব্রতের এই সুন্দর আনন্দময় মিলন নৃত্যপ্রথা এখনও বর্দ্ধমান অঞ্চলের কোন কোন অতি সুদূর নিভৃত পল্লীতে ভদ্রবংশের বালিকাদের মধ্যে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবং আমি নানা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ২০।২২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাঁজো ব্রতের নৃত্যে বর্দ্ধমান ও রাঢ়-অঞ্চলের ভদ্র পরিবারের সকল মহিলা—বালিকা-প্রৌঢ়া-নির্ব্বিশেষে অবাধে যোগ দিতেন। এখনও বর্দ্ধমান বীরভূম অঞ্চলে ভদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে ভাঁজো নৃত্যের প্রচলন আছে।

ভাঁজো নৃত্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা

বর্দ্ধমানের কাটোয়া সব্-ডিভিশনের চ—— গ্রামের ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধা একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের ভদ্রমহিলা এ বিষয়ে সম্প্রতি যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। তিনি বলিয়াছেন:—

"আট বৎসর বয়সে আমার বিয়ে হয়। আমার বাপের বাড়ীতে এবং শ্বশুর বাড়ীতে মেয়েদের ভিতর ভাঁজো নাচের খুব ধুম দেখেছি। বিয়ে হওয়ার পর আমি অনেকবার নেচেছি। প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে ভাঁজো নাচের ধুম মেয়ে-মহলে মহা ধুম লেগে যেত। চ—— গ্রামে মজুমদার ঠাকুরুণ ছিলেন আমার মা-দাদি। আমার যখন ১৬।১৭ বৎসর বয়স তখন তাঁর বয়স ৬০ বছর হবে। গাঁয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সব চেয়ে উৎসাহী। কয়েক দিন আগে হ'তে নাচের ব্যবস্থা করবার জন্যে তিনি উঠে-পড়ে লেগে বাড়ী বাড়ী পয়সা ও চাল তুলতেন। মজুমদার-গৃহিণী লোক পাঠিয়ে ৫।৬ ক্রোশ দূর হ'তে ঢুলী আনাতেন। তিনি গাঁয়ের ঢুলী নিতেন না। বলতেন গাঁয়ের বুড়ি ধরের-বউদের নাচতে দেখলে এ ভাল নয়। বুড়ী বাড়ী বাড়ী গিয়ে সধবা, বিধবা, বউ সকলকে ডেকে আনতেন। পুরুষদের বলতেন 'তোরা বাড়ীতে থেকে ছেলেপিলে আটকে রাখ,—বছরে একদিন বউদের আনন্দ করতে দে'। সন্ধ্যার পর ভাঁজোর পুজো হ'য়ে যেত। বুড়ী বাড়ী বাড়ী গিয়ে দিনের বেলা ব'লে আসতেন 'আজ তাড়াতাড়ি সব খাওয়া সেরে নিতে হবে'। তারপর গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে জমা হোত—ইতর-ভদ্র সকলে—হাড়ী বাগ্দী ডোম সকলে। একদিনের জন্য জাত্-বিচার মানত না কেউ। রাত ৯।১০টার সময় সব নাচতে আরম্ভ করত। ঢোল, সানাই ও কাঁসি বাজত। ঢোল বাজলে পা যেন আপনি নেচে উঠত! ১০০।১৫০ মেয়ে একসঙ্গেই নাচতে আরম্ভ করত। কোন্ দিক দিয়ে পহর কেটে যেত কেউ জানতে পারত না। সকলে একসঙ্গে গান করত, বাজনা বাজাত। সমস্ত রাত আনন্দে কেটে যেত।

"আমরা যে সব গান গেয়ে নাচতাম তার একটি ছিল—

"ভাঁজো গো কল্‌কলানি
মাটির গো সরা,
আমার ভাঁজোর গলায় দেবো
পঞ্চ ফুলের মালা।
এক কলসী গঙ্গাজল
আর এক কলসী দি,

বৎসর অন্তে একবার ভাঁজো
নাচ্‌ব নাত' কি!
পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে
তেঁতুল বলেন বহু, *
সঙ্কের শুক্তনি রাঁধেন
আমি হব শঙ্খ।
ওগো ভাঁজো তুমি
কিসের বড়াই কর?—
আইবুড়ো বেটাছেলের
বিয়ে দিতে নার!
ভাঁজো তুমি এই পথে যেও;—
বেলা গাছে কড়ি আছে
দুধ কিনে খেও।

"১৫ বছর আগে পর্য্যন্ত আমি এই সব দেখেছি। এখনও বাচ দেখে ইঁদ (ঈদ) পুজো হয়, ভাঁজো নাচ হয়। এখন সব বাবুয়ানা হয়েছে—তাই ভদ্রলোকেরা আর যোগ দেয় না। তবে এখনো সব গ্রামে গ্রামে ইঁদ পুজো হয়, ভাঁজো নাচ ও হয়। ভদ্রলোকের মেয়েরা আর নাচে না; চাষাদের মেয়েরা নাচে।"

বাংলার পল্লী-নৃত্যের নিষ্কলুষতা

ভদ্রমহিলাদের মধ্যে লুপ্তপ্রায় এই নৃত্যপ্রণালী প্রাচীন বাংলার খাঁটি মেয়েলি ব্রতের সহজ সরল শুদ্ধ নির্ম্মল নৃত্য-প্রণালীর অনুরূপই ছিল। ইহার মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের আমদানি খেমটা ও বাই-নৃত্যের অথবা আধুনিক রঙ্গমঞ্চের বিলাস-নৃত্যের অশ্লীল ভাবভঙ্গীর বিন্দুমাত্রও আভাষ বা ইঙ্গিত ছিল না। ইহার ভাব ও প্রণালী ছিল অনাবিল, এবং ইহা বাংলার নারীদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং মানসিক আনন্দের স্ফুরণের সুযোগ দিয়া জাতির ও সমাজের জীবনকে মঙ্গলময় ও আনন্দময় করিতে সবিশেষ সহায়তা করিত।

সহরের দুর্নীতিময় জীবনের বিকৃত ও দূষিত আদর্শে কলুষিত-প্রাণ বাঙ্গালীর মনে আজ নৃত্যের নামে রঙ্গালয়ের ও প্রমোদ-মজলিসের যে বিদঘুটে ছবি উদিত হয়, বাংলার পল্লীর নির্ম্মল নিষ্কলুষ ব্রত-নৃত্য ছিল তার ঠিক বিপরীত। ইহা ব্যক্তির ও জাতির প্রাণে পবিত্রতার সঞ্চারেরই সহায়তা করিত।

বাঙ্গালী যদি আবার একটি সজীব, সতেজ, স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তিমান্ জাতি হইয়া উঠিতে চায়, তবে তাহাকে বাংলার বাহির হইতে আমদানি নৃত্যের কুৎসিত প্রণালী ও তাহার চর্চ্চাকে সমূলে বর্জ্জন করিয়া এবং নৃত্যের সঙ্গে কুৎসিত ভাবের কল্পনাকে মন হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া বাংলার নিজস্ব সহজ সরল বিশুদ্ধ নৃত্যপ্রথাকে আবার জীবনে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। একদিকে যেমন নৃত্য সম্বন্ধে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি-বিরুদ্ধ কলুষিত ও বর্ব্বর মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ পরিহার করিতে হইবে,—তেমনি অপরদিকে আবার নৃত্যের প্রণালীর সংশোধন করিয়া কুৎসিত প্রথার বর্জ্জন ও নির্ম্মল প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এবং নৃত্যকে অপরের মনোরঞ্জন-বিধায়িনী বল্গিনী পেশা স্বরূপ অথবা রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত বাবদা স্বরূপ ব্যবহার না করিয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতি নরনারীর আপন আপন আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দের অভিব্যক্তির বিধাতা-প্রদত্ত অমূল্য অধিকার রূপে সহজ, নির্ম্মল ও নিষ্কলুষ ভাবে ব্যবহার করিতে পুনরায় শিখিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

* বাঙ্গ।

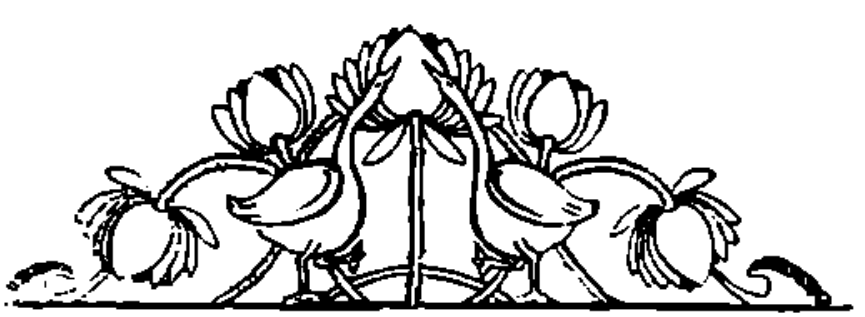

বেল্‌জিক্‌-সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

বেল্‌জিক সাহিত্যে দেশগত বৈশিষ্ট্য কিছুই লক্ষিত হয় নাই ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে। যে সকল সাহিত্যিক ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে লেখনী-পরিচালনাকৌশলে বেল্‌জিয়ামের সাহিত্যকে দেশগত বৈশিষ্ট্যশালী সাহিত্য ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেন তাঁরা কেউই সফলকাম হ'তে পারেন নি, কেন না তাঁদের রচনার উপর ফরাসী প্রভাবের আধিপত্য ঘটেছিল অল্প-বিস্তর ভাবে। এই ফরাসী প্রভাবের জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লেখকগণকে বেল্‌জিয়ানরা অন্তরঙ্গ ব'লে' স্বীকার কর্‌তে পারে নি। তাঁদের লেখা জনপ্রিয় হলেও দেশগত সাহিত্যের ধরণধারণে নিজেদের আসন দ্বিরীকৃত কর্‌তে সক্ষম হন নি তাঁরা। কিন্তু এই সব ফরাসী প্রভাবিত লেখকদের মধ্যে "হেন্‌রি কন্‌সাঁস্‌"এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করেন দেশগত বৈশিষ্ট্য সাহিত্যের মধ্যে প্রবর্ত্তনের জন্য, যদিও তিনি পারতেনও, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে ফরাসী প্রভাবকে তিনি পরিহার কর্‌তে পারেন নি বলেই তাঁর প্রথম জীবনের চেষ্টা সফলতা লাভ কর্‌বার সুযোগ এবং প্রেরণা পায় নি।

"কন্‌সাঁসের" চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বটে কিন্তু তাঁর প্রেরণা একটি লেখকের মনে নব অনুভূতি জাগিয়েছিল—তিনি "চার্ল্‌স্‌ দা কষ্টার্‌।" এঁকে আধুনিক বেল্‌জিক্‌ সাহিত্যের জনক বল্‌লেও চলে। এঁর রচনার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ইনি সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রভাব এঁর পরবর্ত্তী লেখকদের লেখনীর উৎসমুখে প্রেরণা জাগিয়েছিল। এঁর বিখ্যাত বই "লিজেন্ড্‌ অব্‌ টিল আলেন্‌-স্পাইজেল্‌" বেল্‌জিক্‌ সাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করে ও সর্ব্বপ্রথম দেশগত বৈশিষ্ট্যের জন্য সমসাময়িক লেখকগণকে প্রবুদ্ধ কর্‌বার চেষ্টা পায়।

তারপর একদিন আঠারো-শো-আশী খৃষ্টাব্দে "য়্যাক্‌স্‌ য়্যালার"এর সম্পাদনায় "লা জ্যুঁ বেল্‌জিক্‌" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বৈশিষ্ট্যশালী লেখকগণের নূতনতম অনুভূতি এবং বেল্‌জিক্‌ সাহিত্যের অভিনব বৈশিষ্ট্য, প্রকাশ ভঙ্গী ও রূপবাদ সর্ব্বপ্রথম এই পত্রিকাখানিই প্রচার করেন বিশেষ ভাবে। কেবল এই পত্রিকাখানিকে অবলম্বন করেই ঊনবিংশ শতাব্দীর নব বেল্‌জিক্‌ সাহিত্যের অভ্যুত্থান ঘটে সর্ব্বপ্রথম।

আধুনিক বেল্‌জিক্‌ সাহিত্যে কাব্যপ্রতিভা বিশেষ ভাবে উন্নতিলাভ কর্‌তে পারেনি মোটেই,—গদ্যসাহিত্যই তার প্রাণ। "মেতারলিঙ্কের" অপূর্ব্ব নাটকীয় প্রকাশ-পদ্ধতি, গল্প লেখার ধরণ, প্রবন্ধ লেখ্‌বার নবীনতম ভঙ্গী বেল্‌জিক্‌ সাহিত্যের অভিনবত্ব। কবি "ভেরহারেনের" কবিতাগুলির চেয়ে উপন্যাস এবং গল্পগুলিই বেল্‌জিক্‌ সাহিত্যের সজীবতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিখ্যাত লেখক "লেমোন্যারের" প্রথম উপন্যাস আঠারো-শো-একাশী খৃষ্টাব্দে সাহিত্যে যে সজীবতার সৃষ্টি করে তাই সর্ব্বপ্রথম বিশ্বসাহিত্যের আসরে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে বিশ্ব-মনীষীদের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে। এঁর সমসাময়িক লেখকেরাও স্বদেশের যে-সকল চিত্র লেখনীমুখে ফুটিয়ে তোলেন তার মধ্যে সত্যিকারের প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় ব'লে' তাঁদেরও আদর বিশ্বসাহিত্যে বড় কম নয়। তাঁদের মধ্যে "দেনোল্‌দার" "রিলেট্টে", "ভিরেস্‌", "যোসেনবেক্‌" প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকদের গল্পই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বেল্‌জিক্‌ লেখকদের উপর ফরাসী প্রভাব ছিল অতিরিক্ত ভাবে; তার ফলে সত্যিকারের বেল্‌জিক্‌ জীবনের ছবি সেই সব রচনার মধ্যে ফুটে তো উঠ্‌তোই না, উপরন্তু ফরাসী লেখকদের মত ধরণ দিয়ে সুন্দর ভাবে লেখ্‌বার প্রতিভাও লেখকরা হারিয়ে ফেলেছিলেন ব্যর্থ অনুকরণের স্পৃহায়।—এই জন্যই সেই যুগের গল্প ও উপন্যাস জনপ্রিয় হলেও তারে মধ্যে বেল্‌জিয়ানরা নিজেদেরকে খুঁজে পেতো না, যা' পেতো তা' ফরাসী সাহিত্যের চর্ব্বিতচর্ব্বণ আদর্শ ও মতবাদ। সেইজন্য লেখক-

গণকে স্বদেশীয় বল্‌বার দাবী থাক্‌লেও সে সাহিত্য নিছক আপনার বল্‌বার দাবী বেল্‌জিয়ান্‌রা করেনি কখনও। পুরাতন সেই ধারার উপর যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটালেন যে ক'টি লেখক তাঁদের মধ্যে "মেতারলিঙ্ক", "লেমোন্যার" আর "ভোরহেরেন"ই শ্রেষ্ঠ। মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ বেল্‌জিয়ান্ চিত্রশিল্পীরা যেমন রঙের রেখাপাতে অপূর্ব্ব চিত্র সৃষ্টি করে' ইউরোপীয় শিল্পকলার আদর্শস্রষ্টা বলে' পরিগণিত হন, এই সব যুগান্তকারী লেখকরাও লেখনীর উৎসমুখে এক একটি রচনাকে তেমনি ভাবে ছবির মত প্রতিভাত করে' সাহিত্যকলায় জগৎসমক্ষে এক নতুন আদর্শ প্রদর্শিত করেন। আধুনিক বেল্‌জিক্ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে যে তার গল্প ও উপন্যাসগুলির বর্ণনাভঙ্গী এমনি চমৎকার ও সহজ-সুন্দর যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে চিত্রকরের আঁকা এক একখানি ছবির মতই অপূর্ব্ব সজীবতার বিচিত্র প্রাণ-স্পন্দনে। এঁদের ধারাই হ'চ্ছে পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রশিল্পীদের আদর্শে সাহিত্যের মধ্যে সজীব চিত্রের সৃষ্টি করা। একটা ধ্বংসপ্রায় জাতির করুণ ইতিহাস এঁদের রচনার প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠে হাতীয় জীবনের নিগূঢ় বেদনায় সমৃদ্ধ অতীতকে আলিঙ্গন করে'।

আধুনিক বেল্‌জিক্ সাহিত্যে বিজ্ঞপাত্মক লেখকের সংখ্যা নগণ্য—আমাদের বাংলা সাহিত্যেরই মতো। যে ক'জন আছেন তাঁদের মধ্যে "লিপোল্ড কুরুল্"ই প্রধান, অন্যান্যেরা তাঁরই রচনার প্রভাবান্বিত। কিন্তু এঁর রসরচনা যে বেল্‌জিক্ সাহিত্যকে প্রসিদ্ধির শীর্ষে স্থান দিয়েছে তা নয়, "লেমোন্যার", "ইকহাউড," ও "রেমোলদার"এর লিখিত সুন্দর জীবনের ছবি এবং "মেতারলিঙ্ক", "ভোরহেরেন" ও "রুয়েনবার্ক্"এর অনুবাদ ও প্রকাশভঙ্গীই বেল্‌জিক্ সাহিত্যকে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে' স্বীকৃত করে' দিয়েছে।

আধুনিক বেল্‌জিক্ সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক হচ্ছেন "চার্লস্ দা-কষ্টার", এঁর পুরো নাম **চার্লস্-থিয়োডোর-হেনরি-দ্য-কষ্টার**। বেল্‌জিয়ান্ সমালোচকেরা এঁকে বলেন "The father of Belgian literature" (বেল্‌জিক সাহিত্যের জনক)। ইনি ব্রাসেল্‌স্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন আঠারো-শো-সাতাশ খৃষ্টাব্দে এবং সেখানেই উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু শিক্ষা শেষ হবার অনেক আগে কিশোর বয়সেই ইনি যাতে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং এঁর জীবনের অধিকাংশ তাগই অতিবাহিত হ'য়ে যায় কেরাণী-জীবনের একটানা বৈচিত্র্যহীনতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অবসরবিনোদনের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কিছু লিখ্‌তেন খেয়ালবশতঃ। তাঁর এই খেয়াল-প্রসূত বিখ্যাত বই "টীল আলেন্-স্পাইজেল্"—সামান্য অতি-সাধারণ বেল্‌জিক রূপকথা হলেও আধুনিক বেল্‌জিক্ সাহিত্যের পূর্ব্বসূচনা করে সেই বইখানিই বর্ণনাভঙ্গিমা ও ভাষার সৌন্দর্য্যে। দশ বছর ধ'রে এই বইখানি ইনি লেখেন, কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টি পড়্‌লো না এই বইখানির উপর এঁর জীবিতাবস্থায়—লোকে তাঁকে বুঝ্‌তে চিন্‌তে চেষ্টা কর্‌লো না মোটেই, নগণ্য লেখকের লেখা পড়ে' দেখ্‌তে কেউ চেষ্টাও কর্‌লো না একটুও! কিন্তু আজ উনবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীর বেল্‌জিক্ সাহিত্যের উৎস সন্ধান কর্‌তে হ'লে এই বইখানাই পড়্‌তে হবে সর্ব্বপ্রথম।

এঁর মৃত্যু ঘটে আঠারো-শো-উনআশী খ্রীষ্টাব্দে।

তারপর শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী লেখক হচ্ছেন "**গ্রিশিন্স মেতারলিঙ্ক**।" ইনি ধরিত্রীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হ'য়ে উঠেন আঠারো-শো-বাষট্টি খ্রীষ্টাব্দে "ঘেন্ট্" প্রদেশের এক সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে। প্রথমে ইনি আইনজীবী হয়ে পসার জমাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সফলতা অর্জ্জন কর্‌তে পারেন নি বলে' প্যারীতে চলে' আসেন। সেখানে ক'জন লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, তাঁদের প্রতিভায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে তিনি সুরু কর্‌লেন লিখ্‌তে। এঁর প্রতিভা বহুমুখী - কবিতা, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ—সবক'টির মধ্য দিয়েই ইনি স্বদেশীয় সাহিত্যকে গৌরব দান করেন; পরে বিশ্বসাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বলে' স্বীকৃত হন ও নোবেল পুরস্কার পান।

ভাগ্যকে ইনি চিত্রিত করেছেন এঁর সবক'টি রচনার মধ্য দিয়ে। নিয়তির কাছে মানুষ কত ক্ষীণ, কত দুর্ব্বল, কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে সে মানুষকে আক্রান্ত করে, তার সুখ-

সূর্য মেঘাকর হ'য়ে ওঠে,তাকে ঠেকিয়ে রাখবার শক্তি মানবচিত্তে নাই—এ-ই হ'চ্ছে তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত কথাবস্তু। তারপর তাঁর বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে অপরূপ প্রকাশরীতি। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে তিনি এমনি ভাবে বর্ণনা করেন যে দৃশ্যবস্তুগুলো ছবির মত ফুটে উঠ্‌বে পাঠকের মানসচক্ষে। তাঁর লেখার মধ্যে "নীল পাখীই" শ্রেষ্ঠ, এতবড় রূপক নাটক ইতিপূর্বে 'কল্পিনেটাল' সাহিত্যে ছিল না বল্‌লেই হয়। এই নাটকখানিতে তিনি কয়েকটি মূক প্রাণী ও উদ্ভিদকে ভাষা দিয়ে মুখর করে' তুলেছেন। এখানিতে মানবাত্মার মোক্ষলাভের ইঙ্গিত আছে, মরীচিকার মত ওই নীলপাখীর পিছনে সে ছুটে বেড়ায় সারা জীবন—শতেক বাধাবিঘ্ন লোভশোক মানবাত্মা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তবু সে ছুটে চলে নীলপাখীর পিছনে,—ওকে যে তার পাওয়া চাই-ই। তারপর বিশ্বব্যাপী কাহিনীকে ভিত্তি করে' 'মেটা ম্যাগ্‌ডালেন্' রচনা করেন। তিন অঙ্কের এই জনপ্রিয় নাটকখানির মধ্যে নায়কের সন্ধান আমরা পাই না কোথাও, কিন্তু পরোক্ষভাবে বর্ণনাভঙ্গীতে উহা আমাদের মনের উপর এমন একটি রেখা টেনে দিয়ে যায়, কোথাও নায়কের অভাব মনে জাগে না,—আশ্চর্য প্রকাশভঙ্গী!

ইনি যে শুধু রসসাহিত্যই সৃষ্টি করেছেন তা নয়। ইনি একজন জীবতত্ত্ববিদ্, এদিকে এঁর গবেষণার মূল্যও বড় কম নয়, এঁর "উইলোকার জীবনী" এ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এঁর কয়েকখানি বিখ্যাত বই আছে, তার মধ্যে "তিন্তাজিলের মৃত্যু", "ইন্টিরিয়র", "মোনা ভান্না", "আলাদীন ও পাপোসাইসিস্," "মৌমাছির জীবনী" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর বয়স এখন সত্তর বছর।

৪

ক্যামিল লেমোন্যার—লিখতে সুরু করেন উনিশ বছর বয়স থেকে। বেল্‌জিয়াম্ গৃহস্থের চিত্র,বিশেষভাবে কৃষক-পরিবারের জীবন ইনি ফুটিয়ে তুলেছেন অসামান্য প্রতিভায়। এঁর লেখনীর বর্ণ সম্পাতে মানবজীবনের নব বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন অপূর্ব সহানুভূতি, প্রকাশভঙ্গী আর সৌন্দর্যের মহা দিয়ে। অনেক ছোট গল্পের বই ইনি লিখেছেন; তার মধ্যে দুঃখের বুকে মানবাত্মার যে ক্রন্দন তাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সবক'টি গল্পের মধ্যে। এর "বীর সহরের প্রাণ" বিশ্বসাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ। এঁর প্রতিভা আরো উজ্জ্বল ভাবেই হয়তো প্রকাশ পেতে পার্‌তো, কিন্তু ইনি উনপঞ্চাশ বছর বয়সেই কালের কোলে চলে' পড়েন, তাই এঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ কর্‌তে পারে নি,—আরো অনেক নূতনত্বই হয়তো ইনি দান কর্‌তে পার্‌তেন বেল্‌জিক্ সাহিত্যে।

উনবিংশ শতাব্দীর বেল্‌জিক্ সাহিত্যের শেষ লেখক হচ্ছেন "**এমিল ভেরহেরেন্**।" বেল্‌জিক্ কাব্যজগতে ইনি যুগান্তের সৃষ্টি করেন। এঁর মত জনপ্রিয় কবি বেল্‌জিয়ামে আর দুটি নেই। ইনি প্রথম জীবনে ফরাসী প্রভাব বর্জন কর্‌তে পারেন নি; ফরাসী প্রকৃতিবাদ এঁর রচনার মধ্যে প্রথম প্রথম অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু পরবর্তী জীবনে সে প্রভাবকে অতিক্রম করে' ইনি আধ্যাত্মবাদের সৃষ্টি করেন। ইনি জীবনের শেষভাগে লিখ্‌তে সুরু করেন,না হ'লে ইনি বেল্‌জিক্ সাহিত্যের আরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর্‌তে পার্‌তেন। কবিতা লিখ্‌লেও নাটক এবং ছোট গল্পও ইনি লিখেছেন অনেক, কিন্তু সে-সবের মধ্যেও এঁর কবিত্ব প্রধানতা লাভ করে অল্প-বিস্তর ভাবে। এঁর কবিত্বপ্রতিভা বেল্‌জিক্ সাহিত্যের গৌরব। এঁর "এক রাত্রি" গল্পটি বিশ্বসাহিত্যকেও গৌরবান্বিত করে' দেয় চমৎকারিত্বে। ইনি উনিশ-শো-কুড়ি খৃষ্টাব্দে পঞ্চষষ্টি বছর বয়সে ধরিত্রীর বুক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। পরবর্তী লেখকগণ এখনও বিশ্বসাহিত্যে জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন নি বলেই ওঁদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা সম্ভব হোল না।

মানুষের একজোট হওয়া

শ্রী হেমলতা দেবী

মানুষ সহজে একজোট হ'তে পারে না—নিজের ইচ্ছামত চলার দিকেই তারা ঝোঁক ;—পিপ্‌ড়েরা যেমন সার বেঁধে একজোট হ'য়ে চলে, তাদের দেখাতে হয় না বলতে হয় না, সারে সারে তারা চলতেই থাকে নিজের মনে, মানুষ ঠিক তেমনটি পারে না একসঙ্গে পা ফেলতে, হাত তুলতে সৈন্যদের কতবার অভ্যাস করাতে হয়,—স্কুলের ছেলেদের সার হ'য়ে সোজাভাবে দাঁড় করাতে শিক্ষকদের কতবার ধমক দিতে ও সাবধান করতে হয়, কে না দেখেছে। কলে ফেলে চাকায় চলা মানুষের মনের কাজ নয়, তাই ঐ ভাবে চালাতে গেলে থেকে থেকে মানুষ বিগ্‌ড়ে দাঁড়ায়, ছিট্‌কে পড়ে নিজের মতে। মানুষের সোজা পথটা তবে কি ?—ইচ্ছামত চলা। ইচ্ছামত চলতে পেলেই, সে সোজা পথটা খুঁজে পায় নিজের বুদ্ধিবলে সহজে।

কত নূতনতর আশ্চর্য্যতর জ্ঞান মানুষ তুলে ধরেছে পৃথিবীর সামনে, নিজের ইচ্ছামত চলারই ফলে। নূতন কোন-কিছু পৃথিবীতে আসতে পারে না মানুষ যদি না নিজের ইচ্ছামত চলে। তবে কি মানুষ কোনদিন কোন-দিক্ থেকে একজোট হ'তে পারবে না, স্বতন্ত্রই থেকে যাবে চিরকাল ?—দেখা যাক্ আলোচনা করে'।

ধর্ম্মরাজ্যে কতক মানুষ কয়েকবার একজোট হয়েছে, দেখা গেছে পৃথিবীর ইতিহাসে। বুদ্ধের অতিমানবীয় পরম সাধনায় নির্ব্বাণ বা শাশ্বত শান্তির স্বাদ পৃথিবীর মানুষ পেয়েছে। বহু মানুষ তার মধ্যে ডুবে যাবার জন্য একজোট হ'য়ে একপথে চলেছে বহুকাল ধরে'। কিন্তু পৃথিবীকে বাদ দিয়ে চলতে হবে সে সাধনায় ; তাই পৃথিবীর মোটাদরের মানুষ তার নাগাল পায় না সহজে। সাধনা চলুক,—যিনি পারেন সে পথ ধরুন, আয়ত্ত করুন সেই পরম সিদ্ধি,—ধরুক পৃথিবীর কপালে সেই অনির্ব্বাণ আলোক জ্বল্ জ্বল্ করে'। কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ মানুষগুলো যায় কোথায় পৃথিবী ছেড়ে ?—পৃথিবীর জল মাটিই তাদের সর্ব্বস্ব, শস্য-ফসলই প্রাণ, পৃথিবীতে খেয়ে-বসেই তাদের সুখ,—পৃথিবীর ভালোবাসাই তাদের স্বর্গ,—পৃথিবীকে সুন্দর করে' তুলে', সুখী হবার সহজ পথ তাই খোঁজে তারা সব সময়। পৃথিবীর ভালোতে নিজের ভালো কথাটা, বোঝে সহজে।

এল খৃষ্টের নির্ম্মল নিষ্কলুষ সুকুমার মাধুর্য্যময় প্রেমের পরিপ্লাবন পৃথিবীর বুকে,—হাজার মানুষ জড়ো হ'ল তার তলায়। যে কেউ সে প্রেমকে স্বীকার করে' নিজের মধ্যে আনতে পারে, সে সুখী হয় চিরদিনের মত—ত্রাণ পায় অচিরাৎ। কিন্তু খৃষ্টের মত নির্ম্মল হওয়া সহজ ব্যাপার নয় সাধারণের পক্ষে। কোটে যদি মানবাত্মা তত সুন্দর হ'য়ে, আসে যদি খৃষ্টের মানবপ্রেম খৃষ্টান-অখৃষ্টান সকলের অধিকারে, তবেই মানুষ ইচ্ছামত তাকে গ্রহণ করে' ধন্য হবে পৃথিবীর পথে।

এল পৃথিবীতে মহম্মদের মহান্ বাণী—অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক-সত্য আল্লার সুবৃহৎ নাম—ভারতীয় ওঙ্কারের মত পৃথিবীর আকাশ মহাশব্দে ধ্বনিত করে',—ঠেক্‌ল গিয়ে উটের বুল্ সাগের মাথায়। আল্লার আলোকময় নাম বল করল দুর্দ্ধর্ষ আরব-জাতিকে,—জড়ো করল তাদের এক নিশানের তলায় এনে,—ছড়িয়ে পড়ল নূতন আলোক মানুষগুলির গায়ে। অনির্ব্বচনীয় অনন্যকরণীয় বিশুদ্ধ আল্লার নাম শব্দে ও ভাব অনুকরণে ভাবতে শিখল তারা, অবিভক্ত এক-সত্য আল্লার নামে সকল মানুষ সমান হবে একদিন এ পৃথিবীতে সুনিশ্চয়। মুসলমান ভক্তসাধক, কবি ও জ্ঞানীগুণীগণ অনেকে পৃথিবীর ঐ সুন্দর ভবিষ্যৎ দিব্যচক্ষে দেখেও ছিলেন অনেক-বার।

এল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অননুভূত অপূর্ব্ব অনুপম অমৃত-ময় ভক্তি-রসধারা,—পৃথিবীর যত ধূলা মুছে গেল মুহূর্ত্তে, জীব কৃতার্থ হ'ল তার আস্বাদ পেয়ে ;—

"নামে কাঁটা, জীবে দয়া হইল প্রচার।
অভিষিক্ত করি' দিল বঙ্গ বসুধায়:
উচ্চারেন মহাপ্রভু হরিনাম-ধ্বনি।
হরি হরি বলি' মুখে পড়িল ধরণী।"

মানুষ দেখে অবাক্, শুনে অবাক্, পেয়ে অবাক্ সেই অপূর্ব্ব রসের অভূতপূর্ব্ব পরিচয়। পৃথিবী ধরে' রাখ্‌তে পারে না সে রস সারাক্ষণ নিজের মধ্যে, তাই পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে—মানুষ বিকৃত হ'য়ে পড়ে রসসাধনায় অনেক সময়।

এল ভক্ত কবীরের অমূল্য ভক্তবাণী—চিরন্তন সত্যকে প্রতি কথায় প্রতিপাদন কর্‌তে।

এল গুরু নানকের অপূর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ "গ্রন্থসাহেব"—নিরাকারের নব বাণী,—নির্ভীক শিখজাতি গড়ে' উঠ্‌ল যার নব-প্রেরণায়, অসম সাহসে অসত্যের লঙ্কা নিয়ে।

এল রাজা রামমোহনের সংস্কারমুক্ত স্বাধীন বুদ্ধির উপলব্ধি—এক-সত্যের স্বাধীন জ্ঞান, স্বাধীন জ্ঞানের স্বাধীন কাজ,—ধন্য পড়ে' গেল মানুষজাতির গোড়ার মিলটি আশ্চর্য্যভাবে। মানুষের ধর্ম্মের গোড়ায় মিল, কর্ম্মের গোড়ায় মিল, জ্ঞানের গোড়ায় মিল, ভাবেরও গোড়ায় মিল,—এক-কথায় মানুষজাতটি আসলে এক; রাজা রামমোহন এই কথাটি করে' দিলেন সকল মানুষের চোখের সাম্‌নে, দিনের আলোতে।

কথাটা উঠ্‌ছিল ঘুঁইয়ে ঘুঁইয়ে পৃথিবীর চারিপাশে,—জ্ঞানী, গুণী, সাধু, সাধক আভাস দিচ্ছিলেন তার থেকে থেকে। রামমোহনের প্রভার আলোকে সেটি আগুন হ'য়ে জ্বলে' উঠ্‌ল ধপ্ করে'!—দিনের আলোয় পথ দেখা গেল স্পষ্ট ভাবে, ভেঙে গেল ঠেলাঠেলি, ঠাসাঠাসি, চাপাচাপির চাপ—বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়্‌তে সুরু কর্‌ল মানুষের দল এক-জোটে। সকল ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা সুরু হ'ল পৃথিবী জুড়ে'—আগুপিছু করে'। এল দেশে রামমোহনের স্বাধীন বুদ্ধির স্বাধীন কাজ—সর্ব্বোন্নতিবাদ বা উন্নতিসমন্বয়। কালক্রমে বিকৃত, প্রচলিত দেশীয় আচার অনুষ্ঠানের রাশীকৃত জঞ্জাল দূরীভূত হ'য়ে সুরু হ'ল সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, জ্ঞান, কর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা সবের উন্নতি, এবং সকল উন্নতির পরাকাষ্ঠা এদেশে নারী-উন্নতি। একজোটে সমভাবে আলো পড়্‌ল ছোট-বড় পুরুষ-নারী সবার চোখে,—দেখ্‌ল সবাই, লোক জোটানো কাজ নয় তার চোখ-জোটানোই কাজ—

"সাম্নে গেলে কেউ চল্‌বে না আর
চলার পথে,—
দিনের আলো পথ দেখাবে,
চল্‌বে মানুষ ইচ্ছামতে।"

পৃথিবীর গাড়ি এগিয়ে চলেছে হু হু করে'. - মানুষের জ্ঞান বেড়ে উঠ্‌ছে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে,—সকল জাতি, সম্প্রদায়ে স্বাধীন বুদ্ধির মানুষ জন্মাচ্ছেন অসংখ্য। সকলের বুদ্ধি স্বাধীন করে' তুলে', মানবজ্ঞানে এক-সত্যের মিল ঘটিয়ে, পৃথিবী আশ্চর্য্য আনন্দের মধ্যে নিজেকে সফল করে' তুল্‌তে চাইছে একান্ত চেষ্টায়;—তারি আয়োজন আগা-গোড়া।

সমস্ত পৃথিবী স্বাধীন হবে সর্ব্বতোভাবে, সকল মানুষ সমান অধিকার পাবে পৃথিবীর বিচিত্র কাজে, পৃথিবীর দিক্‌খোলা পথে ইচ্ছামত চলে' নয়নাথী সুখী হবে সকল দিক্ থেকে। এই ঐশ্বরিক প্রেরণার গতি বোধ কর্‌বে কে?—

"এক্‌ই সুরে সবাই বাঁধা
জানি বা আর না-ই জানি,
একই তারে সবাই বাঁধা
মানি বা আর না-ই মানি।
একই কথা সবাই বলি
ভাষা যতই হোক্ নাকো,
এক রাগিণী সবাই ভাঁজি
সুরের তফাৎ থাক্ নাকো।
একই মরণ সবাই মরি
মর্‌তে চাই আর নাই বা চাই,
একই জনম সবাই ধরি
বাঁচ্‌তে চাই আর না-ই বা চাই।
এক জোড়নে সবাই জোড়া
বাঁধা সবাই এক ডাঁতে,
দশার ফেরে যতই ফিরি
আগু-পিছু এক সাথে।

এক নিয়মে গড়্‌ছে সবাই—
যতই করি কোলাহল,
তাইতে তারে পায়্‌ব না কেউ,
কারিগরের এমনি কল!

একই ধরম, একই করম
একেরই সব কারখানা,
এক ছাড়া দুই বল্‌ব যারে
কই কোথা তার নিশানা!"

রবীন্দ্র-জয়ন্তী—পুরী

[বিগত ১৩ই পৌষ বৈকালে পুরীর সমুদ্রতীরে, 'ভিক্টোরিয়া স্বাস্থ্যনিবাসের' সম্মুখের প্রাঙ্গণে, চন্দ্রাতপতলে, জনপ্রিয় কলেক্টর শ্রীযুক্ত এন, পি, খাডানি মহোদয়ের সভাপতিত্বে—রবীন্দ্রজয়ন্তী-উৎসব সুনির্ব্বাহিত হয়। বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপটি প্রায় পাঁচশত নরনারী বালকবালিকায় পরিপূর্ণ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছিল। একটি বেদীর উপর কবির আলেখ্যগুলি পুষ্পমালা-সুশোভিত ও ধূপগন্ধে সুরভিত হইয়া সজ্জিত ছিল।—তাহার সম্মুখেই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বেদমন্ত্র পাঠের দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়। তাহার পর একটি প্রার্থনাগানে, উৎসবক্ষেত্রে সুসজ্জিতা, পুষ্পাভরণ-ভূষিতা বালিকাগণ-কর্ত্তৃক বরণ ও মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হইয়া, সমবেত-সঙ্গীত গীত হয়। ইহার পর বালকদেরও সমবেত-সঙ্গীত হইয়া, শ্রীমতী আভাময়ী রায় লিখিত "উদ্বোধন" পঠিত হয়। পরে ক্রমান্বয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ও তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এক এক অংশের আলোচনা করিয়া এক এক জনে কিছু কিছু বলেন এবং বালকবালিকারা কবির কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে ও কবির গানও অনেকগুলি সুন্দর ভাবে গীত হয়। কবিতা-আবৃত্তির মধ্যে শ্রীমতী বিভা রায়ের "এবার ফিরাও মোরে" উল্লেখযোগ্য *। একটি ছোট বালিকার পক্ষে এই দীর্ঘ, কঠিন কবিতাটি আগাগোড়া সুস্পষ্ট, সুমিষ্ট, অনর্গল আবৃত্তি—অল্প প্রশংসার বিষয় নয়! পরে উৎকলবাসীর পক্ষ হইতে রায় সাহেব উমাচরণ দাস কবির সম্বর্দ্ধনা বিশেষ ভাবে করেন। ইহার পর সভাপতির বক্তৃতা, বালিকাগণের সঙ্গত ও জনযোগান্তে উৎসব সমাধা হয়।

জয়ন্তীর সমগ্র ব্যয়ভার ভিক্টোরিয়া স্বাস্থ্যাবাসের স্বত্বাধিকারী কুমার সৌরীন্দ্রমোহন গুহরায় মহাশয় বহন করিয়া, এবং তাঁহার পত্নী শ্রীমতী শচীরাণী দেবীও স্বয়ং উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সমাগত মহিলাদের অভ্যর্থনা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহার সমস্ত আয়োজন-উদ্যোগ-অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণেরও তাহা কম প্রাপ্য নয়। উৎসবে বালিকা ও মহিলাদের পরিপূর্ণ যোগদানে কতই না আনন্দ হয়! আর দশ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা এভাবে হইতে পারিত না; আমাদের জাতীয় জীবন তাহাতে কতটাই না প্রাণহীন এবং শোভা ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত ছিল। জগতের জ্ঞান-কর্ম্ম-আনন্দের সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ নরনারীর সমবেত প্রচেষ্টায় সজীব, সম্পূর্ণ হইয়া উঠুক,—ইহাই প্রার্থনা।

উৎসবে পঠিত দুইটি রচনা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।]

অর্ঘ্য

আজ আমরা যাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য সম্মিলিত হইয়াছি, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিজেরাই গৌরব বোধ করিতেছি। সমস্ত দেশবাসী,—শুধু আমাদের দেশই বা কেন,—সমস্ত পৃথিবীই যাঁহাকে গৌরবের অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছে, আমাদের এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্য তাঁহার কাছে কিছুই নয়,—কিন্তু সেই মহামানবের উদ্দেশে অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পাওয়া আমা-

* কলিকাতার ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সরোজীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তিকারিণীকে একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দান করিয়াছেন।

সেই বিশ্বের গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। তাই এখন, যখন পূজনীয় কবির সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে দেশের সকল স্থানেই তাঁহার অভিনন্দনের আয়োজন হইতেছে, এই উপলক্ষ ও সুযোগ অবলম্বন করিয়া আমারও তাঁহার উদ্দেশে হৃদয়ের প্রীতি-শ্রদ্ধার অঞ্জলি লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি,—আয়োজন ও শক্তি আমাদের যতই তুচ্ছ, যত সামান্যই হউক্।

কাব্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াই কবিরা মানব-জাতিকে চিরকালের ঋণ অপরিশোধ্য ঋণে বদ্ধ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট সেদিক দিয়া ত আমাদের ঋণের কথা বলিবারই নয়, কিন্তু তাহা ছাড়াও জাতীয় জীবনের এমন কোন বিভাগই নাই, যাহা তিনি সমৃদ্ধ না করিয়াছেন। এমন কি, শুধু আমাদেরই নয়, সমগ্র মানবসমাজকেই তিনি নূতন আলো দিয়াছেন, পথ দেখাইয়াছেন। কাজেই তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার দানের কথা কি আর বলিব। এই যে পুণ্যসপ্তাহে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী জাতির প্রাণের ভক্তি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতার নিবেদন বরণীয় কবির পূজ্য চরণে উৎসর্গীকৃত হইতেছে, আমারও তাহার সহিত আমাদের এই দীন অঞ্জলি মিলিত করিতে চাহি মাত্র।

একটি কথা কেবল বলিতে হয়, লোকোত্তরজনের সম্বন্ধে—সাধুবাদ আয়োজনও নয়, সালঙ্কার বাক্যাবলীও নয়। তাঁহারা যে সত্য আমাদের দিয়া যান, তাহার মর্ম্মগ্রহণের প্রয়াস ও জীবনে তাহার প্রয়োগই মাত্র তাঁহাদের প্রতি অনুরাগের প্রকৃত পরিচয়। আজিকার এই সম্মিলন যদি কবির প্রকাশিত সত্য ও সৌন্দর্য্যের সাধনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তবেই মাত্র ইহা সার্থক হইতে পারে। বিশেষতঃ, এখন চারিদিকেই যে বহু সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে, দুঃসময়ও ঘনাইয়া আসিল, তাহাতে এই দ্বিতীয় মহাননার বাণী ও আদর্শই আমাদের আলোক-বর্ত্তিকা!

শ্রী অনিন্দিতা দেবী

মনোমানবোত্তমায়

এই যে স্থূল জগৎ আমাদের চোখের সাম্নে তার বিচিত্র সুখদুঃখ আধিব্যাধি জরামৃত্যু নিয়ে একটি অখণ্ড স্বপ্নলোকের মত রয়েছে, এর পিছনে আছে অপূর্ব্ব রস-রূপের সাগর, শক্তির অপার জলধি, জ্ঞানের পরম আলোক—যার কাছে জড় সূর্য্যের জ্যোতিও নিষ্প্রভ। এ জগৎ সেই আনন্দের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি, সেই রসের আংশিক প্রকাশ—আংশিক বিকৃতি; এ জগৎ সেই শক্তিরই রূপ ধরার চেষ্টা, আপন ভুবনভুলানো সৌন্দর্য্য ও মাধুরীকে আপনার চেতনায় ফুটিয়ে আস্বাদন করার আয়োজন।

যাঁরা সেই পিছনের রূপ-রস-আনন্দ ও জ্ঞানকে অনাবৃত করে' স্থূল-মানুষের চোখের সাম্নে, তার ইন্দ্রিয়ের সাম্নে মেলে ধরতে অসাধ্যসাধনের শক্তি নিয়ে এ জগতে আসেন, তাঁদের একজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। কবি, ঋষি, চিত্রী, গায়ক, বাদক, শিল্পী—এঁদের সকলের কাছে আছে সেই নিগূঢ় রস-জগতের চাবি—সেই আনন্দলোকের দুয়ার খুল্‌বার সঙ্কেত। এই দৃশ্যবেদনা ভরা জড় জগৎ যে এমন এক মহাকাব্য, যার প্রতি রেখায় প্রতি স্পর্শে রয়েছে অনাবিল আনন্দ, এ কথা স্থূলবুদ্ধির মানুষ কি বুঝ্‌তে পার্‌তো—যদি কবি তাকে ভাষা না দিত, যদি গীতকার তাকে ছন্দে ঝঙ্কারে রাগে মূর্চ্ছনায় উদ্বেল করে' না তুল্‌তো, যদি চিত্রী তাকে তুলির সূক্ষ্ম কোমল টানে টানে রূপায়িত লীলায়িত করে' না ধর্‌তো?

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, চিত্রী, গায়ক ও ঋষি। স্বপ্নলোকের অনেকগুলি চাবি এই বাণী ও সত্যের বরপুত্রের কাছে আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের আসন জগতের কবিদেরও বহু উর্দ্ধে,—তিনি ভাষার স্রষ্টা, সুরের দেবতা, রেখার রাজা, আনন্দের যাদুকর, সত্যের ঋষি। শুধু কবি অনেক আছে, শুধু গায়ক অনেক আছে, শুধু ঋষিও এই হতোদ্যমি ভারতে কতই না আজ অবধি এসেছে ও গেছে; কিন্তু এত বড় প্রতিভার বহুমুখ সূর্য্য সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজে আজ অবধি আসে নাই। এইখানে বাঙালী জাতির গর্ব্ব, শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর গর্ব্ব,—ভারতের গর্ব্ব! এত বড় দান জগৎকে আর কে দেবে কালিদাস-তত্ত্বভূতি-সেবিতা ঋষিমুনিপুণ্যরজা হিমাদ্রিকিরীটিনী সাগরমেখলা ভারতমাতা ছাড়া?

এই সমবেত ভক্তিসার্দ্র জনমণ্ডলীর সঙ্গে নতমস্তকে আজ আমি আমার অন্তরের অর্ঘ্য সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের

চরণে নিবেদন করি যিনি নিজ মহিমায় জগতের সুধী-সমাজে আজ সম্রাটের আসনে আসীন! তাঁর সমুত্থিতম জন্মোৎসব জয়যুক্ত হোক্.—আরও দীর্ঘকাল তাঁর ঐ আনন্দের সোনার কাঠিটি নিয়ে তিনি আমাদের দুঃখ-বেদনা ও বন্ধনকেও অমৃত-মধুর করুন!

শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

স্মৃতির সৌরভ

শ্রী গীতা দেবী

যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গালীর নারীসমাজ যখন জড়তার আবেশে প্রসুপ্ত, অচেতন, সেই সময় কোন্ শুভ লগ্নে, রাত্রির অন্ধকারের ভিতর, বিধাতার সৃষ্টি-সরোবরে এই কমল-কুঁড়িটির জন্ম! রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ-সমন্বিত তাহার মুদিত পাপ্‌ড়ির সংবদ্ধ রেখায় রেখায় যে অপূর্ব্ব মহিমার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত, তাহা দেখিয়াও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই যে এই ক্ষুদ্র কলিকা, সকলের পূর্ব্বে প্রভাত সূর্য্যের আলোক আহরণ করিয়া, পূর্ণপ্রস্ফুটিতা হইয়া সকলের মোহাচ্ছন্ন অন্তরে অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিবে।

দিনে দিনে ইহা বিকশিত হইতে লাগিল;—প্রতি পাপ্‌ড়িতে তাহার সৌন্দর্য্যের অনন্ত সম্ভার লুটাইয়া, সহস্র গন্ধবিহীন কিংশুকদলের মাঝে আপনার সৌরভোজ্জ্বল মাথা তুলিয়া মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর ন্যায় সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কোথাও গর্ব্ব নাই, অহঙ্কার নাই, নির্ম্মল অকলঙ্ক নলিনী কেবল আপনাকে বিলাইয়া দিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল!

বাংলার নারীসমাজ এতদিন পঙ্গু—নির্জ্জীব হইয়া ছিল। সরোজনলিনীর মহৎ অন্তরের উজ্জ্বল কিরণ-সম্পাতে তাহাদের প্রস্তরীভূত শিরা-উপশিরায় স্পন্দন সুরু হইল,—অসাড় চিত্ত গতিপ্রাণ বীণার ঝঙ্কারে আকুল হইয়া উঠিল।

সরোজনলিনী অন্তঃপুর বন্দিনীগণের অবগুণ্ঠনের যবনিকা ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিলেন,—তাহাদের অন্ধকার হৃদয়-কন্দরে জ্ঞানের প্রদীপ লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। গৃহ ভিন্ন বাহিরেও যে সুবিশাল কর্ম্মময় জগৎ রহিয়াছে, তাহার সন্ধান দিতে লাগিলেন।

নারী যে পুরুষের ক্রীড়নক অথবা ক্রীতদাসী নহে, সে স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী,—সে পুরুষের সকল আশা-উদ্যমের মূল উৎস-ধারা,—নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাহার মূর্ত্ত আদর্শ দেখাইয়াছেন তিনি।

তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় অভিভূতা হইয়া ভারতনারীর বৈশিষ্ট্য হারান নাই, অন্ধ অনুকরণের স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দেন নাই।

পাশ্চাত্য আবেষ্টনের চিত্তর প্রতিপালিতা হইয়াও স্বদেশকে তিনি প্রাণ-মন দিয়া ভালবাসিতেন। বাংলার লক্ষ লক্ষ অসংস্কৃত পল্লীসমাজের শোচনীয় দুরবস্থায় তাঁহার কোমল প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর বিদুষী পত্নী হইলেও পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা নারীর সহিত পরিচয় করিয়া, আপনার অন্তরের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে সকলের প্রীতি অর্জ্জন পূর্ব্বক নিরক্ষরা গ্রাম্য মহিলাগণকে জাগরণের বাণী শুনাইতেন।

নিজের সমগ্র জীবন দিয়া বুঝাইয়াছেন প্রকৃত শিক্ষা তাহাই, যাহা মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাপথ সুগম এবং সুখময় করে, অপরিসর চিত্তবৃত্তির প্রসার-সাধন করে।

নিরন্তর গৃহকোণে কূপমণ্ডূকের ন্যায় বাস করিলে শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যই শোচনীয় হইয়া উঠে, মনোবৃত্তি নীচ ও স্বার্থান্ধ হইয়া পড়ে। ইহার জন্য তিনি অবরোধপ্রথার বিরোধিনী ছিলেন।

তাই বলিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিতে বলেন নাই,—সর্ব্বাগ্রে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। তবে কেবল তুচ্ছ আহার্য্যের ব্যাপারে চিরদিন ব্যাপৃত থাকিলে অন্য কর্ত্তব্যে ত্রুটি রহিয়া যাইবে;—নেয়েরা যাহাতে সুগৃহিণী ও সুগৃহিণী হইতে পারে, সে জন্য তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল

না। তিনি অবরোধবাসিনী নারীগণের পরস্পর মেলামেশা, সুখ-দুঃখ এবং শিক্ষা দীক্ষার আদানপ্রদানের জন্য ঐকান্তিক ও পরিশ্রমে অনেকগুলি সমিতি গঠন করিয়া গিয়াছেন; বহু দুঃস্থ, অসহায়া নারী সেই সব সমিতি হইতে লাভ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে অলসতা ও এবং বিলাসিতার বৃদ্ধি হইতেছে। যে শিক্ষা আমাদের অলস, অকর্ম্মণ্য, এবং জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে, তাহা বিড়ম্বনারই নামান্তর মাত্র!

সরোজনলিনী কুসংস্কারবর্জ্জিতা আদর্শ-হিন্দুমহিলা। তিনি অন্তরঙ্গ স্বামীর পার্শ্বচারিণী, একনিষ্ঠাবতী, ধর্ম্ম-প্রাণা, প্রেমসেবিকা এবং পুত্রদ্বয়ের জননীস্বরূপা। দয়ার ন্যায় সর্ব্বদিকে তাঁহার অন্তরস্থ কল্যাণশ্রী প্রসারিত ছিল। তিনি ঘর ও বাহির কাহাকেও উপেক্ষা করেন নাই; অন্তঃপুরে এবং বহির্জ্জগতের সমক্ষে তাঁহার অমল চরিত্র অপরূপ হইয়াছিল। তিনি ছিলেন সর্ব্ববিধ গুণান্বিতা, বিধাতার সম্পূর্ণ—অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

নারীর ঐকান্তিক অধ্যবসায়, অপ্রেরণা ব্যতীত নারীর মুক্তি অসম্ভব, তাহা তিনি মনে মনে অনুভব করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুউচ্চ ডিগ্রীর ভিতর নারীত্ব নাই, নৈতিক বক্তৃতার ভিতর নারীত্ব নাই, পাকশালার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেও সম্পূর্ণ নারীত্ব নাই।

নাস্তিক শিক্ষা, স্নেহপ্রীতি সহকারে সুশৃঙ্খল ভাবে সংসারধর্ম্ম পালন, তৎপর নিজের ক্ষমতানুযায়ী দেশ ও দশের সেবা,—অসহায়া নারীজাতির উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গই প্রকৃত রমণীর কার্য্য। যিনি ঘরে বাহিরে, সমস্ত বিষয়ে আপনার অন্তর ব্যাপ্ত করিয়া দিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ নারীর আদর্শ।

অনেক বঙ্গমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারা ভূষিতা হইয়াছেন, সংসার ছাড়িয়া বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নারীধর্ম্মের সম্পূর্ণতার নিদর্শন নহে।

ভারতের মধ্যে একমাত্র সরোজনলিনীকেই দেখিতে পাই, যিনি স্নেহ, প্রেম, দয়া, ধর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা, স্বদেশ-প্রীতি এবং অতুল সাহসিকতায়, সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া শক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

অনন্তের আহ্বানে তাঁহাকে ঊর্দ্ধলোকে যাত্রা করিতে হইয়াছে; কিন্তু শোকে মুহ্যমান হইয়া থাকিলে চলিবে না। নারীধর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়া তাঁহার অসমাপ্ত মহা-সাধনা আমাদেরই সম্পন্ন করিতে হইবে।

সরোজনলিনী অকালে ঝরিয়া গিয়াছেন! কিন্তু তাঁহার অম্লান মহাপ্রভা রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার দীপ্তি মর্ত্ত্যের ধূলিতে মলিন হইবে না। মৃত্যুসিংহাসনে তাঁহার অমর মূরতি অপরূপ জ্যোতির্ম্মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া ভারত-নারীর কর্ম্মজীবনে বেদনার সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে *।

* লেখিকা পঞ্চদশবর্ষীয়া একটি বালিকা।

ভূত-ভারতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি*)

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

পরদিনও হাঙ্গামা সমানই চল্‌ল। পথে বর্ম্মা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, কিন্তু সহরের নানা কুরুক্ষি-পাড়া থেকে অমানুষিক নারীহত্যা শিশুহত্যার খবর আসে। হিন্দুস্থানীরা, কুরুঙ্গিরা, চুলিয়ারা হৈচৈ করে' পথে বেরোয়, তাদের ওপর পুলিশের গুলী চলে! পথে গাড়ীঘোড়ার চলাচল বন্ধ, রিক্‌শও আর প্রায় নেই বল্‌লেই হয়, যদিও রিক্‌শই রেঙ্গুনের বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত লোকের প্রধান বাহন। দোকানপাট, হাট বাজার বন্ধ, সিনেমা বন্ধ, স্কুল বন্ধ, আপিস-আদালতে কেউ যায় না। চুপচাপ বাড়ী বসে' থাকি, থেকে থেকে কোথাও কোন পাড়া থেকে হৈ হৈ করে' কোলাহল ওঠে,দুটো একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ হয়, তারপর ক্রমে ক্রমে আবার সব চুপচাপ।

সেদিন রাত্রি প্রায় দুটোর সময় হঠাৎ জেগে উঠে শুনি নিত্যগোপাল শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে আমায় ডাক্‌ছে। আলোটা জেলে দরজা খুলে বল্‌লাম, "কি ব্যাপার?"

সে বল্‌লে, "আমি তোমার ঘরে শোব।"

আমি বল্‌লাম, "কেন, অকস্মাৎ?"

সে বল্‌লে, "ঐ ঘরে একা শুতে আমার ভালো লাগ্‌ছে না।"

"ভয় কর্‌ছে বল?"

"হুঁ ভয়-ভয়ই একটু কর্‌ছে।"

"তোমাকে নিয়ে মুস্কিল দেখ্‌ছি। ভয়ের সত্যিই যদি কিছু থাকে, ওঘরে এঘরে তফাৎটা কি?"

সে বল্‌লে,—"তুমি ঠিক বুঝতে পার্‌ছ না। ডাকাতের ভয় নয়—"

"তবে?"

"ঘরটায় খুট্‌খাট্‌ করে' সারারাত কি সব শব্দ হ'চ্ছে।"

"এটা ভূতের বাড়ী নয়। ইঁদুর হবে হয়ত!—ইঁদুরকে তুমি এত ভয় কর?"

সে এ-কথার কোনো জবাব দিল না।

বল্‌লাম, "শুতে যাও।"

আমার মুখের দিকে একবার চেয়েই সে চোখ নীচু করে' অনুনয় কর্‌তে লাগ্‌ল।

বল্‌লাম, "আঃ কি জ্বালা! ভগবান্ তুলে তোমায় পুরুষ করে' সৃষ্টি করেছিলেন! অম্‌নি তাঁকে আরম্ভ করে' দিলে? এসো, এই রাত্রে আবার তোমার খাট টানাটানি করে' এঘরে আনা যাক্।"

দুজনে ধরাধরি করে' বহুকষ্টে খাটটাকে আমার শোবার ঘরে ঢুকিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। কিন্তু ঘুম আর হ'লো না, পাশের ঘরে আমার হতভাগা ভাইপুটো দুর্দ্ধমনীয় হাসির বেগ চাপ্‌তে গিয়ে সারারাত সৃষ্টিছাড়া রকমের সব আওয়াজ বা'র কর্‌তে লাগ্‌ল। তার মধ্যে ঘুমোতে পারে কার সাধ্যি?

চা খেতে বসে' সকালে আমার মেজো ভাই বল্‌লে, "শোনা যাচ্ছে বর্ম্মারা Hlawga Lakeএর জলে বাল্‌তি বাল্‌তি বিষ ঢেলে দিয়েছে। তারা নিজেরা সে জল খাচ্ছে না। সমস্ত Non-Burmanদের বিষ খাইয়ে মারবে ঠিক করেছে।"

নিত্যগোপাল বিনিদ্র ক্লান্তিতে শুক্‌নো মুখে একটা শুক্‌নো রুটির টুক্‌রো চিবিয়ে সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা ঠোঁটের কাছে তুলেছে, কথাটা শোন্‌বামাত্র পেয়ালা নামিয়ে রেখে চোখের তারা প্রায় কপালে তুলে ঢোক গিলে বল্‌লে, "এ্যাঁ?"

মেজো বল্‌লে, "তারা নিজেরা Royal Lakes থেকে জল নিয়ে গিয়ে খাচ্ছে।"

---

* ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বাংশ পাওয়া যাইবে—আশ্বিন, ১৩৪৮, 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে।

নিত্যগোপাল বল্‌লে, "আমরা tube wellএর জল খাচ্ছি না?"

মেজো বল্‌লে, "কোথায় tube wellএর জল? চাকররা কি বাইরে যেতে পারবে যে tube wellএর জল আসবে?"

নিত্যগোপাল বল্‌লে, "তোমরা এই চা খাচ্ছ?"

আমি মেজোকে ধমক্ দিয়ে বল্‌লাম, "আঃ! কি বাদ্‌রামো করছিস্? চুপ কর্ না।"

সে চুপ কর্‌ল বটে, কিন্তু নিত্যগোপালকে সেই চা কিছুতে আর খাওয়ানো গেল না।

আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা, তুমি কি পাগল? ঠাট্টা বুঝ্‌তে পার না?'

সে বল্‌লে, "ঠাট্টা বুঝ্‌তে কেন পারব না? খুব পারি। কিন্তু ও যা বল্‌ছে তা সত্যি হতেও ত পারে? যে কথাটা ওর মাথায় আস্‌তে পেরেছে সেটা বর্ষাদের মাথায়ও এসে থাক্‌তে ত পারে!"

আমি বল্‌লাম, "তোমার মতো মাথা যদি সবার হয়, তাহলে পারে। এইবার চা'টা খেয়ে নাও। জেন্‌-শুদ্ধ লোক যদি মরে, তুমি একা বেঁচে থেকে বর্ষাদের সঙ্গে বেশী কিছু সুবিধা করে' উঠ্‌তে পারবে না।"

মেজো এতক্ষণ চুপ করে' ছিল, বল্‌লে, "মেজদা ঠিক শোনেনি, ভিনিস্‌টা মিশিয়েছে সেটা বিষ নয় Bacteria; ফুটন্ত জলে Bacteria বাঁচে না, চা খেলে ক্ষতি নেই।"

তবু চা সে খেল না।

মনটা বিরক্তিতে তেতো হ'য়ে রইল। দুপুরে খেতে বসে' চাকরকে বল্‌লাম, "এই বাবুকে ভুলে খাবার জল দিয়ে ফেলো না যেন। জল ইনি খাবেন না।"

হাস্যবিকশিত মুখে নিত্যগোপাল বল্‌লে, "না, আমি আজ ওদের দিয়ে tube wellএর জল আনিয়েছি, তাইতেই রান্না শুদ্ধ হয়েছে।"

মেজো বলে' উঠ্‌ল, "বর্ষারা tube wellএর সঙ্গে Hawge Lakeএর জলের পাইপ্ জুড়ে দেয়নি ত?"

তাকে ধমক্ দিয়ে থামিয়ে দিলাম। নিত্যগোপালের সে কথাটা বোধ হয় দিনের মনে লাগ্‌ল না। তবু খেতে খেতে বল্‌লে, "Royal Lakes থেকে জল আনিয়ে নিতে পার্‌লেই অবশ্য ভালো ছিল। কিন্তু সে আবার অনেক দূরের রাস্তা যে।"

মেজো বল্‌লে, "বর্ষাদের ওপর শোধ তোল্‌বার জন্যে তারস্তীরেরা তার জলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাক্‌তে পারে।"

ওর কথাতে আমারও হাসি পেল। হাস্‌তে হাস্‌তেই বল্‌লাম, "অবস্থাটা যেখানে এমনি যে বাঁচলেও মর্‌তে হয় মরলেও মর্‌তে হয়, সেখানে মরবার জন্য না করাই উচিত। তুমি একটু সাহস কর নিত্যগোপাল!"

হঠাৎ শেষরাত্রে নিজের বিছানা ছেড়ে একেবারে আমার পাশে আমার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে' নিত্যগোপাল নূতন করে' আবার তার সাহসের পরিচয় দিলে! আমি বিছানায় উঠে বসে' রইলাম, "বল্‌লাম, "তোমাকে বল্‌বার মতো কথাও কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ যে seriously এ রকম ব্যবহার কর্‌তে পারে তাই আমার জানা ছিল না। তোমার মাথায় একটু দোষ আছে আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি তুমি বদ্ধ-পাগল—"

আরও অনেক বল্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে বাকীটা আর বলা হ'লো না। দেখ্‌লাম, তার মুখ ভয়ে পাংশু হ'য়ে গিয়েছে, চোখদুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়্‌বার উপক্রম,—জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়্‌ছে, গা-হাত-পা থর্ থর্ করে' কাঁপ্‌ছে! বল্‌লাম, "কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমার?"

একটা ঢোক গিলে বহুকষ্টে সে উচ্চারণ কর্‌লে, "ওই কোণটায় কালো মতন কি একটা দেখ্‌লাম!"

আলোটা জেলে তাকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লাম কোথাও কিছু নেই; সে কিছুতেই বুঝ্‌ল না। আমার পাশের ঘরে সৃষ্টিছাড়া সব আওয়াজ। হঠাৎ নিত্যগোপালের খাটের ওপাশ থেকে দড়িবাঁধা একটা কালো কম্বল ঝট্‌কা মেরে উঠে পার্টিশানের উপর দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। চীৎকার করে' লাফিয়ে উঠে নিত্যগোপাল আমাকে প্রাণপণ জোরে জড়িয়ে ধরে' কাঁপ্‌তে লাগল। দুই হাতে তাকে ঠেলে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে বল্‌লাম, "হতভাগাগুলোর খেয়ে মেরে কাজ নেই, সারারাত

শয়তানী হ'চ্ছে। তোদেরই চোখে না হয় ঘুম নেই তাই বলে' অন্যদেরও ঘুমোতে দিবি না?" ফিরে এসে দেখ্‌লাম, নিত্যগোপাল বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে, তখনো থেকে থেকে সে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে! বাকী রাতটা জেগে ব'সে পড়াশোনা করেই কাটিয়ে দিলাম।

ভাইগুলো এর পর থাম্‌ল, কিন্তু বিপদ থাম্‌ল না। বর্ষাদের ভয়েও বটে এবং তাদের হাতে কয়েকজনের প্রাণ যাওয়ার প্রতিবাদ হিসাবেও বটে, সহরের সব কুকুর মাতুয়ারা ধর্মঘট করে' কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। পথে ঘাটে স্তূপাকার হ'য়ে ময়লা জমে' উঠ্‌ল। বাড়ীর পিছনের 'কাঁচ্‌রা' গলিগুলোর দুর্গন্ধে টিঁকে থাকা দায় হ'লো। অসুখ-বিসুখ চারিদিকেই হ'তে সুরু হ'লো। শোনা গেল টাইফয়েড কলেরা প্রভৃতি মহামারী সুরু হবার ভয়ও আছে। নিত্যগোপাল কলেরা হবার ভয়ে এবার না খেয়েই প্রায় কাটাতে লাগ্‌ল। ঘরে একটা Aqua Plychotis শিশি ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে দুদিনেই সেটাকে সে দিলে সাবাড় করে'। ফলে হ'লো আমাশা। তাকে নিয়ে তারপর দু' তিনদিন যে কি দুর্ভোগ বাড়ীশুদ্ধ আমাদের!

যাহোক্ সেরে সে উঠ্‌ল। ততদিনে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও একরকম শেষ হ'য়ে গিয়েছে। মাতুয়ারা কাজে ফিরেছে, কুকুর জাহাজী কুলীদের সঙ্গে বর্ষা জাহাজী কুলীদের আধাআধি কাজের বখ্‌রা ব্যবস্থা হ'য়ে রফা নিষ্পত্তিও হ'য়ে গিয়েছে, পথে গাড়ীঘোড়া চল্‌ছে, রিক্‌শও যে ক'টা বর্ষারা তাহতে বাকী রেখেছিল আবার পথে বেরিয়েছে। তাতে বর্ষারাও চড়ে' বেড়াচ্ছে দেখে নিত্যগোপালের মনে একটু ভরসা হ'লো। কিকেলে তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা'র করে' এনে কোকোজীর বাড়ীর দরজায় এসে ঘা দিলাম।

কাশ্‌তে কাশ্‌তে এসে কোকোজী দরজা খুল্‌ল, তারপর আমাদের দেখে' বাক্যব্যয় না করেই দড়াম করে' দরজাটিকে ঠেলে বন্ধ করে' দিয়ে কাশ্‌তে কাশ্‌তে ফিরে গেল। ব্যবহারের একটা কিছু পরিবর্তন দেখ্‌তে পাব ভেবেই এসেছিলুম কিন্তু একেবারে এতটা আশা করিনি। নিত্যগোপালও আমায় টেনে নিয়ে যাম্‌তে পারলে বাঁচে। ক্রমাগত বল্‌তে লাগ্‌ল, "একে বর্ষা তার পরে আইরিশের বন্ধু, ওকে কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। দেখ্‌লে না আমাদের দেখে' মুখ কি রকম কর্‌লে?"

তার কথায় কান না দিয়ে কি করব দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি এমন সময় Phyllis এসে দরজা খুলে দিয়ে হেসে বল্‌লেন, "Good evening! আসুন!"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। নিত্যগোপালও আমার পিছন পিছন ঢুকল। সিঁড়ির দরজা মাকের একটা ঘরে খোলে, সেখান থেকে খোলা দরজায় বসবার ঘরের অর্ধেকটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বসবার ঘরের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে চীৎকার করে' কোকোজী বল্‌লে, "তোমায় খুলে দিতে কে বল্‌লে Phyllis? রাস্তায় কুলীতে কুলীতে মারপিট হ'চ্ছে, সেই ভয়ে যারা এতদিনের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে আমায় এসে দেখে যেতে পারেনি, এমন বন্ধুতে আমার দরকার নেই।"

চাপা গলায় Phyllis বল্‌লেন, "খুলে দিতে বল্‌লেন কিন্তু উনিই।"

আমিও হেসে চাপাগলাতেই বল্‌লাম, "তা আমি জানি।"

কোকোজী আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "কি কানাকানি হ'চ্ছে দুজনে?"

"কিছু না" বলে' তার পাশে গিয়ে বস্‌লাম। বল্‌লাম, "কেমন আছ?"

সে বল্‌লে, "সেটা জান্‌বার তোমার সত্যিকারের কোনো দরকার নেই নিজেই তা জানো, অনাবশ্যক প্রশ্ন কর কেন? আমার ধারণা ছিল তোমার অন্ততঃ সাহস একটু আছে, দেখ্‌ছি তোমরা সবাই সমান। Reggie বরঞ্চ ভালো, সে একদিনও কামাই দেয় নি।"

সত্যমিথ্যায় মিশিয়ে তাকে বল্‌তে হলো, "কি করব, নিত্যগোপালের শক্ত অসুখ করে' বস্‌ল, তাকে নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত-পাছাড়। আজ সে উঠ্‌তেই বেরিয়ে পড়েছি।"

একটু পরে Reggie এল। তারপর বিয়ার, বিয়ার, বিয়ার। Phyllis আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে' বল্‌লেন, "ক'দিন থেকে অসুখটা খুব বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ারের মাত্রাও বেড়ে চলেছে। কাল একবার

বেরিয়ে হ'য়ে পড়ে' দিয়েছিলেন, তবু সারাক্ষণই প্রায় বিয়ার চলছে।"

আমি বল্‌লাম, "এত খেতে যাও কেন?"

তিনি বল্‌লেন, "Reggie আসে, সে খেয়। আমি প্রাণ ধরে' না বল্‌তে পারি না। মেয়াদি একটু কমে, দুর্ভাবনটা একটু ভুলে থাকে।"

কোকোজী আবার হাঁক দিয়ে উঠল, "আবার কি কানাকানি সুরু করেছ?"

হেসে উঠে গিয়ে তার পাশে আবার বস্‌লাম। Phyllis একলা বারান্দায় ঘুরতে লাগ্‌লেন। বিয়ার, বিয়ার, বিয়ার। একটু পরে Reggie উঠে বারান্দায় গেল। দুজনে রেলিঙের ওপর বুকের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প কর্‌তে লাগ্‌ল। তাদের ভাঙাভাঙা কথার দু'একটা শব্দ, হাসির দু'একটা টুকরা ঘরের মধ্যে ভেসে আস্‌তে লাগ্‌ল। বুঝ্‌লাম, যে পথ Waltonকে দিয়ে কাটা হয়েছে, সুযোগ পেয়ে Reggieও সেই পথ ধরে' এগিয়ে যেতে দেরী করেনি। কোকোজীর মুখে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য কর্‌লাম না।

কিন্তু একটুক্ষণ যেতেই আমায় সে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "Phyllisএর নাচ তোমার ভালো লাগে না?"

আমি বল্‌লাম, 'লাগে, তাই বলে' নাচ্‌বার সময় এখন নয়।"

সে বল্‌লে, "সে বিচারের ভার ত তোমার ওপর নেই। যদি কিছু মনে না করো ত তাকে ডাকো একটু!"

উঠে গিয়ে নিজেই গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগিয়ে দিলে। Phyllis এসে বল্‌লে, "কি কর্‌ছিলে? তোমার নাচ দেখ্‌তে আজ ভারি ইচ্ছে কর্‌ছে, একটু নাচ্‌বে?"

ভাবলাম, কি নির্ম্মল অনুরোধ! এ যে প্রায় বেহলার নাচের মতো হ'লো! কিন্তু Phyllis বিনা বাক্যব্যয়ে রাজী হলেন। সে রাজী হওয়ার অর্থ যে কতখানি তা বুঝ্‌তে আমার কষ্ট হ'লো না।

নৃত্য আরম্ভ হতেই দেখ্‌লাম, নিত্যগোপালও বিয়ার ঢাল্‌ছে। তার কানে কানে বল্‌লাম, "মাত্র অসুখ থেকে উঠেছ, আজ ওটা নাই বা খেলে।"

Phyllisএর দিকে চোখ রেখেই সে বল্‌লে, "একটু খাই।"

বেহলারই নৃত্য বটে! বুঝ্‌লাম, এ নৃত্যও আমাদের কাছে তার এক বেহলাজাতলেরই নৃত্য। স্বামীরই কঙ্কাল বুকে করে' তারও সেই নৃত্য,—কিন্তু কত বেশী করুণ আর মর্ম্মস্পর্শী। দেবতাই শুধু এ নৃত্যের বিচার কর্‌তে পারেন না, যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে' অস্তিত্বের সমস্ত আগ্রহেরা তার এই নাচ, সে নিজেও আজ বিচারের আসনে! কি দুরূহ সেই পরীক্ষা!

কোকোজী উঠে একবার পিছনের দিকে গেলে নিত্যগোপালকে বল্‌লাম, "নিত্যগোপাল, এত খেয়ো না। এক গেলাস ত খেলে।"

সে বল্‌লে, "এক গেলাস মাত্র খেয়েছি—"

আমি বল্‌লাম, "কিন্তু কোকোজীর বাড়ীর গেলাসে। কে জানে ভাল করে' ধোওয়াটোওয়া হয় কি না—"

সে বল্‌লে, "Alcoholএ সব germ মরে' যায়।"

Reggie শুন্‌তে পেয়ে বল্‌লে, "বিয়ারে যে পরিমাণ alcohol থাকে তাতে germগুলো মরা দূরে থাক্, বেশ আরো বল্য পেয়ে active হ'য়ে ওঠে।"

নিত্যগোপাল নূতন গেলাসটি মুখে তুলেছিল, একটি বড় চুমুকে যতখানি খাওয়া যায় খেয়ে নিয়ে গেলাসটি নাবিয়ে রেখে বল্‌লে, "আর খাব না তাহলে।"

কোকোজী ফিরে এসে বল্‌লে, "যাক্ Phyllis, আর দরকার নেই। এ তোমার নিতান্ত উলুখনে মুক্তো ছড়ানো হ'চ্ছে।—ওরা গল্প কর্‌তেই ব্যস্ত।"

নিত্যগোপাল চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "না না, আমরা মোটেই গল্প কর্‌ছি না, এমনিই একটু কথা কর্‌ছি—"

তার দিকে বিদ্রূপদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে কোকোজী বল্‌লে, "ওর নেশা হয়েছে।" নিত্যগোপাল মাথা নীচু করে' রইল।

কোকোজীর সম্বন্ধে এটা বল্‌তেই হয় যে তাকে বোতলের পর বোতল বিয়ার খেতে কতবার দেখেছি, কিন্তু নেশা হ'তে কখনো দেখিনি। সে বল্‌ত, নিজেদের শরীর-মনের ওপর বুদ্ধির শাসন এতটুকুও যাদের আছে, তাদের নেশা কিছুতেই হয় না। সে যাক্। Phyllisকে ফিরে এসে বস্‌বার অবকাশ না দিয়েই Reggie এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল। Phyllisবিব্রত হ'য়ে দাঁড়িয়ে কোকোজীকে

ডেকে বল্‌লে, "Reggie আবার তার সঙ্গে নাচ্‌তে বল্‌ছে।"

কোকোজী বল্‌লে, "তোমারও যে দম নেবার দরকার থাক্‌তে পারে Reggie ত আর তা বুঝ্‌বে না? তা, তুমি যদি পার ত নাচ। গ্রামোফোনের রেকর্ড বদ্‌লে দিয়ে ফিরে এসে সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল, "নাঃ, নিত্যগোপালের সত্যিই নেশা হয়েছে। নিজের গেলাস ফেলে রেখে ও দিব্যি আমার গেলাস থেকে খাচ্ছে!"

নাচ্‌তে নাচ্‌তেই Reggie চেঁচিয়ে বল্‌লে, "তোমার গেলাসটি বেশী ভরা ছিল কি? তাহলে দুপটা নেশার ফল নাও হ'তে পারে।"

কোকোজী বল্‌লে, "নাঃ, নিত্যগোপালকে এতটা খারাপ তাই বলে' তোমাদের ভাবা উচিত নয়! আমিও আধখানা খেয়েই রেখে দিয়েছিলাম, তারটাতেই বরঞ্চ কিছু বেশী আছে। দাও গেলাসটা ধুয়ে আনি।"

নিত্যগোপালের ঘোলাটে চোখও চিক্‌চে বেয়োবার জোগাড় হ'লো, বল্‌লে, "টপাস? ওর আধখানা-খাওয়া গেলাস থেকে খেয়েছি।"

আমি বল্‌লাম, "আমি কি করব বল, তোমায় ঘোড়া-গুড়িই নিষেধ করেছিলাম আমি। তুমি ত শুনলে না?"

সে বল্‌লে, "চলো, বাড়ী যাই।"

আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা চলো, যদিও বাড়ী গিয়েও এখন আর লাভ নেই বেশী: এ নাচটা এখুনি শেষ হবে। ঐ কোকোজীও আসছে।"

গেলাসটা শেষ হতেই উঠে পড়্‌লাম। Phyllis আবার গ্রামোফোনের দিকে যাচ্ছিলেন, আমি বল্‌লাম, "নিত্য-গোপালের শরীরটা ভালো নেই। ওকে আমি বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।"

কোকোজী বল্‌লে, Reggieকেও নিয়ে যাও।"

Reggie বল্‌লে, "কেন, আমার ও escortএর কোনো দরকার নেই।"

কোকোজী বল্‌লে "এখন নেই, একটু পরেই হবে; তর্ক না করে' বাড়ী যাও। ঢের রাত হয়েছে।"

Phyllis গ্রামোফোনে দম দিয়েছিলেন। হাতের recordটি নামিয়ে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজেই বদ্‌লার জায়গায় ফিরে এলেন। তাঁকে এবং তাঁর স্বামীকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করে' তিন জনে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

বাড়ী এসে বাকী রাতটা নিত্যগোপাল ঘরে নিজেও ঘুমাল না, আমাকেও ঘুমাতে দিলে না। থেকে থেকে আমাকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে কেবলি বল্‌তে লাগল, "কি হবে? ওর খাওয়া গেলাস থেকে খেয়েছি, ওরই ও যেখানটায় মুখ লাগিয়েছে আমিও সেইখানেই মুখ দিয়েছি।"

আমি বল্‌লাম, "কি আবার হবে? আজকালকার দিনে ও রকম অনেক হয়, তা নিয়ে এত ভাব্‌লে চলে না; তুমি ঘুমোও।"

"আমারও যদি হয়?"

"হ'লে তখন দেখা যাবে।"

"না, না, আমার হবে না।"

"আমি কি বল্‌ছি হবে?"

"এখন সম্ভাবনাটাকে দূর করা যায়, এমন অষুধ-বিষুধ নেই কিছু?"

"ডাক্তাররা বল্‌তে পারে; আছে বলে' ত শুনিনি।"

"তাই ত!"

ভোরে উঠে কোথাও কিছু নেই খক খক করে' সে কাশ্‌তে সুরু করে' দিলে। আবার দেখ্‌লাম, কাশিটাকে রুমালে করে' আলোয় নিয়ে গিয়ে দেখ্‌ছে। বল্‌লাম, "তোমার সত্যিই মাথা খারাপ। কিছু হবার মতোই যদি হয়, তা কি দু' ঘণ্টার মধ্যেই বোঝা যাবে?"

সে বল্‌লে, "দু'ঘণ্টা কেন দু'মাস পরে' তার বাড়ী যাওয়া-আসা চল্‌ছে। ঢের আগেই contagion হয়ে থাক্‌তে পারে।"

তর্ক করা বৃথা বুঝ্‌তে পেরে চুপ করে' গেলাম। সমস্ত দিন সে সমানে কাশ্‌তে লাগল। অসুখ মানুষের কাশি শোনাই যথেষ্ট বিরক্তিকর, কিন্তু কানের কাছে একটা সুস্থ মানুষ ক্রমাগত চেষ্টা করে' করে' কাশ্‌তে থাক্‌লে সে যে কি ভীষণ উপদ্রব তা সকলের জানা থাকবার কথা নয়। মেজাজের দিক দিয়ে আমি প্রায় বৈষ্ণব, কিন্তু সেদিন নিত্য-গোপালের গলা টিপে দেবার কথা আমার যে কতবার মনে হয়েছে তার ঠিক নেই। বিকেলে কেশে রাঙ্গা হ'য়ে সে শুয়ে পড়্‌লো। একজন ডাক্তার বন্ধুকে এনে দেখালাম, তিনি

একটা প্রেসক্রাইব লিখে দিয়ে চলে' গেলেন। আমার দিকে একটু চোখ ফেরে নিতাগোপালকে বল্‌লেন, "অতি সামান্য ছোঁয়াচ একটা লেগেছে, এ ওষুধটার দু'দাগ খেলেই সেটা সেরে যাবে।"

"হাঁ ডাক্তারবাবু সত্যি সার্‌বে ত?"

"নিশ্চয় সার্‌বে। আমাদেরও দিনে দু'বার করে' ছোঁয়াচ লাগে, ঐ খেয়েই ত সারে। তা না হ'লে একটা ডাক্তারও পৃথিবীতে থাকত?"

পরদিন নিতাগোপালের কাশির সঙ্গে সত্যিসত্যিই রক্ত উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তার রুমালে চাপ চাপ রক্তের দাগ দেখে আমি শুদ্ধ চম্‌কে গেলাম। তখনি গাড়ী ডেকে তাকে ডাক্তারের বাড়ী নিয়ে চল্‌লাম। তার বুক টুকে দেখে টেথিস্কোপ লাগিয়ে ডাক্তার আর তার কাশি পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেই হ'লো না। তার গলার মধ্যে আলো ধরে' আমায় ডেকে নিয়ে দেখাল, আল্‌জিভের একপাশে বেশ খানিকটা ক্ষত, তখনো সেখান থেকে একটু রক্ত গড়াচ্ছে! জোর করে' কেশে কেশে গলাটাই সে ছিঁড়ে ফেলেছে! বল্‌লাম, "ওষুধ?" ডাক্তার বল্‌লে, "আমি একটু paint করে' দিচ্ছি, কিন্তু এ রোগের ওষুধ কিছু নেই, 'বুরী'যোগে কিছু লাভ হ'তে পারে, তুমি নিজে সেটা প্রয়োগ করে' দেখ্‌তে পার।" নিতাগোপালের মুখ দেখে মনে হ'লো তার কিছু হয়নি জেনে সে যেন সুখী হয়েছে। বল্‌লাম, "আমাকে দিয়ে সেটা হবার উপায় থাক্‌লে আরও আগেই হ'ত। তোমার যাবস্থা নিতে হ'লে বেশ সুস্থ সবল দেখে দেখে ওর ক্রিয়া দিয়ে দিতে হয়।" ডাক্তার বল্‌লে, "তাহলে ত কথাই থাকে না। রোগ একেবারে গোড়ার অবস্থাতেই তাহলে সারে।"

বাড়ী এসে দেখি Phyllisএর একটুকরা চিঠি নিয়ে একটা বেয়ারা অপেক্ষা কর্‌ছে। কোকোজী হঠাৎ কাকেও কিছু না বলে' কোথায় চলে' গিয়েছে। আমাদের সেই মল্‌লিনের রাতের পরদিন ভোর থেকে সে নিরুদ্দেশ! ছুটে তাদের বাড়ী গেলাম। জানাশোনা যে সমস্ত জায়গায় তার যাবার সম্ভাবনা ছিল সর্ব্বত্র তার করা হ'লো। Phyllisএর একজন মহিলা বন্ধুকে খবর দিয়ে আনা হ'লো তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্যে। কোথাও থেকে কোকোজীর কোনো খবর এল না। পুলিশকে জানানো হ'লো। Reggie Phyllisকে সান্ত্বনা দেবার ভার নিলে, আমি কোকোজীর সন্ধানের চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। কিছুতে কিছু হ'লো না। দিন দশ বারো পরে কোকোজীর চিঠি এল—জীবন্ত কোকোজীর নয় মৃত কোকোজার।

নারী-প্রতিভা

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের কর্ম নীরবে ও নিষ্কামভাবে সম্পাদিত হয় বলিয়া, তাঁহারা অধিকাংশই, প্রায় দুর্গন্ধ বনের ফুলফুলের ন্যায়ই অজ্ঞাত থাকেন। পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের জীবনী অল্প সংগ্রহের ইহা অন্যতম কারণ। আত্মপ্রচারকামী পুরুষের স্বার্থপরতা-দোষেও অনেক মহিলা-জীবনী অপ্রকাশ রহিয়াছে। সামাজিক কু-প্রথাও এইরূপ মহিলাদের কীর্তি-প্রচারে অনেক বাধা দিয়াছে। পুরুষের জীবন-চরিতে বর্ণিত বিষয় অপেক্ষা, মেয়েদের জীবন-চরিতের উপাদান, নারী-সমাজকে সত্বর উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সক্ষম। যে জাতির যত নারী-চরিত অধিক রচিত হয়, সেই জাতির নারী-সমাজই নানাবিধ ভাবোদ্দীপকরূপে শীঘ্র পূর্ণ ও সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া ওঠে।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধা বিখ্যাতা মহিলাদের প্রত্যেকের জীবনী এক এক খানি গ্রন্থ বিশেষ। কাজেই বিস্তৃত আলোচনা এখানে অসম্ভব। তাঁহাদের জীবনের কতগুলি "খুঁটী" মাত্র ইহাতে পাইবেন। সমস্ত জানিতে হ'লে তাঁহাদের জীবনী পাঠ করা আবশ্যক। ঐ সকল জীবনী সংগ্রহ করিয়া পাঠ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে বিবেচনা করিয়া, সংক্ষেপে যাহাতে তাঁহাদের মহৎ জীবনের সহিত "বঙ্গলক্ষ্মী"র লক্ষ্মীদের কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটে, ইহাই ইচ্ছা। অনিচ্ছাসত্ত্বে আর একটি কথা বলিতেছি,—নামের অগ্র পশ্চাতে কিছু আসিয়া যায় না। কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নামগুলি, পর পর হইতে উৎকৃষ্টতর। প্রত্যেকের জীবনের কার্য্যদ্বারা স্বতন্ত্র-ভাবে তাঁহাদের জীবনের মহিমা উপলব্ধি করিবেন।

রাণী ভবানী

অলোকসামান্যা নাটোর রাজ-কুললক্ষ্মী। নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন পুঁটিয়ার রাজা ধর্ম্মনারায়ণের উকীল হইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন। রঘুনন্দন নিজাম মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহভাজন হইয়া নাজের কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন, এবং বিস্তর ভূ-সম্পত্তি তাঁহা রামজীবনের নামে সংগ্রহ করেন। কালিকাপ্রসাদ ও রামকান্ত নামে রামজীবনের দুই পুত্র। কালিকাপ্রসাদ অল্পবয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হইলে রামকান্ত সমস্ত জমিদারীর মালিক হন। এই রামকান্তের স্ত্রী—ভবানী। ভবানী রাজসাহী জেলার ছাতিম-গ্রাম-নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। দয়ারাম নামক জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উদ্যোগে ভবানীর সহিত রামকান্তের বিবাহ হয়। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জমিদারী শাসনে ও যথারীতি রাজস্ব-প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ দেবীপ্রসাদের উপর রাজসাহীর ভার অর্পণ করেন। দেওয়ান দয়ারাম বালিকা ভবানীকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের শরণাপন্ন হন। জগৎ শেঠের অনুরোধে রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে। ১১৫৩ সালে রামকান্তের মৃত্যুর পরে ৩২ বৎসর বয়সে ভবানী নিজহস্তে সমস্ত জমিদারী গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে বৈধব্য দশায় উপনীত হইয়া তিনি হিন্দুরমণীর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শেষদিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। ভবানীর এক-মাত্র কন্যা তারা; ধলাহারের রঘুনাথ লাহিড়ী নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া শীঘ্রই বিধবা হইয়া মায়ের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করেন। রাণী ভবানীর ভূ-সম্পত্তি হইতে বার্ষিক দেড় কোটী টাকা আদায় হইত। ৭০ লক্ষ টাকা সরকারে রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। ভবানীর দত্তক পুত্র, সাধকপ্রবর রাম-কৃষ্ণকে জানেন না এমন লোক আর কে আছেন। ভবা-নীর কন্যা তারার সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে যে তাঁহার রূপযৌবন-মুগ্ধ হইয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে মস্তারাম বাবাজী সদলবলে বাধা দেন।

কেহ বলেন, কৃত্রিম স্থপান প্রস্তুত করিয়া তাহার সংকার ঘোলো করার নবাবের লোকেরা চলিয়া যায়। যাহা হউক ইহা সত্য বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না। রাণী ভবানীর সমস্ত সৎকার্য্যের সীমা করা অসম্ভব। বাংলা হইতে কাশী পর্য্যন্ত তিনি নানা পুণ্যকার্য্যে ভরিয়া রাখিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী বড়নগরেই তিনি বাস করিতেন। বড়নগরকে তিনি দ্বিতীয় কাশী করিয়াছিলেন। গয়া ও কাশীতে নানাবিধ দেবালয় ও ধর্ম্মকার্য্য ভবানীর চিরস্থায়ী কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। ভবানী প্রত্যহ নিজের হাতে রন্ধন করিয়া দশ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। প্রাতঃকাল হইতে আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শেষে স্বহস্তে-প্রস্তুত হবিষ্য গ্রহণ করিতেন। রাণী ভবানী বড়নগর ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেবালয়ের জন্য প্রায় লক্ষ টাকার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন; তৎসমস্ত ঐ দেবকার্য্যে ব্যয়িত হইত। তাঁহার নিজের ও বিধবাগণীর জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তিপ্রার্থিনী হন। এইরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক ইংরাজের বৃত্তি-ভিক্ষা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের শেষ সীমা বলিতে হইবে। রাণী ভবানী রাজপ্রাসাদের নীচের তলায় বাস করিতেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ৭২ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে এই বাংলার দীন-জননী ইহলীলা সম্বরণ করেন। পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজার জীবনকালেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর ন্যায় রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি তখন বাংলায় ছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। ইঁহার অতিবিস্তৃত জীবনকথা জানিতে হইলে জীবনী পড়া উচিত।

অহল্যা বাই

ইনি মালব প্রদেশের রাজা কণ্ডী রাওয়ের মহিষী। ইঁহার কন্যার নাম মুক্তা বাই ও পুত্রের নাম—মালী রাও। পিতার মৃত্যুর পরে মালী রাও অল্পদিন রাজ্য করিয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করিলে, অহল্যা বাই নিজেই রাজ্যভার হাতে করেন। মুক্তা বাই যশোবন্ত রাওকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অহল্যা বাই দত্তকপুত্র গ্রহণে স্বীকার না করায়, গঙ্গাধর যশোবন্ত নামে জনৈক রাজপুরোহিত মহারাষ্ট্রীয় রাজার পিতৃব্য রাঘব দাদার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অহল্যা বাই'র বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞা অহল্যা বাই ইহা জানিতে পারিয়া, মহারাষ্ট্রীয় রাজা মধু রাওকে অনুরোধ করিয়া এক পত্র দেন। সেই পত্র পাঠ করিয়া মধু রাও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র রাঘব দাদাকে অহল্যা বাই'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং যুদ্ধ আর হইল না। অহল্যা বাই সহজেই সকলকে ক্ষমা করিবার মত হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছিলেন। গঙ্গাধরকে ক্ষমা করিয়া প্রধান মন্ত্রী করিলেন। এ দিকে তুকাজী হোলকার নামক জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অহল্যা বাই প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া অতি বিচক্ষণতার সহিত রাজ্যপরিচালনা করিতে লাগিলেন। অহল্যা বাই হিন্দুমহিলাদের মত অন্তঃপুরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন না। তিনি রাজসভায় বসিয়া মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অহল্যা বাই নিজে মহীশ্বরে থাকিয়া সাতপুরা পর্ব্বতের উত্তর দিকের দেশসমূহের রাজস্ব আদায় করিতেন। মালব, নিমাড় এবং দক্ষিণ অঞ্চলের রাজস্বও তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিত। তুকাজী সাতপুরার দক্ষিণ অঞ্চলের হোলকারের অধীনস্থ সমস্ত দেশের কর আদায় করিতেন। নিজের প্রতিভার ও বিবেচনা করিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারী নিয়োগে রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না। সকল কর্ম্মচারীই নিয়মিত ভাবে তাহাদের বেতন পাইত। দিনে দিনে অহল্যা বাই'র যশোদীপ্তি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজগণের প্রতিনিধিরা অহল্যা বাই'র রাজধানীতে আসিতে লাগিলেন। অহল্যা বাই'র প্রতিনিধিও কলিকাতা, পুণা, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপট্টম ও লক্ষ্ণৌতে থাকিয়া সুচারুরূপে রাজকার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

অহল্যা বাই প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া পূজা-আহ্নিক করিতেন। তৎপর কিছু সময় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। পাঠ শেষ হইলে, নিজহাতে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। তৎপরে নিজে আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আড়াই প্রহরের সময়

রাজসভায় যাইতেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরবার বসিত। পরে সান্ধ্যকৃত্য ও রাত্রের আহারের পরেও তিনি সভায় বসিতেন।

ইন্দোর পূর্ব্বে একটি সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল। অহল্যা বাই'র যত্নে, ইহা একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। অহল্যা বাই কখনও কোন প্রজার ধনে লোভ করিতেন না, তাঁহার নিজের ব্যয়ের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তা ছাড়া ইনি হোলকার রাজ্য হইতে দুই কোটী টাকা রাজকোষে মজুত পাইয়াছিলেন। উক্ত সমস্ত টাকাই তিনি ধর্ম্মার্থে খরচ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত সুবৃহৎ রাস্তা অহল্যা বাই প্রস্তুত করাইয়াছেন। গয়ার বিষ্ণুপদ-মন্দির অহল্যা বাই'র বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি। কাশী, উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ ও ভারতের অন্যান্য বহুস্থানে তিনি পান্থনিবাস, ঘাট, দেবমন্দির প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আজীবন তিনি হিন্দু-মহিলার ত্যাগমন্ত্রের মহিমা প্রকাশ করিয়া ভারত-মহিলাদের গৌরবের আসন চির-উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১৭৬৫ হইতে ১৭৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব ও নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মের কার্য্য করিয়া অহল্যা বাই ৬০ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে গিয়াছেন। ভারতের নানা অংশে নানা ভাষায় এই পুণ্যচরিতা রমণীর মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় যোগীন্দ্রনাথ বসুর "অহল্যা বাই" পড়িলে তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। আজ প্রায় ১০৫ বৎসর পরে এই ভাবে এই স্থানে অহল্যা বাই'র স্মৃতির পুণ্য-তর্পণ করিতে পারিয়া নিজকে পূতমন্ত্র বোধ করিতেছি

পণ্ডিতা রমা বাই

শিক্ষা, সভ্যতা ও নারীসমাজের কল্যাণের দ্বারা যে-সব মহীয়সী ভারতললনারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতের স্ত্রী-জাগরণের পুণ্য রঞ্জন-রশ্মি পাত করিয়াছেন, পণ্ডিতা রমা বাই তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনি বাঙ্গালোরের কন্যা হইলেও বাংলার মেয়ে—। এই বিদুষী ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম অনন্ত শাস্ত্রী। ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতার নিকট সংস্কৃত ও প্রধান প্রধান কয়েকটি ভারতীয় ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৬ বৎসর বয়সে পিতামাতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতার সহিত ভারতের বিভিন্ন অংশ ভ্রমণ করেন। বাংলার পণ্ডিতসমাজ ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া "সরস্বতী" উপাধি দান করেন। ইনি শ্রীহট্ট জেলা নিবাসী বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত এম-এ, বি-এল'কে বিবাহ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই বিধবা হন। বিধবা হইবার পরে ইনি সাধারণ সমিতিতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে পুণাতে "আর্য্য মহিলা-সমাজ" স্থাপন করেন। ২৪ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গমন করেন ও তথায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ২৬ বৎসর বয়সে বিলাতের চেল্‌টেনহাম "লেডীজ কলেজে" সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। পরে আমেরিকায় গমন করেন ও কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষাপ্রণালী অধ্যয়ন করেন। ২৮ বৎসর বয়সে বোষ্টন নগরে হিন্দু বালবিধবাদের কল্যাণার্থে "রমা বাই সমিতি" স্থাপন করেন। ৩০ বৎসর বয়সে, আমেরিকা হইতে বোম্বে আসিয়া তথায় বাস করেন, এবং একটি আশ্রম স্থাপন করেন; পরে উহা পুণাতে লইয়া যাওয়া হয়। এই পৃথিবীবিখ্যাতা মহিলা ৬৩ বৎসর বয়সে ১৯২১ সালে ইহলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার প্রণীত "The Highcast Hindu woman" নামক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

কুড়িগ্রাম

সম্পাদকের কথায়ঃ এই সমিতি তিন বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। এই সমিতি ১৩৩১ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখে স্থানীয় ৩টি মহিলার উদ্যোগে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এই সমিতির সভ্যসংখ্যা ৩০ জন ছিল। এখন ৪৫ জন হইয়াছে। চারিটি উদ্দেশ্য লইয়া এই সমিতি স্থাপিত হয়—১ম সাহায্যিকা শিক্ষা ও প্রচার গরীব বালিকাদের বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষা দান; ঘরে ঘরে সূচশিল্পের উন্নতি করা; সেবাদল গঠন। এই সমিতি হইতে ৩টি কার্য্য রীতিমত ভাবে পরিচালিত করা হইতেছে।

দুইজন সভ্যা ধাত্রীর কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্থানীয় যে কোন বাড়ীতেই প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সাহায্যার্থে যাইয়া থাকেন। অনেক গরীব গৃহস্থের এজন্য বিশেষ উপকার হইতেছে।

একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রায় দুই বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে ৪টি বালিকাকে লইয়া বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল। এখন ৪০টি বালিকা হইয়াছে। ইহা একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়। ছাত্রীরা প্রত্যহ রীতিমতভাবে লেখাপড়া, অঙ্ক এবং শিল্পশিক্ষা করিতেছে। সকলেই দরিদ্র ঘরের বালিকা। এখানে একটি নৈশ-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এই সকল বালিকাদের কোনদিনই সে স্কুলে যাইয়া পড়িবার ক্ষমতা হইত না। অর্থাভাবে আজ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন নাই। সম্পাদিকার দুইটি কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী ও শ্রীমতী কল্যাণী দেবী বালিকাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। সম্পাদিকার বাড়ীতেই স্কুল হইয়া থাকে। এই বালিকাদের অনেকেরই বই, শ্লেট এবং শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমিতি হইতে দিতে হয়।

কেন্দ্রসমিতি হইতে গত বৎসর শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় কুড়িগ্রাম মহিলাসমিতিকে যে ২০৲ পুরস্কার দিয়াছিলেন আমরা তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছি এবং এই স্কুলের জন্য তাহা ব্যয় হইয়াছে।

আমাদের এই মহিলাসমিতি হইতে একটি তাঁত এক বৎসর হইল রীতিমত ভাবে চালনা করা হইতেছে। সভ্যাগণ নিজেরাই সূতা কাটিয়া সমিতির বেতনভোগী তাঁতীর সাহায্যে গামছা, তোয়ালে, কাপড় ইত্যাদি বৈয়ার করিয়া লইতেছেন। সমিতি হইতে তাঁতীকে মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া হয়। তাঁতের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সমিতি হইতে কয়েকটি চরকা কিনিয়া কয়েকটি দরিদ্রার বাড়ীতে দেওয়া হইয়াছে।

এই সমিতির মাসিক দুইবার করিয়া অধিবেশন হয়। তাহাতে সমিতির নানারূপ উন্নতির বিষয় আলোচনা করা হইয়া থাকে। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ছোট ছোট মেয়েদের রচিত প্রবন্ধ পাঠ, ধাত্রীশিক্ষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়া থাকে। এই সমিতির সভ্যাগণ অনেকেই সেমিজ, ব্লাউজ, ফ্রক, এমব্রয়ডারি করা টেবিলক্লথ ও

বালিসের ঢাকনি, বাঁশের সাজি, ফুলের ডালা, কাঁথা, সৈতা, বড়ির পাপোস ও শিকা, আচার, মোরব্বা, ডালের বড়ি, প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিক্রয়ার্থ-দ্রব্যাদি সমিতির সম্পাদিকার বাড়ী হইতে বিক্রয় হইয়া থাকে। গত পূজার সময় দুইটি মহিলা এমব্রয়ডারি করা ফ্রক, ব্লাউজ, টেবিল ক্লথ, সেমিজ, বালিস ও ঢাকনা, সার্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া প্রায় ৪০।৫০৲ লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সভ্যাই নিজেদের ব্যবহারোপযোগী সার্ট, পাঞ্জাবী, ব্লাউজ, ফ্রক্ প্রভৃতি গৃহে তৈয়ার করিয়া থাকেন। এখানে সমিতি স্থাপনের পর হইতে সকলের একতা-ভাব বেশী হইয়াছে। সমিতির অধিবেশনে আসিবার কোন যানবাহনের বন্দোবস্ত নাই। সকলেই পদব্রজে আসিয়া থাকেন।

কুড়িগ্রামের অধীনস্থ উলিপুরেও একটি মহিলাসমিতি আছে। এই সমিতি হইতে কয়েকটি মহিলা যাইয়া উহা স্থাপিত করিয়াছেন। সেখানে ধাত্রীশিক্ষার অভাব ছিল। এই সমিতি স্থাপিত হওয়ায় অনেকেই ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সে অভাব দূর করিয়াছেন। কুড়িগ্রাম মহিলা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী গুপ্তা গত আশ্বিন মাসে তীর্থবাস করিতে গিয়াছেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে সকলের সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুকে সভানেত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এই সমিতির সভ্যাগণের মাসিক চাঁদা ।০ আনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। দুর্ভিক্ষের জন্য অনেকেই চাঁদা দিতে অক্ষম হওয়ায় এই সমিতি কিছু দেনা করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই বৎসর মোটের উপর জমা—

৩২৭৶১০

এবং খরচ—৩৫২৷৶০

উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবনের সময় গত ভাদ্র মাসে এই সমিতি হইতে বন্যাপীড়িত স্থানের সাহায্যার্থে চাল, ডাল, পুরানো কাপড় ও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া নানাস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সমিতি এ পর্য্যন্ত স্থানীয় কোন ভদ্র-মহোদয়ের সাহায্য পায় নাই। কয়েকটি মহিলার সাহায্যেই সমিতি চলিতেছে। তাঁহাদিগের নাম—শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা সেন, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্তা সুবর্ণপ্রভা গুপ্তা, শ্রীযুক্তা সুপ্রভাময়ী রায়গুপ্তা এবং শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী। সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাই এই সমিতিতে যোগদান করিয়া থাকেন।

শ্রী শৈলবালা দেবী, সম্পাদিকা।

বরিশাল

সাত বৎসর অতীত হইতে চলিল আমাদের এই প্রিয় সমিতি নানা বাধাবিঘ্ন আপদবিপদ অতিক্রম করিয়া নূতন বর্ষে পদার্পণ করিতে যাইতেছে। বিধাতার বিশেষ কৃপা যে আমাদের এই সম্মিলনকে আজও তিনি সজীব রাখিয়াছেন। আমরা তাঁহারই চরণে প্রণতি করি। বর্ত্তমান বর্ষে সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছে। সঙ্গীত, পাঠ, কার্য্যপ্রণালী-নির্দ্ধারণ, শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের উপায় কি, মহিলা-প্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করা হইয়াছে।

কোন কোনও মহিলা সভ্যা প্রদর্শনীর জন্য শিল্প ও কারুকার্য্য দ্বারা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

নানারূপ গৃহশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য বরিশাল নারী-শিক্ষা সমিতি আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায় উক্ত সমিতির উন্নতিকল্পে আমরা সাহায্য দান করিতেছি।

বর্ত্তমানে মহিলাসমিতির স্থায়ী ফণ্ডে ২৭০ টাকা জমা আছে। বর্ত্তমান বর্ষে কয়েক সভ্যা স্থানান্তরিত হওয়ায় আয় সেরূপ হয় নাই। তথাপি ইহা হইতেই সমিতির ব্যয়, এবং দুঃস্থ ও বিপন্নদের যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

সমিতি হইতে তিনখানি পত্রিকা রাখা হইয়াছে।

নারীশিক্ষা-সমিতির ঘর-ভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া হইতেছে।

স্থানীয় হাসপাতালের সভ্যা মহিলাসমিতির বর্ত্তমান সম্পাদিকাদ্বয় এবং আরো ৩ জন সমিতির সভ্যা—সভ্যা হইয়াছেন এবং হাসপাতালে মাসিক চাঁদা দিতেছেন। সময়ে সময়ে বিশেষ বন্দোবস্তের জন্য একজনের স্থানও দেওয়া হয়।

মেয়ে-হাসপাতালের সম্পাদিকা উক্ত সভ্যাগণের পরামর্শ লইয়া হাসপাতালের সুবিধা ও বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। বিগত দুই বৎসরে হাসপাতাল সর্ব্ববিষয়ে নিয়মিত ও

সুচারু বন্দোবস্তে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। প্রসূতি-বিভাগে ভদ্রমহিলাগণ নির্দ্বিঘ্নে প্রসব ও তদুপযোগী ঔষধপথ্যের সুব্যবস্থায় বিশেষ উপকার লাভ করিতেছেন। এ বৎসর বহু প্রসূতি এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

প্রসূতিদের কোনওরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না হয় সেজন্য শিক্ষিতা দাই ও নার্স রাখা হইয়াছে।

বাহিরে দেখাইবার মত বহির্ভাগে আমরা তেমন জাঁকজমকের কিছুই করিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রত্যেক সভ্যার অন্তরে সহিষ্ণুতা ও সেবার ভাব সমিতির সংস্রবে আসিয়া জাগ্রত হইয়াছে, এবং পুরাতন সভ্যাগণ যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর দেশে আছেন তাঁহারাও তাহা স্বীকার করিতেছেন। ইহাই আমাদের এই শুভ অনুষ্ঠানের পুরস্কার। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।

শ্রী কুসুমকুমারী দাস,
সম্পাদিকা।

সিরাজগঞ্জ

চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তখনকার মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা গৌরী সেন মহাশয়ার উদ্যোগে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন মহাশয় এবং দুইজন মহিলা কর্ম্মী এখানে আসিয়া নারীমঙ্গল সমিতি স্থাপন করিয়া যান; কিন্তু আমাদের অযোগ্যতা ও সাধারণের সহানুভূতির অভাবেই উপযুক্ত সভানেত্রী সত্ত্বেও সমিতি অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া যায়।

ইহার পর গতবৎসর শ্রাবণ মাসে শুভক্ষণে কয়েকজন মহিলা একত্র হইয়া স্থানীয় স্বর্গীয় ভীমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে প্রথম মিলিত হন, এবং সেইখানেই এই সমিতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর দ্বিতীয়বার অধিবেশনের সময় সভাধিক মহিলা উপস্থিত ও মিলিত থাকিয়া সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে আলোচনা করেন। সমিতির উদ্দেশ্য—স্থানীয় মহিলারা অবসর-সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া সংসারের, নিজের ও সমাজের হিতসাধন করিতে পারা। সমিতির অন্য উদ্দেশ্য দুঃখী, দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য করা।

সমিতির প্রথম অধিবেশনে সকলেই সমিতির উদ্দেশ্য কি প্রশ্ন করিলে শ্রীযুক্তা নতিকা দেবী, সম্পাদিকা, স্নেহপুরঃসর সমিতির (তিনি ঐ সমিতির সভ্যা) উদ্দেশ্যমত সমস্ত বুঝাইয়া দেন; কিন্তু চাঁদা দিতে সকলেই অনিচ্ছুক, ও পরবারের অকৃতকার্য্যতার জন্য সকলেই সন্দিহান হইয়া সে বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করেন, তখন তিনি নিজেই অর্থ দ্বারা ছিট, কাপড় ইত্যাদি আনাইয়া তাহা নিজে কাটিয়া দুই-চারিজন মহিলা দ্বারা সেলাই করাইয়া স্থানীয় খলিফাপট্টীর কাটাকাপড়ের দোকানে পাঠাইয়া বিক্রয় করাইয়া তাহা হইতে পারিশ্রমিক দিয়া সমিতিতে কিছু কিছু রাখিয়া সমিতির ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে থাকেন। তাহার পর তেজপুরের আসাম ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড্ হইতে প্রায় দুইশত টাকার অর্ডার আনিয়া, নিজে শতাধিক টাকা সমিতিকে ধার দিয়া কাপড় কিনিয়া, কাটিয়া সভ্যাদের দ্বারা ঐ অর্ডার সেলাই করাইয়া তাহা হইতে সভ্যাদের পারিশ্রমিক দিয়া নিজের ঋণশোধ করিয়া সমিতির ভাণ্ডারে কিছু সঞ্চয় করেন। শ্রীযুক্ত তুলসীরাম সেরওগী মহাশয় বন্যা-সাহায্যার্থে সিরাজগঞ্জে আসিলে তাঁহাকে সমিতির উদ্দেশ্য ও অর্থাভাবের কথা এবং কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া বলাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ৫০৲ টাকা দান করিয়া যান। এইভাবে সমিতির ভাণ্ডার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়। পারদীয়া পূজার সময় তেজপুর হইতে আরও ৩০।৲ টাকার অর্ডার আনিয়া, সেলাই করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এখন সমিতির সভ্যাসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বর্ত্তমানে সমিতির চাঁদাদাত্রী সভ্যা ৩০ জন এবং চাঁদা দিতে অসম্মত সভ্যা ১৫ জন। সভ্যাদের মধ্যে আমাদের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অমিয়া দেবী (ডাক্তার সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী), সহঃ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কুসুমবালা রায় (শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল রায় উকীল মহাশয়ের পত্নী), শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দেবী (শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন তালুকদার ডাক্তার মহাশয়ের পত্নী), শ্রীযুক্তা সুধাংশুবালা দেবী (শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী উকীল মহাশয়ের পত্নী), শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী (শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ লাহিড়ী মহাশয়ের

পত্নী), শ্রীযুক্তা বিমুক্তা রায় শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় মহাশয়ের পত্নী), শ্রীযুক্তা হেমকুমারী দেবী (শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের পত্নী), শ্রীযুক্তা মতিকা দেবী (কাপ্তেন কমীন্দ্রমোহন লাহিড়ী ডাক্তারের পত্নী) ইহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কয়েকজন সভ্যা লইয়া কার্য্যকরী সমিতি করা হইয়াছে এবং ইঁহাদের মধ্যে অনেক অনৈক্য না থাকায় এবং সকলেই নিজে নিজে সমিতির উন্নতিসাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও নিজেদের যত্ন অটুট থাকায় করায় আজ সমিতি এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় আমাদের এই ক্ষুদ্র সহরটি যখন আলোড়িত হইয়াছিল তখন বিশেষজ্ঞ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে কিছু নূতন কাপড় আনিয়া আমরা দুঃস্থ ভগিনীদের সাহায্য করিয়াছিলাম এবং আমাদের সাধ্য অনুসারে সমিতির তহবিল হইতে কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিয়াছিলাম।

পরস্পর ভাবের আদানপ্রদানে ও মেলামেশা মাসে একবার করিয়া সমিতির অধিবেশনের দিনই হইয়া থাকে। এখন সমিতির সভ্যাসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে এবং অন্যান্য মহিলাদের সহানুভূতি ও উৎসাহ পূর্ণ হওয়াতে মাসে দুইবার করিয়া সমিতির অধিবেশন হইতেছে এবং প্রায় অধিবেশনেই প্রায় ১০।৮০ জন মহিলা উপস্থিত থাকেন। প্রতি অধিবেশনে সমস্ত সভ্যা ও অন্যান্য মহিলারা একত্র হইয়া পরস্পর মেলামেশা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিবার বা কোনও পত্রিকাতে কোনও ভাল বিষয় কিছু থাকিলে তাহা পড়িবার বা পড়িয়া শুনাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং দেশব্যাপী এই অর্থসমস্যার দিনে সংসারে থাকিয়াও যে রমণীরা সংভাবে কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন ও কি উপায়ে তাহা সম্ভব সেই-সব বিষয়ও আলোচিত হয়। ডাক্তার সুন্দরী বাবু, বামনদাস বাবুর পুস্তক হইতে শিশু ও প্রসূতি-পরিচর্য্যাগার স্থাপন কি ভাবে করিতে হয় এবং শিশুদের পালন সম্বন্ধে ঐ সমস্ত বড় বড় চিকিৎসকের মতামত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সমিতির কোনও স্থায়ী গৃহ নাই; সেজন্য সকলে একস্থানে বসিয়া গৃহশিল্প প্রচার ও ঐসঙ্গে উহা বিক্রয় করিয়া মহিলাদের উপার্জ্জনের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা হয়। আমাদের বালিকারা, বলিতে গেলে যাহাদের উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, অন্ততঃ পক্ষে যাহাতে চলনসই সামান্য লেখাপড়া ও সেলাই তাহাদের অধিকারে আসে তাহার কল্পনা করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্কুল স্থাপিত করিয়াছি। তাহাতে বর্ত্তমানে ৩০টি ছাত্রী। ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকটি দুঃস্থা বৈষ্ণব ও ভেলে মেয়েকে সমিতি হইতে বই শ্লেট ইত্যাদি বিনা সাহায্য করা হয়। এই স্থানে দুইটি গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকাবিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও (তাহার একটির ছাত্রীসংখ্যা ৮০ অন্যটির ৬০) এই স্কুল ভাল চলিতেছে এবং উত্তরোত্তর ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সমিতির সহ-সম্পাদিকার উদ্যোগেই এই স্কুল তাঁহার গৃহেই প্রথম আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে তাহাতে সহঃসম্পাদিকা মূলধারা রায়, শ্রীযুক্ত শরৎলাল রায় উকীল মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকার ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের কন্যা কুমারী অশোকা সান্যাল শিক্ষাদান করিতেছেন। সম্প্রতি অতি দুঃস্থ পরিবারের একটি সধবা মহিলাকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিবার জন্য মাসিক ৩৲ দিয়া শিক্ষয়িত্রীভাবে রাখা হইয়াছে; আশা করা যায় আমাদের সাধ্যানুসারে এবং অন্যভাবে তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব।

জামা-কাপড় সেলাই, কাঁথা সেলাই, সূতা কাটা, সৈতা-কাটা, বড়ি দেওয়া ইত্যাদি আপাততঃ সমিতির মহিলারা করিয়া থাকেন এবং গত বৎসর শ্রাবণ মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা ঐ সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিয়া সমিতির সভ্যা ও অন্যান্য মহিলাদের পারিশ্রমিক হিসাবে দুইশত ষাট টাকা দিয়াছি এবং সেই সেলাই-লব্ধ অর্থ হইতে কিছু কিছু করিয়া সঞ্চয় করিয়া সমিতির ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত প্রায় একশত ষাট টাকা জমা করা হইয়াছে। সমিতির সভ্যাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহের প্রায় সমস্ত সেলাই নিজেরা করেন, তাহাতে পড়ে ৫।৬৲ টাকার জিনিষ প্রস্তুত হয়। আমরা আজ প্রায় দেড় বৎসর সমিতির সভ্যাদের কাপড় দিয়া সেলাই করাইয়া, স্থানীয় জামা-কাপড়ের দোকানে বিক্রয় করিয়া, এবং পাবনা, রাজসাহী, হাওড়া, কুচবিহার, কৃষ্ণনগর, এমন কি সুদূর আসাম প্রদেশ হইতেও

অর্ডার লইয়া সেলাই করাইয়া বিক্রয় করিতেছি। প্রথম প্রথম সমিতিকে অর্ধাশনের মধ্য দিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু ভগবৎকৃপায় এখন আমরা সমিতির নিজস্ব ভাণ্ডার করিতে পারিয়াছি।

সমিতির বিশেষ সভ্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রাজসাহী থাকিয়া সমিতির প্রস্তুত জামা-কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া সমিতির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সতিকা দেবী সম্পাদিকার চেষ্টায় কলিকাতা, হাওড়া, পাবনা ও আদামে সমিতির প্রস্তুত জামা, কাপড়, সৈতা, কাঁথা বিক্রয় হইয়াছে। আমাদের সমিতির বাৎসরিক উৎসবে শিশু-মঙ্গল ও শিশু-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয় নাই। বর্তমানে সমিতি হইতে জামা, ফ্রক, সেমিজ, ব্লাউজ, সার্ট, পাঞ্জাবী, নানারকম এমব্রয়ডারী, সৈতা কাটা, সূতা কাটিয়া তাহা হইতে বস্ত্রের থান প্রস্তুত করাইয়া তাহা হইতে ব্লাউজ ইত্যাদি তৈয়ারী করান হয়। ইহা ব্যতীত প্রস্তুতের জন্যও সমিতি হইতে বিবিধ সরবরাহ করা হয়। সমিতির সভ্যাগণ সকলেই পরস্পরে যাতায়াত করেন।

বর্তমান বৃত্তিকে তেজপুর মহিলাসমিতির সম্পাদিকা এবং আমাদের সম্পাদিকার শাশুড়ী শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা দেবী দশটি টাকা দান করিয়াছিলেন ও বিশ জোড়া নূতন ও পুরাতন কাপড় ও কয়েকটি জামা বিতরণের জন্য পাঠাইয়াছেন।

বাৎসরিক উৎসবে শ্রীযুক্ত মহানারায়ণ সেন মহাশয় ম্যাজিক দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

শ্রী কুলবালা রায়,
সহঃ সম্পাদিকা।

চোখের জল

শ্রী আশুতোষ সান্যাল

দুখের সাগর সেঁচা মাণিক,
বুকের ব্যথায় সমুজ্জ্বল,
তপ্ত প্রাণের স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাস,
ওরে আমার চোখের জল!
যুগ আঁখির ভঙ্গিপুটে',
মুক্তাসম উঠিস্ ফুটে,—
পাষাণ কেটে উৎস-ধারা
কোথায় থেকে বহাস্ বল্?

সাহারারি মধ্যে তোরে
কে সৃজিল মরুদ্যান?—
ব্যথার রোদের জ্বালায় পুড়ে'
শুকিয়ে আমি নিই এ প্রাণ।
কাঁটায় ঢাকা শুক্নো ডালে,
কোমল গোলাপ কে ফোটালে?
জীবন-ভরা পাপের মাঝে
তুই অমৃত-পুণ্যফল!

গৃহস্থালী বনাম পরিবার-পরিচালনা

শ্রীমতী মাধবনাব

নিপুণতা ও ধৈর্য্যের সহিত সংসার-পরিচালন বিষয়ে যেমন রমণীর সদার্থ শক্তি এবং সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রকারেই তাহা সম্ভব নয়।

এই কার্য্যে সহনশীলতা, দূরদৃষ্টি এবং সবেই সাহসের প্রয়োজন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার ফল পরিশ্রমকে সার্থক করিয়া তোলে। যথার্থ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে, যে সকল গৃহে অবিশ্রান্ত গোলমাল এবং অযোগ্যতা বর্ত্তমান, সেই সকল পরিবার হইতে তুলনায়, সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত পরিবারের কর্দ্দভার অতিশয় লঘু।

আসুন, আমরা দুইটি বিভিন্ন পরিবারের চিত্র ক্ষণ-কালের জন্য চিন্তা করি:—দুই পরিবারেই স্বামী একই মাহিনা পান, এবং পরিবারের পরিচালনের নিমিত্ত সব অর্থই ব্যয় করিতে পারেন। একজন সুযোগ্যা গৃহিণী এই অর্থ অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত হিসাব করিয়া ব্যয় করেন,—গৃহে সব সময়েই উপযুক্ত পরিমাণ আবশ্যক দ্রব্যাদি থাকে, সেখানে কোন খাদ্যদ্রব্য অথবা অন্য বস্তুর অপচয় লক্ষিত হয় না, ছেলেরা সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দরকায় এবং সুন্দর পোষাক-পরিহিত। গৃহের কাজ অতি শান্তভাবে সাধিত হয়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনই বিশৃঙ্খলা হয় না; সুতরাং স্বামী দিনের কঠোর কার্য্যের অবসানে গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া সমস্ত পরিবারটি শান্ত এবং সুশৃঙ্খল দেখিতে পান। তিনি এই উপভোগ্য শান্তভাবের ভিতর কর্ম্মক্লান্তি অপনোদনের জন্য এবং নবীন শক্তি গ্রহণের নিমিত্ত সম্পূর্ণ বিশ্রামলাভ করিতে পারেন। তিনি প্রয়োজনীয় সবই হাতের কাছে পাইয়া থাকেন: তাঁহার শিশু সন্তানগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং গৃহ শৃঙ্খলাপূর্ণ। তিনি ভগবান্‌কে সর্ব্বদাই ধন্যবাদ দেন যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার জন্য এই সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অযোগ্যা স্ত্রী হইলে স্বামী গৃহে ফিরিয়া দেখিতে পান যে, সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি,—অপরিচ্ছন্নতা ও অব্যবস্থা। পারিবারিক কলহের মীমাংসা করার প্রয়োজন; শিশু ক্লান্ত ও যোক্তমান; এবং এই অভিযোগ করা হয় যে, ব্যয়-সঙ্কুলানের টাকার অভাব। যদি তাঁহার কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে গৃহের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলিও বাজার হইতে কিনিয়া আনিতে হইবে।

স্বামীদের উপরে এই দুই পরিবারের প্রভাবের পার্থক্যের বিষয় বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। সুব্যবস্থিত পরিবারের চালক সুস্থ ও সবল হইয়া দিনের কার্য্যে গমন করেন; কিন্তু অপ-রের ঠিক উল্টা। তিনি দিবসের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শ্রান্ত-ক্লান্ত থাকেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অযোগ্যা গৃহিণী এই কারণ দর্শাইয়া থাকেন যে, দারিদ্র্য ও দাসদাসীর অভাবেই তাঁহাদের পরিবারে সর্ব্বত্র অপরিচ্ছন্নতা এবং সর্ব্বদা গোলমাল পরিলক্ষিত হয়। অভিজ্ঞতা কিন্তু এই কথার সমর্থন করে না।

যে পরিবারে দশজন চাকর-চাকরাণী আছে, সেখানেও ঠিকই অব্যবস্থা থাকিতে পারে, যদি গৃহিণীর প্রত্যেকটি চাকরের কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালন করিবার উৎ-সাহ ও শক্তি না থাকে। যে পরিবারের আয় সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ, সেই পরিবারের গৃহিণীর পক্ষে গৃহস্থালীর প্রত্যেকটি ছোট-বড় বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। গৃহস্থালীতে তিনটি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয়:—মিতব্যয়িতা, শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা। ইহা দ্বারাই অর্থ, সময় ও পরিশ্রমের লাঘব করা যায় এবং ফলে পরিবারে পরিপূর্ণ আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইয়া থাকে।

যখন বিশেষরূপে ইহা অনুভব করা যায় যে, গৃহে। আচেতন দ্বারা মানুষ কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়, তখন ইহা নারীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা প্রাত্যহিক বিরক্তি-কর সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথাট হইতে পরিবারকে মুক্ত করিয়া পরিবারস্বামীকে জীবনের গুরুতর সমস্যার সমাধানের সুযোগ করিয়া দিবেন।

ইংলণ্ডে ইহা একটি সাধারণ প্রথা যে, বিবাহিত হইলে পরেই পুরুষ একটি আলাদা সংসার পাতিয়া বসেন এবং তখন সাধারণ শ্রমিকের স্ত্রীর উপরেও ঘর-কন্নার গুরুভার পড়ে। কর্ত্তার আয় প্রতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া তিনি দাস-দাসী রাখিতে পারেন না; তাঁহার স্ত্রীকেই একাধারে পাচিকা, গৃহিণী, শুশ্রূষাকারিণী, সঙ্গিনীকারিণী প্রভৃতি হইতে হয়। অধিকাংশ ইংরাজ বালিকাদিগকে বাল্যকাল হইতেই গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিতে হয়; সুতরাং এমন অনেক গৃহকর্ম্ম থাকে, যাহা নিত্য-নৈমিত্তিক ভাবেই সম্পাদিত হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মাতা শিশুদিগকে এই শিক্ষা দেন যে, পোষাক-আষাক ছাড়িয়া তাহারা যখা-তথা ঢাই করিয়া রাখিবে এবং যেখানে সেখানে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া গুরুভারে চেয়ারের উপরে বা আলনার উপরে সাজাইয়া রাখিবে। তাহাদের ইহাও শিক্ষা দেওয়া হয় যে, প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই বিছানার চাদর ও কম্বল উল্টাইয়া দিবে, যেন তাহাতে বাতাস লাগিতে পারে। শিশুদিগকে যথাসম্ভব পিতামাতার সাহায্য ব্যতীত চলিতে উৎসাহ দেওয়া হয়, এবং প্রায়শঃই দেখা যায় যে, ছয় বছরের শিশুরাও কেবল যে তাহার পা ধোয়া, দাঁত মাজা, নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ-পরিধান করিতে পারে তাহা নহে, সামান্য পরিমাণ অর্থ দিয়া দিলে তাহা দ্বারা মাতার জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি নিকটস্থ দোকান হইতে ক্রয় করিয়া আনিতেও পারে। এই সকল বিষয় অতি সাধারণ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারাই অভ্যাস গঠিত হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট। মেয়েদের অনেক করণীয় বিষয়ই অভ্যাস দ্বারা স্বতঃই সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল-অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অতিরিক্ত বলা নিষ্প্রয়োজন।

মেয়েদিগকে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ পাক-প্রণালী এবং পারিবারিক সংরক্ষণনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং ঘরে মাতার সাহায্য করিতে গিয়া এ বিষয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা হয়।

বলা হয় যে, ইংরাজ রমণী তাঁহার গৃহকে বেড়াজালে বদ্ধ করেন, ইহা সত্য কি মিথ্যা জানি না, কারণ অন্য দেশের রমণীদের পরিচ্ছন্ন-পরিচালন-প্রণালীর সহিত তাঁহাদের তুলনা করিয়া দেখিবার আমার সুযোগ হয় নাই; কিন্তু আমার মনে হয় যে, এক বিষয়ে তাঁহাদের সকলের মৌলিক মিল আছে; তাহা এই যে, তাঁহারা সকলেই এক একটি সুন্দর, সুখকর এবং সুপরিচালিত সংসার রচনা করিতে চান। আপনারা কি ইংলণ্ডের একটি দরিদ্র গৃহিণী অথবা মায়ের দৈনন্দিন জীবনের বিষয় শুনিতে চান?—প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই তিনি চুল্লীর সকল ছাই পরিষ্কার করিয়া ফেলেন চুল্লীর শিকগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন, তার পরে তিনি নীচের তলার সমস্ত কোঠাগুলি এবং যাতায়াতের পথগুলি ঝাঁট দেন এবং তার পরে যে কোথায় প্রাতের ভোজনের ব্যবস্থা করা হইবে, সেই ঘরের সমস্ত আসবাবগুলির ধূলি ও ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলেন; সমস্ত ময়লা—ধূলি-ছাথার পাত্রেই ফেলিয়া দেওয়া হয়; ফেলিবার পূর্ব্বে কখনও সেগুলিকে গৃহের কোণে কোণে জমা করা হয় না। গৃহিণী-মাতের কর্ম্মনীতির ইহা একটি প্রধান কথা—"কাজ কর এবং সব পরিষ্কার করিয়া ফেলো।"

ইতিমধ্যেই বালক-বালিকারা জাগ্রত হইয়া, উঠিবার জন্য গোলমাল করিতে থাকে। তাই মা দোতলার ঘর এবং কোলের ছেলেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া পোষাক পরাইয়া দেন; বড় ছেলে-মেয়েদের প্রাতঃকৃত্য এবং পোষাক-পরিচ্ছদ-পরিধানের তত্ত্বাবধান করেন এবং শিশুকে লইয়া দোতলায় আসিয়া খাবার প্রস্তুত করেন। তিনি উপরে থাকিতেই রন্ধনের কতকাংশ চুল্লীর উপরে প্রস্তুত হইতেছিল। প্রাতের খাবার দেওয়া হয়; খাবার খাইয়া ছেলে-মেয়েরা এবং স্বামী স্কুলে এবং কাজে যান। মা-ই লক্ষ্য রাখেন যে, যেন তাহাদের কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই অভাব না হয়। ছেলেরা যাহাতে গরমা এবং গরম কোট পরে, সে বিষয় লক্ষ্য রাখেন; ছেলেগুলি সব সময়েই এই বলিয়া আপত্তি করিতে থাকে যে, আমরা ঐ সব পরিয়া জড়ভরত সাজিতে চাই না।

পরের কাজ—টেবিল পরিষ্কার করা, থালা বাসন ও রন্ধনপাত্রগুলি ধৌত করা এবং একতলার কোঠাগুলি ঝাঁট দেওয়া। ইহার পর তরকারী কুটিতে বসা এবং রাঁধিবার জন্য তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। ইহার পর বিছানা

পাতা, কাঁটা চেওচ, পোষার ঘর পরিষ্কার করা, এবং কোলের শিশুকে খাবার দেওয়ার কাজ। ইহার পরে দুপুরের খাবার রান্না করা হয় এবং পরিবারের লোকেরা খুব ফিরিয়া খাইতে পারে, তাহার জন্য টেবিল সাজাইয়া রাখা হয়। দুপুরের ভোজন শেষ হইলে এবং থালাবাসন ধোয়া হইয়া গেলে না দু-ঘণ্টা ঘুমঘুং যান। যদি কোন কোলের শিশু থাকে, তাহা হইলে ঐ সময় তাহাকে উদুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনের নিমিত্ত কোন খোলা মাঠে লইয়া যাইতে হয় এবং ফিরিবার সময় তিনি দোকান হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া নিয়া আসেন। শিশুরা যদি বড় হয় এবং বিদ্যালয়ে থাকে, তাহা হইলে অপরাহ্নকালে ঘণ্টা দুই আমোদ-প্রমোদ, ধর্মকাজ এবং বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করণে ব্যয় করা হয়। প্রাত্যহিক সংবে ছবি-ঘরের কর্তৃপক্ষ দুইটা হইতে চারিটা পর্যন্ত সময়কে মাতৃদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া অভিহিত করেন এবং ঐ সংবের অভিনয়ের জন্য অল্প মূল্য নির্দ্ধারিত করা হয়।

এই সময় ছেলেমেয়েদের চা প্রস্তুত করিতে হয়; তারপর বয়স্কারা একটু খেলাধূলা করে এবং শেষে পরের দিনের বিদ্যালয়ের পাঠ প্রস্তুত করিবার জন্য পুনের শিক্ষা আরম্ভ করে। শিশুকে স্নান করাইয়া অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় বিছানায় শয়ন করান হয়; স্বামীর সান্ধ্য খাবার পরিবেশন করা হয়। ৭টায় বয়স্ক ছেলেমেয়েরাও শয়ন করে। স্বামী-স্ত্রী তারপরে সান্ধ্য বিশ্রামের অবসর পান। তখন তাঁহারা নানা বিষয়ের আলোচনা করেন, বেতার সংবাদ শ্রবণ করেন এবং বিশ্রাম উপভোগ করেন। এই সন্ধ্যাকালে যখন স্বামী পত্রিকা ও পুস্তকাদি পাঠ করিতে থাকেন, বেতার শ্রবণ করেন অথবা বন্ধুর সাথে কথা বলেন, তখন স্ত্রী চুলার পার্শ্বে নীরবে বসিয়া যে সব কাপড়-পোষাক ধৈয়ারী এবং রিপু করা সম্ভব, তাহাই করিতে থাকেন। স্বামী কর্ম্ম হইতে ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহাকে কোন বিষয়ে বিরক্ত অথবা উত্যক্ত না করাই এ সকল স্ত্রীলোকদের অভিলাষ। স্বামী ভোজন করার পরে ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলেন ও খেলা করেন, এবং তখন ছেলে মেয়েরা মনে করে তখনকার সন্ধ্যাকাল খাটিতে অতিবাহিত করেন। পুনের পুঙ্খলা, নিয়মিত সময়ে আহার, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্ম ও খেলা দ্বারাই শিশুরা সুখে ও সুস্থদেহে হইয়া উঠে। পুঙ্খলার সহিত পরিচালনার পরিবারে বর্দ্ধিত ছেলে-মেয়েদের তুলনা করাও অতীব সহজ;—বাস্তবিক একটি সৎ অভ্যাস এবং ইহা খারাপ অভ্যাসের মতই সহজে গঠন করা যায়। মোটের উপরে বলা যায় যে, ইংলণ্ডের গৃহ ও বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ আবেষ্টনই কর্তৃত্বের পরিবর্ত্তে অভ্যাসগঠনে সাহায্য করে।

আপনারা বুঝিতে পারিলেন যে, ইংলণ্ডে শ্রমিকের স্ত্রীর জীবন কোন প্রকারেই সহজ নয়; কিন্তু সময় ও অর্থের অপব্যবহার না হয় এবিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সুখে বাস করা সম্ভব, এবং কিছু কিছু আমোদ প্রমোদ, সামাজিক কার্য্য এবং অধ্যয়নেরও ব্যবস্থা করা যায়।

টাকার অভাবই স্বভাবতঃ এই সব মহিলাদের পক্ষে সব চেয়ে কঠিনতর সমস্যা। ইহার ফলে এই সকল রমণীরা সপ্তাহ বাজারে ক্রয় করিতে শিক্ষা করেন, অভাবকে হাসি-মুখে বরণ করেন, কাপড়-পোষাক ধৈয়ারী ও রিপু করেন, জামার হাতা ছিঁড়িয়া গেলে সেগুলিকে নূতন যোজনা করেন, ছিন্ন পোষাককে পরিষ্কার করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করেন এবং এইরূপ অজস্র শত শত পারিবারিক ব্যয়-সঙ্কোচের উপায় উদ্ভাবন করিয়া স্বামীর যথার্থ সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী হইবার চেষ্টা করেন।

ছুটির দিনে

শ্রী নীলিমা সিংহ

আজ আমাদের ছুটি,—
সকাল সকাল চুকিয়ে কাজ,
নদীর তীরে ছুটি।

ভাদ্র মাসের ভরা নদী
ছুটছে কলরোলে,
মাথায় উপর বাঁশের ঝাড়
হাওয়ার তালে দোলে।

গাঙলা-ডেহা
বৃষ্টি গেছে ঝরে',
চিক্‌মিকিয়ে পড়ছে আলো
ঘোলা জলের 'পরে।

ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ
বাতাস ব'য়ে আনে;
আর কি মোরা থাকতে পারি
ব'সে' ঘরের কোণে।

সবুজ ঘাসে জলের ফোঁটা
যেন মুক্তার মালা:
শুক্তি হ'তে মুক্তি কিনো
গেল সাগরবালা।

ভাসিয়ে দেরে ছোট্ট তরী
কেনিল স্রোতের টানে,
যাই রে ভেসে ভাঁটার টানে
অকূল সাগর পানে।

অতল জলে লুকিয়ে আছে
কোন্ অজানা ধন,
সাগর ছেঁচে আনব তুলে
শক্ত করি' মন।

ধরা-মায়ের কঠিন বুকে
খুমিয়ে আছে যারা,
আন। টেনে পাইয়ে তাদের
ভয় করি' কারা।

লাল কাঁকরের পথটি সরু
যেথায় হ'ল শেষ,
সেই খানেতে আছে যে ভাই
অজানা কোন্ দেশ।

আঁধার রেখায় ঘোমটা টেনে
ডুবে পালায় দূরে'
গানের তালে আলোকধারা
নীরব নৃত্য করে।

বিশ্ব-গানের ছন্দে নাচে
তপন, শশী, তারা,
তার সে গানে যোগ দিবি যে,
আয় রে ছুটে তোরা:

আকাশ-বাতাস উঠ্‌ছে ভরে',
উঠ্‌ছে পরাণ মেতে ;
এগিয়ে চলার ডাক্ পড়েছে,
তাকাস্ নে আর পিছে ॥

কেন্দ্রসমিতির কথা

সৈয়দপুর প্রদর্শনী

গত ১০ ই জানুয়ারী রবিবার ই. বি. রেলওয়ের ওয়েলফেয়ার অফিসারের উদ্যোগে সৈয়দপুর রেলওয়ে কলোনীতে ঐ অঞ্চলের লোকদের শীতিলাভের জন্য একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারী-শিল্পবিদ্যালয়ের প্রস্তুত কতকগুলি শিল্পদ্রব্য লইয়া প্রচারক পণ্ডিত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী তথায় গমন করেন। প্রদর্শনীর স্থায়ী কালের জন্য সেখানে একটি ষ্টল নেওয়া হয়। সমাগত লোকেরা শিল্প-দ্রব্যগুলি দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছেন।

শিয়ালদহ মোটর সার্ভিস

শিয়ালদহ মোটর সার্ভিসের স্বত্বাধিকারী মিঃ এ, এ, সোভান ১৯২৯ সাল হইতে ১২ মাসের জন্য তাঁহার কোম্পা-

শ্রীর সময় বাসে আনাদের যাতায়াতের জন্য কর্ম্মীগণকে একখানি করিয়া ফ্রি পাশ দিয়া আসিতেছেন। আমরা অনন্দের সহিত জানাইতেছি যে এবারও মিঃ সোভান সমিতির কর্ম্মীগণের সুবিধার জন্য ১৯৩২ সালের ১২ মাসের জন্য একখানি ফ্রি পাশ দিয়াছেন। আমরা শিয়ালদহ মোটর সার্ভিস কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও মিঃ সোভানের মঙ্গল কামনা করিতেছি। শিয়ালদহ মোটর সার্ভিস কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এস. সি. বাহ ও মিঃ এ. হোসেন ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ এই বিষয় অনেক সাহায্য করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সাইনান মহিলাসমিতি

৬ই জানুয়ারী সোমবার কেন্দ্রসমিতির প্রচারক [illegible] সহ কার্য্য ও ইনান সমিতিগুলি পরিদর্শন করিয়া একদিন সন্ধ্যার সময় সমিতির সভ্যাগণের উপস্থিতিতে পণ্ডিত মহাশয় কি উপায়ে সমিতির কার্য্য প্রসার লাভ করিতে পারে সে বিষয় আলোচনা করেন।

কোরিয়া মহিলাসমিতি

গত ১৩ই জানুয়ারী সোমবার প্রচারক পণ্ডিত মহাশয় কোরিয়া মহিলাসমিতির কার্য্য পরিদর্শন করেন এবং সমিতির সভ্যাগণের প্রশ্নের সিদ্ধান্ত দর্শন করিয়া তাঁহাদের কার্য্য আরও বিস্তৃত করিবার জন্য উপদেশ দান করেন।

হিমানী কাফ্‌স্কেট

আধুনিক অঙ্গরাগের পাঁচটি উৎকৃষ্ট উপকরণ সাঙ্কেতিক পেটিকা—সুদৃশ্য রেশমী কাপড় মোড়া—বাক্সটি মজবুত ও কচিসঙ্গত মূল্য দশ টাকা মাত্র এ দামে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাফ্‌স্কেট অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বাজারের অন্য কাফ্‌স্কেট ইহার তুলনায় নিতান্তই ফেলো মনে হইবে, কিনিবার আগে হিমানীর কাফ্‌স্কেটগুলি দেখিতে অনুরোধ করি।

অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে

নিরুপমা কাফ্‌স্কেট

ক্ষুরুম কাফ্‌স্কেট

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

হিমানীর নানা প্রসাধন দ্রব্য ও

উপহারে অতুলনীয়।

অতুলনীয়

উপহার

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি

সাহিত্যরসিকদিগের জন্য প্রতি বৎসরের অপূর্ব্ব আয়োজন। গল্পে ও চিত্রে সম্ভারে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এবারে কথাবস্তু রচনার ভার লইয়াছেন শ্রীকেশব গুপ্ত, বিজয়রত্ন মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবিনাশ ঘোষাল, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী প্রভৃতি। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী-নিপুণ তুলিকায় এবারেও ইহা সমুজ্জ্বল হইবে। মূল্য পূর্ব্ববৎ ১৷৷০—১৫ হিমানী পুরস্কার কুপনের পরিবর্ত্তে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ও

শম্ভু ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

৪৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

Printed by A. C. Sirkar at the Classicss. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

স্বর্গীয়—কুমারী হাসিনী সেন

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩৮ [৪র্থ সংখ্যা

গায়ত্রীর ধ্যান

৺ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অগ্নিতে ভোগ দান করছি—পৃথিবীর বিষয়-ভোগ বায়ুপথ দিয়ে স্বর্গে উঠে জ্ঞানানন্দে পর্য্যবসিত হ'চ্ছে। স্বর্গ হ'তে শক্তি, জ্ঞান এবং আনন্দ অবতীর্ণ হ'চ্ছে,—তাই আমরা জান্‌ছি শুন্‌ছি, কর্‌ছি কর্ম্মাচ্ছি, খাচ্ছি দাচ্ছি। সেই সূর্য্যের জ্ঞান, শক্তি এবং আনন্দ আমরা ধ্যান করি;—তিনি আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন।

'বাস্তবিক সত্তা'ই সর্ব্বজগতের অক্ষয় জীবন-স্বরূপ—অবিনাশী প্রাণস্বরূপ; তার কোনকালেই বিনাশ নাই। সেই গোড়ার মহাপ্রাণ যাহা চায় তাহা গোড়ার মহাজ্ঞানে সর্ব্বদা স্বতঃই প্রকাশমান। আর সেই গোড়ায় চাওয়া ও পাওয়ার একত্র সম্মিলনের অটল আনন্দের উপরেই সমস্ত জগতের মূল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এবং তা'ই সমগ্র জগতের সমস্ত শাখাপ্রশাখায় রস সঞ্চার কর্‌ছে। সেই গোড়ার 'বাস্তবিক সত্তা'ই আমাদের প্রত্যেকের 'বাস্তবিক সত্তা'। প্রত্যেক শাখার পুষ্প যেমন মূল বৃক্ষেরই পুষ্প, তেমনি প্রত্যেক মানবাত্মার 'বাস্তবিক সত্তা' পরমাত্মারই 'বাস্তবিক সত্তা'। পরমাত্মার 'বাস্তবিক সত্তা' ছাড়া জীবাত্মার দ্বিতীয় কোন 'বাস্তবিক সত্তা' নাই।*

* ইহা যদি দ্বিজেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব বিবৃতিকা।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ফাজিলতুন্নেসা খোহা এম্-এ

আজ যাঁহারা আমাকে বাংলার একটি মহিমাময়ী ও করুণাময়ী নারীর পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে এই সভায় যোগদান করিবার এবং কিছু বলিবার সুযোগ দিয়াছেন, সর্বপ্রথমে আমি তাঁহাদিগকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ধরণীর বুকে সেই গরীয়সী নারী শ্বেতপদ্মের মতই ফুটিয়াছিলেন ও তাঁহার কল্যাণসুরভি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া নারীজীবনের সার্থকতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আবার তাহারই বুকে ঝরিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি এই ঝরিয়া পড়ার ভিতরই চিরশাশ্বত হইয়া রহিয়াছেন,—তাঁহারই কল্যাণবাণী ও সেবা আজ মূর্ত হইয়া বাংলার নারীর প্রাণে শিক্ষা, স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার পথ বাছিয়া লইবার প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সরোজনলিনীর "নারীমঙ্গল" প্রেরণা আজ দেশ-বিদেশে অশিক্ষিতা দুঃস্থা নিরাশ্রয়া নারীর নিরাশার প্রাণে আশার বর্তিকা জ্বালিয়া অন্ধকার হইতে আলোর সন্ধানে লইয়া যাইতেছে। আজ তাই আমি আমার বক্তব্য বিষয় বলিবার পূর্বে সেই স্বর্গীয়া নারীকে, যিনি নারীর সর্বাঙ্গীন উন্নতিকে জীবনের একটি প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি নারীশিক্ষা ও নারীর আপরণ বিষয়ে আপনার উৎসাহ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত ভারতে নিজের যুক্তবুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাকে আজ আমার সশ্রদ্ধ ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক শিক্ষিতা নারীই মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া থাকেন, এবং এ সম্বন্ধে অনেকেই অনেকবার বলিয়াছেন; কাজেই আমার বলিবার মতন নূতন কিছুই নাই—তবু যাহা আমি পূর্বেও বলিয়াছি আজও তাহাই বলিব। কেন না, সুপ্ত প্রাণকে জাগাইতে বারবারই হয়তো একই ভাবে ডাকিতে হয়, আশা,—একদিন সে ডাক সকলের প্রাণে পৌঁছিবে। অন্ততঃ আমি সেই আশাই করি।

জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিয়া সমাজের কাজে লাগাইবার জন্য দুইটি জিনিসের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন—শিক্ষা এবং স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বলিতে আমি অবশ্য সামাজিক স্বাধীনতার কথাই বলিতেছি। এ-দুইটির মধ্যেও প্রথম এবং পরম প্রয়োজন শিক্ষার। কারণ সত্য শিক্ষা চিন্তার স্বাধীনতার ভিতর দিয়া সামাজিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটিকে স্বতঃই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। স্বাধীন চিন্তা এবং বিভিন্ন মতবাদের আবহাওয়ায় যাঁহারা গঠিত হন,—সমাজের অন্ধ সংস্কার ভাঙিয়া দিয়া, গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া আপন ব্যক্তিত্ব লইয়া সহজভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইয়া উঠে।

Roman Rolland, Bertrand Russel প্রভৃতি বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই সত্যটি প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তিই মানুষের কাম্য। এতদিন সমাজ সর্বত্রই ব্যক্তিকে সমষ্টির নিকট বলি দিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সে যুগের অবসান হইয়া গিয়াছে। সমাজের জন্য সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে বিসর্জন দেওয়া অন্যায় এইটাই নবীন যুগের নূতন বাণী। যে সমাজ সমষ্টির ভিতর ব্যক্তিকে যত বেশী ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছে, সেই সমাজই সত্যকার সভ্যতার পথে ততখানি অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু যখন আমাদের দেশের দিকে ফিরিয়া তাকাই তখন আমরা কি দেখিতে পাই? ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া তো দূরের কথা, অনেক স্থানেই সমাজের অর্দ্ধেক অংশকে এমন ভাবে চাপিয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাহার অস্তিত্বও বোধ হয় কাহারও মনে পড়ে না। মানবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজনীয়তা যেমন সমান, সমাজদেহেও ঠিক সেইরূপ নারী ও পুরুষ সমাজদেহের দুইটি অঙ্গ। উভয়ের প্রয়োজনই তুল্যরূপ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়

সব সমাজই এই প্রয়োজনীয় অঙ্গাংশকে উপেক্ষা করিয়া উন্নত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? নারীকে অজ্ঞানতার অন্তরালে রাখিয়া দিলে মানুষের কোন সাড়াই তার মনকে জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না। যুগের পর যুগ এমনি ভাবেই কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই জড়তা ঘুচাইয়া সমাজদেহকে সুস্থ করিবার সেইরূপ চেষ্টা হয় নাই। শ্রদ্ধেয়া সরোজনলিনী দত্ত এই সত্য টি জীবন দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাই আজ তাঁহার নারীমঙ্গল সঙ্ঘের মধ্যে সেই প্রয়াস দেখিয়া আমি আমার কথা কয়েকটি লইয়া সকলের সামনে দাঁড়াইতে সাহস পাইতেছি।

আমাদের মেয়েদের হইয়া তাঁহাদের অন্তরের শ্রেষ্ঠ দাবীটিকে আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জানাইতে চাই—

"দেবী নহি, নহি আমি
সামান্যা রমণী! পূজা করি' রাখিবে মাথায়
সেও আমি নই। অবহেলা করি' পুষিয়া
রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তায় যদি
অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমায় পাইবে তবে পরিচয়।"

এখন এই দাবী সার্থক করিবার, এই জড়তা ঘুচাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দেশের এবং সমাজের কাজে প্রাণমন সঁপিয়া দিতে সমর্থ হইবার জন্য নারীর প্রয়োজন—শিক্ষা। শিক্ষা বলিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কথা বলিতেছি না। স্বর্গীয়া সরোজনলিনী, নারীমঙ্গলের জন্য যে শিক্ষাকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এবং দেশসেবায় আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন প্রয়োজন সেই শিক্ষার—অর্থাৎ যে শিক্ষা মানবমনের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া মনকে প্রসন্ন করিয়া তুলে, যাহা নিজের আত্ম-অভিমান ও স্বার্থ বলি দিয়া অপরিচিত আত্মীয়কে সেবা করিতে ও সহানুভূতি দেখাইতে শিখাইয়া দেয়, এবং মানুষকে যাহা ন্যায়বিচারে ক্ষমতা দেয়। সংক্ষেপে আমাদের কথা—"The harmonious development of all our faculties—mental, physical and moral." সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে বলা যায় যে এইরূপ শিক্ষা আপন আপন ক্ষেত্রোপযোগী ভাবে সকলেরই প্রয়োজন। এ কথাও আমি স্পষ্ট বলেই বলিতে চাই যে এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন নারীরই বেশী, কেন না "The hand that rocks the cradle rules the world." জননীর প্রভাব যে প্রত্যেকটি সন্তানের ভিতর দিয়া সমাজে অনুভূত হয় সে সত্য সর্ব্ববাদিসম্মত। সুশিক্ষিতা জননীর প্রভাব যেমন সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করে, তেমনি অশিক্ষিতা জননীর প্রভাব সমগ্রভাবে সমাজকে পশ্চাতের দিকে টানিয়া রাখে। সে সত্যটি আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ হইতে বেশ পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করা যায়। যদিও এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য অনেক বিজ্ঞ ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাঁহাদের সে চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হয় নাই তাহা বলিলে হয়তো তেমন অত্যুক্তি হইবে না। আমার মনে হয় এই বিরোধ জাগাইয়া রাখিবার খুব বড় একটা কারণ নারীশিক্ষার অভাব। অশিক্ষিতা সঙ্কীর্ণমনা জননীর সন্তান আপনার শৈশবলব্ধ সংস্কারের বশে নানাপ্রকার বিরোধ সৃষ্টি করিয়া যদি দেশকে অবনতির পথে টানিয়া লয়, তবে দোষ দেওয়া যায় কাহাকে?—সেই ছেলেকে না তাহার মাকে, না তাহার ধর্ম্মকে? আমরা সকলেই জানি, জীবনের প্রত্যূষে মানব সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, সংসার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়া যায়, তাহাই অধিকাংশ স্থলে চিরজীবনের জন্য স্থায়ী হইয়া থাকে। শিশুকালে অর্জ্জিত বিশ্বাসের প্রভাব আমাদের জীবনের অনেক স্থলে আমাদের অজ্ঞাতেই কাজ করে। শিশুর শিক্ষা সাধারণতঃ মায়ের কোলে বসিয়াই আরম্ভ হয়। এই শিক্ষাদাত্রী জননীর দায়িত্ব যে কত বেশী তাহা সহজেই অনুমেয়। শিশুর হৃদয়ে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ভবিষ্যতে সেইগুলির প্রভাবই তাহার মতামত, তাহার কর্ম্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবে। সুতরাং এই প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে সে যেন অবনত মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখিতে পারে, সেজন্য একান্ত

চেষ্টার প্রয়োজন। শিশুকে বুঝাইয়া দিতে হইবে—ভারতবর্ষ তাহার মাতৃভূমি এবং তাহারা ভারতবাসী। জননীকেও বুঝিতে হইবে—জাতীয়ত্ব গড়িয়া উঠে সমধর্ম্মের ভিত্তির উপর নয়, সমদেশকতার ভিত্তির উপর। ইংরাজ ফরাসী জার্ম্মান প্রভৃতি ইউরোপের জাতিসমূহ এবং আমেরিকাবাসী সকলেই খৃষ্টান। কিন্তু সেজন্য ফরাসী দেশীয় কোন খৃষ্টানই আপনাকে জাতিতে জার্ম্মান বা ইংরেজ বলিয়া পরিচিত করিতে প্রয়াসী হইবে না। ফ্রান্সের খৃষ্টান ফরাসী ও ইংলণ্ডের খৃষ্টান ইংরেজই থাকিবে। ধর্ম্ম তাহাদের জাতীয়তার উপর আসিতে পারে না। সেই রকম ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান ভারতবাসী—অন্য পক্ষিরে তাহাদের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই বরং লজ্জার বিষয়ই আছে। ভারতবাসী মাত্রই তাহাদের আপনার জন। এই শিক্ষা তাহাদের বিশেষ ভাবে পাইতে হইবে। তাহাদের বুঝিতে হইবে, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্ম বড় জিনিষ হইলেও জাতীয় জীবনে তাহা সব চেয়ে কাম্যবস্তু নয়। এই জ্ঞানের জন্য চাই উদার শিক্ষা, যাহা পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। পরিণত বয়স্কের চিত্তে এই ভাবটির স্ফূর্ত্তি হওয়ার উপযোগী বীজ শিশুচিত্তে বপন করিতে হইবে। এই সত্যটি প্রত্যেক সম্প্রদায় হৃদয়ের সহিত অনুভব করিয়া যদি ইহাকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন, তবে আমার মনে হয়, সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমাপ্তি অতি সহজেই হইতে পারে। সেইজন্য উপযুক্ত শিক্ষিতা জননীর একান্ত প্রয়োজন। বিখ্যাত ফরাসী বীর নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন "The hope of France is in her mothers." আমি আজ এই কথাটাকেই একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে চাই—"The hope of India is in her mothers." এইতো গেল শিশুচরিত্র গঠনের জন্য জননীরূপিণী নারীর শিক্ষার প্রয়োজনের কথা।

স্ত্রীরূপেও শিক্ষিতা নারীর কত প্রয়োজন তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি। নরনারীর সৃষ্টির উদ্দেশ্যই নারী ও পুরুষ পরস্পরের compliment—একজন অন্যজনের substitute নয়।

একবার পুরাণ ইতিহাস খুলিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে নরনারী জীবনযাত্রার পথে সৃষ্টির এই মূল উদ্দেশ্যটি ভুলিয়া যায় নাই। গৃহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই নরনারী পরস্পরের সঙ্গী। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহাদের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃষ্টির স্রোত পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে কাহারও দায়িত্ব বেশী রহিয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই একের জীবন অন্যের জীবনের বিকাশের পরিপন্থী হইয়া উঠে নাই। কি এক অপূর্ব্ব চেতনা তাহাদের জীবনকে রসে, গন্ধে, গানে ভরিয়া দিয়া পূর্ণ করিয়া সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। গৃহে আনন্দরূপিণী নারী, কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মিণী—এরূপ সহধর্ম্মিণীর দৃষ্টান্ত পুরাণ ইতিহাসে বিরল নয়।

সমাজের কোন পরিবর্ত্তন করিতে গেলেই, তা যত বড় উন্নতির জন্যই হউক না কেন, সমাজের সঙ্গে বিরোধ বাধেই। আবার সমাজ যতদিন বেঁচে ভাবে বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহাকে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে। কারণ, যাহার প্রাণ আছে তাহার গতি আছে এবং যাহার গতি আছে সে নিশ্চল অবস্থায় থাকিতে পারে না। এই জন্য চিরদিনই সমাজের বুকে এমন কর্ম্মীর প্রয়োজন হয় যাঁহারা এই বিরোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিবর্ত্তন-স্রোতের বাধা দিতে পারেন। ইঁহারা যখন বাহিরের সংঘাতে ক্লান্ত হইয়া অবসন্নহৃদয়ে গৃহে আসেন, তখন তাঁহাদের এই অবসাদের বোঝা নামাইয়া দিয়া চিত্তকে উৎসাহিত করিয়া রাখিতে না পারিলে তাঁহারা ভাঙিয়া পড়িবেন। তাঁহারা তখন কামনা করেন আন্তরিক সহানুভূতি এবং অদম্য উৎসাহ,—তাঁহারা তখন চান ভাবধারার আদানপ্রদান। তাহাদের এই প্রাণের কামনাকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে, তাঁহাদের নিরুৎসাহ চিত্তে আশা জাগাইয়া দিতে, তাঁহাদের পরিশ্রান্ত মনকে শক্তি দিয়া সজীব করিয়া রাখিতে পারে কে?—পত্নীরূপেই হউক কি দুহিতা বা ভগ্নীরূপেই হউক, এ কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন শুধুই উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা নারী। তাঁহাদের অভাবই আজ সমগ্র দেশের সমাজকে কর্ম্মকীর্ত্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু সুখের বিষয়, নারীর উন্নতির পথে এই যে শিক্ষার অভাবজনিত বিরাট বাধা, তাহা ভাঙিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য নবীন যুগে শিক্ষিত নরনারীর সাহস ও

উৎসাহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। আজ যাঁহার স্মৃতি উপলক্ষে এই সভার আয়োজন হইয়াছে, তিনিও এই নবীন যুগের নবীন আকাঙ্ক্ষাটি ১৯ বৎসর পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে ত্রুটি যতই থাকুক না কেন, তবু নারীজীবনে তাহা মধুরতার স্বাদই আনিয়া দিবে। তাঁহার সেই ভবিষ্যৎ বাণী আমরা নারীমঙ্গল সঙ্ঘের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিব কতখানি সত্য ও সার্থক হইয়াছে।

এইরূপ ভাবে দেশের বা সমাজের যে কোন সমস্যা নিয়াই আলোচনা করি না কেন, অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাই যে নারীকে বাদ দিয়া যখনই পুরুষ একা অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে তখনই তার ফলে শুধু সমাজ নিত্য নূতন সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরও বলিবার অনেক রহিয়াছে, কিন্তু আর বেশী অগ্রসর হইলে সকলের শুনিবার হয়তো ধৈর্য্য থাকিবে না। তাই আজ কবি Tennysonএর কথাতেই আমার বক্তব্য শেষ করিয়া আমি বিদায় নিতে চাই—

"The woman's cause is man's.
They rise or sink together;
Dwarfed or God like bond or free.
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow?"*

* সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক উৎসব অধিবেশনে পঠিত।

তুমি

শ্রী হিরণ্ময়ী দেবী বি-এ

তুমি প্রভু, বন্ধু, প্রিয়, তুমি সে পুরুষ
যারে আমি বার বার করেছি যাচনা;
তুমি ভারতের মোর—নহ তুর্ক, রুষ;—
দেশ ছেড়ে চলে' গিয়ে তুমি ত বাঁচ না!
তুমি আপনার, নহ পরদেশী বঁধু,
শ্যামলিমা তব মুখ—স্বদেশের মধু!
কি সুন্দর দীপ্ত আঁখি প্রতিভায় ভরা,
আমাদের এই খোলা আকাশ নিয়ত;
চাহনি যাহার, মনে চিরমোহরা,
স্নেহ-দৃষ্টি বনশ্যামা প্রকৃতির মত।
কোমলে কঠোরে মেশা বর-কলেবর,
মানবপূর্ণতা সে যে পশুত্বের পর!
মনে মনে অনেক করেছি তোলাপাড়া,—
অমন ধরে না মনে কারে তোমা ছাড়া!
বুদ্ধিবলে বলীয়ান, স্নেহে মনে দড়,
কোথাও পড়েনি চোখে তোমা হ'তে বড়!

হুগলী জেলার ছেলেভুলানো ছড়া

শ্রী মনমোহন নরহন্দর

সকল জাতির মধ্যেই ছেলেভুলানো ছড়া প্রচলিত। ছোট ছোট খোকাখুকুকে কেন্দ্র করিয়া এগুলি মাতৃহৃদয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। শিশু চিরকালই নূতন। যখন সে মাতৃকোলে প্রথম আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই মায়ের প্রাণ এক অজানা অনুভূতি আনন্দে শিহরিয়া উঠে। শিশুর সেই কুসুমকোমল মুখখানি দর্শন করিয়া, তাহার হাসিকান্নাকে কেন্দ্র করিয়া মাতৃহৃদয় নিত্যকার জীবনযাত্রা ও অভিজ্ঞতার বেষ্টনীর মধ্যে খাপছাড়া ভাব বুনে। কল্পনার উৎসমুখে শিশুর প্রবোধ-বাক্য বাহির হইয়া আসে; দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে ইহার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। যুগযুগান্তর হইতে নারীহৃদয়ে এই ভাববিকাশের ধারা একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। মাতা অশিক্ষিতা হউন, অপটু হউন, তবুও তাঁহাকে মৌলুক শিশুর জন্য কথা কহিতেই হইবে। সে শিশুর পুরীর জন্য যতটা, তার চাইতে বেশি নিজের পুরীর জন্য। হৃদয়ের হইতে হইতে যে আনন্দের সুর বাজিয়া উঠে মাতা তাহাকে অবরুদ্ধ রাখিবেন কিরূপে! এই জন্যই বাৎসল্যরসে পরিপুষ্ট স্বভাবজাত ঐ সব ছড়াগুলির কোন-প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন হয় নাই। সাধারণ-প্রচলিত ছড়াগুলিই সাহিত্যের প্রাণ; তাহার অধিকাংশই বহু মানবের অভিজ্ঞতাপ্রসূত, তাহার উপর আবার কত কবি ও সাহিত্যিকের জাঁচড় পড়িয়াছে; কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়াগুলি সংস্কার ও পরিমার্জন হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত। তাই এগুলি শিশুসাহিত্য- শিশুর মতই চিরনূতন!

এইরূপ কতকগুলি ছড়া আমার হুগলী জেলায় অবস্থানকালে সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশই সারা বাঙলায় প্রচলিত। আমরা ইহার মধ্যে মাতৃহৃদয়ের ভাববৈচিত্র্যের সন্ধান করিব। শিশু তাহার শিশুপ্রকৃতির জন্যই সুন্দর। বিশ্বের পাপপুণ্য, কুটিলতার ছায়া তাহার উপর পড়ে নাই, তাই সে সরল—পবিত্র। তাহার কাছে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই; সে মানবমাত্রেরই দুইহাত।

মায়ের কোলে যখন খোকা আসে তখন তিনি তাহাকে সব চাইতে সুন্দর দেখেন। মায়ের অন্তরের শত কল্পনা শত আবেগ তাহাতেই আসিয়া কেন্দ্রীভূত হয়। সত্য শিব সুন্দরের ছায়া মানবমাত্রেরই অন্তস্তলে বিরাজমান; সেই শুভ সুন্দরের উপর সকলেরই একটা আকর্ষণ থাকে। খোকা-খুকুকে কোলে লইয়া তাহার রক্তকমল-ওষ্ঠে চুম্বন করিতে গিয়া যখন মায়ের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তখন না সুন্দরের মোহ এড়াইতে পারেন না—শিশুকে আরও সুন্দর দেখিবার জন্য মনে তীব্র বাসনা জাগে। বাহিরের সৌন্দর্য্য দিয়া তাহাকে সুন্দরতর করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই কল্পনায় বিভোর হইয়া বাহিরের স্থায়ী সৌন্দর্য্য-অলঙ্কারের কথা লইয়া মায়ের প্রাণ বলিয়া উঠিল—

খুকু আমার সোনা,
তাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেবো দানা।
খুকু আমার বাদু,
তাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেবো বাদু।
খুকু আমার ধনা,
তাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেবো চৌদানা।

যুগ-বিপর্য্যয়ে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিকে মানুষের যে রুচি বদ্‌লাইয়াছে ইহাতে তাহার কোন প্রকার ছোঁয়াচ লাগে নাই। প্রাচীনত্বের ছায়া লইয়াই এখনও চলিয়া আসিতেছে ইহা। রুচিদুষ্ট শিক্ষাপ্রভাবে আমাদের সেই পুরানো সম্পদ চলিয়া গিয়াছে; মায়ের মুখে ছড়া বলার গুন্‌গুনানি আর বড় শোনা যায় না। যদি কোনদিন আবার সেই সম্পদ ফিরিয়া পাওয়া যায় তখন কালস্রোতের প্রভাবও দেখা যাইবে এবং একালের গয়নার নামও শোনা যাইবে!

মা কেবল গয়না পরাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না, অন্তঃস্থিত

সুন্দরের ছেলেরা প্রকৃতির উপরও নজর পড়িল। বিরহ মনোহর শতদলের উপর তাঁহার শিশুর নূতা কল্পনা করিতে বাধিল না। তাহার সঙ্গে নিজ জীবনযাত্রার কথাও ফুটিয়া গেল। নীচের ছড়াটিকে একজন সাধারণ মৎস্যজীবী গৃহস্থ মেয়ের সরল কল্পনা বলিয়া ভ্রম হয়—

পুঁটু নাচে কোন্‌খানে ?—
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে পুঁটু কি করে ?—
দুধ-পালি-গাদি মাছ ধরে,—
মাছ ধরে আর ফুল পাড়ে !

উজ্জ্বল রঙীন জিনিষমাত্রই শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই জন্য ফুল শিশুর প্রিয়। মাতৃহৃদয় তাই শিশুর হাতে ফুল দিয়া ছাড়িল।

নিজের নাড়ীছেঁড়া ধনের কাছে মা আর কাহাকেও সুন্দর দেখিতে চান না। সৌন্দর্য বিচারে এই পক্ষপাতিত্বকে কোন মাতৃহৃদয়ই কোনকালে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাই ছেলের রূপ সমালোচনা করিতে ছেলেকে কেহ কালো বলিলে মায়ের প্রাণে আঘাত লাগে, কিছুতেই তিনি সহ্য করিতে পারেন না। বাহিরের সেই আঘাতে মায়ের মুখে ফুটিয়া উঠিল—

খোকনকে কে বলে রে কালো ?—
আমার আঁধার ঘরের আলো !
কে বলে রে খাঁদা ?—
তার চোখে লাগুক ধাঁধা !
খাঁদা কি বল্‌তে দেখে ?—
সোনা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দেখে !

কেবল শিশুর বাহিরের রূপই মায়ের কাছে সুন্দর নয়, তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে আস্ফালনে সন্তানবৎসল মাতৃহৃদয়েও আনন্দ-আলোড়ন উপস্থিত হয়। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশশক্তি-প্রভাবে সে যখন হাত-পা নাড়িতে থাকে তখন মা তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলেন—

হাত ঘুরঘুর নাড়ু খেয়ো,
নইলে নাড়ু কোথায় পাব !
সোনার নাড়ু গড়িয়ে দেবো,
গড়িয়ে গেলে কুড়িয়ে দেবো !

মা ছেলেকে নাড়ুর প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু হাত না ঘুরাইলে নাড়ু দেবেন না। শুধু কি তাই ? —সোনার নাড়ু দেবেন। সোনার নাড়ু যে ভোজনের দিক দিয়া উৎকৃষ্ট নয় সে খেয়াল তাঁহার নাই —শুধু উজ্জ্বল, সুন্দর, মূল্যবান বলিয়াই।

সৃষ্টি আশ্চর্যের মুখে পড়িলে সে খুসী হয়, তাই কোন রমণী খোকনমণিকে কোলে লইয়া আদর করিয়া বলিয়াছেন—

খোকন সোনা চাঁদের কোণা
কে রেখেছে নাম,—
সদাই তার হাসাবদন
নত্তা খেতে চান !

ছড়ার মধ্যে একটা সুরের ইঙ্গিত আছে। সাধারণ-প্রচলিত ছড়া আর ছেলেভুলানো ছড়া এই দুইয়ের মধ্যে একটা বড় রকমের ব্যবধান আছে। একটি অভিজ্ঞতা-প্রসূত সরল জ্ঞানসাহিত্য, আর একটি মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য-রসের ভাবপ্রবাহ। এইজন্য ছেলেভুলানো ছড়াগুলির মধ্যে প্রাণস্পর্শী শক্তি বেশী আছে। আবৃত্তি করিলেই সাধারণ মানুষের প্রাণেও ঐরূপ বাৎসল্যরসের উদ্রেক হয়, শিশুর একটি সুস্পষ্ট চিত্র মানসপটে উদিত হয়,—একটি শিশু সন্তানকে ঐরূপে কোলে লইয়া আদর ও চুম্বন দ্বারা আনন্দ-লাভের জন্য প্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠে।

মায়ের কাছে খুকুর চাইতে জগতের সব জিনিষই ছোট; তবু তাঁহার খুকুকে যে তাঁহারি মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, একথা ত তিনি ভুলিতে পারেন না, তাই তিনি সাংসারিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা লইয়া শিশুজীবনের ভবিষ্যৎকে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাঙ্গসুন্দর-বোধে কল্পনা করিলেন—

খুকুর দেবো বিয়ে বেগম মহলে,
খুকু হবে বেগম সাহেব, বাঁদী সকলে।
খুকু হাতে পরবে হীরের বালা,
গলায় পরবে মুক্তোমালা ;
সোনার খাটে থাকবে শুয়ে রূপোর মহলে ;
শতেক দাসী বাঁধবে চুল বেগমসাহেব হেলে !

শিশু স্বাভাবিক চাঞ্চল্যবশতঃ কিছুতেই ঘুমাইতেছে না, অথচ মাতাকে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে, তাই মাতা ঘুমপাড়ানী মাসীপিসিকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তিনি বাটীতন্ধ পাণ ধরিয়া দিয়াছেন। তখনকার সমাজ-জীবনে তাম্বুল অভ্যর্থনার একটি সম্মানপ্রদ বস্তু বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজ-দরবারে অভিজাত সম্ভ্রান্ত অতিথি আসিলে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে তাম্বুল দান করা হইত। রমণীগণের তাম্বুলরসে অধর রঞ্জিত করা সৌন্দর্য্যসাধনার একটি অঙ্গ ছিল। চণ্ডীমঙ্গলে সুখী রমণীদের কথা উল্লেখ-ছলে লিখিত আছে—"খাসা গুয়া খায় সাঁচি পান।"

বাঙালী রমণীর মাতৃহৃদয়ে তাই ধ্বনিয়া উঠিল—

ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে' পাণ দেবো গাল ভরে' খেয়ো।

ঘুম পাড়াইতে না পারিয়া খেলায় নিযুক্ত করিবার ছলে আহ্বান করিলেন—

আয়রে পাখী দোর খোলা,
খোকন নিয়ে কর্‌বি খেলা।
আয়রে পাখী বোস্ ডালে,
ভাত দেবো তোরে সোনার থালে।
তুই খাবি দাবি কল্‌কলাবি,
খোকন নিয়ে খেলা কর্‌বি।

খোকা যখন কাঁদিয়া অস্থির হয়, কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না, অথচ সাংসারিক সকল কাজ পড়িয়া থাকে, তখন মা খোকার উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যরসের সহিত বিরক্তিরস মিশাইয়া দেয়। তাহারি প্রভাবে মায়ের মুখে প্রবোধবাক্যের সহিত শাস্তির ভীতিপ্রদর্শন-বাক্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল—

আয় কেঁদোনা, আয় কেঁদোনা,
ছোলাভাজা দেবো;
এবার যদি কাঁদ তবে
তুলে আছাড় দেবো!

ছোলাভাজা মুখরোচক, গৃহের ভোজ্যবস্তুর পরিবেষ্টনীর মধ্যে সহজপ্রাপ্য, অথচ খোকার প্রিয়, তাই মা ছোলাভাজার লোভ দেখাইলেন। অপরদিকে উৎকট শাস্তির ভয়। পরম স্নেহাস্পদের কাছে অল্প শাস্তির ভয় উপেক্ষিত হইতে পারে তাই আশঙ্কা। শিশুর প্রতি মায়ের এই বিরক্তভাব পিতার প্রাণে আঘাত করিল। পিতা তাই তাঁহার শিশুর মায়ের উপর অনুযোগ করিয়া খোকাকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন—

না! না! না!
পুকু, কেঁদো না!
চাল চিবিয়ে খাব আমি
তুমি রেঁধো না।

শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম কান্না, সে কাঁদিবেই আর মাকে সংসারের কাজও করিতে হইবে। তাই শিশুর কান্না থামাইবার জন্য তাঁহার অনেক সময় কাটিয়া যায়। আগুনি কাঠ ঠিকমত শুকান হয় না, ভিজে কাঠে রাঁধিতে হয়; রান্নাও ঠিকমত হইয়া উঠে না। আহারে বসিয়া গৃহকর্ত্তা অপরিপক্ক রান্না খাইয়া শিশুর কাঁদনের কথা মনে করেন; তাহার মায়ের কষ্টের কথা মনে পড়িয়া যায়। শিশুর মায়ের কোলে শিশুকে দেখিয়া তিনি তখন বলিয়া উঠেন—

পুকু আমার কেঁদেছে,
ভিজে কাঠে রেঁধেছে।
কাল যাব গঞ্জের হাট,
কিনে আন্‌বো শুক্‌নো কাঠ।

শিশুর আসিবার বহু পূর্ব্বেই মায়ের মনে শিশুর আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। তাঁহার সব দেহ-মন সকল সময়ে শিশুকে কাছে পাইতে চায়। শিশু স্বাবলম্বী না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কাছছাড়া করিতে চান না,—পাছে তাঁহার খোকার গায়ে আঁচড় লাগে। ক্ষণিকের অদর্শনে মায়ের প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে—অমঙ্গল চিন্তাটাই আগে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, মায়ের মন না শত্রুর মন! খোকা যখন একটু বড় হয়, চাঞ্চল্য-বশতঃ মায়ের চোখের আড়ালে আনন্দনে স্থানান্তরে গমন করে অথবা খেলায় নিমগ্ন হয়, তখন আশঙ্কাকুলা মাতা হঠাৎ খোকাকে ধরিয়া ফেলিয়া কোলে তুলিয়া আলিঙ্গন করতঃ অভিনব আনন্দ অনুভব করেন। শিশুর সেই চাঞ্চল্য দমন করিতে মায়ের মুখে ভয়দেখান-ছলে অপূর্ব্ব স্নেহরসের প্রকাশ হইয়া পড়ে—

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি,
খোকন গেছে কার বাড়ী ?
নিয়ে আয় ত রে লাল ছড়ি,
খোকন মেরে খুন করি !

রবীন্দ্রনাথ এই স্বগতোক্তিটুকু করিয়া বলিয়াছেন—

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই,
বেঁধে মরি কেটু স'রে দাঁড়ালে !

শিশুর জন্মকথা আলোচনায় বিশ্বকবি আবার মায়ের মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।
ছিলি আমার খুকুলখেলার,
তোরে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেবেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাই পূজায় তোমায় পূজা করেছি !

নারীত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে নারীর মাতৃত্বের উপর ; অপরাপর গুণরাশি মাতৃত্বকে কেন্দ্র করিয়া নারীদের স্বৈনী রচনা করে একটি মানবশিশুকে মধ্যে রাখিয়া,—মানবসন্ততির হৃদয়ে যে স্নেহ-করুণা-ভালবাসার নিঃস্বার্থ বহিয়া চলে তাহাই জগৎ-পারাবারে পরিণতি লাভ করিবার মূল উৎস।

বন্দিনী

শ্রী উষারাণী দেবী

'ও ছোট বৌমা !'

গুলের কৌটাটা আঁচলের খুঁটে বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে উঠানে দাঁড়িয়ে মিত্র গিন্নি দোতলার দিকে চেয়ে ডাক্‌লেন—'ও ছোট বৌমা !'

দোতলার সামনের ঘরের দরজাটা খুলে একটি বছর পনেরর মেয়ে বারান্দায় এসে ব্যস্তকণ্ঠে উত্তর দিলে—'কেন মা ?'

মিত্র গিন্নি বল্‌তে লাগ্‌লেন—'সন্তোষ কাল কলকাতায় আস্‌বে(ছে)। ভট্‌চায মশাই বল্লেন কাল ভালো দিন নেই, আজ আটটার পর যাত্রা করে' থাক্‌তে। তুমি গা ধুতে যখন যাবে তখন আমার ঘরের তাকের ওপর থেকে কাঁসার ঘটিটা নিয়ে গিয়ে বেশ করে' মেজে এক ঘটি জল এনে শোবার ঘরের এক পাশে রেখে দিও,—ঘটিটা যেন আবার আধখালি রেখো না। সবই তোমায় তো ব'লে' দিতে হয় কিনা ! আমি যাচ্ছি একবার ওপাড়ায়, দেখি কালো বাড়ী যদি মাছ জোগান থাকে ;—এখানে তো বেলা দুপুরের আগে বাজার বস্‌বে না ?—গাড়ী তো দশটায়। অন্তবার দু'দিন আগে বলে, সবই যোগাড় করে' রাখি। এ যে হঠাৎ বলে যাব, এখন কোথায় পাই কি তার ঠিক নেই ! শুধু ডাল-ভাত খাইয়েই বা কোন্ প্রাণে যাত্রা করাই ? ক'দিনই বা রইল, ভালোমন্দ কিছুই খাওয়াতে পার্‌লুম না। নিজে না খেলে তো হবে না—লোকজন সব সমান কিনা, এলে বল্‌বে পেলুম না। ওদের আর কি বলো, যত জ্বালা আমারই ! ভূত-গুলো শুধু গিল্‌তে আছে একপাল !'—বক্‌তে বক্‌তে মিত্র গিন্নি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বধূ মাথা রেলিংয়ের ওপর ভর দিয়ে শাশুড়ীর চলন-পথটির পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

স্বামী কাল কলকাতা যাবেন, এই খবরটা হঠাৎ তার বুকে এমন একটা ঘা দিলে যা সাম্‌লাতে একটু সময় গেল। সামনেই পানাপুকুরের ধার দিয়ে আমগাছের ছায়ায় ঢাকা পাকে-চলা পথটি ঘুরে' মিত্র গিন্নি ওপাড়ায় যাচ্ছিলেন, মায়ার চোখদুটি সেই দিকেই চেয়ে ছিল। কিন্তু মন থেকে তার

তখন এই শান্ত সবুজ পল্লীখানি মিলিয়ে দিয়ে কলকাতার একটি চার-চারজন শত্রুমুখর পথের ধারে বড় বড় ইট-কাঠের ইমারতগুলার গা ঘেঁসে একটি শুষ্ক নিরানন্দ বাড়ীর ম্লান ছবি ফুটে উঠ্‌লো।

তের বছরের হাসি-কান্নায় ভরা সেই বাড়ীখানি মায়া আজ দু'বছর দেখ্‌তে পায়নি। এই দুটি বছরের প্রতিটি দিন সে অনুভব করেছে সেই বাড়ীখানি ব্যগ্র দুটি বাহু বাড়িয়ে যেন তাকে বল্‌ছে—'ওরে আয় আয়, ফিরে আয়, শূন্য ঘরে একাকিনী জননীর দিন যে কাটে না,—আঁধার ঘরের প্রদীপ তুই, বুকভরা কান্না নিয়ে মা যে তোরই পথ চেয়ে বসে' আছে...ফিরে আয়! ফিরে আয়!'

মায়ার চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। আত্মহারা মায়া হয়তো আরও অনেকক্ষণ এমনি কান্নায় ডুবে অসমাপ্ত কাজের জন্যে আরও অনেক কান্নার কারণ ঘটিয়ে তুল্‌তো, কিন্তু পেছনে বড় বৌ নন্দরাণীর গলা পেয়ে সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফিরে দাঁড়ালে। নন্দরাণী হাসিমুখে এগিয়ে এসে মায়ার মাথাটা কাঁধের ওপর টেনে নিয়ে বল্লে—'কিরে, ঠাকুরপো কাল যাবে শুনে একেবারে কেঁদে ফেল্লি!'

মায়া তাড়াতাড়ি লজ্জাব্যাকুল কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো—'ছিছি দিদি! তুমি ওসব কেন বল্‌ছ? তুমি তো জানো কলকাতার কেউ যাচ্ছে শুন্‌লেই আমার মন কেমন করে, মা'র কথা বেশি করে' মনে পড়ে,—একা তিনি কেমন করে' এতদিন আছেন ভেবে কান্না পায়!'

মায়ার চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। নন্দরাণী আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বল্‌তে লাগ্‌লো—'মন কেমন করে তা ঠাকুরপোকে কেন বলিস্‌নে বোকা! কতবার আসে যায়, তোকে দেখিয়ে আন্‌তো?'

কুণ্ঠিত কণ্ঠে মায়া উত্তর দিলে—'বলি তো কতবার...'

উৎসুক কণ্ঠে নন্দরাণী জিজ্ঞেস কর্‌লে—'বলিস্? তা, কি বলে সে?'

মায়া ধীরে ধীরে বল্লে—'বলেন, ওসব আমি কি জানি, মা যা বল্‌বেন তাই হবে।'

নন্দরাণী অসহিষ্ণু ভাবে বলে' উঠ্‌লো—'ওঃ কি আমার মাতৃভক্ত রে! নিজে তো মা মরে' গেলেও পৌঁছ রাখেন না, যত ভক্তি বউ পাঠাবার বেলা! তুই বল্‌তে পারিস্ না, মা তো সবারি সমান, আমার কি মা'র ওপর কোন কর্ত্তব্য নেই? বিধবা মানুষ একা আজ দু'বছর ধরে' তোমাদের খোসামোদ করে' মরে' যাচ্ছে, মাঝে মাঝে একটু দেখা করে' তৃপ্তি দেওয়া কি আমার কর্ত্তব্য নয়?...তুই নেহাৎ ভালো মানুষ, আমি হ'লে দিতাম শুনিয়ে!'

একে তো নন্দরাণীর সঙ্গে বেলাটাই শাশুড়ী পছন্দ করেন না, তার ওপর এই কথাগুলো কারো কানে গেলে অনেক লাঞ্ছনা তার জন্যে উঠ্‌বে ভেবে মায়া তাড়াতাড়ি মাথাটা তুলে নিয়ে বল্লে—'যাই দিদি! মা আস্‌বার আগে কাজগুলো সেরে আবার যমুনায় জল এনে রাখ্‌তে হবে।'

নন্দরাণী একটু হেসে বল্লে—'তবেই তুই গেলি!'

মায়া ম্লান হেসে চলে' গেল।

দিনের দীপ্ত আলো সন্ধ্যার ধূপছায়া আঁচলের আড়ালে মিলিয়ে গ্যাছে। এমন সময় মায়া ধোঁয়ার ভরা ধুনুচিটা হাতে নিয়ে ঠাকুর-ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালে।

সাড়ীর সিঁদুরাঁধা প্রান্তটি ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে এসে বুকের 'পরে দুল্‌ছে, মৌন দুটি ঠোঁটের কোণে যেন কাতর মিনতি-ভরা বেদনার বাণী উঁচু উঠ্‌ছে, শান্ত দুটি কালো চোখের কোলে উচ্ছল জল যেন গোপন শাসন মান্‌তে চাইছে না আর।

ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর ঢুকে একপাশে ধুনুচিটা রেখে মায়া নারায়ণের সিংহাসনের নীচে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে' পড়ে' রইল।

একটু পরে গিন্নির গলা শোনা গেল—'ওরে ক্ষেমি, যা তো চট করে' একবার ওপাড়ায়, নওগিন্নি দুটো কই মাছ দেবে, নিয়ে আয়।'

শাশুড়ীর গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে চোখ-মুখ মুছে নিয়ে বাইরে আস্‌তেই মিত্র গিন্নি বল্লেন—'কথায় কথায় একেবারে সন্ধ্যে হ'য়ে গ্যাল। যাও তো বৌমা গামছাটা এনে—যাই কাপড়টা কেচে আসি; তুমি যমুনার জল এনেছ তো?'

ছেড়ে বেড়ে মায়া উত্তর দিলে—'যাই মা।'

গিন্নি আঁচলে বাঁধা কৌটাটা খুলে একটিপ গুল মুখে দিয়ে কৌটাটা বুকের ওপর রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লেন—'ওরে ও ক্ষেমি, যা না বাপু ঈশ্‌গিদ্‌, আমার এখনি এসে বল্‌বি 'দিলেনি ছেতের বেলা...' তোদের কি বল্‌, মুখের কথা বল্‌লেই হোল। মাছ দুটো এনে পুবের রান্নাঘরে টিনে জল দিয়ে রাখিস্‌, ভাল করে' চাপা দিস্‌ যেন।'

ক্ষেমি তখন রান্নাঘরে একবার ধোঁয়ার মধ্যে উনান দুটোয় হাওয়া দিতে দিতে বল্‌লে—'যাই গো গিন্নিমা, উনান দুটো না ধরিয়ে গেলে আমায় নিয়ে যাবে।'

মায়া গামছা এনে হাতে দিলে। মিত্র গিন্নি জিজ্ঞেস কর্‌লেন—তোমার এ বেলায় উঁড়ায় যা'র করা, তরকারী কোটা সব হয়েছে?'

মায়া মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলে—'না।'

গিন্নি ছেলে উঠে বল্‌লেন—'না কেন, এতক্ষণ হচ্ছিল কি? খালি বসে' বসে' হাসি আর গল্প! সহরে মেয়ে কিনা, কাজে কি আর মন লাগে। ছেলেটাকে এবার তো কিছুই খাওয়াতে পার্‌লুম না, ভাব্‌লুম দুটো-একটা আজ করে' দেব, তা কি হবার জো আছে—যে দরদী বউ হয়েছে সন্তোষের।'

গিন্নি বল্‌তে বল্‌তে ঘাটে গেলেন কাপড় কাচ্‌তে। মায়া সেখানেই একটু চুপ করে' দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লে কি তার দোষ! ভোর হ'তে রাত্র অবধি কখন তার বিশ্রাম? তবু কেন শাশুড়ী এমন বলেন! বাড়ীর সকলের সুখ-সুবিধার আয়োজনেই তো তার দিনরাত্রির সময়টুকু শেষ হ'য়ে যায়। দুঃখ তাতে তার একটুও নেই—মা বলে' দিয়েছেন এই মেয়ে মানুষের ধর্ম। কিন্তু একটু মিষ্টি কথা, একটু স্বচ্ছন্দতা, এও কি তার পেতে নেই! চোখ দুটো মুছে ফেলে মায়া উঁড়ার ঘরে ঢুকে পড়্‌লো।

প্রদীপের স্বল্পালোকে বসে' মায়া একরাশ তরকারী প্রায় কুটে শেষ করে' এনেছে এমন সময় ক্ষেমি ঘরে ঢুকে মায়ার সামনে দুটো মোচা রেখে বল্‌লে—'এই নাও বৌঠান, গিন্নিমা এ দুটো কালকের নেগে কুটে রাখ্‌তে বল্লেন, কাল সকালে ছোট দাদাবাবুকে দেঁসে দিতে হবে।'

মায়া একবার দেখ্‌লে—কোন কথা কয় না। ক্ষেমি চলে' গেল। অভ্যস্ত হাত দুটি অভ্যাসমত কাজ করে' গেলেও মায়ার মন যেন কানায় কানায় ব্যথায় ভরে' উঠ্‌ছিল। সে যেন আজ দু'বছরের দিনগুলা মনের ওপর মেলে ধরে' একটা দেওয়া-নেওয়ার হিসাব মিলিয়ে নিতে চাইছিল।

মায়ের দেওয়া শিক্ষায় যে সহজ আনন্দভরা মন নিয়ে সে প্রথম এ বাড়ীতে পা দিয়েছিল, শঙ্কার কালো মেঘের আড়াল থেকে সেই মনটাকে মায়া আর খুঁজে পাচ্ছিল না। চিন্তামগ্না মায়া হঠাৎ চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌লে মাতু ঠাকুরুণ দরজায় দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন—'কই বৌমা, তোমার শাশুড়ী কই গো

মায়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে বঁটিটা রাখ্‌তে করে' উঠে এসে মাতু ঠাকুরুণকে প্রণাম কর্‌লে। একমুখ হেসে মায়ার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বল্‌লেন—'জন্ম-এয়োস্ত্রী হও মা!'

মায়া তাড়াতাড়ি বুকের ওপর একখানি আসন পেতে দিলে। মাতু ঠাকুরুণ বল্‌তে লাগ্‌লেন—'বউ বুঝি বাড়ী নেই? তবে আসন কেন পাত্‌ছ মা, তুমি তো আর কথা বল্‌বে না, একা আর বসে' কি কর্‌বো?' পেছন থেকে মিত্র গিন্নি উত্তর দিলেন—একা আর বস্‌তে হবে না, এই আমি এসে পড়েছি ঠাকুর্ঝি!'

মাতু ঠাকুরুণ মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন—'আজ কাপড় কাচ্‌তে যে এত দেরী বউ?'

মায়ার হাত থেকে শুক্‌নো কাপড়খানি নিতে নিতে গিন্নি বল্লেন—'কাল সন্তোষ কলকাতায় আস্‌বে (যাবে), হঠাৎ আজ দুপুরে বল্লে। গাড়ী কাল দশটায়, তার আগে এখানে তো বাজার বস্‌বে না, তাই একবার ওপাড়ায় গিয়েছিলুম কারো বাড়ী যদি মাছ জেয়ানো থাকে জান্‌তে। তা নওগিন্নির ছিল দুটো কই মাছ, কত খুসি হ'য়ে দিতে চাইলে; এসে ক্ষেমিকে দিয়ে আনিয়ে নিলুম। সব সময়ই প্রায় আমার বাড়ীই তিন তিন মাছ থাকে জেয়ানো: কি করে' জান্‌বো বলো, মাছগুলো মরে' যাচ্ছিল তাই সেদিন

বলতে হাঁপাতে। আবার কাল বিশু ছেলেকে বোলে পাঠাতে হবে। বোস' ঠাকুর্ঝি,—দাঁড়িয়ে রইলে যে!'

মাতু ঠাকরুণ মায়ার পাতা আসনখানির ওপর গিয়ে বসলেন। মায়ার হাতে ছাড়া-কাপড়খানি দিয়ে গিন্নি গিয়ে সুখে বসলে তিনি বললেন—'সন্তোষ তোমার সেদিন না এলো, এরি মধ্যে আবার কলকাতায় কেন যাবে?' গিন্নি বেশ একটু গর্বের সুরে বলতে লাগলেন—'সেখানে সব বড় বড় লোকের ছেলেদের সঙ্গেই ওর বন্ধুত্ব কিনা, তারা সব চিঠি দিয়েছে কি থিয়েটার করবে, ও না থাকলেই নাকি চলবে না। সব দিকেই বাছার আমার সমান বিদ্যে, সবাই ওকে মানে। সেই সব জজ-ব্যারিষ্টারদের বাড়ী বড় বড় লোক ঢুকতে পারে না—সেখানে অত আদর পাওয়া তো যার-তার কর্ম নয়!'

মাতু ঠাকরুণ গম্ভীর মুখে বললেন—'কি জানি বউ, আমরা সব পাড়াগাঁয়ের মানুষ, আমাদের অমন বিদ্যের মন ভরে না। সোমত্ত ছেলে-বউ ঘরকন্না করবে তাই আমাদের ভালো লাগে। যত বিদ্যেই থাক্, বারমাস ছন্নছাড়া নিয়ে বিদেশে পড়ে' থাকা আমাদের ভালো বলে' মনে হয় না, ঘরে অমন লক্ষ্মীবউ, তা দু'দিন ঘরের তলায় মাথা রাখে না।'

গিন্নি বিরক্ত মুখে বলেন—'লক্ষ্মী বউ? আর বাছা বোল' না ঠাকুর্ঝি! বউই যদি মনের মতন হোত তবে কি আর বাছা বিদেশ বিভূঁয়ে বারমাস পড়ে' থাকে? সেই তো আমারও দুঃখ!' একটু বিস্মিত ভাবে মাতু ঠাকরুণ বলেন—'সে কি! অমন পিতিমের মত রূপ, কাজে কর্মে খাসা বউ মনের মত নয়?' গিন্নি বিজ্ঞ ভাবে উত্তর দিলেন—'আজ-কালকার ছেলেরা কি আর অমন মুখটেপা মিন্‌মিনে মেয়ে পছন্দ করে? ও বলে, ওর সব বন্ধুদের বউরা গানে বাজনায় লেখায় পড়ায় তৈরী, তার কাছে কি ছোট বৌমা!—দুটো কথা বলতে পারে না মুখ তুলে'। নামে সহরে মেয়ে; আমাদের সব পাড়া-গাঁয়ের মেয়েরা ওর চেয়ে ঢের চটপটে চালাকচতুর। এ বউ কিছু নয়,—ও মেয়ে কি আর আমার সতুর ঘুগ্যি! কিসের সুখে ছেলে বাড়ী থাকবে বলো?'

মাতু ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—'তা দেখে শুনে অমন মেয়ে আনলে কেন, মেয়েটাও এখন দুঃখ পাচ্ছে—বড় হয়েছে, বোঝে তো সবই?'

গিন্নি তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন—'ওর আবার দুঃখ কি বলো, আমার বাড়ী কোন্ অভাবটা আছে? মা-সোহাগী মেয়ের বাপের বাড়ীর জন্যেই প্রাণটা পড়ে' থাকে, সোহাগীর কথা তো ওর ভারী ভাবনা কিনা! ছেলের আমার মনের সুখ হোল না, অমন ছেলে ক'টা হয় বলো? তা আগে কি জানি বলো, সতীশ বলে, দেখতে শুনতে ভালো, এক মেয়ে, বাড়ীঘর টাকাকড়ি সবই পরে পাবে। তাই আর অমত করলুম না। তখন যদি জানতুম তবে কি ছেলের জীবনটা দুঃখে ভরে' দিই টাকার লোভ করে'? আর, একেবারে যে মাটির দেবতা! কি করেই বা জানবো বলো কলকাতার মেয়ে একেবারে ছাই—এ আর কে ভাবতে পারে?'

মাতু ঠাকরুণ কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মায়াকে আসতে দেখে চুপ করে' গেলেন। মায়ার দিকে চেয়ে চোখদুটি তাঁর মমতাকোমল হ'য়ে উঠলো। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে তিনি চোখদুটি ফিরিয়ে নিলেন।

গিন্নি মায়াকে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার কাজ হয়েছে?'

মায়া মাথা নেড়ে জানাল—'হাঁ।'

গিন্নি বললেন—'গণ্ডা চারটে নারকোল ছাড়িয়ে দিয়ে গেছে?'

মায়া তেমনি মাথা নেড়ে জানালে—'হাঁ।'

গিন্নি বললেন—'যাও সেই নারকোল ক'টা কুরে নিয়ে আর সের খানেক তিল বা'র করে' বেশ করে' ভেজে মুচে নিয়ে খানকতক চন্দ্রপুলি আর গোটা কতক তিলের নাড়ু করে' ফেলগে। আর বাঁশীর মা খানিকটা দুধ দিয়ে যাবে সেটা ক্ষীর করে' ক'খানা পোকুলপিঠে তৈরী করগে। ক্ষেন্তিকে বলো—দুধের ঘরের কাঠের উনুনটা জ্বেলে দিক্।'

মায়া চলে' গেল। মাতু ঠাকরুণও আস্তে উঠে বললেন—'যাই বউ, রাত হ'য়ে গেল।'

সঙ্গে সঙ্গে গিন্নি উঠে বলেন—'এসো ঠাকুর্ঝি! আজ বড় ব্যস্ত, দু'দণ্ড বসে' কথা বলবারও সময় নেই। সতুকে তো এবার কিছুই খাওয়াতে পারলুম না; পোড়া মন বোঝে না, যেগুলো সহরে পাওয়া যায় না সেগুলো করে' দেই, গাড়ীতে খাবে বাছা। সময় তো নেই আজ, তাই তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলুম না। দেখি সময় যদি পাই কাল-পরশু যাব তোমাদের পাড়ায়। যে সংসার হয়েছে আমার,

যেটা না দেখবো সেটা আর হবে না। বড় বৌমার তো ছেলেমেয়ের অসুখ লেগেই আছে!—নিজের নাওয়া খাওয়া, তাই তার হয় না সময়ে; আর ছোট বউ তো দু'বছরের খোকানিতে মানুষ হোল না,—দুঃখ কি কম? দু'দণ্ড ঠাকুরের নাম কর্ত্তে পাই না—'

গিন্নির মুখ আর বন্ধ হয় না দেখে মাতু ঠাকরুণ একটু হেসে 'তাহ'লে যাই, সময় পেলে যেও' বলে' চলে' গেলেন। গিন্নি সেখানে বসে' শুধুহাতে আচমনের ভঙ্গীতে মুখের কাছে তিনবার হাতটা নেড়ে জপে বসে' গেলেন।

একটু পরে রাধী এসে সেই জকের ওপর বসতেই তিনি বল্লেন—'হ্যাঁরে, সেই কোন্ সকালে দুটি ভাত মুখে দিয়ে বাপেদের বাড়ী গেচিস্ আর রাত হ'য়ে গ্যাল ক্ষিদে তেষ্টা নেই?' রাধী হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—'তুমি তো মা সবই জান! আমি বিকেলে বাড়ী এসে ছোট বৌদির কাছে চুল বেঁধে জল খেয়ে গেছি, তুমি তখন ওপাড়ায় ছিলে।'

গিন্নি আবার তেমনি আচমন করে' জপ করতে লাগলেন। রাধী চেঁচিয়ে বল্লে—'ও বৌদি, এক গেলাস জল আর দুটো পান দিয়ে যাও তো।'

মান্না তখন সবে তিলের কাইটা বিনাখালো পাথরে ঢেলে পাকাতে সুরু করেছে, এমন সময় রাধীর ডাক শুনে সে ভয় পেলে। এখনি না পাকিয়ে নিলে কাই সব শক্ত হ'য়ে যাবে—নাড়ু আর পাকানো যাবে না। আবার এখনি পান, জল না দিলেও শাশুড়ী বকবেন! একটু ইতস্ততঃ করে' মান্না উত্তর দিলে—'একটু পরে যাচ্ছি ভাই ঠাকুর্ঝি!'

মৃদু কোমল কণ্ঠের এই কথা ক'টি আবার গিন্নির জপে বিঘ্ন ঘটালে; তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে' উঠ্লেন—'কেন গো বড় মানুষের মেয়ে এখন তোমার সুবসৎ নেই? সারা দিন তো বাড়ীই ছিল না, এখন একটু তেষ্টার জল চাচ্ছে তা হকুম হোল একটু পরে! এত মেজাজ কেন শুনি?'

ভয় ভীত কণ্ঠের উত্তর এলো—'তিলের কাইটা যে শক্ত হ'য়ে যাবে মা!' রাধী ফিস্‌ফিস্ করে' বল্লে—'ওটা অছিলে মা! ছোট বৌদি আজকাল আমার কথা শুনতে চায় না, ভাবে—বুঝি অপমান হবে।' গিন্নি তেমনি চাপা গলায় বল্লেন—'ও সব ওই বড় বৌয়ের শিক্ষে। সে নিজে যেন সতীপনা হাত করে' কাউকে আর মানতে চায় না, ওকেও তেমনি কর্ত্তে চায়। সন্তোষ আমার সে ছেলে নয়, আসুক (থাক্) তো কাল বাড়ী থেকে, তারপর ও-বউকে আমি ঠিক করবো—দেখি বড় বৌ ওকে কত বাঁচায়!'

মান্না তার দোতলার ঘরটির জানলায় দাঁড়িয়ে দূরে মাঠের বুকে এলিয়ে পড়া যে সড়কটি ধরে' সন্তোষের গাড়ীখানি এইমাত্র চলে' গেল, সেই দিকে চেয়ে ছিল।

যার বন্ধনে বন্দিনী সে, তার গমনপথটির পানে চেয়ে তার মন আজ জানতে চাইছিল—আর কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, সে ঐ আসা যাওয়ার পথ চেয়ে মুক্তির পদধ্বনির প্রতীক্ষা করবে!

অনেকক্ষণ পরে নিম্ন গিন্নির গলা শোনা গেল—'অ বৌমা!'···

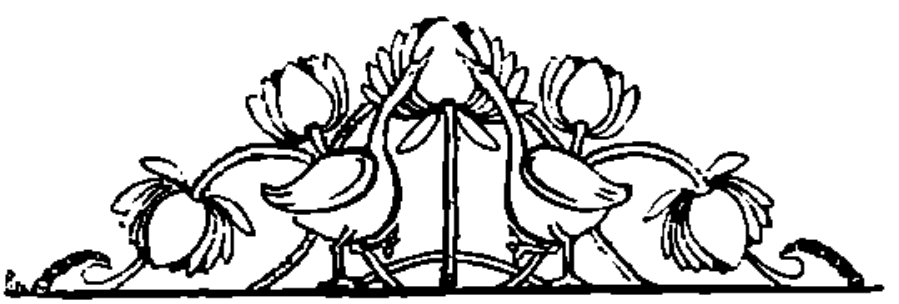

ঊষা

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

উপলখণ্ডের নিটোল থালে সাজিয়ে আবীর রাঙা,
নীলের ডালা
সাজিয়ে অলক্তকে, আমার ঊষা
ঐ যে আসে—দীপ্ত প্রবাল-ভূষা,—
নবপ্রাতা
মন্দাকিনীর স্বর্ণসুধা-নীরে,—
নব আঁখির পাতা !

ধীরে ধীরে
ঐ যে আসে পূর্ব্ব দুয়ার খুলে'—
আকাশ-ভরা ছড়ায়ে কনক-চুলে।
নীহার-কণা —মন্দাকিনীর বারি
পড়ছে ঝরে' আঁচল চুঁয়ে তারি।
কূজন-কলস্বরে,
বনে বনে পল্লব-মর্ম্মরে,—
ধ্বনিত তার মধুর মুখর চরণ-নূপুর-ধ্বনি,
বলয়-রণরণি।

প্রচুর রাশি রাশি
ফুলের মুখে অনুরাগের হাসি।
হাওয়ার ভেসে ভেসে
এসে
নিশ্বাস নির্ম্মল,
পল্লবাগে গন্ধে জাগে বহু শতদল।

নবপ্রাতা ;—বায়নি ধুয়ে কিন্তু
ললাট-তটের চন্দনেরি বিন্দু
সকলখানি তবু তাহার,—ঐ যে তারে লেখা
অস্ত-শশীর অর্দ্ধ উজল-রেখা।

ঊষা আসে পূর্ব্ব-দুয়ার খুলে,'—
আলোক-আঁচল অনিল-ভরে দুলে !
গগন, ভুবন আলোয় আলোকময়...
হৃদয়-দুয়ার দিলাম খুলে'—আমারো হৃদয়
আলোক-স্রোতে ভেসে গেল।
আকাশ হ'তে নেমে,
প্রেমে
ঊষা আমার হিয়ার মাঝে এল !

হাসি

শ্রী ললিতা সেন

ভাঁড়ের ভাঁড়ামি, রসিকের রসিকতা, নির্ব্বোধের অজ্ঞান নির্ব্বুদ্ধিতা আমাদের হাসায়।—Circusএর clown দর্শকদের হাসায়। যাহা দেখিলে আমাদের হাসি পায়—অতিদীর্ঘ কিম্বা ক্ষীণদেহ, বা অতি স্থূলকায়ও আমাদের হাসির কারণ। বেহুরের সঙ্গীতচর্চ্চায়, বিপুল দেহভারাক্রান্তের ললিত নৃত্যের উদ্যমে, বয়স্কের শিশুসুলভ চাপল্যে আমাদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। মানুষের অদ্ভুত বিশেষত্ব বা মুদ্রাদোষ দেখিলে আমরা হাসি,—তাহার ব্যঙ্গানুকরণ আরও হাস্যকর। অনেক সময় আমরা অসম্ভব এবং অত্যন্ত অদ্ভুত অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া হাসিয়া থাকি। একবার শান্তিনিকেতন আশ্রমের আনন্দবাজারে একটি লটারীর দোকানে কতকগুলি ছবি বিক্রয় করা হইয়াছিল। ছবির বিষয়গুলি ছিল অত্যন্ত কৌতুকাবহ —হিরণদি'র ঘুট পরিয়া ফুটবল খেলা,অপূর্ব্বানন্দ বাবুর মোটর বাইক, চিত্রকর নন্দলাল বাবুর পায়ের নূপুর, কলাভবনের মাসিমা সুকুমারী দেবীর highheel shoe, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সিগারেট কেস্, জনৈক দা'র কবিতার খাতা,—এই প্রকার আরও অনেক ছবি। ছবিগুলি দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া যে-কোন-লোকের হাস্যসংবরণ করা প্রায় অসাধ্য। এইরূপ নানা উপলক্ষে আমরা হাসি। কিন্তু ইহার তলায় কি কোন গূঢ় কারণ নাই? হাসা কি কেবল মানুষের খেয়াল? নিতান্ত খেয়ালের বশেই মানুষ হাসে,—মনের গোপন কক্ষে তাহার হাসির কি কোন কারণই লুক্কায়িত থাকে না?

জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সকলই আজকাল পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। তাঁহারা প্রত্যেকটি বিষয়কে বিশ্লেষণ করিয়া, নানারকম পরীক্ষা করিয়া, তাহার মূলতত্ত্বটি জানিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টার অন্ত নাই,—কত পরীক্ষা, কত মতভেদ, কত বিশ্লেষণ!—বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার একটি বিষয় হইতেছে মানুষের হাসি।

হাসি প্রধানতঃ দুই প্রকারের—উচ্চহাস্য ও স্মিতহাস্য। বস্তুতঃ হাসি জিনিষটিই এত সূক্ষ্ম, জটিল ও রহস্যময় যে ইহাকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে কোন অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক ঘটনা বা বস্তু দেখিলেই মানুষ হাসে। খ্যাতনামা ফরাসী পণ্ডিত Bergson হাসি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষ হাসে সেখানেই যেখানে সে দেখে জড়ের নিকট প্রাণ পরাজিত।" আমরা দেখিব সকল ক্ষেত্রেই একথা বলা চলে কি না।

উচ্চহাস্যের মধ্যে একপ্রকার হাসি আছে যাহা কলুষলেশহীন পবিত্র মনের নির্ম্মল আনন্দ হইতে উচ্ছ্বসিত। তাহার মধ্যে কোন গ্লানি অনুভব করা যায় না,—সে হাসি মনের সকল বিষাদ, আবিলতা সমস্ত দূর করিয়া দেয়। পরিহাসের হাসিতেও কিছুটা এই ভাব লক্ষ্য করা যায়। যেখানে অনেকে একত্র মিলিত হইয়া বসেন, সেখানে সাধারণতঃ নানাপ্রকার কৌতুক-পরিহাস হইয়া থাকে। কিন্তু যখনই সেই পরিহাসের মধ্যে কাহারও প্রতি বিদ্রূপ বা শ্লেষাত্মক কোন ভাব প্রবেশ করে তখনই তাহার নির্ম্মলতা আর থাকে না। যে পরিহাসে আঘাত আছে, তাহা, যাহাকে আঘাত করা হয় তাহার বেদনার স্থান। সেই পরিহাসে সকলে হাসিতে পারে কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দ অনুভব করিতে পারে না।

হাসির আর একটি দিক আছে—সাহিত্যের হাস্যরস। লেখক অনেক-সময় তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া পাঠককে হাসাইতে চেষ্টা করেন। এই কাজটি একটু আয়াসসাধ্য। মনের ভাব মুখে প্রকাশ করা অনেক সময়েই সহজ। কিন্তু তাহা, বিশেষতঃ যে সকল ভাব হাস্য উদ্রেকের জন্যই প্রকাশ করা হইতেছে, সে সকল ভাব লিখিয়া প্রকাশ করিতে একটু

বিশেষ নৈপুণ্য চাই। এইজন্য কৌতুকপূর্ণ রচনা লিখিতে গেলে তাহার প্রধান কাজ—বিষয় নির্ব্বাচন। লেখককে প্রথমে দেখিতে হইবে সাধারণতঃ কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিলেই সকলে হাসিবে। এইখানে অধিকাংশ লেখকই Bergsonএর মতের অনুগামী। যাঁহারা সুলেখক এবং সুরসিক তাঁহাদের সহজ জ্ঞানের দ্বারাই হউক বা স্বাভাবিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারাই হউক বা যে কারণেই হউক, কেমন করিয়া যেন মানবচরিত্র তাঁহাদের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে জীবনের বিচিত্র গতির মধ্যে কোথাও একটু জড়ত্ব যেই মানুষের চোখে পড়ে, তখনই সে আপনা হইতেই হাসিয়া উঠে। ইহা লক্ষ্য করিয়া মানবচরিত্রের বা মানবসমাজের যাহা কিছু ত্রুটি, যাহা কিছু জড়ত্বের পরিচয় দেয়, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহারা রচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সুকুমার রায় প্রভৃতি এবিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর', রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' প্রভৃতি অনেক রচনাই, এবং শিশুসাহিত্যে সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' সাহিত্যজগতে হাস্যরসের জন্য প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই এমন বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন যাহাতে সহজেই হাস্য উদ্রেক করে। যেমন। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোলে'—

"রামগরুড়ের ছানা,
হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা বল্‌লে, বলে, 'হাস্‌ব? না, না, না, না'।"
—ইত্যাদি।

আমাদের সমাজে একদল লোক আছেন, যাঁহারা বিষয়কর্ম্ম লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত,—বাহিরের কোন রঙ্গ-রসিকতা, আমোদ-প্রমোদে মন দিবার অবসর তাঁহাদের নাই। নিতান্ত নীরস, শুষ্ক প্রকৃতির মানুষ তাঁহারা (ইংরাজীতে যাহাকে বলে matter of fact)। তাঁহাদের মধ্যে স্ফূর্ত্তির অভাব, প্রাণ সেরূপ স্বচ্ছন্দপ্রবাহিত নহে। প্রাণের এই গতিরোধ, এই পরাজয়ই মানবচিত্তকে হাসায়। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই প্রায় এই ধরণের বিষয় লইয়াই তাঁহাদের কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

প্রাচীন হাস্যরসপ্রধান সাহিত্যের মধ্যে গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলিই বেশী প্রচলিত। কিন্তু অধিকাংশের মধ্যেই শ্লীলতার অভাব। ভদ্রসমাজে ঐ গুলির আলোচনা করিতে আপনা হইতেই মনে সঙ্কোচ আসে। সেইজন্য ঐ গুলি আধুনিক সাহিত্যে স্থান পাইবার অযোগ্য।

যাহা হউক এতক্ষণ উচ্চহাস্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন স্মিতহাস্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। অনেকের নিকট এরূপ শুনা যায় যে যাহারা উচ্চহাস্য করে না, তাহাদের মন নিখাদিল নহে। ইহা নিশ্চয় যে হাসি আমাদের মনের ভাব অনেকখানি প্রকাশ করে। আমার মনে হয় যে উচ্চহাস্য অপেক্ষা স্মিতহাস্যই মনের বিচিত্র ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ। এরূপ দেখা গিয়াছে যে কেহ হয় ত সাধারণতঃ উচ্চহাস্য করে না—কিন্তু তাহার প্রফুল্ল মুখের মৃদু শুভ্র হাসিটিই চিত্তে আনন্দের শিহরণ জাগাইয়া তোলে, সূর্য্যের মৃদু কিরণপাতে পুষ্পের আনন্দপুলকের মত। সেই হাসিটি যে চিত্তের পরিচয় দেয়, তাহাকে কি কোন অংশে দেহ বলা চলে?

এখন দেখিব সাধারণতঃ আমরা কি কারণে স্মিতহাস্য করি,—তাহার পর, সকল প্রকার হাসি সম্বন্ধেই Bergson-এর মত প্রচার করা চলে কি না তাহা বিচার করিব।

শিশুর মুখে স্মিতহাস্য দেখিতে পাই, কিন্তু সে যে বিশেষ কোন কারণে হাসে তাহা বলা যায় না। অবশ্য এ কথা যদি কেহ বলেন যে পৃথিবীর সকল কলুষ এবং পাপস্পর্শমুক্ত শিশুর অন্তরাত্মা আপনার অজ্ঞাতেই মানবের ত্রুটি দেখিয়া হাসে, তবে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। উহা বিচার করিবার সামর্থ্য আমার নাই। সাধারণ লোকে মনে করে যে শিশু অকারণ বা পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আনন্দেই হাসিয়া থাকে।

বয়স্ক ব্যক্তির হাসির মধ্যে এক প্রকার হাসি আছে—এক একজনকে দেখা যায় শুধু একটি সুস্মিত হাসিতেই সাদরে অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া লয়। সেই হাসিটিও কি Bergsonএর মতানুযায়ী? অনেক সময় কাহারও কাহারও মুখের উপর একরূপ অদ্ভুত হাসি খেলিয়া যায়—দেখিবামাত্র বুঝা যায় যে মনে মনে কাহারও দুরবস্থা পরি-কল্পনা করিয়া ঐ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্থলে বলা যায়

যে, যে হাসিল, সে মনের অজ্ঞাতে ঘাড়ের নিকট প্রাণের পরশ দেখিয়াছিল—তাই সে হাসিয়া উঠিল। লজ্জা বা সঙ্কোচের হাসিকেও এদিক দিয়া ঐ শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় এমন অনেক হাসি দৃষ্টিগোচর হয়, যাহার সম্বন্ধে Bergson-প্রদত্ত কারণটি প্রয়োগ করা অসম্ভব।

হাসির যে কারণগুলি লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে উহার সবগুলিই মানসিক। আমাদের হাসি প্রকাশ পায় দেহযন্ত্রের ভিতর দিয়া। আমাদের সমস্ত শরীরে বিচিত্র রকমের muscle system আছে। স্নায়ুগুলি ঐ মাংসপেশীর সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন। স্নায়ুগুলির কতকগুলি অন্তর্মুখ, কতকগুলি বহির্মুখ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল প্রকার শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির সংবাদ ঐ অন্তর্মুখ স্নায়ুগুলি আমাদের মস্তিষ্কে লইয়া যায়। সেই অনুসারে যাহা করিতে হইবে, বহির্মুখ স্নায়ুগুলি আবার মাংসপেশীগুলিকে সেই আদেশ দেয়। মাংসপেশীগুলি যেন কতকটা আপনা আপনিই তাহা করিতে থাকে। শরীরের কোন কোন অংশে সেগুলি এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট যে সহজেই সাড়া দেয়। সেই সকল জায়গায় বাহির হইতে কোনপ্রকার স্পর্শ লাগিলেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠে এবং তখনই হাসিতে বাধ্য হই। পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলে আমাদের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা প্রায় সকলেই জানেন। গায়ে সুড়সুড়ি লাগিলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকেই হাসিতে বাধ্য হন। "আবোলতাবোলের" কাতুকুতু-বুড়োর নিতান্ত ইচ্ছা সে সকলকে হাসায়। কিন্তু তাহার কেষ্টদাসের পিসীর গল্প শুনিয়া যখন কেহ হাসিল না, তখন সে চোরাও অনন্যোপায় হইয়া পালকের সুড়সুড়ি দিয়া সকলকে হাসাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

একরকম gas আছে, তাহা, যে muscle systemএ আঘাত লাগিলে আমরা হাসি তাহাকে অতি সহজেই উত্তেজিত করে। উহাকে বলে laughing gas. ঐ gas নিশ্বাসের সহিত একটুও যদি শরীরে প্রবেশ করিতে পারে তবে আমাদের nerveগুলিকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। সে সময় যে কোন লোকের পক্ষে না হাসিয়া থাকা অসম্ভব।

Tear gasও ঠিক এইভাবে কাঁদাইতে পারে। ইউরোপে উহার জনতাকে শান্ত করিবার জন্য অনেক সময় আজকাল এই দুই প্রকার gas ব্যবহৃত হয়। উহার জনতার মাঝখানে ঐ gasপূর্ণ একটি বোমা ছুঁড়িয়া মারিলে উহা বিদীর্ণ হইয়া সমস্ত বাতাসে gas ছড়াইয়া যায়। যখন সকলে হাসিতে হাসিতে কিংবা কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই অবসরে পুলিশ অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া চলিয়া যায়। Tear gasই এই সকল ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত হয়।

কাহারও কাহারও স্নায়ুসন্নিবেশ এত sensitive যে অতি সামান্য অভিঘাতেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে বারবার ঐরূপ হইতে হইতে হাসি সংযমের বাহিরে চলিয়া যায়। সামান্য কোন কারণ পাইলেই হাস্যরোধ করা মনের সাধ্যাতীত হইয়া উঠে এবং বহুক্ষণ ব্যাপিয়া হাসি কেবলি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে। তখনই উহাকে hysteria রোগ বলা হয়। পাগল অনেক সময় বিনাকারণে অর্থহীন হাসি হাসে। তাহারও খানিকটা ঐ একই কারণে। সাধারণতঃ মানসিক আঘাত হইতেই উহার উদ্ভব। আমাদের মনের উপর আচম্বিতে কোন আঘাত লাগিলে তাহা আমাদের nervous systemকেও আঘাত করে। যেমন কেহ হয় ত কোন অন্যায় কাজ করিয়াছে—আকস্মিকভাবে সে যদি ধরা পড়িয়া যায় তবে তাহার মনে যে আঘাত লাগে তাহা হাস্যোদ্রেককারী nervous systemকেও স্পর্শ করে এবং সে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে হাসিয়া ওঠে। শোকের আঘাতেও অনেককে ঐরূপ হাসিতে দেখা যায়। কান্নার কারণও মানসিক বা শারীরিক আঘাত। বারবার শোক পাইয়া যে আর কাঁদিতে পারে না, তাহার ঐ প্রচণ্ড আঘাতের প্রকাশ হয় এই রকমের হাসিতে।

বিচিত্র রকমের এবং নানা অবস্থার হাসির কথা বলা গেল। ইহার মধ্যে আনন্দের যে হাসিটি তাহা আমাদের জীবনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। দুঃখ বা বিষাদ আমাদের মনকে চাপিয়া ফেলিতে চাহে,—তাহার ভার মনের পক্ষে দুর্বহ। নিজের জীবন সকলের কাছেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। কিন্তু যে ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া অসহ্য দুঃখকেও সহ্য করিতে বাধ্য হয়, সে অকাতরে আত্মহত্যা করিতেও ভয় পায় না। এইজন্য আনন্দ আমাদের জীবনের খুব একটি বড় সম্পদ।

Laughter is the sunshine of our life. সূর্য্যরশ্মি যেমন পৃথিবীর সমস্ত রোগবীজাণু এবং অন্ধকার দূর করিয়া তাহাকে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে, হাসির শুভ্র-সুন্দর আলোকপাতেও তেমনি আমাদের জীবন সমস্ত দুঃখ-শোক কাটাইয়া জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে। উহা আমাদের জীবনীশক্তিকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া তোলে। যে দরিদ্র বিধবা আপনার কঠিন দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, সে যদি দিনান্তে একবারও আপন শিশুপুত্রের আনন্দোৎফুল্ল মুখখানি দেখিতে পায় তবে সেই অল্পকালের আনন্দটুকুই তাহার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করিয়া রাখে,—তাহার অন্তরে অনেকখানি শক্তি আনিয়া দেয়,—তাহার সমস্ত দুঃখকে যেন আলোকিত করিয়া তোলে। অনেকে বলেন যে যিনি প্রাণ খুলিয়া খুব হাসিতে পারেন তিনি দীর্ঘায়ু। ইহা খুব সত্য কথা। কাহারও কাহারও একপ ধারণা আছে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রাণ খুলিয়া হাসেন না। ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সরল, সুমিষ্ট উচ্চহাস্য যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা কখনই সেরূপ বলিবেন না।

যে কোন পদার্থের সংকোচন তাহার মৃত্যুর লক্ষণ। প্রাণবান সকল জিনিষের মধ্যেই আপনাকে বিস্তৃত করিবার, বিকশিত করিবার একটি প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। কুঁড়ি আপনাকে ফুটাইয়া তুলিয়া, আপনাকে বিস্তৃত করিয়াই বাঁচে। হাসি যে শুধু আমাদের মনের প্রসারতা সাধন করে তাহা নহে, হাসিলে আমাদের শরীরও কিছু পরিমাণে প্রসারিত হয় ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এইজন্য হাসিকে বলা হইয়াছে tonic of life.

হাসি মানুষের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া স্বভাবতঃই সে উহার প্রতি আকৃষ্ট। সারাদিনের পরিশ্রমের পর মানুষ এমন কোন স্থান বা সঙ্গ চায় যেখানে সে হাসিতে পারে। ইহার মূল কারণ ক্লান্ত মনের ক্লান্তি দূর করা। সেই সময়ে যদি খুব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কিছু তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তাহা সারগর্ভ হইলেও মনকে তৃপ্তি দান করে না। সন্ধ্যাবেলা মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তি দেয় হাস্যরসপূর্ণ গল্প বা অভিনয়। তাই ঐ সকল বিষয়েরই খুব সমাদর অধিকাংশ লোকের কাছে। সন্ধ্যা বেলা যে বাড়ীতে হাসিগল্প হয় বেশী সেই বাড়ীতেই লোক-সমাগম হয় বেশী। ইহাই মানুষের স্বভাব। Cinema houseএ যেদিন বিশেষ কোন কৌতুকপূর্ণ চিত্র দেখান হয় সেদিন সেখানে স্থান-সঙ্কুলান অসম্ভব। জগদ্বিখ্যাত সুনিপুণ comic অভিনেতা Charlie Chaplin এবং Harokl Lloyd নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, অদ্ভুত কথাবার্ত্তা, চালচলনে অবলীলাক্রমে জনসাধারণকে এত হাসাইতে পারেন যে অভিনয়জগতে কখনই তাঁহাদের অভিনয়ের সমাদরের অভাব হয় না। এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রসিক লোকের সমাদর সর্ব্বত্র। ইহার একমাত্র কারণ মানুষ হাসিতে চায়,—হাসির পোষাক নিজের ভিতরে না থাকিলেও সে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে।

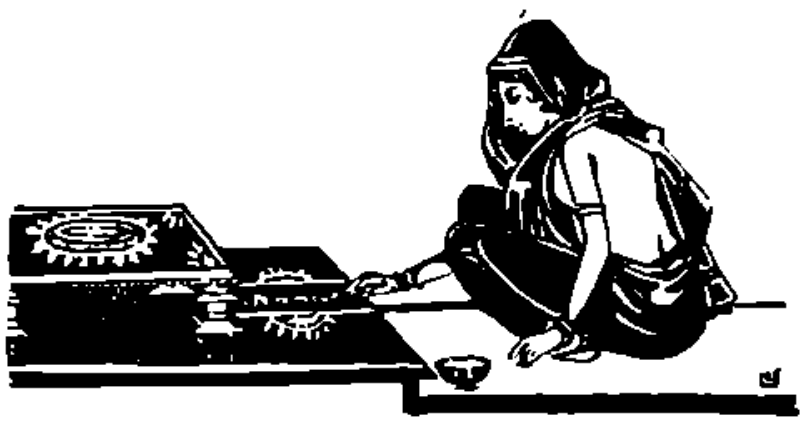

বাহিরের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

সেফিল্ড

সেফিল্ড—ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে রেলপথে ৪৩ মাইল। আমরা স্বামী-স্ত্রী সেফিল্ডে পৌঁছলাম দিনের বেলাতেই। ম্যাঞ্চেষ্টারের দুরবস্থার পর আর কোথাও পারতপক্ষে রাত্রে পৌঁছব না স্থির করে' রেখেছিলাম ;—তাই সেফিল্ডে দিনে পৌঁছে, লগেজরুমে জিনিষপত্র রেখে, প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করে' সহর দেখ্‌তে বের হলাম।

গুপ্ত এবং মাধু তখন সেফিল্ড তাঁদের এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে এসেছিল। আমরা ইচ্ছা করেই তাদের পূর্ব্বে কোন সংবাদ দিই নি এবং তথায় পৌঁছেও তাদের কোন খোঁজ খবর নিই নি। তাদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট তারিখে লণ্ডনে একত্র হ'য়ে কন্টিনেণ্ট (Continent) বেড়াতে যাব এরূপ ইতিপূর্ব্বেই স্থির হ'য়ে ছিল।

উৎকৃষ্ট ছুরি কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য সেফিল্ড বিখ্যাত। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সেফিল্ডে তেমন খুব ভাল ষ্টীল প্রস্তুত হ'ত না—সুইডেন্ ও স্পেন থেকে উৎকৃষ্ট ষ্টীল

ফেনাক্তিস্তম্ভ

এনে তদ্দ্বারা এখানে ছুরি কাঁচি প্রভৃতি তৈরী কর্‌তে হ'ত। সুইডেনের ষ্টীলের মতন ষ্টীল তখন আর কোথাও জন্মাত না। বহু চেষ্টার পর হেনরি বেসিমার নামক এক ব্যক্তি অল্পব্যয়ে উৎকৃষ্ট ষ্টীল প্রস্তুতের এক সহজ উপায় আবিষ্কার করেন, এবং সেফিল্ডের ধনীদিগের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে উহা প্রস্তুত কর্‌তে আরম্ভ করেন। ইহাতে ষ্টীল প্রস্তুত ব্যবসায়ে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বত্র

উদ্ভিদ-উদ্যান

ইস্পাতের খান করে' যায়। আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে এই ইস্পাতের নাম হয় বেসিমার ইস্পাত। আজ পর্য্যন্ত সেফিল্ডে এই বেসিমার ইস্পাত যথেষ্ট প্রস্তুত হ'চ্ছে। ক্রমশঃ অধিকতর উন্নত প্রণালীতে ইস্পাত তৈরী করে' আমেরিকা ইস্পাত মার্কেট অধিকার করে' নেয় নেয় এরূপ অবস্থা ঘটে,—এ ছাড়া যুদ্ধজাহাজের জন্য পুরু প্লেট এবং বড় বড় ইঞ্জিনের ও প্রেসের জন্য সকল রকম ঢালাই কাজ এখানে হয়। ইদানীং এখানে বাইসাইকেল, গ্রামোফোন এবং নিকেল-সিলভারের বাসনপত্র ও কাঁটাচামচ ইত্যাদিও তৈরী হ'চ্ছে। ইংরেজরা হাতে খাওয়া ভুলে গেছে—সেফিল্ডই

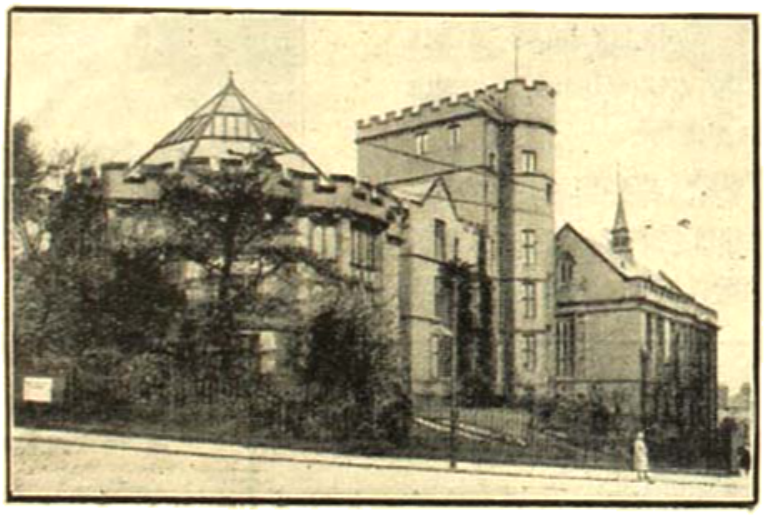

বিশ্ববিদ্যালয়

কিন্তু তার চেয়েও ভাল ইস্পাত প্রস্তুত করে' সেফিল্ড তার চিরন্তন খ্যাতি বজায় রেখেছে।

ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি, ক্ষুর, করাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, চাষ-আবাদ ও কাঠের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতি—এবং অস্ত্রচিকিৎসা ও অস্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ জন্য সেফিল্ড সমস্ত সভ্যজগতে পরিচিত। এদের হাত বা আঙুল—অর্থাৎ সেফিল্ডের কাঁটাচামচ না হ'লে এদের খাওয়া চলে না।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মার্ক ফার্থ (Mark Firth) নামক একজন নামজাদা ইস্পাত নির্ম্মাতা একটি কলেজ স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে কলেজের নাম হয় ফার্থ কলেজ। এই অঙ্কুর থেকেই সেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ও প্রসার।

এখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় শিক্ষার সুবিধা ত আছেই—অধিকন্তু সম্প্রতি স্থানীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে কয়লা, কাচ, লোহা, ভূতত্ত্ব ও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে নানা-প্রকার গবেষণা চল্‌ছে এবং তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ রিসার্চ লেবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া বাহিরের শিক্ষার্থীর জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। গরীব ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ফ্রি স্কুলও আছে।

রাঙ্কিন মিউজিয়াম নামে একটি মিউজিয়ামে নানারকমের চিত্র, মৌলিক ড্রইং, অনেক মূল্যবান পুস্তক, খনিজ দ্রব্য, গাছপালা ও মৃত জীবজন্তুর সংগ্রহ আছে।

সেফিল্ডের টাউন হল এবং উপাসনা-মন্দিরটি (Cathedral) বেশ সুন্দর। হাসপাতাল, আতুরাশ্রম ও বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখা গেল। গত জার্মান যুদ্ধে সেফিল্ডের যে সব লোক প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের স্মৃতি-স্তম্ভ (War memorial) স্থাপিত হয়েছে Weston পার্ক নামক একটি পার্কের ভিতরে।

সেফিল্ডের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। রাস্তাঘাট বাঁধানো। স্থানটি খুব পরিষ্কার না হ'লেও নোংরা নয়। আমরা সমস্ত দেখে শুনে পরদিন রেলযোগে বার্মিংহাম যাত্রা করলাম।

(ক্রমশঃ)

ভূত-ভারতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

চম্‌কাবেন না, সত্যি সত্যি ভূতের চিঠি নয়। সে বেঁচে থাক্‌তে লিখে তার এক বন্ধুর কাছে রেখে গিয়েছিল, বলে' গিয়েছিল, তার মৃত্যুর পর আমাকে যেন পাঠায়। সোরেবের এক গ্রাম থেকে তার এক বন্ধু চিঠিটি আমায় পাঠিয়েছে।

কোকোজী লিখেছে—

"আমার এ চিঠি তুমি যখন পাবে তখন আর এই পৃথিবীতে তোমাদের একজন হ'য়ে আমি থাক্‌ব না। এই চিঠিটির জবাব তোমার কাছ থেকে আশা কর্‌ব না, যে কথাগুলি লিখ্‌ছি সেগুলি তোমার মনের তারে কি সুরে বাজ্‌বে তা ভাব্‌বারও আমার প্রয়োজন থাক্‌বে না, অথচ লিখ্‌ছি। নিজের প্রতি অনেক কর্ত্তব্যই আমার অসম্পূর্ণ রইল, মরে' যাবার পরেও তোমরা বন্ধুরা আমার স্মৃতির প্রতি অবিচার না কর এইটুকু কাজ যাও আজ নিজের জন্যে করে' যাচ্ছি।

"আমার ভাব্‌তে ভালো লাগে যে মৃত্যুর পরেও কোনো-না-কোনো রূপে এই পৃথিবীর জল মাটি বাতাসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কটা বজায় থাক্‌বে। তোমাদের seanceএ বস্‌তে দেখে আমি ঠাট্টা করেছি, কিন্তু এটা ভাব্‌তে পেলে সত্যিই আমি খুসি হই যে এই যে আমার বিশেষ একটা ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি পৃথিবীতে বিকাশ লাভ করেছিল, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্যে সেটার মূর্ত্তি বদ্‌লে যাবে না। তোমাদের সেই seanceগুলোতে Walterএর মতো করে' বড় বড় তত্ত্বকথা বল্‌তে এবং তোমাদের তথ্যানুসন্ধানে সাহায্য কর্‌তে যাবার জন্যে আমার বিশেষ যে আগ্রহ আছে তা মনে কোরো না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তোমরা ক'বন্ধুতে এর পর যখন একসঙ্গে মিল্‌বে, নিজেদেরই অজান্তে নিজেদের চারপাশে আমার অভাবে একটা কিছুর অভাব অনুভব কর্‌বে, হয়ত যখন বুঝ্‌তে পার্‌বে ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে কর্‌বে, কোকোজী বেঁচে থাক্‌লে আজকের আড্ডাটা আরও জম্‌ত, —তখন যেখানে যে অবস্থাতেই আমি থাকি, তোমাদের

সঙ্গে মিশ্‌তে, তোমাদের মুখ দেখ্‌তে, তোমাদের কথা শুন্‌তে আমার প্রাণ ব্যাকুল হবে।

"মরণের সঙ্গে মুখোমুখি যাদের কোনোদিন পরিচয় হয়নি, জীবনে কোন্ জিনিসগুলো যে সত্যিকারের মূল্যবান্ তা বোঝা তাদের পক্ষে সহজ নয়। আজ পৃথিবীর কাছ থেকে মোটামুটি হিসাবে বিদায় নিয়ে এসে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, এই পৃথিবী ছেড়ে গিয়ে কোন্ জিনিসগুলোকে সত্যি সত্যি আজ বেশী miss কর্‌ব। আগে বুঝ্‌তে পারিনি যে, মানুষ সাধারণ দৃষ্টিতে যে জিনিসগুলোকে বহু মূল্যবান্ ব'লে মনে করে, মরণের কালো নিকষে সেগুলির কোন মূল্যই ওঠে না। আজ তাই এ ভেবে আমার কষ্ট হ'চ্ছে না যে, পৃথিবীতে এসে করবার মত আমার কিছু করা হ'লো না, দেবার মত কিছু দেওয়া হ'লো না, জীবনকে বহুধা বহুদিন ধরে' নানারকম করে' আমার উপভোগ করা হ'লো না, পৃথিবীর মানুষের স্মৃতির ফলকে নিজের নামকে অক্ষয় করে' আমি এঁকে রেখে যাচ্ছি না। আজ এ মনে করেও আমার কোনো ক্ষোভ নেই যে হৃদয়ের দিক দিয়ে সকলের সমস্ত দেনা-পাওনা আমার মেটানো হয়নি, কোনোরকম হিসাব-নিকাশের কোনো অর্থই সীমাহীন শূন্যতার সামনে দাঁড়িয়ে মনে আসে না। আজ পৃথিবীর যা কিছু আমার জীবনে এসেছে এবং যা কিছু আসেনি, তাদের সমস্তের চাইতে সন্ধ্যাবেলাকার আমাদের চার বন্ধুর সেই বিশ্রম্ভালাপের আড্ডাটি আমার চোখে বড় হ'য়ে উঠ্‌ল।

"বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার সম্মুখে প্রসারিত অনন্ত জীবনের মধ্যে আমার অনেক দেনা-পাওনার হিসাব মিটবে, বারে বারে চরিতার্থতার পথে নব নব জয়যাত্রার ভেতর আমার বিরাম থাকবে না, কিন্তু আমাদের সেই সান্ধ্য বন্ধুসিলে প্রতিদিন যে সহজ আনন্দ নিজে থেকে মূর্ত্তি ধরে' উঠ্‌ত একমাত্র তাই এ পৃথিবীতে আমার এই জীবনটির একান্তভাবে নিজস্ব জিনিস। অথচ তোমাদের সঙ্গে ক'দিনেরই বা আমার জানাশোনা, হৃদয়ের আদানপ্রদান কতটুকুই বা তোমাদের সঙ্গে আমার হয়েছে।

"আমি জানি আমার মৃত্যুর পর তোমাদের seance আমার বস্‌বে; তার পুরোপুরি অধিকার Walterএর হইল। পেন্সিল চেপে লিখ্‌তে কোনোদিন আমার ভালো লাগ্‌ত না, পরেও লাগ্‌বে না। কিন্তু এর পর আমাদের অর্থাৎ তোমাদের ক'বন্ধুর আড্ডাটি যখনই আবার জম্‌বে, আমার জন্যে একটা খালি চেয়ার সেখানে তোমরা রেখো। একটা গেলাসে আমার জন্যেও খানিকটা বিয়ার তোমরা ঢেলো, খানিকক্ষণ টেব্‌লে সেটাকে রেখে দিও, তারপর হাওয়া লেগে ফেন্‌সে হ'য়ে যাবার আগেই কেউ একজন সেটাকে খেয়ে নিও।

"তোমরা সকলে আমার জন্যে অনেক করেছ, তার জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ জানানো আমার উচিত, যদিও মাঝে মাঝে একথাও আমার মনে হয়েছে যে, যে-টাকাটা আমাকে বিয়ার খাওয়াবার জন্যে এবং নিজেরা খাবার জন্যে তোমাতে এবং Reggieতে মিলে খরচ করেছ তার খানিকটা পেলে আমি হয়ত কোনো একটা ভালো Sanatoriumএ গিয়ে সেরে আস্‌তে পার্‌তাম। আজ ত সে সব হিসাবের কোনো অর্থই আমার কাছে নেই, সে কথার আলোচনা করে' আজ আর কি হবে!

"তোমাদের প্রতি বহুদিন বহু আচরণে আমার রূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে; তোমাদের কাছে সেজন্যে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিন্তু আমি জানি, আমাকে ক্ষমা করেই তোমরা আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলে। আমার রূঢ়তার অর্থ যে কি তা বুঝ্‌তে পেরেছিলে বলেই ত তোমরা আমার বন্ধু। ও জিনিষটা আমার স্বভাবে কম ছিল, কিন্তু আমার অসুখ সুরু হবার পর ইউনিভার্সিটির কাজ ছাড়া থেকে সুরু করে' পদে পদে যে আমাকে মাথা নুইয়ে চল্‌তে হয়েছে, হার মান্‌তে হয়েছে, হাত পাত্‌তে হয়েছে, হীনতা স্বীকার কর্‌তে হয়েছে, তার দুঃখ সহ্য করার শক্তি আমার স্বভাবে আরও কম ছিল। মনে মনে যাদের কাছে নিজে থেকে আমার মাথা নত হ'য়ে থাকত বাইরে তাদেরই সনে বিরোধ করে' অকৃতজ্ঞতা দিয়ে রূঢ়তা দিয়ে সেই অবনতিকে আমি ঢাক্‌তে চেষ্টা কর্‌তাম। সে তোমরা জান্‌তেই। কিন্তু তোমরা এটা বোধহয় জান্‌তে না যে আমার নিজের ব্যবহারে যে ত্রুটি হ'ত, Phyllisএর সাহায্যে সেই ত্রুটি প্রতিবারেই আমি মিটিয়ে দিতে চেষ্টা কর্‌তাম। আমাদের সান্ধ্য বন্ধুসিলে সেইজন্যেই সারাক্ষণ তাকে আমি আমার কাছে রাখ্‌তাম। কেবলমাত্র

পুরুষের সঙ্গ পেয়ে কোনো মেয়ের আত্মবলিপ্সা তৃপ্ত হবার কথা নয়। এমন অনেক বিষয়ে আমরা আলোচনা করতাম যাতে যোগ দিয়ে তার কিছুমাত্র ভালো লাগত না, বা যাতে যোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবই হ'ত না, তবু এতদিনের মধ্যে একবারও সেই সাদা রুমালে তাকে তোমরা অনুপস্থিত হ'তে দেখনি। খুব ইচ্ছা করলেও, নিজের কোনো বন্ধুর সঙ্গে বাইরে খোলা হাওয়ায় একটু বেড়াতে যাওয়া, অথবা কোনোদিন ভালো একটা সিনেমা কিম্বা দেখতে যাওয়ার সুবিধাটুকু তার ছিল না, সেইটুকু লোভ পর্য্যন্ত তোমাদের জন্যে সে পরিত্যাগ করেছিল। তোমরা তার নাচ দেখতে ভালোবাসতে, ইচ্ছা অনিচ্ছায় তাকে নাচতে হ'ত। তোমাদের কোনো অনুরোধে কোনদিন সে না বলেনি। আমাদের মৌচাকটির মক্ষিরাণী জোর করে' তাকে আমি করেছিলাম,—তার অন্যকার কোনো মাধুর্য্যের প্রলোভন তার ছিল বলে' আমার মনে হয় না।

"আমার সেই অবমান সহনকুণ্ঠ দর্পিত স্বভাবই আজ আমার সকল প্রিয়জনদের থেকে দূরে, সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে সংস্পর্শবর্জ্জিত, এই সুদূর গিরিউপত্যকার নির্জ্জন নির্ব্বাসনে নিয়ে এসেছে। আমার এই অতিশপ্ত জীবনের শেষ দিন ক'টা আমার দুঃখভোগ দিয়ে আমার প্রিয়জনদের আনন্দকে আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। লোকে আমাকে করুণার পাত্র ভাবছে, এ দেখতে আমি কোনোদিনই পারলাম না; এখন যখন আমি সত্যই অত্যন্ত করুণার পাত্র তখন ত তা আরও পারবনা। তা ছাড়া আমি এখন কুৎসিত, বর্ণনাতীত কুৎসিত। সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারি না, কেঁচোর মতো শরীরটাকে দুমড়ে সারাক্ষণ কেবল থক্ থক্ করে' কাশছি আর চাপ চাপ রেগ্না আর রক্ত তুলছি। শরীরের ঠক্‌ঠকে হাড় ক'খানা কেবল বাকী, তেল-চেলে মুখটা তুলে টিপ্‌সি হ'য়ে উঠেছে। মৃত্যু আমাকে আরোই কুৎসিত করবে। আমার যে মুখের দিকে Phyllis একদিন তার নীলাভ আয়ত চোখদুটির মুগ্ধদৃষ্টি তুলে' তাকিয়ে থাকত, যে মুখকে নিজের আতপ্ত কোমল মুখের মাঝখানে ধরে' চুমোর উপর চুমো খেয়ে তার সাধ মিটত না, তার মনে সেই মুখের স্মৃতির উপর মরণপাণ্ডুর বিকৃত বিকট একটা মুখের স্মৃতিকে আমি চাপিয়ে দিতে পারব না। তোমার মনে আছে, আমি তোমাদের একদিন বলেছিলাম, তোমরা মেংটিপরা কালারা আমাদের ফুলের মতো সুন্দর বর্ণাদেহের ওপরে ক্রিমিকীটের মতো এসে পড়েছ, তোমরা আমাদের landscapeটাকে নষ্ট করছ? আমি ঠিক ঐরকম। আমার মৃত্যুবিবর্ণ মুখের দিকে কিছুতেই পারব না আমি Phyllisকে তাকাতে দিতে। আমি তাই পালিয়ে যাচ্ছি, আমার এই সর্ব্বনেশে পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে সকলের চোখের আড়াল দিয়ে লুকিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে আমি চলে' যাব।

"তোমরা আমার জন্যে শোক কোরো না বন্ধু। পৃথিবীতে এ-ধরণের ব্যাপার এই ত আর প্রথম ঘটছে না? অকালেই যে মৃত্যু আমাকে গ্রাস করছে এতে ত আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, আশ্চর্য্য এই যে চারদিকে দিনের পর দিন এত অকালমৃত্যু দেখেও মানুষ তাই নিয়ে শোক করে। নিত্যগোপালের কথা ত তুমিই আমাকে বলেছ, তার বাপ, তার ছোট একটি ভাই, তার বড় দুটি বোন্···আমি তোমাকে এমনি ধারা আরও পঁচিশটি পরিবারের কথা বলতে পারি, সব ক'টা আমার পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে। অন্ততঃ আমার তাতে অকাল-মৃত্যুটাই নিয়ম, দীর্ঘজীবী হওয়াটাই নিয়মের ব্যতিক্রম। আমি নিজের জন্য দুঃখ করছি না। আমি বৌদ্ধ, পুনর্জ্জন্মবাদে আমি বিশ্বাস করি, আমি বিশ্বাস করি যেখানে আমি শেষ করছি নবতর জীবনে যখন চোখ মেলব আবার সেইখান থেকেই আমার সুরু করতে হবে, কাজেই সত্যিসত্যি কিছু আমি হারাচ্ছি না। কেবল যে-হিসাবে তোমাদের আমি হারাব, সেই হিসাবে Phyllisকেও আমি হারাব। আমার অনন্তকালের চলার পথে আমার পথ-সঙ্গিনী প্রিয়াকে বারবার নূতন নূতন রূপে আমি পাব, কিন্তু এটা ঠিক যে সেই আমার অনাগত জীবনের প্রিয়ারা যেরূপেই আমার চোখে ধরা দিক্, যত গভীর করেই তাদের আমি ভালোবাসি, আমার Phyllisকে এই জীবনের পথের শেষেই চিরকালের জন্যে আমি রেখে গেলাম।

"আমি Phyllisকে সত্যিসত্যি ভালোবাসি কি না, এটা তোমাদের অনেকবার মনে হয়েছে আমি

জানি। আমার নিজেরও সে কথা বহুবার মনে হয়েছে। নিজের মনের কাছ থেকে আমি কেবল এই জবাব পেয়েছি, যে, মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যে-মানুষ তার ভালোবাসা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের ভালোবাসার থেকে আলাদা হ'তে বাধ্য। এমন অনেক জিনিস আছে যা তোমাদের কাছে অপরিসীম মূল্যে মূল্যবান্, কিন্তু আমার কাছে একেবারেই মূল্যহীন। তোমরা যে জিনিসটাকে passion বল, আমার কাছে সেটা ব্যাধির নামান্তর। ভালোবাসার শারীরিক প্রকাশগুলি আমার কাছে আজ প্রকৃতির খেয়ালের দাসত্ব অন্ধ অনুবর্তিতা। তাদের মধ্যে প্রেমের যে প্রকাশ তা আমার কাছে অনর্থ ন্যাকামো। তবু তাকে আমি ভালোবাসতাম কি না, এ প্রশ্নের উত্তর হাঁ কিম্বা না বলে' আমি দিতে পারব না। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে আমার নিজের জীবনীশক্তি যখন প্রতিদিন ভাঁটার টানে নিঃশেষ হ'য়ে আসছিল তখন পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে তার জীবনে আমি বেঁচে ছিলাম। যখন চতুর্দিকার পৃথিবী থেকে আনন্দের খোরাক আহরণ করবার ক্ষমতা আমার চলে' গিয়েছিল, তখন তার আনন্দের মধ্যে নিজের হারানো আনন্দকে পরিপূর্ণ করে' আমি খুঁজে পেয়েছিলুম। তার চোখ দিয়ে নিত্যকার ভোরের আলোকে আমি দেখতাম ও তৃপ্ত হতাম, তার কান দিয়ে পাখীর গান শুনতাম ও তৃপ্ত হতাম, তার বুকের স্পন্দনে জীবনের বেগবান্ নিবিড়তা আমার উপলব্ধিগোচর হ'ত—আমি তৃপ্ত হতাম। আমার নিজের চেয়েও এই অর্থে অন্ততঃ সে আমার কাছে ঢের বেশী ছিল। কিন্তু সেটাকে তোমরা ভালোবাসা বলবে কি না জানি না।

"কিন্তু আমার নিজের ভালোবাসা নিয়ে আমার মনে যত সংশয়ই থাক্, আমার অন্তরতম অন্তরে আমি জানতাম আমার প্রেম যা দেওয়ার তা আমি তাকে দিয়েই রেখেছি। সে যে কি জিনিস, এবং কি রকম করে' যে তা দেওয়া যায় তা বলে' বোঝানো অসম্ভব, প্রতি মানুষের কাছে তার স্বরূপ এবং প্রকাশ আলাদা।

"কিন্তু আসল সংশয় যা তা আমার জেগেছিল Phyllisএর ভালোবাসা নিয়ে।—আজ সেকথা তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই। সেই সঙ্গে এও বলছি যে আমি প্রায় নিশ্চয় করেই জানি যে সেটা প্রায় সবটাই আমার মনগড়া সংশয়, তবুও মনের কাছে সেটা সংশয়ই। আমার অন্য অধিকাংশ দুর্ভাগ্যের মতোই এরও সূত্রপাত হয়েছিল আমার অসুখটা ধরা পড়বার সময় থেকে। তারপর ক্রমে ক্রমে সে সংশয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ মনে হ'চ্ছে আমার মনের স্বভাব-সত্যের বিচারশক্তিকে আমি একেবারে নিঃশেষে হারিয়ে বসে' আছি। চারিদিক দিয়ে এই সংশয়ের উর্ণনাভজালে আমার সমস্ত চিন্তা, বুদ্ধি, হৃদয়বৃত্তি আজ সমাচ্ছন্ন।

"আজ মনেই আনতে পারছি না, কবে কেমন করে' অলক্ষ্যে এই বিষ আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, আজ তারই বেদনায় আমার সমস্ত অস্তিত্ব বিদারিত হ'য়ে উঠেছে। কবে প্রথম Phyllisএর চোখের প্রেমাঞ্জনকে করুণার অশ্রু বলে' আমার মনে হয়েছিল, আজ ক্রমে এমন হয়েছে, তার প্রেমার্দ্র অন্তরের সহস্র অকুণ্ঠিত দানকে, তার একনিষ্ঠতাকে, তার আত্মত্যাগকে প্রতি পদে তার করুণার্দ্র চিত্তের ভিক্ষার দান বলে' আমি মনে করছি। যুকেও নিজেকে আমি বোঝাতে পারিনি তার কাছ থেকে পাওয়া আমার তুচ্ছতম আনন্দের মধ্যেও, তার সঙ্গে আমার প্রতিটি তুচ্ছ মুহূর্তের গায়েও এই সংশয়ের কালি ছড়িয়ে লেগে গিয়েছে। যত বেশী আগ্রহের সঙ্গে তার ভালোবাসাকে আমি চেয়েছি, তত বেশী করে' সেই ভালোবাসার অজস্র প্রমাণকে তার কৃপার পঙ্কিল বলে' আমি মনে করেছি। রোগযন্ত্রণা তার তুলনায় কিছুই নয়। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য সে যন্ত্রণাকে যেমন ভাবে সহ্য করছে আমিও তেমনই ভাবে সহ্য করতে পারতাম; কিন্তু Phyllis হয় ত আমাকে আর ভালোবাসে না, আমার প্রতি তার কোনো মুগ্ধতার ভাব আর নেই, আমি আর তার শ্রদ্ধার পাত্র আরাধনার বস্তু নই যেমন একদিন Walverhamptonএ তার সঙ্গে প্রথম দেখা হবার সময় আমি ছিলাম, হয় ত কেবলমাত্র আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়েই সে আমাকে ছেড়ে চলে' যাচ্ছে না, এ চিন্তার লেশমাত্র আমাকে পাগল করে' দিত, এতখানি সহ্য করবার শক্তি আমার কল্প দেহমনে আর ছিল না।

"আমার স্বভাব যদি কিছু কম দর্পিত হ'ত, আমি হয় ত

তোমাদের সকলের সম্বন্ধে, বিশেষ করে' Reggieর সম্বন্ধে jealous হ'তে পারতাম। আমি বলেছি, তাকে জোর করে' আমি আমাদের মৌচাকের মক্ষিরাণী করেছিলাম, কিন্তু রাণীর স্থানে সে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লো তখন তা'ই নিয়েই আমি বেমনাও পেতাম, যদিও সে বেদনাকে নিজের কাছে নিজে আমি স্বীকার করতাম না। আমি ত দেখতাম Reggieর সঙ্গে কেমন সহজে পরোক্ষীয়ের মতো সে মিশত, কেমন সহজ আনন্দে তাদের কথাবার্ত্তা, হাসি-পরিহাস জমে' উঠ্‌ত। সেই জিনিষগুলির জন্যেই ত আমারও অন্তর তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে থাকত। কিন্তু যখনই Phyllis আর আমি একলা হতাম, সে আমাকে অস্বাভাবিক আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে' চুমো খেত, অত্যন্ত আগ্রহে আমার সেবা করেই আমার হৃদয়টাকে সে আমার বেশী করে' মনে পড়িয়ে দিত, আমাকে সান্ত্বনা দিত, আমার কানে কানে আশার কথা বলত, উৎসাহের কথা বলত। আমার তখনকার সে যন্ত্রণার কথা তাহ'লেও এখন আমার ভয় হয়। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। মৃত্যুকে আগ বাড়িয়ে আন্‌ছি জেনেও আমি বিদায়ে ডুবে নিজের মনের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগ্‌লাম।

"মৃত্যুর পরে মানুষের মনের মধ্যে যদি তাকিয়ে দেখা সম্ভব হয়, তবে আমি হয়ত তার মনের মধ্যে তাকিয়ে আমার এই সংশয়ের সমাধান করব, কিন্তু এও সম্ভব যে, যে-ভয় নিয়ে তাকে ছেড়ে আমি পালিয়ে এসেছি, সেই ভয়ই তখনো তার মনের মধ্যে আমাকে তাকাতে দেবে না। হয়ত পাছে আমার ভয় সহ্য হয় এই ভয়েই তখনো তার কাছ থেকে আমায় পালিয়ে বেড়াতে হবে। তবু তার কাছে ফিরে যেতে আমার ইচ্ছে করবে, আমি জানি তাকে হারিয়ে আমার অনন্তকালের জীবন আমার কাছে দুর্ব্বহ হবে,—আমার পঞ্চশরের আর কোনো অর্থ থাকবে না।

"তার কাছ থেকে শেষ বিদায় আমায় চেয়ে নিতে আসা হয়নি। কি বলে' বিদায় নিতে আমি পারতাম? সুন্দর অপরিচিত দেশে, নির্ব্বান্ধব নিরাশ্রয় করে' তাকে আমি ফেলে চলে' এসেছি, কোন্ মুখে তার কাছে ফিরে আমি দাঁড়াতাম? অবশ্য সে নিজে উপার্জ্জনক্ষম, তদুপরি সারা-ক্ষণ আমার কাছে থাকবার জন্যে এতদিন কোনো চেষ্টা সে করেনি, পরের আশ্রিত হ'য়ে থাকবার গভীর অবমাননাকেও হাসিমুখে স্বীকার করেছে। আমি আশা করছি, সে যাতে দেশে ফিরে যেতে পারে, দয়া করে' সেই ব্যবস্থা তুমি করবে। যে বন্ধুর জন্যে এত করেছ, তার প্রতি এই শেষ কর্ত্তব্যটুকু করতে দ্বিধা করবে না।

"সেইখানে Wolverhamptonএর সেই বৃদ্ধটিকেই তাকে আবার ফিরে যেতে বোলো, এবং যথাসম্ভব এই দু'তিনটি বৎসরকে দুঃস্বপ্নের মতো করে' ভুলে যেতে বোলো, তার কাছে এই রকম করেই আমি আজ বিদায় চাচ্ছি।

"তবু মনে হয় যদি কখনো ফুলের ছুটির পর ফুল করেও সে এসে তার দু'তলার আফিসঘরের Ivy-জড়ানো জান্‌লাটিতে এসে দাঁড়ায়,যেমন করে' একদিন আমার তৃষিত দৃষ্টির সম্মুখে পরদের মতো দাঁড়িয়ে সে আমায় জানালে—আর দেরি নেই, দু' মিনিটের মধ্যে কাপড় ছেড়ে আমি আস্‌ছি, তবে হয়ত ঠিক তখনকার মতোই রৌদ্রের মাঠে চেরীগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার দু'চোখের দৃষ্টি ভরে' তাকে আমি দেখ্‌ব। একবার ছুটির সময় Worcestershireএ বেড়াতে গিয়ে churchএর মাঠে গগনচুম্বী একজোড়া পপ্‌লার গাছের তলায় দুজনে পাশা-পাশি আমরা বসেছিলাম, সেদিন সেইখানে প্রথম তাকে আমি আমার প্রেম-নিবেদন করেছিলাম। যদি আবার কোনো ছুটিতে সেই জায়গাটিতে ফিরে যেতে তার ইচ্ছে করে, সেই জোড়া পপ্‌লারের নীচে আবার কখনো ফিরে বসতে যদি তার মন চায়, হয়ত তার অজ্ঞাতে তার পাশে বসে' তার একটি হাতের ওপর আমার হাতখানিকে আমি রাখ্‌ব।"

চিঠিটি নিয়ে Phyllisএর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি শোক করলেন না। অনেক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর চোখের দৃষ্টি তাঁর পায়ের কাছের মাটিতে নিবদ্ধ হ'য়ে রইল, তাঁর সুকুমার নাসারন্ধ্র অতি মৃদু একটু কাঁপ্‌ল, তারপর আমার মুখের ওপর নীলাভ নয়নের উদাস দৃষ্টি তুলে বল্‌লেন, "আমার বন্ধু Normanএর বাড়ীতে আমি থাকতে যাব। আপনি দয়া করে' এবাড়ীর furniture, আমার গহনা-

গাটি সব নিলাম করিয়ে কোকোজীর দেনাপাওনাগুলো মিটিয়ে দেবেন।"

আমি বল্লাম, "তারপর আপনার কি করে' চল্‌বে?"

তিনি বল্লেন, "আমার জন্যে ভাববেন না। Methodist স্কুলে একটা কাজ খালি আছে অনেকদিন থেকে, তারা আমায় সাধাসাধি করছিল, সেইটে নিয়ে নেব।"

আমি বল্লাম, "দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে যদি, তবে সে ব্যবস্থা এখন করা যেতে পারে।"

তিনি বল্লেন, "অনেক ধন্যবাদ! কিন্তু কোকোজীর দেহ যে-দেশের মাটিতে মিশেছে সে-দেশের মাটির চেয়ে প্রিয় আমার কাছে কিছু নেই। ব্রহ্মদেশকে আগে কখনো ভালোবাসিনি, আজ নিজের দেশ জেনে ভালোবাসছি।"

বাজারে কোকোজীর যে সমস্ত দেনা ছিল, আমাতে ও Reggieতে মিলে সেগুলি শোধ করে' দিতে চাইলাম, কিন্তু আমাদের সাহায্য কিছুতেই তিনি নিতে রাজী হলেন না। আমরা বল্লাম, "এ সাহায্য ত আপনি নিচ্ছেন না, আমাদের পরলোকগত বন্ধুকেই এ সাহায্য আমরা করতে চাচ্ছি।"

তিনি বল্লেন, "এখনো কোনো সাহায্যের তাঁর দরকার আছে এ কথা ভেবে তাঁর পরলোকস্থ আত্মার আমি অপমান করতে চাই না।"

কোকোজী যে সত্যিসত্যিই আমাদের কাছে কতখানি ছিল, তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেটা আমরা বুঝ্‌লাম। একসঙ্গে কোকোজী এবং Phyllis দুজনকেই আমরা হারালাম। দেকের ধারে সহর থেকে দূরে তাঁর বন্ধু Normaর বাড়ীতে Phyllis বাস করতে গেলেন, আমাদের বন্ধুত্বের সমস্ত দাবীকে উপেক্ষা করেই গেলেন, তাঁর সঙ্গে আর যে কখনো কোনো উপলক্ষে আমাদের দেখা হবে সে সম্ভাবনা মাত্র রইল না।

সান্ধ্য মজ্‌লিস্ তার পর থেকে আর জমে না। নিত্যগোপাল আমার বাড়ীতেই থাকে, Reggieও প্রায়ই আসে, কিন্তু তিন বন্ধুতে বসে' সারাক্ষণ কেবলই পুরানো দিনগুলি নিয়ে আলোচনা হয়, বর্ত্তমানকে ভুলে গিয়ে অতীতের মধ্যে আমরা বাঁচি, কোকোজীর কথা, Phyllisএর কথা ছাড়া আমাদের আর কোনো কথা হয় না, বল্‌বার মতো আর কোনো কথা আমরা খুঁজেও পাই না। দিনগুলির মধ্যে দিয়ে যখন চলে' এসেছিলাম, তখন ভালো করে' সেগুলির দিকে আমরা তাকিয়েও দেখিনি; যখন সেগুলির মধ্যে আবার ফিরে যাওয়ার সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত পথ বন্ধ, তখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম সত্যিই কতখানিকে হাতের মধ্যে পেয়েও আমরা বুঝ্‌তে পারিনি—ছেড়ে এসেছি। জীবন কি অপরূপ বেশ নিয়েই আমাদের সম্মুখে এসেছিল, তার চোখের দিকে চোখ তুলে পর্য্যন্ত আমরা তাকাইনি।

Reggio বিয়ার শুদ্ধ আর খেতে চাইত না, বল্‌ত, "কি হবে?"

নিত্যগোপাল বল্‌ত, "ও জিনিস কেবল খাবার জন্যে কোনোদিন আমি খেতাম না। Phyllisকে বিয়ারের গেঁাকে আমি নিতান্ত আপনার করে' অন্তরের গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌তে পেতাম, এমনিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে শুদ্ধ সাহস হ'ত না।"

Phyllisকে ছেড়েও কোকোজীর অভাবও অতান্ত নিবিড় করে' আমরা ক'বন্ধুতে অনুভব করতাম। সে কেবল আমাদের বন্ধুই ছিল না, তার জুড়বার বুদ্ধি ছিল যা ব্রহ্মদেশীয়দের বুদ্ধিবৃত্ত আর কারও মধ্যে খুব অল্পই আমরা দেখেছি। যে কোনো বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করা যেত এবং আলোচনা করে' সুখ হ'ত। সব জিনিস নিয়ে সে ভাব্‌ত, সত্যকে অনুরাগের সঙ্গে অনুসন্ধান করত, এবং সত্যের সাক্ষাৎকার পেলে স্বভাবসুলভ সরলতায় আকর্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে অবলম্বন করত। সঙ্গী হিসাবে তার তুলনা ছিল না, প্রতি জিনিসের মধ্যে তার আনন্দের দিকটি, হাসির দিকটি সে দৃষ্টিপাত মাত্র দেখ্‌তে পেত। কিন্তু তার অভাবকেও Phyllisএর অভাবের সঙ্গেই আমরা জড়িয়ে ভাব্‌তাম। আমরা মনে করতাম, হয়ত Phyllisএর সঙ্গে পূর্ব্বেকার মতো মিল্‌তে পার্‌লেই এক-সঙ্গে দু'জনের অভাবই আমাদের মিটবে।

কিন্তু সকলে মিলে নানারকম করে' ভেবেও সে-অভাব মেটাবার কোনো উপায় আমরা করতে পার্‌লাম না। Phyllisকে দু'তিনখানা চিঠি লিখেও Reggie জবাব

পেলে না। যে বন্ধুর বাড়ীতে তিনি থাকেন, তিনি অবিশ্বাসিনী, Methodist স্কুল সংলগ্ন একটি বাড়ীতে তিনি থাকেন। সেখানে বিনা আহ্বানে Phyllisএর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া একেবারেই অকল্পনীয় ব্যাপার। বাইরে সিনেমায়, থিয়েটারে, সভাসমিতিতে কোথাও যে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে সে-সম্ভাবনাও ছিল না, কেন-না শৌকার্ত্তা phyllis কোথাও বেরোন না, কিছুদিন যেতে না যেতেই সেটা আমরা বুঝতে পারলাম।

তিন বন্ধুর মধ্যে কে তাঁর সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে সাক্ষাৎ করতে পারে দেখবার জন্যে বড় রকম বাজি রাখা হ'লো, কিন্তু সে বাজির টাকা কেউ যে কোনোদিন হারুব সে ভয়ের কোনো কারণ দেখা গেল না।

কিন্তু জীবনের মধ্যে সত্যিই একটা শূন্যতা-বোধ এসেছিল। সে শূন্যতাকে পূর্ণ করবার চেষ্টা আমাকে করতেই হ'লো: বহুদিন পর আবার Walterএর শরণাপন্ন হব ঠিক করলাম। Materialisation সম্বন্ধে নানা অকাট্য সাক্ষ্য-সম্বলিত Dennis Bradleyর তৃতীয় বইখানা তখন সবেমাত্র আমার হস্তগত হয়েছে। প্রতিজ্ঞা করলাম, Walterএর সাহায্যে কোকোলীকে তার নশ্বররূপে আবার একদিন আমাদের সান্ধ্য মজলিস আমি ফিরিয়ে আনব। তাকে দেখব, তার সঙ্গে কথা বলব, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের সমস্যা সম্বন্ধে তার সঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত মাত্র হয়েছিল সেটাকে শেষ করব। এবার আর ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা হিসাবে আমরা মিলব না, সমানে সমানে আমাদের আলোচনা হবে, যে জিনিসকে সত্য বলে' অনুভব করি, তাকে প্রকাশ করে' বলতে এবার কোকোলীর অসুস্থতার বাধাটাও আর থাকবে না। সে সান্ধ্য মজলিসে Phyllisকে ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই না বলতে পারবেন না, হয়ত পুরানো দিনের মতো করেই সেখানে আবার তিনি নাচবেন। এমনিধারা আরও কত উন্মাদ উদ্ভট কল্পনা!

প্রথমটা রেঙ্গুনের যেখানে যেখানে Spiritualistদের আড্ডা ছিল ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও সন্তোষজনক কিছু দেখলাম না। সর্ব্বত্রই প্রবঞ্চনা এবং আত্মপ্রবঞ্চনার রাজত্ব। তার চেয়ে বেশী কিছু কি করে' থাকবে? পরলোককে জানবার আগ্রহ নিয়ে পরলোকের সঙ্গে কেউ কারবার করতে আসে না, যদি পরলোকের সাহায্যে ঐহিক সুখসুবিধা কিছু বাড়িয়ে নেওয়া যায় সেই লক্ষ্যই প্রায় সকলের। অন্ততঃপক্ষে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে' দু'একটা সন্তোষজনক উত্তর না পেলে কারও তৃপ্তি হয় না। যারা নিজেদের মৃত 'প্রিয়জনদের টানে seanceএ যোগ দেয় তাদেরও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে' যেতে বেশীদিন লাগে না। কারণ ইহলোককেই যারা একান্ত করে' জানে, মৃত পরিজনেরা পর হ'য়ে যেতে তাদের বেশী সময়ের দরকার হয় না। তা ছাড়া সত্যিকারের প্রেতত্ত্বে আগ্রহী লোকদের circle খুঁজে মোটে পেলামই না বলা চলে। অধিকাংশরাই সাময়িক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে দু'চারদিন জিনিসটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, জ্ঞানাহরণের চাইতে আমোদ পাওয়াটার দিকেই তাদের বেশী লক্ষ্য।

এক জায়গায় দেখলাম কয়েকজন খ্রীষ্টান নারী মিলে একটি circle পরিচালনা করছেন। খ্রীষ্টকে আমি ভালবাসি শুনে আদর করেই তাঁরা আমাকে তাঁদের মধ্যে গ্রহণ করলেন কিন্তু দু'দিন গিয়েই বুঝলাম সেখানে যে প্রেতাত্মারা আসা-যাওয়া করে, তাদের বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি এবং জ্ঞানের প্রসার বাইবেলের গণ্ডীকে কোথাও অতিক্রম করে না। Original Sin, আদিম মানবদম্পতির স্বর্গোদ্যান-চ্যুতি, Last Judgmentএর তথা ইত্যাদি শোনবার জন্যে ঐহিক ব্যবস্থাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এত আছে যে তার জন্যে পরলোক থেকে আত্মাদের তলব করবার প্রয়োজন কেন হ'চ্ছে বুঝতে পারলাম না।

Reggieকে বলতে সে বললে, "আমার কিন্তু সত্যিই মনে হয় যে স্বর্গ জায়গাটা মস্ত বড় Salvationistদের একটা আড্ডা। আওড়ালিত পাদ্রীর পোষাক পরে' ভগবান যেখানে বসে' থাকেন, সেখানে জোরে হাসবার বা কথা বলবার নিয়ম নেই। বেচারা বীঠোফেন্ সেখানে নিজের গীতবাদ্যের বৈঠক জমাতে গিয়ে ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন, ভগবান্ বেচারা বুঝতেই পারলেন না লোকটা যা বলতে চায় তার অর্থ কি। তাঁকে অবশেষে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে নীচের দিকে এসে আসর জমাতে হ'লো। ওদিকে স্বর্গোদ্যানের Salvationistরা ক্যাষ্টানেট বাজিয়ে

যেন গান ধরল 'Save my soul dear Jesus', তখন বুড়ো ভগবানের দু'হাত তুলে সে কি নৃত্য!"

অগত্যা Reggieকে ডেকে নিজেই আবার পেন্সিল নিয়ে বসলাম। নিত্যগোপাল প্রথমটা আমাদের সঙ্গে খুব একপালা তাই নিয়ে ঝগড়া করল, তারপর বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এবারকার seanceএ Walter এল না, প্রথমেই এল কোকোজী। কোকোজীর হাতের লেখার একটা বিশিষ্ট ছাঁদ ছিল, তার অক্ষরগুলো সব বাঁদিকে হেলত। দেখ্‌লাম, লেখার ছাঁদেও ভুল নেই। এসেই সে তার চিরকালের অভ্যাস-অনুযায়ী একপালা আমাদের গাল দিলে, বল্‌লে, "দুই লক্ষীছাড়া একসঙ্গে হয়েই বড় অশান্তি আরম্ভ করেছ। কবরের মধ্যে দু'দিনও যে একটু জুড়োব তার যো নেই।" বল্‌লে, "আমাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে, সে জায়গাটার সন্ধান তোমরা করলে না যে বড়? নদীর ধারে ঘাসে-ঢাকা চালু জমির ওপরে মরিয়ান্ গাছের ছায়ায় নীচ সুন্দর স্থানটি। মরবার আগে নিজে জায়গাটা আমি পছন্দ করে' ঠিক করেছিলাম।" বল্‌লে, "তুমি আমার সেই চিঠি Phyllisকে যে দেখিয়েছিলে বড়? আমি কি তোমায় বলেছিলাম দেখাতে?" আমি বল্‌লাম,"নিজে ত তাকে একলাইন্ লিখ্‌লে না—আমার চিঠিটিও তাকে দেখিয়েছি বলে' তোমার আপত্তি!" সে বল্‌লে, "দেখিয়েছ বেশ করেছ। এবার চিঠিটি সাবধানে রেখো, নিত্যগোপাল ত এরই মধ্যে চুরি করে' নিয়ে পড়েছে।" মনে পড়্‌ল সত্যিই চিঠিটাকে যথেষ্ট সাবধানে রাখা হয়নি। বল্‌লাম, "আমার অপরাধ হয়েছে, আজকেই সেটিকে তালাবন্ধ করব।" সে বল্‌লে, "ঐ ত তোমার দোষ, চট্ করে' অপরাধ স্বীকার কর, কিন্তু অপরাধটা আসলে যে কোন্‌খানে তা ভেবে দেখ না। বোঝ না যে লুকিয়ে চিঠি যে পড়ে তার অপরাধের চেয়ে লুকিয়ে চিঠি পড়্‌বার সুবিধা যে করে' দেয় তার অপরাধটা কিছু কম নয়। সব রকম অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়া তোমাদের জাতির চরিত্রগত দুর্ব্বলতা, কেবল কি আমার চিঠিটাকে তালাবন্ধ করলেই তার প্রতিকার সম্পূর্ণ হবে?" ইত্যাদি।

কয়েকদিন কাট্‌ল, কিন্তু কিছুতেই Phyllis সম্বন্ধীয় কোনো আলোচনাতে তাকে টান্‌তে পার্‌লাম না। আশ্চর্য্য এই, তখনো তার মেজাজকে আমাদের ভয় হ'ত। তাই তাই, Phyllisএর কথা বেশী আগ্রহ সহকারে বল্‌তে গিয়ে না জানি তার কাছ থেকে কি অভাব্য তিরস্কারই শুন্‌ব! আমি তবু ধৈর্য্য অবলম্বন করে' অপেক্ষা করাই স্থির করলাম, কিন্তু Reggie অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল। সেদিন আরও ভালো ফল পাবার জন্যে নিত্যগোপালকেও জোর করে' ধরে' বসিয়ে তিনজনে মিলে planchette ধরা হ'লো। কোকোজী আস্‌তেই Reggie বল্‌লে, "আজ আমাদের লাক্কা মজলিসের সব-ক'জনই উপস্থিত, কেবল একজন ছাড়া।" কম্পিতবক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কোকোজী বল্‌লে, "হাঁ, Phyllisএর কথা আমিও ক'দিন থেকে ভাব্‌ছিলাম। তাকে জানা এখনই সহজ হ'তে না পারে, কিন্তু সে যখন নিঃসংশয় করে' জান্‌বে যে সত্যিই তোমাদের কাছে আমি এসে থাকি, তখন আর সে আপত্তি করবে না।" আমি বল্‌লাম, "Walter বল্‌ত প্রমাণ চাইলে প্রমাণ পাওয়া শক্ত হয়, ওটা না চেয়ে পাওয়ার জিনিষ। তুমি যে এসো আমরা সেটা বিশ্বাস করি, কিন্তু ওঁকে কি করে' নিঃসংশয় করে' সেটা বোঝাব?" কোকোজী বল্‌লে, "Phyllisকে বোলো ইউনিভার্সিটিতে কাজ শেষ অবধি চালাতে পার্‌ব কিনা নিয়েই আমি একটা ইন্‌সিওর করেছিলাম। না জেনে তাকে সেটার কথা বলিনি। প্রোভিডেন্ট ফণ্ডে আমার যে টাকাটা পাওনা হয়েছিল, কাজ ছাড়্‌বার সময় সেটা আমি নিইনি, তার থেকে due premiumএর সবটাই দেওয়া হয়েছে। ইউনিভার্সিটির আফিসে খোঁজ করলে সব জান্‌তে পার্‌বে।"

পরদিন Phyllisকে ইন্‌সিওরেন্সের কথা জানালাম না। আসল কথা, নিজেদের মনেও আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলাম না। কি জানি শেষে বোকা বন্‌তে হয়। যাও বা এই seanceএর সূত্রে নূতন করে' Phyllisএর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হবার একটা সম্ভাবনা আছে, সেটাও চিরকালের জন্যেই যাবে তা হ'লে। কিন্তু নিত্যগোপাল হঠাৎ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। দেখ্‌লাম, একদিন seanceএ বসেই সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি তার শ্রদ্ধা আমাদের শ্রদ্ধাকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। বল্‌লে,

"তোমরা লিখ্‌তে যদি সঙ্কোচ বোধ কর, আমিই লিখ্‌ব।" কোকোজীও উঠোউঠি করেকবার এসে সেই একই কথার পুনরুক্তি কর্‌লে। তখন তিনজনে বসে' অনেক ঘুলিয়ানা করে' Phyllisকে আমরা চিঠি লিখ্‌লাম।

লিখ্‌লাম, "আজ ক'দিন ধরেই কোকোজী আস্‌ছে,—অন্ততঃ আমরা বিশ্বাস করি যে সে আস্‌ছে। কিন্তু বিনা প্রমাণে আপনাকে আমরা যদি না বিশ্বাস কর্‌তে এ রকমও হওয়া সম্ভব যে তার বল্‌বার কথা বা, তা আমাদেরই মন্দ মনের নানা কথার সঙ্গে মিশিয়ে ছাড়া তার বল্‌বার উপায় নেই। হয় ত ক্রমে ক্রমে তাকে আরও বেশী করে' আমরা পাব। এমন দিন হয়ত আস্‌বে যখন কোনো সন্দেহই আর থাক্‌বে না। নিজেরা নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আমরা চেষ্টার ত্রুটি কর্‌ব না।

"কিন্তু আমাদের অনুরোধ ইন্‌সিওরেন্সটার বিষয়ে আপনি ইউনিভার্সিটিতে খোঁজ নিয়ে দেখ্‌বেন। হয়ত আমাদের অতিবিশ্বাসের ফলে আপনাকে খানিকটা পণ্ডশ্রম কর্‌তে হ'তে পারে। কিন্তু কোকোজীর কথা ভেবে ঐটুকু আপনি কর্‌বেন। তাকে যদি নিজেদের মধ্যে আবার আমরা ফিরে পাই, তবে সে যে আমাদের কতখানি পাওয়া হবে, তা বোঝা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। আমরা নিজেরাই খোঁজ নিতে পার্‌তাম, কিন্তু সেটা আমাদের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হবে।"

ইউনিভার্সিটিতে সকলেই Phyllisকে জান্‌ত, সেখানে হঠাৎ আমাদের খোঁজ নিতে যাওয়ার জন্য বাধাও ছিল। চিঠিতে সব কথাই প্রায় লিখ্‌লাম, কিন্তু যে কথাটা সব চেয়ে বেশী বল্‌তে চাই সেইটেই সাহস করে' কেবল বল্‌লাম না। কোথাও ঘুণাক্ষরেও তাঁকে বুঝ্‌তে দিলাম না যে তিনিও আমাদের সান্ধ্য মজ্‌লিসে পুরনো দিনের মতো করে' মিল্‌বেন।

তৃতীয় দিনে বেহারার হাতে Phyllisএর কাছ থেকে আমাদের চিঠিটির জবাব এল। এক টুক্‌রা কাগজের উপর পেন্সিলে কাঁপা-হাতে সে লিখেছে, "আমি নীচে Normaর গাড়ীতে একলা অপেক্ষা কর্‌ছি। একবারটি নীচে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।"

কাগজটিকে Reggie ও নিত্যগোপালের নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে নীচে নেমে গেলাম। ফুটপাথের কাছে গাড়ীবারান্দার আড়ালে মোটর অপেক্ষা কর্‌ছিল। আমি অভিবাদন কর্‌তেই আমাকে প্রত্যভিবাদন করে' Phyllis বল্‌লেন, "ভেতরে এসে বসুন।"

ভিতরে গিয়ে বস্‌লে তিনি বল্‌লেন, "আপনাদের séance এখন কোথায় হয়?"

আমি বল্‌লাম, "আমারই বাড়ীতে।"

তিনি বল্‌লেন, "আপনার সঙ্গে কে কে আর বসে?"

আমি বল্‌লাম, "Reggie আর নিত্যগোপাল।"

"বাড়ীতে কি আপনি একলা থাকেন?"

"ছোট ছুটি ভাই থাকে, তারা আমাদের এদিক্‌টাতে আসে না।"

"Norma নিজে spiritualismএ খুব বিশ্বাস করে। তাকে নিয়ে এলে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে?"

"আপত্তি কেন থাক্‌বে? Circleটা একটু বড় হ'লে অপেক্ষাকৃত ভালো ফল পাওয়া যাবার সম্ভাবনা।"

"রোজই কি আপনারা বসেন?"

"কিছুদিন ধরে' রোজই ত বস্‌ছি।"

"আমরা রোজ আস্‌তে পার্‌ব না, সপ্তাহে তিনদিন আস্‌ব। কাল ত শনিবার? কাল আস্‌ব, পরশু আস্‌তে পারি, বৃহস্পতিবারেও আস্‌তে কোনো বাধা নেই। কখন বসেন?"

"সন্ধ্যারই বসি। যেদিন আপনাদের সুবিধা হবে আস্‌বেন।"

তিনি বল্‌লেন, "আচ্ছা, আজ আসি তাহ'লে।"

আমি নেমে পড়ে' তাঁর করমর্দ্দন করে' বল্‌লাম, "কিন্তু আপনি ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলেন কি না তা ত বল্‌লেন না?"

গাড়ী চল্‌তে সুরু করেছিল, তিনি পিছনের দিকে মুখ বাড়িয়ে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। খবরটা সত্যি।"

কম্পিত বুকে উপরে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের খবর দিলাম। Reggie বল্‌লে, "কোকোজীর honourও আজ বিসর্জ্জন আন্‌তে পাঠাও।"

আমি বল্‌লাম, "না, ও রকম করে' তাকে honour করা হবে না। অত্যন্ত শুদ্ধ সুস্থ মন নিয়ে না বস্‌লে কোনো-

দিন seanceএ ভালো ফল পাবে না। যত রাজ্যের যাতাল ভূতেরা এসে গোলমাল বাধাবে।"

কিন্তু সেদিন আর আমরা seanceএ বসলাম না।

পরের দিন বিকেল না হতেই তিন বন্ধুতে মিলে আমার বসবার ঘরটার চেহারাটা একটু বদলাতে উঠে' পড়ে' লাগ্‌লাম। Reggieর কাছ থেকে একটা কার্পেট ধার করে' আন্‌লাম, জানালা দরজার পরদা খুলানো হ'লো, চেয়ারগুলোকে ঝেড়ে মুছে' ঠিক করলাম, গোল টেবিলটার উপরে জরীর কাজ করা মখমলের একটা কভার চাপা দিয়ে ফুলদানীতে একগোছা চন্দ্রমল্লিকা সাজিয়ে দেওয়া হ'লো। চন্দ্রমল্লিকা Phyllisএর প্রিয় ফুল।

সাড়ে ছয়টায় Phyllis আর Norma এলেন। Normaর সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয় করানো শেষ হ'য়ে গেলে, ঘরের আলোটাকে কাপড়-ঢাকা দিয়ে একটু স্তিমিত করে' আমরা planchette নিয়ে বস্‌লাম। কিন্তু আধঘণ্টার ওপর অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কোকোজী এল না। কেউই এল না। একবার Planchetteটা অতি মৃদু গতিতে চল্‌ল, তারপর কাগজটার একপাশ থেকে আর-একপাশ পর্য্যন্ত গড়িয়ে গিয়ে ফিরবার পথে কাগজের মাঝখানটায় লাট্টুর মতো ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগ্‌ল। আরও আধঘণ্টা এই রকম চল্‌ল। আমি একলা পেন্সিল ধর্‌লাম, কিন্তু আমার হাত সেদিন চল্‌লই না। তখন অবশ্য সেদিনকার মতো সভাভঙ্গ করাই ঠিক হ'লো। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছিল। বুঝলাম, Phyllisএর সঙ্গে seanceএ বস্‌বার পালা এই পর্য্যন্ত।

Phyllis এবং Normaকে তিনজনে মিলে আমরা গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে গেলাম, সেদিনকার seance বিষয়ে কোনো কথাই তাঁরা বল্‌লেন না। Reggieর কবিতা লেখা কেমন চল্‌ছে Phyllis তা জান্‌তে চাইলেন। আমার বাড়ীটা যে কত সুন্দর Norma তারই ব্যাখ্যা করে' আমার খুসি কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। আমরা এমন বিষণ্ণ বোকা বনেছিলাম, যে, তাঁদের কোনো একটা কথার বুদ্ধিমানের মতো একটা জবাবও দিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

ফিরে এসে সাজানো ঘরটার মাঝখানে তিনজনে চুপ-চাপ বসে' রইলাম। কিছুক্ষণ পরে Reggie বল্‌লে, "তুমি জানো না, কোকোজী আমাদের সম্বন্ধে কতখানি jealous ছিল। বেঁচে থাক্‌তে মুখ ফুটে কিছু বলেনি, আজ সুযোগ পেয়ে বেশ করে' শোধ নিয়েছে।"

আমরা কেউই সে কথার কোনো জবাব দিলাম না।

Reggie বলে' যেতে লাগ্‌ল, "তোমাদের আমি বলিনি, কিন্তু কোকোজীর একবার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, যে, আমি Phyllisকে ভালোবাসি। কেবল এই নয়, Phyllisও হয়ত বা আমাকে ভালোবাসে এ ধারণাও তার মনে এসেছিল। তোমরা কেউ যখন থাক্‌তে না, আমার কথা নিয়ে Phyllisকে সে একটু আধটু খোঁচা দিতেও ছাড়্‌ত না। আমি Phyllisকে বলেছিলাম, তুমি এ রকমের খোঁচাগুলিকেও সহ্য কর কেন? Phyllis বলেছিল, কি কর্‌ব, অসুস্থ মানুষের এই সব পাগ্‌লামোকে notice কর্‌লেই সেগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে বেশী। আমার বিশ্বাস, কোকোজীর আসল রাগটা আমার ওপরেই। যদি ইচ্ছা কর, আমাকে বাদ দিয়ে seanceএ বসে' দেখ্‌তে পার।"

আমি বল্‌লাম, "আমার? রক্ষা কর। যতটা হতমান হ'তে হয়েছে তাই ঢের।"

কিন্তু পরের দিন সাড়ে ছ'টারও বরং একটু আগেই Normaকে সঙ্গে করে' Phyllis এসে হাজির। বল্‌লেন, "নূতন মানুষ সঙ্গে থাকাতে কাল তোমাদের seance জম্‌তে বাধা হয়েছে, Norma সেজন্যে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত। কিছুতেই আস্‌তে চাচ্ছিল না, আমি জোর করে' ধরে' নিয়ে এসেছি। অপরিচয়ের বাধা কাল বেটা ছিল, আজ নিশ্চয়ই সেটা আর তত থাকবে না।"

এত আগ্রহ করে', এত একাগ্রতার সঙ্গে কোনোদিন আর seance বসেনি, তবু সেদিনও আধঘণ্টা কেটে গেল, কোকোজী বা Walter কেউ এল না। বাইরে বর্ষা, ভিতরে পাখা চল্‌ছে, তবু ঘামে কাপড় জামা চুপচুপে হ'য়ে ভিজে যেতে লাগ্‌ল। অবশেষে হতাশ হ'য়ে আগের দিনের মতোই উঠে পড়্‌ব ভাব্‌ছি, এমন সময় হঠাৎ নিত্যগোপাল চেয়ার থেকে গড়িয়ে ধুপ্‌ করে' কার্পেটের ওপর পড়ে' গেল। সকলে হাঁ-হাঁ করে' উঠ্‌ল। Reggie ছুটে

গিয়ে জল এনে তার চোখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌লুম, আমি তার জামার গলার বোতাম খুলে দিয়ে তার শিথিল মাথাটা কোলে নিয়ে ব'সে' তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লাম। Phyllis Normaকে বোঝালেন, ও চিরকালেরই nervous,আগে ত scandalএর ত্রিসীমানা মাড়াত না, স্নায়ুগুলীর ওপর অত্যন্ত বেশী strain হবার দরুণ এ-রকম হয়েছে।

অনেকক্ষণ তাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি কর্‌বার পর সে চোখ খুল্‌ল। জিজ্ঞেস কর্‌লাম, "কেমন আছ এখন?"

উত্তরে যে কথা বল্‌ল, সে নিত্যগোপাল নয়। সে কোকোজী। দোলা হয়ে ব'লে' পরিচিত গলার আওয়াজে, কোকোজীর সেই বিশেষ এক রকমের কর্‌বার ভঙ্গীতে সে বল্‌লে, "তোমাদের কি ধারণা, আমি ট্রাবাদুকুলোসিস্‌টা এবার পর্য্যন্ত ব'য়ে নিয়ে এসেছি? বেশ আছি; কি রকম আবার থাক্‌ব?"

উঠ্‌তে তার কষ্ট হ'চ্ছিল, আমাতে আর Reggieতে ধ'রে' তাকে চেয়ারটার ওপর বসিয়ে দিলাম।

Phyllisএর মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, নিত্যগোপালের মুখের ওপরে নির্নিমেষে স্থাপিত তাঁর সেই দৃঢ়-নিবদ্ধ দৃষ্টি, সে দৃষ্টির অর্থ বোঝা আমার সাধ্যাতীত।

Norma বল্‌লেন, "ইউনিভার্সিটিতে Phyllis খোঁজ করেছিলেন, তারা বলেছে শেষ দুটো premiumএর টাকায় কম পড়াতে policy lapse হ'য়ে গিয়েছে। Phyllis ইচ্ছে কর্‌লে রসিদগুলো সব দিতে পারেন।"

কোকোজী বল্‌লে, "Phyllis সেগুলো তাঁদেরই রাখ্‌তে ব'লে' এসেছেন তো?"

Norma বল্‌লেন, "হ্যাঁ।"

কোকোজী বল্‌লে, "Phyllis একটু বিচলিত হয়েছেন ব'লে' মনে হ'চ্ছে। তা একটু হবার কথা বটে। ওঁর চেহারা এত খারাপ হ'য়ে গিয়েছে! সেই gland extractটা আর খাচ্ছ না Phyllis?"

Phyllis কি একটা বল্‌তে গিয়েও চুপ ক'রে' গেলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "আমি পাঁচ মিনিট এঁর সঙ্গে একটু একলা থাক্‌তে চাই,—যদি কিছু মনে না করেন। হ্যাঁ Norma, তুমিও।"

সকলে মিলে সিঁড়ি বেয়ে ছাতে চলে' এলাম।

(ক্রমশঃ)

রত্নবণিক্

শ্রী হৈমবতী দেবী

রত্নবণিক্ বক্ষ-মাণিক
লক্ষ্য করেছে,—
সবার মাঝে রতন-রাজে
এসে ধরেছে।
কেউ বলে, "ছি, এরেই বুঝি
হয় বলেছে?
এর যে দেখি সবই মেকি—
রাংতা জলেছে!
বণিক্ যাহা নেংচে কাঁচা
বড্ড ঠকেছে,
মাণিক বলে' অগাধ জলে
সোনা ফেকেছে।"
কেউ বলে, "না, এমন কানা
কেবা দেখেছে,—
কেমন ছিরি, বণিক্‌গিরি
কোথা শিখেছে?"
বণিক্ সেরা হৃদয়চেরা
মণি চিনেছে,—
সকল ত্যজে ফকির সেজে
এরে কিনেছে!

ঈদ্দিশ্ সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

হিব্রু ও জার্মান ভাষার সংমিশ্রণে যে ভাষার সৃষ্টি তারই নাম ঈদ্দিশ্ বা হিব্রু-জার্মান ভাষা। এ ভাষা খুব প্রাচীন নয়, তাই তার সাহিত্যও প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না। রাষিয়া ও পোল্যাণ্ডের সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা পরস্পরের আচার-ব্যবহারে প্রভাবান্বিত হ'য়ে এই সংমিশ্রিত ভাষার সৃষ্টি করে। সেই জন্যই এই ভাষার সাহিত্যের একটা বিশেষ আশঙ্কা হ'চ্ছে এই যে, সে সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট দেশগত কোন মর্য্যাদা নাই, দুটি সীমান্ত প্রদেশেই এর যেটুকু আদর। তাই সাড়ে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির দুরাকাঙ্ক্ষা বিশেষ কেউ পোষণ করতো না। কিন্তু তারপর সীমান্তের এই অধিবাসীদের নিজ ভাষাকে জগদ্বাসীর সমক্ষে দাঁড় করাবার জাগ্‌লো অত্যধিক আগ্রহ—তারই ফলে অতি-আধুনিক ঈদ্দিশ্ সাহিত্যের সৃষ্টি।

ঈদ্দিশ্ ভাষাভাষী কোন বিশেষ দেশ না থাকলেও ঈদ্দিশ্ সাহিত্যের একটা নিজ মর্য্যাদা আছে—যা সকল সাহিত্যেরই আছে অল্প-বিস্তর ভাবে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে' ঈদ্দিশ্ সাহিত্যে নব্যপন্থীদের যে আন্দোলন চল্‌ছে তারই ফলে অতি-আধুনিক ঈদ্দিশ্ সাহিত্যের বিস্ময়কর স্ফুরণ ঘটেছে—বিশ্বসাহিত্যের আসরে সে স্থিরীকৃত করে' নিয়েছে নিজের মর্য্যাদা।

ঈদ্দিশ্ সাহিত্যে যে ক'জন লেখক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের রচনার উপর রুষ সাহিত্যের প্রভাব এসে পড়েছে বিশেষভাবে—রুষ সীমান্তের অধিবাসী বা জীবনের

কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত থেকে মনের কোন এক গোপন কোণে রুষ-চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফ্যালে বসেই হয়তো। কিন্তু তাহ'লেও ইহুদী-জীবনের রূপ মোটেই ক্ষীণ হ'য়ে যায়নি তাদের লেখনীর রেখাপাতে। গত ক'বছরের মধ্যে ইহুদি সাহিত্যিকরা এমন সুন্দর সুন্দর গল্প ও উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন যা শুধু তাদি'কেই সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী করেনি, তাদের মাতৃভাষার প্রতিও দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করেছে —যে ভাষাকে ভাষা বলে' স্বীকার করতেও লোকে কার্পণ্য করতো এর আগে।

ইহুদি সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন যে ক'জন লেখক, তাঁদের মধ্যে "সলোমন্ জ্যাকব্ র‍্যাবিনোভিচ্" আর "আইজ্যাক্ লোব্ পেরেজ"ই হচ্ছেন অগ্রণী। এঁদের সমসাময়িক এবং পরবর্তী লেখকেরা এঁদের প্রকাশভঙ্গী, পর্যবেক্ষণধারা ও চরিত্রচিত্রণের অনুভূতি অনুকরণ করেন; তারই ফলে ইহুদি সাহিত্য বৈশিষ্ট্যশালী সাহিত্য হ'য়ে ওঠে এবং সাহিত্যরসিকদের কাছে সজীবতার পরিচয় দিতে পারে। 'পেরেজ'ই হচ্ছেন যুগান্তকারী লেখক, তাঁর রচনাতেই সর্ব্বপ্রথম ইহুদী-জীবনের সুখদুঃখের সত্যিকারের রূপ ধরা পড়ে, নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্ব নিয়ে ও ভিন্নদেশীয় সাহিত্যপ্রভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে।

অতি-আধুনিক ইহুদি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে বিদ্রোহাত্মক আত্মভূতি যা' ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোপোন্মুখ ইহুদী জাতির জীবনে প্রতিনিয়তই প্রকাশ পাচ্ছে—জাতির সেই অন্তর্মুখী ব্যথা আধুনিক ইহুদি গল্প ও উপন্যাসে রূপ পেয়েছে অপূর্ব্ব সহানুভূতি আর চিত্তদ্রবী দরদ নিয়ে। অবনত ধ্বংসোন্মুখ জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিজেকে-চিন্‌তে-না-পারার নিষ্ঠুর পরিহাস এই সাহিত্যের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে, যা' শুধু পাঠকের মনকেই চিন্তিত করবে না, বিশ্বের আসরেও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এমনি ধারা প্রাণের দরদ দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টায় অন্য কোন সাহিত্য গর্ব্ব করতে পারে না কেবল রুষ সাহিত্য ছাড়া,—এই জন্যই সমালোচকরা বলেন, রুষ-সাহিত্যের প্রভাব এসে পড়েছে ইহুদি লেখকদের উপর প্রচ্ছন্নভাবে, হাজার হোক রুষ-সীমান্তেই তো এ সাহিত্যের জন্ম!

—তাহ'লেও তাঁরা এ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতে পারেন নি।

আগেই বলেছি **আইজ্যাক্ লোব্ পেরেজ**কে ইহুদি সাহিত্যের জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না, ইনিই অতি-আধুনিক ইহুদি সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক, সমালোচকদের মতে। ইনি প্রথমে হিব্রু ভাষায় লিখতে সুরু করেন, কিন্তু পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারেন না বলে' ইনি পরে ইহুদি ভাষায় লিখতে থাকেন। ইহুদি ভাষা জনসাধারণের ভাষা, তাই জনসাধারণের চোখে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়তে বিলম্ব দেরী হোল না, তাঁর রচনার আদরও হোল খুব শীঘ্রই। ছোট গল্পগুলিকে যেরূপ নিপুণ চিত্রকরের মত তিনি রূপ দিতে পারতেন, ঐশ্বরিক প্রতিভা না থাকলে তেমন কেউ পারে না। তাই তিনি অন্যান্য লেখক-গণের অনুকরণীয় হয়েছিলেন অচিরেই। এঁর গল্পগুলির টেক্‌নিকের মধ্যে রুষ প্রভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদী-জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের ধারা তিনি অপূর্ব্ব দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন বলেই ইহুদি সাহিত্য তাঁকে আপনার বলে' গর্ব্ব বোধ করতে লজ্জিত হবে না মোটেই। 'ইহুদি টেল্‌স্' এঁর প্রসিদ্ধ গল্পের বই—এখানি বিশ্ব-সাহিত্যে বিশেষ ভাবে আদৃত হয়েছে।

আঠারো-শো-একান্ন খৃষ্টাব্দে ইনি পোলোণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, এক অতি-সাধারণ গৃহস্থ ঘরে। তরুণ বয়স থেকেই ইনি লিখতে সুরু করেন—প্রথমে হিব্রু পরে ইহুদি ভাষায় এঁর জীবিতাবস্থাই এঁর গল্পগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইনি সুন্দর এই ধরণীর বুক থেকে বিদায় নেন।

•

র‍্যাবিনোভিচ্—পেরেজেরই সমসাময়িক। রুষিয়ায় এঁর জন্ম হয় আঠারো-শো-ঊনষাট খৃষ্টাব্দে। ইনি লিখতে সুরু করেন **সোলোম্ র‍্যাবিনোভিচ্** নাম দিয়ে—এই নামেই ইনি ইহুদি সাহিত্যে পরিচিত, এঁর আসল নামে এঁকে চিন্‌বে খুব কম পাঠকই। সমসাময়িক সব ক'টি

লেখকের মধ্যে ইনি ছিলেন সকলের চেয়ে সুপুরুষ—মাথায় কাঁকড়া কাঁকড়া কোঁকড়া চুল, প্রশস্ত কপালের নীচে দীপ্তিভরা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি, উন্নত নাসা, সুন্দর সবল ভাবব্যঞ্জিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব। চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে এমন অপূর্ব্ব বেদনার আভাষ ইনি দিতে পারতেন যা' এঁর সমসাময়িক লেখকরা সৃষ্টি করতে পারতেন না; আবার সেই বেদনার মধ্যেই স্থানে স্থানে তিনি এমনি হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারতেন যাতে বেদনা-টুকু আরো ঘনীভূত হ'য়ে উঠে' পাঠকদের বুকের অশ্রুর উৎসমুখে এসে যাচ্ছো। এইখানেই তাঁর রচনার কৃতিত্ব। ইহুদী-জীবনের অতিতিক্ত ঘটনাগুলোকেও তিনি অপূর্ব্ব সহানুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সত্যিকারের শিল্পীর মত। এঁর গল্পগুলিও বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ আদৃত হয়েছে ও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। উনিশ শো-ষোল খৃষ্টাব্দে ইনি ধরিত্রীর বুকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইস্রেল্ হাংরিজ্ তাঁর ছদ্মনাম **লিবিন্** নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। রুশিয়ায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন আঠারো-শো-বাহাত্তর খৃষ্টাব্দে। ছোট গল্প ইনি লিখেছেন খুব কম, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সেগুলি উজ্জ্বল রত্ন-স্বরূপ! ইহুদী জীবনের দারিদ্র্য ও শ্রমিক সংসারের ছবি তাঁর লেখনীর মুখে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। সামান্য খুঁটি-নাটি ঘটনাগুলিকেও তিনি দক্ষতার সঙ্গে রূপ দিয়ে সুন্দর করে' তুলেছেন। তাঁর লেখনী-পরিচালনার আদর্শই হ'চ্ছে দুঃস্থ ইহুদী-সংসারের বিপর্য্যয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করা। এই দিক দিয়ে তাঁর গল্পগুলো প্রকাশভঙ্গীর সারল্যে ও সাধারণ রসবোধে সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। এঁর জীবনের অধিকাংশ বছরই অতিবাহিত হ'য়ে যায় যুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে—এখনও ইনি আছেন যুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সেই। এঁর "পিক্‌নিক্" গল্পটি বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। শ্রমিকজীবনের সুখের চড়া, সামান্য বিপর্য্যয়ে সে সুখভোগের পরিকল্পনা শ্রমজীবীর মনে কতটা অতৃপ্তির ব্যথা ঘনীভূত করে' তোলে তা'ই ইনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পটির মধ্যে।

যে সব রুশ লেখক রুশ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে সুপরিচিত করে' তুলতে না পেরে ইংরিশ্ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ করেন, **আব্রাহাম্ রৈজিন্** সেই দলেরই একজন। ইনি একাধারে কবি ও গল্পলেখক হিসাবে ইংরিশ্ সাহিত্যে সুপরিচিত। এঁর গল্পগুলো খুবই জনপ্রিয়। ইনি অদৃষ্টবাদী; নিশ্চয় অদৃষ্টের নিষ্ঠুর ভ্রূভঙ্গীতে ভবিষ্যতের সুন্দর মোহ কি নিদারুণ আঘাত পায়, দীনদুঃখী ইহুদী-জীবনের মধ্য দিয়ে তাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন চমৎ-কার ভাবে। তাঁর "বিশু" গল্পটিতে তাঁর এই সব রচনা-বৈশিষ্ট্য অসাধারণ ভাবে ফুটে উঠেছে বলেই বহু বিভিন্ন ভাষায় এই গল্পটি অনূদিত হ'য়ে গেছে ও বিশ্বের সাহিত্য-রসিক পাঠকপাঠিকাদের কাছে তাঁকে সুপরিচিত করে' দিয়েছে। এঁর বয়স এখন ছাপান্ন বছর। যুনাইটেড ষ্টেট্‌সেই ইনি এখন আছেন।

•

সোলোম্ র‍্যাশ্এর নাম না করলে ইংরিশ সাহিত্যের পরিচয়ই র'য়ে যায় অসম্পূর্ণ। আঠারো-শো-আশী খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডে এঁর জন্ম। এঁর বহুমুখী প্রতিভা ইংরিশ্ সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করেছে বিশেষ ভাবেই—ইনি একাধারে গল্প, উপন্যাস, নাটক ও ছোট ছোট কবিতাও (দু'একটা) লিখেছেন। পেরেৎসের মত ইনিও প্রথম সুরু করেন হিব্রু ভাষায় লিখতে। কিন্তু হিব্রু ভাষা গণ-ভাষা নয় বলে' ওঁর লেখা হিব্রু-অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে বিশেষ আদৃত হোল না;—তাই দেখে তিনি ইংরাজীতে লিখতে সুরু করেন। এঁর নাটক "প্রতিহিংসার দেবতা" ইংরাজীতে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিউ-য়োর্কের সেন্সর্ থেকে বন্ধ হ'য়ে যায়। বইখানা তিনি শেষ করেন বহুদিনের ঘত্নে ও পরিশ্রমে; তাই এই ঘটনায় তিনি ব্যথিত হ'য়ে পড়লেন খুবই। ইংরাজী ভাষায় লিখতে তাঁর মন বিরূপ হ'য়ে গ্যালো; তিনি সুরু করলেন ইংরিশ্ ভাষায় লিখতে। এঁর উপন্যাস ও গল্পের প্রকাশভঙ্গীতে দুর্ব্বলতা দেখা যায় বিশেষ ভাবেই, কিন্তু তাই বলে' এঁর গল্প ও উপন্যাস পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না এমন ধারণা কেউ যেন না করেন। ইংরিশ্ পাঠক-পাঠিকাদের ইনি বিশেষ প্রিয়—কেন না

ঠিক যতটুকু লেখানে বলার দরকার তার বেশী একটা কথাও তিনি বলেন না, আর তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলোর মধ্যে চমৎকার এমনি একটা নাটকীয় ভাব আছে যা সবসময়ই মনকে তৃপ্ত করে' তোলে।

গ্যাশের মত **ডেভিড্ পিন্স্কী**ও এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। রুশিয়াতেই এঁর জন্ম আঠারো-শো-বাহাত্তর খৃষ্টাব্দে। এঁর জীবনের বেশীর ভাগই প্যাছে বিদেশে প্রথমে জার্মানী, পরে য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে বিদেশে অধিকাংশ জীবনকাল অতিবাহিত করলেও স্বজাতির সুখ-দুঃখ-কষ্ট-অশান্তিকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলবার মত পর্য্যবেক্ষণ তিনি লাভ করলেন কেমন করে'! ইহুদি সাহিত্যে আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ছোট গল্পেও তাঁর হাত চমৎকার। এঁর লেখার ধরণ, প্রকাশভঙ্গী, বর্ণনাকৌশল বেশ বস্তুসুরে এবং পারিপাট্য ও প্রতিভার পরিচায়ক। মানবজীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখবার মত পূর্ণদৃষ্টি তাঁর মত ইহুদি সাহিত্যে আর কারো নাই। গল্প ও নাটকের কথাবস্তু তিনি বেছে নেন সাধারণ অতিদরিদ্র শ্রমিক-পরিবারের জীবন থেকে; এজন্য তাঁর গল্পগুলো সাধারণতঃই সহানুভূতিপ্রবণ হ'য়ে পড়ে। শ্রমিকজীবনের সত্যিকারের রূপ তিনি ফুটিয়ে তোলেন—ভাল-মন্দের কোন বিচারই তিনি করেন না। সেইজন্যই হয়তো সেদিন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা "প্রলোভন" নামক গল্পটি নিউ-য়োর্কের সেন্সর্ কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেছে বিশেষ কোন কারণ না জানিয়েই। এঁর নায়ক নায়িকা—তা তা'রা যতই সমাজনীতিবিরুদ্ধ কাজ করুক্ না কেন, তাদের জীবনের অতৃপ্তি পাঠক-পাঠিকার বুকে দীর্ঘশ্বাস জাগাবেই—এইখানেই তাঁর চরিত্রসৃষ্টি: নৈপুণ্য। লেখক হিসাবে এইটুকুর জন্যই তিনি সত্যিকারের শিল্পী। ইনি এখন আছেন য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সে প্রায় কুড়ি বছর ধরে'।

আর যে সব ইহুদি লেখক এ যুগে প্রাধান্য লাভ করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে আর আলোচনা করতে চাই না, কেন না তাঁদের লেখার মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের চেয়ে উপরিউক্ত লেখকগণ বা কয় লেখকগণের প্রভাব বিশেষভাবেই প্রকাশ পেয়েছে—কিন্তু তাই বলে তাঁদের প্রতিভাকে আমরা অস্বীকার করছি না।

আপনার সব কাজ আপনি করতে পারা

শ্রী শিবাপ্রসন্ন বসু

জ্ঞান হ'বার সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌লাম বাবা, কাকা, দাদা ইত্যাদি বাড়ীর বড়ো বড়ো লোকেরা বিনা বাধায় আপনার ইচ্ছা অনুসারে রোজ একলা সহরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ান, আর বাড়ী এসে কতরকম মজার মজার গল্প করেন তার ঠিক নেই; কিন্তু আমরা, ছোট ছেলেরা, যদি একবার সদরের সীমানার ভুল করে' গিয়ে পড়্‌লাম ত ছুটে আস্‌তেন বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠরা নানারকম আদেশ, উপদেশ ও নীতি-পূর্ণ কথার ঝুড়ি নিয়ে, যা শুনে আমরা আমাদের এই ভয়ঙ্কর ভুল হ'তে সাবধান হ'তে শিখি।

তখন সেই গল্পগুলোকে সত্য ঘটনা বলে' মনে কর্‌তাম। তাই তাঁদের আদেশগুলো মান্‌তে বাধ্য হ'তাম। কিন্তু মনটা নিভৃত কোণে বসে' বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌তো তাঁদের এই পক্ষপাতিত্ব দেখে, কিন্তু প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌তে সাহস পেত না—আপন মনেই দু'একবার গর্জন করে' ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ হ'য়ে পড়্‌তো চরে।

এই মনোভাব একদিন মায়ের কাছে আভাষে প্রকাশ করে' ফেল্‌লাম। মা তো সমস্ত শুনে একটু হাস্‌লেন; হেসে বল্‌লেন—'ওরা সব যে এখন বড়ো হয়েছে বাবা,—তুমিও যখন ওদের মতন বড়ো হবে তখন ঠিক ওদেরই মতন আপন ইচ্ছায় বেড়াতে পার্‌বে—তখন এই বাল্যের কঠোর বিধি-নিষেধগুলো আপনিই লোপ পাবে।'

তখন মনে ভাব্‌তাম বুঝি বড়োদের মতন কেবল লম্বা-চওড়া হলেই বড়ো বলে' সবাই মান্‌বে—তাই সমবয়সীদের সঙ্গে লেগে গেলাম পরামর্শ কর্‌তে কি করে' দেহটাকে বাড়ানো যায়। একজন একটু সাহস করে', আমাদের চেয়ে কিছু বেশী বয়সের বড়ো এক বুরুব্বির কাছে গেল হদিস্ নিতে। তিনি যা উপায় বাৎলালেন সেটা আমাদের সকলের মনের মতো হওয়ায় আমরা লেগে গেলাম তার সাজ সরঞ্জাম যোগাড় কর্‌তে; কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য-বশতঃ আমরা শরীর ফাঁপাবার মালমশলা কিছুই যোগাড় কর্‌তে পার্‌লাম না—পার্‌লে নিশ্চয়ই আকাশের মতন বড়ো হ'য়ে, হাওয়ায় চড়ে' এতদিনে স্বর্গ দেখে আস্‌তাম, আর সেই কাহিনী জল দিয়ে লিখ্‌তে বসে' যেতাম মাটির ওপর, আর একবার।

একদিন কে কি কথায় বল্লেন—'বয়স যত না এগোক, দেহের বাড় এগিয়েছে অনেকটা···'কি ঐ রকম কোন কথা, যার মানেতে সেদিন থেকে বুঝ্‌লাম বয়স না এগোলে শরীর ফাঁপ্‌তে ফুল্‌তে পারে না, আর যদি বা হঠাৎ ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ অসময়ে যা'র দেহ ফেঁপে ফুলে একশা হ'য়ে বড়োর সঙ্গে পাল্লা দিতে চেষ্টা করে' সে নাকি সকলের ঘৃণ্য হ'তে বাধ্য হয়। সমস্ত শুনে ত একটু ভয় হ'ল, তাই আস্তে-আস্তে মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"আমার বয়স কত?"

মা বল্লেন, 'আট বছর—'

মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়্‌লাম—সবে আট,—এখনও কত আট সেকলে তবে যে বুড়ো হব তার ঠিক নেই।

আমাদের বাড়ীর চাকর শুভ ছিল সব চেয়ে স্বাধীন, কেন না সে এক এক মিনিট অন্তর রাস্তায় যেত বেড়াতে আর তার চেহারাটা ছিল বেশ মোটা সোটা—অন্ততঃ তার পা'দুখানা ছিল খুবই মোটা। তার সেই চেহারা দেখে ভাব্‌তাম, সেই বুঝি বাড়ীর সব চেয়ে বড়ো। সব চেয়ে বড়ো না হ'লে কি আর অতো স্বাধীন হ'তে পারে!

একদিন চুপি চুপি শুভকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—তোমার বয়স কত?

'চল্লিশ বছর—'

'ও বাবা—চারের পিঠে শূন্য চল্লিশ! আচ্ছা, আমার কবে তোমার মতন চল্লিশ বছর বয়স হবে?'

শুভ হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—'কেন?'

'চল্লিশ বছর বয়স হ'লে তোমার মতন বড়ো হবো,

তোমার অমন মোটা মোটা পা হবে, আর আপন ইচ্ছায় বেড়িয়ে বেড়াবে সমস্ত কলকাতা।'

ভণ্ড ছেলে বলে—'একদিন তোমার বয়স চল্লিশ বছর যে হবে তাতে কোন ভুল নেই, কিন্তু দাদাবাবু এই আমার মতন মোটা মোটা পা যেন তোমার কখনো না হয়।' কথাটা তখন ভালো লাগেনি।

বয়স তখন সবে আট,—চল্লিশ হ'তে যে বেশী দেরী নেই ভণ্ড বলে' দিয়েছে—তবু আমি বোজ বয়সকে বারে বারে বলতে লাগ্‌লাম একটু জোরে হাঁটতে। কিন্তু সে তার মর্জ্জিমতন চলতে লাগ্‌ল পল, প্রহর, দণ্ড, দিন, রাত্রি, বার, সপ্তাহ, পক্ষ, মাসের ঘোরানো ঘোরানো গলির মধ্য দিয়ে, বছরের বড় বড় রাস্তার দিকে হেলতে দুলতে একপা একপা করে'...বড় রাস্তা পার,—সেটা পেরিয়ে আবার সেই গলির রাজ্যে ঢুকে ঘুরতে আরম্ভ করে খুব ধীরে ধীরে। আমার অসহ্য মনে হয়; কিন্তু সে আমার কথা মোটেই কানে তোলে না—চলতে থাকে নিজের গোঁয়ে।

অনেকগুলো রাস্তা পেরিয়ে আসবার পর শুনলাম আমি যার খোঁজে বেরিয়েছি তার নাম সাবালক হওয়া। ঐ সাবালকির খোঁজে এমন অনেক বড় বড় লোকও বেরিয়েছেন যাঁরা আমার ঈপ্সিত ধন লাভ করেছেন অনেকদিন আগে।

খোঁজ নিয়ে, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনারা কোন্ পথে চলেছেন?'

দলের মধ্য হ'তে একজন বললেন—'স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের পথে। তুমিও এসো না আমাদের সঙ্গে!'

আমি তখন সবে 'কোঁকোর কোঁ' মাংসের স্বাদ পেয়েছি, তাই ধর্ম্মের কথাটা ভালো লাগ্‌ল না, আর স্বার্থ জিনিষটার স্বরূপ তখনও ঠিক্ ভালো করে' ধরতে না পারলেও মনে মনে তাকে আমার সাবালকির সহায় ভেবে ত্যাগ করতে পারলাম না—বৈরাগ্য দূরেই রইল। ঐ দুটো কথাই যখন মনে লাগ্‌ল না তখন আর কোন কথা না বলে' চলতে লাগ্‌লাম বয়সের ক'ড়ে আঙুলটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে', তাঁদের পেছনে ফেলে'।

আরো কিছুক্ষণ চলবার পর,—তখন বোধহয় আরো দু'টো বড় রাস্তা পেছনে ফেলে এসেছি—একটু ছায়ায় দাঁড়িয়েছি বিশ্রামের আশায়,—এমন সময় শুনলাম কতকগুলি নরনারী বেরিয়েছেন স্ত্রীজাতির সাবালকির জন্যে।

স্ত্রীজাতি কবে যে সাবালিকা ছিল তা আমার মনে পড়লো না। না পড়বারই কথা।

বাড়ীতে দেখি মা দিব্যি সিন্দুক খুলে আপনার ইচ্ছামত টাকা বা'র করে' ভণ্ডকে বাজারে পাঠান,—দুধের দাম, ধোপার দাম, ঝি-চাকরের মাইনে দেন;—সে-কি দু' এক টাকা? একেবারে গোছা গোছা!—কিন্তু ঐ যে অত টাকা খরচ করেন তাতে তো বাবা কিংবা আমরা কেউই বাধা দিই না—হিসাব চাই না? তিনি বেশ হাসিমুখে রান্না করেন, সকলকে পরিবেষণ করে' খাওয়ান,—আবার কারুর, সে আমাদেরই হোক্ আর বাবার ই হোক্, অসুখ করলে, ব্রেদ্, দুধ, সাগু, কি বার্লী ওয়াটার্ নুন্ নেবুর রস কি চিনি দিয়ে খেতে দেন ভাত-ডাল তরি-তরকারীর বদলে। তাতে জিভে মিষ্টি না বলে' ভাত খাওয়ার জন্যে বেশী বিরক্ত করলে এমন রাগ করেন যে আর একবার 'না' বলবারও সাহস থাকে না কারো।

মা শিল্পীবাড়ী মানুষ—তাঁর কথা ছেড়েই দিলাম না হয়; কিন্তু বৌদি, এই সেদিন যার বিয়েতে আমি নিজে দু'পাতা ভরতি করে' পদ্য লিখ্‌লাম, বাড়ীর সকলে যেখানা পড়ে' চমৎকার হয়েছে বলেও অন্ত একখানা লিখে ছাপিয়েছিল, সে যে তার কাঁদুনে ছোট্টো ছেলেটা কাঁদলে পরেই ছুটে এসে দু'চারটে মধুসূদন পীল খাইয়ে দেয়, কই তাতে ত কেউ বারণ করেও থামাতে পারিনি। মেয়েদের এত প্রতাপ তবু কিনা বলে 'আমরা অবালিকা।' এই সব ভাবতে ভাবতে যেই মনে হ'ল হয় এঁরা নিছক মিথ্যাবাদী, নয় বদ্ধপাগল, অমনি মনটা খুব খুশী হ'য়ে বিশ্রামের কথা ভুলে গিয়ে আবার চলতে লাগ্‌লো।

রাস্তা যত পেছিয়ে আসতে লাগ্‌ল নতুন নতুন কত জিনিষ যে চোখে পড়তে লাগ্‌ল তার আর ঠিক্ নেই; ঐ সবের কিছু বা পারতাম বুঝতে কিছু বা পারতাম না।

এমনি করে' যখন উনিশটা পেরিয়ে কুড়িটার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম, তখন হঠাৎ কি মনে হওয়ায় পেছনে ফেলে

আসা রাস্তাটার দিকে একবার ফিরে দেখ্‌লাম। বাঁধা-নিয়মে বোঝাই মোটটা একবার খুলে দেখ্‌তে গিয়ে দেখ্‌লাম কতগুলো পুরাতন বাঁধন যে রাস্তার মাঝে হারিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু কতকগুলো হারিয়ে যাওয়ায় আমার পথচলা যে সহজ হয়েছে তা নয়; উল্টে এত ভারী হ'য়ে উঠেছে যে একপা চল্‌তে গেলেই হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয়।

এখন আমি বড়োর মধ্যে একজন—বাল্যের সেই বাহিত সাবালকি এখন আমার করতলগত। কিন্তু যখন বুঝি আমি এখন সাবালক হয়েও আমার আপনার সব কাজ আপন ইচ্ছামত কর্‌তে পারি না তখন চোখ ভরে' আসে জল। মা'কে এখন জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা করে—কই মা আমার সেই স্বপ্ন যার রঙে আমার শৈশব রঙীন হ'য়ে উঠ্‌ত,—মুনিষ গন্ধে বালামল মাতাল হ'তো,—মনোহর মূর্ত্তি দেখে মোহিত হতাম?

মালতী

শ্রী কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

[শুধু কল্পনার বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা কথার গাঁথা কাহিনীই নয়—এ মালতী। চোখের সুমুখে এই নিরপরাধ মেয়েটির তিলে তিলে-মরা জীবন্ত মরণের ছবি দেখে শিউরে উঠেছি। আজ সে মরণের ওপারে; তাই এ কাহিনী আপনাদের সাম্‌নে তুলে ধরার বাধা হোল না।]

বাপ-মা মরার কতদিন পর দাদা দিল মোর বিয়ে
কিছু মনে নাই,—চলি বেদনার অসহন ভার নিয়ে।
পারিনাক আর বহিতে জীবন এই আজি মনে হয়;
তাই দিতে চাই মরণের আগে আপনার পরিচয়:—
হয়তো কেহই শুনিতে চাবে না দুঃখের ইতিহাস,
তবু জানাবোয়।—না হয় করিও যদি কর উপহাস।
কারণ, জানি যে আমারি মতন বেঁচে-মরা মেয়ে আছে
জানাতে জানে না মনের বেদনা যাহারা তাহারো কাছে;
আপনারে খালি দুঃখের আগুনে পোড়াইছে পলে পলে,
ছিম হ'য়ে গেছে কলিজা তাদের কাতর আঁখির জলে!
শুধু সান্ত্বনা রাখিয়াছে তারা—আছে আছে ভগবান,
সময় হইলে করিবেন তিনি বেদনার অবসান!···
জ্বালা, অপমান আমার জীবনে আজিকে বেঁধেছে ঘর,—
নিরাশার মাঝ দিয়েছে এ মোর মরমের বালুচর।

অপরাধ শোন,—আমার জীবনে স্বামীর আপন যান
সন্তান এলো; জনক করিল জন্মের অপমান!···
তত বাজে নাই মোর বুকে তাই···মোর নামে কালি ছেলে
পেল না সে সুখ, কহিল আমায়, ও নয় উহার ছেলে;
এই অছিলায় দিল সে আমায় ঘরের বাহির করি';—
কচি শিশুটিরে বুকে নিয়া শেষে চলিলাম পথ ধরি'।
জানিনাক পথ,—দেখাবে কে পথ, ঝরিল চোখের জল,
বাউরীর মেয়ে 'বীরুমী' কহিল, কেঁদে কি হইবে বল!
'বাসিনি'রে নিয়া স্বামী তোর এবে হাসিয়া কাটাক্ কাল,—
পথের বিধবা গতি হোক্ বাছা, তুই গেলি রসাতল!
ঝর, মুখপুড়ী বাসীর সেদিনো মুখে কথা ফোটে নাই,
তিনটি সোনার চাঁদের মা হ'য়ে মুখে সে লেপিল ছাই···
আবাগীর লাগি' মা-পোরে তোরা যে আজ সহহারা হ'লি,
কুলটার ছাড়ি' ঘর-দোর তোর যৌ তুই যাবি চলি'!
কহিনু, বীরুমা তা'ছাড়া আমার পথ কি জগতে আছে?—
তবে বল্ বাছা!···মোরে সে কহিল, নিয়ে যাব কার কাছে?
কোথা যাব? মোরে নিয়ে যাবে কোথা? তাকনায় কাঁদে মন,
বাপ-মার কাছে দাদাও গিয়াছে! কে আছে আপন জন?
মনে পড়ে' গেল বুড়ো পিসি মোর আজিও রয়েছে বেঁচে,

অসহায় আমি তাই কাছে যাই ভিখারীর মত হেঁটে !
তার বুকে আছো মোর লাগি' আছে মায়ের মতন স্নেহ,—
কোল পেতে নেবে ডাকের টানে সে ছাড়া নাই ত কেহ !

বীরুণী চলিল আগু পথ ধরি' আমি পিছু চলি ধীরে,
চেনা পথখানি ছবির মতন ফুটিল মনের তীরে :—
'দেশ্‌লা'র মাঠ পারায়ে হেরিনু অদূরে কুসুমপুর,
রাজকুসুমের বন দেখা যায়—আর নয় বহুদূর।
চরণ চলে না গাঁয় পথে আর,—ভাবিনু গলগ্রহ
কাহারে আবার জ্বালাতে এলাম ?—মন কাঁদে অহরহ !
বীরুণী কহিল, চল্ বাছা চল্—ওই ত পিসির বাড়ী,
ক্ষুধা রোদ খেয়ে হাঁপিয়ে পড়েছি, দাঁড়াতে না আর পারি।

চোরের মতন বসিলাম গেয়ে পিসির দাওয়ায় এসে···
আদরে আমায় টেনে নিল পিসি মার মত ভালবেসে !
দু'পহর রোদে বীরুণী আমায় হাপিয়া চলিল কেঁদে,—
ভিখারিণী আমি—সে গেল আমায় চির-ঋণ দিয়া বেঁধে !
আমায় লভিয়া দেখা পিসিমার ছেলে-বউ গেল পর,
আমি কোথাকার পাপ যেন এসে ভাঙিনু সুখের ঘর।

মরণ দেবতা ভগবানে তাই প্রাণধন দিয়া ডাকি :—
কহি, প্রভু মোরে মরণ দানিয়া সম্মান দেবে নাকি ?
ভয়হারী মোরে অভয় দানিল,—দয়াল করুণাময় !—
ক্ষয় দিয়া মোর নারীর জীবন করিলেন অক্ষয় !
খালি বুক মোর অনাথ আমার রহিল অনাথ কোলে,—
তাহারে আশিস্ মা হোয়ে দিলাম তোমাদের বলে' কয়ে'।

* * *

মঙ্গলের ঘন ছিলাম শিয়রে, গুণিনী মালতী মেয়ে
ডাকিল—অনাথ,বুকে আয় বাবা !·· জল প'ল চোখ বেয়ে।
মোর চোখদুটি ভরিয়া উঠিল মা হওয়ার বেদনায় ;—
সকলের চোখ হইল সজল মঙ্গলের মহিমায় !
জননীর হাসি ফুটিয়া উঠিল শিশুর চুমার ভরে,
মঙ্গলও ব'ল হাসিটুকু লেখা মায়ের ঠোঁটের 'পরে।
এক বছরের কচি শিশুছেলে না পেলে মায়ের স্তন,
ডোমেদের ঘরে হেলা-অনাদরে বাঁচে আর কতখন !
অনাথের মরা তাই দেখিলাম এমনি করদিন পর ..
রহিল সেদিন মনে পুনরায় বেদনার নির্ঝর !

আজো মোর চোখে ভরে'আসে জল মনে হ'লে এই ছবি,—
"মালতী মা"দের সুখে আজো কাঁদি আমি পল্লীর কবি।

অগ্নিশিখা

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

কলকাতার শীতের সন্ধ্যা ; ধোঁয়ায়, ধূলায়, কালিতে আগত সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে' এনেছে। কর্ম-ক্লান্ত কেরাণীর দল গৃহমুখে ফিরে' চলেছে। পথে যেতে যেতে বিষ্ণুপ্রিয় চারদিকের বাড়ীগুলি দেখে দেখে যাচ্ছে। তার ইচ্ছা একটা ছোটখাট বাসা ঠিক করে। কাজে ঢুকে পর্য্যন্ত অর্থাভাবে স্ত্রীকে আনতে পারে নি। মেসে কায়ক্লেশে দিন চলে' যায়। এখানের আয় থেকে এতদিনে কিছু সংস্থান করে' বাসা করে' থাকার আশা করতে পারছে, কিন্তু সুবিধামত বাসা মিলছে না।

পথিক বন্ধুদের ছেড়ে বিষ্ণু একটা গলির ভিতর দিকে বাসা খুঁজতে খুঁজতে চল্ল। প্রশস্ত রাজপথে বাসা পাওয়া অসম্ভব। গলির ধূমাচ্ছন্ন বায়ু ভেদ করে' যেতে যেতে এক-স্থানে একটি জীর্ণ গৃহের গায় লেখা "ভাড়া দেওয়া হইবে"।

বিষ্ণু বাড়ীটির উপর-নীচে তাকিয়ে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলে। এই বাড়ী!—বাড়ীর গায় বহুদিন সংস্কার হয়নি; চার পাঁচ ঘা'র করা কলাই চেহারা। স্থানে স্থানে পুরানো গোলাপী রংএর এক একটা ছমাটের ভগ্নাংশ দেয়ালকে অবলম্বন করে' পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। জানালা দরজার গায় কোন্‌কালে কি রং ছিল বোঝা যায় না। নীচে দুটি দরজা পাশাপাশি, একটার গায় কেবল কাগজের ফলক টাঙানো। অপর দরজার ফাঁক দিয়ে বিষ্ণু অনেক চেষ্টায় বুঝ্‌ল যে মানুষ আছে। দরজায় ঘা দিয়ে ডাক দিলে—"কেউ বাড়ী আছেন নাকি?" কোন সাড়া নেই। আবার ঘা দিয়ে জোরগলায় ডাকার পর ভিতরে মানুষের পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। দরজা খুলে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক বল্লে, "কি চাই মশাই—" স্ত্রীলোকটির ময়লা কাপড়, রুক্ষ চেহারা দেখে তাকে কি বলে' অনুমান হ'ল। তার পাশে এসে দাঁড়াল একটি বছর তিনেকের ছেলে—ছুটফুটে রং, টানা টানা বড় চোখদুটি ভীত-কাতর, সুন্দর দেহে অযত্নের ময়লা পড়ে' ম্লান দেখাচ্ছে; ছেলেটির দিক থেকে বিষ্ণু আর চোখ ফেরাতে পারল না।

মুগ্ধ বিষ্ণু কিন্তু কথার উত্তর না দেওয়ায় কি ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে, "কি মানুষ বটে! চাই কি তোমার, কথা নেই? যাও বাবু।"

অপ্রস্তুত হ'য়ে বিষ্ণু বল্লে, "এই বাড়ীটা ভাড়া চাই, কত ভাড়া, কে ভাড়া দেবে খোঁজ করতে এসেছি। বল্‌তে পার তুমি?" "হাঁ পারিযৈ কি—তবে তোমরা কতজন লোক থাকবে শুনি; আমাদের বাবু আবার লোক বেশী হ'লে ভাড়া দেবেন না। বড় জোর তিন-চার জন। ভাড়া ২৭৲ টাকার কম হবে না।"

বিষ্ণু বল্লে, "লোক বেশী নই আমরা, কিন্তু ঘর এত মোটে দুখানা, তারই এত ভাড়া? বাবুর সঙ্গে কখন দেখা হবে?" "সে বল্‌তে পারি না। তোমার ইচ্ছে বাবু এতেই রাজী হও, না হ'লে অন্যত্র দেখ।"

আর কত খুঁজবে! আজ একমাস ত হ'ল, কত বাড়ীই দেখ্‌লে—দেশ থেকে চিঠি এসেছে সে কথা মনে হতেই আর ইতস্ততঃ না করে' বিষ্ণু বল্লে, "আচ্ছা, কাল আসব, ভাড়া দিয়ে বাড়ী ঠিক করে' যাব। খুলে একটু পরিষ্কার করিয়ে রাখতে পারবে?"

"সে বাবু তোমরা নিজেরা করিয়ে নিও; অত কে করবে।" ছোট ছেলেটি একটু উঁকি দিয়ে বল্লে, "তুমি আসবে কাল?"

"আসব বৈ কি! তোমার নাম কি খোকা?"

"আমার নাম গোপাল।"

"সত্যি তুমি গোপাল।"

কি ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বল্লে, "যা যা ভেতরে যা। ...তা মশায়ের নাম কি?"

কিন্তু কর্ত্রীর ও রুক্ষ ব্যবহারে বাড়ী ভাড়া নেবার সখ বিষ্ণুর একেবারে চলে' গেল। তবু ছেলেটির মুখে কি যেন মায়া মাখানো—দেখে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছে না। তাই বল্লে, "আমার নাম শ্রী বিষ্ণুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।" "ব্রাহ্মণ—তা ভাল, তাহ'লে অন্যলোককে আর কথা দেব না।" "আচ্ছা"—বলে' দ্রুতপদে বিষ্ণু গলির মোড় ঘুরে গেল।

দুই

এই আবর্জ্জনার মধ্যে ঐ জরাজীর্ণ বাড়ী, এই রুক্ষ কির শাসন সবই যেন তার কেমন শ্রীহীন লাগল। কতকাল পরে তার প্রাণের নবীন আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার নূতন সংসার পাতা। কত কবিত্ব, কত শোভা, সুন্দর কল্পনা কোথায় ভেসে গেল। তার পরিবর্ত্তে এই বস্তুগুলির মধ্যে এসে তার স্ত্রীকে থাকতে হবে, এই কথা মনে করতে তার কষ্ট হ'ল। তবে ঐ গোপালটিকে যদি কাছে পায়, তবে সারা দিন তার সঙ্গীর দরকার হবে না। কি সুন্দর ছেলেটি! অন্যমনে মেসের পথে ফিরে চল্ল—পথে গ্যাস জ্বলে' জ্যোতিহীন চোখের মত অন্ধকারের বুকে ফুটে আছে। বিষ্ণুর মনটি আশা নিরাশায় ভারাক্রান্ত।

পরদিন শনিবার সকাল সকাল আফিস থেকে ফিরে এসে নূতন বাসাটাকে দিনের আলোয় দেখার জন্য বেরিয়ে পড়্‌ল। সন্ধ্যার অন্ধকারে যেটুকু লুকানো ছিল আলোয় তাই যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বিষ্ণু বিমুখ মনটাকে সাধ্যসাধনায় অনেক করে' এই বাড়ীতেই থাকার জন্য প্রস্তুত করেছে। পল্লীগ্রামে একা স্ত্রী থাকতে পারে না। সম্প্রতি তার মা মারা গেছেন; এতদিন কোনমতেই সুবিধা না করতে পারায় কোন দূর আত্মীয়ার কাছে তাকে রেখে

আস্‌তে হয়েছে। নিকটে আত্মীয়স্বজন নেই, বেশে কার কাছেই বা থাকবে? তাড়াতাড়ি বন্ধুতে মি এসে একটা চাবি দিল ও একটা কাগজে বাড়ী ভাড়া নেবার খস্‌ড়া সই করিয়ে নিলে। ঘর খুলে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দেখে বিষ্ণুর মনটা অনেকটা সুস্থ হ'য়ে এল। দুখানি করে' উপরে নীচে চারখানি ঘর,—নীচের ঘরগুলি বাসোপযোগী নয়, তবে উপরের ঘরগুলি বেশ বড় ও খোলা। সামনে খানিকটা বোয়ানো অপ্রশস্ত বারন্দা রেলিং দিয়ে ঘেরা। ছোট একটু উঠান—কিন্তু কলের ব্যবস্থা আছে। বাড়ীটির মাঝ দিয়ে যেন অর্দ্ধেক ভাগ করে' ভাড়া দেওয়া হয়েছে; অপর পাশের সঙ্গে কোন যোগ নেই। কেবল নীচের বারন্দার শেষে একটা দরজা দুই বাড়ীর মধ্যে। বহুদিন না খুলে তার কব্‌জার কব্‌জার মরচে ধরে' গেছে।

ছুটো কুলী ডেকে বাড়ীটা ধুইয়ে মুছিয়ে রেখে রাত্রির ট্রেনে বিষ্ণু গেল স্ত্রীকে আন্‌তে।

রবিবার সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা থার্ড ক্লাস গাড়ী বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে চাবি বা'র করে' দরজা খুলে বিষ্ণু জিনিষপত্র—ছোটবড় পোঁটলাপুঁটলি সব নামিয়ে দরজায় জমা কর্‌তে লাগ্‌লো। একটা লণ্ঠন বা'র করে' আগে জ্বালিয়ে নিয়ে গাড়ীর ভেতর থেকে স্ত্রীর হাত ধরে' নামালে। সহসা আলোয়ানে আপাদমস্তক ঢাকা গাড়ী থেকে সে মেয়ে দরজার ভেতর গিয়ে দাঁড়াল; ভাড়া নিয়ে গাড়োয়ান চলে' গেল।

রাশীকৃত জিনিষের স্তূপ আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে সর্‌তে লাগ্‌ল। বিষ্ণু ডাক্‌লে, "শুন্‌ছ মঙ্গলা, আর একটা আলো জেলে নাও; জিনিষগুলো এখান থেকে খুলে আস্তে আস্তে উপরে নিয়ে যাওয়া যাক্।" দরজা বন্ধ করে' দুজনে তখন সংসারের কাজে লেগে গেল।

স্ত্রী মঙ্গলার শ্যামসুন্দর দেহে স্বাস্থ্যের ও যৌবনের শ্রী। বড় বড় চোখ মমতায় ভরা। সুগঠিত বলিষ্ঠ হাতের কর্ম্মপটুতায় কিছুক্ষণের মধ্যে জিনিষগুলির কিছু কিছু ব্যবস্থা করে' বিষ্ণু বল্লে, "মঙ্গলা, রাত্রের রান্না কি হবে?" মঙ্গলা বল্লে, "আজ আর রান্না—। চারদিক যে রকম নোংরা হ'য়ে আছে, কাল পরিষ্কার করে' তারপর হবে। সঙ্গে চিঁড়ে, মুড়ি-মুড়্‌কি আর গাছের কলা আছে। আজ রাতে এই দিয়েই কলার করা চল্‌বে। তোমার কষ্ট হবে হয়তো?"

বিষ্ণু হেসে স্ত্রীর মাথাটা নাড়া দিয়ে বল্লে, "তোমার কষ্ট হবে না, আমারই হবে কেন? আজ সত্যিই হাঙ্গামা করে' দরকার নেই। আজ শুছিয়ে নিতে হবে—কাল সকালে তো আবার আপিস! তোমার কয়দিন খুব অসুবিধা হবে—না?" মৃদু হেসে মঙ্গলা বল্লে, "অভ্যাস হ'য়ে যাবে। তুমি কয়দিন খুব তাড়া দিও।"

"কাল সকাল সকাল বাজার যেতে হবে—" বলে' বিষ্ণু বিছানার বাঁধনটা টেনে খুল্‌তে লাগ্‌ল।

"না, কাল বাজার যাবে কেন? অনেক তরকারী আছে, তা ছাড়া প্রায় আধমণ চাল আছে। আস্‌বো বলে' সব ধান বিক্রী করে' দিয়ে, সামান্য কিছু ভানিয়ে নিয়েছিলাম। তুমি যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসো, আমি এগুলো তুলে নিয়ে কাপড় ছেড়ে আস্‌বো।"

বিষ্ণু কলতলায় চলে' গেল। ঘরের ভিতর বিছানা করে' মঙ্গলা কাপড় নিয়ে কলতলায় এসে দেখল বিষ্ণুর হাত মুখ ধোয়া হ'য়ে গেছে। মঙ্গলা বল্লে, "কেমন যেন গা'টা ছম্ ছম্ করছে, তুমি ঐ দিকে একটু দাঁড়াও, আমি এখনি কাপড় ধুয়ে আন্‌ছি।"

বিষ্ণু হেসে বল্লে, "কাল থেকে কি কর্‌বে মঙ্গলা?"

স্ত্রীর চোখদুটি স্বামীর মুখের উপর তুলে মঙ্গলা বল্লে, "এই পাশের বাড়ীতে কি কেউ নেই—?"

বিষ্ণু গলা নামিয়ে বল্লে—"জানি না। সেদিন একটি ছেলে দেখেছিলাম ও একজন মি, আর তো কাউকে দেখিনি। সাড়া শব্দও বড় কিছু পাওয়া যায় না, লোক আছে মনে হয় না যেন; দেখা যাক কেমন চলে।—"

তিন

বিষ্ণু যখন ছোট তখনি তার বাবা মারা যান। সামান্য কিছু জমি থেকে কায়ক্লেশে দিন চালিয়ে বিষ্ণুর মা তাকে কিছু দূর পড়িয়েছিলেন। তারপর পাশের গ্রামের যদুনাথ চাটুয্যের একমাত্র মেয়ে মঙ্গলার সঙ্গে তার বিয়ে দেন। মঙ্গলা তখন সবে এগার বছরের মেয়ে। মঙ্গলার বাপের চেষ্টায় বিষ্ণু আই-এ পর্য্যন্ত পাশ করে' বি-এ পড়্‌তে আরম্ভ করল। এক বছর পরে হঠাৎ শ্বশুর শাশুড়ী মারা গেলেন,

তাতে পড়া ছেড়ে সংসারের সকল দায়িত্ব তখন থেকেই মাথায় নিতে হ'ল। একমাত্র মাকে অবলম্বন করে' তাদের সংসার গড়ে' উঠ্‌ল। মাতৃপিতৃহারা মঙ্গলা শাশুড়ীকেই মা বলে' জান্‌ল। সংসারখানি সেবাযত্ন দিয়েও যখন সে শাশুড়ীকেও ধরে' রাখ্‌তে পার্‌ল না তখন জান্‌ল যে তার ভাগ্য বড়ই মন্দ।

বিষ্ণু কলকাতায় থেকে পঞ্চাশ টাকায় কেরাণীগিরি করে' কোনমতে সংসার চালাত; মা মারা যাবার পর একা স্ত্রীকে গ্রামে রাখা অসম্ভব হওয়ায় তাকে কলকাতায় আনা যাবৃতে হ'ল। কেরাণী হলেও বিষ্ণুর মনটা ছিল স্বাধীন-ভাবাপন্ন। তার সততায় ও কর্মনিপুণতায় তার আয়ও কিছু বৃদ্ধি হয়েছে। সে সারা দিনের কাজের পর হাস্যমুখী গৃহলক্ষ্মীর নিপুণ সেবা লাভ করে' নিজেকে কৃতার্থ মনে করত। হাসি গল্প কৌতুকে সন্ধ্যার পর থেকে যতক্ষণ তারা ঘুমিয়ে না পড়ত তাদের বেশ কেটে যেত। মঙ্গলা সারা দিন গৃহের সকল কাজ সেরে রাখ্‌ত। সন্ধ্যার পর স্বামীর কাছে কখনো কখনো বা সে নানা বিষয় শিক্ষা করত।

দিনের পর দিন কেটে যায়। সুনিপুণ গৃহিণীপনায় বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসারটি সুখী হ'য়ে উঠ্‌ছে। নিজের হাতে সকল কাজ করেও মঙ্গলা অবসর-সময়ে কি করবে ভেবে পেত না।

সপ্তাহ দু' তিন পরে একদিন গভীর রাত্রে পাশের বাড়ীর ভিতর থেকে একটা গোলমাল ও চাপাকান্নার শব্দে মঙ্গলার ঘুম ভেঙে গেল। আস্তে বিষ্ণুকে ঠেলা দিয়ে ডাক্‌ল, "শুন্‌ছ গো ঐ বাড়ীতে কিসের গোল হ'চ্ছে? যেন কে কাঁদ্‌ছে! দিনে লোকের সাড়া পাই না, রাত্রে হুড়োহুড়ি করে কান্না—এ কেমন বাড়ী।"

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বিষ্ণু মঙ্গলার হাতটা টেনে নিয়ে বল্লে, "ঘুমাও তুমি। এ কলকাতায় কত কি গোলমাল হয়—অত ভাব্‌তে গেলে কি চলে, কে কার খবর রাখে!"

আবার দু'চার দিন যায় মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত কর্কশ কণ্ঠের হুঙ্কারধ্বনি শোনা যায়।—কচিৎ কখনও দরজার ফাঁকে ছেলেটিকে দেখা যায়; মঙ্গলা কখনো বাইরে তাকে দেখ্‌লে ডাক্‌লে—যায় কিন্তু হঠাৎ ছেলেটি সেখান থেকে ভিতরে চলে' যায়। যেন কেমন রহস্যজড়িত সবটা! সংসার চলা-ফেরার কোন হাওয়া নেই, হঠাৎ মাঝে এক এক দিন রাত্রে বকাবকি হুড়োহুড়ি কিম্বা কান্নাকাটি শোনা যায় মাত্র।

সেই রকম এক রাত্রে বিষ্ণু ঘুম ভেঙে শুন্‌লে পক্ষ গলা কেবলি শাসিয়ে শাসিয়ে বক্‌ছে আর একটা করুণ কান্নার ঢেউ যেন ঠেলে ঠেলে বা'র হ'য়ে আস্‌ছে।

মঙ্গলা বল্লে, "কি মুস্কিল বল ত, বউটাকে রোজই মারে বোধ হয়; কি স্বামী—উঃ কি কাঁদ্‌ছে!"

বিষ্ণু স্ত্রীকে কাছে টেনে বল্লে, "তোমার স্বামী যদি তোমাকে মারে—"

"ইস্" বলে' মঙ্গলা গভীর সুখে স্বামীর বুকে মাথা রাখ্‌ল। কিন্তু অনেকক্ষণ চলে' গেল, তাদের ঘুম এল না।

বিষ্ণু দিনের বেলায় অনেক চেষ্টায়ও ওবাড়ীর সাড়া ওবাড়ী থেকে কিছু পেল না।

আপিস যাবার আগে মঙ্গলাকে বল্লে, "না দেখে কখনও দোর খুলে দেবে না।"

মঙ্গলা পাণ দুটি স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে বল্লে, "রোজই আস্‌তে তোমার এত দেরী হয়, একদিনও কি সকালে ছুটি হয় না?"

মঙ্গলার গালদুটি টিপে দিয়ে বিষ্ণু বল্লে, "তুমি কি জান, যে এক মিনিট না দেখ্‌লে তোমার জন্যও আমার মন কি রকম ছট্‌ফট্ করে? ও মুখ না দেখে কি বেশীক্ষণ থাকা যায়!—কিন্তু সাহেব তো তোমায় দেখে নি কাজেই ছুটিও দেয় না। যাবে একদিন আপিসে,—বল্‌বে গিয়ে সাহেবকে যেন আমায় শীঘ্রি ছেড়ে দেয়?"

"আহা আমি যেন তাই বল্‌ছি! বেশ—এখন বুঝি দেরী হয় না? খেতে বসে' যত তাড়া, ভাত আর গলা দিয়ে নামে না!"

"ভাতগুলি নামে ঠিক, কিন্তু আমার যে নাম্‌তে ইচ্ছা করে না। কতকালে যে এই ছাই কেরাণীগিরি থেকে রক্ষা পাব তাই ভাব্‌ছি।"

"আচ্ছা উঠ ত এখন; এর পর কবে কোন্‌দিন ট্রাম থেকে পড়্‌তে পড়্‌তে রক্ষা পেলে, কবে চৌদ্দে আপিস

গেলে, এই সব ঘা-তা বানিয়ে বসবে আর আমি ভয়ে মরি!"

"আচ্ছা মঙ্গলা, সত্যি বল ত এখন যদি আমি না যাই, কিম্বা খুব দেরী করে' যাই তবে কি হয়?"

হঠাৎ আনন্দে মঙ্গলার মুখখানি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল··· পরক্ষণেই ম্লান হ'য়ে বল্লে, "কেন মিথ্যা আশা দাও, সাড়ে নয়টা বেজে গেছে—"

এক লাফে উঠে স্ত্রীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়ে রহে, "চল দোর দেবে।"

দোর দিয়ে মঙ্গলা রাস্তার ধারের জানলায় গিয়ে দাঁড়াল; বিধু মোড় ফেরার আগে একবার ফিরে তাকিয়ে গেল।

চার

নিস্তব্ধ বাড়ীটার মধ্যে মঙ্গলার কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগ্‌ল: তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে শোবার ঘরের মেঝেতে বসে' নিজের নিরালা দুপুরটা কি করে' কাটাবে তার আয়োজন নিয়ে বস্‌ল। বিধু তাকে কতক-গুলি রঙীন কাগজ, আঠা, কাঁচি, ছুরী এই সব এনে দিয়েছে, অবসর-সময় তাকে বসে' বসে' কাগজের ফুল কাটা, পাখী তৈরী, ঠোঙা তৈরী এই সব শেখার, কখনও রং ও তুলি দিয়ে পাতা-ফুল আঁকতে দেখিয়ে দেয়। মঙ্গলা সহজ বুদ্ধির জোরে চট্‌পট্ সব শিখে নেয় দেখে বিধুর ভারী আনন্দ হয়,—সেও রবিবার সারাদিন তার সঙ্গে এই সব নিয়ে কাটায়।

একেবারে পল্লীগ্রামের মেয়ে সেই এগারো বছরেরটি এসে পরের ঘরেই মানুষ হয়েছে; সকলের সুখের দিকে তাকিয়ে নিজের কিছু সুখ,সখ বা ইচ্ছা কোনদিন ভাবতেই পারেনি। সামান্য একটু লেখাপড়া সে জান্‌ত, আর তো ঘরের কাজ ছাড়া অন্য কিছুই শিখেনি; অভ্যস্ত কাজগুলি সে নিপুণতার গুণে শীঘ্র শেষ করে' অবসর-সময়টুকু নানা নূতন কাজে ভরে' তুলতে ক্লান্তি বোধ করত না।

বিধু তার উৎসাহপূর্ণ কাজ দেখে তাকে নূতন করে' কি কি কাজ দেওয়া যায় সে বিষয় ভাবতে লাগ্‌ল। আস্তে আস্তে সে অনেক ছোটখাট কাজ শিখাতে লাগ্‌ল—কাগজের ফুল, পাখা, পাখী—এ সব ছাড়াও ঔষধের কৌটা করা, কাঠের কৌটায় রং দিয়ে চিত্র করা এইগুলিও বেশ নিপুণতার সঙ্গে মঙ্গলা শিখে ফেল্‌ল। ঠোঙা সে এত করতে লাগ্‌ল যে এই সব জিনিষ দোকানে দিয়ে ক্রমে তাদের বেশ দু'চার টাকা ঘরে আস্‌তে লাগ্‌ল। প্রথম যেদিন এগুলি নিয়ে বিধু দোকানে দিতে যাবার কথা বল্লে, সেদিন তো মঙ্গলা মহা কপড়া লাগিয়ে দিলে। মুটের মাথায় এক ঝাঁকা ফুল পাখী ঠোঙা চাপিয়ে বিধু রবিবার দিন যখন বার হ'চ্ছে, মঙ্গলা এসে স্বামীর হাত ধরে বল্লে,"কর কি, এগুলো নিয়ে গেলে লোকে যে পাগল বলবে! কি করছ যে তার ঠিক নেই।—"বিধু হেসে বল্লে,"দেখাই যাক্ না এগুলি নিয়ে গিয়ে কি হয়, ঘরে পড়ে' থেকে তো কোন লাভ হবে না—"

মঙ্গলা বল্লে, "হাঁ তোমার মত পাগল কিনা সব, তাই আবার পয়সা দিয়ে কিন্‌বে!"

"দেখোই আগে আমি পাগল কি ছাগল কিছু ঠিক কিনা।"

"আচ্ছা কেন এই ভূতের বোঝা নিয়ে যাবে বল ত? —আমার লজ্জা করে।"

লজ্জা কি,— সবাই কি ভাববে যে আমারি মঙ্গলা সুন্দরী এই সব তৈরী করেছেন! আর যদি কেউ জানেই তাতে তার উপকারই হবে। আমাদের দেশের মেয়েরা বাজে সময় এত নষ্ট করে যে সেই সময়টা যদি তারা না ঘুমিয়ে, না গল্প করে', পরনিন্দা না করে' সৎ কাজে লাগাত তবে ঘরের অনেক অভাবও মিটত আর সংসারে পরনির্ভরতা ও অলসতার আড্ডাও একটু কমত।"

"আচ্ছা যাও,—দেখে এস। বেশী দেরী ক'রো না—" বলে' সে স্বামীকে ছেড়ে দিলে।

সেদিন পাশের এক মুদির দোকানে গিয়ে ছুইশ' ঠোঙা নামিয়ে দিয়ে বল্লে, "এগুলি কত দিয়ে নেবে?" মুদি নেড়ে চেড়ে দেখে বল্লে, "বাবু চার আনা শ' দেব। কাগজ তত ভাল না, কাগজ ভাল হ'লে আমরা ছয় আনা আট আনা পর্য্যন্ত শ' দিয়ে থাকি।" সেইগুলি তাকে দিয়ে বিধু আট আনা নিয়ে পথে ব,'র হ'ল।

কিছু দূর যেতেই একটি রঙীন ফুল-পাখী-ওয়ালা বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে ডাক দিয়ে বল্লে, "ওহে শোন।"

লোকটি কাছে এসে বল্লে, "কি চাই বাবু?—"বিকু বল্লে, "আমি কিছু চাই না, তুমি আমার এই ফুল, পাখীগুলি বিক্রি করে' দেবে?—তোমায় লাভ দেব।"

সে লোকটি জিনিষগুলি দেখে বল্লে, "বাবু, আমায় বিক্রি করে' দিন; আমি পরে বিক্রি করে' নেব।"

বিকু দেখ্‌লে লোকটা নিজে বেশী লাভ নিতে চায়। বল্লে, "কত দেবে?"

সে বল্লে—"পাঁচ সিকে দেব বাবু।"

দু' চারটি লোক সামনে এসে দেখে শুনে বল্লে, "সে কি বাবু, এমন জিনিষ এত সস্তায় দেবেন না—এগুলি আপনার দু'টাকার বেশী হবে। দিন, আমি নেব।"

পরেই দু'জন খরিদ্দার দাম ঠিক করে' বল্লে, "দিন বাবু ছোট বড় সব দু'পয়সা করে' ধরে' দিন; যদি লাভ থাকে তবে পরে আবার নেব। আপনার ঠিকানা—" বিকু বল্লে, "আবার রবিবারে এই দোকানে এসে দিয়ে যাব। যদি তোমাদের নিতে ইচ্ছা থাকে এখানে এস।"

সেদিনের পাওয়া সাড়ে তিনটি টাকা যখন বিকু মঙ্গলার হাতে দিয়েছিল, তখন তার মুখে যে একটি অপূর্ব্ব আনন্দের হাসি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল তা দেখে বিকুর মন আনন্দে ভরে' উঠেছিল।

সেই টাকা দিয়ে একটি ব্যাঙ্কের বই করে' দিয়ে মঙ্গলার নামে টাকা জমা দিল বিকু। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে তার যা আয় হ'ত তাই সে জমা করে' রাখ্‌ত। খেলাচ্ছলে নিজের অবসর-সময় খাটিয়ে কত অনায়াসে নিজস্ব কিছু আয়—সে কথা মনে করে' মঙ্গলার বড় উৎসাহ হ'ল। কিছুদিন যায় একদিন মঙ্গলা সলজ্জভাবে বিকুকে বল্লে, "আমার একটা কথা রাখ্‌বে?" বিকু বল্লে, "তোমার কথা রাখ্‌ব বই কি—কোথায় যাচ্ছে না ব্যাঙ্কে বল ত?"

"আহা, শোনই না, তুমি বড্ড ঠাট্টা কর তাই বল্‌তে চাই না—"

"না না বল, শুনব।"

"এতক্ষণ পরে কথাটা বল্‌তে তার কেমন বাধবাধ ঠেক্‌তে লাগ্‌ল; তাই ম্লান হ'য়ে বল্লে, "থাক্ আজ।" বলে', মঙ্গলা কথাটা না বলে' একটি নিশ্বাস ফেল্লে।

হঠাৎ মঙ্গলার উৎফুল্ল মুখখানি ম্লান হ'য়ে যেতে দেখে বিকুর দুঃখ হ'ল, বল্লে, "না গো বল কি কর্‌তে হবে—আর দুষ্টুমি কর্‌ব না সত্যি।"

"আচ্ছা কত টাকা হ'ল—"

এই বিধাজড়িত ভাবের প্রশ্নে বিকু বুঝ্‌লে তার সঞ্চিত কত টাকা হয়েছে সে কথা সে জান্‌তে চায়। হয় ত তা দিয়ে তার কিছু করার সখ হয়েছে তাই সে হেসে বল্লে—"তোমার টাকা চাই, কি কর্‌বে বল ত?"

ব্যস্ত-হ'য়ে মঙ্গলা বল্লে, "আমি চাই-না, কত হ'ল, যদি তা দিয়ে তুমি একটা হাতঘড়ি কেন তো, কেমন হয়? আচ্ছা হয় না কি ঐ টাকা দিয়ে—অনেক দাম নাকি? আমার বড্ড ইচ্ছা কর্‌ছে তোমার হাতে একটা ঘড়ি পরিয়ে দিই—!"

"ওঃ তাই বল! সোনার্জ্জিত টাকায় তুমি স্বামীর ওপর সখ খাটাতে চাও? আমি ঠিক করেছিলাম তোমারই কিছু করিয়ে দেব। তুমি দেখ্‌ছি তার ওপর টেক্কা দিলে!"

"তুমি আমায় তো চিরকাল ধরেই দিচ্ছ; আমি তোমায় কিছু কখনো দিতে পারি? আগে কি একথা ভাব্‌তেও পার্‌তাম! তাই বল্‌ছি—"

"আচ্ছা দেখ্‌ব। এই কয় মাসে প্রায় ত্রিশ টাকার উপর হয়েছে, সব টাকাটাই যে খরচা হ'য়ে যাবে তবে—"

মঙ্গলা সোৎসাহে বল্লে, "বেশ তো ভালো ঘড়ি হবে, বেশ ভালো দেখে কেনো—কেমন? তোমার এখন যেটা আছে ঘরে থাকবে, আমি তাই দেখে কাজ কর্‌ব।"

"আচ্ছা আন্‌ব তবে—"

দিন দুই পরে আপিস থেকে ফিরে বিকু হাত-মুখ ধুয়ে ডাক দিল, "ওগো শুন্‌ছ, একটু শোন' না—"মঙ্গলা হাতের কাজ রেখে এসে কাছটি ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্লে, "ডাক্‌ছ আমায়?"

বিকু তার হাতে একটি ঘড়ির বাক্স দিল।

"ইস্! এই যে এনেছ," বলেই বাক্স খুলে সুন্দর ঘড়িটি দেখে আনন্দে তার চক্ষুদুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল।

স্বামীর হাতটি সস্নেহে টেনে নিয়ে আনাড়ি হাতে ঘড়িটি বাঁধ্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। তার অপটু হাতের ব্যাকুলতায় নিষ্ফলতায় বিকু হেসে নিজেই সাহায্য করে'

ঘড়িটি বেঁধে নিল। মঙ্গলার আনন্দ সুন্দর মুখখানি বিষ্ণুকে মুগ্ধ করল।

বিষ্ণু বলে—"তোমার আনন্দ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি. আমার কাছে বল, আমিও একটা জিনিষ এনেছি।" বলে' অপর একটি সুন্দর বাক্স খুলে এক জোড়া ওপেল পাথরের দুল বা'র করে' মঙ্গলার কানে পরিয়ে দিয়ে বিষ্ণু বলে, "কি সুন্দর দেখাচ্ছে মঙ্গলা, আয়না দিয়ে দেখ। আজ যদি মা থাকতেন! ..মা নিশ্চয়ই দেখ্‌ছেন আর কত সুখী হচ্ছেন।"

আনন্দের আতিশয্যে মঙ্গলার চোখদুটি ছল্ ছল্ করছিল—দুঃখের দোঁয়ায় দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে' পড়্‌ল।

বিষ্ণু পায়ে একটা প্রণাম করে' লজ্জিত আরক্ত মুখখানি নিয়ে সে একপ্রকার দৌড়ে অন্য ঘরে চলে' গেল। বিষ্ণু সহাস্যে ডাকল, "শোন শোন প্রণাম তো কর্‌লে কিন্তু—"

মঙ্গলা গৃহান্তর থেকে বলে, "দাঁড়াও, তোমার জল খাবার নিয়ে যাই—" (ক্রমশঃ)

বাংলার সেকাল ও একাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

এই ত গেল বাংলার নারীসমাজের অতীত দিনের সহজ নির্ম্মল নৃত্যগীতময় মুক্ত-জীবনের ছবি। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে প্রাচীন বাংলার জীবনে মুক্তভাবের ছড়াছড়ির প্রভাবে বাঙ্গালী একদিন কি জলে কি স্থলে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি ছিল। তাহার জীবনের ধারা ছিল ভীতিহীন ও পৌরুষময়;—স্থলপথে ও জলপথে বাঙ্গালী দেশবিদেশে অকুতোভয়ে বাণিজ্যপ্রসার, আধিপত্যবিস্তার ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে ছুটিয়াছিল,—এসিয়ার এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার বাহুবল ও ধর্ম্মপ্রচার প্রচেষ্টা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং সুদূর ইউরোপ পর্য্যন্ত তাহার পণ্যসম্ভার খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহার পল্লীজীবন সার্ব্বজনীন নৃত্যগীতের ও পৌরুষক্রীড়ার প্রাণময় আনন্দধারায় প্লাবিত ছিল।

সেই সর্ব্বব্যাপী মুক্তভাবের স্থানে বাংলার জীবনে আজ আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই—সমাজের প্রতিস্তরে এবং জীবনের প্রতি-পদে শত সহস্র ভ্রান্ত বিধি-বিধানের দণ্ডমুণ্ডের অনুশাসনে মানুষের প্রাণের উৎস নিরুদ্ধ এবং তাহার আত্মা ভীতিবিদ্ধ ও সঙ্কুচিত,—তাহার স্বচ্ছ অনাবিল জীবন-আকাশ কৃত্রিমতার ঘনান্ধকার কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন,—পদে পদে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিকূল আচরণের মূঢ়তার বিষময় বিষে তাহার জীবন অবসন্ন,—ধর্ম্ম ও শিক্ষার ভ্রান্ত আদর্শের অবলম্বনে মুক্তির ও আনন্দের অভিব্যক্তির সহজ প্রণালীগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার জীবন পঙ্গু, শক্তিহীন ও অশ্লীল।

যে বাঙ্গালী একদিন প্রাণের মুক্তভাবের পূর্ণতার প্রেরণায় দলে দলে ছুটিয়াছিল চীন, জাপান ও পূর্ব্ব এসিয়ার নানা দেশে তাহার ধর্ম্মপ্রচার করিতে,—যাহার নৌবাহিনী ছুটিয়াছিল সিংহলে তাহার বাহুবলের আধিপত্য স্থাপন করিতে,—তাহার সমাজ-চরিত্রের প্রহেলিকাময় পরিবর্ত্তনে সেই বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও জীবনাদর্শ আজ এমনই বিসদৃশ পঙ্গুতাময় রূপ ধারণ করিয়াছে যে তাহার সমুদ্রযাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং 'কালাপানি' পার হওয়া একটা ঘোরতর পাপ হইয়া পড়িয়াছে। জাতিভ্রষ্ট হইবার ভয়ে সে আপন দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে কূপমণ্ডূক হইয়া থাকে।

স্বকৃত পঙ্গুতা-বিধান

সমুদ্রযাত্রার কথা দূরে থাকুক, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে হইলে তাহাকে যাত্রী করিতে হয় পঞ্জিকার তিথি-

নক্ষত্র দেখিয়া; আর যাত্রার সময়ের সঙ্গে যদি শাস্ত্রবচনের মিল না হয়, তাহা হইলে তাহা শোধ্‌রাইতে হয় এক দিন, দুই দিন কি ততোধিক দিন পূর্ব্বে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাত্রার অভিনয় দ্বারা তিথি-নক্ষত্রের দোষ কাটাইয়া। প্রাচীন বাংলার মানুষের দেশবিদেশে যেচ্ছা-বিচরণের কি পরমাশ্চর্য্য পরিণতি! একটা দেশের মানুষের সমাজ যে কি করিয়া ধর্ম্মের নামে এই বিংশ শতাব্দীতেও নিজের হাত-পা বাঁধিয়া পঙ্গু হইয়া বসিয়া থাকিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাহাতে গর্ব্ব অনুভব করে, এবং শিক্ষার আলোক লাভ করা সত্ত্বেও নিজের অন্ধতা ও পঙ্গুতা নাশ করিতে নিশ্চেষ্ট হয়, তাহার এরূপ বিচিত্র দৃষ্টান্ত জগতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

আর দেশবিদেশে বাণিজ্যের কথা?—চাঁদ সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের দেশে আজ চাকুরির কাঙ্গালীবেশে দ্বারে দ্বারে ফেরা, কেরাণীগিরির কলম ঘষা, অথবা অলস ভাবে নিরাপদে ঘরে বসিয়া পৈতৃক জায়গা-জমি ভোগদখল করিয়া কোনরকমে কায়ক্লেশে প্রাণধারণ করাই হইয়াছে ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বংশসম্ভূত লোকের লক্ষণ;—বেচাকেনার ঘৃণ্য ব্যাপারে হাত দেয় শুধু 'ছোটলোক' খোট্টা, মাড়োয়ারি, ভাটিয়া ব্যাটারাই!

সপ্তদশ ও পাল যুগের দিগ্বিজয়ী বাঙ্গালী জগতে আজ যেন ভীরুর জাত বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, এই হেঁয়ালির বিশ্লেষণ আমরা পাইব এককথায়—বাংলার মানুষের জীবনে অতীত যুগের সার্ব্বজনীন মুক্তভাবের পরিবর্ত্তে সার্ব্বজনীন ভীতিজনিত আড়ষ্টতা। বাংলার অতীত যুগ যেমন ছিল মুক্তভাবের যুগ, তেমনি বাংলার বর্ত্তমান যুগকে ভীতির যুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উঠিতে ভীতি, বসিতে ভীতি, চলিতে ভীতি,—হাসিতে ভীতি, নাচিতে ভীতি,—ভূতের ভীতি, প্রেতের ভীতি,—শাস্ত্রের ভীতি, ধর্ম্মের ভীতি,—বাপ-মা'র ও অসংখ্য গুরুজনের ধমকের ভীতি, শিক্ষকের ধমকের ও বেত্রাঘাতের ভীতি,—জাত যাওয়ার ভীতি,—ব্রাহ্মণের ভীতি, বারবেলার ভীতি, হাঁচি-টিকটিকির ভীতি,—পাত্রাভাবে অবিবাহিতা থাকিলে মেয়ের অপবাদের ও জাতিনষ্টের ভীতি,—ভাসুরের ও মামা-শ্বশুরের মুখ দেখার ভীতি, ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ সনাতন শাস্ত্রানুমোদিত ভীতির বিশুদ্ধ অনুশাসনে শাসিত বাঙ্গালীর স্নায়ুপ্রবাহে যে প্রাচীন পৌরুষভাবের পরিবর্ত্তে এক সর্ব্বগ্রাসী ভীতিময়তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দখলকার হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

ক্রীড়ার স্থান

ক্রীড়া?—খেলাধূলা?—আমার মনে আছে, আমরা যখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন খেলাধূলা ও ক্রীড়ার নামে আমাদের গুরুজন ও শিক্ষকবর্গ জাঁত্‌কাইয়া উঠিতেন—খেলাধূলা করে শুধু দুষ্ট ছেলেরা! আমার মনে আছে, একবার আমাদের গ্রাম্য স্কুলে খেলাধূলা করিবার অপরাধে আমাকে নির্ম্মম বেত্রাঘাত খাইতে হইয়াছিল, এবং 'আর কখনও খেলা করিব না' এই মর্ম্মে দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। ক্রীড়ার প্রতি চরমপন্থী বিদ্বেষের সেই অন্ধকারময় যুগের আজ অবসান হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই বিদ্বেষ আমাদের সমাজের কর্ত্তাদিগের এবং অভিভাবক-দিগের মন হইতে এখনও সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় নাই। ক্রীড়া যে শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক অপরিহার্য্য অঙ্গ-বিশেষ,—ক্রীড়ানুরাগই যে মানুষ জীবনযুদ্ধের শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে,—ক্রীড়ার আনন্দ যে মানুষের প্রাণের মুক্ত-ভাবের ও আনন্দের বিকাশের একটি প্রধান সোপান স্বরূপ,—দেশের প্রত্যেক ছেলের এবং প্রত্যেক মেয়ের শরীর এবং মনের শক্তি-গঠনের জন্য ক্রীড়ার চর্চ্চা যে অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়, এবং প্রত্যেক বালক ও প্রত্যেক বালিকার ক্রীড়ার সুব্যবস্থা করিবার জন্য যে সমাজ দায়ী,—আর শুধু বালক-বালিকার জন্যই নয়, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর শরীর ও মনের সুস্থতা এবং সামর্থ্যের বিধান ও রক্ষার জন্য ক্রীড়া যে নিত্য-প্রয়োজনীয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে ও কার্য্যে পরিণত করিতে আমাদের দেশে এখনও অনেক দেরী।

ইংরাজ জাতির জীবনে ক্রীড়ার স্থান

বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য উন্নত জাতিগণ ইহা সম্পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, পাশ্চাত্যের প্রতি-দেশে আমরা দেখিতে পাই, খেলাধূলার সার্ব্বজনীন

চর্চ্চার বিরাট ব্যবস্থা। যে ইংরাজ জাতি শৌর্য্যে বীর্য্যে এবং সমৃদ্ধিতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাদের দেশে আমরা ইহার চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিতে পাই। সেখানে আবালবৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে এবং স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে নানাপ্রকার খেলাধূলার দৈনন্দিন নিয়মিত চর্চ্চার যে অসাধারণ ব্যাপ্তি, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

জাতীয় জীবনে খেলাধূলার সার্ব্বজনীন চর্চ্চার যে কি গভীর উপযোগিতা, তাহা ইংরাজ জানে বলিয়াই ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন বলিয়াছিলেন, "ইটন স্কুলের ক্রীড়াভূমেই আমি ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয় করিয়াছিলাম।" এবং তাহা জানে বলিয়াই তাহারা এক বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে যাহার নাম "The National Playing Fields Association"—"জাতীয় ক্রীড়াভূমি-বিধান সমিতি"; যাহার সভাপতি স্বয়ং সম্রাটপুত্র ডিউক্ অব্ ইয়র্ক (Duke of York); যাহার উদ্দেশ্য ইংলণ্ডের প্রতি গ্রামে এবং প্রতি সহরের প্রতি পাড়ায় আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে সকলের খেলাধূলা করিবার উপযোগী প্রশস্ত ক্রীড়াভূমির ব্যবস্থা করা; যাহার পরামর্শ-অনুযায়ী ক্রীড়াভূমির ব্যবস্থা না রাখিয়া আজকাল ইংলণ্ডের কোন গ্রাম অথবা কোন সহরের কর্ত্তাগণের গৃহনির্ম্মাণ করিবার অধিকার নাই; এবং যাহার কর্ম্মযোগের লক্ষ্য দেশশুদ্ধ ক্রীড়াভূমির এমনই ছড়াছড়ি করা, যেন দেশের কোন ছেলে বা মেয়ে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে কখনও না বলিতে পারে "I have nowhere to play."—"আমার যে খেলিবার জায়গা নাই।" জাতির জীবনে শক্তি ও আনন্দের পূর্ণস্ফুরণের পক্ষে ক্রীড়ার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা যে-জাতি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার পক্ষেই এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব।

বাংলায় ক্রীড়ার পরিণতি

আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন বাংলার মানুষ ক্রীড়ার সঙ্গে প্রাণের আনন্দের ও শক্তির এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, এবং তাহার ফলে নানাপ্রকার লৌকষময় ও আনন্দময় ক্রীড়ার ব্যবস্থায় বেশ ভরপুর ছিল। বাংলার মধ্যযুগে ইহার যে কি বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। বাংলার সহরে সহরে প্রত্যেক ছেলের এবং প্রত্যেক মেয়ের খেলাধূলার উপযোগী প্রশস্ত ক্রীড়াভূমি যে নাই শুধু তাহা নহে, যে-বাংলার পল্লীগ্রাম একদিন সমস্ত জাতির ক্রীড়াভূমি ছিল সেই পল্লীগ্রামে আজ ছেলেদের খেলাধূলার এতটুকু স্থানমাত্র খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। সহরেই হউক্ আর গ্রামেই হউক্, কয়েকটি মুষ্টিমেয় ছেলে মাত্রই ফুটবল বা অন্যান্য ক্রীড়া করিবার সুযোগ অথবা স্থান পাইয়া থাকে,—বাকী বেশীর ভাগ বালকদিগকে সুযোগের অভাবেই হউক্, স্থানের অভাবেই হউক্, অথবা শিক্ষক ও অভিভাবকের উৎসাহের অভাবেই হউক্, খেলাধূলা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রাচ্যে নারী-প্রগতি

শ্রী বিমলেন্দু সরকার বি-এ

পরিবারকে সুন্দর করা যেমন নারীর কর্ত্তব্য—তেমনি দেশের ও দশের উন্নতি কর্‌বার জন্যও নারীদের নানারূপ কাজ আছে। জাতীয় জীবনে নারীর যে কিছু কর্ত্তব্য আছে, তা' জগতের সভ্য জাতিরা অল্প-বিস্তর বুঝ্‌তে পেরেছেন, সে জন্যে চারিদিকে নারী-জাগরণের সাড়া পড়ে' গিয়েছে। নারীরা বুঝ্‌তে পেরেছেন, তাঁরা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে হীন নন। তাই তাঁরা নিজেদের দাবির বুঝ নেবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন। আমাদের এই ভারতেও সেই আন্দোলনের ঢেউ এসেছে। চারিদিকে নারীদের নূতন উদ্যম ও ভবিষ্যৎ আশার পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে। এই সময় অন্যান্য দেশের নারীরা কিভাবে তাঁদের কাজে অগ্রসর হচ্ছেন—তার বিবরণ জান্‌তে পার্‌লে আমাদের নারীপ্রচেষ্টার কর্ম্মপদ্ধতির বিশেষ সাহায্য হবে মনে করে' কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে' লিখ্‌ছি।

যে সব দেশ খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'চ্ছে—চীন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত চীন-পরিবারে কন্যা জন্মগ্রহণ কর্‌লে পিতামাতা চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌তেন। চীনা মেয়েরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অসূর্য্যম্পশ্যা হ'য়ে পড়্‌তেন। কোন পুরুষের মুখ দেখা ছিল তাঁদের পক্ষে মহা পাপের ব্যাপার। কি ভাবে কন্যাদায়ের হাত থেকে মুক্তি পাবেন, তাই ভেবে পিতামাতা আকুল হতেন। কিন্তু আজকাল এঁদের শুভবুদ্ধি হয়েছে—চীনের আর সে অবস্থা নেই। আজকাল রাস্তাঘাটে, হাটেবাজারে দেখা যায়—চীনা মেয়েরা নির্ভয়ে বেড়াচ্ছে, জিনিষপত্র কিন্‌ছে, গল্পগুজব কর্‌ছে। আজ তারা বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। আশ্চর্য্য! দশ বৎসর আগে যারা বাড়ীর বাইরে যাওয়াকে পাপ বলে' মনে কর্‌ত, তারা সংস্কারকে কি করে' জয় কর্‌ল।

চীন মেয়েরা মুক্তি পেয়েছে কোন্ মন্ত্রের বলে? এর মূলে শিক্ষা। চীনা নারীদের মুক্তি দিয়েছেন তাঁদের স্বামী, পুত্র ও ভাইরা। সেখানকার পুরুষেরা বুঝেছেন—যতদিন না নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান স্বাধীনতা ও শিক্ষা দেওয়া হবে ততদিন তারা একটা বোঝা হ'য়ে থাক্‌বে। এই সুবুদ্ধি তাঁদের হয়েছিল বলেই আজ চীনের ইতিহাস একেবারে বদ্‌লে গিয়েছে। তাই তাঁরা আজ কুসংস্কারকে সরিয়ে রেখে, গতানুগতিকের বন্ধনকে ছিন্ন করে', তাদের জন্য নূতন শাস্ত্র তৈরী করেছেন। নারী আজ সেখানে পুরুষের ক্রীড়া-পুত্তলিকা নেই—তারা সত্যই আজ তাঁদের জীবনসঙ্গিনী। নব্য চীনে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি নারীরা ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী, প্রফেসর, আইনব্যবসায়ী, নার্স, সেক্রেটারী, পত্রিকা-সম্পাদিকা, লেখিকা, এমন কি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারি পর্য্যন্ত কর্‌ছেন। স্বীকার কর্‌তে হবে এঁদের সংখ্যা খুব কম—কিন্তু যেরূপ গতিতে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে মনে হয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁদের সংখ্যা খুব বেড়ে যাবে।

১৯২২ সালে সর্ব্বপ্রথমে চীনা নারীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে "Women's Suffrage Association" ও "Women's Rights League" এই দুটি সঙ্ঘ দক্ষিণ চীনের কোন কোন প্রদেশে স্থাপিত হয়। হুনানের (Hunan) অধিবাসীরা সর্ব্বপ্রথমে নারীদের পুরুষের সঙ্গে সমান দাবী গ্রাহ্য করেন এবং ১৯২১ সালে পেকিং সহরে যে ক্ষণস্থায়ী পার্লামেণ্ট স্থাপিত হয় তাতে একজন নারী-প্রতিনিধি পাঠানো হয়।

আজকাল কোয়ানটং (Kwuntung) ঐ দুটি সঙ্ঘ একত্র মিলিত হ'য়ে "Women Movement General Alliance" নামে পরিচিত। নানা প্রদেশে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং অনেক সভ্যও আছেন। এঁদের মূল উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, চীন ও অন্যান্য দেশের নারীদের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা।

১৯২৮ সালে ৮ই মার্চ্চ তারিখে ক্যাণ্টন সহরে আন্তর্জ্জাতিক মহিলা দিবসে (International Women's

Day) একটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। সেখানে হাজার হাজার চীনা ও বিদেশী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এত বড় সভা পরিচালনের জন্য নারীরা পুলিশের কোনরূপ সাহায্য নেন নি। স্ত্রী ভলান্টিয়াররা সমস্ত দেখাশুনার ভার নিয়েছিলেন। এই সভায় নানা বিষয় আলোচনা হয়েছিল। তাঁরা কি কি কাজ করতে চান তারই কতকগুলি প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করা হয় ও উপস্থিত সকলে তার সমর্থন করেন। তাঁদের কার্য্যতালিকা থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল—

১। সমস্ত নারীআন্দোলন-সঙ্ঘকে মিলিত করতে হবে;

২। স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষার মধ্যে কোন ভেদ থাকবে না;

৩। ব্যবসা-ক্ষেত্রেও পুরুষ ও নারীতে কোন ভেদ থাকবে না;

৪। আইনে নারীদের সমানাধিকার দেওয়া হবে;

৫। স্ত্রী ও পুরুষের বেতনের হার সমান হবে;

৬। শিশু-শ্রমিকদের রক্ষা করতে হবে;
কৃষকদের ও শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে;
বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে;
শিশুকালেই বাক্‌দান ও শিশুপত্নীকে তার স্বামিগৃহে পাঠানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে;

১০। স্ত্রী ও পুরুষের উভয়ের নীতির মাপকাঠি এক হবে।

উপরের তালিকার দিকে চাইলেই বোঝা যায় তাঁরা তাঁদের পুরাতন দৃষ্টিকোণ একেবারে ছিন্ন করতে চান। তাঁরা নিজেদের অন্তরে যা কিছু অন্যায় মনে করেছেন, তাকেই একেবারে দূর করতে চান—কোনরূপ শাস্ত্রের বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সেগুলিকে ধরে' রাখবার চেষ্টা করেন নি। এর মূলে আছে—সুশিক্ষা, যে শিক্ষা মানুষকে উদার করে, ভাল ও মন্দ বিচার করবার অনুভূতি দেয়, এবং ভালোকে কার্য্যে পরিণত করবার শক্তি দেয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবার জন্য নারীদের কি কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে একজন চীনা মহিলার কি অভিমত তাঁর একখানি চিঠির অংশ থেকে বুঝতে পারা যাবে:—

"জাতির মাতা নারী। জগতে শান্তি স্থাপনের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার দাবী করে' নারীই তা কার্য্যতঃ করবে। এ নারীদেরই করতে হবে—তাদের হ'য়ে আর কেউ করবে না। এই প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করতে আধ্যাত্মিক বলে বলবতী একদল শিক্ষিতা নারীর দরকার যাঁরা দূরদৃষ্টিসম্পন্না, যাঁদের দায়িত্ব-বোধ আছে—এবং যাঁদের মধ্যে এমন তেজ আছে যার দ্বারা তাঁরা সমস্ত মানবজাতিকে তাঁদের শক্তির পরিচয় অনুভব করাতে পারবেন।"

এইখানে দেখা যায় ক্ষুদ্রতার গণ্ডীকে ছাড়িয়ে তাঁরা তাঁদের কার্য্যক্ষেত্রকে কতদূর প্রশস্ত করতে চান।

চীনা নারীরা সমস্ত প্রকার কাজকর্মকে নিজেদের আয়ত্তাধীন করে' ফেলেছেন। তাঁরা যেরূপ বেগের সঙ্গে কাজ করছেন, যদি অন্তর্বিবাদ (Civil War) না থাকত, তবে এতদিন তাঁরা আরও অগ্রসর হ'তে পারতেন।

তারপরে জাপানের দিকে চোখ চাইলেও দেখতে পাই সেখানেও কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত মেয়েদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। জাপানের 'ওকুমামা' অর্থাৎ ঘরের বৌ কখনো বাড়ীর বাইরে যেতে পারতেন না। কিন্তু ১৯১০ সালের পর থেকে এখন সম্পূর্ণ উল্টা ব্যাপার। এখন সেখানকার মেয়েরা সবরকম কাজেই যুক্ত আছেন। জাপানে একটি নিয়ম ছিল যে, কোন রাজনৈতিক সভায় মেয়েরা উপস্থিত থাকতে পারবেন না বা সভা করতে পারবেন না। কিন্তু সেখানকার মেয়েরা এই নিয়মের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন সুরু করলেন যে ১৯২১ সালে সেই নিয়ম উঠিয়ে দেওয়া হোল। ১৯২০ সালে জাপানে "New Woman's Association" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের কাজই হোল নারী ও পুরুষের সমান অধিকার সাব্যস্ত করা

ডাক্তারি ব্যবসাটা জাপানী মেয়েদের খুব প্রিয় হয়েছে। জাপানে ১৩০০ মেয়ে ডাক্তার, ৩৫০০ নার্স, ৫০০ দাঁতের ডাক্তার আছেন ও অনেক ঔষধের দোকান মেয়েরা চালাচ্ছেন।

টোকিও সহরে জাপানী মেয়েদের জন্য প্রায় ২০খানি মাসিক পত্রিকা আছে। মনে করবেন না এই সব পত্রিকায়

শুধু গোলগল্প ও উপন্যাস ভরা থাকে। জাপানী নারীরা মানবজীবনের নানা দিক নিয়ে প্রবন্ধ লিখে আলোচনা করে' থাকেন। রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি, জাতিগত সমস্যা, স্বাস্থ্য, বিবাহসমস্যা, যৌনসমস্যা ও বিদেশীয় আচার-ব্যবহারের বিচার করা—কিছুই আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হয় না।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হ'চ্ছে যে তুরস্ক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর, এই সমস্ত মুসলমানপ্রধান দেশ—যারা কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে মেয়েদের আটক করে' রেখেছিলেন, সেখানে কি করে' মেয়েরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই অচলায়তনের সমস্ত গণ্ডীকে ভেঙে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের এই মুক্তির মূলে ছিলেন ও আছেন একদল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষিত পুরুষ—যারা বুঝেছেন নারীদের প্রীতিমত শিক্ষা দিয়ে পুরুষের সাথী না করতে পারলে কোন জাতিরই উন্নতির আশা নাই।

একজন তুর্কী রাজকর্ম্মচারী নারী-স্বাধীনতার পক্ষে বলতে গিয়ে বলেছেন—

"To bring women into our social life will be the first step in our true regeneration. Civilization is the culture of spirit, fineness of thought and purity of character, and when men and women mingle freely it will elevate masculine standard."—তাৎপর্য্য, নারীদের আমাদের সামাজিক জীবনে আনয়ন করাই আমাদের সত্য নবজীবন-প্রাপ্তির প্রথম সোপান। সভ্যতা হ'চ্ছে আত্মার কৃষ্টিসাধন, চিন্তার নির্ম্মলতা ও চরিত্রের পবিত্রতা, এবং যখন পুরুষ ও নারী স্বাধীনভাবে মেলামেশা করবে, তখন পুরুষের আদর্শ উন্নত হবে।

মুসলমান নারী-জাগরণের ইতিহাসে যে কয়জন নারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে লতিফে হানুম, সেলমা এক্রম, হালিদে হানুম, নাজিফ আবেদ প্রভৃতি অন্যতমা। এই সকল মুসলমান নারীরাও ব্যবসায়, শিক্ষা, আইন, পত্রিকা সম্পাদন কার্য্য প্রভৃতিতে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। কি কি কাজ তাঁরা করছেন তার একটি তালিকা দিলে—চীন ও জাপানী নারী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি হবে। তবে শিক্ষায় তাঁরা কতখানি অগ্রসর হয়েছেন, নীচের উদ্ধৃত অংশ থেকে বুঝতে পারবেন—

"One of the dynamic Syrian feminists is Mme Julia Demeschique.....She also edits and publishes political weekly, with brilliant discussions on every subject engaging the attention of the Near East or the world at large. Nationalism, French and British mandates, the policies of the League of Nations, Arab-Zionist difficulties, the Mosul problem, the Kurdish-Turkish-Persian triangle, the oil problem of Bagdad, Sovietism, the future of India, the weakness of China, the cleverness of Japan, and other subjects are discussed frankly by the leading men and women."

আশা করা যায় উদার ভাবে সমস্ত জিনিষকে গ্রহণ করলে আমাদের দেশে নারীপ্রগতি জগতের অন্যান্য দেশের নারী-প্রচেষ্টার সঙ্গে সমান তালে চলবে। তবে সর্ব্বপ্রথমে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

নারী-প্রতিভা

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারা বাই

(১)

অসামান্য সৌন্দর্য্যাধিকারিণী মেবারের বিখ্যাত রাজপুত বীরবালা। চৌলুক্যবংশীয় রাজা সোলাঙ্কী রাও সুরতানের কন্যা। সুপ্রসিদ্ধ তক্ষশীলা বা তোড়াটকে ইঁহার রাজধানী। লয়লা খাঁ নামক জনৈক পাঠান সর্দ্দার সুরতান জীকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া দিলে, তিনি আরাবল্লীর পাদদেশে মেবারে আসিয়া অতি সামান্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। পিতার এই দুঃখের সময় তারা বাই কিশোরী। বসনভূষণ কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি সর্ব্বদা বর্ম্মচর্ম্মাবৃত হইয়া—কখনো কখনো অশ্বারোহণে অসি লইয়া, আবার কখনো কখনো ধনুর্ব্বাণ লইয়া খেলা করিতে ভালোবাসিতেন।

এখন তারা বাই কিশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। রাজপুতনার বীরমহল তারা বাই'র রূপের কথা, গুণের কথা, অশ্বারোহণে দক্ষতা এবং ধনুর্ব্বাণ ও অসিচালনার কথা লইয়া সর্ব্বদাই সরগরম হইতে লাগিল। মেবারের রাণা রায়মল্লের তৃতীয়পুত্র জয়মল্ল আসিয়া তারা বাই'র পাণিপ্রার্থী হইলেন।

কিছুদিন হইতে সুরতান কয়েকবার তোড়াতক্ষ উদ্ধার করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠানরাজকে আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পিতার এই সব যুদ্ধাভিযানের সহিত কিশোরী তারাও অপরিসীম যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রবল পাঠানরাজের সহিত পারিয়া উঠেন না। এই সময় সুরতান প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে বীর 'তোড়া' উদ্ধার করিয়া দিবেন, তাঁহাকে তিনি রূপবতী-গুণবতী কন্যা তারাকে সম্প্রদান করিবেন। জয়মল্ল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইল। মেবারের মধ্যমপুত্র পৃথ্বীরাজ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অগ্রসর হইলেন। এ যাবৎ পৃথ্বীরাজ মাড়বারে পিতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত ছিলেন, রাজা উদ্ধার করিয়া দিয়া পিতার ক্ষমা-লাভ করেন। তারা বাই পৃথ্বীরাজকে বলিলেন, যিনি তোড়া উদ্ধার করিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার পাণি-পীড়নে সমর্থ হইবেন। পৃথ্বীরাজের অনুরোধে 'তোড়া' উদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই তারা বাই'র সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তারা বাই পৃথ্বীরাজকে বলিয়া-ছিলেন, 'যদি তিনি তোড়া উদ্ধার করিয়া দিতে না পারেন তবে তিনি রাজপুত নহেন'।

মুসলমানদের মহরমের উৎসব আসিল—তোড়ার সমস্ত মুসলমান আনন্দে মত্ত। বিপুল আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে 'তাজিয়া' বাহির হইয়াছে, পাঠানরাজও রাজবেশে যাইতে-ছিলেন। অকস্মাৎ পৃথ্বীরাজ ও তারা বাই সুনির্ব্বাচিত পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আফঘান সর্দ্দারকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সমস্ত সৈন্যকে কিছু দূরে রাখিয়া তারা বাই, পৃথ্বীরাজ ও সেনগড়ের সামন্তরাজ এই তিন জন নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আফঘান নায়ক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে এই তিনজন?" সঙ্গে সঙ্গে তারা বাই'র নিক্ষিপ্ত শায়ক ও পৃথ্বীরাজের বর্শা যুগপৎ পাঠানপতির অঙ্গ স্পর্শ করিল—তাঁহার মস্তক ভূমিলুণ্ঠন করিল। আফঘান সর্দ্দারের এইরূপ মৃত্যুতে, সমস্ত পাঠান সৈন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তারা বাই, পৃথ্বীরাজ ও সেনগড়ের সামন্তরাজ আসিয়া নগর-তোরণে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে এক বিশাল হস্তীর শুণ্ড তরবারির আঘাতে

তারা বাই ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। অনতিবিলম্বে নিমিত সৈন্য আসিয়া সমগ্র পাঠান সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। তাহারা ভোড়াতল হইতে পলায়ন করিলে, মুঘলেরা তাহা অধিকার করিলেন।

হায়! এই বীরদম্পতির জীবননাটক যে ভাবে অকালে ঘটিয়া পড়িয়াছিল, তাহা ভাবিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। সংসারে যাঁহারা শুধু একটীকিছু মহৎ কার্য্য করিতে আসেন, তাঁহারা বুঝি এই ভাবেই ফাঁকি দেন। পৃথ্বীরাজের ভগ্নীপতির নাম প্রতু রায়। এই প্রতু রায় সিরোহীর একজন সামন্ত। হঠাৎ পৃথ্বীরাজ স্নেহের ভগ্নীর পত্রে জানিতে পারিলেন যে প্রতু রায় তাঁহার ভগ্নীকে প্রহার করিয়াছে। পৃথ্বীরাজ ভগ্নীর লাঞ্ছনা, তথা নারীর লাঞ্ছনায় অধীর হইয়া তরবারিহস্তে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, একেবারে ভগ্নীপতির শয়নকক্ষে উপস্থিত। প্রতু রায়ের চক্ষু তখন চড়কগাছ। যাহা হউক, প্রতু রায় ক্ষমা-প্রর্থনা করায় পৃথ্বীরাজ প্রতু রায়কে ক্ষমা করেন। কিন্তু প্রতু রায় ক্ষমা চাহিয়া পৃথ্বীরাজের লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত পাপপূর্ণ ছিল, সে সুযোগ বুঝিয়া বিষ প্রদান পূর্ব্বক পৃথ্বীরাজের জীবন নাশ করেন। মৃত্যুসময়ে প্রিয়তমা তারা বাই'র সহিত দেখা হইতে পারে নাই। তারা বাই এই মৃত্যুসংবাদে অধীর হইয়া অনন্ত চিতায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রিয়তমের অনুগমন করেন। আজও রাজপুতানার তারা বাই ও পৃথ্বীরাজের বীরগাথা ও প্রণয়কথার গান লোকে গাহিয়া থাকে।

(৪)

ভারতগৌরব শিবাজী মহারাজের স্নেহের পুত্রবধূ—মহারাষ্ট্র নেতা রাজারামের জ্যেষ্ঠা পত্নী। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ে রাজারামের মৃত্যু হইলে, সম্রাট ঔরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করেন। তারা বাই শোক, ভয়, লজ্জা ইত্যাদি বিসর্জ্জন দিয়া পতির রাজ্য রক্ষার জন্য অসিধারণ করিলেন। যে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়রা ঔরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, বীরবালা তারা বাই, তাহাদিগকে নিজের বুদ্ধিবলে, ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করেন। অনুমান ১৭০৪ অব্দে মোগল বাহিনী পুণা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে তারা বাই শঙ্করজীকে সিংহগড় অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। মোগল সম্রাট্ সিংহগড় অধিকার করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন 'বক্সিস্ বক্স্' অর্থাৎ ঈশ্বরের দান। অবিলম্বে শঙ্করজী তারা বাই'র তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে কোলাপুর, পনহালা ও সিংহগড় অধিকার করিয়া ফেলেন। ইহাতে মোগল সম্রাট্ যৎপরোনাস্তি মনোদুঃখ পাইলেন। মোগল সম্রাট্ যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তারা বাই সেই সমস্ত মোগলাধিকৃত স্থান-সমূহ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তারা বাই মহা উৎসাহে মহারাষ্ট্র বীরগণের হৃদয় জয় করিয়া, বিপুল উদ্যমে কার্য্য করিতে লাগিলেন। মোগল সম্রাট্ যতই যুদ্ধের উদ্যোগ, নানাবিধ কূটনীতি, অবরোধ ও ধ্বংসনীতির প্রয়োগে তৎপর হইতে লাগিলেন, তারা বাই'র মহোৎসাহ ও চেষ্টায় মহারাষ্ট্রের বল তদপেক্ষাধিক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঔরঙ্গজেব যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মোগল সম্রাট দাক্ষিণাত্যে যেরূপ সৈন্য-সামন্ত, আমীর-ওমরাহ লইয়া বিপুল সমারোহে অবস্থান করিতেছিলেন, মহারাষ্ট্র সেনানায়কেরাও স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া মহাসমারোহে নূতন নূতন অধিকৃত স্থানে আনন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তারা বাই'র অসীম ক্ষমতাবলে মহারাষ্ট্রগণের পুনরুদ্যমে ঔরঙ্গজেব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তারা বাই সিংহগড় অধিকার করিলে, মোগল সম্রাট্ মনোদুঃখে পীড়িত হইলেন।

রাজারামের মৃত্যু হইলে, তারা বাই কতিপয় অমাত্যের সাহায্যে দশমবর্ষীয় বালক দ্বিতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, সপত্নী রাজস্ বাইকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। ঔরঙ্গজেব, তারা বাই'র সহিত যখন কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তখন অসুখ হইতে উঠিয়াই সম্রাজ্ঞীর পুত্র সাহুকে জুল্‌ফিকার খাঁ'র সঙ্গে সিংহগড় অধিকার করিবার জন্য পাঠাইলেন। সাহুর মারফতে জুল্‌ফিকার, এই আবেদন সমস্ত মহারাষ্ট্রগণের নিকট পাঠাইলেন যে সাহুই প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, মহারাষ্ট্রীয়দের প্রত্যেকেরই সাহুকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। খাদ্যাভাব হওয়ায়, সিংহগড় জুল্‌ফিকারের হাতে আসিল, কিন্তু কিছুই

হল হইল না। সনদ-অভাবের সুযোগে শঙ্করজী আবার সিংহগড় অধিকার করিলেন। কিয়রখেড়ের রাজকন্যার সহিত সাহুর বিবাহ হয় (১৭০৭) মহা ধুমধামের মধ্যে। মোগল সম্রাট্ বহু উপহারের সহিত শিবাজীর সুপ্রসিদ্ধ 'ভবানী' অসি ও অবরুদ্ধ খাঁ'র তরবারি সাহুকে প্রদান করেন। এই বৎসরেই ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। মোগল সৈন্য চলিয়া গেলে, তারা বাই পুণা অধিকার করিবার জন্য আয়োজন করেন। যাদব পুণায় মোগল সেনাপতি মোদী খাঁকে জব্দ করিয়া চাকন দখল করেন। কিন্তু যাদব অল্পদিন মধ্যেই সাহুর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন, কাজেই সাহু তথা মোগলদের একটি বলবান্ সহায় মিলিয়া গেল।

শঙ্করজী তারা বাই'র পক্ষে পুরন্দর দুর্গ অধিকার করিলে, সাহু উহা ছাড়িয়া দিতে বলেন,কিন্তু তারা বাই'র আদেশমত শঙ্করজী উহা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে সাহু শিবাজীর প্রথম রাজধানী রাজগড় অধিকার করেন। শঙ্করজী প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার পথে বাধা দেখিয়া জলমগ্ন হইয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। প্রভুভক্ত শঙ্করজীর মৃত্যুতে তারা বাই বিষম মনঃকষ্ট পাইলেন। ১৭১২ খৃঃ তারা বাই'র পুত্র শিবাজীর মৃত্যু হইলে, আইন-অনুযায়ী তারা বাই'র রাজ্যাধিকার নষ্ট হইল। তারা বাই ও তাঁহার পুত্রবধূ ভবানী, উভয়েই বন্দী হইলেন। ভবানী গর্ভবতী ছিলেন, এই সময়ে এই বিখ্যাত বীরবালার নানা প্রকার দুঃখ উপস্থিত হইল। যথাসময়ে ভবানী একটি পুত্র প্রসব করিলেন—তারা বাই সাবধানে পুত্রটিকে গোপন করিয়া রাখিলেন। ১৭৪৯ খৃঃ সাহুর মৃত্যু হইলে, তারা যাঁহাকে এতদিন গোপনে পালন করিয়াছিলেন, তিনিই উত্তরাধিকারী স্থির হইলেন। সাহুর নিকটে পেশবা বালাজী লিখিয়া লইয়াছিলেন, যে তারা বাই'র পৌত্র রাজা হইলেও রাজ্যশাসনের ভার বালাজীর হস্তেই থাকিবে, কিন্তু শিবাজী বংশের নাম যাহাতে উজ্জ্বল থাকে তাহা পেশবাকে করিতে হইবে।

যাহা হউক,—এখন তারা বাই'র বয়স ৭০ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার ধৈর্য্য, স্মৃতিশক্তি বা কর্ম্মোদ্দীপনা কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বালাজী সর্ব্বস্ব—পৌত্র নামে নাত্র রাজা। এইরূপ পরাধীনতা তারা বাই'র অসহ্য। কাজেই তিনি স্বয়ং রাজ্য লইবার জন্য চেষ্টিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। বালাজী ভয় পাইয়া তারা বাইকে নিম্নলিখিত রূপে এক পত্র দিলেন —"তাঁহার ন্যায় সদাশয়া, বুদ্ধিমতী ও উচ্চপ্রকৃতির রমণী আর নাই; তিনি যাহাতে অধিকাংশস্থলেই শাসনশক্তির পরিচালন করিতে পারেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমি রাজা সাহুর নিকট যে ক্ষমতা পাইয়াছি, রামরাজ যাহাতে তাহা স্বীকার করেন, বৃদ্ধা রাণী তৎপক্ষে অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।" মহারাষ্ট্রগণ বালাজীর কূট রাজনৈতিক জ্ঞানের তারিফ করিলেন। বালাজী ভিতরে ভিতরে মহা শত্রুতা সাধন করিতে লাগিলেন। তারা বাই বালাজীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মহারাষ্ট্রগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পেশবা বিবেচনা করিলেন, তারা বাই'র সহিত তিনি মল্লযুদ্ধে পারিবেন না; কাজেই বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি গুণে, মানে ও বলে সর্ব্বপ্রধান; আপনার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নহে। আপনি পুণায় আসিয়া প্রধান শক্তি গ্রহণ করুন।" কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, রামরাজ পিতামহীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে তারা বাই অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ইহাতেই তিনি সমস্ত ক্ষমতা হারাইলেন। মনের দুঃখে তিনি আর বেশীদিন বাঁচিলেন না।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয়া ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

শ্রী হেমলতা সরকার

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতা রমণীর একটি আদর্শ চরিত্র। ইনি স্বনামধন্যা মনস্বিনী কবি কামিনী রায়ের দ্বিতীয়া ভগ্নী। ইঁহাদের পিতা চণ্ডী-চরণ সেন মহাশয় এক স্বাধীনচেতা তেজস্বী পুরুষ বলিয়া এ দেশে খ্যাত। তিনিও একজন যশস্বী লেখক। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে টম কাকার কুটীর, মহারাজ নন্দ কুমার ইত্যাদি পুস্তক অতিশয় প্রসিদ্ধ। ভক্তিভাজন চণ্ডী-চরণ সেন মহাশয় কন্যাদিগকে যত্নসহকারে উচ্চশিক্ষা দিয়া-ছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কবি হইলেন; তিনি বিশ্ববিদ্যা লয়ে বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সহোদরা কুমারী যামিনী আমার সতীর্থী ছিলেন। বাল্যাবধি তাঁহাকে জানিতাম—সেই আমার বিদ্যালয়ের সঙ্গিনী—সহপাঠিনী যামিনী ছেলেবেলায় তাঁহার মুখে কথা বড় ছিল না—স্বভাবতঃই চুপচাপ আত্মপ্রকৃতির বালিকা ছিলেন। সকলের সঙ্গে ভাব, সকলের সঙ্গে হাসি-গল্প করিয়া করিয়া বেড়ানই অভ্যাস তাঁহার ছিল না। সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র এই আমার বাল্যবন্ধুকে দেখিতাম। কিন্তু সেই ছোট বেলা হইতে কি প্রতিজ্ঞার বল—যাহা ধরিতেন কেহ তাহা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিত না। পাঠ্যাবস্থায় দেখিতাম অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি—কত সুন্দর সুন্দর ইংরাজি গদ্য মুখস্থ বলিয়া যাইতেন। আমরা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "তুমি গদ্য কি করে' মুখস্থ কর ভাই?" উত্তর—"আমি ত মুখস্থ করি না, দু' একবার পড়লেই মুখস্থ হ'য়ে যায়।" আর কি দেখিতাম? চুপচাপ মেয়েটি যখন বিশেষ বিশেষ বন্ধুর কাছে মন খুলিয়া গল্প করিতেন, তখন তাঁহার কি সুন্দর বর্ণনাশক্তি—কি উজ্জ্বল মুখশ্রী—কি সুন্দর হাসি! যামিনীর বন্ধুত্বের ভিতর একটু বিশেষত্ব ছিল, সেই কিশোর বয়সেই যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়াছে সে বন্ধুত্ব এ জীবনে ছিন্ন হয় নাই। বিদ্যালয়ের বন্ধুকে রোগশয্যা-পার্শ্বে সেবা বিধায়ের দিন দেখিলাম।

আমারা আই-এ পর্য্যন্ত একসঙ্গে পাঠ করিবার পর যামিনী বলিয়া বসিলেন, বি-এ পড়িবেন না, ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবেন। বন্ধুজনেরা কত নিষেধ করিলেন,—পিতা দোরতর প্রতিবাদ করিলেন,—চারিদিক হইতে সকলে বাধা দিতে লাগিল। যামিনীর অটল প্রতিজ্ঞা—ডাক্তারি পড়িতে যাইবেনই। ক্রমে সকলের প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল। যামিনী মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তখন হইতে আমাদের দেখাশুনা কখনও কদাচিৎ হইত। ডাক্তারি পড়িবার সময় তাঁহাকে অনেকপ্রকার কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়া-ছিল—কিন্তু যামিনী কখনই আরামপ্রিয় ছিলেন না। নীরবে সকল প্রকার কষ্ট অসুবিধা সহ্য করা অভ্যাস ছিল। তার পর যথাসময়ে ডাক্তার হইয়া কলেজ হইতে বাহির হইলেন।

আমি যামিনীকে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিবার ও জানিবার সুযোগ পাইলাম—যখন ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে তাঁহারই চেষ্টায় আমার স্বামী 'বীর হাসপাতালের' ডাক্তার হইয়া নেপালে গেলেন। তখন যামিনীর চরিত্রের অপূর্ব্ব বিকাশ, অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গেলাম। কেবল কি কর্ম্মশক্তি,—কি তাঁর পুণ্য প্রভাব, নেপাল সরকারে কি তাঁর উচ্চ সম্মান! আরও দেখি-লাম বালোর সেই নীরব বালিকা এখন কি তেজস্বিনী নারী! নেপালে প্রায় এক বৎসর নিত্য তাঁহার সহবাসে সুখে কাটি-য়াছে—যদিও তাঁহার কদাচ নিশ্চিন্ত হইয়া দু'দণ্ড কথা বলি-বার সুযোগ হইত না। আমরা প্রথমে একই বাগানে দুইটি ছোট ছোট বাড়ীতে থাকিতাম—তারপর পার্শ্বের বড় হাসপাতালে ডাক্তারের কোয়ার্টারে উঠিয়া যাই। আমরা নিদ্রা হইতে উঠিতে না উঠিতে দেখিতে পাইতাম যামি-

নীকে লইয়া যাইবার জন্য রাজপরিবার বা সম্ভ্রান্ত ঘরবাড়ী লোকদের বাড়ী হইতে অনেক গাড়ী আসিয়াছে। এবং যামিনীর গাড়ীর পশ্চাতে অমন ৭।৮ খানি গাড়ী বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিতাম। যে গাড়ীখানি সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিল যামিনী সেই গাড়ীতে সেই বাড়ীতে সর্ব্বাগ্রে গেলেন—গাড়ীগুলি সব তাঁহার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শেষ গাড়ীখানি করিয়া শেষ রোগীকে দেখিয়া বাড়ী ফিরিলেন। প্রাতে ৭টার মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া সারাদিনের মত বাহির হইতেন। কখন বেলা ২।৩টায় ফিরিতেন—কখন বা ফিরিতে ফিরিতে দিবাশেষ হইত।

একটি মেয়েদের হাসপাতালে যামিনীর তত্ত্বাবধান করিতে হইত—সেখানে বিস্তর বাহিরের রোগী এবং অনেকগুলি স্থায়ী চিকিৎসাধীন রোগী ছিল। এই হাসপাতালের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম—কিন্তু হাসপাতাল খুলিবার পূর্ব্বেই ভোর হইতে না হইতেই তাঁহার জন্য গাড়ীর পর গাড়ী প্রতীক্ষা করিত। এমন অনেক সময় হইত, সারাদিন কঠিন শ্রম করিয়া শয্যা গ্রহণ করিতে না করিতে মধ্যরাত্রিতে জরুরি ডাক আসিত, তখন সেই প্রচণ্ড শীতে মিস্ সেন তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া রোগী দেখিতে যাইতেন। যখন তাঁহার পিতামাতা কিছুদিনের জন্য সেখানে ছিলেন, তখন তাঁহারা কত নিষেধ করিতেন, বিশেষভাবে তাঁহার পিতা বলিতেন—"এখন গাড়ী ফিরিয়ে দাও, সকালে যাবে বলে' দাও।" যামিনী কখনও শুনিতেন না, বলিতেন, "অত্যন্ত প্রয়োজন না হ'লে কি আর রাত্রে লোকে গাড়ী পাঠায়? আমার যেতেই হবে। তখন পিতার চক্ষু জল আসিত—"আহা বড় কষ্ট তোমার!" যাঁহার স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া পিতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত—তাঁহাকে কোনদিন কখনও কষ্টের কথা বা শ্রান্তির কথা বা অসুবিধার কথা উচ্চারণ করিতে শুনি নাই। এমন অনেক সময় হইয়াছে যে হাসপাতালে কঠিন রোগী আছে—কি কোন কঠিন অপারেশন আছে, তখন মিস্ সেনকে বাধ্য হইয়া রাজবাড়ীর গাড়ী ফিরাইয়া দিতে হইত, কারণ তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি দরিদ্র অসহায় নারীকে অবহেলা করিয়া রাণীদের সামান্য রোগের চিকিৎসা করিতে যাওয়া অবৈধ বোধ হইত। কিন্তু রাজবাড়ীর গাড়ী ফেরান এক দুঃসাহসিকতার কাজ!—কেহই এত বড় দুঃসাহসিক কাজ করিতেন না—"নয় হাসপাতালের রোগী মরেই যাবে, তাই বলে' রাজবাড়ীর ডাক অগ্রাহ্য করা?" একমাত্র মিস্ সেনের সে সাহস ছিল—এবং একদিন সামান্য ভাবে মহারাজ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, মিস্ সেন কি সত্যকথা শুনাইলেন, "আপনারা নিয়মে লিখে রেখেছেন হাসপাতালের কাজের সময় কেউ বাইরের ডাকে যাবে না; কিন্তু রোগীর প্রাণের দায়েও আপনাদের ডাকে অবহেলা করলে অপরাধী হ'তে হয়—এ নিয়মের কি অর্থ!" মিস্ সেনের কথা শুনিয়া মহারাজের মুখ লাল হইয়া গেল। অন্য কাহারও মুখে একথা শুনিলে সেই দিনই তাঁহার বরখাস্ত হইত, কিন্তু মিস্ সেন "কাজ ছাড়িয়া দিব" বলিলে তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। নেপাল রাজ্যে সে সময় দাসত্বপ্রথা ছিল—আরও কতপ্রকার সামাজিক কুরীতি, কুনীতি ছিল। যামিনীর দারুণ ঘৃণা এ সকলের প্রতি। আমার নিকট এই সকল কদাচার বর্ণনা কালে ঘৃণায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিত, বলিতেন—"প্রচুর উপার্জ্জন করি বলে' না—টাকার মায়ায় নয়,—কখনো এদেশে থাকতে পারতাম না যদি না সাধ্বী সতী বড় মহারাণী ও মহারাজ চন্দ্র শামসেরের সাধ্বী পত্নীর চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করত।" এই দুই সাধ্বী নারী তাঁহাকে যে কি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালোবাসিতেন তাহা বলিতে পারি না।

মহারাজ অধিরাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী কাশ্মীর রাজ্যের কুলু উপত্যকার কোন ক্ষত্রিয় গৃহস্থের কন্যা ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া ৭ বৎসরের বালিকাকে আনিয়া ৯ বৎসরের বালক মহারাজ অধিরাজের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। এই বড় মহারাণীর মিস্ সেনের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ছিল—তাহা বন্ধুত্ব বলিব, কি সখিত্ব বলিব, কি গুরুর প্রতি শিষ্যার ভক্তি বলিব তাহা আমি জানি না। এ এক অপূর্ব্ব প্রেম! এই বড় মহারাণী তখন যুবতী। মহারাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী হইলেও তিনি উপেক্ষিতাই ছিলেন—মনে হইত জগতে মিস্ সেনই তাঁহার একমাত্র জুড়াইবার স্থান। প্রতিদিন নিজহস্তে রন্ধন করিয়া মিস্ সেনকে পাঠাইতেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রতিদিন মিস সেনের জন্য ফুলের মালা, ফুলের পাখা, নানাবিধ

সুখাদ্য ও মহারাণীর নিজহাতে প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী আসিত —তাহা অপরজনের আহার করা কঠিন। তিনি নিজে যাহা আহার করিতেন সবই মিস্ সেনের জন্য আসিত। মিস্ সেন ছুটিতে দেশে গিয়াছিলেন: ফিরি-া আসিলে একদিন মহারাণী বলিলেন, "আমি অমুক আচার করেছি, কিন্তু মুখে দিই নি—আপনি আগে না আস্বাদ করলে আমি কি-করে' খাই?" এই মহারাণী যখনই শুনিতেন মিস্ সেন কাজ ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন, শোকে আচ্ছন্ন হইতেন, মিস্ সেনকে বলিতেন, "তবে আমি কি করে' বাঁচ্‌ব?" মিস্ সেন বলিতেন, "তবে কি আপনি আশা করেন, আপনাদের প্রেমেই আমি মজ্‌ব?—এখানে চিরদিন থাকা কি সম্ভব?" কিন্তু তাঁহার প্রাণ প্রবোধ মানিত না। ভগবানকে ধন্যবাদ—আজ তিনিও স্বর্গে।

একবার আমরা নেপালে থাকিতে সংবাদপত্রে পড়িলাম ভূমু উপত্যকায় ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া বিস্তর লোকের প্রাণ গিয়াছে। সেই কত দিনের পুরানো সংবাদ মিস্ সেনের মুখে শুনিয়া মহারাণীর কি দুর্ভাবনা—কি দুঃখ! "মিস্ সেন, হয়ত আমার বাবা-মা প্রাণে মারা গিয়েছেন! আমি তাঁদের সংবাদ চাই—আমাকে আপনি তাঁদের সংবাদ এনে দিন।" আবার তখনই বলিতেছেন যে, "বাপ-মা ৭ বছরের মেয়ে আমাকে বিদর্জন দিয়ে গিয়েছেন—আর এ জীবনে একদিনও দেখ্‌লেন না, সেই বাপ-মার জন্য আমার প্রাণ এত কাঁদে কেন? নারী হ'য়ে জন্মান কি কঠিন শাস্তি মিস্ সেন!" আমি জানি মিস্ সেন অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন সংবাদ আনাইতে—কিন্তু ফল কি হইয়াছিল স্মরণ নাই। নেপাল রাজ্যে টেলিগ্রাম ছিল না। মিস্ সেন মহারাণীর জন্য অনেক করিতেন। নেপালের রাজবাড়ীতে মেয়েদের লেখাপড়া, গানবাজনা শেখান হয়। এই মহারাণী পিয়ানো বাজাইতে জানিতেন,—রাগরাগিণীর জ্ঞান খুব ছিল। মিস্ সেন অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতের রাগরাগিণী তাঁহাকে বলিলে তিনি বাজাইয়া শোনাইতেন, এবং ঠিক হইল কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন। কত ব্রহ্মসঙ্গীতের অর্থ বুঝাইয়া দিতে বলিতেন। মিস্ সেন অতি চোস্ত ধরবারী নেপালী অনর্গল বলিতে পারিতেন। একদিন মনে আছে মিস্ সেন তাঁহারই অনুরোধে "কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাঁদারে, জনম-নিভৃতে নাথ যাহা আছে লুকায়ে" এই ব্রহ্মসঙ্গীতটির অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "এ ত পরমহংসের কথা—প্রাণ খুলে এ কথা কে বল্‌তে পারে?" একদিন তিনি পূজায় বসিয়াছিলেন, মিস্ সেনকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি পূজা সারিয়া আসিতেই মিস্ সেন একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "মহারাণী, বড় সময় নষ্ট হ'ল—আপনি এতক্ষণ ধরে' কি পূজা কর্‌ছিলেন? এত পূজা কি করেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরকে বলি—জন্ম যদি দাও ত আর রাজরাণী কোরো না।" এ সব কথা দিনের পর দিন যামিনী আমায় বলিতেন।

আর, মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্র শাম্‌সেরের মহিষীর প্রতিও কি তাঁর অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল। এই মহারাণী তিন বৎসর থাইসিস্ রোগে কষ্ট পাইয়া মারা যান; মিস্ সেন এই তিন বৎসর প্রতিদিন তাঁর কত যে যত্ন, কত যে সেবা করিতেন তাহা আর বলিবার নয়। এই রাজদম্পতির আশ্চর্য্য ভালোবাসার কথা মিস্ সেন কত যে বলিতেন। স্বামী রাত্রে বার বার আসিয়া পত্নী কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেন—আর পত্নীর জন্য কি তাঁহার ব্যাকুলতা! পত্নী তাই পীড়ার শেষ বৎসরে শীঘ্র মরিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। মিস্ সেনকে বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র মর্‌তে দিন—আমি মহারাজের কষ্ট আর দেখ্‌তে পারি না।" আমি তখন নেপালে, যখন এই সাধ্বী সতীর মৃত্যু হইল। বাগমতী নদীর তীরে যখন তাঁর মৃত্যুর পর থাকিয়া থাকিয়া কামান ধ্বনিত হইতে লাগিল, মিস্ সেন নিজের ঘরে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য আজও চক্ষে ভাসিতেছে। বলিলেন, "এঁর জন্যই এ রাজ্যে বাস করতাম, আর নয়—এবার আমি যাবোই।" বাস্তবিক মিস্ সেনের আন্তরিক সেবার কথা বলিতে পারি না—তিনি ডাক্তার ছিলেন না, সেবিকা ছিলেন।

মিস্ সেনের দিবানিশি যে দুরন্ত শ্রম দেখিয়াছি, এত শ্রম করিতে কখনও কোন নারীকে দেখি নাই। ডাক্তারি

করিয়া যেটুকু সময় পাইতেন,ঘরের কাজে কর্মিতে—এমন কি রন্ধন করিতে বসিতেন। তাঁহার ক্ষেত-খামার—গরু-বাছুর হাঁস-মুরগি, ধান-চাল শাক-সব্জি নিয়ে প্রকাণ্ড সংসার। ভোক্তার অভাব ছিল না;—কেবল তদ্বির, গৃহিণীপনা, আর বিতরণ। তাঁহার হস্তের রান্নাও কি এত সুন্দর! এক এক দিন আমি অবাক্ হইয়া বলিতাম, "কবে এত রাঁধতে শিখলে, কোনদিন ত কিছু জান্তে না?" বলিতেন, "এ সব নাকি শিখতে হয়? ৬ মাসে ওস্তাদ রাঁধুনি হওয়া যায়। আমার রাঁধতে ভালো লাগে।" অবসর-সময়ে নিত্য কত সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমাদের পাঠাইতেন। যামিনীর ঘরে আমরা নেপালে যে সকল রাজভোগ্য বস্তু, অহো! ভোগ্য ভোগ করিয়াছি ঐ অল্পদিনে এমন কাহারও ভাগ্যে হয় না।

যামিনীর কথা বলিতে আরম্ভ করিলে শেষ করিতে পারিব না। আর দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিবৃত্ত হইব। আমরা নেপালে থাকিতেই তাঁহার বড় ভাই সেখানে যারা যান—তখন তাঁহার মাও সেখানে ছিলেন। সেই ভাইটিকে যামিনী কি প্রাণ দিয়া সেবা করিতেন! যখন ঔষধ-পথ্য খাইতে চাহিতেন না,—কি মিষ্ট করিয়া বলিতেন, "লক্ষ্মী ভাই খাও, ভাল হবে।" ভাইকে আর কেহ কিছু জোর করিয়া অনুরোধে করাইতে পারিত না; যামিনী বলিলেই অমনি শিশুর মত হাঁ করিতেন। ভাই'এর সেবায় শ্রান্তি-ক্লান্তি ছিল না—বাহিরে দুরন্ত ঝড়, ঘরে অনিদ্রায় রাত্রি-যাপন। সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা! সেই ভাই তাঁহার কোলেই গেলেন। সে শোক অবর্ণনীয়। যামিনীর মুখে সেদিন প্রথম অনুযোগ শুনিলাম,"ভগবান, আমার ভাইটির প্রাণ দান কর্বে বলে' এত কষ্ট কর্লাম—এই তোমার বিচার হ'ল!" অমনি তাঁহার ভক্তিমতী জননী বলিয়া উঠিলেন, "যামিনী, ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যা করেছেন ভালোর জন্যই। প্রাণ ফেটে গেলেও—আমাদের শোকের সমস্তই মঙ্গলময় বল্তে হবে।" নেপালে ব্রাহ্মরা খৃষ্টানদের ন্যায় অস্পৃশ্য। পুত্রের মৃত দেহ কোলে করিয়া সেই গভীর শোকের সময় জননীর দারুণ অবস্থা মনে হইল—যামিনী বলিলেন, "মা, তোমায় আমায় নিয়ে যেতে পার্ব না?" অর্থাৎ স্পর্শ ত কেহ করিবে না। যামিনীর প্রতি মহারাজ চন্দ্র শামসেরের কি আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কত সহানুভূতি জানাইয়া উপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দেখিয়াছিলাম সেই দুর্দ্দিনে জননীর বিশ্বাস, ভক্তি, আর কন্যার অপরাজিত সেবা ও ভাই'এর প্রতি ভালোবাসা! সেই ভাই'এর বিধবা পত্নীর প্রতি যামিনীর কি অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। যতগুলি ভাই ছিল প্রত্যেকটিকে পিতামাতা যে স্নেহে সন্তান পালন করেন সেই গভীর স্নেহে প্রত্যেকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন মাতৃপিতৃ-ভক্তি—এমন স্বজনবাৎসল্য আর দেখিব না।

আর একটি ঘটনা।—যামিনী একদিন তিন মাসের একটি ফুটফুটে বালিকা ক্রয় করিলেন। মিস্ সেন সেদিন প্রাতঃকাল হইতে বাহিরের কাজে ঘুরিতেছেন। অতিদরিদ্র, ছিন্ন বস্ত্র-মাত্র পরিহিত পাহাড়ী দম্পতি তিন মাসের একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশু-বালিকা মিস্ সেনকে বিক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত। মিস্ সেন একটি শিশু-বালিকা প্রতিপালন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই কথা লোকমুখে শুনিয়া এই দরিদ্র দম্পতি গেটের দারে তিন মাসের শিশু বিক্রয় করিতে আসিল। মিস্ সেন গৃহে নাই—আমার নিতান্ত আপত্তি, সেই নোংরা লোকেদের অতি নোংরা শিশুটিকে যামিনী গ্রহণ করেন। তাহাদের বলিলাম, "তোমরা আজ যাও, সন্ধ্যা হ'তে চল্ল, আজ আর কিছু হবে না।" তারা নড়ে না। দারুণ অশান্তি! এমন সময় যামিনী উপস্থিত। সেই হৃষ্টপুষ্ট মাতৃদুগ্ধপুষ্ট তিন মাসের ফুটফুটে শিশুটি যামিনীর মন কাড়িয়া লইল। তিনি তখনই দরদস্তুর করিয়া টাকা দিয়া শিশুটিকে কিনিলেন। কেনা হইলে শিশুটিকে যামিনীর কোলে দিয়া মা মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তার স্বামী সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তারা বিদায় হইল। তখন রাত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে যামিনী নিজহস্তে তাহার মাথায় ক্ষুর দিলেন। পরে সাবান ও গরম জলে ভাল করিয়া শিশুটিকে স্নান করাইলেন—সেই তার জীবনে প্রথম স্নান। তার পর পরান কি? আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইলেন, "যদি শিশুর মত জামা কাপড় থাকে দাও।" আমি অবাক্! সত্য সত্যই এই শিশুটি যামিনী মানুষ করিবে? বলিলাম, "ভাই, কিন্লে ত মা'র দুধখেকো শিশু, কি কর্বে' মানুষ কর্বে?" কি কষ্ট এই শিশুর জন্য তিনি করিয়াছিলেন তাহা

বর্ণনীয় নয়। কত রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া কাটাইয়াছেন। মায়ের ক্লান্তি আসে, যামিনীর ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিল না। আমার মনে হইত অপাত্রে ন্যস্ত এত আদরযত্ন! কাঠকুড়ুনির মেয়ে কখনও ভালো হয়? এ মন্তব্য শুনিতে যামিনী ভালোবাসিতেন না। শুনিলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন। মহারাণী পর্য্যন্ত হাসিয়া বলিতেন, "মিস্ সেন, যতই কর, ওর মগজ তোমার মত হবে না।" মিস্ সেন বলিতেন, "মুশিকার কি হয় এবার পরীক্ষা হবে।" এই শিশুটি বড় হইল—একেবারে স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ হইল। যামিনীর ইংলণ্ড যাইবার সময় টাইফয়েডে অল্প ইহার মৃত্যু হয়। সন্তানের জন্য জননীর শোক কি তাহার অভিজ্ঞতা যামিনীর হইল।—সেই প্রথম শিশুপালন!

তখন হইতে আরও কত অনাথা বালিকাকে যামিনী জননীর ন্যায় পালন করিয়াছেন। আমার স্বামী মহাশয় বলিতেন, "মিস্ সেনের কি বাৎসল্যের ক্ষুধা,—কি মা হবার যোগ্যতাও! কেবল পুরুষ জাতির কারো প্রতিই প্রেমদৃষ্টি পড়্‌ল না—উনি মা হ'তে প্রস্তুত, কিন্তু কারো পত্নী হ'তে প্রস্তুত নন।" আমার এই কথা বলিতেন, কিন্তু মিস্ সেনকে দেখিলে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলিতেন। কি গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার মিস্ সেনের প্রতি ছিল।

মিস্ সেনকে দেখিলেই লোকের শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইত। নেপাল রাজ্যে তাঁহার যে প্রভাব ছিল সে কেবল তাঁহারই চরিত্রের বলে। আমি দেখিয়াছি অর্থ তিনি প্রচুর উপার্জ্জন করিয়াছেন;—আশ্চর্য্য! অর্থ লইয়া নাড়া চাড়া করিতে কখনও দেখি নাই, এমন কি অর্থ স্পর্শ করিতেও দেখি নাই। তাঁহার সঙ্গিনী মিসেস্ গুপ্তা বলিতেন, "আজ অমুক অমুক জায়গা হ'তে এত টাকা এসেছে—" অমনি বলিতেন, "কলকাতায় পাঠিয়ে দিন।" মিসেস গুপ্তা টাকার ব্যবস্থা করিতেন। যামিনীর আহারে পরিচ্ছদে বিলাসিতা ছিল না। প্রতিদিন প্রাতে ৫টায় উঠিয়া স্নান করিয়া আধা-গোড়া ধোপার বাড়ীর নির্ম্মল শুভ্র কাপড় চোপড় পরিয়া সেব করিতেন। ৭টার মধ্যে ডাল ভাত আলুসিদ্ধ ডিমসিদ্ধ খাইয়া প্রস্তুত। তাঁহার জন্য মুরগির ব্যবস্থা করিবার যো ছিল না—"আমার একার জন্য একটি প্রাণী, তা হবে না।"—যোরতর প্রতিবাদ! তাঁহার জন্য কোন বিশেষ ভাল ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, এই কথাই সর্ব্বদা বলিতেন। রেশমী শাড়ী কখনও পরিতেন না—কোন অলঙ্কার কখনও পরিতেন না—দুইখানি হাত খালি, কানে শুধু দুটি বহুমূল্য হীরার দুল ছিল। আমি ঠাট্টা করিয়া বলিতাম, "কোথাও কিছু নাই—কানে বহুমূল্য হীরা।" বলিতেন, "মহারাণী নিজে আমায় পরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আমার স্মরণার্থ সর্ব্বদা পরবেন খুল্‌বেন না', তাই খুল্‌তে পারি না।" অলঙ্কার বদনে ভূষণে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার প্রতিদিনের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রবসনা মূর্ত্তি দেখিয়া মহারাণীরা বলিতেন, "কি সুকুমারী আপনি! আমাদের দেখ্‌তে এত ভাল লাগে—প্রতিদিন সব পরিষ্কার নির্ম্মল কাপড়, এমন পবিত্র লাগে। কেন ভাল কাপড় গহনা পরেন না?" বলিলে কেবল হাসিতেন, কোন উত্তর দিতেন না। বহুমূল্য উপহারের ত অন্ত ছিল না—কিন্তু নিজ ভোগের জন্য কিছুই নয়। যামিনী যেমন রোমন্থী তেমনি বুদ্ধিমতী, তেমনি তেজস্বিনী ছিলেন। চক্রাকুমর নেপাল রাজ্যে সকল বাড়ীতে তাঁহার গতিবিধি ও আদর ছিল—কিন্তু কাহারও নিকট ধরা দিতেন না, তাঁহাদের সকল কথা শুনিতেন—একটি মন্তব্যও মুখ হইতে বাহির হইত না। তাঁহারা বলিতেন, "মিস্ সেন সব শোনেন কিন্তু বোবা।" তিনি শুনিয়া যাইতেন—কোনপ্রকারে মনের ভাব জানিতে দিতেন না। আমি বিস্মিত হইয়া কত সময় ভাবিতাম, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া এত দূরদেশে এমন করিয়া কোন্ মেয়ে থাকিতে পারে? বিস্তর উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু ধনের মায়া কোনদিন ছিল না, ধন তাঁহার ভোগের জন্য নয়—পৃথিবীর কোন ভোগসুখে তাঁহার স্পৃহা ছিল না।

এমন নিষ্কাম পরসেবা—এমন নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি! অনাবিল দেহমন লইয়া সেই শুভ্র ফুলটি—বিধাতার হস্তরচিত সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্যরাশি আজ অকস্মাৎ ধরনিকা পার হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। এমন একটি অপূর্ব্ব নারীচরিত্র আমি কখনও দেখি নাই। অনন্যসাধারণ আশ্চর্য্য চরিত্র! আমার সহোদরা যামিনীর কথা ভাবিলে শ্রদ্ধায় আমার মন পূর্ণ হয়। ধন্য তাঁহার পুণ্য-

শোক জনক-জননী—এমন কন্যারত্ন তাঁহাদের ক্রোড়ে আসিয়াছিল! ধন্য হইবে এই দেশ পরিবার যদি এই চরিত্রের গৌরব এই পরিবারে রক্ষিত হয়। প্রথম যুগের শিক্ষিতা নারী কুমারী যামিনী কি আদর্শই রাখিয়া গেলেন। ধন্য তাঁহার জন্মস্থান। আজ তাঁহার জন্য অনাথা কন্যারা কাঁদিতেছে, আর কাঁদিতেছে তাহারা যাহাদের তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন! ভগবানের সেবিকা, পিতামাতার ভক্তিমতী কন্যা, ভাইবোনের স্নেহময়ী ভগ্নী, বন্ধুর অকৃত্রিম বন্ধু, অনাথাদের জননী, কুমারী যামিনী আমার সহোদরা হইলেও তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতেছি।

ক্ষীর ও নীর

থার্ড ক্লাস—শ্রী রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। প্রকাশক—ডি, এম্, লাইব্রেরী; ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য —১৷০ দেড় টাকা।

ত্রয়োদশটি গল্পসমষ্টি লইয়া এই থার্ড ক্লাস। প্রথম গল্প থার্ড ক্লাস নামানুসরণই গ্রন্থনামকরণের মূল নহে,—সমাজের তৃতীয় শ্রেণীর উপেক্ষিত-সাধারণের সুখদুঃখের কথা লইয়াই প্রধানতঃ এই কথা-মালিকা গ্রথিত হইয়াছে; এবং শেষোক্ত দিক দিয়াই গ্রন্থনামের সার্থকতা সমধিক।

মরণোন্মুখ পুত্রের গৃহোন্মুখী কল্যাণী মাতার ব্যাকুলতায় সমাজের যাত্রাযান অপেক্ষা মাত্র করে না—ছুটিয়া চলে পাটের দালালের গৌরব বহন করিয়া। হৃতমর্য্যাদা তৃতীয় শ্রেণীর পুরস্কারকে কনুইয়ের গুতা দিয়া পথবিধায়ক ফ্লাইং চেকার ভ্রূক্ষেপহীন দলিত পদক্ষেপে নীরবে চলিয়া যায়। অসংখ্য তৃষ্ণার্ত্তের নিকট না পৌঁছিয়া পানিপাঁড়ের পানীয়-দাক্ষিণ্য পৌঁছিতেছে কোন্ একজন নগণ্য কাহার সম্মুখে সসম্ভ্রমে! চোখের জলে গোলা বিদ্রূপের রক্তবর্ণে শিল্পী-কথাকারের কথা-রেখাচিত্র কি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রসানুভূতিকারুণ্যে, "আপেল"এর নটবর হিউগো'র ভগ্নিনকে এবং ফিরিওয়ালা "নিধিরাম" রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং অলক্ষিতে চক্ষু আপনি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এক দিকে "তীর্থের" রামু মালী বর্ত্তমান অন্তঃসারশূন্য দেবায়তন-বিধানের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে কঠোর ইঙ্গিত প্রকাশ করিতেছে,—অন্য দিকে "চণ্ডীমণ্ডপ" তার অধুনালুপ্ত প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের ধ্বংস-স্তূপের দিকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া তাকাইতে বলিল।

সবগুলি গল্পের রস-পরিচয় বা বিশ্লেষণের স্থান এখানে নাই। অধিকাংশই প্রায় সমান শিল্পবৈশিষ্ট্যশালী। রচনাকৌশল অভিনব—ভাষা সরল এবং কথা-বন্ধন সংযত ও সংক্ষিপ্ত। এক কথায়, ছোট গল্পের সংজ্ঞায় আবিলতা না আনিয়াও, ইহা প্রথম শ্রেণীর শীর্ষ-পংক্তিবর্ত্তী হইয়াছে, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জয়ন্তী—শ্রী প্রতাপ সেন বি-এস্ সি। প্রকাশক—শ্রী বিমলাচরণ রায় চৌধুরী; কাজি-বাজার, কটক।

ইহা রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কবিগুরুকে কবিবর্গের প্রীতির অর্ঘ্যদান। পরিচারিকার কবিশেখর কালিদাস সত্যই বলিয়াছেন, "যদি সম্পূর্ণ যোগ্য নাও হয়, ভক্তি-নিবেদনের আকুতি ভরা অঞ্জলিই ইহাদের সকল কুণ্ঠা-সঙ্কোচ, দৈন্য-মালিন্য দূর করিয়া দিবে।"

কবির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ,—পরিচয় পাওয়া যায়।

—বঃ সঃ

নন্দিনী—শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। মূল্য—দেড় টাকা।

দুইটি বড় গল্পে বইখানি শেষ হইয়াছে। (১) নন্দিনী (৮৮ পৃষ্ঠা)—(২) জননী (৭৩ পৃষ্ঠা)। 'নন্দিনী'র মল্লিকা ও 'জননী'র শঙ্করী উভয়েরই শৈশব কাটিল অজস্র সুখ-সোহাগের মধ্যে। কিন্তু শেষ পরিণতি পড়িয়া চোখ অশ্রুসজল হইয়া ওঠে। এই হিসাবে গল্প দুইটির মধ্যে সুরের একত্ব আছে। "বাংলা দেশে মল্লিকা মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছে। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সে নয়।

লোভ করিয়া যেমন সে সেদিকে হাত বাড়াইয়াছিল, তেমনি উপযুক্ত শাস্তিই তাহার হইয়াছে।" লেখকের এই কয়েকটি কথায় "নন্দিনী"র বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে। আর শঙ্করী অপরিণত বুদ্ধিতে যে ভুল করিয়াছিল, প্রতিমুহূর্তে সশঙ্ক হইয়া থাকিত মেয়ে অপর্ণার যেন তেমন কখন না ঘটে। যখন জানিল যে তাহা নয় তখন বিপুল আনন্দে সে কাঁদিয়া ফেলিল। শৈলেজানন্দের লিপিভঙ্গিমা অনুকরণীয়। এই গল্প দুইটিতে তাঁহার যশ আরও বাড়িবে।

কৃত্তিবাস

মন্দিরের চাবি—কাব্যগ্রন্থ। শ্রী কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্, ৪ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—চার আনা।

কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে যে বিষয়টি বড় করিয়া চোখে পড়িয়াছে, তাহা হইল কবির সত্যিকারের বেদনা-বোধ, এবং এরূপ কবিতার ইহাই হইল প্রাণবস্তু। দশটি কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'শ্যাম নটরাজ' শীর্ষক কবিতাটি ভাব-সম্পদে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটি কথা, কবি এটিতে বড় বেশী রকম সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের সহজ-সুন্দর রূপটি ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। সংজ কথায় প্রাঞ্জল কবিতা 'প্রভাতের ডাক' আমাদের তৃপ্তি দিয়াছে। কোনো কোনো কবিতায় দৈর্ঘ্য কমাইয়া বলিবার বিষয়টি আরও একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিতে পারিলেই ভাল হইত; ইহাতে লাভ হইত এই দিক দিয়া যে কবি এই স্থানটুকুর মধ্যেই আরও দুই একটি নূতন কবিতা সংযোজনা করিতে পারিতেন।

মাঝে মাঝে চমৎকার প্রসাদগুণ লক্ষিত হয়। ছন্দ প্রায় নির্দ্দোষ; ভবিষ্যতে সহজ কথার উপর আকৃষ্ট হইলে ইনি যে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারিবেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

বই হিসাবে দাম কমই ধরা হইয়াছে। এই শ্রেণীর বইয়ের বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক।

—কঃ

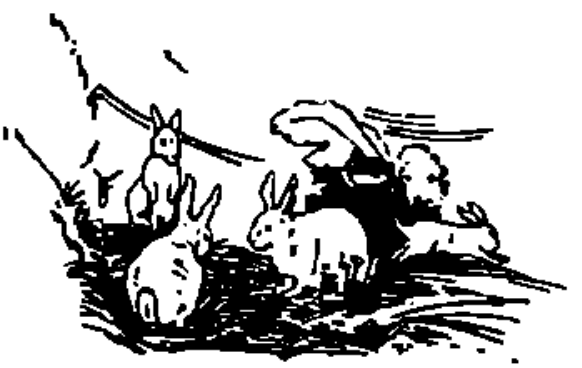

বেতারে গ্রাম্য-গীতি ও গ্রাম্য-নৃত্য

[মেঘদূত—বিদূষী]

গত ২৩শে জানুয়ারী শনিবারের সান্ধ্য-অনুষ্ঠানটি বাংলা দেশের বেতারের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনন্তকালের জন্য স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। সেদিনকার ভারতীয় সান্ধ্য-প্রোগ্রামের ৭টা থেকে ৮-৩০ মিনিট সময়টুকুর পরিচালনভার গ্রহণ করেছিলেন ইণ্ডিয়ান রেডিও কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষেরা। ইণ্ডিয়ান রেডিও কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ মহাশয়েরা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত। বেতার-অনুষ্ঠানের সঙ্গীতাদির সংস্কারের জন্য তাঁদের চিন্তাশক্তির পরিচয় আমরা এতদিন বাক্যের ভিতর দিয়েই পেয়ে এসেছিলাম, এইবারে কার্য্যতঃ তাঁরা যা দেখালেন, তার জন্য আমরা তাঁদের তারিফ না করে' আর থাকতে পারছি নে। বেতারের সান্ধ্য-অনুষ্ঠান এতদিন একটানা একঘেয়ে সুরেলা গানেরই সমষ্টিমাত্র ছিল। কিন্তু গত শনিবারের এই আসরটি সুরে-বেসুরে, নৃত্যে গানে, ঢোলে কাঁসিতে, মাদলে-গাবগুবাগুরে এক অপরূপ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করেছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে পরিব্যাপ্ত ছিল উন্মাদনাপূর্ণ আনন্দ, বন্ধনহীন গতি ও শিশুসুলভ স্বচ্ছন্দতা। ইণ্ডিয়ান রেডিও কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলী এই অনুষ্ঠানের জন্য স্বনামধন্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহোদয়কে সদলবলে বেতার-আসরে এনে সকলেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

গুরুসদয় বাবুকে আমরা কেবলমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট বলেই সম্মান করিনে,—ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য তাঁর উপরের খোসা মাত্র। তাঁর নারী-শিক্ষানুরাগ সরোজনলিনী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমগ্র বাংলা দেশে ব্যাপ্ত, তাঁর বাংলা সাহিত্য-সাধনা "ভজার বাণী"র পংক্তিতে পংক্তিতে প্রকটিত, আর তাঁর পল্লী-প্রাণতার বার্ত্তা আজ গ্রাম নগর ছেড়ে বেতারের দ্বারা ব্যোমপথ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। সোদনের অনুষ্ঠানে গুরুসদয় বাবু প্রথমেই একটি সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা গ্রাম্য-গীতি ও গ্রাম্য-নৃত্যের মাধুর্য্যের বিষয় সুন্দররূপে বিবৃত করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার ভিতর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম—সত্য সত্যই তিনি বাংলার পল্লীকে কিরূপভাবে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। সেই জন্যই তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত পল্লীনৃত্য ও ধ্বংসোন্মুখ পল্লীস্থিতিকে উদ্ধার ক'র' তাতে প্রাণ-সঞ্চার করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। তাঁর এই পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নি—দিনের পর দিন সফলতার দিকেই অগ্রসর হ'চ্ছে। জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তার আসনে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েই তিনি তাঁর সময় অনায়াসেই কার্য্যে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর বক্তৃতাতেই প্রকাশ যে, তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, প্রভৃতির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের, মফঃস্বলের জমীদারদের পর্য্যন্ত নাচিয়েছেন। গুরুসদয় বাবুর নৃত্যানুরাগের পরিচয় আমরা প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে আরও একবার পেয়েছিলাম। তিনি তখন হাওড়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। শালিখার গোবর্দ্ধন-মাটা-সাহিত্য সমাজের কোন একটি বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ও সে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে নৃত্যের মাধুর্য্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে উৎসাহভরে বলে' উঠলেন, "আজ আমরা সকলেই নাচবো,—আপনারা সকলে উঠুন—উঠুন জলধর বাবু।"···

গুরুসদয় বাবু বেতারের আসরে সেদিনের সঙ্গীত-অনুষ্ঠানটিতে কয়েকটি স্বরচিত সঙ্গীতের অবতারণা করেছিলেন। কেবল স্বরচিতই নয়—প্রত্যেকটি গানের মধ্যে গুরুসদয়

বাবুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখীপ্যমান রয়েছে। আমরা যখন তাঁর প্রথম গানটি শুনলাম—"ভগবান হে, খোদাতালা হে, জয় জয়!—" তখন এই কথাই মনে হচ্ছিল যে, সেই এক অদ্বিতীয় ভগবান কত রূপে, কত নামে, কত ভাবে বিভিন্ন আধারের মধ্যে কত বিচিত্র মধুর লীলা করছেন।

গুরুসদয় বাবুর দ্বিতীয় স্বরচিত সঙ্গীত "জয় জয় ভারত-মাতা" গানও পূর্ব্বের গানটির মতোই স্ব-সম্পদে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন-অধিনায়ক" গানের পরে কোনও সঙ্গীতরচয়িতা এরূপ গান লিখবার জন্য প্রয়াস করেন নি। তাঁর তৃতীয় সঙ্গীত জারি-গান। এই জারি-গান মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত লোক-সঙ্গীত। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় মহাকবি শেলির বচন উদ্ধৃত করে' এই জারি-গানের এক সুন্দর পরিচয় দিয়েছিলেন। এই গানটি তাঁরা "বেশ বেশ বেশ ভাই," "চুপ কর গো" বলে' শেষ করেছিলেন। বোধ হয় —জারি-গান শেষ করবার ঐরূপই রীতি। তাঁদের চতুর্থ সঙ্গীত—"চাষা"। গানটির সঙ্গত হোলো আনন্দলহরী বা গাবগুবাগুবে। "ছোটলোক নয় রে চাষা," বলে' গানটির আরম্ভ। এ গানটিও গুরুসদয় বাবুর স্বরচিত সঙ্গীত। বাউলের সুরে গীত হওয়ায় গানটি প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছিল। যাঁরা এই সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে "চাষার" গানের স্বাভাবিকতা স্ফুরণ করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন।

"জ্ঞানের মশাল নিয়ে হাতে,
নেমে আয় চাষের ক্ষেতে।"

—এই দুটি চরণে কবি চাষাদের প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগ ও হিতৈষণা প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের পঞ্চম বিষয়বস্তুটি হ'চ্ছে—"কাঠি-নৃত্য।" গুরুসদয় বাবু এই নৃত্যের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করে' জানতে পেরেছেন যে, এক সময়ে এর নাম ছিল যুদ্ধ-নৃত্য। তখন তলোয়ার নিয়ে এ নৃত্য দেখানো হোত;—এখন তলোয়ারের বদলে কাঠি। মাদলে এ নৃত্যের সঙ্গত হোলো। গুরুসদয় বাবু মাদলের এই সঙ্গতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে' বললেন—"মাদলে রুদ্রভাব—যুদ্ধনৃত্য। করুণ-রসের সুন্দর সমাবেশ।" কথাটা সত্য। এই কাঠি-নৃত্যের সঙ্গে বীর ও করুণ রসের সমন্বয় সাধন করে' গুরুসদয় বাবুর স্বরচিত সঙ্গীতও গীত হয়েছিল। তাঁদের ষষ্ঠ বস্তুটি হ'চ্ছে "বাউল-সঙ্গীত।" নৃত্য-সহযোগে এ গানটি গীত হয়েছিল। গাবগুবাগুব যন্ত্রের সঙ্গে গীত হওয়ায় বাউলের প্রকৃত রসসৃষ্টি হয়েছিল এ গানটিতে। আমরা বীরভূম অঞ্চলের ঝুমুর গান শুনেছি। সে গানে মাঝে মাঝে "লেগে যা মজা, লেগে যা মজা, লেগে যা মজা।" বলে' গায়ক-গায়িকারা হর্ষধ্বনি প্রকাশ করে। এই বাউল গানটিও শেষ হোলো ঠিক সেইরূপ আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে। গানের শেষে গায়কেরা সমস্বরে বলে' উঠলেন, "জয় ভগবান, জয় ভগবান, জয় ভগবান।" সম্ভবতঃ এটি বাউলের সংকেত রূপবিকাশ।

সপ্তম বস্তুটি হ'চ্ছে রাইখিশে (রায়বেঁশে) নৃত্য; সঙ্গে গান "আয় মোরা সবাই মিলে' খেলবো রাইখিশে।" এ গানে গুরুসদয় বাবু ঘোষণা করলেন যে, গ্রাজুয়েটের ঘাড়ে ঢোল ও গ্রাজুয়েটের হাতে কাঁসি। আমাদের দেশের ডিগ্রীধারী যুবকেরা যে পল্লীসঙ্গীতের প্রতি এতটা অনুরাগী হয়েছেন, এ আমাদের জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে আশাতীত আনন্দের কথা। অতঃপর ব্রহ্মচারী-সঙ্গীত ও অভিনন্দন-গান। দুটি গানই সুন্দর। অভিনন্দন-গানটি কীর্ত্তন সুরে গীত হওয়ায় বেশ রসমধুর হয়েছিল।

"তারা মোদের সবার প্রিয়,
সকলের আদরণীয়, সকল গুণে বরণীয়।"

—এই "তারা" বলে' অভিনন্দিত করলেন তিনি তাঁর গানের আসরের শ্রোতৃবৃন্দকে। অনুষ্ঠানের শেষে Hip, Hip, Hurrah-ধ্বনির স্বদেশী রূপটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে—তাঁরা সর্ব্বশেষে তিনবার উচ্চারণ করে' বললেন—ও-ব্-ব্-ব্ ইয়া, ও-ব্ ব্-ব্ ইয়া, ও-ব্-ব্-ব্ ইয়া। আমরা প্রত্যেক জাতীয় অনুষ্ঠানে এইরূপ হর্ষধ্বনিরই আশায় আশান্বিত হ'য়ে রইলাম। গুরুসদয় বাবুকে আমাদের ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁর ভাষাতেই বলি—

"তুমি মোদের সবার প্রিয়,
সকলের আদরণীয়, সকল গুণে বরণীয়!"*

—বরণীয়

* সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় "বঙ্গীয় পল্লীসঙ্গীত রক্ষা সমিতি"র পক্ষ হইতে পল্লীসঙ্গীত ও পল্লীনৃত্য শিক্ষার নিমিত্ত "শিক্ষক ট্রেনিং ক্যাম্প" স্থাপন করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা, বগুড়া, চব্বিশ-পরগণা, হুগলী প্রভৃতি বহু জেলায় হাই স্কুলের প্রায় ৪০ জন শিক্ষক এই ক্যাম্পে যোগদান করিয়াছেন।—ব: স:

কালিয়া মহিলাসমিতি

বর্ত্তমানে আমাদের সমিতির একটি স্থায়ী পাকাঘর ও তাঁতের জন্য একটি পাকাঘর শ্রীযুক্ত ভামিনীরঞ্জন সেন শর্ম্মা মহাশয় করিয়া দিয়াছেন। ১লা শ্রাবণ হইতে সমিতি একটি অবৈতনিক স্কুল খুলিয়াছেন। ২ জন শিক্ষয়িত্রীর মাহিনা ১৫৲ ও ১০৲—ইহাও উক্ত ভদ্রলোক বহন করেন। স্কুলে এই কয়মাসে ৭১ জন ছাত্রী হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর বালিকা বহুসংখ্যক। ৪ জন মহিলা নিয়মিত তাঁত শিখিতেছেন। কাপড় বোনা আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য মহিলাগণ এবং কালিয়া প্যারীশঙ্কর বালিকাবিদ্যালয়ের বালিকাগণ এই স্কুলে কাটিং ও সেলাই শিখিতে প্রতি শনিবার আসিয়া থাকেন। স্কুলের বালিকাগণকে মাসে ২ দিন রন্ধন শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতিমাসে একদিন করিয়া সমিতির অধিবেশন হয়। জানুয়ারী মাস হইতে নাই ট্রেনিং ক্লাস খোলা হইবে এবং এই স্কুলে আরও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইবেন। এইস্থান হইতে পড়িয়া মেয়েরা ম্যাট্রিক দিতে পারিবেন। পূর্ব্বে সমিতিতে চাঁদা আদায় করা হইত এখন তাহা হয় না, কারণ সমিতির সমস্ত ভার শ্রীযুক্ত ভামিনীরঞ্জন সেন বহন করিতেছেন। তবে বিশেষ সময়ে, যেমন বন্যার সময়, আমরা চাঁদা তুলিয়া কিছু সাহায্য করিয়াছিলাম। কোনও দুঃস্থ লোককে সাহায্য করিবার জন্য পৃথক চাঁদা তুলিয়া সাহায্য করিলাম। এইভাবে চাঁদা আদায় করিয়া থাকি, নিয়মিত মাসিক কোন চাঁদা আদায় করি না। সেলাই ইত্যাদি মেয়েরা পুরানো কাপড় দ্বারা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন প্রতিমাসে যে অধিবেশন হয় ইহাতে মেয়েরা স্তোত্র-পাঠ, আবৃত্তি, গান করিয়া থাকেন। লাঠি ও ছোরা খেলার কোনও বন্দোবস্ত নাই, তবে শীঘ্রই হইবে। আগে যেমন মহিলাদের প্রাচীনাগণ সমিতিতে যোগ দিতে তীব্রভাবে বাধা দিতেন (একদল পুরুষও), এখন সেটা মোটেই নাই।

সমিতির ঘরেই স্কুল বসে। ঐ ঘরের সম্মুখে তিনটি মন্দির আছে—শিব, দুর্গা, ও নারায়ণ দেবের। সমিতির শিক্ষণীয় বিষয়—

১। মন্দিরের সম্মুখে স্তোত্রপাঠ, ২। সাধারণ পাঠ, ৩। চরকায় সুতা কাটা, ৪। সেলাই শিক্ষা, ৫। চিত্রাঙ্কণ ৬। তাঁত বয়ন শিক্ষা, ৭। মাসে ১ দিন রন্ধন শিক্ষা।

মাসে ১ দিন মহিলাসমিতির অধিবেশন। প্রতি মাসে সমিতি একখানি হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা "তৃপ্তি" বাহির করেন। ইহাতে সারগর্ভ প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, গল্প ও মহিলাদের অঙ্কিত ছবি বাহির হইয়া থাকে। সমিতির আলোচ্য বিষয়—মাতৃমঙ্গল, শিশুপালন, নারীর কর্ত্তব্য, কর্ম্মই ধর্ম্মের সোপান—ইত্যাদি।

শ্রী বিভা দেবী,
সম্পাদিকা।

কায়স্থপল্লী মহিলাসমিতি

আজ ৮।১০ বছর যাবত এই গ্রামে "কায়স্থপল্লী পল্লী-মঙ্গল সমিতি" নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। উহার মধ্য দিয়া এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার উন্নতিমূলক কার্য্য হইয়াছে। নারীকে বাদ দিয়া কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভবপর নয় ভাবিয়া বিগত ১৩৩৬ সনের পৌষ মাসের এক শুভদিনে উক্ত সমিতির কতিপয় শ্রদ্ধাভাজন

স্থাপয়িতার প্রচেষ্টায় কায়স্থপল্লী,ভামছাইট ও সাধুপুর গ্রামের মহিলাদের নিয়া এক মহিলাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে পল্লীমঙ্গল সমিতির সুযোগ্য সভ্য শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র-জীবন দত্ত রায় বি-এল্ মহাশয়ের 'বর্ত্তমানে নারীদের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতার ফলে এবং তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শুকদেব দত্ত আই-সি-এস্ মহোদয়ের প্রেরণায় ও সাহায্যে উৎসাহান্বিতা হইয়া উক্ত তিনটি গ্রামের মহিলাগণ মিলিয়া "কায়স্থপল্লী নারীমঙ্গল সমিতি" স্থাপন করেন।

এইলে রাত্রি জাগিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে থাকিতে প্রত্যেকেরই আগ্রহ দেখা যায়।

বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ঘর যাহাতে প্রসূতি-পরিচর্য্যাগার নির্দ্ধারিত হয় তাহার জন্য এই সমিতি হইতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

গ্রামের মহিলাদের যাঁহার যে বিষয়ে পারদর্শিতা আছে তাঁরা সেই সেই বিষয় অবসর-সময়ে মেয়েদের শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহার কাঁথা, ন্যাপ্পের সলিতা, টিপ্‌রাই তাঁতে তোয়ালে, পাপোস্, বাঁশ ও বেতের কাজ, সেলাই, পোষাক-

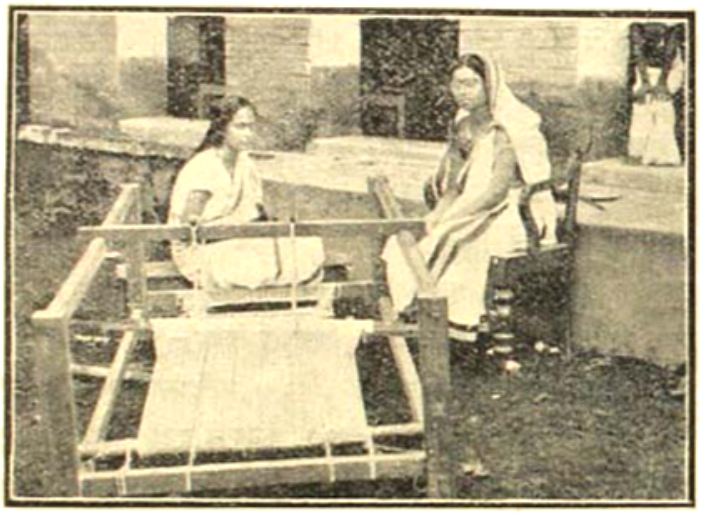

শ্রীযুক্ত রোদ—সেবহারী মহিলাসমিতির শিল্পশিক্ষালয়

বর্ত্তমানে সমিতির সভ্যাসংখ্যা ৪৫ জন; ইহার মধ্যে বিধবা ৯ জন। পরিচালিকাগণের মধ্যে শ্রীযুক্তা গিরিবালা রায়, তরুবালা রায়, কুমারী লিলি রায় ও পুতুল রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বে এই গ্রামে মহিলাদের একত্রে মিলিবার কোনই সুবিধা ছিল না। তাঁরা ঘরের কোণে নিজেদের ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিতেই বেশী ভালবাসিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রত্যেক মাসে বৈঠক করিয়া সভার বন্দোবস্ত হওয়ায় ভাবের আদানপ্রদানের সুবিধা হইয়াছে এবং ইঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া ক্রমশঃই ইঁহারা এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। ইহা আজ বড়ই গর্ব্বের বিষয় যে কুলবধূরা পর্য্যন্ত প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে সাহসী হইয়াছেন। গ্রামে কেহ অসুস্থ পরিচ্ছদের কাটছাট, সূচশিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

এই গৃহশিল্প প্রচারের জন্য বর্ত্তমান সনের বিগত ২৪।২৫।২৬ আশ্বিন শ্রীযুক্তা গিরিবালা রায়, তরুবালা রায়, কুমারী লিলি রায় ও পুতুল রায়ের চেষ্টায় একটি মহিলা-শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। অত্র গ্রাম-নিবাসী বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকা প্রদর্শনীক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সব ক দৈনিক বাংলা ও ইংরাজী পত্রিকাতে যথাসময় প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে স্থানীয় শিল্পজাত জিনিষ ব্যতীত চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম, সদর ও মহকুমা সহর হইতে এত শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি হইয়াছিল যে সুবৃহৎ

দালানের চারিখানি কোঠায় তিলধারণের স্থান ছিল না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই—তিনদিন-ব্যাপী প্রদর্শনীর যাবতীয় কার্য্য মহিলাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। বিভিন্ন শিল্পের নিপুণতার জন্য পুরস্কার ও প্রশংসাপত্রের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গ্রামের দুঃস্থা মেয়েদের জন্য একদিন বিনামূল্যে প্রদর্শনী দর্শনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা প্রীতিরাণী চৌধুরীর চেষ্টায় এই গ্রামে এপর্য্যন্ত ৫টি তাঁতে বিভিন্ন বাড়ীতে তোয়ালে ও ছিট প্রস্তুত হইতেছে। এই প্রদর্শনীর পর গ্রামে বেশ একটা কর্ম্ম-চেতনা আসিয়াছে এবং তাঁতের কাজ ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য আরো জোরের সহিত চলিতেছে। সমিতির স্থায়ী কোনও গৃহ না থাকায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধা করা যাইতেছে না।

স্থানীয় পল্লীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে এ বৎসর তিনটি বিধবা-বিবাহ করানো হইয়াছে। স্ত্রী-আচারাদি এই সমিতির সভ্যারা বিশেষ আগ্রহসহকারে সম্পন্ন করিয়া এ বিষয়ে নিজেদের আন্তরিক সাহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন।

মাসিক সামান্য চাঁদার উপর নির্ভর করিয়াই সমিতির কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল, কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে চাঁদা আদায় একরূপ বন্ধ। গত প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রয়ের টাকা—পুরস্কার, প্রশংসাপত্র ছাপানো ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে।

এই সমিতির পরিচালনা বিষয়ে আমরা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র-জীবন রায় বি-এল, ডাক্তার হেমচন্দ্র দত্ত রায়, যোগেশচন্দ্র দত্ত রায় বি-এ, সুন্দরবিহারী দত্ত রায় ও জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত রায়ের নিকট হইতে বিশেষভাবে সাহায্য পাইতেছি। গত প্রদর্শনীতে আমরা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায়, শৈলেশচন্দ্র দত্ত রায় ও অনিলভূষণ দত্ত রায়ের নিকট হইতে বহুপ্রকার সাহায্য পাইয়াছি।

শ্রী সুরবালা রায়,
সম্পাদিকা।

সম্পাদিকার জল্পনা

নারীর নরহত্যার প্রবৃত্তি

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে আর এক দুর্দ্দৈব দেখা দিয়েছে। অপরিণত মন বুদ্ধির বালিকারা নরহত্যার প্রবৃত্ত হয়েছে অসম্ভব দুঃসাহস দেখিয়ে। মানুষ যখন মানুষের বুকে ছুরি বসায়—বুক লক্ষ্য করে' গুলি ছোঁড়ে, তখন সে কতকটা উন্মত্ত হয়েই কাজটি করে' থাকে। নিজের ও অন্যের মধ্যে এরূপ উন্মত্ততার প্রশ্রয় দেওয়া যে কতদূর অনিষ্টকর ও কত গুরুঅপরাধের আকর, বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই তা বোঝেন—জ্ঞানীরা খুব ভাল করেই তা জানেন। দুঃখ যখন একান্ত দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে, দুর্দ্দিন যখন দশদিকে ঘনিয়ে আসে বুদ্ধি স্থির রাখাই তখন বাঁচ্‌বার একমাত্র উপায়। বুদ্ধিনাশে সকল দিকে সর্ব্বনাশ ঘটে একথা কি সত্য নয়? জাতির শুশ্রূষাকারিণী ঘরের মেয়ে যদি হত্যা-কারিণী পাষাণী হ'য়ে ওঠেন, তবে তাকে বাঁচ্‌বে কার কোলে গিয়ে? ভগবানের নাম উচ্চারণ করে' যে কাজ করতে পারা না যায় সে কাজে সুফল প্রত্যাশা দুরাশা। হত্যাকারী ছোরার সময় ভগবানের নাম উচ্চারণ করে' মানুষের বুকে ছুরি বসাতে পারে কি? সহস্র বৎসর ব্যাপী অনৈক্যের দারুণ দুর্ব্বলতায় জাতি জর্জ্জরিত; একটি মানুষ মেরে সে অপরাধের ক্ষালন হবে এও কি সম্ভব? কল্যাণবুদ্ধিতে জাতির ঐক্য-বদ্ধ হওয়া, সমগ্র জাতির কল্যাণকে একবুদ্ধিতে সকলের দেখ্‌তে শেখা, ভগবানের শরণাগত হ'য়ে ঐশীশক্তির প্রসাদ ভিক্ষা করা চাই প্রত্যেকের, তবেই ভগবান নিজহাতে পরিত্রাণ বেঁটে দেবেন জাতির ঘরে ঘরে।

প্রত্যেক পরিবারের মা-বাপরা সচেতন হ'য়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে শিশুমতি কন্যাদি'কে এরূপ গর্হিত কাজ থেকে প্রতি-নিবৃত্ত করার চেষ্টা করুন, এই প্রার্থনা।

স্বর্গীয়া ডাঃ কুমারী যামিনী সেন

বাংলার সুকন্যা, জাতির গৌরবস্থানীয়া খ্যাতনামা ডাঃ কুমারী যামিনী সেন গত ৭ই মাঘ, ১৩৩৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার ৬টায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবনের মোট ঘটনাগুলি দৈনিক সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে ও হ'চ্ছে। আমরাও সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করে', তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত থেকে তাঁর চরিত্রগত মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করবার সুযোগ যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার কিছু পরিচয় দিয়ে সেই স্বর্গগতা ভগ্নীর আত্মার উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করে' পরিতৃপ্ত হ'চ্ছি।

কুমারী যামিনী সেন জীবনে অর্থোপার্জ্জন করেছেন বেশ। উপার্জ্জনের প্রত্যেক পয়সাটি তিনি সঞ্চয় করে' গেছেন নিজের হাতে,—এটি কম প্রশংসার কথা নয়।

যাঁরা স্বভাবতঃই সৎ, উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতা পেলে দেশে, কালে ও ঘরেবাইরে তাঁরা যে কতখানি সুফল ফলাতে পারেন, কুমারী যামিনী সেনের জীবন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাঙালী ঘরে পারিবারিক সুদৃষ্টান্ত ও সংশিক্ষার সু-ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখে তার আশপাশের অন্যায় চাপকে ঠেলে ফেলে যাঁরা যথার্থ কল্যাণের মধ্যে নিজেদের বুক্তিদান করতে পারেন, বর্ত্তমান বাংলার নূতন গঠনে তাঁরাই জাতির অগ্রদূত। নারীসমাজের সেই-সকল অগ্রপথযাত্রীদের মধ্যে কুমারী যামিনী সেনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আজন্ম সন্ন্যাসিনী-স্বভাবা পবিত্র-চরিত্রা এই চিরকুমারী বাঙালী কন্যা পিতৃপরিবারের যেমন অশেষ কল্যাণকারিণী ছিলেন, পরিবারের বাইরে অনাথ বালক-বালিকাদেরও ছিলেন তেমনি তিনি সাক্ষাৎ জননী।

এই দুই স্থানে তাঁর কল্যাণমূর্ত্তি আমাদের চোখে-দেখা জিনিষ—কানে-শোনা শুধু একটা কথা মাত্র নয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় বঙ্গলক্ষ্মীর অন্যস্থানে তাঁর সম্বন্ধে অন্য একজন বিশিষ্টা মহিলার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাও প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হইল। বর্ত্তমান শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে তিনি আলোক-স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করুন, এই প্রার্থনা।

সমাজ সেবায় বাংলার নারী

ঘটনাক্রমে পুরীতে, বয়সে প্রবীণ এক বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। পুরীতে তিনি বাস করেন না—বেড়াতে গেছেন—সেখানে নিজের বাড়ী আছে সমুদ্র-তীরে। আলাপ-পরিচয়ে বোঝা গেল মানুষটি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি বিচক্ষণ—অভিজ্ঞও বহুবিষয়ে। দেশের সকল খবরই তিনি রাখেন, নিজেও দেশের হাজার কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিশেষভাবে। প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠ্‌ল শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েদের সমাজ-উন্নতিকর কাজে যোগ দেওয়ার। বল্লেন, আজকাল বাংলার অনেক মেয়েই ত শিক্ষিতা হ'য়ে উঠেছেন কিন্তু সমাজসেবার কাজে দরকার হ'লে প্রায় কাউকেই পাওয়া যায় না, এ বড় দুঃখের কথা। তিনি নাকি অনেক চেষ্টা করেও কোন শিক্ষিতা মহিলার তেমন সহায়তা পান নাই তাঁর সংশ্লিষ্ট নানা কাজে—কাজেই কথাটা বল্‌তে পারেন। অমন একজন গুণী লোকের কথা শুধু কানে শুনে কিরে আসা গেল না, কথাটি মনে করে' নিয়ে এসে ভাল করে' ভেবে দেখ্‌তে হ'ল বাড়ী ফিরে'।

বাঙালী সভ্যজাতি,—উদ্যমের সভ্যতা ও ভদ্রতা প্রত্যেক ভদ্র বাঙালী পরিবারের পুরুষ-নারী উভয়ের স্বভাবে রক্তমাংসের মত জড়িত, সহজাত সংস্কারের ভাবে যুক্ত। বর্ত্তমান কালের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা না হয়েও বাংলার মেয়েরা দেশীয় রীতিতে সমাজসেবা করে' আসছেন বহুকাল থেকে। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পরেও মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী রাসমণি, পুঁটিয়ার রাণী শরৎ-সুন্দরী, মহারাণী হেমন্তকুমারী, সম্ভোষরাজ-পরিবারের খ্যাতনামা দীনমণি চৌধুরাণী, জাহ্নবী চৌধুরাণী, রাজা রামমোহনের পৌত্রবধূ গোলাপসুন্দরী দেবী, জ্ঞানদা দেবী, স্বর্গীয়া হরিমতি দত্ত, লেডী বসন্তকুমারী চাটার্জ্জী প্রভৃতি বাঙালী কন্যারা এক অক্ষর ইংরাজী না পড়েও উচ্চাঙ্গের সমাজসেবা করে' গেছেন বহুতর দিক্ দিয়ে। গরীবের মেয়ের বিবাহ দেওয়া, গরীব ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, নিজের সংসারে বহু বিধবাকে আশ্রয়দান, দূর নিকট সকল আত্মীয়ের অভাবমোচন, স্বজন-প্রতিপালন, দীনদরিদ্রকে পেট ভরে' খাওয়ানো প্রভৃতি কল্যাণকর সমাজসেবাগুলি তাঁদের নিত্য কাজের অঙ্গ। তা ছাড়া স্কুল, কলেজ, আশ্রম, দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা, পুকুর খোঁড়া, রাস্তা তৈরী ইত্যাদি তাঁদের অনেক লোকহিতকর কীর্ত্তিও দেশের মধ্যে জাজ্বল্যমান। শুধু ছিল না পৃথিবী সম্বন্ধে

তাঁদের সুস্পষ্ট জ্ঞান। তাই পৃথিবীর সঙ্গে যোগে তাঁরা চল্‌তে জান্‌তেন না, কর্‌তেও পারেন নাই পৃথিবীর সঙ্গে যোগে কোন কাজ। আর সদর দরজার চৌকাঠটি পার হ'তে পার্‌তেন না ব'লে' নিজের ব্যক্তিত্বও ফোটাতে পারেন নাই ঘরের মাঝে। ফলে আত্মবলের চেয়ে তাঁদের অর্থবলের দিকেই লোকের নজর পড়ে বেশী।

দিন বদ্‌লেছে, আধুনিক শিক্ষা সকল মানুষের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর দিকে,—মেয়েরাও তা থেকে বাদ পড়েনি। পৃথিবীর সঙ্গে যোগে চলার জন্য তারাও এখন প্রস্তুত হ'চ্ছে সকল দিক থেকে। তবে ঘর সাম্‌লে বাইরের কাজে যাবার সুযোগ-সুবিধা পান খুব কম মেয়েই। অনেকেরই ঘরে অভাব-অনটন প্রচুর। গ্রাজুয়েট মেয়েরা শিক্ষা শেষ করেই চাকরীতে ভর্ত্তি হচ্ছেন পরিবারের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য, প্রায়ই দেখা যায়। পিতৃমাতৃহীন ভাই-বোনদের মানুষ করা—বিধবা মাকে অভাব জান্‌তে না দিয়ে সযত্নে তাঁর সেবা করা তাঁরা ধর্ম্ম বলে' মনে করেন খুব বেশী। পারিবারিক সেবার মধ্য দিয়েই তাঁরা সমাজ-সেবা করে' থাকেন প্রতিদিন। অন্নভাবে যথোচিত অধিকার না থাকায় অনেক শিক্ষিতা কুমারী ও বিধবাকে স্বাধীন জীবিকা-অর্জ্জনের পথ দেখ্‌তে হয় গোড়া থেকে। যাতে অর্থ নাই শুধু স্বার্থত্যাগ তেমন কাজে যোগ দেওয়া তাই সম্ভব হয় না তাঁদের পক্ষে সব সময় সহজে। অন্নের সংস্থান, শিক্ষা, সময়, সুযোগ ও পারিবারিক ঔদার্য্য সবই যাঁদের অনুকূল, ঘরে মা, বাপ, স্বামী, সন্তানের সেবার সঙ্গে সঙ্গে এখন তাঁরা বাইরে বিস্তৃত সমাজের সেবায়ও স্বেচ্ছায় অগ্রসর হবেন—অন্যরা ঘর বাঁচিয়ে যতদূর পারেন সমাজ-উন্নতির কাজে সাহায্য কর্‌বেন, আমাদের বিশ্বাস। কারণ, সময় এসেছে —যখন আর কারো স্থির থাকার উপায় নাই।

আশা করি, ঐ প্রবীণ ভদ্রলোকটি সব দিক ভেবে দেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ সমাজসেবার কাজ সম্বন্ধে অনেকটা আশান্বিত হবেন।

কেন্দ্রসমিতির কথা

স্কুলে সাহায্য

বিলাতের ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এ বৎসর সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়ে ১৩১৲ টাকা দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গত বৎসর তাঁহারা ২৩১৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

বরিশালে স্মৃতি-উৎসব

বরিশাল মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাস জানাইতেছেন:—গত ১৯শে জানুয়ারী স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর স্মৃতি-দিবসে স্থানীয় মহিলাসমিতির আনুকূল্যে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতির সম্পাদিকা "নারীকল্যাণে সরোজনলিনী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে সরোজনলিনীর জীবনীর কয়েকটি অংশ পাঠ করা হয়। সমিতির পক্ষ হইতে সরোজনলিনীর বিদেহী আত্মার শুভকামনা ও তাঁহার পারলৌকিক জীবনের প্রভাব সমিতির প্রতি বর্ষিত হ'ক এই মর্ম্মে প্রার্থনা হয়।

নিখিল ভারত নারীসমিতিতে মিঃ দত্তের দান

মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ মহিলাকর্ম্মী ডাঃ মিসেস্ মুথুলক্ষ্মী অম্মল রেড্ডি শ্রীযুক্ত শুকসদয় দত্ত রচিত সরোজনলিনীর ইংরাজি জীবনী পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হন যে তিনি পত্র লিখিয়া আমাদিগকে জানান যে ভারতের নারীসমাজের উন্নতির জন্য প্রত্যেক মহিলার এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। মান্দ্রাজে নিখিল ভারত নারীসম্মিলন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত মহিলাগণের মধ্যে সরোজনলিনীর জীবন-কথা বহুল প্রচারের জন্য ডাঃ রেড্ডি আমাদের নিকট কতকগুলি পুস্তক চাহিয়া পাঠান। তদনুসারে মিঃ দত্ত নিখিল ভারত নারীসমিতির হস্তে ১০০ শত খানি পুস্তক বিনামূল্যে প্রদান করিয়াছেন।

কলে মোজা, টুপি ও মাফলার বোনা শিক্ষা

ইতিপূর্ব্বেই সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়ে কলে মোজা, টুপি, মাফলার প্রভৃতি দ্রব্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদিন স্কুলের সাধারণ ছাত্রীগণ এই শিক্ষার সুযোগ পাইত। এই কার্য্য শিক্ষায় যথেষ্ট উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রী ব্যতীত বাহিরের দুঃস্থ মহিলাগণ এই সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া যাহাতে ৬ মাসের মধ্যেই কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারী মাস হইতে কেবলমাত্র মোজার ক্লাসে শিক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন মহিলাকে গ্রহণ করা হইবে। ৬ মাস পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে স্কুলে মাসিক ২৲ টাকা বেতন দিতে হইবে না। ৬ মাস পরে যোগ্যতা অনুসারে মহিলাগণের বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে। প্রতিদিন ১১টা হইতে ৪০ পর্য্যন্ত ক্লাস হইবে। এই বিভাগের শিক্ষার্থিনীগণ নিজেরা যাতায়াতের ব্যবস্থা করিবেন। স্কুলের বাসে তাঁহাদিগকে লইয়া আসা হইবে না। উপরোক্ত কার্য্যগুলি যাঁহারা শিক্ষা করিতে চান তাঁহারা অবিলম্বে স্কুলের সেক্রেটারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন বি-এ মহাশয়ার নিকট ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অবিলম্বে আবেদন করিবেন।

সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়ে নূতন শিক্ষার বিষয়

বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়ে পুস্তক বাঁধাই ও নানাপ্রকার গালার কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। শান্তিনিকেতন হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন অভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রী এই কার্য্যগুলি শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিখিল ভারত নারী-সম্মিলন

কেন্দ্রসমিতির পরিচালক-সভার সহঃ সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীরদবাসিনী সোম গত ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত নারী-সম্মিলনের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগদান করেন। উক্ত অধিবেশন উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়ের শিল্পদ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মাণিকগঞ্জ মহিলাসমিতিতে স্মৃতিসভা

মাণিকগঞ্জ মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী কিরণবালা সেন জানাইতেছেন গত ১২শে জানুয়ারী মাণিকগঞ্জ মহিলাসমিতির উদ্যোগে স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর স্মৃতি-উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সন্ধ্যারা সকলে মিলিয়া এইদিন দ্বিপ্রহরে একটি বনভোজনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত মহিলাগণ সকলে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির শাখা গ্রামে গ্রামে বিস্তার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হন।

২০ নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য-সমিতির প্রদর্শনী

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতা কর্পোরেশনের ২০ নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য-সমিতির উদ্যোগে একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার মহিলা-দিবস উপলক্ষে সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়ের নার্সিং বিভাগের ছাত্রীগণ বিশেষ যোগ্যতার সহিত স্বেচ্ছা-সেবিকার কার্য্য করেন।

সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীগণ

নিম্নলিখিত মহিলাগণ সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়ের ১৯৩১ সালের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া গত ১২শে জানুয়ারীর বার্ষিক সভায় ডিপ্লোমা পাইয়াছেন :—(১) শ্রীমতী সুষমারাণী সরকার, (২) শ্রীমতী বিজলী সেন, (৩) শ্রীমতী নলিনী সরকার, (৪) শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবী, (৫) শ্রীমতী নবনলিনী রায়চৌধুরী (৬) শ্রীমতী নলিনী দেবী, (৭) শ্রীমতী চারুলতা রায়, (৮) শ্রীমতী রেণুকা মিত্র, (৯) শ্রীমতী ছিন্নলতা দেবী, (১০) শ্রীমতী বীণা বসু, (১১) শ্রীমতী বিভুবালা সেন, (১২) শ্রীমতী সুধারাণী সেন, (১৩) শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।

পুরস্কার বিতরণ

নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি গত ১২শে জানুয়ারী সরোজ-

নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক স্মৃতিসভায় বিতরিত হইয়াছে :—

১। সেনহাটী মহিলাসমিতি, ৫০৲ মূল্যের প্রথম পুরস্কার, শ্রীযুক্ত শুকসদয় দত্ত প্রদত্ত।

২। ৫০৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার, শ্রীযুক্তা লীলা মিত্রকে, শ্রীযুক্ত শুকসদয় দত্ত প্রদত্ত।

সুপরিচালিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত মহিলা-সমিতিগুলি প্রত্যেকে শ্রীযুক্ত শুকসদয় দত্ত প্রদত্ত ২০৲ করিয়া পুরস্কার পাইয়াছে :—

(৩) টালা, (৪) মূলঘর (খুলনা), (৫) যশোহর, (৬) কলমা (২৪ পরগণা), (৭) কাঁয়াল (খুলনা), (৮) ইতিনা (খুলনা), (৯) কুড়িগ্রাম (রংপুর), (১০) বারাসাত (২৪ পরগণা), (১১) লোহাগড়া, (১২) বাইনান (হাওড়া), (১৩) রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ইন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ঠাকুরগাঁও (দিনাজপুর) মহিলাসমিতিকে ১০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

(১৪) শ্রীমতী কামিনী বসু ধরিশাল মহিলাসমিতিকে একটি ১৫৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার দিয়াছেন।

(১৫) রায়সাহেব পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব দিল্লী মহিলাসমিতির সম্পাদিকাকে সূচিশিল্পের জন্য একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিয়াছেন।

(১৬) কেন্দ্রসমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রেমাবধ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ সরোজনলিনী নারী শিক্ষালয়ে এক শত টাকা মূল্যের একটি মোজার কল পুরস্কার দিয়াছেন। শিক্ষালয়ের মোজার ক্লাসের সুন্দর কার্য্য দেখিয়া মিসেস্ ঘোষ এই পুরস্কার প্রদানের দ্বারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

(১৭) মিসেস্ এ, সি, ব্যানার্জি সুন্দর প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী গীতা দেবীকে একটি স্বর্ণ-চিহ্নিত রৌপ্যপদক প্রদান করিয়াছেন।

সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়—

(১৮) সেলাই ও ছাটকাটের জন্য প্রথম পুরস্কার, স্বর্ণ-চিহ্নিত রৌপ্যপদক এবং একটি ওয়ার্ক বাস্কেট, শ্রীমতী সুষমারাণী সরকারকে প্রদত্ত।

(১৯) সেলাই ও ছাটকাটের জন্য ২য় পুরস্কার, রৌপ্য-পদক, শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম কর্তৃক শ্রীমতী বিজলী সেনকে প্রদত্ত।

(২০) এমব্রয়ডারীর জন্য ১ম পুরস্কার, রৌপ্যপদক, ডাঃ মিসেস্ ব্যানার্জি কর্তৃক শ্রীমতী বিজলী সেনকে প্রদত্ত।

(২১) এমব্রয়ডারীর জন্য ২য় পুরস্কার, রৌপ্যপদক, মিসেস্ পি, সি, সেন কর্তৃক শ্রীমতী বীণাপাণি বসুকে প্রদত্ত।

(২২) বেতের কার্য্যের জন্য ১ম পুরস্কার, রৌপ্যপদক, শ্রীযুক্ত হলাইলাল সেট কর্তৃক শ্রীমতী সুষমা সরকারকে প্রদত্ত।

(২৩) বেতের কার্য্যের জন্য ২য় পুরস্কার, রৌপ্যপদক, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীমতী রেণুকা মিত্রকে প্রদত্ত।

(২৪) শতরঞ্জ ও কার্পেট বোনায় কৃতিত্বের জন্য রৌপ্য-পদক, শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন কর্তৃক শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবীকে প্রদত্ত।

(২৫) শতরঞ্জ ও কার্পেট বোনায় কৃতিত্বের জন্য রৌপ্যপদক, মিঃ বি, সেনগুপ্ত কর্তৃক শ্রীমতী সুষমারাণী সরকারকে প্রদত্ত।

(২৬) বস্ত্রবয়নে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার, মিঃ এ, সি, গুপ্ত কর্তৃক শ্রীমতী রেণুকা মিত্রকে প্রদত্ত।

(২৭) বস্ত্রবয়নে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার, শ্রীযুক্ত শুকসদয় দত্ত কর্তৃক শ্রীমতী ছিন্নলতা দেবীকে প্রদত্ত।

(২৮) সন্ধ্যাবহারের জন্য পুরস্কার, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক শ্রীমতী লাবণ্যবতী রায় চৌধুরীকে প্রদত্ত।

(২৯) রন্ধনে পারদর্শিতার জন্য রৌপ্যপদক, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র কর্তৃক শ্রীমতী সুশীলা দেবীকে প্রদত্ত।

উপরোক্ত পুরস্কারগুলি ব্যতীত স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রীগণের মধ্যে গুণানুসারে ১৬টি পুরস্কার বিতরিত হয়। এই সকল পুরস্কারের ব্যয় শ্রীযুক্ত শুকসদয় দত্ত, শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম ও ডাঃ এম, সাহা প্রদান করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কেন্দ্রসমিতির সপ্তম বার্ষিক উৎসব

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি আজ সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টম

বর্ষে সমাপন করিল। একটি প্রতিষ্ঠানের জীবনের পক্ষে সাত বৎসর কাল সামান্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এই সাত বৎসরের মধ্যে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি বাংলার নারীসমাজে যে অপূর্ব্ব জাগরণের সঞ্চার করিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও লক্ষিত হয় নাই। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে কতকগুলি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া জনসমাজের সম্মুখে সমিতির বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এ বৎসরের বার্ষিক উৎসব লক্ষ্য করিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে বঙ্গদেশে কোন প্রতিষ্ঠান এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ সুন্দরভাবে সুগঠিত ও বহুবিস্তৃত হয় নাই। স্বর্গীয়া সরোজনলিনী যে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহার শিখা আজ উজ্জ্বল হইয়া বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রভা বিস্তার করিয়াছে। সরোজনলিনীর স্বামী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অদম্য কর্ম্মশক্তি, অকৃত্রিম দেশভক্তি তাঁহার সাধ্বী পত্নীর অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে দেশব্যাপী করিয়া দিয়া আমাদের দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। তাঁহার সহিত মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নিঃস্বার্থ কর্ম্মীগণ সমিতির কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন।

প্রদর্শনী

গত ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কেন্দ্রসমিতির কার্য্যালয়ে মহিলাসমিতি-সমূহের প্রেরিত শিল্পদ্রব্যাদির একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মাননীয়া লেডী রমণ গত ১৬ই জানুয়ারী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করেন। বঙ্গদেশ এবং তাহার বাহির হইতেও প্রায় ১০০টি মহিলাসমিতি শিল্পদ্রব্যাদি প্রেরণ করেন। সুদূর ব্রহ্মদেশ এবং দিল্লী হইতেও সুন্দর সুন্দর শিল্পদ্রব্যাদি প্রদর্শনীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। প্রতি বৎসর বার্ষিক উৎসবের সময় মহাসমারোহে একটি শিল্পপ্রদর্শনী হইয়া থাকে। গত ৫ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহার পর বর্ষে বর্ষে মহিলাগণ সমিতির ভিতর দিয়া শিল্পকার্য্যের কিরূপ উন্নতি করিয়া আসিয়াছেন এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এবারকার শিল্পদ্রব্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর এবং নৈপুণ্যসূচক হইয়াছিল। দিল্লী মহিলাসমিতি হইতে প্রেরিত সূচিশিল্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল।

স্মৃতিসভা

গত ১২শে জানুয়ারী কলিকাতার এলবার্ট ইনষ্টিটিউট্ হলে মহাসমারোহে কেন্দ্রসমিতির সপ্তম বার্ষিক স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবীর সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু অধিবেশনের দিন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার স্থানে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা মণিকা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। কেন্দ্রসমিতির সভাপতি মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী একটি সুন্দর বক্তৃতায় শ্রীমতী মণিকা দেবীকে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীমতী গীতা দেবী তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন। কলিকাতার সকল শ্রেণীর বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও মহিলা সভায় যোগদান করেন। সভায় এরূপ জনসমাগম হইয়াছিল যে সভার উপরে নীচে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক মহিলা ছিলেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস বক্তৃতার সময় স্বীকার করেন যে তিনি ইতিপূর্ব্বে কোন সভায় এত মহিলাসমাগম দেখেন নাই এবং বলেন যে ইহা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যেরই প্রত্যক্ষ ফল। বাংলা দেশের অধিকাংশ জেলা হইতেই মহিলাসমিতির প্রতিনিধিগণ নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আগমন করেন। বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এ, টি, ওয়েষ্টন একটি মনোহর বক্তৃতায় কেন্দ্রসমিতি যে সুন্দর ও প্রকৃত জনহিতকর কার্য্য করিতেছে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যতটা সম্ভব সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। মিসেস্ কাজিমুন্নেসা জোহা এম-এ সভায় একটি সুন্দর ভাবপূর্ণ প্রবন্ধপাঠ করিয়া সকলকে

চমৎকৃত করেন। সভানেত্রী বিভিন্ন মহিলাসমিতি এবং সরোজনলিনী নারী শিল্পশিক্ষালয়ের ছাত্রীগণকে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করেন। শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি ইংরাজি ভাষায় এবং শ্রীযুক্তা মনীষা রায় এম-এ বঙ্গভাষায় সমিতির গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন রায়, রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন সমিতির বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। কেন্দ্রসমিতির নার্সিং স্কুলের বর্ষনা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার একটি পুরস্কার, সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মণিকা দেবী একটি সুবর্ণপদক এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুইটি ড্রেসিংকেস প্রদান করিবার অঙ্গীকার করেন।

সরোজনলিনী শিল্পশিক্ষালয়ের গানের ক্লাসের ছাত্রীগণ সবিশেষ নিপুণতার সহিত উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং শেষ-সঙ্গীত গান করিয়া পণ্ডিত সকলের চিত্তবিনোদন করেন।

প্রার্থনা-সভা

গত ১৭ই জানুয়ারী রবিবার প্রাতে স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর পুণ্যআত্মার প্রীতিকামনায় কেন্দ্রসমিতির কার্য্যালয়ে একটি প্রার্থনা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় একটি প্রার্থনা করিয়া সকলের চিত্ত মুগ্ধ করেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী স্বর্গীয় ন্যায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী গীতা দেবীর রচিত সরোজনলিনীর জীবনের প্রভাব এবং নারী-আদর্শ বিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই উপলক্ষে সরোজনলিনীর চিত্র পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল এবং স্কুলের ছাত্রীগণ তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও পবিত্র ভাবদ্যোতক হইয়াছিল।

নলিনী-দিবস

কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক উৎসবের সময় প্রতিবৎসর ১২শে জানুয়ারী নলিনী-দিবসের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। এবারও ঐদিন কেন্দ্রসমিতির সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহের জন্য নলিনী-দিবসের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তলাটিয়ারগণ কলিকাতার রাস্তায় নানা স্থানে ফুল বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে দেশে আর্থিক সঙ্কটের জন্য কিঞ্চিদধিক ৪ শত টাকা মাত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। নলিনী-দিবস সাব্ কমিটির সম্পাদক মিঃ টি, সি, বসু বিশেষ যত্নের সহিত এই অনুষ্ঠান পরিচালন করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

গলষ্টন পার্কে লোকনৃত্য ও সঙ্গীত

গত ২৩শে জানুয়ারী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতার গলষ্টন পার্কে একটি প্রীতিসম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কেন্দ্রসমিতির সভ্যগণ এবং কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে সকলের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের আবিষ্কৃত লোকনৃত্য ও লোক-সঙ্গীত প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনাদৃত বঙ্গপল্লীর নিভৃত কোণ হইতে লুপ্তপ্রায় লোকনৃত্যের আবিষ্কার করিয়া দত্ত মহাশয় বঙ্গবাসীকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি শুধু আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে এই স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম-নৃত্য সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ প্রত্যেক স্কুলে বালকদের মধ্যে এই নৃত্য প্রচলনের জন্য আদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে সিউড়িতে সম্প্রতি একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকগণ বালকদের মধ্যে প্রচলনের জন্য লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত শিক্ষা করিতে আসিয়াছেন।

কলিকাতা সহরে সর্ব্বপ্রথম সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির আনুকূল্যে এই গলষ্টন পার্কে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত প্রদর্শিত হয়। কেন্দ্রসমিতির সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সুলতানপুর শ্রীরাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং বীরভূম জেলার একদল রায়বেঁশে এই উপলক্ষে আনীত হইয়াছিল। সুলতানপুর স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত রায়বেঁশে নৃত্য,

কাঠি নৃত্য ও সঙ্গীত, বাউল নৃত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন। গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ ঢোল ও কাঁসি বাজাইয়াছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত গোয়ালিয়ারা হইতে যে রায়বেঁশের দল আসিয়াছিল তাহাদের বাঁশ-নৃত্য এবং নানাপ্রকার ব্যায়ামকৌশল বাস্তবিকই বিস্ময়ের জিনিষ। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিপুল উৎসাহের সহিত বিভিন্ন নৃত্য পরিচালন করেন। নৃত্যের সঙ্গে যে সকল গান হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয়ের রচিত। এই নৃত্য বহুব্যাপকভাবে প্রচলিত হইলে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া আমাদের দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যায়ামনৃত্য একদিকে আনন্দদায়ক অন্যদিকে স্বাস্থ্যের উন্নতিকর। ড্রিলের পরিবর্ত্তে প্রতি স্কুলে এই নৃত্য প্রচলিত হইলে বালকগণের স্বাস্থ্যের অশেষ উন্নতি হইবে।

রেডিওতে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত

গত ২৩শে জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির আগ্রহে এবং শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে বেতারে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুলতানপুর ব্রাঞ্চ উচ্চ ইংরাজি স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ অতি সুন্দর ভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানটি শেষ করেন। নৃত্যের তালে তালে কতকগুলি লোকসঙ্গীত এবং শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের কয়েকটি গান হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণ এই গানগুলি শুনিয়া উচ্চ প্রশংসা করেন। রেডিও ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীতে সেদিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এবং বাহিরে শ্রোতারা ঢোল, কাঁসি, মাদল, গাবগুবাগুব প্রভৃতির তালে তালে বিভিন্ন প্রকারের পল্লীসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন। সংবাদপত্রে এই অনুষ্ঠানের উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে।

শিক্ষিতা মহিলাদের রুচি অনুযায়ী প্রস্তুত সাবান

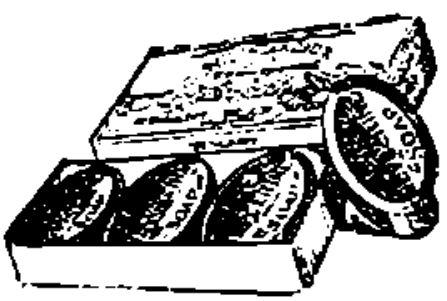

হিমানী-গ্লিসারিণ

মধুর গন্ধ, ব্যবহারে গা চড় চড় করে না। গায়ের চামড়া নরম থাকে ও সুন্দর হয় ও কম ক্ষয় বলিয়া হিসাবমত সস্তা। মধুর গন্ধে আপনার স্নানাগার আমোদিত করিবে।

মুক্তার মত দাঁতগুলির সৌন্দর্য্য রক্ষার ভার

হিমানীর
নীম ডেণ্টাল ক্রীম

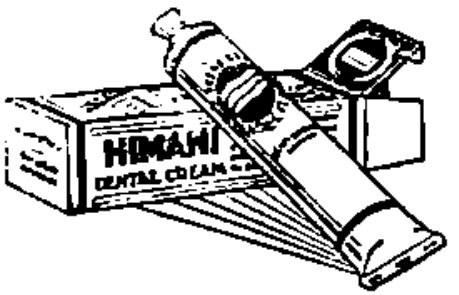

লইতে সক্ষম—অনেক রকম নকল হইয়াছে। হিমানী নামটী দেখিয়া লইলে পশ্চাতে কোনও অনুতাপ করিতে হইবে না।

যাঁহারা পায়োরিয়া নামক দন্ত রোগে কষ্ট পান তাঁরা হিমানীর আইওডিন ডেণ্টাল ক্রীম ব্যবহার করিবেন—ভারতে হিমানীই আইওডিন ডেণ্টাল ক্রীমের প্রথম প্রবর্ত্তক।

প্রচারক—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং ৪৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

Printed by A. C. Sirker at the Classicse 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

চিত্রসূচী ৶৹

"পাতের শিল্প"

চিত্র — শ্রী নন্দলাল বসু

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৮ [৫ম সংখ্যা

বিশ্বব্যাপী

(গান)

৺ রজনীকান্ত সেন

চক্ষের পাশে রাখিয়া কোথায়
খুঁজিস্‌ যে তাই ভাবি;
ভ্রান্ত, এখনো ভ্রান্তি গেল না ?
সে যে রে বিশ্বব্যাপী !

অন্ধ রে, ওরে অন্ধ,
এখনো কি আঁখি বন্ধ ?
এ যে বিচিত্র নিখিল-চিত্র
কার এ মূরতি-ছবি ?
ওরে তাহারি যে রূপরাশি
জ্যোৎস্নার সুধা-হাসি,
দিব্য কিরণ-আলোক-পূরিত
শত গ্রহ-তারা-রবি !

এই যে রে ছোটা ফুল
গন্ধে করে আকুল,
তারি অলক্ষ্য তনু-সৌরভ
কুসুমে রয়েছে মাখি'।
ওই তটিনীর জলতান
তাহারি যে কলগান,
তাহারি নামটি কাননে গগনে
গাহিছে অযুত পাখী।

ওরে তুইও যে রে সেইজন—
সেই প্রাণ ! সেই মন !
ও তোর দেহ যে তারি দেহ নিয়ে,
সে যে পৃথিবীর সবি—
জন্ম-মৃত্যু আলোক-আঁধার
চেতন-জড়-বিটপী ! *

* কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সৌজন্যে স্বর্গীয় ভক্ত-কবির এই অমূল্য প্রকাশিত সঙ্গীতটি প্রকাশিত হইল।

জাতীয় জীবনে নারী

শ্রী সুধাময়ী দেবী বি-এ

আজকাল জাতীয় উন্নতিকল্পে নানা দিক্ দিয়া নানারূপ প্রচেষ্টা চলিতেছে। সমাজসংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, সম্প্রদায়গত বিরোধের উচ্ছেদসাধন—এইরূপ নানা সমস্যা এদেশবাসীর মনকে আন্দোলিত করিতেছে; কতজন কত দিক্ দিয়া চেষ্টা করিতেছেন জাতির দৈন্য দূর করিবার জন্য।

জাতিকে বড় করিয়া তুলিতে হইলে জাতির ভবিষ্যৎ আশা যাহারা—সেই শিশুদের যে প্রথমে দেহমনে সুস্থ-সবল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—এ কথা কিছু নূতন না হইলেও কার্য্যতঃ আমরা ইহার অর্থ তেমন করিয়া বোধ হয় বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

এক একটি পুষ্পে এক একটি শিশুর আগমন যে জাতীর সম্পদ্ বৃদ্ধি—এমনি ভাবে কি আমরা এ বিষয়টি দেখিতে শিখিয়াছি? যদি তাই দেখিতাম তবে এত শিশু প্রতি বছর অবহেলা ও অযত্নের ফলে অকালে প্রাণ হারাইত না, এত প্রসূতি লোকচক্ষুর অন্তরালে তিল তিল করিয়া আপনার দেহটি ধ্বংস পাইতে দিত না—শত শত মাতৃহীন শিশুর অশ্রু-লাঞ্ছিত দেহমন আমাদের জাতিকে দুর্ব্বলতার চরম-সীমায় উপনীত করিত না।

পশ্চিমের উন্নতিশীল জাতিগুলির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই শিশুদের সুস্থ-সবল করিয়া তুলিবার, তাহাদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার কত চমৎকার ব্যবস্থা রহিয়াছে, নিত্য নূতন কত ব্যবস্থা বাহির হইতেছে। আবার তারা কি কেবল গাছটি বাদ দিয়া সুমিষ্ট ফলটি পাইতে চাহিতেছে? না, তারা জানে গাছের তদারক না করিলে সুফল পাইবার আশা বিড়ম্বনা। সেজন্য মায়ের তদারকের ব্যবস্থাও তারা করিয়াছে। মায়েরা নিজেরাও এ সম্বন্ধে কত ভাবে, নিজেদের অভিজ্ঞতা অন্য পাঁচজনকে শুনায়, সমবেতভাবে শিশুপালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে। জাতির উন্নতি তাদের কাছে কল্পলোকের বস্তু নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং প্রত্যেক মা জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ প্রত্যেক শিশুটিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট। তারপর শিশু গড়িবার ভার কেবল মায়েদের উপর দিয়াই তারা নিশ্চিন্ত নয়, সমগ্র জাতির ভাবনা ইহার উপর নিহিত: তাহাদের মুনিসিপ্যালিটিতে শিশুদের স্বাস্থ্যপরিদর্শক বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসক রাখা হয়। সুস্থ-সবল শিশুর মায়েদের পুরস্কৃত করা হয়। ভাবী মায়েদের স্বাস্থ্য যাতে ভাঙিয়া না যায়, তার জন্য সমগ্র জাতি সজাগ। আমেরিকা হইতে একটি বাঙালী মহিলা কিছুদিন পূর্ব্বে কোন পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন সেখানে 'মায়ের দিন' বলিয়া বছরে একটি বিশেষ দিন আছে। সেইদিন ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে মহাসমারোহে মা'কে অর্ঘ্য নিবেদন করে। কেবল যে একটি দিনেই তাহাদের মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা পর্য্যবসিত তাহা নয়। মায়েদের অকালমৃত্যু নিবারণ-চেষ্টা তাহারা প্রেসিডেন্টের সাহায্যে বিধিমতে করে। লেখিকা লিখিতেছেন, "সারা দেশময় গির্জ্জায়, রেডিয়োতে, বিজ্ঞাপনে, দৈনিক সংবাদপত্রে, থিয়েটারে, বায়স্কোপে, রাস্তায় বক্তৃতায়, স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে যে প্রতিবৎসর আমেরিকার মত আধুনিক দেশেও প্রায় ১৬০০০ হাজার স্ত্রীলোক সন্তান-প্রসবকালে মারা যায়। যদি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ও সেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহ'লে এর অধিকাংশ স্ত্রীলোকই এই অকালমৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে। কত হাজার সুখের সংসার মায়ের অকালমৃত্যুতে নিরানন্দময় হয়। কত হাজার সন্তান মাতৃস্নেহের অভাবে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করে। কেবল সহৃদয় আমেরিকানদের সহযোগে ও সাহায্যেই এ অকালমৃত্যুর হাত থেকে অধিকাংশ নারী সহজে রক্ষা পেতে পারে। তবে তাঁরা কি এ কর্ত্তব্যে বিরত থাকবেন?"—এই হইল স্বাধীন জাতির লক্ষণ। জাতিগত কোনও প্রকার ত্রুটি তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

আর আমাদের দেশে বছরে কত হাজার হাজার শিশু,

কত হাজার হাজার প্রসূতি মরে, সেবা ও জ্ঞানের অভাবে প্রাণ হারাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা দুয়ারীতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে ঐ বইএর পাতেই লেখা থাকে, তাহার প্রতিকারের জন্য কি বিধিমতে চেষ্টা হয়? হয় ত বা বিদেশীয়দের অনুকরণে দু'একদিন Child welfare Exhibition হইল, তাতে দু'চারটি চার্ট টাঙাইয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়া দেওয়া হইল। তারপর সারাবছর আর কে কার খবর রাখে।

নূতন শিশু আসে যখন, তখন অধিকাংশ স্থলেই তার ন্যূনতম আয়োজন কিছুই থাকে না। অন্ধকার একটি ঘরে অপরিচ্ছন্ন ছিন্ন বস্ত্রের উপর শিশুকে অভ্যর্থনা করিয়া লওয়া হয়। সেই শিশুও আসে মাতার যথেষ্ট পুষ্টির অভাবে ক্ষীণ দেহ লইয়া। তাহার পর মাতার উপযুক্ত পথ্যবিধান ও শুশ্রূষার অভাবে, সদ্যজাত শিশুর যথাযথ যত্নের অভাবে, যথেষ্ট আবহণের অভাবে হয় শিশু, নয় মাতা—কখনো বা উভয়েই প্রাণত্যাগ করে। প্রাণ যেখানে যায় না সেখানেও তাহারা জীবন্মৃত হইয়া থাকে। ছোঁয়াচরা সম্বন্ধে যাহাদের তেমন বাচবিচার নাই তাঁহাদের অবস্থাও ইহার চেয়ে বিশেষ কিছু উন্নত নয়। সূতিকাগৃহের হয় ত বা তাঁহারা ভাল ব্যবস্থা করেন; কিন্তু শিশুপালন ও তৎসঙ্গে নিজেদের শরীরপালন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেও প্রায় থাকে না। তা ছাড়া নিজেদের শরীররক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও তেমন অনুভব করেন না। অধিকাংশ স্থলে নিজেদের জীবনের মূল্য নাই এই বোধে তাঁহারা নিজেদের শরীরের প্রতি অবহেলা করেন। যেখানে অর্থের অনাটন নাই সেখানেও শারীরিক নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে ও নারীর জীবনের মূল্য কম এই মনোভাবে নিজেরা যথাসময়ে পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া করেন না; বাড়ীর লোকেরাও সে সম্বন্ধে তদারক করার প্রয়োজন বোধ করেন না। অনেক সময় আবার যথেষ্ট শরীরচালনার অভাবে শরীর পঙ্গু হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রেও জ্ঞানের অভাবই বলিতে হইবে।

সূতিকাগৃহ পৃথক হওয়া দরকার বোধেই সম্ভবতঃ ভিন্ন আঁতুড় ঘর করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আঁতুড় ঘর অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আঁতুড় ঘরে ক্রমাগত লোকসমাগম, যাতায়াত হইলে প্রসূতির বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে, মন উত্তেজিত হয়, তাহাতে শরীরেরও ক্ষতি করে; এই সব বিবেচনায় সম্ভবতঃ নানা লোকের অনাবশ্যক যাতায়াত নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বাহিরের অপরিচ্ছন্নতা প্রসূতি ও শিশুর ক্ষতি করিতে পারে এই কারণেও শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত কাহারও প্রবেশ নিরাপদ বিবেচনা করা হইত না। বর্তমানে ছোঁয়াচ্ছুঁয়ির বাধা ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়ায় আঁতুড় ঘরে ভিড় হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং বিছানায় যে-সে বসিলেও বিপদের সম্ভাবনা।

বস্তুত এ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন যে শিক্ষার ধারা ছিল কালের গতিতে তাহা খণ্ডিত, বিকৃত, কুসংস্কারে পরিণত। আবার আধুনিক জ্ঞান কিছুই আমরা লাভ করি না। যে মেয়েরা দু'দিন বাদে মা হইতে যাইবে, মানুষের জীবন লইয়া নাড়াচাড়া করিবে, তাদের এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানদান আমরা প্রয়োজন মনে করি না। তাহার ফল ভোগ করে মায়েরা নিজেরা ও দুঃখের ভাগী করে অসহায় কচি শিশুদের, যারা একান্তই নির্ভর করে মায়ের জ্ঞান ও সেবার উপর। আর আমাদের দুর্গতিগ্রস্ত পরাধীন জাতির এমনই মনোভাব যে কতকগুলি নারী বা কতকগুলি শিশু যদি বেঘোরে মারা যায় তাতে কার কি আসে যায়। বাড়ীর একটি বৌ মরিলে আর একটি আসিবে, একটি শিশু গেলে আর পাঁচটি আসিবে। আমাদের দেশে শিশু জন্মাইবার ত অভাব নাই, তা সে যত প্রসূতিই মরুক্ আর যত শিশুই মরুক্—আর যত নারী ও শিশুই ক্ষীণ, রুগ্ন ও পঙ্গু হইয়া থাক্ না কেন। এই অনুকরণী জাতের স্ত্রীপুরুষ কেহই তেমন করিয়া ভাবে না যে এইরূপে সমগ্র জাতি অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে।

পুরুষেরা এ সম্বন্ধে উদাসীন ত বটেই, মেয়েদেরও ধারণা মেয়েদের জীবনের মূল্য পুরুষের অপেক্ষা কম। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া অর্থাভাব যেখানে, সেখানে পুরুষদের খাওয়ার ব্যবস্থা যৎকিঞ্চিৎ ভাল করা হয়, কারণ তাঁহারা শরীরের রক্ত জল করিয়া টাকা উপার্জন করিয়া আনেন! মেয়েদের ভাগ্যে প্রতিদিন পেটভরা খাবার জোটে কিনা সন্দেহ, যদিই বা জোটে তা' কেবল পেটই ভরাবার মত, পুষ্টিকর কোনও খাদ্য তাদের জোটে না। অনাটনের সংসারে

ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থা হওয়া কঠিন, কারণ যে উপার্জ্জন করে তাহার শরীর ভাল না রাখিলে চলিবে কেন? কিন্তু যে মা শরীরের রক্ত দিয়া চার পাঁচটি সন্তানের জন্ম দেন, বুকের রক্ত দিয়া তাহাদের পোষণ করেন, তাঁরও যে পুষ্টির প্রয়োজন আছে, তাঁর পুষ্টির অভাবে কেবল একটি জীবনেরই যে ক্ষতি তা নয় সন্তানরাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এ সকল কথা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিলে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিতেন না।

তবে অভাবের সংসারে আর কি করা যায়, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। অভাব কমাইতে পারা যায় নানা দিক দিয়া। মেয়েরা একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া সংসার চালাইতে পারিলে ব্যয় সঙ্কোচ করা যায় নানা দিকে, এমন কি আয়বৃদ্ধিও করা যায়। ইহ'র জন্য চাই মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা। এ সম্বন্ধে 'পরিবারে নারীর স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে (বঙ্গলক্ষ্মী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭) আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়া অভাবের সংসারে সন্তানের সংখ্যা বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের দেশে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই এ বিষয়ে সজাগ হওয়ার প্রয়োজন আছে। সন্তানের সংখ্যাধিক্য আর্থিক দিক দিয়া ক্ষতিকর ত বটেই, শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যও ইহাতে বিনষ্ট হয়। পশ্চিমের 'জন্মশাসন' আন্দোলন আমাদের দেশে এখনও তেমন ভাল-চোখে দেখা হয় না, কিন্তু ইহার আংশিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিলে যে জাতির সমূহ ক্ষতি, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

অর্থের অভাব যেখানে তেমন নাই, সেখানে জ্ঞানের অভাব ও নারীর জীবনের মূল্য কম এই মনোভাব এত ঘনীভূত যে তাহা দূর করা সহজে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাচীন শিক্ষার ধারা এখন খণ্ডিত, বিকৃত, কুসংস্কারে পরিণত। বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা—তাহাও মেয়েদের দেওয়া প্রয়োজন মনে করা হয় না। পাশ্চাত্য জাতিগুলির উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের মেয়েদের শিক্ষা। শিক্ষা তাহাদের কেবল কতক-গুলি পুঁথি কণ্ঠস্থ করায় পর্য্যবসিত নয়, জীবনে কার্য্যকরী সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা তাহাদের আছে। আমাদের মেয়েদের শিক্ষাদানই এতদিন নিষ্প্রয়োজন মনে করা হইত; এখন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিঞ্চিৎ স্বীকৃত হইলেও বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার যে কত প্রয়োজন তাহার এখনও তেমন উপলব্ধি হয় নাই। পশ্চিমে সকল প্রকার বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, এই বিজ্ঞান শিখাইবার বিধিমত ব্যবস্থা হইতেছে। এক একটি বিষয় লইয়া কতশত গ্রন্থই বা লেখা হইতেছে। আমাদেরও আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিতেছে না। সংসার করা ত ছেলেখেলা নয় যে, কোনও জ্ঞান কোনও শিক্ষা ইহার জন্য না থাকিলে চলে। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়া এ প্রবন্ধে আমি বিশেষ করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেই বলিতেছি যে ইহা মেয়েদের অবশ্যশিক্ষণীয়। এ সম্বন্ধে অবহেলার ফলে কতশত সংসার রোগে শোকে তারাক্রান্ত,নিরানন্দময়। জাতিগত কত বড় ক্ষতি এ যে তাহা মেয়েরা নিজেরা ভাবিয়া দেখে না বলিয়াই নিজেদের জীবনকে তাহারা অবহেলা করিতে পারে।

মেয়েদের জীবন সম্বন্ধে এই মনোভাব সমাজে বড়ই বদ্ধমূল, সুতরাং ইহা দূর করাও সময়সাপেক্ষ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেবল পুরুষদের মধ্যেই এ সম্বন্ধে যে উদাসীনতা আছে তাহা নয়, মেয়েদের মধ্যেও আছে। যে মেয়ে একটু বেশী খায়, তাহার সমালোচনা মেয়েরাও করে। মেয়েদের কম খাওয়া বাহাদুরি বলিয়া গণ্য। ভাল জিনিস যাহাকিছু তাহা মেয়েরা স্বামী-পুত্রকে খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট হয়, ইহা স্বাভাবিক। তবে পাঁচজনকে লইয়া যে সংসার, সেখানে মেয়েরা পরস্পরের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করিবে এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায় মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকায় তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে উদাসীন ত বটেই, অন্যের সম্বন্ধেও বটে। বিশেষ করিয়া বাড়ীর বৌএর স্বল্পের যে প্রয়োজন আছে তাহা মুখে কেহ কেহ স্বীকার করিলেও, কার্য্যতঃ করিতে এখনও অনেকেই প্রস্তুত নহেন। বাড়ীর বৌ সকলের সেবা করিবে—তাহা তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার সেবা-যন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য কাহারও দিবার আবশ্যকতা নাই—এই ধারণা এদেশবাসীর মনে এতই বদ্ধমূল যে

অন্তঃস্বত্বা বধূরও মুখের দিকে চাওয়া কেহ দরকার মনে করে না। 'সাধ' খাওয়াইবার রীতি একটা আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবলই নিয়মে পরিণত হইয়াছে—তাহার মধ্যে আন্তরিকতা বড় আছে বলিয়া মনে হয় না। একদিন সেই রীতি বজায় রাখিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করা হয়। সন্তান প্রসবের সময় যে মেয়ে মায়ের কাছে যাইতে পায় তাহার ভাগ্য ভাল; মায়ের কাছে যাওয়ার এই রীতি মন্দ নয়। কিন্তু ইহাই কি সমস্যার একমাত্র সমাধান? বৌ পরের মেয়ে হইতে পারে, কিন্তু যে সন্তান তাহার গর্ভে, সে যে একান্ত নিজেদের, অদূরদর্শিতা এখানেই। বাড়ীর বধূর প্রতি উদাসীন থাকিয়া আমরা তাহার সন্তানের মঙ্গল চাই!

বধূরাও তেমনই অদূরদর্শী। নিজের শরীরের অবহেলা করা তাহাদের এমনই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের প্রাণাধিক সন্তানগুলির মঙ্গল যে তাহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে তাহা বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। এই অজ্ঞতা এই দৈন্যের হাত হইতে মেয়েদের মুক্তি পাইতেই হইবে। নিজেরা এই দুর্গতি সম্বন্ধে সজাগ না হইলে আর কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? পশ্চিমের সমগ্র জাতি যে সজাগ, তাহার কারণ সে সব দেশের নারীরা জাগিয়াছে। নিজেদের ও সমগ্র জাতির সমস্যা তাহারা চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, অনুভব করিতে শিখিয়াছে।

আমাদের দেশে মেয়েদের এই বোধ জাগ্রত হইলে পারিবারিক বা সামাজিক কোনওরূপ অশান্তির আশঙ্কা করিবার হেতু নাই; কারণ প্রকৃত বোধ বা জ্ঞান কখনই কাহাকেও স্বার্থান্ধ করিয়া দিতে পারে না। নিজের শরীর রক্ষা করিয়াও এদেশের মেয়েরা তেমনই কায়মনোবাক্যে স্বামী পুত্র আত্মীয়স্বজনের সেবা করিবে, সংসারের সুখ তখন আরও বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে,—মৃতপ্রায় জাতি পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে।

মৈমনসিংহ গীতিকা

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম্-এ

"Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air."

—Grey

—এই কথাটি পরম সত্য। মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি ও পঙ্গু শক্তি প্রকৃতিসুন্দরীর কত পুষ্পেরই না সন্ধান লইতে পারে না। সীমার দূরত্ব অতিক্রম করিয়া অসীম দিকচক্রবালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিন্তু উহা সীমার মাঝে অসীম মাত্র। উহাতে অসীমের খর্ব্ব বই পর্ব্ব নাই। কত শত-সহস্র নক্ষত্ররাজি যে অসীম আকাশের বুকে ফুটিয়া আপনা আপনি ঝরিয়া পড়িয়া যায়, মানবরাজ্যে তাহার রশ্মি পৌঁছিতে কত যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়, কে তাহার তত্ত্ব লয়? ব্যোমরাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের ঘরেরই যে কত অমূল্য জিনিষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার খবরই বা কয়জন করেন।

আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের অতি অভিনব সামগ্রী সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৈমনসিংহ জেলায় যে এত চমৎকার পল্লীগাথা পল্লীপুষ্পের ন্যায় অনাঘ্রাত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া লুক্কায়িত ছিল তাহার সন্ধান কয় জন সাহিত্যিকই বা জানিতেন?

ডাক্তার রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মৈমনসিংহের ও অন্যান্য জেলার পল্লীগানের সংগ্রহ হইতেছে। ডাঃ সেনের নাম বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে; এই উপলক্ষে উহার ঔজ্জ্বল্য অধিক বর্দ্ধিত হইল।

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই গানগুলির অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। এই গানগুলির মূল্য ও কাব্যরস সম্বন্ধে

কোন গ্রন্থ উদ্ঘাটন করা আমার মত অনৈতিহাসিকের ও অসাহিত্যিকের পক্ষে অশোভন।

বাঙ্গলা দেশে নানাপ্রকার গানের প্রচলন আছে। বাঙ্গলার প্রায় সকল জেলাতেই নিরক্ষর কৃষকগণ এই সকল গানের রচক ও অধিকাংশের রচক। এই সমস্ত গানে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই গানের সংখ্যা যে কত তাহা নির্দ্দেশ করা এক প্রকার অসম্ভব। এই গানের নানাপ্রকার মূল্য আছে। কোনটার তাত্ত্বিক, কোনটার সামাজিক, কোনটার দার্শনিক —কোনটার কাব্যরস আমাদিগকে উহা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রলোভিত করে। এখনও এই অনাবিষ্কৃত দেশ নব কলম্বসের সাহসিকতা ও পরিশ্রমের অপেক্ষা করিতেছে। কোন্‌টার যে কি মূল্য তাহা সাধারণ পাঠক ও সংগ্রাহকের পক্ষে নির্দ্ধারণ করা একেবারে অসম্ভব। জহুরী-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি পল্লীগানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুতরাং এক্ষণে আমাদের কার্য্য হইতেছে নির্ব্বিচারে এই সকল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা।

পল্লীগানকে প্রধানতঃ Ballads ও Lyrics (গাথা ও খণ্ডকবিতায়) বিভক্ত করা যাইতে পারে। Balladsগুলি বুঝিবার জন্য বেশী বেগ পাইতে হয় না। মুস্কিল এই Lyricsগুলি লইয়া। lyricsএর মধ্যে আবার নানা বিভাগ আছে—ঘুয়া, বারমাসী ইত্যাদি। আবার ঘুয়া নানাপ্রকার হইতে পারে; চাপান ঘুয়া, রসের ঘুয়া ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত কবি গান আছে, শারী গান আছে, জারী গান আছে, ঘাটু গান আছে, ভাগ গান আছে, কুমুর গান আছে। এই সকল গান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এখনও যথেষ্ট পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন। এই গানগুলি লইয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমার মনে হয় এই সকল গান সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত করিলে সমগ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

মৈমনসিংহ গীতিকা Ballads জাতীয় গান। সুতরাং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিমজ্জিত দেশ হইলেও ইহার মধ্যে উহার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মের কোন ছায়া পর্য্যন্ত নাই। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় কেন না বাঙ্গলার সমস্ত প্রাচীন পুঁথিগুলি ধর্ম্মের প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য রচিত অথচ ধর্ম্মের উল্লেখমাত্র ইহাতে নাই! প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থকারগণ যাঁহারা পুস্তক লিখিয়াছেন তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারকে উদ্দেশ্য করিয়া পরোক্ষভাবে সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যাপৃত হইয়াছেন; পরন্তু এই সকল গানে উহার অভাব এবং ইহা মাত্র আনন্দ পরিবেষণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম বাঁচিল কি মরিল সেদিকে উহার লক্ষ্য নাই। এইজন্য এই সকল গান পাঠের উপদেশ হয় নাই, প্রকৃত-পক্ষে সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্যই এই সকল গানের মাধুর্য্য আমাদিগকে অতর্কিতভাবে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

মৈমনসিংহ গানগুলি পল্লীপুষ্পের ন্যায় পেলব ও সুন্দর—সংসারের ধূলিধূসরিত সংরক্ষিত মূর্ত্তিমান অরূপ ও অসৌন্দর্য্য নহে। গানগুলির রচনায় কোনপ্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নাই। উহার সারল্য ও সরীব ভাব আমোদিগকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। এই সরলতা শিশুর সরলতার মত আনন্দপ্রদ। আমার মনে হয় এই গানগুলির মত পল্লীগান অন্য কোন দেশে পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।—সত্যই উহা অতুলনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত মৈমনসিংহ গীতিকার আলোচ্য খণ্ড 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কমলা', 'চন্দ্রাবতী', 'দেওয়ান ভাবনা', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কেনারাম,' 'রূপবতী', 'কাজল- রেখা' এবং 'দেওয়ান মদীনা' লইয়া গ্রথিত। ইহার মধ্যে 'কাজলরেখা' রূপকথা,—অন্যগুলি পালা গান। এই গানগুলি কি ভাবে পাওয়া যায় তাহা আমরা জানি না, তাহা জানা থাকিলে অনেক সুবিধা হইত। তবে আমাদের বন্ধু মৌঃ বহিমুদ্দিন সাহেবের নিকট মৈমনসিংহের এই গান গাওয়া অবস্থায় যে ফটো দেখিয়াছি, তাহার সাজসরঞ্জাম দেখিয়া মনে হয় উহা গাজির গীত নামে বাঙ্গলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র পরিচিত। ছেলেবেলায় আমরা গাজির গীত শুনিয়াছি। তাহাতে গায়েন যে সব আয়োজন করিতেন এই ছবিতে উহার সাক্ষাৎ পাইতেছি। এমন কি গায়েন যে ভাবে দাঁড়াইয়া গান করিতেন মৈমনসিংহ গানে ঠিক

সেই প্রকার দেখিতেছি,—অদ্যাবধী পর্য্যন্ত মিলিয়া যাইতেছে।

এইখানে আর একটি অবান্তর কথা বলিয়া লইতেছি। গাজির নাম বাঙ্গলা দেশে খুব প্রসিদ্ধ। গাজির পীর ঠিক ধান ভানিতে শিবের গীতের ন্যায় প্রবাদ-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তা ছাড়া গাজির বাঘ ও তদীয় ভ্রাতা বাদারের বাঘ পূজা বাংলার কোন কোন জেলায় প্রচলিত আছে। দক্ষিণে রায় কোথাও কোথাও বাঘের রাজা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কিন্তু গাজির নামও আমরা বাঘ সম্পর্কে পাই, এবং তিনি বাঘের রাজা বলিয়া সম্মানিত হন। আমার আরও মনে হয় সত্যপীরের চেয়ে গাজির প্রতিপত্তি বাঙ্গলা দেশে কম নহে। এমন কি সত্যপীরের Cultএর সঙ্গে সঙ্গে গাজির Cult ছিল বলিয়া ধারণা হয়।

গাজিকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য লোককথার (Folk Stories) ও গানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; এবং বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য গাজির নিকট প্রার্থনা এবং অলৌকিক উপায়ে বিপদমুক্তি প্রভৃতি আমরা জানিতে পারি। এই গাজি যে তাহা আমরা জানি না; কিন্তু গাজি যিনিই হউন এককালে বাংলার উপরে যে, তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়।

সুতরাং এই গাজির গোত্র এবং যুগ-পরিচয় হইলে মৈমনসিংহ গানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেকটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। মৈমনসিংহে এই সকল পল্লীগানে অজস্র আরবী পারসী শব্দের ব্যবহারে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। এই সকল আরবী পারসী শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ইহা ধারণা করা অন্যায় হইবে না যে, এই সকল গান রচনাকালের পূর্ব্বে মুসলমান সভ্যতা সুদীর্ঘকাল বাংলার বুকে স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। যে সকল শব্দ নিরক্ষর অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রাম্য কবিগণ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বাংলার গ্রামে প্রবেশ করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শুধু ইহাই নহে, হিন্দু কবিগণ সহর-সভ্যতা হইতে দূর পল্লীগ্রামে বাস করিয়াও অবাধে বিদেশী শব্দগুলি স্ব স্ব রচনায় স্থান দিতেছেন। এই গানগুলিতে আমরা আর একটি জিনিষ পাই, উহা সত্যপীরের কথা। সত্যপীরের আগমন ও তাঁহার প্রভাবের স্পষ্ট ছবি "কঙ্ক ও লীলায়" গানে ধরা পড়িয়াছে। সত্যপীর লইয়াও অনেক আলোচনা দেখিয়াছি কিন্তু কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

এই গানগুলির ভাষার দিক বিচার করিলে বিশেষ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার মধ্যে এমন একটি শব্দ নাই যাহা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ চিহ্নিত শব্দ। শুধু মাত্র গল্প বলিবার ধারা—'কোন কাম করিল' ইত্যাদি —প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করিতেছে। তবে মাত্র ইহার উপর নির্ভর করিয়াই উহার প্রাচীনত্বের সার্টিফিকেট দেওয়া চলে না। প্রায় চারিশত পৃষ্ঠার কবিতা পুস্তকে প্রাচীন শব্দের ব্যবহার নাই, ইহা আমাদের নিকট আশ্চর্য্য লাগে কেন না আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত লোকেরা এখনও মাঝে মাঝে এমন শব্দ ব্যবহার করে যাহা সুপ্রাচীন এবং বাঙ্গলা সাহিত্যে বহুদিন হইল সে শব্দ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে সকল শব্দ আছে তাহা তত্ত্ববিদের: উহার phonetic decay দেখিয়া অনেকটা প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারেন। আমরা নীচে এই গ্রন্থের একটি গল্পের আলোচনা করিতেছি।

২

গাঙ্গো পাহাড়ের উত্তরে সুদীর্ঘ ছয় মাসের পথ, তাহারই উত্তরে হিমানী পরবত, এই হিমানী পরবতের পারে সপ্ত সমুদ্র আছে, সেখানে

"চান্দ সুরুয নাই অন্ধারিতে ঘেরা।
বাঘ ভালুকে বইসে মাইনসের নাই লড়াচড়া।
বনেতে করিত বাস হুমরা বাইদ্যা নাম।"

এই হুমরা বাইদ্যা বহু নদীর তীরে কাঞ্চনপুর গ্রামে আসিয়াছিল। কাঞ্চনপুরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের "ছয় মাসের শিশু কন্যা পদ্মা সুন্দরী" হুমরা বাইদ্যা রাত্রিতে চুরি করিল।

এই কন্যাকে লইয়া হুমরা লালনপালন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সে বড় হইতে লাগিল।—তাহার বয়স বিশ বৎসর হইল, সে খেলা কছুরত শিখিল। হুমরা বাইদ্যা তাহার নাম রাখিল—মহুয়া।

"সাপের মাথায় যেমন থাকয় মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী।

আঁধার ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কন্যা সোনা।
হাটিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পড়ে চুল।
মুখেতে ফুটিয়া উঠে কনক চাম্পার ফুল।
আগল ডাগল আঁখিরে আসমানের তারা।
বাইদ্যার কইন্যার রূপে ভাইরে মুনির টলে মন।
এই কইন্যা লইয়া বাইয়া ভরমে তিনভুবন।"

ভমরা ও তাহার দল বাঁশ তাঁবু ঘড়িকাছি, তোতা ময়না দয়েল টিয়া, ঘোড়া গাধা শিকারী কুকুর, রাও-চণ্ডালের চাড় ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া তিন মাস পরে বাদুন-কান্দা গ্রামে উপস্থিত হইল।

সেই বাদুনকান্দা গ্রামে নদেরচাঁদ সভা করিয়া বসিয়া আছেন। নদেরচাঁদ জমিদার, তাঁহার প্রাঙ্গণে বাদ্যার খেলা দেখান হইল। এই স্থানেই বাদ্যার ছেঁরির সাথে নদেরচাঁদের প্রথম দেখা হয়। এবং

"যখন নাকি বাইদ্যার ছেঁরি বাঁশে বাইলো লাড়া।
বসা ছিল নদের ঠাকুর উঠ্যা হইল খাড়।
ঘড়ি বইয়া উঠ্যা যখন বাঁশে বাজি করে।
নদের ঠাকুর উঠ্যা কয় পইরা নাকি মরে।"

মহুয়ার জন্যে এই আশঙ্কা, শেষে ইহাই প্রেমে পরিণত হইল এবং এই সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি

"মনে বলে নদের ঠাকুর মন যেন তার নাই।"

এই আকাঙ্ক্ষাই এই পল্লীগানের মূল কেন্দ্র। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত ঘটনাগুলি সংঘটিত হইতেছে। আকাঙ্ক্ষা শেষে নদেরচাঁদকে পথের পাগল করিয়া তুলিয়াছিল।

বাইদ্যারা ইনাম স্বরূপ হাজার টাকার শাল, অনেক টাকা-কড়ি পাইল। তাহারা বাস করিবার জন্য একখানা বাড়ী চাহিল, ঠাকুর সন্তুষ্টচিত্তে জমিজমা দিলেন। সেখানে তাহারা ঘর দুয়ার উঠাইল, বেগুন মরিচ লাগাইল, কন্দ কলা লাগাইল, এবং 'চৌদিকে মালকের বেড়া আয়না সারি সারি'।

এক দিন মহুয়া খেলা দেখাইয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিতেছিল, তাহাকে পথে একা পাইয়া নদের ঠাকুর তাড়াতাড়ি কহিল,

"শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ।
মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক।"

নদের ঠাকুর মহুয়াকে বলিল, "কাল এই সময়ে জল লইতে আসিও, 'ভরা কলসী কাছে তোমার তুল্যা দিয়াম আমি'।" পরদিন সন্ধ্যাবেলা মহুয়া জল আনিতে ঘাটে গিয়াছে, নদেরচাঁদও সেই সময় জলের ঘাটে গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল,

"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে কি স্মরণ।"

মহুয়া ভাণ করিয়া বলিল,

"শুন শুন ভিনদেশী কুথার বলি তোমার ঠাঁই।
কাইল যা কি কইছিলা কথা আমার মনে নাই।"

এই ভাবে দুইজনের কথোপকথন আরম্ভ হইল। এই কথোপকথন ভারি চমৎকার। ইহার মধ্য দিয়া দুইজনের হৃদয়ের একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। এইজন্যেই উহা তুলিয়া দিতেছি,—

"তুমি ত ভিনদেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা—আমি লজ্জা করি।"
"হাসি মুখে কও না কথা আমার সঙ্গে নাই কেউ।
জল ভর সুন্দরী জলে দিছ ঢেউ।
কেথা তোমার মাতা কইন্যা কেথা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার পূর্ব্বে ছিলে কোথা।"
"কোন বুঝিবে মোর পুরা মনের কথা।
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর-সুখেতে বাড়িয়া।"
ঠাকুর বলে—"কইন্যা তোমার পানে বান্ধা ছিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি না কইয়াছি বিয়া।"
"কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন বৈবন তোমার যায় অকারণ।
কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন বৈবন কালে নাহি দিছে বিয়া।"
"কঠিন আমার মাতা পিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া।"

"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তোর।
গলায় কলসী বাইন্ধা জলে ডুব্যা মর।"
"কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।"

মহুয়া বাহিরে নদ্যার ঠাকুরের এই প্রণয়-নিবেদন অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান করিল কিন্তু অন্তরে সুখের অনলে জ্বলিয়া মরিতে লাগিল। এই রোগ অন্য কেহ বুঝিতে পারিল না, শুধু তাহার পালক-সই ইহা বুঝিয়া ফেলিল। মহুয়া ইহা গোপন করিতে পারিল না,—তাই মহুয়া ধীরে ধীরে তাহার পালক-সই-কে বলিতেছে,—

"মনের আগুন সই নিবাই কেমন কইরে।
এই দেশ ছাড়িয়া চল তিন দেশতে যাই।
বুঝাইলে না বুঝে মন কি দিয়া বুঝাই।"

অবুঝ মনকে সে কিছুতেই বুঝ মানাইতে পারিল না, পালক-সই বলিল, "মহুয়া সই, তুমি সাতদিন জলের ঘাটে যেও না, নদ্যার ঠাকুর যখন জলের ঘাটে আসবে তখন আমি ব'লে দিব 'কাইল নিশিতে সুন্দরী গেছে তোমার ঘ'রে'।" ইহা শুনিয়া মহুয়া বলিল, "সই তাকি হ'তে পারে? তাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে আমি আগেই ম'রে যাব। তুমি সাক্ষী হও 'নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী'।"

হুমরা বাইদ্যা সাবধানী লোক। আর তাহা ছাড়া "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতন ছড়িয়ে পড়ে।" তাই সে তাহার ভাই মানকিয়াকে বলিতেছে, "চল ভাই এদেশ ছেড়ে যাই—কেন না, 'আমার কন্যা পাগল হইছে নদ্যার ঠাকুর লাগে'।"

কিন্তু মানকিয়া বলিতেছে, " 'এই দেশ না ছাইরো ভাইরে আমার মাথার কিরা', এমন সোনার দেশ কোথায় পাব।"

ফাল্গুন মাস চলিয়া যায় যায়—চৈত্র মাস আসিতেছে। সোনার কোকিল গাছে গাছে বসিয়া ডাকিতেছে, এবং "আগরাদিয়া সইলের ধান উঠাছে পাকিয়া।"

এমন এক দিন নদেরচাঁদ দুই প্রহর রাত্রে আসিয়া উঠিল —সিয়ানের আড়বাঁশীটি হাতে তুলিয়া লইল। মহুয়াকে আসিবার জন্য ঠার দিয়া বাঁশী বাজাইল।

আসমানে 'চৈত্যার বউ' ঘন ঘন ডাকিতেছে। বাঁশী শুনিয়া সুন্দরী কাঁচার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাছার বদন নূতন করে সুখে ঘুমাইতেছিল; "ঘরের বাহির হইল কইন্যা পাগল হইয়া।" এবং ধীরে ধীরে নদীর ঘাটে চলিল, দেখিল —নদ্যারচান প্রেমের বাঁশী বাজাইতেছে।

তারপর—"কোলাকুলি গলাগলি করে দুইজন।"

নদ্যার ঠাকুর বলিতেছে,

"মা ছাড়বাম বাপ ছাড়বাম ছাড়বাম ঘরবাড়ী।
তোমার লইয়া কন্যা অইবাম দেশান্তরি।"

বাইদ্যার ঝেঁড়ি তাহার প্রত্যুত্তরে নদ্যার ঠাকুরের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতেছে,

"আমি নারী পাগলিনী বন্ধুরে তুমি গলার মালা।
তিলেক মাত্র না দেখিলে হইরে পাগলিনী।
পিঞ্জরায় বাইন্দ্যা রাখছে পাগলা পক্ষিণী।
কুল যদি হইতারে বন্ধু কুল হইতে তুমি।
কেশেতে ছাপাই রাখতাম আইরিয়া বানতাম বেণী।
আমি মরি জলে ডুব্যারে বন্ধু আমার মাথা খাও।
ছাড়ান দিয়া আমার আশা ঘরে চল্যা যাও।"

যখন তাহারা "দুঁহু বুকে দোঁহা কাঁদে", তখন হুমরা বাইদ্যা অলক্ষ্যে থাকিয়া সকল দেখিল।

ইহার ফলে হুমরা বাইদ্যা বাসুনকান্দা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আষাঢ় রাত্রিতে নিজ গ্রাম অভিমুখে রওনা হইল। যাওয়ার আগে মহুয়া নদেরচান্দকে বলিয়া গেল, "উত্তর দেশে কিছুদিন পরে তুমি আমার সন্ধানে যেয়ো; 'মল-খাগরার বেড়া আছে দক্ষিণ দুয়ারি ঘর', সেইখানে অতিথ হ'য়ে তুমি যেয়ো; তোমাকে জলপান করতে 'সইল ধানের চিড়া দিব, বলতে দিব পিড়া', তুমি দালিধানের চিড়া সবরি-কলা ও ঘইষের দুধ দিয়ে খেয়ো। আজই তোমার শেষ দেখা—আর দেখা হবে কিনা কে জানে!"

নইদ্যার ঠাকুর বেদেদের পরিত্যক্ত বাড়ী যাইয়া দেখিল ভাঙ্গা ঘর পড়িয়া রহিয়াছে—চালে ছাউনী নাই। পিঞ্জরা খালি করিয়া পাখী উড়িয়াছে! তাহার কত কথা মনে পড়িল।

মাতার নিকট হইতে নইদ্যার ঠাকুর তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে বিদায় লইতে গেল। মাতা যাইতে দিতে সম্মতা নহেন।

নদেরচাঁদকে বলিলেন, "তুমি পুত্র ছাইড়া গেলে আমি যাইবাম মরে।"

প্রেমের টান বড় বিষম টান!—শেষে প্রেমেই তাহাকে আকুল আকর্ষণে পাগল করিয়া তুলিল। নিশুর অন্ধকার রাত্রে পুত্র নিরুদ্দিষ্ট হইল। যাত্রার সময় উদ্দেশে পিতা-মাতাকে প্রণাম করিল।

(৩)

কাশী, বৃন্দাবন কোথা পড়িয়া রহিল। বাধ্যার কন্যার সন্ধানে নদের ঠাকুর ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে লাগিল। এক মাস যায় দুইমাস যায় তিন মাসও গেল, তবুও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। নদের ঠাকুর উন্মাদবৎ দিবারাত্রি ভ্রমণ করিতে লাগিল। যাহাকে পায় তাহাকেই প্রশ্ন করে, "জিজ্ঞেই বাইদ্যার লাগ পাইবাম কতদূর।" গরুর রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তুমি গরু রাখ, মাঠে মাঠে থাক, তুমি কি এই পথে মহুয়া সুন্দরীকে যেতে দেখেছো? তার রূপের কথা কি বলিব—

'মেঘের সমান কেশ তার তারার মত আঁখি,
চাচর চিকণ কেশ কন্যার রূপের সুন্দরী—
আন্ধার ঘরে শুইলে কন্যা কাকা সোনা জ্বলে'।"

কোথায়ও আর খোঁজ মিলিল না। ঠাকুরের ধৈর্য্যের বাঁধ ছিন্ন হইবার উপক্রম, দুর্ব্বল হৃদয় দুর্ব্বিষহ তার সহ্য করিতে অক্ষম, শ্রান্ত পদ আর চলিতে অপারগ, ক্লান্ত দেহ জর্জ্জরিত, "তাই বইসা নদ্যার ঠাকুর ছুড়িল কান্দন"। আশা বড় কুহকিনী!—বসিয়া থাকিতে দেয় কৈ? বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস চলিয়া গেল—"কাঁদিয়া বেড়ায় নদ্যার ঠাকুর উজানীচু পথে।" আষাঢ় শ্রাবণ ক্রমে এইভাবে গেল। পূর্ব্ব আকাশে গর্জ্জন করিয়া মেঘ পশ্চিম আকাশে বর্ষণ করে—ভাদ্র আশ্বিন মাস এই ভাবে গেল। নদ্যার ঠাকুর নানাস্থানে খুঁজিতে লাগিল। দুর্গাপূজা আসিল—নদ্যার ঠাকুরের বাপ-মা দেশে কান্দিতে লাগিল। কার্ত্তিক মাস তাহাদের কান্দিতে কান্দিতে কাটিল।

অঘ্রাণ মাস, অল্প অল্প শীত, কংসাই নদীর তীরে নদের-চাঁদ মহুয়া সুন্দরীর দেখা পাইল—

"সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসি পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভ্রমরা পাগল—।"

হুমরা বাইদ্যার বাড়ী নূতন অতিথি আসিল—ভিন্ন দেশে বাড়ী। মহুয়া কলসী লইয়া জল আনিতে চলিল।

এতদিন ভাবিয়া ভাবিয়া কন্যার যৌবন কালি হইয়াছে, বাধ্যার দলে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল,—এতদিন কন্যা নিদ্রা যায় নাই, ভাত পানি খায় নাই। মাথার বিষে কন্যা পাগলিনী প্রায় হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে তার বাতের বেদনা হইয়াছিল। অকল পাতিয়া শুইয়া থাকিত, ছয় মাস কন্যার কাঁদিয়া কাঁদিয়া গিয়াছে, কন্যা ভাতও রাঁধে নাই খেলায়ও মন দেয় নাই,—এমন কি তার জীবন সংশয় হইয়াছিল। আজ হঠাৎ এমন ধারা হইল কেন, ছয়মাসের মরা যেন উঠিয়া খাড়া হইয়াছে!

অন্ধকার নিশীথ-রাত্রি—আসমানে উজ্জ্বল তারা। হুমরা বাইদ্যা ঘুম হইতে উঠিল।

নদীর তীরে হিজল গাছ, তাহার নীচে নদ্যার ঠাকুর বিভোরে ঘুম যাইতেছে।

হুমরা বাইদ্যা কন্যা মহুয়ার শিয়রে গেল—মহুয়া স্বপ্নে নদেরচাঁদের মধুর মুখখানি দেখিতেছে। এমন সময় কানের কাছে যেন মেঘের গর্জ্জন হইতেছে,—জাগিয়া দেখিল তাহার পিতার চক্ষু জলন্ত আগুনের মত! পিতা বলিল, 'এই ছুরি নিয়ে তুমি নদীর তীরে যাও, নদের ঠাকুর সেখানে শুয়ে আছে। ষোল বছর তোমাকে কত কষ্টে মানুষ ক'রেছি, তুমি আমার একটা কথা রাখ,—সেই ভিনদেশী পুরুষ যাদুমন্ত্র জানে, তার বুকে ছুরি বসিয়ে মেরে ফ্যালো,—কন্যা তুমি আমার মাথা খাও, কথা রাখ, দুষমনকে সাগরে ভাসাও।'

আসমানের তারা ডুবিল, চাঁদ আর দেখা যায় না, সোনালী চাঁদনী রাত 'আবে' ঢাকা পড়িল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মহুয়া ছুরি হাতে লইল এবং নদের ঠাকুরের কাছে গেল। কন্যার মাথার চুল পায়ে পড়িল, চক্ষে পানি বহিতে লাগিল, উপায় চিন্তা করিয়া উন্মাদিনী হইল।

পিতার আদেশ, কর্ত্তব্য বড় কঠোর,—পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া ঠাকুরের শিয়রে বসিল।

হিজল গাছের নীচে নদীয়ার ঠাকুর,—'আসমানের চান্দ যেন জমিনে পড়িয়াছে'। ঠাকুর নিদ্রায় অচৈতন্য।

একবার দুইবার করিয়া কন্যা 'বিষলক্ষের' ছুরি উঠাইল ও নামাইল।

মহুয়া ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুর উঠ, কত ঘুম যাও? পাষাণ বাপ তোমাকে হত্যা করার জন্যে ছুরি দিয়েছে। তোমাকে কেমন ক'রে হত্যা করি। তোমাকে হত্যা কর্‌তে আমার চিত্ত চায় না। আমার বাপ পাষাণ, আমার হৃদয় পাষাণ নয়। তোমাকে বধ ক'রে কেমন ক'রে ঘরে ফিরে যাব! বিয়ের বাতি জ্বালিয়ে কেমন ক'রে ফুঁ দিয়ে নিবাবো? জানি না বন্ধু, এই বিষলক্ষের ছুরি আবার নিজের বুকেই মারবো কিনা!"

কাঁচা ঘুম হইতে স্বপ্ন দেখিয়া নদীয়ার ঠাকুর জাগিয়া উঠিল—শিয়রে মহুয়া সুন্দরী, হাতে বিষলক্ষের ছুরি

নদীয়ার ঠাকুরকে আর হত্যা করা হইল না। প্রেম জয়ী হইল। দুইজন ঘোড়ায় চড়িয়া রাজার আবাস হইতে পলায়ন করিল। তাজী ঘোড়া পবন-বেগে ছুটিল। অনেক দূর গিয়া তাহারা ঘোড়া ছাড়িয়া দিল,—শিক্ষিত ঘোড়া ঘরে চলিয়া গেল। সম্মুখে পাহাড়িয়া নদী, ঢেউ উঠিতেছে পড়িতেছে, বিশাল বিস্তার। পার হইবার কোন উপায় নাই।

এমন সময় এক সাধুর বেকাই ডিঙ্গা আসিল। সাধুর নৌকায় পার হইবার জন্য সাধুকে ডাকাডাকি করিল, সাধু নৌকা ভিড়াইল।

পরমা সুন্দরী কন্যা দেখিয়া সাধু পাগল হইল, চক্রান্ত করিয়া নদীয়ার ঠাকুরকে জলে ফেলিয়া দিল।

সাধু বলিল—

"কাল না ভাজর আঁখি লম্বা মাথার চুল।
বিধি আইজ মিলাইল মধুভরা ফুল।
এমন যৌবন কন্যা যার অকারণ।
আমারে তারহ কন্যা রাখহ মোর মন।
এমন সোনার পানসি তাতে নাহি নাই
যৌবন চলিয়া গেলে কেহ না দিবে ঠাঁই।

ফুলে ভরা মধু কন্যা ফির একেশ্বরী।
তোমারে পাইলে আমি বাঞ্ছা পূর্ণ করি।
বসন ভূষণ দিব আর দিব নীলাম্বরী।
নাকে দিব কানফুল কাঙ্কা সোনায় গড়ি।
গন্ধতৈল দিয়া তোমার বান্ধা দিব কেশ।"

মহুয়া নীরবে সকল শুনিল—মনে মনে বুদ্ধি করিল অসাধু সাধুর হাত হইতে বাঁচিতে হইবে। কন্যা সাধুর প্রস্তাব স্বীকার করিল, কৌশলে বিষ মিশাইয়া সাধু ও মাঝি মাল্লাগণকে পান খাইতে দিল। পাহাড়িয়া তরুকের বিষে সকলের প্রাণ গেল। তখন

"নৌকার উপরে বসি কন্যা হাসে খলখল।
বিষলক্ষের ছুরি কন্যার কাঁকলে আছিল।
ডাণ্ডি' ডিঙ্গার কাছি কাটিয়া ফেলিল।
কুড়াল মারিল কন্যা ডিঙ্গার তলায়।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা জলের উপর।
ডুবা সহ সাধুর লাও ডুইবা হলতল।"

নদীর পরপারে উঠিল। কিন্তু কোথায় তার প্রাণের বন্ধু নদেরচান্দ? কন্যা নদের ঠাকুরের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল। গাছে ফল নাই, নদীর জল দূরে, "বিনায় অবশ অঙ্গ না বাঁচে পরাণি।"

কন্যা আর দুঃখক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। আত্মহত্যা করিতে উদ্যত,—পর মুহূর্তে আবার আশা জাগিল।

"না দিব না দিব পরাণ আরও দেখি শুনি।
জঙ্গলের মধ্যে কার কাতর পরাণি।"

(৪)

অদূরে ভাঙ্গা মন্দির, তার মধ্যে সাপের বাসা। কন্যা রাতে থাকিবার আশায় তথায় গেল। দেখিল মন্দিরের মধ্যে মরার আকার কে একজন মানুষ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মাংস শুকাইয়া গিয়াছে, হাড় মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কন্যা চিনিতে পারিল না সে কে? বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল—এই ঠাকুর নদেরচান্দ। কন্যার মৃতদেহে প্রাণ আসিল।

"এমন সময় শিরে জটাচুল লম্বা মুহ দাড়ী।
আইল সন্ন্যাসী এক হাতে লইয়া খড়ি।"

কন্যা ভাবিতে লাগিল বিধি একি ঘটিল! সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল, তাহার পরিচয় কি? কন্যা বুকে বল পাইল, সে সন্ন্যাসীর পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহাকে সকল কথা আগাগোড়া বলিল। সন্ন্যাসী শুনিয়া কন্যা ঔষধ

দিতে চাহিল এবং শ্বাস ধরিয়া নদীর পানি আনিতে বলিল, সে মন্ত্র পড়িয়া দিবে। এক দুই দিন করিয়া তিন দিন যায়। নন্দারচান আঁখি মেলিয়া চাহিল। ক্রমে ভাল হইল, ভাত খাইল। কন্যা ঠাকুরের পূজার ফুল দূর বন হইতে সাজি করিয়া আনে। এদিকে এক অঘটন ঘটিল।

"কন্যার যৌবন দেখি মুনির ভুলিল মন।'

সন্ন্যাসীর পূজার ফুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, পূজা করা হয় না।

গভীর নিশীথে সন্ন্যাসী আসিয়া মহুয়াকে ডাকিল—

"আজি পূর্ণিমার নিশি আরে শনিবার দিনে।
ঔষধ তুলিতে কন্যা চল গহীন বনে।"

আস্তব্যস্ত হইয়া কন্যা উঠিয়া মুনির সাথে চলিল। গহীন বনপথে নদীর কেনারায় পৌঁছিল। মুনির সংযমের বাঁধ ভাসিয়া গেল,— সে বলিল,

"আমার কথা শুন ধিয়া মন।
পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যৌবন।
তোমার রূপেতে আরে কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যোগ।
এমন কূলের মধু কাঁও মোরে ভোগ।"

কন্যার মন নন্দেরচান্দের জন্য ব্যাকুল। সন্ন্যাসীর কথায় তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা বলিল—

"স্বামীরে বাঁচাও আগে সত্য করি আমি।
যাহা চাও তাহা দিব বাঁচাইলে পরাণি।"

ইহা শুনিয়া মুনির মুখ কালি হইল। বলিল—

"দুই দিন সময় দিলাম ভাবিয়া স্থির কর।
নিজে খাওয়াইয়া বিষ পতিকে না মার।"

কন্যা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এই রাক্ষসের হাত হইতে বাঁচিবার উপায় দেখি না। নন্দারচান্দ অসুস্থ, হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম, কি করি, ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা—

"আবেব্যস্তে নন্দারচান্দে কান্দে তুইল্যা লইল।
নিশিকালে যায় কন্যা ফিরে ফিরে চায়।
দারুণ সন্ন্যাসী যদি পাছে লাগাল পায়।"

পলাইয়া দারুণ সন্ন্যাসীর হাত হইতে বাঁচিল। এক মাস দুই মাস করিয়া ছয় মাস গেল। নন্দের ঠাকুর ভাল হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহারা অনেক দূরে যাইয়া বাসা বাঁধিল।

"সামনে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি।
চৌদিকে রাঙ্গা ফুল ডালে পাকা ফল।
এইখানে আছয়ে কন্যা মিঠা মধুর জল।"

তাহাদের দিন বিমল আনন্দে কাটিয়া যাইতে লাগিল, তাহারা সংসার পাতিল। নন্দার ঠাকুর হাটে যায়। 'বাদ্যার ছুঁড়ি ডাক্যা বলে কিইয়া আইন নথ।'

"রাত্রিতে থাকয়ে ঠাকুর কন্যা লইয়া বুকে।
দিনেতে উঠিয়া দোঁহে ভ্রমে নানান সুখে।
হস্ত ধরিয়া সুন্দর কন্যা ফিরে বনে বন।
পাড়িয়া আনে বনের ফল করিতে ভক্ষণ।"

এই সুখ বেশী দিন রহিল না, অকস্মাৎ শিরে বাজ পড়িল। একদিন সন্ধ্যাবেলা নন্দেরচান্দ মহুয়াকে সঙ্গে করিয়া পথে বেড়াইতেছে। দুইজন গলা ধরাধরি করিয়া গহীন বনে গেল, সুন্দর মসৃণ প্রস্তরের উপরে তাহারা বসিল। অদূরে ঢেউয়ের মাঝে পানি খেলিতেছে। এমন সময় দূরে বংশীধ্বনি হইল, কন্যা চমকিয়া উঠিল। নন্দের ঠাকুর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কন্যা চক্ষু মুদিয়া বলিল, "কাইলী বাঁশি বাঁচিবে বন্ধু কইবাম কথা।" নন্দার ঠাকুর বলিল, জানি না আজ কেন তোমার এমন হইল, তুমি কেন চলিয়া পড়িলে? মহুয়া কাঁদিয়া বলিল, "এই শেষ দিন।"

"সাপে নাহি খাইছে মোরে গেছে সুখের দিন।
দূর বনে বাজল বাঁশী শুনছ যে কাণে।
আসিবে রাজার দল বধিতে পরাণে।
আমার ও পালঙ্ক-দই বাঁশী বাজাইল।
সামাল করিতে পরাণ ইসারায় কইল।
আইজ নিশ থাকবে বন্ধু আমার বুকে শুইয়া।
আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়া।"

রজনী প্রভাত হইল। তাহারা কুটীর হইতে বাহিরে আসিল। চৌদিকে চাহিয়া শিকারীদের দেখিল,—সামনে দুসরা বাদ্যা যমের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার হাতে বিষলক্ষের ছোরা, চক্ষু জলন্ত আগুনের ন্যায়। তার নাকের নিশ্বাস যেন ডাকের ন্যায়, সে বলিল—

"প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষমনেরে মার।
আমার পালক পুত্র সুজন খেলোয়াড়।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ।"

মহুয়া বলিল, 'আপন পতির গলায় কেমন ক'রে ছুরি দেব?' "মারা পাকে বাপ তুমি আমি আগে মরি।"

আবার দুমরা মহুয়াকে সুজন খেলোয়াড়ের সহিত বিবাহ দিতে চাহিল এবং ঘরে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিল।

মহুয়া বলিল,

"কেমন কইরা যাইবার দেশে বন্ধুরে মারিয়া।
তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া।
আমার বন্ধু চান্দ সুরুজ কালা সোনা জলে।
তার কাছে সুজন বাদ্যা জোনাই যেমন জলে।
সোনার তারা বন্ধু একবার দেখ।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইরা দেখ।"

ইহা শুনিয়া দুমরা রাগিয়া উঠিল, মহুয়ার হাতে বিষ-লক্ষের ছুরি দিল। কন্যা একবার পালঙ্ক-সখীর পানে চাহিল, আবার পতির মুখ দেখিল। কন্যা মুহূর্ত্তে বিষাক্ত ছুরিকা আমূল আপনার বক্ষে প্রবিষ্ট করাইল। ধরণীতলে বৃন্তচ্যুত গুলাবের ন্যায় লুটাইয়া পড়িল। নিষ্ঠুর ব্যাধের দল নবেরচাঁদের প্রাণ বধ করিল।

দুমরা যাইয়া তাহার ভুল বুঝিল, তাহার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। কবর করিয়া দুইজনকে সমাধিস্থ করিল। তারপর যত বাদ্যার দল বিদায় হইল, সেখানে রহিল কেবল সুখদুঃখের সাথী পালঙ্ক-সই। অকূল ভরিয়া কন্যা বনের ফুল আনে, জঙ্গলে বসিয়া বসিয়া মনের গান গায়, চক্ষের জলে মাটি ভিজায়।

কান্নাকাটি করিয়া সে শোকেতে পাগলের মত হইল! সে তার সখীকে ডাকে, "সখী তুমি উঠে এস, কথা কও, দুরন্ত বাইদ্যার দল ফিরে গেছে। তুমি সুখের ঘর বেঁধে বাস কর। দুই সই হাসিখুসিতে মালা গেঁথে নবেরচাঁদের গলায় দিব।"

এই গল্পটিতে যে কাব্য ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই প্রশংসনীয় এবং আনন্দপ্রদ। শুধু এই গল্পটি নহে, মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যান্য শাখাগুলিও মনোহর। পাঠক এই গীতিকাগুলি স্বয়ং আস্বাদ করিয়া দেখুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এইবার আমরা এই পল্লীগানের সাধারণ পরিচয় প্রদান করিলাম। বারান্তরে ইহার ভাষাতাত্ত্বিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক দিক আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাহিরের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

বার্ম্মিংহাম

আমরা 'লেষ্টার' থেকে রেলপথে বেলাসময়ে বার্ম্মিংহামে এসে পৌঁছলাম। বার্ম্মিংহাম রেলওয়ের একটা বড় কেন্দ্র—ষ্টেশনটিও প্রকাণ্ড। লণ্ডন থেকে মাত্র ঘণ্টার পথ। যাতায়াতের সুবিধা যথেষ্ট আছে। এখানে আমাদের জনৈক বন্ধু—ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল মৃত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র থাকতেন। শ্রীমান্ গুহের সহিত আমরা এক জাহাজেই বিলাত আসি। ইনি অতি অমায়িক ও মিশুক লোক। ইতিপূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে তোমাদের জামাইবাবু একবার বার্ম্মিংহামে এসেছিলেন এবং শ্রীমান্ গুহের বাড়ীতেই ছিলেন। তখন তিনি এখানকার অনেকটা দেখে-শুনে যান। তাই এযাত্রা আমাদের এখানে কোন প্রকার অসুবিধা বা অপরাধ হয় নাই।

বার্ম্মিংহাম বেশ বড় সহর। জার্ম্মানযুদ্ধের কয়েক বছর আগে "অষ্টন মেনর" নামক একটা সম্পত্তি সহরের অন্তর্ভুক্ত হয়—তাতে সহরের আয়তন ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারপর জার্ম্মানযুদ্ধের সময় অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য অনেক রকম উপকরণ এই বার্ম্মিংহামেই তৈরী হয়েছিল খুব বেশী পরিমাণে। এই সব কাজকর্ম্মে চারদিক থেকে লোকজনও এসে জুটেছিল অনেক। যুদ্ধ শেষ হ'লে পরও তাদের অনেকেই এখানে থেকে গেছে—তাই বার্ম্মিংহামের লোকসংখ্যা আরো বেড়ে গেছে। বর্ত্তমানে এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ন' লক্ষ।

সহরের মধ্যেই অনেক কল-কারখানা ও চিমনি আছে—কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তবু ধূমের উৎপাত তত্টা নাই। সহরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গেই বাগান অথবা লন (Lawn) আছে।

এদেশের লোকে বলে যে বার্ম্মিংহামের মাটিরই এমন একটা গুণ আছে যে এখানে ভূমিষ্ঠ হ'লে আপনা হতেই তার কারিগরি বুদ্ধি ফুটে উঠে। বাস্তবিকই এখানে ঘরে ঘরে শিল্প—ছোট বড় শিল্পশালা ও শিল্প-বিদ্যালয়ের সংখ্যা গ'ণে শেষ করা যায় না। তাই এখানকার ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকে নানাপ্রকার শিল্প সম্বন্ধে দেখে-শুনে বিনা আয়াসে যে জ্ঞান লাভ করে তা' অন্যত্র স্কুলে প'ড়ে বা কারখানায় এপ্রেন্টিস ক'রে শিখতে হয়।

এখানে তৈরী না হয় এমন জিনিষ কম। অনেক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার ও আবিষ্কারক বার্ম্মিংহামে জন্মগ্রহণ করেছেন। ষ্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কারকর্ত্তা জেমস্ ওয়াটসের জন্মস্থান বার্ম্মিংহাম। তাঁর নিজস্ব প্রাণ্ট কারখানাটি তাঁর মৃত্যুকালে যে অবস্থায় ছিল আজ পর্য্যন্ত ঠিক সেই অবস্থাতেই বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত আছে।

লোহা ও কয়লা এই দু'টা জিনিষই বার্ম্মিংহামে সুলভ। শিল্পীর অভাবও এখানে নেই—তাই এখানকার তৈরী অনেক জিনিষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় কেউ পেরে উঠে না। লোহার স্প্রেক, স্ক্রু, তার, দড়ি, কব্জা প্রভৃতি একচেটে ব্যবসা। বন্দুক, রিভলভার, ছুতার মিস্ত্রী ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ জন্য বার্ম্মিংহাম প্রসিদ্ধ। সমস্ত ধাতব দ্রব্যই এখানে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়—তন্মধ্যে পিতলের জিনিষই সব চেয়ে বেশী। ঘুরেলারি, সোনা রূপা ও সিল্টিকরা জিনিষও কম প্রস্তুত হয় না। নানা রকমের বোতাম, হুক, প্রভৃতি ছোটখাট জিনিষ তৈয়ারীর কল-কারখানা যে কত তা বলা যায় না। রেলগাড়ী নির্ম্মাণ এখানকার একটা মূল্যবান শিল্প। বাইসাইকেল, মোটর সাইকেল ও মোটর গাড়ীও এখানে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। "D. S. A" সাইকেলের নাম তোমরা জান—

সেজন্য'র উহা ছিল। Birmingham Small Arms কোম্পানী উহার নির্ম্মাতা। কোম্পানীর নাম থেকেই নাম হয়েছে "B. S. A."। এই কোম্পানী নানা রকমের জিনিষ বানায়।

ডানলোপ (Dunlops) টায়ারের নামও তোমাদের জানা আছে। কলকাতায় ডানলোপের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। এমন সাইকেল বা মোটরওয়ালা নেই যে ডানলোপের নাম না জানে। এই টায়ার এবং রবারের নানারকম জিনিষ প্রস্তুত হয় বার্ম্মিংগামের কাছেই "ফোর্ট ডানলোপ" নামক একটা জায়গায়।

ফিক্ষ গ্লাসগোর বিশ্ববিদ্যালয়টির মত সুন্দর নয়—তার দৃশ্য

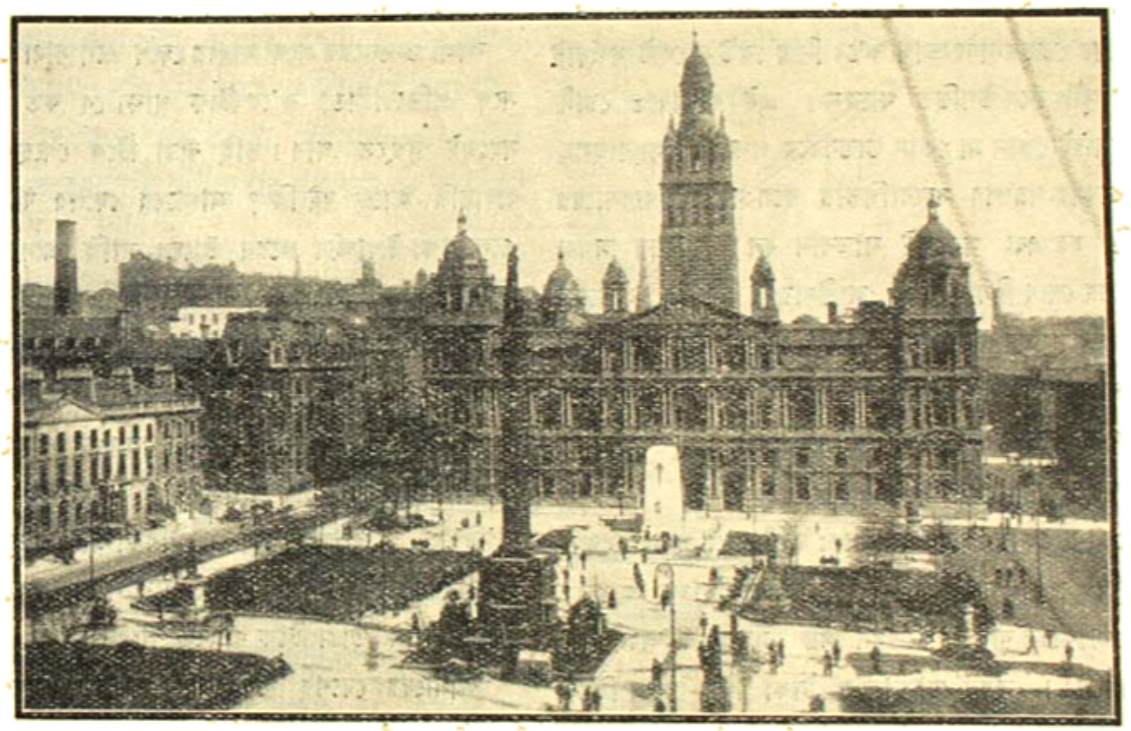

বার্ম্মিংহামের একটি রাস্তা

বার্ম্মিংহামের আর একটা প্রধান শিল্প পীলপেন প্রস্তুত। এই পেন রেল ও জাহাজে ক'রে প্রায় সাত হাজার মাইল ঘুরে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে বিক্রি করে পয়সায় দু'চিনটা ক'রে। এই সামান্য দামের পীলপেন তৈরী ক'রে তার জোসিয়া ম্যাসন (Sir Josiah Mason) নামক এখানকার এক ব্যক্তি যে কি বিপুল সম্পত্তি রেখে গেছেন তা শুনলে তোমরা অবাক হবে। বার্ম্মিংহামের বিখ্যাত বিজ্ঞান-কলেজ (Mason's Scientific College) ও অনাথাশ্রম (Mason's Orphanage) ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। এই উভয় প্রতিষ্ঠানে তিনি ষাট লক্ষ টাকার উপর দান ক'রে গেছেন। এ ছাড়া তাঁর আরো অনেক সম্পত্তি ছিল। তিনি পীলপেন নির্ম্মাণ ক'রে নানা সদনুষ্ঠানে কোটী টাকা দান করতে সমর্থ তাঁর পেনের কারখানাটা কতবড় একবার ভেবে দেখ দেখি?

বার্ম্মিংহামের বিশ্ববিদ্যালয়টিও বেশ—প্রকাণ্ড বাড়ী—চারদিকে ফাঁকা জায়গা। ভেতরের বন্দোবস্তও ভাল—ম্যাঞ্চেষ্টার ও সেফিল্ডের বিশ্ববিদ্যালয় চাইতে অনেক ভাল। অতি চমৎকার—এখনও যেন আমার চোখে ভাসছে। যুদ্ধের পর থেকে বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক নূতন নূতন বিভাগ খোলা হয়েছে—তন্মধ্যে স্থানীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে স্থাপিত বাণিজ্য বিভাগ, নগর প্রস্তুত প্রণালী, জীববিজ্ঞান ও খনিবিজ্ঞান বিভাগের নাম করা যেতে পারে।

অনেকগুলি লাইব্রেরীও এখানে আছে। লাইব্রেরীতে ব'সে পড়ার এবং লাইব্রেরী থেকে ঘরে পুস্তক নিয়ে গিয়ে পড়ার উভয় প্রকারের বন্দোবস্তই আছে।

বার্মিংহামে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে; তন্মধ্যে টাউন হলটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভিতরের হলটিতে আড়াই হাজার লোকের বস্‌বার অথবা পাঁচ হাজার লোকের দাঁড়াবার স্থান আছে। টাউন হলের কাছেই মিড্‌ল্যাণ্ড ইনষ্টিটিউট—এখানে বিজ্ঞান, নানাপ্রকার শিল্প এবং মিকানিক শেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। জার্মান-যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ (War Memorial), কুইন কলেজ, কুইন হাসপাতাল, ডাকঘর, মার্কেট হল, এক্সচেঞ্জ, কুইন হোটেলের বাড়ীগুলি দেখ্‌বার মত।

বিলাতে ডাক্তারি কর্‌তে হ'লে সাধারণতঃ দু'তিন জন মিলে যৌথ কারবারের মতন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং নিজেদের ভেতর সময় ভাগ ক'রে নিয়ে কেউ না কেউ সর্ব্বদাই কন্‌সাল্‌টিং রুমে উপস্থিত থাকেন। এই বন্দোবস্তে রোগী সব সময়েই কোন না কোন ডাক্তারকে পায়। বলা বাহুল্য, এই প্রকার পরস্পর সহযোগিতার ফলে সহজেই ব্যবসায়ের উন্নতি হয় এবং সকলেই লাভবান হন। মাসের অথবা বৎসরের শেষে হিসাব ক'রে অংশীদারগণ নিজের নিজের অংশমত লাভের টাকা ভাগ ক'রে নেন। অংশীদারগণের মধ্যে যদি কেউ ইচ্ছা করেন তাঁর অংশ অন্য ডাক্তারকে বিক্রি ক'রে চ'লে যেতেও পারেন। প্র্যাক্‌টিস্ অনুযায়ী অংশের মূল্য ধার্য্য হয়।

কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে কেউ কেউ আমাদের দেশের মত একাকীই প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করেন। যখন প্র্যাক্‌টিস্ বৃদ্ধি পায় তখন অন্য ডাক্তারকে অংশীদার ক'রে নেন। নূতন ডাক্তারকে টাকা দিয়ে অংশ কিনে নিতে হয়। একটি বাঙালী ডাক্তার (ডাক্তার সেন গুপ্ত) এই প্রকারে 'সেফিল্ড'এর একটা গ্রামে এক বৎসরেই বেশ পসার জমিয়েছেন।

বিলাতের নানা জায়গায় অনেক ভারতীয় ডাক্তার আছেন। তাঁদের অনেকেই মেম বিয়ে ক'রে এদেশবাসী হ'য়ে গেছেন। ভারতীয় ডাক্তারদের ভেতর ডাঃ রায় পার্ভের (মারাঠী—বাড়ী নাগপুরে) পসার-প্রতিপত্তিই সব চেয়ে বেশী—মাসে ৭।৮ হাজার টাকা রোজগার করেন। ইনি বার্মিংহামেই প্র্যাক্‌টিস্ করেন—স্থানীয় হাসপাতালের ভিজিটিং সার্জ্জন—অনেক গোরা ডাক্তার এঁর অধীনে কাজ করেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় ডাক্তার পার্ভের বিশেষ সুনাম আছে। বার্মিংহামের বাইর থেকেও অনেক রোগী অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে এসে থাকে। লণ্ডনে "হার্লে" ষ্ট্রীটই হ'চ্ছে বড় বড় ডাক্তারের আড্ডা। তথায়ও ডাক্তার পার্ভের কনসাল্‌টিং রুম আছে। তিনি সেখানে সপ্তাহে দু'দিন উপস্থিত থাকেন। খুব বেশী উপার্জ্জন না থাক্‌লে হার্লে ষ্ট্রীটের মত জায়গায় consulting room রাখা পোষায় না—বিশেষতঃ নূতনকারের পক্ষে উহা অসম্ভব। এখানে আরো কয়েকটি ভারতীয় ডাক্তারের সুনাম আছে। বাঙালী ডাক্তার বোস্ (বসু) সম্প্রতি এসেছেন এবং এর মধ্যেই বেশ নাম ক'রে বসেছেন।

কালা ডাক্তারের পক্ষে সাদার দেশে এসে সাদা ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে টিকে থাকা যে কত কঠিন তা সহজেই বুঝ্‌তে পার। তাই যাঁরা টিকে গেছেন তাঁদের বাহাদুরি আছে বই কি? আমাদের দেশের যাঁরা এদেশে এসে টাকা উপার্জ্জন করেন তাঁদের নাকি এদেশের মেয়ে বিয়ে না কর্‌লে সুবিধা হয় না—বিশেষ ডাক্তারি লাইনে। এদেশের যে মেয়ে আমাদের দেশের ছেলেকে বিয়ে করে তার বেশীর ভাগই হয়—ভাবী স্বামীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশে। বিয়ের পর যখন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় এবং যখন পতিপত্নী বুঝ্‌তে পারেন যে তা'দি'কে বিলাতেই বাস ও জীবিকার্জ্জন ক'র্‌তে হবে, তখন মেম বৌ নানাপ্রকারে স্বামীকে সাহায্য করেন এবং তাতেই নাকি তাঁরা টিকে থাক্‌তে পারেন।

আমাদের দেশের গুটিকয়েক লোক এদেশে থেকে উপার্জ্জন ক'রে মেম বৌ ও ছেলেপেলে নিয়ে এক-প্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাচ্ছে দেখে কতকটা আনন্দ হ'ল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল—কৈ আমাদের দেশের ত কোন লাভই হ'ল না! এদেশের টাকা ত এখানেই থেকে গেল? তারপর—যদি ছেলেটির মা বাপ জীবিত থাকেন—তাঁদের কথা একবার ভেবে দেখ দেখি! তাঁরা হয়ত ভিটে মাটি বন্ধক দিয়ে ছেলেকে বিলাতে পাঠিয়ে দিয়ে কতই না আশা ক'রে ব'সে ছিলেন। তাঁদের অর্থ ত গেলই—ছেলেটিও যে চিরদিনের তরে গেল! এই সব কত কথা মনে উঠ্‌ল। তবু মনকে বুঝালাম—যথা-লাভ।

দেশের লাভ না হোক্ দেশের ছেলে ত তার পেটের সংস্থান বিদেশ থেকে করছে।

আমার বড়ই কৌতূহল হ'ল জান্‌তে—সাদা রোগীরা কেন সাদা ডাক্তার ছেড়ে কালা ডাক্তারের কাছে যায়—বিশেষতঃ মেয়ে রোগী ও প্রসূতিরা। ডাক্তার ও রোগীদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যা বুঝ্‌তে পার্‌লাম তার সার মর্ম্ম এই—শুধু গরীব বলেই যে সাদা রোগী কালা ডাক্তারের কাছে যায় তা নয়—যায় কালা ডাক্তারের নরম ব্যবহারে। রোগী ব'লে কালা ডাক্তার যেমন ঘর নিয়ে মিষ্টি কথা ব'লে চিকিৎসা করে তার নিজের দেশের ডাক্তার তা করে না—তারা যেন সর্ব্বদাই ব্যস্তবাগীশ—বাজে কথার সময় নেই—চট্‌পট্ রোগী দেখে' প্রয়োজনীয় দু'চার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বা প্রেস্ক্রিপ্‌সন ক'রে গুডবাই ব'লে চ'লে যায়। কালা ডাক্তার সেরূপ কিছু ব্যস্ততা দেখায় না—সে রোগীর কাছে স্থিরভাবে ব'সে ধীরে ধীরে তার খুঁটিনাটি সব কথা শুনে রোগীর ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে মনে প্রাণে চেষ্টা করে তার ব্যথা উপশমের জন্য। কালার ভেতর ভায়ের কোমল হৃদয়টি আছে—তাই তার কাছ থেকে ভিউটী ছাড়াও সহানুভূতি ও সমবেদনা পাওয়া যায়; আর সাদার ভেতর আছে সৈনিকের দৃপ্ত হৃদয় এবং ভিউটীই তার মূলমন্ত্র। কিন্তু ডাল্‌হাউসীকো কৃষ্ণকায়ই হউক আর বঙ্গমাংসাহারী শ্বেতকায়ই হউক রোগী যে সে রোগীই। অসুখ হ'লে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও দুর্ব্বলতা আসে—তখন কঠোরতা ভাল লাগে না—তখন সে চায় প্রাণের পরশ, আর সেই প্রাণের পরশটুকু সে পায় বেশীমাত্রায় কালা ডাক্তারের কাছ থেকে।

সব দেখে শুনে আমরা বিকাল বেলায় গাড়ীতে উঠে লণ্ডন রওনা হ'লাম।

(ক্রমশঃ)

মন্দারণ দীপশিখা

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি এস্

অস্ত গেল ক্লান্ত সূর্য্য। পশ্চিমের সোনার গগনে
অন্ধকার মেলি দিল আপনার কালির তুলিকা।
একাকী চলিতেছিনু দিবসের কর্ম্ম-অবসানে
অশ্বপৃষ্ঠে ত্বরিতগতিতে—যেথা বাঁধিয়াছি নীড়
ধ্যানমৌন বটচ্ছায়ে সুশীতল দীর্ঘিকার পারে।
লঙ্ঘি মাঠ, ডিঙায়ে আড়াল, ঘন অরণ্যের শ্রেণী
পশ্চাতে রাখিয়ে পঁহুছিনু আমোদর-কূলে,—যেথা
একদিন বঙ্কিমের নবোদ্ভিন্ন যৌবনের দ্বারে
প্রেয়সী কল্পনা দেখা দিল দুর্গেশনন্দিনী-রূপে।
ভাবি,—এই সেই শৈশবের স্বপ্নেঘেরা মন্দারণ!
যেদিন প্রভাতকালে ফুল্লুক্তির বন্দনধ্বনিতে
প্রাতঃসূর্য্য হেসিতেন আমোদরে স্বমহিমাচ্ছায়া—
সেদিন কোথায় গেল? মহাকাল আপন গহ্বরে
রাখিয়াছে পুঞ্জীভূত করি অতীতের যে সৌরভ,
বার্ত্তা তার বর্ত্তমানে পঙ্কহর পাবে না কি আর?
দয়াহীন, মায়ালেশহীন কী কঠোর এ বিধান,
যাহা লয়—চিরতরে লয়, শুধু অস্পষ্ট স্বপন,
ভ্রান্তির ধূপছায়া মনক্ষতি প'ড়ে থাকে পিছে!

সহসা দেখিনু দূরে—ইষ্টকের স্তূপ 'পরে
শীর্ণকায় দীন নারী এক আনাচে প্রদীপশিখা
নেমে যায় গ্রামপথে। কৌতূহল জাগিল হৃদয়ে,
শুধালাম তারে ডাকি,—'কহ মাতা কিসের প্রদীপ?'
—শুনিলাম যে কাহিনী মৌনচ্ছায়া সান্ধ্যঅন্ধকারে
সে যে অতি পুরাতন এক বিস্মৃত দিনের গাথা,
যেদিন এ বঙ্গভূমে শৌর্য্য ছিল ঘরে ঘরে—
বঙ্গের শার্দ্দূল হ'তে বঙ্গের পুরুষ ছিল বলী,
বীরাঙ্গনা বঙ্গনারী তুচ্ছ করি জীবন-মরণ
রাখিতেন সম্মান আপন,—সেই দিবসের গাথা।

আজ হ'তে বহুবর্ষ আগে বেথা বীরেন্দ্র নামেতে
বৃদ্ধ রাজা পরিখা অতুল—দীপ্ত যশোভাতি তাঁর
লভ্যি নদীগিরিবন উত্তরিল দিল্লীর প্রাসাদে।
শুনি ক্রুদ্ধ দিল্লীশ্বর রাজ্যলোভী পরশ্রীকাতর
লক্ষ সৈন্য ল'য়ে সাথে করিল এ দুর্গ অবরোধ।
বাজিল বিজয়-ডঙ্কা, ধন্য সবে ছাড়ি হুহুঙ্কার
মন্দারণ গড় রাখে শঙ্কাহীন ব্যাঘ্রের মতন।
বলকে সহস্র বর্শা,—সহস্র বীরের মুষ্টি হ'তে
ছুটে যায় অস্ত্রাঘাতের প্রতিশোধ নিতে, কোষমুক্ত
দীপ্ত তরবারি। ব'হে গেল উচ্ছ্বসিত রক্তস্রোত
লাল হ'ল আমোদর-বারি। সূর্য্য নামে অস্তাচলে।

দিনশেষে ম্লানমুখে বৃদ্ধ রাজা মন্ত্রণাসভায়
ভাবিছেন হত সেনাপতি, কাল কি হবে উপায়!
হেনকালে এলোচুল রক্তাম্বরা রাজার নন্দিনী
পশি' সভাতলে কহিলেন—'আমি লব সৈন্যভার।'
শুনিয়া সে-বাণী উঠে সভামাঝে বৃদ্ধ জয়ধ্বনি।
শিশু যারা, জরাজীর্ণ যারা, সবে কয়, 'যে কল্যাণি
আমরাও তব সাথে যাব।' যারা রোগের শয্যায়
তারাও আঁকড়ি অসি কহে—'নাহি ভয়, নাহি ভয়।'
হোমের কজ্জলী ল'য়ে পুরোহিত রাজকন্যা-ভালে
লেপি জয়টীকা কহে—'মাতঃ, হও বিজয়িনী রণে।'
অশ্রুরুদ্ধ মহারাজ সগৌরবে মোছাইয়া শির
কহিলেন—'অপুত্রক ব'লে আর কাহিনেক ক্ষোভ,
তুই মোর শতপুত্র সমা।' হ'ল রজনীপ্রভাত।

তার পর মন্দারণ রণাঙ্গনে যে বহ্নি জ্বলিল
তাহার দহনশিখা আজো লিখা আছে যে সেথায়—
মৃতের কঙ্কালস্তূপে, ভস্মীভূত দুর্গের প্রাঙ্গণে,
বিচূর্ণিত দেবালয়ে, ভীতিময় শ্মশানভূমিতে।
নারীর নয়ন হ'তে যেই বহ্নি, যেই উদ্দীপনা
সঞ্চারিয়ে রক্তস্রোতে দিকে দিকে জ্বালে দাবানল
সে বহ্নিতে করি স্নান ভীরু সেও ভাবে মৃত্যুঞ্জয়—
তাই ত হিন্দুর শাস্ত্র নারীরে পূজেছে শক্তিরূপে।

যুঝিলেন হিন্দুসৈন্য, সিন্ধুসম দিল্লীর বাহিনী ;
জয় তার ভাগ্যে নাই, নাহি থাক্, মৃত্যুরে বরিল।
ডুবে গেল রক্তরাঙ্গ সায়াহ্নতপন, সাথে তার
মন্দারণ ভাগ্যলক্ষ্মী ডুবিলেন অনন্ত তিমিরে।
বন্দী হ'ল রাজার নন্দিনী। ভাঙিয়ে তোরণ-দ্বার—
বিজয়ী দিল্লীর সৈন্য প্রবেশিল রাজার প্রাসাদে
সমুদ্রের তরঙ্গের মত। রাজা জরাজীর্ণ তবু
ল'য়ে মুক্তঅসি রোধিল দুয়ার। হাসি দিল্লীর সম্রাট
কহিলেন—'দিও না সহজ মৃত্যু, বন্দী কর ওরে।'

মণিময় উচ্চ সিংহাসনে শুভ্র চন্দ্রাতপ-তলে
বসেছেন বিধর্মী সম্রাট ; যত সভাসদ্ দল
বসিয়াছে চারিপার্শ্বে অহঙ্কারে উদ্ধত পুলকে।
সম্মুখে প্রাঙ্গণতলে হীনবেশে শৃঙ্খলিতকরে
বন্দী রাজা, রাজার নন্দিনী আর মহিষী প্রবীণা।
কহিলেন দিল্লীশ্বর কাংস্যকণ্ঠে পরুষবচনে
'রে কাফের দও তোর কষ্টমৃত্যু সাহসের-মুখে।
কিন্তু তোর স্ত্রীকন্যার তরে মোর বেদনা অসীম—
আপনি বহিব আমি সযতনে দৌহাকার ভার,
মাতা ও কন্যার মাঝে মোরে ল'য়ে কাড়াকাড়ি হবে।'
শুনি কথা সভামাঝে খল্ খল্ উঠে হাস্যধ্বনি—
রসিক তাতার যত রাসভের মত হেলাইয়ে
গ্রীবা হাসে অট্টহাসি ; কহে সবে—'সাবাস্ সাবাস্।'

শেষ হ'লে প্রশংসা-ব্যঞ্জন চুকারিল দিল্লীশ্বর—
'রে বর্বর, মরিবার আগে যদি ইচ্ছা কিছু থাকে
খুলে বল্, কাল যায়।' রাজা কহে—'আনন্দে মরিব
শুধু তার আগে মুক্ত কর লোহার শৃঙ্খল মোর
দিয়ে যাব স্ত্রীকন্যার জীবনের শেষ আলিঙ্গন।'
এ প্রার্থনা গ্রাহ্য হ'ল। মহিষীরে দিয়ে আলিঙ্গন
রাজা কহে—'বল দেবি, এ অন্তিমে কি তোমার বাণী ?'
"নাহি ভয়'—মৃত্যু মোর কাণে কাণে কয়"—রাণী কহে।
নিমেষে রাজার অসি মহিষীর বক্ষ ভীর্ণ করি
শতাধীন মৃত্যু দিয়ে ভাবী অসম্মান নিল হরি।
ত্রাসন্ন প্রহরীরা ঘেরে এল উন্মুক্তকৃপাণ,
রাজারে ঘিরিয়া রোষে মুহুর্মুহু করে অস্ত্রাঘাত।

চাহি রাজা কন্যাপানে দীননেত্রে কহিল—'তনয়া,
নারায়ণ গতি তোর।' স্নিগ্ধভাষে মধুর বচনে
আশঙ্কিত ভীত চিত্তে উত্তরিল রাজার নন্দিনী—
'শার্দ্দূল শিশুর ভীতি কিবা আছে শৃগালের ঠাঁই।'
মরণ-পাণ্ডুর মুখে শান্তিচ্ছবি ফুটিল রাজার।

প্রসারিয়ে খর্ব্ব বাহু দিল্লীশ্বর নামিয়ে ভূ
ছুটে যায় রাজকন্যা পানে। নম্রতা —
'হে বিজয়ী, চিন্তা নাই, আজই রাত্রে হবে পরিণয়;
এবে অনুমতি দেহ গুহাগৃহে দেবপূজা করি।'
পুলকিত দিল্লীশ্বর কহে গদগদভাবে—'আহা
কটে ছটে! তবে শীঘ্র কর উৎসবের আয়োজন।'
হেরি আপনার লোমশ বপুর পানে ভাবে মনে—
'এই রূপ দেখি মজিয়াছে রাজকন্যা; সযতনে
এই অঙ্গ করিয়াছি বনকুক আবরণস্থিত—
এর প্রভাব কি বৃথা? শঙ্কা!—এ যে মন্মথের পঞ্চ-
শর সম, যদি একবার বিদ্ধ করে রমণীর
হিয়া, তবে আর মুক্তি কোথা তার? তবুও এখনো
দেখে নাই রাজকন্যা মাণিক্যের ভাণ্ডার আমার!'

সাজিল বিজিত পুরী উৎসবের বিচিত্র সজ্জায়।
শবময় শ্মশানেতে চিতাগ্নির রক্তরশ্মি যথা
ঘোরালোকিয়ে মৃত্যুর প্রাঙ্গণ টেনে তোলে নিশীথিনী-
তিমিরের যবনিকা হ'তে যত বীভৎস নক্সা—
কৃমিকীট, নরঅস্থি, শিবাভুক্ত ক্ষীত নরদেহ,—
সেইমত উৎসবের তীব্র রশ্মি মন্দারণ গড়ে
জাগাল বীভৎস রূপ ভয়দীর্ণ ধ্বংসের ছায়ণে।

সাজি নটবর বেশে, বারম্বার মুকুরে নিরখি
বপু, উত্তরিল দিল্লীশ্বর যেথা রাজার নন্দিনী
গুহামাঝে পূজারতা। কহে—'বিবাহ-লগন
ব'হে যায়, চলে এস সত্বে, করি অর্চ্চনা তোমার।'
সহসা গুহার মাঝে রণরণ্ বাজিল বিষাণ—
আচম্বিতে ছুটে এল প্রলয়ের বীভৎস বহ্নিশিখা
গুহাগাত্র ভেদ করি। পুঞ্জীভূত কৃষ্ণ ধূমরাশি
রক্তজিহ্বা করিয়ে বিস্তার উঠে মহাশূন্য পানে।

—ধরণীর বক্ষ হ'তে মুক্ত যথা নির্ঝরপ্রপাত
উৎসারিয়ে উর্দ্ধপানে ব'হে যায় জলধিগর্জ্জনে
বিরাট ধরিনী সম শত কথা কহিয়ে বিস্তার,
সেই মত ওষ্ঠাতল হ'তে এক রমণীর প্রাণ
শৌর্য্যে পূত, ভক্তিস্নিগ্ধ, মৃত্যুহীন, শুভ্র অমলিন
উৎসারিয়ে এল ছুটে—মিশে গেল অসীমের বুকে।

তারপর গেছে কত যুগ, কত উত্থান-পতন।
সেই গুহা—আজ তাহা ইষ্টকের ভগ্নস্তূপ ; তবু—
ভোলে নাই সে কাহিনী মন্দারুণ নারী। তাই আজো
বিপুল গৌরবময় সে মহিমা, সেই হুতাশন,—
তাহারে স্মরণ করি প্রতি সাঁঝে দীপ জ্বালে হেথা
পল্লীবালা।

ফিরে এনু ক্লান্তকায়ে বিজন আবাসে—
তখন উঠেছে ফুটে নভস্তলে একটি তারকা ;
হেরি তারে মন্দারুণ দীপশিখা পড়ি গেল মনে।

বসন্ত ও শরৎ

—করুণা

ছোট মাসী কথা কয় একটু সোহাগ্যে ধরণের সুরে, অন্ততঃ কতকটা সেইরূপই আজ কয়দিন হইল মনে হইতেছে।

—রাণু, সকাল সকাল চান করে' নাও, আজ তোমাকে কিন্তু অনেক কাজ করতে হবে।

ভাইদের সাথে গল্প করিতে করিতে রাণু ওত্তর হইতে উত্তর দিল, যাচ্ছি ছোট-মাসী।

বিপিন, জুড়ন আর রাণু। তিন জনে মিলিয়া ঘরে যেন হাট বসাইয়াছে। ছোদ্দ পনর বছরের বিপিন, অত্যন্ত মোটা গোবেচারী চেহারা, এতদিন তাহাকে নেহাৎই শান্ত-শিষ্ট বলিয়া মনে হইত, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে সকলের উপরে টেক্কা দিতেছে সেই। দিদির সঙ্গে পাল্লা জবাব চালাইতে ওবাড়ীতে আর কেউ পারিয়া ওঠে না। জুড়নও সবাইকে হাসায় বটে, কিন্তু বয়স তার এই নয় বৎসর, গোছাইয়া কিছু বলিতে পারে না।

একটা ছবির বই লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছিল। রাণুও কিছুতেই ছাড়িবে না, বিপিন তাহা কড়িয়া লইবেই। হেঁচ্‌কা হেঁচ্‌কি টানাটানিতে বইটার উপরের দু' তিনটা পাতা ছিঁড়িয়া গেল।

—এই যাঃ! হ'লো তো? দেখাবে এখন মজাটা মেসো এসে! আমার কি দোষ, ছেলের আর সবুর সয় না। দেখ এখন ছবি বসে' বসে'!

আঁচলটা তুলিয়া লইয়া রাণু দ্রুতপদক্ষেপে বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিপিন ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ছিঁড়লো তা' হয়েছে কি? বাবার অমন বই ঢের আছে। তারী আমার ভয় দেখানো হ'চ্ছে···আমি ওসব কেয়ার করি না।

—ছেলের আবার বড়াই দেখো! যত বড় বড় কথা, মেসো বাসায় না থাক্‌লেই;—সাম্‌নে তো দেখি কেঁচোটি! ছাড়্ না, আমার কাজ আছে ঢের।

—কিচ্ছু কাজ নেই।···হাঁ মা, রাণু দি' এখন যেতে পার্বে না, তুমিই ব'লে'না এবেলা।

মা হাসে।

—দিদিকে আর ছাড়্‌তে ইচ্ছা হয় না,না রে বিপ্‌লে? এতদিন তো দিদির নাম করতিস্‌নে বড়? দু'দণ্ড জিরোব বলে' মেয়েটাকে আনালাম, যত সব ফেউ জুটেছে—আছেই পেছনে লেগে।

জুড়ন বইটা লইয়া নাচিতে সুরু করিয়া দিয়াছিল, মাঝখান হইতে মাকে ভেঙ্‌চি কাটিয়া বলিয়া বসিল,—আমি বুঝি জানি নে সে কথা, বিয়ে হবে কিনা আমাদের এখেনে, তাইতো এলো!—আমরা সব শুচি খাবো..

রাণু জুড়নের গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া বলিল, পাজি ছেলে...

ছোট-মাসী উচ্চ হাসিয়া উঠিল;—সোনো ছেলের কথা! বলি ও পাথুরে গোপাল, তুমি এসব শুন্‌লে কোত্থেকে?

বিনি ঝি বাসন মাজিতেছিল, উত্তর দিল, বল'না খোকা-বাবু, কার কাছে শুনেছ। মিথ্যে কথাতো আর নয়, সে তো আমরাও জানি। ছোট-মাসীর দিকে ফিরিয়া বলিল, আমার কিন্তু এবার ভাল বিদায় চাই মা!

···আচ্ছা লো আচ্ছা, বিয়ে তো আগে হোক্, তোর জন্যে বেনারসী-সাড়ী কিনে আন্‌বো একখান।

বিনি বলিল, নিজের যখন মেয়ে নেই, তখন ঐ-ই তোমার মেয়ে। পাওয়া-থোয়ার আশা আমরা কর্ব্বই তো, তা বা-ই বল।

চান করিয়া আসিয়া রাণু ছোট-মাসীকে খালাস করিয়া দিয়া বলিল, কি কি সব রান্না হবে?

একটা তালিকা দিয়া ছোট-মাসী উঠিয়া দাঁড়াইল।

—কুটনো আমি সব কুটে দিয়েছি, ঐ ওপাশে আলু রেগুন, দু'কালি কপিও ছেলে দিও ঝোলে। বাপ্‌রে, মোটা মানুষ, একটানা পনর মিনিট বসে' থাকতে পারি না।

বিনি ঝি রান্নাঘরে পৈঠায় বসিয়া দুই হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চুলের জট ছাড়াইতেছিল। তাহার পাশে ছোট-মাসী পা ছড়াইয়া বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল।

কোথাকার কোন্ ইন্‌জিনিয়ার ছেলে মাসে হাজার টাকা রোজগার কর্‌ছে, রাণুর সাথে সম্বন্ধ এসেছিল, মেয়ে তাদের পছন্দ হয়েছিল, শুধু টাকার জন্যই না হ'ল না! তা যাক্, আরও দু'তিনটে ভালো সম্বন্ধ আছে। একটা ওঁদের আপিসে। ছেলে এম্‌ এ পাশ, মাইনে এখন দু'শো পাচ্ছে —বাড়্‌বে না কি চারশো নাগাদ। আর একজন ডাক্তার, মাস গেলে পাঁচ সাতশো টাকা রোজগার করে। তা তুই দেখিস্ বিনি, রাণু আমার ডা-ক্তারের হাতে পড়্‌বে না, ওর লক্ষ্মী-শ্রী আছে। যে দেখ্‌ছে, বল্‌ছে, হাঁ, মেয়ের মত মেয়ে বটে! তা আজকালকার দিন কাল', নইলে ও-মেয়ে লুফে নেবার মতনই। আর কাজ-কর্ম্মের কথা,—আমরা তো বাপু, হাঁড়ি চড়াতে শিখেছি বিয়েরও কত পরে। রাণু তো ওর এই পোনর, কোন্ কাজটা শিখ্‌তে বাকী আছে শুনি?

বিনি বলিল, সে কথা একশো বার। যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। মুখভরা হাসি—যেন দুগ্‌গো পিত্তিমে।

ছোট-মাসী, ছোট-মাসী বলিয়া রাণু মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া ওঠে।

—কি হ'লরে ওঘরে? নাঃ, বিপ্‌লেটার সাথে আর পারা গেল না। এই বিপিন, এলিনে এখনো তোরা সব এদিকে! এখন ওকে কাজ কর্‌তে দাও, হাঁ, দিনরাত খালি ঘন্টিপনা!..

দশটা কাজ একসঙ্গে করিতে দিলেও রাণুর বাধে না। ...ছাগল-ওয়ালা ছাগল লইয়া হাজির।

—মা, ছাকুল দুধ্‌টা নিয়ে যান মা।

এখন আর বলিতে হয় না, ছোট-মাসীর নির্দ্দেশমত রাণুই তাহার কাছ হইতে দুধটা বুঝিয়া লয়।

—আয়গা দেখি···

ছাগলওয়ালা পোয়াটা উপুড় করিয়া প্রমাণ করে, তাহাতে জল নাই।

লোকটা ওদিকে একটু ঘুরিয়া বসে। রাণু সতর্ক-দৃষ্টি রাখে, ট্যাঁক্ হইতে জল-ভর্ত্তি শিশি বাহির করিয়া কোন-ক্রমে দুধের সহিত মিশাইয়া দেয় কি না।

দুধটা হাতে লইয়া দুই মিনিট ধরিয়া সেটা ঢালা-উবুড় করিয়া কেনা মারিয়া রাণু বলিল—আর একটু দিয়ে যাও।

ছোট মাসী নানা কারণে রাণুর উপর এত খুসী।

সন্ধ্যার পরেই মজলিসটা জমে পুরাদমে। পশ্চিম হইতে কাল ওরা সব ফিরিয়াছে। বৌদি' ত রাণুকে পাইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ছোট-মাসী, বিপিন, কুড়ন এদের আসন কিছুমাত্র টলে নাই—বরঞ্চ কিছু যেন বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কথা হইতেছিল ঠাকুরপোর সঙ্গে।

—তুমি যা'ই কেন তোমার বোন্‌ঝিটির প্রশংসা কর'না বৌদি', বেজন্মে সবাই পেছিয়ে যাচ্ছে, তা' ত কিছু বুঝবে না—কি রকম দিনকালটা পড়েছে একবার ভাব দেখি? লোকে নিজের পেটের চিন্তায়ই অস্থির। মানি তোমার বোন্‌ঝিটি চমৎকার সুন্দরী, সেরন্ত ঘরের কাজকর্ম না হয় সবই জানে, কিন্তু শুধুতো একটা প্রাণী নয়, সেই সাথে যে অন্ততঃ আরও ক'পয়সার ভাবনা রয়েছে।...আমাদের বাংলাদেশের মেয়েদের আমরা এত ভয় করি কেন জান বৌদি'?

ছোট-মাসী বলিল, না, কি জন্যে শুনি?

—তারা সব কুড়ে ইঁদুর বসে' বসে' ভোলের ধান উজাড় করে বসে'। গরীব স্বামী কোরা হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে মাস গেলে ক'টা টাকা এনে হাতে দিল, ব্যস, তারই উপর সব নির্ভর। কেনরে বাপু, নিজেরা কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখ্‌তে পারো না।

নির্ম্মলা ওপাশ হইতে নগেনের উপর কুপিত দৃষ্টি হানিতেছিল। এত লোকের সামনে কথা কয় না তাই, নইলে এ কথার উচিত উত্তর এখনই সে শুনাইয়া দিতে পারিত।

ছোট-মাসী বলিল, কি উপার্জ্জন করবে শুনি? আপিসে বেরিয়ে তোমাদের মত কলম পিষ্‌বে না-কি?

—ঐত, তোমাদের ঐ এক কথা! রোজগার বুঝি লোকে শুধু এক কেরাণীগিরি করেই করে? কত সব ইস্কুল রয়েছে, দাওনা সেখানে পাঠিয়ে, সেলাই, মোজা, গেঞ্জি, নানারকম সেলাইয়ের কাজ সব শিখে আসুক। যেমনী যদি না পায়, মাস দু'য়েক পাঠাও। কিছু না পারে মাস গেলে পঁচিশ ত্রিশটে টাকা তো ঘরে বসে' কুড়োতে পারবে। তখন আর বিয়ের জন্যে এত ভাবনা না করলেও চল্‌তে পারে।—হাঁ, আরও একটা রাস্তা আছে অবশ্য, কিন্তু সে তুমি পারবে না, সুতরাং সে আর না বলাই ভালো।

ছোট-মাসী বলিল, হাম বাড়াচ্ছ না কি ঠাকুরপো? বলি রাস্তাটা কি বলোই না একবার—মহাভারত তো কিছু আর অশুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে না?

—যাচ্ছেই তো। বল্‌লে এখনি লাঠি নিয়ে উঠ্‌বে। অথচ কাজটা মোটেই খারাপ নয়। আজকাল কত মেয়ে তো তাদের বর নিজেরাই ঠিক করে' নিচ্ছে।

—ও, এই কথা! তোমার পেটে এত গুণ ঠাকুরপো? ঝাঁটা মারি তেমন মেয়ের মুখে। লোলা তার ভেঙে দেব'না নোড়া দিয়ে! সাতজন্ম যদি মেয়ের বিয়ে নাও দিতে পারে বাপ মা, গলায় দড়ি কলসী বেঁধে যেন ডুবিয়ে মেরে, তবু যেন ...ছি, ছি, ঘেন্নায় মরে' যাই,—নিকুচি করেছে তেমন মেয়ের।...

—তথাস্তু। দিও তুমি তোমার সেই এম্‌এ পাশ ছেলের সঙ্গে ঐ পুঁটির বিয়ে। আর তুমি রাণু, অমন চুপ-চাপ যে? বয়ের কথায় তোমার তো ভারী লজ্জা! একটু জোরসে কথা কও, কথাবার্ত্তা দু' একটা যা হোক্ কিছু বল! তুমিতো দেখছি বাড়ীটার চেহারাই একদম ফিরিয়ে দিয়েছ। দিনরাত গল্প, চেঁচামেচি, হাসির হুল্লোড় এতো লেগেই আছে! বৌদি', তুমিতো বড় ঘুম-কাতুরে, এখন রাত ক'টায় শোও? আমার কিন্তু একটা বড় সাধ হয় বৌদি', সেটা হ'চ্ছে, একেবারে বিয়ের উপযুক্ত এমনি একটি সুন্দরী মেয়ে হ'তে পারতুম!...সবাই ভালবাসবে, প্রশংসা করবে, চেয়ে থাকবে।...

নগেনের কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শুধু নির্ম্মলা এমন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঘাড়টা একবার এদিক হইতে ওদিকে ফিরাইয়া নিল যে, নগেনের উপরে তাহার কতই ঘৃণা!

নগেন তাহা উপভোগ করিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল।

ছুটনকে রাত্রে একবার করিয়া উঠাইতে হয়। নয় দশ বছর বয়েস, এখনও ছেলেটার শিশুর মত কোন কোন কু-অভ্যাস যায় নাই। কিন্তু তাহাকে কি উঠান যায়! যদি বা টানিয়া হেঁচড়াইয়া কোনক্রমে আনিয়া বাইরে বসাইয়া দেওয়া গেল, ঘুম-চোখ আর সে কিছুতেই খুলিবে না। কাতুকুতু দিয়া রাণু তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে। বলে, 'যার আছে মোটা ছেলে, ওজনদরে ছাড়্‌বো বলে; ছ্যাংটা ছেলে দিগম্বর, ডোমের মেয়ে বিয়ে কর্‌।'…

ছুটন হাসিয়া গিয়া বলে, তোরই তো বিয়ে। একটা খাঁদা ছেলে হবে কিনা তাই—।

রাণু খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

—বেশ তো, হবেই তো! ও ছোট মাসী, এই দেখ ছুটন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—। আর আমি তোমার সাথে থাচ্ছি না।…ছোট-মাসী, তোমাদের বাড়ীটা বেন কেমন, চাঁদের আলো পড়ে না। দেখ গিয়ে আমাদের বাড়ী, কেমন ফুট্‌-ফুটে জোছ্‌না উঠানের 'পরে। আমরা সব বারান্দায় বসে' কত রাত অবধি' গল্প করি…

ঘরে যাইবার আগে দুয়ারে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ গল্প চলে।

কোন্‌ বাড়ীর বৌ'র পর পর দশটা মেয়ে হয়েছিল, নাম রেখেছিল, 'ওরে বাবা', 'ওরে মা'। আরেকজন রেখেছিল, 'আর চাই না,' 'আর পারি না'—এমনি ধারা আরও কত কি।

গুন্‌ গুন্‌ করিয়া বৌদি'র সাথে এক-আধটু গানও গাওয়া হয়—'আমার অভিমানের বাদলে আজ—'

বারিধি একটি নূতন রকম চিন্তা লইয়া বাসায় ফিরিল। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর এই কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীটের দিকে একটু ঘুরিতে গিয়াছিল, একটা পানের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া পান খাইতেছে, দেখে, একটি বধূ একটি ক্ষুরেলারির দোকানের পাশে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য কৌতূহল হইতেই একটু আগাইয়া গিয়া দেখিল, দোকানের সাম্‌নের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া একটি ভদ্রলোক বধূটিকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, কই, এসো না ভিতরে, কেমন শাঁখা তোমার পছন্দ হয়, দেখে শুনে নেছে নাও…

এক-পা অগ্রসর হইয়া বধূটি আবার দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে ভদ্রলোকটি নামিয়া আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। যাইবার সময় চুপি চুপি দু'টি কথা যুবক বলিয়াছিল, বারিধি তাহা শুনিতে পাইয়াছে।—'এত যদি লজ্জা, তবে আসা হয়েছিল কেন শুনি?'

আলো যদিও সেখানে প্রচুর ছিল না, তবু যতটুকু দেখা যায়, দেখিল, বধূটি এ কথার উত্তরে একটুখানি সঙ্কুচিত লজ্জিত হাসি হাসিল। কর্ণা মোটেই নয়, কালোও বলা যায় না, দুইয়ের মাঝামাঝি রং। মুখও এমন কিছু সুন্দর নয়। তবু বারিধির বড় ভাল লাগিল। বেশ একটি মিষ্টি নম্রকরুণ ভাব মেয়েটির সারা মুখ-চোখের উপরে। বেশ-বাস দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, নিতান্ত সাধারণ ঘরের বউ। কেন জানি না, বারিধি ধরিয়া লইল, এঁরা স্বামী-স্ত্রী নিশ্চয়ই খুব সুখী। সৌন্দর্যের উগ্রতা নাই, হাস্য-পরিহাসের উচ্ছলতা নাই, যতটুকু আছে স্থির, শান্ত, অন্তরে ধরিয়া রাখিয়া একটু একটু করিয়া উপভোগ করিবার মত।…

আলোটা নিবাইয়া দিয়া বারিধি অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল।

ওবাড়ী হইতে ছোট-মাসীর উচ্চ হাসির রোল শোনা যাইতেছে—মজলিশ্‌ চলিয়াছে পুরাদমে, বোঝা যায়।

ক'টা দিন ধরিয়া ওবাড়ীর ভিতরকার আবহাওয়া তাহাকে অনেক আবাইয়াছে। রাণুকে বারিধি ইতিমধ্যে অনেকবারই দেখিয়াছে।

বয়সের ধর্ম বলিয়া নিজেকে সে অব্যাহতি দিতে চায় না, হয় তো অন্যায় তাহার কিছু হইয়াছেই। ওদের হাসি, ওদের কথাবার্তা, খুঁটিনাটি সে লক্ষ্য করিয়াছে দিনের পর দিন। প্রথমটা রাণুকে দেখিয়া বারিধির ধাঁধা লাগিয়াছিল।

সদর দরজা খোলা ছিল, ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিতেই চোখে পড়িল, একটি তরুণী বারান্দায় বসিয়া কোটনা কুটিতেছে। সমস্তই স্পষ্ট দেখা যায়। আগুনের মত রং, পরিপূর্ণ যৌবনের শ্রী সর্ব্বাঙ্গে। একখানি বাসন্তী রংয়ের সাড়ী পরা, তারই সাথে মানাইয়া একটি ব্লাউজ গা'য়।

কিন্তু ধাঁধাঁ তাহার চোখটিকে ঝলসাইয়া দিয়াই চলিয়া গেল না। তাহার একটু কারণ ছিল।

ছোট-মাসী ইহার কথাই সেদিন এবাড়ীর মেয়েদের কাছে গল্প করিয়াছিল, তাহাতে বারিধির একটু স্থান ছিল। কিন্তু আজ সে কথা মনে পড়িয়া তাহার হাসি পাইতেছে। এখন ছোট মাসীর মুখে ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ারের কথা, কার কত আয়, কোন্ ছেলে দেখিতে কার্ত্তিকের মত সুপুরুষ—এই সব। কিন্তু মজা হইয়াছে এই যে, বারিধি তাহার এই হাসির কোন সঙ্গত অর্থও খুঁজিয়া পায় না।—হাসিবার ইহাতে কি আছে? ওঁরা সব ডাক্তার ইন্‌জিনিয়ারের গল্প করে বলিয়া? তবে কি তাঁরা তার মত একজন লোকের গল্প করিবে না কি? নিজের মনের পুঞ্জীভূত রুদ্ধ বাষ্পকে হাল্কা করিয়া দিবার জন্য ভাবিয়া হাসে,—মানুষ ভালমন্দ বিচার করে, ভবিষ্যৎকে যতদূর সম্ভব খতিয়া মাজিয়া দেখিয়া লয়, বেশ তো, বুদ্ধির কাজই করে তো! হিসাব করিয়া কাজ করিলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। আবার তাহার হাসি পায়,—মানুষ কিন্তু হিসাব করিতে ওস্তাদ।···

একদিন রাণু বারিধির মুখের উপর ঠাস করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। সে যা করিয়া ওদিকে চাহিয়াও ছিল না যে তাহারই জন্যে তাহাকে এরূপ তিরস্কার করা দরকার। একটু থামিয়া থাকিয়া কারণটা বারিধি বুঝিতে পারিল।

কাল রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে বেশ একটু সোরগোল করিয়া একটা বড় রকমের ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। ছোট-খাটো ঝগড়া সেত' প্রায় রোজই হয়। অন্য দশটা বাড়ীতে ঝগড়া হইলে যেমন বাহিরের লোক বিশেষ কিছু টের পায় না, এ বাড়ীর কিন্তু সে মার্জ্জিত রুচি নাই—বাধিল তো কাছা-কাছি সব ক'টা বাড়ীর লোকে তাহার প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইবে।

কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল কিনা সে কথা যাক্, কিন্তু রাণু যে ইহাদের উপর বিরক্ত হইয়াছে, তাহারই অনন্ত প্রকাশ অমন ছুটিয়া আসিয়া ঠাস করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া। খারাপ তো কিছু করে নাই! এমন নির্লজ্জ হীনতার উপর ঘৃণা প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার নাই নাকি? এমন উদ্ভট প্রশ্ন বারিধির মনে কেন যে ওঠে, তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিচার করিতে বসিয়া যায়।

ভিতর হইতে বাঁশীর মত মিষ্টি হাসি, ভাইবোনের সাথে সস্নেহ উচ্চ কলরোল ভাসিয়া আসে। গুন্ গুন্ করিয়া একটা সুর টানিতে টানিতে বারিধি বাহির হইয়া গেল।

অন্ততঃ আজ বারিধি মনে করিতেছে, ব্যাপারটা তাহার কাছে সমাধা হইয়া গেল! রাণু যেন পৃথিবীর বসন্ত, তাহার সৌন্দর্য্য দূর হইতে উন্মাদনার সৃষ্টি করে—হঠাৎ—আচম্‌কা। সে যে দোলা দিয়া যায়, তাহা মনে কোন গভীর রেখাপাত করিয়া যায় না। তাহাকে লইয়া বসন্তের সুরধনেই উৎসব করিতে হয়—অনুস্বরের সহিত তাহার চির-বিয়োগ। আর ঐ নম্রনত বধূটি—ধরার শরৎ! শান্ত, স্থির, সুগভীর। আপনাকে মেলিয়া ধরিবার লজ্জায় আপনার মধ্যে আপনি কখন শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে যেন। তাহাকে লইয়া ধ্যান করা চলে,—উৎসব নয়।

শরৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বারিধি বলিল, দে তো তোর সেই চিঠিটা।··

শরৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, কোন্‌টা?

আরে, সেই যে 'প্রিয়তম...'

শরৎ অন্ততঃ দশবার তাহার এই চিঠিখানা বারিধিকে দেখাইয়াছে। বিরক্ত হইয়া বলিল, তুই যেন কি, একটু ঘুমিয়েছিলাম, একটু না একটা ছুতা করে'···আমি চল্লাম, বলিয়া শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—চিঠিটা···

পকেট হইতে একটা রঙীন খাম সমেত চিঠিখানা বাহির করিয়া বারিধির দিকে ছুঁড়িয়া দিল।—ও আর আমি চাই না।

চিঠিখানা তাহার পকেটে পুনরায় পুরিয়া দিয়া বারিধি হাসিয়া বলিল, প্রণয়িনীকে অমন করে' বিচার করতে নেই পাগল। সে হয়তো সত্যি তোকে···। ভাল কেউ বাসতে পারে না, ওটা একটা মিথ্যা জোরকরা নূতন কথা। দেখ্‌তে জান্‌লে দু'পা এগোলেই দেখা যায়।

—তাই নাকি! বলিয়া শরৎ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বারিধির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঘরে বাইরে

ইনি নবাবজাদী ইসমৎ খানম মওলা বক্স,—সম্প্রতি পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের স্কুলের নার্সী-তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা-বিজ্ঞানে উচ্চ ট্রেনিং করিয়াছেন, ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম সি. এম্. বি।

:—

(২) দুই হাতে কণ্ঠে অল্প শক্তি প্রয়োগ করিয়া বলশালীকেও অনায়াসে ভূপাতিত করা হইতেছে।

(৩) শত্রুকে সাম্‌নের দিক হইতে এক হাতে কোমর জড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে থুথ্‌নিতে ধাক্কা দিয়া সহজেই কাবু করিয়া ফেলা যায়।

আইরিশ সূতাকাটা

একটি আইরিশ মহিলা স্বগৃহে চরকা চালাইয়া সূতা প্রস্তুত করিতেছেন।

জেকোস্লোভাক্ সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

প্রাচীনত্বের মর্য্যাদার দিক্ থেকে দেখ্লে জেকোস্লোভাকিয়ার সাহিত্যের গৌরব নেই মোটেই। উপরন্তু এ দেশের সাহিত্যে শক্তিশালী লেখকের অভাব বিশ্বসাহিত্যের শ্রদ্ধা অর্জ্জন কর্তে পারেনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। রুষ-সাহিত্যের গতানুগতিক রীতিকে অনুসরণ কর্তে গিয়ে 'শেক্,' 'নেরুদা' প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকরাও নিজস্ব প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে আংশিকভাবে হত্যা করেছেন এবং স্বদেশের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভাকেও হীন ক'রে দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের দৃষ্টিতে নিজেদের অজ্ঞাতেই। কারণ এঁদের সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী লেখকেরা যাঁরা এঁদের সাহিত্যের ধারাকে দেশগত বৈশিষ্ট্যশালী মনে ক'রে ব্যক্তিগত সৃষ্টির মধ্যে সেই ধারাকে বাঁচিয়ে রাখ্বার চেষ্টা করেছেন তাঁরাও প্রভাবান্বিত হ'য়ে পড়েছেন রুষ-সাহিত্যেরই। এই জন্যই জেকোস্লোভাক্ সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত দেশগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণবিকাশ প্রকাশ পায়নি। রুষ সাহিত্যের ছাঁচে ঢালাই করা দোষে দুষ্ট হ'য়ে পড়েছে এদেশীয় সাহিত্য—শক্তিশালী প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদেরও আনুকরণিক হীনতার জন্য।

এদেশের সাহিত্য প্রাচীন নয় সেকথা আগেই বলেছি। মনীষীদের গবেষণার উপর আস্থা রেখে বিচার কর্লে বল্তে হবে সত্যিকারের জেকোস্লোভাক্ সাহিত্যের জন্ম হয়েছে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে—সম্ভবতঃ তেরো-শো-বাট্ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই এই সাহিত্যের জন্ম। জন্ম বল্লাম এই জন্য যে, এর আগে এ ভাষায় কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি, হাংগেরীয় সাহিত্যকেই এরা আগে স্বদেশীয় সাহিত্য ব'লে মনে কর্তো; সেই কারণেই কথিত ভাষায় (জেক্-ভাষায়) সাহিত্যসৃষ্টির প্রবৃত্তি জাগেনি এদের মনে। যাঁরা প্রথম জেক্-ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির আন্দোলন সুরু করেন 'জন্ হাস্'ই হচ্ছেন তাঁদের অগ্রণী। তেরো-শো-বাট্ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রোভাকিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। অসামান্য প্রতিভা ছিল এঁর। ছাব্বিশ বছর জীবনের মধ্যে ইনি স্বজাতীয় গতানুগতিক আত্ম-অবিশ্বাসী চিন্তাধারা ও ধর্ম্ম-ভাবকে সমূলে উৎপাটিত কর্বার চেষ্টা পান। একটা আকস্মিক ধূমকেতুর মত ইনি স্বদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি নিজ মতবাদের উত্তাপুচ্ছ বিকীরণ করেন। স্বদেশবাসীকে সর্ব্বতোভাবে—মনে-প্রাণে-চিন্তায়-ধর্ম্মে স্বাধীন ক'রে তুল্তে, উন্নতিকামী ক'রে তুল্তে, আত্ম-বিশ্বাসী ক'রে তুল্তে, সজীব ক'রে তুল্তে ইনি চেয়েছিলেন—সে দিক থেকে ধর্ম্মনীতি, সমাজ—এ সবের কোন নীতিই ইনি মান্তে চান্নি। হয়তো তিনি সফলকাম হতেন কিন্তু এত দ্রুত-পরিবর্ত্তন-প্রয়াসের জন্যই অশিক্ষিতেরা তাঁর আন্দোলনকে বুঝ্লো না, রাজশক্তিও তাঁকে প্রচার কর্লো রাজদ্রোহী ব'লে, ধর্ম্মযাজকেরা বল্লো—ধর্ম্মদ্বেষী; ভ্রান্ত অশিক্ষিত জনতা ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্লো তাঁর বিপক্ষে। চোদ্দ-শো-পনেরো খৃষ্টাব্দে সমসাময়িক ধর্ম্মের বিপক্ষে প্রচারকার্য্য চালানোর অপরাধে 'প্রাগ্' বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক 'জন্ হাস্'কে জীবন্ত দগ্ধ করা হোল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে! অশিক্ষিত স্বজাতির মধ্যে জ্ঞানপ্রচার-প্রচেষ্টার হোল এই পরিণতি। এঁর আন্দোলন না ঘট্লে জেক্-ভাষাকে আজও বিশ্বসাহিত্য একটা দেশগত ভাষা বলেই অস্বীকার কর্তো, জেক্ সাহিত্যের অস্তিত্বও থাক্তো না—হাংগেরীয় সাহিত্যের মাঝে সে আপনাকে হারিয়ে ফেল্তো। জেক্-ভাষাকে একটা দেশগত ভাষা ব'লে বিশ্বের আসরে পরিচয় দেবার এই যে প্রেরণা, এই অনুভূতির উদ্ভব হয় 'জন্ হাসের' উদ্বীপনার মধ্যে। এঁর সেই আন্দোলন আজ সার্থক হ'তে চলেছে—সেই জন্যই এই সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি উল্লিখিত না হ'লে, এঁকে বাদ দেওয়া হবে—সে ইতিহাস হ'বে অসম্পূর্ণ।

জন্ হাসের প্রেরণা নিয়ে যে ক'জন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন মাতৃভাষাকে বিশ্বের

দরবারে শ্রদ্ধেয় ক'রে তোল্বার চেষ্টায়,—তাঁদের মধ্যে যাঁদের প্রতিভা সমকক্ষভাবে স্ফুরণলাভ করেছে তাঁদের মধ্যে 'কর্নেলিয়ুস্'ই অন্যতম। কিন্তু এঁর প্রতিভাও 'হাসের' মত রচনার দিকে তত বেশী উৎকর্ষতা লাভ করেনি যতটা করেছে আদর্শবাদের দিক থেকে। সে যুগের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল আদর্শবাদের মধ্যেই বিশেষভাবে। সেই জন্যই এঁর আদর্শবাদ বিশেষ প্রসারতা লাভ করেছিল সে যুগের নাট্যকারদের মধ্যে।—এই জন্যই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

তাৎপর এক্কেবারে সপ্তদশ শতাব্দীর কথা—।

কর্নেলিয়ুসের পরে, উল্লেখযোগ্য বিশেষ শক্তিশালী লেখকের নাম আর পাওয়া যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর সুরুতে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক আকাশ কুজ্ঝটিকা-আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে—অষ্ট্রিয়ানদের সঙ্গে বার বার যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের মনোবৃত্তি নিরুৎসাহ হ'য়ে উঠে। এই যুদ্ধবিগ্রহের সুরু হয় পনেরো-শো ছাব্বিশ খৃষ্টাব্দে,যখন "মোহাক্‌ৎস" যুদ্ধে এদেশের রাজপুত্র নিহত হন ও অষ্ট্রিয়া-রাজ-শক্তির করতলগত হ'য়ে পড়ে এই রাজ্যটি। সেই যে স্বাধীনতা-আন্দোলন সুরু হয় তা শেষ হ'ল প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী "ফ্রেডারিক"কে রাজাসনে বসিয়ে। কিন্তু তারপরেই য়ুরোপে ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ (Thirty-year's war) সুরু হয়; তার ফলে দেশবাসীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে' সাহিত্যচর্চ্চার সুযোগ পায়নি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত। যে ক'বছর চেকোশ্লোভাকিয়া অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল সে ক'বছর অষ্ট্রিয়ানরা জেক্-ভাষার সমূহ ক্ষতি করে, আইনের বিধি-নিষেধে জেক্-ভাষার প্রচলন পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দেয় এ দেশটির বুকে।—এ ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি তখন সময়-বিশেষে দণ্ডার্হ হ'য়ে পড়ে বলেই সাহিত্যানুশীলন সে যুগে প্রায় রুদ্ধ হয় বল্লেই হয়। সেই অনড় জড় অবস্থার স্থায়িত্বও দীর্ঘ হ'য়ে পড়ে রাজনীতিক-ধর্ম্মনীতিক আন্দোলনে ও যুদ্ধবিগ্রহে। কিন্তু স্থিরতা হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে বেগবান হ'য়ে উঠ্‌লো প্রগতির বিবর্ত্তনে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আবার জেক্-সাহিত্যের সাড়া পাওয়া গেল বিশ্বসাহিত্যের আসরে—।

শুধু সাড়া নয়, সাহিত্য-রসিকদের মুখে মুখে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো দেশবিদেশের লেখকগণের রচনার গৌরব কাহিনী। এত শীঘ্র বিশ্বসাহিত্যের সহিত সমতালে পা' ফেলে' অগ্রসর হ'বার মত গৌরব সে পেল কেমন ক'রে—ভেবে বিস্মিত না হ'য়ে পারা যায় না। কিন্তু তার চেয়ে বিস্মিত হ'তে হয় দুজন লেখকের অভ্যুদয়ে, যাঁদের সৃষ্টি জেক্-সাহিত্যের সব-কিছু মলিনতা বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে তাকে অতিআধুনিক ক'রে তোলে।—এঁরা হচ্ছেন 'শেক্' ও 'নেরুদা।' এঁদের প্রতিভা এযুগের জেক্-সাহিত্যের পথস্রষ্টা—পুরাতনের বাঁধানীতি, রীতিধারা, সব কিছু ভেঙে চুরে এঁরা দুজন জেক্-সাহিত্যকে একেবারে চিরনূতন আধুনিক ক'রে গ'ড়ে তুলেন। এঁদের সৃষ্টির প্রভাবকে আধুনিক শক্তিশালীরা কেউই অতিক্রম ক'রে উঠ্‌তে পারেননি—তা তিনি "ভ্রচ্‌লিকী" বা "থিয়াসেক্" যেই হোন না কেন!

শ্লোভাকিয়া অধুনা জেক্-প্রদেশেরই অন্তর্গত, কিন্তু জেক্-প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে এ প্রদেশটি হাংগেরীয়ানদের অধীনে ছিল। বহুদিনের পরাধীনতার চাপে এঁদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, স্বভাব ও সাহিত্য হাংগেরীর ধরণেই গ'ড়ে ওঠে। হাংগেরীয়ই ছিল এঁদের রাজভাষা; কাজেই প্রদেশগত ভাষাটির বিকাশ হয়নি মোটেই—যা'ও হয়েছে তার মধ্যে হাংগেরীয় প্রভাব এত বেশী যে সে সব লেখকরা শ্লোভাক্ ভাষায় না লিখে' হাংগেরীয় ভাষায় লিখ্‌লে হয় ত নূতন কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি কর্‌তে পারতেন। এঁদের প্রদেশগত বৈশিষ্ট্যশালী সাহিত্য বল্‌তে যা আমরা পাই তা হাংগেরীয় সাহিত্যেরই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ—সে রীতির আজও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি।—সেইজন্যই এখানে তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখি না—হাংগেরীয় সাহিত্যের মধ্যেই এঁদের সাহিত্য লুকিয়ে আছে। বহুদিনের সাহচর্য্যে এটি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জেক্-সাহিত্যের মধ্যেও রুষপ্রভাব আছে একথা আগেই বলেছি, কিন্তু তাই ব'লে সে শ্লোভাক্ সাহিত্যের মত এ তার মধ্যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত ক'রে ফেলেনি—এই যা কথা। তবে দুয়ের মধ্যেই প্রভাব আছে—কম আর বেশী।

উনবিংশ শতাব্দীতে জেক্ সাহিত্যে যে নব অভ্যুত্থান ঘটে, সে বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা হচ্ছেন "য়ান্ নেরুদা।" জেক্-লেখকদের মধ্যে ইনিই অন্যতম। আঠারো-শো-চৌত্রিশ খৃষ্টাব্দে 'প্র্যাগ্' সহরে এঁর জন্ম হয়। ইনি উচ্চশিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পান এই প্র্যাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই। ছাত্রাবস্থা থেকেই এঁর দৃষ্টি পড়ে জেক্ ভাষার উন্নতি-বিধানের প্রতি—তখন থেকেই ইনি স্বদেশীয় সাহিত্য অনুশীলন করতে সুরু করেন। এঁর সাধনার প্রথম সৃষ্টি ইনি যখন জনসমক্ষে ধরেন তখন তার আধুনিকতায় মনীষীরা মুগ্ধ হন আর রক্ষণশীলরা কটূক্তি করেন তীব্রভাবেই—এঁর প্রথম সৃষ্টিই জেক্-সাহিত্যে এনে একটা বিবর্তন ঘটায়। ইনি জীবিত ছিলেন আঠারো-শো-একানব্বই খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী—ইনি একাধারে কবি, নাট্যকার, আর্গ্যালিষ্ট, সমালোচক, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক ছিলেন। এঁর রচনাভঙ্গী ছিল চমৎকার। 'দি ভাম্পায়ার' নামক গল্পটিই এঁর রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইনি জেক্-ভাষার কী উন্নতি যে করেছেন তা এঁর পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের রচনার সঙ্গে এঁর রচনার তুলনা করলেই বোঝা যায়। ইনি জেক্-সাহিত্যের যুগান্তকারী স্রষ্টা।

"জেকোস্লোভাক্ ষ্টোরিজ্" এঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ।

নেরুদার পরবর্ত্তী অন্যতম লেখক হিসাবে 'য়েতোস্লাভ্ সেক্'এর নামই উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জেক্-সাহিত্যের প্রধান রূপস্রষ্টা বল্‌তে 'সেক্'ই—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের জেক্-সাহিত্য এঁরই রচনা বৈশিষ্ট্যকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে। বোহেমিয়ার এক গ্রামে এঁর জন্ম হয় আঠারো-শো-ছেচল্লিশ খৃষ্টাব্দে। সেই গ্রাম্য সহরের স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ ক'রে ইনি প্র্যাগ্ সহরের এক 'জিম্‌নাসিয়াম্' থেকে 'গ্র্যাজুয়েট' হ'য়ে ওকালতি পড়তে সুরু করেন। কিন্তু সাহিত্যের নেশা এঁর মস্তিষ্কের মধ্যে এমি আলোড়ন তখন সুরু করেছে যে ওকালতির নথিপত্র স্থায়িত্বলাভ করবার অধিকার পেল না সে মস্তিষ্কের মধ্যে। সুযোগও জুটে গেল একখানি পত্রিকার সম্পাদকতা করবার, সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন ওকালতি পড়া। সেই থেকে একাগ্রভাবে এঁর সাহিত্যসাধনা সুরু হোল—সঙ্গে সঙ্গে সহ-সম্পাদনার হিসাবে সুনামও ক'রে ফেল্‌লেন। তারপর পর পর কয়েকখানি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদনার ভার পড়ে এঁর উপর—সম্পাদকীয় যোগ্যতায় ইনি কতদূর শ্রেষ্ঠ তারই প্রমাণ দেন ইনি সে সময়। এর সম্পাদনা সে যুগের ছিল আদর্শ। সেই সময় ইনি কয়েকটি এপিক্ (epic) কবিতা লিখে' সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গৌরবে অলঙ্কৃত হ'ন। তারপর উপন্যাস, গল্প ও কয়েকখানি প্রবন্ধের বইও ইনি লেখেন—সব ক'খানিই সে যুগের সাহিত্যের আদর্শ। উনিশ-শো-আট খৃষ্টাব্দে ইনি লোকান্তর গমন করেন।

বিংশ শতাব্দীর তরুণ জেক্-সাহিত্য-স্রষ্টারা এই দুজনের সৃষ্টি-প্রভাব থেকে নিজেদের এখনও বিশেষভাবে মুক্ত ক'রে নিতে পারেননি বলেই ওঁদের নাম নেই বিশ্বসাহিত্যে।

সেক্ এবং নেরুদা দুজনের উপরেই রুষ-সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায় যদিও, তথাপি এঁরা রুষ লেখকদের মত সমাজের নিম্নস্তরের কলকারখানা-নিষ্পেষিতদের জীবনই শুধু চিত্রিত করতে চাননি—সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের মাটিতে সোস্যোটিজম্‌এর বীজবপনের চেষ্টা করেন নি। এঁরা সমাজের সকল স্তরের লোককেই নায়ক-নায়িকা হিসাবে চিত্রিত করতে একটুও সঙ্কুচিত হননি—জমিদার থেকে ভেড়ীবাদক পর্য্যন্ত সকলের চরিত্রই এঁরা কল্পনা করেছেন আন্তরিক দরদ দিয়ে। এঁদের এই সমবেদনার প্রকাশভঙ্গীটুকুর আভাষটা রুষ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে অজ্ঞাতেই ধার নেওয়া—সেই জন্যই এঁরা আংশিকভাবে হত্যা করেছেন এঁদের সৃষ্টিপ্রতিভাকে—তা ব'লে এঁদের সৃষ্টির হীনতা প্রকাশ করছি না আমরা এখানে, কেননা অজ্ঞানকৃত (আমাদের এইরূপই বিশ্বাস) এই দুর্ব্বলতাটুকু সত্ত্বেও এঁরা জেক্-ভাষার—শুধু জেক্ ভাষার কেন, বিশ্বসাহিত্যেরও যুগান্তকারী স্রষ্টা।

অগ্নিশিখা

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

আকাশ সেদিন ঘন-মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠে উজ্জ্বল দীপাবলী-শোভিত কলকাতা সহরকেও চমক লাগাচ্ছে। চাপা মেঘের গুরু গুরু ডাকে থেকে থেকে ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত যেন কেঁপে উঠ্‌ছে। মঙ্গলা ক্ষিপ্রহাতে গৃহকাজ সেরে নিচ্ছে, আর তার বুকের ভিতরটাও চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছে! কাজ সাঙ্গ করে' উপরে এসে দেখে —বিষ্টু তন্ময় হ'য়ে লেখাপড়া কর্‌ছে।

রাত্রের আহার্য্যসামগ্রী ঘরের কোণে সযত্নে ঢাকা দিয়ে রেখে, তুষের আগুনের ঝড়াইএর উপর ভাতের ডেক্‌চি বসিয়ে মঙ্গলা ভাব্‌ছে, কি কর্‌বে; এমন সময় পাশের দরজার কাছে একটা বড় মোটর এসে দাঁড়াল। কড়া নাড়্‌তেই কি এসে দরজা খুলে দিল। মঙ্গলা জানালা দিয়ে দেখ্‌লে এক বিপুলায়তন ভদ্রবেশী লোক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় মোটর থেকে নেমে ভিতর চলে' গেল। মোটরখানা পাড়া কাঁপিয়ে বা'র হ'য়ে গেল। ঝি ঝনাৎ করে' দরজায় খিল এঁটে দিল। সারা পৃথিবী নাড়া দিয়ে আকাশ কড়্‌ কড়্‌ করে' ভেঙে উঠ্‌ল—কোথায় যেন পড়্‌ল বাজ।

ভয় পেয়ে মঙ্গলা 'মাগো' বলে' জানলার কাছ থেকে সরে' এল। বিষ্টু মঙ্গলার কথা ও শব্দ শুনে হেসে বল্লে, "কি গো—কি দেখ্‌লে?"

মঙ্গলা চুপি চুপি বল্লে,- "একটা মস্তবড় গোঁফওয়া-চোঁফওয়া লোক মোটর করে' ঐ বাড়ীতে এল। আমি না জানি আজ বউটার কপালে কি আছে!—আচ্ছা, কেন বউকে মারে—ও কি ভালবাসে না?"

"বল্‌তে তো পারি না মন্থু, এমন করে' তোমার মত আপনা ভুলে আর কেউ ভালবাসে কিনা—।"

শন্ শন্ করে' হাওয়া দিয়ে কোঁটা কোঁটা বৃষ্টি এল, ঝড়ও হ'য়ে এল। খাওয়া-দাওয়া সেরে স্বামী-স্ত্রীতে শুয়ে পড়্‌ল। মঙ্গলা বল্লে, "কি জানি আজ মনটা কেমন লাগ্‌ছে—"

বৃষ্টি বেশ জোরে এল। বাদলা দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দের গুঞ্জনে তারা ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার সঙ্গে মেঘের গর্জ্জন মুহুর্মুহু সারা পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। ঝড়ে জলে দোল খেয়ে খেয়ে বহিঃপ্রকৃতি একটা প্রলয়নৃত্য আরম্ভ করে' দিয়েছে যেন!

এই দুর্য্যোগের ঝঞ্ঝারও ভেদ করে' করুণ আর্ত্তনাদে কে সহসা সেই সুপ্ত পল্লীকে সচকিত করে' তুল্ল,—"বাবা গো···"

মঙ্গলা লাফিয়ে উঠে বসে' ধাক্কা দিয়ে স্বামীকে জাগিয়ে বল্লে, "ওগো শুন্‌ছ কী চীৎকার...মেরে ফেল্লে আজ বউটি কে!" বল্‌তে বল্‌তে মঙ্গলার চোখের জল বিষ্টুর হাতের উপর ঝরে' পড়্‌ল।

আবার সেই করুণ চীৎকার!—বিষ্টু আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এল—ও-বাড়ীর বার থেকে শুন্‌তে-ওঠা কান্না ছুটে বেরুতে লাগ্‌ল। বিষ্টু সদর দরজা খুলে ভাব্‌ছে, কি কর্‌বে,—ভীষণ বৃষ্টি! হঠাৎ পাশের দরজা ঝড়ের ঝাপটায় যেন খুলে গেল—একটা ক্ষীণ-মান দেহ রাস্তার উপর আছড়ে পড়্‌তেই বিষ্টু হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিয়ে নিজের দরজা বন্ধ করে' দিলে। মঙ্গলা ত্রস্তপদে কাছে এসে দেখে একটা অর্দ্ধমৃত মেয়ের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্তধারা ঝরে' পড়্‌ছে। অজ্ঞান দেহটুকু বিষ্টু কোলে করে' উপরে তুলে নিয়ে এল। বাইরে প্রকৃতির গর্জ্জন আর বর্ষণ তাদের কাজে সহায়তা কর্‌ল।

বাড়ীর উপরে নিয়ে মলিন ভেজা কাপড় ছাড়িয়ে মঙ্গলা তাকে একখানি সাড়ী পরিয়ে দিলে। তার মূর্চ্ছাহত মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিষ্টু স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। এ কি রূপ মানুষের! অনাবৃত বাহুর ও মুখের উপর অসংখ্য

মায়ের দাগ,—রক্ত ফুটে রয়েছে। মঙ্গলা সযত্নে সেগুলি মুছে দিচ্ছে আর চোখের জল মুছ্‌ছে।

বিকুর বিমূঢ় ভাব সে লক্ষ্য করেনি, আস্তে আস্তে বল্লে, "এস এঁকে ধ'রে' বিছানায় শুইয়ে দাও। ঠাণ্ডায় সব আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। এখনো তো জ্ঞান হলনা ?..."বিকু বল্লে, "বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন, একটু সেক্ দিলে ভাল হয়—বেশ ত কড়াইয়ে আগুন আছে কি না ?"

মঙ্গলা আগুন নিয়ে এসে সেক্ দিতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ পরে চেতনার লক্ষণ দেখা দিল। বিকু বল্লে, "একটু কিছু খাওয়াতে পার্‌লে ভাল হ'ত। যেন কত কাল কিছু খায় নি !" মঙ্গলা বল্লে, "টিনের দুধ আছে সেই থেকে একটু করে' দিই, ষ্টোভটি জেলে দাও না।"

মঙ্গলা একটু দুধ করে' নিয়ে এল।

মেয়েটি একবার চোখ খুলে কাতরকণ্ঠে বল্লে, "মাগো—" মঙ্গলা ডাক্‌ল, "দিদি—দিদি—মুখ খোল, একটু খাও।"

আহত ভাবে চম্‌কে উঠে মেয়েটি উত্তেজিত-কণ্ঠে বল্লে, "কে—কে—"

আলোটা উজ্জ্বল করে' দিয়ে মঙ্গলা বল্লে,"ভয় ক'রোনো দিদি, আস্তে কথা বল' ; তুমি পাশের বাড়ীতে এসেছে।"

দারুণ তৃষ্ণায় কণ্ঠ দিয়ে স্বর বা'র হ'ল না। মঙ্গলা অল্প অল্প করে' দুধ তার মুখে দিতে লাগ্‌ল, একটু একটু করে' অনেকটা দুধ খেয়ে মেয়েটি যেন চেতনা পেলে। চারিদিক চেয়ে বল্লে,—"আমি কোথায় ?"

মঙ্গলা তাকে বুঝিয়ে বল্লে, "ব্যস্ত হ'য়োনা, তুমি এই পাশের বাড়ীতে এসেছে। ওরা তোমার মেরেছে ; কথা ব'লোনা, তাহ'লে জান্‌তে পার্‌বে।"

এতক্ষণে মেয়েটি কেঁদে উঠ্‌ল—"আমার ছেলে গোপাল কই..."বিকু এগিয়ে এসে বল্লে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, কালই গোপালকে এনে দেব।"

গভীর অবসাদে মেয়েটি আবার অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌ল। মঙ্গলা তার গায় হাত দিয়ে বল্লে, "গা কি ভীষণ গরম—যেন পুড়ে যাচ্ছে !"

বিকু সাবধানে তার ললাট স্পর্শ করে' বল্লে, "হ্যাঁ অমই-ত, কি আর কর্‌ব, জল দাও—বাতাস করি।" "কি আর কর্‌বে," মঙ্গলা বল্লে, "তোমার তো আপিস আছে, তুমি ঐ কম্বলটা পেতে ঐখানে মেজেতে শোও—আমি বসে' থাকি।"

বিকু শুয়ে শুয়ে এই মেয়েটির জীবনের কথা কল্পনা কর্‌তে লাগ্‌ল। কি করে' ঐ ধনুষ্কার হাত থেকে রক্ষা করা যায় একে, তাই এক ভাবনা। আহা, এই অসহায় দুটি নারীকে ফেলে সে আপিসেই বা কি করে' যাবে ? দু'-একদিন না হয় নাই-ই গেল, কিন্তু কি কর্‌বে একে নিয়ে ? —

৬

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে রাত্রি প্রভাত হ'ল। বৃষ্টিধৌত ভোরের আলো জানলার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতেই বিকু বিছানা ছেড়ে উঠে পড়্‌ল। সারা রাত জাগরণ-ক্লান্ত মঙ্গলা মেয়েটির মাথার কাছে হাতটির উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে ; দুখানি সুপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বিকুর মনে কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌ল। যে মঙ্গলাকে এত সুন্দর বলে' সে মনে করে, আজ নবাগতার রূপের প্রভায় সে উজ্জ্বলতা যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। ঐ দেহে কিছু নেই—তবু যেন চম্পচাপা রূপ উছ্‌লে পড়্‌ছে। মনকে ধমক দিয়ে বিকু ভাব্‌লে, মঙ্গলা তো অসুন্দরী নয় একটু রং না হয় ময়লা—।

হঠাৎ মেয়েটি 'মা—' বলে' চোখ মেল্‌তেই বিকুর দিকে চোখ পড়েই চম্‌কে উঠ্‌ল। বিকু বল্লে, "ভয় পাবেন না, আমরা আপনাদের ভাড়াটিয়া বাসিন্দা, কাল রাতে আপনি এখানে এসেছেন। কি কর্‌ব বলুন তো আপনার জন্যে ?"

মেয়েটি চুপ করে' ভাবতে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু সে মনে কর্‌তে পার্‌ল না যে কেমন করে' এখানে এল। সে শুধু মঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে—"আমার ছেলেকে এনে দাও দিদি, তারা মেরে ফেল্‌বে !"

স্বামী স্ত্রীতে পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করে' মঙ্গলা বল্লে, "হ্যাঁ এনে দেব তোমার ছেলে। কিন্তু ভয় কি, সে ত তার বাবার কাছেই আছে—"

"বাবার কাছে ?"—উত্তেজনায় মেয়েটি শয্যায় উঠে বস্‌ল। "ব'লোনা, ব'লোনা, ও দস্যু—চোর—চুরি করে' এনেছে আমাদের। ওর বাবা ?—আঃ! তাকি কখনো পাবে

দিদি—!" মেয়েটি ঢলে' পড়ল। মঙ্গলা তাকে শুইয়ে দিলে সে অচেতন অবশ হ'য়ে পড়ে' রইল।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে মঙ্গলা বল্লে, "ঐ লোকটা তাহ'লে ওর স্বামী নয়—তবে এ মেয়েটি ওর কে?"

হঠাৎ ঘৃণায় মঙ্গলার সারা দেহ-মন যেন সংকুচিত হ'য়ে উঠ্‌ল। শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বিনু তার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে, মঙ্গলার পিঠে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বল্লে, অস্থির হ'য়োনা, নিশ্চয় মেয়েটি সৎ, তাই এত অত্যাচার সয়েছে। কোন লুকানো ইতিহাস আছে হয়ত', ওর জ্ঞান হ'লে আপনিই বল্‌বে। তা ছাড়া যে আশ্রিত সে নারায়ণ, তাকে অযত্ন কর্‌লে যে অকল্যাণ হবে মঙ্গলা—"

স্বামীর কথায় তার মন অনেকটা স্বস্তি পেল বটে, কিন্তু আত্মসম্বরিত সংসার তার কিছুতে যেতে চাইল না—উচ্ছ্বসিত করুণার বন্যাধারারও মুখে একখণ্ড মস্ত পাথর চাপা পড়ে' গেল। ভারাক্রান্ত মনে মঙ্গলা গৃহকর্ম্মে চলে' গেল। বিনু বল্লে, "দেখি একবার ছেলেটাকে কেমন করে' পাই—"

ঘোর উঠে ভিজে আল্‌সের ফাঁকে ফাঁকে এসে অপরিসর উঠানে পড়েছে। রাতের বাসনগুলি কলতলায় নামিয়ে মঙ্গলা মাজ্‌তে বস্‌বে এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। মঙ্গলা ব্যস্ত হ'য়ে সভয়ে দরজার ফাঁকে চোখ দিয়ে দেখ্‌ল—সেই ঝি।

বিনু বাইরের কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কে?—তোমার কি চাই—"

ঝি বল্লে, "বাবু, একটু নীচে এস তো, দরকার আছে।"

বিনু নীচে আস্‌তেই মঙ্গলা আড়ালে সরে' গিয়ে দাঁড়াল।

ঝি বিনুর হাতে একটা কাগজ দিয়ে বল্লে—"সে বেটী তো পালাল, ছেলেটাও সকালে কোথায় গেল খুঁজে পাচ্ছি না···সব তো গেল, এখন কি কর্‌ব আমি এখানে থেকে? আমি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে' যাচ্ছি বাপু!—কে থাকে এসব হাঙ্গামায়? এই কাগজে লেখা আছে বাবু, পড়ে' যা কর্‌বে কর! এই যে পালালে, এখন কি কর্‌বে কে জানে, আমি বুড়ো মানুষ কেন ফেসাদে পড়ি? তখনি বলেছিলাম কাজ নেই; বাবু তা শুন্‌লে না।—মর্ এখন জেল খেটে!"

"তোমার বাবু কি এখান থেকে চলে' যাচ্ছেন নাকি"?

ঝি বল্লে, "হ্যাঁ—পশ্চিম না কোথায় যাবে কে জানে। তা পালালে কি হ'বে, জান্‌তে কি আর কারু বাকী আছে?" বিনু ঝির কথায় যত কান না দিল কিন্তু কাগজটা পড়ে' চিন্তিত হ'য়ে বল্‌লে, "এ মাসের আজ দশ তারিখ, আমরা ও মাসের দশ তারিখে উঠে যাব। আগের মাসের ভাড়া নিয়ে যাও।"

উপর থেকে ২৫৲ টাকা এনে ঝির হাতে দিল।

মঙ্গলা বল্‌লে, "তুমি আরো এক মাস এ বাড়ীতে থাক্‌বে?" বিনু বল্লে, "কি করব, একে কোথায় ফেল্‌ব? ছেলেটিও শুন্‌ছি চলে' গেছে; এখানে থাক্‌লে হয়ত' একদিন খোঁজ মিল্‌বেই।—তারপর এই মেয়েটিকে কি অসহায় অবস্থায় রাস্তায় ফেলে দেওয়া যায়? একটু সুস্থ হ'লে যা ভাল হয় করা যাবে।"

কলতলার কাজ সেরে মঙ্গলা উপরে গিয়ে দেখে—বিনু অচেতন মেয়েটির মাথায় জলপটী দিয়ে বাতাস দিচ্ছে। মঙ্গলা যেতেই বিনু বল্লে, "মঙ্গলা, উনুন ধরিয়েছ কি? আমি বাজার থেকে দুধ নিয়ে আসি, আর কিছু বরফ নিয়ে। মরাটা বড় যেন বেশী মনে হ'চ্ছে; তুমি সাবধানে থেক—কেউ ডাক্‌লে দোর খুল'না।"

উদ্বিগ্নমনে মঙ্গলা বল্লে, "তুমি আপিস যাবে না—?"

"না আজ থাক্, কি হয় দেখি।"

মঙ্গলা দোর দিয়ে উপরে গেল।

বিনু বাজার থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "জ্ঞান হ'ল কি?"

মঙ্গলা দুধ, বরফ ও অন্যান্য জিনিষ নিতে নিতে বল্লে, "কই আর জ্ঞান হ'ল! মাঝে মাঝে গোপালকে ডাক্‌ছে আর ছট্ ফট্ কর্‌ছে—যে জ্বর, শেষকালে কি হয় কে জানে!" মঙ্গলা স্বামীর আরো কাছে সরে' গিয়ে বল্লে, "কি কি বল্‌লে শুন্‌লে ত? শেষটায় আমরা যদি কোন হাঙ্গামায় পড়ি—"

বিনু বল্‌লে, "যদি হাঙ্গামায় পড়্‌তেই হয়, তাতে ভয় পেলে চল্‌বে কেন? তুমি কি বল, ওকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আস্‌ব, না, ঐ গুণ্ডার হাতে ছেড়ে দেব?"

নিরুপায় মঙ্গলা বল্‌লে—"না, তাকি হয়, এমনি ত ফেলে রাখা চল্‌বে না, ওষুধপত্রও দিতে হ'বে।"

"আমি ডাক্তার বাবুকে বলে' এসেছি, সন্ধ্যার সময় তিনি আস্‌বেন। ততক্ষণে হয়ত' ঐ কি ওষাড়ী থেকে চলে' যাবে; তা হ'লে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

মঙ্গলা বল্‌লে, "ছেলেটি এখানে নেই—এই কথা শুন্‌লে অসুখ সারার থেকে বেড়ে যাবে।"

"আজ সকালেই গেলে বেশী দূর কি আর যাবে? হয়ত' ঘুরে এখানেই আস্‌বে। না পাই তো, থানায় খবর দেব।"—অস্ফুট কাতর শব্দে মঙ্গলা সচকিত হ'য়ে বল্‌লে, "যাই দুধ জাল দিয়ে নিয়ে আসি, তুমি মাথায় বরফ দাও।"

বিষ্ণু বরফের ব্যাগটি পকেট থেকে বা'র করে' বরফ ভেঙে ভাতে ভরে' রোগিণীর মাথায় ধর্‌ল। কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা দিতেই উপকার হ'ল—মেয়েটি চোখ মেলে চাইল। মঙ্গলাও তখন দুধ নিয়ে উপরে এল, কাছে এসে বল্‌লে, "দিদি, দু' চামচ দুধ খাও দেখি—"

দু' চার চামচ দুধ খেয়ে মেয়েটি ঝর্ ঝর্ করে' কেঁদে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "আমার গোপাল আজ ২।৩ দিন কিছু খায়নি যে।···"

বিষ্ণু বল্‌লে, "কাঁদ্‌বেন না, আমি তার খোঁজ করেছি, সে সেখানে নেই। পাশেই কোথায় লুকিয়ে আছে হয়ত' —আমি খুঁজে আন্‌ব।"

"ও বাড়ীতে নেই?—তবে তারা তাকে মেরে ফেলেছে!"

"না, না, মার্‌বে কেন, কি বলেছে সকালে উঠে কোথায় বেরিয়েছে। আপনি একটু সুস্থ হ'ন, আমি এনেদিচ্ছি।"

"উঃ—না গো না, তারা কি নিষ্ঠুর জান না। মেরেছে, খেতে দেয় নি,—তারপর কি তারা রাখ্‌বে?"

মনের উদ্বিগ্নতায় মেয়েটি আবার জ্ঞান হারাল। বিষ্ণু কি কর্‌বে—কেবল বরফ দিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

মঙ্গলা কোনমতে ভাতে ভাত রান্না করে' উপরে রোগীর কাছে এসে বস্‌ল।

সারাদিন অচেতন, মাঝে মাঝে প্রলাপের এক একটি কথা অস্ফুট স্বরে বলে—আবার চুপ। বিষ্ণু সারাদিন অন্যান্য ভাবে তার শিয়রে বসে' সেবা কর্‌ছে। মঙ্গলা মাঝে মাঝে নিজকে বিড়ম্বিত মনে কর্‌ছে কিন্তু বিষ্ণুর মুখের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা দেখে কিছু বল্‌তেও পার্‌ছে না, যথাকর্ত্তব্য কাজ করে' যাচ্ছে।

ডাক্তার এল, খুব ভাল করে' দেখে বল্‌লেন, "বড় শক্ত মশাই! মাথার বরফ সর্ব্বদাই দেবেন, আর জ্ঞান হ'লে এই ওষুধটা খাওয়াতে চেষ্টা কর্‌বেন। আমি একটা ইন্‌জেকশনও দিয়ে যাই,—বড় দুর্ব্বল।"

বিষ্ণু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বল্‌লে—"কি বোঝেন ডাক্তার বাবু, ভয়ের কিছু আছে?"

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বল্‌লেন, "কে হ'ন ইনি আপনার?"—বিষ্ণু ডাক্তারকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিস্তারিত সব বল্‌লে।

ডাক্তার বল্‌লেন, "বড় মুস্কিল তো! ছেলেটিকে না পেলে ওঁকে বাঁচান শক্ত হবে-"

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। বিষ্ণু তাঁর দর্শনী দিতে গেলে ডাক্তার বল্‌লেন, "নাঃ, আপনি কেন দিচ্ছেন? আপনি যেমন আশ্রয় দিয়েছেন, তেমনি আমারও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; কাজেই ওর দরকার নেই—আমি আপনিই এসে দেখে যাব। কাল সকালে আস্‌ব।"

অবস্থার পরিবর্ত্তন নেই। তিন দিন কেটে গেল। বিষ্ণু পাশের প্রত্যেক বাড়ী, গলি সব খোঁজ করেছে, একা মানুষ এদের ফেলে দূরেও যেতে পারে না—খোঁজ পায়নি। সাতদিনের ছুটী নিয়ে বাড়ী বসে' আছে, এই রকম মরণাপন্ন রোগী ফেলে যাইই বা কেমন করে'?

চতুর্থ দিনের শেষ রাত থেকে অবস্থা বড়ই খারাপ হ'য়ে এল। ভোর হতেই বিষ্ণু ডাক্তারের কাছে যাবে বলে' ভাব্‌ল কিন্তু রোগী ফেলে সে নড়্‌তে পার্‌ছিল না, বিকারের ঘোরে উঠে পালায়, চেঁচায়, কাঁদে,—মঙ্গলা ত ভয়েই অস্থির। সন্ধ্যার সময় রোগীকে নিস্তেজ দেখে বিষ্ণু তাড়াতাড়ি ছুটল ডাক্তারের বাড়ী। পথে যেতে যেতে কতকগুলি রাস্তার ছেলের সঙ্গে একটি উজ্জ্বলবর্ণ নগ্ন শিশুকে দেখে বিষ্ণুর হঠাৎ মনে হ'ল গোপাল বলে'। ধম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখে যে গোপালই তো বটে··· সারা গা'য় ধূলো, চোখে জল, শীর্ণ দেহ। কাছে গিয়ে ডাক দিলে—"গোপাল,—গোপাল!"

বিকুর ডাক শুনে গোপাল ছুটে কাছে এসে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে' কেঁদে উঠ্‌ল—"মা—মা কই আমার..."

সাগ্রহে তাকে বুকে তুলে নিয়ে বিকু বল্‌লে, "গোপাল কোর'না, মা আছে, কেঁদ'না। কেন তুমি আমার কাছে যাওনি—?"

গোপাল অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে কেঁদে বল্‌লে, "কেন মা আমায় নিয়ে গেল না?"

"তোমার মা'র যে বড় অসুখ, শুন, তুমি কেঁদ'না; কোথায় ছিলে তুমি?"

গোপাল দূরে একটা বস্তি দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"ঐ মনিহার মা'র কাছে ছিলাম, সে যে যেতে দেয় নি।"

ডাক্তার বাবুর কাছে গিয়ে বিকু বল্‌লে, "এখনি চলুন ডাক্তার বাবু, অবস্থা বড় সুবিধার নয়। এখনি আস্‌তে আস্‌তে পথে তাঁর ছেলেটিকে দেখাব;—যদি রাখ্‌তে পারেন, চলুন একবার।"

ডাক্তার বাবু তৈরী হ'য়ে বল্‌লেন, "চলুন, ওষুধ'র হয়ত' আজ রাত্রে থাক্‌বে না-ওষুধ। এত দূর আপনার বারবার আসা কঠিন—অমন আসন্নমৃত্যু রোগী ফেলে' চলে' আসাও উচিত নয়।"

ঔষধপত্র নিয়ে ডাক্তার বাবু ট্যাক্সি ডাক্‌লেন, বিকুকে ও গোপালকে তাতে উঠিয়ে নিয়ে এলেন।

সারা রাত ধরে বাহুরে পালা চল্ল: ডাক্তার বাবু তাঁর সমস্ত শক্তি ও মন দিয়ে সেবা কর্‌তে লাগ্‌লেন, বিকু ও মঙ্গলা তাঁর আদেশমত কলের পুতুলের ন্যায় খাটতে লাগ্‌ল। গোপাল মাকে ঐ রকম দেখে একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল। তখনি বিকু কোলে নিয়ে বল্‌লে—"কেঁদ'না, তাহ'লে পালের বাড়ী থেকে ওরা ধরে' নিয়ে যাবে..." ভয়ে সেই যে সে চুপ কর্‌ল আর একটুও কাঁদ্‌ল না, কেবল মা'র অবশ হাতের মধ্যে মুখ গুজে পড়ে' রইল, নড়েও না। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে রোগীর অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন দেখে ডাক্তারের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। বিকু বল্লে, "ডাক্তার বাবু, বাঁচ্‌বে তো?" ডাক্তার বল্লেন, "আর ভয় নেই, এর পর সেবারই কিন্তু খুব চাই।"

গোপাল সারা রাত প্রহরী হ'য়ে বসে' আছে—ঘুমে ঢুলে পড়ে আবার চম্‌কে উঠে বসে,—মায়ের অবশ হাতখানা বুকে চেপে ধরে। মৃত্যু বুঝি এমন সজাগ প্রহরীর কাছ থেকে তার মা'কে কেড়ে নিতে পার্‌লে না।

সাত দিনের দিন ভোর বেলায় জ্ঞান হ'য়ে মা যখন দেখ্‌লে যে তার হারাধন তার কাছে ঘুমিয়ে আছে তখন অনেকে সে তাকে বুকে টেনে নিতে চাইলে, কিন্তু তার অবশ হাতখানা শুধু গোপালের গাত্র স্পর্শ কর্‌ল মাত্র। সেই স্পর্শে গোপাল চম্‌কে উঠে দেখে—তার মা তার দিকে চেয়ে আছে, দুই চোখ দিয়ে অশ্রুজল ঝ'রে পড়্‌ছে।

"মা, মাগো—" বলে' গোপাল মায়ের বুকের কাছটিতে সরে' গেল। মঙ্গলা ও বিকু উঠে দেখে—মাতাপুত্র পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে' আছে,—গোপাল তার মায়ের বুকে মুখ লুকে লুকে কাঁদ্‌ছে।

বিকু গোপালের কাছে সরে' গিয়ে বল্লে, "গোপাল, কেঁদ'না—দেখ্‌ছ না তুমি কাঁদ্‌ছ বলে' তোমার মা কাঁদ্‌ছেন, কত কষ্ট হ'চ্ছে! তুমি ওঠ, উঠে মা'র গায় হাত বুলিয়ে দাও, বাতাস কর।"—গোপাল উঠে বসে' মায়ের চোখ নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে বল্লে—"মা, কেঁদ'না, আমি আর কাঁদ্‌ব না—"

রোগীর দেহে যেন প্রাণ সঞ্চার হ'ল—যে প্রাণ ধরে' রাখার জন্য এত চেষ্টা, এত আয়োজন, এই কোমল স্পর্শে তা মৃতসঞ্জীবনীর কাজ কর্‌ল। দু'চার দিনের মধ্যেই গোপালের মা বেশ সবলতা লাভ কর্‌ল; বিছানায় উঠে বস্‌তে কষ্ট বোধ কর্‌ত না। ক্রমে ক্রমে সুস্থতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল।

৭

ভাদ্রের প্রখর রৌদ্র খাঁ খাঁ কর্‌ছে। রাস্তা পথিক দু'চার জন পথ চল্‌ছে, ফেরীওয়ালারা একঘেয়ে সুরে হেঁকে যাচ্ছে "চুড়ি চাই, চুড়ি চাই গো—" কেউ ডাক্‌ছে "মাথা ঘষা তেলের মসলা, গোলাপাস—" কিন্তু এই রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে কোন বাড়ই দরজা খুলে সা'র হ'চ্ছে না।—দূরে দূরে কাঁসারির ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে—ঢং ঢং ঢং ঢং।

নিভৃত ঘরের কোণে মঙ্গলা তার দৈনিক কাজের ডালি খুলে বসেছে—গোপালের মা তাকে সাহায্য কর্‌ছে। দুটি প্রাণীর ভার পড়ায় মঙ্গলা আজকাল একটু বেশী মন দিয়ে

কাজ করে। মঙ্গলা বল্‌লে, "হাঁ৷ ভাই সেদিন সেই গল্পের আর কি হ'ল বল্‌লে না যে,—বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলে? তারপর কি হল?—"

গোপালের মা ক্ষীণ হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে বল্‌লে—"সেই মেয়েটির নাম অলকা। সে মা-বাপের খুব আদুরে মেয়ে। একমাত্র মেয়ে—আর সুন্দরী বলে' নামও ছিল। কাজেই অনেক দেখে-শুনে ভাল ঘরে তার বিয়ে দিলেন বাপ-মা। যেমন বড় ঘর তেমনি মহাদেবের মত বরও পেল। মা-বাপের ঘর থেকে সে আর বিশেষ কিছু পায়নি কেবল রূপ ছাড়া; তাই নিয়েই সে স্বামীর ঘরে রাজার বসিয়েছিল—বিনা-কড়িতে সে সব জয় করে' নিলে। সুখে স্বচ্ছন্দে কিছু দিন কেটে গেল। ও ধারে অলকার বাপের বাড়ীর গ্রামে হ'ল মড়ক। অনেক লোক মারা গেল। সেই ধাক্কায় অলকার মা-বাপ দুইই মারা গেল। তখন অলকার কোলে সবে দু'মাসের একটি ছেলে।—"

অনেক চেষ্টায় গোপালের মা একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিতে গেল কিন্তু দীর্ণ বক্ষ তা চাপা দিতে দিল না। মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে মঙ্গলা বল্‌লে, "এ কি সত্যি গল্প দিদি? তুমি বল্‌তে যদি দুঃখ পাও—"

গোপালের মা হেসে বল্‌লে, "শোনই না গল্পটি কেমন, তারপর সত্যি-মিথ্যে তুমি বিচার ক'রো।—

"মা-বাপকে হারিয়ে অলকা স্বামীকে আরো গভীর ভাবে অনুভব কর্‌ল, তার সকল অভাব সে স্বামীর স্নেহে ভুলে থাকৃত। ছেলেটি দিন দিন বড় হ'তে লাগ্‌ল, চাকর-দাসী আত্মীয় পরিজন নিয়ে অলকা রাণীর মত ঘর কর্‌তে লাগ্‌ল। সুখের সংসারে তার আনন্দে দিন কেটে যেত। অতিথি-অভ্যাগত অনাথ-আতুর কখনো দ্বারে এসে ফিরে যেত না,—বৎসরে পূজা-উৎসব লেগেই থাকৃত; সারা গ্রাম তাদের আনন্দে আনন্দিত হ'ত। সকলে অলকাকে সোহাগ করে' বল্‌ত—'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী'। কিন্তু এত আদর-সোহাগেও তার কপাল ভেঙে গেল—ঠেকাতে পার্‌ল না।

"সেবার গোকুলপুরে অলকাদের গ্রামে মেলা বস্‌ল। দেশ-বিদেশ থেকে এল কত দোকানপাট, নাচগান, বায়স্কোপ-থিয়েটার,—কত দলে দলে লোক এল আশপাশের গ্রাম থেকে।—তিন দিন মেলা চল্‌বে। অলকা স্বামীকে ধরে' বস্‌ল, 'চল না মেলা দেখ্‌তে যাবে?' স্বামী বল্লেন, 'বড় ভীড়—কষ্ট হবে যে।' তবু অলকা আবার ধরে' বস্‌লে, 'চল' না, কিছু হবে না।'—"

মঙ্গলা বল্‌লে, "অলকার স্বামীর নাম কি বল্‌লে—"

গোপালের মা একটু হেসে বল্‌লে, "গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে বুঝি এত কথা বলে? আচ্ছা ধর, তাঁর নাম ছিল অরবিন্দ। তিনি ছিলেন ডাক্তার। খুব বিদ্বান আর বুদ্ধিমান লোক।

"মেলায় যাওয়া স্থির হ'ল। লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া সঙ্গে গেল,—দারোয়ান গেল ছেলেকে নিয়ে। ছোট ছোট তাঁবু পড়েছে,—প্রকাণ্ড মাঠটা যেন সহর হ'য়ে গেছে! দোকানের পর দোকান,—কোথাও মাটির পুতুল, কোথাও কাঁসার বাসন, কোথাও রূপার দোকান, কোথাও বা রাশ রাশ রঙীন কাপড়। আবার অন্য ধারে সার্কাসওয়ালা হাঁক্‌ছে, 'দু'পয়সা বাবু, ছাগলের সঙ্গে বাঘের লড়াই,সিংহীর লড়াই।' বাঁদর-নাচ, পুতুল-নাচ, কিছুর অভাব নেই। নাগোরদোলার পাক খেয়ে খেয়ে ছেলের দল হৈ চৈ কর্‌ছে! পথের ধারে ধারে মণিহারীর দোকান—চীনের পুতুল, কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা,—রাশে সবদিক ঝল্‌মল। এটা ওটা কিন্‌তে কিন্‌তে ও দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে বেলা পড়িয়ে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো—দু'চারটা করে' আলো জ্বলে' উঠ্‌ল। লোকের ভীড় যেন ঠেসে ধর্‌তে লাগ্‌ল। ছেলে দারোয়ানের কোল থেকে অলকার কাছে আস্‌বার জন্য কাঁদ্‌ছিল, তাকে কোলে নিয়ে অলকা বল্‌লে, 'ফিরে চল,আজ অনেক দেখা হয়েছে।' পিছনে ভীষণ ভীড় দেখে তারা বল্‌লে, ঐ মাঠের পাশ দিয়ে ঘুরে গাড়ীতে উঠ্‌বে।

"হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে সব চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, 'পালাও পালাও আগুন আগুন—'এক মুহূর্ত্তে সে কি হৈচৈ,—যেন প্রলয়কাণ্ড!...ছুটে যায় কোথায় কে তার ঠিক নেই। যে দিকে অলকা তার স্বামীর হাত ধরে' যাচ্ছিল—সেই দিকেই লোকের স্রোত ছুটে চল্‌ল যেন পঙ্গপালের মত। লোকের পায়ের ধাপটে সব পিষে যেতে লাগ্‌ল। ছেলেকে বুকে চেপে অলকা কোনমতে পথ করে' যাচ্ছে, হঠাৎ এক ঝট্‌কায় স্বামীর হাত

থেকে তার হাত ছিন্ন হ'য়ে গেল—ঠেলে দিয়ে সে একেবারে ভীড়ের মধ্যে পড়্‌ল। লোকের ধাক্কায় দিশাহারা হ'য়ে সে জনস্রোতের মধ্যে ভেসে যেতে লাগ্‌ল—দাঁড়াতে পারে কার সাধ্য! স্বামীর ডাক কানে একবার মাত্র গেল তারপর আর শুনতে পেলে না,—আগুন তখন তার লেলিহান জিহ্বা মেলে লক্ লক্ করে' উঠ্‌ছে·· সন্ধ্যার অন্ধকারে লোক চেনা যায় না···অলকার হাত ধরে' একজন কে টান দিলে—অলকা আশ্রয় পেয়ে জোর করে' তার হাত ধর্‌ল। কোনমতে কে যেন তাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এসে একটা রাস্তার ধারে গাড়ীর কাছে দাঁড় করাল। অলকা এতক্ষণ ভাব্‌ছে তাদেরই কোন চাকর বা দরোয়ান হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা লোক দেখে অলকা মাথার কাপড় টেনে দিল। লোকটা গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে তাকে তাতে টেনে তুল্‌ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'চার জন তাতে উঠে বস্‌ল। তারপর গাড়ী থেকে লোকটা মুখ বাড়িয়ে বল্‌লে—'চল ইষ্টিশান্।'

"অলকা ভয় পেয়ে বল্‌লে, "আমাদের বাড়ী ইষ্টিশানের দিকে নয়—শেওলা তলায়।'

"পিশাচের দল হেসে উঠ্‌ল। অলকা ভয়ে চীৎকার করে' উঠ্‌তে গেল,জোর করে' একটা লোক তার মুখ চেপে ধর্‌ল। ছেলেটির মুখও একজন বন্ধ করে' দিল। অলকা অসহায় বিহ্বল হ'য়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌ল। রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে—ষ্টেশানের পথও প্রায় দু' মাইল। গাড়ী যখন থাম্‌ল তখন অলকা আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌তে গেল কিন্তু একটা লোক তার দিকে একটা ছুরি দেখিয়ে এমন কথা বল্‌লে যে তার বাক্‌শক্তি এক মুহূর্ত্তে কে কেড়ে নিল, প্রাণপণে ছেলেকে বুকে চেপে বলির পশুর মত সে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল—"

গোপালের মা'র গল্প মঙ্গলা হাতের কাজ ভুলে অবাক হ'য়ে শুন্‌ছে, গোপালের মা থাম্‌তেই, মঙ্গলা শিউরে উঠে বল্‌লে, "ভগবান!—ভগবান!—উঃ! এমন কি হয় দিদি, তুমি কার কাছে শুন্‌লে—"

আগ্রহভরা চোখদুটি গোপালের মা'র মুখের দিকে তুলেই মঙ্গলা ভয় পেয়ে ডাক্‌ল, "দিদি—দিদি—"

অনেক চেষ্টায় গোপালের মা আসন্ন মূর্চ্ছাকে সাম্‌লে নিয়ে কাতরকণ্ঠে উত্তর দিলে—"দিদি!"

"থাক্ আর গল্প বল্‌তে হবে না। এমন সব গল্প তুমি জান যা শুন্‌তে শুন্‌তে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে,—শুন্‌তেও কষ্ট হয় অথচ না শুনেও থাক্‌তে পারা যায় না।"

"আর কি শুন্‌বে দিদি! এ গল্প শুনে যার প্রাণ হাঁপায় না—সে প্রাণ কি মানুষের প্রাণ? তবু অলকা এমন পিশাচের দলে পড়েও বেঁচে ছিল, আর তাকে তারা বল কষ্ট এমন যন্ত্রণা নেই যে দেয়নি। শেষে সেখান থেকে সেই রাত্রে অন্য এক গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর একটা লোক অনেক টাকা ও অলকার স্বামী গহনাপত্র সব অন্য লোকগুলোকে দিয়ে অলকাকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে গেল। এতদিন অলকা ছিল বেড়া আগুনে, এবার পড়্‌ল কড়াইএর তেলে! এর মধ্যে একটা ভাল এই হ'ল যে, যে লোকটা নিয়ে এল তারই সে বাড়ীটা, সে নিজে কলকাতায় কাজ কর্‌ত। দিনে সে বাড়ী থাকৃত না, রাত্রে অলকা ঘরে দোর দিয়ে থাকৃত। দুপুরে দুটা ছাইভস্ম যা পেত তাই খেত,খেয়ে ছেলেকে নিয়ে ঘরে দোর দিত—ছেলেকে একটিবার কাছছাড়া কর্‌ত না। একটা ঝি রেখে দিয়েছিল, সেই ঝি সারাদিন কত বকুনি বকৃত, কত ছল করে' দুষমনের হাতে তাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ত তার ঠিক নেই। যেদিন সেই লোকটা বাড়ী থাকৃত না সকাল সকাল ফিরত সেদিন আর অলকা ঘর থেকে মোটেই বা'র হ'ত না; তাকে যা খেতে দিত সে তা না খেয়ে লুকিয়ে রাখ্‌ত তাই ছেলেকে খেতে দিত, নিজে উপবাসে জীর্ণ হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। ছেলে ক্ষুধায় ছটফট কর্‌লে তার বুকের রক্ত দিয়ে তাকে থামিয়ে রাখ্‌ত। দিনের পর দিন না খেয়ে খেয়ে তার দিন কাটৃত তবু অভাগীর প্রাণ যায়নি। এখন বল ত' দিদি এই অভাগীর কি হবে?—"

বিমূঢ়া মঙ্গলা বল্‌লে, "দিদি—একি তুমি! কেঁদ' না, সত্যি বল, তোমার স্বামীর নাম কি অরবিন্দ—তুমিই কি অলকা?"

"হ্যাঁ বোন্ এই অলক্ষীই অলকা।—আর সেদিন স্বামীর নাম বলিনি শুধু বিজ্ঞাপন দিতে বলেছিলাম এই জন্য যে সেদিনের ঘটনা শুন্‌লেই তিনি খোঁজ নিতে আস্‌বেন। কিন্তু

দিদি সেই ঘটনার পর ছ'মাস হ'তে চল্‌ল, তিনি যে কোথায় তার কোন খোঁজ জানি না। ভাব্‌ছি দেখে একটা টেলিগ্রাফ করে' দেখ্‌বো যে তিনি দেশে কি না—"

"হাঁ তাই ভাল, এত কথা তো তুমি বল'নি, জিজ্ঞাসা কর্‌তেও পারি না তুমি কি মনে কর্‌বে ভেবে।"

"বলিনি দিদি—কত কথা যে ভাবি তা ভগবান জানেন! আমার নিজের হাতে গলা কাট্‌তে বল্‌লে তাও পার্‌ব কিন্তু আমি নিজে যে নিষ্পাপ একথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পার্‌ব কি? আমার স্বামী আমায় কখনো অবিশ্বাস কর্‌বেন না—তাই তাঁর সাক্ষাতে সব বলার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সপ্তাহ তো ঘুরে গেছে, বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'চ্ছে, কই, কেউ তো খোঁজ নিলে না!"

গোপাল ঘুমিয়ে ছিল, উঠে ব'সে ডাক্‌ল, "মা—"

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে দুজনেই কাজে হাত দিল। গোপাল উঠে এসে রঙীন কাগজে আঠা মাখাতে বস্‌ল।

মঙ্গলা মৃদু গলায় বল্‌লে, "কাল সকালেই সব ঠিক করা যাবে, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না দিদি—"

মুক্তি-দেখা

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্‌-এ

এই যে লতা, রঙীন মুকুল
　　মাটির চেতন আনে,
সূর্য্যালোকে দ্বারের পাশে
　　উঠ্‌ল দুলে প্রাণে—
দেখ্‌ব কবে এই ছবিটি
　　ডুবিয়ে দিয়ে মোরে
বিশ্বরসের অতল দেখা
　　তার মাঝে রয় ভ'রে?
মধুর বেলা রইল একা
　　রূপ-রসে প্রাণ লীন,
দেখ্‌তে এরেই ফিরতে হবে
　　হয়তো বা একদিন?

কত কী যে হারিয়ে থাকি
　　হয়নি মিলন-দেখা,
মনের ছায়া মোরায় আঁখি
　　তাই তো কিরি একা।
রূপ নিল যা, রূপের লোকে
　　ডাক্‌ল আমায় কাছে
সেই বাঁধনে এড়িয়ে প্রেমের
　　মুক্তি কোথায় আছে?
জাগ্‌ব ব'লে সবার মাঝেই
　　আলোয় বাজে বীণ,
আনন্দলোক খুল্‌বে দুয়ার
　　সেই কবে একদিন॥

এবার পরিচয়ের ব্যথা
　　স্বপ্নে এসে লাগে,
বেলা-শেষে রঙ্‌ নিল আজ
　　মনের অনুরাগে।
হঠাৎ চেয়ে সীমা না পাই
　　পথের বাণী আসে—
এই তরুতল, অচিন্‌ ধূলি,
　　মনের বাসে ঘাসে!
মোর লতা আজ কী মূর্ত্তি তার
　　আলোক হবে ক্ষীণ—
দেখ্‌ব তারেই, ফির্‌ব আসি'
　　এইখানে একদিন॥

সম্পাদিকার জল্পনা

জল্পনা কাদের জন্য

বহুলক্ষীর জল্পনাগুলি প্রধানতঃ তাঁদের জন্য যে সব ভগিনীরা আমাদের মত অল্পশিক্ষিতা অথবা অশিক্ষিতা অথচ শিক্ষা কম বলে' দেশ, সমাজ, পরিবার সম্বন্ধে দায়িত্ব যাঁদের অন্য কারো অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়। যাঁরা ভাবেন অথচ ভালো করে' ভাবতে জানেন না—সন্তান পালন করেন অথচ গোড়া থেকে সুশিক্ষা দিয়ে সব দিকে সন্তানকে সামলে রাখতে জানেন না,—ঘরের মধ্যে পরিশ্রম করেন দিন-রাত অথচ অনভ্যাস বশতঃ বাইরে এসে কোন কাজে হাত লাগাতে পারেন না সংসারে, পরিবারে যাঁরা চির কল্যাণী অথচ সব রকম শিক্ষা ও সহজ স্বাধীনতার অভাবে অন্যের কল্যাণ-আয়োজনে নিজের পরিবারটিকে ঘিরে রাখতে জানেন না যাঁরা যথেষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রে বুদ্ধি খাটাতে না শেখায়- সেই সকল প্রিয়তমা ভগিনীদের হাতে তুলে দিতে চাইছি জল্পনার কথাগুলি ভালোবেসে। বিপদ্‌কালে কোন কথা ফেলা যায় না শুনি; তাই একথা-গুলিরও হয়ত কোন না কোন সুফল ফলতে পারে কারো না কারো কাছে এই দুঃসময়ে।

৫

দেশের আব্‌হাওয়া

আজকাল অনেক বাপ-মা'কে বলতে শোনা যায়, ঘরের ছেলে-মেয়েদের বাগ মানানো যায় না আদৌ; দেশের উত্তেজক আব্‌হাওয়ার মুখে তারা উড়ে চলছে দিন-রাত,—ঘূর্ণিপাকে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে; কোন একটি সুব্যবস্থার মধ্যে এনে তাদের স্থিতি করানো মহা দায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেশের মধ্যে। সন্তান নিয়ে সকলেই যেন আজ বিপন্ন!

দেশের হাওয়া যেদিকে বয় মানুষ সেদিকে চলবেই। সে চলার গতি রোধ করবে কে? সন্তানের বাপ-মা'রা উদাসীন না থেকে যদি সেই হাওয়ার মুখে নিজেরাও এসে দাঁড়ান ও তার অনুকূল-প্রতিকূল গতিবিধিগুলি নিজের চোখে স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করেন, তবে ঘরে এসে তাঁরা সন্তানকে সুবুদ্ধি সৎপরামর্শ দিয়ে যথাযথ ভাবে দেশের কাজে লাগাতে পারেন। মনুষ্যত্বের নূতনতর চেতনায় সমস্ত পৃথিবী আজ সচেতন হ'য়ে উঠেছে সব দিকে,—চাপ দিয়ে সে চেতনাকে কারো মধ্যে ঠেলে রাখা চলবে না আর ছেলে-বুড়ো-নির্ব্বিশেষে। বাপ-মা'রা তাই অনর্থক ছেলে-মেয়েদের চাপতে না গিয়ে দেশের ও দশের কাজ তুলে দিন তাদের হাতে যত পারেন। নিজেরাও সেই সঙ্গে নেবে পড়ুন দেশের সকল কাজে। ঘরে বাইরে সংস্কার সুরু করে' দিন দেশ-সমাজ পরিবারে। তবেই ছেলে-মেয়েদের ঘরে পাবেন বাইরে পাবেন,—দেশের কাজে দেখতে পাবেন নূতন ভাবে নূতন করে'। স্বাস্থ্যে গড়ে' তুলুন তাদের দেহ, শিক্ষায় গড়ে' তুলুন তাদের মন, শিল্পে ব্যবসায়ে সহায় হ'য়ে বাঁচিয়ে রাখুন তাদের দেশের ধন। বাপ-মা সঙ্গে থেকে কাজ করালে সামঞ্জস্য ছাড়িয়ে তারা যখন-তখন ছিটকে পড়বে না অপথে বিপথে। সুখী হবে সকল পরিবার সন্তানদের নিয়ে। দেশ ছেড়ে সুদশার আশা নিরাশা!

৬

অভিভাবকের দায়

পরিণত মন-বুদ্ধিতে ভালোমন্দ বিচার করে' যাঁরা কোন কাজে প্রবৃত্ত হন, তাঁদের কাজ সম্বন্ধে কারো বলার কিছু থাকে না। তাঁরা নিজের জ্ঞানে চলেন—মানুষ ও ভগবান উভয়ের কাছে নিজের কাজের নিজেই জবাবদিহি করতে পারেন স্পষ্ট করে'; অন্ততঃ সেরূপ আশা করা যায়। কিন্তু মন যখন কাঁচা, বুদ্ধি অস্থির, অভিজ্ঞতা অল্প, বয়সও খুব কম,—উত্তেজনার বশে নিজের স্বভাবের বিপরীত যে কোন কাজ করে' ফেলা যখন সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব, সেই বয়সের ছেলেমেয়েরা অভিভাবকের চোখ এড়িয়ে পারিবারিক প্রভাব থেকে ছিটকে পড়ে' বাইরের নানা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে জাতির গঠনকাজে অত্যন্ত বিঘ্ন

ঘটবে বলে' আমরা মনে করি। এ সম্বন্ধে আমরা অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

অভিভাবকের দায় বড় গুরু। শিশুকালে বাপ-মা সন্তানকে সকল আপদ থেকে সরিয়ে রাখেন—বালককালে দুর্নীতি থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেন। চরিত্রটি তাদের কতক পরিমাণে গড়ে' না ওঠা পর্য্যন্ত তাঁরাই তা'কি'কে কল্যাণবন্ধনে বেঁধে রেখে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে' তুল্‌বেন এটিই মঙ্গল—এটিই স্বাভাবিক। কথায় বলে—

"ছেলে হবে বাপের বেলবান বাহু,
মেয়ে হবে মায়ের প্রাণের রক্ত ;
সকল পরিবার মিলি' এক হবে—
গড়িবে জাতির বলিষ্ঠ শক্ত।"

এর পরে মানুষ অভিভাবকত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বাপ-মা নিজের চোখের সাম্‌নে তখন দেখ্‌বেন—ছেলে মেয়ে মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে

"সত্য বল্‌ছে সোজা চল্‌ছে,
কর্‌ছে নাকো কারেও ভয় ;
আপন কাজে আপ্‌নি স্বাধীন—
একে অন্যের বোঝা নয়।"

এই ফলে জাতি জয়যুক্ত হবে—অভিভাবক দায়মুক্ত হবেন। ...ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হবে জাতির জীবনে!

•

সাধারণের কথা

দেশের কথা আজকাল পথে ঘাটে মাঠে হাটে বাজারে ছড়ানো। রাস্তার দাঁড়িয়ে ভিস্তি ঝাড়ুদার দেশের কথা কয়। খরিদ্দারই দোকানদার কেনা-বেচার সময় দরদস্তুর করার আগে দেশের কথা কইছে, দেখা যায়। বুঝে' না-বুঝে', ভেবে না-ভেবে এসব কথা তারা আলোচনা কর্‌ছে, সকলেই শোনেন। এলোমেলো ছড়ানো কথা কুড়িয়ে নিজের মনে জোড় খাইয়ে অনেক সময় তারা একটা ভুল ধারণা করে' বসে—সেটা ভালো নয়। দেশহিতৈষী সমাজ-সংস্কারকের দল যদি মনোযোগ দেন ও দৃষ্টি রাখেন, এবং এ সম্বন্ধে তাদের একটা সত্য ধারণা দেবার ব্যবস্থা কর্‌তে পারেন, তবে সমাজের অনেকখানি কল্যাণ হয়, আমরা মনে করি। যেমন অবনত শ্রেণীর লোকদের নিয়ে উন্নত শ্রেণীর লোকরা কি ভাবে মেলামেশা কর্‌তে পারেন—তার রীতিপদ্ধতি কেমনতরটি হ'লে উভয় দলের মধ্যে পাপ যায় সে সম্বন্ধে সামাজিক গঠন সহযোগে যদি তাঁরা পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা দিয়ে তাদের একটা পরিষ্কার ধারণা দিতে পারেন - যাতে নিজেদের উন্নতি সম্বন্ধে আশা ও আনন্দের সঙ্গে তারা মনে বল পায়,—তবে জাতির পক্ষে অনেকখানি কল্যাণ হবে বলে' আমাদের বিশ্বাস।

শিক্ষা দিয়ে উন্নত করার চেষ্টা ত আছেই, কিন্তু এতে অসময়ে বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে সহজে একটা মোটা-মুটি উন্নতির ধারণা জন্মাতে পারে নিজেদের সম্বন্ধে। সমাজের পক্ষে এটা কম সুফল নয়। সমাজসেবকদেরও বিষয়ে আমরা মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌তে চাই।

•

পংক্তিভোজে রকমফের

এদেশে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে পংক্তি ভোজের চল ছিল না। বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে অনেকে সে সংস্কার এখন ছাড়িয়ে উঠ্‌ছেন এবং হিন্দুজাতিকে এজন্য সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বল্‌তেও কেউ ছাড়েন না। ভালই। কিন্তু ভেবে দেখেন যদি তাঁরা, আর এক ধরণের ভেদবৈষম্য ভোজন ব্যাপারে দেখা যায় না যে, তা নয়। ধনী-দরিদ্রে পংক্তি-ভোজে বসা সর্ব্বদা সকলে দেখেন কি? উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী নিম্নপদস্থের সঙ্গে একত্র সারি গেঁথে বসে' ভোজন করেন কি? এতেও মানুষে মানুষে কম ভেদ করা হয় না। দৈনিক ভোজে ও চলাফেরায় সকলে সমভাবে আহার বিহার সম্ভব না হ'লেও ক্রিয়াকর্ম্ম পালপার্ব্বণে,ছেলেমেয়ের বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবাদি ব্যাপারে এবং সাধারণ মেলামেশায় ধনী-দরিদ্র যদি একত্র বসে' পরস্পরায় ভুলে' এক পংক্তিতে ভোজন করেন, তবে জাতিগত ঐক্যের একটি গোড়াবাঁধা অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হয় দেশে, আমরা মনে করি।

ধনী-দরিদ্রেরা সুযুক্তি দেখিয়ে মেয়ে-মহলে এই ভেদ-বৈষম্য বিলুপ্ত করার চেষ্টা করুন,—নানা পথ দিয়ে মেলা-মেশায় দরিদ্র-গৃহিণীদের সমান আসন দিন্ নিজেদের সঙ্গে—বৎসরের মধ্যে যতবার পারেন পংক্তিভোজে বসুন তাদের নিয়ে। ধনী-দরিদ্রে ব্যবহার-ব্যবধান কম অনিষ্টকর নয় জাতির পক্ষে।

•

জাতির উৎকৃষ্ট নমুনা

নরনারীর সমান অধিকার নিয়ে আজকাল কথা উঠেছে দেশের মধ্যে। বিষয়টি আন্দোলিত হ'চ্ছে চারদিকে, শোনা যায়। 'সমান অধিকার' না বলে' যদি 'নিজের অধিকার' বলা যায় তা হ'লে কথার ভাবটি বোধ হয় আরো বেশী পরিষ্কার হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। দুটি মানুষের চেহারা যখন অবিকল এক নয়—মা-মেয়েতেও নয়, বাপ-ছেলেতেও নয়, ভাই বোনেও নয়, তখন পুরুষ-নারী এই দুই জাতীয় মানুষের মধ্যে দেহে, মনে ও স্বভাবে অবিকল একতা সম্ভবপর কি করে'? কিছু না কিছু প্রভেদ আছেই, সকলেই দেখ্‌তে পাচ্ছেন। পুরুষ-নারী উভয়েই মানুষ বটে—কিন্তু দুই জাতীয় মানুষ। উভয়ের শারীরিক সৌন্দর্য্য যেমন দুই ধরণের, মানসিক সৌন্দর্য্যও তেমনি প্রভেদ থাকা সম্ভব—হয় তো বা উভয়ের কাজও কিছু বিভিন্ন। সমস্ত স্বভাবটি ফুটে উঠ্‌তে পেলে প্রত্যেকের বিশেষত্বটি সহজে ধরা পড়্‌তে পারে ভালো করে' দলের মাঝে। পাখী যখন তার রঙীন পাখা মেলে দুষ্টপুষ্ট চিকণ দেহটি নিয়ে দূরের আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশপথে উড়ে চলে, তখন সে তার উৎকৃষ্ট রূপটি নিজে দাঙ করে ও অপরকে দেখায়। আবার সে যদি অনাহারে জীর্ণশীর্ণ ও রুক্ষ-কাপটে মূর্চ্ছিত হ'য়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে, তবে তার সে দুঃখ পৃথিবী সইতে পারে কি?—নিজে ত তখন সে চেতনহারা। পাখী-জাতের উৎকৃষ্ট নমুনা যেমন ওড়া-পাখী, মাটিতে-পড়া পাখী নয়, পুরুষ-নারী উভয়ে সমানভাবে সুশিক্ষা ও স্বাধীনতা পেলে তেমনি এ দুই জাতের মধ্যে এমন অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নমুনার নরনারী দেখা যাবে যারা ফুটিয়ে তুল্‌তে পারবে দুই জাতের বৈশিষ্ট্য সবার সামনে স্পষ্ট করে'। অতএব দুই তরফের সম্বন্ধে মনগড়া কোন বিশেষত্ব খাড়া কর্‌তে গিয়ে বৃথা কথা না বাড়িয়ে উভয় জাতিকে সুশিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া গোক্ সুচারু রূপে; পরে 'ফলেন পরিচীয়তে।'

জাতির ভগবান

সকলে বলেন, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি,—তাঁদের পূজার জন্য হিন্দুসমাজটি কোটি সম্প্রদায়ে ভাগ করা। এক কর্‌বে তাঁদের কোন্ পথ দিয়ে? কথা সত্য; কিন্তু সব দেবতা মিলে' এক ভগবান—এটি হিন্দুদেরই কথা, যদিও দেবতাবহুলতার গোড়ার কথাটি চাপা পড়ে' যায় অনেক জায়গায় ব্যবহারের সময়। বিপদে পড়্‌লে মানুষ গোড়ার কথাটার খোঁজ করে বেশী করে'। আজকাল বিপদে পড়ে' গীতার ভগবানকে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুরাই জাতির ভগবান বলে' ভাব্‌তে ও মান্‌তে সুরু করেছেন। এটি সৌভাগ্যের কথা। এক ভগবানে জাতির মিলন অনেক পরিমাণে সম্ভব।

কয়েকটি আলোচনা

শ্রী মনোজ বসু

শিউড়ী মেলা ও পল্লীসম্পদ

পশ্চিম বাংলার উল্লেখযোগ্য যত মেলা আছে শিউড়ী মেলা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। বহুকাল হইতে বছর বছর এই মেলা হইয়া আসিতেছে। প্রথমে সামান্য পশু-প্রদর্শনী হইত, এখন সেখানে দেশের কৃষি ও শিল্পজাত প্রায় সমস্তরকম জিনিষ দেখানো হইয়া থাকে।

কিন্তু এসব ছাড়া আর একটি বিশিষ্ট কারণ আছে যে-জন্য শিউড়ী মেলা আজ দু'বছর সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলার এখানে-সেখানে যে সব অপরূপ নৃত্য-গীত অবজ্ঞাত হইয়া দিন দিন নষ্ট হইয়া যাইতেছিল তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া এই মেলায় অজস্র অর্থব্যয়ে অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। এই মহৎ প্রচেষ্টার গৌরব মেলা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের।

গত বৎসর ময়মনসিংহ হইতে আরীর দল আসিয়াছিল। দত্ত মহাশয়ের অবিস্মৃত 'রাইবিশে'রাও ঐ সময়ে সর্বপ্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে বীরনৃত্য দেখাইয়া সকলের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জানাইয়াছিল। এবছরের অনুষ্ঠানেও সেই ময়মনসিংহের আরী ও স্থানীয় রাইবিশে, কাঠিনাচ আছে। এবার নূতন আসিয়াছে ঝুমুর নাচ, বাঁকুড়া জেলার ঝাঁপি-কীর্তন, বর্ধমানের রমণী দাসীর বাউল এবং ফরিদপুর হইতে অপূর্ব অবতার-নৃত্য।

দেখিতে দেখিতে মনে হইল যেন পূর্ববঙ্গে উত্তরবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে—যেখানে যত হাসি ও আনন্দ ছিল সব যেন হাত ধরাধরি করিয়া ঐ মাঠটুকুর উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পল্লীকে আমি ভালবাসি, তাহার আনন্দ ও শ্রী আমার অন্তর স্পর্শ করে এ কথা বারম্বার মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া পল্লীপ্রীতির পরিচয় দেওয়া কঠিন কথা নয়। কিন্তু নাগরিক সভ্যতা হইতে বহুদূরে নিভৃত গ্রামের কোণে ক্রম-বিলীয়মান পল্লীসম্পদগুলির গত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে সত্য সত্যই আবার দশজনের সামনে তুলিয়া ধরিতে যে কত স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, কত শ্রম অর্থ ও আত্মপ্রত্যয়ের দরকার হয় বাহির হইতে তাহার ধারণা করা যায় না। গুরুসদয় বাবুকে কেবল মাত্র মুখের কথায় ভাল বলিলেই দেশের লোকের কর্তব্য শেষ হইয়া যাইবে না।

মেলাক্ষেত্রে পৌঁছিবা মাত্র যে রকম অবাক হইয়া গিয়াছিলাম এখনও তাহা মনে পড়িতেছে। সন্দেহ হইল, স্বপ্ন দেখিতেছি না ত? সে সময় পল্লীসম্পদ সমিতি নিখিল বঙ্গের শিক্ষক-ছাত্রের জন্য ক্যাম্প খুলিয়াছিলেন। বিভিন্ন জেলা হইতে মাষ্টার মহাশয়েরা আসিয়া ছাত্রদের সঙ্গে রাইবিশে, আরী ও অন্যান্য পল্লীর নাচগান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে আকাশ কাঁপাইয়া জয়োল্লাস উঠিতেছিল—আব্‌ব্‌ব্‌ ইয়া—আব্‌ব্‌ব্‌ ইয়া—। পঞ্চাশের ওপারে গিয়া যে সব শিক্ষকের সভ্যতব্য ও নিরীহ গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইবার কথা, দেখিলাম খালিপায়ে আনন্দ-ভরে তাঁহারাও নাচিতেছেন। নাচ-গান শিখাইতেছে অশিক্ষিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর কয়েকজন। ইহাদিগকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়া ইহাদের নির্দেশ অনুসারে চলিতে ভদ্র-সন্তানদের কিছুমাত্র বাধিতেছে না। গ্রাজুয়েটের কাঁধে ঢোল উঠিয়াছে। আবার রোগটা এই রকম সংক্রামক যে একটু পরে দেখি, ডিরেক্টর সাহেব (Director of Physical Instruction) টুপি ফেলিয়া গলায় ঢোল বাঁধিয়া বাজাইতে সুরু করিলেন। দুঃখদৈন্যপীড়িত বাংলার কুটীরে কুটীরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগোচরে এত আনন্দ লুকানো ছিল, আগে কে তাহার সন্ধান জানিত?

অপূর্ব্ব পালাগান ও তাহার অভিনয়

পালাটির নাম ওমর খৈয়াম। তৈয়ারী করিয়াছেন, বঙ্গলক্ষ্মী সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী।

১৬ই ফাল্গুনী সন্ধ্যায় সংবাদনলিনী সমিতির গৃহে ঐ সমিতির সাহায্যের জন্য উহা প্রথম অভিনীত হয়।

গোড়ায় ভাবিয়াছিলাম, কবি ও জ্যোতির্বিদ ওমরের জীবন লইয়া নাটিকা লেখা। ভাবিবার কারণ আছে। কিম্বদন্তী ওমরের জীবনকাহিনীতে বিস্তর নাটকীয় উপাদান ঢুকাইয়াছে। বারান্তে পেও তাহার ছবি উঠিয়াছে।

পরে দেখিলাম অদ্ভুত ব্যাপার! এরূপ বৈচিত্র্য কেমন করিয়া বুঝিব?

গল্প লইয়া পালা বাঁধা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। গল্পকে বাদ দিলাও যে নিছক দার্শনিক তত্ত্বকে মনোরম করিয়া অভিনয় করা চলে বড়-মা * যোগকরি তাহা প্রথম দেখাইলেন। ওমর খৈয়ামে একেবারেই কোন প্লট নাই। কবির ভাব-মুকুলের প্রথম উন্মেষ হইতে সুরু করিয়া শেষ পরিণত অবধি বিচিত্র মালায় গ্রথিত করা হইয়াছে।

দৃশ্যপটের এমন কিছু আড়ম্বর নাই। প্রতি দৃশ্যের আরম্ভে নিঃসীম শান্তি—সাকি এবং পারিপার্শ্বিকতা—অকস্মাৎ আমাদিগকে অতীতের এক গম্ভীর সুন্দর লোকে পৌঁছাইয়া দেয়। তারপর কবি দেখা দেন, একটি করিয়া রোবাইয়াৎ আবৃত্তি করেন; তাঁর পিছনে এক ভাব-মূর্ত্তি অনভিস্ফুট চিন্তাধারাকে নৃত্যগীতে লীলায়িত ও পরিস্রাবিত করিয়া দিয়া যান।

মোট আটটি রোবাইয়াৎ ও আটটি দৃশ্য। গ্রন্থনের বিচিত্র কৌশলে ঐ স্বল্প পরিসরের মধ্যে ওমরের দার্শনিকতার প্রায় সমগ্র রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দার্শনিকতা জিনিষটাকে আমরা ইতরসাধারণ সাধারণতঃ সযত্নে পাশ কাটাইয়া চলি। বড়-মা ইহাকে লইয়া নাটক গাঁথিয়াছেন। নাট্যরীতির সনাতন পাঁচিলের মধ্যে যেন একটু নূতন আলো ঢুকিল। বড়-মার হাতে পড়িয়া দার্শনিকতাও শেষকালে তার গম্ভীর নুখোস ছাড়িয়া তরুণ মনের উপর বসিয়া গুঞ্জন সুরু করিল। আমরা বড়-মাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

অভিনয়কালে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়া যিনি ওমরের ভাবমাধুর্য্য রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য। ওমরের বেশে যে মহিলাটি অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহার অনুভূতিরও প্রশংসা করিতে হইবে। ইঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি।

* শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী—যাহারা ইঁহার সংস্পর্শে আসেন অবশ্যম্ভাবরূপে ইঁহার সন্তান হইয়া যান।

অনুভূতি

শ্রী সংজ্ঞা দেবী

যদিও দিয়াছ নাথ মোর ভাগ্য সনে
বাসনা-উদ্রেককারী বহু কাম্য ধনে,
রাখনি গো তবু মোহ-অন্ধকারে ঘিরে,
পেয়েছি পরশ তব হৃদয়-গভীরে।
মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ে লুকায়েছ প্রভু,
দেখেছ আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগে কিনা কভু।
অপেক্ষের তরে দেব ছন্দ উলসিয়া,
গাঢ়তর বিষাদে যে দিয়াছ ফেলিয়া;
তখনি তো অনুভব পাইয়াছি দেখা
সকল তরঙ্গ—তার আদিভূমি রেখা।
বিশ্বে যে আনন্দরূপ উঠিছে বিকাশি,
মানব-হৃদয়ে যাহা প্রকাশে উচ্ছ্বাসি,
সবার আদিতে সেই মূল উৎস যিনি,
অক্ষয় অব্যয়রূপ পরমাত্মা তিনি।
বুঝিতে না পারি আমি মূল-ভূমি তাঁর,—
সুখ-দুঃখ-বিমিশ্রিত ছায়া করি সার।

নারী-প্রতিভা

(পূর্ণাবয়বি)

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

করমেতি বাই

জীবন-যুদ্ধে করমেতি বাই'র সাধনা যে ভাবে অনুযুক্ত হইয়াছে, সকলের পক্ষে সে সাধনা প্রিয়তর হইবে ইহা বলা যায় না। মানুষের জীবন পূর্ণতম নহে; সেজন্য ভুল চুক আছে। সকলের প্রতিভাও একই শুরুকে অনুসরণ করে না। করমেতি বাই'র প্রতিভার পথ সকল নারী গ্রহণ করিবেন না, ইহাও সত্য। তবে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভার দৃঢ়তা যে ভাবে তিনি রক্ষা করিয়াছেন, করমেতি বাই'র শুধু সেই দিকটা, আমরা যে কোন সাধনায় সাধক হই না কেন, গ্রহণ করিতে পারি। তিনি আধুনিক নহেন, বাঙ্গালীও নহেন; দাক্ষিণাত্যের কন্যা তিনি। দেশ-কাল-ভেদে মানুষের চরিত্রেরও ভেদ হইয়া থাকে। আধুনিক বাঙ্গালী মহিলারা তাঁহার সাধনার দিকটা ঠিক কিভাবে দেখিবেন বলিতে পারি না। অনুমান করি, তাঁহার নিজের দেশের আধুনিকারাও তাহা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে না পারেন। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, এক শ্রেণীর উচ্চ মানসিক গুণসম্পন্না মহিলারা তাঁহার মনের স্বাধীনতা-টুকু গ্রহণ করিবেন। করমেতি ধনীর কন্যাও নহেন, ধনীও নহেন, তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কন্যা মাত্র। অন্যান্য অনেকের মত তিনিও বাল্যকালে পিতার নিকট শিক্ষা করিয়া বিদুষী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব নহে। বিবাহের উপযুক্ত কালে তিনি পিতার নিকটে বিবাহাবদ্ধ হইতে রাজী হন নাই। ইহা তাঁহার জীবনের তৎকালোচিত বিশেষত্ব। পিতার অনুরোধে এই বিশেষত্বকে তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহা করমেতির জীবনযুদ্ধের নৈতিক দিকের বিষম ভুল। এই ভুল ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন ভুল অযোধের চক্ষে পড়ে না। কৃষ্ণ-প্রেমের সাধনার পথে বিবাহ করা তাঁহার বিরুদ্ধ; ইহাই ধারণা ছিল। অনেকে বলিবেন, করমেতির ইহা ভুল। হইতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিলে প্রত্যেক মানুষের চিন্তার একটা স্বাধীনতা থাকিতে পারে। গতানুগতিক প্রবাহে জীবনতরী যাঁহারা ভাসান নাই, প্রায়ই তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহ করা যদি কৃষ্ণ-প্রেমের অন্তরায় হয়, আর তাহাই যদি তিনি মনে প্রাণে বুঝিয়া থাকেন, তাহাতে করমেতির কি ভুল আছে? করমেতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁহার পিতার অনুরোধে যদি বিবাহ হইয়া থাকে, আর করমেতির স্বামী যদি ইহা জানিয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিয়া থাকেন, আর সেই বিবাহ যদি অশান্তির হয়, তাহাতে করমেতির দোষ কতটুকু? শুধু কেবল এই সমস্যাটির মীমাংসার জন্য আমি পাঠিকাদের নিকট সাগ্রহ প্রার্থনা করি।

করমেতির বিবাহ সুখের হয় নাই। স্বামীকে অত্যন্ত বিষয়পরায়ণ দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে করমেতির প্রীতিবোধ হয় নাই। জীবনের এই মহা সমস্যায় যে সব মানুষ পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে জীবনের কোন একদিক হারাইতে হইয়াছে। যাঁহারা বলেন 'যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাই বিধিলিপি, তাহাই ঈশ্বরের দান, তাহাই হাসি-মুখে সুখের হউক, দুঃখের হউক গ্রহণ করিতে হইবে' (বিশেষতঃ বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণার মূলে একটা মস্ত নৈতিক যুক্তিও তাঁহাদের আছে; এই যুক্তিও অতি শ্রদ্ধেয় কিন্তু নির্ভুল নহে), তাঁহাদিগকে এই প্রবল নৈতিক যুক্তির আশ্রয় লইয়া জীবনে যাহা তাঁহাদের একদিন শ্রেয় ও প্রেয় ছিল তাহাও বাধ্য হইয়া ভুলিতে হয়। এই যে মনের বিরুদ্ধ ভাবধারার সহিত তাঁহাদের আজীবন সংগ্রাম করিতে হয়, হয়ত বা অনেকে জয়ীও হইয়া থাকেন, কিন্তু

জীবনের অন্যদিকে যাহা তাঁহাদের লোকসান হয় তাহার খতিয়ান হয়ত আর তৈরী হইবারই উঠে না। ইহা গেল এক দিকে। অন্য দিকে, যাহা কাহারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিয়াছে, তাহা যদি কেহ মানিতে রাজী না হন, যদি তিনি মনে করেন, আমার স্বাধীন চিন্তা আছে, স্বাধীন ইচ্ছা আছে, ইহা প্রকৃতির দান, ইহার অপব্যবহার পাপ; তিনি যে ভ্রান্ত ইহার সম্বন্ধে কি যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ নির্ভুল নহে। একজন যাহা ভুল মনে করেন, অনেকে তাহা করেন না, আবার অন্যে যাহা ভুল বলিয়া মনে করেন না অনেকে তাহা করেন। সত্যের এই সমাধান মহাপুরুষ বা মহানারীদের কাছে সাধ্য হইলেও জগতে ইহা লইয়া চিরদিন গোল চলিয়াছে ও চলিবে। সর্ব্বসম্মত সমাধান সম্ভব নহে। মানুষের জীবন হেলনার বস্তু নহে, তাহা লইয়া ঠাট্টা-তামাসা চলে না, খানখেয়ালী চলে না। আমার যাহা ভাল লাগে অপরের তাহা লাগিবে ইহার কোন মানে নাই। সুক্ষ্মদর্শীরা সমস্ত জিনিষের মধ্য হইতেই একটা মহাসত্যের সন্ধান পান বলা কখনও বিকৃত হয় না। যাহা হউক, কয়মেতি পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয়-যুক্তিবাদিনী ছিলেন। তিনি স্বামীর সহকারিণী হওয়া তাঁহার স্বাধীন চিন্তার তোড়াতালি দিয়া কাজ করিতে রাজী হন নাই, বা নৈতিক যুক্তিও স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রকৃতির দানই মানিয়া লইতে রাজী। কাজেই কয়মেতি পিতৃগৃহেই রহিয়া গেলেন। এই জীবনদ্বন্দ্বে কয়মেতির যেটুকু প্রতিভার পরিচয় আমরা পাই, তাহার দৃঢ়ত্ব আমরা মোড় ফিরাইয়া যে কোন কার্য্যে লাগাইতে পারি।

কয়মেতি পিতৃগৃহে থাকিয়া দিনরাত কৃষ্ণ-চিন্তা করিতেন। তিনি শুনিয়াছিলেন বৃন্দাবনে বসিয়া কৃষ্ণ সাধনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু তখন আজকালের ন্যায় কয়েকটি টাকার বিনিময়ে বৃন্দাবন দর্শন করার উপায় ছিল না। পিতার নিকট উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলে তাহা সিদ্ধ ত হইবেই না, বরঞ্চ পিতা কৌশলে বাধা দিবেন। কয়মেতির পিতা পরশুরাম পণ্ডিত সেই দেশের অনেক রাজার পুরোহিত ছিলেন। কাজেই পণ্ডিতজী দরিদ্র হইয়াও রাজ-পুরোহিতের নির্দ্দিষ্ট দ্বিতল বাড়ীতে বাস করিতেন। রাজা ও কয়মেতির পিতা ইঁহারা উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কয়মেতি সময় সময় পাগলের ন্যায় ভাব করিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেন। পিতা কন্যাকে অতি ভালবাসিতেন এবং সাবধানেও রাখিতেন খুব। একদিন রাত্রে কয়মেতির বৃন্দাবন যাওয়ার প্রবল বাসনা হওয়ায় নিদ্রা হইতে উঠিয়া দরজা খুলিতে না পারিয়া ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে ধাবমান হন। দক্ষিণদেশ হইতে পায়ে হাঁটিয়া একটি যুবতী মেয়ের বৃন্দাবন যাওয়া অতিশয় কঠিন কার্য্য, দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠা বলা যাইতে পারে। কয়মেতির ভীষণ প্রতিজ্ঞা ও মনের দৃঢ়তা এই ভয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নাই। কয়মেতি মনের আবেগে ও অন্তরের প্রেরণায় ভয়, মান অপমান তুচ্ছ করিয়াছিলেন। (আমার জানা কোন একটি মহিলা তাঁহার পিতৃভবন হইতে যথা-সময়ে গাড়ী না পাওয়ায় তাঁহার স্বামীর রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইতে না পারায় যথেষ্ট মানসিক ও আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সাহস করিয়া পায়ে হাঁটিয়া গেলে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিতেন। যদি তিনি কয়মেতির বাই'র বা সেইরূপ অন্যান্যের জীবন-চরিত জানিতেন, হয়ত ভয় ও লজ্জা তাঁহার এই চিরদুঃখের কারণ হইয়া থাকিত না।) প্রভাতে পরশুরাম পণ্ডিত কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। রাজাকে বলিলে রাজা আশ্বাস দিয়া চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। কয়মেতি যখন একটা প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ বহু-দূরে লোকের অনুসরণ বুঝিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী একটি মৃত ও পশ্বাদির দ্বারা অর্দ্ধভুক্ত গলিত উষ্ট্রদেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কয়মেতির অনুমান সত্য, তাঁহার অন্বেষণকারীরা মৃত উষ্ট্র অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া গেলে, কয়মেতি গলিত উষ্ট্র হইতে বহির্গত হইয়া দূরে এক জলাশয়ে নিজ দেহ ধৌত করিয়া পুনরায় বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইভাবে তিনি বহুকষ্টে বৃন্দাবন পৌঁছিয়াছিলেন।

সংকল্পের সাধনা কয়মেতির রক্তে আগুন লাগাইয়া না দিলে তিনি কখনই এইভাবে এ কার্য্য করিতে পারিতেন না। কয়মেতির এই দৃঢ় সঙ্কল্প অনেক কর্ম্মে লাগাইয়া আমাদের উদ্দেশ্য আমরা সিদ্ধ করিতে পারি। কয়মেতি কৃষ্ণ পাবার উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া

সকলেই যে কৃষ্ণ পাবার জন্ত এইরূপ কার্য্য করিবেন তাহার কোন মানে নাই। আমাদের জীবনের নানা বিভাগে আমরা এইরূপ সাহস এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষাপ্রদর্শন করিতে পারি। যুগে যুগে যে সকল মহামানব জগতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পদচিহ্নে এই মর্ত্ত্যধাম পবিত্র করেন, আমরা শুধু তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিলে এই মানব-জন্ম সফল করিতে পারি। এই পৃথিবী দুঃখের স্থান নহে। যা বন্ধীজনের অপূর্ণতাই আমাদের দুঃখকে নূতন নূতন ভাবে সৃষ্টি করে। তাই আমরা এই জীবনকে ভার বোধ করি। চৈনিক ধর্ম্মনেতা মহাত্মা কনফুচি বলেন যে, মানুষের একটি পরিপূর্ণ অবস্থাকে তিনি ঈশ্বর অপেক্ষাও প্রিয় বোধ করেন। করমেতির পিতা যখন দেশের পর দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কন্যাকে বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে দেখিতে পান, কন্যার অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তি মিশ্রিত মুখের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তিনি কন্যার কথা ভুলিয়া গিয়া দেবী-বোধে প্রণাম করেন। কন্যাকে গৃহে নিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। করমেতির পিতার মুখে রাজা সমস্ত শুনিয়া তিনিও দাক্ষিণাত্য হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়া এই অসাধারণ ভক্তিমতী রমণীকে দর্শন করেন। রাজা অনেক অনুরোধ করিয়া করমেতিকে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বৃন্দাবন ব্রহ্মকুণ্ডে আজও সেই লুপ্ত স্মৃতির কিছু বিদ্যমান আছে।

আনন্দীবাই জোষী

যে সকল মেয়েদের, যে কোন কারণেই হউক, অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছে, তাঁহারা আনন্দীবাই'র জীবনচরিত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে, বাল্য-বিবাহের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াও তিনি তাহার কু-ফলের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহের অন্যান্য ফলাফলের কথা না ধরিয়াও একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, শিক্ষায় তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা প্রায় অধিকাংশ স্থানেই ঘটে। আনন্দীবাই'র ৯ বৎসরে বিবাহ হইলেও স্বামীকে কলিকাতায় রাখিয়া ১৭ বৎসর বয়সে তিনি (১৮৮৩ খৃঃ) ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। আনন্দীবাই গণপৎরাও জোষীর কন্যা। গণপৎরাও বোম্বাই প্রদেশের 'কল্যাণ' নগরের অধিবাসী। বাল্যকালে তিনি কন্যাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়াছিলেন। আনন্দীবাই'র স্বামী গোপাল বিনায়ক জোষী স্ত্রীর শিক্ষার জন্ত সর্ব্বপ্রকার কু-সংস্কার বর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্ত্রীকে শিক্ষার জন্ত বিদেশে পাঠাইয়া, তিনি ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে গোপন করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। আনন্দীবাইকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন ৩ বৎসর পরে, যখন আনন্দীবাই ফিলাডেল্‌ফিয়ার চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, ডাক্তার উপাধির একটি মূল্যবান্ প্রমাণপত্র করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি বিদেশ হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া আসিয়া কোলাপুরের এড্‌ওয়ার্ড হাসপাতালে চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন।

দশের সেবা দ্বারা ও আর্ত্তের সুখদুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ ভাবিয়া এই মৃত্যুশীল জগতে যাঁহারা ধন্যা হইয়াছিলেন আনন্দীবাই তাঁহাদের একজন। জগতে সকলের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। আনন্দীবাই'রও তাহা হয় নাই। তিনি যে ভালবাসা নিয়া কোলাপুর হাসপাতালে মেয়েদের সেবা করিবার জন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই ভালবাসার আশা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। ২১ বৎসর বয়সে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলা যেমন কবি তরু দত্তকে অকালে হারাইয়া তাঁহার তপ্ত স্মৃতিতে কতকগুলি তরুণতরুণীকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, ঠিক সেইমত কোলাপুরের সেই ক্ষীণ শেষ আলোটুকুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানাইয়াছিলাম একটা নির্ব্বাক্ অভিনন্দন—একটা রক্তাঞ্জলি।

(ক্রমশঃ)

পাথেয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শুক্রবারে নবগোপাল চাটুয্যের আসিয়া শক্তিকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবার কথা ছিল, বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে নবগোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

নবগোপালকে দেখিয়া ভবতারা বলিল, "কি রে নবো, তুই আজ এলি, চাটুয্যেমশাই কাল আস্‌বেন ত ?"

নবগোপাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আসবেন না। তোমার চাটুয্যে মশাই পেছিয়েছেন।"

ভবতারা বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "পেছিয়েছেন ? কেন, পেছোবার এতে কি আছে তার ?"

নবগোপাল মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "কি যে বল মাসিমা, ওই খিরিষ্টান্ মেয়ে নিয়ে কি আমাদের মত গেরোস্তো মানুষের ঘর করা চলে ?"

নবগোপালের কথায় ভবতারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "খিরিষ্টান্ কি রকম ? বামুনের মেয়ে, আচার-নিয়ম মেনে চলে, আমার দেওর-ঝি, সে হোলো খিরিষ্টান্ !"

নবগোপালের বেশ মনে আছে কতদিন শক্তি ও তাহার মাতার আচরণকে ভবতারা 'খিরিষ্টানি চাল' বলিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াছে ; সে আশা করিয়াছিল শক্তির বিষয়ে সেই আপত্তি তুলিলে ভবতারা হয়ত আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিবে না ; কিন্তু এখন ভবতারাকে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতে শুনিয়া সে ও বুঝিল যে ইহা স্বার্থের সেই বাঁধা প্রয়োজন হইলে যাহা উত্তরকে দক্ষিণ বলিতেও দ্বিধা বোধ করেনা। একটু কুণ্ঠিত ভাবে সে বলিল, "খিরিষ্টান বল্‌ছি ব'লে কি সত্যিই খিরিষ্টান ? তা নয় ; তবে ও মেয়ে আমাদের বাড়ি গিয়ে যখন ইংরিজিতে গ্যাট্‌ ম্যাট্‌ করবে তখন, আমার কথা ছেড়েই দাও, তোমার চাটুয্যে মশাই-ই ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না-কি ? এক সঙ্গে ঘর করছি, তোমার চাটুয্যে মশায়ের বিদ্যে জানতে আমার বাকি নেই। ঠিক বিয়ে আর সই মেয়ে চাকরী ক'রে এসেছেন, ইংরিজিতে একখানা বড় চিঠি এলে চক্ষু চড়ক গাছ হয় !"

অন্য সময় হইলে পিতৃ-প্রকার এমন চমৎকার নমুনা দেখিয়া ভবতারা নিশ্চয়ই পুলকিত হইত, কিন্তু এখন তাহার মানসিক অবস্থা ঠিক হইয়া রহিয়াছে ; বিরক্তিভরে বলিল, "রাখো তোমার ইংরিজিপনা নবো ! ও আমাদের বাড়িতে ইংরিজিতে কত গ্যাট্‌ম্যাট্‌ করছে শুনি ? যখন বই পড়ে তখনো ঘাড়টি গুঁজে মনে-মনে পড়ে,—ইংরিজি পড়ছে, না বাঙলা পড়ছে তা বোঝাই যায় না, তা বলে কি-না গ্যাট্‌ম্যাট্‌ করবে !"

এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নবগোপাল বলিল, "তুমি জানোনা মাসিমা, দুষ্ট ঘোড়া আস্তাবলে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু গাড়িতে জুতলেই লাথ মারে। ও তোমার ভয়ে এখানে চুপ ক'রে আছে, আমাদের বাড়ি গিয়ে ঠিক মূর্ত্তি ধরবে।"

ঠিক যখা সময়ে গিরিবালার কঠিন অসুখ হইয়া শক্তির বিবাহ চক্রান্তে একটা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় গিরিবালার মনটা এমনিই বিগড়িয়া ছিল, তাহার উপর নবগোপালের অনিচ্ছা ও আপত্তির কথা শুনিয়া সে আর মনের ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না ; অপ্রসন্ন মুখের মধ্যে একটা কঠিন ভাব আনিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "কেউ কারু কিছু ক'রে দিতে পারে না রে নবো, সবই অদৃষ্টে করে। নইলে তোর পক্ষে ত রাজকন্যে আর অর্দ্ধেক রাজত্বই হচ্ছিল, তোদের হঠাৎ এমন দুর্ম্মতিই বা হবে কেন ? স্বয়ং মহাদেবই পারেন নি, মোহরের থলির কাছাকাছি এসে সখ ক'রে কানা হয়ে এড়িয়ে চ'লে গেল,—তা আমি তো কোন্ ছার !"

কাহিনীটা নবগোপালের জানা ছিল না, তাই আংশিক উল্লেখে ঠিক মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল, "কানা

খোঁড়ার কথা জানিনে মাসি, কিন্তু ও যা বলেছ, লাক কথার এক কথা! অদেষ্টে না থাকলে কিছুতেই কিছু হবার যে নেই।"

নবগোপালের সহিত কোনো বিষয়েই মতের ঐক্য বরদাস্ত করিবার মত তখন ভবতারার মনের অবস্থা নয়,—ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "অদেষ্টে আবার কি! আমি চতুর্দ্দিক আট-ঘাট বেঁধে সমস্ত ঠিক করলাম, তোরা ইচ্ছে ক'রে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি তার অদেষ্টে?"

নবগোপালের একবার মনে হইল বলে, লক্ষ্মী যদি স্বয়ম্বরা হইয়া পূর্ব্বাহ্নেই আপনার নারায়ণ আপনি নির্ব্বাচিত করিয়া রাখেন ত' তাহার পক্ষে অদৃষ্টই শুধু নয়, দুরদৃষ্ট। কিন্তু শক্তির নিকট তাহার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়া সে কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। যে দুঃখ তীক্ষ্ণ কাঁটার মত এখনো তাহার মনের মধ্যে বিঁধিয়া আছে তাহাকে এমন অবলীলার সহিত অস্বীকার করিবার অভিনয়ের দুঃখে তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ভবতারা গজর গজর করিয়া বলিতে লাগিল, "ছোলো ন', ভালই হয়েছে। ওর যা তো শুনছে—বরণ বাচন যা হয় একটা কিছু হ'য়ে যাক, তারপর রূপে-গুণে অমন ছেলের আবার ভাবনা! কত পাশ-করা ছেলে লুপে নিয়ে যেতে চাইবে। মাত্র হাতে টাকাটাই কি কম?—এক একটা গয়না ভারী কত—"

গিরিবালার গয়নার ওজনের পরিমাণের বিষয়ে নবগোপালের মনে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না,—জমিদারীই যখন দখলে আসিল না তখন জমিদারীর অন্তর্গত জমি-জমার সংবাদে জানিয়া লাভ কি? ভবতারাকে গিরিবালার গয়নার বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিতে না দিয়া সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "গিরিবালার বরণ বাচন কি মাসি মা? অসুখ না কি তাঁর?"

"রাত কাটে তো দিন কাটে না এমনি অবস্থা, তা বলে কি—না অসুখ!"

"কি হয়েছে তাঁর?"

"সে তুই ইচ্ছে হয় কবরেজকে জিজ্ঞেস করিস্ আমি অত কথা জানিনে—আমি শুধু জানি সে মরতে বসেছে।"

নবগোপাল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "বেশ দেখি মাসি মা, এই সব কাণ্ডকারখানার মধ্যে তুমি বাবাকে আনাচ্ছিলে আশীর্ব্বাদ করাবার জন্যে! সে কি বিছুছিরী দেখতে হোত!"

ভবতারা বলিল, "সে আমার বেওরা-টি, আমি বুঝতুম। মেয়ের বিয়ের আবার সময়-অসময়। না মারা যাবার ছ'মাসের মধ্যে তেরোটা বাসিক আর সপিণ্ডী-করণ ক'রে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে—আর এ ত' এখনো নড়চে চড়চে।"

আর কোনো কথা না বলিয়া নবগোপাল উঠিয়া পড়িল। তাহার অশিক্ষিত অমার্জ্জিত মনের কোনোখানে এমন একটা বিরোধ দেখা দিল যে ভবতারার সহিত আর কথাবার্ত্তা চালাইতে প্রবৃত্তি হইল না, গিরিবালার ঘরের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

গিরিবালার ঘরে উপস্থিত হইয়া নবগোপাল যাহা দেখিল তাহাতে বুঝিল সত্যই মরণ-বাঁচনের সমস্যা। দুইটা বালিসের উপর মাথা রাখিয়া গিরিবালা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে; দেহ জীর্ণ; চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চোখের কোলে ঘন কালীর ছাপ; প্রত্যেকটি নিশ্বাস চেষ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়া লইতেছে এবং ফেলিতেছে, তাহার সংখ্যা শুধু বক্ষের উত্থান পতন দেখিয়াই গোণা যায় না, পিছন ফিরিয়া থাকিয়াও এক-একটি পৃথক পৃথক ভাবে শোনা যায়; সমস্ত মুখমণ্ডলে পরিপূর্ণ অবসাদের এমন একটা অস্বাভাবিক ছায়া যে দেখিলেই আশঙ্কা হয় জীবন সূর্য্য বুঝি অস্তাচলেরই দিকে দ্রুত চলিয়া পড়িতেছে। ঐর বিবর্ণমুখে মাথার শিয়রে বসিয়া শক্তি ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছিল।

শয্যার নিকট আসিয়া নবগোপাল বলিল, "এই সে দিন দেখে গেলাম ভাল আছেন, এরি মধ্যে এত অসুখ?"

শক্তি বলিল, "আপনি যে দিন এসেছিলেন সেইদিন থেকেই অসুখ। আজ পাঁচ দিন।"

গিরিবালা চোখ বুজিয়া ছিল, কথার শব্দে চাহিয়া দেখিল। নিশ্বাসটা একটু সামলাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "নবগোপাল এসেছ?"

নবগোপাল তাড়াতাড়ি আরও নিকটে গিয়া শক্তির

হাত হইতে পাখাখানা টানিয়া লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া বলিল, "কথা কোয়োনা মাসিমা, তোমার কষ্ট হবে।"

গিরিবালার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, কিন্তু সে হাসি দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয় না, সে হাসিরও মধ্যে অস্তগামী সূর্য্যের আভা। নড়িয়া চড়িয়া একটু কাৎ হইয়া শুইয়া ম্লান কণ্ঠে বলিল, "কষ্টের পালা শেষ হয়ে এসেছে বাবা, এবার কষ্টের অবসানই হবে। কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল যাবার আগে অশোকের সঙ্গে একবার দেখা হ'লনা! হ'লে বোধহয় নেত্রেটার একটা গতি ক'রে যেতে পারতাম।"

শক্তির দিকে চাহিয়া নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "অশোক কে?" তার পর সহসা কি মনে পড়িয়া এবং কি মনে করিয়া কণ্ঠস্বর ঈষৎ খাটো করিয়া বলিল, "সেই পাশ-করা পাত্রোর না-কি?"

গিরিবালার সম্মুখে সহসা এই প্রশ্নে এবং সে প্রশ্নের সমাধান উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী মন্তব্যে শক্তির মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। উত্তর দিয়া নিরস্ত না করিলে পাছে নবগোপাল প্রশ্নের পুনরুক্তি করিয়া বসে এই আশঙ্কায় মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, হাঁ সেই বটে।

ইঙ্গিতের মর্ম্ম অনুভব করিয়া বিস্ময়ে নবগোপালের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্ববৎ চাপা গলায় কিন্তু কিছু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তবে যে সে দিন কল্লে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে আছে?"

যে উদ্দেশ্যে কণ্ঠস্বর চাপা করা তাহা শুধু এবারই ব্যর্থ হয় নাই, পূর্ব্ববারও হইয়াছিল,—অর্থাৎ গিরিবালা নবগোপালের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিল, অধিকন্তু এ কথাও বুঝিয়াছিল যে নবগোপালের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বদিন শক্তি তাহাকে নিশ্চয়ই জানাইয়া থাকিবে যে অশোকের সহিত তাহার বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। বিপন্না কন্যাকে তাহার বিদ্রূপ অবস্থা হইতে উদ্ধারের জন্য সে বলিল, "বিয়ের কথা পাকাপাকিই হয়ে আছে বাবা, তবে তার হাতে আর একবার ভাল ক'রে সঁপে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম।"

গিরিবালার কথা শুনিয়া নবগোপালের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হইয়া গেল, বলিল, "সঁপে আর কেন মাসি মা? এই তেসরা শেরাবোন বিয়ের দিন আছে, সেই দিন একেবারে বিয়ে দিয়ে দাও।" তাহার পর শক্তির দিকে চাহিয়া সেই রকম চাপা গলায় বলিল, "মাসিমার এত অসুখ হ'লে কি হয়? কান খুব! সমস্ত কথা শুনতে পেয়েছে।" আরও একটু গলা চাপিয়া বলিল, "তেসরা শেরাবোন বিয়ের দিন আছে কেমন ক'রে জানলাম জানো? সেই দিন ভবতারা মাসী তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার মৎলব করেছিল।" বলিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

বলিয়া রাখা ভাল গিরিবালার কান এই অধিকতর সতর্কতাকেও ফাঁকি দিয়াছিল। কিন্তু এ কথায় আলোচনা উপস্থিত অবাঞ্ছনীয় বলিয়া নবগোপালের প্রকাশ্য কথাটুকুর উত্তরে বলিল, "এত শীগ্‌গির বিয়ে হয়ে উঠবে না বাবা। অশোকের বাপ বেঁচে আছেন, তিনি তার সুবিধে মত দিন স্থির কর্‌বেন।"

"তবে পাত্তোরের ঠিকানা দাও আমি তাকে ধরে নিয়ে আসি।"

গিরিবালা বলিল, "তার দরকার নেই, সে আমাদের চিঠি পেলেই আস্‌বে। তুমি যদি আমাদের চিঠিটা ডাক বাক্সে ফেলে দাও। এর আগে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু সে বোধহয় ডাকে দেওয়া হয় নি, তাই উত্তর আসে নি।"

তিলে-শিবানীপুর হইতে আধক্রোশ দূরে একটা গ্রামে সপ্তাহে তিন দিন হাট বসে,—সেখানে চিঠির বাক্স আছে।

নবগোপাল উৎসাহভরে বলিল, "কই চিঠি দাও। ডাক বাক্সে নয়, আমি একেবারে খাসেখালীর ডাক ঘরে ছেড়ে দেবো।"

"সে যে অনেকখানি পথ বাবা?"

"হোক্ না অনেকখানি পথ, তোমার বোমপোর পায়েও চাকা লাগানো আছে।" বলিয়া নবগোপাল হাসিতে লাগিল। তাহার পর সহসা হাসি বন্ধ করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া চাপা গলায় বলিল, "আজ ভবতারা মাসীকে জানিয়ে দিলাম যে তোমার সঙ্গে বিয়েতে আমাদের মত নেই। ওরে বাবা, চটে একেবারে লাল। বলে তোদের অদেষ্টে নেই তাই অমন লক্ষ্মীকে হাতে পেয়ে পায়ে

ঠেলি।" তাহার পর ক্রমবর্দ্ধমান কণ্ঠস্বরে বলিতে লাগিল, "গিন্নিমাসীকে সব কথা বল্‌ব শক্তি? এ্যাঁ, বলনা, বলব?"

অভিনয়ের সরলতায় এবং কৌতুকে গিন্নিবালা এবং শক্তি উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। গিন্নিবালা বলিল, "বলবার দরকার নেই নবগোপাল, আমি সমস্ত বুঝতে পেরেছি। তুমি অতি সৎ ছেলে, আশীর্ব্বাদ করি তুমি সব রকমে সুখী হও।" তাহার পর শক্তিকে বলিল, "শক্তি, চিঠিখানা ঠিকানা লিখে নবগোপালকে এনে দে।"

নবগোপাল বলিল, "সাহেবের কি নাম বল্‌লে? অশোক?"

"হাঁ। অশোকনাথ বাড়ুয্যে।"

নবগোপাল বলিল, "অশোক থাকে কোথায়?"

"কলকাতায়।"

মনে মনে কি হিসাব করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া নবগোপাল বলিল, "তা হ'লে লিখে দাও রোববারে সন্ধ্যে বেলা যেন সাতমী স্টেশনে এসে পৌঁছোয়। আমি সাত-ঘাঁটেতে হাজির থেকে তাকে শিবানী-পুরে পৌঁছে দিয়ে দূর থেকে সরে পড়ব।"

গিন্নিবালার চক্ষু কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "এ তুমি পারবে নবগোপাল?"

কতকটা দর্পভরেই নবগোপাল বলিল, "খু-উ-ব!"

গিন্নিবালা বলিল, তবে তাই লিখে দে শক্তি। তা হ'লে কাল আসতে আর কোনো অসুবিধে হবে না!" তাহার পর কতকটা আপনার মনে মনে বলিল, "রবিবার! তাকে সে পর্য্যন্ত আমি কোনো রকমে থাক্‌ব।"

নবগোপাল বলিল, "তুমি চিঠি লিখে ঠিক ক'রে রাখ শক্তি, আমি চল্লুম। মাসীর সঙ্গে কথা ক'য়ে আধ ঘণ্টা পরে আসছি।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নবগোপাল প্রস্থান করিলে গিন্নিবালা বলিল, "কলমার মধ্যে জীবে লুকিয়ে থাকে শুনেছি,—নবগোপালের মধ্যে তাই দেখতে পাচ্ছি শক্তি।"

শক্তি বলিল, "সে কথা হয় ত' সত্যি, কিন্তু তুমি অনেক কথা কয়েছো মা, হাঁপাচ্ছো—আর কথা কোয়ো না, স্থির হয়ে শুয়ে থাক।" বলিয়া অশোককে লেখা চিঠিখানা বাহির করিয়া প্রয়োজনীয় কথাটুকু লিখিতে বসিল।

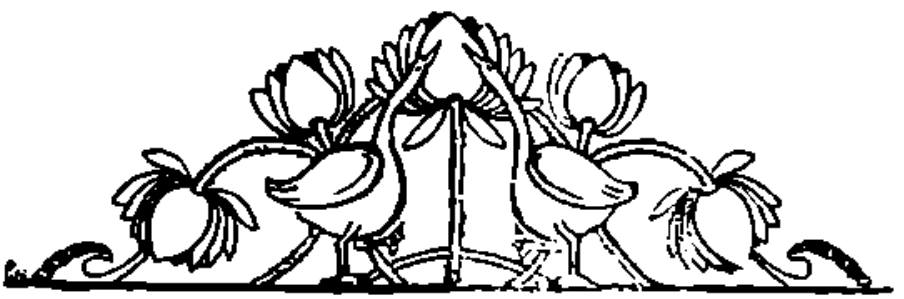

বাংলার পল্লীসম্পদ

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

আমাদের এই পল্লীসম্পদ সমিতির উদ্দেশ্য খুবই বৃহৎ। বাংলার তথা সমস্ত ভারতের জাতীয় জীবন ব্যাপ্ত রয়েছে 'পল্লীসম্পদ' এই কথাটীর মধ্যে। এই সমিতি ভারতে নবজীবনের সূচনা করবে। বিউকানন সাহেবের (বাংলার শাসনের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর) কাছে আপনারা এখনই শুনলেন, একশো বছর আগে ডেন্‌মার্ক দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। এখন ধনের সমান বিভাগ হওয়ায় এই একশো বছরে সে দেশ এমন সমৃদ্ধ হয়েছে যে দারিদ্র্য বলে' কোন জিনিষ সেখানকার লোক জানে না। This is due to their unique system of Folk High Schools (এটা সম্ভব হয়েছে সে দেশের অভিনব লোকশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা)। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কৃষি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের প্রাচীন সংস্কৃতির উদ্ধারসাধন। প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত কোন জাত কৃষিই হোক্ আর শিল্পই হোক্ – কোন ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা পেতে পারে না। ডেন্‌মার্কের প্রাচীন যুগের রসকলা সঞ্জীবিত হয়েছে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায়। তারা কৃষি শিল্প উদ্ধার করেছে, লোক-সাহিত্যকেও বাঁচিয়েছে।

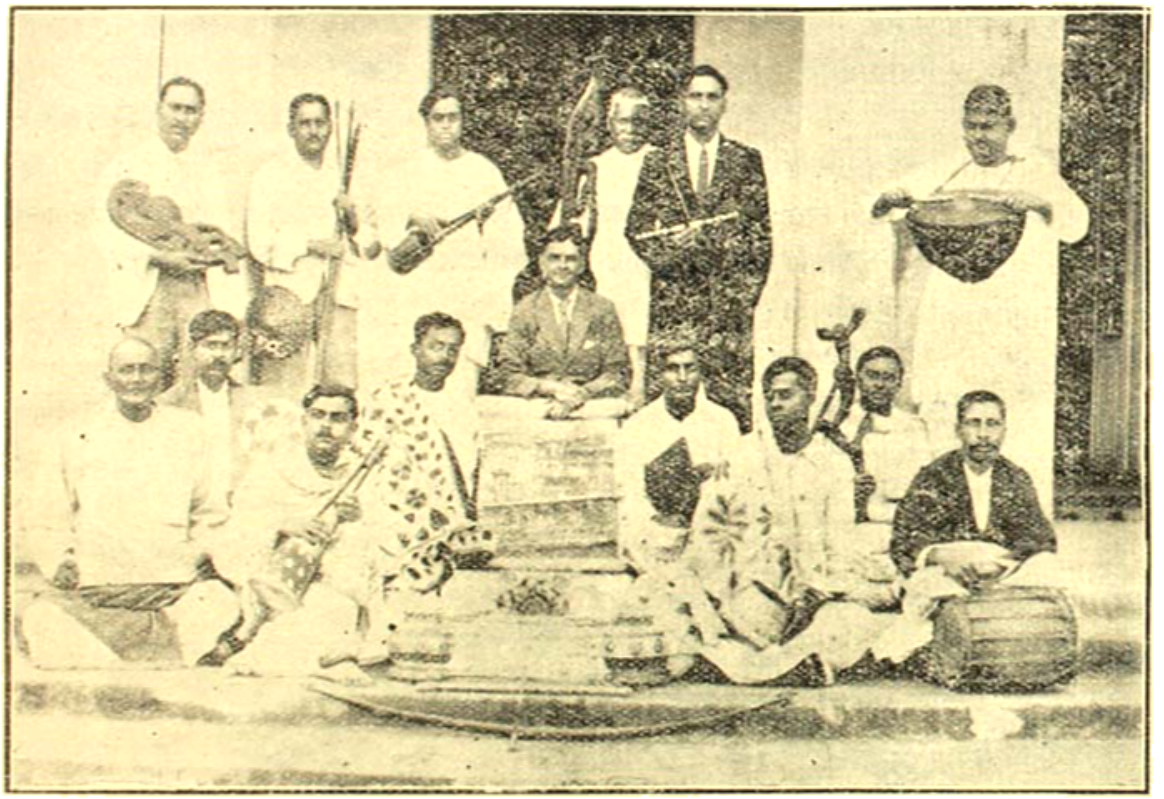

বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির কর্ম্মীমণ্ডল

মধ্যস্থলে সভাপতি :—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্। পার্শ্বের বামদিক হইতে উপবিষ্ট :—১ম শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র; ৩য় শ্রীযুক্ত অনাথ বসু। পার্শ্বের দক্ষিণ দিক হইতে উপবিষ্ট :—২য় শ্রীযুক্ত সুধাংশু রায়; ৩য় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।

বাস্তবিক, আমাদের বর্ত্তমান প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে জাতীয়

জীবনের পুনঃসংস্কার। বাইরের আলো আমরা নিচ্ছি এবং নিতেও হবে। গাছের মতো আমাদের বর্ত্তমান সমাজ বাইরের আলো হাওয়া নেবে—কিন্তু শিকড় থাকবে জাতীয় জীবনের গভীরতম তলদেশে, সেখান থেকে চিন্তা ও ভাবের অনুপ্রেরণা আহরণ করে' তার অন্তরকে গড়ে' তুলবে। বর্ত্তমানে যে ধরণের শিক্ষা চলিত আছে, তাতে মূলের সহিত সংযোগ থাকছে না। আমাদের পল্লীসম্পদ সমিতি সেই সংযোগ ঘটাতে চায়।

ধর্ম্ম নিয়ে দেশ জুড়ে মারামারি; কিন্তু যথার্থ ধর্ম্ম মারামারি নয়। ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা আমরা ভিরঙ্গর ভারীওয়ালাদের গানে পাই. বাংলার সংস্কৃতিতে এই ঐক্যভাব ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। ময়মনসিংহের আ ছরদ্দিন বেপারীর কাছ থেকে যে সব ভারীগান সংগ্রহ করেছি তার বন্দনার মধ্যে আছে

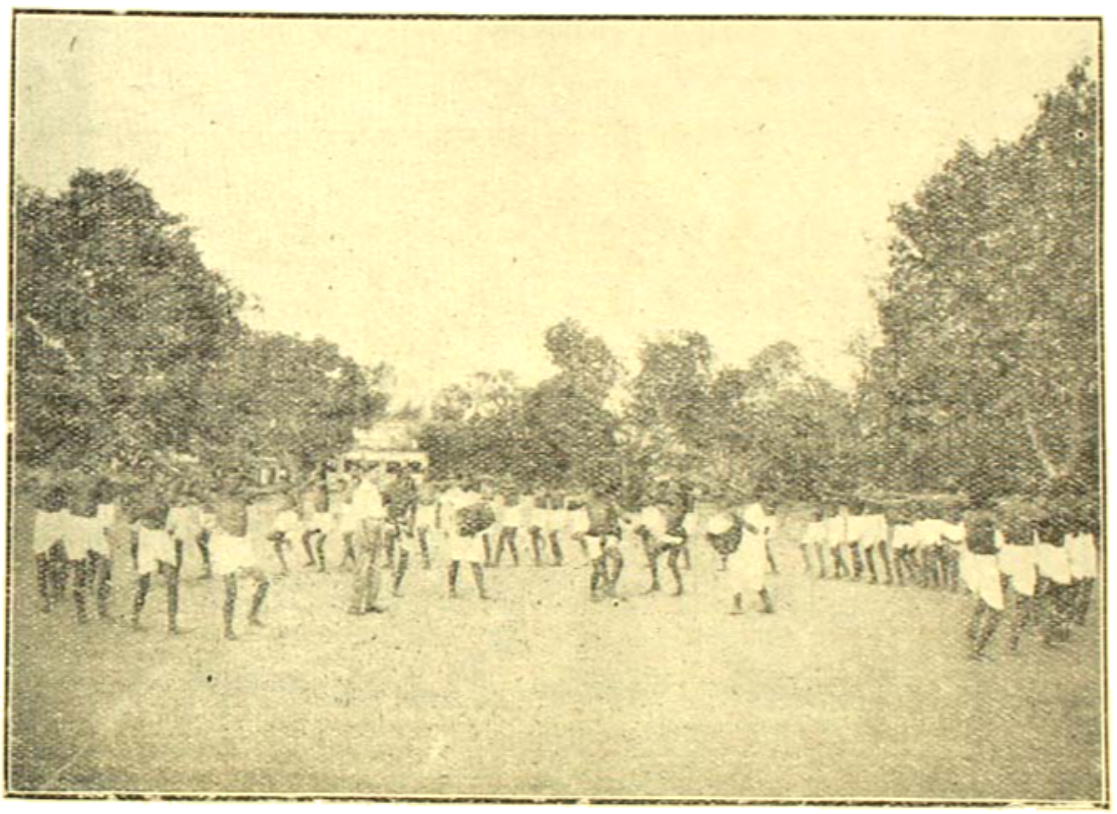

শিটচ্ড়া লোকনৃত্য শিক্ষাকেন্দ্রে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বাংলার বালা মেয়ার হাইস্কুলের শিক্ষকগণের রাহকৈশে নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ভারতবর্ষে ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে বলে' আমার বিশ্বাস নেই। ধর্ম্ম রাজনীতি প্রভৃতির নানা সম্মেলন আছে, কিন্তু ভারতের প্রাণপ্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারবে মাত্র এই পথ। শুধু মন্দির ও প্রাচীন মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে নয়, জীবন্ত রসকলার ভেতর দিয়েই প্রাণের সহিত সত্যকার পরিচয় ঘটা সম্ভব, যে জীবন্ত রসকলা এখনো বেঁচে আছে শিক্ষিতের সংস্পর্শ হ'তে বহু-দূরে—নিরক্ষর জনসমাজে, যে সব পল্লীর মেয়েরা এ যুগের আলোর নামে বাইস্কা ঘর রছুলের দিকে চাইও।

সে ঘর বান্ধিয়াছে বন্ধা শুইয়া নিদ্রা যাইও।
সেই ঘরেরও শীতে বান্ধা তীর্থ বারাণসী।
মুসলমানের ত্রিশ রোজা হিন্দুর একাদশী॥
মুসলমানের আল্লা আল্লা হিন্দু বলেন হরি—।
মনে ভেবে দেখেন সবে এক নামেই তরি॥

ময়মনসিংহের কয়েকজন মুসলমান ভারীগায়ক আজ এখানে আছেন। তাঁরা আমার নমস্য। তাঁরা আমাদের

প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক। সেদিন অকুণ্ঠে তাঁরা কীর্তন গাইতেন। বাংলার খাঁটি মানুষ ধারা, সাম্প্রদায়িকতার তারা ধার ধারে না।

লর্ড আরউইন বলেছেন 'You cannot change the soul of a nation' (জাতির আত্মা কেহ পরিবর্তন করতে পারে না)। কিন্তু সেই soul of the nation (জাতির আত্মা) কোথায়? সেদিন মাষ্টার মশায়েরা (মিউনী পল্লী-শিক্ষা-কেন্দ্রে সমবেত শিক্ষকবৃন্দ) প্রায় যেদিন মুক্ত হবে সেদিন আর দলাদলি থাকবে না। সেজন্য লোকসাহিত্য উদ্ধারে আমরা ব্রতী।

আমার গানগুলিও লোকসাহিত্যের অনুকরণে তৈরী, ভাববিলাস নেই। বাংলার নিরক্ষর লোকের কণ্ঠে এর যদি স্থিতি হয় আমি ধন্য হ'ব।

পৃথিবীর অনেক দেশ দেখেছি, আমার মনে হয় বাংলার রসকলা যেরূপ পরিপূর্ণ তেমন আর কোথাও নেই। শুধু এই দিক দিয়েই আমাদের দেশ আবার পৃথিবীতে গৌরবময়

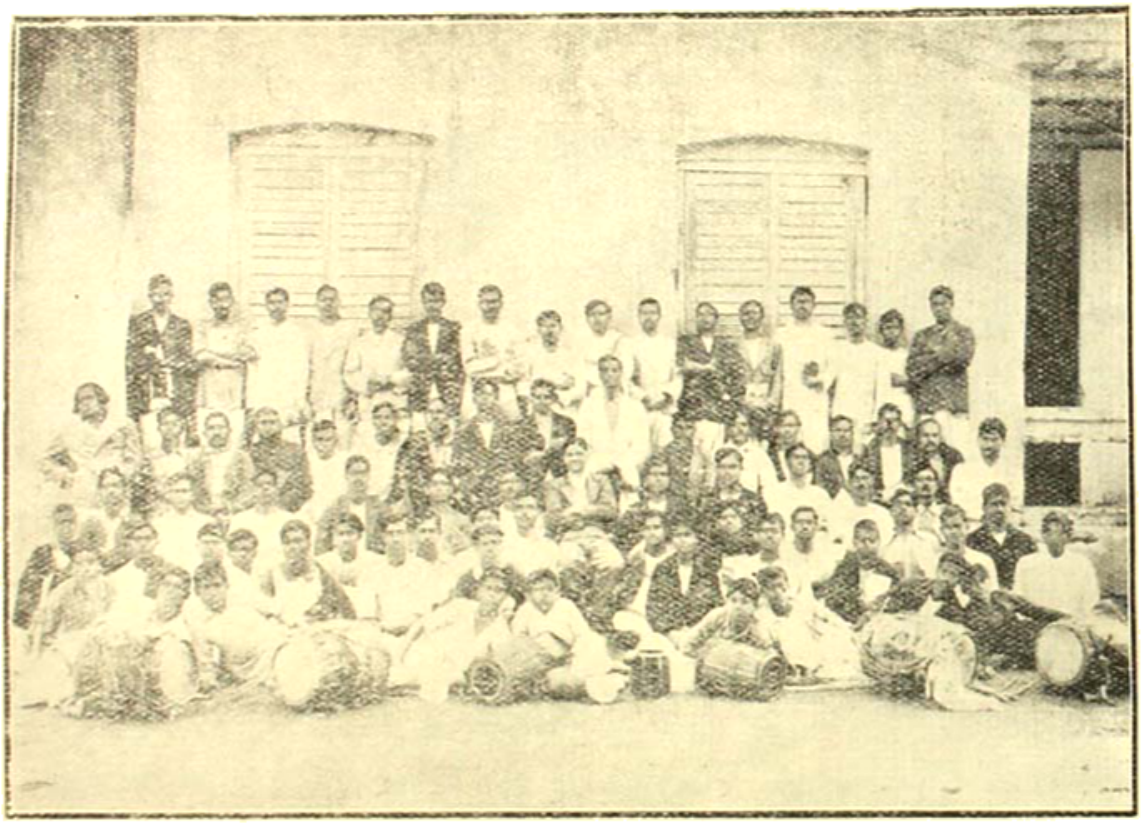

লোকশিক্ষা কেন্দ্রে বাংলার বাধা ছেলার হাইমুলের সমবেত শিক্ষকগণ ও শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত।

গিয়ে মুসলমানদের বাড়ীতে কীর্তন শুনে এসেছেন। সত্যপীরের গান—যে দেবতা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই—তার দল আমরা দেখে থাকি। ভোম মুসলমান সবই সেই দলে থাকে, ধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব উদাহরণ এইখানেই।

এই অপূর্ব ধর্মসমন্বয়ের বাণীতে সমগ্র ভারতবর্ষ আবার জেগে উঠবে, পৃথিবীকে এই সম্পদ বাংলা দেশ দেবে। The soul of India is in her villages (ভারতের আত্মা আছে তার পল্লীগ্রামে)। এই সব নিরক্ষরদের কণ্ঠ আসন পাবে। পল্লীসম্পদ-রক্ষা সমিতির কাজ এই জন্য অতি বৃহৎ।

আশ্চর্য সহজ সৌন্দর্যবোধ রয়েছে বাংলা দেশের মেয়েদের মধ্যে। সেদিন আমি এক গ্রামে গেছলাম। আমি গিয়েছি শুনে আধ ঘণ্টার মধ্যে আল্পনায় প্রতি বাড়ীর আঙিনা ভরে' গেল, সবগুলি নিখুঁত। এমনি সহজাত শিল্পমন আমাদের নিরক্ষর পল্লীবাসীদের। কলকাতার নামকরা আর্টিষ্টেরা এত শীঘ্র এত সহজে এমন নিখুঁত করে' কখনো করতে পারতেন না।

বাংলার ক্রম-বিস্পষ্ট পট (Serial Scroll)-এর এত উচ্চাঙ্গের কলাসম্মত ছবি অন্যান্য দেশে বড় সংজ্ঞলভ্য নয়। পৃথিবীর বড় বড় আর্টিষ্টেরা এখন পারিপ্রেক্ষিক (perspective) ও আলো-ছায়ার সমাবেশ ছেড়ে খালি রেখা (line) ধরেছেন। অথচ আদিকাল থেকে বাংলার চিত্রকলার এইটেই বর্ণকথা। রাজপুত শিল্প বা মোগল শিল্পের চেয়ে বাংলার চিত্রশিল্প বহুতর। সুতরাং আমাদের শিল্পীদের অনুপ্রেরণার মূল ভিত্তি হবে বাংলার নিজস্ব শিল্প পদ্ধতির উপর—ভারতের অপরাপর প্রদেশের অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পদ্ধতির উপর নয়। বাংলার নিজস্ব রসকলার যেদিন খোঁজ পড়বে সেইদিনই লোকে এর দাম বুঝবে। এই সব পট তৈরী করে পটুয়া জাত—হিন্দুরা বলে তারা হিন্দু নয়, মুসলমানেরা বলে মুসলমান নয়। বাংলার জাত-শিল্পীদের এই দুর্দশা, খেতে পায় না বলছে। আমরা এদের দিকে সমস্ত দেশের চোখ খুলতে চাই।

সাহিত্যেও যে কত বিকৃতি এসেছে তার অন্ত নেই। সর্বত্রই দেখা যায় নারীভাব—কিন্তু সত্যকার বাংলা কখনো তা নয়। আলেয়ার আলোর মতো বিদেশের বাংলার মোহাবেশের ভয়ে ফিরতে হয়েছিল। যে পৌরুষ এখনো বেঁচে আছে, তার অবজ্ঞাত বাহক যারা আমার সৌভাগ্য আমি তাদের চিনতে পেরেছি।

মেলার মহলিসে আর ডাক পড়ে না দেখে এই রাইফিশেরা বাইজীর মতো আত্মহত্যা করেছিল। সৌভাগ্যের কথা এই, ওরা গোপনে গোপনে বীরব্রতের চর্চা রেখেছিল। শ্রীযুক্ত বিউক্যানন স্কট ল্যাণ্ডের লোপ, বীরের জাত—সকলেই এদের মর্যাদা দিতে পেরেছেন।

বাংলার এই নিজস্ব বীরব্রতে আমরা সমগ্র দেশকে আবার মাতিয়ে দিতে চাই। যতদিন আমরা এদের নিয়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উচ্চ আসনে বসাতে না পারছি ততদিন উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

---

* সভার পরিবেশন সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রবন্ধ রূপে। শ্রীযুক্ত নরেশ বসু কর্তৃক অনুলিখিত।

লিপি

শ্রী কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এম্-এ

স্নেহের আড়ালটী, বুঝ না তাহারে
এমন দুটো কথা যদিই কিছু কহ
যাহাতে ভরে' উঠি জনম গিরি টুটি'
স্নেহের ভরা-নদী সাগর পানে বহে,—

বলিও আমাতারে না করে মন তার ;
তাহারা সু-তরুণ, আমার দিন আর
ফুরায়ে এল ভাই মিনতি করি তাই
বুড়ার দাবী-দাওয়া যেটুকু মিটিবার।

এই তো হাতে হাতে শারদ পূজা এল
তোমার দিদি নাতা আমারে এক ফেলে
তাঁহার কৈলাসে যাবেন এই মাসে
এ ভাঙা তরণীরে আপদ সব ঠেলে ;—

নলিনী-চলচল ডাগর জোড়া আঁখি
তখন তুমি যদি আমায় পানে রাখি'—
এস এ নিরজনে ভ্রমর-গুঞ্জনে
আমিও কানে কানে কহিব কত না কি !

দুটো বা পাকাচুল তুলিয়া দিতে দিতে
চোখের দুটো কথা চোখেই শুনে নিতে
কভু বা হাতখানি হৃদয় 'পরে আনি'
জুড়ায়ে দিলে ব্যথা বুলায়ে সারা চিতে।

বয়সে ছোট যারা সহজে যায় ভুলে'—
আলগা বাঁধা গেরো আপনি যায় খুলে'।
বুড়ার হাড়ে হাড়ে জড়ায় একেবারে
স্মৃতির বাঁধনিকা টুটিয়া উঠে ভুলে!

হৃদয় কটাহের দুগ্ধ সম মোর
সফেন সুধারাশি ধরিব মুখে তোর;
স্মৃতির ইন্ধনে উথলি উঠি মনে—
আকুল বেদনায় ঘনায় আঁখিলোর!

বহুত কুড়ি চায় করিয়া দিয়া পার
এখন বসে' আছি পারের পথে চেয়ে;
তাহারি তরীখানি আমায় বলে' কানি
যেজন দয়া করে' আসিবে তরী বেয়ে।

কেহ বা লীলাময়ী—করুণাময়ী কেহ—
কেহ বা ভালোবাসা, কেহ বা দিবে স্নেহ;
কাহারো আঁখিলোর পাপের হবে মোর,
স্মরিব মনে মনে—স্মরিবে কেহ কেহ।

তরুণ-তরুণীর স্মৃতির অমরায়
অমর হব নরি, তাহারি ভরসায়
মরণে নাহি ভয়। মরণ যদি হয়
মিলিবে লিপিখানি সঠিক ঠিকানায়?

একটু মনে হয়, অতেনা মহোদধি—
ভবের পারাবার পঙ্কজে নিরবধি!
উঠিলে তারে ঢেউ সাহস দিতে কেউ
অসীম সাহসিকা রহিত সাথে যদি।

যাত্রা হ'লে সুরু সভয়ে কব তা'রে
বুকের দুরু দুরু,—আমার অভয়ারে
মরণ-সহচরী বক্ষে ধরি' ধরি'
জীবন বীমা করি' চলিব পরপারে।

নৃত্য

(খাদ্যের দিক হইতে)

শ্রী রমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্

"অন্ধের হস্তী-পরিচয়" ন্যায়

স্বদেশপ্রাণ, মহাপ্রভব গুরুসদয় দত্ত I. C. S. মহাশয়, বর্ত্তমানে বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি তথায় স্বকীয় কর্ম্ম করিয়া, দুইটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পাইয়া, নিজে যত আনন্দিত হইয়াছেন, দেশের, তথা বাঙ্গালী জাতির, তত উপকার সাধন করিতে পারিয়াছেন। মহাপ্রাণ দত্ত মহাশয়ের স্বর্গগতা পত্নীর নামে যে "সরোজ-নলিনী শিল্পাশ্রম" কলিকাতায় ৪৪ নং বেনিয়াটোলা লেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আশ্রমের পত্রিকা "বঙ্গ-লক্ষ্মীতে", "রাস-বেশে" বা "রাই-বেশে" সম্বন্ধে বিস্তর চিত্রসম্বলিত প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তৎসম্পর্কে গুরুসদয় বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাও দেখিয়াছি; এবং যাঁর বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "অমৃত-বাজার পত্রিকায়" (১লা আশ্বিন, ১৩৩৮ তারিখে) তৎসম্পর্কে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহাও দেখিলাম।

বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর্ বটন্‌লী সাহেব, ঐ নৃত্যের মধ্যে, ছাত্রদের কল্পনা-প্রসারের পথ দেখিলেন; এবং বাঙ্গালার ছাত্র-স্বাস্থ্য-বিষয় পরিচালক বুকানন্ সাহেব, উহার মধ্যে ড্রিলের চেয়ে ভাল জিনিষ দেখিতে পাইলেন; দত্তজ মহাশয় ইহার মধ্যে একটি কলা আবিষ্কার করিলেন এবং দেশের বহু শত বৎসরের একটি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাইলেন। বটন্‌লী সাহেব, তাঁর প্রথম বাঙ্গালী-ছাত্রদের তাঁর প্রকাশের একটা ক্ষেত্র আবিষ্কার করিলেন; বুকানন্ সাহেব ইহাকে উৎকৃষ্টতর দেশী ড্রিল মনে করিলেন। ইহার মধ্যে আরো কি আছে, তাহাই সন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে, কাঠ-বিড়ালের সাগর-বন্ধনের ন্যায়, আমি নিম্নে কয়েক পংক্তি লিখিলাম;—আশা করি, অন্ততঃ বাঙ্গালী পাঠকরা তাহা একটু মনোযোগ সহকারে পড়িবেন।

আমাদের পাশ্চাত্য-দুলভ মনোবৃত্তি

আমি এ প্রসঙ্গে, "ব্যায়ামের" দিকটা দেখিয়া লইব। সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে ব্যায়ামের মস্ত সুফল এই যে, খেলোয়াড়গণ খেলাকে দেবতার স্থানে বসাইয়া, মনপ্রাণ ঢালিয়া, তাহার সেবায় মাতিয়া যায়; হারিলে, সাংখ্যের পুরুষ সাজে; জিতিলে, মুনির মত ধৈর্য্য দেখায়; কখনো কাপুরুষোচিত বা হীনচেতার ভাব দেখায় না;—এক কথায়, নিয়ম শৃঙ্খলিত, পরমত-সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগিতা, সাহস, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য শিখিয়া, মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হয়। এ কারণে ব্যক্তির বা জাতির চরিত্র গঠনে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে খেলাধূলা অতীব

আবশ্যক। এই জন্য, কি অসভ্য কি সভ্য,—সকল অবস্থার মানুষই অল্প-বিস্তর সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে (in a team spirit) ব্যায়াম করিতে ভালবাসে। অসভ্যদের মধ্যে, নাচ ও কৃত্রিম-রণক্রীড়া সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত; সভ্য সমাজে, নানারূপ "কসরৎ" ও খেলা ধূলা প্রচলিত। আমাদের মধ্যে অনেকেই, আদিম-অবস্থাপন্ন-মানবের নৃত্য বা রণকৌশল দেখেন নাই; কিন্তু, পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সম্মত খেলা-ধূলার কথা সকলেই অল্প-বিস্তর জানেন বলিয়া, প্রথমে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রণালীর কথাই উল্লেখ করিব।

আমরা—অর্থাৎ, যাঁহারা এরূপ মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠের মত "সভ্য" ও "শিক্ষিত"—প্রতীচ্য জাতি হইলেও, শিক্ষায়, ক্রীড়ায় ও চিন্তাধারায়, এক রকম পাশ্চাত্য হইয়াই গিয়াছি—যেহেতু, পাশ্চাত্য সব কিছুই আমাদের "হাঁড়ির ভিতরে" ঢুকিয়াছে। এই জন্য, "ব্যায়াম" বুঝাইতে, কপাট, ডাণ্ডা-গুলি, ডন-বৈঠকের কথা না বলিয়া, ডাম্বেল ভাঁজা, হকি, ফুটবল, টেনিস্, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলা, ও জিম্‌ন্যাষ্টিক করার কথা ছাড়া, আর কিছুর কথা বলা চলে না।

এ দেশে ব্যায়াম-চর্চ্চার দুর্দ্দশা

যদিও আমাদের স্কুলের ছেলেরা আপনা-আপনিই দৌড়াদৌড়ি করে—তবুও, এ কথা বলা চলে না যে, এ দেশে, এখনো, কোনও বালক বা বালিকাদের বিদ্যালয়ের নিম্ন-শ্রেণীতে, কোনও রূপ বাঁধ-ধরা, ক্রমিক-উন্নতির ধারে, ব্যায়াম বা খেলার প্রবর্ত্তন হইয়াছে বা হইবার সম্ভব ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে, যত বা অভিভাবকরা, তত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও সমান-ভাবে উদাসীন। সত্য বটে, ছেলেরা ও অভিভাবকরা প্রতি-বৎসরে, বিনা ওজরে, "স্পোর্টস্ ফি" নামক টেক্স আদায় দেন; এবং বিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারাও বেমালুম তাহা আদায় করিয়াই, কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখান; এবং আরো সত্য বটে যে, এই গৌরী-সেনের দেশে, খুব মোটা বেতনে, একজন—"স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইবার নির্দ্দেশক" রূপে (Director of Physical Education) এখানে আসিয়া—আমাদিগকে পরম অনুগৃহীত ও আপ্যায়িত করিতেছেন; তবু, এই সত্য কথা যে, এ যাবৎ কোনও বিদ্যালয়ে, কি উপরের শ্রেণীতে কি নিম্ন-শ্রেণীতে, সকল ছাত্রের জন্য, কোন ও রীতিমত, ব্যায়াম-চর্চ্চার এতটুকু চেষ্টা হয় নাই।

কাযেই, দেখা যায় যে, সহরে ও পল্লীগ্রামে, মুষ্টিমেয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কেন, অপর যুবকরাও খেলা-ধূলা বা ব্যায়াম কিছু কিছু করে। কিন্তু, তাহারা কয়-জন? তাহারা মুষ্টিমেয়। কারণ, এই কার্য্যে কিছু ব্যয় আছে—সে ব্যয় সঙ্কুলান করিবার সামর্থ্য সকলের থাকে না; এবং এই কার্য্যে, অভিভাবকের ও সমাজের সহানুভূতি থাকে না;—যাহারা খেলাধূলা বা জিম্‌ন্যাষ্টিক্ করে তাহারা "বয়াটে" নামে অভিহিত হয়। এখন, অভিভাবকরা নিজেরাও "সভ্য" সাজেন, এবং শৈশব হইতে, ছেলেদিগকে "সভ্য ও শিষ্ট" সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হন। এই জন্য, ছেলে একটু দৌড়াইলে ভয়ে শিহরিয়া, নিষেধ করেন —"দৌড়াইও না, পড়িয়া যাইবে!"

কাযেই, যদি দেশের শতকরা মাত্র দুই কি পাঁচটি ছেলে ব্যায়াম করে—তাও বিষম তীব্র আওতায়—তবে হইলে কি হইল? কিন্তু যে কয়টিই করে, তাহারাই বা কতদিন ধরিয়া তাহা করিতে পারে? চরৎকারা অল্পচিন্তার ঠেলায় পড়িয়া, অচিরেই তাহারা তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

এই কয়েকটি কথা হইতে আমরা বুঝিলাম,—প্রথমতঃ, এ দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শারীরিক চর্চ্চার ধুমধামই থাকিলেও, ব্যাপকভাবে, কিছুই আসল কাজ হয় না অথচ, দেহ সুস্থ না হইলে মন সুস্থ হইবে কি করিয়া?

দ্বিতীয়তঃ, কি বিদ্যালয়ে, কি পল্লীগ্রামে,—মুষ্টিমেয় উৎসাহী যুবক কয়েক বৎসর মাত্র আপনারই চাড়ে ব্যায়াম করে এবং উপকৃতও হয়। সে দিকে কাহারো দৃষ্টি আছে কি?

তৃতীয়তঃ, কেহই পাশ্চাত্য মতে বেশী দিন ব্যায়াম করিতে চাহে না। তাহার কারণ এই মনে হয় যে, উহা নিতান্ত প্রাণহীন, এক-দেশী এবং একঘেয়ে। এই মতে, দেহের

কতকগুলি পেশী যেন বাঁধা-রাস্তায় চলিয়া চলিয়া, ক্রমে আড়ষ্ট হইয়া আসে। নিয়মিতভাবে যেমন-তেমন অঙ্গচালনা করিলেও, সারা দেহের কিছু না কিছু উপকার হয়ই,—এ বিষয়ে মতভেদ নাই; কিন্তু, পাশ্চাত্য সকল প্রকারের ব্যায়াম-চর্চ্চাই একঘেয়ে ও শুধু কতকগুলি মাংসপেশীকে বাড়ায়। এই জন্য, আজকাল জিমন্যাষ্টিক্স্ ও এমন কি ষ্ট্রাংগো প্রভৃতির পথে কসরৎ কেহ কেহ প্রথমাবস্থায় করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে চাহেন না, ও পারেন না। এখন ঐ পথ বর্জ্জন করিয়া খেলার দিকে সকলেরই বেশী ঝোঁক বাড়িয়াছে। যেহেতু, সঙ্ঘবদ্ধ খেলার জয়-পরাজয়ের উত্তেজনা আছে—খেলাটা কৃত্রিম হইলেও প্রাণবন্ত বটে।

চতুর্থতঃ, কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ে, বালিকাদিগের দেহ চর্চ্চার কোনও চেষ্টা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চমতঃ, এ দেশে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, সাধারণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এমন কি ধনীদের মধ্যেও, ঘরে ঘরে, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চ্চার খুবই প্রসার ছিল; এবং দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, এই বাঙ্গালী জাতিই যুদ্ধের সৈন্যদলভুক্ত হইয়া, কত রণকৌশল ও বীরত্ব দেখাইয়াছিল। আর আজ?—ছেলেরা দৌড়াইলে, আমরা শিহরিয়া উঠি;—আর, যদি কেহ শরীর-চর্চ্চায় একটু মনোযোগী হয়, তবেই তাহাকে বয়াটের দলে ফেলি! এই সর্ব্বনেশে মনোবৃত্তিই আমাদিগকে আরো উৎসন্নের পথে লইয়া যাইতেছে।

চাই জাতীয়-শিক্ষা

এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমাদিগের কর্ত্তব্য অনেক।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক অভিভাবককে—বিশেষ করিয়া জননীদিগকে—ছেলে-মানুষ করার কথা বেশ করিয়া শুনিতে ও শিখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, "ছেলে" বলিলে, তৎসঙ্গে ও বিশেষ এবং বেশী করিয়া, "মেয়েদিগের" কথাও ধরিয়া লইতে হইবে। যথার্থরূপে ছেলে-মানুষ করা বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা পর্ব্বত-প্রমাণ!

দ্বিতীয়তঃ, খেলার ভিতর দিয়াই, মানব শিশুর ভাবী জীবনের গতি ও প্রকৃতি এবং চরিত্র গড়িয়া উঠে—এ কথাটা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে; এবং সেই সঙ্গে, মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমাদের ভাষায়, "ছেলে খেলা" কথাটিকে আমরা কত মারাত্মক দারুণ সূচক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছি!

তৃতীয়তঃ, দেহ ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিলে, তবে তাহার চূড়ার (মস্তিষ্কের) উৎকর্ষ সার্থক হয়; অতএব, যে শিক্ষায় ও যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ছেলেদের মানসিক-উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে, দৈহিক স্বাস্থ্যের বিকাশ একতালে না হয়, সে শিক্ষা ও সে প্রতিষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ না করিলে, ভাবী বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ-করাই হইবে ও হইতেছে। এতদ্বিষয়ে সকল অভিভাবককে জাগরূক হইতে হইবে। কোথায়, কোন্ ডাইরেক্টর খোসখেয়ালের বশে, যা'-তা' হুকুম দিয়া বাহির করিবেন; বা টেক্সট্-বুক্-কমিটি যা'-তা' বই আমাদের ঘাড়ে চাপাইবেন; অথবা ইউনিভার্সিটি যত ইচ্ছা পরীক্ষার বাঁধন-কষণ করিবেন;—এ সকলের মূল বহুকাল পূর্ব্বেই যাওয়া উচিত ছিল;—এখনো যায় নাই, কারণ, আমরা এ সব বিষয়ে ভাবিও না—চেষ্টা করাও দূরের কথা।

চতুর্থতঃ, অন্ধ-পরাণুকরণে কোনও জাতি কখনো "মানুষ" হইয়া উঠিতে পারে না;—বিশেষতঃ খেলা ধূলা বিষয়ে। ঘর করিয়া হাসিলে, সে হাসি ভ্যাংচানিতে দাঁড়ায়! খেলা-ধূলার ভিতর দিয়া যখন আমাদের ভাবী চরিত্র ও মানসিক গতি নির্ণীত হয়, তখন সেই খেলাটা সম্পূর্ণভাবে "জাতীয়" আদর্শে না হইলে, আমরা কখনোই এ দেশের মানুষ হইব না। এই জন্য, যাহাতে শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত, খেলা, ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় ভাবে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য দেশের লোকের একঘোঁটে তাহা না চলিলে, কখনই আমরা তাহা পাইব না। আমি পাশ্চাত্য কোনও খেলার বিরোধী নই। তবে, আগে দেশী, পরে পাশ্চাত্যের খেলা—এইটাই আমি চাহি। যে উপায়ে হিন্দু অনার্য্য, শক, হূন, তাতার প্রভৃতিকে আপনার জন করিয়া লইতে জানে, আবশ্যক হইলে, কেমন করিয়া পাশ্চাত্য খেলাকে প্রাচ্য খেলার অঙ্গীভূত করিতে হয়, তাহা আর তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ কর

আমি চিরকালই বলিয়াছি এবং এ স্থলেও বলি যে, এদেশে, শিক্ষাদান করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়; যেহেতু, তাঁহার আদর্শ-জীবনে, এ দেশের ভাব ও রীতি অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এক-রকম রাজার "ছেলে" হইলেও, সর্ব্বদাই মল্লাগারে, উন্মুক্ত মাঠে ও ঘাটে, বাঁশী বাজান ও নৃত্য করিতেন। ইহার মধ্যে, খুব বেশী ছন্দানুবর্ত্তিতা ছিল; এবং শিশু জীবন গঠনে ছন্দানুবর্ত্তিতা, যে কত বড় সহায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কোন বিশিষ্ট প্রথায় ব্যায়াম-চর্চ্চা না করিয়াও, নৃত্য করিয়া, ও উন্মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যকিরণ সেবনের ফলে, শ্রীকৃষ্ণ বীর জ্যেষ্ঠ বলরাম অপেক্ষা কম বলশালী ছিলেন না; অথচ, তাঁহার দেহ কত কমনীয় ছিল! শ্রীকৃষ্ণ পরম রূপবান পুরুষও ছিলেন। হঠযোগ-প্রক্রিয়ায় সমগ্র দেহ অতীব বলশালী হয়। যোগ বুঝি না;—কাযেই, যেটা বুঝি না, সেইটার উপরে ভর করিয়া কোনও কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু শরীর-গঠনে নৃত্য যে কতটা সহায়তা করে, তাহা জনসাধারণ জানেনও না, এবং হয়ত বিশ্বাসও করিবেন না। এর জন্য, নৃত্য সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিতেছি।

পাশ্চাত্য ব্যায়াম ত্যাগের কুফল

এ দেশের যে যে যুবকরা ১৪।১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়ার সঙ্গে কিছু কিছু ব্যায়াম চর্চ্চা করেন, তাঁহারা ২৫ বৎসর বয়সে লেখা-পড়া সাঙ্গ করিয়া, কাযকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কাযে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি কারণ তাঁহাদিগকে ঘুটিয়া থাকে; যথা—

নিয়মিতভাবে, প্রত্যহ মুক্ত বায়ু সেবন করা আর ঘটিয়া উঠে না।

২) প্রত্যহ, নিয়ম করিয়া, খেলাধূলা ক্রমশঃই থাকে না বলিয়া, নিত্য যে প্রচুর ঘর্ম্মত্যাগ ঘটিত, তাহার অবকাশ কমিয়া আসে; বরং তৎস্থানে অনেকক্ষণ নানারকম জামা-জোড়ার আবদ্ধ থাকায়, দেহে রক্ত চলাচলের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাতও সৃষ্ট হয়।

(৩) বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, আহারের ব্যয় কমে;—অর্থাৎ কুসুমের ও হৃৎপিণ্ডের জোর কমে।

(৪) প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে পায় না বলিয়া, কিডনী নামক মূত্র সৃষ্টিকারী যন্ত্রের উপরে অথবা চাপ পড়ে; কাযেই ক্রমশঃ ব্লাড-প্রেসার বা রক্তচাপ বাড়ে।

(৫) ক্রমশঃ এইগুলির ফলে, "ভুঁড়ি" জন্মায়; অর্থাৎ, একদিকে যেমন উদরের প্রাচীর শিথিল হয়, অন্য দিকে, সেই সঙ্গে মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক বক্রতা নষ্ট হয়। তাহার ফলে, উদর ও বক্ষোগহ্বরের যাবতীয় যন্ত্র বিকল হইতে থাকে। যে ব্যক্তির দেহ সুস্থ, তাঁহার পেটের মাংসপেশী দৃঢ় থাকে বলিয়া, সমস্ত দেহ-যন্ত্র যথাস্থানে থাকিয়া, সুস্থ-ভাবে কায করিতে পারে। মাংসপেশী দৃঢ় থাকিলে "ভুঁড়ি" জন্মায় না। এজন্য, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ধাত আসিয়া উপস্থিত হয়;—অর্থাৎ যেখানে দৈনিক ও ঠিক সময়ে, নিয়ম করিয়া, দেহ-মল অন্ততঃ দুইবার নিষ্কাশিত হইত, তথায় দৈনিক একবারও তাহা হয় কি না সন্দেহ; এবং দেহ-মল যথাযথ ভাবে নিষ্কাশিত না হওয়ায়, অকাল জরা উপস্থিত হয়।

(৬) এই সঙ্গে, আহারের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা অধিকাংশই বেশী খাই,—কেহ লোভ বশতঃ, কেহ ভ্রমাত্মক ধারণা বশতঃ। সে ভ্রমাত্মক ধারণাটি এই যে, খুব তৃপ্তি করিয়া "ভুরি"-ভোজন করাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। দেহের আবশ্যকের অতিরিক্ত ভোজন করিলেই—তা' সে যত "তৃপ্তি" করিয়াই হউক—দেহকে সেই অতিরিক্ত আবর্জ্জনা বাহির করিবার জন্য অতিরিক্ত শ্রম করিতে হয়। অর্থাৎ, পরিপাক যন্ত্রগুলিতে অধিকক্ষণ ধরিয়া রক্তাধিক্য ঘটে,—তাহার ফলে দেহের অপর অংশে রক্তের স্বাভাবিক পরিমাণের ন্যূনতা ঘটে, দেহের অবসাদ ক্ষয় হয়, এবং বাড়তি খাদ্য হইতে যে বাড়তি-অবর্জ্জনার সৃষ্টি হয়, তাহা নিষ্কাশিত করিতে সকল সময়ে দেহ সমর্থও হইতে পারে;—কাযেই, আপনার অবিবেকিতার জন্য, দেহে ক্রমশঃ ময়লা জমে, তাহার ফলে, অকাল-জরা বা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই জরা আসিবার পূর্ব্বে, দেহে মেদ-সঞ্চার হইয়া, আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দেয়। আমরা কি সে সতর্কতার বাণী শুনি?

পালিত কুকুর-বিড়াল বা অন্য গৃহপালিত (stout বা obese) হইলে, সে অবস্থাটাকে দোষাবহ মনে করি; কিন্তু স্বয়ং দুলকায় হইলে, মনে মনে খুসী হই, এবং সেটা বংশানুক্রমিক অবশ্যম্ভাবী অবস্থা, এই মনে করিয়া, তৃপ্ত থাকি। কিন্তু এটা খুব ধ্রুব সত্য যে, দেহে মেদ বাহুল্য হওয়া, স্বাস্থ্যের চিহ্ন নহে—ব্যায়ামের লক্ষণ। আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবন-বীমা কোম্পানীরাও, বাধ্য হইয়া, ধরিয়া লইয়াছেন যে, ২৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে, সাত আট সের দৈহিক ওজন কার্য্যতঃ অন্যায় হইলেও লোক-চক্ষুতে অন্যায় নহে! অথচ দৌড়-দৌড়ের ঘোড়ার পৃষ্ঠে এই "সামান্য" ৭।৮ সের ভার চাপানর ফলে, অনেক সময়ে, সে ঘোড়া বাজি জিতিতে পারে না! এই প্রসঙ্গে আগে স্মরণ করাইয়া দিই যে, বিবৃদ্ধ মেদ শুধু চর্ম্মের নিম্নেই আপনার স্থান করিয়া লয় না—হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র প্রভৃতির ভিতরে বা আশে পাশে জমিয়া, উক্ত যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক কার্য্যের যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করিয়া নিতান্ত ক্রমে আয়ুক্ষয় করে। কাজেই দৈহিক আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা না করিলে, ভুঁড়িবৃদ্ধি, মাংসপেশীর শৈথিল্য, কাযেই হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ, বাত, ব্লাড্ প্রেশার বৃদ্ধি, সন্ন্যাস রোগ, বহুমূত্র, বহুমূত্র—প্রভৃতি দেখা দেয়।

জীবনকে সত্যকার ভোগ করিবার পন্থা

কাযেই, সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দমনে জীবনটাকে সত্যকার "ভোগ" করিতে হইলে, দুইটি প্রধান কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে:—(১) খুব বুঝিয়া, আবশ্যক মত ভোজন করা; এবং যাহা করিলে দৈনিক তিনবার মলত্যাগ হয়, তাহা করা চাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় একটি প্রবাদ বচন আছে,—"নিজ অবস্থা "অতিক্রম" করিয়া ঘর-বাড়ী করিবে; অবস্থা "অনুযায়ী", বেশ-ভূষা করিবে; কিন্তু খাইবে, অবস্থার চেয়ে "ঢের কম করিয়া।" এটি অতীব জ্ঞান গর্ভ কথা। (২) নিয়মিতভাবে, এক সঙ্গে সমস্ত দেহের ব্যায়াম করা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নারী মূর্ত্তিদের লোক স্বল্পকালের জন্য, ব্যায়াম বা খেলা করে,—এবং তাহারাও, বেশীর ভাগ হাতের ও পায়ের কতকগুলি মাংসপেশী লইয়াই ব্যস্ত থাকে;—কাযেই, সে ব্যায়ামের ফল যেমন একদেশীয়, তেমনি একঘেয়ে, কাযেই অল্পদিন স্থায়ী হয়। এই জন্য, মধ্যবয়সে, ব্যায়াম বা খেলা ছাড়িতে না ছাড়িতেই, দেহ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। শুধু মাংসপেশী লইয়াই দেহ নহে। দেহে "স্নায়ু" ও "স্নায়ু" আছে; শিরা ধমনী আছে; যন্ত্রপাতি আছে; গ্লাণ্ড (বিশেষ করিয়া, endocrine glands) আছে। তাহা ছাড়া, শৈশবে আমরা বুকে হাঁটি; তাহার পরে পর-পর চারাগুড়ি দিই, দাঁড়াইতে শিখি ও দৌড়াই—from serpentine to quadruped to biped posture to running;—কাযেই, পিঠ, পেট, কোমর ও উরুদেশ—প্রধানতঃ এই চারটি স্থানের উপরেই আমাদিগকে বেশী করিয়া মনোযোগ দেওয়া চাই। যাহারা নিয়মিত পাশ্চাত্য মতে ব্যায়াম বা খেলা করেন, তাঁহারা যদি নিজ নিজ উরু ও নিতম্বদেশ লক্ষ্য করেন, ত দেখিবেন যে, ঐ দুইটি স্থান তেমন দৃঢ় ও সুপুষ্ট হয় না। এবং জুতার ঘোরে পা আড়ষ্ট হইয়া আসে—গুল্ফ ও তৎসন্ধি বিশ্রী হয়।

নৃত্যের বিশেষ গুণাবলী

অথচ কোনও বর্ব্বর বা অসভ্য জাতির মধ্যে—মেদবাহুল্য, উদরপ্রাচীরের শৈথিল্য বা ভুঁড়ি, অল্প পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড), অপুষ্ট নিতম্ব দেখা যায় না। তাহারা দুই দিন বসিয়া থাকিলেও, তাহাদের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে না। তাহারা ত ঐরূপ কর্ম্মঠ, সুপুষ্ট, সুগঠিত ও লঘু দেহ লইয়া "জন্মায়" নাই—তাহারা আপনাদিগকে ঐরূপ "করিয়া" লইয়াছে। তাহাদের সহজ নৃত্য-ভঙ্গীর সাহায্যে তাহারা একসঙ্গে সমগ্র দেহের উন্নতি সাধন করে। তাহারা দেহের ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া উন্নতি সাধন করে না—যেহেতু, তাহারা biceps জানে না, trapezius মানে না।

যাহারা নৃত্য করে, তাহারা তালে তালে, এবং বারম্বার স্বচ্ছন্দে, ঘুরিয়া ফিরিয়া, নানারূপ কৌশল দেখায়। এ দিকে, পাশ্চাত্য মতে ব্যায়ামে, আকস্মিক ভাবে, কতকগুলি মাংসপেশীর উপরে জোর প্রয়োগই প্রথম এবং শেষ কথা। যাঁহারা কলকব্জা বুঝেন, তাঁহারা দেখিবেন

যে, নৃত্যটা turbine or rotary engine ; এবং বিলাতি ব্যায়ামটা, reciprocating or opposing engine. নৃত্যে শক্তির অপচয় নাই, পাশ্চাত্য ব্যায়ামে শক্তির ধ্বংসের অপব্যয় আছে।

দ্বিতীয়তঃ, নৃত্য করিতে গেলে, প্রধানতঃ উদর ও কোমরেরই বেশী কাজ হয়। ভগবান এই উদরের প্রাচীরকে নমনীয় করিয়াছেন, এবং উদরের ভিতরেই, আমাদের পুষ্টির এবং দেহগঠনের যন্ত্রপাতি রাখিয়াছেন। এই উদরেই, হিন্দুমতে মণিপুরচক্র ও পাশ্চাত্যমতে Solar plexus বা abdominal brain নামক sympathetic স্নায়ুর অতীব প্রয়োজনীয় অংশ রাখিয়াছেন। এবং মানবজীবনের তিনটি প্রধান গুপ্তের মধ্যে একটি যন্ত্র—gonads ও adrenals নামক endocrine glands—এই উদরেই স্থিত। কাযেই, এটা বেশ বুঝা যায় যে, যদি মস্তিষ্কের ও বক্ষের পরে কোনও দেহাংশের স্থান থাকে, তবে তাহা উদর ও বস্তি। নৃত্য করিতে গেলে, প্রধানতঃ উদর ও বস্তির সকল যন্ত্রই অল্পবিস্তর নাড়া চাড়া পায়। যদি বস্তিকে চক্রের মধ্যমণ্ডল বা নাভি (centre) কল্পনা করা যায় (এবং সেরূপ কল্পনা কিছু অযৌক্তিকও নহে), তবে, স্বচ্ছন্দে এ কথা বলা চলে যে, এই নাভির ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হস্ত-পদাদি-রূপ চক্রের পরিধিগুলি (radii) স্বতঃই নাড়া চাড়া পায় ও পুষ্ট হইয়া উঠে।

তৃতীয়তঃ, নৃত্যকালে, একটা গোড়ালির উপরে ভর দিয়া পাক খাওয়া, দুদিকে কোমর বাঁকাইয়া অঙ্গভঙ্গী করা, উন্নত্ত, নীচু হইয়া অর্দ্ধ বসিয়া পড়া, সারা দেহকে লীলায়িত ভাবে আন্দোলন করা—ইত্যাদি কারণে, উদর ও বস্তির মধ্যস্থ দৈহিক যন্ত্রগুলিও ঐ ঐ ভাবে নাড়া চাড়া পায় এবং সেই সঙ্গে, সমস্ত দেহের সমতা (balance), ভারসামঞ্জস্য (poise) ও গতিমাধুরী (grace) সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে। তাহা ছাড়া, নৃত্যকারীদের চরণের গঠন ও সৌষ্ঠব একটা দেখিবার জিনিষ।

চতুর্থতঃ, নৃত্যকালীন কখনো এমন ভাবে আঁতমারার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করা হয় যে, মনে হয়, যেন তদ্দ্বারা সমস্ত আঁতটিকে টিপিয়া, চাঁছিয়া দেওয়া হইল—যাহার ফলে, আমাদের অন্ত্রমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহা স্বচ্ছন্দে ক্রমশঃ অগ্রগতি হইতে পায়—কোষ্ঠশুদ্ধির পথ খোলসা করা হয়। পাশ্চাত্য মতে পেটের কসরৎগুলির ফল, পেটের যন্ত্রপাতিকে নীচের ও সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া—ভুঁড়ি তৈয়ার করা। নৃত্যে তাহা আদপে হইতে পায় না, বরং উদর-প্রাচীরকে বেশ দৃঢ় করে। তদ্ব্যতীত নৃত্যের ফলে সকল বোধক-স্নায়ু সজাগ হইয়া উঠে, মনে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি বিরাজ করে।

তাহা হইলে বেশ বুঝা গেল যে, শরীরকে সুস্থ রাখিবার ও গড়িয়া তুলিবার জন্য, এই এই বিষয়ে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে :—

(১) ব্যায়ামকালীকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যায়াম করার প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য,—শরীরকে সুগঠিত ও দৃঢ় করা, নিত্য নিয়মিত ২।৩ বার যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় তাহা করা, এবং মন ও সমগ্র শরীরকে স্বচ্ছন্দে রাখা। এই সবগুলিই পাওয়া যায়, যদি উদর ও বস্তিদেশকে প্রধান লক্ষ্যস্থল করিয়া ব্যায়াম করা যায়—অর্থাৎ নৃত্যের সাহায্যে; হাতের বা পায়ের মাংসপেশীর দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখিলে, এ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

(২) ব্যায়ামকালীন যত ছন্দানুবর্ত্তিতা থাকে, এবং সেই সঙ্গে গতি ও ভঙ্গী যত সহজ হয়, ততই সমস্ত দেহের মাংসপেশীগুলি সহজে গড়িবার অবকাশ পায়।

(৩) উদর ও বস্তিদেশকে প্রধান লক্ষ্যস্থল করিলে, হাত-পায়ের মাংসপেশী (trapezius) ও deltoid আপনা-আপনিই গড়িয়া উঠে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র-ভাবে খেলাইতে হয় না।

এই কারণেই মনে হয় যে, আদিম বা অসভ্যাবস্থায় যে নৃত্য নিয়মিত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিত্যই আচরিত হয়, তাহা যেমন শরীর গড়ে ও ভাল রাখে, বোধ হয়, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কসরৎ করিয়া, তাহা হয় না। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের দেহ লীলায়িত, তিনি নৃত্যশীল এবং বংশী তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তিতার প্রতীক।

বর্ত্তমানকালের পাশ্চাত্য ball dancing কখনো দেখি নাই ; তবে তদ্বিষয়ে শুনিয়া, ছবি দেখিয়া, ও পড়িয়া মনে হয় যে ঐ নৃত্যে আমার পূর্ব্বধৃত সবগুলি নাই ; এই জন্য সে নৃত্যের ততটা সাধুবাদ দিতে পারিলাম না।

"রায়-বেঁশে" নৃত্য দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং

উৎসঙ্গে প্রত্যেক নৃত্যশীল ব্যক্তির মৈথিক গঠন দেখিয়া মনে হয় যে, ঐ নৃত্যে আদিম যুগের নৃত্যকারীদের যথেষ্টই মাল-মসলা ও ভঙ্গী আছে। একারণে, drill ও gymnastics ত্যাগ করিয়া, প্রাণবন্ত নৃত্যের প্রসার হইলে, দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। এ বিষয়ে মাননীয়া শ্রীযুক্তা লি, কে, রায় ও কবিসম্রাট ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও মাননীয় মিঃ গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের চেষ্টার জন্য, তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

ঝামেলা

শ্রী রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

সংসারে এ কি ঝামেলা,—
দম্ ছুটে যায় খেটে খেটে, হায়, তবু বকুনির বা ঠেলা :
দীনবেশে থাকি যায় বাড়ে ভয়ে,
রাখিনি ভৃত্য চুরি-সংশয়ে,
বাজারের বোঝা ঘাড়ে করে' বহি,—জমে না একটি আধেলা !

সকালে উঠিয়া মুদীর দোকানে চলিতে চরণ শিহরে,
তিন মাস হ'লো দাম আছে বাকী
দেখিলে দোকানী হাঁকে' দেয় ডাকি',
অপমানে নত মস্তকে মোর চিন্তা-দানবী বিহরে।

কাপাকড়ি নাই,—বহুদিন হ'লো ছেড়েছি সদন বাজারে,
শুধু আলুভাতে ভাত খেয়ে খেয়ে
ছেলেগুলি কাঁদে মোর পানে চেয়ে,
ব্যথার দহনে আঁখিজল যায় ধূঁয়া হ'য়ে আঁখি-আকারে।

কাবুলীওয়ালা দরজা-গোড়াতে রোজ যায় লাঠি ঠুকিয়া,
লুকাইয়া থাকি চুপ্‌চাপ্ ঘরে
মনে মনে কত ডাকি ঈশ্বরে,
ভয়ে-ভাবনায় শোণিতের ধারা দেহে বয়ে যেন শুকিয়া !

ও-পাড়ার পথ ভুলিয়া গিয়াছি বহুদিন হ'লো চলি না,
সাধু সাঁতি পাবে পয়সা ক'আনা
পূজায় কিনেছি কাপড় দু'খানা,
মনে নাই ঠিক্, আরো পাবে কত মলিনার মাসী মলিনা।

পোষাকের কথা ভুলিয়া গিয়াছি গামছা জোটে না পরিতে,
ছেলেগুলি মোরে পরি' ছেঁড়া টানা,
গিন্নীর সদা মুখ হাঁড়িপানা,
খেটে খেটে মরি আমি দিবানিশি—সময় পাই না মরিতে !

ঔষধ নাই, পথ্য জোটে না, বোনটি ভুগিছে অসুখে,
উপবাসী আঁখি করি' ছল ছল
জানায় কেবলি কাঁদনের বল,
সহিতে পারি না,—বেঁচে আছি তবু মিথ্যা আশার দুখে !

শ্রীরামপুর মহিলাসমিতি

শ্রীরামপুর মহিলাসমিতি ১৩৩৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে স্থাপিত হয়। গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান সালে সভ্যাসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু সমিতির অধিবেশনে উপস্থিতিসংখ্যা প্রায় পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সভ্যাসংখ্যা মোট ৪২ জন। সমিতির অধিবেশনে ১০।১২ জন সভ্যা নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকেন। প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ বালিকাবিদ্যালয়ে বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। এবৎসর সমিতির সভ্যাগণের তাঁতবোনা শিক্ষার জন্য একখানি তাঁত বসানো হইয়াছে। মিলের সুতায় জামার কাপড় বোনা হইতেছে। ঐ পর্য্যন্ত মোট ৩০ গজ কাপড় বোনা হইয়াছে। সমিতির অনেকগুলি সভ্যা ঐ কাপড় বুনিয়াছেন। কাপড়ের সব-টুকুই ।/০ গজ হিসাবে বিক্রয় করা হইয়াছে। তিনজন সভ্যা মোটামুটি ভাবে এবং দুইজন ভালভাবেই বুনিতে শিখিয়াছেন। সরোজনলিনী নারীশিক্ষা মন্দির হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণা একজন সুদক্ষা শিক্ষয়িত্রীকে গত বৈশাখ মাস হইতে সেলাই ও ছাটকাট শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। সেলাই ক্লাসে ৯ জন সভ্যা শিক্ষালাভ করিতেছেন। শিক্ষয়িত্রীর উদ্যোগে সেলাই শিক্ষা ভাল-রূপই হইতেছে। এপর্য্যন্ত মোট ১২৮টি জামা সেমিজ ইত্যাদি তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০৬টি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং ২০টি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। ১৩৩৭ সালের পৌষ মাস হইতে বর্ত্তমান সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সমিতির মোট আয় ১৮৭৯/০ এবং মোট ব্যয় ১৭৯।৶৫। তহবিলে মোট ৮৶১৫ গচ্ছিত আছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের মহিলাদের মধ্যে একটি চরকা-প্রতিযোগিতা

হবন্দের উদ্যানে সরোজনলিনী নারী শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের বনভোজন।

মহিলাসমিতির দুইজন সভ্যা যোগদান করেন। তাঁহারা দুইজনই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক লাভে সমর্থ হইয়াছেন। উত্তর ও পূর্ব্ববাংলার বন্যা-পীড়িত পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে শ্রীরামপুর মহিলা-সমিতির সভ্যাগণ বঙ্গীয় সঙ্কট-ত্রাণ সমিতির তহবিলে তাঁহাদের যৎসামান্য ২৫৲ দান করিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী দাস,
সম্পাদিকা।

বড় পাল্লাসী মহিলাসমিতি

ডিষ্ট্রিক্ট্ হেল্‌থ অফিসার মহাশয়ের সহযোগিতায় আমাদের সমিতির মেম্বারগণ একটি দাই ট্রেনিং ক্লাস খুলিয়া ছয় জন মেম্বার প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন

গ্রামে মেম্বারদের উৎসাহে বহু কোন উৎসাহী যুবক একটি দশবর্ষা অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করে। কুসংস্কার বশতঃ সামাজিক নির্য্যাতন এই মেয়েটির উপর প্রবর্ত্তিত হইয়া এয়োতি প্রভৃতি নারীসামাজিক অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিলে, মেম্বারগণের চেষ্টায় উহা হইতে পারে নাই। গ্রামের সামান্যসংখ্যক স্ত্রীলোক এখনও ইহার বিরোধী থাকিলেও, অধিকাংশ স্ত্রীলোক সমিতির মেম্বারগণের সহিত মিলিত হইয়া এই ব্যাপারের সামঞ্জস্যসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়টির অবস্থা খারাপ হইয়াছিল; সম্প্রতি জনৈকা মেম্বার ইহার শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়া পরিচালনা করায় বর্ত্তমানে ইহার অবস্থা ভাল।

গ্রামে উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের অভাব। এইজন্য বিবাহোপযোগী গ্রামের ২।৩টি যুবককে শিক্ষিতা মেয়ের সহিত যাহাতে বিনাপণে বিবাহ হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। মেয়ে শিক্ষিতা হইলে, বালবিধবা কন্যা বিবাহ করা যাইবে।

ইতিমধ্যে গ্রামেশিক বিন্দুসভার জনৈক প্রচারক ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে নারীদিগের শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

শ্রী মনোরমা সরকার,
সম্পাদিকা।

ল্যান্‌স্‌ডাউন রোড মহিলাসমিতি

গত চারি বৎসর হইতে এই সমিতিটি পাড়ার মেয়েদের মধ্যে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। প্রতি শনিবার ও মঙ্গল-বার বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ৮৩ নং ল্যান্‌স্‌ডাউন রোড ভবনে সমিতির ক্লাস বসিয়া থাকে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি হইতে শ্রীমতী সুশীলা দাস মহিলাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত সেলাই ও কাটছাট শিক্ষা দিয়া থাকেন। সঙ্গীতসম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতের ক্লাসে মেয়েদের বামাবন্ধু

কাপেট বোনা—সেবাশ্রমী মহিলাসমিতির শিল্পশিক্ষালয়।

শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেলাই ক্লাসের মাসিক চাঁদা ।৹ আনা মাত্র। সঙ্গীত-ক্লাসের জন্য মাসিক ২৲ টাকা করিয়া লওয়া হয়। সমস্ত মেয়েরাই পায় হাঁটিয়া আসিয়া থাকেন। সম্প্রতি সমিতির সভ্যা-সংখ্যা ২১ জন মাত্র।

শ্রী প্রভাবতী দেবী,
সম্পাদিকা।

যশোহর মহিলাসমিতি

বর্ত্তমানে মহিলাসমিতির সভ্যা-সংখ্যা ৬০ জন। তন্মধ্যে ৩২ জন বিশিষ্টা মহিলা কন্যা আছেন, ইঁহারা শিক্ষিত,

সমিতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা রাজবালা মিত্র; সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা চারুশীলা বসু; সহঃ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অনিমা দেবী। সমিতির গচ্ছিত অর্থ প্রতি বৎসর কোনও জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করা হইয়া থাকে। বাঁকুড়া ও খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে একবার এই সমিতি ৩০৲ ও বস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছে। সরোজনলিনীর জন্ম বাৎসরিক-উৎসবে কাঙ্গালী-বিদায় এবং অন্ধ ও খঞ্জদিগকে বস্ত্র দান করা হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ২ বৎসর ধরিয়া দুইটি দরিদ্র বালিকার লেখাপড়াইবার যাবতীয় খরচ সমিতি চালাইতেছে। এই বৎসর মহিলাসমিতির সভ্যাগণ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত স্থানের সাহায্যার্থে বাড়ী বাড়ী যাইয়া অর্থ এবং বস্ত্র সংগ্রহ করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট ২৫৲ এবং ৩৭ খানা বস্ত্র এবং দেশনায়ক ষতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নিকট ২৫৲ প্রেরণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই বৎসর ষশোহর মহিলাসমিতি স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য এক বিশেষ দান করিয়াছেন। স্থানীয় বিদ্যালয়টি সংস্কার অভাবে জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমিতির সভ্যাগণ বিশেষ উদ্যোগ সহকারে টিকিট বিক্রয় করিয়া স্কুলের সাহায্যের জন্য একটি অভিনয় করেন এবং এতদ্বারা প্রায় ৪০০৲ টাকা সংগ্রহ করেন। অধিকাংশে টাকা দ্বারা স্কুল গৃহের সংস্কার সাধিত হয়। তদ্ভিন্ন মহিলাসমিতি একটি লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। মহিলাসমিতির এই সাহায্যে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারা মহিলাসমিতির ১০ জন সভ্যা লইয়া স্কুলের অন্তর্ভুক্ত একটি পরামর্শসংঘ গঠন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই বালিকাবিদ্যালয়টি উচ্চ স্কুলে পরিণত করিতে এই সংঘ চেষ্টা করিতেছে।

পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান ও মেলামেশার বিষয়ে চেষ্টা :—

মহিলাসমিতির সভ্যাগণ যাহাতে পরস্পর মেলামেশার সুযোগ লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য সমিতি হইতে কখন কখন প্রীতিভোজ অথবা কখন কখন অভিনয়াদি হইয়া থাকে। সমিতির স্থায়ী কোনও গৃহ না থাকায় প্রত্যেক সভ্যার গৃহে পর্য্যায়ক্রমে সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। এতদ্বারাও সভ্যাগণ মেলামেশার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

সেলাইয়ের কাজ—সেবাশ্রম মহিলাসমিতি।

সভ্যাগণের শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা করিবার জন্য সম্পাদিকার গৃহে একটি খেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই স্থানে প্রত্যেক দিন অনেক সভ্যা যোগদান করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত সমিতির অন্যতমা সভ্যা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী সেন প্রায় ৪০টি বালিকা লইয়া প্রতিদিন খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদি শিক্ষা দান করেন।

এক বৎসর হইল সমিতি হইতে ২০৲ বেতন দিয়া শিল্পশিক্ষার জন্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রতি পাড়ায়

হইয়া শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সভ্যাগণ সার্ট, পাঞ্জাবী, প্যাণ্ট ইত্যাদি অতি উত্তমরূপে তৈয়ারি করিয়া থাকেন। এবং সময় ২ একদিন সভ্যাগণ নিজেদের মধ্যে এমব্রয়ডারী, পশমী বোনা প্রভৃতি শিল্পাদি করিয়া থাকেন। এই সকল দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রী করার ব্যবস্থার সুবিধা না হওয়ায় সভ্যাগণ স্ব স্ব গৃহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

সমিতির অধিবেশন :—

প্রতি মাসে এগারো সাধারণ অধিবেশন হইয়া থাকে। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণকে লইয়া মাসে দুইটি অধিবেশন হইয়া থাকে। তাঁতের দরুণ ক্লাস সপ্তাহে দুদিন ও এমব্রয়ডারী ক্লাস একদিন হয়।

রাজবালা মহিলাসমিতি, ভবানীপুর

গত বৎসর অপেক্ষা আমাদের সমিতির সভ্যা বা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশিষ্ট সভ্য-সংখ্যাও দশজন হইতে প্রায় কুড়িজন হইয়াছেন। সাধারণ সভ্যা মাত্রেই সমিতির শিক্ষাধীনে নানারূপ নিত্য-প্রয়োজনীয় গৃহশিল্প, যথা—জামার নানাপ্রকার ছাঁটকাট (পেনী, ফ্রক, সার্ট, পাঞ্জাবী, ব্লাউস, বডিস, ব্লাউজ, সেমিজ, নিকার, রাকপ্যাণ্ট, কোট প্রভৃতি) শিক্ষা, সূচিকার্য্য (এমব্রয়ডারী), সশমের মোজা, টুপী, জাসী, সোয়েটার, পুলোভার প্রভৃতি নিয়মিতভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং ঐ সঙ্গে বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, হাতের লেখা, তৃতীয়মান অর্থাৎ ক্লাস (III) শ্রেণীপর্য্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া

আরামবাগ মহিলাসমিতি (পুরীধাম)।

সমিতিতে যাতায়াতের জন্য গাড়ী নির্দ্দিষ্ট আছে।—উহার ব্যয় সমিতির অর্থ হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। ১০ জন সভ্যা ১৲ হিসাবে চাঁদা দান করেন। অপরাপর সভ্যাগণ ৷৷০ এবং অক্ষম হইলে ফ্রি সভ্যাও লওয়া হইয়া থাকে।—সমিতির সঞ্চিত অর্থ সভ্যানেত্রীর নামে ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে হস্তে ২০০৲ জমা আছে। মাসিক চাঁদার অর্থ সম্পাদিকার নিকট থাকে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত রূপ ব্যয় হইয়া থাকে :—২৲ দরওয়ান মাহিনা
৪৲ গাড়ী ভাড়া
৪৲ একজন চাপরাসীর বেতন
১৲ একটি দরিদ্র বালিকার মাহিনা

১৯৲ মাসিক ব্যয়।

শ্রী চারুশীলা বসু,
সম্পাদিকা।

হইয়া থাকে। প্রথমবর্ষে একজন মাত্র শিক্ষয়িত্রীর উপর শিক্ষাদানের ভার অর্পিত ছিল কিন্তু আলোচ্য বর্ষে শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষার প্রকার বৃদ্ধি করায় শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাও বাড়াইতে হইয়াছে। শ্রীমতী ষোড়শীবালা ঘোষ জামার ছাঁটকাট প্রভৃতি গৃহশিল্প ও তাঁতের কার্য্য শিক্ষা দিবার ভার, সরোজনলিনী কেন্দ্র সমিতি হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া—গ্রহণ করতঃ তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। শ্রীযুক্তা প্রভাতি দেবী তাঁহার সুনিপুণ হস্তে মনোহর সূচিকার্য্য শিক্ষা দান করিতেছেন। শ্রীযুক্তা শান্তিময়ী ঘোষ মহাশয়া পঠন ও লিখনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উল্লিখিত তিনজন শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা সমিতির শিক্ষার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে এবং ৫০ জন শিক্ষার্থিনী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।

যাঁহাদের ঐকান্তিক যত্নে ও প্রচেষ্টায় এই সমিতি সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মিস্ লতিকা রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রতি মাসে সমিতিকে ৩০৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার এই অসামান্য সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই সমিতি আজ এত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের গভীরতম কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ৩৯নং গিরিশ মুখার্জ্জি রোড, গিরিশ-ভবন-স্থিত শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাসবাটীর এক অংশ বিনা ভাড়ায় সমিতির কার্য্যের জন্য ছাড়িয়া দিয়া সমিতিকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন; তজ্জন্য সমিতি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। উক্ত গিরিশ-ভবন-স্থিত মাননীয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশিশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ আমাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুলোচনা দেবীও আমাদিগকে সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। মোটের উপর এই সমিতি মুখার্জ্জি পরিবারবর্গের নিকট তাঁহাদের অকপট আন্তরিকতার জন্য ঋণী।

আমাদের সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ দে মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর স্মৃতির জন্য এই সমিতিকে একটি সেলাই-কল প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে সমিতি তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছে।

মাননীয়া প্রকৃতি দেবী অনুগ্রহপূর্ব্বক সমিতির সহ-সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

কেন্দ্র সমিতির সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী নানা উপায়ে সাহায্য করিয়া আমাদের সমিতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া সমিতির কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কবিভূষণ বসু মহাশয় আমাদিগকে সমিতি পরিচালনা বিষয়ে বহু সাহায্য করিয়া বাধিত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞ।

এই সমিতির উন্নতির জন্য কেন্দ্রসমিতি হইতে মাসিক ৫৲ টাকা সাহায্য করা হইয়া থাকে। ইহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। শুধু টাকা দ্বারা নহে কেন্দ্রসমিতি এ বর্ষে কয়েকবার আমাদের সমিতি পরিদর্শন করিয়াছেন ও আলোকচিত্র সাহায্যে সমিতি কর্ত্তৃক আহূতা মহিলাবৃন্দকে নারীপ্রগতির নব নব তথ্য বর্ণনা করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুক্তা চারুবালা সরকার আমাদের সমিতি পরিদর্শন করিয়া সমিতির কার্য্যাবলীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা গীতা দেবীও পরিদর্শনান্তে সমিতির বহু সুখ্যাতি করিয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে ব্যয় বাদে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সমিতির মজুত তহবিলে ৮০৲ টাকা আছে।

শ্রী রাণুবালা মিত্র,
সম্পাদিকা।

ভ্রম সংশোধন

"আহরণ" বিভাগে উদ্ধৃত 'চুরুট' নামক নিবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা "ভারতবর্ষ" হইতে আহৃত হইয়াছে।

কঙ্কাল

শ্রী শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

পুরানো বাস্তুভিটে—
কত অলিখিত ইতিহাস আছে এর প্রতিখানি ইটে!
কত মধু স্মৃতি অন্তরে ধরি' দাঁড়ায়ে নীরব স্থির,—
কত ঝড় ব'য়ে গিয়াছে উপরে, পড়েছে বৃষ্টি নীর।
এক কালে এই ভিটাখানি ছিল মুখর উৎসবেতে,
ক্রীড়াচঞ্চল ছেলেদের ছিল কত কলরব এতে।
এখন সেদিন নাই—
পুণ্য-কঙ্কাল বাস্তুভিটাটি—আছে শুধু স্মৃতিটাই!

মনে পড়ে মোর শৈশবে কত খেলিয়াছি আঙিনাতে,
কভু হাসাহাসি কভু কোন্দল, কভু বারি আঁখিপাতে।
ঐ যে ইটের স্তূপের উপর উঠেছে অশথ গাছ,
ঐখানে ছিল তুলসী মঞ্চ,—কোথা সে মঞ্চ আজ!
ঐ মঞ্চেতে পিতামহী মোর অঞ্চল দিয়া গলে,
সাঁঝের প্রদীপ রেখেছে প্রণতা হ'তেন তুলসী-তলে।
কোথা আজি সেই দিন,—
কালের আড়ালে শৈশবস্মৃতি স্বপনের মাঝে লীন।

স্নেহ-আশ্রয়ে পালিল যাদের, তারা কত গেল ছাড়ি',—
সেদিনের শিশু কোন্ সে অজানা দেশেতে জমালো পাড়ি;
এখনো ওধরে তেমনি তো আঁকা রহিয়াছে বসুধারা,
উৎসব-স্মৃতি আছে মিলনের,—কোথা বর-বধূ তা'রা!
গত সুখ-স্মৃতি, অনলেতে হৃদি পুড়িয়া হয়েছে ছাই;
বজ্র-আহত বৃক্ষের মত দাঁড়ায়ে ভিটাটি তাই—।
আজি বহুদিন পরে,—
মোদের পুরানো ভিটাটি দেখিয়া আঁখিতে অশ্রু ঝরে!

কেন্দ্রসমিতির কথা

কেন্দ্রসমিতির নূতন নির্ব্বাচন

গত ৩রা মার্চ্চ সংঘের রাজা মাননীয় স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের সভাপতিত্বে কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কেন্দ্রসমিতির পরিচালক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

পৃষ্ঠপোষিকাগণ

মাননীয়া লেডী জ্যাকসন; বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী।

সহঃ পৃষ্ঠ-পোষিকাগণ

সংঘের লেডী রাণী সাহেবা; মিসেস্ এস্,এন্, মল্লিক; শ্রীযুক্তা বীণাপাণি খান (বারাজোল); লেডী ইস্‌মাইল সেঠ্।

সহঃ পৃষ্ঠ-পোষকগণ

রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে বাহাদুর; রায় বাহাদুর সেট্‌মল ডাগ্‌মিয়া; রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ বাহাদুর; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল; মাননীয় রাজা নাজিমুদ্দিন সি, আই, ই; রায় বাহাদুর মধুরা প্রসাদ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি, আই, ই, এম, এ, বি, এল; লেঃ কর্ণেল স্যার এইচ, সুরাবর্দ্দি; মাননীয় স্যার এ, কে, গজনবি, মাননীয় মেঃ বি, পি, সিংহ রায়; মাননীয় নবাব কে, জি, এম, কায়োকি।

সভাপতি

মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী।

সহঃ সভানেত্রী

শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী দেবি, এ, বি, টি।

সহঃ সভাপতি

স্যার হরিশঙ্কর পাল।

সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ

রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

সম্পাদিকা

শ্রীযুক্তা হেমনতা দেবী।

সহযোগী সম্পাদিকা

শ্রীযুক্তা গীতা দেবী, বি, এ, বি, টি; শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল; ডাঃ শ্রীযুক্ত রেবেন্দ্রনাথ রায় এম, বি।

সহকারী সম্পাদিকা

শ্রীযুক্তা দীপ্তি দেবী বি, এ, বি, টি।

পরিচালক-সভার অন্যান্য সভ্য

মিঃ কে. সি রায় চৌধুরী এম, এল, সি; শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল; রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ; শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি আই. ই. এস এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস; মিঃ এইচ, কে, দে বার-এট্-ল; শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন; শ্রীযুক্তা কাদিনী বসু; রায় বাহাদুর ইন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়; ডাঃ পি, সি, সেন এম, বি; শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র গুপ্ত বি, এল; মিঃ টি, পি ঘোষ; ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী পি, এইচ্, ডি; শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্র; মিঃ এন্, এন্, ঘোষ বার-এট্-ল; শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস, সি; রায় বাহাদুর সরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী এম, এ, বি, টি; রায় শশিভূষণ দে বাহাদুর; শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ; শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, এস; শ্রীযুক্ত সুধা ও রায়; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্তা মনীষা রায় এম, এ; মিঃ টি, সি, বসু; মিঃ ডাবলু, সি, বানার্জ্জি; শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস এম, এ; শ্রীযুক্ত অনোরঞ্জন বসু বি, এ; শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার বি, এল; শ্রীযুক্তা সুশীলা রায়; লেডী সি, ডি, বসু; রায় জে, সি, সেন বাহাদুর; মিসেস কাজিমুন্নেসা মোহা এম, এ; শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বোষ; ডাঃ সতীন্দ্রনাথ মিত্র এম, বি; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পালা; মিঃ এন, এস, লেটেল; শ্রীযুক্ত মণিভূষণ দত্ত; শ্রীযুক্ত মনে রঞ্জন ঘোষ।

কস্‌বা মহিলাসমিতি

গত ২রা জানুয়ারী সিঙ্গাপুর ওয়াই, ডব্লিউ, সি-এর অনারারী সেক্রেটারী কুমারী ওরেন কস্‌বা মহিলাসমিতির কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন। ঐ দিন তিনি নারীমঙ্গল বিষয়ে মহিলাদের নিকট একটি বক্তৃতা করেন। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, তাঁহার এই বক্তৃতা বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সমিতির সভ্যারা অতি সুললিত সঙ্গীত দ্বারা কুমারী ওরেনকে আপ্যায়িত করেন।

সৈয়দপুরে স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনী

ই, বি, আর রেলের কর্তৃপক্ষ ও Railway welfare Officerএর উদ্যোগে ই. বি, আর-এর সৈয়দপুর ষ্টেশনে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি অতি সুন্দর স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে এই স্থানে শিশুমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির শিল্পদ্রব্যের একটি ষ্টল পরিচালন করেন।

মিউজিয়মে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী

গত ২০শে জানুয়ারী হইতে মিউজিয়মে কলিকাতা স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল সপ্তাহ উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হয় তাহাতে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনার্থ ও পুস্তিকা বিক্রয়ের জন্য একটি অতি সুন্দর ষ্টল খোলা হইয়াছিল। এই ষ্টলের বিভিন্ন দ্রব্যগুলি, বিশেষভাবে গ্রাম্য কাঁথার উপরে সুন্দর হাতচিত্র, কাগজের প্রস্তুত ফুল, উলের আসন এবং শিশুবিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রশংসিত হইয়াছে।

বেহালায় শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনী

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বেহালায় একটি শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল

সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, ঐ দিন স্বাস্থ্য ও শিশু মঙ্গল বিষয়ে আলোকচিত্র সাহায্যে একটি বক্তৃতা করেন।

খড়গপুরে শিশুমঙ্গল ও স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী

খড়গপুরে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী উপলক্ষে নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন গত ১০ই ফেব্রুয়ারী মহিলা-দিবসে নারীমঙ্গল ও তাহার প্রচেষ্টা বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

শ্রীরামপুরে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী

শ্রীরামপুরে স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন গত ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী রোগ ও তাহার প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য ও শিশু-মঙ্গল বিষয়ে আলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন। বহু লোক প্রতিদিন এই বক্তৃতায় উপস্থিত হন।

সিউড়িতে বিরাট শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প-প্রদর্শনী

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সিউড়িতে একটি বিরাট শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প-বিষয়ক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে সন্তোষনলিনী গুপ্ত নারীমঙ্গল সমিতির শিল্প-বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্য ও বিভিন্ন শাখা-সমিতি হইতে প্রেরিত শিল্পদ্রব্যের একটি ষ্টল খোলা হইয়াছিল। শিল্পদ্রব্যগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। লোহাগড়া মহিলাসমিতি কাঁথার জন্য, দুমকা সমিতি কাঠের চিরুনীর জন্য, সন্তোষনলিনী শিল্প-বিদ্যালয় সেলাইয়ের কাজের জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র লাভ করেন। জেমুনের মৌলমিন মহিলাসমিতি কাগজের ফুলের জন্য এবং বলোহরের ডোমাধাটা মহিলাসমিতি উলের আসনের জন্য দুইটি রৌপ্যপদক পুরস্কার পান।

হুগলী মহিলাসমিতি

বর্ত্তমানে কিছুদিন হয় শ্রীযুক্তা চারু দাস হুগলী মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা রূপে তাহার কার্য্য পরিচালন করিতে-

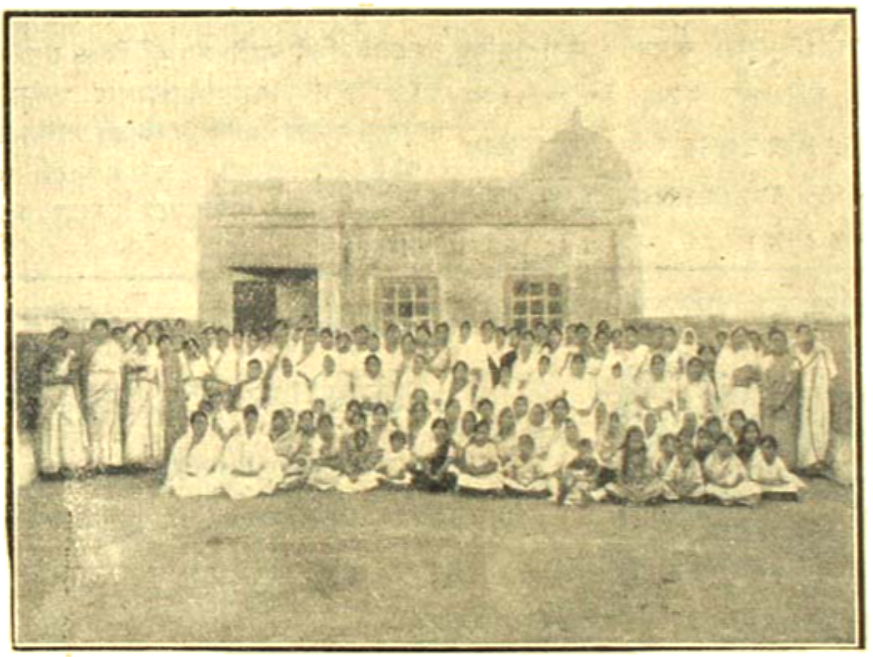

কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক মহিলা-সম্মেলন।

ছেন। সম্পাদিকার পত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে সমিতির কাজ ভালই চলিতেছে। এবার উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পে সাহায্য করার জন্য এই সমিতি ৫০৲ টাকা দান করিয়াছে এবং শীতকালে ২০৲ টাকা মূল্যের শীতবস্ত্র দরিদ্রদিগকে দান করা হইয়াছে। এই সমিতি হইতে দুইটি সেলাইয়ের কেন্দ্র খুলিয়া সেলাই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শীঘ্রই এখানে তাঁতে বস্ত্রবয়ন শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হইবে।

বাংলার নিজস্ব কলা প্রদর্শনী

একবৎসর হইল শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বঙ্গীয়

পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি নাম দিয়া একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় এই বৎসরের মধ্যে বাংলার পল্লীসম্পদের অনেক কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত বাংলার লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য এখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি বাংলার নিজস্ব কলার যে সমস্ত আশ্চর্য্যজনক নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা লইয়া একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের আওতায় কলিকাতায় ১৯নং সমবায় ম্যানসনে এই প্রদর্শনী হইতেছে। সুপণ্ডিত কলাবিদ্‌ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ২০শে মার্চ্চ রবিবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বাংলার নিজস্ব কলা সম্বন্ধে একটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। কলাপারদর্শিনী কলিকাতার অনেক সুধীমণ্ডলী সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। আগামী সংখ্যায় বঙ্গলক্ষ্মীতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

কেন্দ্রসমিতিতে অভিনয়

কেন্দ্রসমিতির বার্ষিক উৎসবের সময় শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর নেত্রীত্বে সমিতির কার্য্যালয়ে ওমর খৈয়মের অভিনয় হইয়াছিল। সরোজনলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের এবং বাহিরের কয়েকজন মহিলা ছাড়া বিশেষ প্রশংসার সহিত নিপুণভাবে অভিনয় করেন। শ্রীযুক্তা প্রকৃতি দেবী এই অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অশেষ পরিশ্রম করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা গীতা দেবী, শ্রীযুক্তা দীপ্তি দেবী এবং শ্রীমতী মমতা মিত্র নামাভাবে অভিনয়ে সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতার হাস পরিবারের মেয়েরা বিশেষ তৎপরতার সহিত অভিনয় করেন। আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীত

আগামী ১৬ই এবং ১৭ই এপ্রিল শনিবার ও রবিবার সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি ও সুলতানপুর শ্রীরাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে গলফ্‌ন পার্কে লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীত প্রদর্শিত হইবে। বিখ্যাত বাইবিদে নৃত্য, কাঠি-নৃত্য, ধুপ-নৃত্য প্রভৃতি নৃত্য প্রদর্শিত হইবে। কেন্দ্রসমিতির কার্য্যালয়ে ইহার জন্য টিকিট পাওয়া যাইবে।

শিক্ষিতা মহিলাদের রুচি অনুযায়ী প্রস্তুত সাবান

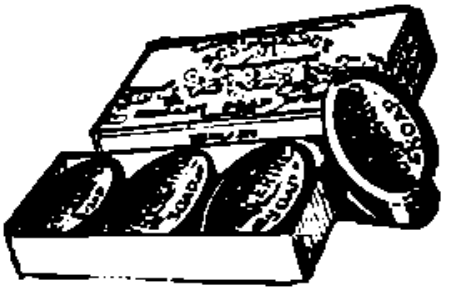

হিমানী-গ্লিসারিণ

মধুর গন্ধ, ব্যবহারে গা চড় চড় করে না। গায়ের চামড়া নরম থাকে ও সুন্দর হয় ও কম ক্ষয় বলিয়া হিসাবে মত সস্তা। মধুর গন্ধে আপনার স্নানাগার আমোদিত করিবে।

মুক্তার মত দাঁতগুলির সৌন্দর্য্য রক্ষার ভার

হিমানীর

নীম ডেণ্টাল ক্রীম

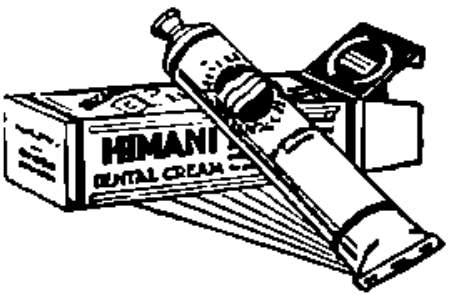

লইতে সক্ষম—অনেক রকম নকল হইয়াছে। হিমানী নামটী দেখিয়া লইলে পশ্চাতে কোনও অনুতাপ করিতে হইবে না।

যাঁহারা পায়োরিয়া নামক দন্ত রোগে কষ্ট পান তাঁরা হিমানীর আইওডিন ডেণ্টাল ক্রীম ব্যবহার করিবেন—ভারতে হিমানীই আইওডিন ডেণ্টাল ক্রীমের প্রথম প্রবর্ত্তক।

প্রচারক—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং ৪৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him. at 45 Beniatola Lane. Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচলে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ঐক্যের একটি পথ

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে অন্য অনেক দেশের লোকদের মত ঐক্য জন্মিবার অনেকগুলি বাধা আছে। সেগুলি ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে বটে, কিন্তু কতকগুলি এখনও প্রবল আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে ভাষার ভেদ একটি বাধা। যাহারা ইংরেজী জানে, তাহারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের ইংরেজী-জানা লোকদের সহিত মিলামিশা করিতে পারে। হিন্দী বা হিন্দুস্থানী জানিলে ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের বিস্তর লোকের সহিত কথাবার্ত্তা এবং ভাব ও চিন্তার বিনিময় চলিতে পারে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক লোক হিন্দী শিখিতেছে। বাংলা জানিলে বঙ্গ বিহার ছোটনাগপুর উড়িষ্যা ও আসামের অধিকাংশ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা চালান যায়; তদ্ভিন্ন অন্যত্র প্রবাসী বাঙালী এবং কতকগুলি বাংলা-জানা অবাঙালীর সহিতও ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান চলিতে পারে।

ধর্ম্মতের পরস্পরের সহিত মিলামিশার যতটা অন্তরায় আগে ছিল, এখন রাজনৈতিক কারণে উহা তদপেক্ষা অনেকটা বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা কর্ত্তব্যবোধে পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে মিশিলে এই বাধা ক্রমশঃ কমিবে; কারণ মানুষের সঙ্গে না মিশিলে তাহাকে ভাল করিয়া জানা যায় না, এবং ভাল করিয়া না-জানিলে তাহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় না।

শুধু পুরুষ মানুষরাই পরস্পরের সহিত মিশিলে আমাদের জাতীয় ঐক্য অন্য অনেক দেশের লোকদের মত হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নারীরা পরস্পরের সহিত মিশিলে সকল প্রদেশ ও

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীরা দুর্নীতি ও শিষ্টাচার অতিক্রম না করিয়া পরস্পরের সাহচর্য্য করিলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পাইবে। নারীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা এইরূপ মিলামিশা ও সাহচর্য্যের অন্তরায়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত দেশগুলিতে প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুনারীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। মুসলমানদের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক পরিবার অবরোধপ্রথা না-মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলা দেশে হিন্দুদের মধ্যে—বিশেষতঃ গ্রাম-অঞ্চলে—পর্দ্দার আতিশয্য কখনও ছিল না। এখন কি নগর কি গ্রাম, সর্ব্বত্রই হিন্দুদের মধ্যে পর্দ্দা কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে উহা এখনও খুব প্রবল। পর্দ্দা মানেন না এমন মুসলমান পরিবারের সংখ্যা অত্যল্প বলা। এইজন্য হিন্দু পুরুষ ও নারীদের সহিত মুসলমান পুরুষ ও নারীদের মিলামিশার প্রবল বাধা রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, মুসলমানেরা পর্দ্দা মানিলেও যে-সব হিন্দু পর্দ্দা মানেন না, তাঁহাদের বাড়ীর মহিলারা মুসলমান অন্তঃপুরে পর্দ্দানশীন মহিলাদের সহিত দেখা করিতে পারেন এবং মুসলমান পুরুষদের সহিতও কথা বলিতে পারেন। স্থলবিশেষে ইহা সম্ভবপর হইলেও সাধারণতঃ ইহা করা চলে না। কারণ, যাঁহারা পর্দ্দা মানেন, তাঁহারা প্রধানতঃ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে উহা মানেন, যে, পর্দ্দা ব্যতিরেকে নারীদের মানসম্ভ্রম ও সুশীলতা রক্ষিত হয় না। সুতরাং যাঁহারা নিজের পরিবারে ও সমাজে অবরোধপ্রথা মানিয়া চলেন, তাঁহারা পর্দ্দানশীন ভিন্ন স্বদেশীয়া অন্য মহিলাদিগকে মানসম্ভ্রমবিশিষ্ট ও সুশীলা বলিয়া অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ হওয়া অন্যায় ও অসঙ্গত নহে।

এইরূপ যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া বুঝা যায়, যে, অবরোধপ্রথা আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির একটি বাধা। এই বাধা অবশ্য ক্রমশঃ দূর হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এই সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এখনও চালাইতেছেন। তাহার পর রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ইহা ব্যাপকতর হইয়াছে।

সম্প্রতি মুসলমান সমাজে একটি অভিজাততম পরিবারে পর্দ্দা উঠিয়া যাওয়ার আশা হয় যে, ক্রমশঃ এদেশের মুসলমান সমাজ হইতেও উহা উঠিয়া যাইবে, যেমন তুরস্ক, এবং কিয়ৎপরিমাণে পারস্য প্রভৃতি অন্য কোন কোন মুসলমান দেশ হইতে উহা উঠিয়া গিয়াছে। পর্দ্দা উঠাইতে গেলে নারীদিগকে শিক্ষিত করা দরকার, ইহা অনেকে বলেন। একথার আলোচনা না করিয়া ইহাই বলিতে চাই, যে, পর্দ্দা উঠাইয়া না দিলে শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট হইতে পারে না। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দরাবাদের লোক-সংখ্যা এবং আয় সকলের চেয়ে বেশী। ইহার নৃপতি নিজামের চেয়ে বড় মুসলমান নৃপতি ভারতবর্ষে নাই। তিনি সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বেড়াইতে যান। সেখানে তিনি যে-দিন মুসলমান বালিকাবিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলেন, সেদিন ঐ বিদ্যালয়ে তাঁহার সম্মানার্থ পর্দ্দা টানা হয় নাই। তিনি তাহাতে প্রীত হইয়া ছাত্রীদিগকে বলেন, "তোমরা দেখিতেছ আমার বাড়ীর মেয়েরা পর্দ্দা মানে না; তোমরাও তাহাদের মত পর্দ্দা মানিও না।" বস্তুতঃ লক্ষ্ণৌতে নিজাম যতদিন ছিলেন, তাঁহার সম্বর্দ্ধনাদির জন্য আয়োজিত যত সভা-সমিতিতে গিয়াছিলেন, বা শহরের দ্রষ্টব্য যে-সব স্থান ও অট্টালিকাদি দেখিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যেখানে যেখানে তাঁহার পরিবারের অন্তঃপুরিকারা গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় গিয়াছিলেন। ইহাতে লক্ষ্ণৌয়ের মত মুসলমান সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রের উলেমা ও মুজ্‌তাহিদ্‌গণ কোন প্রকার প্রতিবাদ বা আপত্তি করেন নাই।

তুরস্ক পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশে এ বিষয়ে যেরূপ সংস্কার হইয়াছে, নিজামকে তাহার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হইতেছে।

শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী এবং কবির প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পারস্য দেশে যাইবেন। ১১ই মার্চ্চ বম্বাই হইতে এরোপ্লেনে তাঁহাদের রওনা হইবার কথা। ইতিমধ্যেই তাঁহাদের অন্যতম সঙ্গী মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীর বৈদেশিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬ঠা মার্চ্চ এরোপ্লেনে যাত্র

করিয়া পারস্যে পৌঁছিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট হইতে ঐ দেশের সামাজিক অনেক তথ্য জানিতে পারা যাইবে। কাগজপত্রে যাহা পড়িয়াছি, তাহার দুএকটি কথা বলিতেছি।

অবরোধপ্রথা বোরখাপরিধান প্রভৃতি অনিষ্টকর রীতি দূর করিয়া পারস্যনারীদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা পারস্য দেশে বহু বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন কাল হইতে আগত সুফীদিগের ধর্মমত এবং আধুনিক বাহাই ধর্মসম্প্রদায়ের মত এইরূপ চেষ্টার অনুকূল ছিল। ১৯২১ সালে যখন রিজা শাহ পহ্‌লবী তাৎকালিক পারস্য-রাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন, সেই সময়ে নূতন যুগ আরম্ভ হয় এবং পারস্যের স্বদেশপ্রেমিক মহিলা-সমিতি স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সভ্যদিগকে নানা উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। এখনও তাহার সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। কিন্তু ইহার নিম্নলিখিত ছয়টি উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হইতেছে :—

(১) স্ত্রীস্বাধীনতা; নারীদের মধ্য হইতে অবগুণ্ঠন অপসারণ।

(২) সামাজিক, পৌর ও রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহে তাহাদের অধিকার স্থাপন।

(৩) ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাদের বিবাহ রদ করা।

(৪) বহুবিবাহ বন্ধ করা।

(৫) স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে বিবাহের সময় স্বামীর অঙ্গীকৃত যৌতুক স্ত্রীর জন্য আদায় করিবার নিমিত্ত বিশেষ নিয়মাবলী নির্ধারণ।

(৬) নারীদের স্বাধীনভাবে সভাসমিতি গঠন ও পরস্পরের সাহচর্য্য করিবার অধিকার, এবং তাহাদের প্রতিপক্ষের সহিত তর্কবিতর্ক চালাইবার অধিকার স্থাপন।

পারস্যের পার্লেমেণ্ট বা ব্যবস্থাপক সভার নাম মজলিস্। কয়েক মাস ধরিয়া মজলিসের সম্মুখে পারস্যের বিবাহঘটিত আইনের পরিবর্তনার্থ একটি বিল্ উপস্থাপিত ছিল। সম্ভবতঃ তাহা এতদিন আইনে পরিণত হইয়াছে। ইহার একটি উদ্দেশ্য বিবাহের ন্যূনতম বয়স ৯ হইতে বাড়াইয়া ১৩ করা। আইনের আর একটি ধারায় আছে, যে, যদি কেহ একটি পত্নী থাকিতে আবার বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে যাহাকে দ্বিতীয় পত্নী করিতে যাইতেছে তাহাকে প্রথম পত্নীর অস্তিত্বের বিষয় জানাইতে হইবে; না জানাইলে দ্বিতীয় বিবাহ আইন অনুসারে অসিদ্ধ হইবে। আইনের অন্য একটি ধারা অনুসারে, বিবাহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার কেবল পুরুষদের একচেটিয়া থাকিবে না। ইহার অর্থ এই, যে, যে-যে রকম দুর্নীতি বা অন্য কারণে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, স্ত্রীও সেই সেই কারণে স্বামীকে তালাক দিতে পারিবে। তা ছাড়া, বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিলে স্বামী বিবাহের সময় স্ত্রীর নিকট যে-যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা পালন করিতে হইবে।

বিলটি আইন হইবার আগে হইতেই লোকমত পুলিসের সাহায্যে তদনুসারে কাজ আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দশ বৎসরের একটি মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য রাজপথ দিয়া একটি মিছিল যাইতেছিল। তাহাদিগকে থামাইয়া বিয়ের কাজী ও তাহার বাপমাকে রাজকর্মচারীদের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা তখনি সবাসরি বিচার করিয়া বিবাহ বন্ধ করিবার হুকুম দিল।

পারস্য অপেক্ষা তুরস্কে সামাজিক পরিবর্তন বেশী হইয়াছে। বোরখা অবগুণ্ঠন তুরস্ক হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তুর্কমহিলারা এখন অবাধে মুখ খুলিয়া সর্ব্বত্র চলাফিরা করিতে পারে। আইনের দ্বারা তাহাদিগকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নূতন পদবীতে উন্নীত করা হইয়াছে। আর্থিক বিষয়ে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষদের সহিত সাম্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিবাহবিষয়ক আইনও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কন্যাদিগকে আর সম্প্রদান করা হয় না; তাহারা নিজেই নিজের জীবনসঙ্গী নির্ব্বাচন করে। তালাক দিতে হইলে মুইজার্লাণ্ড দেশের অনুরূপ তুর্ক আইন অনুসারে ডিক্রি তাহা করা চলে না। সর্ব্বসাধারণের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে বালিকা ও তরুণীরা শিক্ষা পাইতে পারে এবং পাইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রী উভয়ের একই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ সমর্থিত হইয়াছে এবং তদনুসারে কাজও হইতেছে।

ভারতবর্ষের বাহিরে মুসলমান সমাজের যে প্রগতি ও

উন্নতি হইতেছে, ভারতীয় মুসলমান সমাজ তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে না, পারিতেছে না। নিজামের আচরণ তাহার একটি প্রমাণ। বিদেশে যাহা ঘটিতেছে, হিন্দু বা মুসলমান কাহারও দ্বারা তাহার অন্ধ অনুকরণ সমর্থনযোগ্য নহে। বিচার করিয়া সাহসের সহিত শ্রেয়ের পথে চলিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান তাহা করিলে জাতীয় ঐক্য, সংহতি, প্রগতি ও উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে।

বাসনা আমার

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

নারীজন্ম হয় যদি ফিরে এই দেশে
তুমি এসো আরবার মোর বর বেশে,
তোমারে পরাব মালা। প্রেমের কলায়
তোমায় আমায় মাঝে ব'বে অহরহ,
হর-পার্ব্বতীর মত। মোর অভিমান
হাসিমুখে স'রে যেয়ো,—দিয়ো মোরে স্থান
ভালোবেসে কোলে বুকে। ভিখারী ঠাকুর,
তোমার সকল দৈন্য করি' দেব দূর।
স্বল্পে তুষ্ট তোমা, আর রুষ্ট ক্ষণতরে,
আমার সোনার দক্ষী পরমাণ্নে ভরে'
অন্নপূর্ণা দেব পাত্তে। কামনা আমার
পাই যেন পুত্ররূপে অনিন্দ্য কুমার
দেব-সেনাপতি ; যেন সতীর মতন
অমনি মরণ হয়,—জীবনে যতন!

সে-কালের কথা

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

ডাক্তার কবিরাজ

গোড়ায়ই ব'লে রাখা ভাল যে, আমি পাড়াগাঁয়ের লোক ; অবস্থার তাড়নায়,দারিদ্র্যের প্রেরণায় সহরে প্রবাস-জীবন যাপন কর্‌তে হয়েছে। তা ব'লে পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নাই,—গ্রাম-পল্লীর সে-কালের সুখের স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়ে চির-মুদ্রিত হ'য়ে আছে। সুতরাং, আমার 'সে-কালের কথা' সেই গ্রাম-পল্লীরই কথা —সহরের বিলাস-বিমূঢ় স্মৃতির চর্চ্চা নহে। আমরা বাল্যকালে আমাদের পাড়াগাঁয়ে যা দেখেছি, যা ভোগ করেছি, 'সে-কালের কথা' তারই চিত্র—আমার বৃদ্ধ বয়সের দৌর্ব্বল্য ও অক্ষমতা অবশ্য সে চিত্র যথাযথ ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌বে না। তা হ'লেও সেই বহুকাল পূর্ব্বের স্মৃতি-চর্চ্চা আমাকে আনন্দ দেয়, আমার প্রাণে শান্তি দান করে। তারই জন্য আমার এ চেষ্টা ব্যর্থ, কি সার্থক, সে কথা ভাব্‌বার আমার অবকাশ নেই। আমি ধীরে ধীরে সেই সে-কালের,—আমার বাল্যকালের দেশের কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। বঙ্গলক্ষ্মীদের সুস্বাদু, সমৃদ্ধ পাতে পরিবেষণ কর্‌বার মত দ্রব্যসম্ভার আমার নেই, সে কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে নিবেদন কর্‌তে আমি অণুমাত্রও লজ্জা অনুভব কর্‌ছিনে। অতএব, ভূমিকা আর দীর্ঘ না ক'রে কথা আরম্ভ করা যাক্।

এবার আমি সে-কালের পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার কবিরাজ-দের কথা বল্‌ব। কবিরাজী চিকিৎসা আমাদের দেশের জিনিষ—আমাদের নিতান্তই আপনার ধন ; তাই কবিরাজী চিকিৎসার কথাই আগে বলি।

আমাদের গাঁয়ে একজন কবিরাজ ছিলেন ; তাঁকে আমরা বুদ্ধি প'ড়ে অবধিই দেখেছি। তিনি অতি খর্ব্বকায় মানুষ ছিলেন ; সেই জন্য আমরা ছেলেমেয়েরা কেন, গ্রামের সকলেই তাঁকে 'পুঁটে কবিরাজ মশাই' ব'লে ডাক্‌তেন। তাঁর আসল নাম একরকম তলিয়ে গিয়েছিল : পুঁটে কবিরাজ বল্‌লেই আমাদের গ্রাম শুধু নয়, আশপাশের দশখানি গ্রামের লোক তাঁকে চিন্‌ত। কবি-রাজী চিকিৎসা কর্‌তেন ব'লেই যে তাঁর এত প্রতিপত্তি হয়েছিল, তা নয় ;—তিনি একবারে যাকে বলে শিবতুল্য মানুষ, তাই ছিলেন,—গ্রামা দেবতার মত তিনি সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ কর্‌তেন। যেখানে রোগীর আর্ত্তনাদ, যেখানে রোগের ভীষণ যন্ত্রণা, সেখানেই, না ডাক্‌তেই তিনি উপস্থিত হতেন,—এ যে তাঁর অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। কোন রকমে, একটু সংবাদ পেলেই হোতো, অমনি কবরেজ মশাই হাজির! ধনী-দরিদ্র বিচার নেই, অর্থের কথা, এখনকার সর্ব্বনেশে ভিজিটের কথা, ততোধিক ভীতিজনক এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য বারো টাকা দিতে হবে, এমন প্রাণান্তকর চুক্তির কথা কেউ কোনদিন কবরেজ মশাইয়ের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'তে শোনে নাই।

প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে তিনি বাইরের ঘরে এসে বস্‌তেন। তাঁর বাক্সও ছিল না, আলমারীও ছিল না, বড় বড় ছাপার বইও ছিল না। একটা বেতের ঝাঁপি ছিল ; তারই মধ্যে মোটা কাগজে মোড়ক-করা সব বড়ি থাক্‌ত, আর ঘরের বেড়ায় অনেকগুলি বাঁশের চোঙ্গায় থাক্‌ত তাঁর মহামূল্য তৈল। কখনও কখনও দেখ্‌তাম, একটা মেটে হাঁড়ির ভিতর থেকে তিনি শামুক বা'র কর্‌তেন। সেই সব শামুকে চূর্ণ ঔষধ থাক্‌ত। ছেঁড়া মাদুরে ব'সে সমাগত দরিদ্র রোগীদের তিনি ঔষধ দিতেন। কোনদিন দেখিনি, তিনি ঔষধের মূল্যের জন্য কারু কাছে হাত পেতেছেন—যে যা ইচ্ছে ক'রে দিয়েছে, তাই হাসিমুখে নিয়েছেন। গ্রামের গরীব দুঃখী সকলকেই যে পুঁটে কবরেজ মশাই চিন্‌তেন! তাই কেউ যদি, একটু বেশী মূল্য দিত, এই চার আনা কি ছয় আনা, তা হ'লে অমনি কবরেজ মশাই

বল্‌তেন, "আরে হরিচরণ, তোর অবস্থা ত জানি। অত দিস্ নে, ও ছ-আনা পয়সা নিয়ে যা। ছেলেটা আরাম হোক্, তখন যা হয় দেখা যাবে।"—এই ছিলেন আমাদের গ্রামের গৃহ-দেবতা পুঁটে কবরেজ মশাই। বল্‌তে পারেন, সে দিন কোথায় গেল! কি পাপে আমরা পুঁটে কবিরাজের মত চিকিৎসক হারিয়েছি!

থাক্‌ এখন সে অনুশোচনা! বাড়ীতে যে সব রোগী আস্‌ত, তাদের দেখা শেষ ক'রে, কবরেজ মশাই প্রায় প্রদক্ষিণ কর্‌তে বেরুতেন। সারা গ্রামটা ঘুরে আসা তাঁর চাই-ই। যারা সংবাদ দিয়ে যেত, আগে যে তাদের বাড়ীতেই তিনি যেতেন তা নয়; তাঁর প্রতিদিনের ভ্রমণের পথে যে রোগীর বাড়ী আগে পড়্‌ত সেইখানেই আগে

আবার অনেকে তাঁর বাড়ীতেও সংবাদ দিত তারা জান্‌ত, চক্র-সূর্য্য যেমন কোনদিন কক্ষচ্যুত হয় কবরেজ মশায়েরও তাদের পাড়ায় আগমন কোন কারণে রোধ হবার যো নেই। তারা পথের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌ত; কবরেজ মশাইকে দেখ্‌লেই বাড়ীতে ডেকে নিত। শুধু যে পুরুষেরাই তাঁকে আহ্বান কর্‌ত, তা নয়; বাড়ীর মেয়েছেলে বৌ-ঝি কারও কবরেজ মশাইয়ের কাছে সঙ্কোচ ছিল না কেউ তাঁকে দেখে লজ্জা কর্‌ত না। এই অনাদরের পুঁটে কবরেজ মশাই।

তিনি দু-মিনিটের মধ্যেই আজকালকার মত রোগী দেখে প্রণামীর জন্য হাত পাত্‌তেন না। তাঁর চাদরের প্রান্তে মোড়ক-বাঁধা ঔষধ থাকৃত। কোন্ মোড়কে কি ঔষধ আছে, তা তিনি মোড়ক খুলে বড়ি দেখেই বল্‌তে পার্‌তেন; মোড়কে লেখা দেওয়া থাকৃত না। রোগী দেখে, অবস্থা অনুসারে এক দিন, দুই দিন, কি তিন দিনের ঔষধ দিতেন, পথ্যের ব্যবস্থা কর্‌তেন; রোগের বাড়াবাড়ি হ'লে খবর দিতে উপদেশ দিতেন, নইলে তিনি আপনা থেকেই রোজ আস্‌বেন, খবর দিতে হবে না, এই ভরসা দিয়ে গাত্রোত্থান কর্‌তেন। গৃহস্বামী কি বাড়ীর গিন্নী তাঁকে একটা আধুলি দিয়ে প্রণাম বা নমস্কার কর্‌ত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁর প্রথম দর্শনী ছিল ঐ আট আনা। তারপর রোগী যেদিন আরোগ্য-স্নান কর্‌ত, সেদিন কবরেজ মশাইয়ের বিদায় একটি টাকা। আমাদের মত গরীব ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে কবরেজ মশাই কখনও এর বেশী পেতেন না—আশাও কর্‌তেন না। যারা ধনী লোক তাদের সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাও যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে টানাটানি নয়।

আজ এখানেই শেষ করি। পরে ডাক্তার মশাইয়ের কথা বল্‌ব। আমার কথাই পাঁচ কাহন হ'লে কি কাগজে চলে? কি বলেন?

ব্রাহ্মণ

শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পঁচিশ ও পাঁচশ'র বিশেষ প্রভেদ কিছু নাই,
ব্রাহ্মণীরে নারিলাম বুঝাইতে এই কথাটাই
কোনোক্রমে; ফিরে ফিরে প্রতিদিন সেই এক কথা
উপায়বিহীন জনে অকারণে মনে দিয়া ব্যথা—
"ও-বাড়ীর বড়বাবু গাড়ী চড়ে' ফেরে পাঁচটায়;
যায় সে যখন খুসী; মাসিক পাঁচশ' টাকা পায়।
ন'টা থেকে ছ'টা খেটে তুমি বাপু অফিসার ঢেঁকি
কিছু কম হোক্—কোন্, নিয়ে আসো তাহার অর্দ্ধেকই।"
হাসিমুখে শুনে যাই, বড়বাবু হইনি যখন
ভাগ্যদোষে—গরীবেরে নিরন্তর হয় আলাতন,
এ ত' জানা-কথা। ক্রমে এক, দুই, তিন, চা'র করে'
পঞ্চবিংশ রৌপ্যমুদ্রা শ্রীহস্তে নিঃশেষে দিনু ঝরে'—
মাসের মাহিনা মোর; দেখালাম পকেট উলটি',
আর যা'ই হই কিন্তু নিমকহারাম নই বটি।

সে কহিল রুষ্টমুখে সুটাইয়া মৃদু বাহুখানি,
"পারিনা উঠি না আর, এমাসে রাখিব এক দাসী ;
একা লোক, শত কাজ।" তৎক্ষণাৎ ভয় লাজ ছাড়ি'
দুই কর করি' জোড় আমি কহিলাম তাড়াতাড়ি,
"দাসীতে কি কাজ প্রিয়ে—আমি আছি হেথা চিরদাস,
যখন যা' প্রয়োজন—ইচ্ছামত কর হুকুমাস !
দয়া করো গৃহলক্ষ্মী—করিও না আয়োজন আর
স্বল্পবিত্ত দরিদ্রের খরচ অধিক বাড়াবার।"
মুহূর্ত্তে আনিয়া জল দুই চক্ষে, স্ত্রী কহিল কাঁদি',
"তুমি কেন দাস হবে ? আমি শুধু আছি কেনা-বাঁদী !
যতদিন বেঁচে আছি, এমনি খাটিব দুখ বুজে।
মরে' গেলে যত খুসী দেখে-শুনে ভালো করে' খুঁজে,
আনিয়ো তোমার প্রভু,—আনিয়ো মনের মত রাণী,—
তখন বারেক রেখো,—তখন রাখিয়ো চাকরাণী।"
এই কি উচিত হ'ল ! বিনাদোষে এই কথা শুনে
থাকিতে কে পারে মৌন ? আপনার মনের আগুনে
যে নিত্য মরিছে জ্বলে,—অসহায়, অর্থহীন, তারে
কেন এই অপবাদ,—নিঠুর আঘাত বারেবারে ?
আজ হ'ল ধৈর্য্যচ্যুতি,—কহিনু, "করেছ অপরাধ,
করো যাহা ভালো বোঝো,—আর আমি সাধিব না বাদ,
আর করিব না মানা। ওই বেলা কাটে শাক-ভাতে—
তা'ও বন্ধ করো মোর,—দাসীর বেতন হবে তাতে।
পাচক রাখিতে চাও,—তা'ও রেখো। আশা পূর্ণ হয়
বিবিধ সুখাদ্যে যদি, তা'ও পাবে ; থাকিয়ো নির্ভয়,
চুরি করে', ভিক্ষা করে', অর্থ আমি ঠিক দেব এনে।
যে আজ্ঞা করিতে হয়, করে' যেয়ো, চলিব তা মেনে।
অবশেষে যদি একদিন পড়ি' পুলিসের হাতে
বন্দিগৃহে যেতে হয়,—তোমার যে নিন্দা হবে তা'তে—
সেটুকু করিও সহ্য ; দস্যুপত্নী যদি বলে লোকে
অদৃষ্টেরে দুষিয়ো না, সেদিন অকূল দিয়া চোখে।"
প্রদীপ্ত অনলসম গৃহিণী উঠিল ক্রোধে জ্বলি',
"একথা বলিলে মোরে আজ মোর কেহ নাই বলি !
শরীরের শ্রান্তি নাই ? মানুষের নাই দেহ-মন ?
শুনি নাই মিষ্ট কথা, প্রাণপাত করি' আজীবন।
এও ভাগ্যে ছিল মোর ! কথা কহিলেই অপমান !
গলে দড়ি নাহি জোটে। ইচ্ছা হয় করি বিষপান—
কথার বিষের চেয়ে সে বিষ অনেক মিষ্ট হবে।
মুখে নুন দিয়ে কেন না আমারে মারেনি শৈশবে ?
এ কষ্ট ত'তো না পেতে ; এত দুঃখ ছিল নাকো তাতে।
জলে পড়া ভালো ছিল না পড়িয়া চাষালের হাতে !"
কিছুক্ষণ সহ্য করি' স্তব্ধ হয়ে রহে মিষ্টবাণী,
পথেতে বাহির হ'নু, কাঁধে ফেলি' উত্তরীয়খানি।
বলিয়া গেলাম তাঁরে,—"অপরাধ ক্ষমিলো আমার,
অবশ্য যদ্যপি ফিরে,—তবে দেখা হবে পুনর্ব্বার।"

পথে দাঁড়াইনু আসি'।—আমার পিতার ঘরখানি
ধনীর প্রাসাদপার্শ্বে,—অন্তরে জাগালো আত্মগ্লানি।
অর্থ চাই, চাই অর্থ ; ভালো হয় যে কোন উপায়ে,
অর্থ পেতে হবে,—এ ত' নহে শুধু উদরের দায়ে,
এযে সংসারের দাবী। প্রশ্ন করে ধিক্কৃত পৌরুষ—
'সঞ্চয় করোনি কেন ? কেন কভু লও নাই ঘুষ
অন্য সবার সাথে ?' বড় দুঃখ হ'ল আজ মনে,—
আগাগোড়া এতদিন ভুল করে' চলেছি জীবনে।
ভুলে করিয়াছি বিয়ে, ভুল করে' লয়েছি চাকুরী,
চলেছি কর্ত্তব্যপথে চিরদিন না করিয়া চুরি—
সেও ভুল করে'। আজ পথ মোর হ'য়ে গেল স্থির ;—
আর ভুল হবে নাকো। অর্থ লাগি' যদি পৃথিবীর
শেষ প্রান্তে যেতে হয়, তাও যাব ; দৈন্য যদি ঘোচে,
অনন্ত নরক আমি হাসিয়া লভিব নিঃসঙ্কোচে।

বন্ধু ছিল গুণমুগ্ধ,—পৃষ্ঠপোষী ছিল ধনবান,
যাহারা চরিত্র লাগি' দূর হ'তে করিত সম্মান,
সাহস করেনি কভু সহায়তা করিতে আমারে ;
আজি সাহায্যের লাগি' দাঁড়ালেম তাহাদেরি দ্বারে।
কেহ দিল অর্থ ভিক্ষা ; কেহ বা সন্ধান গুপ্ত পথ
মোর তরে খুলে দিল। যারা মোরে ভাবিত নরক—
তাদের শ্রদ্ধার মূল্যে কিনিলাম তাদের করুণা।
যত অর্থ হ'ল লাভ,—প্রচারিত হল তা'র গুণা।

চিনিলাম পণ্যশালা, চিনিলাম যত গলি-ঘুঁজি
পাপের কুটিল পথে। প্রথমে সামান্য ছিল পুঁজি,
ক্রমেই চলিল বেড়ে ;—বেড়ে গেল ক্ষমতা সাহস
নিত্য নব জয়গর্ব্বে। বিবেকেরে করিলাম বশ,
সে আর তোলে না মাথা। নগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথে,
মদের দোকানে মোর লোক নাহি ধরে দিন-রাতে।
আছে ভৃত্য, মধ্যরাত্রে গুপ্তপথ্য চলে লেনাদেনা
চীনাপল্লীমাঝে ; আজ বাজারেতে সম্ভ্রম ধরে না।
চা-বাগানে যত দুর্ব্ব—কুলি হ'য়ে যায় দলে দলে,
আমার সম্পর্ক আছে তা'রো সাথে কেহ কেহ বলে।
গো-মেষ বিদেশে যায়, তা'তে নাকি অর্থ মোর আসে।
মোর অর্থ খাটে নাকি দূরগ্রামে শূকরের চাষে।
ছড়ায় পড়িছে টাকা। ছোটো বড় যে কোনও কাজ
অর্থ দিতে পারে যত্র,—তাহেই সম্মতি আছে আজ।
প্রকাশ্যে গোপনে কত কর্ম্মচারী দস্যু-জুয়াচোর,—
কত কর্ম্মনিষ্ঠ সাধু আমিকে পালিত অর্থে মোর।
সেনারের খেলা হ'তে,—বন্দী হ'তে,—ধনীগৃহ হ'তে,—
কমলার কৃপা আসে আমারে ভাসায়ে রক্তস্রোতে।

বিপুল ব্যবসা ফাঁদি', একদা সবারে ফাঁকি দিয়া,
সহস্রের অর্থ লুটি', সহসা সাজিনু দেউলিয়া।…

•

বহু জাল, জুয়াচুরি,—অর্থ দিয়া সর্ব্বত্র বিজয় ;
সর্ব্বপাপে অভ্যাহত,—শত্রু মোরে আজি করে ভয়।
দ্যূতের দোকানে যায় গুপ্তপথ্য ; স্বদেশীর দিনে
বিদেশী খদ্দর মোর কত লোকে ল'য়ে গেছে কিনে'।
বুদ্ধিমানে সবি বোঝে, পরিচিত সবে করে ঘৃণা,
সম্মুখে সম্মান করে, তবু সবে ; পাদস্পর্শ বিনা

ছোটোরা কহে না কথা ; আত্মীয়েরা আসিতো স্নেহের
দিনে পাঁচবার আসি' তত্ত্ব লয় এ সুস্থ দেহের।
সৌধতুল্য গৃহ মোর ; আজ তার মহলে মহলে
কত লোক, কত কাজ ;—সারাদিন কাটে কোলাহলে।
ব্রাহ্মণী প্রশান্তমুখে গৌরবে করেন গিন্নীপনা ;
অর্থে যাহা কেনা যায়,—কেনারসী, মোটর, গহণা,
কিছুরি অভাব নাই। দান, ধ্যান, ব্রত-উপবাস,
আছে লোক-লৌকিকতা—তেরো পর্ব্ব আছে বারো মাস
কুটুম্বের যাতায়াত, অন্ন-পান বাহিরে অন্দরে ;
দলে দলে দাসদাসী খায় দয়, যে যা' ইচ্ছা করে।

দ্বাদশ বৎসর পরে গ্রামে মোর হ'ল দুর্গোৎসব
সুবিপুল সমারোহে। প্রশংসিল গ্রামবাসী সব—
"কুলের সুপুত্র" বলি', দক্ষিণান্তে অধ্যাপকগণ
করিলেন, "ধন্য তুমি, নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ।"
সহসা পড়িল মনে—দ্বাদশের পূর্ব্বে একদিন,
ধর্ম্ম মানিতাম যবে,—খাটিতাম বিরামবিহীন
সারাদিন হাসিমুখে,—সদাচারী, শান্তির প্রত্যাশী
সকল দুঃখের মাঝে, উপেক্ষা লভিয়া ভালোবাসি' ;
যে দিন পঁচিশ টাকা বেতনের কর্ম্মী ছিনু খাঁটি,
ট্রামের পয়সাটুকু বাঁচাইতে ক্রোশ দুই হাঁটি'
সন্ধ্যায় খোলার ঘরে শাক-অন্নে ভরিয়া উদর
সুনিদ্রায় যেত রাত্রি ; কাহারে ছিল না যবে ডর,
সন্দেহ ছিল না কারে, কারো 'পরে ছিল না বিদ্বেষ ;
পিছনে প্রশংসা দিত—সম্মুখে করিত যারা স্নেহ।…
মুখে শুধু হাসিলাম ; বিতৃষ্ণায় ভরে' গেল মন,—
সে দিন চণ্ডাল ছিনু, আজি আমি পবিত্র ব্রাহ্মণ!

উৎকলী "খণ্ডকবিতা"

শ্রী রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে ইংরাজি 'লিরিকে'র নাম (Lyric, 'খণ্ডকবিতা' রাখা হয়েছে। আলোচনা করে' দেখলে জানা যায় লিরিকের অবলম্বিত রীতি উৎকল-দেশীয় খণ্ডকবিতার মধ্যে প্রায়শঃ সম্পূর্ণ ভাবে পরিলক্ষিত হ'য়ে থাকে। ইংরাজি লিরিকের লক্ষণ এই যে, সে রচনা ভাবনাত্মক,—তা কবির সাময়িক কোন বিশেষ ভাবকে ব্যক্ত করে—ভাষা সরল, তরল ও সঙ্গীতময় এবং গীত-যোগ্য। উৎকলের খণ্ডকবিতায় এই-ই অপরিহার্য্য রীতি। অবশ্য আমাদের প্রাচ্যের প্রায় সমস্ত দেশের খণ্ডকবিতা কোন অংশে এই নিয়মগণ্ডিবহির্ভূত নয়। এখন উক্ত নিয়মগুলির আশ্রয় নিয়ে উৎকলী খণ্ডকবিতার আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সম্যক্ পর্য্যালোচনা করলে বোঝা যায় উৎকলী খণ্ড-কবিতাগুলি আধুনিকতা ও প্রাচীনতা-গুণে সম্পূর্ণরূপে দুটি ভাগে বিভক্ত, এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক। উৎকলের প্রাচীন খণ্ডকবিতাগুলির আদর্শ হ'চ্ছে পুরাতন সাংস্কৃতিক ছাঁচ, কিন্তু নব্য খণ্ডকবিতার আদর্শ বহুপরিমাণে ইংরাজি এবং বাঙলা ছাঁচের। প্রাচীন লিরিকের পরেই ইংরাজি কিম্বা বাঙলা ছাঁচে ঢালা নূতন লিরিক উৎকলের সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে।

সাহিত্যের তুলনাত্মক আলোচনা (comparative study) করলে দেখা যায় ইংরাজি সাহিত্যের একটা ক্রম-বিকাশ আছে; আমাদের দেশের সাহিত্যে কিন্তু তা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। স্বাধীন সাহিত্যের স্বাধীন বিকাশ। কিন্তু যে সকল সাহিত্য অনুকরণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের বিকাশপথ স্বতন্ত্র। বাঙলা সাহিত্য যেমন অধিক পরিমাণে ইংরাজি ও হিন্দী সাহিত্যের উপর নির্ভর করে, উৎকলী সাহিত্যেও তেমনি ইংরাজি ও বাঙলা সাহিত্যের উপর নির্ভর করে সমধিক।

উৎকলের প্রাচীন খণ্ডকবিতায় কবির চিন্তাপথকে সংস্কৃত যেমন নিয়ন্ত্রিত করেছে, নব্য লিরিকে ইংরাজি এবং বাঙলা তদ্রূপ উক্ত পথকে সীমাবদ্ধ করছে। প্রাচীন খণ্ড-কবিতাগুলি অতিমাত্রায় সংস্কৃতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ায় ইদানীন্তন অনেক লেখকই তাকে প্রকৃত লিরিক আখ্যা দিতে রাজি নন। কিন্তু রাজি না হওয়াও ভ্রমাত্মক বলে' মনে হয়। লিরিকের পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি প্রয়োগ করে' দেখলে বোঝা যায়, প্রাচীন খণ্ডকবিতা যত সে নিয়মগুলি সুচারুরূপে পালন করে, আধুনিক লিরিকই তত করে না। প্রাচীন লিরিকগুলি প্রায় সমস্তই গীতি যোগ্য। আধুনিক লিরিকগুলির মধ্যে সেই গীতি-প্রকৃতি বা গাইবার যোগ্যতা তত (বা সময়ে সময়ে মোটেই) থাকে না।

প্রীতিরস লিরিকের একটি বিশিষ্ট সম্পদ; তরুণ কবিরা এরূপ কবিতার বিশেষ ভক্ত। উক্ত প্রীতি-রস যে কোনও শ্রেণীর হ'তে পারে। তা ভাবুক তরুণ কবিকে যত আসক্ত করে, অন্য রস তত করতে পারে না। পৃথিবীর প্রায় চৌদ্দ আনা লিরিক এই প্রীতিরস-প্রবাহে সিক্ত। এই রস নিয়ে লিরিক-লেখকেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনবরত সুখতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত করেন, আর উক্ত রসের আধিক্য বশতঃই হোক্ বা সাময়িক প্রয়োজনের বলেই হোক্ লিরিকের চিন্তাস্রোত বহুমুখী হ'য়ে থাকে, এবং লিরিক-কবিদের সেই চিন্তাস্রোত বহুমুখী হ'য়ে প্রীতিরসের মহা-সিন্ধুতে লীন হ'য়ে যায়। উৎকলের কি আধুনিক, কি প্রাচীন উভয়বিধ লিরিকেই এই প্রীতিরস একটা সাধারণ (common) গুণ। কিন্তু আধুনিক কবিরা সেই প্রীতিরসের যেমন স্বকীয় অবতারণা করে' থাকেন বা গেয়ে থাকেন প্রাচীন কবিরা ঠিক তেমনটি পারেন নি। উক্তরূপ প্রাচীন কবিদের অনেক ত্রুটি হয়েছে।

এখন এ স্থলে আধুনিক ও প্রাচীন উৎকলী লিরিক-কবিতাগুলির মধ্যে প্রকারভেদ নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ দেখতে পেলে, উৎকলী প্রাচীন

লিরিকগুলিতে কবিরা প্রীতিরসের ভাবধারাকে নিজের মুখ থেকে প্রকাশ না করে' কল্পিত কোন স্ত্রী-পুরুষের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য উক্ত দুটি ধারার মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর তা আমাদের এস্থলে বিচার্য্য নয়।

নিম্নে একটি উৎকলী লিরিক-কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হ'ল। কবিতাটি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। যমুনাতটে রাধিকাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন—"হসি হসি আসে মিলি রাধাপাশে
কহন্তি বশোদা বালো',
'খরাবেলে মাই যাইথিলু কাহি
মুহঁ বহছি কালো লো
মার দেলে কি গালি ?
মুখচন্দ্র যাইছি মউলি-লো'···।"

রাধিকার উত্তর—"রাধিকা কহন্তি 'শুন কাহ্নু কেহি
গালি দেই নাহিঁ মোতে,
যমুনাকু নীর— পাই আসিথিলি
এঠারে ভেটিলি তোতে রে,
কাল সঙ্গে আসিছু
ঘোর অরণ্যরে বসু আছু-রে'···," ইত্যাদি।

এইরূপে প্রাচীন কবিরা রাধা-শ্যাম নাম দিয়ে দুটি স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করে' তাদের মুখ দিয়ে আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। আমরা রাধা ও শ্যামকে পুরাণ-বর্ণিত ব্যক্তিগত রাধা শ্যাম বলে' মনে করছি না; প্রেমিক পুরুষ শ্রেষ্ঠীর নাম শ্যাম এবং প্রেমিকা স্ত্রী শ্রেণীর নাম রাধা দেওয়া হোক্, অথবা প্রেমিক পুরুষগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক পুরুষের নাম 'শ্যাম' এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রেমিকা স্ত্রীর নাম 'রাধা' দেওয়া যাক্। অতএব রাধা ও শ্যাম এই নাম দুটি সাধারণ নাম—এই দুই নামের অধীন হ'য়ে পড়ে যত প্রেমিক-প্রেমিকারা। সুতরাং প্রাচীন কবিরা এই নাম দুটি নিয়ে কিম্বা দুটি কাল্পনিক স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করে' তাদের মুখ দিয়ে স্ব-স্ব মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, এবং সেই প্রেমভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী-পুরুষ রাধা-শ্যামের চরণের তলে তাঁদের ভক্তিপূত প্রীতিরস সমর্পণ করেছেন। কিন্তু আধুনিক কবিরা তা মানতে চান না, উপাসনা করা ত দূরের কথা! নব্য কবিরা উক্ত কাল্পনিক স্ত্রী-পুরুষ দুটিকে অস্বীকার করে' নিজেকেই হয় ত রাধা বা শ্যাম মনে করে' বসেন। সুতরাং তিনি নিজের কথা অন্যের মারফতে না বলে' নিজের মুখেই বলে' থাকেন।

উদাহরণ স্বরূপ একটি কবিতার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করা হ'ল,—
যথা,—"সূর্য্য চন্দ্র তারা তুম্ভরি আজ্ঞারে
বরষন্তি জ্যোতিরাশি,
তুম্ভরি কুসুম প্রতি প্রভাতরে
হসই আনন্দে ভাসি।
পিতামাতা বন্ধু ভাই ভগিনীর
হৃদয়ে দেইছ প্রীতি,
তেণুঁ মুঁ সংসারে রহিছি আনন্দে
সুখ ভুঞ্জি' নিতি নিতি।···" ইত্যাদি।

এই সমস্ত কারণে কবিদের মনে ভাবপ্রকাশের জন্য সময় সময় যে সঙ্কোচ জেগে ওঠে, তা প্রাচীন কবিদের মধ্যে নাই, কেন না তাঁরা নিজের মনের কথা পরের মুখ দিয়ে প্রকাশ করে' নিজেরা আত্মগোপন করেছেন।

এটা অনেক কবির সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু নির্ভীক স্বাধীনচেতা কবি সে সঙ্কোচ অনুভব করেন না। উৎকলী 'ভঞ্জীয়' লিরিকগুলি নব্য শ্রেণীর। তাতে কবি নিজের মনের কথা নিজেই স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন,—কারো মারফতে নয়। অবশ্য এজন্য প্রাচীন কবিরা নিন্দার্হ নন; কেন না তখনকার দিনে ঐরূপ কবিতা লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। আর এক কথা এই যে তাঁরা তাঁদের স্বীয় মূর্ত্তিমতী কল্পনাকে সর্ব্বদা সম্মুখে রেখে নিজেরা তার অন্তরালে থাকতে ভালোবাসতেন।

এস্থলে একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন; কংসের আদেশে তার দূত অক্রূর যখন গোপপুর থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে, গোপীরা তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ও ব্যথিত হ'য়ে পড়েছে। এক মুহূর্ত্ত কৃষ্ণ বিরহ তাদের অসহ্য। এই কথাটি কৃষ্ণভক্ত কবি তাঁর কবিতায় এইরূপে গোপীদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন, যথা,—
"বিষ দেই নাশ করি যাব।
নির্জ্জলাগে গোপপুরে যাব।

তিলে অন্তর হোইলে মরযাউ
এবে দুই চারি দিন কহ হে মোহন···।" ইত্যাদি।

এখন নবীন লিরিকগুলিতে আত্মগোপন-রীতি অন্য প্রকার। আধুনিক কবি আত্মগোপন করেন তাঁর ভাব-গূঢ়তায়। অধিকাংশ নব্য লিরিক ভাবগূঢ় (mystic)। তাই কবি সকল শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বোধগম্য ন'ন।

নিম্নলিখিত একটি কবিতার উদ্ধৃত অংশে এটা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে—

"কিপাই ন হেলু তু'লো ছোট গ্রহ দীপ
তীব্র-বধূ-আখির আলোক,
কাহিঁকি আসিছু নেই মায়া-মরীচিকা
ছায়া-নীড় কোলে নেই শোক।"

এস্থলে 'মিষ্টিক' বা 'ভাবগূঢ়' কবিতার মূল্য —কোথায়? কবির আত্মগোপন চেষ্টায় নয়, ভাববোধের ক্লিষ্টতায় নয়, মাত্র ভাববোধের সেই ক্লেশ সত্ত্বেও পাঠকের ধৈর্য্য, ঐকান্তিকতা এবং পরিশ্রমের ফলে যখন অন্তর্নিহিত ভাবটি সুবোধ্য হয়—তখন সেই পরিশ্রমের সাফল্যে! ভাবগূঢ় কবিতাগুলির অর্থ বুঝতে পাঠক চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু যদি সহস্র চেষ্টা ও চিন্তার ফলেও তার অন্তর্নিহিত ভাব নীরস কিংবা নীচ অথবা দরিদ্র বলে' প্রতিপন্ন হয়, তবে পাঠকের চেষ্টা ত বিফল হয়ই, অধিকন্তু পাঠক উক্ত প্রকারের কবিতা বা কবিদের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়। মিষ্টিক বা ভাবগূঢ় কবিতাগুলির মধ্যে ভাব উচ্চ, উদার, মহান এবং সাত্ত্বিক হওয়া উচিত। ওয়ার্ড্‌স্-ওয়ার্থ, ইমরসন্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের 'মিষ্টিক লিরিকে'র মধ্যে এইরূপ ভাব লিপিবদ্ধ থাকাতেই সেগুলি আজ অমরত্বপূজ্য।

ভাব নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় প্রাচীন লিরিক আধুনিক লিরিকের চেয়ে অনেক বিষয়ে পৃথক্। প্রাচীন লিরিকগুলি আলোচনা করলে বোঝা যায় উক্ত কবিতা-গুলিতে নারীভাব যত বেশী, পুরুষভাব তত নয়। কবি বরং বাইরে পুরুষভাব ধারণ করলেও অন্তরে নারীভাব পোষণ করেছেন। তাই কবির প্রাণে পুরুষ ও স্ত্রী-প্রকৃতির সংমিশ্রণ হেতু কবিতাগুলি অত্যন্ত সরস। কিন্তু আধুনিক পুরুষ-কবি দূরে থাক্—স্ত্রী-কবিরাও তদ্রূপ কবিতা রচনা বিষয়ে প্রয়াস দেখান নি। নারী-ভাব অনুভব করা প্রাচীন কবিদের একটা বিশেষত্ব এবং সেইখানেই তাঁদের সরসতা ও শ্রেষ্ঠতা। তারপর পুরুষ কবিতা স্ত্রীলোকদের হৃদয়গ্রাহ্য হয় কি না সন্দেহ, কিন্তু স্ত্রী-কবিতা সকল শ্রেণীর লোকের অনুভবযোগ্য। যে কবিতা পুরুষভাবের আশ্রয় নেয় তাকে পুরুষ-কবিতা ও যে কবিতা স্ত্রীভাবের আশ্রয় নেয় তাকে স্ত্রী-কবিতা আখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে। পুরুষভাব কি, আর স্ত্রীভাব কি, তা বোধ হয় কাউকেও বোঝাতে হবে না।

সকলেরই এ বোধগম্য। নিম্নলিখিত কাব্যাংশ হ'তে এর স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। পুরুষভাব-প্রকাশক কবিতা, যথা,—

(ক) "নিজ ভাবনারে বুলই মুঁ তারে
ন পারে সে কিপা বুঝি,
নিবিড়াশ্লেষে বান্ধই দেহ মন,
রুকত নেত্রে মুঁ যে তার প্রতি
ধাএঁ মহাক্রোধে কুলি'
তুচ্ছ করই তা' আদর আলিঙ্গন।"

(খ) "শিরীষপেলা বা' বক্ষরে রহিছু
গিরিসম শোভা মন,
শুরু সঙ্কল্প সে শিখাইছি পন্থা
পুরুষ মারণ ক্রম।
রখাই অনেক দিন উপবাসে
দেখাই সুধা কলস,
ন খাইলে মলি মলি যেতু খাউ
চখাই ন দেউ লেশ।
হসন্ত ভগারি বোলি কিপা মোর
অসন্তুষ্ট কর রাজি,
বসন্ত উৎসঙ্গ মোর ঘরে ভলা
কথন্ত সিনা মরজি।" ইত্যাদি।

স্ত্রীভাব-প্রকাশক কবিতা, যথা —

(ক) "যেহ শুনন্তা হৃদয় বেদন
সেহি যাউ অছি সংহারি।"

(খ) "কাহাকু কহিবুঁ এ কথা।
কেহ থন্তিব মঠ বাধা।
কৃপাণু হোই হেবে কৃপা ছাড়ি অভাবে
তুহ্মেভ শোভিলনি সখা হে।"
"নিশাকালে মোর কোলে
শোই থাউ শ্রম বলে
স্বপনরে দেখু কিস কিস।
'মা' বোলি চমকি পড়ু
ওঠে দুই দুগ্ধ ভিড়ু
পুন শোউ ঘোড়ি হোই বাস রে,
জীবন
সে কথা স্মরি মরি যিবি
'উঠ' বোলি কাহাকু ডাকিবি রে।"
"কোলে শোই থাউ
নিদ ভাঙ্গি গলে তোর
মো' গলা ছন্দি
ডাকু মাতা গির,
কলা মাণিক হে।"—ইত্যাদি।

ভাবের সম্বন্ধে যেমন, ভাষা সম্বন্ধেও আধুনিক ও প্রাচীন কবিতাগুলির মধ্যে তদ্রূপ বিশেষ প্রভেদ বিদ্যমান। শত চেষ্টাতেও আধুনিক কবি প্রাচীন ভাষা প্রয়োগ করে' লিখ্‌তে পার্‌বেন কিনা সন্দেহ; অবশ্য অসাধারণ শিল্পীর পক্ষে সবই সম্ভব। আজকাল যেমন অতিপ্রাচীন "অজন্তা চিত্র-শিল্পের" পুনরুদ্ধার হ'চ্ছে, তদ্রূপ প্রাচীন ভাষার উদ্ধার-চেষ্টাও একটা বিশেষ সাহিত্যিক কলাকুশলতার পরিচায়ক। আধুনিক চিত্রশিল্পী নবীন তুলিকা নিয়ে প্রাচীন অজন্তা চিত্রশিল্প রচনা করে' তাতে আবার যদি সেই যুগের ভাবনাধুর্য্য সন্নিবেশিত কর্‌তে পারেন, তা তাঁর কলাজ্ঞান এবং হস্তলঘুতারই পরিমা। মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়। যে জাতির প্রকৃতি যেমন, কিম্বা যে কালের প্রকৃতি যেমন, ভাষাই তার পরিচয় দেয়। আজকাল "ভাবগূঢ়" (mystic) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবকে আরো গূঢ়তর কর্‌বার জন্য অপ্রাকৃতিক ভাষারও বহুল সৃষ্টি হয়েছে। সেই অপ্রাকৃতিক ভাষার মধ্য দিয়ে নবযুগের পাঠক 'মিষ্টিক' কবিতার ভাবদুর্গের মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। অবশ্য সমস্ত 'মিষ্টিক' কবিতায় এই ভাষাপ্রাকার বা ভাবদুর্গ নাই, যদিও প্রায় অধিকাংশ কবিতাই আধুনিক যুগে এই প্রকারের।

ভাষার সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে গিয়ে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন উৎকলী লিরিক লেখকের নাম এখানে বলা উচিত। কবিসূর্য্য বলদেব, মধুসূদন, গোপালকৃষ্ণ, বনমালী, উপেন্দ্র ভঞ্জ, দীনকৃষ্ণ প্রভৃতি ধারাবাহিক লিরিক-কবিতার সৃষ্টি করে' গেছেন। তাঁদের লিখিত 'ছান্দ' নামক কথাটিই লিরিক নাম যোগ্য। এই হিসাবে "অভিমন্যু" নামক একজন লেখক, শ্রেষ্ঠ লিরিক-লেখক নামবাচ্য। আরো অনেক লিরিক-লেখক আছেন। এই অভিমন্যু, মধুসূদন ও গোপালকৃষ্ণের সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেক সাদৃশ্য আছে —তুলনাত্মক পাঠে (comparative study) তা সহজে বোঝা যায়।

নিম্নলিখিত দুটি কাব্যাংশ দ্রষ্টব্য :—

উৎকল-কবি মধুসূদন লিখেছেন,—
"—'কে চাহিব চাহ তোতে গর্ব্ব অবজ্ঞারে
কিম্ব লোভিনি, মুঁ ই তো দুঃখে কাতর।
আছ সো প্রাণতোর মর্ম্ম হাহাকারে
কান্দই বিকলে মোর ব্যথিত অন্তর।
বিষাদে ঝুরি' তোতে, চাহিলি বিকলে
পতিত-পাবনী বিশ্বজননী-চরণে।
আশার অমৃত জ্যোতি সে পদকমলে
দেখিলি অভয়বাণী শুনিলি শ্রবণে।'
কহিলে মা জগদম্বা পতিতপাবনী,—
'পতিতা হেলেহেঁ নারী মোহরি তনয়া,
উদ্ধারিবি তাকুকণে দেই মুক্তি মণি,
মো কন্যা তোহরি হেব লভি' মোর দয়া।
সতীত্ব, দেবীত্ব তার ললাটে লিখিত,
কে তাকু দেখিব দিষে করিব বঞ্চিত?'—"
বাঙলার রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—
"দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।"

সত্যই ভাষার আভ্যন্তরিক সরলতা প্রাচীন লিখিকের একটা প্রধান গুণ। তবে যমক চেষ্টা আর অলঙ্কারবহুল যেমন সময়ে সময়ে সেই কবিতাগুলিকে সুন্দর ও সরল করেছে তেমনি সেগুলিকে একটু দুর্ব্বোধ্যও যে করেনি নয়।

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য,—

"কৃষ্ণা পক্ষরীরে পশিলে কি ধরে
শুক্লা পরি হরিনাম,
কৃষ্ণাটী শুক্লারে পশিলে কি করে
ছুআ সিচ পরাক্রম,
সরসে কুহাবাউ থাএ সিনা,
কুহাই কুহাই পুট দেলে ফেলে লগা কি চোইব সুনা।"

এ স্থলে অনুপ্রাস, অন্ত্যপ্রাস ও যমকের অত্যন্ত প্রয়োগ করা হয়েছে।

তা বলে' সেই সকল প্রতিবন্ধকের জন্য কবিতার ভাব সকল সময় আটকে থাকে না। প্রাচীন কবিতাগুলিতে সময় সময় ভাষাক্লিষ্টতা যেমন একটি প্রতিবন্ধক, আধুনিক কবিতায় ভাবক্লিষ্টতা তেমনি ভাবের সহজ-বোধ পক্ষে একটি অন্তরায়। আমরা কোনটির প্রতি দোষারোপ করছি না। এটা সকল কবিতার যুগধর্ম্ম। আমরা যা বলছি, তাতে কেবল সেই যুগ-ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করছি মাত্র। প্রাচীন কবিতায় যেমন সময় সময় গ্রাম্য লোকপ্রচলিত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, আধুনিক কবিতায় তেমন দেখা যায় না। নবীন কবি সে-সকল পরিহার করেই চলেন। প্রাচীন কবিতার আর একটি লক্ষণ এই যে তা সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে গঠিত বলে' ব্যবহৃত ভাষাগুলি কিছু না কিছু একটা অর্থ প্রকাশ করে,—প্রাচীন কবিরা বহুল নিরর্থক শব্দ ব্যবহার করেন নি। কিন্তু আজকাল অনেক লিখিক দেখা যায়, যাতে অনেক শব্দ কেবল কবিতায় "সংখ্যা"র অনুরোধে ব্যবহৃত হয় এবং কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে না ব'লেই সেগুলিকে পরিহার করলেও প্রকৃত অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে।

যথা,—"রক্তিম অধর অলপ বিকাশি
চুম্বিলা কিবা আপনা মনে,
জানি নহিলা সে মুহূর্ত্তক অন্তে
কি অবা ঘটিব তার জীবনে।"

এ স্থলে 'কিবা', 'মুহূর্ত্তকে'র 'ক' ও 'অবা' এগুলির বিশেষ কোন অর্থ নাই, কেবল সংখ্যার অনুরোধে এগুলি এস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি ঠিক সংস্কৃতের 'চ, ব, তু, হি'র মত। এরূপ আরো অনেক উদাহরণ আছে।

প্রাচীন ও আধুনিক উভয় শ্রেণীর কবিতাই তরুণ পাঠকের নিকট চমৎকারক চিত্তাকর্ষক এবং উত্তেজনাত্মক (sensational)। কল্পনাকুশলতা (Romanticism) আমরা উভয় কবিতাতেই ন্যূনাধিক দেখ্‌তে পাই। কেবল-মাত্র যুগ-ধর্ম্ম হেতু সেই কল্পনা এবং ভাবপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে—উক্ত কল্পনাচাতুর্য্য যাতে বাজে ঘটতে পারে, নাও পারে। শেষে এস্থলে বক্তব্য এই যে প্রাচীন কবিতা আলোচনা করলে দেখা যায়, আধুনিক কবি কিছু নূতন কথা বলছেন না, কিন্তু যা পূর্ব্বে বলা হয়েছে বা লেখা হয়েছে তাকে আবার নূতন ভাবে বলছেন; তবে ইংরাজি এবং বাঙলা সাহিত্যের অনুকরণে সময় সময় কতকগুলি নূতন চিন্তা ও নূতন কথা দেখতে পাওয়া যায়—যদিও সেগুলি সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প।

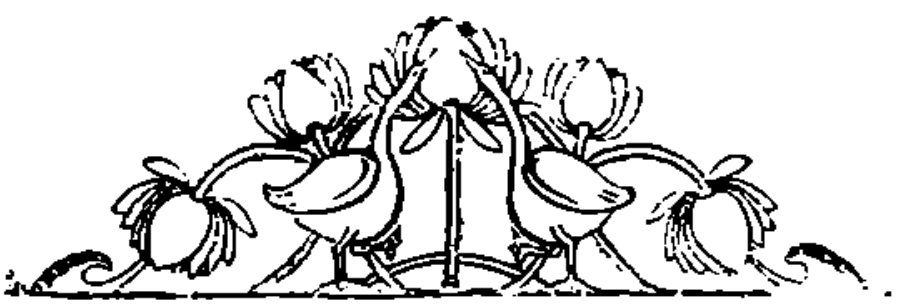

বেথুন সাহেবের অভিভাষণ

শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্-এ

[ইং ১৮৪৯ সালের ৭ই মে সোমবার ২৬শে বৈশাখ, ১২৫৬] বাহির-সিমুলিয়ার স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানাতে কলিকাতায় প্রথম বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বাঙ্গলা তথা ভারতের নারীপ্রগতির ইতিহাসে এই দিনটি এক স্মরণীয় দিন বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন বাঙ্গলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অন্যতম গুরু বেথুন সাহেব। বালিকাবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা সভার সভাপতিও হন তিনিই। এই সভার সভাপতি রূপে মহামতি বেথুন যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা সে সময়ের অনেক সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) সম্পাদিত সেই যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা সাময়িক পত্র 'সম্বাদ ভাস্করে' ৯ই মে বৃহস্পতিবার ও ১২ই মে শনিবারের সংখ্যাতে অভিভাষণটি বাঙ্গলাতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হয়। বাঙ্গলা দেশের স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে এই অভিভাষণটির বিশেষ এক স্থান আছে। অধিকন্তু ইহারই হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ-সাহিত্য নিয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকটও অভিভাষণটি প্রয়োজনে আসিতে পারে বলিয়া আমরা তাহার ভাষার ও ছেদ-চিহ্নাদির কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া যথাযথ ভাবে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম। এ ব্যাপারে পূর্ব্বোক্ত বালিকাবিদ্যালয় সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞাতব্য আরও কয়েকটি বিষয় 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।]

"হে বন্ধুবর্গ, অদ্য আমরা যেজন্য এখানে সমাগত হইয়াছি তদুপলক্ষে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য করা কর্ত্তব্য, আমারদিগের সকলের পক্ষে অদ্য কি মহোৎসব ও আনন্দের দিন, যদ্যপি যাহারই স্বীয় সন্তানদিগের উন্নতির জন্য স্বাভাবিক সুখোদয় হয় এতদ্বিদ্যালয় হইতে যে উপকার প্রত্যাশিত হইয়াছে তাহাই তোমারদিগের আনন্দের হেতু, এবং এই মহদ্ব্যাপারে আমি অনুকূলতা করিতে সক্ষম হইয়াছি ইহাতেই আমার কথনাতীত হর্ষোদয় হইয়াছে, পুত্র কন্যা ও কলত্রবিশিষ্ট হইলে যে সুখ ঘটিত আমার ভাগ্যে তাহা সম্ভোগ হয় নাই, তথাপি সমীপস্থ বন্ধুবর্গের এবং এই দৃষ্টান্তানুগামী অপর বহু লোকের সন্তানগণের সুখের কারণীভূত হইবার আমার অন্তঃকরণে পিতৃবৎ আমোদ হইতেছে।

"আমি বিলাত হইতে এতদ্দেশে আগমনের পূর্ব্বেই এতদ্রাজ্য বিদ্যানুশীলনের বিশেষত গবর্ণমেণ্টের অধীন পাঠশালা সকলের আমি এইক্ষণে যাহার প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছি ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক রিপোর্ট পুস্তকাদি দেখিয়াছি তদ্দৃষ্টে এমত স্থির করি বঙ্গদেশের লোকেরা ৩০ বৎসরাধিক কাল শিক্ষা করিয়া যেপ্রকার উপকৃত ও তদর্থ জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাতে অপর অর্দ্ধাংশের বিদ্যাভ্যাস অনতিবিলম্বেই প্রয়োজনীয় হইবেক, আমি অনুমান করিয়াছিলাম তোমরা বিদ্যারসগ্রাহী হইয়া তদ্যুক্তা সঙ্গিনীগণের অভাব বুঝিতে পারিবে, এবং বিদ্যাবতী স্ত্রীর আচরণে গৃহস্থালীর যে সুখোদয় হয় তাহারো নমুনা হইবে, এবং আমি ইহাও অনুভব করিয়াছিলাম নানা দেশীয় ইতিহাস পাঠে তোমরা ইহা চিন্তা করিবে এক জাতি অপর জাতি হইতে যত অধিক সভ্য হয় ততই তাহারদিগের অঙ্গনাগণ অধিক বিদ্যানুরাগিণী ও সভ্যাভব্যা হইতে পারে, এবং আমি ইহাও ভাবিয়াছিলাম এতদ্ভাব তোমারদিগের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা বুঝিবে সন্তানগণের শিক্ষাতে প্রথমত স্বীয় ২ মাতার বিশেষ সদ্গুরুতা অপেক্ষা করিবে।

"বালক বালিকাগণের যখন বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়, এবং যখন প্রতিক্ষণ দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য বিষয়ে তাহার-

---

* এই দুই সংখ্যা 'সম্বাদ ভাস্কর' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। সম্বাদ ভাস্করের সম্পূর্ণ ফাইল পাওয়া যায় না। মাত্র ৯ সংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, অসম্পূর্ণ ১৯০ বৎসরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুস্তকাগারে ও অসম্পূর্ণ ১৯০ বৎসরের আমার নিকট আছে।

দিগের একই বুদ্ধি জন্মে, তখন যে মাতার অধীনে তাহারা রক্ষিত হয় সেই জননী দ্বারাই সৎজ্ঞানের উপদেশ পাইয়া মহৎ ও সৎ হইতে পারে, অতএব স্ত্রীগণের স্বভাবগুণে এতদ্দেশীয় লোকেরাও সচ্চরিত্র হইবেন বিচিত্র কি, এবং ইহাও শুদ্ধ কৈশরাবস্থায় প্রয়োজনীয় হয় এমত নহে, সর্ব্ব সময়েতেই যোষিৎগণের ভাব গ্রহণীয় এবং আমাদিগেরও সর্ব্বতোভাবে এই মহৎ কর্ত্তব্য যাহাতে তাঁহারদিগের ভাব, ভাষা, ধর্ম্ম ও মানের দিগে ধাবমান হইতে পারে।

"ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বেই আমার পূর্ব্বোক্ত ভাবসকল উদয় হয় অত্রাগমনাবধি আমি দেখিয়া শুনিয়া তাহাই স্থিরিকৃত করি, এবং বঙ্গরাজ্যে তদভিপ্রায়ের কার্য্যবৃদ্ধি পাইতেছে ইহা বুঝা যায়, বরং যেহ আপন স্ত্রী, কেহ দুহিতা বা ভগিনীকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন মধ্যে ২ এমতাদিও শ্রবণ করি, সত্য বটে কোন ২ স্থলে মাত্র এ সকল ঘটনা অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ হইতেছে, কারণ এই যে দেশপ্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রথার অন্যথাচরণ বিশেষত লোকেরা এতদ্রাজ্যে পূর্ব্বপ্রচলিত ধারাকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করেন ইহাতে এস্থানে তদ্বিপরীতাচরণ সহজ ব্যাপার নহে, অতএব কথিত নূতন ব্যবহার ক্রমোন্নতির পক্ষে ভরসাপ্রদ বলিতে হয়, অধিকন্তু যখন চিন্তাদ্বারা অবধারিত হইতেছে নারীগণকে নিভৃত স্থলে রক্ষণ তোমারদিগের আদি প্রথা নহে কেবল আক্রমণকারি মোসলমান রাজার ব্যবহার দৃষ্টে এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে তখন আমি আরো ভরসা প্রাপ্ত হইতেছি তোমারদিগের পূর্ব্ব কাহিনী ও উত্তট গ্রন্থ সকলের অনুবাদ যাহা আমি পাঠ করিতে পারি তাহাতে মুনিকন্যা ও রাজমহিষীগণের স্বাধীনত্বের বিদ্যা এবং গুণেরও ব্যাখ্যা দেখিতেছি কিন্তু তাঁহারদিগের বংশাবলীকে তাহাতে ক্রমে দূরতরা দেখা যাইতেছে।

"লীলাবতীর উপাখ্যানের সত্যাসত্যতা নির্দ্দেশকরণে আমি অক্ষম এবং এমত স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা অথবা যে গ্রন্থ তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ আছে তাহা তন্নাম্নী বিদ্যাবতীর স্বরচিত কিম্বা তাঁহার পাঠজন্য প্রস্তুত হইয়াছিল ইহাও বলিতে পারি না, কিন্তু বুঝিতে হইবেক তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের এপ্রকার কঠিনতর গ্রন্থ অপাঠ্য হইলে গ্রন্থকর্ত্তা ঐ স্ত্রীলোকের নামে সে গ্রন্থ প্রচলিত করণার্থে এক গল্প রচনা করিতেন না।

"অতএব ইহা বিবেচনাসিদ্ধ হইয়াছে তোমরা আপনারদিগের পূর্ব্ব সৌভাগ্যকালীন অবস্থা হইতে স্বজাতীয় স্ত্রীগণকে হীনাবস্থায় রাখিয়াছ, সুতরাং তৎসংশোধন প্রস্তাব তোমরা উল্লাসিত হইয়া গ্রহণ করিবে।

"এ সকল সৎকারণ সত্ত্বেও আমি আগে বিবেচনা করিয়াছিলাম এতদ্বিষয়ের প্রকাশ্য উদ্যোগের উদ্যমভঙ্গ হইলে ভারতবর্ষীয় অঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে অর্থাৎ এতদ্রাজ্যস্থ লোকেরদের সভ্যতা সম্বর্দ্ধিতকরণ সোপানারোহণ অবিবেকতা জন্য একপদ বিচলিত হইলে এই মহৎ কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ও বিলম্ব হইবেক এ নিমিত্ত আমি এক বৎসর আগে ইহা চিন্তা করিয়াছি ১৮৪৮ সালের এপ্রেল মাসে আমি এতদ্রাজ্যে উপনীত হইয়া ১৮৪৯ সালের এপ্রেল মাসে আমার অভিপ্রায় এতৎসম্বন্ধে বন্ধুগণের মধ্যে কোন ২ ব্যক্তির নিকট বিস্তারিত রূপে ব্যক্ত করি কিন্তু যে বিধি তোমারদিগের বালিকাগণকে শিক্ষাদান করিবেন তাঁহাকে তৎপূর্ব্বেই এ বিষয়ের সাধ্যসাধকরূপে স্বীকৃতা করাইয়াছিলাম।

"আমি অনেক প্রকারে সুচিন্তা পূর্ব্বক এই উদ্যোগের সূত্রপাতে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা গ্রহণ করিলাম না কারণ হানি অপেক্ষা উপকার অধিক আছে, আমি আমরিকাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাহা সুসিদ্ধকরণার্থ বিলম্বাবলম্বন শ্রেয় জ্ঞান করি নাই, কারণ এই যে আমার মতের অনুকূলতা করিতে যাঁহারা প্রস্তুত হইলেন কোন প্রকারে তাঁহারদিগের উৎসাহভঙ্গ না হয়।

"রাজ্যের এমত মহদুপকারক বিষয় গবর্ণমেণ্টের সুগোচর করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে গেলে অনেক তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইবে, তাহা বিজাতীয় মহাশয়গণের বিবেচনাধীনে অর্পণ হইবার পর সম্ভাবনাও ছিল, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের ব্যাঘাত ও তদপেক্ষা মন্থরতর কালবিলম্ব সম্ভাবনা আছে, এবং গবর্ণমেণ্টের সমীপে এ সব উদ্যোগের সুসিদ্ধতার হেতুবাদ দর্শাইয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত, অতএব গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপণে এইক্ষণকার এই সকল বিড়ম্বনা জ্ঞান করিয়াছি, পক্ষান্তরে আমার রাজকীয় এবং

গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয় সকলের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণকে পক্ষে সংস্থাপিত বিদ্যামন্দিরের গৌরব ও স্থায়িত্বের প্রতিভূ হইতে পারে।

"আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম এবং তাহা যথাক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত হইল এই বিদ্যামন্দির স্থাপন ও এতৎ সাহায্যকরণার্থে প্র : স্বয়ং বাক্ত করিলে তোমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিবে, এই প্রত্যাশায় কলিকাতার বিদ্যালোকবর্দ্ধি যুবগণকে আমার অভিপ্রায়ের মর্ম্মজ্ঞ করাইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে করি অতএব তোমরা যে সদ্ভাবে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলে এবং তজ্জন্য আমি যে বাধিত হইলাম তাহা বাক্ত করিবার বাকী প্রায় রহিল না।

"এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের পক্ষে যাহা ও তত্র পরিবারের এ স্থানে অধিক স্বীকারকরণ আবশ্যক এজন্য আমি প্রথমতঃ হিন্দু কাপ্তেন, রাজা কালীকৃষ্ণ, বাবু আশুতোষ দেব, এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষা কৌন্সেলের অন্যান্য সংসভ্যগণ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রসময় দত্তের সহায়তা গ্রহণ করি কি না, এবং যদিচ ইহাও উপলব্ধি হয় তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বিরুদ্ধপক্ষ থাকু করিবেন না তথাপি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করি যাঁহারদিগের সহিত নিয়ত লিখন পঠন করিয়াছি তাঁহারদিগের আকার স্বজনগণের পরিবার হইতে বালিকাগণকে বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রদান করিবেন।

"আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম উক্ত হিন্দু সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা এমত করিতে পারেন তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে সংস্রব রাখিবেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহেন, কিন্তু তাহাতে আমার অনভিমত যেহেতু সিদ্ধির বিলম্ব হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন যাঁহারা নিজ ব্যয়ে স্ব স্ব গৃহে আপন ২ পরিজনগণকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম হন তাঁহারা সেই প্রথাই উত্তম জ্ঞান করিতে পারেন এবং এতদ্দেশের বর্ত্তমানাবস্থার বিপরীত গতিক হইলে তাঁহারদিগের তৎপ্রথাতেই আমার সম্মতি দিতে হয় অতএব এ দেশের অবস্থা ও অন্য সদুপদেষ্টার অপ্রতুল হেতু সাধারণ হিতার্থে তাঁহারদিগের মত পরিত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধই ইহা তাঁহারদিগকে বুঝাইতে কঠিন হইত, এতদ্ভিন্ন উক্ত মহাশয়েরা স্বীয় ২ পদানুসারে বন্ধুবান্ধব লইয়া আমার অভিপ্রায়ের দোষগুণ বিবেচনা করিতেন যথায় অপরিচিত বিষয় আমার কোন কথাই বলা হইত না কিন্তু আমার নিগূঢ়াভিপ্রায় আছে এতদ্বিদ্যালয়ের কার্য্যের এক প্রকার পদ্ধতিও ধারাবদ্ধ করিয়া তোমারদিগের সম্মুখে আমি উক্ত মহাশয়গণকে আহ্বান পূর্ব্বক আমারদিগের কত ব্যাপার সম্বর্দ্ধন করাইয়া তাহাতে তাঁহারদিগের সম্মতি ও সাহায্য চাহিব, এইক্ষণে শুদ্ধ এই কারণে তাঁহারদিগকে আহ্বান করা হইল না ইহাও সময়ক্রমে ঐ সকল মহাশয়গণকে বুঝান যাইবেক ইউরোপীয় আমার কতিপয় বন্ধু যাঁহারা অদ্যকার শুভ কর্ম্মারম্ভবিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন ও যাঁহারা ইহার সুসিদ্ধতা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান তাঁহারা অদ্য এইস্থলে উপস্থিত হইবেন কি না আমাদের জিজ্ঞাসা করেন এবং এতদ্বিষয়ের মন্তব্য বিবিধরূপ দ্বারাও অদ্য এতৎসভাগার পরিপূর্ণ হইত কিন্তু তাহাও পূর্ব্ব কারণে আমি সূচিত রাখিয়াছি, এক গোপনীয় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠাতে এরূপ সমারোহের প্রয়োজন করে না, কিন্তু কালে এমন দিন উপস্থিত হইবেক তাহাতে ঐ সকল প্রতিবন্ধক থাকিবে না, এই "কলিকাতা কিরেল স্কুল" যাহার তৎকালে যে কোন শ্রেষ্ঠ নামকরণ হউক ইহা এতদ্রাজ্যের মাননীয় ও প্রধান হিতকারী বিদ্যামন্দির হইবেক।

"প্রস্তাব সমাপন পূর্ব্বে এখানে কি প্রকারের বিদ্যাশিক্ষা হইবে আমার তাহাও প্রকাশ করা উচিত, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত স্কুল সকলে যেমত কোন ধর্ম্ম চর্চ্চা হয় না এখানেও সেই প্রথা প্রচলিত হইবেক, আমি জানি অনেকে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে উপহাস করিবেন, বিশেষতঃ তাঁহারা এখানে কিরূপ শিক্ষা হইবেক তাহা অনুমান করিয়া কৌতুক করিতে পারেন এবং তাহা আমারও উপহাসজনক হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় বালকগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয় যাহা আমি সর্ব্বদা বলিয়া থাকি তাহা যদি তোমরা কেহ শ্রবণ করিয়া থাক তবেই বুঝিবে দেশীয় ভাষানুশীলনে বালকগণের অধিক যত্নকরণ আমার নিতান্ত মানস তবে ইংরাজী বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা বিধায় তাহার চর্চ্চা কর্ত্তব্য বলি এবং ইহাও প্রত্যাশা করি অবিলম্ব কালে বিদ্যার্থিকা আমারদিগের ঘরে যাহা শিক্ষা করিয়া ছেন তাহা স্বভাষায় অনুবাদ করেন, অতএব অধ্যাপকগণ যাহারা কেবল আপন

পরিবারে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে তাহারদিগের প্রতি তদপেক্ষায় আমি উক্ত বিদ্রূপকারীগণের অপেক্ষাও অধিক বৈরক্ত্য প্রকাশ করিব, বঙ্গভাষানুশীলনই এখানকার মূল শিক্ষা হইবেক, তবে পরিশিষ্ট গুণ বিবেচনায় বিশেষ পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে ইহার পর ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারিবেক এতদ্ভিন্ন অন্য সংস্র প্রকার শিল্পবিদ্যাদি যাহা আমা অপেক্ষা আমার বন্ধু বিবি হিউ সর্ডেন ব্যাখ্যা করিতে পারেন তিনিই তত্তাবতের উপদেশ দিবেন এই বিদ্যাশিক্ষায় তোমারদিগের বালিকাগণ আপনারদিগের গৃহশোভা এবং উত্তমরূপে কালযাপন করিতে পারিবেন, প্রাচীন বাণী আছে—"আলস্য সকল পাপের জননী" কিন্তু প্রকৃত আলস্য পৃথিবী মধ্যে অত্যল্প আছে তবে প্রয়োজনীয় ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি না থাকিলে অসৎ কর্ম্মে রত হইতে হয়।

"এস্থলে অন্য এক কথা যাহা তোমরা সকলে বিজ্ঞাতা থাকিতে পার তাহা না বলা অনুচিত হইতেছে, সেই প্রশংসিত উদ্যোগ আমার এ অভিপ্রায় সিদ্ধকরণের অধিক উৎসাহপ্রদ হইয়াছে, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাধ্যাপনীর সমাজ যোগে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন গবর্ণমেণ্ট সহিত তিনি উক্ত গ্রামে দেশীয় বালিকা-গণের জন্য এক বিদ্যালয়ের ব্যয়ানুকূল্য করিতে প্রস্তুত আছেন, এতদাবেদনের প্রতি গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মনযোগী হইবেন তাহা আমি পূর্ব্বে বলিতে পারি না ইহাতে আমি যে সকল কিংবদন্তী ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা উপস্থিত হইতে পারে অধিকন্তু এতদ্বিষয় সুসিদ্ধ হয় না যে গবর্ণমেণ্ট তাহা পরীক্ষার্থ নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কলিকাতা নগরীয় স্কুলে সাহায্য করিতে পারেন, সে যাহা হউক জয়কৃষ্ণের উদ্যোগে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি পাইবেক এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের ভাব ব্যক্ত হইতেছে, মান্দ্রাজ হইতে শেষাগত সমাচারে অত্রত্য এডবোকেট জেনরল লেখেন তথাকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দুই জন ব্রাহ্মণ ছাত্র বালিকা-গণের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আমি ইহার অভ্যন্তর সমাচার চাহিয়াছি এবং উক্ত ছাত্রদ্বয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সাধ্যানত তাঁহারদিগের অনুকূলতা করিব।

"অন্য এক কথা আছে, তাহা এই যে একদিবস রাত্রে আমার সদনে ধার্য্য হয় দুই কমিটী নিযুক্ত করা যায় তাহার এক কমিটী স্কুল সংস্থাপন যোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করেন অপর কমিটী পাঠার্থিনীগণকে বাছনী করিয়া গ্রহণ করেন, ইহার প্রথমোক্ত কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু বাবু দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বদান্যতা ও অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার এই বাটী আমারদিগকে অর্পণ করিলেন এজন্য উক্ত কমিটী অবসর পাইলেন, কিন্তু শেষোক্ত কমিটীর অধিক প্রয়োজন হইতেছে অতএব তোমারদিগের অভিমত হইলে যাঁহারা বাটী অনুসন্ধানার্থ কমিটীভুক্ত হইয়াছিলেন- তাঁহারাই আগামী ছয় মাসের জন্য শেষ কমিটীভুক্ত হউন, অনেক পাঠার্থিনী উপস্থিতা হইতেছে তাহারদিগের বাছনী করিবার ভার আর কাহার উপর দেওয়া যায়, এবং কৃতকার্য্য হইব কি না ইহা পরে বলিবার অপেক্ষা করে না, সন্দেহ নাই আমরা সুসিদ্ধ হইয়াছি এবং পরমেশ্বরানুকম্পায় অদ্য যে পতাকা রোপণ করিয়াছি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব যাবৎ এতদ্রাজ্যস্থ লোকেরা কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক স্বীকার না করেন তাবৎ তাহা পশ্চাৎগামী হইবার নহে।

"সর্ব্বশেষে আমি তোমারদিগকে স্মরণ করাই তোমরা সকলে মধ্যে ২ আমার বাটীতে একত্র হইবে, কারণ এই স্কুল তোমারদিগের সন্তোষমতে চলিতেছে কি না, এবং কোন বিষয় পরিবর্ত্তনযোগ্য কি না এবং সর্ব্ব বিষয় ইহা তোমারদিগের অভিমতানুযায়ী ও তোমারদিগের বালিকা-গণের হিতকারী হইতেছে কি না তোমারদিগের সাক্ষাতা-ভাবে ইহা বিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিব।"

ওলট-পালট

"যে প্রেম রহস্যময়ী চুপে কথা কও,
দুখের দুয়ারখানি উঁকিঝুঁকি রও।
আত্মবলি— তারে তুমি ঘোরাও ঘুরিতে ;
অহংকা বন্ধের মণি কে পারে ঘুরিতে।"

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

সুরেন্দ্রনাথের বাপ অমরেন্দ্রনাথ সামান্য কেরাণী থেকে সুরু ক'রে লক্ষপতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মা-লক্ষ্মীর কৃপা-দৃষ্টি কখন যে কার উপর পড়ে তা' ত' বলা যায় না. তাই তুচ্ছ এক কেরাণী কারবার ক'রে আজ সহরের লক্ষপতিদের দলভুক্ত। অমরেন্দ্র বাবুর পয়সা হ'তে তাঁর ঝোঁক গিয়ে পড়ল বংশের দিকে। একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথের বিয়ে তিনি ভাল বংশেই দিলেন। সুলেখার বাপ গরীব তবে বংশ ছিল খুবই উচ্চ, তাই বিনা পয়সায় তিনি মেয়েটিকে পার করতে পারলেন, শুধু পার নয় মেয়েকে রাজরাণী ক'রে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

সুলেখাকে পেয়ে সত্যিই সুখী হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ। চার পাঁচ বছর তাদের কেটে গেল আনন্দের মধ্যে দিয়ে। ঘরে শাশুড়ী ছিল না, সুলেখাই গৃহিণী। শ্বশুর কাজে ব্যস্ত থাকেন, বৌয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কেবল ঐ আহারের সময়। সুরেন্দ্রনাথও বাপের আপিসে রোজ বেরুত তবে দায়িত্ব তার বিশেষ না থাকায় সুলেখার সঙ্গসুখ সে যথেষ্ট পেত। তাদের আনন্দের মধ্যে যেটুকু ফাঁক ছিল সেটুকু পরিপূর্ণ হ'ল কমলাকে পেয়ে। ছোট্ট ফুলের মতন মেয়ে —তার হাসি-কান্নায় মুখর হ'য়ে থাকত অমরেন্দ্রনাথের প্রকাণ্ড বাড়ীখানা।

একটানা সুখ বুঝি মানুষের কপালে সয় না। মৃত্যু এসে একদিন বাড়ীর কর্তা অমরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুলেখার সংসারে হ'য়ে গেল অনেক ওলট-পালট। সুরেন্দ্রনাথই এখন কারবারের মালিক। অতবড় আপিসের ভার এখন সম্পূর্ণ তারই উপর। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত খেটে যায় আপিসের কাজে। বাড়ীর সঙ্গে ক্রমশঃ তার সম্পর্ক খাওয়া-শোয়াতেই এসে দাঁড়াল। সেই যে সকালে খেয়ে বেরিয়ে যান রাতের আগে আর বাড়ী ফেরেন না। বাড়ী এসে যে দুদণ্ড কথা কইবেন তারই বা সময় কই? খেয়েদেয়েই কাগজপত্র নিয়ে টানাটানি। একটা দেড়টা বেজে যায় শুতে। আগে আগে সুলেখা জেগে থাকত বটে কিন্তু আজকাল সে দেখে তাতে কোন লাভ নেই, কাজ তার স্বামীকে এমনি পেয়ে বসেছে যে সুলেখার মত সামান্য নারীকে তাঁর মনে পড়বে কেন? স্বামী তার আর শুধু স্বামী নেই তিনি এখন টাকা তৈরীর কল। টাকার নেশা ভীষণ জিনিষ। মাতালের মত কেবল মাত্রা বেড়েই চলে। হাজারের ঘরে যে খেলা সুরু হয় সেটা গিয়ে পড়ে লক্ষের কোঠায়,আবার কি ক'রে সেটা কোটির ঘরে উঠবে তাই ভেবেই দিন কাটে। সুরেন্দ্র-নাথের জীবনেও তাই হ'ল। সুলেখার শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ ঢাকা প'ড়ে গেল চকচকে রুপোর চাকতি দিয়ে, তার মিষ্টি গলার স্বর চাপা প'ড়ে গেল টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দে। প্রথম প্রথম এই পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে সুলেখা দাঁড়িয়েছিল বটে মাথা তুলে', কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝল প্রতিদ্বন্দ্বী তার বড়ই প্রবল—হার মানতেই হ'ল তাকে। সেদিনের কথা ত' ভোলবার নয়? সেই যে এক বাদল-সন্ধ্যায় বড় আশা করেই সে তার স্বামীকে বলেছিল—"ওগো আর আমাদের টাকার কি দরকার? যা আছে তাই কে ভোগ করে? ঐ টাকার জন্যে তুমি যে ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে কত দূরে স'রে গেছ সেদিকে কি লক্ষ্য রাখ? যদি আমরা পরস্পরকেই হারালাম তবে টাকা নিয়ে কি হবে?"— সুরেন্দ্রনাথের মনটা যে সুলেখার কথায় একবারও চঞ্চল

হ'য়ে ওঠে নি তা' বলা চলে না কিন্তু সে মুহূর্ত্তের তরে। একটু হেসে, সুলেখাকে কাছে টেনে নিয়ে সে বল্লে—"তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, টাকার প্রয়োজনের কি শেষ আছে?"—এর পর সুলেখা স্বামীকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলে নি।

পাঁচ বছরের মেয়ে কমলাই এখন সুলেখার সব। তাকে খাইয়ে পরিয়ে শিখিয়ে তার দিন কাটে। সুরেন্দ্রনাথ টাকার স্তূপের উপর ব'সে এদের জীবনের বাইরেই র'য়ে গেলেন।

বসন্তকুমার রায় সুরেন্দ্রনাথের আপিসের ম্যানেজার। কর্ত্তার আমলের লোক। বসন্তকুমারের পুত্র সন্তোষকুমার দশ বছরের ছেলে বিনয়কুমারকে পিতার হাতে স'পে দিয়ে অল্প বয়সেই এপারের খেলা সাঙ্গ ক'রে চ'লে যান। বিনয় ও তার বিধবা মা শান্তিকে নিয়েই বসন্ত বাবুর সংসার।

সুলেখার সঙ্গে শান্তির অনেকদিনের ভাব। অমরেন্দ্র বাবুর আমল থেকেই এই দুই পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আসা চ'লে আসছে। কমলা আর বিনয়ের বন্ধুত্বের আরম্ভও ঐ সময় থেকে।

বিশ বৎসর বয়সে বিনয় বেরুল বিলাতের পথে ডাক্তার হ'বার জন্যে। যাবার আগে সে যায় কমলার সঙ্গে দেখা করতে। দক্ষিণ দিকের মার্ব্বেল পাথরের বড় বারান্দাটায় ব'সে ছিল কমলা একা। হাত-পা'গুলো তার পাথরেরই মত ঠাণ্ডা। বিনয়ের দিকে সে চোখ তুলে' চাইতেই পারে নি পাছে তার চোখের জল উথ্‌লে প'ড়ে কোন অঘটন ঘটায়।

যাবার সময় বিনয় ব'লে গেল—"তোমার আমার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা' আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না; তবে যদি ভগবান মুখ তোলেন, যদি নিঃস্বার্থ ভালবাসার কোন দাম থাকে তবে এ ব্যবধান কাটিয়ে উঠ্‌তে পারব নিশ্চয়। ফিরতে আমার দু'চার বছর লাগবে। যদি যেমনটি রেখে গেলাম তেমনটি এসে পাই তবে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ এখান থেকে বিদায় হ'লাম সে আকাঙ্ক্ষা মেটাবার চেষ্টা করব...এখন আমার যা অবস্থা তাতে কিছুই দাবী করা চলে না তাই যা বলবার আছে তা না বলেই গেলাম।"

রাজা বাহাদুর শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদের নাম সকলেই জানে। এক সময় কোলকাতা সহরের অর্দ্ধেক বাড়ীই তাঁদের ছিল। বাৎসরিক আয় যে তাঁদের কত তা' কেউ কোনদিনও সঠিক বলতে পারে নি। তিন পুরুষ থেকে কিন্তু এঁদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'তে সুরু করেছে। শরৎকুমার যখন পিতার স্থান অধিকার করলেন তখন তাঁর একখানি বাড়ী ও ছোট একটি জমিদারী ভিন্ন সবই চ'লে গিয়েছিল বন্ধকীদের হাতে। তাই তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন পুত্র হরশচন্দ্রের বিবাহ তিনি বড় লোকেরই ঘরে দেবেন। সুযোগ পেয়ে গেলেন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে। সুরেন্দ্রনাথও রাজা বাহাদুরের প্রস্তাবে সুখী হ'লেন। তাঁর ত' টাকার অভাব নেই—রাজা বাহাদুরের সব সম্পত্তি তিনি কিনে নিয়ে মেয়েকে যৌতুক দেবেন, মেয়ে তাঁর রাণী হবে। প্রস্তাব শুনে সুলেখা একটি কথাও বলেন নি, মেয়ে তাঁর সুখী হ'লেই হ'ল, এইটিই তাঁর বক্তব্য। কিন্তু মেয়ের মুখ দেখে ত' মনে হয় না এ বিয়েতে তার মত আছে। বিয়ের ঠিক হ'য়ে অবধি তার খাওয়া ঘুচেছে। মুখের হাসি ম্লান আগে থেকেই হ'য়ে এসেছিল এখন রেখা-টুকু পর্য্যন্ত দেখা যায় না। অনেক সয়েছে সুলেখা, টাকার জন্যে সে তার স্বামীকে হারিয়েছে—ফের সেই টাকারই মত তুচ্ছ জিনিষ যে মান, তারই জন্যে তার একমাত্র মেয়ে কমলারও জীবন নষ্ট হ'তে চল্ল? আর কত তাকে সইতে হবে? কমলার দিকে আর চাওয়া যায় না। থাকতে না পেরে একদিন সুলেখা কমলাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বল্ল—"কমল, আমি তোমার মা, আমার কাছে কিছু লুকিও না, বলো আমায় এ বিয়েতে তোমার মত আছে কি না?" অনেকক্ষণ পর কমলা বল্ল—"বিয়ে করতে পারব না মা—"সুলেখা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল তারপর ধীরে ধীরে কমলার মুখখানা দুই হাতে তুলে ধ'রে জিজ্ঞেস করল—"বিনয়কে পেলে সুখী হ'স কমল?" কমলার চোখে খুঁজে পেল সুলেখা তার প্রশ্নের উত্তর।

নিজের জন্যে সুলেখা স্বামীর কাছে কিছু চাইবে না

ঠিক করেছিল কিন্তু আর চুপ ক'রে থাকা চলে না, কমলাকে সুখী করবার জন্যে সে সব করতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথের মন আজ বেশ প্রফুল্ল। কারবারের কাজ এমন দৃঢ়ভাবেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে, ভাবনার বিশেষ কিছু নেই। এবার আর তেমন ক'রে আপিসের কাজে ডুবে না থাকলেও চলবে। আর সত্যিই ত'? কার জন্যেই বা এত টাকা জমান? ভোগ করবার মধ্যে ত' ঐ এক কমলা—তারও ত' সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে। সেও ত' রাজরাণী হ'তে চল। এই সময় তার মাঝে মাঝে মনে হয়, সুলেখা যদি তাকে একটি পুত্রসন্তান দান করত? সুলেখার কথা আজকাল তার মনের কোণে প্রায়ই উঁকি মারে। সে যেন কিন্তু কেমন পর হ'য়ে গিয়েছে, নাগাল পাওয়া যায় না তার। কাজের দিক দিয়ে সুলেখার কোন দোষ ধরবার নেই—সে সুরেন্দ্রনাথের সংসারকে ক'রে রেখেছিল দর্পণসুন্দর। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, সুলেখা নিজে যেন হ'য়ে গিয়েছিল কলের মানুষ!

যা হ'ক আজ সে ঠিক করেছিল সুলেখার সঙ্গে দশ বছর আগের সেই পুরান সম্বন্ধটা পুনরায় ফিরিয়ে নেবে। ফুল-চন্দনের গন্ধে ভরা অতীতের দিনগুলোকে সে আনবে ফিরিয়ে। সকাল সকাল বাড়ী ফিরে সুরেন্দ্রনাথ ঘরে ব'সে ভাবছিল সুলেখারই কথা, এমন সময় সুলেখা নিজেই এসে দাঁড়াল তার পাশে। সুরেন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি এড়িয়ে গম্ভীরভাবে সুলেখা বলল—"দেখ, তরুণের সঙ্গে বিয়ে দিলে কমলা সুখী হবে না; ও সত্যি চায় বিনয়কে—" সুলেখার কথা শেষ হ'বার আগেই সুরেন্দ্রনাথ ব'লে উঠলেন—"তোমার কথা বোঝা আমার সাধ্য নয়; শেষে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে আমারই কর্ম্মচারীর ছেলের সঙ্গে! এরই জন্যে গায়ের রক্ত জল ক'রে টাকা করেছি? হাসালে তুমি! যাক্ এ বিষয়ের আর আলোচনার প্রয়োজন নেই; ভদ্রলোকের এক-কথা। ঐ ঘরেই কমলার বিয়ে দিতে হবে। তুমি বরং এক শিশি মধ্যমনারায়ণ তেল আনিয়ে মাখ, উপকার পাবে—"

পুরোদমেই চলেছে কমলার বিয়ের উদ্যোগ। আত্মীয়-কুটুম্বতে বাড়ী সরগরম। কলের মা'র মন খারাপ—সে বিয়ের কোন কাজে হাত দেয় না। আর সত্যিই ত', এক মেয়ে, আজ যাবে কাল পরের ঘরে চ'লে যাবে—মন কি মায়ের ভাল থাকে? বাড়ীর লোকেরাও তাকে তাই এ সব কাজে বেশী জড়াতে চান না, জড়াবার দরকারও নেই, তাঁরা এক-এক জনেই এক এক শ'। তাঁদের হাঁকডাকে বাড়ীতে কাক-চিল পার না বসতে।—"ও বৌমা, বরের জোড়খানা রাখ্‌লে কোথায়?...ঠাকুর ঝি, টোপর এসেছে?...ও তরুর মা, পুব দিকের ভাঁড়ারে পুরি-পেলাসগুলো রাখা হ'ল? ঠিক ঝিগুলো করছে কি? কেবল পানদোক্তা চিবুলেই চলবে?...পিঁড়েতে আল্‌পনা দিচ্ছে কে? অ ছোট বৌ, ছিরি গড়্‌তে করে?...রাধা দিদি, রাঙ্গু নাপ্‌তিনীর বাড়ী খবর দেওয়া হ'ল?...মতিকে দিয়ে বিয়ের কাজ চলবে না, ও যে বাছা বিধবা!"—এই রকম কত কথা সুলেখার কানে আসে অনবরত। বুক তার ফেটে যায়—কিন্তু উপায় নেই!

বিয়ের আর দিন সাতেক বাকি। সুলেখা সন্ধ্যে থেকেই ঢুকেছে গিয়ে বিছানায়। সামনের বারান্দায় অনেকগুলি বৌ-ঝি গল্পগুজবে ব্যস্ত। এদের কথায় সুলেখা বড় একটা কান দেয় না তবে আজ হঠাৎ তাদের একটা কথাতে মনটা তার হ'য়ে উঠ্‌ল চঞ্চল। একজন মহিলা বলছিলেন—"কমলের আমাদের বরাত ভাল, কেমন ঘরে গিয়ে পড়ছে! একেবারে নিষ্কলঙ্ক বংশ বাকে বলে আর-কি! সাতপুরুষ ধ'রে ওদের বাড়ীর কি'টির পর্য্যন্ত নামে কেউ কিছু বলতে পারে না। এই ত' সেদিন, ওদেরই বাড়ীর এক মেয়ের কোন্ বড় এক রাজবাড়ীতে বিয়ের ঠিক হয়েছিল, সর্ব্বস্ব বেচেও অমন বর কেউ পায় না, এঁরা ত' পাচ্ছিলেন বিনা পয়সায়—কিন্তু হ'লে কি হবে? ছেলের মা'র স্বভাবচরিত্তির ভাল নয়, সেই শুনেই না আমাদের জামাইয়ের বাপ তখুনি সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন—গরীবের ঘরে মেয়ে পড়বে সেও ভাল তবু কলঙ্কিত বংশে তিনি মেয়ে দেবেনও না নেবেনও না। এই রকমই ত' হওয়া চাই! বংশ-মর্য্যাদা ব'লে ত' একটা জিনিষ আছে? তাই দেখে শুনে নিচ্ছেন কেমন ঘরের মেয়ে! কমলের মা'র মত সতী-লক্ষ্মী আজকালকার দিনে ক'টা আছে—"

পরদিন সকালে সুলেখাকে আর বাড়ীতে পাওয়া গেল না। নিবেদের মধ্যে বিয়েবাড়ী পরিণত হ'ল শ্মশানে।

কমলা শয্যা নিল; সুরেন্দ্রনাথ নিজের ঘর থেকে মোটে বেরুলেনই না। সুলেখার লেখা চিঠিখানা বার বার পড়েও তিনি বুঝতে পারছিলেন না কিছুই, সে লিখেছিল—"অনেকদিন থেকেই টের পেয়ছিলুম আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই। আমি এর আগেই এখান থেকে চ'লে যেতুম কিন্তু ছিলুম কেবল আমার মেয়ের জন্যে। তারও ত' ভাল ব্যবস্থাই করেছ অতএব আমার আর এখানে থাকবার কোন দরকার দেখি না। আমি চলুম আমার এক ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে। যে কলঙ্কের কালী তোমার বংশে লিখে দিলুম তার জন্যে তুমি আমায় কোনদিনও ক্ষমা করবে না জানি, ক্ষমা চাইবার স্পর্দ্ধাও রাখি না।"

কমলার বিয়ে ভেঙে গিয়েছে, ভাঙবারই কথা, কুলত্যাগিনী মায়ের মেয়েকে ঘরের বধূ করা চলে না। সুরেন্দ্রনাথের কোলকাতার বাড়ীতে তালা বন্ধ। মেয়েকে নিয়ে তিনি থাকেন তাঁর বরানগরের বাগান-বাড়ীতে। কাজকর্ম দেখেন পুরাতন ম্যানেজার বসন্ত বাবু। সুরেন্দ্রনাথকে দেখলে পরে তাঁকে আর ব্যানার্জ্জি কোম্পানীর বড় সাহেব ব'লে মনে হয় না,—জীবনসংগ্রামে পরাস্ত লোকের মতই দেখায় তাঁকে।

কথাও যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছে পাথরের মত। কারো সঙ্গে কথা কয় না, আপন মনেই থাকে। মা'র কথা সে ভাবতে চায় না অথচ মা'র কথা ছাড়া অন্য কথা কিছুই তার মনে আসে না।

সম্প্রতি বিনয়ের একখানা চিঠি সে পেয়েছে, কৃতিত্বের সঙ্গে সে ডাক্তারি পাশ ক'রে সরকারী হাঁসপাতালে বড় চাকরী নিয়ে শীঘ্রই দেশে ফিরছে। এসে সে পরীক্ষা করবে তার ভাগ্যের।—বিনয়ের চিঠি এল বড় অসময়।

কমলাদের বরানগরে বাড়ী ছিল ঠিক গঙ্গার উপর। মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান চাওা ঘাট। সন্ধ্যা হ'লে কমলা এই ঘাটে এসে থাকত ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে। সেদিন ছিল শুক্লা চতুর্দ্দশী। কমলা এসে ঘাটে ব'সে, এমন সময় কি এসে তার হাতে দিল একখানা খামে আঁটা চিঠি। উপরের হাতের লেখা দেখে কমলা খানিক ব'সে রইল স্তব্ধ হ'য়ে—একি সম্ভব? মা'র তাকে মনে পড়েছে এতদিন পরে! কোন রকমে খামখানা ছিঁড়ে সে পড়ল—"মা আমার, তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে কিন্তু কোথা থেকে যে আরম্ভ করব ভেবে পাচ্ছি না। প্রথম, তোমায় জানাতে হবে কোথায় আমি আছি। তোমার বাবার বাড়ী ছেড়ে আমি গিয়ে উঠি তোমার ম্যানেজার দাদা বসন্ত বাবুর ওখানে। আমার বাবাবন্ধু শান্তি যে আমায় আদর ক'রে তুলে নেবে সে ভরসাটুকু ছিল। এবার তোমায় জানাই, কেন তোমাকে ছেড়ে এসেছি। তরুণের সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে বিনয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা তোমার বাবার কাছে তুলি, তিনি তা' শুনে আমার পাগলাগারদের ব্যবস্থা করেছিলেন! বুঝলুম তোমাকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচাতে পারব না। ঠিক এই সময় শুনলুম তরুণের বাবার বংশমর্য্যাদা বড় বেশী, কলঙ্কিত বংশের মেয়ে তিনি নেবেন না, তাই কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চ'লে এলাম। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে তোমার পিতৃকুলে কালী দিলেম, এ যে আমার কত বড় দুঃখ তা ভগবানই জানেন; কিন্তু তোমার সুখের কাছে সবই তুচ্ছ। তোমার বাবার বিরুদ্ধে যে অন্যায় করলাম তার আর ক্ষমা নেই, তবে সান্ত্বনা এই যে এতে তাঁর বাইরের বাহবাটা মাত্র। আমার অভাব তিনি কোন দিনও বোধ করবেন না সে আমি ভাল ক'রেই জানি। আর তা ছাড়া টাকাতে সব হয়, টাকা ঢাললে বংশের কলঙ্কও মুছে যাবে। এক সময় তোমার বাবার কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম সেটা যে চিরদিনের করতে পারিনি সেটা আমার কিম্বা আমার বরাতের দোষ—তোমার বাবা এর জন্যে দায়ী ন'ন। তাঁর ভার এখন তোমার উপর, দেখো তাঁর যেন অযত্ন না হয়। যাহ'ক বিনয় ত' শীগ্‌গির আসছে, তার সঙ্গে তোমার যা বোঝাপড়া তা তুমি নিজেই কোর'—আমি ত' রইলুম দূরে। এখান থেকেও আমায় এবার যেতে হবে—বিনয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে আমার থাকা ভাল দেখায় না। কোথায় যে যাব তা' এখনও ঠিক করিনি কিন্তু যেখানেই থাকি একবার আমায় দেখা দিও। ভগবান জানেন তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে ভাল কাজ করেছি কি মন্দ, তবে এর ফলে যদি তুমি সত্যি সুখী হও তা' হ'লেই সব সার্থক। মা'র

আশীর্ব্বাদের যদি কোন মূল্য থাকে তবে তুমি নিশ্চয় সুখী হবে—"

নিমেষে কমলা তুলে নিল চিঠিখানা তার বাবার হাত থেকে। তিনিও সবটা পড়লেন নিঃশব্দে। তারপর কমলার মাথাটা লুটিয়ে পড়ল তার বাপের বুকে। বাপের চোখের জল পড়তে লাগল মেয়ের মাথায়,—মেয়ের চোখের জল ভাসিয়ে দিল বাপের বুক।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে সুলেখা ব'সে ছিল বসন্ত বাবুর খোলা ছাদটায়। ভবিষ্যৎ জীবনটা তার এই অন্ধকারের মতই কালো!

আসছে কাল বিনয় বাড়ী এসে পৌঁছবে, থাকি ও বসন্ত বাবু কোথায়ই বলুক এ বাড়ীতে তার থাকা আর চলে না। কিন্তু সে যাবে কোথায়? স্বশুরকুলে যথেষ্ট কলঙ্ক এনেছে এর উপর আর কতটি তাকে করতে হবে? ভদ্রাসনটাই তার হয়েছে বিড়ম্বনা! হঠাৎ তার মনে হ'ল কে যেন তাকে ডাকলে নাম ধ'রে, তারপর কার দুই বলিষ্ঠ বাহু তাকে ক'রে ফেলল আবদ্ধ। সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বললেন—"আমায় ক্ষমা করতে পারবে?" সুলেখার নিশ্বাস বন্ধ হ'বার জোগাড় হয়েছিল, সে একটিও কথা বলতে পারল না। সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় বলেন—"বিনয়ের চিঠি পেয়ে আমি যখন কমলাকে বলাম যে এ বিয়েতে আমার কোন আপত্তি নেই তখন কমলার মুখের সে ছবি আমি কোনদিনও ভুলব না। বাপ হ'য়ে সামান্য মানের জন্যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিয়ে দিয়ে আমি যে কি সর্ব্বনাশ করতে বসেছিলাম সেটা এবার বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পারলাম; আর না হ'য়ে মেয়ের সুখের জন্যে তুমি যা করেছ সেটা আমার চিরজন্ম লজ্জা দেবে! টাকার নেশা আমার কেটে গেছে, যদি একেবারে তোমায় না হারিয়ে থাকি তা' হ'লে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দাও—"

কমলা একবার ছাদে এসে তখুনি নেমে গেল। অনন্তকাল হ'তে এই যে একটি মুহূর্ত্ত তার বাপ-মা পেয়েছেন এতে কারুরই অধিকার নেই—এমন কি তারও না।

প্রভাতে ও সন্ধ্যায়

শ্রী শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

প্রভাতে যখন দেব-মন্দিরে
ছিনু বন্দন-রত,
মন্দির-দ্বার ঘিরিয়া ছিল সে
পথের পান্থ যত।

স্নান-অবসানে সিক্ত-বসনে
তুমি পবিত্র বেশে,
পূজার সাজি হস্তে ধরিয়া
দাঁড়ালে দুয়ারে এসে।

তোমারে হেরিনু সবাকার মাঝে
মণ্ডিতা সুষমায়—
আপনারে তুমি বিলায়ে দিয়েছ
বিশ্বের আঙিনায়!

•

সন্ধ্যায় যবে মন্দিরে আসি'
বসিনু আসন 'পরে,
তুমি এলে দ্বারে ভক্তি-বিনতা
স্তুতির প্রদীপ করে।
কেহ নাই সেথা—শুধু তুমি আমি;
তোমা পানে দেখি চেয়ে,
আমার নয়নে তোমার অপার
মাধুরী গিয়াছে ছেয়ে

বাহিরের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

অক্সফোর্ড

বার্মিংহাম থেকে লণ্ডনে এসে পৌঁছলাম রাত্রে। লণ্ডন জানা যায়গা। হেমষ্টেডে—যেখানে ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার থেকে গিয়েছি—চিঠি লেখে আগেই ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিলাম; সুতরাং রাত্রে এসে পৌঁছলেও আমাদের কোন অসুবিধা হয় নি। পরদিন গুপ্ত ও মাধুর জন্যও সেই বাড়ীতেই ঘরের বন্দোবস্ত ক'রে তাদের চ'লে আসতে লিখে দিলাম।

লণ্ডনের অনেকটা আমাদের আগেই দেখা আছে। পরেও লণ্ডন দেখার সুযোগ অনেক ঘটবে। তাই গুপ্ত, মাধুর অপেক্ষায় ৩।৪ দিন লণ্ডনে ব'সে না থেকে আমরা এই ফাঁকে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ দেখে আসা স্থির করলাম। খোকা পড়ছে 'ইন্ টন্' স্কুলে। তোমার জামাই বাবু ও আমার উভয়েরই একান্ত ইচ্ছা যে স্কুলের পড়া শেষ হলেই খোকাকে অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজের কোন একটা ভাল কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দি। সুতরাং এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় খুব ভাল ক'রেই দেখতে হবে।

লণ্ডন থেকে রেলপথে ৫৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অক্সফোর্ড। মোটর, রেল, জাহাজ সকল প্রকার যানেই অক্সফোর্ডে যাতায়াত চলে। নদীপথে যাতায়াতই সব চেয়ে আরামদায়ক ও আনন্দজনক; কিন্তু তাতে টাকা ও সময় উভয়ই লাগে বেশী—তাই আমরা ট্রেনেই চ'ড়ে বসলাম। ট্রেন যতই অক্সফোর্ডের কাছাকাছি আসতে লাগল ততই কলেজগুলির উঁচু উঁচু চূড়া ও গম্বুজ দেখে মন অব্যক্ত আনন্দে ভ'রে গেল। ধীরে ধীরে ট্রেন ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা নেমে পড়লাম এবং একখানা ট্যাক্সি ডেকে ক্লেরেণ্ডন হোটেলে গিয়ে উঠলাম। সৌভাগ্যক্রমে হোটেলেই একটি ভাল গাইড জুটে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

আমাদের দেশের তীর্থস্থান দেখতে গেলে পুরাণেতিহাস জানা থাকলেও যেমন পাণ্ডা সঙ্গে থাকলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়, তেমনি বিদেশের কোন-কিছু দেখতে হ'লে তথাকার ইতিহাস ও গাইডবুক পড়া থাকলেও একটি গাইড সঙ্গে নিলে নানা বিষয়ে সুবিধা হয়—নতুবা অনেক স্থলে জগন্নাথের রথযাত্রা দেখতে গিয়ে রথের ঘোড়া দেখাই সার হয়। আমাদের দেশের বর্ত্তমান পাণ্ডারা অনেকেই অশিক্ষিত—যা' তা' ব'লে বিদেশ যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করতেই ব্যস্ত; কিন্তু এ দেশের গাইড অনেকেই সুশিক্ষিত,—অল্প সময়ে দেখে শুনে সব বিষয় জানতে হ'লে গাইডের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়।

হোটেল থেকে বের হ'য়ে কিছু দূরেই Carfax—এটা একটা চৌমাথার নাম। চারটা রাস্তা চার দিক থেকে এসে এখানে মিশেছে। এই চৌমাথা থেকে পূর্ব্বদিকে যে রাস্তাটি গেছে তার নাম 'হাই ষ্ট্রীট'। হাই ষ্ট্রীটের দু'ধারেই সারি সারি কলেজ। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে কলেজের গেট, চূড়া ও গম্বুজসহ এ রাস্তাটি অতি চমৎকার দেখায়। কেউ কেউ বলেন সমস্ত পৃথিবীতে এ রাস্তাটির মত দৃশ্য বিরল। আমাদের কিন্তু তেমন কিছু মনে হ'ল না। এই চৌমাথা থেকে অক্সফোর্ডের যে কোন কলেজে হেঁটে যেতে পনর মিনিটের বেশী লাগে না।

চৌমাথা থেকে দক্ষিণ মুখে যেতেই বাঁ দিকে টাউন হল ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রকাণ্ড বাড়ী—ডান দিকে ডাকঘর। আমরা ডাকঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে (১) পেমব্রোক (Pembroke) কলেজে প্রবেশ করলাম। প্রবেশদ্বারটি সুপ্রশস্ত ও সুগঠন—কলেজের ঘর-বাড়ীও মন্দ নয়। ১৬২৪

খৃষ্টাব্দে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। বিখ্যাত অভিধান-প্রণেতা স্যামুয়েল জন্‌সন এবং প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্ল্যাকষ্টোন এই পেম্‌ব্রোক কলেজের ছাত্র। ডাক্তার জন্‌সনের অনেক স্মৃতিচিহ্ন এখানে আছে।

Folly Bridge—পেম্‌ব্রোক কলেজ থেকে বের হ'য়ে St. Aldates দিয়ে বরাবর দক্ষিণ মুখে কিছুদূর গেলেই আইসিস (Isis) নদীর উপরে যে পোল পাওয়া যায় তার নাম 'ফলিব্রীজ'। আমরা এই পোলের উপর থেকে নদীর পারে সারি সারি কলেজের বজরা ও নৌকাসকল দেখ্‌লাম। নদীর উভয় পারে কলেজের বাগান, লন (Lawn) ও খেলার মাঠ। হরিদ্বর্ণ চূণাচ্ছাদিত মাঠ ও লন দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন সবুজ মখমল পেতে রেখেছে।

(২) ফলিব্রীজ থেকে ফিরে এসে পেম্‌ব্রোক কলেজের পূর্ব্বদিকে রাস্তার অপর পারে খৃষ্ট চার্চ্চ কলেজ (Christ Church College)। ১৫২৫ খৃঃ অব্দে এই অপরূপ সৌন্দর্য্যময় কলেজটির প্রথম ভিত্তি গঠন করেন কার্ডিন্যাল উল্‌সি। সাত বৎসর পরে রাজা অষ্টম হেন্‌রি এর নূতন ভিত্তি স্থাপন করেন। রাস্তার উপরেই কলেজের গেট—গেটের উপর 'টম টাওয়ার' (Tom Tower) নামক বিখ্যাত চূড়া। এই টাওয়ারে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলান আছে। ঘণ্টাটির ওজন ২১০ মণ। রোজ রাত ন'টার সময় ১০১ বার ঘণ্টা বাজে—আর সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের সব গেট বন্ধ করা হয়। লণ্ডনের বিখ্যাত সেণ্টপল কেথিড্রেলের নির্ম্মাতা প্রসিদ্ধ স্থপতি স্যার ক্রষ্টোফার রেন (Sir Christopher Wren) ১৬৮২ খৃঃ অব্দে এই মনোরম কারুকার্য্যময় গেট ও টাওয়ার প্রস্তুত করেন। এই কলেজে বড় বড় তিনটি প্রাঙ্গণ আছে। 'টম কোয়াড' (Tom Yuad) নামক আঙ্গিনাটি কেবল যে অতি বড় তা নয়—অতি সুশোভন—লম্বায় ২৬৪ ফিট, পাশে ২৬১ ফিট। এত বড় আঙ্গিনা অক্সফোর্ডে আর কোন কলেজেই নাই। আঙ্গিনার ঠিক মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা—ফোয়ারা থেকে চারদিকে চারটি রাস্তা—অবশিষ্ট স্থান সবুজ ঘাসে ঢাকা 'লন'। নানা কারুকার্য্যখচিত কলেজ হল (Hall) অর্থাৎ ভোজনাগার অতি রমণীয়—লম্বা ১১৫, পাশ ৪০ এবং উঁচু ৫০ ফিট। লাইব্রেরীতে বহু পুস্তক ও চিত্রাদি আছে। এ কলেজের সঙ্গে যে কত খ্যাতনামা লোকের নাম জড়িত তার ইয়ত্তা নাই—ইংলণ্ডের ৯জন প্রধান মন্ত্রী এবং ভারতের ৮ জন বড়লাট এই কলেজের ছাত্র। কলেজের পাশেই কলেজের উপাসনা-মন্দির—খুব বড় না হলেও বড়ই সুন্দর—আট-কোণা চূড়া—মাটি থেকে ১৪৪ ফিট উঁচু।

(৩) ওরিয়েল কলেজ (Oriel College) ১৩২৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। দেখেও পুরাতন বলেই মনে হ'ল। হল, উপাসনা-মন্দির, লাইব্রেরী সব নূতন। সিসিল রোডস্ (Cecil Rhodes) এই কলেজের ছেলো ছিলেন।

(৪) করপাস খৃষ্টি কলেজ (Corpus Chresti College) ১৫১৬ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। বাহির থেকে বেশ দেখায়। আঙ্গিনাতে যে নলাকার সূর্য্যঘড়িটি আছে সেটা তৈরি হয়েছিল সাড়ে তিনশ' বছর আগে।

(৫) মার্টন কলেজ (Merton College) ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানবিচারক Walter de Merton কর্ত্তৃক ১২৬৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। আগে ছেলেরা কলেজের বাইরে থাকত—কলেজে এসে প'ড়ে যেত। মার্টন কলেজের প্রতিষ্ঠাতাই সর্ব্বপ্রথমে কলেজের ভেতর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা করেন। দেখাদেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কলেজও ক্রমশঃ এই আদর্শের অনুসরণ করে। অক্সফোর্ডে মার্টন কলেজের লাইব্রেরী সব চেয়ে প্রাচীন। হলে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। কলেজের বাগান এবং বাগানের রাস্তাগুলি সুবিন্যস্ত ও সুশোভিত। বাগানের দক্ষিণেই কলেজের সুবিশাল মাঠ। অনেক নামজাদা লোক এই কলেজের ছাত্র। ১২৯৯ হ'তে ১৩৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ৭০ বৎসরে ক্যাণ্টারবেরিতে মোট ৭ জন বিশপ নিযুক্ত হন—তন্মধ্যে ৬ জনই ছিলেন মার্টন কলেজের ছাত্র।

(৬) University College—মার্টন কলেজ থেকে মার্টন্‌ষ্ট্রীট পার হয়েই ইউনিভারসিটি কলেজ—অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মধ্যে সবচেয়ে পুরান কলেজ—১২৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ষ্ট্রীট থেকে কলেজটি অতি সুন্দর দেখায়। কলেজ হল, লাইব্রেরী ও অন্যান্য বিল্ডিং সবই মানানসই। কবি শেলির (Shelley) অর্দ্ধমূর্ত্তি (statue) এখানে

আছে। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি কমিশনের প্রেসিডেণ্ট সাড্‌লার সাহেব (Sir Michael Sadler) এখনকার বর্ত্তমান কর্ত্তা।

(২) কুইন্‌স্ কলেজ (Queen's College) ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। হাই ষ্ট্রীটের উপরেই বিচিত্র ফটক—ফটকের উপর গুম্বজের নীচে রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের পত্নী রাণী ক্যারোলিনের (Queen Caroline) অর্দ্ধমূর্ত্তি (statue)। শূকরের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে মেরে ফেলে।

এ কলেজের আর একটি সুন্দর প্রথা এই যে নূতন বৎসরের প্রথম দিনে প্রত্যেক ছেলের হাতে একটি পুই ও একটু সুতো দিয়ে বলা হয়—"এটা লও এবং মিতব্যয়ী হও (Take this and be thrifty)।"

৮। All Souls College—১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।

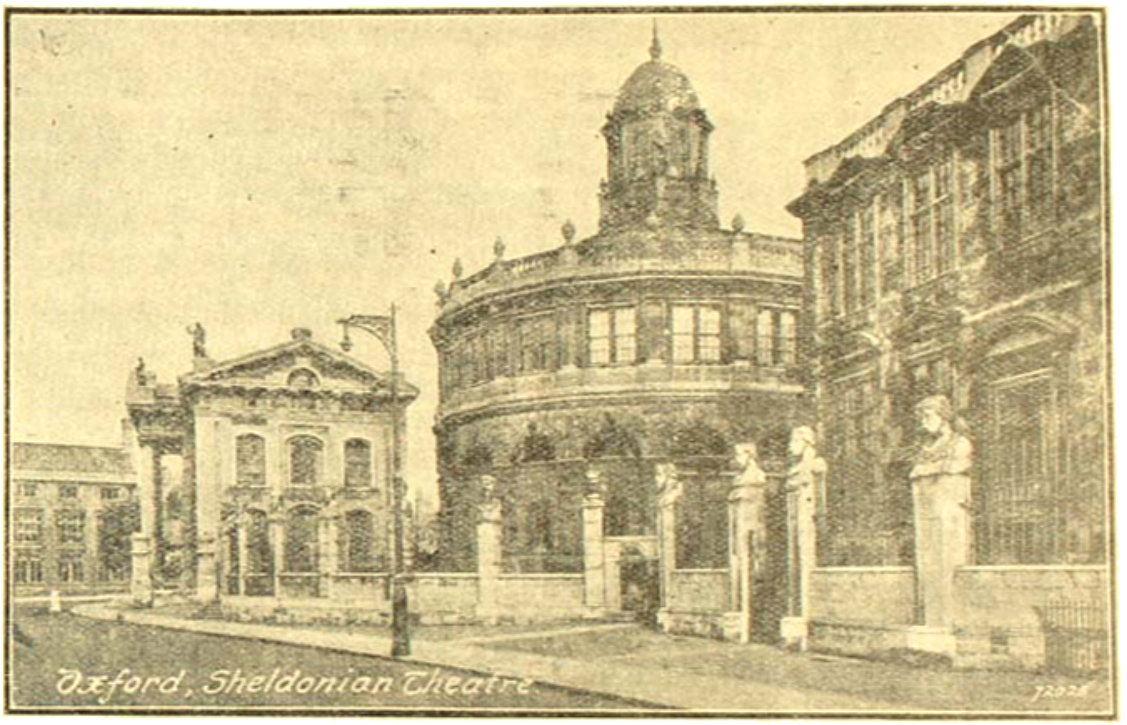

শেল্ডোনিয়ান থিয়েটার—অক্সফোর্ড

লাইব্রেরীতে মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্ট (Paradise Lost) এবং সেক্সপিয়রের প্রথম বারের ছাপা অনেক পুস্তক আছে। Halley's Commetএর আবিষ্কর্ত্তা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ হেলি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। এ কলেজে একটি অতি আশ্চর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে। প্রতি বৎসর খৃষ্টোৎসবের দিনে সকলে সমস্বরে গান করতে করতে কলেজের রান্না-ঘর থেকে একটি শূকরের মাথা এনে ভোজনাগারের খাবার টেবিলের উপরে রেখে দেয়। এ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে এই কলেজের একটি ছাত্র বনের ভেতর ব'সে পড়ছিলেন এমন সময়ে একটা বন্য শূকর এসে তাঁকে আক্রমণ করে—ছাত্রটি ভয় না পেয়ে তৎক্ষণাৎ হাতের পুস্তকখানা

এ কলেজটি অন্যান্য কলেজের মত নয়—এর বিশেষত্ব এই যে গ্রেজুয়েট না হ'লে এখানে কেউ ভর্ত্তি হ'তে পারে না। অন্যান্য কলেজের প্রতিষ্ঠানমাত্র গ্রেজুয়েটস্ এবং ডিগ্রিধারীরাই এখানে থেকে নানা বিষয়ে গবেষণা করেন এবং তাঁরাই এ কলেজের ফেলো (Fellows) লিষ্টভুক্ত হন। কলেজ লাইব্রেরী বেশ বড়—তাতে প্রায় দু'লক্ষ পুস্তক আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের প্রধান মন্ত্রী লর্ড স্যালিসবারি (Lord Salisbury) এবং স্থপতিবিদ্যাবিশারদ রেন (Sir Christopher Wren এখানে গবেষণা করতেন। এঁদের প্রতিমূর্ত্তিও এখানে আছে।

৯) বালিয়ল কলেজ (Balliol College) ১২৬৩ খৃঃ

অর্থে স্থাপিত। কথিত আছে যে 'জন ডি ব্যালিয়ল' নামক একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যারণ (Boron) কোন একটা বিষয় নিয়ে ডারহামের লর্ড বিশপকে অপমান করেন। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্যালিয়লকে ডারহামের উপাসনা-মন্দিরের সিঁড়ি পরিষ্কার করতে বাধ্য করা হয় এবং তাঁর কাছ থেকে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়। হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে ব্যালিয়ল তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে যেতে পারেন নাই, কিন্তু ব্যালিয়লের পত্নী ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রাজবংশের মেয়ে—তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর এই কলেজ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বামীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। কবি Mathew Arnold এবং আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

Martyr's Memorial—তৎকালীন ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধতা প্রচার জন্য ওয়েষ্টমিনিষ্টারের বিশপ 'ল্যাটিমার', লণ্ডনের বিশপ 'রিড্‌লি' এবং ক্যাণ্টারবারির আর্কবিশপ 'ক্রেনমার' অভিযুক্ত হন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে অক্সফোর্ডের ডিভিনিটী স্কুলে এঁদের বিচার আরম্ভ হয়। ১লা অক্টোবর 'ল্যাটিমার' ও 'রিড্‌লি'র প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং তার দু'সপ্তাহ পরেই তাঁরা উভয়ে হাসিমুখে জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। আর্ক-বিশপকে দণ্ড দিতে হ'লে পোপের মঞ্জুরি চাই—পোপের কাছ থেকে আর্কবিশপ 'ক্রেনমারের' দণ্ডাদেশ আসতে প্রায় এক বৎসর কালবিলম্ব ঘটে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ক্রেনমারের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার সুবিধা নিয়ে তাঁরা দ্বারা কয়েকখানা প্রতিজ্ঞাপত্র এই মর্ম্মে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে তিনি তাঁর পূর্ব্বতন ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তন ও পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু এতেও তাঁর দণ্ডাদেশ রহিত হয় না। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে উপস্থিত হতেই হঠাৎ 'ক্রেনমারের' সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর হ'য়ে যায়। তিনি তখন সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে দৃঢ়-স্বরে বলেন—"I renounce and refuse all such papers as I have written and signed with my hand wherein I have written many things untrue, and as my hand offended, my hand therefore shall be first burnt."

—এই কথা ব'লে তিনি তিলমাত্র বিচলিত না হ'য়ে নিজের দক্ষিণ হস্তখানা সর্ব্বাগ্রে জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়ে দেন—হাত পুড়ে ক্রমশঃ শরীরের অন্যান্য অংশে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্ব্বশরীর ভস্মে পরিণত হয়।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসাধারণের চাঁদায় এই তিন মহা-পুরুষের স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হয়। সেণ্ট মেরি ম্যাগডালেন গির্জ্জার উত্তরে, Balliol কলেজের পশ্চিমে, St. Giles ষ্ট্রীটের উপর এই স্মৃতিস্তম্ভ দেখে আমরা ধন্য হয়েছি। এই স্তম্ভের দক্ষিণ দেয়ালে বাইবেল-হস্তে ক্রেনমারের, পূর্ব্ব দেয়ালে রিড্‌লির এবং পশ্চিম দেয়ালে ল্যাটিমারের প্রতিমূর্ত্তি আছে। স্তম্ভের উত্তর দেয়ালে লেখা আছে :—

"To the glory of God and in grateful commemoration of His servants, Thomas Cranmer, Nicholas Ridley, Hugh Latimer; prelates of the Church of England, who near this spot, yielded their bodies to be burnt; bearing witness to the sacred truths which they had affirmed and maintained against the Errors of the Church of Rome, and rejoicing that to them it was given not only to believe in Christ, but also to suffer for His sake; this monument was erected by public subscription in the year of our Lord God MDCCCXLI."

(১০) ট্রিনিটি কলেজ (Trinity College) ১৫৫৫খৃঃ অব্দে স্থাপিত। ব্যালিয়ল কলেজের ঠিক পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ব্রড ষ্ট্রীটের উপর অতি সুন্দর লোহার ফটক। আমরা এই ফটক দিয়ে ভিতরে গিয়ে হল, লাইব্রেরী ও ভজনালয় প্রভৃতি দেখ্‌লাম। ভজনালয়ে সুগন্ধি সিডার কাঠের ধূপ থেকে যেন অনবরত পবিত্রতার সুবাস বের হ'চ্ছে। কলেজের বাগানের একটা রাস্তার দু'ধারে সারি সারি লেবু

গাছ—রাস্তাটির নাম 'লাইম ওয়াক"। এই লেবু গাছের এভিনিউটি প্রথম প্রস্তুত হয় ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে। এত দীর্ঘকাল এই এভিনিউটিকে এমন সুন্দর ভাবে বজায় রাখা মালীর পক্ষে কম সুখ্যাতির কথা নয়। বিখ্যাত বক্তা উইলিয়ম পিট (William Pitt) এখানে পড়তেন।

(১১) ওয়াডহাম কলেজ (Wadham College) ১৬১০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। Nicholas Wadham নামক এক ব্যক্তি এই কলেজটির পরিকল্পনা করেই মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর পতিপ্রাণা ডরোথি ওয়াডহাম স্বামীর

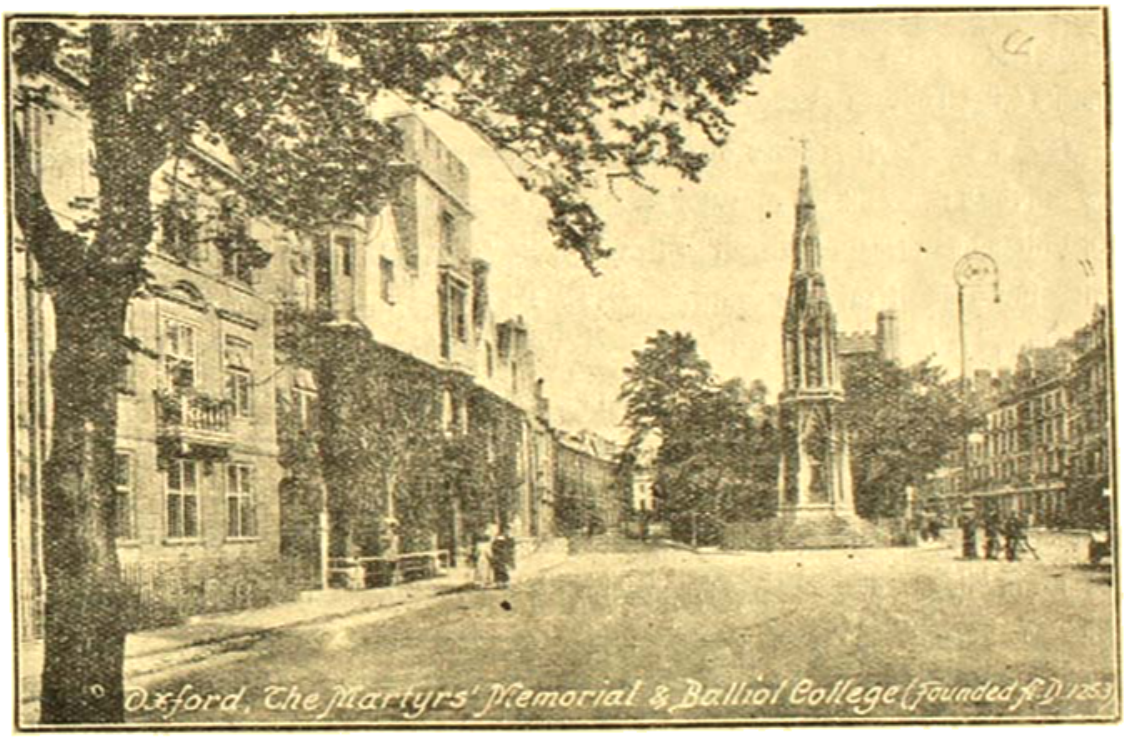

বালিয়ল কলেজ ও মার্টার্স-স্মৃতি

স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁর পরিকল্পিত কলেজ ঠিক তাঁর মনের মতন ক'রে বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করেন। স্থপতিবিদ্যা-বিশারদ Sir Christopher Wren প্রথম এই কলেজ থেকেই ডিগ্রী নিয়ে পরে All Souls কলেজে গিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

(১২) নূতন কলেজ (New College) ১৩৭৯ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। এই কলেজের চূড়াগুলির (Towers) শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। বাগানটি চমৎকার—বাগান থেকে কলেজ ও ভজনালয় অতি সুন্দর দেখায়। ভজনালয়ের কাচকার্য্য অতুলনীয়। ভজনালয়ের জানালার কাচে (১) বিশ্বাস (Faith), (২) আশা (Hope), (৩) প্রেম (Charity), (৪) মিতাচারিতা (Temperance), (৫) দৃঢ়তা (Fortitude), (৬) সাধুতা (Justice) এবং (৭) পরিণাম দর্শিতার (Prudence) চিত্র অঙ্কিত আছে। বাইর থেকে এ চিত্রগুলি চমৎকার দেখায়।

(১৩) ম্যাগডালেন কলেজ (Magdalen) ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। অক্সফোর্ডে যতগুলি কলেজ আছে আমার কাছে এই কলেজটিই সব চেয়ে ভাল ব'লে মনে হ'ল। কলেজটি হাইষ্ট্রীটের উপর—পাশেই চারওয়েল (Cherwell) নদী এবং নদীর ধারে ধারে বেড়াবার রাস্তা। কলেজ বাড়ী, টাওয়ার, হল, লাইব্রেরী, উপাসনা-মন্দির, প্রাঙ্গণ সবই মানানসই। বিস্তৃত বাগান, পার্ক ও খেলার মাঠ ইত্যাদি নিয়ে এত জায়গা অক্সফোর্ডের আর কোন কলেজেই নেই। টাওয়ারের উপরে উঠে অক্সফোর্ডের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। আমাদের বর্ত্তমান রাজপুত্র (H. R. H. Prince of Wales) এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এই কলেজে একসঙ্গে পড়তেন। আমরা কলেজ দেখে

"ম্যাগডালেন" পোলের উপরে উঠ্‌লাম। এই পোলটি চার-ওয়েল নদীর উপর—দৈর্ঘ্যে ৪২৬ ফুট। পোলের ঠিক মধ্যস্থল থেকে চারদিকের মনোরম দৃশ্য দেখে ফিরে এসে আমরা ক্লান্ত হ'য়ে বোটানিক গার্ডেনে গিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম। অক্সফোর্ডের বোটানিক গার্ডেনই ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রথম বোটানিক গার্ডেন। বাগানের ভেতরই লেক্‌চার হল এবং প্রফেসারদিগের বাসস্থান।

Bodleian Library—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী স্থাপিত হয় ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু নানা প্রকার অবস্থান্তরের পর যখন তা একপ্রকার লোপ পাওয়ার মত হয় তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন প্রথিতনামা পুরাতন ছাত্র 'বডলি'র (Sir Thomas Bodley) পঞ্চদশ বর্ষ-ব্যাপী (১৪৯৮ থেকে ১৬১৩ খৃঃ) অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এর পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। তদবধি তাঁর নাম অনুসারেই ইউ নিভার্সিটি লাইব্রেরীর নাম হয়েছে 'বডলিয়ান' লাইব্রেরী। বডলি সাহেব নিজেও এই লাইব্রেরীর জন্য অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে গিয়েছেন। তারপর অনেকে অনেক টাকা, পুস্তক ও প্রাচীনত্বের প্রভৃতি দিয়ে এই লাইব্রেরীর নানা প্রকার উন্নতিবিধান করেছেন। বিলাতে কোন নূতন পুস্তক ছাপা হ'লেই ছাপাখানার আইন অনুসারে তার এক কপি এই লাইব্রেরীতে দিতে হয়। এই লাইব্রেরীতে অনেক মূল্যবান হাতের লেখা পুঁথি আছে। হাতের লেখা চীনা ভাষার পুস্তক আছে ১৭০০০ এবং খৃষ্টাব্দে নেপালের মহারাজা দান করেছেন ৬৩৩০ খানা সংস্কৃত পুঁথি। বৃটিশ সাম্রাজ্যে বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী সব চেয়ে বড়। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে 'বডলিয়ান লাইব্রেরী'র স্থান অষ্টম। এই লাইব্রেরীতে প্রবেশ করতে তিন পেন্স ফি: দিতে হয়।

Sheldonian Theatre—সেল্ডোনিয়ান থিয়েটারের প্রবেশ-ফি: তিন পেন্স। বাইরের রেলিংএ অনেক পাথরের মূর্ত্তি আছে—কিন্তু কতকগুলি এমন ক'রে গেছে যে মুখ চেনা যায় না। ভিতরের দেয়াল ও চাঁদোয়া নানারকম চিত্রে চিত্রিত। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে এই বিল্ডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে দু'দিন খুব জাঁক-জমকের সহিত সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞদিগের সম্মিলন হয়—তদবধি এটা একটি বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি (Honorary) ডিগ্রী বিতরণ উপলক্ষে সভাসমিতিও এইখানেই হয়।

Radcliff Camera—রাজা তৃতীয় উইলিয়মের চিকিৎসক প্রসিদ্ধ ডাক্তার "জন র‍্যাডক্লিফ" একটি লাইব্রেরী প্রস্তুত জন্য ৪০,০০০ পাউণ্ড এবং লাইব্রেরীয়ানের বেতনের জন্য আরো অনেক টাকা রেখে যান। এই টাকাতেই এই মনোরম বিল্ডিং প্রস্তুত হয়েছে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে। বর্ত্তমানে এটি 'বডলিয়ান' লাইব্রেরীর রিডিংরুম রূপে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। এখানে দু' পেন্স দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হয়।

Indian Institute—Sir Monier Williams অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। ভারতের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান যাতে বহুলভাবে ইংলণ্ডে প্রচারিত হয় তদুদ্দেশ্যে ইনি অক্সফোর্ডে এই "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট" নামক ভবনের প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। এই উপলক্ষে তিনি ক্রমান্বয়ে তিনবার ভারতবর্ষে এসে নানা বিষয়ে অনুসন্ধান এবং নানাপ্রকার পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন। ইনি ইংরেজী-সংস্কৃত এবং সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান এবং অন্যান্য অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে L. L. D. উপাধি প্রদান করেন। এই ইনষ্টিটিউটের মিউজিয়ম ও লাইব্রেরীতে অনেক শিক্ষাপ্রদ মূল্যবান সংগ্রহ আছে। এখানে দর্শক-দের কোনপ্রকার ফি: দিতে হয় না।

বডলিয়ান লাইব্রেরী, ডিভিনিটী স্কুল, সেল্ডোনিয়ান থিয়েটার, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট এবং র‍্যাডক্লিফ ক্যেমেরা, সবগুলি বিল্ডিংই পরস্পরের কাছাকাছি।

লণ্ডনে ফেরবার পূর্ব্বে আমরা মোটর ভাড়া ক'রে সহরটা ঘুরে অন্যান্য কলেজ, থিয়েটার, ছাপাখানা, পার্ক, মিউজিয়ম, মানমন্দির প্রভৃতি যতটা সম্ভব বাইরের দেখা দেখে নিয়েছি—নৌকা ভাড়া ক'রে নদীতেও কিছুকাল বেড়িয়ে এসেছি। সমস্ত দেখে শুনে আমরা তৃতীয় দিন সন্ধ্যার ট্রেনে লণ্ডনে ফিরে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

রুম্যান্ সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

রুম্যানিয়া দেশটির সাহিত্য বিকাশলাভ করবার মত প্রেরণা পায়নি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে। অর্দ্ধ চন্দ্রাকারের এই দেশটি হাঙ্গেরী, রাশিয়া, বুল্গেরিয়া ও সার্ভিয়া—এই চারটি রাজ্যের মধ্যে অবস্থিতি করার ফলে ঐসব দেশের রাজন্যবর্গের শক্তি এখানে বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হয়েছে।—প্রথমে তুর্কী, পরে রাশিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করতে এরা বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আঠারো-শো-সাতাত্তর খৃষ্টাব্দের তুর্কী-যুদ্ধে রুম্যানিয়ানরা যেভাবে আত্ম-নিয়োগ করেছিল রাশিয়ার স্বপক্ষে,—সেই শৌর্য্যবীর্য্য আর আত্মত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ রাশিয়া এঁকে স্বাধীনতা দান করে আঠারো-শো-একাশী খৃষ্টাব্দে। পর-পদানত এই জাতি এতদিন শুধু পরাধীনতার চাপে পিষ্ট হয়েই আসছিল, সাহিত্যের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি দেবার উৎসাহ তখন তাদের ছিল না। এই সব কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশের সাহিত্য সবল ও স্বাস্থ্যবান হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি।

রুম্যান্ ভাষাটি হ'চ্ছে তুর্কী, হাঙ্গেরীয় ও স্লাভোনিক্ ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট। এই জন্যই এ সাহিত্যের উপর কম-বেশী প্রভাব আছে ঐ তিনটি সাহিত্যেরও—এবং এটা খুবই স্বাভাবিক।

এদেশের সাহিত্যকে চারটি পর্য্যায়ে ভাগ ক'রে দেখা চলে—প্রথম হ'চ্ছে সৃষ্টি-প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় হ'চ্ছে প্রারম্ভ, তৃতীয় সাধারণ ক্রমবিকাশ এবং চতুর্থ আধুনিক।

প্রথম যুগের কথাই প্রথমে আমাদের বল্‌তে হবে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই পর্য্যায়ের মধ্যে ধরা যেতে পারে। প্রথমে সুরু হ'ল বাইবেলের অনুবাদ করা। বাইবেলের স্তোত্রগুলি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনাগুলির অনুবাদ তদানীন্তন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তারই ফলে অনুবাদকেরা নিত্যনূতন ধর্ম্মতত্ত্বগুলির অনুবাদ করতেন নবীন উৎসাহে। এই সময়ে **মিরন কোষ্টিন্** নামে এক জন লেখক সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করেন ধর্ম্মপুস্তক ছাড়া দেশীয় ইতিহাস চালাবার জন্য। এর পূর্ব্বে স্বরচিত কোন বই চালাবার চেষ্টা আর কেউ করেন নি—ইনিই এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম অগ্রবর্ত্তী হন, তাই এঁর বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। আর একটি কারণও আছে, ইনি জাতীয় ইতিহাসের যে ক'টি অধ্যায় লিখে গেছেন ঐতিহাসিক বিচারে তার একটা বেশ মূল্যও আছে। আর তাঁর লেখাই রুম্যান সাহিত্যের প্রথম জাতীয় রচনা—সেদিক থেকেও মিরণের রচনার মূল্য কম নয়। এঁর ইতিহাসখানি সে যুগে চলেছিল কিনা তা' আমাদের জানা নেই তবে সে যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্যশালী লেখক যে তিনি ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমতানৈক্য নেই। এঁর বই-খানির নাম "দি হিষ্ট্রি অফ মল্দাভিয়া।"

দ্বিতীয় পর্য্যায় হ'চ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে উন বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। এর আগে রুম্যান্ ভাষায় ধর্ম্মযাজকেরা উপাসনা করতে চাইতেন না কিন্তু এই সময়ে জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ সকল আপত্তিকে নিমজ্জিত ক'রে দিয়ে রাজকর্ত্তাদের রুম্যান্ প্রার্থনা করতে প্রেরণা জাগায়। ফলে দেশের ভাষার উপর দেশবাসীর আগের চেয়ে অধিকার জন্মে,—শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পায়। এই জাতির জাগরণের প্রভাবে কয়েকজন কবি এবং প্রবন্ধকারের অভ্যু-দয় ঘটে কিন্তু এগুলি সাধারণতঃ লাটিন এবং গ্রীক কবি-তার অনুবাদ। বাইবেলের অনূদিত স্তোত্রগুলির ধরণেই এই কবিতা ও প্রবন্ধগুলি, সেজন্য এসব অনুবাদকেরা বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হ'তে পারেন নি।

এই গতানুগতিক ধারার বুকে একদিন জাগ্‌লো বিপ্লব।

রুম্যান সাহিত্য এতদিন স্তোত্র, কবিতা, বাইবেল আর ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, হঠাৎ সে সীমারেখা

আরও বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো একখানি উপন্যাসের আবির্ভাবে। এই ঐতিহাসিক "হেলিওদোরাস্"এর "ইথিওপিকা" নামক উপন্যাসের অনুবাদ জনসাধারণের কাছ থেকে এই উপন্যাসখানি পেলো অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি। এই অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হ'য়ে অনুবাদকেরা "এথিসী" আর "ইলিয়াড্"এরও অনুবাদ ক'রে ফেল্‌লেন। এ দুখানি বইও জনসাধারণের কাছ থেকে বড় কম আদর পেলো না। অনুবাদকেরা তখন চেষ্টা করলেন নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করবার। প্রথম প্রথম বৈদেশিক সাহিত্যের খুব বেশী প্রভাব পড়লো তাঁদের রচনার মধ্যে, তথাপি তাঁরা নিরুৎসাহ না হ'য়ে পূর্ণোদ্যমে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে চল্‌লেন একটির পর একটি ক'রে—।

এঁদের এই স্বকীয় সৃষ্টিপ্রচেষ্টার সার্থকতাতেই তৃতীয় পর্যায়ের হোল সুরু। এটিকে কাব্যযুগ বল্‌লেও চলে। এ যুগে রুমান্ কাব্য-সাহিত্য আশাতিরিক্ত বিকাশলাভ করে। সেই সব কবিতার প্রকাশ ও রচনাপদ্ধতি আধুনিক রুমান্ কবিদের মধ্যেও বিশেষভাবেই লক্ষিত হয়। এঁরা অতীতের সেই গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিয়ে চলেছেন যেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগের এই কাব্যসাহিত্যকে আধুনিক রুমান্ কবিরা আজও অতিক্রম ক'রে যেতে পারেননি সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে। এই কাব্যযুগের সর্ব্বাগ্রজ হচ্ছেন বিখ্যাত রুমান্ কবি **এসিনেস্কু**। চল্লিশ বছর আঠারো শে-উনপঞ্চাশ হ'তে উননব্বই পর্য্যন্ত) জীবনের মধ্যে রুমান্ বাগ্‌দেবীর চরণে যে অঞ্জলি দিয়ে গেছেন ইনি তা এঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের কাব্যের সঙ্গে এঁর কাব্যের তুলনা ক'রে না পড়লে বোঝা যায় না। সহজ সরল ভাষায় লীলায়িত ছন্দে কাব্যের ভাবধারাকে কতটা ব্যাপক ভাবে প্রকাশ করা চলে তা' এঁর রচনায় দেখা যায়। এঁর এই রচনাধারার সৃষ্টিবৈচিত্র্য এঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী এবং আধুনিক কবিদের কাব্যের উপরও কম-বেশী পরিমাণে দেখা যায়। "এসিনেস্কু"ই হচ্ছেন রুমান্ সাহিত্যের এক অন্যতম প্রধান কবি

তারপর আধুনিক যুগের কথা—:

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে রুমান্ গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি। ইতিপূর্ব্বে গদ্যসাহিত্য একেবারেই যে ছিল না তা নয় তবে তাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। এই গদ্যসাহিত্যের দুর্ব্বলতা একটি লোককে কুণ্ঠিত ক'রে তুলেছিল,—সে শুধু অপেক্ষা করছিল স্বদেশীয় সাহিত্যের এ-দিকটা সরল ক'রে তোল্‌বার উপযুক্ত অবসরের। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন শক্তিশালী লেখক কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে হন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সমালোচক। এঁর নাম হ'চ্ছে **—মোরোয়েস্কু**। প্রত্যাশিত সুযোগ এল স্বদেশের স্বায়ত্তশাসন লাভ করার পরেই। দেশের গদ্যসাহিত্যকে বিশ্বদরবারে সমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার উচ্চাশা নিয়ে "কন্‌ভর্বিরি লিতারেয়ার" নামক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে একদল তরুণ লেখককে ইনি সাহিত্যজগতে সুপরিচিত করলেন—এ সব শক্তিশালী তরুণেরাই পরে তাঁর স্বপ্নকে সফল ক'রে তোলে। এই তরুণ দলের অন্যতম লেখক ছিলেন **ক্যারাজোল্**—এর রচনার বৈশিষ্ট্য এর সমসাময়িক লেখক দলকে প্রভাবান্বিত ক'রে ফেলেছিল। ইনিই আধুনিক রুমান্ সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক।

"কন্‌ভর্বিরি লিতারেয়ার" পত্রিকার মধ্য দিয়েই ইনি রুমান্ জনসাধারণের কাছে পরিচিত হ'য়ে ওঠেন। এঁকে আবিষ্কার করেন বিখ্যাত সমালোচক "মোরোয়েস্কু" 'লিতারেয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত এঁর কয়েকটি ছোট গল্প পড়েই 'মোরোয়েস্কু' মুগ্ধ হন এঁর রচনার সৌন্দর্য্যে। তিনি বুঝ্‌লেন তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে পার্‌বে—বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে নিজের আসন স্থিরীকৃত ক'রে নিতে পার্‌বে এই লেখক। তাই সমালোচনার সময় তিনি মুক্তকণ্ঠে ক্যারাজোলের প্রশংসাই করলেন। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সমালোচকদের মতামতের উপর সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আংশিক ভাবে। এক্ষেত্রেও তাই হোল, মোরোয়েস্কুর সমালোচনার ফলে সমসাময়িক লেখকেরা ক্যারাজোলের বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ ক'রে সাহিত্যপ্রগতিকে দ্রুত পূর্ণবিকাশের দিকে এগিয়ে দিল। বিশ্বসাহিত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ লেখকের সঙ্গে ক্যারাজোলের সৃষ্টিসৌন্দর্য্যের তুলনা চলে। অধ্যাপক 'মেহেদিনৎসি' তাঁর সমালোচনার একস্থানে বলেছেন—"Caragiale, the most dramatic author of our time, is a man of culture, literary and artistic

in the highest sense of the world. 'The Easter Torch' ranks him high among the great short-story writers." দি ইষ্টার টর্চ এঁর বিশ্ববিখ্যাত একটি গল্পের নাম।

এঁর এই খ্যাতি শুধু গল্পের উপর ভিত্তি ক'রে নয়, অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাটকও ইনি লিখেছেন। রুম্যানিয়ার সাধারণ ও দরিদ্র-শ্রেণীর জীবনযাত্রাকেই ইনি বিশেষভাবে রূপ দিয়েছেন এঁর গল্পে এবং নাটকে। সরল সহজ প্রকাশভঙ্গীতে ইনি ফুটিয়ে তুলেছেন অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ধারাকে, কোথায় তার গতি ব্যাহত হয়নি, বাধা পায়নি কোনখানেই। যা তিনি বলতে চেয়েছেন তা দুর্বোধ্য হ'য়ে ওঠেনি,—চরিত্রসৃষ্টির বাহুল্য ও পাণ্ডিত্যের পাঁইতাড়া দেখাতে ইনি চেষ্টা করেননি কোথাও।—এই জন্যই এঁর রচনা জনগণের কাছে এত প্রিয়, তারা যে নিজ জীবনযাপন-ধারাকে খুঁজে পায় এঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে!

ইনি উনিশ-শো-বারো খৃষ্টাব্দে ষাট বছর বয়সে জগৎ থেকে বিদায় নেন।

এঁর এই সৃষ্টিধারার অনুকরণে আরো কয়েকটি লেখক রুম্যান্ সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন, কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে প্রবেশলাভ করবার মত যোগ্যতা তাঁরা এখনও অর্জন করেননি। এঁদের মধ্যে চার জনই সমধিক প্রতিভাপন্ন, তাঁরা হচ্ছেন :—"পোপোভিসি ব্যানাট্‌সিন্থ," "প্রেভিসি," "শাদোভিন্থ" ও "বেৎসা"।

পর পর দুটি বৈদেশিক লেখিকা রুম্যেনিয়ার সাহিত্যকে গৌরবদান করেছেন, এঁরা দুজনেই হচ্ছেন রাজমহিষী—ভূতপূর্ব রাণী "ক্যারমেন্ সিল্ভ," ও বর্তমান রাণী "কুমেন্ মেরী"।

রাণী সিল্ভার রচনাবৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না, রাণী হিসাবেই তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। সিল্ভা গতানুগতিক ধারাকেই পুষ্ট ক'রে আসছিলেন, কিন্তু কুমেন মেরী তা করেন নি। অবশ্য, এঁর যে সব বৈশিষ্ট্য সেগুলি আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যেরই চর্বিত-চর্বণ,—ইনিও ইংরাজ কন্যা এবং ইংরাজীতেই গল্প লেখেন। তবে গল্পগুলির মধ্যে কথাবস্তু রুম্যান্ জনসাধারণকে নিয়ে গড়ে' উঠেছে বলেই রুম্যানরা এঁর রচনাকে—তা সে বৈদেশিক ভাষায় রচিত হলেও, স্বদেশীয় সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ ব'লে গর্ব করে। পনেরো বছর বয়সে ইনি রাজবধূ হ'য়ে এদেশে আসেন আঠারো-শো-নব্বই খৃষ্টাব্দে,—বর্তমান পর্যন্ত ইনিই রাজ-রাণী। কিন্তু বিয়াল্লিশ বছর এ দেশটির বুকে কাটিয়ে আজও ইনি এদেশের ভাষাকে উপযুক্তভাবে দখলে আনতে পারেননি, তাই তিনি ইংরাজীতে লেখেন। রুম্যানিয়ার নিম্নশ্রেণীর অভাব-অনটন-ক্লিষ্ট জনসাধারণ এঁর রচনা পড়তে বিশেষ ভালবাসে। রাজরাণী হ'য়ে, আজন্ম বিভব-বিপুলতার মধ্যে পালিত হয়েও এই সব দীনদুঃখীদের অন্তরের সত্যরূপের সঙ্গে ইনি যে কেমন ক'রে পরিচিত হ'য়ে উঠলেন, ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। এঁর গল্পে ইনি মধ্যম ও নিম্নশ্রেণীর লোককে নায়ক ক'রে সার্থকতা অর্জন করেছেন, কিন্তু ধনী-নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে ইনি সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে সৃষ্টি করতে পারেননি। দীনদুঃখী জীবনের সঙ্গে ইনি কেমন ক'রে এত পরিচিত হ'য়ে উঠলেন, কে জানে। এঁর রচনার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলবার নেই, কেন না এঁর গল্প সাধারণতঃ ইংরাজী সাহিত্যের আধুনিক গল্পের মতো এবং ইংরাজী সাহিত্যের দিক থেকে কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁর নেই, উপরন্তু কিছু কিছু রুশ প্রভাবও লক্ষিত হয়।

ইনি বর্তমান রাজমহিষী, এঁর বয়স এখন সাতান্ন বছর।

আর কোন বৈদেশিক লেখক-লেখিকা রুম্যান্ সাহিত্যকে রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধশালী করবার তেমন চেষ্টা করেননি। হয়তো অনাগত রাজমহিষীরাও পরে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্ম-নিয়োগ করবেন, কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের গর্ভেই থাক্। যে সব তরুণেরা এখনো উন্মীলমান, তাঁদের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করা এখন অসম্ভব। সেইজন্যই আধুনিক রুম্যান সাহিত্যের আলোচনা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত টেনে এনে আমরা যবনিকা ফেললাম এইখানেই।

ভূত-ভারতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

ছাতে এসে Normaকে প্রথম ভালো করে' লক্ষ্য করে' দেখ্‌লাম। Normaকে ঠিক সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু সব জড়িয়ে তাঁকে দেখ্‌লে চোখদুটোর তৃপ্তি হয়। আধুনিক মাপকাঠিতে সুন্দরী নারীদের যতটা কাঠির মতো লম্বা হওয়া দরকার হয় ঠিক ততটা তিনি নন্। লম্বায় মাঝারি রকম, পুরন্ত গোলগাল চেহারা। আর্য্য এবং নোর্ডিক রক্তের মিশ্রণে সময়-সময় একটি অপরূপ লাবণ্যের উদ্ভব হয়, Norma সেই লাবণ্যে অনেকখানি লাবণ্যবতী ছিলেন। আর্য্যদের কাটা কাটা তীক্ষ্ণতা, ভোঁতা নোর্ডিক মিশ্রণ বেশ জুড়োল করে' আনে; খাঁড়ার মতো নাকে একটু সৌকুমার্য্য এনে দেয়; বড় বড় চোখ কানের দিকে অল্প একটু ঊর্দ্ধবোঁকা হ'লে চোখের দৃষ্টি নরম হয়। গায়ের বর্ণও উৎকট সাদার চাইতে একটু হল্‌দের ছোপদেওয়া সাদা অনেকের কাছেই বেশী প্রীতিকর লাগে।

কিন্তু ছাতে যতক্ষণ আমরা রইলাম, Reggieই তাঁকে সারক্ষণ দখল করে' রইল। Reggie কবি, Normaও নিজে কবিতা লিখে থাকেন; আমি একেবারে prosaic মানুষ, সুতরাং ইচ্ছে থাক্‌লেও তাঁদের সব আলোচনায় যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু Normaকে ভালো করে' দেখে নেবার সুযোগ সেই জন্যেই আমি পেলাম।

একটু পরে নীচের থেকে ডাক এল। এসে দেখি, নিত্যগোপাল টেবিলের উপর মাথা রেখে বেহুঁস হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। Norma হেসে বল্‌লেন, "কি হলো, খবর ভালো ত?" ইঙ্গিতে তাঁকে চুপ করতে বলে' Phyllis বল্‌লেন, "আজকে আমরা যাই। রাতও ত বেশ খানিকটা হয়েছে। কালকে আবার আসা যাবে।"

Norma বল্‌লেন, "কাল তো সোমবার, কাল কি করে' আস্‌বে? Y. W. C. যাবে না?"

Phyllis বল্‌লেন, "Debate শুনতে আমার ভালো লাগে না, তুমি কাল একলাই যেয়ো।"

Reggie তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "না না, debate শুনতে গিয়ে কি করবেন? উনিও আপনার সঙ্গেই আস্‌বেন। উনি যদি চান ত seanceএর পর সে নিয়ে debate করে' আমরাই তাঁকে শুনিয়ে দেব।"

Norma হেসে বল্‌লেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই আস্‌বে। Seanceএ বস্‌তেই আমার বেশী ভালো লাগ্‌বে, কষ্ট করে' তাই নিয়ে আবার debate করে' আমায় আপনার শোনাতে হবে না।"

Phyllis বল্‌লেন, "কবি মানুষ, শুনতে ভালো লাগে এমন কথা উনি এম্‌নিতেই ঢের শোনাতে পার্‌বেন।"

Normaর কানের কাছটা একটু লাল হলো বলে' বোধ হলো।

নিত্যগোপালের হুঁস ফিরে এলে তাকে বসিয়ে জেরার পর জেরা করতে লাগ্‌লাম—শরীর এখন কি রকম লাগ্‌ছে, trance হবার আগেই বা কি রকম লাগ্‌ছিল, tranceএর সময়কার কোনো কথা তার মনে আছে কি না, Phyllis এতক্ষণ ধরে' তাকে নিয়ে একলা বসে' কি করলেন? কিন্তু দেখ্‌লাম, কোনো কথারই সে জবাব দিতে পার্‌লে না। চেয়ার থেকে পড়ে' যাবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার শরীর বেশ ভালোই ছিল, কখন পড়ে' গিয়েছে তাও সে জানে না। তারপর হুঁস ফিরে আস্‌বামাত্রই আগে যেমন সুস্থ বোধ করছিল তেমনি সুস্থ সে বোধ করছে। মাঝে কি ঘটেছে কিছুই সে জানে না। Phyllis তাকে নিয়ে প্রায়

দেড় ঘণ্টা একলা ছিলেন শুনে সে অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করলে। বললে, "তোমরা ঠাট্টা কর্‌ছ।"

সোমবারেও কথাসময়ের একটু আগেই বন্ধুকে নিয়ে Phyllis এসে হাজির হলেন। সেদিন পেন্সিল রেখে নিত্যগোপালকে নিজেই প্রথম থেকে পড়া গেল। কয়েক মিনিট তাকে চুপ করিয়ে রেখে তাকে suggestion দিতে দিতেই সে ঘুমিয়ে গেল। মিনিট দুই রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করবার পর এক ঝট্‌কায় সে উঠে বস্‌ল, চোখ রগ্‌ড়ে বল্‌লে, "Good evening all! Norma ও আজ এসেছে, খুব খুসি হয়েছি; দেখেছিলাম আস্‌তে পারবে না। কিন্তু Reggie সম্বন্ধে সাবধান! ভারী বদ্ ছেলে ও, আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের ওপরেই Phyllis এর সঙ্গে সে প্রেম কর্‌ত।"

Phyllis লজ্জিত হ'য়ে মাথা নত করে' রইলেন। Reggie বল্‌লে, "তুমি কর্‌তে দিলে ত? কিছুই তোমার চোখ এড়াত না। সারারাত আমাদের কথা শোনাতে!"

কোকোজী বল্‌লে, "আমি কথা না শোনালেও কোনো ক্ষতি ছিল না তা ঠিক। দরকার হ'লে Phyllisই তোমায় তা শোনাতে পার্‌তেন।"

Reggie বল্‌লে, "দরকার হয় নি সেটা ভালো ত?"

কোকোজী বল্‌লে, "তা ত মানিই,—তা না হ'লে তোমাকে বন্ধু বলে' স্বীকার করব কেন?"

আমি বল্‌লাম, "আমাদের কাছে ফিরে আস্‌তে পেরে তোমার বেশ ভাল লাগে কোকোজী?"

সে বল্‌লে, "যাকে কথা বল্‌বার স্বভাবটা তোমার আর গেল না। তোমার কি ধারণা যে ভালো না লাগ্‌লেও আমি রোজ আসছি?"

"আস্‌তে কোন কষ্ট হয় না ত?"

"কষ্ট বিশেষ কিছু না, তবে অনেক ভিড় ঠেলে আস্‌তে হয় এই যা। পথে কোথাও ভালুক-নাচ হ'লে এক শ্রেণীর লোকের ভিড় জমে' যায় তা দেখেছ? এও কতকটা তেমনি। তোমরা গোল হ'য়ে বস্‌লেই তোমাদের চারদিকে এক শ্রেণীর প্রেতাত্মারা গোল হ'য়ে ভিড় করে। যারা ওর মধ্যে একটু চড়বড়ে তারা তোমাদের সঙ্গে কথা বলে', আলাপ করে', আসর জমিয়ে অন্যদের একটু তাক্ লাগিয়ে দিতেও চায়!"

Reggie বল্‌লে, আচ্ছা কোকোজী, সেবারে Jubilee Hall এ Health Week Exhibition দেখ্‌তে গিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি আমায় একটা কথা বলেছিলে, সে কথা তুমি বেঁচে থাকতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পারে নি। দেখি তোমার মনে আছে কিনা কথাটা?"

কোকোজী বল্‌লে, "বেশ, আর সবাই সেটা শুনুক, কেমন?"

Reggie বল্‌লে, "বলই না? না হয় কোন্ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বলেছিলে তাই বল?"

কোকোজী বল্‌লে, "ছেলের আমাকে test করবার ইচ্ছে হয়েছে। তোমাদের Walter হ'লে তোমায় বেশ এক তাড়া খেতে হ'ত। আচ্ছা জায়গাটা বল্‌ছি—Baby Clinic."

Reggie হেসে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমরা সকলে কৌতূহলী হ'য়ে তার দিকে চাইতে সে হাস্‌তে হাস্‌তেই বল্‌লে, "ওর ঠিকই মনে আছে!" এর পর কোকোজী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আরও কি সব বল্‌লে, তার পর দুজনেই খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল।

হাসির ঝোঁকটা মিট্‌লে Phyllis এর দিকে চেয়ে কোকোজী বল্‌লে, "তোরা Phyllis আর ভারী neglected feel কর্‌ছে! তোমরা না হয় কেটে-পড় খানিকক্ষণের জন্যে, পরে আবার এসে যোগে। ওকে দুএকটা কথা বল্‌বার আছে, সেগুলো বলে' নিই।"

উপরে এসে Norma কে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার? Phyllis কে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

Norma বল্‌লেন, "করেছিলাম। বেশি কিছু ও বল্‌তে রাজি হলো না। কিন্তু এটা বল্‌লে, যে তার স্বামীরই আত্মা, সে বিষয়ে তার সন্দেহের লেশমাত্র নেই। নানা রকম করে' তাকে সে পরীক্ষা করেছে। এমন সমস্ত কথা, যা তারা দুজন ছাড়া পৃথিবীতে তৃতীয় প্রাণী আর কারও জান্‌বার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাও সে অনায়াসে বল্‌তে পেরেছে। অন্য একজনের মস্তিষ্কের সাহায্য নিয়ে তাকে

ভাবতে চাও, সেটা ভুলে গেলে চলবে না।' সেজন্যে জায়গায় জায়গায় অল্প স্বল্প একটু গোল বাধে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই সব কথাই মোটামুটি একটু অস্পষ্টভাবে তার মনে পড়ে। কিন্তু মনে তার পড়েই, এবং যতটা পড়ে তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট।"

Reggie বললে, "সে পরিচয়ও এইমাত্র নীচে থেকে আমরা পেয়ে এলাম। সেদিনকার Health Exhibitionএর সে কথাটা, আমি কাকেও কখনো বলিনি। আমার নিজেরই মনে ছিল না, আজকে হঠাৎ মনে পড়ল। কিন্তু বলতে সে ত ঠিকই পারল। শুধু জায়গাটার কথা নয়, পরে আমার কানে কানে সবটাই সে বলেছে।"

আমি বললাম, "কথাটা কি?"

Reggie বললে, "সে তোমার শুনে কাজ নেই। আমি বলেছি জানতে পারলে বকে' আমায় ভূতছাড়া করবে। তা ছাড়া বলতে আমি যাবই বা কেন?"

একটু পরেই আমাদের ডাক এল। নীচে গিয়ে দেখলাম, একটি অনুপম প্রীতিপ্রফুল্লতার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে Phyllisএর সুন্দর মুখখানি আরও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ নানা গল্পগুজবে কাটাবার পর Reggie সম্বন্ধে Normaকে আর একবার সতর্ক করে' দিয়ে কোকোজী বিদায় নিয়ে চলে' গেল। ঘুমন্ত নিত্যগোপালকে নিয়ে আমি রইলাম, Reggie অতিথিদের বাড়ী পৌঁছে দিতে চলে' গেল।

পর দিন ভোরে নিত্যগোপালের ঘুম ভাঙলে যে লোকটা বিছানা ছেড়ে উঠল সে নিত্যগোপাল নয়, সে কোকোজী। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "আজ তোমার সঙ্গে বসে' একটু প্রাণ খুলে গল্প করতে ইচ্ছে হলো, তাই ভোর বেলাই এসে পড়েছি। তা আমি বেঁচে থাকতে এমন ধারা কাও তোমরাও কিছু কম করনি, তাই কিছু মনে করবে না আশা করি।"

আমি বললাম, "এসেছ বেশ করেছ, কিন্তু বাড়ী-ভর্তি মানুষ, তুমিও কিছু বাংলা বলতে বা বুঝতে পার না, তাদের ভোলানো যাবে কি করে'? আসল কথাটা জানতে পেলে হয়ত ভয় পেয়ে যাবে।"

সে বললে, "এক কাজ করা যাক্। Royal Lakeএ এ সময়টা বিশেষ কেউ থাকবে না, চল আজকের দিনটা সেইখানে ঘুরে কাটিয়ে দেওয়া যাক্। অনেকদিন Lakeএর ধারে বেড়াই নি।"

তাকে নিয়ে দিনের আলোর পথে বেরিয়ে জনবহুলতার মাঝখানেও আমার কেমন যেন সেদিন ভয় ভয় করছিল, সেটা স্বীকার করব। ভয় বললেও জিনিসটাকে ঠিক বোঝানো হয় না। হঠাৎ কেমন যেন মনে হচ্ছিল যে, আমার চারদিককার পরিচিত পৃথিবী একরাত্রেই কেমন অচেনা অবাস্তব হ'য়ে গিয়েছে। কোনো কিছুরই যে-চেহারাটা চোখে পড়ছে সেটা যেন তার ঠিক চেহারা নয়, আগাগোড়াটাই ছদ্মবেশ। আমার মধ্যেও যে মানুষটাকে 'আমি' বলে' এতদিন জেনেছি, সেটা শুদ্ধ যেন আমি নয়, আর কেউ।

সাম্পানে করে' Lake পার হ'য়ে ওপারের Dalhousie Parkএর তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন নিভৃত একটা কোণে আমরা গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে' বসে' চারদিকটাকে দেখে কোকোজী একটা নিশ্বাস নিয়ে বললে, "এই জায়গাটায় এসে বললেই Suffolkএর Walberswick বলে' একটা জায়গার কথা আমার মনে পড়ে। দূরে জলের ওপরে খানিকটা কুয়াশা কল্পনা করতে পারলেই ছবিটা মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়। কেম্ব্রিজ থেকে খুব দূরে নয় সেই জায়গাটা। কেম্ব্রিজে বেড়াতে গিয়ে Phyllisএর বাবার এক বন্ধুর বাড়ীতে সেখানে আমরা কিছুদিন অতিথি হ'য়ে ছিলাম। তখনো আমাদের বিয়ে হয়নি, আমরা যে বিয়ে করব একথা মনেও করেনি কেউ। Phyllisএর বন্ধু বলেই সর্ব্বত্র আমি সমাদর পেতাম। Phyllis নিজেও আমাকে বন্ধু বলে' জানত। বন্ধুদের কাছ থেকে ছুটি পেলেই সে আমাকে নিয়ে মাঠের মাঝখানে জলের ধারে এসে বসত। বেশ কিছুদিন ধরে' সে আমার কাছে পালিভাষা শেখবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পড়া এবং পড়ানোর চাইতে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের গল্প শোনা এবং করার দিকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল বেশী। সমস্ত প্রাচ্য সভ্যতার প্রতিই তার অত্যন্ত গভীর অনুরাগের পরিচয় তখনই

আমি পেয়েছিলাম। সেই অনুরাগই কোনও বিচিত্র উপায়ে আমারও প্রতি তাঁকে অনুরাগিণী করে' থাকবে।"

আমি বললাম, "তোমার প্রতি তাঁর অনুরাগের সঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি তাঁর অনুরাগের কোনো সম্বন্ধ আছে, এ আমি মনে করিনে। তোমাকে আর সব-কিছুর বাইরে ধরেই তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন এবং প্রথম থেকেই বাসতেন। হয়ত তোমাকে ভালোবাসতেন বলেই প্রাচ্যকেও তিনি ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলেন; এদেশে আসবার পরে প্রাচ্য-সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মোহ অনেকটাই ছুটে গিয়েছিল বলে' আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তোমার প্রতি ভালোবাসা একবিন্দুও কোনোদিন কমে নি।"

সে বললে, "হ্যাঁ, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে আমাকে সমান ভালোবেসেছে, তা আমি জানি, তবু কি জানি কেন সন্দেহ হ'ত। আজ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি; এ জন্যে আরও আমি সুখী। তুমি জানো না Phyllisএর ভালোবাসা নিয়ে কি তীব্র jealousy আমার মনে ছিল। আমার ব্যবহারে কখনো সেটা আমি প্রকাশ হ'তে দিইনি, কিন্তু তোমাদের কারও কাছে তাকে একলা রেখে আমার মনে শান্তি থাকত না। সাধারণতঃ মেয়েরা যা চায় অসুস্থ অক্ষম অবস্থায় তার কিছুই তাকে আমি দিতে পারিনি বলে', দারিদ্র্যের দুঃখ, নিষ্ফলতার দুঃখ, নিরাশার দুঃখ দিনের পর দিন তাকে আমার দিতে হ'ত ব'লে তার সম্বন্ধে ভয়ের আর আমার অন্ত ছিল না। সেই সঙ্গে তোমাদের সকলকেই আমি ভয় করতাম।"

একটু একটু করে' তার মনের এতটা গোপন দিক্ বহুক্ষণ ধরে' সে আমার কাছে উদ্ঘাটিত করলে। এ যে থাকতে তার যে সমস্ত ব্যবহারের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত না, আজ নিজে থেকে সে সমস্তই আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে গেল। অত্যন্ত গর্বিত স্বভাবের সঙ্গে তার চেয়েও বহুগুণ বেশী জোরালো ভালোবাসার সংস্পর্শ ঘটলে তার ফলে মানুষের জগতে কি বিষম বিপ্লবের যে সূত্রপাত হয় তা বুঝতে পেরে সেইসঙ্গে এও বুঝলাম, জীবনের শেষ দিন-ক'টা বেচারা কোকোজীকে অসুস্থ দুর্বল দেহ-মন নিয়ে নিজের সঙ্গে কি তুমুল সংগ্রাম করে' কাটাতে হয়েছে। পরাজয়বিমুখ তার মনকে বিরূপ অদৃষ্ট একেবারে দুর্গতির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়ে তারপর মরণের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। পৃথিবীতে একমাত্র যে মানুষটির ওপর কায়মনোবাক্যে সে নির্ভর করতে পারত, তাকে নিয়েও তার এক মুহূর্ত্ত শান্তি ছিল না, অথচ নিজেকে নিয়ে তার দারুণ অভিমান নিঃসংশয় হবার চেষ্টাতেও তাকে প্রবৃত্ত হ'তে দেয়নি।

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, "এখন ত আর তোমার মনে কোনো সংশয় নেই, এখন নিশ্চয়ই মনে শান্তি পেয়েছ, সুখী হয়েছ।"

সে বললে, "সুখী হয়েছি? Phyllisকে ছেড়ে স্বর্গের সিংহাসন নিয়েও আমি সুখী হব না। অসুখ হ'য়ে অবধি তিনটা বৎসর এক দিনের জন্যেও তার সঙ্গে আমি ভালো করে' কথা বলিনি, তাকে কাছে ডেকে আদর করিনি। তার আনন্দের কোনো উপাদান জোগানো আমার সাধ্য ছিল না, কিন্তু যেটুকু আনন্দ আমার মুখের দুটি মিষ্টি কথায়, একটুখানি সদয় ব্যবহারে তাকে আমি দিতে পারতাম, তাও তাকে দিতে আমি কার্পণ্য করেছি। তোমাদের ওপর সন্দেহ করে' কথায় কথায় তাকে আমি খোঁচিয়েছি, অপমান করতেও দ্বিধা করি নি। তুমি কি মনে কর, সেসব কথা মরে' গিয়েই ভোলবার?"

আমি বললাম "ভোলা শক্ত তা জানি। কিন্তু Phyllisকে তুমি সব বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন।"

কোকোজী হেসে উঠল। বললে, "এতদিন ধরে' দেখছ, তবু Phyllisকে তোমরা কত কম জানো? তাকে বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা কি সে করেছে? তের আগেই সে বুঝতে পেরেছে এবং ক্ষমাও করেছে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি ব্রহ্মদেশের মানুষ। ক্ষমা পেয়ে এবং ক্ষমা করে' আমাদের মন খুসী হয় না।"

আমি বললাম, "তার বেশী Phyllis আর কি করতে পারেন?"

সে বললে, "কিছু না, তিনি কি করতে পারেন না-পারেন সে কথাই হচ্ছে না। আমি কেবল আমার দিকটা ভাবছি। আমি আমার ব্যাধিজীর্ণ পার্থিব দেহটার

বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছি বটে, কিন্তু তোমায় বলতে আমার বাধা নেই, যে মনের দিক দিয়ে একটা বন্ধন আমায় কাটেনি। বিশেষতঃ Phyllis; তাকে ছেড়ে, তাকে চোখের আড়াল করে' দুদণ্ড দূরে থাকা আমার পক্ষে নরকবাসের মতো যন্ত্রণাদায়ক।"

আমি বল্লাম, "ইচ্ছে করলে তাঁর কাছে কাছে সারা-ক্ষণই ত তুমি থাকতে পার? ছায়ার মতো তাঁর অনুসরণ করতে পার?"

সে বল্লে, "তা হয় না। মানুষের মধ্যে যে জিনিষটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পার্থিব, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে তাকে দেখা সম্ভব নয়। আর তার মধ্যে যে জিনিষটা ইন্দ্রিয়াতীত, তাকেও দেখতে পাওয়া অসাধ্য এই জন্যে যে জড়দেহের আবরণে সেটা একেবারেই সমাচ্ছন্ন।"

আমি বল্লাম, "আমার সাধ্যমত তোমাকে আমি সাহায্য করব।—হয়ত নিত্যগোপালের দৃষ্টিকে অবলম্বন করে' প্রতি সন্ধ্যায় তুমি Phyllisকে দেখে' যেতে পারবে।"

সে বল্লে, "আমি জানি, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু মানুষের মনকে ত তুমি জানো? কেবল এটুকু নিয়ে কখনো সে তৃপ্ত থাকতে পারে না। আজ দুদিন তোমার সহায়তায় তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, সে জন্যে তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। কিন্তু এই দেখতে পাবার ফল কি হয়েছে? যে অতৃপ্তি নিয়ে আমি মরেছিলাম তা আজ সংস্রগুণ বেড়ে গিয়েছে। আজ বিশেষ করে' সেই কথা বলব বলেই তোমাকে এখানে আমি নিয়ে এসেছি। তুমি নিত্যগোপালকে ত জানো? যে মন দিয়ে বিধাতা তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাতে পৃথিবীতে কোনোদিন যে সে কারুর কোনো কাজে লাগবে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আমি যতদূর জানি সে কাউকে ভালোও বাসে না। কি হয়—যদি তার সঙ্গে আমি দেহ বদল করি? হাঁচি শোয়েরোর পল্লীপ্রান্তরের মাঝখানে 'সু' নদীর ধারে আমার তৃণাচ্ছাদিত সমাধি প্রকৃত-পক্ষে তারই সমাধি হয়,—আর তার দেহ অবলম্বন করে' আমি পৃথিবীতে বাঁচি?"

তার কথা শেষ না হতেই আমি আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম, বল্লাম, "না, না, এমন ভয়ানক কথা শুনলেও পাপ হয়। আমি জানি এ পাপ চিন্তা আর এক মুহূর্তও তুমি মনে স্থান দেবে না।"

সে বল্লে, "তুমি চমৎকার তা আমি জানতাম। কিন্তু শোনো, ভালো করে' ভেবে দেখো। যদি এমন হ'ত, তোমাকে কোনো কারণে আমাদের দুজনের মধ্যে একজনের জীবনকে বেছে নিতে হ'ত, তুমি কাকে নিতে? বেশ করে' বিচার করে' বোলো। সব দিক্ দিয়ে সাবধানে দুজনকে তোল করে' কি বলবে তা ঠিক কোরো।—বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, চরিত্রে, হৃদয়বৃত্তিতে, সমস্ত দিকের উপযুক্ততায় বেঁচে থাকবার অধিকার কার বেশী, নিত্যগোপালের না আমার? দুজনের ভালোবাসবার ক্ষমতা দিয়ে বিচার কোরো, এই পৃথিবীকে কে বেশী ভালোবেসেছে, নিত্যগোপাল না আমি? Phyllisকে দিয়ে বিচার কোরো, মানুষের ভালোবাসা পাবার এবং মানুষকে ভালোবাসবার জন্যে কার বেঁচে থাকা বেশী প্রয়োজন, নিত্যগোপালের না আমার?"

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে এসে তার একটি হাতকে আমার কাঁধের উপর রেখেছিল, হাতটি-কে নামিয়ে দিয়ে নিজেরই অজ্ঞাতে তার কাছ থেকে আমি একটু দূরে সরে' গেলাম, কাঁপা গলায় বল্লাম, "আমি বিচার করব না, করতে চাই না। এই পৃথিবীর জীবন মৃত্যু, দণ্ড-পুরস্কার সমস্ত ব্যবস্থার পেছনে যে বিচারককে আমি মানি তাঁর বিচারই আমার পক্ষে যথেষ্ট—আমার কাছে এই জানাই যথেষ্ট জানা যে তাঁরই অলঙ্ঘ্য বিধানে তুমি মরেছ, নিত্যগোপাল বেঁচে আছে।"

সে বল্লে, "উত্তেজিত হয়োনা, শান্ত হ'য়ে আমি কি বলতে চাই তা শোনো। বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানের কথা বলছ, কিন্তু তাঁর কোন্ বিধানকে কবে মানুষ মাথা পেতে নিয়েছে? যে হিসাবে আমার মৃত্যুটা তাঁর বিধান, সে হিসাবে আমার দুরারোগ্য ব্যাধিও তাঁরই বিধান অনুসারে হয়েছিল। সে বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তোমাদের অন্যায় মনে হয়নি। প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে এ বিদ্রোহ চলেছে। যদি ভেবে দেখ, দেখতে পাবে এই বিদ্রোহে জয়ী হওয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনমুক্তির প্রেরণা দিয়েই বিধাতা মানুষকে চরিতার্থতার পথে আহ্বান করেছেন। পদে পদে তাঁর দেওয়া বন্ধনকে ছিন্ন করেই

যুগে যুগে সেই চরিতার্থতার পথে মানুষের জয়যাত্রা চলেছে। অকালমৃত্যুও এমনই একটা বন্ধন। আমি যদি মৃত্যুকেও পরাজিত করে' জয়ী হ'তে পারি, তবে সেটাই কি আমার গৌরবের কথা নয়? তার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বই কি জয়যুক্ত হবে না?"

আমি বল্লাম, "কিন্তু তার জন্যে নিত্যগোপালের প্রাণকে তুমি মূল্য স্বরূপ চাচ্ছ?"

সে বল্লে, "চাচ্ছি। যে-কোনো যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে মূল্য দিতে হয়। প্রাণের মূল্যও দিতে হয়। এ মূল্যও তোমাদের আমি দিতে বলছি।"

আমি প্রায় আর্ত্তকণ্ঠে বলে' উঠ্‌লাম, "হত্যা?"

সে বল্লে, "পার্থিব হিসাবে হত্যা এ নয়। পৃথিবী দেহটা নিয়েই বিচার করবে। আর অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে, নিত্যগোপালকে মূল্যস্বরূপ দিয়ে আমাকে কিনে পেলে পৃথিবীর লাভ ছাড়া লোকসান নেই।"

আমি বল্লাম, "কিন্তু নিত্যগোপালের মা বেঁচে আছেন। তিনি বহুসন্তানের জননী ছিলেন, তাঁর ঐ একটি বই এখন আর নেই।"

সে বল্লে, "তাঁর কথাটাই কি একমাত্র ভাব্‌বার? আর তিনিও ত বৃদ্ধা, কতদিনই বা আর বাঁচ্‌বেন? তাঁর ছেলে বেঁচে আছে এইটুকু জান্‌লেই তিনি খুসি হবেন, আর নিত্যগোপালকে দিয়ে সেইটুকু তাঁকে জানাবার মতো অবসর আমি সহজেই করে' নিতে পারব।"

আমি বল্লাম, "আর নিত্যগোপাল, তার কথাটা কি ভাব্‌বার নয়?"

সে বল্লে, "এতক্ষণ ধরে' তোমাকে বল্‌ছি কি আমি তা হ'লে? তার কথাটা তার হ'য়ে তুমি ভেবে আমায় বল্‌তে পার, সে ক্ষমতা তোমার আছে বলেই ত তোমায় এত কথা আমি বল্‌ছি।"

আমি বল্লাম, "শোনো কোকো জী, সে ক্ষমতা যদি সত্যিই আমার থেকে থাকে, তবে তুমি যা চাচ্ছ তা কিছুতেই আমি হ'তে দেব না। কেবল তাই নয়, এই যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় Phyllisকে দেখ্‌তে পাওয়ার সুযোগ তোমার ছিল তাও আমি বন্ধ করব।"

আমার কথা শুনে তার মুখ ভয়ে পাংশু হ'য়ে গেল। মনে হলো সে থর্ থর্ করে' কাঁপ্‌ছে। পরিত্যক্ত আসনটায় বসে' পড়ে' আমার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি তুলে মিনতির সুরে সে বল্‌লে, "না না, এত নিষ্ঠুর আমার প্রতি তুমি হ'তে পার না।"

আমি কঠিন সুরে বল্লাম, "তবে আমি যা আদেশ করব তা কর।"

সে বল্লে, "করব। বলো কি করতে হবে?"

আমি বল্লাম, "এখনই নিত্যগোপালকে ছেড়ে তুমি চলে' যাও।"

"আচ্ছা, যাচ্ছি। তুমি তাকলে আমায় আসব —" বলে' কোকোজী বিদায় হ'য়ে গেল।

নিত্যগোপালের অসাড় দেহটাকে বারকয়েক ঝোরে নাড়া দিতেই সে দুহাতে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে উঠে বস্‌ল। শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে বল্‌লে, "একি ব্যাপার! এখানে কি করে' আমি এলাম?"

আমি বল্লাম, 'বাড়ী ফিরে চলো শৈলগিরি, সেখানে সব কথা বলব।"

বাড়ী এসে Reggieকে ডেকে পাঠালাম। সে এলে তাদের নিয়ে নিভৃতে বসে' রইল, Royal Lakeএ যা যা ঘটেছিল সব তাদের বল্লাম। নিত্যগোপাল দুই করতলে মুখ ঢেকে নীরবে বসে'; Reggieও অনেকক্ষণ চুপ করে' রইল, তারপর বল্‌লে, "এ সব জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করবার বিপদ্ আছেই, সেটা এর থেকে বোঝা গেল। যতটা হয়েছে তাই ঢের, এইখানেই থেমে যাওয়া যাক্।"

আমি বল্লাম, "থেমে যাব তা ত ঠিকই করেছি। কিন্তু Phyllisকে বোঝাবার ভার তোমাকে নিতে হবে Reggie।"

সে বল্‌লে, "নিত্যগোপালের এই বড় বিপদের সম্ভাবনা এ জিনিষটাতে আছে জান্‌লে Phyllis খুব সহজেই আমাদের ক্ষমা করতে পারবেন। আর তাঁর কথাটা এক্ষেত্রে ভাব্‌বারই কোনো দরকার নেই।"

নিত্যগোপাল এই জায়গাটাতে মুখ তুলে বলে' উঠ্‌ল, "না, তাঁর কথাও ভাব্‌বার দরকার আছে। —তাঁকে বিধাতা

একবার এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যা তাঁর পাওনা নয়। হারানো ধন ফিরে পাবার লোভ দেখিয়ে আবার তার চেয়েও বড় শাস্তি তোমরা তাঁকে দিতে চাও? মানুষ হ'য়ে তা তোমরা করবে কি করে'?"

আমরা দুজন প্রায় একসঙ্গে বলে' উঠলাম, "কি তুমি তাহ'লে আমাদের করতে বলছ?"

একটুখানি ভেবে সে বললে, "যেমন চলছিল তাই চলুক না।"

আমি বললাম, "তারপর যদি কিছু বিপদ্ হয় তখন কে সামলাবে?"

"কেন, তুমি?"

"যদি ফের রাখতে না পারি, কোকোজীর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় যেতে চাই?"

সে বলে, "জীবিত মানুষের চেয়ে মৃতের ক্ষমতা যদি বেশীই হয় তাহ'লে seance বন্ধ করেই বা কি লাভ হবে? তোমাদের seanceএ বলার অপেক্ষা সে নাও রাখতে পারে।"

তবে কিছুক্ষণ আমাদের কারও মুখে কথা ফুটল না। অবশেষে Reggie বললে, "শোনো নিত্যগোপাল, সে কি করতে পারে না পারে তা নিয়ে কেবল কথা হচ্ছে না। আমাদের দিক থেকে বাঁচবার চেষ্টা বটুকু আমরা করতে পারি তা আমাদের করতে হবে ত? তা না করে' উল্টে তাকে আমাদের সাহায্য করতে বল?"

নিত্যগোপাল বললে, "সাহায্য করলেই বা ক্ষতি কি? ভেবে দেখতে গেলে কোকোজী যা বলেছে তা ত সত্যি কথাই। আমার এই তুচ্ছ একটা জীবনের বিনিময়ে দুটি মূল্যবান জীবনকে আমি যদি সার্থক করতে পারি তবে তা খুসি হয়েই আমার করা উচিত।"

আমি প্রায় চীৎকার করে' বললাম, "শেষটা তুমি শুদ্ধ তাই বলছ?"

সে বললে, "আমি বেশ করে' ভেবেই বলছি।"

আমি বললাম, "তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, ভাববার যা তা আমরাই ভাবছি। কোকোজীর প্রভাব তোমার মনের ওপর পড়েছে, তোমার মন এখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।"

Reggie বললে, "তুমি যত ভালো করেই ভেবে বল, তুমি কখনো মনে কোরো না যে তুমি আত্মহত্যা করতে চাইলেই আমরা তোমায় বন্ধু তা তোমায় করতে দেব।"

সে বললে, "কিন্তু কোকোজীও তোমাদের—"

Reggie তাকে ধমক্ দিয়ে থামিয়ে দিল। বললে, "চুপ কর তুমি! তোমার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতেও আমরা চাই না।"

বৃহস্পতিবারের আগে Phyllis আর নাও আসতে পারেন মনে করেছিলাম, কিন্তু অন্ধকার হতেই Normaকে নিয়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। Reggie কথা বলার উপলক্ষ করে' আগে আগে Normaকে ছাতের দিকে নিয়ে গেল, আমি নিত্যগোপালকে দেখিয়ে Phyllisকে বললাম, "আজ আমাদের mediumএর শরীরটা তত ভালো নেই, আজ তাকে বিশ্রাম করতে দেওয়াই বোধ হয় উচিত।"

কোতের ছায়া এক পলকের মতো Phyllisএর মুখে দেখা দিয়ে তখনই মিলিয়ে গেল, স্মিতহাস্যে তিনি বললেন, "বোধ হয় কেন বলছেন? নিশ্চয়ই উচিত। Reggie আমার বন্ধুকে মুক্তি দিলেই এবার আমরা চলে' যাব।" তারপর নিত্যগোপালের দিকে এগিয়ে গিয়ে করুণা-মাখানো সুরে বললেন, "কি হয়েছে আপনার, কেমন আছেন এখন?"

তাঁর চোখের দিকে চোখ তুলে চেয়ে কি একটা বলতে গিয়েই সেটা নিত্যগোপালের গলায় আটকে গেল। পাথরের মূর্তির মতো স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে তার সারা দেহ থরথর করে' কাঁপতে লাগল। আমি ছুটে তার কাছে যেতে না যেতেই চেয়ারের এতটা হাতার উপর মাথা রেখে সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল। যখন মূর্চ্ছা ভাঙল, তখন শুনলাম কোকোজী কথা বলছে!

আজ তার গলার সুর বড়ই বিষণ্ণ বড়ই করুণ। সত্য কথাটাই বলুক, তখন তার কাতর মিনতিভরা চোখের দিকে চেয়ে তার জন্যে সত্যিই আমার মনে করুণার উদ্রেক হচ্ছিল। সে সেটা বুঝতে পারল কি না জানি না, মিনতির সুরেই আমাকে বললে, "দুমিনিট্ Phyllisএর সঙ্গে কেবল

তুমি আমার একলা থাকতে যাও, তার বেশী দেরি আর আমি করব না।"

তার বেশী দেরি সেদিন সত্যিই সে করল না। কিন্তু পরের দিনও সে এল, তারও পরের দিন। ক্রমে আমি বুঝতে পারলাম ব্যাপারটাতে আমার আর হাত কিছু মাত্র নেই, তার আসা কিম্বা যাওয়া কোনোটাই আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারা কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রিত নয়। নিত্যগোপালকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ করলাম, নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হলো না। তাকে জোর করে ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে দূরে গিয়ে থাকতেও বললাম, কিন্তু সে রাজি হলো না। বললে, "তোমরা কেন যে এত অস্থির হচ্ছ বুঝি না। আমার কথা যদি জানতে চাও, আমি সব দিক দিয়ে এই ক'দিনে এত সুখী হয়েছি যে জীবনে কখনো তা হই নি। পরকে এতখানি আনন্দ দেবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়?"

প্রতিভা

শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রতিভা পাষাণী নারী,—পূজা তারে দেয় সর্ব্বলোক,
মোদের হৃদয়স্তরে রচি তার বন্দনার শ্লোক—
তবু তার তৃপ্তি নাই, তবু সেই দেবীর হৃদয়
খুঁজিবারে গিয়ে শুধু মানিলাম ব্যর্থ পরাজয়।

প্রতিভা কি শুকতারা?—দেখা দেয় বহুদূর হ'তে,
শুভ্র দীপ্তি ঢালি' দেয় প্রভাতের নির্ম্মল আলোতে
ভাগ্যবান মানবের লাগি'; তার পরে ধীরে ধীরে
সম্বরিয়া জ্যোতিরেখা নেমে যায় অস্তাচলশিরে!

জীবন-মৃত্যুর মাঝে প্রতিভা কি স্বপ্নের মতন?—
সুপ্তি জাগরণ মাঝে এনে দেয় সৌন্দর্য্যের ধন
অকূল ভরিয়া তার?—স্বপ্ন যার নাই এ জীবনে
জন্ম তার ব্যর্থ হ'লো সুষুপ্তির মরণ-শয়নে!

প্রতিভারে ভালবাসি, কিন্তু হায় মিথ্যা ভালবাসা,
আমার জীবনকাব্যে নাই তার প্রণয়ের ভাষা!

রামায়ণের কথা ও অন্যপূর্ব্বা বিবাহ—শ্রী দেবেন্দ্রকৃষ্ণ বেদ। ২৪৯ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট—প্রাপ্তিস্থান। মূল্য—১৲ এক টাকা।

রামায়ণের কথা—ঐতিহাসিক গবেষণা বা তত্ত্বপরীক্ষা-মূলক গ্রন্থ। উদ্দেশ্য—পুরাকালীন স্বদেশীয় সমাজের পরিচয়-অন্বেষণ। অতীত সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা, বর্ত্তমান সমাজের সংস্কারের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ সমাজের নবীন গঠনে সাহায্য করে। 'রামায়ণের কথা' গ্রন্থকারের প্রচুর অধ্যয়ন, পাণ্ডিত্য ও শ্রমের নিদর্শন।

অন্যপূর্ব্বা বিবাহ—'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়' এই দুই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট। 'অন্যপূর্ব্বা' নামকরণে গ্রন্থকার মনুসংহিতার অনুসরণ না করিয়া 'প্রকৃতিবোধ' অভিধানের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় অন্যপূর্ব্বা—বাগদত্তা যদি অপর পাত্রের সহিত পরিণয়প্রয়াসিনী বা পরিণীতা হয়। 'প্রকৃতি-বোধে' অন্যপূর্ব্বা—বিধবা ("যে কন্যার স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ হয়; দ্বিরূঢ়া, পুনর্ভূতা")।

'অন্যপূর্ব্বা-বিবাহে'র দ্বিতীয় খণ্ড পূর্ব্বে (১৯১০ সালে) বিপক্ষ পক্ষীয়দের আপত্তিখণ্ডন-প্রয়াসে একবার "বিধবার বিবাহ উচিত কি না" নামে প্রচারিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ—গ্রন্থকারের মহাপ্রাণতার পরিচায়ক।

জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—শ্রী ভারতচন্দ্র মজুমদার। প্রাপ্তিস্থান—১২০২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—১৲ টাকা।

সাধারণ বিচার বাদ দিলেও বলিতে হয়, একদল লোকের ধারণা যে রবীন্দ্রনাথের মন বিদেশ-বিহারী—স্বদেশের প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান নাই। ইঁহারা ইহাও বলেন যে, যে-মাটির উপর দেশ ও জাতি দাঁড়াইয়া আছে,—রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাহার সহিত কোন সংযোগ নাই; সে সাহিত্য দুষ্প্রাপ্য আর্কিড্ বা পরগাছার মতই সৌখিনতায়-সংলগ্ন। "জাতি-গঠনে রবীন্দ্রনাথ" এই দুই সংশয়ের নিরসন করিবে।

বহু পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রবন্ধ-সাহিত্য হইতে বিচক্ষণতার সহিত এই অংশগুলি সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছে।

জাতি ও দেশাভিমানীগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

—বঃ সঃ

মেঘমল্লার—শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য—দুই টাকা।

বইখানিতে দশটি গল্প আছে। গল্পক'টি নাতিবৃহৎ, কিন্তু তা' বলিয়া সাধ্য কি যে এক নিশ্বাসে এক একটা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াই! "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত" বিভূতি বাবুর সাহিত্যিক জয়স্তম্ভ। কিন্তু এই মেঘমল্লারের কয়েকটি গল্পে বিশেষ করিয়া তিনি যে কলা-নিপুণতা ও রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে

তাহা নিষ্পন্ন হইয়া রহিবে। রবীন্দ্রনাথের পরেও ছোট গল্প যে কি অপরূপ হইতে পারে এই বইখানি পড়িবার আগে তাহার কল্পনা হয় না।

সাবধানী লেখক একটিও অনাবশ্যক ছত্র লেখেন না। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এইরূপ লিপিসংযম একান্ত প্রয়োজনীয়, পটভূমি সঙ্কীর্ণ বলিয়া সেখানে রাগ-রাহুল্যের অবকাশ নাই। ছোট গল্পে চরিত্রের ক্রমবিবর্তনও প্রত্যাশা করা অন্যায়। কল্পিত ছবিখানা যদি তাহার সর্বগত ভাবটুকু লইয়া পাঠকের মনে ফুটিয়া উঠে তবেই লেখকের সাধনা সার্থক। সামান্য দুই চারিটি ছত্রে একখানি সুপরিস্ফুট মনোহর ছবি আঁকাইতে বিভূতি বাবুর জুড়ি দেখি না। 'নাস্তিক' গল্পের শেষাংশে এইরূপ পাশাপাশি তিনটি ছবি ফুটিয়াছে, ইচ্ছা করিলে মূলগল্প হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় এবং তাহাতেও কম উপভোগ্য হয় না।

নাস্তিক গল্পটি এই সংগ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প এবং বাংলা ভাষার অপূর্ব সৃষ্টি বলিয়া মনে করি। এই গল্পে এবং 'মেঘমল্লার' গল্পটিতে লৌহ আবহাওয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও বিদ্যা জাহির করিবার দুশ্চেষ্টা নাই বলিয়া অতি সহজে আমরা গল্পে প্রবেশ করিতে পারি। "পুঁইমাচা"র ক্ষেন্তি তাহার রুক্ষ অগোছালো চুলে ভোজন-প্রিয়তায় মাতায় তাড়নে এমন কি অকালমৃত্যুতেও অত্যন্ত করুণ ভাবে 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা'র কথা মনে করাইয়া দেয়। 'ঠেলাগাড়ী' গল্পটি পড়িয়া শেষ করিলেও শেষ হয় না, মনের মধ্যে বহুক্ষণ অবধি ঘড় ঘড় করিয়া যেন ঠেলাগাড়ী চলিতে থাকে। 'অভিশপ্ত' 'নববৃন্দাবন' এবং 'মেঘমল্লারে' অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে কিন্তু লিখিবার গুণে অবিশ্বাসের বাষ্পটুকুও মনে উঠে না। 'নববৃন্দাবন' গল্পটি একান্ত ভাবপ্রবণ—পাঠককে ভাবপ্রবণ করিয়া তুলে, কিন্তু লেখক আগাগোড়া যদি ভাবের সমতা রাখিয়া যাইতে না পারিতেন সামান্য ত্রুটীতেই সমস্ত গল্প মাটি হইত। এ যেন ঘড়ির উপরে হাঁটিয়া নদী পার হওয়া, একটু এদিক-ওদিক হইলে আর রক্ষা নাই। লেখক এই বিষম পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—কৃত্তিবাস

অনুরাগ—শ্রী কনকলতা ঘোষ। প্রকাশক—নিয়োগী নিকেতন, ১৯১।এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। ভাল কাগজের জ্যাকেটের উপর পরিকল্পনা। পৃঃ ৯৩, দাম আট আনা।

কবিতার বই। ভাষা ভাব ও ছন্দের ভেল্কি দেখাইবার প্রয়াস নাই, সমস্তই অন্তরের দরদ দিয়া লেখা। পড়িতে পড়িতে লেখিকার আবেগ আমাদিগকেও আকুল করিল। স্বামীকে সদ্য হারাইয়া তাঁহার উদ্দেশে পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হইয়াছে। কবিতার মধ্যে লেখিকার অশ্রুবিন্দুগুলি যেন স্পষ্ট ফুটিয়া রহিয়াছে। বইখানি সকলের ভাল লাগিবে বলিয়া মনে করি।

—শ্রী মনোজ বসু

সরল চিকিৎসা বিধান ও গৃহ-চিকিৎসা—শ্রী দেবপ্রসাদ সান্যাল এল্. এম্, এস্, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান— পি, সি, চক্রবর্তী এণ্ড ব্রাদার্স, ৭৩নং বেচু চাটার্জী ষ্ট্রীট, আমাপুকুর, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। বাংলা ভাষায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র যে এত সরল ভাষায় লিখিত হইতে পারে এবং তাহা যে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই বোধগম্য হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না। এলোপ্যাথিক ডাক্তারের টেবিলোপ এবং তাঁহার মুখে বিজাতীয় ভাষায় রোগের নাম বাঙ্গালী পরিবারে ডাক্তার চেয়ে ভীতির সঞ্চারই বেশী করে। আমাদের বিশ্বাস এই বইখানি পড়িলে সে ভয় দূর হইবে। এমন-কি সাধারণ কয়েক শিশি ঔষধের সাহায্যে রোগের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও যে কোনও গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব নয়। এই জন্যই এই বইখানির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। আমাদের মত দরিদ্র দেশে প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবেই রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিবার সুযোগ পায় এবং যখন ডাক্তার আসে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ উপশম দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। গ্রন্থারম্ভে দেহতত্ত্ব অধ্যায়ে মানবদেহের বিভিন্ন অংশ (Anatomy) এবং তাহাদের ক্রিয়া (Physiology) সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। রোগের প্রতিকার, সূচনা, লক্ষণ, সাধারণ

প্রতিকার, শুশ্রূষা, পথ্যাদি, ঔষধ প্রয়োগ, শুরুতর লক্ষণাদি সমস্তই বিশদ ভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় বইখানি বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে এতই প্রয়োজনীয় যে পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লিখিলে ভাল হয়।

গ্রন্থকার পুস্তকখানি বঙ্গজননীগণের করকমলে উৎসর্গ করিয়াছেন: আমাদের বিশ্বাস তাহা খুবই উপযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিবেদন হইতে ২।৩ লাইন উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের আলোচনা শেষ করিতেছি—

"বঙ্গজননীগণ যদি রোগের সাধারণ লক্ষণ, এবং প্রথম অবস্থায় রোগের চিকিৎসা-প্রণালী অবগত থাকেন, তাহা হইলে অনেক সময় অচিকিৎসা এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি হইতে পারে।"

—আর্. বি

সম্পাদিকার জল্পনা

দশের বুকে দেবীর আসন

পাঁচটা কথার মিশালে একদিন এক ভদ্রলোক বল্‌লেন, "সংঘমুখী হিন্দুসমাজকে এক করার জন্য একজন অবতার-বিশেষ মানুষ দরকার। হিন্দুরাজা ত নেই, সমাজের মানুষগুলো যুক্তি বলে' হঠাৎ মান্‌বে কাকে? রাজা থাকলে হয়ত যে অবল বদল দরকার হ'ত—বাল-বিধবার বিয়ে দেওয়া, ছোট জাতকে বড় জাতে উঠিয়ে নেওয়া ইত্যাদি হয়েক রকমের সমাজসংস্কারগুলো সভা ডাকিয়ে চল্ করে' দিতে পার্‌তেন চট করে'; খানি ঠেলে চল্‌তে হ'ত না এত দলের মত নিয়ে।" পাশে বসে' ছিলেন আর এক ভদ্রলোক; তিনি বলে' উঠ্‌লেন—"অবতারের পথ চেয়ে বসে' থাক হাঁ করে'! রাজা খুঁজে মরো মাথা খুঁড়ে'!—কেন? 'দশে মিলে করে কাজ হারে জিতে নাহি লাজ।' দশের বুদ্ধি এক কম্‌লে একটি অবতার খাড়া হ'তে পারে। হলেন হিন্দুরাজা, কিন্তু তিনি যদি পুতুল হ'য়ে সিংহাসনে বসে' থাকেন কিম্বা বাঘ-ভালুক হ'য়ে দশের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েন, তেমন অকালকুষ্মাণ্ড রাজা নিয়ে সুবিধাটা হবে কার?" আগের মানুষটি বল্‌লেন, "কথাটা শুন্‌তে ভালো, কিন্তু শুন্‌ছে কে? দশের বুদ্ধি মেলাবে কি করে'? তুমি যাকে বলো সুবুদ্ধি আমি বলি তাকে কুবুদ্ধি। গোল বেধে গেল ঐখানে।" শেষের মানুষ।—"দশের দিকে চোখ ফেরালে সকল কথাই সোজা হয়। নিজের ইষ্ট ভেবে মর্‌ছি দিনরাত ঘরের কোণে নিজের মনে।

'ছটাক ঠেলে আলোক মেলে।
পথ দেখি ঐ দুচোখ মেলে।
দশের দিকে চোখ ফেরালো।
পড়্‌ল পথে দিনের আলো॥'

জানো না, চণ্ডীতে লেখা আছে, যুদ্ধে দেবতারা হেরে হেরে হয়রান। বুদ্ধি জোগান-দেবে মেল্‌বার। নিজের নিজের সামবুদ্ধি সংগ্রহ করে' তাঁরা মিলিয়ে ফেল্‌লেন যেই এক করে', অমনি হ'ল চণ্ডীর আবির্ভাব।

'দশের বুকে দেবীর আসন।
পর কোথা ভাই,—সবাই আপন।'—"

ঠাকুর-চিত্র-প্রদর্শনী

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুল-চন্দ্র দে'র উদ্যোগে গত ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে আর্ট স্কুলের গৃহে ঠাকুর-চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্র ছাড়া শিল্পী রবীন্দ্রনাথের নূতন নক্সায় চামড়ার কাজ, প্রতিমা দেবীর উদ্ভাবিত নূতন নক্সার গালার কাজ ও রাণী দে'র (Lino-

cut-এর) এ্যালবাম দেখান হয়। জিনিষগুলি সুন্দর ও প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু নূতনত্ব আছে।

•

সফল প্রচেষ্টা

মাত্র বছরখানেক আগে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে গত ২০শে মার্চ্চ ঐ সমিতি থেকে কলিকাতা "ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি"র কলাগৃহে বাঙলার আদিম পটচিত্রের যে প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল, তার সাফল্য দেখে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। কলাবিশারদ অবনীন্দ্রনাথ, মুকুলচন্দ্র প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের মুখরিত প্রশংসা ও দর্শকগণের মুগ্ধ দৃষ্টি সকলের চিত্তাকর্ষণ করেছিল খুব বেশী করে'। বাংলার প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তিগুলি রক্ষিত ও তার দ্বারা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হওয়াটা জাতির পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়।

"সেবিকা-সদন" স্থাপন

কলিকাতা সহরের আধুনিক ধনী-বসত্ অঞ্চলে অর্থাৎ সাহেবী পাড়ার ঝি-চাকরের বেতন খুব বেশী। আট টাকা খাওয়ার বদলে ঝি ও দশ টাকা খাওয়ার বদলে চাকর ওদব অঞ্চলে মেলে না আদৌ। অনেক সময় তার চেয়ে বেশীও দিতে দেখা যায়। কচি শিশুর কাজজানা ভালো-রকম তৈরী আয়ার বেতন অনেক জায়গায় ষোল আঠার থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ পর্য্যন্ত হ'য়ে থাকে। এতটা রোজগার বড় কম কথা নয়। জমিদার বাবুদের সদর সেরেস্তার সরকার মুহুরী ও ছোটখাটো সওদাগরী আফিসের কেরাণীরা এর থেকে ঢের কম বেতন পায়। ঐ সব মোটা মাহিনার আয়াগা প্রায়ই কিন্তু পাহাড়ী, নেপালী, ভুটানী হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টান হওয়ায় মিশনারী মেমদের তালিম পেয়ে অনেকটা কাজের লোক হ'য়ে উঠে। বাঙালী ঝিদের মধ্যেও অনেকেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী; তাদের শিশুপরিচর্য্যা ইত্যাদি শিখিয়ে তৈরী করে' নিতে পারলে ধনী বাঙালী ঘরে উচুদরের ঝিয়ের কাজ চালাতে পারবে তারা খুব ভালো করেই, আমাদের বিশ্বাস। বাঙলার ধনী-গৃহিণীরা উদ্যোগী হ'য়ে এদের শিক্ষার জন্য একটি 'সেবিকা-সদন' স্থাপন করে' যদি দলে দলে শিক্ষিত ঝি তৈরী করে' তুলেন, তবে তাঁদেরও সুবিধা হয়, জাতির দিক থেকেও একটা কল্যাণকর ব্যবস্থা হ'তে পারে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর দুঃস্থাদের জন্য। অনেক ধনী বাড়োয়ারী পরিবারে ইষ্টান আয়া রাখা চলে না; তাঁদের গৃহিণীরাও এ বিষয়ে মনোযোগ দিলে ভালো হয়। তাঁদের অর্থবলও আছে বেশী অনেকের চেয়ে; মনে করলে তাঁরা সহজে দেশের মধ্যে একটা নূতন প্রতিষ্ঠান গড়া করতে পারেন।

গুড়ের আদর

বাংলার নানা স্থানে আজকাল গুড়ের ব্যবহার প্রচলন হয়েছে খুব বেশী। বর্ত্তমান অর্থাভাবের সময় এটি বেশ খাপ খেয়েছে মানুষের মনের সঙ্গে। ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে যদি উৎকৃষ্ট নমুনার গুড় বাজারে আমদানি করতে পারেন যথেষ্ট পরিমাণে, তবে প্রচলনটি স্থায়ী হ'য়ে যেতে পারবে দেশের মধ্যে। পৌষে খেজুর গুড় ও গ্রীষ্মে আখের গুড় পুষ্টিকর ও উপাদেয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দারুণ উত্তাপে পথশ্রান্ত পথিকদের জন্য গুড়জলানো ঘিয়া ছোলা দিয়ে জলপান দানের ব্যবস্থা দেখেছি একটি পরিতৃপ্তিকর সুন্দর প্রাচীন প্রথা।

দৈব সম্পদ

যে দেশের সকলে মানুষ পেটে খাওয়ার সুযোগ পায়—বেকার বসে' থাকে না যে জাতির একটি মানুষ একদিনও, ভগবানের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত সেই দেশ ও জাতি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে একথা নিঃসন্দেহ সত্য। অসংখ্য বেকার-বিড়ম্বিত যে দেশ ও যে জাতির অধিকাংশ মানুষ অনাহারে মৃতপ্রায়—বাঁচবার চেষ্টায় তারা যখন প্রাণ-পণ উদ্যোগ সুরু করে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দুনিয়ার

খোলা রাস্তায়, পায়ে হেঁটে চল্‌তে থাকে পৃথিবীর অনুরান
পথ ধরে', ঐশ্বরিক নিয়মে তারা তখন নূতনতর কাজের
প্রেরণা লাভ করে নিজের মধ্যে—পৃথিবীতে তাদের নূতন
জন্ম হয় দৈবপ্রসাদে।

'হাওয়ার ভরে আস্‌বে নেমে
নূতন কাজের প্রাণ,
জানত আর অক্ষমতার
ঘট্‌বে অবসান।
প্রাণের দায়ে পড়্‌বে যখন
কাজের পরে হাত,
সহজ শ্রমে জাতির জীবন
জাগ্‌বে অচিরাৎ।'

ফিরিওয়ালা

জসীম উদ্দীন এম্‌-এ

ঝাঁকায় ভরিয়া তরমুজ কাটি' ফিরি'য়ালা পথে চলে,
উপরে গগনে খর নিদাঘের বহ্নির শিখা জ্বলে।
ধূলায় জ্বালায় রোদের অনল বাতাস ফিরিছে টানি',—
মহাপিপাসায় শুষ্ক ধরার ফাটিছে বক্ষখানি।

দোকানে দোকানে টিনের চালা যে রোদে হ'য়ে গেছে লাল,
নিদাঘ নিঠুর নীল গগনের পুড়েছে মেঘের পাল।
ফিরি'য়ালা চলে নগরের পথে—মাথায় ঝাঁকার 'পরে
সাজান রয়েছে কালি কালি কাটা তরমুজ থরে থরে

অগ্নিশিখা

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

(৮)

গ্রামখানি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সঙ্গে একটু করে' জমি—নিজের হাতে সব্‌জীর দুচারটা গাছ সকলেই লাগিয়েছে; কারো কারো বাঁশের বেড়ার উপর নূতন কিউের ফুল ফুটে আলো করেছে, কারো বা ঘরের দাওয়ার আশপাশ ঘিরে' দুচারটি দোপাটির সাদা-লাল ফুল ফুটে আছে। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আস্‌ছে—নিস্তব্ধ গ্রাম-খানি পাখীর কাকলিতে মুখরিত

ষ্টেশান থেকে বড় লাল রাস্তাটি বরাবর সহরের বুকের উপর দিয়ে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। সহরের দিকে রাস্তাটি বেশ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত, কিন্তু গ্রামের মধ্যে এসে রাস্তাটি ক্রমে ক্ষীণ হ'তে হ'তে শেষ প্রান্তে তার চিহ্নটি গরু-চলার পথে পরিণত হয়েছে। গ্রাম থেকে দুমাইল দূরে ডাকঘর, বড় রাস্তা ধরে' ডাকঘরের পেয়াদা তার লাল সাইকেল নিয়ে সাঁ সাঁ করে' গ্রামে ঢুকল। অপরিচিত লোক দেখে দুএকটা কুকুর ডেকে উঠ্‌ল। টেলিগ্রামের লোক দেখে কেউ কেউ সচকিত ঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করল, "কার টেলিগ্রাফ রে—?"

পিওন বল্লে, "অরবিন্দ গাঙ্গুলীর।"

"অরবিন্দ গাঙ্গুলীর খোঁজ কে নেয় রে—" বলে' এক বৃদ্ধ দাওয়া থেকে রাস্তায় নেমে এল।

পিওন বল্লে,—"বাবুর বাড়ী কোথায়—?"

বৃদ্ধ লোকটি উত্তর দিক দেখিয়ে বল্লে, "ওই শেতলা-তলায়। যাও,—এই মোড় ফিরলেই মস্ত বাড়ী; কিন্তু সেখানে তো বাবু নেই আজ ছয়মাস হ'ল। বাবু গৃহত্যাগী হ'য়ে গেছেন,···এক দরোয়ান আছে, দেখ যদি কেউ এসে থাকে—"

পিওন আবার সাইকেলে উঠে ঘণ্টা দিল টিং টিং।

প্রকাণ্ড বাড়ী অন্ধকারের বুকের উপর দৈত্যের মত পাহারা দিচ্ছে, তার চারদিকে দেওয়াল-দেওয়া বাগান—আগাছায় ভরা। গেটের কপাট ভাঙা। বারান্দার এক কোণে দরোয়ান কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে বসে' আছে, তারই আত্মীয়-পরিজনে সেখানটা ভরা। বৃদ্ধ দরোয়ান বহুদিনের পুরানো, সে মায়া করে' বাড়ী ছেড়ে যেতে পারেনি। সেই যে অসুখের দিনে তার মনিব স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাড়ীর বা'র হয়েছে সেই থেকে সে বসে' আছে—কেউ ত আর ফিরে এল না!···সাইকেল দেখে জীর্ণ বৃদ্ধ অসম্ভব আশায় হাঁক দিল, "কোন্ হ্যায়—"

পিওন উত্তর দিল, "টেলিগ্রাফ আছে; অরবিন্দ গাঙ্গুলী বাবু বাড়ী আছেন?"

বৃদ্ধের জীর্ণ বক্ষ বিদীর্ণ করে' একটা বড় নিশ্বাস পড়্‌ল, বল্লে,—"না ভাইয়া বাবুত নেই···'তার' দাও—দেখি কে ভেজ্‌ল, পড়িয়ে আনি।"

পাশের বাড়ীতে দরোয়ান টেলি পড়িয়ে নিতে গেল। পরেশ পাশের বাড়ীর যুবক; বেরিয়ে এসে টেলিগ্রাফ পড়ে' প্রত্যুত্তর দেবার ফরমে লিখে দিল, এখানে কেউ নেই, টেলিগ্রাফ রেখে যেওয়া হ'ল।

দরোয়ানের হাতে টেলিগ্রাফ দিয়ে সে বল্লে, "রঘুসিং, বাবু এলে দেখিও; ঘর করে' রেখে দাও—এতে ঠিকানা আছে, ঐ ঠিকানায় বাবুকে যেতে লিখেছে।"

বৃদ্ধের শুষ্ক গাল বেয়ে অশ্রুধারা বইছিল, মুছে বল্লে, "কবে যে তাঁরা আস্‌বেন সে ভগবান জানেন!—"

পরেশ বল্লে, "কি করবে রঘুসিং, অরবিন্দদা না এলে যে কোন খবর পাব তা ত বুঝি না।"

বর্ষা শেষ হ'য়ে গেছে। শরতের মাতামাতি, তবু থেকে থেকে রৌদ্রবৃষ্টির খেলা চল্‌ছে। কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, পরক্ষণেই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অস্তমান সূর্য্য তার বিদায়রশ্মি ছড়িয়ে দিয়ে ধরণীকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে দিলে। পাতায় পাতায় বৃষ্টির বিন্দু তখনও কাঁপ্‌ছে; সন্ধ্যামালতীর আধফোটা পাপ্‌ড়ি থেকে

দিনশেষের সমস্ত খুঁজে ছ-একটা পাখী তখনও লোলুপ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রায় প্রতি গৃহস্থের বেড়ায় বেড়ায় সব্জীর ফুল ফুটেছে। কিংবা ফুলের মৃদু গন্ধে ও ভেজা মাটির গন্ধে আগত সন্ধ্যাকে মোহাবিষ্ট করে' তুলেছে। দূরের পথিক গৃহ কিরছে, গাঁয়ের ব্যাপারী পসরা মাথায় দিনশেষে গাঁয়ের পথে ঘরে চলেছে, সকলেই কর্মক্লান্ত; যে যার কাজ সেরে নিভৃত শান্তিময় কুটীরে ফিরছে; ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠ্‌ছে।

পথে লোকজন ক্রমে কমে' আস্‌ল; ছেলের দল আঁধার হ'য়ে আস্‌ছে বলে' খেলা ফেলে ঘরে ফিরেছে। আকাশে মেঘের ফাঁকে পঞ্চমীর চাঁদ দেখা দিয়েছে, তার ক্ষীণ আলো পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ক্ষীণ আলোয় পথ বেয়ে চলেছে এক দীর্ঘদেহধারী পুরুষ—রুক্ষ একমাথা চুল, মলিন বেশ, দীর্ঘ চেহারা দেখ্‌লে তাকে চেনা দুষ্কর।

পথিক গ্রামের মাথায় এসে একবার ক্লান্ত চোখ তুলে চারদিক চেয়ে দেখ্‌লে। ঐ অদূরে তার বাড়ী—কিন্তু সে বাড়ীতে আর আছে কি? কিছুই না!—সব গেছে! আজ দীর্ঘ ছ' মাস ধরে' অরবিন্দ তার অর্থলালসা সব নিঃশেষ করে' তার চারাধন খুঁজে ফিরেছে, কিন্তু কোথাও সে তাদের চিহ্নটুকুও পায় নি। আজ বিফলমনোরথ হ'য়ে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে নিজের ভিটায় ফিরে আস্‌ছে। ক'দিন থেকে জ্বরে তার শরীর অবশ; দীর্ঘ দেহ তার দেখ্‌লে মনে হয়, সেটুকু সে এই ভিটায় বিসর্জ্জন দিতেই এসেছে।

পথে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, আবার সে ক্লান্ত পদক্ষেপে বিগত জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী ভাবতে ভাবতে সেই গৃহহীন গৃহপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হ'ল। রঘু সিং বল্লে,—"কে তুমি, কি চাও—?"

"রঘু সিং, আমি অরবিন্দ—" বলে' বারান্দার সিঁড়িতে সে বসে' পড়্‌ল।

বৃদ্ধ রঘু সিং যেন নিজের কানকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না। "কে, কে, বাবু" বল্‌তে বল্‌তে বৃদ্ধ আলো নিয়ে ছুটে এসে অরবিন্দকে দেখে "মা গো" বলে' বসে' পড়্‌ল।

বিভীষিকা দেখ্‌লে মানুষ যেমন করে' চম্‌কে উঠে, রঘু সিং অরবিন্দের কঙ্কালসার চেহারা দেখে তেমনি করেই চম্‌কে উঠেছিল। এই সেই অরবিন্দ!—যার যেমনতর অভাব ছিল না, যার স্বাস্থ্যে ও দেহের সৌন্দর্য্যে লোকের মনে বিস্ময় আস্‌ত, এই সেই অরবিন্দ? না-বলে' দিলে তাকে চেনা যায় না···।

বৃদ্ধ হু হু করে' কেঁদে উঠ্‌ল।

অরবিন্দ বল্লে, "রঘুয়া, কাঁদিস্ নে। আর আমি বস্‌তে পার্‌ছি না। তোর বউ-রাঙ্গীমাকে আর আন্‌তে পার্‌লাম না, ···ঘুরে ঘুরে আমার দশা এই হয়েছে! একবার পরেশকে ডাক দে,—বড় জ্বর আস্‌ছে।"

ব্যস্ত হ'য়ে রঘু সিং মলিন চাদরে চোখের জল মুছে বল্লে, "চল হাত মুখটা ধুয়ে নেবে,—আর উপরের ঘর খুলে দিই গে।"

"না রঘু, উপরে আর যাব না, নীচের হলটা খুলে দাও, যে ক'দিন থাকব শুতেই চল্‌বে।"

রঘু উপরের ঘর থেকে বহুদিনের বন্ধ আলমারি খুলে ধোয়া জামা-কাপড় নিয়ে এল। তাড়াতাড়ি দুটো লণ্ঠন জেলে নীচের ঘর খুলে একটা বাতি সেখানে রেখে উপর থেকে কিছু বিছানা এনে বড় তক্তপোষের উপর পেতে বিছানা করে' দিল। অন্য লণ্ঠনটা হাতে করে' রঘু পরেশকে ডেকে আন্‌তে গেল। পরেশ এসে দেখে অরবিন্দ বাইরে রকের উপরই শুয়ে পড়ে' আছে। পরেশ ব্যস্ত স্বরে বল্লে, "অরদা, করেছ কি,—এখানে শুয়েছ! আর এ কি করেছ দেহের!—ওঠ, ভিতরে চল।"

কোনমতে কম্পমান দেহ তুলে অরবিন্দ ভিতরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। গায়ে কম্বলটা টেনে দিয়ে পরেশকে পাশে বস্‌তে ইঙ্গিত কর্‌ল।

পরেশ পাশে বসে' মমতার সঙ্গে তার রুক্ষ চুলগুলির মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইল, কারো কোন কথা বলার নেই—

কিছুক্ষণ পরে অরবিন্দ বল্‌ল—"পরেশ, ভাই, অনেক দিন হ'ল···আর তাদের যে পাব সে আশা রাখি না! কত দেশ যে ঘুরলাম তার ঠিকানা নেই,—শেষ পর্য্যন্ত যত নীচ বস্তিতেও খুঁজ্‌তে বাকী রাখিনি,·· কোথাও তার চিহ্ন পেলাম না। তাই ভাব ছি তারা বেঁচে নেই···আর কি হবে ভাই, এই ঘর বাড়ী বিক্রি করে' যা হবে সব অনাথ-আতুরকে বিলিয়ে দিয়ো। আমার সব গেছে।···স্বাস্থ্য যে ছিল তাও গেছে।—

শেষ দু' মাস ছিলাম দুর্ভিক্ষের মুখে ; বন্যায় যে কত গ্রাম ভেসে গেছে তার ঠিক নেই,—সেই সব ভাঙা ঘরের তলে তলে কত দিন কাটিয়েছি কত অনাথ-আতুরদের নিয়ে। কতবার মনে হয়েছে যদি কারুর বন্ধ-ঘরের আগল এই ঝড়ায় ভেঙে গিয়ে আমার হারানো মাণিক বেরিয়ে আসে···কিন্তু না তা ত পেলাম না!—এই বর্ষার জলে ভিজে না খেয়ে না ঘুমিয়ে কত রাত-দিন কাটিয়েছি,—তারই এই প্রায়শ্চিত্ত। আর, মনেও কোন শক্তি নেই, দেহও অচল হয়েছে, দেশের কাজ করতেও আর বুকে জোর পাব না। যে দেশের পিশাচগুলো এমন করে' আমার বুকে শেল হানল তাদের সেবা করে' কি হবে? এক একবার মনে হয় প্রতি সুখসুপ্ত ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই,—চমকে তারা উঠুক শুধু আমার অলকা হারায় নি!...যে সব পল্লীতে পল্লীতে ঘুরেছি সে সব কথা বলতে মুখে বেধে যায়। কত গৃহলক্ষ্মী আমারি অলকার মত রেহনীচ থেকে ছিন্ন হ'য়ে ঐ পাঁকের তলায় ডুবে রয়েছে,—উদ্ধারের পথ জানে না, সমাজ তাদের তুলে নেবে না! এমনি করে' তিলে তিলে তাদের মনুষ্যত্বকে মেরেছে যে তারা যে মানুষ এ বোধও তাদের ঘুলিয়ে গেছে। হয় ত অলকাও ঐ রকম—না, না, পরেশ, সে মরে' গেছে—সে জীবন থাকতে কখনো পাপে যাবে না—উঃ কি যন্ত্রণা! আলোটা কমিয়ে দাও তো..."

"অরুণা, তুমি আর কথা বল' না ; রঘু সিং, মা'র কাছ থেকে দুধ নিয়ে এস দীগ্‌গির।"

ঘরে সারা রাত কেটে গেল ; ভোরের দিকে অরুণা ঘুমিয়েছে। পরেশ রাত্রে এখানেই ছিল, সকাল বেলায় অরবিন্দকে অনেকটা সুস্থ দেখে বলে, "অরুণা, তুমি যখন এখানে ছিলে না একদিন একটা টেলিগ্রাম এসেছিল তাতে কে এক ভদ্রলোক তোমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিলেন। তুমি তখন কোথায় জানিনে তাই লিখলাম কেউ নেই। টেলিগ্রামখানা রেখে দিয়েছিলাম অবশ্য। এখন একটা উত্তর দিলে হয় যে—তুমি এসেছ?"

"কই দেখি, দেখি—" বলে' অরবিন্দ আগ্রহে বিছানায় উঠে বসল।—টেলিগ্রামখানা বার কতক পড়েও বিশেষ কিছু বুঝতে পারল না। বলে, 'আমি তো বিকুদা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে' কাউকে চিনতে পারলাম না ; তবু দাও লিখে যে আমি এখানে এসেছি, যদি কোন দরকার থাকে আসতে, আমি শয্যাশায়ী, যেতে পারব না।"

পরেশ সেই ভাবে লিখে রঘু সিংকে দিয়ে বলে, "রঘু এটা ডাকঘরে দেবে, আর এইটা বড় ডাক্তার বাবুর কাছে দিয়ে আসবে। তোমার ছেলেকেই পাঠাও।"

তাকে দুআনা কাগজ দিয়ে ঘরে ফিরে এসে পরেশ দেখলে, অরবিন্দ দুই হাতে মাথা চেপে ধরে' বসে' আছে—চোখদুটো অসম্ভব লাল। পরেশ বুঝল আবার জ্বর আসছে ; তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় জলপটী দিয়ে সে বাতাস করতে লাগল।

(৯)

মঙ্গলা কাজকর্ম সারা করে' ঘরে এসে দেখে, বিকু আলো নিবিয়ে জানালার উপর মাথা দিয়ে চুপ করে' বসে' আছে। মঙ্গলা বিস্ময়-অভিভূত স্বরে বলে, 'তুমি যে ওখানে?"

আজ এই কয় মাসের মধ্যে সে বিকুকে রাত দাড়ে-দশটা, এগারটার আগে বিছানায় শুতে বা কাজকর্ম বন্ধ করে' বসতে দেখেনি, আজ হঠাৎ এমন অন্ধকারে চুপ করে' বসে' থাকতে দেখে তার মনে কেমন ধাক্কা লাগল : কি এমন চিন্তা করেছে যে তাতে আলোর আড়াল খুঁজে নিতে হয়েছে? কাছে গিয়ে মঙ্গলা তার মাথায় হাত দিয়ে স্নেহ-তরল কণ্ঠে বলে, "অসুখ করেছে কি,—তা শুয়ে পড়লে না কেন?"

বিকু মঙ্গলার হাত ধরে' কাছে বসিয়ে নিয়ে বলে, "না, অসুখ কিছু করে নি তবে কেমন যেন ভাল লাগছে না। তুমি তো আজকাল আর আগের মত আমার কাছে আস না মঙ্গলা!" "সব সময় কি তোমার কাছে আসতে পারি। দিদি একা, তার দুঃখের কথা মনে হ'লে এতখানি আরাম নিতে কেমন যেন লাগে, তাই তারই কাছে বেশী থাকি। তবু সে কতবার বলে আমায় আসতে, কিন্তু একটা কেমন যেন বাধা লাগে।···হ্যাঁ গো টেলিগ্রামের কোন উত্তর এল না?" "এসেছে ; সেখানে কেউ নেই। সেই কথাই বসে' বসে' ভাবছিলাম—এ কোন্ দারিদ্র ভগবান আমার উপর ফেললেন? নিজের বলতে তো সংসারে কেউ কোথাও

নেই, তাই বুঝি এই পথের গণ্ডী বুঝিয়ে দিলেন।" "কি আর কর্‌বে, যখন দৈব এনে দেয় তখন তা মাথা পেতে নিতেই হবে, কেমন্‌বে কি করে'?"

পরস্পরের কথাবার্ত্তায় মনটা কিছু হাল্‌কা হ'য়ে এল। ক্রমে ক্রমে ঘুমের শান্তি এসে তাদের মনের সকল গ্লানি মুছে নিল।

সে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে বিধু অন্য বাড়ীতে এসেছে। অন্য আর, চারটি প্রাণী, সকল দিক দিয়েই তাকে ভাব্‌তে হ'চ্ছে। অলকা শুনেছে তাদের গ্রাম থেকে টেলিগ্রাফ এসেছে সেখানে কেউ নেই; দিনকতক থেকে মনের দুশ্চিন্তায় তার আর যেতে যেন কিছু নেই। কোনমতে সে নিজের কাজ-কর্ম্ম করে' চুপ করে' বসে' থাকে। একটা ম্লান বিষাদের ছায়া যেন আস্তে আস্তে সকলকে ঘিরে ধর্‌ছে, বিধু যেন এর মধ্যে থেকে থেকে হাঁপিয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ ভাব্‌তে তার ভয় হয়। সেই যেদিন প্রথম অলকাকে সে দেখে সেইদিন হঠাৎ তার একটা সুপ্ত চেতনাকে সজাগ করেছিল তার অপরূপ রূপের জ্যোতি। আজও তার শিরায় উপশিরায় তা জেগে আছে। তাই সে অলকাকে এড়িয়ে চলে,—কিন্তু চকিতে তাকে দেখে যে কেন তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য মনটা উৎসুক হয়, নিজের এই ঔৎসুক্যকে সে ভয় করে। যে হরিণী ব্যাধভয়ে ভীত হ'য়ে তার আশ্রয়ে এসে নির্ভয় হয়েছে সেখানে থেকে কি তাকে ভয়গ্রস্ত হ'তে হবে? কিন্তু যদি বেশীদিন একত্রে থাক্‌তে হয় তবে তো একটা সহজ ভাব না এলে থাকা যাবে না। বিধু ঠিক কর্‌ল অলকার সঙ্গে আলাপ করে', এই তৃষ্ণা—এটা তার কাটাতে হবেই। বাড়ীতে থেকে এই ভাবে আড়াল করে' নিয়ত নিজেকে লজ্জিত মনে করে' থাকাটা বিড়ম্বনা,—এ হ'তে পারে না। তার সঙ্গে সহজ বন্ধুতা করে' চল্‌তে হবে—বন্ধুরা হয় ত কিছু ভাব্‌বে, তা ভাবুক, কিন্তু ব্যবহারে যদি কিছু অন্যায় না থাকে তবে তা দুদিনে স'রে যাবে। বিধু নিজের মনের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করে' এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়ে, আলিপ কেরৎ বইএর দোকানে গিয়ে কয়েকখানা ভাল বই কিনে নিয়ে বাড়ী এল। সেদিন সে মঞ্জলাকে পড়তে দিল না, ঘরে ঢুকে দেখে—জানালায় মাথা দিয়ে অলকা আনমনে বসে' আছে, তার হাতে তুলার গাঁজ কিন্তু কাজ সে করে' উঠ্‌তে পার্‌ছে না,—ক্ষীণ আলো তার ক্লান্ত ম্লান মুখে প'ড়ে' তাকে এত করুণ দেখাচ্ছে যে, বিধু ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ কোন কথা বল্‌তে পার্‌ল না। তারপর আস্তে আস্তে ডাক্‌ল,—"দিদি—" চম্‌কে উঠে অলকা নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে মাথার কাপড়টা বেশী করে' টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অলকার সঙ্কোচে বিধুও প্রথমটা সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল কিন্তু জোর করে' নিজের মনকে ঠিক করে' নিয়ে বল্লে,"দিদি, অমন করে' থাক্‌বেন না, ছোট ভাইটির বাড়ীতে যতদিন ভগবান রেখেছেন! ততদিন তাকে সেই অধিকার দিন, নেহাৎ পরের মত এমন করে' রাখ্‌বেন না। দুঃখের তো কোন কিনারা করে' উঠ্‌তে পার্‌ছি না দিদি!—যদি ঘরে এসে দেখি একটু মনের আরামে আছেন তবু ভাল লাগে; না হ'লে ঘরে টিক্‌তে পারা কঠিন, মনে কেবলি হয় যে কিছু করে' উঠ্‌তে পার্‌ছি না।"

অলকা বুঝ্‌ল তার পীড়াগ্রস্ত মন এই দুটি হাস্যমুখর স্বামীস্ত্রীকে কত নীরব করে' দিয়েছে। তার চিন্তাকাতর মন সর্ব্বদা যে ব্যথা ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়, অজ্ঞাতে সেই ব্যথা ওদের বুকেও চেপে বসেছে,···কতকাল এদের কাছে থাক্‌তে হবে,···হয় ত আজীবন··· জোর করে' নিজের সঙ্কোচকে সরিয়ে অলকা বল্লে,—"না, আমি তো পর মনে করি না. সারাদিন কি করে' কাটাব তাই ভেবে পাই না—"

বিধু আগ্রহভরে বল্লে, "দিদি, এই বই ক'খানি এনেছি পড়্‌বেন। আর, আমার কাছে সঙ্কোচ কর্‌বেন না—এই মাত্র আমার অনুরোধ। আমাদের আর কেউ নেই তা শুনেছেন নিশ্চয়; দয়া করে' যখন ভগবান আমাদের কাছে এনেছেন আপনাদের, তখন জান্‌তে হবে আমাদের আপন হ'য়েই বাস কর্‌তে হবে। আপনি সহজ হ'য়ে যদি চলেন দেখ্‌বেন আঘাত হাল্‌কা হ'য়ে যাবে।"

অলকা মৃদু হেসে বল্লে, "আচ্ছা ভাই, তাই হবে। আজ থেকে ছোট ভাই বলেই মনে কর্‌ব। তবু যদি দিদির কোন অসঙ্গত ব্যবহারে দুঃখ দেয়, তখন কিন্তু দাদার মতই বুঝিয়ে দেবেন।"

বিষ্ণু আনন্দে তাড়াতাড়ি অলকার পায়ের গোড়ায় একটা প্রণাম করে' নিয়ে বল্লে, "এই কথাই ঠিক রইল দিদি, আর বদল হয় না যেন, দুদিনেই হোক্ দুদিনেই হোক্ ঠিক তাদের উপযুক্ত হ'য়ে যেন সেবা কর্‌তে পারি এই মাত্র প্রার্থনা।"

"কি কর্‌লেন? সত্যি যে আপনি বয়সে বড় হবেন, বড়র প্রণাম কি নিতে আছে?—"

"না, দিদি চিরদিনই বড়, সেকি ছোট হ'তে পারে?... চলুন দিদি দেখি মঙ্গলা কি কর্‌ছে।"

"হ্যাঁ,তাই চলুন" বলে' দুজনে উপরে গিয়ে দেখে—মঙ্গলা গোপালের সঙ্গে গল্প কর্‌ছে আর খেলা কর্‌ছে। বিষ্ণু আর অলকাকে একত্রে আস্‌তে দেখে সে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে,—"কি দিদি কি হ'ল?"

অলকা হেসে বল্লে, "মঙ্গলি, এবার আর দিদি নই, আমি ননদিনী; ভাইটি তো নাছোড়বান্দা, বড় দিদি না করে' ছাড়্‌লেন না! এবার তোমারই জ্বালা পোহাতে হবে ননদীর..."

অলকাকে আনন্দ করে' কথা বল্‌তে শুনে ও স্বামীকে প্রফুল্লমুখে অলকার সাম্‌নে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে মঙ্গলা প্রথমটা খুবই অবাক হ'য়ে গেল, কিন্তু যে একটা বিষাদের ছায়া তাদের নিত্য আনন্দস্রোতকে একেবারে ঘিরে ধরেছিল, হাসির ও আনন্দের বাতাসে তার মেঘাবরণ স্বচ্ছ হ'য়ে আস্‌তে দেখে সে উৎফুল্ল হ'য়ে অলকাকে জড়িয়ে ধরে' বল্লে, "বাঁচ্‌লাম দিদি! তুমি যে এইটুকুও হাস্‌তে জান তাও বিশ্বাস হয় নি। দিদি, তুমি যদি একটু খুসী হ'য়ে আমায় দুষা মারও তাও সইব, কিন্তু তুমি আর মুখ বুজে বসে' থেক না; আমার যেন কেমন ভয় করে।" মঙ্গলার মাথাটা বুকের উপর চেপে নিয়ে অলকা বল্লে "না বোন্ আর আমি মুখ বুজে এমন করে' থাক্‌ব না, আমার আঁধার তোমাদের হাসি দিয়ে ঘুচে-মুছে ফেলে আমায় মানুষ করে' নাও—"

বিষাদের গাঢ় অন্ধকারকে একটু হাল্কা করে' দিতে পেরে বিষ্ণুর সদাপ্রফুল্ল মন খুসী হ'য়ে উঠ্‌ল—বল্লে, "বেশ দিদি! খেতে দেবে না বুঝি তোমরা? মঙ্গলা তো তার গোপালকে নিয়েই আছে, ভুলেই গেছে আমাদের খিদে পায়...হ্যাঁরে গোপাল, তোর মাসীমা তোকে কি বল্‌ছিল রে?"

অলকা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, "আমি যাই খাবার আনি, হাত-মুখ ধুয়ে নিন।"

গোপাল ছেলে বিষ্ণুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' বল্লে, "তুমি বুঝি জান না মাসীমা কি বলেছে?"

মঙ্গলা গোপালের গালদুটি টিপে দিয়ে হেসে বল্লে, "না, আজ থেকে আমি মাসীমা, আর এঁকে মামাবাবু বল্‌বি, কেমন মনে থাক্‌বে তো?"

বিষ্ণুর কোল থেকে গোপাল লাফিয়ে নেমে বল্লে, "তাই নাকি মাসীমা, তুমি মামীমা হ'য়ে গেলে?—যাই মাকে বলে' আসি!"

স্বামী স্ত্রী পরস্পর মুখ চেয়ে মৃদু হাস্‌ল।

তার পর মঙ্গলা ঘরে এসে দেখে—আলো জেলে বিষ্ণু কাজ কর্‌ছে। অনেক দিন পরে আজ স্বামীর মুখের আনন্দটুকু মঙ্গলাকে যে মহাধন দান করেছে! কাছে এসে আলোটা হঠাৎ কমিয়ে দিয়ে চেয়ারের হাতার উপর ভর দিয়ে বল্লে, "কি কর্‌ছ, চল না একটু পড়বে কি গল্প কর্‌বে—"দুহাতে মঙ্গলার হাতদুটি ধরে' বিষ্ণু বল্লে, "চল, দিদি কোথায় তাঁকেও ডাক, আজ যেন কতদিনের একটা পাপর নেমে গেছে; দিদিকে এমন পরের মত করে' রেখে যেন কেমন নিজের ঘরও পর হ'য়ে গিয়েছিল।"

মঙ্গলা বিষ্ণুর মুখের উপর মাথা ঝুইয়ে বল্লে, "আমি তো পর হয়েইছি—নয়?"

মঙ্গলাকে মৃদুভাবে একটা টোকা দিয়ে বিষ্ণু বল্লে, "তুমি বড় দুষ্টু হ'চ্ছ! বল, কি পড়বে? ঐ দেখ মেঘ করেছে—চল, বর্ষার কবিতা পড়ি গিয়ে।"

অলকা নিজের মনের বিষাদকালিমাকে আর ছড়াতে দেয় না, হাসি-গল্পে নিজের দুঃখকে সকলের চোখের আড়াল করে' রেখেছে কিন্তু একা যখন থাকে তখন নিজের অপহৃত সুখ-সৌভাগ্যের জন্য চোখের জল না ফেলে পারে না। কি কর্‌বে সে এমন ভারগ্রস্ত জীবন নিয়ে অন্যকে ভারগ্রস্ত করে'!... আজকাল সে পড়াশুনা, সেলাই করে; কত সূচের সূক্ষ্ম কাজ সে মঙ্গলাকে শিখিয়েছে। কাজের তরাটে কোনমতে দিনের বেলা সে

কাটায়, কিন্তু রাতের অন্ধকারে সুপ্ত নিস্তব্ধতায় তার লক্ষ-হারা বাথাভরা প্রাণ তাকে ব্যাকুল করে' তোলে—দুহাতে গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরে' কেঁদে ওঠে,—"ওগো অন্তর্যামী, কি পাপ করেছি যে এমন করে' আমায় মারছ!—"

ব্যথা কেটে গেছে, শরৎ তার প্রসন্নতা নিয়ে দিকে দিকে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দিয়েছে। ছোট-বড় সকল ঘরেই শরতের সঙ্গে সঙ্গে পূজার বাঁশি বেজে উঠছে। উৎসবে আগমনী দীন দুঃখী সকলের প্রাণের বেদন যেন মুছে নিচ্ছে! অলকা আর মঙ্গলা বসে' বসে' নিজেদের নিজেদের দেশের পূজার কথা বলছে। এই কলকাতা সহরে পূজা যেন তেমন ভাবে হয় না,—গ্রামের পূজা যেন সকলের, আর সহরের পূজা যেন যার যার নিজের। অলকা তাদের বাড়ীর পূজার সময় কি রকম আনন্দ-উৎসব হয় সেই সব গল্প করতে করতে বল্লে, "কখনও তাই পূজার সময় বাড়ী ছেড়ে থাকিনি, আমার স্বামীও সেখানে থাকুন পূজার সময় বাড়ী ছেড়ে থাকতেন না। আমাদের বাড়ীর পূজা গ্রামশুদ্ধ—কত গাঁয়ের লোক আসে প্রসাদ নিতে, রাত্রে গান নাচ কত কি যে হয় তার ঠিক নেই। আর কি সে-চিটায় কেউ প্রদীপ দিতে যায়?— হায় ভগবান!"

বহুদিন পরে মঙ্গলার সামনে অলকার চোখের জল ঝরে'পড়ল। মঙ্গলা নিখাদ ছেলে বল্লে,"দেখ' দিদি,—মা দুর্গা কি করেন; এখনো তো পূজার প্রায় মাস দেড়েক বাকী।"

"হাঁ এবার পূজা কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি হবে।"

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল, বিকু ডাকল, "গোপাল—গোপাল—"

গোপাল লাফিয়ে উঠে বল্লে, "মামাবাবু এসেছেন, দোর খুলে দিয়ে এস।"

মঙ্গলা ত্রস্তপদে উঠে বল্লে, "এত সকালে যে আজ! যাই খুলে দিয়ে আসি।"

বিকু নিজের ঘরে ঢুকে ডাক দিল, "দিদি, ও দিদি,শুনে যান তো—"

অলকা ঘরে গিয়ে বল্লে, "কি বলছ ভাই?"

অলকার সজলোজ্জ্বল চোখদুটির দিকে তাকিয়ে বিকু বল্লে, "দিদি, খবর এসেছে অরবিন্দ বাবু দেশে এসেছেন কিন্তু শ্যামাশায়ী, আমায় গিয়ে দেখা করতে। বলুন ত, কি করব?"

কোনমতে এতক্ষণ অলকা দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কথা শেষ হ'তেই বসে' পড়ল। অতি কষ্টে শক্তিসঞ্চয় করে' বল্ল, "তাঁর অসুখ—আমি যাব না?"

বিকুকে নির্ব্বাক করে' দিল অলকার প্রশ্ন। কি বলবে সে— যদি যান না পায়? বিকুর মনের কথা যেন অলকা বুঝতে পারল, বল্ল, "ভাই, তুমি আমায় সেখানে নিয়ে যেতে ইতস্ততঃ করছ, তা করার কথা, কিন্তু এত অপমান সইল আর সেখানে যদি স্থান না পাই সে অপমান কি সইবে না? তবু একবার দেখে আসি চল, না হ'লে কি করে' থাকব বল ত?"

মঙ্গলা সবই শুনছিল, সে বল্লে, "হাঁ দিদি,যাবে বই কি! ঠাকুর জামাই যে রকম মানুষ শুনেছি, তাতে তিনি দিদির কোন অপমান করবেন না। কাল সকালেই চল সবাই যাই। তারপর অসুখ মানুষ, কেমন আছেন কে জানে—"

সকলে মিলে ভেবে চিন্তে ঠিক হ'ল কাল সকালেই যাওয়া যাবে। বিকু চার দিনের ছুটির দরখাস্ত করে'আপিসে পাঠিয়ে দিল।

অলকা বল্লে, "দেখ ভাই, মঙ্গলা কিন্তু কয়দিন থাকবে ওখানেই - ওকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে আসতে পারবে না। তুমি না হয় দিদির জন্য কষ্ট করে' কয়দিন যেয়েই খেয়ো—"

"সে হবে তখন; তোমাদের গোছগাছ করে' নাও।"

অলকার জিনিষ বা কি—যে, গোছাবে। মঙ্গলার সংসারের একটু গোছগাছ করা—দুচারখানা কাপড়, একটা সামান্য পোঁছের বিছানা,এই তো জিনিষ। অলকা মঙ্গলাকে বল্লে, "মঙ্গলি, নিবি কি?—কিছুর কি সেখানে কম আছে? যদি ভগবান মুখ তুলে চান তখন তো তোদেরই ঘরদোর সবই।"

"মনে থাকে যেন দিদি, আমার ঘরদোরে তুমি বেড়াতে যাচ্ছ—"

কাসির যাওয়ার খবরটা পেয়ে অলকার চিন্তাক্লিষ্ট মনটা একটু হাল্কা হয়েছে মঙ্গলা খুঁটিনাটি কথায় তাকে হাসাচ্ছে। তাদের জিনিষপত্র সব গোছ হ'য়ে গেল। ভোরের দিকেই যাত্রা করবে সেই জন্য সবাই প্রস্তুত হ'য়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

চিত্রকলায় বাংলার স্থান

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই সি এস্

বাঙ্গলার পরিকল্পিত নাবটীর বেঙ্গল প্রতিভা-সৌরভে
বাঙ্গালী জাতির স্থান তথাতে অদ্বিতীয়, ইহার উপরি
আধুনিক শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজে বাঙ্গালীর নাই।
তাই যে আজ বিদেশ সভ্যতার আদরে তার কবির আজ
নিষ্ঠুরতা-লজ্জায় অবন
ভারতের সেই মহিমময়
ধন্যধারা আজও ইতিহাসের দুর্ভাগ্যের পরিহাসে
নীরবতায়

অজন্তার গুহা গুহাগাত্রে,—মোগল ও
রাজপুত প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে,—চীন,
জাপান, ইতালি ও ফ্রান্সের বহু-বেদেতের বিলুপ্তির ধ্বংসের,
—চিত্রক।

বাঙ্গালার নিজস্ব
মন্দাকিনী-ধারা হইতে
অবনীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করিয়াছিল, বর্ত্তমান
অবক্ষয়ে দুলাবাদি-স্রোতের
মন্দাকিনী-ধারায় বিচিত্র

আজ পরিচয় করুক; এবং যে গভীর নিষ্যাতন-প্রপীড়িত পল্লীবাসী পটুয়াগণ প্রাচীন বাংলার এই অধিষ্ঠীয় চিত্রকলা-প্রতিভার বাহক, তাহাদিগকে স্নেহালিঙ্গনে তুলিয়া লইয়া শিল্পকের আসনে বরণ করুক;—বাঙ্গালীর আত্ম-নিকৃষ্টতা-বিশ্বাস অরুণালোক সংস্পর্শে কুজ্ঝটিকার ন্যায় অচিরে দূর হইয়া যাইবে; বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস-হীনতা-দুর্ব্বল অবনত মস্তক আবার সমুন্নত হইয়া উঠিবে; বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব প্রাচীন রসকলা-প্রতিভার ঐশ্বর্য্যে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া পৃথিবীর রসকলামন্দিরে পুনরায় শ্রেষ্ঠ পূজারীর আসন গ্রহণ করিবে।

•

পটুয়া

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

খ্যাত এরা পটুয়া নামে
পেশায় চিত্রকর;
জীর্ণ এদের শরীরগুলি,
জীর্ণ এদের ঘর।
গ্রামের সকল দরিদ্রদের
চেয়েও এরা হীন;
এদের পাড়া গ্রামের ভিতর
সব চেয়ে মলিন।
হয় না এদের আহার যোগাড়
ভিক্ষা-বৃত্তি বিনা;
মুসলমান্ ও হিন্দু দুয়েই
এদের করে ঘৃণা।
করে পূজার মূর্ত্তি রচা
চিত্র আঁকার কাজ;
শিল্প শাস্ত্রে সুদক্ষতায়
পণ্ডিতে দেয় লাজ।

এরাই ছিল প্রাচীন যুগে
বিশ্বকর্ম্মার জাত;
রাজার চিত্রশালায় ছিল
এদের শুধু হাত।
নর দানবের পুরীর ছবি
এরাই দিত এঁকে;
অজন্তাতে দেয়াল গুহে
এরাই দিত মেখে'।
জ্ঞানীর গুণীর কীর্ত্তি এঁকে'
রচ্‌ত এরা ছবি;
এরাই ছিল জ্ঞানের গুণের
কীর্ত্তি-গাথার কবি।
তত্ত্বকথা সরল ভাষায়
সহজ সুরে গে'য়ে;
জ্ঞানের আলোর ছটায় এরা
দেশটা দিত ছে'য়ে।

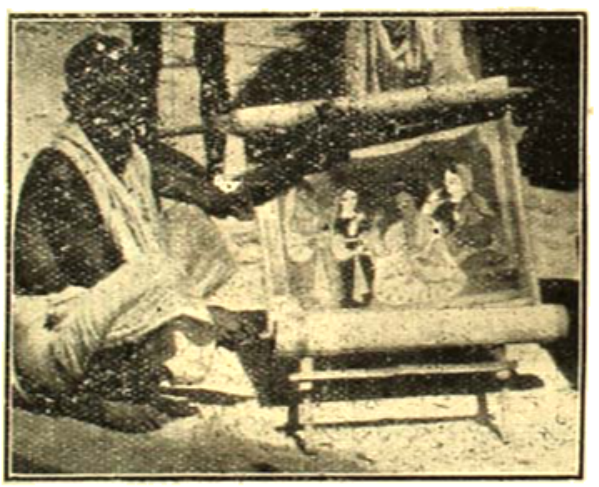

পটুয়া

গানের সুরে পুরাণ শ্রুতি
ইতিহাসের বাণী;
দেশের নরনারীর ঘরে
এরাই দিত আনি'।

এদের রচা দেবদেবীদের
হিন্দু করে পূজা;
তবুও এদের ছোঁয় না তারা—
যায় না সেটি বুঝা।

এদের গাওয়া পুরাণ-গাথায়
পরাণ হিঁদুর কাঁদে,
এদের ছোঁয়া জল খে'তে তার
তবুও জাতে বাধে।
নেয় প্রতিমা এদের গড়া,
দেয় না শুধের দাম;
হায়! ভারতের হিন্দুয়ানীর
এমনি পরিণাম।

অনাদৃত হ'য়ে এরা
আজ এ বাংলা দেশে;
পেটের দায়ে বেড়ায় পথে
জন মজুরের বেশে
হিন্দু এদের ছোঁয় না তবু
এরা যেথায় প্রীতি;
শাস্ত্র বিধান নেমে' পালে
চিত্রকলার নীতি।
হিন্দুর অধিক হিন্দু আত্মা
আজও এদের প্রাণ;
এদের ছুঁতে হিন্দু তবু
করে হেয় জ্ঞান।

আজও এদের তুলির টানে
ইন্দ্র-ধনু লাজে;
অধিতীয় আজও এরা
চিত্রকরের কাজে।
আজব্ তাই এ দৃশ্য—এরা
বাংলা দেশের মাঝে;
অশনে বেড়ায় পথে
অকিঞ্চনের সাজে।
দেশ-বাসীরা বিদেশ-কলার
অনুকরণ-রত;
দেশের যারা কলা-রসিক
ভিক্ষা তাদের ব্রত।

শীর্ণ এদের শরীরগুলি
জীর্ণ এদের ঘর;
মুসলমানে করে ঘৃণা
হিন্দু ভাবে পর।
দিক্ সে দেশের এদের যেথায়
আদর নাহি আজ;
দিক্ সে দেশের এমন গুণীর
নাইরে যেথায় কাজ।

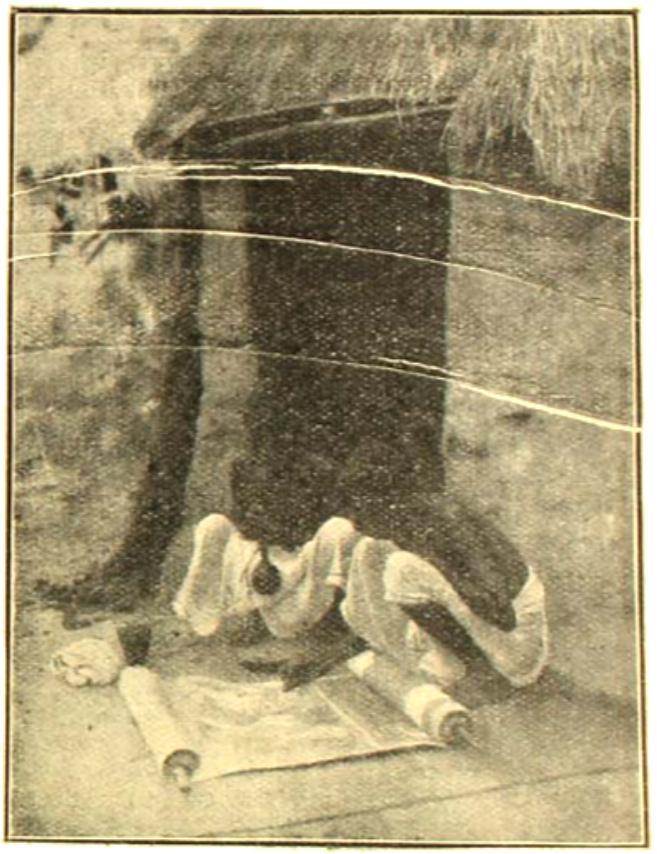

পটুয়া—জীর্ণ পথে

ইচ্ছে করে আমার এদের
কোলে টেনে' নি'
ক্ষমা মাগি আমার মূঢ়
জাতির পক্ষ হ'য়ে।
আস্‌বে কবে সেদিন যবে
পুল্‌বে মোদের চোখ্;—
হে ভগবান্ সেই প্রভাতের
অরুণোদয় হোক্!*

* 'পটুয়া' নামক পুস্তিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

[সংক্ষেপ জীবন-চরিত]

শ্রী কামিনী রায় বি এ

বাঙ্গালা ১২৭৮ সনের ১ই আষাঢ়, ইংরাজী ৮৭১ সনের জুন মাসে বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে ডাক্তার যামিনীর জন্ম হয়। এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে পিতামহের লোকান্তরিত এবং তাঁহারও বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যামিনী পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান, আমি প্রথম। আমি তখন সদ্য বরে চলিয়াছি, তাই তাঁহার জন্মদিনের কথা মনে আছে।

তাঁহার পিতা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছেন, শাস্ত্রমত তিনি ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধ না করাতে তাঁহার জাতও গিয়াছে! অতএব তিনি থাকিয়াও নাই। এইজন্য পিসীমারা, বিশেষ মেজো পিসীমা আশা করিতেছিলেন একটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাদিগে পিতৃকুল রক্ষা পাইবে। তাই তিনি সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া ব্যাকুলভাবে নব শিশুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন দেখিলেন একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তখন, "আমারও নেয়!"—এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অবিলম্বে স্নান করিয়া নিজ ভবনে ফিরিয়া গেলেন। প্রসূতির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিয়াও গেলেন না। এমনি অনাদরে এই কন্যার জীবনের আরম্ভ। ইহাকে জন্ম দিয়া মাতাও অপরাধিনীর মত অনাদৃতা। ভবিষ্যতে এই অনাদৃতা কন্যার দ্বারাই পিতৃকুল পবিত্র এবং জননী কৃতার্থ হইয়াছেন।

সে কালের সূতিকাগৃহ কি রকম ছিল, এখন তাহা অনেকে কল্পনাও করিতে পারেন না। উঠানের মাঝখানে ছোগলা কিম্বা চাঁচ দিয়া ঘেরা ও ছাওয়া একটু স্থান, তাহার মধ্যে সাঁতসেঁতে জমীর উপর একটা ছেঁড়া পাটী কিম্বা অব্যবহার্য্য ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া প্রসূত ও প্রসূতির শয্যা; পাশে একটা অগ্নিকুণ্ড। পাঁচ দিন এইভাবে কাটিবার কথা। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল, উঠান জলে ভরিয়া গেল, শিশু লইয়া প্রসূতি বিপন্ন। রাত্রি প্রভাত হইলে, বাসভবনের কিছু দূরে ও উহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যদিকে একখানি কুটীরে এই অস্পৃশ্যদের জন্য স্থান করিয়া দেওয়া হইল।

একটি মাস শেষ হইবামাত্র মাতাকে পূর্ব্বের ন্যায় গৃহমার্জ্জন ও রন্ধনাদি যাবতীয় কর্ম্মভার স্বহস্তে লইতে হইল। কেবল শিশুকে স্তন্য দিতে যেটুকু সময় লাগে তদ্ব্যতীত দিবাভাগে তাহার পরিচর্য্যার জন্য বড় বেশী অবসর পাইতেন না। আমার উপর পড়িল শিশুকে দেখিবার ও রাখিবার ভার। আমি তাহাকে ভাল ভরিয়া কোলে করিতে পারিতাম না। দুই বাহু দিয়া বুকের উপর চাপিয়া লইয়া বেড়াইতাম। মাঝে মাঝে শিশু যখন কাঁদিয়া উঠিত, থামাইতে না পারিলে সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতাম। কিন্তু বেশী দিন এ ভাবে যায় নাই। শিশুর আড়াই কি তিন মাস বয়সে পিতৃদেব আমাদের বরিশাল লইয়া আসিলেন। এখন হইতে আমাদের কন্যাজীবন নূতন গৌরব লাভ করিল। এই সময়ে পরিচারিকাদি নিযুক্ত হইলেও আমি বোনটির কাছে কাছেই থাকিতাম এবং কিছু ক্ষণের জন্য তাহাকে কোলে পাইলে পরম সুখী হইতাম। অতি শৈশব হইতেই যামিনীর হৃদয়ে মাতার পরেই আমার স্থান হইয়াছিল। অল্পক্ষণ আমাকে না দেখিলে সে কাঁদিয়া অস্থির হইত। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর দুই মাস, তখন আমার তৃতীয়া সহোদরা প্রেমকুসুমের জন্ম হয়, কাজেই মাতার আদর ও পরিচর্য্যা যামিনীর যথেষ্ট লাভ হইত না। হয়তো সেই জন্যই আমার উপর তাহার অনুরাগ এতটা সম্ভব হইয়াছিল। আমার নয় বৎসর বয়সে আমাদের

তিনটিকে লইয়া মাতৃদেবীকে কিছুকাল মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে থাকিতে হয়। সেখানে যখন স্কুলে পড়িতেছি, এক এক দিন দিদির জন্য রোরুদ্যমান শিশুকে শান্ত করিবার জন্য পরিচারিকা তাহাকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া, আমি বড় লজ্জা পাইতাম। সমবয়স্কাদের সঙ্গে খেলা করিতেছি, বোনটি সঙ্গে থাকিতে চাহিত, সঙ্গিনীরা পছন্দ করিত না, বড় বিপদে পড়িতাম; কখনো বা তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতাম। মনে যে একটু বাধা পাইতাম না তাহা নহে, তবে সঙ্গিনী-দের কাছেও তো মান রাখা চাই। ইহার আরও দেড় বৎসর পরে যখন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে ছয় মাস কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলাম, সে যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইল। তাহার সকল ত্রুটি ও অপরাধের শাস্তি ও সংশোধনের উপায় ছিল এই কথাটি বলা—"আমি তোর দিদি হব না।" দিদির প্রতি এই অপূর্ব্ব অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, চিরদিন তাঁহার গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি, আদর ও যত্ন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। অন্য ভাই-বোনের প্রতিও তাঁহার স্নেহের অভাব ছিল না, সকলের জন্য খাটিয়াছেন, আবরণ সকলের জন্য ভাবিয়াছেন। পিতা-মাতার প্রতি ভক্তির সঙ্গে ভাই-বোনের প্রতি মমতা তাঁহার প্রকৃতিগত গুণ ছিল।

এই প্রকৃতিগত গুণ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া পরিবারের গণ্ডী ছাড়াইয়া কত অনাথ আতুরকে আপনার করিয়া লইয়াছে। শৈশব হইতেই এই স্নেহশীলতার সহিত তেজ স্বিতাও যথেষ্ট লক্ষিত হইত। শৈশবে অল্পেই রুষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্বল্পভাষী রোষ নীরব-অভিমানে পরিণত হইয়াছিল। এই অভিমান একটু কম হইলে, তাঁহার স্নেহপিপাসু জীবনে বেদনার পরিমাণও কম হইত। এখন অসময়ে জানিতেছি যে, সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদের অজ্ঞানকৃত ত্রুটিকে স্নেহের অভাব, অবহেলা ও দারুণ উপেক্ষা মনে করিয়া বড়ই ব্যথা পাইয়াছেন; মুখ ফুটিয়া না বলায়, আমরা ইহার প্রতীকার করিতে পারি নাই।

তাঁহার মধ্যে জ্ঞানানুরাগ ও স্মরণশক্তির প্রাখর্য্য অতি অল্প বয়স হইতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার প্রথম জীবনের অধিকাংশই আমার সহিত বেথুন স্কুল ও কলেজে কাটিয়াছে। এইখানে স্বভাবগুণে যামিনী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার বালোর সহপাঠিনীদের মধ্যে হেমলতা দেবী (সরকার), প্রিয়ম্বদা দেবী ও জীবনবালা ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য; স্বর্গীয়া চারুপ্রভা বসু (আর জগদীশচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠা ভগিনী), কুমারী স্বর্ণলতা রুদ্রম্মা (পরে স্বর্ণলতা রাও) এবং কুমারী সরলা রক্ষিত তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। শেষোক্তা যামিনীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া সিমিডি হইতে আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে ছিলেন। ১৮৯০সনে বেথুন কলেজ হইতে এফ্-এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। স্বর্গীয়া কাদম্বিনী গঙ্গুলী প্রভৃতি চারিটি বঙ্গমহিলা কলিকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যয়নে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনী ছিলেন। সে সময়ে এখনকার মত অন্যান্য কলেজে নারী-পুরুষের একত্র অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল না। মেডিকেল কলেজেই এই সহ-শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন। আমাদের দেশের পুরুষদের এ সম্বন্ধে মত ও দৃষ্টি তখন মোটেই উদার ছিল না। ছাত্রেরা ছাত্রীদের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, কি না, সে বিষয়ে অনেকে অনেক আশঙ্কা করিতেন। এই আশঙ্কা হইতেই বোধ হয় আমাদের পিতা মহাশয় ইচ্ছা করেন নাই, যে, তাঁহার কোন কন্যা চিকিৎসা ব্যবসা গ্রহণ করেন। আমি যখন ডাক্তারী শিখিবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আমার কন্যারা স্নেহের চিকিৎসক না হইয়া আত্মার চিকিৎসক হইবে, তাহারা ঘরে বসিয়া সদ্‌গ্রন্থ রচনা করিবে।" আমাকে ডাক্তার হইতে দিতে তাঁহার অমত জানিয়া আমি আর দ্বিরুক্তি করি নাই। এইখানেই আমার ও যামিনীর মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট। আমি জীবনে অনেক বিষয়ে অনেক সংকল্প করিয়াছি কিন্তু পিতা-মাতার সাহ ও সহানুভূতি না পাইলে একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ মনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি। আমার সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল না বলিয়াই এরূপ পারিয়াছি। যামিনীর সে দৃঢ়তা ছিল, তাই বাহিরে নীরব থাকিলেও ভিতরে ভিতরে সংকল্প ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে পিতা মহাশয়কে অনেক বুঝাইয়া যামিনীর ইচ্ছার অনুকূলে তাঁহার মত করাইলাম।

মেডিকেল কলেজে যাঁহারা যামিনীর সহপাঠী ছিলেন তাঁহারা তাঁহার স্বল্পভাষিতা, সর্ব্ব বিষয়ে সংযম ও শুচিতা এবং জ্ঞানার্জ্জনে একনিষ্ঠতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার স্নেহপ্রবিতা এমন ছিল যে, পুরুষ সহপাঠীরা তাঁহার সহিত কোনপ্রকার বাচালতা করা দূরে থাকুক, আবশ্যকীয় কোন বিষয় জানিবার জন্যও তাঁহার সম্মুখে আসিতে ভয় পাইতেন। তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাঁহার নীরব সতেজ ভঙ্গী, তাঁহার স্নিগ্ধ স্মিতি অযথা-কৌতূহলীকে তিরস্কৃত ও স্তম্ভিত করিয়া দিত। এদিকে তাঁহার স্নেহশীলতা মিষ্ট-ভাষিতা ও মিষ্ট ব্যবহারে তিনি ইংরাজ বাঙ্গালী হিন্দু ও খৃষ্টান সহপাঠিনী ও স্বর্ণময়ী হষ্টেলের সহ-বাসিনীদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে, বিশেষতঃ শেষ কয়দিনে, বিশেষ ভাবে পাইয়াছি। একটি হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবা স্বর্ণময়ী হষ্টেলে থাকিয়া যখন ক্যাম্বেল স্কুলে পড়িতেন, তখন যামিনীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। সেখানে গিয়া যামিনী সেখানে তাঁহার জন্য একটি চাকরী জোগাড় করিয়া ডাকিয়া পাঠান। সাংসারিক ঘটনাচক্রে সে সময়ে তিনি যাইতে পারেন নাই, চিঠিরও উত্তর দিতে পারেন নাই। বহু বৎসর কাটিয়া যাইবার পর তাঁহার এক সময়ে মনে হইল যে, পত্রের উত্তর না দিয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন, একবার সাক্ষাৎ করিয়া ইহার কারণ খুলিয়া বলিতে হইবে। অনেক সন্ধানের পর শুনিলেন, যামিনী পুরীতে আছেন। গত পূজার ছুটির পূর্ব্বে পুরী গিয়া ট্রেণ হইতে নামিয়াই ডাক্তার যামিনী সেনের বাড়ীর খোঁজ করিতে লাগিলেন। যামিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিয়াছেন তো?" বৃদ্ধা যামিনীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এই আমার ঠাকুর দর্শন, এই দর্শনের জন্যই এবার আমার পুরী আসা।" ইনি বাড়ী ফিরিবার মাস দুই তিন পর যখন যামিনীর পীড়ার সংবাদ পাইলেন, অমনি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আমাদের ভগিনীর সেবার জন্য লোকের অভাব ছিল না, দুইটি নার্সও নিযুক্ত ছিল। তথাপি আচারপরায়ণা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যা চৌদ্দ পনর দিন অনাহারে ও অল্পাহারে থাকিয়া রোগীর বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কখনও পার্শ্বের ঘরে চুপটি করিয়া বসিয়া করজোড়ে তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিতেন। যখন মৃত্যু আসন্ন দেখিলেন তখন "আমার ভাই! আমার ভাই!" বলিয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্বর্ণময়ী হষ্টেলে থাকিতে যামিনীর সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ একটি ইংরাজ বন্ধুও ব্যাকুল হইয়া বার বার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। যামিনীর অধীনে যাঁহারা হাসপাতালে কাজ করিয়াছেন, যাহাদের তিনি নিজে শিক্ষা দিয়া নিপুণ নার্স করিয়া তুলিয়াছেন, তাহারাও উৎকণ্ঠিত চিত্তে কতবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৭ সনে এল্-এম্-এস্ পরীক্ষা পাশ করিয়া, যামিনী কিছুকাল কলিকাতা আসিয়া স্বাধীন ভাবে ডাক্তারি করিতেছিলেন; কিন্তু দেখিলেন সহজে নারী ডাক্তার লোকে ডাকে না, সেখানে বাড়ীর বাঁধা পুরুষ ডাক্তার নিজে পারিবেন না বলিয়া, নারী ডাক্তারকে দেখাইতে পরামর্শ দেন, সেইখানে সেই পুরুষ ডাক্তারের মনোনীত নারীকে ডাকা হয়; ফী দিবার সময়ও অনেক অবিচার করা হয়। ফী সম্বন্ধীয় ফাঁকি এবং অবিচার একপ্রকার অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইত, কিন্তু যামিনীর পক্ষে 'কেস' পাইবার জন্য পুরুষ ডাক্তারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। তাই অল্পকাল পরেই ১৮৯৮ সনের শেষ ভাগে চাকরী লইয়া সোলাপুর যাত্রা করিলেন। এই কাজ ছাড়িয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের সুপারিশীতে ১৮৯৯ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি নেপাল রাজ্যের নবপ্রতিষ্ঠিত নারী হাসপাতালের ভার লইয়া ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন ও শ্রীযুক্তা কুন্দকুমারী গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধীর-কুমারও সঙ্গে গিয়াছিলেন। যতীন্দ্র সেখানে স্কুলের অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সুধীর ছাত্র রূপে ভর্ত্তি হইয়া সেখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেখানে হাসপাতালের অধ্যক্ষতার সহিত অধিরাজ, মন্ত্রীমহারাজ ও অন্যান্য অমাত্য পরিবারের মহিলাদের চিকিৎসার ভার যামিনীর উপর অর্পিত হয়। তিনি চিকিৎসানৈপুণ্যে কেবল অর্থ ও সুখ্যাতি অর্জ্জন

করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, নিজের চরিত্রগুণে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগও আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। নেপালের অধিরাজের মাতা 'মুন্না-বড়-মহারাণী' বা শ্রীপাচ, অধিরাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী 'জ্যেঠা-বড় মহারাণী' এবং মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্র সামসের জঙ্গ বাহাদুরের পত্নী 'বড় মহারাণা' তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। যামিনী নেপাল ত্যাগ করিতে চাহিলে ইঁহারা অধীর হইয়া উঠিতেন।

দেশীয় রাজাদের রাজ্যে তোষামোদকারীরাই সাধারণতঃ রাজার ও রাজপরিবারের প্রিয় হইয়া থাকে। যাঁহারা সর্ব্বত্র আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া, সত্য ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাহেন, তাঁহাদের যে কেবল অপ্রিয় হইতে হয় তাহা নহে, সময়ে সময়ে বিপন্নও হইতে হয়। কুমারী সেন পিতার উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। তাঁহার তেজস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ছোট-বড় কাহারও কাছে তাঁহাকে নত হইতে দিত না। এই সকল দেখিতে অভ্যস্ত হইলেও মহারাজ চন্দ্র সামসের এই তরুণবয়স্কা বাঙ্গালী মেয়ের এই গুণগুলির সমাদর করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে গিয়া নানা কথা, নানা আলোচনা শুনিয়াও কোন একস্থানের কথা স্থানান্তরে প্রকাশ করেন নাই। এই আশ্চর্য্য বাক্‌সংযম মহারাজকে অতীব প্রীত ও বিস্মিত করিয়াছে। কিন্তু রাণীরা এই বলিয়া অনুযোগ দিতেন যে, ডাক্তারিন মিস সাহেব এত কথা শোনেন হাঁ-কি-না, ভাল-কি-মন্দ কিছুই বলেন না, ইঁহার সহিত গল্প জমে না। তাঁহারা ইঁহাকে আদর-যত্ন ও আতিথ্য দ্বারা আপ্যায়িত করিতে চাহিতেন কিন্তু যামিনী কোথাও জলটুকু পর্য্যন্ত পান করিতেন না। কারণ, জানিতেন ওঁরা ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন।

সকাল ৭টার সময় তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া কাজে বাহির হইতেন, অপরাহ্ণে গৃহে ফিরিতেন। হাসপাতালের কাজ এবং রাজাধিরাজ ও মহারাজ পরিবারের ও অন্যান্য স্থানের রোগী দেখিয়া বিশ্রামের জন্য তাঁহার একটুও অবসর মিলিত না। প্রায় দশ বৎসরের এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তখন সেখানকার চাকরী ছাড়িয়া আসিলেন। মহারাজ তাঁহাকে ছুটী লইয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে স্বাস্থ্যলাভের পর আবার ফিরিয়া আসিতে পারেন; কিন্তু আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে থাকিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। বিশেষ মহারাজ চন্দ্র সামসের জঙ্গের পত্নীর মৃত্যুতে তিনি এত শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন যে আর নেপালে থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিত না। ইতিপূর্ব্বে ১৯০৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নেপালে তাঁহার ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহনের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি কি গভীর স্নেহ ও অসামান্য ধৈর্য্যের সহিত প্রাণপণে ভ্রাতার সেবা ও চিকিৎসা করিয়াছেন তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা এখনও শ্রদ্ধাভরে বর্ণনা করেন।

১৯০৯ সনের মার্চ্চ মাসে তিনি নেপাল ত্যাগ করিলেন। স্বদেশে আসিয়া চিকিৎসিত হইবার কিছুকাল পরে, ইচ্ছা হইল কলিকাতার ডাফরিন হাসপাতালে (Dufferin Hospital) কাজ করেন। ইয়ুরোপীয় উপাধি না থাকিলে তথায় প্রধান ডাক্তারের পদ পাইবার সম্ভাবনা নাই তাহা তাঁহার জানা ছিল। এতদ্ভিন্ন নূতন জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষাও বিশেষ প্রবল হইল। এই সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আজকাল অনেক রমণীই বিলাত যাইতেছেন, আমার কিন্তু বিলাত যাওয়া হইবার ছয়মাস পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কখনও বিলাত যাইবার ইচ্ছা হয় নাই। স্বদেশেই অপরিচিত লোকের সহিত বাক্যালাপ করা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন, বিদেশে বিজাতির মধ্যে একাকী বাস করা আমার পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। পঠদ্দশা সমাপ্তির পর হইতেই আমি কাজে প্রবৃত্ত হই। নিজের কাজ লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, ঐ কাজের ও নিজ পরিবারের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা ভাবিবার আমার অবকাশ ছিল না বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। তিন বৎসর পূর্ব্বে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। রোগের প্রকোপ উপশম হইবার পর অন্যান্য বিষয় চিন্তা করিবার অবসর জুটিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যে, আমি নিতান্ত antiquated (সেকেলে) হইয়া পড়িয়াছি। বিজ্ঞানশাস্ত্র ক্রমশঃ উন্নতিশীল কিন্তু আমি সময়ের সঙ্গে চলিতে পারি নাই, অনেক পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি। এই নষ্ট সময়ের উদ্ধার কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে রমণী চিকিৎসকের অভাব একটা বিশেষ অভাব। স্ত্রীরোগের জন্য ভাল স্ত্রী চিকিৎসকের দরকার। আমার ছাত্রী-জীবনে Operative Surgery and Gynecology-র যেরূপ অবস্থা ছিল, এখন তাহা হইতে এই দুই বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, সুতরাং আমি যদি আমার স্বদেশীয় ভগিনীদের যথার্থ উপকার করিতে চাহি, তাহা হইলে আধুনিক উপায়-সকল আমার জানা দরকার এবং এজন্য যে সকল বিশেষ হাসপাতাল বিলাতে আছে তাহাতে অধ্যয়ন ও তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে ইহার জন্য বিলাত যাইতে আদেশ করিতেছিল কিন্তু আমার নিজের স্বভাব আমাকে এই কার্য্য হইতে বিরত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। আমি ইহাদের বিরোধের মীমাংসার এক উপায় করিলাম। Dufferin fund সংস্রবে ভারতবর্ষীয়দের বিলাত যাইবার জন্য scholarship দেওয়া হয়, ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিরাই অধিকাংশ স্থলে এই scholarshipগুলি পায়। আমি মনে করিলাম যে স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত করা যাউক। আমাকে যদি দেয় তবে আমার পক্ষে বিলাত যাওয়া কর্ত্তব্য ইহাই বুঝিব।

"আমি বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র পাঠাইয়া দিলাম। যথাসময়ে উত্তর পাইলাম যে আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। ১৯১১ সনের ৮ই মার্চ্চ আমি বোম্বাই মেলে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

"জাহাজে ডাক্তার পি, কে, রায় ও পি, কে, সিংহ এই দুই জন আমার পরিচিত সহযাত্রী ছিলেন।"

ডাবলিনের রেঞ্চার্ড হাসপাতালে থাকিয়া কাজ শিখিয়া ও পরীক্ষা দিয়া উপাধি লাভ করিলেন, এম ডিগ্রী লইলেন এবং গ্লাসগো ইউনিভার্সিটীতে পড়িয়া ও Fellowship পরীক্ষা দিয়া Fellow of the Royal Faculty of Surgeons and Physicians উপাধি লাভ করিলেন। কেবল এ দেশের মহিলাদের মধ্যে নহে, সে দেশেও নারীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করিলেন। ইহা তখনকার দিনে বিশেষ গৌরবের কথা। এই উচ্চ উপাধি লাভের পর ১৯১২ সনের জুন মাসে যামিনী আরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিনে গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে লেডী ডাফরিণের সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি অযাচিত ভাবে বার্লিনের Consul ও Ambassador উভয়ের নিকট পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া হাউস হইতেও স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের সুপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন। জার্ম্মান ভাষা একেবারেই জানা নাই, বার্লিনে একটিও পরিচিত মানুষ নাই, তথাপি কেবল জ্ঞানপিপাসা ও স্বদেশের নারীজাতির কল্যাণেচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এবং ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যাত্রা করিলেন। যে মানুষ স্বভাবতঃ লাজুক এবং অনিপুণ, সহজ অর্থে এবং রূপক অর্থেও যাহার ভিড় ঠেলিয়া নিজের জন্য পথ করিবার একান্ত অনভ্যাস, তাঁহার এই সাহসের কথা মনে করিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়। কত কষ্টে সেখানে Professor Bremen ও Dr. Mainzer প্রভৃতির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, তাঁহাদের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারাদি দেখিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহা কয়েকদিনের লিখিত এক জীর্ণ ছিন্ন স্মৃতিলিপিতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে লিখিত কোন স্মৃতি-পুস্তক তাঁহার পাওয়া যায় নাই। বার্লিনে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার কোন ইংরাজ মহিলা বন্ধু তাঁহাকে বলিয়া-ছিলেন, পরীক্ষার জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই, তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধমনোরথ হইবে। কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত হইল দুঃসহ শোকের পরীক্ষা।

নেপালে থাকিতে যামিনী একটি তিন মাসের তুটিয়া কন্যাকে তাহার পিতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া, সন্তানস্নেহে পালন করিতেছিলেন। ইহার প্রতি যামিনীর বাৎসল্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ইহার প্রতি তাঁহার এই আশ্চর্য্য স্নেহের পরিচয় পাইয়া নেপাল হাসপাতালের এক শ্রেণীয়া রোগিণী মৃত্যুকালে নিজের শিশুকন্যাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া যায়। যামিনী সেটিকে কলিকাতা আনিয়া নিজের নিঃসন্তানা ভগিনীকে দিয়াছিলেন। তুটিয়া বালিকাটির সহাস্য প্রফুল্ল মুখ ও সরল ব্যবহার আমাদের সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যামিনী উহার নাম রাখিয়াছিলেন কল্যাণী

উহার ডাকনাম ছিল 'টুটু'। যামিনীর ইয়ুরোপ বাসের সময় সে আমাদের জননীদেবী, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া ও বিশেষ ভাবে মিসেস্ গুপ্তার হেফাজতে ছিল। যামিনী যখন বার্লিনে সেই সময়ে (৬ই জুলাই তারিখে) টাইফয়ড রোগে তাহার মৃত্যু হয়। উহার মৃত্যুতে যামিনী দারুণ ব্যথা পাইবেন জানিয়া আমরা সকলেই শঙ্কিত হইতেছিলাম, এবং তাহার রোগের সময় যাহাতে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার কোনই ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে সাবধান ছিলাম। সে সময়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধীর ইংলণ্ডে ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিবাসের ভিটা

শ্রী অবনীনাথ রায় বি-এ

রূপক নাটকের একটা মস্ত সুবিধা এই যে মানুষ তার উপর ইচ্ছামত interpretation আরোপ করতে পারে। এই হিসাবে রূপক লেখাগুলি অত্যন্ত দ্বিতিস্থাপক। এ-লেখা নিয়ে মানুষের নতুন নতুন মতবাদ সৃষ্টি করার, নতুন আদর্শের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টার যেন আর শেষ নেই। যেমন মেটারলিঙ্কের নাটিকা-লী। তাঁর অপূর্ব রূপক নাট্য L'oiseau-(নীল পাখী)এর সমালোচকরা যে কতরকম interpretation দিলেন তা' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের নাটিকাগুলির সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তাঁর 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'রক্ত-করবী' প্রভৃতি নাটিকার বহু interpretation হয়েছে। আর এই সমস্ত interpretationএর ভিতরকার একটা মজা হ'চ্ছে এই যে একের সঙ্গে অন্যের কোন বিরোধ নেই। তার কারণ রূপক নাট্যের লেখক যে কি মনোভাব নিয়ে, কি আদর্শ প্রচার করতে কৃতসংকল্প হ'য়ে কলম ধরেছেন তা' সঠিক কারুর বলবার উপায় নেই। অতএব এ বিষয়ে সব সমালোচকই অকুতোভয়।

'শ্রীনিবাসের ভিটা' এই রকম একখানি রূপক নাটিকা। পুস্তিকখানির লেখিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী। বাংলা দেশের নারী-প্রগতির যাঁরা কিছুমাত্র খবর রাখেন তাঁরা এঁর নামের সঙ্গে সুপরিচিত। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল-সমিতির সহিত ইনি একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। নারী-শিক্ষার কাজেই ইনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। বইখানির মধ্যে দিয়ে লেখিকা একটি বিশেষ মতবাদ গ'ড়ে তুলতে চেয়েছেন ব'লে মনে হয়। সেটি হ'চ্ছে এই যে আমাদের দেশের পরম এবং চরম আশ্রয় ধর্মবুদ্ধি, সনাতন আদর্শের সন্ধানে আমাদের বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, সে আদর্শ আমাদের দেশেই অক্ষয়ভাবে ধর্মনীতির মধ্যে বেঁচে আছে, সেখান থেকেই তাকে আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।

"আছে আমার ভাঙা ঘরে দেয়াল অতি পুরাতন,
তারি তলায় পোঁতা আছে লক্ষ টাকার ঐকাধন।"

—শ্রীনিবাস এই লক্ষ টাকার ঐকাধনের গৌরবেই গৌরবান্বিত ছিল কিন্তু সে ধনকে যে আবার যুগোপযোগী ক'রে নিতে হয় এ বিষয়ে তার খেয়াল ছিল না। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত পুঁজিও যে ব'সে খেলে ক্ষয় হ'য়ে যায় সে কথা সম্ভবতঃ শ্রীনিবাস ভুলে গিয়েছিল। এ হ'চ্ছে নিজের পুঁজির উপর অতি বিশ্বাসের ফল। তাই যাত্রায় পেয়াদাকে এসে স্মরণ করিয়ে দিতে হ'ল যে খাজনা না দেওয়ার ফলে তার ভিটে বিকিয়ে গেছে। এখন এ ভিটেকে মেরামত করতে হবে, নতুন ক'রে গড়তে হবে। তাই যে সহরের "বাড়ীগুলো ভাঙা, দেয়ালগুলো ফাটলে ভরা, আর চারিদিক জুড়ে ফাটলের মধ্যে বাসা করেছে চাম-চিকে, ছুঁচো, ইঁদুর, আরসোলা ও মাকড়সা", সে সহরের সংস্কার সুরু হ'ল। সংস্কারের পর সেখানে রাজা এলেন।

আমাদের মধ্যে আজ অনেক কিছু জঞ্জাল, অনেক আবর্জনা এসে আশ্রয় করেছে, তার সংস্কার অত্যাবশ্যক কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে তার বনিয়াদ অত্যন্ত পোক্ত। রাজার আবির্ভাবের প্রত্যাশা যদি করতে হয় তবে এই সংস্কৃত বনিয়াদের উপরই করতে হবে, তাকে অস্বীকার ক'রে নয়।

অতএব শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এই রূপক নাটিকা-খানির ভিতর দিয়ে ভারতের সাধনার একটি নিগূঢ় রহস্যের আভাস দিয়েছেন।

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর লেখা সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত কিন্তু এই নাটিকা-খানির উপর আইডিয়ার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নাটক পড়েছেন তাঁরা এই নাটিকাখানির সঙ্গে উক্ত নাটকের কতকটা সাদৃশ্য আছে বলতে পারবেন।

বাংলার নিজস্ব কলা

(কলিকাতায় প্রদর্শনী)

শ্রীঃ সুদর্শন মিত্র এম্-এ

কলিকাতা সহরে পর পর অনেকগুলি কলাপ্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রত্যেকটির নানা বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্প্রতি সহরবাসীর মানসনে বাংলার নিজস্ব কলার যে প্রদর্শনী হইয়া গেল তাহা অভিনবত্বে, বৈশিষ্ট্যে এবং উপযোগিতায় সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই সকল শিল্পকলার নিদর্শন শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ মহাশয় বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে বাংলার পল্লীগ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহা এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাদৃতভাবে পড়িয়া ছিল শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দিয়া তাহাকে বিশ্বজনসম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া দেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। গত ২০ শে মার্চ্চ রবিবার ডাঃ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি. আই, ই, কলিকাতার বহু কলাবিদ্ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির সমক্ষে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। উদ্বোধন-কালীন একটি বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর উপযোগিতা এবং জাতীয় জীবনে ইহার প্রকৃত মূল্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। তিনি আরও বলেন দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত দ্রব্যাদি লইয়া একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। দত্ত মহাশয় ছায়াচিত্রযোগে একটি বক্তৃতা করিয়া এই বিষয়ে সকলের উৎসাহ সঞ্চার করেন। পল্লীগ্রামের পটুয়াগণ কি প্রকার সঙ্গীত ও উপাখ্যান দ্বারা তাহাদের পট সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে তিনি তাহা প্রদর্শন করেন।

দত্ত মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই বাংলার লোকসঙ্গীত ও লোক-নৃত্যের বীরত্বব্যঞ্জক রূপ দেশবাসীকে দেখাইয়াছেন এবং শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহা বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত প্রচার করিতেছেন। বহুযুগের এই লোকসঙ্গীত ও লোক-নৃত্য যাহা এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাতবাস করিতেছিল দত্ত মহাশয় তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যে শিল্পকলার বিলুপ্তপ্রায় ধারা এখনও বর্ত্তমান আছে তাহার কতকগুলি সুন্দর সুন্দর নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া এই প্রদর্শনীতে দেখাইয়াছেন। এই প্রকারের শিল্পকলার অস্তিত্ব এতদিন কলাবিদ্গণের অজ্ঞাত ছিল। যাঁহারা এই প্রদর্শনী দর্শন করিতে আসিয়া-ছিলেন তাঁহারা সকলেই বাংলার নিজস্ব কলার আশ্চর্য্যরূপ পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। দত্ত মহাশয় প্রদর্শনীতে আনীত চিত্রপটগুলির কলানৈপুণ্য, পদ্ধতি এবং উপাখ্যান-

ভাগ সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন এবং শিল্পীগণ কি সুন্দর ভাবে ভারতের বহুপ্রাচীন ভাবধারাকে বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বাংলার প্রকৃত সম্পদকে বুঝিয়া তাহাকে যথাযোগ্য সম্মানের আসন প্রদান করিবার জন্য সকলকে প্রাণস্পর্শী ভাষায় অনুরোধ করেন। উদ্বোধনসভায় পটুয়াগণ উপস্থিত হইয়া কিভাবে গান করিয়া তাহারা দাতাগণের নিকট পট দেখায় তাহা প্রদর্শিত হয়। পল্লীর এই পটুয়ারা এখনও চিত্রকর বলিয়া খ্যাত। কিন্তু এখন আর তাহাদের পূর্ব্বের সমাদর নাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই তাহাদিগকে ঘৃণা করে কিন্তু তথাপি তাহারা বাংলার প্রাচীন সম্পদকে, সভ্যতার একটি ধারাকে বহন করিয়া আনিয়াছে।

এই পটুয়াগণ পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের উপাখ্যান গান করিতে করিতে পট দেখাইত। এই প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবিকার উপায়ও বন্ধ হইয়াছে। পটুয়ারা সরল গ্রামবাসী। তাহাদের পটের যে কোন মূল্য আছে তাহা তাহারা মোটেই বুঝে না। অথচ প্রত্যেক পটের কি সুন্দর বর্ণবৈচিত্র্য, কি সুন্দর অঙ্কনপদ্ধতি এবং তাহা কি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ভাবের দ্যোতক!

দত্ত মহাশয় ছায়াচিত্র সহযোগে পট হইতে কয়েকটি আদর্শ চিত্র প্রদর্শন করেন। কাঠের খোদাইকরা কাষ্ঠগুলিকে অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের নিদর্শনরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। এই সকল কাঠের কাজ ঘরের চাল ধরিয়া রাখিবার কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঘরের দেয়ালের সৌন্দর্য্যবিধানের জন্য পল্লীগ্রামের মহিলারা কি সুন্দর লাল রঙের চিত্র অঙ্কন করেন তাহাও ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত হয়। এই সকল দেয়ালচিত্র আলপনা হইতে বিভিন্ন এবং বাংলার নিজস্ব জিনিষ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় সহরের কৃত্রিম সভ্যতা এখন পল্লীকে আক্রমণ করিতে বসিয়াছে। সেই সভ্যতার স্রোতে পল্লীর তথা দেশের প্রকৃত সম্পদ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জাতীয় কলার এই মহামূল্য সম্পদকে মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাঙ্গালীকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা আশা করি প্রত্যেক বাঙ্গালী দত্ত মহাশয়ের অনুপ্রাণনায় উৎসাহিত হইয়া বাংলার এই সম্পদগুলিকে বিনষ্ট অথবা বিজাতীয় ভাবের দ্বারা কলুষিত হইতে দিবেন না।

সে

শ্রী হৈমবতী দেবী

আমার মনের আলো প্রাণের আলো
চোখের আলো সে,—
সেই আলোক বিনা হৃদয় বীণা
নীরব হ'লো যে।
হয় না কো তার সুরের খেলা,
নীরব সকাল-সন্ধ্যা বেলা,
প্রাণের সঙ্গ প্রাণের মেলা
বিফল হ'লো রে!

হৃদয়-বীণার সকল সুরই
বিকল হ'য়ে যায়
সে যদি না সকাল-সাঁঝে
আলোক ফেলে তায়;
তার আলোকে দেখ্‌তে পাবি
সকল সুরের সকল চাবি,
সেজন ছাড়া প্রাণের দাবী
পূরায় বলো কে?

—

কাঁঠাল (খুলনা)

১৩৩৬ সালের কথা। কেমন করিয়া একখানি বঙ্গলক্ষ্মী আমাদের গ্রামে কেহ হয় ত লইয়া আসিয়া থাকিবে। আমরা কতিপয় মহিলা, যাঁহারা একটু লিখিতে পড়িতে পারিতাম, আগ্রহের সহিত পড়িয়া দেখিলাম,—কত দেশে কত গ্রামে মহিলারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, সমিতি গঠন করিয়াছেন। আমাদের মনেও আশার সঞ্চার হইল। হয় ত বা আমরাও এমনি সমিতি গঠন করিয়া নিজেরাও শিক্ষিত, উন্নত হইব, তথা গ্রামকেও সুন্দর ও উন্নত করিতে পারিব। কিন্তু একে পাড়াগাঁ, তাহাতে আবার শিক্ষার আলোক মেটেই পড়ে নাই; আমরা আটটি মহিলা—সাহস কি যে এই কাজে নামি, তথাপি আশায় রহিলাম।

তখন মাঘ মাস। গ্রামস্থ কয়েকটি যুবকের উৎসাহে ও সহযোগিতায় বাগেরহাট হইতে শ্রীমতী লীলা মিত্র (বাগেরহাট সমিতির সম্পাদিকা) মহাশয়াকে আনাইয়া সভা করিলাম। প্রায় ২৫।২৬টি মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। লীলা মিত্র মহাশয়া বক্তৃতা দিয়া সমিতি গঠনের উপকারিতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। খুব উৎসাহের সঞ্চার হইল। ১০।১২ জন সভ্যা লইয়া প্রথম সমিতি সেই দিনই গঠিত হইল। (২০ মাঘ, ১৩৩৬)

প্রথম সময়ে মাত্র ১০।১২ জন সভ্যা লইয়া সমিতি গঠিত হইলেও দুই বৎসরে সভ্যাসংখ্যা বাড়িয়া ৫০ জন দাঁড়াইয়াছে।

গ্রামস্থ মহিলাদের পরস্পর মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান অবশ্য এখন সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা নিকটস্থ বাগেরহাটের মহিলাসমিতির সভ্যাদিগকে ও দলানী গ্রামস্থ মহিলাসমিতির সভ্যাদিগকে বহু দিবস নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি ও তাহাতে আমরা পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান ও মেলামেশার সুযোগ পাইয়াছি।

আমরা মহিলাদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারকল্পে এ-বৎসরে মোট ৬টি লেক্‌চারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। ডাঃ অরুণচন্দ্র নাগ এম্‌বি মহাশয় ২টি, ডাঃ এ, কে, বসু এইচ এম্‌বি ৩টি ও শ্রীমান সুধাংশুকুমার রায় ১টি বক্তৃতা দিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেকাংশে সচেতন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর গ্রামে কলেরায় ৫।৭টি লোক মারা যাইত। এ বৎসর মহিলারা অবহিত হওয়ায় মোটেই কলেরা দেখা দেয় নাই।

মাতৃ ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধেও ৮টি বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তন্মধ্যে, পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ১টি এবং উপরোক্ত ডাক্তার মহাশয় দুইজন ১টি বক্তৃতা দিয়াছেন।

আগে কেহই শিল্পকার্য্য জানিত না। এখন অনেকেই কিছু কিছু শিখিয়াছেন। এই বৎসর একটি শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। অনেক মহিলা বিড়ি প্রস্তুত করিয়াই মাসে ২০৲।২৫৲ টাকা রোজগার করিতেছেন। সমিতি অনেক সময় সভ্যাদিগকে দ্রব্যাদি সাহায্য করিয়া থাকেন।

সভ্যাগণের চেষ্টায় একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসবাবপত্রের জন্য ৫০৲ টাকা

দিয়াছেন। গ্রামস্থ দুইজন মহিলা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন।

কেন্দ্রসমিতি হইতে সাহায্য পাইয়া এ বৎসর ধাত্রী-শিক্ষার ক্লাস খোলা হইয়াছিল। ১৫ জন পাশ করিয়াছে।

দরিদ্র বিধবারা উৎসাহ পাইয়া বিড়ি তৈয়ার করিয়া বেশ ভালভাবে দিনপাত করিতেছে। প্রথম মূলধন সমিতি হইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

এ বৎসর আলপনা-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি বসু প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এডভোকেট এস্, সি. সোম পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন।

বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ কে, দি, নাগ মহাশয় দুইবার আসিয়া সভ্যাদিগকে বহু উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়া উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন।

নবগ্রাম

গত ১৩৩১ সনের বৈশাখ মাসে আমাদের গ্রামের একটি বয়স্থা মহিলা অন্য একটি দুঃস্থা মহিলাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি সভা করিয়া ব্যক্তিগত সাধ্যানুসারে চাঁদা গ্রহণ করেন। কোন কারণবশতঃ ঐ মহিলাটি ঐ টাকা সাহায্য লইতে বিরত হন। তখন শ্রীযুক্তা সুশীলাসুন্দরী গুপ্তা ঐ টাকার দ্বারা কাপড় সূতা প্রভৃতি আনিয়া গ্রামের কয়েকজন মেয়ে দিয়া একটি সমিতি করিয়া ঐ কাপড়ে জামা রুমাল তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ঘরে খাবার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াও বিক্রয় করা হয়।

সমিতি হইতে সাধ্যমত পরের উপকার করা, সর্ব্বসাধারণে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, মেয়েদের পরস্পর মেলামেশার সুযোগ দেওয়া—এই সমিতির উদ্দেশ্য।

সমিতির বর্ত্তমান সভ্যাসংখ্যা ২০ জন। তন্মধ্যে সভানেত্রী শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী গুপ্তা। সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দেবী—ঠিকানা ৮৩।বি অখিল মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা। সহসম্পাদিকা শ্রীমতী অনিতা মিত্র—নবগ্রাম পোঃ, জেলা ঢাকা।

গ্রামের কোন বাড়ীতে অসুখ হইলে সমিতিতে খবর দিলে সমিতি এখান হইতে লোক পাঠাইয়া দেবার ব্যবস্থা করে। কোন দরিদ্র লোকের অসুখ হইলে সমিতির ফণ্ড হইতে তাহাকে অর্থ ও লোক দ্বারা সাহায্য করে। গরীব ছাত্রীগণের পুস্তকাদি সমিতি হইতে দেওয়া হয়। গত বন্যার সময়ে সমিতি ভিক্ষা করিয়া কিছু চাউল ও পুরাতন কাপড় বন্যা-পীড়িত লোকদের মধ্যে দান করিয়াছে। সম্প্রতি একটি গরীব বিধবার পুত্রের অসুখে সমিতি ২৸০ আনা দান করিয়াছে। আর একটি মুসলমান স্ত্রীলোকের অসুখে সমিতি ৮ইতে ।৷৹ সের চাউল ও ২৷৵০ আনা দান করিয়াছে।

প্রতি সোমবারে মহিলাগণ একত্র হইয়া নানা বিষয় আলোচনা করা হয়। বঙ্গলক্ষ্মী হইতে প্রবন্ধ পড়া ও সেলাই করা হয়।

এখানে গৃহশিল্প শিক্ষার জন্য কোন শিক্ষয়িত্রী নাই। গ্রামের মেয়েরা পরস্পরের কাছে সেলাই শিক্ষা করেন, এখানে ফ্রক ব্লাউজ সেমিজ টেবিলক্লথ পাঞ্জাবি সার্ট ছেলেদের ইজার উলের সোয়েটার মোজা এমব্রয়ডারির কাজ পুঁতির কাজ নারিকেল-কাঠির ও বাঁশের ফুলের সাজি পাপোষ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে কোন শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের তেমন সুবিধা নাই, মেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজের বাড়ীর যাবতীয় সেলাই করিয়া মাসে ৩৲।৹৲ টাকা আয় করেন। এখানে সুতা দিয়া কাপড়ের পাড় ও পাড়ের সূতা দিয়া খদ্দরের সাড়ীর পাড় প্রস্তুত হয়।

এখানে সভ্যারা যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন তাহার মাসিক মূল্য গড়ে ৮৲।১০৲ টাকা।

এখানে ফাল্গুনের শেষে একটি শিল্পপ্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীতে মেয়েদের হাতের তৈরী আচার খাবার জামা ফুলের সাজি প্রভৃতি বিক্রয় হয়—বিক্রয়ের পরিমাণ ২০৲।২৫৲ টাকা। আমাদের সমিতিতে ভাল বিলাতী বিস্কুটের অনুকরণে এক প্রকার বিস্কুট তৈয়ার হয়।

সেলাই শিখিবার জন্য সমিতি হইতে মেয়েদের কাপড় সূতা দেওয়া হয়। অন্যান্য বিষয় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না।

সমিতির আয়ব্যয়ের হিসাব—

সমিতির চাঁদা বাবদ আদায়	
মিষ্টান্ন বিক্রয় ও জামা বিক্রয়	
একজন সভ্যার আদায় চাঁদা	
জামা বিক্রয়	১০৲
মোট—	১৮৲

খরচ

একজন মেয়েকে ১ বৎসর বোর্ডিংয়ে রাখিয়া পড়ার খরচ	১৩০৲
একজন অনাথার মাতৃশ্রাদ্ধে দান	
একজন গরীব ভদ্রলোকের শ্রাদ্ধে দান	৫৲
একজন রোগীকে দান	২৸০
একজন স্ত্রীলোককে দান	২৸৵০
মোট খরচ—	১৪৩৷৵০
মোট জমা	১৮০৲
মোট খরচ	১৪৩৷৵০
হাতে আছে	৩৭৲

শ্রী অনিতা মিত্র
সঃ সম্পাদিকা

মাণিকগঞ্জ

বর্ত্তমানে এই সমিতির সভ্যাসংখ্যা ৪৭ জন। প্রত্যেকে বাৎসরিক ১৲ টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন।

এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে দাসরা, মত্ত, বেটকা, বেতিলা ও নবগ্রাম হইতে বহু ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাতে মহিলাগণের মধ্যে আদানপ্রদানের বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে মহিলাদের উন্নতি বিষয়ে একটি সুন্দর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাহার পর সভানেত্রী ও সম্পাদিকার বাসায় আর ১০।১২টি অধিবেশন হইয়াছে।

সভানেত্রীর বাসায় মহিলাদের মনোরঞ্জনের জন্য বয়স্কাউটদের কৌতুকক্রীড়ার আয়োজন হইয়াছিল।

এই মহিলাসমিতির উদ্যোগে গত ফেব্রুয়ারী মাসে মাণিকগঞ্জ শিশুপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। আচার্য্য পি, সি, রায় মহাশয় শিশুপ্রদর্শনীতে একটি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া মহিলাদের আগ্রহের ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। ৬ মাস হইতে ৩ বৎসরের নীচে প্রায় ১০০টি শিশু প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ৫০৲ টাকা, তেওতার জমিদার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বাবুর পত্নী একটি স্বর্ণপদক ও নগদ ২০৲ টাকা দান করিয়া শিশুদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। প্রথম শিশুটিকে স্বর্ণপদক ও অপর শিশুদের মধ্যে টাকা ও রৌপ্যপদক দেওয়া হইয়াছে। শিশুদের জন্য খাবার, খেলনা, দুধ, ফল ইত্যাদির বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল।

এই সমিতিতে আচার্য্য পি, সি, রায় একটি রৌপ্য ফুলদান মেয়েদের প্রতিযোগিতা জন্য দিয়া গিয়াছেন। ৩ মাস পর পর সমিতি হইতে একটি মেডেল ও ফুলদানটি লইয়া প্রতিযোগিতা হয়। এ পর্য্যন্ত ২টি প্রতিযোগিতা হইয়াছে—একটি চরকা ও একটি বুনানে। দুইবারই স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত ললিত মৈত্র মহাশয়ের মেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১২টি মেয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়।

মহিলাদের শিল্প ও সূচিকার্য্য শিক্ষার জন্য মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে একজন শিক্ষয়িত্রী (শ্রীমতী চারুবালা মিত্র) নিযুক্ত আছেন। সম্পাদিকার বাসায় একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রতি শনিবার তথায় মেয়েরা উপস্থিত হইয়া ছাট, কাট, নানাবিধ সূচিশিল্প এবং এমব্রয়ডারি ইত্যাদি শিখিয়া থাকে।

১৩৩৫।৩৬ সনের মাণিকগঞ্জ প্রদর্শনীতে মহিলাসমিতির সভ্যাগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকার সূচিশিল্প ও বহু খাদ্যদ্রব্য প্রদর্শিত হয়। তাহাতে পুরস্কার ও বিচারের ভার মহিলাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। বহু মহিলা প্রদর্শনী কমিটি কর্ত্তৃক মেডেল ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সমিতি হইতে সভ্যাদের পড়িবার জন্য বিচিত্রা, স্বাস্থ্য-সমাচার ও বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা লওয়া হয়।

সমিতিতে প্রতি সপ্তাহে মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, প্রসূতি-পরিচর্য্যাগার স্থাপন বিষয়ে আলোচনা হয়। মেয়েদের ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান হইবার জন্য মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডী, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পড়িতে দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর

পারুলবালা দেবী উপস্থিতি, মৃণালিনী সেন, সুষমা রায়, কল্যাণী দেবী আশা ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সমিতির মেয়েরা এমব্রয়ডারি টেবিলক্লথ জামা প্রভৃতি, ঝাঁইনের, পুতির কাজ করিয়া থাকে। শিক্ষের জন্য সমিতি হইতে দেওয়া হয়। বিক্রয়লব্ধ ধন হইতে মেয়েদের পারিশ্রমিক দিয়া লভ্যাংশ সমিতিতে থাকে। তাহা ব্যতীত তাদের বড়ি সুপারিণ্টাটা ছিপা কাঁথা আচার জাম জেলি মোরব্বা আমসত্ত্ব সাজি ডালা প্রভৃতি মেয়েদের তৈয়ারী করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্থানীয় মেলা ও বাজারে সে সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হয়।

মণিপুরী তাঁতের কাজও মেয়েরা করিতেছে। তোয়ালিয়া ও চাদর তাহাতে প্রস্তুত হইতেছে।

সমিতিতে একটি তাঁত ক্রয় করা হইয়াছে। তাঁতে প্রস্তুত গামছা সাড়ী ও জামার কাপড় বিক্রয় হইতেছে।

পুরাতন কাপড়ের কাঁথা তুলনি পাড়ের চাদর পর্দা, পুরাতন কাপড়ের পুতুল ও নানাবিধ খেলনা, পাপোষ সাবান প্রস্তুত এবং রন্ধনশিক্ষা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিও মেয়েদের সুন্দররূপে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সমিতির স্থায়ী গৃহ সম্পাদিকার বাসায়। মহিলারা যাতায়াতের সুবিধা পান।

সমিতি হইতে প্রতি বৎসর মহিলাদের একটি "আনন্দ-মেলা"র অনুষ্ঠান হয় ও মেয়েদের শিল্পপ্রদর্শনী হয়। গত বৎসর প্রদর্শনী ও মেলা অতি সুন্দর হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে প্রায় ২০০০ সূচিশিল্প প্রদর্শিত হইয়াছিল। মহিলাসমিতি ব্যতিরেকে অন্যান্য গ্রাম হইতেও বহু শিল্প আসিয়াছিল। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এস্ কে, চ্যাটার্জি আই, সি, এস, মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। মেয়েরা উদ্বোধন-সঙ্গীত, আবৃত্তি ও গান করে। একটি ৬।৭ বৎসরের মেয়ে অতি সুন্দর আবৃত্তি ও গান করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করে। স্থানীয় সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় মেয়েটিকে একটি রৌপ্যপদক দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীপতি গোস্বামী মহাশয় মা ও জাতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাতে মেয়েপুরুষে প্রায় ২৫০০ লোক হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস "আনন্দ-মেলা" হয়। মেয়েদের হাতের খাবার, খেলনা, পান, চা, বিস্কুট, মোয়া, মুড়ি, ছিপ, কাঁথা, আচার, মোরব্বা ইত্যাদির বহু দোকান বসে ও বিক্রয় হয়। উক্ত মেলায় মেয়েরাই কেবল কেনাবেচা করিয়া থাকেন। দুই দিবসই ব্যাণ্ড পার্টির বন্দোবস্ত ছিল। এই মেলাতে সন্নিহিত গ্রামের বহু মেয়েরা উক্ত কার্য্যে যোগদান করিয়া মেলাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মেলা প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে।

সমিতিতে ধাত্রী-শিক্ষা দেওয়া হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস মহাশয় এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এককালীন সাহায্য করিয়া মহিলাসমিতিকে উৎসাহিত করিয়াছেন :—

ধামকোড়ার জমিদার দীনেশবাবুর স্ত্রী
বানিয়াচঙ্গের জমিদার রায় বাহাদুর
হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
বানিয়াচঙ্গের জমিদার দীনেন্দ্র রায়চৌধুরী
তেওথার জমিদার হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী
ডেরাশ্রীর জমিদার সিদ্ধেশ্বর রায়
কুমিল্লার উকিল রায় বাহাদুর দুর্গা দাস
বরদাখাতের জমিদার যোগেশ ঘোষ
৮। শ্রীযুক্তা সুধা বসুমদার
৯। শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেন
১০। শ্রীমতী নয়নবালা সেন মদনসিংহ
১১। বাহড়া-নিবাসী
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
জয়সেনপুরের শ্রীযুক্তা সুধাংশু ঘোষ
শ্রীযুক্ত দীনেশ সিকদার ই, বি, —
শিল্পের জন্য একটি স্বর্ণপদক

ইহা ব্যতীত ২৲।৩৲ টাকা সাহায্যও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

এই সমিতি হইতে নত গ্রামে একটি শাখা সমিতি খোলা হইয়াছে।

সমিতি হইতে একটি হারমোনিয়ম কিনিয়া মেয়েদের গান-বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয়।

এবার বন্যাতে মহিলাসমিতি বহু কাজ করিয়াছেন। সম্পাদিকা ২।৩ জন সঙ্গী লইয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া

বাবু ম০ চাল ও ৫০৲ টাকা নগদ সাহায্য পান। উক্ত টাকা দ্বারা চাল খরিদ করিয়া, বাড়ী বাড়ী নৌকা করিয়া গেইয়া অংশানুসারে চাল, পয়সা, পুরাতন কাপড় দান করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রিলিফ ফণ্ড হইতে স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ৩০৲ টাকা মহিলাসমিতিকে সাহায্য করার জন্য দিয়াছিলেন। রায় সাহেব প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত, সবরেজিষ্ট্রার প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র দাস, জমিদার নিশিকান্ত রায়, তেওতার ম্যানেজার সারদাপ্রসাদ দাস, ইঁহারা দুর্ভিক্ষ কার্য্যে সমিতিকে বহু সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য সমিতি হইতে ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রী কিরণবালা সেন,
সম্পাদিকা

বহুবাজার (কলিকাতা)

শ্রীভগবানের কৃপাশক্তিতে আজ ২ বৎসর কাল সমিতি এবং তাহার অধীনস্থ একটি শিক্ষালয় সুচারুরূপে চলিয়া আসিয়াছে। এই মহিলাসমিতির দুইটি বিভাগ আছে :— একটি শিল্পাগার, অন্যটি পাঠাগার। শিল্পবিভাগের ছাত্রীদের মাসিক ১৲ এবং ২৲ হারে এবং পাঠাগারের ছাত্রীদের যথাক্রমে ১৲, ৸০, ।০ হারে বেতন দিতে হয়। সমিতির সভ্যাগণের মাসিক ১৲, ৸০, ।০ হারে চাঁদা দেওয়া নিয়ম।

শ্রীমতী শৈলবালা সরকার কুটীরশিল্প এবং চরকা শিক্ষা দিয়া থাকেন। সমিতির বর্ত্তমান সভ্যাসংখ্যা ২৬ জন। ছাত্রীসংখ্যা মোট ৫০ জন। সমিতির সভ্যাগণ নিয়মিত ভাবে সমিতিতে যোগদান করিয়া নানাবিধ শিক্ষামূলক বিষয়ের আলোচনা করিয়া সমিতিকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন। সমিতির শিক্ষালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়, যথা—ইংরাজি, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ছাঁটকাট, চিত্রাঙ্কণ, মাটির গঠনকার্য্য, ব্যায়াম, সঙ্গীত, কুটীরশিল্প, চরকা, পুঁথির ও তুলার কাজ।

শ্রী উমাশশী দেবী,
সম্পাদিকা

সাধুর পরিচয়

("সন্থন্ জাত্ না পুছো নিগুণিয়া—")

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সাধুর জাতি ?—হায় নির্গুণ,
পুছিস্‌নে তুই আর ;
ছত্রিশ জাত্—সবার ওরেই
মুক্ত সাধন-দ্বার।
হিন্দু তুরক্ পাশাপাশি
এ পথ দিয়ে চল্‌ছে হাসি' ;
সাধনাতেই, ঋষি—ঋষি,
সন্ত—রবিদাস ;—
মুচকরাস, শুচির প্রাণেও
আত্মা করেন বাস !…
সাধু—সাধুই, সত্যজ্ঞানই
শেষ-পরিচয় তাঁর।

আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষা

শ্রী সুখলতা রাও বি-এ

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষালয়গুলির শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা আমেরিকাবাসীর নিকটে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর নারীগণ এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, ইহাতে যে কেবল অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হইবে তাহা নহে, এই শিক্ষা তাঁহাদের জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে—ব্যবসায়ক্ষেত্রে, গৃহক্ষেত্রে এবং সর্ব্ববিধ জীবনসংগ্রামের ভিতরে তাঁহাদিগকে শক্তি ও সাহস প্রদান করিবে।

বর্ত্তমান সভ্যজগৎ, গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য, রন্ধনগৃহের ও অন্যান্য গৃহকার্য্যে সর্ব্ববিধ সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, হাসপাতালের রোগীদিগের পক্ষের সুব্যবস্থার জন্য সুদক্ষা ও শিক্ষিতা নারীদিগের অভাব বোধ করিতেছে। ইহারই নিমিত্ত আমেরিকায় শিল্প, বিজ্ঞান, আইন, কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি প্রধান প্রধান বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা কোন বিশেষ দিকে পারদর্শিতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁর জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞান শিক্ষাবিভাগই এই বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ। অধিকাংশ ছাত্রী এই বিভাগেই অধ্যয়ন করিতেছেন। এমন কি ভেরমণ্ট ওয়াশিংটন, নিউ মেক্সিকো, নিউজিলণ্ড, ভিয়েনা প্রভৃতি সুদূর দেশ হইতে ছাত্রীগণ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থে আসিয়া থাকেন। গৃহের সর্ব্ববিধ সুশৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে :—

নানারূপ শিল্পকার্য্য, খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, গৃহের যাবতীয় ব্যবস্থার সুপরিচালিত পদ্ধতি, শারীরিক ব্যায়াম, বস্ত্রবয়ন, শিশুপালন, শিশুশিক্ষা ইত্যাদি।

পূর্ব্বে এই সকল বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র রন্ধন ও সীবন শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে গৃহ-পরিচালনা করিয়া গৃহকে আনন্দনিকেতন করিয়া তোলা, সমাজের মঙ্গলসাধন করা ও কর্ম্মক্ষেত্রে দক্ষতা লাভ করাই এই সকল ছাত্রীদিগের উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সময় এবং অর্থের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার শিক্ষা করা, নিত্য জীবনধারার মধ্যে সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান ও আনন্দলাভ করা এবং সামাজিক প্রীতির বন্ধন রক্ষা করাই এই শিক্ষালাভার্থিনীদিগের অন্তরের কামনা।

ডিগ্রীলাভের পূর্ব্বে অন্ততঃপক্ষে চারি বৎসর এই সকল ছাত্রী বিদ্যালয়সংলগ্ন ছাত্রীনিবাসে থাকেন। কোনও বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করা ব্যতীত ইঁহারা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, আমেরিকার ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, শরীরবিজ্ঞান, প্রাণী ও সমাজবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, বস্তুবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। অন্য পক্ষে গৃহপরিচালনাক্ষেত্রে পারদর্শিতালাভের জন্য, নানারূপ রন্ধন শিক্ষা, গৃহের আসবাব পরিষ্কৃত রাখা, পোষাক-পরিচ্ছদ ধোওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। ছ' মাস যাবৎ এইরূপ এক একটি গৃহপরিচালনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ও অনাথ শিশু প্রতিপালন করিয়া ইঁহারা প্রকৃত দক্ষতা লাভ করেন। ইঁহাদের শিক্ষা কেবল পুস্তকপাঠেই আবদ্ধ নয়; প্রত্যেক কার্য্য ইঁহারা হাতে কলমে শিক্ষা করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত এই ছাত্রীদের পরিচালিত সংবাদপত্র 'হোমমেকার' সকল শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশের যাবতীয় কল্যাণ বিষয়ে আলোচনা করিবার নিমিত্ত ইঁহাদের সমিতি ও ক্লাব আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে কেবল পড়াশুনা নয়, ক্রীড়াকৌতুক ও

নির্দ্দোষ বাবস্থা আছে।

বর্ত্তমান যুগে আমাদের ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে নানারূপ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা নারী-প্রতিষ্ঠা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা আমেরিকার এই অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিলে দেশবাসীর নিকট সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

(Modern Review তে প্রকাশিত Women's Education in American Colleges হইতে গৃহীত সারাংশ।)

বর্ত্তমান সংখ্যার বহুবর্ণ চিত্র

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত বহুবর্ণ ছবিখানি নানা কারণে অতিশয় মূল্যবান। উহার বিষয়বস্তু—শ্রীগৌরাঙ্গের নগরকীর্ত্তন। ছবির প্রায় মধ্য ভাগে (অর্থাৎ ডান দিক হইতে দ্বিতীয় প্রধান মূর্ত্তিটি) শ্রীগৌরাঙ্গদেব। তিনি কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা, সঙ্গে বৈষ্ণব পুঁথিতে উল্লিখিত সুন্দর পার্ষদবৃন্দ। পার্ষদবর্গের যেরূপ বর্ণনা ও চিত্র আমরা নানাবিধ বৈষ্ণব পুস্তকে পাইয়াছি, এই ছবির মূর্ত্তিগুলির সহিত তাঁহাদের সেই সব চেহারার অনেকগুলি অবিকল মিলিয়া যায়। এই একখানি চিত্রের মধ্যে প্রধান বৈষ্ণব মণ্ডলীর সমাবেশ এবং প্রত্যেকটি মূর্ত্তিতে ব্যক্তিগত ভাব-বৈশিষ্ট্য মনোহররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—এই হিসাবে ছবি-খানির মূল্য অসামান্য।

নগর মধ্য দিয়া ভাবপ্রবাহ ছুটিয়াছে কীর্ত্তনিয়াদের ত কথাই নাই;—পথে ঘাটে যে যেখানে আছে, মানুষ পশু সকলেই যেন সম্বিৎ হারাইয়াছে। নারীরা কলসী কাঁখে জল আনিতে গিয়া ভাববিহ্বল মুখে চাহিয়া আছে, কাজের কথা মনে নাই। গরুগুলি নদীতে জলপান করিতে আসিয়াছিল, তৃষ্ণা ভুলিয়া তাহারা ঊর্দ্ধমুখে কীর্ত্তন শুনিতেছে। নৌকারোহী ভদ্রলোকের হাতের হুঁকা ভাবাবেশে জলে পড়িয়া যাইতেছে, খেয়াল নাই। মাঝিরাও নৌকা বাওয়া বন্ধ করিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া আছে।

এই মনোরম চিত্রের কিছু সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে সামনের নদীকূলে এবং পিছনের পটভূমিকায় নীলাভ বর্ণলেপ। এই পরিপ্রেক্ষিতের যোজনা আধুনিক কালের কেহ করিয়াছে, চিত্রবিদেরা এইরূপ অনুমান করেন।

মূল চিত্রখানি প্রাচীন, কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত বনিয়াদি ঘরে ঝিনষ্টপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বায়বীকার করিয়া উহার অনুলিপি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের যে লোকশিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে সেই অনুলিপি রাখা হইয়াছিল, কলারসিকেরা উহার প্রচুর প্রশংসা করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়েরই সৌজন্যে উহার প্রতিকৃতি বঙ্গলক্ষ্মীতে ছাপা সম্ভব হইল।

ম—

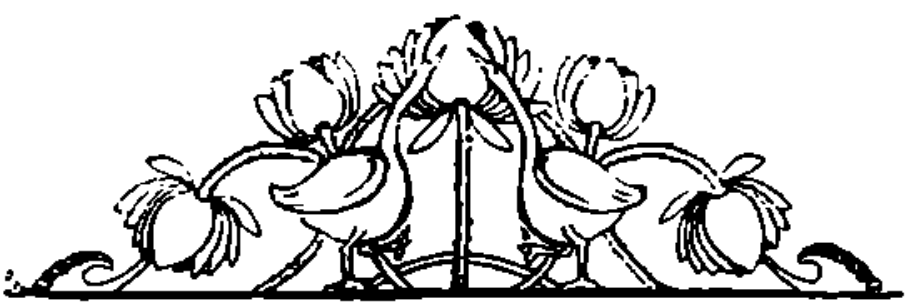

কেন্দ্রসমিতির কথা

কলিকাতায় লোকনৃত্য উৎসব

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে গত ১৬ই এপ্রিল শনিবার এবং ১৭ই এপ্রিল রবিবার কলিকাতার গলটন পার্কে বাংলা দেশের নিজস্ব লোকনৃত্যের এক বিরাট অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বাংলা দেশে এখন যে নৃত্য প্রচলিত আছে তাহার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে বাঙ্গালী তাহা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। সেই বিস্মৃতপ্রায় জাতীয় বিশিষ্টতার পুনরুদ্ধারের জন্য শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ মহোদয় যে অক্লান্ত চেষ্টা এবং অশেষ শ্রম স্বীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিবে। এইরূপ তেজোদীপক পল্লীনৃত্যের উৎসব ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় সর্ব্বজনসমক্ষে কখনও প্রদর্শিত হয় নাই।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল বাংলার বিভিন্ন জেলার অধুনালুপ্ত অনেক প্রকার লোকনৃত্য। ঢাক, ঢোল, মাদল, কাঁসি, খোল এবং গোপীযন্ত্র এই কয়টি বাদ্যযন্ত্র দ্বারাই সমুদয় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হইয়াছিল। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এখন যে সকল নৃত্য ক্ষীণভাবে প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বীরভূমের "রায়বেঁশে" নাচই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বাউরি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জাতিদের মধ্যে এই নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। পূর্ব্বে ইহারাই বাংলার সৈনিকের কার্য্য করিত। রায়বেঁশে নৃত্য প্রকৃত পক্ষে বাংলার সামরিক নৃত্য। কালক্রমে উহাই আজ বাউরি জাতিদের ভিতর আসিয়া কোনরকমে টিকিয়া আছে মাত্র। বলিষ্ঠ, পেশীবহুল রায়বেঁশেদের বীরনৃত্য দেখিয়া মনে একটি শক্তির প্রেরণা জাগিয়া উঠে।

পূর্ব্ববঙ্গের "ভারি" নৃত্য, বীরভূমের "ঝুমুর" নৃত্য এবং ফরিদপুরের "ধূপ" নৃত্য ও "অবতার" নৃত্য, এবং বর্দ্ধমান জেলার "বাউল" নৃত্য ও সঙ্গীত অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়া সকলের চিত্তস্পর্শ করিয়াছিল।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত সুলতানপুর শ্রীরাম হাইস্কুলের ছাত্রগণ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় সকলপ্রকার পল্লীনৃত্য শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত রায়বেঁশে নাচ, ভারি নাচ এবং বাউল নাচ প্রদর্শন করেন। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অনেক প্রকার সুন্দর সুন্দর ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ বি, এ, শ্রীযুক্ত নবনীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, স্বয়ং ঢোল, কাঁসি ও গোপীযন্ত্র বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বাজাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাংলার স্কুলসমূহে এই সকল পল্লীনৃত্য প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় ইতিপূর্ব্বেই অনেক স্কুলে এই সকল নৃত্য প্রচলিত হইয়াছে।

এই নৃত্যোৎসবে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল যশোহর জেলার "মেয়েলি ব্রত-নৃত্য"।

বাংলার ভদ্রসমাজের মেয়েদের ভিতরও নানা পূজা অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে নৃত্যের যে প্রচলন ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মিঃ দত্ত যশোহর জেলায় এইরূপ নৃত্যের প্রচলন আছে সংবাদ পাইয়া তথায় স্বয়ং গমন করেন এবং সেখানকার মেয়েদের ব্রতনৃত্য দর্শন করেন। তিনি অভিভাবকদের অনুমতি লইয়া কয়েকটি মেয়েকে লইয়া কলিকাতা আসেন। কলিকাতায় আজকাল যে রকম নারীনৃত্যের প্রচলন হইয়াছে তাহাতে এই ব্রতনৃত্য একটি নূতন জিনিষ। পল্লীগ্রামে বধূরা এই নৃত্য করিয়া থাকেন কিন্তু কলিকাতায় অল্পবয়স্কা বালিকাদের দ্বারাই ঐ নৃত্য প্রদর্শিত হইয়াছিল।

গলটন পার্কে সেদিন নৃত্যোৎসবে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। কলিকাতায় পল্লীনৃত্যের এরূপ অনুষ্ঠান আর কখনও হয় নাই।

সাব-কমিটির সভ্য নির্ব্বাচন

গত ১২শে এপ্রিল শুক্রবার মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রসমিতির পরিচালক-সভার একটি অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে সমিতির বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালনের জন্য সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঐসব কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

স্কুল কমিটি :—সভাপতি মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী; সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী দোম বি, এ, বি, টি; সভ্যগণ :—রায় বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় এম, বি, শ্রীযুক্তা কামিনী বসু, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী পি, এইচ, ডি, পি, আর এস, শ্রীযুক্তা গীতা চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ বি এল, শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন বি, শ্রীযুক্তা কাজিমুন্নেসা মোহা এম, এ।

প্রচার সংক্রান্ত কমিটি :—সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; সভ্যগণ :—শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী এম, এ, বি, টি, শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, মিঃ টি, পি, বোস, শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন বি, এ।

অভিনয় সংক্রান্ত কমিটি : শ্রীযুক্ত চন্দ্র-মাধব ঘোষ বি, এল (সম্পাদক), মিঃ কে, সি রায় চৌধুরী এম, এল, সি, মিঃ টি, পি, বোস, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় এম, বি, শ্রীযুক্তা প্রকৃতি দেবী, শ্রীযুক্তা ইন্দু চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি।

মহিলাসমিতি পরিদর্শন কমিটি :—শ্রীযুক্তা মৃণ্ময়ী রায় (সম্পাদিকা), শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন, শ্রীযুক্তা মনীষা রায় এম, এ, শ্রীযুক্তা গীতা চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী।

অর্থ সংক্রান্ত কমিটি :—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস, সি, ডাঃ পি, সি, সেন, এম, বি, এম, আর, এ, এস, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস।

"বঙ্গলক্ষ্মী" সাব কমিটি :—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (সভানেত্রী), শ্রীযুক্ত মনোজ বসু বি, এ (সম্পাদক), শ্রীযুক্তা দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী পি, এইচ, ডি, ডাঃ রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস।

ধানবাদে শিল্প-প্রদর্শনী

গত ২৩শে মার্চ্চ বুধবার হইতে এক সপ্তাহের অধিক কাল ধানবাদে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় একটি বিরাট শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। বহুস্থান হইতে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর চারু ও কারু-শিল্প এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতেও মহিলাদের প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের সূচিশিল্পের একটি ষ্টল এখানে খোলা হয়। ঝিল্লী মহিলাসমিতির চিকণের কাজগুলি বিশেষ ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, আলোকচিত্রের সাহায্যে এই প্রদর্শনী উপলক্ষে নারীমঙ্গল, কুটীরশিল্প শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রসূতি-পরিচর্য্যা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

জনাই শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী

গত ২৮শে মার্চ্চ হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামে স্থানীয় সাধারণ লোকের উৎসাহে একটি শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন ও একজন মহিলা কর্ম্মী বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসবে যোগদান করেন এবং শিশুমঙ্গল ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সকলের দৃষ্টি এই দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করা হয় যে জ্ঞান ও সংস্কারের সাহায্যে বহুপরিমাণে এদেশের ভয়াবহ শিশুমৃত্যুকে দূর করা সম্ভব। প্রায় ১০০টি একবৎসর বয়স্ক শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং ৬ জন শিশুকে পুরস্কার দেওয়া

হয়। মিঃ বি, কে, মুখার্জ্জি, মহম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং ডাক্তার কে, চাটার্জ্জি প্রভৃতির চেষ্টায় প্রদর্শনীর কাজ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

খিদিরপুরে মহিলাসভা

গত ১লা এপ্রিল খিদিরপুরে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী উপলক্ষে একটি বিরাট মহিলাসভার অধিবেশন হয়। প্রায় ৪০০ শত মহিলা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, আলোকচিত্র সাহায্যে নারীমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আলোকচিত্র সাহায্যে এই বক্তৃতা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে কুমারী বার্টন যে সুন্দর অঙ্গপরিচালনা ও ব্যায়াম প্রদর্শন করেন তাহা সকলকে বিশেষ উৎসাহ দান করে। কুমারী বার্টন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে বাঙ্গালী মহিলারা সুখের প্রধান উপাদান স্বাস্থ্যের প্রতি এত উদাসীন। মহিলাদের পূর্ণ স্বাস্থ্যের উপরই ভবিষ্যৎ শক্তিশালী তেজস্বী জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে। ব্যায়াম ব্যতীত সাধারণ খেলা ধূলাতেও মহিলাদের যোগদান করা কর্ত্তব্য। কোন কোন খেলায় বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন হইলেও খেলার সাধারণ ভাবে আমাদের ভিতর সহযোগিতা,

দমদমের বাগানে সরোজনলিনী নারী শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের ব্যায়াম

ঢাকুরিয়া মহিলাসমিতিতে বক্তৃতা

গত ৮ই এপ্রিল শুক্রবার ঢাকুরিয়া মহিলা ব্যায়াম-সমিতির উদ্যোগে একটি অতি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। স্থানীয় মহিলাসমিতির সভ্যারা ব্যতীত বহু বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা এই উৎসবে যোগদান করেন। সর্ব্বপ্রথমে একটি সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপরে ওয়াই, ডব্লিউ, সি-এর মহিলাদের স্বাস্থ্যপরিদর্শিকা ও পরিচালিকা কুমারী এম, বার্টন, নারীর স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চ্চা বিষয়ে অতি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা করেন। সহানুভূতি এবং সহযোগের ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, মিস্ বার্টনের এই বক্তৃতার অনুবাদ করিয়া দেন। স্থানীয় মহিলা ব্যায়াম-সমিতির সভ্যারা অতি সুন্দর ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। ব্যায়ামক্রীড়া পরিচালক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় এই অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

ডোমরা নারীমঙ্গল সমিতি

গত ৫ই চৈত্র রংপুর জেলার অন্তর্গত ডোমরা গ্রামে একটি মহিলাসভায় উপস্থিত মহিলাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির একটি শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এই সমিতি একটি বালিকা-বিদ্যালয় ও একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হইয়াছেন এবং যাহাতে সকল মহিলাদের ভিতর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিশু-পালন বিষয়ক জ্ঞান প্রসার লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীযুক্তা হিরণ্ময়ী রায় এই সমিতির সম্পাদিকা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

করাচী ভারতনারী শিল্পাগার

করাচী হইতে ভারতনারী শিল্পাগারের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুশীলা ঘোষ জানাইয়াছেন যে তথায় তিনি সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রণালী ও আদর্শানুযায়ী মহিলাদের ভিতর লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

চক্রধরপুর মহিলাসমিতি

চক্রধরপুরে বল্যাণী সঙ্ঘ নামে যে মহিলাপ্রতিষ্ঠান ছিল কিছুদিন হয় উহা সঙ্ঘাদের ইচ্ছানুযায়ী সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির শাখা-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীমতী পঙ্কজিনী দে উহার সম্পাদিকার কার্য্য করিতেছেন। মহিলারা কুটীরশিল্পের উদ্ধার ও প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ উৎসাহী হইয়াছেন।

শিক্ষিতা মহিলাদের রুচি অনুযায়ী প্রস্তুত সাবান

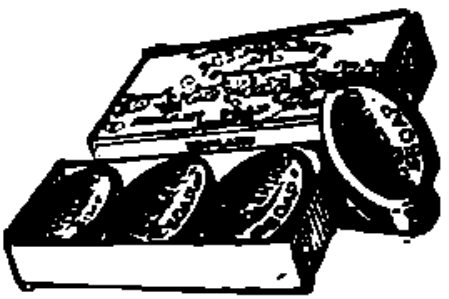

হিমানী-গ্লিসারীণ

মধুর গন্ধ, ব্যবহারে গা চড় চড় করে না। গায়ের চামড়া নরম থাকে ও সুন্দর হয় ও কম ক্ষয় বলিয়া হিসাবে সস্তা। মধুর গন্ধে আপনার স্নানাগার আমোদিত করিবে।

মুক্তার মত দাঁতগুলির সৌন্দর্য্য রক্ষার ভার

হিমানীর
নীম ডেণ্টাল ক্রীম

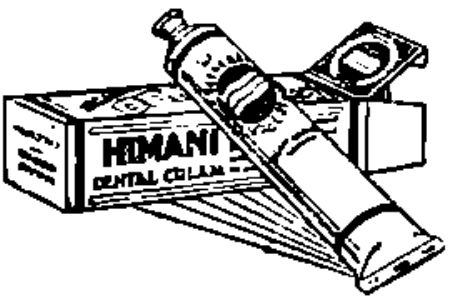

লইতে সক্ষম—অনেক রকম নকল হইয়াছে। হিমানী নামটী দেখিয়া লইলে পশ্চাতে কোনও অনুতাপ করিতে হইবে না।

যাঁহারা পায়োরিয়া নামক দন্ত রোগে কষ্ট পান তাঁহারা হিমানীর আইওডিন ডেণ্টাল ক্রীম ব্যবহার করিবেন—ভারতে হিমানীই আইওডিন ডেণ্টাল ক্রীমের প্রথম প্রবর্ত্তক।

প্রচারক—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং ৪৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Benintola Lane, Calcutta.

শিশুর খাদ্য

আমাদের বার্লী
আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক
প্রণালীতে প্রস্তুত

★ ★ ★ ★

শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া
ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

★ ★ ★ ★

পঞ্চাশ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত

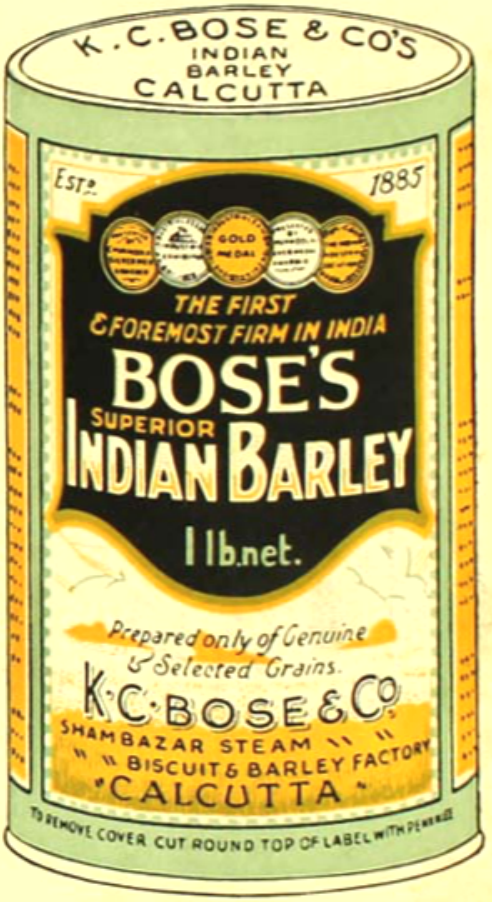

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

Sambhabhan Printing Works

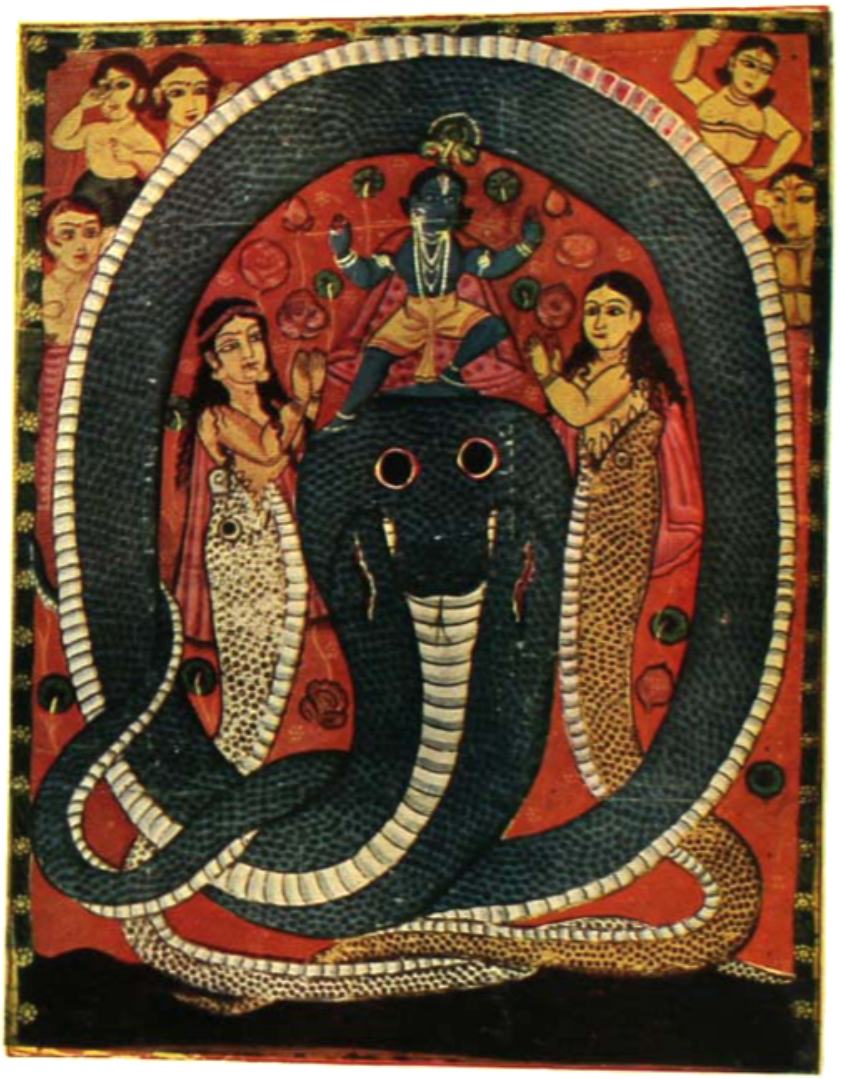

কালীয়-দমন

(প্রাচীন পট হইতে)

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ [৭ম সংখ্যা

শিল্পকলা ও বঙ্গনারী

কুমারী ছায়া দেবী

আজ নারী-জাগরণের যুগ। সর্ব্বত্রই নারীজাতির ভিতর চঞ্চলতা প্রকাশ পাইতেছে। জাগরণ মানে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তোলা। সমাজ গতিশীল—স্থিতিশীল নহে। যে সমাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিবে সে'ই বর্ত্তমান যুগে স্থিতিলাভ করিবে। বঙ্গনারী কোনদিন নিশ্চেষ্ট ছিল না—জড়তায় কোনদিন তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। বঙ্গনারী কোনদিন নিষ্ক্রিয় ছিল না—সর্ব্বদাই সজাগ ছিল এবং আছে। সভ্যতার তারতম্যে বা কৃষ্টির তারতম্যে মানবমনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। প্রত্যেক ভাবই (idea) ভালমন্দ-মিশ্রিত। আবার উচ্চস্তরে মানবমনে যখন একতা বা সমতার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ভালমন্দ বা সু ও কু বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। স্থবির যে, সে এই নারী-জাগরণের ভিতর মৃত্যুর চিহ্ন দেখিবে; কবি যে, সে এই জাগরণের ভিতর সজীবতার লক্ষণ পাইবে।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যার কথা চলিত আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহারও অধিক কলাবিদ্যা আছে। রসকলার উদ্দেশ্য—মানবমনে সৌন্দর্য্যস্পৃহা জাগরিত করা। সৌন্দর্য্যজগতে জাতি বিচার নাই—সেখানে নরনারীর প্রভেদজ্ঞান নাই, ভেদবুদ্ধির খুঁটিনাটি বিচার-বিতর্ক নাই। সৌন্দর্য্য-আস্বাদনে মানবমন স্নিগ্ধ, শান্ত ও নম্র হয়। দেহাত্মবুদ্ধির নীচ কামনা এখানে বিলুপ্ত হইয়া মানবমন নব-বস্তুর রসাস্বাদনে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। এই সৌন্দর্য্যজগতে মানব দেবতায় পরিণত হয়। তাহার পূর্ব্বজগৎ অতর্কিত ভাবে বিদায়-গ্রহণ করে। সৌন্দর্য্যরসাস্বাদন দ্বারা মানব-জগতে প্রীতির মিলন হয়; এ মিলনে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের চরিতার্থতা ও কল্যাণ কামনা করে। মানবমনে যখন সৌন্দর্য্যবোধের অভাব হয় তখনই জগতে অশান্তির বাতাস বহে। যে জাতি যত উচ্চস্তরের শিল্পীর সৃষ্টি করিতে

পারিবে সে জাতি কখনও তত অগ্রসর হইবে। জাতিকে—মানবমনকে উন্নীত করিতে হইলে রসকলার চর্চ্চা ও প্রসার প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য।

সৌন্দর্য্যরসানুভূতি আত্মাবনের বস্তু—ইহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। উচ্চস্তরের রসবস্তু বাক্য দ্বারা প্রকাশ পায় না; ইহা চোখ দিয়া, মুখ দিয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনার দ্বারা সাধারণ মাত্র প্রকাশ পায়। নরনারীর দেহের ও মনোভাবের তারতম্যের জন্য প্রকাশও বিভিন্নভাবে হয়। উচ্চস্তরের রসবস্তু কেবলমাত্র উদ্বোধক দ্বারা, মাত্র আভাসইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ পায়। কারণ এ ভাব প্রকাশ করিবার ভাষার আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। ভাষা সে স্থানে অচল—বাক্যের অগম্য সে-স্থান। সেইজন্য শিল্পী তাহার বিষয়বস্তুর ভিতর মৃদু ভাব-আভাস দ্বারা, উদ্বোধক দ্বারা মানবমনকে—দ্রষ্টাকে উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। এইখানে প্রত্যেকের জানা উচিত শিল্পী খানিকটা পথ উদ্বোধক দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারেন মাত্র, কিন্তু বাকী পথ দ্রষ্টাকে ও শ্রোতাকে সেই আভাস-ইঙ্গিতকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই সর্ব্বদেশের সর্ব্ব উচ্চস্তরের শিল্পীদের সনাতন পথ।

নারীকে কর্ম্মঠা ও শক্তিশালিনী করিবার জন্য বঙ্গদেশে নানাস্থানে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও ভবিষ্যতেও যথেষ্ট উঠিবে। বর্ত্তমানে নারীজাতি স্বাবলম্বী হইবার জন্য নানা শিল্পের চর্চ্চা করিতেছেন। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতেছে—অতীতে বঙ্গনারীরা শিল্পজগতে কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহারই যৎসামান্য আভাস দেওয়া। বর্ত্তমানকে শক্তিশালী করিতে হইলে অতীতের জ্ঞান থাকা অতীব প্রয়োজন। অতীতের গর্ভ হইতে বর্ত্তমানের উৎপত্তি। যাঁহারা অতীতকে ঘৃণার চক্ষে পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানের সংস্কারপ্রয়াসী তাঁহারা প্রায়ই বিফলমনোরথ হইয়াছেন।

চিত্রকলা

নরনারীর স্বভাবই হইল চিত্র করা। ইহা তাহাদের সহজাত বৃত্তি। মানসিক বৃত্তি যাহা রহ ও তুলির দ্বারা পটে অঙ্কিত হয় তাহার নাম চিত্র: এবং এই বৃত্তি যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহার নাম কাব্য। মানবমন, হয় মানসিক বৃত্তি নয় বাহ্যিক দৃশ্য, পটে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিবে। চিত্রকলায় মানবমন আনন্দ পায়। চিত্র দেখিবার জন্য পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী ও নির্ধন সকলেই ব্যগ্র। সকলেই মুগ্ধচিত্তে চিত্র দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করে। কবি ও চিত্রকরের উদ্দেশ্য এক, শুধু পন্থা বিভিন্ন। দু'জনারই উদ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করা। উভয়েই সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টি দ্বিবিধ—দেবী ও আসুরী। যাহা দ্বারা সমাজে মঙ্গল সাধিত হয় তাহা দেবী এবং যাহা দ্বারা সমাজে অকল্যাণ হয় তাহা আসুরী। সেই জন্য স্রষ্টা দুই প্রকার—প্রেয়স্কাম ও শ্রেয়স্কাম। যাহার সৃষ্টিতে সমাজে অশান্তি আনয়ন করে তাহার নাম প্রেয়স্কাম এবং যাহার সৃষ্টির দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয় তাহার নাম শ্রেয়স্কাম। চিত্রকলার ডাকনাম হইল ছবি। যদিও এই বাংলা তথা ভারতবর্ষে একদিন চিত্রকলার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ চিত্রকলার উদ্দেশ্য কি এবং ইহা দ্বারা সমাজে কি মঙ্গল সাধিত হয় সে বিষয়ে এখন সম্পূর্ণ অজ্ঞতিজ্ঞ। জনসাধারণকে এ বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা কলাবিদ্‌দের বর্ত্তমানে প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। ইহার ফলে উভয়েরই কষ্টের লাঘব ও সুবিধা হইবে।

মানুষ যে সমাজের বা ধর্ম্মেরই অন্তর্গত হউক না কেন, চিত্র অঙ্কিত করিবার, দেখিবার এবং নিজগৃহে রাখিবার প্রবৃত্তি তাহার সহজাত। মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময় সময় কোন বাহ্যিক জড়শক্তি তাহার সুকোমল বৃত্তিগুলিকে কিছুদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া রাখে। শিক্ষার প্রভাবে সেই বাহ্যিক জড়তা যখন তিরোহিত হয় তখন আবার সেই সুকোমল সহজাত বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হয়। চিত্রকলা অতি প্রাচীন পদ্ধতি। জগতে কোন্ সময় আদিম মানব প্রথম চিত্রের রেখাপাত করিয়াছিল সে বিষয় এখন অজ্ঞাত। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় অতি প্রাচীনকালে যাহারা বাস করিত তাহারা একখণ্ড কাঠের কয়লা দ্বারা নানা জীবজন্তুর ছবি আঁকিত।

বনে শিকার করিতে করিতে যে সব জন্তুর সাক্ষাৎ মিলিত, তাহারা তাহাদেরই নকল করিবার জন্য ঘরে বসিয়া অঙ্কন অঙ্কিত করিত। ইহাতে তাহারা এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আনন্দ পাইত। জীবজন্তুর নকল করিবার প্রেরণাই ছিল প্রথম উদ্দেশ্য এবং ও সাথে অজানা এক আনন্দ জড়িত থাকিত। চিত্রবিদ্যার ইতিহাসের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায় বাহ্যিক দৃশ্য অঙ্কিত করাই ছিল ইহার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। হয়ত বা এই বাহ্যিক দৃশ্যাঙ্কন করিবার মূলে কোন সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যাখ্যা থাকিতে পারে। তাহাদের অঙ্কিত যে সমস্ত চিত্র আজও দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি সুন্দর এবং চমৎকার। এই সমস্ত চিত্র নর ও নারী উভয়েই অঙ্কিত করিত। নর ও নারীর চিত্র অঙ্কিত করিবার এই সহজ প্রবৃত্তি নানা স্তরের ভিতর দিয়া বর্তমানে চিত্রকলা নামে অভিহিত হইয়াছে।

উল্কি

গায়ে উল্কি দ্বারা সজ্জিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করা অতীব প্রাচীন প্রথা। সমস্ত কার্য্যের মূলে আনন্দ রহিয়াছে; আনন্দ ব্যতিরেকে মানব কোন কর্ম্মই করিতে পারে না,—কর্ম্মে আনন্দ পাইতেছে বলিয়াই সে কর্ম্ম করিতেছে। নর ও নারী অতি প্রাচীন কালে উল্কি দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করিত। বর্তমানেও এ প্রথা সমাজে অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। নর-নারীর গাত্রে অলঙ্কার দ্বারা শোভিত হইবার স্পৃহার মূল উৎস হইল—এই উল্কি। এই উল্কিই কালক্রমে স্বর্ণালঙ্কারে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে শিক্ষার তারতম্যে নরসমাজে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। অলঙ্কার মানেই শোভা। অবশ্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহারের মূলে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও যথেষ্ট আছে।

চিত্রকলার সংজ্ঞা

এখন প্রশ্ন হইতেছে চিত্রকলা (painting) কাহাকে বলে? এ বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত আছে। ভারতবর্ষের মত এস্থলে আলোচনা করা সুশোভন। জনৈক শিল্প-সমালোচক লিখিয়াছেন, "Painting an attempt to represent or reproduce a picture of the mind through colour or lines or by certain suggestives, or painting might be called a system of philosophy written out by symbols and colours."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানসিক বৃত্তিকে রং এবং রেখার দ্বারা প্রকাশ করার নামই হইল চিত্রকলা। বর্ত্তমানে চিত্রকলার একটি নিজস্ব দর্শনশাস্ত্র আছে—নিজস্ব নিয়ম কানুন আছে। চিত্রকলাজগতে আজ ইহা প্রভূত কল্যাণ সাধিত করিতেছে। মোটেই ইহা অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নহে; মানবসমাজে ইহার একটি গভীরতম উদ্দেশ্য আছে। চিত্রবিদ্যা জনসাধারণের ভিতর শিক্ষাবিস্তারেরও একটি উৎকৃষ্টতম পন্থা। চিত্রকলার প্রচার ও প্রসার দ্বারা জাতি শোভন ও শক্তিশালী হয়।

আল্‌পনা

চিত্রকলায় বঙ্গনারী যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। বঙ্গনারীর চিত্র অঙ্কিত করা যেন একটি নেশা। সর্ব্ব-কার্য্যের ভিতর একটি সুশ্রী চিত্র অঙ্কিত করাই ইহাদের একমাত্র কামনা। আল্‌পনা একটি বিশিষ্ট চিত্রকলা। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ভিতর বঙ্গনারী অদ্বিতীয়া। বঙ্গদেশের প্রতি শুভকার্য্যে আল্‌পনার প্রয়োজন হয়। ইহা ভাল কাঠের পিঁড়ার উপর বা ভাল ঘরের মেঝে বা উঠানের উপর দেওয়া প্রচলিত আছে। এই আল্‌পনার ভিতর দিয়া বঙ্গনারীরা নানাপ্রকার চিত্র নিত্য অঙ্কিত করিয়া থাকে। বাংলা-দেশে যত পূজাপার্ব্বণ আছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তত নাই। সেজন্য বঙ্গনারীরা তাহাদের চিত্রকলার উৎকর্ষ লাভ করিবার যেরূপ সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে অন্যান্য প্রদেশের নারীরা তত পায় নাই এবং এজন্য অন্য প্রদেশের নারীরা বঙ্গনারীর সহিত এ বিষয়ে সমকক্ষ নয়। নারী-জাতির ইহা স্বাভাবিক বৃত্তি। ইহা দ্বারা নারীজাতির সংবৃত্তিগুলি বিকাশ পায়, উন্নত হয়।

এই আল্‌পনার ভিতর নানা বস্তু বা বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করা হয়। আল্‌পনা দেওয়া বঙ্গনারীর

পূর্ব্বের ও ভাষার কথা। ইহা লইয়া আমাদের নারীমহলে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন তাঁহাকেই প্রতি শুভকর্ম্মে গ্রামবাসীরা নিমন্ত্রণ করে—ইহা নারীজাতির মহা সম্মানের নিমন্ত্রণ। সেজন্য আল্‌পনা দিবার সময় বঙ্গ-নারী তাঁহার সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া সফলতা লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ইহার ভিতর শুধু যে নানাপ্রকার বস্তু, পক্ষী বা জন্তুর চিত্র অঙ্কিত করেন তাহা নয়; ইহা ছাড়া বঙ্গনারীরা নানাপ্রকার ঠকান কৌশল অঙ্কিত করিয়া থাকেন এবং পারিপার্শ্বিক ব্যাপারবিশেষও অঙ্কিত হয়। এই আল্‌পনা লইয়া একটি বৃহৎ পুস্তক লেখা যায়। এত-প্রকারের আল্‌পনা আছে যে তাহাদের নাম ঠিক করাও মুস্কিল। এই আল্‌পনাকে অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার ছড়ার প্রচলনও হইয়াছে—শুনিতেও সেগুলি বেশ মিষ্ট। আল্‌পনার ভিতরকার চিত্রের উদ্দেশ্য বা অর্থ সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য ছড়ার উৎপত্তি। বঙ্গনারীর চিত্রকলা জানিতে হইলে প্রথম আল্‌পনা জানিতে হইবে।

পট

পটুয়া শ্রেণী ছাড়াও, পটের উপর চিত্র বঙ্গনারীরা অঙ্কিত করিত। দেব-দেবীর মূর্ত্তি লইয়া এই সব চিত্র অঙ্কিত হইত। সত্তর- আশী বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গনারীর হাতের অঙ্কিত চিত্র এখনও অনেক প্রাচীন গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। দেয়ালের গাত্রের চিত্রও (mural painting) তাহারা অঙ্কিত করিত। এখনও এ বিষয় বাংলাদেশে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে অনেক নারী চিত্র-কলা শিক্ষালাভ করিতেছেন। ইঁহাদের কিছু কিছু চিত্র প্রদর্শনীতে দেখান হয়। নারীজাতির চিত্রকলা ভালভাবে শিক্ষালাভ করা উচিত। ইহাতে নারীজাতির এবং চিত্র-কলার নূতন জগৎ সৃজন হইবে। স্বভাবতঃ পুরুষেরাই এ বিষয় আলোচনা করেন; নারী নামে মাত্র। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত হয় তাহার মধ্যে শত-করা আশীখানি চিত্র নারীচরিত্র লইয়া অঙ্কিত হয়। পুরুষ-চিত্রকরেরা যদি কেবলমাত্র নারীর মনস্তত্ত্বই অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহারা ত সে বিষয়ে বিফলমনোরথ হইবেনই এবং তৎসাথে নিজেদেরও চিন্তাশক্তির দুর্ব্বলতা জানান করিবেন। নারীর দ্বারাই নারীর মনস্তত্ত্ব আলোচনা সম্ভবপর। আজিকার দিনে পুরুষ-শিল্পীরা যদি বীর্য্যবান্ শক্তিমান্ ভাব চিত্রের দ্বারা দেশের মধ্যে বিস্তার করিতে পারেন তবে তাঁহারা দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত করিবেন। পরাধীন জাতির শিল্পীর নিকট শিল্পকলা বিলাসিতার সামগ্রী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বঙ্গনারীরা যদি এ বিদ্যা সাগ্রহে গ্রহণ করেন তাহা হইলে চিত্রজগতে নূতন সম্পদ সৃষ্টি হইবে এবং ইহাতে অর্থের দিক দিয়াও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। একজন বড় শিল্পবিদ্ সত্যই লিখিয়াছেন, "In painting, sculpture and clay-moulding woman is found to surpass man in many respects, as they require a delicate touch and clear knowledge of the differences in colours, and the woman has an instinctive aptitude for the selections of colours. If painting and similar other arts be taught her, she will go ahead of the malefolk of the community."

চিত্রকরের উপর জাতির মান-মর্য্যাদা নির্ভর করে। চিত্রকর মনে করিলে জাতির উত্থান-পতন করাইতে পারেন। সু-চিত্রকর হইলেন—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সঙ্গীত

পূর্ব্বে বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত ছিল—কীর্ত্তন ও শ্যামাসঙ্গীত বাংলার জলবায়ু ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। বাংলা শ্যাম ও শ্যামার দেশ। কীর্ত্তন ও শ্যামাসঙ্গীত দুইই ভক্তিরসের সঙ্গীত। ইহাই হইল বাংলা-দেশের নিজস্ব সঙ্গীত। বোধহয় রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গীতচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করেন। বর্ত্তমানে বাংলা ভাষায় বহুপ্রকৃতির ভাবপ্রকাশক সঙ্গীতচর্চ্চা হইতেছে। আদান-প্রদানে জাতি শক্তিমান হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে সেই সমাজ বলবান হইবেই। বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার দ্রুত উন্নতির মুখ্য কারণ হইল বহির্জাতির সহিত আদান-

প্রধান। সঙ্গীতচর্চ্চা করা নারীজাতির সহজাত বৃত্তি। বাংলাদেশে পূর্ব্বে বৌদ্ধপ্রাধান্য ছিল। বাংলার অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর বৌদ্ধভাব ওতঃপ্রোত ভাবে মিশান আছে। যদিও "গম্ভীরা"র উৎসবকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গনারীরা নানাস্থানে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন, কিন্তু সঙ্গীত-চর্চ্চার পূর্ব্বে বঙ্গনারীরা কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই, করিবার উপায়ও ছিল না। তখনকার সামাজিক মনস্তত্ত্ব নারীর সঙ্গীতচর্চ্চার বিপক্ষে ছিল। তখনকার দিনে বঙ্গ-নারী নৃত্য বা গীত করিলে সমাজে তাহার অপযশ হইত। নরসমাজে তাহার চরিত্রের দুর্নাম পর্য্যন্ত বহুমুখে শতধারায় বহিত। স্বেচ্ছায় কেহই সহজে দুর্নাম বহন করিতে চাহে না। রাজা রামমোহন রায় প্রথম গতানুগতিক জীবনধারা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নব-জাগরণের তিনিই প্রথম গুরু। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আজ বঙ্গসমাজে মনো-বৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জাগরণের ইহাই স্বাভাবিক পন্থা। জাগরণের চিহ্নই হইল নরনারীর সুপ্রবৃত্তি বিকাশের সর্ব্বপথমুক্তি। সমাজ তখন বিকাশের পথের পরিচালক হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী লইয়া মাথা ঘামাইবার তখন তাহার সময় থাকে না। বিরাটের তখন সে পূজারী। আজ নারী সঙ্গীত গাহিলে কেহ অপযশ গাহিবে না। সমাজ আজ নারীর সঙ্গীতচর্চ্চার সহায়ক। আজ বঙ্গনারীর সঙ্গীত চর্চ্চার বিশেষ প্রয়োজন। সঙ্গীতচর্চ্চার দ্বারা জাতি কৃষ্টি-বান হয়। সঙ্গীতচর্চ্চা মানবমনকে সুখদুঃখের অতীতা-বস্থায় লইয়া যায়। সাধক-জীবনেও ইহা মহা ফলদায়ক। ইহার চর্চ্চা নারীজাতির মঙ্গলপ্রদ।

সঙ্গীতচর্চ্চার প্রবৃত্তি মানব কাহারও নিকট হইতে শিক্ষালাভ করে নাই। ইহা তাহার সহজাত বৃত্তি। সঙ্গীতচর্চ্চার ছন্দ সাতটি প্রাণীর নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। স্বরের ছন্দ ও সঙ্গীতের ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্বরের ছন্দ সরিৎবরার হিল্লোল-কল্লোল হইতে উৎপন্ন। সঙ্গীতের ছন্দ পশুপক্ষীর ডাক হইতে সংজাত। ষড়জাদি সপ্তসুর পশুপক্ষীর ডাক। সাতটি পশুপক্ষীর নাম হইল— ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ঘোটক ও হস্তী। ইহাদেরই সুসজ্জিত নাম হইল – ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। প্রথমে সঙ্গীতের সৃষ্টি, তার পর তান-লয়ের উদ্ভব। সঙ্গীত শিক্ষালাভ করিতে হইলে সংযমী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সংযমী ব্যক্তি ব্যতীত উচ্চ-স্বরের গায়ক হয় না। সঙ্গীতচর্চ্চা মহা পবিত্র বস্তু। সাধক সঙ্গীতচর্চ্চা দ্বারা তাঁহার ইষ্ট দর্শন করেন।

নৃত্য

নৃত্য করিবার প্রবৃত্তিও নরনারীর হৃদয়বৃত্তির স্ফুরণ হইতে নরনারী নৃত্য করে। নৃত্য করিলে মানব বড়ই আনন্দ অনুভব করে। নৃত্য তিন প্রকার – ধর্ম্ম, দেবনৃত্য, নরনৃত্য ও কামনৃত্য। মানবমন যখন উচ্চস্তরে গমন করে তখন তাহার দেহে একপ্রকার পুলক হয়। এই পুলকই তাহাকে সমতালযুক্ত নৃত্য করায়। সাধক সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে ভালবাসে। এই নৃত্যের নাম হইল দেবনৃত্য। "নটরাজের" মূর্ত্তি হইল এই ভাবের উচ্চ বিকাশ। যাঁহারা দাক্ষিণাত্যের নটরাজের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাঁহারা দেবনৃত্যের ভাব বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সাধকগণ এই-প্রকার দেবনৃত্য করিতেন। উচ্চ ভাবের সহিত মানবের বাহ্যিক আবরণ পরিবর্ত্তিত হয়। যে দেবরূপভাবে হৃদয়ে চিন্তা করিবে তাহার বাহ্যিক দেহের আবরণও সেইরূপ হইবে। মন করে রচনা। মন মানে—ভাব। উন্মাদ হইতে সাধকদের যে নৃত্য করিবার স্পৃহা জাগে তাহার নাম হইল নরনৃত্য। নীচ প্রবৃত্তি উদ্দীপক যে নৃত্য তাহার নাম হইল কামনৃত্য। নর ও নারী উভয়েই চিরকাল নৃত্য করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানেও নর অতি উচ্চস্তরের নৃত্য দেখা-ইতেছে। নারীজাতির সুধার্জ্জিত নৃত্য অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। রসতত্ত্ব-ব্যতীতও, নৃত্য হইল একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। নারীজাতির পক্ষে নৃত্য ও সন্তরণ উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। নৃত্য করিতে হইলে দেহের সমস্ত পেশীর সঞ্চালন করিতে হয়। পেশীসঞ্চালনের দ্বারা স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং সুগঠন দেহের লাবণ্য ফুটে। নারীজাতির সুস্থ ও সবল দেহ রাখিবার পক্ষে নৃত্য একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ব্যায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল স্বাস্থ্য ভাল রাখা।

আনন্দের হাটে নৃত্যের আসর বসে। পূর্ব্বে বিবাহোৎ-সবে, বসন্তোৎসবে ও নানা দেবদেবীর উৎসব উপলক্ষে নারীরা নৃত্য করিত। এখনও দাক্ষিণাত্যে সন্ধ্যাকালে নিত্য

প্রাচীন যুগে নারীরা কোন কোন ঋতুকে ঘিরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। তৎকালীন সমাজবিন্যাসের জন্য পূর্ণে বঙ্গনারীরা নৃত্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই; দেখাইবার উপায়ও ছিল না। নৃত্য করিলে সমাজে অপযশ রটিত। এখনও এই মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ শিক্ষিত সমাজ হইতে বিদূরিত হয় নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে মতপরিবর্তন হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষা ও কৃষ্টির তারতম্যে মানবের world-view পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমানে বঙ্গনারীর (নারীসমাজে) নৃত্য অভ্যাস করা কল্যাণপ্রদ হইবে। আজ নারী সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তজ্জন্য তৎসমাজে ইহার প্রচলন কষ্টকর হইবে না। বর্ত্তমানে বঙ্গনারীকে নৃত্য শিক্ষালাভ করিতে হইলে প্রাচীন ভারতের নৃত্য সম্বন্ধে পুস্তকাবলী পাঠ ও চিত্রগুলি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করা উচিত। এ

আরম্ভ করিতে হইলে পুস্তকপাঠ অপেক্ষাও চিত্রপাঠ করা বিশেষ কলপ্রদ। চিত্রে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমা-গুলি সরলভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পুস্তকপাঠ হইতে চিত্রে pose-এর জ্ঞান শীঘ্র লাভ হয়। Pose হইল নাটক, নৃত্য ও চিত্রের মেরুদণ্ড। যাহার যত ভাল pose দিবার শক্তি থাকিবে সেই তত সফলকাম হইবে। নর ও নারীর pose (অধিষ্ঠান) দিবার ভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। নৃত্য দ্বারা নানা মূর্ত্তি (figure) দেখান হয়। সময় সময় নৃত্য দ্বারা মানবজীবনের সময়-বিশেষের ঘটনাবলী প্রকাশ করা হয়। নৃত্য দ্বারা মানবমনের নানা স্তরের নানা ভাব প্রকাশ করা যায়। যাহার যত পেশীশক্তি বশে আনয়ন করিবার শক্তি থাকিবে তিনি তত ভাল নৃত্যকার হইবেন। জাতির মানসিক চিন্তারাশির উপর তাহার সমাজবিন্যাস ঘটে; তজ্জন্য প্রত্যেক জাতির কলাজ্ঞানও স্বতন্ত্র ছিল। বর্ত্তমানে পরস্পরের ভিতর ভাবের আদান-প্রদানের ফলে অল্পবিস্তর সকলের চিন্তা-জগতের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রায়ত সকল জাতির নৃত্য-উৎসব হইল এক শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যা। নৃত্য দ্বারা নারীর দেহ ও মন সুস্থ থাকিবে।

সূচিকার্য্য

সূচিকর্ম্ম দ্বারা কাপড়ে নানাপ্রকার ফুল, পাতা, বাড়ী, বাগান, জীবজন্তু প্রভৃতি অঙ্কিত করায় বঙ্গনারীর অদ্ভুত কৃতিত্ব। পটের উপর রঙ ও তুলির সাহায্যে চিত্রকর যেমন চিত্র অঙ্কিত করেন সেইরূপ সূচি ও সুতার সাহায্যে বঙ্গনারী নানাপ্রকার নয়নমনোমুগ্ধকর ছবি ফুটাইয়া তুলেন। সামান্য অপ্রয়োজনীয় কাপড় লইয়া সূচিকার্য্যের সাহায্যে তাঁহারা অঙ্গের রূপ ফুটাইয়া তুলেন। দৃষ্টান্ত—ছোট ছোট কাঁথা তৈয়ারি। যে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ছিন্ন পরিধেয় সচরাচর মানুষে পরিত্যাগ করে তাঁহারা সেইগুলি লইয়া তাঁহাদের সূচিকর্ম্মের কৌশল দ্বারা এমন সুশ্রী নানা-প্রকার কাঁথা তৈয়ারি করেন যে তাহা জগতের যে কোন কলাবিদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইতে পারে। অশোভনকে শোভনে পরিণত করাই হইল শিল্পীর শিল্পিত্ব। সাধারণ ব্যক্তি যে বস্তুকে অকেজো, বাজে বলিয়া পরিত্যাগ করে সেই বস্তুই শিল্পীর হস্তে নব সৌন্দর্য্যের রঙে রঞ্জিত হইয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া সম্মানিত হয়। শিল্পী প্রকৃতির অনুকরণ করে না; কারণ প্রকৃতিকে (nature) অনু-করণ (copy) করা যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও শিল্পীর দৃশ্য স্বতন্ত্র রসবস্তু। মাঠে গরু ঘাস খাইতেছে ইহা হইল প্রাকৃতিক দৃশ্য; এ দৃশ্য দেখিয়া আমরা আনন্দ উপ-ভোগ করি না—কিছু জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি না। কিন্তু এই দৃশ্যটি যখন শিল্পী তাঁহার মন হইতে প্রকাশ করেন তখন দেখিবার ও জানিবার জন্য আমাদের আর আগ্রহের সীমা থাকে না। শিল্পীর চিত্রে আনন্দ মাখান থাকে। ইহাই হইল শিল্পীর শিল্পিত্ব। সৎসাহস ও সৎবৃত্তি শিল্পীর একান্ত প্রয়োজন।

কাঁথা ও দোলাই

অল্প খরচে কৌশল দ্বারা সুশ্রী ও সুন্দর জিনিষ সম্পাদন করিবার শক্তি বঙ্গনারীর অসীম। সুযোগ ও সুবিধার অভাবে অনেকে তাহাদের স্বাভাবিক সুকোমল বৃত্তগুলিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারে না। পরিত্যক্ত কাপড়ের পাড় হইতে নানা রঙের সুতা বাহির করিয়া পরি-ত্যক্ত কাপড়গুলি লইয়া সূচিকর্ম্ম দ্বারা শীতকালে গায়ে দিবার জন্য বড় কাঁথার সৃষ্টি বঙ্গনারীর সূচিকার্য্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। পূর্ব্বে শীতকালে গায়ে কাঁথা দিবার প্রচলন ছিল। প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রয়োজনানুযায়ী দোলাই ও কাঁথা

নিজগৃহে তৈয়ারি করিত। এখনকার মত ব্যাপার তখন প্রচলিত ছিল না। বঙ্গনারী তাঁহাদের সুবিধামত সময়ে নিত্য সামান্য সূচিকর্ম দ্বারা এই দোলাই ও কাঁথা তৈয়ারি করিতে পারেন। গায়ে দিবার এই দোলাই ও কাঁথা একটি দেখিবার বস্তু। ইহা এত দেখিতে সুন্দর হয় যে ধনী ব্যক্তিকেও শাল ত্যাগ করিয়া কাঁথা ব্যবহার দ্বারা আনন্দ অনুভব করিতে হয়। তাঁহারা সংসারধর্মের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া এইরূপ সৃষ্টি করিতেন। ইহা নানা-প্রকার হয় এবং ইহাতে নানাপ্রকার কারুকার্য থাকে। দূর হইতে ইহা দেখিলে সময় সময় সুস্থ চক্ষুতেও ভাল কাশ্মীরী শাল বলিয়া ভ্রমে পড়িতে হয়। ইহা বঙ্গনারীর গার্হস্থ্য, সৌন্দর্যের ও সম্মানের সামগ্রী। বর্তমানে দুঃস্থা নারীরা যদি এইরূপ ভাল ভাল কাঁথা তৈয়ারি করিয়া বাজারে বিক্রয় করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কিছু অর্থও লাভ হইতে পারে।

রেশম ও জরীর কাজ

তাঁহারা রেশমের কাজ, জরীর কাজও ভাল রকম জানিতেন। আসন ও ঘরের বিছানা প্রভৃতিতে বঙ্গনারীরা তাঁহাদের কার্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চাকাই চাদর ও কাপড়ে ফুল তোলাতে (চিড়িয়া-বুটি ইঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঢাকাই মস্‌লিন্ ও হাতেকাটা সুতার প্রস্তুত কাপড় সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। ছাঁচের কার্যও (moulding) খুব ভাল জানিতেন। নানা ফুলের, ফলের ও জন্তুর ছাঁচ তৈয়ারি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন। তুলার দ্বারা তৈয়ারি পুতুল ও খেলনা বিক্রয় করিতেন। ইহাতে সামান্য সামান্য অর্থও সঞ্চয় হইত। ইহা ব্যতীত সুতা দ্বারা তৈয়ারি সালি, খুকেপোষ, সুজনী ও হাতপাখার ঝালর,—বেতের দ্বারা, বাঁশের চ্যাচারির দ্বারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিত্য তৈয়ারি করিতেন।

প্রতিমা ও কেশবিন্যাস

বাল্যকাল হইতেই বঙ্গনারী প্রতিমা গড়িতে অভ্যস্ত। ছেলেবেলা হইতে ন্যাকড়া পুতুল, বুড়ি পুতুল, আল্‌তাদী পুতুল প্রভৃতি ইঁহারা সুন্দর ভাবে গড়েন। সোলা দ্বারা নানা ফুল, ফল, পাখী, জন্তু ও পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়া থাকেন। কড়ি দিয়া নানা প্রয়োজনীয় বস্তু ইঁহারা তৈয়ারী করিতেন। কড়ির আসনা, পাটরা, সিকে ও মশারির ঝালর প্রভৃতি সুন্দরভাবে তৈয়ারী করিতেন। এ সমস্ত জিনিষ আজকাল সমাজে চলিত নাই। কিন্তু বাংলাদেশে পূর্বে এইসব কাজ খুব চলিত ছিল। বঙ্গনারীরা কলাবিদ্যার পরিচয় দিয়া থাকেন—বিবাহের ফুলসজ্জার তত্ত্বে। এই ফুলসজ্জার তত্ত্বে ইঁহারা নানাপ্রকার কৌশল দেখাইয়া থাকেন। এই তত্ত্বের ভিতর পানের ফুলবাগান, ঘরের ফুলবাগান, কড়ি ও সুপারির ফুলবাগান, পাণ ও সুপারির খাড়লণ্ঠন প্রভৃতি বহুবিধ কারুকার্য দর্শাইয়া থাকেন। ইহাকে তাঁহারা চলিত কথায় শিন্নি-(শিল্প) কার্য বলেন। এই ফুলসজ্জার তত্ত্বে বাগানের চাঁস, চানার হাতী, সন্দেশের নানা মূর্তি গঠন করিয়া কলাবিদ্যার সুন্দর পরিচয় দিয়া থাকেন। বিবাহে ছিরিগড়া ইঁহাদের অন্যতম সুন্দর কলাবিদ্যার পরিচয়। মুখসজ্জা ও কেশবিন্যাসেও ইঁহারা যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। এরূপ কেশবিন্যাসের পারিপাটা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এক খোঁপারই নাম কত,—বুটকি খোঁপা, বুটকি খোঁপা, হেলে খোঁপা, ফিরিঙ্গী খোঁপা, বিউনি খোঁপা, টিয়াপাখী খোঁপা, চূড় খোঁপা, পেতেপাড়া খোঁপা, সিঁথিকাটা খোঁপা, চাটাই খোঁপা, প্রজাপতি খোঁপা, ধারের সিঁতে খোঁপা, এলবার্ট খোঁপা ইত্যাদি। পশমের কার্য ইহাদের নিকট কিছুই নহে। পশম দ্বারা নানা-প্রকার ছবি, আসন, খেলনা গোলাপপাসের কারপা ও হুঁকার বৈঠক প্রভৃতি ইঁহারা সুন্দর ভাবেই তৈয়ারি করিয়া থাকেন। রন্ধনের কার্যে বঙ্গনারী সিদ্ধহস্তা। এক নারিকেলচূর্ণ দিয়াই নানাপ্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ারি করিয়া থাকেন। এ বিষয় বলিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘকলেবর হইয়া যাইবে; তজ্জন্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। বঙ্গনারীর কলাবিদ্যার পরিচয় আমি সামান্যই এস্থলে উল্লেখ করিলাম। ইহা ব্যতীতও তাঁহাদের যথেষ্ট কলাবিদ্যার পরিচয় আছে।

বর্তমানে নানাপ্রকার কলাবিদ্যার আমদানি হইয়াছে। আজকাল নারীরা ঐ সকল কলাবিদ্যার অনেকগুলিই উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতেছেন। বাংলাদেশে সহরগুলি

হইত না। বর্ত্তমানে কোন কোন নারী কাপড়ের পাড়ের দ্বারা এমন সুন্দর সতরঞ্চি তৈয়ারি করিয়াছেন যে তাহা একটি দেখিবার জিনিষ হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের পক্ষে গৌরবের সামগ্রী। কেহ কেহ নারিকেল-বাল্‌দের কাঠি লইয়া সুন্দর সুন্দর Straw-hut, Wastepaper-box প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়াছেন। কেহ কেহ শঙ্খকে নানা প্রকারে রঞ্জিত করিয়া কলাবিদ্যার পরিচয় দিতেছেন। চাল দিয়া, মাংসের আঁশ দিয়া, ডাল, তিল প্রভৃতি দিয়া চিত্র সৃষ্টি করা বর্ত্তমানে ইঁহাদের নিকট কিছুই নয়। আসনের উপর পশম দ্বারা ছয় সাত হস্তের বাঘ বা সিংহের মূর্ত্তি চিত্র করাও অধুনা ইঁহাদের নিকট অতি সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক নারীরা প্রত্যেক জিনিষ খুব সরু সরু করিয়া কাটিতে পারে। বর্ত্তমান নারীপ্রদর্শনীতে ইহা একটি দেখিবার বস্তু। বঙ্গনারী শিক্ষা, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে কলাবিদ্যার জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন। ইহা স্তুতিবাক্য নহে—অতীব সত্য।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্গনারীর চিন্তাধারার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। আদান-প্রদানে জাতির ভিতর নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা হইল যান্ত্রিক সভ্যতা। যান্ত্রিক সভ্যতায় জিনিষ-পত্র খুব প্রচুর উৎপাদন হয় এবং সেজন্য জিনিষের মূল্যও সস্তা হয়। যান্ত্রিক সভ্যতায় ধনী দিন দিন প্রচুর ধনশালী হয় এবং সাধারণ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া যায়। আমরা কৃষকজাতি; কুটীরশিল্প আমাদের প্রাণ। কুটীর শিল্প যান্ত্রিক শিল্পের সহিত অবাধ প্রতিযোগিতায় হটিয়া যায়। বর্ত্তমান জগতে স্বাধীন দেশেও অবাধ প্রতিযোগিতায় যান্ত্রিক শিল্পই যান্ত্রিক শিল্পের নিকট নত হইয়া যাইতেছে; ফলে স্বাধীন দেশে যাঁহারা যান্ত্রিক শিল্পকেই একমাত্র সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক মনে করিয়াছিলেন তথায়ও বেকার-সমস্যা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। পরাধীন জাতির শিল্প স্বাধীন জাতির শিল্পের নিকট অবাধ প্রতিযোগিতায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুটীরশিল্পই হইল জাতির মেরুদণ্ড। কুটীরশিল্প ও যান্ত্রিক শিল্প এই দুয়ের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ে জাতি জাগ্রত ও বলবান হয়। দরিদ্র পরাধীন কৃষক-জাতি সহসা যান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নত হইতে পারিবে না; সময় যথেষ্ট লাগিবে। সেজন্য জাতিকে বাঁচিতে হইলে কুটীর শিল্পকে প্রথম রক্ষা করিতে হইবে। একমাত্র দৃঢ় আত্মবোধ এক্ষেত্রে কুটীরশিল্পকে রক্ষা করিতে পারে এবং তজ্জন্য জাতিকে নানা কৃচ্ছ্রসাধনা করিতে হইবে। কারণ, সর্ব্ব সভ্যতার মূল বিষয় হইল অন্ন। অন্নের উপর জাতির গতি নির্ভর করে। বিনা অন্নে কোন জাতি শক্তিমান হয় না।

বর্ত্তমান প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে বঙ্গনারীকে সজীব ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নানা কলাবিদ্যার শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইবে। এ কথা সত্য, উচ্চস্তরের কলাবিদ্যা সুলভ হয় না; কিন্তু এক্ষেত্রে যে কোন উপায়ে হউক জিনিষের মূল্য হ্রাস করিতে হইবে। বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে নারীদের শিল্পকলার প্রদর্শনী হইতেছে। নারীরা তাঁহাদের নানা রকমের কারুকার্য্য এই সব স্থানে দেখাইতেছেন। এই সব স্থানের জিনিষের মূল্য সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট বেশী। যদি সাধারণে জিনিষ না খরিদ করে তাহা হইলে অর্থাগম হওয়া কঠিন হইবে। সাধারণ হইল জাতির প্রাণ! সাধারণে জিনিষ ক্রয় করিলে অনেক দুঃস্থা নারী কষ্ট হইতেও পরিত্রাণ পায়।

বর্ত্তমানে বঙ্গনারীকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। অভাবগ্রস্ত বঙ্গনারীরা ক্ষুধার তাড়নায় দিন দিন হীনকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে যাইতেছে। নারীজাতির মানসম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইলে বঙ্গনারীকে ইহার পথ বাহির করিতে হইবে। কুটীরশিল্পে নারীজাতি স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে। আমাদের এখন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে যাহাতে স্থানে স্থানে প্রতিমাসে একটি করিয়াও বঙ্গনারীর শিল্পকলা-প্রদর্শনী হয় তাহার চেষ্টা করা। জনকয়েক ধনী-ব্যক্তি কৃপাদৃষ্টিতে নারীজাতির সামগ্রী কিনিবে এরূপ প্রদর্শনীর প্রয়োজন নাই। আজ উচ্চশিক্ষিতা নারীদের বৃথাগর্ব্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের ভগ্নীদিগের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। আভিজাত্যের দিন চলিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য চাই সৎসাহস, সহানুভূতি, বুকভরা ভালবাসা ও সর্ব্বোপরি অকৃত্রিম দৃঢ় স্বজাতীয়তা। নারীজাতি স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ। একবার যদি সুবিধা ও সুযোগ পায় তাহা হইলে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে।

অনুশীলনে অতীতের কলাবিদ্যা ভবিষ্যতে উজ্জ্বলতর হইবে।

জয়ী হইতে হইলে নানাস্থানে স্থায়ী প্রদর্শনী খুলিতে হইবে। প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিতে হইবে। নিজদেশজাত দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করিবার জন্য লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা জনমত গঠন করিতে হইবে। দেশজাত উৎকৃষ্ট কলাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বর্ত্তমানে নানাস্থানে অবৈতনিক শিল্পালয় খুলিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক শ্রেষ্ঠ কলা-বিদ্যাগুলিও আমাদের চিন্তাজগতে আনয়ন করিতে হইবে। সাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য মাঝে মাঝে pretical demonstration দ্বারা শিল্পবিদ্যা দর্শাইতে হইবে। বর্ত্তমানে লোকশিক্ষার ইহা একটি সুন্দর পন্থা। নূতনে সাধারণতঃ মানব আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য যত নূতন নূতন সুন্দর সুন্দর নক্সা প্রদর্শিত হইবে তত অর্থাগম হইবে। পূর্ব্বের বিলাসিতার সামগ্রীকে এখন ব্যবসায়জগতে আনিতে হইবে। অধ্যবসায় ব্যতীত সফলতা লাভ হয় না। বঙ্গনারীর আজ দৃঢ় অধ্যবসায় প্রয়োজন। আজ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। যাহাতে কলাবিদ্যার প্রসার দেশমধ্যে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। বিনা শিক্ষায় বর্ত্তমানে কোন জাতি সংঘর্ষে বাঁচিতে পারিবে না। মানব হিসাবে কেহই উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নয়; শিক্ষার অভাবে মানবের ভিতর কৃষ্টির তারতম্য হয়। আমরা যত শিক্ষা লাভ করিব আমাদের চিন্তাজগতও (world-view) তত বৃদ্ধি পাইবে। স্বাধীন সংস্কৃতি দ্বারা চালিত হইয়া আমরা দেশের শ্রী, সম্পদ ও সম্মান বৃদ্ধি করিব। আজ আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সঙ্ঘই হইল শক্তি। বঙ্গ-নারী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা সুরু করেন তাহা হইলে তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। বিলাসিতা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ কঠোর জীবনসংগ্রাম সম্মুখবর্ত্তী। বঙ্গনারী কি এই সংগ্রামে তাঁহাদের শক্তি প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হইবেন?

গাজনে আনন্দোৎসব ও ধর্ম্মমঙ্গলের প্রভাব

শ্রী মনমোহন নরসুন্দর

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত দিনগুলি যখন ধীরে ধীরে বাঙ্‌লার বুক হইতে বিদায় গ্রহণ করে এবং অপরদিকে নববর্ষ তাহার অজ্ঞাত রূপটি লইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্র-সর হইতে থাকে, তখন সারা বাঙ্‌লার উপরে দিক্‌দিগন্ত-কম্পিতকারী চক্কানিনাদের সঙ্গে শিবের ও ধর্ম্মের গাজন সকলকে মাতাইয়া তুলে। বহু যুগের শিক্ষা, সভ্যতা ও রুচি বিপর্য্যয়ের ঝঞ্ঝাঘাত অতি-প্রাচীন এই উৎসব-অনুষ্ঠানকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ম্লান করিয়া দিতে পারে নাই। ইহা আপামর-সাধারণ বাঙালী-জীবনের ধর্ম্ম, মঙ্গল ও নির্ম্মল আনন্দোৎসব-ইতিহাসের এক অধ্যায়। সে প্রাচীন ধারা আজ আর নাই; এখন তাহা ক্ষীণ, তরঙ্গ তাহার মৃদু। প্রতিঘাত হয় ত সামান্য, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, সভ্যতার প্রাচীন উৎসের সন্ধান করিতে গেলে, বাঙালীর বর্ত্তমান ধর্ম্মজীবন ও লোক-সাহিত্যের এই নিগূঢ়বদ্ধ আড়ষ্ট-তার মধ্যেও তাহার অতীত রূপটি ধরা পড়ে—ক্ষীণকায়া ধরাগঙ্গার মৃদু ধারা হিমালয়ের উৎসিত গোমুখী-প্রপাতের মতই আনন্দ দান করে। গাজনোৎসবের আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের সঙ্গে সভ্য শিক্ষিত বাঙালীর যোগাযোগ না থাকিলেও তাহাদের সরল বিশ্বাস সহজ আনন্দকে কেহই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, প্রকারান্তরে নানাভাবে তাহারিগকে সাহায্য করে এবং আংশিক আনন্দও উপভোগ করে।

গাজনোৎসবের আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের মধ্যে হাজ্‌কো চুকমত নৃত্যগীত উহার একটি অঙ্গ। গ্রামের বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন দল আসিয়া ধর্ম্ম বা শিবের মণ্ডপে উপস্থিত হয়। একজন ছড়াদার বা মূল গায়েন, দুই তিন জন ব্যঙ্গকর, নারীবেশে সজ্জিত দুই চারি জন পুরুষ এবং আরও কয়েক-

ছন্দে লোক লইয়া এক একটি দল গঠিত হয়। উহারা ঢাক, ঢোল, একতারা ও কাঁসি সহযোগে তালে তালে নৃত্যরত আরম্ভ করে। আবার কখনও বাজনা থামাইয়া শিব বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ছড়া বলিয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করে। কোন কোন দল ভূত-প্রেতের কাল্পনিক রূপে অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া নৃত্যে যোগদান পূর্ব্বক সকলের কৌতুক উৎপাদন করিয়া থাকে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ছড়াদার, মণ্ডপে সমবেত গ্রামের সমস্ত নরনারীর সম্মুখে, সারা বৎসরে অনুষ্ঠিত সামাজিক অপকর্ম্মগুলি পাঁচালীর ভঙ্গীতে বলিয়া যায়—কাহাকেও বাদ দেয় না বা খাতির করে না। একটি দিনের জন্য যেন তাহারা পল্লী-সমাজের নির্ভীক সমালোচক, তাহাদের সেই সমালোচনা যতই কঠোর বা গ্লানি রসিকতা পূর্ণ হউক না কেন কেহই তাহাতে রুষ্ট হয় না। অপকর্ম্মের উপর যেন কথার এই মিষ্ট মিষ্ট কশাঘাত সকলেরই আনন্দদায়ক - কাহারও মনে দুঃখ বা ক্ষোভের সৃষ্টি করে না অথচ বৃহৎ সংযমের জন্য সুদূরে প্রেরণা সঞ্চার করে।

নিষ্কোচ আত্মোদ্রেকপ্রমোদ সুন্দর ও পরিণত দেহমনের নিদর্শন। ইহা মানুষকে শক্তিসঞ্চয়ে সাহায্য করে, কর্ম্মে উৎসাহ দান করে। কর্ত্তব্যপূর্ণ কঠোর কর্ম্মজীবনে এগুলিকে সুশিক্ষিত ছাত্র, উচ্চ পদীয় বা বিজ্ঞ ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। এই নৃত্য ও গীত উভয়ই আমাদের জাতীয় প্রকৃতির 'লীলায়িত আত্মপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি'। সমগ্র মানবজাতির চরিত্র অনুসন্ধান করিলে মনে হয় ইহা মানবপ্রকৃতির 'ছন্দাত্মক ক্রীড়া বিশেষ'।—"মানুষ যখন জড়ত্বের ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রয়োজনাত্মক প্রবৃত্তি হইতে আপনাকে উচ্চস্তরে উত্তোলিত করিয়া আত্মার গভীর ও বিস্তৃত আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও লক্ষ্যের অভিব্যক্তি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করে তখনই তাহার প্রক্রিয়াগুলি ললিতকলার রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ললিতকলা মানুষের আত্মার মুক্তভাবেরই একটি লক্ষণ এবং মানবের আত্মার মুক্তভাব হইতেই ইহার উদ্ভব।"

এই জন্যই এই নৃত্যের কোনপ্রকার ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। নামসংকীর্ত্তনের গোপন অন্তরালে যে আনন্দরসের উদ্রেক হয়, বাহিরে তাহাই সহজ ও সরলভাবে লীলায়িত হইয়া দেখা দেয়। আধুনিক থিয়েটারের ললিত বিহ্বলপূর্ণ নর্ত্তকীর হাবভাব যেমন করিয়া লালসার উদ্রেক করে এই নৃত্যক্রীড়া তাহা করে না—ইহা সরল পল্লীকুলকের অনাড়ম্বর জীবনের আনন্দ-স্পন্দিত সহজ গতিপ্রবাহ মাত্র এবং নব বর্ষে পুরাতনের পুঞ্জীভূত জড়ত্বকে দূর করিয়া জীবনের পথে পাথেয় সঞ্চয় করিবার প্রকৃত উপায়।

গাজনোৎসবের নৃত্যগীতরূপ অনুষ্ঠানিক অঙ্গ—ধর্ম্ম ও শিবের সন্ন্যাসী বা ভক্তের সব চেয়ে বড় বস্তু নয়; তাহাদের সরল ধর্ম্মবিশ্বাস ও কষ্টসহিষ্ণুতাই দেখিবার বিষয়। শিক্ষিত বাঙালীর চক্ষে উহা অনুমনের বিবেচনারহিত অন্ধবিশ্বাস বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু তবু সেই বিশ্বাস, অলৌকিকত্ব, দৈবানুগ্রহ লাভের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরতাকে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। উহা অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে আপনার স্থানটুকু দখল করিয়া বসে।

ইহাকে ভিত্তিহীন অনার্য্যের পূজা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বাঙালী ধর্ম্মভীরু জাতি—তাহার প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক আচার-অনুষ্ঠানে ধর্ম্মমঙ্গলের এমন একটা প্রভাব আছে যাহা আমাদের কুপ্রবৃত্তিকে সতর্কই করিয়া দেয়—'কুৎসিৎ কোনপ্রকার অনুষ্ঠান এদেশে চলিবে না'। এই গাজন ছাড়া আরও বহুপ্রকার ব্রত ও উৎসব বাঙালীর মনে বিরাট স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। এদেশে প্রাচীন কবিরা শীতলা, ষষ্ঠী, মনসার পাঁচালী, চণ্ডী-উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন—দেশের অধিবাসীরা তাহাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল, আর ক্ষীণপ্রাণ হইলেও আজও তাহা চলিয়া আসিতেছে। বাহ্যরূপ দেখিয়া কামনামূলক পূজা বলিয়া উপেক্ষা হয় ত অনেকে করেন কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সেই সব আচার-অনুষ্ঠান ও পূজার মধ্যে বাঙালীর শিল্প ও সুকুমার মনের পরিচয় আছে, বিচিত্র ভাবানুসন্ধানের আবিষ্ক্রিয়া-শক্তি আছে। পরমাত্মার অসীম স্বরূপলীলার সেগুলি এক একটি রূপক মাত্র; মনকে সংযত করিয়া অসীমের পথেই লইয়া যায়। আনন্দময়কে নিহিত করিবার উপায় উহা—উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসংযমের পরিপোষক নয়।

এই প্রসঙ্গে শিব ও ধর্ম্মের গাজনে কোন কোন পুরাণ-কাহিনীর প্রভাব আছে কিনা আলোচনা করা যাক। বৌদ্ধ পালরাজাদের আমলে সাধারণের মধ্যে কিছিৎ বিস্তৃত বৌদ্ধ

মতেরই সমধিক প্রচলন ছিল। বৌদ্ধ মহাযান মত নানা ভাবে ভারতের নানা প্রদেশে দেখা দিয়াছিল। বঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মিশ্রণে নূতনভাবের সাধনা ও পূজা-পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল পূজা পদ্ধতি সমাজের উচ্চস্তর হইতে অবতরণ করিয়া নিম্নে আসিয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল। শিব ও শক্তিপূজা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে প্রসারলাভ করিলেও নিম্ন শ্রেণীতে বৌদ্ধ শূন্য-মূর্ত্তির রূপান্তর—ধর্ম্মপূজার গাজন ও শিবের গাজনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। রাজা গণেশের পরবর্ত্তী কালে বিরচিত রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও 'ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি' উভয় তান্ত্রিকতার বা ধর্ম্মের সামঞ্জস্যসাধন করিয়াছিল। তিনি শিবের মুখে ধর্ম্ম অর্থাৎ শূন্যমূর্ত্তির বন্দনা করাইয়াছেন। একালের ধর্ম্মপূজা বা শিবপূজায় বাগ্দী, হাড়ি ও ডোমেরা যে 'দেয়াসীন' হইয়া থাকে তাহা শূন্যপুরাণেরই প্রভাব। 'নমো ধর্ম্ম নিরঞ্জন,' 'ভাবসিদ্ধি শূন্যমূর্ত্তি' অথবা—

'নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্ব্বিকারং গুণাশ্রয়ং।
বন্দে পরময়া ভক্ত্যা ধর্ম্মমনাদিরূপিনং॥'

প্রভৃতি মন্ত্র বৌদ্ধভাবেরই পরিপোষক। কালক্রমে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য বশতঃ ধর্ম্মের গাজন লোপ পাইয়া শিবের গাজনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতির গাজন অনুষ্ঠান ও হরিবংশের বাণোপাখ্যানকে উপজীব্য করিয়াই শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া মনে হয়। বাণোপাখ্যানকে শৈব ও বৈষ্ণবের জয়পরাজয়ের কাহিনী বলা যাইতে পারে। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত আছে। ইহা ছাড়া আরও বহু প্রাচীন গ্রন্থে শৈব ও বৈষ্ণবের ঘোর বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথা লিখিত আছে।

পরম শিবভক্ত বাণকন্যা উষার সঙ্গে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয়; বাণ তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং অনিরুদ্ধকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করেন। অনিরুদ্ধ কালীভক্ত ছিল, তাই দেবীর প্রসাদে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নিশীথ-সময়ে মুক্তিলাভ করে। অমানিশায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণ-রাজের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা বাণরাজের বাহুসমূহ ছেদন করিয়া যেমন শিরশ্ছেদনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অমনি শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন—

'মা বাণস্য শিরশ্ছিন্দি সংহরস্ব সুদর্শনম্।'

৭।৮৬—ধর্ম্মসংহিতা।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আপনার বাণ জীবিত থাকুক, এই আমি চক্র প্রতিসংহার করিলাম। নন্দী তখন বাণকে বলিলেন—'বাণ, তুমি শঙ্কর সমীপে গমন কর।' বাণ গমন করিতে উদ্যত হইলে নন্দী তাহাকে রথে আরোহণ করাইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিয়া দিলেন—'বাণ, তুমি শঙ্কর সমীপে নৃত্য করিতে থাক তাহাতে তোমার কল্যাণলাভের সম্ভাবনা আছে।' জীবনপ্রাপ্তি বিহ্বলচিত্ত বাণ রক্তাক্ত কলেবরে মহাদেবের সমুখে গিয়া পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতে লাগিল।—হরিবংশে এই প্রকার বর্ণনা আছে, কিন্তু শিবপুরাণে বা ধর্ম্মসংহিতায় এই নৃত্যের ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়।

'শির কম্পসহস্রাণি প্রতানীকান সহস্রাণঃ
চারীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ

৭।১৯৯।১২৭—ধর্ম্মসংহিতা।

ভক্তবৎসল মহাদেব প্রিয় ভক্তকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হতচৈতন্য অবস্থায় বারংবার নৃত্য করিতে দেখিয়া বলিলেন—'বৎস! আমি প্রসন্ন হইয়াছি এখন অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' বাণ বলিল—'প্রভো, এই বর দান করুন যেন আমি অজর অমর হইয়া থাকিতে পারি।'

'বাণঃ সদা শিবো দেবো বাণাসুরোঽপি চ।
তেন যস্মাৎ কৃতং তস্মাদ্বাণলিঙ্গ মুদাহৃতম্॥'

—বীরমিত্রোদয়।

শঙ্কর বর দান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন অন্য কোন কামনীয় থাকিলে প্রার্থনা করিতে পার। বাণ কহিল—'দেব! আমি যেমন বাণপ্রপীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে আপনার নিকট নৃত্য করিলাম, আপনার কোন ভক্ত যদি এইরূপ করে সে যেন আপনার পুরস্কার লাভ করিতে পারে।' শঙ্কর বলিলেন—'সত্যসন্ধ সরল কোন ভক্ত নিরাহার থাকিয়া তোমার মত নৃত্য করিলে সে তোমার আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ করিবে।' ইহার পর

মহারাজ বাণ শঙ্করপ্রসাদে আরও দুইটি বরলাভ করিয়াছিল। তৃতীয় বরে তাহার অস্ত্রপ্রহারের উপশম হয় এবং চতুর্থ বরে প্রমথগণের প্রধান হইয়া মহাকাল নামে চিরকাল সে খ্যাতিলাভে সমর্থ হয়। চড়ক পূজায় বাণফোঁড়া ইত্যাদি ক্লেশকর ব্যাপার, উপবাস, নৃত্যাদির মূলসূত্র ইহাই।

সিন্দূররঞ্জিত লৌহশলাকাবিদ্ধ 'বাণ'—রক্তাক্ত কলেবর বাণেরই প্রতীক। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে অর্ঘ্য দেওয়া হয় সে মহারাজ বাণেরই স্মৃতিপূজা। বাণকে স্মরণ করিয়া ভক্তেরা শিবের পুত্রত্ব বা অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য উপবাসী থাকিয়া বাণবিদ্ধ দেহে শিব সকাশে নৃত্য করিতে থাকে। বাণের মত প্রক্রিয়াকারীও পরমায়ু, ধন, মান এবং জীবনান্তে অমরত্ব লাভ করিবে, এই তাহাদের বিশ্বাস। এই গেল সন্ন্যাসীদের অনুষ্ঠান ও নৃত্যের মূল সূত্র। এখন ভূতপ্রেতের বেশে সজ্জিত ভক্তগণের কৌতুককর নৃত্যের মূলে কোন পুরাণ বা সংহিতার কোনপ্রকার আখ্যান আছে কিনা দেখা যাক্।

নটরাজ আশুতোষ নৃত্যকৌতুকপ্রিয়, বোধ হয় তাই ভক্তেরা নৃত্যগীত দ্বারা তাঁহার সন্তোষবিধানের চেষ্টা করিয়া থাকে। ধর্মসংহিতায় একস্থানে আছে—একদা নটরাজ নন্দীকে আদেশ করিলেন—'হে বানরানন! তুমি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া গৌরীকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর।' নন্দী প্রস্থান করিলে অপ্সরাগণ বলাবলি করিতে লাগিল—'শম্ভু ব্যতিরেকে কে ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে?' চিত্রলেখা বলিল—'তোমাদের মধ্যে কেহ যদি নন্দীর রূপ ধারণ করিতে পার তাহা হইলে আমি গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া শঙ্করকে স্পর্শ করিতে পারি। উর্ব্বশী বৈষ্ণব-যোগ জানিত, সে সহজেই অবিকল নন্দীর রূপ ধারণ করিল। চিত্রলেখা হইল গৌরী। অন্যান্য অপ্সরাগণ ঐ পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া নিজেরাও একে একে পার্ব্বতীর এক-একজন সহচরীর বেশ ধারণ করিল। তাহাদের সেই কৃত্রিম রূপকে কাহারও কৃত্রিম বলিয়া চিনিবার জো ছিল না। নন্দীবেশে উর্ব্বশী শঙ্কর সমীপে গমন করিয়া বলিল—'গৌরীর সহিত মাতৃগণ আপনার নিকট আগমন করিয়াছে, এখন কৃপাকটাক্ষ দান করুন।' শিব তখন পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে সমারূঢ় হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

'এবমুক্তস্তয়া রুদ্রস্ত্যক্ত্বা পর্য্যঙ্কমুত্তমং।
পুরস্তাদ্বির্যযৌ গৌর্যাঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু ॥'৬৬

তৎপরে—

'রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্ব্বাঃ কপট মাতরঃ।
কচিদ্ গায়ন্তি নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ ॥' ৬৭

—ধর্মসংহিতা।

অপ্সরাদের এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না—ছিল কেবল কৌতুক-বাসনা মাত্র। শিব একেবারে মোহিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। পরে নন্দীর সহিত গৌরী আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন—তখন যথা বিস্ময়ের অবতারণা হইল।

'কিমিয়ং পার্ব্বতী দেবী কিমিয়মিতি চিন্তয়ন্।
তাং দৃষ্ট্বা চকিতা সর্ব্বে কিমিয়ং ন সুশোভনা ॥' ১২

—ধর্মসংহিতা।

এখন প্রকৃত পার্ব্বতীকে খোঁজা বড় শক্ত হইল—পার্ব্বতী দুইজন। অনন্তর মহাদেবের পার্শ্বস্থিতা পার্ব্বতী, অপ্সরাগণের কৃত্রিম রূপ শঙ্করের প্রেম উৎপাদন করিয়াছে জানিতে পারিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। সকলেই তখন কৌতুকে যোগদান করিল। শিবেরও যথেষ্ট আনন্দের উদয় হইল। এই শিবসন্তোষ উপাখ্যান হইতে শিবপ্রীতি-সম্পাদন কামনায় মণ্ডপে সেবকগণ অদ্ভুত কৃত্রিম বেশে নৃত্য-গীত উৎসব করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয়।

সন্ন্যাসী বা ভক্তগণ ব্যতীত যে সকল অন্যান্য লোক এই নৃত্যগীত উৎসব করিয়া আনন্দ উপভোগ করে এবং লোকের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে তাহারা সব সময়ে এই ধারা বা আদর্শকে মানিয়া চলে না—নিজের নিজের সুকুমার মনের উপাস্য বা বরণীয় দেবতার স্তুতিগান করে। বাঙ্‌লা দেশে রামায়ণী ভাব বা আদর্শের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও শৈব ও বৈষ্ণব ভাবেরই প্রাধান্য বেশী। তাই শিবের স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলে কৃষ্ণপ্রেমের গানও শুনিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া হরিবংশের রাসোপাখ্যানের সঙ্গে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব বিদ্যমান তাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। যাহা হউক এই সার্ব্বজনীন আনন্দোৎসবের

মধ্যে যে বাঙ্‌লার কবির সৌন্দর্য্যসাধন ও পুরাণ-সংহিতা-কারদের ধর্ম্মমঙ্গলের প্রভাব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গাজনোৎসবের মূল তত্ত্বগুলি আলোচিত হইল। উহাকেই কেন্দ্র করিয়া নানাভাবে গাজনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাঢ়, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের গাজনোৎসবই আনন্দের সন্ন্যাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিচার করিতে গেলে ইহার মধ্যে বাঙালীর নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কৌতুকরস নৃত্যগীত যেমন একদিকে বাঙালীর নির্ম্মল আনন্দ করিবার অভি-ব্যক্তি, সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেতে নূপুরপায়ে নৃত্য তেমনি পৌরুষ-মনের পরিচায়ক। ঢাক, ঢোল আর কাঁসির শব্দ উহাদের মনে যেন শিবের রুদ্রভাব আনয়ন করে, সঙ্গে সঙ্গে মুখেও সেই ভাব ফুটিয়া বাহির হয়—'হর হর বোম্ বোম্ ভোলা মহেশ্বর'। বাদ্যের তালে তালে পা নাচিতে থাকে, সাঁওতাল নৃত্যের মাদলের মতই কতকটা ঐ বাদ্যের গতি—নৃত্যের সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে। সাধারণ গানের যে বাজনা, ইহার সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই—যেন শুধু নৃত্যের বাদ্য—মহাদেবের ডমরুর ধ্বনি। নৃত্যের সঙ্গে সাত্ত্বিকতার এই সংমিশ্রণই বাঙালীর নৃত্যসাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নৃত্যগুরু নটরাজকে নৃত্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করা সহজ ছিল না; সেই নৃত্য দ্বারা যখন ভক্তকে প্রীতি উৎপাদন করিতে হইয়াছিল বা মূলে সেই বাসনা ছিল, তখন যে তাহাকে নৃত্যকলায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইয়াছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। শিব-পুরাণে—ধর্ম্মসংহিতায় বাণের নানাপ্রকার নৃত্য করার কথা আছে। তাহা পাঠ করিলে মনে হয় উহাতে পৌরুষ-ভাবেরই প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। বাদ্যকর ও ধূনাধারকের চতু-র্দ্দিক ঘিরিয়া এখন যে প্রকার নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাতে মনে হয় পূর্ব্বে এই নৃত্যের উন্নত কোনপ্রকার রূপ ছিল। কালক্রমে সাধারণের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার ফলে বাঙালী তাহার প্রাচীন ধারাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তবু আজও যাহা আছে তাহা দেখিয়া সহজেই মনে হয়—বাঙালী আনন্দ করিতে জানিত এবং তাহাদের নৃত্যকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তাহারা জড়কে প্রশ্রয় দেয় নাই—আত্মাকে সঙ্কুচিত করে নাই। তাই যেমন তার সৈন্য ছিল, পতাকা ছিল, বাণিজ্যপোত ছিল, শিল্প ছিল, স্থপতিকার ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল, বীর্য্য ছিল, সাহস ছিল, তেমনি তাহার আনন্দ ও আনন্দের প্রকাশও ছিল।

নব জাগরণের নবীন প্রভাতে বাঙ্‌লার বুকে আজ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাঙালী যদি আজ তাহার নিজস্ব সম্পদকে পুনরায় লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে এই সব অবজ্ঞাত, অশ্রদ্ধেয় প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাহাকে ডুব দিয়া মণি আহরণ করিতে হইবে, তাহা সাধারণের দ্বারে পরিবেষণ করিতে হইবে।

* এই প্রবন্ধ-রচনায় মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শুকসদয় দত্ত মহাশয়ের 'মদকলা' প্রবন্ধ এবং 'মধ্যযুগে বাঙলা' (শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়), 'আমের গম্ভীরা' (শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত) প্রভৃতি পুস্তক হইতে যথেষ্টভাবে সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।—লেখক।

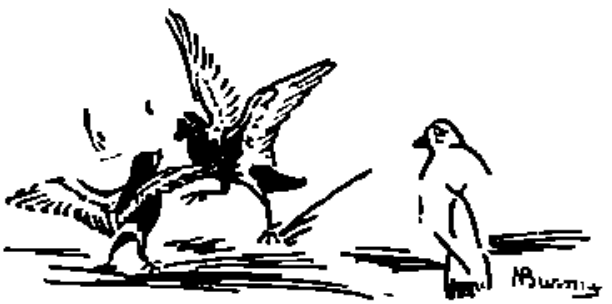

পথিক

শ্রী প্রতাপ সেন বি-এস্-সি

বাধহীন-কণ্ঠ-ঝরে এসেছ পথিক
নিদাঘ সংকেত ল'য়ে চোখে,
তোমার বরণ তরে রচিয়ু যে গীত
সে গীত ধ্বনুক লোকে-লোকে।
এ খানি নহে ক', বন্ধু, নন্দন-সভার
প্রশস্তি—কুসুম দিয়ে গাঁথা;
এর ছন্দ মন্ত্ররবে জানিবে এবার
রুদ্রের ডমরু তালে বাঁধা।
মঙ্গল তূণের পথে নহে যাত্রা তব,
নাহি তা'র ছায়া সুশীতল;
তোমার চলার সাথী—কঙ্কাল-মানব,
সত্যশিব—পথের সম্বল।

ন যযৌ ন তস্থৌ

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম্-এ, বি-এল্

হঠাৎ সেদিন সকাল-বেলাই শচীনের নামে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির।

মা শুকনো মুখে শুধোলেন—কে করলে টেলি? কা'র কী হলে?

শচীন পিওনের হাতের কাগজে নম্বর মিলিয়ে সই করে' দিতেই পিওন সাইকেল করে' অন্যত্র চলে গেলো—মাতা পুত্রের কাছে সে কী অনর্থ-বিদারণ দুঃসংবাদ বহন করে' এনেছে তা জানবার জন্যে সেখানে সে আর দাঁড়ালো না।

টেলির মোড়কটা খুলতে গিয়ে শচীনের হাত কাঁপছে। মা'র মুখ ব্লটিং-কাগজের মতো শাদা। খবরটা শোনবার অধীর আগ্রহে দু' চোখ ঠিকরে পড়ছে।

টেলিটা পড়ে' শচীন একেবারে পাথর হ'য়ে গেল এক বার—দু' বার, তিন বার সে পড়লে—কথাটার ঠিক অর্থবোধ হচ্ছে কি না সন্দেহ হওয়াতে আরো একবার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো একবার।

মা ব্যস্ত হ'য়ে জিগ্‌গেস করলেন,—কী খবর? বল্‌ছিস না কেন কিছু?

কী যে বলবে, কেমন করে' যে বলা যায় শচীন কিছুই ভেবে পেলো না। বলতে গিয়ে টের পেলো গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না, মাথা কেমন ঘুরতে সুরু করেছে,—অথচ পৃথিবীর কোথাও একটু পরিবর্তন হচ্ছে না।

তাকে তখনো চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা শোকাকুল কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লেন—শিগ্‌গির বল্, কোথায় কী সর্বনাশ হ'ল—

শচীনের ওতক্ষণে হয় ত' হুঁস্ হোল। তাড়াতাড়ি সে সদর দরজার কাছে এসে রাস্তায় উঁকি মেরে বললে,—পিওনটা বেরিয়ে গেল বুঝি?

মা বললেন,—কেন, আমাদের বাড়ির টেলি নয়?

শচীনের বুক কেঁপে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি আবার সে টেলিটা পড়্‌লে,মোড়কের গায়ে পেন্সিলের শাদা লেখাটুকুও—না, না, পিওন ভুল করে নি। নিশ্চয় নয়। ভুল অমনি করলেই হ'ল!

মা ছেলের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লেন;

বল্‌লেন,—আমাকে কিছু বল্‌ছিস না কেন? তোর দিদির টেলি নাকি? কেন পিওনকে খুঁজ্‌ছিস—

শচীন বল্‌লে,—কাছাকাছি ওকে দেখ্‌তে পেলে কিছু বক্‌শিস দিতাম।

মা অবাক হ'য়ে বল্‌লেন,—বক্‌শিস!

—হ্যাঁ। শচীন আরেকবার অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নিলে: আমার চাকরি হ'ল, মা। দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সেই চাকরিটা।

খবরটা শচীন নিতান্তই সহজ সাদা গলায়, অনুচ্ছ্বসিত উদাসীন কণ্ঠে মাকে জানালে। এ-খবরে বিশেষ যেন উৎসাহিত হ'বার কিছু নেই। এ সংবাদ যেন তার জীবনের খবরের কাগজে পৃষ্ঠা-জোড়া প্রকাণ্ড হেড্‌লাইন নয়, স্বল্প-পাইকার ছাপা নিতান্তই মামুলি একটা ছোট খবর,—পৃষ্ঠা উল্‌টে গেলেও চোখে পড়্‌বে না। এ চাকরি পেয়ে সে যে বাবার ঋণ শোধ করে' বাড়িটাকে মুক্ত কর্‌তে পার্‌বে, ছোট ভাইটাকে স্কুলে ও বোনটাকে সৎপাত্রে দিতে পার্‌বে, আপন অনশন থেকে এতগুলি প্রাণীকে স্বচ্ছন্দে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে—খবরটা পেয়ে আনন্দে সে একটা আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লো না। চোখ কচ্‌লে আবার সে টেলিটা পড়্‌লো। রাস্তার দিকে একবারটি শুধু চেয়ে দেখ্‌লো—পৃথিবীর কোথাও এতটুকু পরিবর্ত্তন হচ্ছে না।

অথচ এই একটা চাকরির জন্যে সে অন্ধের মত স্বর্গ-পাতাল অন্বেষণ করেছে। উত্তরমেরু-আবিষ্কারের একাধিকার বৈজ্ঞানিকের চেয়ে তার পরাজয় কম মহত্তর ছিলো না। দরখাস্ত টাইপ করে' করে' সে এখন দস্তুরমতো টাইপিষ্ট্‌-এর কাজের জন্যে দরখাস্ত কর্‌তে পারে—এত তার স্পিড্‌! চাকরির জন্যে কী না করেছে সে! দেবতা-প্রাপ্ত কোন বটের ঝুরিতে সে পরনের কাপড় ছিঁড়ে ঝুলো রেখে দিয়েছে, শেকড় খেটে খেয়েছে, গলায় মাদুলি ধারণ করে' ত্রিসন্ধ্যা ছেড়ে বাকি তিরিশ বছরই এসে ত' তাকে সেই মাদুলি-ধোয়া জল খেতে হ'ত। কবরেজের ভাগ্য-রেখাটা গ্রহবৈগুণ্যে নিজের কব্জিতে হ'য়ে আছে, কোনো অপোগণ্ড শুভলগ্নে সেটা ঊর্দ্ধমুখে অভিযান কর্‌লো কি না দেখবার জন্যে সেই কবরেজের উপর কম অত্যাচার হয় নি—মাঝে-মাঝে কপালকেও সেই অত্যাচার ভাগ করে' নিতে হ'ত।

সেই চাকরি! সেই চাকরি আজ এলো—একেবারে অনায়াসে, হাতের মুঠোর মধ্যে, রূঢ় প্রত্যক্ষ দিনের আলোয়।

অথচ সে কি না পাথরের মতো নিশ্চল, গলা দিয়ে তার স্বর ফুট্‌ছে না!

আশ্চর্য্য,—শচীন পরম উদাসীনের মতো, কর্ণীর সন্ধ্যাপার্শ্বে বিচক্ষণ ডাক্তারের মতো পরিষ্কার খর খরে গলায় বলে' যাচ্ছে:

সেই যে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের কেরানির চাকরিটা, মা। পঞ্চাশ টাকায় সুরু,—বছরে দু' টাকা করে' বেড়ে চুয়াত্তর টাকা পর্য্যন্ত। মনে নেই? সেই যিনি অগুরুল-দাদা যে-খবরটা দিলেন—তোমার কিছু মনে থাকে না, মা।

আশ্চর্য্য! মা'র-ও সে-কথা মনে নেই।

বিপুলা পৃথ্বী নিরবধি কাল ধরে' অচলা থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু মা'র মুখ—আমাদের মা'র মুখ—কে-মুখ ছাইয়ের মতো শাদা ছিলো সহসা আগুনের মতো দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি তিনি ছেলের একান্ত কাছে সরে' এসে চীৎকার কর্‌তে গিয়ে শিশুর মতো হেসে উঠ্‌লেন,—সেই চাকরিটা? হ্যাঁ, বুঝ্‌তে পেরেছি বৈ কি! পঞ্চাশ টাকা মাইনে? তারা টেলি করে' জানিয়েছে বুঝি! দেখি—দেখি টেলিটা।

বলে' মা টেলিটা ছেলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আঁকা-বাঁকা অক্ষরগুলির দিকে ফ্যালফ্যাল করে' তাকিয়ে রইলেন। বল্‌লেন, কোত্থেকে না এসেছে বলি টেলি-টা?

শচীন বল্‌লে, দিনাজপুর থেকে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দিনাজপুর থেকেই ত'। পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবে ত'—সত্যি?

শচীন গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—কি-একটা ত' যে ফর্ম্ম ফোর্ম্ম পাশ করেছিলাম—কি বলো?

—না, না, তা ত' করেছিলি। আর কী লিখেছে তারা? তর্জ্জমা করে' বল্ না আমাকে।

টেলিটা হাতে নিয়ে ফের আরেকবার প'ড়ে শচীন মানেটা মাকে বুঝিয়ে দিলে। মা তৎক্ষণ নিশ্বাসরোধ ক'রে' মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্য্যন্ত উৎকর্ণ ক'রে' সে-ব্যাখ্যা আয়ত্ত কর্‌লেন। পরেই দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে নিমিষে তাঁর শরীর বন্ধনমুক্ত হ'ল—পাখীর ডানার মতো লাঘা হ'য়ে গেল।

শচীন বল্‌লে,—কিন্তু আজ রাত্রের ট্রেনেই রওনা হ'তে হ'বে। পর্ত্ত গিয়ে জয়েন্ করা চাই-ই।

যেন তাতে কতো অসুবিধে! দাঁড়াও, সে-সব ব্যবস্থা পরে হ'বে। এখন ত' মোটে সকাল। মা হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন,—দে, দে, টেলিটা আমার হাতে দে—তোর পিসিমাকে শুনিয়ে দিয়ে আসি—

টেলিটা মা'র হাতে ছাড়্‌বার আগে শচীন আরেকবার প'ড়ে নিল। মা একটু থাম্‌লেন। না, ঠিকই আছে—কোথাও এতটুকু ভুলচুক নেই।

মা ঘরের মধ্যে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—শাঁক বাজাও ঠাকুরঝি, খোকার চাকরি হয়েছে। বলে'ই তিনি ছোট খুকির মতো কল্‌কল্ ক'রে' উলু দিয়ে উঠ্‌লেন।

পিসিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যস্ত হ'য়ে প্রশ্ন কর্‌লেন,—কী হ'ল বৌঠান?

টেলিটা খুঁজে নাড়্‌তে নাড়্‌তে মা বল্‌লেন,—আমার খোকা গো খোকা—

আনন্দে কথাটা আর তিনি শেষ কর্‌তে পার্‌লেন না।

পিসিমা উঠানে নেমে বল্‌লেন,—কী হ'ল? ম্যাজিস্টর কিরে কর্‌বে বলে' মত্ দিলে বুঝি?

—না গো না, খোকার চাকরি হয়েছে। এই টেলি এসেছে দেখ।

—হয়েছে? দেখি দেখি—

ব'লে', আর দ্বিরুক্তি না করে' পিসিমাও উলু দিয়ে উঠ্‌লেন।

মা বল্‌লেন,—সত্যনারায়ণকে সিন্নি দেবার ব্যবস্থা কর আজ।

পিসিমা বল্‌লেন,—তুমিও এবার বৌ ঘরে আনবার বন্দোবস্ত কর।

সকাল বেলায় শচীন যে-টিউশানিটা করে, আজ সেখানে যাবার প্রয়োজন নেই। খানিকটা সময় সে একেবারেই কিছু কর্‌লে না—ক্লান্তের মতো তক্তপোষটার উপর শুয়ে রইলো।

খানিকক্ষণ। মনে হ'ল আজ থেকে তার ছুটি।

এখুনি উঠে প'ড়ে দিনাজপুর যাবার সব বন্দোবস্ত তার ঠিক কর্‌তে হবে। তার এখনো দেরি আছে। আরো খানিকক্ষণ সে বিশ্রাম নিতে পারে। খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে পরে চোখ চাইলেই সে-খবর আর মিথ্যে হ'য়ে যাবে না।

বাইরে বারান্দায় ননদ-ভাজে তখনো জটলা কর্‌ছে। উনুন জ্বলে' আছে, তরকারি কোটা হয় নি। ঝোক্ না একটু দেরি। শচীন এসে বল্‌লে,—মা, কিছু টাকা লাগ্‌বে যে। ট্রেন-ভাড়া, জিনিষ-পত্রও ত' কিন্‌তে হ'বে কিছু। টাকা এখন পাই কোথায়?

মা ম্লানমুখে বল্‌লেন,—তুই আজই যাবি নাকি?

—বা, আজই না গেলে পর্ত্ত চাকরিতে গিয়ে জয়েন কর্‌বো কী ক'রে'?

—তাই একেবারে আজই যেতে হ'বে? কিছুই ত' তোর তৈরি নেই। গিয়ে উঠ্‌বি কোথায়?

শচীন বল্‌লে,—সে পরের কথা। এখন আপাততঃ কিছু টাকা চাই ত'। কে দেবে!

মা ঘরের মধ্যে এসে বল্‌লেন,—আমার কাছে একখানা সিনি ছিলো। সেইটাই বেচ্‌তে হ'বে দেখ্‌ছি। উপায় নেই। পাব্‌বিনে? এখন সোনার দর কত?

মা তাঁর ট্রাঙ্ক খুলে বহুদিনকার পুরোনো একটি কাঠের বাক্স বা'র কর্‌লেন। তার মধ্যে থেকে বেরুলো সিঁদুর-কৌটো—তার ভেতরে ময়লা ন্যাকড়ার একটা থলি—তাতে চক্‌চকে একখানি সিনি—ভিক্টোরিয়ার আমলের। আজকের মা'র আনন্দের মতোই ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে।

মা বল্‌লেন,—ট্রেন-ভাড়া বাবদ রেখে বাকিটায় দরকারি দা দু' একটা লাগে কিনে ফ্যাল্। এই নে।

এই গিনি দিয়ে ছিরের সময় মাকে আশীর্ব্বাদ করা হয়েছিলো। জীবনের প্রথম যৌবন-স্পন্দটিকে মা এ-যাবত সযত্নে রক্ষা করে' এসেছেন।

—দিনাজপুরের ভাড়া কত? কি-কি তোর কিন্‌তে হ'বে?

—তাই ভাব্‌ছি।

—এক জোড়া জুতো কেন, ধুতি, জামা—

—না না, ও সব যা আছে তাতেই চল্‌বে। তুমি কেচে একবারটি ইস্ত্রি করে' দিলেই চলে' যাবে। জামাগুলোয় বোতাম লাগিয়ে দিয়ো। জুতো একজোড়া নেহাৎ না হ'লেই নয়।

মা আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন,—না, কিন্‌বি বৈ কি। ফিতে-বাঁধা জুতো কিনিস্ বাপু, ও-সব গুঁড়-তোলা জুতোয় দু' মাসও চলে না। একটা মশারি নিবি নে?

—মশারি দিয়ে কী হ'বে?

—কি-জানি, যদি ম্যালেরিয়া ধরে। তা, আমাদের ঘরেরটাই দিয়ে দেব 'খন। চাল্‌-এর ওপরে একটা কাপড় ঝুলিয়ে নিলেই চল্‌বে। সেলাই করবার পথ নেই।

শচীন বল্‌লে,—মশারি লাগ্‌বে না।

—না, না—একটি মোটে মাস ত' তার পরেই ত' বাইনে পাবি,—আমরা কাটিয়ে দিতে পার্‌বো। তোষকই নেই—ছোট লেপখানা পেতে শুতে পার্‌বিনে?

—স্বচ্ছন্দে। শোবার আবার কী ভাবনা?

মা বল্‌লেন,—তবে ঐ লেপখানাই দিয়ে দেব। গায়ে দেবার জন্যে একখানা চাদর নিস্।

—ও-সব বাবুগিরি করে' লাভ কী?

—না না, গায়েও দে'য়া যাবে, দরকার হ'লে বিছানায়ও পাত্‌তে পার্‌বি। একটা ছাতা নিস্ কিন্তু। নতুন রোদ—মাথাধরি হ'তে পারে। যা তোমার স্বাস্থ্য। টোটকা-টাট্‌কি যা দু'চারটে ওষুধ লাগে—নিস্ মনে করে'। একটা কর্দ্দ করে' ফ্যাল্।

পেন্সিল-কাগজ আন্‌বার কথা মনে হ'তেই মা সহসা চোখ-মুখ বিবর্ণ করে'—গভীর অন্ধকার দেখে অসহায় কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লেন—এ্যাঁ, টেলিটা কোথায় ফেলে এলাম!

হলে'ই ছুটে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। মাটির ওপর নিতান্ত অবহেলায় সেটা পড়ে' আছে। দূর থেকে মনে হয় সামান্য এক টুক্‌রা কাগজ।

টেলিগ্রামটার থেকে কাল্পনিক ধূলো মুছ্‌তে মুছ্‌তে মা বল্‌লেন—তাগ্যিস্ হাওয়ায় উড়ে যায় নি। শকাদের গরুটাও আবার উঠোনে ঢুকেছে—খেয়ে ফেল্‌তেও ত' পার্‌তো। ভ্যাগ্যিস। ট্রাঙ্কেই রেখে দি—বাবা।

ট্রাঙ্কে রাখ্‌বার আগে শচীন আরেকবার খবরটা পড়্‌লে। মা আবার একটু থামলেন। না, খবরটা অতি-বাস্তব সত্য—কোথাও এতটুকু ভুলচুক নেই।

শকাদের গরুটা যে উঠোনের এক কোণে পালং-শাকের ক্ষেতটা সাবাড় করছে, সে দিকে মা'র পরে নজর দিলেও চল্‌বে।

টেলিটা ট্রাঙ্কে বন্ধ করে' রেখে মা বল্‌লেন,—কোন্ বাক্সটা নিবি? আছেই ত' মাত্র দুটো—ওটা ত' একেবারে ভাঙা। আমার বড়োটাই তা হ'লে নিস্।

শচীন বল্‌লে,—দরকার কি? ভাঙাটাতেই চল্‌বে। কিন্তু আর কি কেনা বাকি বলো দেখি।

—তুইই ভেবে ছাখ্ না কি আর লাগ্‌বে।

—আমার আবার কী লাগ্‌বে! আমি ভাব্‌ছি তোমার জন্যে এক জোড়া কাপড়—পিসিমাকে না-হয় একখানা দিয়ো—আর ঘুনি সেদিন আমার কাছে চাকরি হ'লে একখানা বাসেরহাটি শাড়ি নেবে বলে' বায়না ধরেছিলো—ওর জন্যে—

মা ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন—দূর পাগল! ও-সব এখন থাক্। দু' মাস হোক্ আগে চাকরি। আমার এত কষ্টের গিনি ভাঙিয়ে কাপড় কিন্‌তে হ'বে! শোন কথা!

ছেলের সঙ্গে ছ'পা এগিয়ে এসে ফের বল্‌লেন,—একটা ছাতা আনিস্ কিন্তু অবশ্যি। একটা লণ্ঠন লাগ্‌বে না? ছাখ্ ভেবে। রাত্রে আলো চাই ত'।

শচীন বল্‌লে,—কী হ'বে!

শচীন এগোচ্ছিল, মা কাছে এসে গলা নামিয়ে বল্‌লেন,—চাকরির কথা সবাইকে যেন বলে' বেড়াস্ নে। কে জানে কে কোথা থেকে ভাঙচি দিয়ে বস্‌বে। আমাদের শত্রুর ত' আর অভাব নেই—

শচীন আমতা-আমতা করে' বল্‌লে,—অতুকুল-দাদাকে ত' অন্তত বল্‌তে হ'বে।

—হ্যাঁ, অতুকূলকে বল্‌বি বৈ কি। আর পারিস্ ত' কামিনী-ডাক্তারকেও বলে' আসিস্। তোকে সেই সব অসুখটা থেকে ভালো করলে। আর—আর, হ্যাঁ, সে আমিই গিয়ে বল্‌তে পারবো।

বাজার করে' শচীন যখন বাড়ি ফিরলে, মা তখন ঘরে নেই। ঘুনি বল্‌লে, পিসিমাকে সঙ্গে করে' কেদারবাবুর বাড়ি গেছেন, সেখান থেকে যাবেন চণ্ডী-দাদামশায়ের বাড়ি। অতুকূল আর কামিনী-ডাক্তারকে ত' শচীনই খবর দেবে।

ঘুনি মাদার বাক্স গুছিয়ে দিয়ে বল্‌লো।

মা উঠানে ঢুকে বল্‌লেন,—ওদের সবাইর আক্কেলটা একবার দেখ্‌লে ঠাকুরঝি। পরের ভালো চোখ মেলে কেউ সইতে পারে না। চাকরিটা পেতে না পেতেই সবাই ঘুরো ধরেছে—পাকা বাড়ি তুল্‌ছ কবে খোকার মা! তুল্‌বো বৈ কি—একশো বার তুল্‌বো। রাজলক্ষ্মী বৌ ঘরে আন্‌বো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পায়ের তলায় কাঁচা মাটি সোনা হ'য়ে উঠ্‌বে।

পরে শচীনের দিকে চোখ পড়্‌তেই তিনি এগিয়ে এলেন, প্রসন্নমুখে বল্‌লেন,—এসেছিস্? কত দর পেলি গিনিটার? কই, ছাতা আনিস্ নি?

শচীন বল্‌লে,— ছাতা দিয়ে কী হ'বে? এই এক বাক্স সাবান এনেছি, মা।

—তা বেশ করেছিস্। লঞ্চন?

—লঞ্চন লাগ্‌বে কিসে? তোমাকো সব যেমন! আর, এই একটা হাফ্-প্যাণ্ট।

মা অনায়াসে সায় দিলেন,—হাফ্-প্যাণ্ট? তা মন্দ নয়।

শচীন বল্‌লে,—এই সাবানের বাক্সটা ঘুনির, আর—এই টুনু, তোর জন্যে খাকির এই হাফ্-প্যাণ্ট এনেছি দ্যাখ্। ইস্কুলে যাবি নে?

বগল-বাগ ছেড়ে টুনু লাফিয়ে এলো। দাঁতকোঁচা মেরে কাপড়ের উপর দিয়েই প্যাণ্টটা দিলে। আর সাবানের বাক্স খুলে নতুন টাট্‌কা গন্ধে ঘুনি বিভোর হ'য়ে গেল।

মা বল্‌লেন,—ছানার বেঁধে কিছু বাসন দিই সঙ্গে। যদি দরকার হয়—বলা যায় না।

শচীন বল্‌লে,—একা মানুষ, থাক্‌বে গিয়ে মেসে, বাসন দিয়ে কী হ'বে?

পিসিমা বল্‌লেন,—হ্যাঁ, বিয়ে করে' নতুন যখন সংসারি পাত্‌বে তখন ও সব বেঁধে-ছেঁদে দিয়ো! ভাব্‌তে গিয়ে মা'র চোখ ছলছল করে' উঠ্‌লো। ভাঙাগলায় কণ্ঠে বল্‌লেন,—দু'জনকেই ছেড়ে দিয়ে একলা আমি থাক্‌বো কি করে'?

ঘুনি সাবানের ঘ্রাণ নিতে-নিতে বল্‌লে,—আমরাও থাক্‌বো গিয়ে।

পিসিমা বল্‌লেন,—তুই ত' যাবি শ্বশুরবাড়ি।

টুনু লাফিয়ে বল্‌লে—আর আমি থাক্‌বো ইস্কুলে।

চোখের জল মুছে মা বল্‌লেন,—এই ভিটে-কোঠা ছেড়ে যেতেও যে বুকটা ফেটে যাবে, ঠাকুরঝি।

শচীন বল্‌লে,—সেজন্যে এখন থেকেই ব্যস্ত হ'য়ে লাভ নেই। সেরটাক্ মাংস এনেছিলাম, মা। রান্নাঘরে রেখে এসেছি। কি রে টুনু, মাংস খাবি নে?

টুনুকে তখন দেখে কে!

আর ঘুনি গেল আলু কুট্‌তে।

বতোই বেলা পড়্‌তে লাগ্‌লো মা'র মন ততোই অবসন্ন হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। তাঁর খোকা আজ চলে' যাবে—নিবান্ধব অপরিচিত জায়গায়—কোলাহলকীর্ণ বৃহৎ জনতার মধ্যে। এই ঘর-বাড়ি মাঠ-আকাশ তাঁর খোকার বিরহে নিমেষে শূন্য হ'য়ে যাবে। আজ মাঝরাতে উঠে ঠাণ্ডার ভয়ে খোকার শিয়রের জান্‌লাটা চুপি-চুপি আর তাঁর বন্ধ করে' দিতে হ'বে না।

মা বল্‌লেন,—আজকে তোর না গেলেই নয়? এক দিন দেরি করে' গেলেই কি চাকরিটা ফস্‌কে যেতো? শেষের কথাটা বলে' ফেলেই মা তাড়াতাড়ি সাম্‌লে নিলেন,

—খবর পেয়েই ত' তক্ষুণি আর যোড়ুনো যায় না! এইটুকু ওরা বুঝবে।

শচীন হেসে বললে,—ওরা বুঝলেও আমি-তুমি কী করে' বুঝি বলো?

কিসেল হ'তেই মেঘ করে' এলো—তারপর এলো বৃষ্টি। গাছ-পালা অন্ধকার করে'—আকাশ আচ্ছন্ন করে', প্রবল প্রগাঢ় বৃষ্টি।

আর বৃষ্টি নিয়ে এলো মা'র মনে অসীম ব্যাকুলতা।

মা বলে গেলেন,—এই বৃষ্টি মাথায় করেই যাবি?

শচীন বললে,—আমি ত' আর নৌকা নিচ্ছি না, যাবো ট্রেনে। ট্রেন সেই রাত বারোটায়। ততক্ষণে ফর্সা হ'য়ে যাবে।

—গাড়ি বলেছিস্?

—গাড়ি লাগবে কী করতে? মিছিমিছি খরচ করে' লাভ কী! একটা ট্রাঙ্ক আর বিছানা—হরলাল ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে না? খুব পারবে। ওকে বলে' রাখো আগে থাকতে। আর জল না থামলে তখন দেখা যাবে। গাড়ি করলেই বারো গণ্ডা পয়সা।

মা ছেলেকে কাছে নিয়ে বসলেন। বৃষ্টিতে সান্নিধ্যটি আরো করুণ ও শোকাবহ হ'য়ে উঠেছে। শচীন মা'র কোল ঘেঁষে শুয়েছে অসহায় শিশুর মতো, আর না তার চুলে হাত বুলুচ্ছেন ও নতুন জায়গায় কেমন সে থাকবে বা থাকবে না, কার সঙ্গে মিশবে বা মিশবে না, আফিস থেকে কিসে কী সে পাবে বা খাবে না—এই নিয়ে অসংখ্য উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। বৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে শচীন মা'র কথা শুনছে।

যাবার সময় কাছে এলো। মেঘ কেটে গিয়ে কিসে একটু জ্যোৎস্না উঠেছে। হরলাল লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে তৈরি। মোট-ঘাট প্রস্তুত।

অবিশ্রান্ত ঝিঁঝি ডাকছে।

যা সকর্মণে শচীনের হাতে টেলিটা তুলে দিয়ে বললেন,—কোটের ভেতরের পকেটে রেখে দে। বারে বারে নাড়াচাড়া করিস্ নে।

কোটের ভেতরের পকেটে রাখবার আগে শচীন আরেকবার টেলিটা পড়লে।

তারপর মাকে প্রণাম করলো। পিসিমাকে প্রণাম করলো। ঘুনি উঠে দাদাকে প্রণাম করতে এসে প্রায় কেঁদে ফেললে। টুনু ঘুমিয়ে পড়েছিলো—কান্না থামাতে গিয়ে ঘুনি তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিলে। আড়মোড়া ভেঙে দুটো কাঁইকুই করে' টুনুও এসে দাদাকে প্রণাম করলে।

দাদা না চলে' গেলে তার কের ঘুমুতে যাওয়া হচ্ছে না।

মা গলা গলায় বললেন,—পৌঁছেই কিন্তু দিস্।

—নিশ্চয়।

শচীন রাস্তায় নামলো—হরলাল চলেছে আগে আগে, কাঁধের উপর লাঠির ডগায় লণ্ঠন বেঁধে। চারদিক নিরুম—ঝিঁঝির ডাকে সেই নিঃশব্দতা আরো বেশি গাঢ় হ'য়ে উঠেছে।

লণ্ঠনটা আর দেখা গেল না। এতক্ষণে মাঠ পেরিয়ে ওরা ষ্টেশনের রাস্তা নিয়েছে।

পথে জল আর কাদা। সোঁ সোঁ করে' হাওয়া বইছে। ষ্টেশনে পৌঁছুতে আর কতোক্ষণ না-জানি লাগবে!

ঘরের অন্ধকারে এসে মা আর চোখের জল ঠেকে রাখতে পারলেন না। ঘুনিও বালিশের কোণে চোখ মুছছে। পিসিমা কাছে এসে বসলেন।

মা বললেন,—কী ঝিজিরি ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছ! কোটের ওপর চাদর একটা কিছুতেই জড়িয়ে নিলে না। যা কিছু জিনিস-পত্র—সব আমাদের জন্যেই রেখে যাবে। এখন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জারি না হ'লে হয়—

পিসিমা বললেন,—ছেলের যা স্বাস্থ্য।

—এই স্বাস্থ্য নিয়েই এতো বড়ো হ'ল! আবার মেঘ করলো বুঝি! ষ্টেশনে পৌঁছুবার আগেই বৃষ্টি এসে যাবে নাকি?

পিসিমা জান্‌লা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—না, আস্‌তে-আস্‌তে ঘণ্টাখানেক।

—ও! ততক্ষণে পৌঁছে যাবে। কি বলো?—বাইরে অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মা বল্‌লেন,—ছাতা একটা কিছুতেই কিন্‌লে না—নিয়ে এলো কি না টুনুর জন্যে একটা হাফ্-প্যাণ্ট! নিজের জন্যে পারতপক্ষে একটা আধলাও খরচ কর্‌বে না—তুমিই ত' তা নিজ চোখে দেখ্‌ছ ঠাকুরঝি, যা-কিছু কুড়িয়ে-মুড়িয়ে পায় সব চালবে এই সংসারে।

পিসিমা বল্‌লেন,—সত্যনারায়ণের কৃপায় দিন ত' এবার ফিরতে চল্‌লো।

মা মনে মনে প্রণাম করে' বল্‌লেন,—ঠাকুরের কৃপায় শরীরটা ভালো থাকে—শুভলাভে গিয়ে পৌঁছুতে পারে—পথ ত' আর একটুখানি নয়! তুমি শুয়ে পড়ো—হ্যাঁ, তুমি আর জেগো না—রাত কিন্তু কম হয় নি। আমার এখুনি ঘুম আস্‌বে না। খোকার ট্রেনটা আগে ছাড়ুক।

রাত্রির বিস্তীর্ণ স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে' বহু দূর হ'তে কখন এঞ্জিনের বাঁশি বাজ্‌বে তা শোনবার জন্যে মা কান পেতে বসে' রইলেন। এত দূর থেকে শোনা অবশ্যি যায় না, কিন্তু না শুন্‌তে পান্।

পিসিমা শুয়ে পড়্‌লেন। মা তখনো তাঁর খোকার কথাই বলে' চলেছেন—একেবারে ওর সেই ছেলেবেলাকার কথা,—যখন ও হয়, যখন ও নতুন কথা বল্‌তে শেখে, যখন ও প্রথম গ্রাইজ পায়।

মা হঠাৎ পিসিমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বল্‌লেন,—ঘুমিয়ে পড়্‌লে নাকি ঠাকুরঝি? শুন্‌তে পাচ্ছ না, এতক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ঘুমোবার একটু জায়গা পেয়েছে কি না কে জানে!

শচীন যদি ঘুমোবার জায়গা না পায় তবে বিছানায় গা ছড়িয়ে মা-ই বা কী করে' ঘুমোন?

মেঘ ডাক্‌ছে—আসুক এবার বৃষ্টি। শচীন নিশ্চয়ই গাড়িতে জান্‌লা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসেছে—গোয়ালন্দের ষ্টিমার ত' সেই সকালে। ষ্টিমারে ওঠ্‌বার পথটুকু পেরবার সময় বৃষ্টি না হ'লেই হয়!

না, মা'র জন্যে ছোট ভাই-বোনের জন্যে কষ্ট কিসের! চাকরি করে' সবাইকে সে কাছে নেবে—একদিন এ-শহরেও ত' বদলি হ'তে পারে। এখন একটু ঘুমা,' খোকা! আজকে আর রাত জাগিস্ নি।

মা'র একটু তন্দ্রা এসেছিলো,—দরজায় কে যেন ধাক্কা মাচ্ছে, ডাক্‌ছে—মা, মা, ওঠ, দরজা খোল।

মা ধড়মড় করে' উঠে বস্‌লেন।

গাছ-পালা কাঁপিয়ে সোঁ সোঁ করে' হাওয়া বইছে।

স্বপ্নের মধ্যেও মা শচীনের ডাক শুন্‌ছেন। জান্‌তেন ও কিছু নয়—তবু মা দরজা খুল্‌লেন।

এবং দরজা খুল্‌তেই দেখ্‌তে পেলেন—চোখের সামনে অবারিত শূন্য মাঠ নয়, সশরীরে শচীন দাঁড়িয়ে। পেছনে মোট-মাথায় দরওয়ান, হাতের লণ্ঠনটা ওর নিবে' গেছে। আলোটাকে এতটা সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে পর্য্যাপ্ত তেল ছিলো না।

শচীন কেমন ম্লান, অপরাধী। গলা দিয়ে তার স্বর ফুট্‌ছে না।

মা'র সমস্ত শরীর কাঁপ্‌তে লেগেছে—চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন,—কী হ'ল? ফিরে এলি যে?

শচীন বল্‌লে,—ট্রেনটা মিস্ কর্‌লাম ষ্টেশনে যেতে-যেতেই চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—সে কি? মা বসে' পড়্‌লেন,—এত আগে গিয়েও ট্রেন ধর্‌তে পার্‌লি নে? তখন বল্‌লাম গাড়ি নিতে—মা'র কথা ত' গ্রাহ্য করিস্ না তোরা।

ঘরে ঢুকে ভিজে কোটটা ছাড়্‌তে-ছাড়্‌তে শচীন বল্‌লে, সে জন্যে নয় মা। এই মে-মাস থেকে ট্রেনের সময় বদলে দিয়েছে। গাড়ি আজকাল ছাড়্‌ছে সাড়ে-এগারোটায়। অনেকেই খবর পায় নি, অনেকেই ফিরে এসেছে।

মা নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বল্‌লেন,—ওরা ত সব আর চাকরি কর্‌তে যাচ্ছিলো না। কিন্তু কী হ'বে?

শচীন অস্থির হ'য়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি কর্‌তে লাগ্‌লো।

মা আর্তনাদ করে' বল্‌লেন,—চাকরিটা তা হ'লে গেল ?

শচীন ধমকে দাঁড়ালো। বল্‌লে,—না, না যাবে কেন ? গেলেই হ'ল আর কি ! কাল যাবো। খবর পেয়েই তক্ষুণি যাওয়া যায় নাকি ? ওরা তা বুঝবে না ? ওরা চাকরি করছে না ?

মা বল্‌লেন,—আজ রাত্রে আর কোনো ট্রেন নেই ?

—আজ আর আবার ট্রেন কোথায় ? কাল আবার সেই রাত বারোটায়।

মা ধনুকে উঠ্‌লেন,—বারোটায় ?

—না, সাড়ে-এগারোটায়। কাল ঠিক মনে থাকবে। কিন্তু ষ্টেশন থেকে ফিরে আস্‌তে জলে কাপড়-জামা প্রায় ভিজে গেছে। বাইরে যা জলো হাওয়া !

মা অবুঝের মতো বল্‌লেন,—আজ রাত্রেই কোনো উপায়ে আর যাওয়া যায় না ?

শচীন বল্‌লে,—তুমি যে এখন আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচো।

—ও দিকে সব যে গেল—

মা'র অস্ফুট আর্তনাদ শুনে শচীনের গায়ের রক্ত ঠিম হ'য়ে এলো। সব সত্যি গেল নাকি ? বাড়িটাকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করা যাবে না, ছোট ভাইবোন দু'টো শীতের পাতার মতো শুকিয়ে মরবে, মা বুড়ো বয়সেও দু'বেলা হাঁড়ি ঠেল্‌বেন—আর, আর শচীনের কল্প-অতীত নববধূটি আরো বহুদিন অপরিচয়ের কুজ্ঝটিকার আড়ালে অজ্ঞাতবাস করবে !

শচীন দীর্ঘ নিশ্বাসে বুকের পাথরটা নামিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—না, চাকরি যাবে কি করে' ? তা কি কখনো হয় ?

মা অসহায়ের মতো বলে' উঠ্‌লেন,—পর্শু কাজে যেতে না পারলে যদি তারা অন্য লোক নিয়ে নেয় !

—নিলেই ত' আর হ'ল না।

—হ'ল না কী ! যদি নেয়, তুই কী করতে পারিস্ ?

শচীন বল্‌লে—সে পরে দেখা যাবে, তুমি এখন আমাকে একখানা শুকনো কাপড় দাও দিকি। বেশিক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকলে অসুখ করবে।

সেই কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' মা বল্‌লেন,—আর কোনো ট্রেনে অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না ? সত্যি ?

—জানি না। গেলে হয় ত' দু দিন পরে গিয়ে পৌঁছুতে হ'বে।

মা দুই হাতে মুখ ঢেকে বল্‌লেন,—তবে আর কি ওরা তোকে নেবে ? ওদের কথামতো পৌঁছুতে পারলি না—ওরা কড়া লোক নিশ্চয়ই—কথার একটুমাত্র নড়চড় হ'লে কাজ ছাড়িয়ে দেয়। যে দিনকাল পড়েছে—কাজ ছাড়াবার ছুতো একবার ওদের পেলেই হ'ল। আর,—আর কোনো উপায়েই যাওয়া যায় না আজ ? ভাখ্ না ভেবে। অনুকূলকে একবার ডেকে পাঠাবো ?

শচীন বল্‌লে,—কাজ ছাড়াবে কী ! দস্তুরমতো টেলি করেছে না ?

মা হঠাৎ উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন,—হ্যাঁ, টেলি—আছে ত' ওটা পকেটে ?

শচীন তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়াতে লাগ্‌লো।

মা শুকনো গলায়—বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গিয়ে বল্‌লেন,—কী ? নেই ?

—কী যে বলো তুমি, মা। আছে বৈ কি। কোথায় যাবে ? দস্তুরমতো ভেতরের পকেটে রেখেছি। আলোটা জ্বালো।

মা বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে' কুপিটা জ্বালালেন।

শচীন বল্‌লে,—এগিয়ে আনো আলোটা।

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বেরুলো। সামান্য ঘামিকটা ভিজে' কাগজটা একটু নরম হয়েছে বটে। মোড়ক থেকে টেলিটা বা'র করে' শচীন আরেকবার পড়্‌লো—আরো একবার।

মা নিশ্বাস বন্ধ করে' বল্‌লেন,—ঠিক আছে ত' ? দে, আমার কাছে দে—ট্রাঙ্কে রেখে দি। দেখিস্ ঠিক আছে ত' ?

বলে' মা নিজেই কুপির আলোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টেলিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

শচীন বল্‌লে,—হ্যাঁ, ঠিক আছে বৈ কি। খবর কি আর মিথ্যা হ'তে পারে ?

মা বল্‌লেন,—পর্শু ই ঠিক হাজিরা দিতে বলেছে ?

—তা বলুক। দেখি আরেকবার। বলে' শচীন টেলিটা আরো একবার পড়্‌লে।

হ্যাঁ, ঠিকই আছে। কোথাও এতটুকু ভুলচুক নেই।

বাহিরের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী

কেম্ব্রিজ

লণ্ডন থেকে অক্সফোর্ডে গিয়েছিলাম রেলে—আর কেম্ব্রিজ যাওয়া হলো 'বাসে' ক'রে—উদ্দেশ্য সেই মাসগোর মতনই সহরের বাইরের দৃশ্য দেখা। কিন্তু ঠিক আমাদের দেশের মত পাড়াগাঁ চোখে পড়্‌ল না, দেখ্‌লাম—অতি পরিপাটি রাস্তা। মাইলের পর মাইল যতদূরই যাও না কেন মোটর চলাচলের জন্য অতি সুন্দর বাঁধানরাস্তা সর্ব্বত্র। এই রাস্তার সুবিধা আছে বলেই পাড়াগাঁ ঠিক পাড়াগাঁ নেই—অনবরত মোটর বাস্ চল্‌ছে—সহর ও পাড়াগাঁর ব্যবধান ক'মে গেছে—গ্রামের লোকেরা সহরের সঙ্গে যোগ রেখে নানারকম ব্যবসায় ও কাজকর্ম্মে উন্নতিলাভ করেছে।

বাসের ভেতর থেকে উঁকি মেরে আশে পাশে যতটা দেখা যায় দেখ্‌ছি—আর মনের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চাইছে আমাদের নিজের দেশের পথ ঘাটের দুরবস্থার প্রতি। পাড়াগাঁ কেন, আমাদের দেশের অনেক সহরের রাস্তার সঙ্গেও এ সমস্ত রাস্তার তুলনা হয় না। রাস্তার দু'ধারে সারি-সারি গাছ, এমন একটা মাঠের ভেতর দিয়ে দ্রুতগতিতে বাস্ চল্‌ছে আর আমি—"ভাল রাস্তা থাক্‌লে হয় ত আমাদের দেশের অবস্থাও অন্য রকম হ'ত" ইত্যাদি—কত-কি ভাব্‌ছি এমন সময়ে হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিয়ে বাস্ থেমে গেল। গাড়ী শুদ্ধ সব লোক নেমে পড়্‌ল—আমরাও নাম্‌লাম। চালক বল্‌লে—ইঞ্জিনের কি রোগ হয়েছে সার্‌তে একটু সময় লাগ্‌বে।

নেমে দেখি রাস্তার এক পাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে এক বুড়ী। আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম—জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ বাছা?" বুড়ী আমায় মস্ত একটা পুঁটুলি দেখিয়ে বল্‌লে যে তার বাগানে কিছু তরিতরকারি হয়েছে তাই নিয়ে যাচ্ছে সহরে—তথায় বিক্রি কর্‌লে যাতায়াতের বাস্ ভাড়া দিয়েও দু'পয়সা ঘরে আস্‌বে। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জান্‌লাম প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে এক পল্লীতে বুড়ীর বাস—ছেলে বউ আছে তারা সহরে কাজ করে—সপ্তাহে এসে মাকে দেখে যায়। বইটি খুবই ভাল—বুড়ীকে কায়কর্ম্ম কর্‌তে মানা করে। কিন্তু বুড়ী বলে, "যতদিন শক্তিসামর্থ্য আছে কেন নিষ্কর্ম্মা ব'সে থেকে ওদের গলগ্রহ হই?" দেখ, এদের মনোবৃত্তি! দেখ, কি রকম স্বাবলম্বী এরা! অশীতিপরা বৃদ্ধাও ব'সে থেকে নিজের ছেলে-বৌর উপার্জ্জন ভোগ কর্‌তে নারাজ।

বুড়ীর সঙ্গে এই সব নানা কথা বল্‌তে বল্‌তে বাসের ভোঁ বেজে উঠ্‌ল। আমিও বুড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠ্‌লাম।

যথাসময়ে কেম্ব্রিজ পৌঁছা গেল। লণ্ডন থেকে ৫৪ মাইল উত্তরে 'ক্যাম' (Cam) নদীর পারে কেম্ব্রিজ। পৌঁছতে লাগ্‌ল আড়াই ঘণ্টা।

ট্রাম্পিংটন ষ্ট্রীট দিয়ে সহরে প্রবেশ ক'রে ডান দিকে বোটানিক গার্ডেন ও 'চেসাণ্ট' (Chesnut) কলেজ এবং বাঁ দিকে 'লে' স্কুলের (Ley School) নূতন বাড়ী-ঘরগুলি রাস্তা থেকেই দেখে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে Fitz William মিউজিয়মে প্রবেশ কর্‌লাম। Viscount Fitz William নামক জনৈক সম্পন্ন ব্যক্তি এই মিউজিয়ম প্রস্তুত জন্য নগদ একলক্ষ পৌণ্ড এবং তিনি যে সকল চিত্রাদি সংগ্রহ করেছিলেন সমস্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ ক'রে যান। তারপর আরও অনেকে অনেক টাকা, অনেক মূল্যবান চিত্র, প্রাচীন মুদ্রা ও পুস্তকাদি দান করেন। এখানে দেখার এত জিনিষ আছে যে তার ইয়ত্তা নাই। অনেক জিনিষের মূল্য বুঝ্‌বার শক্তিও আমাদের নাই। বিল্ডিং যেমন প্রকাণ্ড তেমনি মনোরম

ও বৈচিত্র্যময়—উহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। মোট ব্যয় হয় এক লক্ষ কুড়ি হাজার পৌণ্ড। দর্শক মাত্রেরই এ মিউজিয়মটি দেখা কর্ত্তব্য। প্রবেশ করতে কোন ফি: লাগে না।

(১) Peter House College—মিউজিয়মের উত্তরেই 'পিটার হাউস' কলেজ—কেম্ব্রিজে সব চেয়ে পুরাণ কলেজ। ১২৮৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। কবি 'গ্রে' (Gray) এই কলেজেই প্রথম পড়তেন, পরে 'পেম্ব্রোক কলেজে যান।

(manuscript) আছে। তিনি প্রথম পিটার হাউস কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে পরে এখানে আসেন।

(৩) Queen's College—ট্রাম্পিংটন ষ্ট্রীট থেকে পশ্চিম মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার উত্তরের রাস্তা দিয়ে গেলেই 'কুইনস্ কলেজ'। রাজা ষষ্ঠ হেন্‌রি স্থাপন করেন King's College—রাণীরও দেখাদেখি হ'ল একটা Queen's College চাই। তাই রাণী মার্গারেট এই কলেজ স্থাপন করেন ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ইংলণ্ডে গৃহ-

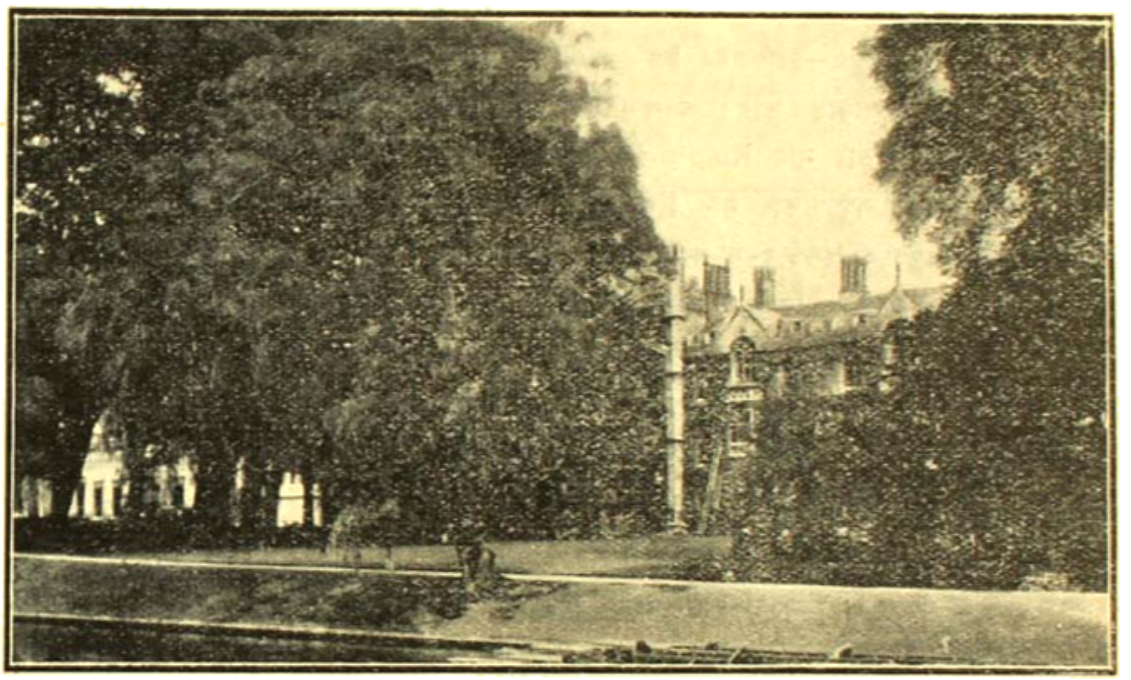

নদী হইতে ট্রিনিটি কলেজ—কেম্ব্রিজ

(২) Pembroke College—পিটার হাউস কলেজ দেখে রাস্তার অপর পারে পেম্ব্রোক কলেজে প্রবেশ করলাম। Earl of Pembroke একটা মল্লযুদ্ধে (Tournament) বিবাহের রাত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর্লের বিধবা পত্নী মৃত স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৩৪৭ খৃঃ অব্দে এই কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজের মন্দিরটি লণ্ডন নগরীর বিখ্যাত (St.Paul's Cathedral) সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রালের নির্ম্মাতা স্থপতিবিদ্যাবিশারদ Sir Christopher Wren সাহেবের প্রথম কাজ। কলেজ লাইব্রেরীতে কবি গ্রে'র অর্দ্ধমূর্ত্তি (bust) এবং তাঁর Elegy নামক কবিতার পাণ্ডুলিপি

যুদ্ধ (Civil War) আরম্ভ হয়। ফলে কলেজটি একরকম উঠেই যায়। সৌভাগ্যক্রমে বিজয়ী রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের পত্নীর সহিত রাণী মার্গারেটের বিশেষ সখ্য ছিল। তিনি ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে এই কলেজটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক প্রিয় সখীর কীর্ত্তি রক্ষা করেন। কলেজের ফটকটি বেশ—উপরে গম্বুজ এবং গম্বুজের চার কোণায় ৪টি চূড়া। ভেতরে কয়েকটি আঙিনা; আঙিনার চারদিকেও সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং। উপাসনা-মন্দিরটি অতি রমণীয়। কলেজ কম্পাউণ্ডের ভেতর দিয়েই ক্যাম্ নদী প্রবাহিত। পোল পার হ'য়ে নদীর অপর পারে কলেজের বাগান ও খেলার মাঠে যেতে হয়।

St. Catherine College—কুইন্‌স কলেজের ঠিক পূর্ব্বদিকে ট্রাম্পিংটন ষ্ট্রীটের উপরই 'সেণ্ট ক্যাথেরিন' কলেজ। ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। এ কলেজের প্রাঙ্গণ ও উপাসনা মন্দিরটি অতি রমণীয়।

(৪) Corpus Christe College—রাস্তার অপর পারেই 'কর্পাস ক্রিষ্টি কলেজ' কেম্ব্রিজ মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক ১৩৫৭ খৃঃঅব্দে প্রতিষ্ঠিত। রাস্তা থেকে দেখতে অতি চমৎকার দেখায়। লাইব্রেরীতে অনেক হাতে লেখা পুঁথি আছে। লাইব্রেরী ও হলের ভিতরের দৃশ্যও বেশ বৈচিত্র্যময়। হলে অনেকগুলি ছবি আছে।

King's College—ট্রাম্পিংটন ষ্ট্রীট বরাবর উত্তর মুখে গিয়ে বীচ ষ্ট্রীটে পড়েছে। তার যে অংশ 'Caius' কলেজের সামনে পড়েছে তার নাম King's Parade, যে অংশ ট্রিনিটি কলেজের সম্মুখে তার নাম ট্রিনিটি ষ্ট্রীট এবং যে অংশ (St. John's) 'সেণ্ট জন্‌স্' কলেজের সম্মুখে তাকে বলে "সেণ্ট জন্‌স্ ষ্ট্রীট"। 'কিংস্ প্যারেড' রাস্তার উপরেই বিখ্যাত 'কিংস্ কলেজ'। রাজা ষষ্ঠ হেনরি ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ স্থাপন করেন এবং পূর্ব্বেই বলেছি যে এই কলেজ থেকেই রাণীও কুইনস্ কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আগে কেবলমাত্র 'ইটন' কলেজের ছাত্রদেরই ভর্ত্তি করা হ'ত—বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এ কলেজের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। প্রায় ৪০০ বছর এই ভাবে চলার পর এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করেছে এবং তদবধি অন্যান্য স্কুলের ছাত্রও এখানে ভর্ত্তি হ'চ্ছে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন মহাশয় এই কলেজ থেকে র‍্যাংলার (wrangler) উপাধি এবং পরে গণিতবিদ্যা চর্চ্চার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক স্মিথস্ প্রাইজ (Smith's Prize) লাভ করেন। শ্রীযুক্ত সেনের পূর্ব্বে আমাদের দেশের আর কেউ এই উচ্চ সম্মান লাভ করেন নাই।

আইভিলতা-মণ্ডিত উচ্চ সিংহাসনের মধ্যস্থলে কিংস্ কলেজের গেট—তার পরই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ফোয়ারা। ডান দিকে উপাসনা-মন্দির, বাঁ দিকে 'হল' ও অন্যান্য বিল্ডিং। সম্মুখে উচ্চ খিলান এবং খিলানের উভয় পার্শ্বে ফেলোদিগের থাকার ঘর। এই খিলানের পথ দিয়ে এগিয়ে গেলেই সুবিস্তৃত 'লন'—যেন সবুজ রংয়ের মখমল পাতা হয়েছে—আর লনের গা ঘেঁসেই চলেছে ক্যাম্ নদী। নদীর উপর পোল—পোল পার হলেই কলেজের বাগান ও খেলার মাঠ। কলেজটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। উপাসনা-মন্দিরটি এত বড় যে অক্সফোর্ডের বড় গির্জ্জাও এর কাছে মাথা নীচু করে। লম্বে ৩১০ ফিট, পাশে ৪০ ফিট, উচ্চতায় ১৪৬ ফিট। দুপাশে ১২টি ক'রে ২৪টি কাচের জানালা—৪৯ ফিট উঁচু ও ১৬ ফুট পরিসর। এই সমস্ত জানালার কাচে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা চিত্রকর কর্ত্তৃক কুমারী মেরি এবং বাইবেল-ঘটিত নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একমাত্র এই কলেজের এই অমূল্য কাচগুলিই কালাপাহাড় 'ডাউসিংয়ের' হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

তোমরা অবশ্যই আমাদের দেশের কালাপাহাড়ের নাম শুনে থাকবে। কালাপাহাড় ছিল একজন ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমান সেনাপতি। বাংলার কোন এক উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে তার জন্ম—কিন্তু কোন নবাব-কন্যার প্রণয়ে প'ড়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে বেহার ও বেনারস মধ্যে এমন দেবমূর্ত্তি ছিল না যা কালা-পাহাড় ধ্বংস অথবা অঙ্গহীন করে নাই। প্রকাশ আছে যে কালাপাহাড় পুরীর জগন্নাথ মূর্ত্তি পুড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয় এবং সেই পাপে তার হাত-পা খ'সে পড়ে এবং তার মৃত্যু ঘটে। কালাপাহাড়ের ন্যায় বিলাতে 'ডাউসিং' (Dowsing) নামক একজন প্রবল প্রতাপান্বিত মূর্ত্তিবিদ্বেষী লোক ছিল। এই 'ডাউসিং' কেম্ব্রিজের সমস্ত উপাসনা-মন্দিরের নানা দেশের নামজাদা চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত মূল্যবান কাচের জানালাগুলি ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়। কেবলমাত্র কিংস্ কলেজের কাচগুলিই রক্ষা পায়। কেউ বলেন যে ক্রমওয়েলের আদেশে 'ডাউসিং' কিংস্ কলেজে প্রবেশ করে নাই; আবার কেউ বলেন যে 'ডাউসিং' অনেক টাকা ঘুষ পেয়ে কিংস্-কলেজ মন্দিরে হাত দেয় নাই।

(১) Clare College—কিংস্ কলেজের উত্তরপূর্ব্ব কোণে ক্লেয়ার কলেজ। রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের দৌহিত্রী Domina de Clare কর্ত্তৃক ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। কলেজের পিছনেই ক্যাম্ নদী। এ কলেজের (War Memorial Buildings) যুদ্ধ-স্মৃতি-ভবনটি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য—অন্য কোন কলেজেই যুদ্ধস্মৃতি রক্ষার্থ এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর নূতন বিল্ডিং নাই। এই স্মৃতি-ভবনের ভিতরের খিলানের উচ্চতা ৮০ ফিট। ব্রেজার পোল পার হ'য়ে নদীর অপর পারে লাইম এভিনিউ নামক পরিপাটি রাস্তা দিয়ে কয়েক পা হেঁটে গেলেই এই 'যুদ্ধ-স্মৃতিভবন' ও খেলার মাঠ। এই পোলের নাম "Bridge of uncountable halls"—এই অপূর্ব্ব অসংখ্য বলের পোলের উপর থেকে দুপাশের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়।

University Library—কিংস্ কলেজের উপাসনা-মন্দিরের ঠিক উত্তরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী। ভিতরে গিয়ে দেখ্‌তে হ'লে আগে অনুমতি নিতে হয়। অনেক মূল্যবান পুস্তক ও চিত্রাদি এখানে আছে। বিলাতে যত পুস্তক ছাপা হয় বডলিয়ান লাইব্রেরীর মত এই লাইব্রেরীও বিনামূল্যে ঐগুলির এক-এক কপি পেয়ে থাকে।

Senate House—য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরীর পাশেই সিনেট হাউস। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস ও সভা-সমিতি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নেওয়া এবং ডিগ্রি দেওয়াও এখানেই হয়।

৮। Caius College—সিনেট হাউস রাস্তার বাঁ দিকে এই কলেজ ১৩৪৮ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। এখান থেকেই ট্রিনিটি ষ্ট্রীট আরম্ভ। এ কলেজে (১) বিনয়-তোরণ (Gate of Humanity), (২) সম্মান-তোরণ (Gate of Honour) এবং (৩) পুণ্য-তোরণ (Gate of Virtue) নামক তিনটি ফটক আছে। কলেজটি বেশ বড়। এখানে ভেষজ-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষারও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

Trinity College—১৩১৩ খৃষ্টাব্দে 'মাইকেল হোম' নামক একটা বাড়ী বাইবেলের পাঠার জন্য প্রস্তুত হয়, পরে ১৩৩৬ খৃঃ অব্দে 'কিং হল' নামে আর একটা ছেলেদের থাকার জন্য হয়। এই উভয় বাড়ী দিয়ে রাজা অষ্টম হেনরি ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ট্রিনিটি কলেজ স্থাপন করেন। রাজা অষ্টম হেনরির প্রতিমূর্ত্তি এখানে আছে। এ কলেজের বেমন

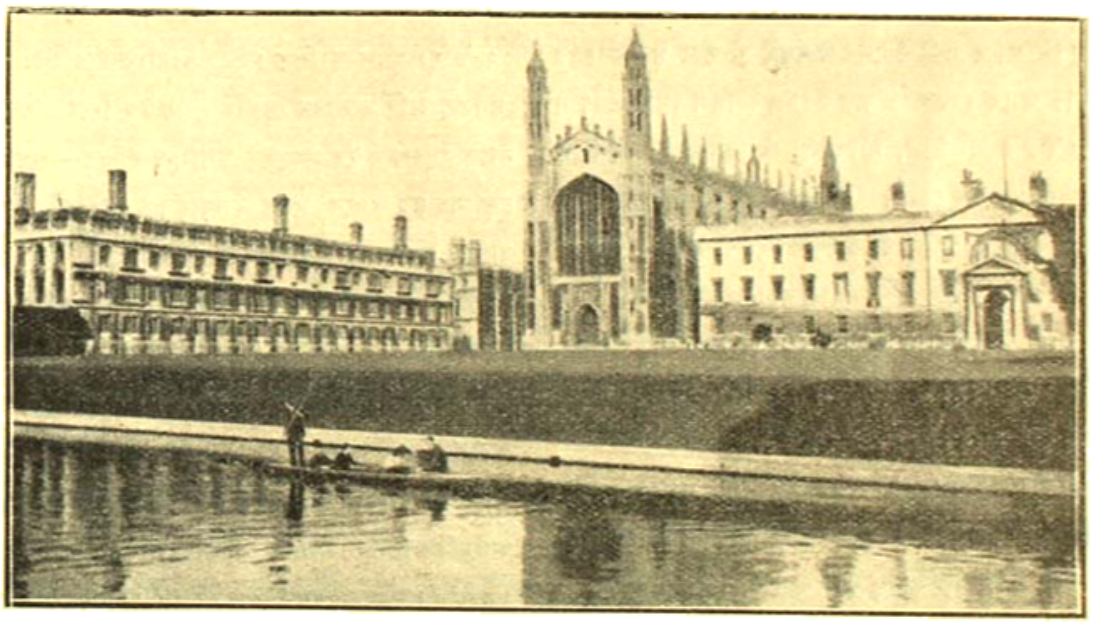

নদী হইতে কিংস্ কলেজ—কেম্ব্রিজ

'গেট'—তেমনি প্রাঙ্গণ—তেমনি ঘর-বাড়ী—সবই প্রকাণ্ড। প্রাঙ্গণ আছে পাঁচটি। প্রথমটির নাম (Great Court) 'গ্রেট কোর্ট'—এর মত বড় প্রাঙ্গণ অন্য কোন কলেজেই নাই। এমন কি অক্সফোর্ডের Christ কলেজের 'টম কোয়াড' (Tom Quad) নামক প্রাঙ্গণও এর কাছে হার মানে—দৈর্ঘ্য ৩১৪, প্রস্থ ২২৮ ফিট। এই প্রাঙ্গণে প্রবেশের গেট আছে তিনটি। আমরা ট্রিনিটি ষ্ট্রীট্ থেকে "Great Gate Way"নামক ফটক দিয়ে এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ফোয়ারা; ডান দিকের

গেটের নাম 'রাজার ফটক' (King's Gate), বাঁ দিকের গেটের নাম 'রাণীর ফটক' (Queen's Gate)। হল (Hall) অর্থাৎ ভোজনাগার আছে তিনটি। ছেলেদের থাকার হোষ্টেল আছে সাতটা—তাতেও সঙ্কুলান হয় না ব'লে অনেক ছেলেকে কলেজের বাইরে থাকতে হয়। কলেজ লাইব্রেরীটি আমার কাছে বড়ই ভাল লাগ্‌ল। সুন্দর সুন্দর আলমারীতে বইগুলি অতি সুন্দর ভাবে সাজান। আলমারীর মাথায় মাথায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের অর্দ্ধমূর্ত্তি (busts) এমন ভাবে রেখেছে, যেন তাঁরা—এই লাইব্রেরী যাঁরা ব্যবহার করেন উপর থেকে তাঁদের তত্ত্বাবধান করছেন। লক্ষাধিক পুস্তক লাইব্রেরীতে আছে—তা'ছাড়া প্রায় দু'হাজার হাতের লেখা বই আছে। নিউটন, মিল্টন ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ লেখকের অনেক পাণ্ডুলিপি পুঁথি আছে। নিউটনের অর্দ্ধমূর্ত্তি ও তাঁর মৃত্যুকালের মুখের ছাঁচ আছে। অতি যত্নে তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি এখানে রক্ষিত হ'চ্ছে। নিউটন, ম্যাকলে, থ্যাকারে, বায়রণ ও টেনিসন এখানে পড়তেন। অতি আগ্রহ ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁদের থাকার ঘরগুলি দর্শকগণকে দেখান হয়। লাইব্রেরীর পশ্চিমেই ক্যাম নদী—লাইব্রেরী থেকেই নদীর জল দেখা যায়। পোল পার হ'য়ে ওপারে কলেজের 'লন', 'এভিনিউ' ও বাগান প্রভৃতি। পোলের উপর থেকে কলেজের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়।

(১০) St. John's College—ট্রিনিটি কলেজের পরই সেণ্ট জনস্ কলেজ। ১৫১১ খৃঃ অব্দে রাজা সপ্তম হেনরির মাতা লেডী মার্গারেট কর্ত্তৃক স্থাপিত। এ কলেজের গেটের মত বিচিত্র কারুকার্য্যময় গেট আর কোন কলেজেই নাই। উপাসনা-মন্দিরটিও বেশ। লাইব্রেরীর পিছনেই ক্যাম নদী।

সেণ্ট জনস্ কলেজ দেখে, সেণ্ট জনস্ ষ্ট্রীট্ দিয়ে বরাবর এগিয়ে গিয়ে আমরা গোলগির্জ্জার কাছে ব্রীজ ষ্ট্রীটে পড়্‌লাম। গোলগির্জ্জা ডান দিকে রেখে ব্রীজ ষ্ট্রীট দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই ক্যাম নদীর উপরে বড় পোল (Great Bridge)। এই বড় পোলের উপরে উঠে চারদিকে যতটা দেখা যায়—বিশেষতঃ ক্যাম নদীর বক্ষে সারিসারি কলেজের নৌকা এবং নদীতীরে নৌকার ঘরগুলি—কিছুকাল দেখে আমরা বাসায় ফিরে এলাম। বড় পোল পার হলেই ডান দিকে ম্যাগডালেন (Magdalen) কলেজ; কিন্তু অসময় ব'লে এবং ক্লান্ত বোধ করাতে সে কলেজ তখন দেখা হ'ল না।

(১১) Christ College—ক্রাইষ্ট কলেজও রাজা সপ্তম হেনরির মাতা কর্ত্তৃক ১৫০৯ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত। এ কলেজের গেটটিও ঠিক সেণ্ট জনস্ কলেজের গেটেরই মতন—তবে অনেকে বলেন সেণ্ট জনস্ কলেজ গেটের শিল্পকার্য্য অপেক্ষাকৃত ভাল। কবি মিল্টন এখানে পড়তেন ব'লে পৃথিবীর নানাস্থান থেকে দর্শকগণ এই কলেজ দেখতে আসেন। কবি যে ঘরটিতে থাকতেন তা খুলে দর্শকদিগকে দেখান হয়।

Emmanuel College—ইমানুয়েল কলেজ ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত। St. Andrew's Street থেকে দেখতে অতি মনোরম দেখায়। ফটক দিয়ে প্রথম আঙিনাতে প্রবেশ ক'রে সম্মুখেই উপাসনা-মন্দির—গুম্বজ, ঘড়ি ও চূড়া সহ দূর থেকে বেশ দেখায়। লাইব্রেরী, মাষ্টারদের বাড়ী, ছেলেদের হোষ্টেল, ভোজনাগার, লেকচার ব্লক সমস্তই দেখা গেল। বাগানটি অতি রমণীয়। একটি দীঘি আছে। স্নান ও সন্তরণের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। ঠিক সময়মত গিয়েছিলেম বলেই এ সবগুলি দেখা গেল। অবশেষে মাটির নীচের রাস্তা দিয়ে ইমানুয়েল ষ্ট্রীটের অপর পারে কলেজের নূতন আঙিনা ও ঘরবাড়ী দেখে ফিরলাম। আমেরিকার Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা Harvard সাহেব এখানে পড়তেন। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্, মহাশয় এবং তাঁর পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রসদয় দত্ত উভয়েই এই কলেজের ছাত্র।

কেম্‌ব্রিজে ছিলাম তিন দিন। আমাদের এক বন্ধুর সাহায্যে আগে থেকেই রুম ঠিক ক'রে রেখেছিলাম—সুতরাং আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। এসেছিলাম 'বাসে' ক'রে, ফিরে গেলাম রেল গাড়ীতে। লণ্ডনে পৌঁছতে লাগ্‌ল মাত্র দেড় ঘণ্টা। দেখবার আগে আমরা সহরের অন্যান্য অনেক জায়গা ঘুরে দেখেছি। দ্বিতীয় দিন সকাল বেলাটা কুইন রোড, ক্যাম নদীর পার এবং

কলেজের পোলের রাস্তায় হেঁটে হেঁটে ঘুরে ফিরে কাটিয়েছি। কুইন রোডের উভয় দিকে কলেজের বাগান, এভিনিউ ও খেলার মাঠগুলি দেখে বড়ই তৃপ্তি লাভ করেছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে আমরা অনেক দূরে—রিডলি হল (Ridley Hall) ছাড়িয়ে Newnham College নামক মেয়ে কলেজের গেটের কাছে গিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে পড়ি। ইতিমধ্যে গেরেট গোল্টেন পোলের ঘাটে নৌকা-ভাড়া ক'রে কিছুকাল ক্যাম নদীতেও বেড়িয়ে দেখেছি। বাস্তবিক পক্ষে কলেজগুলি পিছনের দিক থেকে দেখতেই খুব ভাল দেখায়।

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ উভয়ই অতি ছোট ও পুরান সহর—উভয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রধানতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় দু'টির প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এমন কোন বিদ্যাই নেই যার চর্চ্চা এখানে হয় না এবং যার উন্নতি এখানে হয় নাই। এখানকার প্রত্যেক কলেজই বহু লেখক, বহু কবি, বহু বৈজ্ঞানিক ও বহু রাজনৈতিকের স্মৃতির সহিত জড়িত। এখানকার প্রবীণ অধ্যাপকেরা আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিদের ন্যায় একনিষ্ঠ ভাবে আপন আপন গবেষণায় মগ্ন থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকেও অনুপ্রাণিত করেন। সাধারণতঃ আর্টের জন্য অক্সফোর্ড ও সায়েন্সের জন্য কেম্‌ব্রিজ প্রসিদ্ধ।

অক্সফোর্ডের ২৪টি কলেজের মধ্যে ১৩টি এবং কেম্‌ব্রিজের ২৪টি কলেজের মধ্যে মাত্র ১২টি কলেজের ভেতরে গিয়ে দেখা ঘটেছিল। মেয়ে কলেজের মধ্যে আমরা অক্সফোর্ড Somerville কলেজ এবং কেম্‌ব্রিজ Newnham কলেজ দেখেছি বটে কিন্তু ভিতরে গিয়ে ভালরকম দেখার সুবিধা ঘটে নাই। এই উভয় কলেজেই পুরুষের কলেজের ন্যায় পড়াশুনা ও খেলাধূলার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে। এমন কি মিস্ ফিলিপ্পা ফসেট নাম্নী Newnham কলেজের একটি বিদুষী ছাত্রী নাকি সিনিয়ার র‍্যাংগলার অপেক্ষাও উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। কলেজ ছাড়া আমরা আর আর দ্রষ্টব্য স্থানও যতটা পেরেছি দেখেছি। একটি ভাল গাইড জুটেছিল বলেই আমরা এত অল্প সময়ে এতটা দেখতে শুনতে পেরেছিলাম। সব সময়ে সব জায়গা খোলা থাকে না—কোন কোন জায়গায় আগে অনুমতি নিয়ে যেতে হয়—কোন কোন জায়গায় দর্শনী দিয়ে প্রবেশ করতে হয়—কাজে কাজেই ভাল ক'রে কোন কিছু দেখতে গেলে সময় লাগে অনেক। যা হোক্, আমরা যতটা দেখতে পেরেছি তাতেই সন্তুষ্ট।

তোমরা হয় ত লক্ষ্য করেছ যে ঠিক একই নামের কলেজ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে, যথা—কর্পাস ক্রিষ্টি, ডেছার্স, ম্যাগ্‌ডালেন, পেমব্রোক, কুইনস্, সেণ্ট জন্‌স এবং ট্রিনিটি নামে কলেজ অক্সফোর্ডেও আছে কেম্‌ব্রিজেও আছে।

প্রত্যেক কলেজেই শিক্ষকদের ও ছেলেদের থাকার ঘর-বাড়ী, রন্ধনশালা, ভোজনাগার, লাইব্রেরী, উপাসনা-মন্দির, নানা কারুকার্য্যখচিত ফটক, আঙ্গিনা, বাগান, খেলার মাঠ, বজরা, নৌকা ইত্যাদি আছে। কোন কলেজে ঘর-বাড়ী বড় ও সংখ্যায় বেশী—কোন কলেজে ছোট ও সংখ্যায় কম, এই যা।

গত জার্ম্মান যুদ্ধে এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন—তন্মধ্যে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন প্রত্যেক কলেজেই তাঁদের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁদের নাম প্রস্তর, পিত্তল অথবা কাষ্ঠফলকে স্পষ্টাক্ষরে, অনেকস্থলে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা হয়েছে। অধিকাংশ কলেজের উপাসনা-মন্দিরেই এই প্রকার স্মৃতিলিপি দেখা গেল। এতদুদ্দেশ্যে 'ট্রেনার' কলেজে একটি অতি সুন্দর "যুদ্ধ-স্মৃতি-ভবন" নির্ম্মাণ করা হয়েছে। কেম্‌ব্রিজে একমাত্র Pembroke কলেজেরই ৩০০ ছাত্র, অক্সফোর্ডের New কলেজের ২১০ এবং Balliol কলেজের ১৯১ জন ছাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণদান করেছেন। একস্থানে লেখা আছে যে অক্সফোর্ডের ১৩,৫৭১ জন যুদ্ধে গিয়েছিলেন তন্মধ্যে ২,৬৭০ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফিরে আসেন নাই।

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্‌সেলারই কর্ত্তা। সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন খ্যাতনামা ছাত্রই এ পদের জন্য মনোনীত হন এবং একবার মনোনীত হ'লে আজীবন এ পদে থাকেন। প্রকৃত কর্ত্তা কিন্তু ভাইস্ চ্যান্‌সেলার। এই পদে প্রত্যেক কলেজের প্রধান শিক্ষক এক এক বৎসরের জন্য পর পর নিযুক্ত হন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন (Proctor) প্রক্টর আছে। প্রক্টরের

কাজ—ভাইস্ চ্যান্সেলারকে আফিসের কাজ-কর্মে সাহায্য করা এবং কলেজের ছেলেদের তত্ত্বাবধান করা। প্রক্টরের অধীনে অনেক চর বা গুণ্ডচর আছে—তাদের Bulls বা Bull.dogs বলে। ছেলেরা যদি কলেজের ভেতরে কোন অন্যায় কাজ করে তার বিচার করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ; কিন্তু কলেজের বাইরে কোন অন্যায় কাজ বা নিয়মভঙ্গ করলে উহা প্রক্টরের শাসনাধীন। কোন ছেলেই কলেজের পোষাক ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বাইরে যেতে পারে না—কোন কোন স্থানে ছেলেদের যাওয়াই নিষেধ। রাত ন'টার মধ্যে সকল ছেলেকেই আপন আপন কলেজে ফিরে যেতে হয়। ছেলেদিগকে এই রকম অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু ছেলেদের এমন জিদ যে কোন কোন নিয়ম ভঙ্গ করা চাইই চাই! কিন্তু চরের চোখ এড়ানও সহজ নয়; কোন ছেলে নিয়মভঙ্গ করলেই তৎক্ষণাৎ চর এসে তাকে জানায়—"প্রক্টর সাহেব সেলাম দিয়েছেন (Proctor pays his compliments to you)!"—প্রক্টরকে ছেলেরা খুব ভয় করে।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Union এবং Debating Club বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে অনেক সময় ইংলণ্ডের বড় বড় বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞেরা যোগদান করেন। কখন কখন রাজনৈতিক গবেষণায়—বিশেষতঃ সাময়িক রাজনীতি সম্বন্ধে বাদানুবাদে রাজমন্ত্রীরা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকেন। ইংরেজ জাতির চরিত্রগঠনে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় কম সাহায্য করে নাই।

এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক কলেজেই খেলাধূলার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে এবং সকল ছাত্রই এ সম্বন্ধে সুযোগ পায়। লেখাপড়ায় ভাল ছেলের যেমন খাতির, ভাল খেলোয়াড়েরও সেই রকম খাতির। Senior Wrangler-এর মতনই Full Blue-র খাতির। এক কলেজের সঙ্গে অন্য কলেজের প্রতিযোগিতায় যারা কলেজ থেকে খেলার জন্য মনোনীত হয় তা'দি'কে হাফ ব্লু (Half Blue) এবং এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমস্ত কলেজ থেকে মনোনীত হ'য়ে যারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় খেলতে যায় তা'দি'কে ফুল ব্লু (Full Blue) বলে। কেম্ব্রিজের ব্যাজ (Badge) ঈষৎ নীলাভ আর অক্সফোর্ডের ব্যাজ গাঢ় নীল।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের খেলাধূলার বাৎসরিক প্রতিযোগিতা সমস্ত ইংলণ্ডের জাতীয় উৎসব ব'লে বিবেচিত হয়। এই সব খেলার মধ্যে রাগ্‌বি (Rugby), ক্রিকেট এবং নৌকা বাচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্ষিক প্রতিযোগিতার খেলা সবগুলিই হয় লণ্ডনে। তখন সামান্য মুটে মজুর থেকে প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত তাতে মেতে যায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে প্রতিযোগিতাস্থল লোকে লোকারণ্য হ'য়ে পড়ে। যারা যেতে পারেন না তাঁরা পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতার আলোচনায় মত্ত থাকেন। ক'লকাতায় মোহন বাগান ক্লাব যখন I. F. A. Shield-এ semi final অথবা final খেলে তখন আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে অনেকটা এই প্রকার উত্তেজনা ও উন্মাদনা দেখা যায়।

নৌকা-বাচ খেলার মত আনন্দময়, উত্তেজক ও উন্মাদক খেলা আর নেই। প্রত্যেক বাচের নৌকায় ৮জন দাঁড়ি থাকে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছা বাছা খেলোয়াড়েরা যথাক্রমে আইসিস নদী ও ক্যাম নদীতে একসাথ হ'য়ে প্র্যাক্‌টিস করে। পরে লণ্ডনের টেম্‌স (Thames) নদীতে ২০ দিন প্র্যাক্‌টিস করে। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট দিনে টেম্‌স নদীতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতার স্থান (course) এক মাইল লম্বা। নদীর দু'ধারে চা'র পাঁচ লক্ষ দর্শক এই নৌকা-বাচ দেখতে জড় হয়। সকলেই জামা বা টুপিতে একটা ব্যাজ লাগায়। যারা অক্সফোর্ডের জয় কামনা করে তারা গাঢ় নীল এবং যারা কেম্ব্রিজের পক্ষপাতী তারা ঈষৎ নীলাভ রংয়ের ব্যাজ পরে। এই ব্যাজ যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ আছে তারাই পরে তা নয়—যারা কখনও বিশ্ববিদ্যালয় দেখে নাই তারাও মনে মনে অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজের আদর্শকে পূজা করে। সেদিন ইংলণ্ডের সমস্ত সংবাদপত্র এই বাচ খেলার কথাতেই পূর্ণ এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই আলোচনাতে মত্ত থাকে।

সমস্ত জাতিটাই এই বিশ্ববিদ্যালয় দু'টিকে ঠিক আপনার জিনিষ ব'লে মনে করে—তাই এ দুটি

প্রতিষ্ঠান এত বড় হ'তে পেরেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতিটার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। হায়, কবে আমাদের দেশের প্রাচীনেরা আমাদের ছেলেদের খেলাধূলায় এমন প্রাণ খুলে মিশতে পারবেন! কবে আমাদের দেশে তরুণের সম্মান হবে! কবে আমাদের জাতটা আবার নবীন হবে! (ক্রমশঃ)

উৎকলী সঙ্গীত ও কবিতা

শ্রী রামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

গত বারে আমরা উৎকলী লিরিক্ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। আজ এই প্রবন্ধে উৎকলী সঙ্গীত ও কবিতা এবং উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাই নিয়ে কিছু বলবো।

উৎকলে, সাধারণ কথায় বলতে গেলে, যা উত্তমরূপে গান করতে পারা যায়, যার পদবিন্যাস-কৌশল এবং সুর-মাধুর্য্য শ্রোতার ও গায়কের কর্ণরসায়ন হয়, তাই হ'চ্ছে সঙ্গীত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এর সংজ্ঞা কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হ'তে পারে, কিন্তু মূলভাবে আমরা সঙ্গীতের সংজ্ঞাকে (definition) উল্লিখিত ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠা করে' থাকি। যে পদ্য গীতযোগ্য এবং যাতে সুরসম্পদ বিদ্যমান, তা'ই সঙ্গীত এই জন্যই যে, নিস্বনের মধ্যে ললিত-মধুর এমন গুণ রয়েছে যা শ্রোতার কর্ণপ্রীতিকর হয় এবং যা ক্ষণেকের জন্যও আমাদের হৃদয়কে পুলকিত করে;—রসপুলক-উৎপাদন-কারী সুমধুর বাণীপ্রবাহই ত সঙ্গীত! তাই আমরা সঙ্গীত আখ্যা দিয়ে থাকি: জলের কল্‌কল্—সঙ্গীত, বাতাসের সন্‌-সন্—সঙ্গীত, বৃক্ষের মর্ম্মর—সঙ্গীত, পক্ষীর কূজন—সঙ্গীত, কোকিলের কুহু—সঙ্গীত, ঝর্ণার ঝর্ঝর—সঙ্গীত। মানুষ এ সকল সঙ্গীতের অর্থ বোঝে না বটে কিন্তু এদের সুরের ললিত-মধুর গুণে—সুরে মুগ্ধ হয়ই। কিন্তু কবিতার সম্বন্ধে এ রীতি প্রযোজ্য নয়।—আমরা যাকে কবিতা বলি তা সঙ্গীত নাও হ'তে পারে। সঙ্গীত কর্ণপথে প্রবেশ করে, কিন্তু কবিতার প্রভাব নীরবে হৃদয়তন্ত্রীতে অনুভূত হয়। কবিতায় ভাব, অনুভব এবং ঐকান্তিকতা হ'চ্ছে প্রধান সামগ্রী কিন্তু সঙ্গীতে সুরমাধুর্য্য এবং কর্ণপ্রীতি এই দুটিই মুখ্য পদার্থ।

উৎকলী পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বলেন, সঙ্গীত ও কবিতা তাঁদের ভাষায় দুটি পৃথক্ বস্তু—সঙ্গীতের রাজ্য এবং কবিতার রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন। তবে অনেকে এই মতের প্রতিবাদও যে করেন না, তা নয়। তাঁরা বলেন,—যা আমরা সুর করে' গাইতে পারি ও যা পড়বার সময় বা শোনবার সময় আমাদের মনে অতিমাত্রায় আনন্দ দেয়, সে'ই আমাদের সঙ্গীত; কিন্তু যার ভেতর থেকে কিছু শেখবার আছে, তা আমাদের কবিতা। এ মত ভ্রান্ত; কারণ পদের আসা কবিতার উদ্দেশ্যই হ'ল কিছু শিক্ষা দেওয়া নয়,—আনন্দ দেওয়া। কবি কদাচিৎ নিজের লেখনীর সাহায্যে জগতে জ্ঞানপ্রচারের প্রয়াসী হ'য়ে থাকেন। তিনি যে ভাবে বিভোর হন, যে আনন্দে উন্মত্ত হন, যে রসে আপ্লুত হন, সেই ভাব, সেই আনন্দ ও সেই রসকে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে প্রেরণ করাই তাঁর লেখনীর অভিপ্রায়। এমন কবিও থাকতে পারেন যাঁরা জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য সমুৎসুক—তবে তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প। জগতকে শিক্ষা দান করা যে কবিদের উদ্দেশ্য তাঁরা অতি নীরস ও অতীব কৃপার পাত্র। পৃথিবীর বরেণ্য শ্রেষ্ঠ কবিরা এরূপ ধরণের নন। কারণ তাঁরা নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও আনন্দ এবং অজ্ঞ ঢেলে দিয়ে গেছেন! সুতরাং দেখতে গেলে পূর্ব্বোক্ত মতে উৎকলী সঙ্গীত ও উৎকলী কবিতার সীমা নির্ণয় করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক বা অমূলক।

উৎকলী সঙ্গীত বা উৎকলী কবিতা—এই উভয়ের ক্রিয়ায় কেউ কেউ ভ্রান্ত সংজ্ঞার সমতা এনে ফেললেও, তারা যে সকল সময় একই বস্তু নয়, এ আমরা

নিঃসন্দেহ বলতে পারি। পদ্য ও কবিতার মধ্যে যে প্রভেদ, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গুণ হিসাবে সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে সেই প্রভেদ বা সম্বন্ধ বিদ্যমান। পদ্য হ'চ্ছে ভাবরিহীন নিকৃষ্ট রচনা, কিন্তু কবিতা ঠিক্ বিপরীত অর্থাৎ ভাবগর্ভ এবং উচ্চশ্রেণীর। সমস্ত কবিতা পদ্য হ'তে পারে কিন্তু সমস্ত পদ্য কবিতা নয়। আমরা কবিতা-পাঠে মোহিত হ'য়ে যাই কিন্তু পদ্যপাঠ আমাদের প্রাণে কোনো স্পন্দন আনে না। সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে ঠিক্ এমনিই একটা সম্বন্ধ আছে: উচ্চ জাতীয় সঙ্গীতের অপর নাম কবিতা, কিন্তু যে সঙ্গীত কবিতা নয় তাকে আমরা নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত মনে করি। পদ্য এবং নিকৃষ্ট সঙ্গীত একই জাতীয়। সময়ে সময়ে পদ্যেও একটু মোহকরী রসের রঞ্জিতভাব পরিলক্ষিত হয়—নিকৃষ্ট সঙ্গীতও কখনো কখনো আমাদের কর্ণ ও মনকে হরণ করে' থাকে। তাই বলে' আমরা পদ্যকে কবিতা বল্‌ব না বা নিকৃষ্ট সঙ্গীতকে উচ্চস্থান দিব না। যা প্রাণ স্পর্শ করে না, যা হৃদয়ে স্পন্দনের সঞ্চার করে না—সেটা অতি তুচ্ছ সামগ্রী। কেবল পদ্যের শব্দ-যোজনা-কৌশলে কিম্বা নিকৃষ্ট সঙ্গীতের স্বর-সম্পদে আমরা তন্ময় বা মোহিত হই না।

সঙ্গীত উচ্চজাতীয় হ'লেই কবিতার আশ্রয় খোঁজে। উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। উৎকৃষ্ট সঙ্গীতকেই আমরা প্রকৃত সঙ্গীত আখ্যা দিব। যথা :—

দীনবন্ধু দইত্যারি, দুখো ন গণা মোহরি
হেলো কি নিষ্ঠুর চিত্ত নীলাচলে বিজে করি'।
অগাধ জলরে গজো
ডাকিলা যে দেবরাজো
তা' ডাক কু চতুর্ভুজো শ্রবণ দা' থিলো ডেরি।
দীনবন্ধু দইত্যারি……ইত্যাদি॥

কুরুপতি সভাতলে
দ্রৌপদী বিবস্ত্র কালে
তা' ডাকো শুনিলো হেলে দক্ষোক্ত করিলো পারি।
দীনবন্ধু দইত্যারি……ইত্যাদি॥

দুখো যা ন রখো মোতে
শরণো তো পাদোপতে
কহে যাই ধরো গীতে কে এথু কহিব পারি।
দীনবন্ধু দইত্যারি……ইত্যাদি॥

নিকৃষ্ট সঙ্গীতকে সঙ্গীত না বলে' কেবল গীত নাম দেওয়া যাক্। উৎকলী সাহিত্যে নিকৃষ্ট সঙ্গীত বা গীতের লক্ষণ এই যে, যে স্বরগরিমায় সেগুলি ক্ষণিকের জন্য আদরণীয় হয়, কয়েকবার শোন্‌বার বা গান কর্‌বার পরে তার সে গরিমা লুপ্ত হ'য়ে যায় এবং শুন্‌তেও ভাল লাগে না। যেমন :—

মান উদ্ধারণো কহুছে কারণো
শরণো বু তুহ্ন পাদতলে।
নারকও রথি যাউথিলে ভাসি'
উদ্ধরি' ধরিল বাহুবলে।
রাবণকু মারি ধরাকু রখিল
সীতাকু আনিলো কেতে ছলে।
মান উদ্ধারণো……ইত্যাদি॥

কিন্তু সঙ্গীতের মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ ও স্থায়ী। সুতরাং সংক্ষেপে এই কথা বলা যেতে পারে যে, সব কবিতা সঙ্গীত হ'তে পারে না কিন্তু সঙ্গীত মাত্রেই নিহিত কবিতা। পুষ্পের মধ্যে সৌরভ যেমন প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত থাকে, সঙ্গীতের মধ্যে কবিতা তেমনি থাকে ডুবে।

নির্গন্ধ কুসুমের বাহ্য সৌন্দর্য্যে আমরা ক্ষণকাল মুগ্ধ হ'য়ে—তারপর ফেলে দিয়ে থাকি, কিন্তু সুরভিত ফুলের বেলায় তা করি না। সেইরূপ কবিতা-সম্পদে মণ্ডিত সঙ্গীত চিরদিন থাকে, কিন্তু কবিতাবিহীন সঙ্গীত সৌরভহীন পুষ্প সদৃশ ক্ষণস্থায়ী। কবিতায় ভাবই হ'চ্ছে প্রাণ—কিন্তু সঙ্গীতে কবিতাই প্রাণ। প্রকৃত সঙ্গীতের স্বরগ্রাম হ'চ্ছে অবয়ব, কিন্তু কবিতা হৃৎপিণ্ড।

কবিতা :—

জগতর সিংহদ্বারে
জ্ঞান-অর্ণব-তীরে
বিজ্ঞানর রত্নবেদিকা
দেখ রাজে রুচিরে।

তহিঁ সিংহাসনো পুণারো
স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত
তহি পরে বিজে নবীন
যুগ চির-বাঞ্ছিত।
মস্তকে শোভই কিরীট
প্রেমমণি-খচিত,
হস্তে রাজদণ্ড স্থায়রো
মহামহিমান্বিত।
একোতানে বিশ্ব কবিত্র
ধরি অমর বীণ,
গাইছন্তি অভিনন্দন-
গীত অমৃতজিনা।"
—মধুসূদন রাও।

সঙ্গীত :—

কলাকলেবর কহ্লাই
সঙ্গে যোহিণীসুতে।
করন্তি মধুর বিজয়ে
দাণ্ডে দেখ সঙ্গীতো।
খসি পড়ুছি কি আকাশ
বেহে গঙ্গা যমুনা,
কার সঙ্গে প্রাণ শোষিলে
নাশো গলা পুতনা।
.....ইত্যাদি।

এইজন্য প্রকৃত কবিতা হোক্ বা সঙ্গীত হোক্ প্রত্যেকের মর্য্যাদা বোঝা পাঠক বা শ্রোতার ধৈর্য্য, সৌজন্য ও সমপ্রাণতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। আয়র্লাণ্ডের নবযুগের বরেণ্য কবি W. B. Yeats সত্যই বলেছেন—"One afterall writes poetry for a few careful and sympathetic friends." অনেক সময় কেউ কেউ ইচ্ছা করেন, সঙ্গীতের ভাবমাধুর্য্য এত বেশী প্রকাশমান হওয়া দরকার যে শ্রবণ বা পঠনের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেটা বোঝা যায়—শুনতে শুনতে সঙ্গীতের ভাব প্রকাশ না হ'লে তদ্ধাতীয় সঙ্গীত আদরণীয় নয়। প্রকারান্তরে কবিতার প্রতিও এই মত দেওয়া যেতে পারে; তবে সমস্ত কবিতা সকলের পক্ষে পড়তে পড়তে বা শুনতে শুনতে বোধগম্য হওয়া অস্বাভাবিক হ'তে পারে। এই মত যে কতদূর সমীচীন তা আমরা বলতে পারি না।—মেঘের কাছে জলের জন্য চাতক একটি কবিতায় বলে' "বর্ষা, বর্ষা" বলে' চেঁচালে নিশ্চয়ই মেঘ তার মুখে জল' পড়ে না। বর্ষার জলের জন্য চাতককেই বর্ষার গুণে উড়ে যেতে হবে!

গভীর জলাশয়ের উপর ভেসে-বেড়ানো একটা কথা, আর তার তলস্পর্শ করা আর একটা কথা। অনেক সন্তরণপটু লোকই জলরাশির উপর বহুদূর ভেসে যেতে পারে কিন্তু সবাই তলস্পর্শ করতে পারে না—এটি একটি ভিন্ন শক্তির অপেক্ষা করে। তেমনি কবিতা ও সঙ্গীতের ভাবের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য একটা ভিন্ন শক্তির প্রয়োজন। শ্রোতা বা পাঠকের রসিকতা, ধৈর্য্য, সৌজন্য, সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা এই শক্তিরই বিভিন্ন অঙ্গ। ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হ'য়ে কবিদের পক্ষের দ্বারা উড়তে পারলে পাঠকের অনুভব কবির অনুভবের সঙ্গে সমকক্ষ হয়। সঙ্গীতের স্বরগ্রাম ও কবিতার ছন্দক্রীড়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিত্তাকর্ষক হয়—কিন্তু ভাবময়ত্ব কেবল রসিক এবং সহৃদয় পাঠক বা শ্রোতার অবধারণায়ই আসে।—যেমন সর্প একটি সঙ্গীতপ্রিয় জীব সে সঙ্গীতের সুরে যত মুগ্ধ হয় ভাবে তত বিভোর হয় না। রসিক ও ভাবুক কবি প্রকৃতির পূর্ব্বকথিত সঙ্গীতগুলির চিরমধুর নিস্বনে যত আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ে তদপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হয় সেই সঙ্গীতগুলির অপ্রত্যাশিত ভাবে। প্রকৃতির সঙ্গীত সাধারণের নিকটে গূঢ় ও রহস্যময় হলেও কারো কারো কাছে সে সকলের ভাব লুকানো থাকে না, কিন্তু তাকে বোঝবার জন্যে কবিপ্রকৃতির প্রয়োজন। প্রকৃতি-সঙ্গীতে শাশ্বত মাধুর্য্য বর্ত্তমান।

কবিতা বা সঙ্গীত সহজে বোধগম্য না হ'লেই যদি সেটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয় তবে পৃথিবীর অনেক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতই আমাদের বাদ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত অনেকে না বুঝতে পারলেও তার এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে আপাত-অর্থবোধহীনতা রসের পরিপন্থী হয় না। তাঁর গীতাঞ্জলিগত সঙ্গীতগুলি জগৎবিখ্যাত হ'লেও বিশ্ব এখনও তা সুস্পষ্ট বোঝে নি'। তা বলে' তা কি নিকৃষ্টশ্রেণীয় বলে' আমরা মনে করবো? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ইমার্সন, ব্লেক,

ব্রাউনিং প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত কবিদের সঙ্গীত প্রকৃতি-সঙ্গীতের মতই ভাবগূঢ় (Mystic)। সঙ্গীতরাজ্যের মধ্যে ভাবগূঢ় সঙ্গীতগুলির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সহজবোধগম্যতা সঙ্গীত বা কবিতার উৎকৃষ্টতার একটা বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে কিন্তু অপরিহার্য্য লক্ষণ নয়। পূর্ব্বোক্ত কন্দু নদীর মত অনেক কবিতা ও সঙ্গীতের ভাব অন্তর্নিহিতই থাকে। অবশ্য, যে সেই বালুকারাশির আবরণ মোচন করতে পারবে সে নিশ্চয়ই অন্তঃসলিলা মন্দাকিনীধারার সন্ধান পাবে। ভাব, ভাবের আত্যন্তিক গাম্ভীর্য্যে গূঢ় হ'য়ে যায় এবং সময় সময় কবির স্বার্থবোধক বক্রোক্তি-ছটায় সঙ্গীত বা কবিতা ভাবগূঢ় হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই শুনতে শুনতে অর্থ বুঝে নেওয়ার যে বিধি, তা কবিতা ও সঙ্গীতের সম্পর্কে নির্দ্দেশক মাপকাঠি বলা যেতে পারে না।

এস্থলে উপরোক্ত দুই প্রকারের ভাবগূঢ় কবিতার উদাহরণ দেওয়া গেল :—

(ক) ভাবের আত্যন্তিক গাম্ভীর্য্য হেতু 'ভাবগূঢ়' : যথা—

কহে বসিবিলা ধ্রুব উপরে,
বিষ্ণু পদকু লভিলা উত্তারে,
বদন্ত পঙ্কজ অন্তরে রহি,
বহন সে ভয়ঃনাশন বিধি,
বকতা এ গিরো,
বিশ্রামবার্ত্তা কহিবা সুন্দরে ॥১॥
বধূ কামদর্পে অছি জীবনে,
বধূ কামবশে ভ্রমে এ বনে,
বাহুন্ত অছ থেড়ে রমণীরে
কিশল শোভা তহুঁ রমণী এ
বিশে বাহু রখে,
বিলোকিছি গলা দক্ষিণ পথে ॥২॥
ইত্যাদি……'বৈদেহীশ বিলাস'
(উপেন্দ্র ভঞ্জ)

(খ) স্বার্থবোধক বক্রোক্তি ছটা হেতু 'ভাবগূঢ়' : যথা—

দেখি নব কালিকা বকালিকা মালিকা
আলি কালিকা কান্ত ঘরি,
হৃদা কেমন্তে করি কহিবা মন্তকারী গতিকি
এমন্ত ক্ষিতারি সে,—সহচরী,
ভাবে বঞ্চিলে এ-কালোকু
কথা দিবো কালোকালোকু
একেত ক্ষীণোদিনো হেলা দুর্দ্দিনো দিনো
নলহু যন্ত্রন্ত খেলোকু রে,
হিত আন যানহু সত কামীজনহু
অহি পশা অহিত এহি,
হত কৃপাণু সাণু মানন্ত ভাণু ভাণু—
তাপন্ত নিস্তারিগা মহী রে, সহচরী,
বিরহানলো হৃদোছলে
জলে সে হত নহে জলে
করুছি ভাতো ভাতো বেদকু শতো শতো
হৃদাছলোরে ঘন কোলেরে।
……ইত্যাদি।

—লাবণ্যবতী।

এইরূপ অনেক কবিতা ও সঙ্গীত। কিন্তু দুর্ব্বোধ্য ভাব সেগুলিকে অনেক স্থলে অসুন্দরও করেছে।

যদি সঙ্গীতের বাহ্য সৌন্দর্য্য (স্বরমাধুর্য্য ও পদবিন্যাস-কৌশল প্রভৃতি) মনোমুগ্ধকর হয় তবে রসিকদের পক্ষে যথেষ্ট বলে' গণ্য হবে। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বা কবিতা রচনা করা যেমন একটি শক্তির পরিচায়ক তেমনি সেগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা আরেকটি বিশেষ সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন। আনন্দ দান করা স্রষ্টার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'লেও মানুষ অত সহজে সেই আনন্দের অধিকারী হ'তে পারে না। বহির্ভাগ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হ'লেই অন্তর্ভাগ সুন্দর হয় না। বাহ্য সৌন্দর্য্যে যারা মুগ্ধ তারা আভ্যন্তরীণ সরসতা উপলব্ধি করতে পারে না। উৎকলের গীতি-কবি 'অভিমন্যু', কবিসূর্য্য বলদেব, গোপালকৃষ্ণ, বনমালী প্রভৃতি—এঁরা মিষ্টিক নন। তাঁদের ভাবসম্পদ সামান্য চেষ্টায় পাওয়া যায়, যদিও রসবোধ সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে সহজ নয়।

যথা :—

"বান্ধিবি কাহারো কেশো কুসুমে করি সুবেশো
কাহা ললাটরে দেবি চিত্তা।

কাহার কর্ণে কুণ্ডলো খসিবি রে মোর বালো
কাহাপাই কণ্ঠবিবি চিহ্ন রে
জীবনো।
কাহা অঙ্গুলি দেবি দেহি,
কাহাকু বা শিকাইবি বাহি রে।"
—কবিসূর্য্য বলদেব রথ।

উৎকলী সঙ্গীতে স্বরমাধুরী ও পদসম্পদ ছাড়া তার উচ্চ রস-ভাবগুলিই চরম উৎকর্ষের লক্ষণ। এই ভাবের অপর নাম—যাকে আমরা বলি কবিতা। সুতরাং উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে কবিতার অস্তিত্ব একটি অপরিহার্য্য লক্ষণ। একটা উৎকলী সঙ্গীত শুনলে বা পাঠ করলে তার বাহ্য-বিলাস আমাদের মনকে দীর্ঘকাল আকর্ষণ করতে পারে না। যথা :—

প্রীতি-লতাকু তু কুঠার পরায়ো
ছেদনো করছু মূলোক
অবিশ্বাসী বোলি এবে সে জানিলু
বাজা ভগর দেবীঠাক।
অক্রূর নাম সেবকে বড় রাগো,—
কিঙ্কিণী আজ্ঞাসে অতি প্রতিকারে
মানদ্বি নারি পালো ঝড়ো।
.....ইত্যাদি॥—কবিসূর্য্য বলদেব রথ।

এই সঙ্গীতের বাহ্যবিলাস ভাল না হ'লেও এতন্নিহিত কবিতা সঙ্গীতকে চিরস্থায়ী পরিমাণে জীবিত করে' রাখে। মানুষের কথা দূরে থাক্, পশু-পক্ষীরাও সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। তাই সঙ্গীতের সাহায্যে মানুষের হৃদয়কে গঠন করা বা তাতে রস সঞ্চার করা বাস্তবিকই একটা উৎকৃষ্ট পন্থা। যে জাতি যত উন্নত এবং যে জাতির সাহিত্য যত উৎকর্ষ লাভ করেছে, তার সঙ্গীত তত মহান্, তত উচ্চ। অবশ্য সঙ্গীত বলতে আমরা এখানে উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতকেই লক্ষ্য করে' বলছি। অতি প্রাচীন উৎকলী সঙ্গীত বা কবিতা আধুনিক সঙ্গীত বা কবিতার চেয়ে উন্নততর বলেই বোধ হয়। তার কারণ এই যে, সঙ্গীতের উৎকর্ষ—জাতির আনন্দ, স্বাস্থ্য, সদ্ভাব ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপরেই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে' থাকে। সঙ্গীতের সাহায্যে উচ্চ উদার ভাব প্রচার করা জাতীয় উন্নতির একটা প্রধান চিহ্ন। আধুনিক উৎকলী সাহিত্যে সঙ্গীতের অভাব অত্যন্ত বেশী। উৎকলীরা উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শিখতে তত চেষ্টা করেন না। ওঁদের জাতীয় বৈঠকে বা বিলাস-বিপনে বাংলা ও প্রাচীন উৎকলী সঙ্গীতই অপেক্ষাকৃত প্রভাব বিস্তার করে' থাকে। পরপ্রাদেশিক সাহিত্য হিসাবে নয়, কিন্তু বাংলা সঙ্গীতের প্রতি এতাদৃশ বিশেষ আদর ও উৎকলী সঙ্গীতের উৎকর্ষের প্রতি অনাস্থা সত্যই নিন্দনীয় এবং সাহিত্যিক দাসমনোভাব ছাড়া আর কিছু নয়।

পূর্ব্বেই বলেছি, উৎকৃষ্ট কবিতা সঙ্গীতের রূপান্তর মাত্র। তাই কবিতা সঙ্গীতময় না হ'লে তারও আদর নাই 'সঙ্গীতময়' অর্থে আমরা কেবল সরল ভাষাকে লক্ষ্য করছি না। কবিতা সঙ্গীতময় হওয়া উচিত—অর্থাৎ ওতে একটা বিশেষ মনোমুগ্ধকর স্বরমাধুরী থাকা আবশ্যক। সঙ্গীত হোক্ বা কবিতা হোক্ প্রত্যেকটাই গীতযোগ্য হওয়া প্রয়োজন বলেই মনে হয়। পৃথিবীর আদি কবি থেকে সুরু করে' আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কবিই গেয়ে গেছেন, কিন্তু কখনো কবিতাকে কথায় বা গদ্যরীতিতে লেখেন নি'। তাই কবিতার ভাষা পৃথক্ বলে' নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কবিতার স্বরগ্রামরীতি কতক পরিমাণে 'ছন্দ' নামে অভিহিত হ'তে পারে। পৃথিবীর কত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক গদ্যকে পদ্যের ছাঁচে ঢেলে দিয়েছেন, তাই বলে' কি সেগুলিকে কবিতা বলে' মেনে নিতে হবে? যে কবিতার উল্লিখিত ছন্দ নাই বা যা একসময়েই গীতযোগ্য নয়, সে তার প্রধান উৎকর্ষ হারিয়েছে নিশ্চয়ই; —যৌবনের উষায় আনন্দ যা, মানুষের জীবনের আশা ও শক্তি যা, কবিতার স্বরমাধুরীও তাই। সঙ্গীতবিহীন কবিতা হীনাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ। আমরা কবিতার স্বর-উচ্ছ্বাস প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে (জল, বাতাস, মেঘ, পাখীর কাকলী, পশুর ডাক, জনতার চীৎকার ইত্যাদি থেকে) লাভ করি। সুতরাং প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বরপরিমাণ আমাদের কবিতাও সরস ও সঙ্গীত হ'য়ে পড়ে। সঙ্গীত কবিতা যত হৃদয়গ্রাহী, সঙ্গীতবিহীন কবিতা তত নয়। তাই কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্বন্ধও সর্ব্বথা অপরিহার্য্য।

উৎকলী সাহিত্যে যে সব উৎকৃষ্ট সঙ্গীত আছে তার প্রধান একটি দোষ এই যে পদের কমনীয়তা হেতু তার অর্থবোধ অধিকাংশ স্থলে আটকে যায়—শব্দবিন্যাসপ্রণালী সরল হ'লেও। যেমন :—

ওহে বিহঙ্গোরঞ্জন-আধারে
চলি চলি দোলি পক্ষি,
অমল ধবল কিরণ-ছটারে
মোহন তুফল রচি।
.....ইত্যাদি।

উৎকলী পণ্ডিত বা কাব্যামোদীদের মতে উক্ত সাহিত্যের সঙ্গীত বা কবিতায় সংযুক্ত বর্ণ কিম্বা সন্ধি-সমাস-উদ্ভূত শব্দ শব্দের অতিপ্রয়োগ অনভিপ্রায়। তাতে বিশেষ ঘটিপাট ও ছন্দপতন হয়—আর সেই নিয়ম লঙ্ঘন করলে সঙ্গীত কবিতাও সুকর ও সুশ্রাব্য হয় প্রকৃত সঙ্গীত বা কবিতা একাধারে বর্ণ, লয়, ছন্দ এবং রাগিণীর অমৃত বর্ষণ করে। যতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে বা পদবিন্যাসে বর্ণ বা শব্দ বেড়ে গেলে তার সমস্ত মাধুর্য্য বিনষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে যার একটু ব্যতিক্রম ঘটলেই উক্ত কবিতা বা সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য তথা গৌরব হানি হয়। সংস্কৃতের মত উৎকলী সঙ্গীত বা কবিতায় কতক পরিমাণে গুরু-লঘু নিয়ম আছে। সে-গুলিকে রক্ষা করে' শব্দবিন্যাস করলে রচনা দোষমুক্ত ভাবেই পরিপুষ্ট হয়। উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ বা কবিরা সে সব মনে চলেন। দীর্ঘ উচ্চারণের স্থলে হ্রস্বস্বর-বিশিষ্ট শব্দ বা লঘু উচ্চারণের স্থলে দীর্ঘস্বর-যুক্ত বর্ণ প্রয়োগ নিতান্ত কদর্য্য ও কুৎসিত। দেখা যায়, উৎকলী সঙ্গীত ও কবিতায় আজকাল এই রীতি অনেক পরিমাণে অবহেলিত হ'চ্ছে।

নিম্নের কাব্যাংশটি দেখুন :—

তু দিনা পুছু মো মানসমূরতি
মুঁ পুণ সাক্ষাত দেবতা,
তু দিনা ভজিলু বীজমন্ত্র কহি,
মুঁ কহেঁ পরাণ-বান্ধবা।
.....ইত্যাদি।

—জনৈক উৎকলী কবি।

এই কাব্যাংশটিতে অনেকগুলি দোষ রয়েছে। প্রথমতঃ, দীর্ঘস্বর স্থানে হ্রস্বস্বর প্রয়োগ; দ্বিতীয়তঃ, হ্রস্বস্বরের স্থলে দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ; তৃতীয়তঃ, কতকগুলি যুক্তাক্ষরকে কবি তাঁর অক্ষমতা হেতু ভেঙে দিয়ে সরল করেছেন। দ্বিতীয় পংক্তির 'মুঁ পুণে'র স্থলে 'পুণে মু' কহলে অথবা 'পুণে' শব্দটির স্থলে একটি যুক্তাক্ষর দিলে বোধ হয় ভাল হ'তো। আবার ঐ পংক্তির 'সাক্ষাতে'র 'ক্ষ'টি ও তৃতীয় পংক্তির 'বন্ধু'র 'ন্ধু'টিকে একটি হ্রস্বস্বরের স্থলে বসান হয়েছে দোষ করে'। পড়তে গেলেই কানে বাধে। এইরূপ 'মরতি' 'পরাণ' এই দুটি শব্দও কবির অক্ষমতার পরিচয় দেয়, কেন না যুক্তাক্ষর 'র্ত্তি' ও 'প্রা'কে এখানে ভাঙা হয়েছে। এইরূপ কাব্যের অবহেলা উৎকলের আধুনিক অনেক কবিই করছেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে নূতন সৃষ্টি তাঁরা করলেও কবিতায় ও সঙ্গীতের কোন ছন্দ বা ধারার পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারেন নি। সে সব বিষয়ে তাঁরা প্রাচীনই র'য়ে গিয়েছেন। একমাত্র এই অবহেলাই যেন তাঁদের নূতনত্ব! কিন্তু এই অবহেলার কারণ দুর্ব্বলতা বা স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বা কবিতা লেখা কঠিন সাধনার বস্তু। শক্ত বলে' আমরা তাকে পরিহার করতে বলছি না। কিন্তু যখন যাঁরা কর্ত্তব্য লিখতে লিখতে পড়তা অঙ্কে বসে পড়তা থেকেই সরলতা বিশুদ্ধতা প্রভৃতি আসে।

উত্তম গায়কের কণ্ঠে সঙ্গীত সুমধুর হয়ে ওঠে। বাদ্যযন্ত্রগুলির তানলয়গুলিও এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে' থাকে। এই জন্য গান ও বাজনা গান্ধর্ব্ব বিদ্যা নামে আর একটি পৃথক কলা। উত্তম গায়ক হ'লে নিকৃষ্ট সঙ্গীতও মনোমুগ্ধকর হয়, দেখা যায়। উৎকল দেশীয় "পল্লী-চৌপদী", পটচিত্রিদের "ওপালো," শবর প্রভৃতি জাতির "জামুদ্রালি" গান গাইবার দক্ষতায় সময় সময় অত্যন্ত প্রীতিকর সুধাব্য হয়। এইখানে মনে রাখা উচিত যে, যা এতক্ষণ নিকৃষ্ট সঙ্গীতগুলিকে মাধুর্য্য দিয়ে থাকে, তা সেই সঙ্গীতগুলির স্বাভাবিক গুণ নয়,—কেবল গায়কের মধুর কণ্ঠেই এর সৌন্দর্য্য। কোন উত্তম গায়কের কণ্ঠে একটি গান শুনলে আমরা তাতে

মুগ্ধ হ'তে পারি কিন্তু তা বলে' আমরা সে সঙ্গীতটিকে উচ্চ স্থান দিব না। কদাচিৎ গায়ক নিকৃষ্ট সঙ্গীতে যে মাধুরী মাখিয়ে দেন তাই নিয়ে সেই সঙ্গীত সরস হ'য়ে উঠে; কিন্তু সেই মাধুরীর অভাবে সেই সঙ্গীতই সাধারণ গায়কের মুখে সুশ্রাব্য হয় না। সঙ্গীতের অনুকরণ প্রবৃত্তিতে সাধারণ লোকের একটা প্রবল পিপাসা। অনেক নিকৃষ্ট সঙ্গীতও ভাল গায়কের কাছে শুনলে লোকে সেটাকে শিখে ফেলে ও যখন তখন আবৃত্তি করতে থাকে। তাই সঙ্গীতকলাবিৎ উত্তম গায়কদের উচিত, সব সময় সমাজে রুচিসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতগুলো লোককে শোনানো। সমাজে উত্তম গায়কদের স্থান বাস্তবিক দায়িত্বপূর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ।

আমরা এখানে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করে' এই প্রবন্ধের উপসংহার করব। যদিও গত মাসে খণ্ডকবিতার (Lyric) কথা কিছু বলা হয়েছে তা'হলেও এস্থলে তার কথাকিৎ পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। একটা প্রশ্ন হ'চ্ছে, —উৎকলী ভাষায় খণ্ডকবিতা (Lyric) পূর্ব্বে আদৌ ছিল কি না? একজন উৎকলী লেখক মন্তব্য লিখেছেন যে— প্রাচীন উৎকলী সাহিত্যে লিরিক ছিল না, বর্ত্তমান যুগে কেবলমাত্র আমদানী করা হয়েছে। এই মত নিতান্ত অসমীচীন। যারা প্রাচীন উৎকলী সাহিত্যে অভিনিবিষ্ট হবেন তাঁরাই দেখতে পাবেন যে সেকালের প্রায় বারো আনা কবিতাই লিরিক। লিরিক কি? যে কবিতা ভাবনাত্মক, যাতে একটি বিশেষ চিন্তার পূর্ণ অবতারণা হ'য়ে থাকে, যার ভাষা তরল, সঙ্গীতময় ও সুবোধ্য আর যাকে গান করতে পারা যায়। এই নিয়মগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে জানা যাবে যে প্রাচীন কবিতাগুলির অধিকাংশই লিরিক। উৎকলের প্রাচীন "ছান্দ"গুলি এক একটি লিরিক। অন্যান্য সঙ্গীতও আছে—সেগুলিতেও লিরিকের সমস্ত গুণ ও নিয়ম বর্ত্তমান। সামন্ত সিংহার, কবিসূর্য্য বলদেব, গোপালকৃষ্ণ, বনমালী প্রভৃতি বিখ্যাত লিরিক লেখকগণের নাম এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্র ভঞ্জ, দীনকৃষ্ণ,—এঁরাও লিরিক লেখক হিসাবে কম পারদর্শী নন। আজকাল ভক্তকবি মধুসূদন দাস একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লিরিক লেখক হ'য়ে উঠেছেন। প্রাচীন উৎকলী সাহিত্যের কোন দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় লিরিকের সংখ্যাই বেশী। এতেও যদি কেউ এর প্রতিবাদ করেন তবে তাঁকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলে' স্বীকার করতে হবে। এখন আধুনিক ও প্রাচীন লিরিকের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় আধুনিক লিরিক প্রাচীন লিরিকের সমকক্ষ নয়। প্রাচীন লিরিকও আধুনিক লিরিকের মত হৃদয়ের সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রীতি, স্নেহ, দয়া ইত্যাদি গুণ ও কোমল রসের আধার। এ ছাড়া প্রাচীন লিরিকে বিভিন্ন রস যত পাওয়া যায় আধুনিক লিরিকে তত যায় না। আবার আধুনিক লিরিকগুলে কতকগুলি কারণে প্রকৃত লিরিক নামেরই যোগ্য নয়। গীতযোগ্য হওয়া লিরিকের একটা প্রধান গুণ, কিন্তু সে গুণ আধুনিক লিরিকে বিরল প্রাচীন লিরিক তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রাচীন যুগে অনেক সঙ্গীতজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে যা স্বতঃই লিরিক ধর্ম্ম। আজকাল আর উৎকলী ভাষায় কেউ লিরিক-সুর সৃষ্টি করছেন না। বিশেষ আবশ্যক হ'লে উৎকলীরা বাংলা, হিন্দী, তামিল কিম্বা তেলেগু ভাষা থেকে সে সকল সংগ্রহ করে' থাকেন। যাঁরা বলেন পূর্ব্বে লিরিক ছিল না আমরা তাঁদের একবার ভাল করে' প্রাচীন উৎকলী সাহিত্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ফেরাতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

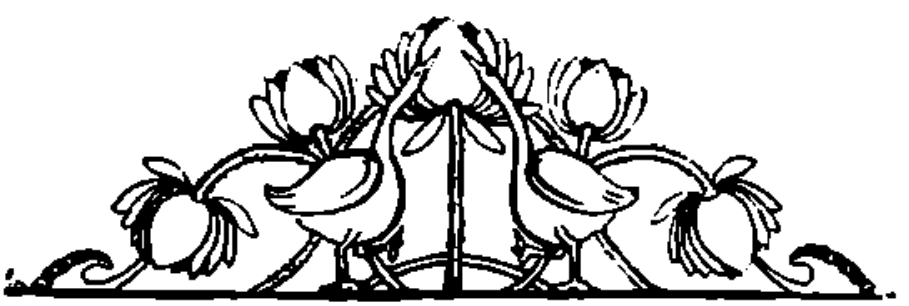

কাক-জ্যোস্নায়

বন্দে আলী

তোমারে ফিরায়ে পেনু বরষার ভরা-মেঘ সাথে,
আধো ছায়া আধো আলো কাক-জ্যোস্নায়—
এলে আজ মোর আঙিনাতে।
দূরের পথিক বেশে, যে অতিথি এলে দ্বারে,
নাহি মোর কোনো আয়োজন.
বিস্ত বস্ত্র-বাস মেলি' ভিখারীর সাজে এ যে
কাঁদে মোর বিরহী তরুন।
ভেবেছিনু কাছে বসি' জীবনের কাঁদা-হাসা
একে একে কহিব সকলি,
কহিব মনের কথা,—গূঢ় মর্ম-ব্যথা মোর
যারে তুমি গেছ পায়ে দলি'!
তোমার পায়ের তলে ফুল ওঠে বিকশিয়া—
ফুলশতদল দল মেলি'
বাজে বাঁশী, ফোটে গান,—নিখিলের কামনারে
কর যেন করো অবহেলি'!

সেদিন তোমার মুখে পড়েছিলো সবটুকু আলো—
মুখের ভাষা-হাসি,—বেশের সৌরভ সব,
বড় মোর লাগিল সে ভালো!
আমারি সমুখে বসি' পড়েছো নয়নে মোর
কে-পিপাসা—কাহার লাগিয়া?
এতদিন পরে বুঝি মোর তরে জাগিয়াছে
ও' কঠিন অকরুণ হিয়া।
তোমার সমুখে আজ আলো হেরে নিরিবিলি
দেখিবারে চাহি মুখখানি,
নিজেরে ঢাকিয়া তুমি আমারে দেখিতে চাহো
সে-আলোরে আঁচলে আনি'।
সেদিনের সব কথা মনে পড়ে বেদনায়—
দুঃখময় সুখের স্বপন;
আমার চোখের জল সেদিন যখনি ঝরে,
আজি তাহা করিছ গোপন!

তুমি হাতে তুলে' মোরে দিলে আজি যেই মধুফল
তাহার আস্বাদ ল'য়ে বিহ্বল অন্তর মোর—
যৌবনের ভাবনা চঞ্চল।
ভেবেছিনু কবো আজ না-বলা বিরহ ব্যথা—
অকথিত সুগোপন বাণী;
পাষাণ গলিয়া নিজে করেছো গরব হেলা
—ঝরণা ঝরেছে তা'র জানি।
তোমারে একেলা পেয়ে কিছুই হ'লো না বলা,
কোনো কথা ফুটিল না ভাষে,
তোমার মুখেতে চাহি' ভুলে গেনু সব দুখ
—তুমি মোর বসেছো যে পাশে!
রাঙা চুমা ভরে' দিলে মোর দুটি করতলে
আমি ছাড়া জানিবে না কেহ,
তোমার হাসির তা'য়—পরশের ছন্দে শুধু
পরিপূর্ণ হ'ল গেহ—স্নেহ।

তোমারে বিদায় দিনু বরষার ভরা-মেঘ সাথে,—
আলোহীন আঁধারেতে সুদূরের পথ বহি'
চলে' গেলে আধ-প'র রাতে।

ভূত-ভারতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ

বেচারা নিত্যগোপাল! এত বেশী এ-জিনিসটাকে যে ভয় পেত, বেছে বেছে শেষটা তারই এই অবস্থা! ভয় পাওয়া দূরে থাক্, নিজেকে সর্ব্বনাশের মুখে স'পে' দিয়েও আজ আনন্দই অনুভব কর্‌ছে সে!

হঠাৎ একদিন সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত তার মূর্চ্ছা ভাঙ্‌ল না। পরদিন তার জ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লাম, সে চোখে কিছু দেখ্‌ছে না, কানেও কিছু শুন্‌ছে না। কয়েকবার ঐ কথাটাই সে বল্‌লে, আর কিছু বল্‌তেও পার্‌ল না। দু'তিন জন ভালো ডাক্তার এনে দেখালাম, কিন্তু কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌ল না। তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ নিজে থেকেই তার শ্রবণশক্তি ফিরে এল, যা-না ক'রে সে কথার জবাব দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে বেশ কিছুদিন লাগ্‌ল। যখন সবদিক্ দিয়ে সে বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আস্‌ছে তখন হঠাৎ আবার একদিন মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ল। সেই দ্বিতীয় মূর্চ্ছা যখন ভাঙ্‌ল, তখন অসুস্থতার কোনো চিহ্ন কোথাও রইল না বটে, কিন্তু যে সুস্থ মানুষটা জাগ্‌ল সে নিত্যগোপাল নয়, কোকোজী।

পাঁচ দিন একটানা নিত্যগোপালের দেহকে আশ্রয় ক'রে' কোকোজী বেঁচে রইল। তার কোনো প্রতিদিনের আমরা কল্পনা পার্‌লাম না। তবু যথাসম্ভব তাকে চোখে চোখে রাখ্‌লাম। সে একবার Normaর বাড়ীতে Phyllisএর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেল, আমরা সঙ্গে গেলাম। Phyllisও অবসর-মতো আমার বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। প্রতিবার কিছু কর্‌তে পার্‌ব না জেনেই তাতে আর আমরা কোন বাধা দিলাম না। পর দিনের দিন ভোরে ঘুম ভেঙে নিত্যগোপাল আবার বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ল।

আমি বল্‌লাম, "ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এর তুমিই দেখে ফিরে যাও, নয়ত তোমার মাকে আমরা খবর দিয়ে এখানে আনাচ্ছি। তোমার যা বলবার তাঁকেই তুমি বলবে।"

সে বল্‌লে, "মা বেচারী বেশ আছেন, মিছিমিছি তাঁকে তোমরা ভয় পাওয়াবে।"

আমি বল্‌লাম, "তা হোক্, তাঁকে ভয় পাওয়ানোই এখন দরকার।"

সে বল্‌লে, "যা তোমাদের খুসি কর্‌তে পার। কিন্তু এটা জুন মাস, বুড়ো বাদুড়কে কষ্টের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আস্‌তে বলা কতখানি সুবিবেচনার কাজ হবে সেটাও তোমরাই ভেবে দেখো।"

আমরা তবু তার মাকে আনানোই স্থির কর্‌লাম, এবং ব্যাপারটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত ক'রে' তাঁকে চিঠি লিখ্‌লাম। বিলেতের বিখ্যাত spiritualistদের যে আড্ডাগুলো জানা ছিল, Stead Bureau, London Spiritual Alliance, Psychic College প্রভৃতিকে চিঠি লিখে তাদের পরামর্শ চাইলাম। তারপর নিজেরা সারাক্ষণ সতর্ক হ'য়ে নিত্যগোপালের উপর চোখ রাখ্‌তে লাগ্‌লাম। তার প্রকৃতিস্থ অবস্থায় দু'তিন জন বৌদ্ধ 'ফুদি' ও 'পৌলা' ওরা ডেকে এনে তাকে দেখালাম, একদিন ষ্ট্র্যাণ্ড হোটেলে একজন professional ইয়োরোপীয় spiritualistএর কাছেও তাকে নিয়ে গেলাম, কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হলো না। কোকোজী আবার এল এবং এবারে পাঁচ দিন নয় বারো দিন একটানা সে রইল।

একদিন নিজে থেকেই সে আমায় বল্‌লে, "তোমাদের ভয় পাওয়াটা কি এবার কিছু কমেছে?"

আমি বললাম, "ভূতের জিনিসটা ঘাড়ে এসে পড়লে লোকে আর তাকে ভয় করে না। কিন্তু এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?"

সে বললে, "উচিত-অনুচিতের বিচার মানুষ পরলোকে এসে ঠিক তোমাদের দৃষ্টি নিয়ে করা যায় না।"

আমি বললাম, "তোমার বিচারের কথাই বলছি।"

সে বললে "যাতে করে' দুদিকই বজায় থাকে তার ব্যবস্থা আমি করব। এই ক'দিন তোমরা ভালো করে' আমার সঙ্গে কথা বলনি, অথচ Phyllis-এর পর তোমাদের বন্ধুত্বের আকর্ষণই কাজলের প্রতি সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আমার ছিল। তোমাদের চোখ দিয়ে আমি চাই না।"

আমি বললাম, "নিত্যগোপালের মা আর দু'চার দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন, তখনো কি এই অবস্থাটাই চলবে?"

সে বললে, "ঠিক এ অবস্থাটা চলবে না, তারই চেষ্টা কিছুদিন ধরে' আমি করছি। তার মায়ের কাছে নিত্যগোপালের এই শরীর নিত্যগোপালেরই থাকবে, বাকী সময়টা প্রয়োজনানুযায়ী এ ছেলের অধিকার আমার। ইচ্ছামতো আনা-যাওয়া করবার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই আমার অনেকটা বেড়ে গিয়েছে তা ত দেখতেই পাচ্ছ।"

আমি বললাম, "তোমার যে রকম অভিরুচি!"

তারই তিন দিন পরে দেশ থেকে নিত্যগোপালের মা এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে দেশের এক বিখ্যাত অবিখ্যাত কবিরাজের বিধানপত্র, অলৌকিক মাদুলী, স্বপ্নাদ্য ঔষধ ইত্যাদি জাতীয় তিনি নিয়ে এলেন। কিন্তু সে সমস্ত সত্ত্বেও নিত্যগোপালের ছেলে কোকোজীর আনাগোনা যথানিয়মে চলতে লাগল। কিন্তু নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যতক্ষণ নিত্যগোপালের মা কাছে থাকতেন ততক্ষণ কোকোজী আসত না, এবং যখনই আসত আমার বাড়ী ছেড়ে সে চলে' যেত। প্রায়ই রাত বারোটা একটা বাজিয়ে সে Normaর বাড়ী থেকে ফিরে আসত, অবশ্য যে ফিরত সে নিত্যগোপাল। Reggieও Normaর বাড়ীর আড্ডাতে গিয়েই এর পর জুটল। তার কাছে শুনলাম, সে বাড়ীতে আড্ডা জমাবার একটা সুবিধা এই যে সেখানে পানীয় দ্রব্য আমদানী করতে কিছু বাধা নেই।

এই অবস্থাটাই যখন প্রায় নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল, তখন একদিন মাকে নিয়ে নিত্যগোপাল তার পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ীটাতে ফিরে গেল। আমি বললাম, "আরও কিছুদিন থেকে গেলে হ'ত না?"

সে বললে, "কি দরকার? তোমাদের আলিয়েছি, তাই ত ঢের।"

আমি একটুক্ষণ চুপ করে' থেকে বললাম, "ভালো তোমার হয় করছে না?"

সে বললে, "ভয়টা যে কেটেছে তার থেকেই ত প্রমাণ হচ্ছে যে কোকোজী আমার সত্যিই কত বড় বন্ধু। আজ বহুদিন পরে আবার সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো বোধ করছি।"

তারপর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে' বললে, "একটা কথা তোমাকে কিছুদিন ধরে' বলব মনে করছি, কিন্তু একটু ভালো করে' না দেখে বলতে সাহস হয়নি কিছুদিন ধরে' নিজের মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করছি। আমি ঠিক সেই আগের মানুষ ত আর নেইই, সারাক্ষণ যে একটা ভয়ের ভার নিয়ে কাটাতাম সেটা গিয়েছে, মনের জোর ফিরে এসেছে, কাজের উৎসাহ বেড়েছে, আমার সেই inferiority complexএর বদলে এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীকে কিছু একটা দেব বলেই যেন আমি জন্মেছি। আমি এও লক্ষ্য করেছি যে সব-কিছু সম্বন্ধে আমার মনটার সজাগ-সচেতন ভাব আর আমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য পর্য্যন্ত এই ক'দিনে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সেটা বিশেষ কিছু নয়। আসল যে পরিবর্ত্তনটা হয়েছে আমার মধ্যে তার কথাই তোমাকে জানাতে চাচ্ছি।"

এই পর্য্যন্ত বলে একটু চুপ করে' থেকে আবার সে বলতে লাগল, "তোমার মনে আছে, প্রথমটা তোমরা যখন Seanceএ বস্‌তে এবং আমার trance হ'ত, জেগে উঠে কোনো কথাই আমার মনে থাকত না? এই অবস্থাটা অনেকদিন পর্য্যন্ত চলেছিল। কিন্তু কিছুদিন থেকে tranceএর সময়ে যা যা ঘটে তার যেন অনেকখানিই আমার মনে থাকছে। যতক্ষণ আমার শরীরটা অধিকার করে' কোকোজী থাকে,

আমি যেন তখনো একেবারে সে শরীরের অধিকার ছেড়ে যাই না, ঘড়ির কোন একটা ছোট কোণ অধিকার করে' আমিও যেন জেগে থাকি। সে যা করে বা বলে বা ভাবে, তার ওপর সাক্ষাৎভাবে আমার কোনো হাত থাকে না, কিন্তু আমি সেগুলোর সাক্ষী থাকি এবং কোকোজী চলে' যাবার পরে তার অনেকগুলিকেই আমি মনে আনতে পারি। কেবল তাই নয়। আমার মনে হয়, এই শরীরটাকে অধিকার করে' আমি যিনে যখন থাকি, তখনও আমার মধ্যে কোনো একটা আত্মগত কোকোজীকে আমি বহন করি। আমার কোনো স্বাধীনতায় সে-সমস্তটা সে হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু আমি কোথায় কি রকম ব্যবহার করলে সে সুখী হয় তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, এবং তদনুযায়ী ব্যবহার থেকেথেকে অনেক সময় আমি করে' থাকে। কোকোজীর বিগত জীবনের অনেক স্মৃতি খুব সহজেই এখন আমি মনে আনতে পারি, মাঝে মাঝে কোনগুলো যে আমার জীবনের স্মৃতি এবং কোনগুলো কোকোজীর তাই নিয়ে আমার গোল বাধে। মোটকথা, এই শরীরটার মধ্যে এখন একসঙ্গে একই সময়ে দুটো মানুষ রয়েছে, তাদের একজন নিত্যগোপাল, আর একজন কোকোজী।"

এর পর আবার কিছুদিন পরে তার সঙ্গে যখন দেখা হলো সে বললে, "দেখো বন্ধু! কিছু এবারে আর দুজনের হয়েও তোমাকে অভিবাদন করছি না, আমার মধ্যে দুটো personality আস্তে আস্তে মিলে এক হ'য়ে গিয়েছে। নিজের খুশিমতো আমাকে নিত্যগোপাল বা কোকোজী যখন যা ইচ্ছা মনে করতে পার কিন্তু তুমি একবারও আসনি কেন এতদিন?

আমি বললাম, "আসতে সাহস হয় নি। বন্ধুত্বের ভারসাম্য একজনের মন রেখে চলাই যথেষ্ট শক্ত, একসঙ্গে দুজনের মন রেখে চলতে যে পারব সে ভরসা একেবারেই করিনে।"

সে বললে, "কেন কর না? নিত্যগোপাল এবং কোকোজী দুজনেই ত তোমার বন্ধু ছিল?"

আমি বললাম, "সে যতদিন তারা আলাদা ছিল। তখন একজনের ওপর রাগ হ'লে অন্যের কাছে তাই নিয়ে নালিশ চলত। কারুর প্রতি মনের টানের কমিবেশী হ'লে সেটা গোপনে প্রকাশ করতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু এর পর সারাক্ষণ ওজন করে' কথা বলতে হবে,কোকোজীকে বাদ দিয়ে নিত্যগোপাল বা নিত্যগোপালকে বাদ দিয়ে কোকোজীকে কিছু বলা চলবে না, একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের জন্য কিছু করা চলবে না।"

সে হোঃ হোঃ হোঃ করে' হেসে উঠল, বললে, "সে অসুবিধাটা কি আমার চেয়ে তোমার বেশী হবার কথা? আমারও অসুবিধা হ'ত যতদিন মানুষ দুটো আমার মধ্যে আলাদা ছিল। কিন্তু তোমাকে বলছি কি তা হ'লে? এক অর্থে নিত্যগোপাল ও কোকোজী দুজনেরই আজ মৃত্যু হয়েছে। দুজনকে মিলিয়ে এক করে' আমার মধ্যে নূতন একটা মানুষের জন্ম হয়েছে। সেই নূতন মানুষটাকে ভালোবাসতে চেষ্টা কর, দেখবে কোনো অসুবিধাই হবে না।"

কথাটাই তার সঙ্গে বসে' পরমুহূর্তে কাঁদিয়ে তার এ কথার সত্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। মনে হলো সত্যই নিত্যগোপাল ও কোকোজী উভয়ের সমস্ত কিছু ভালো, যা কিছু ভালোবাসার সেগুলো তাই মিলিয়ে এই নূতন মানুষটার সৃষ্টি হয়েছে। কোকোজীর জন্য আর নিত্যগোপালের inferiority complex দুটোই চলে' গিয়ে একটি সুন্দর আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মনির্ভরের ভাব তার স্থান অধিকার করেছে, অহংয়ের তেজটা আছে কিন্তু তার ওপরকার কটুতার খোঁচাগুলো আর নেই। মনে হলো একটি নিবিড় আত্মিক মিলনের মধ্যে ব্রহ্মদেশের দুঃসাহস আর ভারতবর্ষের ধৈর্য,ব্রহ্মদেশের বেপরোয়া আর ভারতবর্ষের তীক্ষ্ণ সাধন, ব্রহ্মদেশের উচ্ছৃঙ্খলতা আর ভারতবর্ষের শাসন এই মানুষটিতে একসঙ্গে হ'য়ে গিয়েছে।

নিত্যগোপাল আগে ছবি আঁকত, চারুশিল্প ছিল তার রীতি এবং ভারতবর্ষ ছিল তার দেশ, সুতরাং সে ছবিতে কোনো অভাব ছিল না। এখন সে ছবি আঁকে, তার প্রেরণা জোগায় ব্রহ্মদেশ আর তার রীতিটিও ঠিক ভারতবর্ষীয় আর নেই, সেটা ব্রহ্মদেশের প্রভাবে অনেকখানি প্রভাবান্বিত, কিন্তু সব জড়িয়ে একেবারে তার নিজস্ব। তার আশ্চর্য্য প্রতিভার সমাদর এখন চতুর্দ্দিকে, হাত আজ এখন শিল্পরসিকদের মুখে মুখে।

কোকোজীর বাড়ীর সাদ্ধ্য আড্ডাটা এর পর নিত্যগোপালের বাড়ীতে জমতে লাগ্‌ল। তার দু'একজন আর্টিষ্ট বন্ধুর সমাগমে আমাদের কিঞ্চিৎ দলবৃদ্ধি হলো। Reggie আসে, Phyllis ত আসেনই আর আসেন Normal ;—spiritualismএর চর্চ্চাটা আর হয় না, কবিতা, শিল্প, সাহিত্য, এ সমস্তের আলোচনা নিয়েই আসর সরগরম হ'য়ে থাকে। তাছাড়া আর একটা যে বিষয়ের আলোচনা হয় সেটা ঠিক আসরের বাইরে, গোপনে গোপনে। কিন্তু গোপনে হলেও সেটা আমাদের চোখ এড়ায় না, তাই Reggie সেদিন বারান্দা থেকে Normaকে একহাতে জড়িয়ে ধরে' ভেতরে এনে তার ভাবী পত্নীরূপে তাঁকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলে সেদিন আমরা একটুও অবাক হলাম না। আরও আগেই যে ব্যাপারটা ঘটবে বলে' আমরা আশা করেছিলাম।

কিন্তু সত্যিই একটু অবাক্ হলাম যেদিন শুনলাম, Phyllisও নিত্যগোপালকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন আর নিত্যগোপালের বুড়ী মায়ের তাতে অমত নেই। Reggie আর Norma খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এসে খবরটা দিয়ে গেল, কিন্তু আমার কেমন যেন জিনিসটা ভালো লাগ্‌ল না। যদি সত্যিই নিত্যগোপাল নিজে হ'ত ত নিশ্চয়ই খুব খুসি হতাম,—কিন্তু এই ভূতুড়ে বিয়ে!

এর পর অবশ্যম্ভাবীগুলো স্কুলের বাস উঠিয়ে কলকাতায় ফিরবার আয়োজনে কিছুদিন আমায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হলো, অত্যন্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিত্যগোপালের বাড়ীর আড্ডায় কয়েকদিন যেতে পারলাম না। একদিন আলমারী থেকে বই নামিয়ে সেগুলোকে গুছিয়ে বাক্সে বোঝাই করতে গিয়ে দেখি, এক সার বইয়ের পেছনে আলমারীর গায়ে তিনখানি মামারি রকম মোটা খাতায় কোকোজীর একটি ডায়েরী! মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের শৈশব থেকে সমস্ত ইতিহাস তাতে সে গুছিয়ে লিখ্‌ছিল, একেবারে শেষ হয়নি। প্রথম খাতাটার মাঝখানে একটুকরা একটি চিঠি :—

"নিত্য, বইটা কাছছাড়া কোরো না, আর কাউকে দেখ্‌তেও দিও না, পড়ে' যত শীগ্‌গির পার ফিরিয়ে দিও। শেষ করে' যাবার সময় যেন পাই।—কোকোজী।"

দরজার খিল লাগিয়ে শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিন ধরে' কম্পিত-বুকে ডায়েরীর আদ্যোপান্ত পড়্‌লাম। নিত্যগোপালের অধিকাংশ দুষ্টো মানুষের রহস্য উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেল। Suffolkএর Walberswick এ বেড়াতে যাওয়া থেকে Health Exhibitionএ Reggieকে অতি গোপনে বলা সেই কথা, এমন কি Phyllisএর জন্যে ডাক্তারের বাক্সা দেওয়া gland extractটির বহস্য পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে আর আমার বাকী রইল না।

উত্তেজনায় বুক কাঁপ্‌ছিল, এর পর রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর, ওর জন্যে এত করেছি, আর শেষে ওই কি না এমন ভাবে আমাকে বোকা বানাল। কত বড় দুশ্চিন্তার দুর্ভোগই না দিনের পর দিন ঐ হতভাগাটার জন্যে আমাকে ভুগ্‌তে হয়েছে! বাইরে ভালোমানুষ সেজে পাষণ্ড, ভেতরে ভেতরে এতবড় বজ্জাত। ভূতের গল্পটাগুলো পর্য্যন্ত সব ওর মিথ্যে, কেবল আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে তৈরি। উঃ, একদিন নয়, দুদিন নয়, কতবড় বদমায়েসী ভেতরে থাক্‌লে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এমন অভিনয় মাসের পর মাস গুছিয়ে যাদু করতে পারে! সুন্দর মুখ দেখে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে, তাই এমনিতে পাত্রা পাবে না জেনে কোকোজীর ভূত সেজে হতভাগা তাঁর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করতে চলেছে! কিন্তু কোকোজীর ভূত সত্যিই কি নেই? পায়ল না একদিন ওকে ধরে' ওর গলাটা টিপে দিতে।

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তেই ডায়েরীগুলো বগলে করে' পথে বেরোলাম। ঠিক করলাম সেখানে Phyllis, Reggie, Norma এবং তার জন্য সমস্ত admirerদের সামনেই ওর সমস্ত চালাকী আমি ধরিয়ে দেব। তখন সন্ধ্যা, বেশ অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। স্কুলে সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকার হ'য়ে যেতে বেশী দেরি লাগে না। দূর থেকেই দেখ্‌লাম, তার বাড়ীর সব ক'টা জানালায় আলো জ্বলছে। সিঁড়িতে উঠ্‌বার পথে ছাদে যেয়ালে সর্ব্বত্র নানাবর্ণের উৎসব-সজ্জা। নীচে দাঁড়িয়ে উপরের উৎসব-কোলাহল অস্পষ্ট করে' শুনতে লাগ্‌লাম, সিরানোর সঙ্গে বেলোনার

সঙ্গীত কানে আসতে লাগল। একটু ঘুরে ঘরে' গিয়ে অন্ধকারে নিজেকে যথাসাধ্য আড়াল করে' দাঁড়ালাম। সেখান থেকে বসবার ঘরের অর্ধেকটা অনেকখানি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। দেখলাম, চতুষ্পার্শ্বের বন্ধুদের মিলিত বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থানে স্বয়ংপ্রভাতের প্রজাপতির মতো Phyllisএর নৃত্য চলে। আজ আর বেহালার নৃত্য নয়, আজ এ নৃত্যাবেগ অগ্নিশিখা, আজ আর সে কামনা করে না, কামনাকে আজ সে দর্পের সঙ্গে গ্রহণ করে। তার সেই প্রদীপ্ত কামনার তেজের সম্মুখে আমার রোষবহ্নিকে আমি স্থাপিত করতে পারি সে অপেক্ষের আমার কোথায়? নিজেরই অজ্ঞাতে হাতের ডাম্বেলীগুলোর উপরে আমি কোঁচার কাপড়টা টেনে দিলাম।

যখন বাড়ী ফিরলাম তখন রাত বেশ অনেকখানি হয়েছে। না খেয়েই গিয়ে দরজা বন্ধ করে' আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে কিছুই ভাবতে পারলাম না, চারিদিকে মাথাটির মধ্যে রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন চিন্তা উধাও মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। কোকোজী, Phyllis, Reggie, নিত্যগোপাল, সকলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে সুরু করে' আজ পর্যন্ত সমস্ত দিনের স্মৃতির টুকরো ঘূর্ণীপাকে কাগজের টুকরার মতো জট পাকিয়ে ঘুরতে লাগল। মনটা একটু স্থির হ'লে ভাবতে লাগলাম, বেচারী Phyllis! অদৃষ্ট তাকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেলছে! কোকোজীর অকালমৃত্যুর পরে, সত্যিকারের tragedy যেটা সেটা ত Phyllisএরই জীবনে, তারই মনের মধ্যে,—বাকীটা এই পৃথিবীর অতি সাধারণ একটা দুর্ঘটনা। যার জন্যে তিনি স্বদেশ স্বজন অবলীলায় ছেড়ে এই সুদূর নির্বাসনকে বরণ করেছিলেন, কোনো দুঃখকে দুঃখ মনে করেন নি, কোনো দুর্গতির ভয়ে পেছপা হননি, সে তো তাঁর স্বামী মাত্রই কেবল ছিল না, সে একাকীই তাঁর মনের মধ্যে তাঁর স্বদেশ স্বজন, তাঁর সমস্ত সুখ-আশা, জীবনের প্রতি তাঁর সমস্ত অনুরাগের মর্মস্থানটিকে অধিকার করেছিল। স্বামীকে হারিয়ে তাঁর মতো সর্বহারা ক'জন মানুষে হয়? তাঁর দুঃখ, তাঁর নিরাশার তুলনা নেই বলেই ত এত সহজে নিত্যগোপাল তাঁকে প্রবঞ্চনা করতে সমর্থ হয়েছে। কোথাও আর কোনো অবলম্বন তাঁর নেই বলেই ত যে-তিনিদ মানুষের সহজ বিশ্বাসবুদ্ধির অতীত তারও ওপরে এমন ঐকান্তিক ভাবে তাঁর নির্ভরকে তিনি স্থাপন করেছেন তাঁর এই সুন্দর বিশ্বাস আশ্রয়টিকে কোন্ প্রাণে আমি নষ্ট করব? ভুলেও তিনি যদি একটুখানি সান্ত্বনা পান কেন আমি তাঁকে তা পেতে দেব না? না দেবার কি অধিকারই বা আমার আছে? যে সত্যকে নিদারুণ নিষ্ঠুর আঘাতে আমি উন্মোচিত করতে চাচ্ছি, তাঁর সুন্দর জীবনটির সার্থকতার মূল্য কি তার চেয়ে কম?

পাছে কোথাও ভুলে নিজেকে প্রকাশ করে' ফেলি সেই ভয়ে কলকাতার আসবার আগে তাদের সঙ্গে আমি দেখাও করলাম না। যদিও অবশ্য ইচ্ছা হচ্ছিল, Phyllis সুখী হয়েছেন চোখে সেটা একবার অন্ততঃ দেখে আসতে।

তাদের বিয়ে হ'য়ে গেল কি না?

তারপর কলকাতায় এসেছি আমি আজ দিন-পঁচিশেকের বেশী নয়। একদিন বালিগঞ্জের দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখি, ষ্টেশনের খুব কাছে একটা একতলা বাড়ীর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে কোন্ লোক! নিশ্চয় দিনের বেলাকার ক্ষীণ আলোয় ভূত দেখছি না ঠিক করে' চলেই আসছিলাম, এমন সময় পিছন থেকে নারীকণ্ঠে কে আমার নাম ধরে' ডাকলে। ফিরে দেখি Phyllis ছুটে আসছেন!

বললাম, "কি ব্যাপার?" বিস্ময়ে আমার বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হ'ল!

তিনি বললেন, "ভূতুড়ে ব্যাপার নয়। আসুন, সবই জানতে পারবেন।"

আমি দোরগোড়ায় পা দেবা মাত্র কোকোজী বললে, "আমার স্ত্রীকে এতটা রাস্তা এই রোদে তোমার পিছন পিছন না ছুটিয়ে তোমাদের জাতের আশ্চর্য gallantryর পরিচয়টা না হয় একটু কম করেই দিতে!" তারপর স্মিতমুখী Phyllisএর দিকে চেয়ে বললে, "Phyllis, ও sausage খেতে ভালবাসে তা ভুলো না যেন, আর mayonnaise দিয়ে ডিম। হাঁ, আর তুমি নতুন যে lemon friedটা করতে শিখেছ সেইটে!"

আমি বল্লাম, "হঠাৎ আলাদীনের প্রদীপের সন্ধান পেয়েছ না কি কোথাও ?"

সে বল্লে, "প্রদীপ গোড়াগুড়িই ছিল, মন্ত্রটা সম্প্রতি কেটেছে।" বলে' কল্‌কাতার কোন্ স্কুলের একটি বাঙালী শিক্ষক পেশের বন্ধুর সঙ্গে আরও কি কি সব উপাদান মিশিয়ে তাকে খাইয়ে খাইয়ে প্রায় সুস্থ করে' তুলেছেন সেই ইতিহাস সে বিবৃত কর্‌লে। এখন সে কল্‌কাতারই একটা কলেজে বেশ ভালো মাইনের চাকরী পেয়েছে।

সমস্ত দিনটা তার ওখানেই কাটল। কাকেও কিছু না বলে' হেন্‌রি ছেড়ে চলে' যাবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কবে কোথায় কিভাবে তার কেটেছে, কেমন করে' খবর পেয়ে নিত্যগোপালের সঙ্গে Phyllisএর বিয়ের ঠিক আগের দিন হেন্‌রি গিয়ে হাজির হ'লে সে তাকে উদ্ধার করে' কল্‌কাতায় নিয়ে এসেছে, এখানে কি করে' তাদের চল্‌ছে, পুঁটিনাটি শুদ্ধ সব তার কাছে শুন্‌লাম।

বল্‌লাম, "কিন্তু তোমার সেই চিঠি ?"

সে বল্লে, "সেইটুকু আমার অপরাধ। Phyllisএর ভালোবাসাকে এই সুযোগে একটু পরীক্ষা করে' নেব স্থির করেছিলাম।"

আমি বল্লাম, "তোমার নিতান্ত মাথা খারাপ। আর তা যদি না হয় ত Phyllisকে তুমি ভালোবাসো না। এতবড় ঝুঁকি কোন্-স্থলে কেউ কাউকে দিতে পারে ?"

সে বল্লে, "মাথা তখন আমার খারাপ হয়েছিল সেটা ঠিক। কিন্তু তখন আমার শরীরের অবস্থা এমন ছিল, যে, যে-কোনোদিন আমার মৃত্যু হ'তে পারত। যে দুঃখ Phyllisকে পেতেই হবে, তা কিছুদিন আগে তাকে দিলে আসল ক্ষতি কিছুই হবে না মনে করেছিলাম।"

আমি Phyllisএর দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে নিয়ে হেসে বল্লাম, "পরীক্ষার ফলে কি বুঝ্‌লে ?"

সে বল্লে, "কিছুই না। কেবল বুঝ্‌লাম স্ত্রীচরিত্র চিরকালই পুরুষের অবোধ্য। এ হওয়া খুবই সম্ভব যে Phyllis সত্যিসত্যিই নিত্যগোপালের মধ্যে আমাকে ফিরে পাবেন মনে করে' তাকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু সত্যই যে তিনি নিত্যগোপালকে ভালোবাস্‌তেন না এবং শুদ্ধমাত্র সেই জন্যেই তাকে বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছিলেন না তাও নিঃসংশয় ভাবে জান্‌বার কোনো উপায় আমার নেই।"

Phyllis একমনে একটা ফুলনের ওপরে বেলফের সুতার ফুল তুল্‌তে ব্যস্ত ছিলেন, সুতার রীলটা হঠাৎ বেগে এসে কোকোজীর নাকের ওপর পড়্‌ল।

দুহাতে নাকটাকে চেপে সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়্‌ল। বল্লে, "আর স্ত্রীচরিত্রের রহস্যে নাক ঢোকাতে যাওয়ার শাস্তিটা যে কি হয় তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ।"

তারপর থেকে এখন বালিগঞ্জের সেই একতলা বাড়ীতেই আমাদের সেই পুরনো দিনের আড্ডাটা জমে। যদিও পুরনো দিনের বন্ধুরা দুজনই আর তার মধ্যে নেই। কোকোজীর দয়াতে সেই বাঙালী শিক্ষকটির সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে, আপনাদের মধ্যে কারুর যদি টুথব্রাকুলোসিসের শুশ্রূষার দরকার থাকে ত বল্‌বেন, আলাপ করিয়ে দেব।

গল্প থাম্‌বার পর কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোনো কথা কইলাম না। গল্পের ঘোরটা একটু কাটলে জীবন প্রথম কথা কইল। বল্লে, Reggieর সঙ্গে Normaর বিয়ে আশা করি এতদিনে হয়েছে, কিন্তু নিত্যগোপাল, তার শেষ অবধি কি হলো তা ত বল্‌লেন না ?"

বন্ধু বল্‌লেন, "কোকোজীকে তার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছিলাম, তাকে আস্‌বার আগে আজ্ঞা করে' ধরে' বেঁধিয়ে দাওনি একদিন ? সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, তারই সাহায্যে ও Phyllisএর ভালোবাসা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হ'তে পেরেছি,—তাকে চিরকাল আমি বন্ধু বলেই স্মরণ কর্‌ব। তোমার বাঙালী বন্ধুরা সেখানে তাকে ব্রহ্মদৈত্য বলে' ঠাট্টা করে, কিন্তু কোকোর সত্যি কিছু দোষ নেই।"

সতীন্, জীবন, হরিদাস সকলে প্রায় একসঙ্গে বলে' উঠ্‌ল, "দোষ নেই কি রকম ?"

বন্ধু বল্‌লেন, "কোকোজীর মতে মিত্রাগোপাল প্রবঞ্চক নয়। যে কাজগুলোকে তার অভিনয় বলে' আমরা এখন মনে কর্‌ছি তার একটাও তার ইচ্ছাকৃত নয়। অত্যন্ত ভয়ের মুখে তীক্ষ্ণ nervous ধরণের মানুষের এ-রকম অবস্থা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তার মতে এটা একটা সত্যকারের double personality-র case। তার কল্পনার কোকোজী, ডায়েরীগুলোর সাহায্যে তার দ্বিতীয় personality-টাকে একটা খুব সুনির্দ্দিষ্ট-রকম রূপ দিয়েছিল এই মাত্র।"

সতীন্ বল্‌লে, "তা যদি সত্যি হয় তাহ'লে তাকে অবশ্য ক্ষমা করা ছাড়া উপায় নেই।"

জীবন বল্‌লে, "তা সত্যি না হলেও তাকে ক্ষমা আমি কর্‌তে পারি যদি –"

সতীন্ বল্‌লে, "যদি কি?"

জীবন বল্‌লে, "যদি জান্‌তে পারি শুধুমাত্র Phyllis-এর নিরানন্দ জীবনে একটুখানি আনন্দ এনে দেবার জন্যেই প্রবঞ্চনার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছিল।"

সতীন্ বল্‌লে, "এ নিয়ে অনেক তর্ক করা যেতে পারে, কিন্তু রাত এখন একটা, সুতরাং আজকের মতো আলোচনাটা থাকুক।"

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল। সকলে উঠে পড়্‌লাম। সিঁড়ির পথে সমর হঠাৎ বল্‌লে, "কিন্তু এ-বিষয়ে আর আলোচনা সুরু হবার আগে আমি একটা প্রস্তাবের notice দিয়ে রাখ্‌ছি।"

সমর এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। এত কথার পরেও হঠাৎ আবার কি নূতন সমস্যার কথা তার মনে এল জান্‌তে পথে নেমে সকলে সাগ্রহে তার চারদিকে ভিড় কর্‌লাম।

সে বল্‌লে, "আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, যে-ব্যক্তিকে তোমরা এখন কোকোজী বলে' মনে কর্‌ছ, সে যে সত্যি সত্যি materialise-করা কোকোজীর ভূত নয় সেটা কি-করে' প্রমাণ হবে?"

শেষ

মিলন-মঙ্গল

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

একে অপরের সাথে আজি ঘুরে
যে ডোরে র'য়েছ বন্দী—
অনাদি নিয়মে এ শুধু ধরণে
অমর প্রেমের ছন্দি।
বাসনা আমার তাই বিশ্বপদে
তোমা দোঁহাকার চিত্ত –
অসীম লোকের অমরীর দানে
ভরি' উঠে যেন নিত্য।
মিলন-সুখের মাধবী কুসুম
ত্রিদিবের হোক্ অর্ঘ্য—
ভোগের ত্যাগেতে হোক্ পরিণতি
ধরাতল হোক্ স্বর্গ!

সে-কালের কথা

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

ডাক্তার-কবিরাজ

বৈশাখ মাসের 'বেঙ্গলক্সী'তে সে-কালের কথা উপলক্ষে কবিরাজী চিকিৎসার কথা এবার ডাক্তারী চিকিৎসার কথা নিবেদন করব।

চিকিৎসার কথা বলতে গিয়ে কবিরাজদিগের কথা আগে বলায় শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মহাশয়েরা যেন অভিমান না করেন; তাঁদের দ্বিতীয়-স্থানীয় করবার জন্য তাঁদের কথাটা আগে বলিনি, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। কবিরাজী চিকিৎসা আমাদের নিজের জিনিস, আমাদের দেশের একটা গৌরবের কথা; ডাক্তারী চিকিৎসা আগন্তুক, আমাদের দেশে এ চিকিৎসার বয়স খুব বেশী নয়—ঐতিহাসিকেরা বোধ হয়, এ দেশে এ চিকিৎসার আগমন দুই শত বৎসরও বলবেন না।

আরও একটা চিকিৎসা আমাদের দেশে মুসলমান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; সেটা হকিমী চিকিৎসা। এ চিকিৎসাটা আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে বিস্তৃত হয়েছিল, তা আমার মনে হয় না। আমাদের পল্লী-অঞ্চলে এ চিকিৎসা প্রবেশলাভই করতে পারেনি। শুনেছি, এ চিকিৎসা নাকি আদিমী চিকিৎসা। বোধ হয় সেই জন্যই আমাদের পল্লীপ্রধান গ্রাম-পল্লীতে এ চিকিৎসা প্রচলিত হয় নি। এবং বলতে লজ্জা নেই, মুলেখক শ্রীযুক্ত পরশুরামের 'চিকিৎসা-সঙ্কট' প্রবন্ধেই এই হকিম-শ্রেণীর চিকিৎসকের দর্শনলাভ আমি প্রথম করেছি। সুতরাং হকিমী চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার, কি সে-কালের কি এ-কালের, কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এই কারণেই ঐ প্রসঙ্গটা আমি বাদ দিলাম।

এইবার ডাক্তারী চিকিৎসার কথা বলি। আমাদের অঞ্চলে এই ডাক্তারী চিকিৎসা কে প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন, তার ইতিহাস আমার জানা নেই। যাঁদের কাছে জানবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁরা সকলেই এখন পরলোকগত—আমরাই যে এখন প্রবীণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। এই সব কথা লিখতে হবে, এই সকল বিষয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করতে হবে, এ বাসনা যদি আমাদের প্রথম-যৌবনকালেও মনে হোত, তা হ'লে আমাদের গ্রাম পল্লীর কত, অধুনাবিস্মৃত ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করতে পারতাম; এখন আর সে উপায় নেই। কাজেই, আমাদের পল্লী-অঞ্চলে কবে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রথম প্রবেশ করেছিল, তার সঠিক বা বেঠিক কোন খবরই দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার যখন জ্ঞান হয়েছে, অর্থাৎ যখন আমি সাত আট বছর বয়সের, তখনকার কথা আমার মনে আছে। সেই সময় আমাদের গ্রামে, বোধ হয় আমাদের অঞ্চলেই আমরা প্রথম যে ডাক্তার বাবুর আবির্ভাব দেখেছিলাম, তাঁর নাম প্যারীমোহন গুপ্ত। আমার বেশ মনে আছে, তাঁর বাড়ী ছিল এই কলিকাতার কাছেই অর্থাৎ নৈহাটীর নিকট হালিসহরে। বাঙ্গালা দেশে এত সহর, গ্রাম, পল্লী থাকতে এই হালিসহর থেকে বহুদূরে আমাদের গ্রামে তিনি কেন, কোন্ সূত্রে, কোন্ সংস্রবে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে কথা বলতে পারব না। তিনি আমাদের গ্রামে একেলাই থাকতেন, পরিবার নিয়ে যান নি; আর সে সময় পরিবার নিয়ে কর্ম-স্থলে যাওয়ার যেরূপ ব্যবস্থা তখন হয় নাই; পথ-ঘাটে যাতায়াতেরও তেমন সুবিধা ছিল না, দস্যুভয়ও ছিল। বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথের সংদৃষ্টান্ত অনুকরণ ক'রে আমাদের অঞ্চলে অনেক ছোটখাটো বিশ্বনাথও জন্মেছিল। পারি ত সে সব ডাকাতের কথা, সে সব 'গামছা ঘোড়া'র দলের কথা পরে বলব; এখন ডাক্তার বাবুর কথাই বলি।

আমাদের এই ডাক্তার বাবু অতি নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন। প্রথম প্রথম যে সব ক্যাম্বেল-ছোঁয়া যুবক পল্লী-অঞ্চলে চিকিৎসা করতে গিয়ে একেবারে জাহাজী গোরা

ক'রে বল্‌তেন, এই সব স্বর্গীয় দুর্গাদাস কর মহাশয়ের বাঙ্গালা ডাক্তারী বই দেখে যুবকেরা রোগের নাম 'কামস্‌কট্‌কা' এবং ঔষধের নাম 'পাটাগিনিয়া' ব'লে লোকের মনে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার ক'রে দিতেন, আমাদের এ ডাক্তার বাবু সে শ্রেণীর ছিলেন না; অথবা সে শ্রেণীর আমদানী তখনও হয় নি। প্যারীমোহন বাবু কোথায়, কোন্ বিদ্যালয়ে, কার কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা বল্‌তে পার্‌ব না। তবে, তিনি যে সুচিকিৎসক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর হাতে যে শতকরা চল্লিশ-পঞ্চাশ জন রোগী আরোগ্য লাভ কর্‌ত, এ আমরা দেখেছি এবং জানি।

আমাদের বাড়ীর কাছেই তাঁর বাসা ছিল। আমরা অনেক সময় প্রাতঃকালে কারণে বা অকারণে তাঁর বাসায় যেতাম। অনেক রোগী তাঁর কাছে ঔষধ নিতে আস্‌ত; তিনি রোগ পরীক্ষা ক'রে ঔষধ দিতেন। যে সব রোগী আস্‌তে পার্‌ত না এবং একটাকা দর্শনী দিয়ে ডাক্তার বাবুকে বাড়ীতে নিয়ে যেতেও অসমর্থ, তাদের রোগের বর্ণনা শুনেই ডাক্তার বাবু ঔষধ দিতেন এবং তাদের অনেকের ব্যাধি নিরাময়ও হোতো। সিসির গায়ে দাগ কেটে প্রতিদাগ দুই আনা, দশ পয়সা, কোন কোন ক্ষেত্রে চার আনা হিসাব ক'রে ডাক্তার বাবু মূল্য আদায় কর্‌তেন না। কোন রোগীকে যদি বেশী দামের ঔষধ দিতেন, আর সে যদি চার আনা, কি ছয় আনা মূল্য দিত, তা হলে ডাক্তার বাবু একটু হেসে বল্‌তেন, "ওগো, এটা বড় দামী ঔষধ।" ব্যস্, আর কিছু বল্‌তেন না; 'আরও দেও' এ কথা তাঁর মুখে কখনও শুনিনি। আর, তখন সিসি বোতল ত এখনকার মত সুলভ ও সুপ্রাপ্য ছিল না যে, ডাক্তার বাবু প্রত্যেককে নূতন সিসিতে ঔষধ দেবেন। যাদের বাড়ী দুই একটা সিসি কি বোতল থাক্‌ত, তারা তাই বেশ ক'রে ধুয়ে নিয়ে আস্‌ত; ডাক্তার বাবু তাতেই ঔষধ দিতেন। আর যাদের ঘরে সিসি বোতল নেই, তারা পাথরের বাটি নিয়ে আস্‌ত; ডাক্তার বাবু তাতেই ঔষধ দিতেন এবং ব'লে দিতেন, দু-বারের ঔষধ থাক্‌ল, রোজ তিন বার পরিমাণমত খেতে হবে।

যারা অবস্থাপন্ন, তাঁদের বাড়ীতে রোগী দেখেও ডাক্তার বাবু কখনও দুই-টাকার বেশী ভিজিট নিয়েছেন, এ কথা আমরা কখনও শুনিনি, সাধারণতঃ এক-টাকাই তাঁর ভিজিট ছিল আর এখন? কাও নেই সে কথা ব'লে—সকলেই ভুক্তভোগী।

ডাক্তার বাবুর আর এক প্রণালীর চিকিৎসা আমরা দেখেছি, সে চিকিৎসার কথা মনে হ'লে এখনও আমাদের গা শিউরে উঠে। তাঁর বাসার বড় বড় দালা খোড়লের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় লৌক থাক্‌ত। কারও জ্বরের ভয়ে খুব মাথার যন্ত্রণা হয়েছে, ডাক্তার বাবু বল্‌তেন কি—তার কপালের দুই পাশে দুইটা লৌক লাগিয়ে দিতেন। লৌকেরা সেই রোগীর রক্ত আকণ্ঠ পান কর্‌ত, যখন আর পান কর্‌বার শক্তি থাক্‌ত না, তখন আপনা হতেই খ'সে পড়্‌ত। রোগীর যন্ত্রণা এই রক্তশোষণে কম পড়্‌ত। এ চিকিৎসা না কি বিলাতেও প্রচলিত ছিল, পরে, ইংরাজী বইটই প'ড়ে জান্‌তে পেরেছিলাম যে সেকালে বিলাতে ডাক্তারদের নাম ছিল না-কি 'Leech' অর্থাৎ লৌক। বোধ হয় লৌক ব'সিয়ে চিকিৎসা কর্‌তেন ব'লেই সেকালে বিলাতী ডাক্তারদের এই নামকরণ হয়েছিল: 'ধর্‌লে আর নীঘ্র ছাড়েন না' ব'লে এ নাম ডাক্তারদের হয়নি, এ কথা বল্‌তেই হবে।

আমাদের এই ডাক্তার বাবুর আর একটা প্রধান গুণ ছিল পথ্যের ব্যবস্থা। রোজ জ্বর হ'চ্ছে, এমন রোগী ঔষধ নেবার পর জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ডাক্তার বাবু, কি খাব?"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, "কি খাবে? উপোস দিলেই ভাল হয় আজ। তা, নিতান্ত যদি না থাক্‌তে পার, একটু সাগু কি খৈয়ের মণ্ড খেয়ো।"

রোগী বল্‌ল, "আমি যে সাগু কি খৈয়ের মণ্ড খেতে পার্‌ব না, বমি আসে ডাক্তার বাবু!"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, "ও, বমি আসে; তাইত। তা দেখ, দুটো অম্ল ক'রে চিঁড়ে-ভাজা খেও।"

রোগী বল্‌ল, "চিঁড়েভাজা যে আমার পেটে যায় না ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, "তাইত। পেটে যায় না; কলী ত দেওয়া যায় না। কি খেতে তোমার ইচ্ছে কর্‌ছে বাপু।"

...বলে, "দুটো নরম ভাত হ'লে খেতে পারি

ডাক্তার বাবু একটু ভেবে বল্লেন, না থাক্, অল্প ক'রে ভাতে ঘি দই খেয়ো, পাঁচালের ঝোল দিয়ে, বুঝলে।"

তার থেকে ভাত ও পাঁচালের ... কিন্তু ডাক্তার বাবুর চিকিৎসাধীনে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি।

আমাদের এই ডাক্তার ... কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসা ... অস্ত্র হাতে কর্তে পারবে না, ... হায়, হায়, এমন গুরু ... এখন আর ... অনেক রোগী অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ... পেত। আমাদের ... হাড়ভাঙার ... কই ... প্রয়োজন।

ডাক্তার বাবু অস্ত্র চিকিৎসা না কর্লেও আমাদের গ্রামে এক অস্ত্র লোক ছিলেন। তাঁর নাম ভৈরব ডাক্তার। তিনি ডাক্তারিতে না সুন্দর ছিলেন। সে-ব্যবসায় ত্যাগ ক'রে তিনি অস্ত্র চিকিৎসক হয়েছিলেন। তিনি বল্তেন, "তেন-তার পুরুষ থেকে আমরা ক্ষৌরকারের কাজ ছেড়ে দিয়ে এই ডাক্তারি ... করেছি। আমার প্রপিতামহ ক্ষৌর-কর্মে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন। পুরুষানুক্রমে আমরা সেই বিদ্যা শিক্ষা করেছি।

তাঁর অস্ত্রের মধ্যে ছিল নরুণ, আর ক্ষুর—তাঁদের সেই পৈতৃক ব্যবসায়ের অস্ত্র। এই দুই অস্ত্রের সাহায্যে তিনি অনেক রোগে আরোগ্য কর্তেন। তাঁর দুই তিন রকম মলমও ছিল। অস্ত্র করার পর মলম লাগিয়ে দিতেন, ক্ষত শুকিয়ে গেলে সেই মলমের পট আপনা হ'তেই প'ড়ে যেত; তোল করার প্রয়োজন হতো না। তাছাড়া নরসুন্দর ছেলেও আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা কর্তাম. তাঁর অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু, গুভাগ্যবশতঃ পরলোকে তিনি শেষ-বয়সে তাঁর একমাত্র ছেলেকে ইংরাজী শিখিয়ে ক্যাম্বেল স্কুলে ডাক্তারী শিখতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, দেবীর ঘরে যে বিদ্যা, তা ত ঘরেই বাঁধা আছে। ছেলে ডাক্তারী পাশ ক'রে আসুক, তারপর এ বিদ্যাটাও শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু, তাঁর আশা পূর্ণ হয় নি। ছেলে যখন কলিকাতায় পড়ছিলেন, তখন একদিন অকস্মাৎ তিনি মারা গেলেন; তাঁর দেবীর ঘরে প্রাপ্ত বিদ্যা আর ছেলেকে দেওয়া হোলো না। তাঁর অস্ত্র-বিদ্যার নৈপুণ্য ছেলে যে পান নাই, তাতে আমরা তত ক্ষতি বোধ করিনি; কিন্তু তাঁর মলম কয়টি যে খুব ভালই ছিল।

এইখানেই এবারের মত ইতি। 'ইতি' বটে, কিন্তু আর এক চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা যে বলা হোলো না। সেকালে অর্থাৎ আমাদের বাল্যকালে তার প্রসার না হলেও আমরা যখন কিশোর, তখন তার নাম শুনেছি এবং আমিও সে চিকিৎসাধীন হয়েছিলাম, তার ভাল নাম হোমিওপেথী। এ নামটা সর্ব্বপ্রথম আমি আমার পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মুখে শুনেছিলাম। তিনি অতি গম্ভীর স্বরে বল্তেন, "এ শাস্ত্রের নাম কি জানিস্—এর নাম 'হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা'।"

বীর বাঙালী তরুণ

এই বাঙালী তরুণ—শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রিপন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর (B. Sc.) একটি ছাত্র। উনি সম্প্রতি বালীগঞ্জ ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনটি মুসলমান গুণ্ডার অতর্কিত আক্রমণ হইতে একটি হিন্দু তরুণীকে অসীম সাহসিকতার সহিত রক্ষা করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই রকমই ত চাই!—বাঙলার তরুণ অকুতোভয় হউক! দেশের ভগিনীর জননীর মর্য্যাদা-রক্ষাকারী এইরূপ বীর সন্তানই ত বঙ্গমাতার চির-আকাঙ্ক্ষিত।

বিজয়কৃষ্ণ দীর্ঘজীবী হউন!

পথ

শ্রী সুকুমার সরকার

স্বপ্নের কুঁড়ি ফোটায় শুধুই যে পথ-ধূলি
তারি সে পরাগ-রেণু এ অঙ্গে লয়েছি তুলি'।
হাসির কিরণ-কিরণ যে পথে চরণ ফেলে
তারি পাশে মোর আঁখি শতদল দল যে মেলে।
যে পথ-কিনারে পড়ে মেনকার পায়ের রেখা
ধূলি হ'য়ে আমি লিখিব সে পথে ধ্যানের লেখা।
যে পথে মেঘেরা এনালো অলকে জাগিয়া আছে
হিয়া হবে মোর তড়িৎ-আলো সে পথের কাছে।

ধীবর-দুলালী আজিও যে পথে গোপনে চলে,
যে পথে সমীর আঁচল তাহার কেবলি ছলে,
নূপের গর্ব্ব তুলিয়া সে পথে লুটায়ে রব'—
ভবন ছেড়িয়া সে পারে ভবীন শোণিমা হব'।
লতারা যে পথে লুকায়ে দেখেছে পুরুর প্রিয়া
সে পথ ভিজায় আমার উতল অশ্রু দিয়া।
কস্তুরিকা-হরিণী যে পথে খুঁজিছে নূপে
সে বিরহ পথ-আঁধারে আলায় এ আঁখি-দীপে।

রূপের স্বপনে পরাণের খেলা ভুলিয়া তখন
মানবীর পাশে আপন পাগল পরাণ সঁপে,
কুয়াশা-ধূসর বিজনে মধুর মিলন মাগে—
সে পথে তটিনী-উরস ভরে প্রেমোচ্ছ্বাসে!
রাঘব-পায়ের পরশে যে পথ পড়িয়া নারী
মুক্তা-পাষাণ হইতে লভিল জীবন-বারি,
আমি সে পথের অণুতে অণুতে মিশিয়া রব'—
পরম পুণ্য-প্রভাতে পাপের মুছিয়া লব'।
না-বলা কথা যে বুঝেও না বুঝি' যে পথ-তলে
চলে গেছে কত দেবযানী-হিয়া চরণে দলে,'
সে পথ-কাঁটার একটি বিষাদ-কুসুম হ'য়ে
'বরণ-সুরভি ছড়াব অসীম কালেরে ল'য়ে।

স্মরণচিহ্ন দিতে প্রিয়তমে অলঙ্কারে
পৃথ্বী-তনয়া যে পথে ছড়ালো ভরহারে।
ধূলি তৃণ হ'য়ে সে পথে সে হার লইব আমি—
হৃদয় আমার রাঘব-চোখের নয়নমণি।
তৃতীয়ার চাঁদ যোজিনীর লাগি' যে পথ-'পরে
বিরহ-শয়নে একাকী বসিয়া গুমরি' মরে,
সান্ত্বনা হ'য়ে সে পথ আমার দৃষ্টিপানি
ব্যথিত চাঁদের নয়নে বুলাবে আশার বাণী।
পদ্মের লইয়া যে পথে শিবের পাগল প্রীতি
নৃত্য-ছন্দে রচে শিবানীর সোনার স্মৃতি,
সমীর মিশিয়া সে পথে আমিও ঘুরিব একা—
চক্রধারীর বাঁকা চোখ যদি দেয় গো দেখা!

আষাঢ়ের বঙ্গলক্ষ্মীতে থাকিবে বার্গসঁ'র দর্শন সম্বন্ধীয় মৌলিক আলোচনা, 'রাশিয়ায় নারীশিক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধ, 'উৎকলী কথাসাহিত্যে'র মনোজ্ঞ পরিচয়—ইত্যাদি। এবং আরও থাকিবে ভাবমধুর কবিতা, বিচিত্রসুন্দর গল্প, 'সে-কালের কথা,' সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী—প্রভৃতি অনেক অনেক-কিছু। বঙ্গলক্ষ্মীর কবিতা ও গল্পের বৈশিষ্ট্য-পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

পুরীতে দিনকয়েক

শ্রী ভুবনমোহন দাস এম্-এ

কেহ পুরী যান তীর্থ করিতে, কেহ যান বেড়াইতে, আবার কেহ যান রোগ সারাইতে। আমার রোগ সারিয়াছিল তবে শীঘ্র পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইবার আশায় আমি এ বৎসর এপ্রিল মাসে পুরী গিয়াছিলাম। প্রায় ১৫ বৎসর পরে যাওয়াতে সহরের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। সমুদ্রের ধারে ধারে রাস্তা; স্বর্গদ্বার এবং চক্রতীর্থ ছাড়িয়া বরাবর সমুদ্রের ধারে বাড়ী; ট্যাক্সীর অভাব নাই, যেখানে সেখানে ট্যাক্সী। হোটেলের অভাব নাই—সমুদ্রের ধারে ভাল বাড়ীগুলিই হোটেল। আমি স্বর্গদ্বারের শেষ সীমানায় সমুদ্রের খুব নিকটে ছিলাম বলিয়া সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতাম ও ঘরে বসিয়া সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখিতাম। মনে করিয়াছিলাম একবারে বনবাসের মত থাকিতে হইবে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণেশ্বরের রামনারায়ণ দাদা-সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির এবং সকলের বড় মা, স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি প্রতিবেশী পাইয়া বেশ সময় কাটাইতাম। প্রত্যূষে বিধবা আশ্রমের মেয়েদের সমস্বরে স্তব-পাঠ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিত, তারপর খাওয়া-দাওয়া করিয়া ও বেড়াইয়া কিরূপে যে সময় অতিবাহিত হইত তাহার হিসাব রাখিতাম না। বিশেষতঃ গৌরবাটীতাইতে যে সাধুমা'র আশ্রমে ছিলাম, তাঁহার মাতার ন্যায় স্নেহ ও ঘরে বিদেশে বসবাস করিতেছি বলিয়া মনে হইত না।

পুরাতনের মধ্যে পুরীর সেই জগদ্বিখ্যাত মন্দির ও সেই সীমাহীন পুরাতন সমুদ্র—উহারা যেন নিত্য নূতন। সমুদ্রের ধারে কেহ একলা বেড়াইলে সমুদ্র নিজের রাশি রাশি তরঙ্গ লইয়া তাহার সহিত এমন খেলা করিবে এবং এরূপ গাঢ়স্বরে কথা কহিবে যে, কোন দ্বিতীয় লোকের আবশ্যক বোধ হইবে না। অসুস্থ মনকে সে সুস্থ করে, অশান্ত মনকে সে সান্ত্বনা দেয়, যে নিরাশ হইয়া পড়ে সমুদ্র তাহাকে আশার বাণী শুনায়। দুপুর বেলায় যখন অন্যান্য স্থানে লোকে সেখানকার লোককে পাড়ায়।

মন্দিরে গেলাম। ঠাকুরের নূতন কলেবর—কিন্তু সেই টুঁটো জগন্নাথ—মাথায় সেই পুরাণো মাণিক। মন্দিরের চারিদিকে বিজলীর আলোক দেখিলাম—কেবল ঠাকুরের নিকট সেই পুরাতন অন্ধকার। উড়িষ্যাবাসী কুলপাই সভা হইতেছে কিন্তু এখানে সভা হইলে ভাত যাইবে ভাবিয়া ঠাকুরকে আলোকে আসিতে চাহে না। মন্দিরের গায়ে চারিদিক অশ্লীল নগ্নমূর্ত্তি-পূর্ণ ছিল, উড়িষ্যাবাসী তিন দিক ঢাকা দিয়াছে কিন্তু এখনও একদিকে এমন অশ্লীল মূর্ত্তি আছে যে তাহার দিকে তাকান যায় না। কবে ঠাকুর উড়িষ্যাবাসীকে সুমতি দিবেন যেদিন সমস্ত অশ্লীলতা ঢাকিয়া বিজলীর আলোকে তিনি সকলকে দর্শন দিবেন।

একদিন ভুবনেশ্বর মন্দির দেখিতে সাধ হইল। সকাল বেলা কৃপানন্দ স্বামীর সঙ্গে গিয়া তাঁহার আশ্রমে উঠিলাম। দুপুর বেলায় গরুর গাড়ী চড়িয়া গৌরীকুণ্ডে স্নান ও ঠাকুর দর্শন করিয়া কোনরকমে আশ্রমে আসিয়া ভোগ খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ভোগ খাইতে খাইতে ১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার উড়িষ্যাবাসী-প্রস্তুত জগন্নাথের ভোগের কথা মনে পড়িল; তাহা আর প্রকাশ না করাই ভাল। বিকাল হইলে সেই গরুর গাড়ীতে ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেন ধরিলাম। রাত্রে খাবার সময় পুরী আসিয়া উদর পূর্ণ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

বড়-মা'র সহিত অনেকদিনের পরিচয় থাকাতে আমার আদর যত্নের সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেখানে প্রায় ৮।১০ জন অল্পবয়স্কা বিধবা আছেন এবং ৩।৪ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। বড়-মা শিক্ষয়িত্রীদের লইয়া একটি মেয়েস্কুল চালাইতেছেন। পুরীতে তাহা একরকম নূতন। কলিকাতার মত মেয়েরা বাসে আসে যায়, লেখাপড়া শেখে ও খেলাধূলা

করে। উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীর মেয়েদের শিক্ষা দেখিয়া এক্ষণে অনেক উড়িয়া ভদ্রলোক আপনাপন মেয়ে পাঠাইতেছেন। বিদ্যাশ্রমের মেয়েরাও ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখিতেছেন ও সকালে বিকালে শাকসব্জী বসান, জামার কাটছাট শেখা, আসন, গালিচা বোনা শিখিতেছেন। এত কাজ করিয়াও মেয়েরা বেশ খেলাধূলা করেন ও দলে দলে সমুদ্রে বেড়াইতে যান। নবীনচন্দ্রের সে বাঙ্গলাদেশের বিদ্যার্থীর মত তাঁহাদের মুখ ম্লান নহে; তাঁহারা যেন আপনাপন কাজে ও বেড়ানতে আনন্দে আছেন মনে হয়। তাঁহাদের যে দুঃখ নাই তাহা বলিতেছি না—দুঃখ না থাকিলে মানুষ বলিব কেন—কিন্তু দুঃখ তাঁহাদের মুখ ম্লান করিতে পারে না। বাস্তবিক যাঁহাদের সকল সুখ শেষ হইয়া নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন, তাঁহাদের মুখে হাসি দেখিলে বড়-মা যে কতবড় কার্য্য করিতেছেন ও পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন তাহা সহজেই অনুভব হয়। বড়-মা তাঁহাদের সকলেরই আপন মায়ের মত এবং তাঁহাদের নিঃসঙ্গ জীবনের অভাব পূরণ করেন। যে কেহ তাঁহার আশ্রম দেখিতে আসেন, তিনিই আনন্দলাভ করেন এবং বড়-মা'কে ধন্যবাদ না দিয়া পারেন না। এ সকল কাজ সত্ত্বেও বড়-মা স্কুলের জন্য যেরূপ প্রাণপাত করিতেছেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একদিন স্কুলের বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ আসিল। পুরীর রাজার নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গালীদের একটি ক্লাবে এই সভা হয় এবং তাহাতে পুরীর প্রায় সকল গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মেয়েরা এমন সুন্দর গান ও ড্রিল করিতে লাগিল যে মনে হইল আমি কলিকাতায় থাকিয়া মেয়েদের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে উৎসব দেখিতেছি। সকল মেয়েই বেশ আনন্দ সহকারে আপনাপন কাজ শেষ করিল এবং মেডেল ও পারিতোষিক পাইল। পুরীর রাজা স্কুলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সভা ভঙ্গ করেন। স্কুলের উৎসব যে সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকটা স্কুলের নূতন হেড্ মিষ্ট্রেসের গুণে। মিস্ হিম'ঙ্গী রায় দুই এক মাস আসিয়াই যে মেয়েদের এমন শিখাইয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে বাহাদুরী দিতে হয়।

দেখিলাম অনেক—শিখিলাম বহু; এবং এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া নিজেকে দিন কতক ছুটি দিয়া শরীরটা বেশ সারাইয়া লইলাম। টিকিট করিয়া ছিলাম ১৫ দিনের সুতরাং ছুটি ফুরাইতেই কলিকাতায় আসিয়া আগে যে কাজে ছিলাম এখনও সেই কাজে নিযুক্ত হইলাম। আবার কবে ছুটি পাইব কে জানে?

পরে ও তারপরে

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

"তোমারে ভালবাসি"—কপোত করে, মৃদু
চুমিয়া কপোতীর চঞ্চু 'পরে;
শুনিয়া কপোতীর শিহরে কলেবর,
নয়ন বুজে আসে পুলক-ভরে।
গাছের কালো ডাল কহিল, "রে বাছাল,
আছে ত তার পরে মৃত্যু, শোক!"
গোধূলি-আলো কয়, "নাহি গো নাহি ভয়,
তাহার পরে আছে অমর-লোক।"

নারী-প্রতিভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

চাঁদবিবি

এই জগদ্বিখ্যাতা বীরবালার অপর নাম চাঁদ সুলতানা। ইনি আহম্মদনগরাধিপতি হুসেন নিজাম শাহের কন্যা ও মুর্ত্তজা নিজাম শাহের ভগিনী। যে সমস্ত গুণ থাকিলে মানব জগৎপূজ্য হন, এই মহানুভবা বীর-রমণীর সেইসব গুণের অভাব ছিল না। অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হইয়া বিজাপুরের অধীশ্বর ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও অল্পদিনের মধ্যে পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, অল্পবয়সে বৈধব্যের বিধান বিধির দান বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করেন। (১৫৮০ খৃঃ)

চাঁদবিবি পতিহীনা হইয়া ব্যাকুল হইলেন না। পতির মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য, পূর্বউদ্যমে শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিমকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিমকে রাজত্বে বসাইয়া প্রায় ২।১০ বৎসর মহাগোলযোগে কাটিল। বিজাপুর রাজ্যের সর্দ্দারগণ সুযোগ বুঝিয়া নানা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক,সমূহ উৎপাতের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রধান অমাত্য জয়ন্ত ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া চাঁদবিবি তাঁহার জীবন-নাশের আদেশ দেন। কিশ্বর খাঁ চাঁদবিবির আদেশ প্রতিপালন করিয়া, নিজে প্রধান হইয়া উঠিলেন। দুষ্ট কিশ্বর খাঁ মুরারাও নামক রাজ্যের এক প্রিয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে বিষপ্রদানপূর্ব্বক হত্যা করিয়া চাঁদবিবিকে সাতরা দুর্গে বন্দিনী করিলেন। চাঁদবিবি নানা কৌশলে জনৈক সর্দ্দারের সাহায্যে সাতরা দুর্গ হইতে মুক্তিলাভ করেন। বিশ্বাসঘাতক কিশ্বর বিজাপুর ছাড়িয়া পলায়ন করিলে, পথে মুক্তাকার লোকের হস্তে নিহত হন।

চাঁদবিবি চতুর্দ্দিকে গৃহবিবাদাদি ঘটন সঙ্কট দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইলেন। এই সময় গোলকুণ্ডার রাজা বিজাপুর আক্রমণ করায়, অবস্থা ভীষণতর সাংঘাতিক হইল। চাঁদবিবি এই দুর্দ্দিনে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হইয়া, নানাপ্রকার বুদ্ধি-কৌশলে সর্দ্দারদের বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চাঁদবিবির দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ফলে সকলে আবার একমত হইলেন। ইব্রাহিমের সহিত গোলকুণ্ডার রাজভগিনী তাজ সুলতানার বিবাহ হইল। ইহার পূর্ব্বেই চাঁদবিবির বুদ্ধিবলে আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডা সন্ধি করিয়াছিলেন। বাকী শত্রুগণ হতাশ হইয়া যার যার মুখে প্রত্যাগমন করিলেন। (১৫৮৪ খৃঃ)

বিজাপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া চাঁদবিবি জন্মভূমি আহম্মদনগরে আসিলেন। এই সময় চাঁদবিবির অন্য এক ভ্রাতুষ্পুত্রের (মিরাণ হুসেনের) সহিত বিজাপুরের জনৈক রাজদুহিতার বিবাহ হয়। এই সময় চাঁদবিবির ভ্রাতার ধারণা হয় যে, পুত্র মিরাণ তাঁহাকে (মুর্ত্তজা) হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। মুর্ত্তজা নিজাম শাহ, পুত্র মিরাণকে হত্যা করিবার জন্য শয়নকক্ষে আগুন ধরাইয়া দেন। দৈবক্রমে মিরাণ রক্ষা পাইয়া দৌলাতবাদে পলাইয়া যান। পরে মিরাণ (১৫৮৮ খৃঃ) মুল্লা খাঁর সাহায্যে আহম্মদনগর আক্রমণ করিয়া পিতাকে এক গরম ঘরে পুরিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করেন। মিরাণ তখন মুল্লা খাঁর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করেন; মুল্লা জানিতে পারিয়া মিরাণের শিরশ্ছেদ করিয়া চৌরণদ্বারে ঝুলাইয়া দেন। এই অমানুষিক কাণ্ডে নগরবাসীরা উত্তেজিত হইয়া, দুর্গদ্বারে আগুন ধরাইয়া দিয়া জামাল খাঁর সাহায্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া যে যাহাকে পাইল বিনাশ করিতে লাগিল। সপ্তম দিবসে মুল্লা খাঁ নিহত হইলেন। এই সমস্ত নানা গোলযোগের সময়, চাঁদবিবি স্থির হইয়া সমস্ত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চাঁদবিবির একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ইব্রাহিম নিজামের দুগ্ধপোষ্য শিশু

বাহাদুরকে বাধা করিবা, নিজে অভিভাবিকা হন। ইহাতে নানা শঙ্কা আসিয়া করিয়া দুই আততায়ীরা বাহাদুরকে সরাইয়া কোশলে চাঁদবিবিকে সদৈন্যে চাঁদ দুর্গে পাঠাইয়া দেয়। মিঞা মঞ্জু এই অশুভ বুদ্ধির মূল। রাজ-কুলোৎপন্ন নহে, এমন এক দশম বর্ষীয় বালককে সিংহাসনে বসাইয়া, বাহাদুরকে সরাইয়া দিলেন। ইহাতে মঞ্জুর উপর সকলেই চটিয়া গেল। মিঞা মঞ্জু এইবার নিজের অদূরদর্শিতার ফলে, নিজে বিশেষ অসুবিধায় পড়েন।

এইবার বুদ্ধিমতী চাঁদবিবি আহম্মদনগরের রক্ষয়িত্রী-রূপে কার্য্যভার গ্রহণে অগ্রসর হন। চাঁদবিবির মহত্বের ফলে, মিঞা মঞ্জুর প্রধান কর্ম্মচারী আন্দার খাঁ ঘাতক-হস্তে নিহত ও পূর্ব্বোক্ত বাহাদুর রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। নানাপ্রকার গৃহ-বিবাদাদির দ্বারা এই সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। বীরমহিলা চাঁদবিবি বুঝিয়াছিলেন যে, এই অবস্থায় রাজ্য রক্ষা করা কতদূর কষ্ট-সাধ্য। প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার তিনি নিজ হাতে লইলেন। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। নেহঙ্গ খাঁ ও শাহআলীকে রাজ্যরক্ষার জন্য আহ্বান করিলেন। পশ্চিমস্থ মোগলের সহিত এক ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গেল।

চাঁদবিবির বুহান নিজাম (দ্বিতীয়) নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। তখন নিজামের জীবিতকালে তিনি পিতৃরাজ্য লাভ করিতে চেষ্টা করেন এবং পিতার ক্রোধে পড়িয়া দেশ ত্যাগ করেন ও আকবর বাদশাহের কৃপাপ্রার্থী হন। আকবর বাদশাহ বুহানকে উত্তরভারতে কিছু জায়গীর দিয়াছিলেন, তাহাতেই বুহানের চলিয়া যাইত। আহম্মদ-নগরে গোলযোগের কথা শুনিয়া, আকবর বুহানকে দক্ষিণা-পথে পাঠাইলেন। বুহান নানা সাহায্য পাইয়া আহম্মদনগর অধিকার করেন—এবং নিজে রাজা হন। বিজাপুরের রাজমাতা, ইতিপূর্ব্বে পলাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন বুহান রাজা হইয়াছেন, তখন তিনি আসিয়া জুটিলেন। নানা গুপ্ত ষড়যন্ত্র, গৃহশত্রুতা প্রভৃতির ফলে, মোগল সম্রাট্ আকবরের তত্রত্য সৈনিকদিগের সহিত চাঁদবিবির মনোমালিন্য ঘটিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত নেহঙ্গ খাঁ, চাঁদবিবির আহ্বানে যখন তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে মোগল শিবির দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিলেন যুদ্ধানলের অধীনস্থ অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। এই ভাবে নেহঙ্গ সসৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিজাপুররাজ পঁচিশ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন; হায়দ্রাবাদ হইতে মেহেদিকুলী সুলতানের ছয় সহস্র গোল-কুণ্ডা অশ্বারোহী শাহ দুর্গে উপস্থিত হইল। মোগল সৈন্য মধ্যে যুদ্ধসভা বসিল, স্থির হইল যে চাঁদবিবির সৈন্যেরা দুর্গরক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বেই দুর্গ ধ্বংস করিতে হইবে। দুর্গে পাঁচটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ কাটা হইল, যে দিকে মোগল সৈন্য থাকিবে, সেই দিক পানে চারিদিকের সুড়ঙ্গ মধ্যে বারুদ পুরিয়া, চূর্ণ-সুরকি ও পাথর দিয়া ঐ সুড়ঙ্গ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল তৎপরদিবস ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৫৯৯, সুড়ঙ্গে আগুন দেওয়া হইবে।

চাঁদবিবির অমানুষিক বীরত্ব

রাত্রিকালে, সিরাজী খাঁ নামক জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি এই গুপ্ত সংবাদ চাঁদবিবিকে জানাইলেন। চাঁদবিবি তৎক্ষণাৎ সদলবলে সুড়ঙ্গের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি দিনমানে দুইটি সুড়ঙ্গ নষ্ট করিলেন। সর্ব্ববৃহৎ সুড়ঙ্গ হইতে যখন চাঁদবিবি মালসলা বাহির করিয়া ফেলিতেছিলেন, সেই সময়ে মোগল সেনাধ্যক্ষের আদেশ হইল 'সুড়ঙ্গে অগ্নি প্রদান কর'। অগ্নি দিবামাত্র সুড়ঙ্গস্থ বারুদ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চাঁদবিবির অনেক লোক নষ্ট হইল। প্রাচীরের অনেকটা পড়িয়া গেল। অনেক প্রধান প্রধান যোদ্ধা দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। চাঁদ-বিবি দেখিলেন, আর নিস্তার নাই। তখন তিনি মুখে ঢাকা দিয়া, বর্ম্মচর্ম্ম-পরিবৃত হইয়া, বল্লম তরবারি হস্তে, প্রাচীর রক্ষা করিবার জন্য বিপুল বেগে অগ্রসর হইলেন। কাপুরুষ যোদ্ধাগণ, বীর-মহিলার অসীম সাহস অবলোকন করিয়া, তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। তখন প্রাচীর হইতে মুষলধারে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, আগ্নেয় অস্ত্রের জলদগম্ভীর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইতে লাগিল। বহুশত মোগল বীর প্রাণত্যাগ করিল। দুর্গমধ্যে ও শত্রুশিবিরে আজ চাঁদবিবির যশোগান মুখরিত হইতে লাগিল। চাঁদ-বিবির বিশ্রাম নাই, তিনি দুর্গ-সংস্কারে মহাব্যস্ত। প্রভাত

হইতে না হইতে দুর্গের প্রাচীর অনেকটা প্রস্তুত হইয়া গেল।

মধ্যরাত্রে যুদ্ধ থামিবার পর চাঁদবিবি দেখিলেন, দুর্গে রসদ কমিয়া আসিয়াছে. তিনি শীঘ্র সৈন্যদিগকে আসিবার জন্য পত্র দিলেন। ঘটনাক্রমে সেই পত্র মোগল সৈন্যের হাতে পড়িল। পত্র পাঠ করিয়া ঐ পত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল ও একদল মোগল সৈন্য আনাইবার ব্যবস্থা হইল। মোগল শিবিরেও রসদের অভাব হইয়াছিল। পরন্তু অতিরিক্ত মোগল সৈন্য আসায়, রসদের অভাব আরও অনুভূত হইল। অনেক ভাবিয়া মোগল সেনাপতি চাঁদবিবিকে পত্র দিলেন. যে—যদি চাঁদবিবি বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দেন, তবে তিনি আহম্মদনগর পরিত্যাগ করিবেন। চাঁদবিবি অনেক ভাবিলেন। যদি বিরাট মোগল-শক্তির নিকট পরিণামে পরাস্ত হইতে হয়, তদপেক্ষা এই সম্মানজনক প্রস্তাব শ্রেয় ভাবিয়া সম্মতি দান করিলেন। তিনি বাহাদুর শাহের নামে সনন্দপত্রে সহি করিলেন। মোগল সৈন্য দৌলতাবাদে চলিয়া আসিল।

কিছুদিন অতীত হইতে না হইতেই, নেহঙ্গ খাঁ চাঁদবিবির সর্ব্বনাশের সূত্র খুঁজিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদবিবি এই কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তিনি বালক বাহাদুরকে দুর্গমধ্যে আনিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিলেন। নেহঙ্গ খাঁ দুর্গে প্রবেশ করিতে চাহিলে, চাঁদবিবি বলিয়া পাঠাইলেন, যে—তিনি রাজধানীতে কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু দুর্গমধ্যে তাঁহার প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। নেহঙ্গ চাঁদবিবির কিছু অনিষ্ট করিতে না পারিয়া, শেষে মোগলের অধীন বিদ্ রাজ্য অধিকার করিলেন।

আকবর বাদ্‌শা এই সংবাদ জানিলেন। তিনি সেনাপতি খান্‌খানকে বিদের শাসনকর্ত্তার সাহায্যের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। নেহঙ্গ মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। ঘনপুর কোট্‌লি গিরিসঙ্কটে, বিরাট মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধে ফলোদয় হইবে না ভাবিয়া, তিনি আহম্মদনগরে চলিয়া আসিলেন। চাঁদবিবির সহিত আবার মিটমাট করিতে নেহঙ্গ চেষ্টা করিলেন। চাঁদবিবি বিশ্বাসঘাতককে আর বিশ্বাস করিলেন না। নেহঙ্গ জুন্নার রাজ্যে গা ঢাকা দিলেন।

আবার মোগল সৈন্য আহম্মদনগরে আসিয়া গুপ্ত সুড়ঙ্গ কাটিতে লাগিল। আবার ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। চাঁদবিবি আবার করাল রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বুক্ত-অশিহস্তে, সমরাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় দুর্গমধ্যে বহু গুপ্তগহ্বর উৎপাত হইল। অল্পবুদ্ধি হামিদ খাঁ বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, যে- চাঁদবিবি মোগল হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। ইহাতে কতকগুলি মন্দবুদ্ধি সৈন্য হামিদ খাঁর সহিত গুপ্ত প্রবেশ করিয়া অতর্কিত ভাবে চাঁদবিবিকে হত্যা করিল। মোগল নির্ব্বিবাদে দুর্গ অধিকার করিল। বাহাদুরকে ও অপর বিশ্বস্ত সৈনিকগণকে বন্দী করিয়া আকবরের নিকট প্রেরণ করা হইল। এই বীর-বালার এইরূপ অকস্মাৎ গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণবিয়োগের সংবাদে, চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িল। বিজাপুররাজ ইব্রাহিম অতিমাত্রায় শোকসন্তপ্ত হইলেন। তিনি ব্রজ-মারাঠা মিশ্রিত নিম্নোক্ত পার্শী গাথায় চাঁদবিবির স্মৃতির তর্পণ করিলেন :—

"নন্দন-কাননে সুরবালাগণ করে যথা বাস।
মানব-প্রাসাদে রমণীরতন যথায় প্রকাশ
সৌন্দর্য্যে সদ্‌গুণে তাঁর সম কারো নাহিক উপমা,
বিজাপুর রাণী সেই প্রিয়তমা চাঁদ সুলতানা
"ভীষণ সমরে তেজোবীর্য্য তাঁর দদা উদ্ভাসিত।
সুখশান্তিকালে সরল বিমল সদাশয় চিত
দীন প্রতি মায়া দীনহীন প্রতি অপার করুণা,
ছিল মহারাণী বিজাপুর-প্রিয়া চাঁদ সুলতানা।
"স্বভাবে কোমলতা মধুর মাধুরী নাহিক তুলনা।
তাঁহার মহিমা বর্ণিতে না পারে মানব-রসনা।
সুকুমার কোলে অতি সযতনে পালিল যে জন।
রাজ্যের বিপ্লবে অনাথ বালকে করিল রক্ষণ।
সেই মাতৃ-স্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে করিতে পূজন,
আমি ইব্রাহিম তুচ্ছ কবিতায় করিনু রচন।"

চাঁদবিবির প্রতিকৃতি এখনও বিজাপুরে আছে। সৌন্দর্য্যে সে প্রতিকৃতির তুলনা নাই। গম্ভীর হাবভাব, স্থির মুখমণ্ডল, নীল নয়ন,—মাতৃত্বের পূর্ণবিকাশ। এখনও বিজাপুরের লোকেরা চাঁদবিবিকে ভক্তি করেন ও আহম্মদ-নগরের যুদ্ধের গল্প শুনিতে ভালবাসেন। বহু গ্রন্থে চাঁদবিবির জীবনী ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকথা লিপিবদ্ধ আছে।

(ক্রমশঃ)

পারস্যের পত্র

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী এম্-এ

শিরাজ
২০ এপ্রিল
খলিলাবাদ বাগান

১

শিরাজের খবর হয়তো Libertyতে পাঠানো cableএ পেয়েছ। বেশী খবর শান্তই চিঠিতে জানাবো। বেশ সুন্দর সময় যাচ্ছে। শিরাজে চিরবসন্ত—এমন স্বাস্থ্যকর জায়গা আর নেই। কমলালেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ভ'রে রয়েছে—ডালিমের বাগানে পাখী ডাকছে। ফল-ফুলের গুণে শিরাজ বিখ্যাত—আপেল, আঙুর, চেরি, figs, খেজুর, pears, যা কিছু ফলের নাম করতে পারো সবই আছে। এখানে বরফও খুব কম। একশ টাকায় চার জনের পরিবার সুখে স্বচ্ছন্দে সুন্দর বাড়ি নিয়ে থাকতে দাসী নিয়ে ভালো খেয়ে দেয়ে থাকতে পারে। জন দশেক ভারতবর্ষীয় এখানে আছে।

গুরুদেবকে ঠিক Emperorএর মতো ক'রে রাখছে। এতবড়ো সম্মান ওরা অন্য দেশের রাজা না এলে করে না। Persiaর শা প্রায়ই গুরুদেবকে telegram ক'রে শুভ-কামনা জানাচ্ছেন। কী কাণ্ড, কী আয়োজন, reception তা ব'লে বোঝান যায় না। সমস্ত দেশটা জেগে উঠেছে। সব সময়ে military guard, parade, সব আমাদের জন্যে। সাদির বাগানে এবং হাফিজের সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে কবি গভীর ভাবে বিচলিত হয়েছেন। সাদির সমাধি-বাগানে এমন সুন্দর শোভন অনুষ্ঠান এবং কবিসম্বর্ধনা হয়েছিল কী বলব। গুরুদেবের জন্যে সমস্ত বাগানে দামী কার্পেট মুড়ে দিয়েছিল। স্বপ্নরাজ্যের মতো মায়াময় মনে হচ্ছিল। গুরুদেব এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন—চিরদিনের মতো থেকে যাবে। তাঁর বাণী এখানকার যুগকালাশ্রিত সৌন্দর্যলীলার রঙে মিলে গেল।

ইরানে এসে বাংলার কবি তাঁর কল্পনা জানালেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে পারস্যের অন্তরের যোগ আবার নতুন যুগান্তরে এসে দেখা দিল।

এখন আমরা আছি সহরের প্রান্তে খলিলাবাদ বাগানে। Government Houseএর গোলমালে গুরুদেবের কষ্ট হচ্ছিল। এখানে গোলাপের বাগান, বুলবুল সবই আছে। সব সময়েই খাওয়া দাওয়া চলছে। এরা ঘরে ঘরে অনেক-গুলি ছোট ছোট টেবিলে নানারকম ফল, মিষ্টি, খাবার সাজিয়ে রাখে। সব সময়েই বরফ পা দেবুর সরবৎ ছোট ছোট গ্লাসের গেলাসে ক'রে সবাইকে দিচ্ছে। তা ছাড়া নিয়মিত dinner, lunch ইত্যাদি তো আছেই। বাদাম কিস্‌মিস খেজুর মিষ্টি ডুমুর ইত্যাদি এরা সব সময়েই একটু আধটু খাচ্ছেই। আমরা খেয়েই উঠি না। হবু দেখতে বেশ লাগে।

পারস্য দেশটা সত্যি খুব চমৎকার। লোকেরা যেমন অতিথিবৎসল, জল-হাওয়াও তেমনি সুন্দর, মনোরম। খুব দ্রুত এরা এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান শা ভারি বুদ্ধিমান ভালো লোক, ইনি পাঁচ বছরে দেশের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন। লোকেরা এঁকে সত্যি ভালবাসে। মেয়েদের বুরখা বাবো-বাবো কমছে, এই শা-র রাজত্বে পরদাই উঠে যাবে। তেহেরানের মতো বড়ো এবং য়ুরোপীয় সহরে শুনছি এখনই প্রায় চ'লে গেছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ভালো রাস্তা দেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সুব্যবস্থা, সুশাসনের চিহ্ন সর্বত্র। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী মেয়েদের মহলে মিশে বাড়ির ভিতরকার ধরণধারণ নানা খবর সংগ্রহ করছেন।

বুল্‌গেরিয়ান্ সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

বুল্‌গেরিয়ান্ সাহিত্য আজও শৈশব-সীমা অতিক্রম কর্‌তে পারে নি। এর মূলে আছে এদেশের ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বুল্‌গেরিয়া নামে কোন দেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না। আঠারো-শো-আটাত্তর সালে 'রুমেলিয়া'র পূর্ব্বভাগটুকু পৃথক ক'রে এই দেশটির সৃষ্টি হয় বার্লিনের সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে। সাড়ে চল্লিশ হাজার বর্গ মাইল নিয়ে এই দেশটি;—আর অধিবাসীরা হ'চ্ছে আর্ণেন, রাশান, তুর্কী, গ্রীক্ আর ইহুদী। শুধু পার্ব্বত্য প্রদেশ বল্‌লেই এর সব পরিচয় দেওয়া হয় না, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে এ দেশটি উর্ব্বরতার জন্যও প্রসিদ্ধ। পরাধীন জাতির প্রতিভাবিকাশ নানাভাবে ব্যাহত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত বুল্‌গেরিয়ারও হয়েছিল তাই—তুর্কীদের অধীনে, তুরস্ক রাজভাষা হওয়ায় দেশ-প্রচলিত ভাষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল না কারুরই। যদিও চলিত কথা বুল্‌গেরিয়া ভাষাতেই বলা হোত, তাহ'লেও সাহিত্য বল্‌তে কিছুই ছিল না তখন।

আঠারো-শো পঁয়ত্রিশ খৃষ্টাব্দে প্রথম বুল্‌গেরিয়ান্ ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।

বুল্‌গেরিয়ান্ ভাষাকে সাহিত্য ক'রে তোল্‌বার এই যে প্রচেষ্টা, এর মধ্যে ছিলেন জোপ্‌চিট্‌ রিল্‌স্কি। সে যুগে এঁর ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবেই উপলব্ধ হোত। ইনি ছিলেন একটি নির্জ্জীব বাজক। কিন্তু ধর্ম্মানুরাগের চেয়ে স্বদেশানুরাগই এঁর জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হয়। দেশীয় ভাষাকে ব্যাকরণ ও বিভক্তির মধ্য দিয়ে সত্যকারের সংশোধিত জাতীয় ভাষা ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে ইনি বদ্ধপরিকর হন। এঁর সেই চেষ্টার ফলেই সর্ব্বপ্রথম বুল্‌গেরিয়ান্ ব্যাকরণের সৃষ্টি। এই ভাষাকে প্রচার কর্‌বার জন্য ইনি কয়েকটি স্কুলেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরই আদর্শে ভবিষ্যতে বুল্‌গেরিয়ান্ স্কুলগুলি গ'ড়ে উঠে এঁর স্বপ্নকে আজ সত্যে পরিণত কর্‌তে চলেছে। ইনি জন্মগ্রহণ না কর্‌লে বুল্‌গেরিয়ান্ সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্য-রসিকদের কাছে অপরিচিতই র'য়ে যেত।

আঠারো-শো একাশী খৃষ্টাব্দে আশী বছর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রিল্‌স্কি লেখক ছিলেন না, কিন্তু এদেশের সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এঁরই নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, যেন না ইনি না থাক্‌লে এদেশের সাহিত্য তো দূরের কথা, এদেশের ভাষার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাক্‌তো না।

রিল্‌স্কির প্রেরণায় তাঁরই সমসাময়িক যুগে একজন লেখক সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তাঁর নাম ভজ্জ রাকোস্কী। পঞ্চাশ বছর বয়সেই আঠারো-শো-সাতষট্টি সালে ইনি পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেন, না হ'লে এঁর শ্রেষ্ঠত্ব হয়তো একদিন অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হোত। জাতীয় সাহিত্যের প্রতি ছিল এঁর অগাধ আগ্রহ, তাই এঁর মনোবৃত্তিরও ইনি পরিচালনা করেছিলেন এইখানেই। এঁর রচনা দেশবাসীকে সাহিত্যচর্চ্চা কর্‌তে প্রলোভিত করে—বুল্‌গেরিয়ান্ জাতির মনোবৃত্তি ইনিই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন এঁর সৃষ্টির মধ্যে। বুল্‌গেরিয়ান্‌রা এঁর রচনার মধ্যে নিজেদের খুঁজে পেত, নিজের দেশকে চিন্‌তে ও জান্‌তে শিখ্‌তো এবং সবার উপরে পেত জাতীয় ভাব, যা সকল দেশের সকল মানবকেই মুগ্ধ না ক'রে পারে না।

এঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী হিসাবে আর দু'জনের নাম করা যেতে পারে—প্রথম হচ্ছেন কষ্টো বোটেফ্, দ্বিতীয় পেট্‌কো স্লাভেইকফ্। এঁরা দু'জনেই এ সাহিত্যের অনন্যসাধারণ কবি। শুধু অনন্যসাধারণ বল্‌লেই হবে না, এ সাহিত্যের কাব্য বল্‌তে যা কিছু বোঝা যায়, তার ভাষা ও ধারা এঁদেরই সৃষ্টি। এঁরা নিজেরা ছিলেন কবি এবং বুল্‌গেরিয়ান্ সাহিত্যে আধুনিক কাব্যধারা এঁদেরই ঐকান্তিক ঘরে সৃষ্ট। তদানীন্তন লোকের উপরও এঁদের প্রভাব বড় কম ছিল না। এঁরা ছিলেন স্বভাব-কবি

সেইজন্যই এঁদের রচনা ছিল সরল, ভাষার আড়ম্বরে এঁদের চিন্তাস্রোত কখনও ব্যাহত হয় নি। পাঠকরা তাই এঁদের লেখা পড়তে ভালবাস্তো খুবই।

এদের দু'জনের পরে প্রতিভাসম্পন্ন কবি মাত্র একজনই জন্মেছিলেন, তাঁর নাম আইভান্ ভ্যাসিলাক আঠারো শো পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে এর জন্ম বুল্‌গেরিয়ার এক নগণ্য পল্লীতে। পাণ্ডিত্য ও পর্য্যবেক্ষণশক্তি ছিল এঁর অদ্ভুত-পূর্ব্ব, গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই ছিলেন ইনি সিদ্ধহস্ত। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে কোথায় পূর্ণচ্ছেদ টান্‌লে প্রখরতা প্রকাশ পাবে না এ সম্বন্ধে এঁর জ্ঞান ছিল প্রশংসনীয়। এই প্রখরতা-সংযমের জন্যই বুল্‌গেরিয়ান্ সাহিত্যে ইনি অমরত্ব লাভ করবেন। লেখকের প্রত্যেকটি চিন্তাই ভাষার প্রকাশ পেলে যে সাহিত্য হ'য়ে ওঠে না, তার চিন্তা ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে সংযম থাকা প্রয়োজন—এই কথাটি ইনিই সর্ব্বপ্রথম বুল্‌গেরিয়ান সাহিত্যে প্রচার করেন। ইতিপূর্ব্বে এ ধারণা বুল্‌গেরিয়ান্ সাহিত্যসেবিকদের ছিল না।

এঁর পরেই এ যুগের দিমিত্র আইভানোভ্‌এর কথা। 'এলিন্ পেলিন' এই ছদ্মনামেই ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ। আঠারো-শো আঠাশ সালে 'সোফিয়া' সহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন সাধারণ এক গৃহস্থ পরিবারে। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন একটী স্কুলের মাষ্টার। স্বজাতিকে শিক্ষিত ক'রে তোল্‌বার এঁর একটা আন্তরিক আগ্রহ আছে। গ্রাম্য জীবনের যা ইনি দেখেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন—তাই হয়েছে এঁর গল্প। আসীর বুকে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এঁর রচনার মধ্যে তেমনি কৃষক-জীবন প্রতিবিম্বিত হ'য়ে উঠেছে অতি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে। ইনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেছিলেন যে গল্প শুধু উপভোগ্য হ'লেই হবে না, তার মধ্যে স্বদেশকে চিন্‌বার মত বিষয়বস্তু থাকা চাই। আর বুল্‌গেরিয়ার মত দেশে ধনী সহরে বাবুর চেয়ে দরিদ্র কৃষকের সংখ্যাই অধিক—শতকরা আশী জনই হচ্ছে গ্রাম্য অধিবাসী। এই আশী জনকে চিন্‌তে পার্‌বার জন্যই কৃষক-জীবনকে তিনি চিত্রিত করেছেন। ইতিপূর্ব্বে কৃষক জীবন নিয়ে আর কেউ গল্প লেখেন নি এ সাহিত্যে। দিমিত্র আইভানোভ্‌ই এ বিষয়ে অগ্রণী, এবং এই জন্যই ইনি এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক। একজন সমালোচক বলেন—"He is the first man who lived among the peasants and in the repression of self he found the power to create."—এর মধ্যেই এঁর রচনার বিশেষত্ব ও পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু অজস্র ভাবে ইনি লেখেন না—এঁর গল্প ও কবিতাগুলি নিয়ে আজ পর্য্যন্ত দু'খানি মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ-শো-চার সালে প্রথমখানি প্রকাশিত হবার পর ইনি 'সোফিয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন, এখন পর্য্যন্ত এই পদেই ইনি অধিষ্ঠিত আছেন। এঁর বিশ্ববিখ্যাত গল্প হচ্ছে "কমিশনারের বড়দিন"—Commissioner's Christmas.

বুল্‌গেরিয়ান্ সাহিত্য সম্বন্ধে বেশী কিছুই বলা হ'ল না—বল্‌বার মত কিছু নেইও। এমন কোন বৈশিষ্ট্য এ সাহিত্যে নেই যার জন্য বিশ্বের বুকে ও সাহিত্য বিশেষ-উল্লেখযোগ্য হ'তে পারে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের লেখকদের মতই এদেশের লেখকরাও বিশেষ উৎসাহ পান না অর্থানুকূল্য তো দূরের কথা। তবে দেশটি বল্‌কাণের অন্তর্গত বলেই কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্যে এর স্থানাভাব ঘটে না। তবে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে এ সাহিত্যে একটা স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছন্দ গতি আছে যে দুটি বিশেষত্ব সব সাহিত্যেই থাকা দরকার। উপরন্তু এ যুগের ধারানুবর্ত্তী হ'য়ে দরিদ্র শ্রমিক মজুর ও কৃষকদের নায়ক ক'রে সৃষ্টি করবার আগ্রহ বুল্‌গেরিয়ান্ লেখকদের আছে—যদিও তাঁরা রুষ সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

এই তো গেল এখনকার কথা। কে বল্‌তে পারে হয় তো অদূর ভবিষ্যতে এই সাহিত্যই সর্ব্বজন-সমাদৃত একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে সমাদৃত হবে একদিন!

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীকামিনী রায় বি-এ

বিদেশে ভগিনী একাকিনী এই আকস্মিক শোক-সংবাদে অভিভূত হইয়া পড়িবেন এই আশঙ্কায় তিনি পত্রে না লিখিয়া, স্বয়ং বালিনে গিয়া মুখে তাঁহাকে খবরটি শুনাইলেন এবং সান্ত্বনা ও সহানুভূতি দিবার জন্য কাছে রহিলেন। সন্তান-বিয়োগে গর্ভধারিণী জননীর যে অসহ্য বেদনা, দৈহিক সম্পর্ক বিনাও এই চিরকুমারীর মাতৃত্ব-রসে ভরা নারীহৃদয় সেই বেদনায় একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। পড়াশুনায় আর কিছুতেই মন দিতে পারিলেন না, সুতরাং দেশে ফিরিয়া আসাই সমীচীন মনে হইল। তখনকার মানসিক অবস্থা—শোকের প্রচণ্ড আঘাতে হৃদয়ের হাহাকার, ঈশ্বরের করুণা ও কল্যাণমঙ্গলের প্রতি ক্ষণিক সন্দেহ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব এবং অবশেষে ঈশ্বর-চরণে আত্মসমর্পণ, এ সকলের পরিচয় তাঁহার গোপনে রক্ষিত স্মৃতিলিপি ও দুই একটি ইংরাজী রচনা হইতে সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। দেশে ফিরিবার সময় দীর্ঘ সমুদ্রপথে নির্জ্জনে আপনার বেদনা, অনুযোগ, অভিযোগ সমুদয় পরম-জননীর চরণে লইয়া গিয়া, প্রাণে তাঁহার সান্ত্বনাবাণী শুনিয়া, ক্রমশঃ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী রচনায় এই বাণীসকল স্বপ্নচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা স্মৃতিলিপির কিয়দংশ ও ইংরাজী রচনার যথাযথ (literal) অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রের একটা দিক্ সুব্যক্ত হইয়াছে। শৈশবের ও বাল্যের স্নেহ-বুভুক্ষা যাহা কোনদিন কেহ তাঁহার মুখে শোনে নাই, এই শোকের আঘাতে ভগবানকে তাহা জানাইয়াছেন এবং নির্জ্জনে গোপনে লিপিমুখেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

"১লা আগষ্ট—

আজ এক সপ্তাহ হইল আমার দুটুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি। পৃথিবী সর্ব্বদা যেমন চলে তেমনি চলিতেছে, কিন্তু আমার যেন এই চিরপরিচিত পৃথিবীকে অপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। * * * *

কতবার মনে হইতেছে—সবই কি স্বপ্ন নয়? আবার এক এক সময় নিজের মস্তিষ্কবিকৃতি হইল না-কি বলিয়াও ভয় হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এই, বিদেশে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে, যেন-কিছুই-হয়-নাই এইরূপ ব্যবহার করা। যদি একলা এক ঘরে পড়িয়া থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধহয় শরীর ও মনের উপর এতটা জোর করিতে হইত না। দুই দিন ত চোখের জল কিছুতেই একটু শুধের জন্যও থামাইতে পারি নাই। কি কঠিন আঘাতই পরমেশ্বর দিলেন। কখনও স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই। কোথায় তাহাকে সুস্থ সবল দেখিবার আশায় বাড়ী যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছি, যেখানে যাহা দেখিতেছি, তাহার জন্য সংগ্রহ করিতেছি, কত জায়গায় কত গল্প বলিব ভাবিতেছি—আর কোথায় সে চলিয়া গেল! সতী এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার পরে দুটুকে যখন বাড়ী* আনিলাম, পিতা মহাশয় বলিলেন যে মেয়েটির ভাগ্য ভাল, এত অল্প বয়সে কেহ এত দূরের দেশ দেখে না। ভাগ্য ভালই, শুধু পৃথিবীর দেশই যে দেখিয়াছে তাহা নহে, স্বর্গরাজ্যে গিয়াও সেখানকার শোভা-সৌন্দর্য্য আমাদের পূর্ব্বেই উপভোগ করিতেছে। এখানেও তো কত জায়গায়ই গিয়াছে। কতবার নেপাল গিয়াছে, হাজারিবাগে গিয়াছে,

* কলিকাতার বাড়ী।

পুরীতে গিয়াছে, চাকায় গিয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে তাহার শৈশবস্মৃতি যেন সুখের হয়, যাহা দর্শনীয় ও শিশুজীবনের উপভোগ্য সবই যেন তাহার জীবনে ঘটিয়া উঠে, বিধাতার কৃপায় তাহা সফল হইয়াছে।

সময়ে সময়ে শরীর যখন অবসন্ন বোধ হইয়াছে, ভবিষ্যতে কার্য্য করার সক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়াছে, গত দেড় বৎসরের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বুঝি বৃথাই হল, মনে হইয়া আক্ষেপ করিয়াছি, তখনই টুটুর কথা মনে হইয়া সমস্ত আক্ষেপ থামিয়া গিয়াছে। নিজের শক্তিতে যদি না কুলায় টুটু আছে, আমার সমস্ত সাধ ও শক্তি দিয়া তাহাকে সুশিক্ষা দিব, সে আমার অসমাপ্ত ও আকাঙ্ক্ষিত কাজ সব শেষ করিবে। যেদিন typhoid fever হইয়াছে খবর পাইলাম (তাহার পূর্ব্বেই সে নশ্বর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল) তখনও কেন পরমেশ্বর আমার মনে presentiment আনিয়া দিলেন না? আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। ছেলেমানুষ, typhoid fever, তবে বুঝি অব্যাহতি নাই। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই, চক্ষুর জলে বালিস সিক্ত হইতেছিল। ভোরের বেলায় পরমেশ্বরের দয়ার কথা মনে হইয়া সান্ত্বনার ভাব আসিল। তিনি এতদিন এত করুণা করিয়াছেন, যাঁহারই বিধানে কোপাকার অশিক্ষিত দরিদ্রসমাজের নিম্নশ্রেণীর ঘর হইতে এমন শিশু পাইলাম, কেমন করিয়া তাঁহার করুণায় অবিশ্বাস করিতেছি? তিনি কি আমার হৃদয় দেখিতেছেন না? তিনি কি আমাকে মাতা অপেক্ষাও বেশী স্নেহ করেন না? তিনি কখনই আমাকে এমন আঘাত দিবেন না। তিনি যে আমার নিকট হইতে তাহাকে লইয়া যাইতে পারেন, এই চিন্তার জন্য পর্য্যন্ত নিজকে অকৃতজ্ঞতা দোষে অপরাধী মনে করিয়া কতই অনুতাপ করিলাম।

*

টুটুর প্রতি আমার স্নেহের আবর্ষণ দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইতাম। ছোট একটি শিশুর জন্য এতদূর চিন্তা! নিজের কথা না ভাবিয়া তাহারই ভবিষ্যৎ চিন্তা দেখিয়া আমি অনেক সময় পরমেশ্বরকে আমার হৃদয় এইরূপ প্রসারিত করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছি। তাঁহার দান বিশেষভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি হইয়াছে মনে করিয়াছি। ইয়োরোপ হতে আসিয়া রমণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকটা নূতন ধারণা হইয়াছে, স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া সমাজ-সংস্করণ বিষয়ে সচেষ্ট হইব মনে করিয়াছি। টুটুকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছি। আমাকে দিয়া কোন কাজ না হইলেও তাহাকে দিয়া হইবে আশা করিয়াছি।"

হায় রে মাতৃস্নেহ! হায় রে নারী-হৃদয়ের চরম আকাঙ্ক্ষা—আমার সাধাতীত সাধনার আমার সন্তান সিদ্ধিলাভ করুক! সংসারের কোন্ জননী না চাহেন, সন্তান তাঁহার চেয়েও কৃতী হয়? কিন্তু এখানে জননী না হইয়াও পালয়িত্রীরূপে সেই আত্মবিলোপী স্নেহ দেখিয়া মনে হয়, নারীত্বের সহিত মাতৃস্নেহ একান্তই অবিচ্ছেদ্য।

P & O. S. N. Co

"২০শে আগষ্ট— S. S. China

আমার উপরে সমুদ্রের এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব।

জাহাজখানা জিব্রল্টারে আসিয়াছে। অধিকাংশ যাত্রী ষ্টীমলঞ্চে চড়িয়া বন্দর দেখিতে গিয়াছেন। চারিদিকে বিষম ব্যস্ততা আর নানা রকমের বিষম শব্দ। লোকেরা দ্রুতপদে চলিতেছে, ভারী লগেজ সব উত্তোলিত হইতেছে, মেইলব্যাগ রওনা হইতেছে।

জাহাজের যে দিকটা বন্দরের দিকে সেই দিকেই এই ভিড় ও গোলযোগ, কিন্তু বিপরীত দিকে এসব নাই। ও দিকে প্রখর রৌদ্রতাপ, আর এদিকে সবই শীতল ও নিস্তব্ধ। আমি এক লস্করকে আমার ডেকচেয়ারটা এই দিকে আনিয়া দিতে বলিলাম। সেখানে বসিয়া আমি মনে ছোট ছোট ঢেউয়ের খেলা দেখিতে লাগিলাম। আমার পীড়িত ও উত্তেজিত স্নায়ুগুলী ধীরে ধীরে যেন স্নিগ্ধ ও শান্ত হইয়া আসিল। আজ এক মাস ধরিয়া আমার হৃদয় সন্তপ্ত, অশান্ত ও বিদ্রোহী। আমার ছোটটির মৃত্যুসং-

* My little one কথার এই অনুবাদ করা গেল।

বাদ আমাকে ভীষণ আঘাত করিয়াছে। আমি তাহার কাছে কবে ফিরিয়া যাইব বলিয়া দিন গুণিতেছিলাম। আজ প্রায় সতের মাস হইল আমি ইঙ্গিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছি, আর সেই অবধি এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার জন্যই পড়ি, অপরা দেশ-বিদেশ দেখিয়াই বেড়াই, আমার মন ছিল তাহারই কাছে। ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে তাহাকে শিক্ষা দিব, মনে মনে কত ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতেছিলাম। আমি তাহার জন্য কত বই, কতরকম ছোট ছোট জিনিষ কিনিয়া রাখিয়াছি, যখন যেখানে গিয়াছি সেখানকার পিক্‌চার পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করিয়াছি, যেন ফিরিয়া গিয়া সে সকল স্থানের বিস্তৃত বিবরণ তাহাকে দিতে পারি, সেই জন্য। বাড়ী ফিরিবার দিন যত নিকটতর হইতেছিল ততই সেদিন কত আদরে, কত আনন্দে অভ্যর্থিত হইব সেই দৃশ্য কল্পনা করিয়া মনকে সুখী করিতেছিলাম। আমি দেখিতেছিলাম আমার প্রিয়জনেরা একত্র হইয়া গাড়ী বারান্দার দিকে চাহিয়া সিঁড়ীগুলির উপরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছেন আর আমার ছোট্টটি নাচিয়া বেড়াইতেছে। যেমন আমার গাড়ীখানা গাড়ীবারান্দায় ঢুকিল সে আনন্দে মা-মা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, নামিতে না নামিতে আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অন্যেরা তাহাকে এই অধৈর্য্যের জন্য তিরস্কার করিতেছেন, শুনিলাম। বাড়ী ফিরিবার দিনের এই স্মৃতি আমাকে কতই না আনন্দ দিয়াছে।

ভগবান আমাকে এই বিদেশে এমন নিরাপদে রাখিয়াছেন সেই জন্য আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ ছিল। তিনি আমার এত কল্যাণ করিয়াছেন, তাই আমিও সংকল্প করিয়াছিলাম যে, আমি প্রাণপণ শক্তিতে তাঁহার সেবা ও মানবজাতির সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমি সারাজীবন নিঃসঙ্গ, নিশ্চিন্ত। কিন্তু এই ইয়োরোপ প্রবাসের সফলতার পর—তাঁহার এই এত করুণালাভের পর, আমি আর তো অভিযোগ করিতে পারি না। আর আমার নিঃসঙ্গতার দুঃখ থাকিবে না, আমার ছোট্টটি যে আছে, সে যে আমার জীবন মধুময় করিবে। আমি শিশুকালে চিরদিন একলা ছিলাম। আমার প্রকৃতিটা কেহ বুঝিত না, কেহ আমাকে আমার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিত না। একটুখানি মিষ্ট ব্যবহারের জন্য আমি কত লালায়িত ছিলাম, কিন্তু কেহ তাহা জানে নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা চাপা স্বভাবের বালিকা গড়িয়া উঠিলাম। আমার ব্যবহার নিতান্ত শুষ্ক হইয়া উঠিল, লোকে আকৃষ্ট না হইয়া দূরে সরিয়া যাইত। আমার ভাগ্নে-ভাই-বোনদের প্রতি বিরাগ বা বিদ্বেষবশতঃ এরূপ হইয়াছে, তাহা নহে; ইহার মূলে ছিল আমার অতিরিক্ত সংকোচ বা লাজুকতা এবং নিজের সম্বন্ধে হীনতাবোধ। সে যাহা হউক, এতকাল পরে আমি ভাবিতেছিলাম যে, অবশেষে আমিও সুখী হইতে যাইতেছি, আমি সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া চলিয়াছি।

এমন সময়ে অকস্মাৎ আমার ছোট্টটির মৃত্যুসংবাদ আসিল। সব যেন ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ হইয়া গেল। কি যে হইয়াছে সম্যক্ উপলব্ধি করিতেও পারিলাম না। এও কি হয়, ভগবান্ আমার এইটুকু সুখে বাদ সাধিবেন? আমার তো নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। অন্যেরা জীবনে কত সুখ সম্ভোগ করে। তাহাদের কত বন্ধুবান্ধব, কত ভালবাসা, কত টাকাকড়ি, হাজারো রকমের কত কিছু আছে। আমার কিছুই ছিল না। আমি খাটিয়াছি অন্যের সুখী করিবার জন্য; যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা অন্যের সাহায্যের উদ্দেশ্যে। নিজের জন্য অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সর্ব্বদা সকল বিষয়ে নিজের প্রতি কার্পণ্যই করিয়াছি। আমার কোনকালে অশন, বসন ও অলঙ্কারের জন্য অর্থব্যয় করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। অনেক সময়ে পুস্তক কিনিতে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার সে আকাঙ্ক্ষাও আমি পূর্ণ হইতে দিই নাই। আমি ইয়োরোপে আসিবার জন্য যে বৃত্তি চাহিয়াছিলাম, তাহার কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ ভাল বেতনে বড় চাকরী পাইলে আমার ছোট্টটিকে খুব ভাল শিক্ষা দিতে পারিব দ্বিতীয়তঃ নারীজাতির গৌরব বাড়াইতে পারিব। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানলাভ ছিল অপর উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের জন্য কিছুরই আবশ্যক ছিল না। এখন দেখিতেছি আমার সকল উদ্যম, সকল পরিশ্রম নিষ্ফল হইল।

আমার প্রতি অদৃষ্টের অবিচারের কথাই বার বার মনে

হইতেছে। আমার প্রতি এতবড় নিষ্ঠুর আচরণের জন্য ভগবানকেও আমি দোষী করিতেছি। আমার শোকাক্রান্ত মন স্বভাবতঃই বিকল হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানকেও বিচার করিবার স্পর্দ্ধা রাখি বলিয়া যেন একটা অস্বাভাবিক গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। হায়রে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবত্বের অহঙ্কার!

লণ্ডনে প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক জিনিষ আমাকে উত্যক্ত করিত। যেচারা সুধীর ব্যবসায়ী আমাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিয়াছে; আমি কিন্তু তাহার প্রতি প্রথম প্রথম বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু তাহার নিষ্ঠ স্বভাব ও ধৈর্য্য আমাকে ক্রমে জয় করিয়াছে। আমি যতক্ষণ তাহার কাছে থাকিতাম মুখে প্রফুল্লতা দেখাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তখনও হৃদয়ের মধ্যে শোকের দংশন সমান ভাবেই পীড়া দিত।

সমুদ্র আমার মনের উপর আশ্চর্য্য মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। আমার হৃদয় যেন জুড়াইয়া দিতেছে। আমি যে কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা বুঝাইয়া দিতেছে; ওর স্নেহমধুর স্বরে আমাকে বলিতেছে—'ওরে অবুঝ, ভগবান্‌কে বিচার করিতে বিচারকের আসনে বসিয়াছ?' তাইতো! এই যে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান লইয়া এত অহঙ্কার, এ জ্ঞান কোথা হইতে পাইলাম? এ যে সেই মঙ্গলময় ভগবান্ পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞানের ক্ষুদ্রতম কণিকা মাত্র। কি স্পর্দ্ধা আমার, আমি তাঁহার মঙ্গল ভাবের অতল রহস্য উদ্ভেদ করিতে চাই?

আজ সমুদ্র আমাকে ঘুমপাড়ানিয়া গান গাহিয়া স্বপ্নরাজ্যে পাঠাইয়াছিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি আমাদের জীবনদাতা মহান্ পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। আমি ঠিক দৃষ্টি দ্বারা দেখি নাই, কিন্তু আমি তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিতেছিলাম, তাঁহার স্বর শ্রবণ করিতেছিলাম। আমি 'স্বর' ও 'শ্রবণ' এই দুই শব্দ ব্যবহার করিতেছি, কারণ ঠিক কি করিয়া মনের অনুভূতি বুঝাইব জানি না। মানুষের ভাষায় কেবল এইরূপেই তাহার প্রকাশ সম্ভব। সেই স্বর যেন বলিতেছিল—'বাছা, তুমি ক্লিষ্ট, তুমি অসুখী, তোমার হৃদয় সংশয় ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। আমি যদিও তোমার হৃদয়খানি ভাল করিয়াই জানি, তবু আমি চাই, তুমি আমার কাছে তোমার মনের সকল কথা খুলিয়া বল।'—আমি বলিলাম, তুমি কেন সকলের সঙ্গে একরকম ব্যবহার কর না? এ সংসারে কেহই সম্পূর্ণ সুখী নহে সত্য, কিন্তু তথাপি প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে কিছু না কিছু সুখ আছে, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আর কাহারও একটু সুখ আছে বলিয়া আমি যে অসন্তুষ্ট তাহা নহে। মানুষ যে পরিমাণে দুঃখ ভোগ করে, তাহার তুলনায় তাহার সুখটুকু অতি সামান্য। আমার যদি সাধ্য থাকিত, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এমন কি নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়াও অন্যের সুখ বৃদ্ধি করিতাম। আমার অভিযোগ এই যে, সে দুঃখ না দিলেও চলে, সেই অনাবশ্যক দুঃখ তুমি দিয়া থাকে। আমার সেই ছোট্ট শিশুটি, সে তো কাহারও সুখের পথে বাধা ছিল না; বরং সে ক্ষুদ্র জীবনটুকু এত সুখে ভরা, এমন আনন্দময় ছিল, যে, যে কেহ তাহার কাছে আসিয়াছে তাহারই উপরে আপনার আনন্দ-কিরণ বর্ষণ করিয়াছে। এমন একখানি জীবন আমার নিকট হইতে কেন কাড়িয়া লইলে? তুমি কি আমার হৃদয়ের শূন্যতা দেখিতেছ না? তুমি কি দেখিতেছ না, যে আমার যাহা কিছু শক্তি ছিল, আমার মধ্যে যাহা কিছু রাখিবার মত ছিল, তুমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্তই লইয়া গিয়াছ? আমার মনে হয় আমার জীবনে আর কিছুই নাই। আমি একলা এই শূন্য হৃদয় লইয়া কিরূপে সংসারের সম্মুখীন হইব? তুমি চিরদিন আমার প্রতি কঠিন। যখন আমি শিশু ছিলাম, আমার মনে আছে, আমি আমার মাতার স্নেহ, মায়ের আদর-মাখা স্পর্শের জন্য কত ক্ষুধিত থাকিতাম, কিন্তু তাহা পাই নাই। যদি তুমি আমার স্নেহের ক্ষুধা না-ই মিটাইবে, তবে কেন এমন হৃদয় দিলে যাহা স্নেহের জন্য এত ব্যাকুল? কেন আমাকে স্নেহ-ভালবাসার অনুভূতি দিলে, অনুভূতি-হীন অথবা উদাসীন করিলে না কেন? যদিও আমার হৃদয় প্রীতি ও সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল ছিল, তবু আমি সেজন্য অভিযোগ করি নাই, নিজের অদৃষ্ট লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেই চেষ্টা করিয়াছি। তারপর এই শিশুটিকেই ভালবাসিতে, পরম স্নেহে লালন পালন করিতে দিলে কেন, যদি বেশী দিন ইহাকে আমার কাছে না-ই রাখিবে? আমি এতকাল সব

সহ্য করিতে পারিয়াছি কিন্তু এই শেষ পরীক্ষা আমার সাধ্যের অতীত।

সেই জ্যোতি:পুরুষ বলিলেন—'শোন বৎসে, কোন শুভ সাধনা নিষ্ফল হয় না। তুমি সত্য বলিয়াছ, তোমাকে কোমলতা, স্নেহ ও সহানুভূতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এ সকল মহত্তর মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করিবে। তোমার সমস্ত ভালবাসা কি তুমি আমাকে দিতে পার না?' আমি বলিলাম—তুমি এত মহান্, বুদ্ধির এমন অগম্য, তুমি চিন্ময় সত্ত মাত্র, আমি তোমাকে আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়া তৃপ্তি পাই না। আমি তো বিদেহী আত্মা নই; আমি একটা মানুষ মাত্র; আমি যাহাদের ভালবাসি তাহাদের সুখ ও কল্যাণের জন্য আমি আমার সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিতে চাই। আমি এত ক্ষুদ্র, এত তুচ্ছ, তুমিও আমাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পার না, যেমন একজন মানুষ আর একজন মানুষকে ভালবাসিতে পারে। তাহা ছাড়া, মানুষের মধ্যেই এ পৃথিবীতে যত সাধু মহাত্মা আছেন, তাঁহাদের তুলনায় আমি কোন্ ছার; নিশ্চয়ই আমার চেয়ে তাঁহারাই তোমার প্রিয়তর। যে তুমি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর, সে তুমি কি আমার ছোট ছোট নিরাশার ব্যথা, আমার ব্যর্থ অনুশোচনা, দুঃখ দুর্ভাবনা শুনিবার জন্য একটুও আগ্রহযুক্ত হইবে? না-না, তুমি যে আমার পক্ষে অতিশয় মহান্, তোমার ভালবাসা আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। আমি এক অবয়ব সত্তা, একটি ভাব মাত্র লইয়া সুখী হইতে পারি না। আমি একটা মানুষের মত একজন চাই।

তখন সেই জ্যোতির্ময় সত্তা অতি করুণার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—'অবুঝ হইও না, আমার দিকে চাও, আমার কথা শোন। তুমি আমাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পার না, কারণ আমি সমগ্র, আর তুমি আমার অংশ মাত্র। কিন্তু বিশ্বাস কর, যে, আমি—এই আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহা মানুষের সকল ভালবাসার চেয়ে বড়। আমার ভালবাসা তোমার সবচেয়ে অসম্ভব স্বপ্নেরও অতীত। আমি তোমার স্রষ্টা, তোমার জীবনদাতা, তোমার প্রেম ভিক্ষা করিতেছি। ওরে আমার অবোধ সন্তান, তুই বলিতেছিস্ আমি তোকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে জানি না, যেমন করিয়া মানুষ মানুষকে ভালবাসে? ভালবাসার ভাব কে মানুষের দিয়াছে? সে যে আমি। কে ভালবাসা প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছে?—সে যে আমি। কোন মানুষ আমার ভালবাসার গভীরতা ও প্রসার ইয়ত্তা করিতে পারে না। আমি তোমাকে আমার জন্য চাহিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমিই তোমার হৃদয় কোমল, স্নেহময় ও পরদুঃখকাতর করিয়াছি। তুমি তোমার বাল্যে যেটুকু স্নেহ পাও নাই সত্য, কিন্তু স্নেহের অভাবে আমি তোমার হৃদয়টুকু অনুভূতিহীন ও উদাসীন হইতে দিই নাই। আমি তোমার ব্যথিত, পীড়িত হৃদয়খানি আমার দিকে আকর্ষণ করিয়াছি। তুমি স্মরণ করিয়া দেখ, তোমার মনে পড়ে কি না, যে যদিও তুমি তখন ক্ষুদ্র বালিকা ছিলে এবং যদিও বালবুদ্ধিতে আমাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তথাপি তুমি অন্য সব শিশু হইতে একটু ভিন্ন রকমের ছিলে। তুমি আমার কাছে আসিয়া তোমার সমস্ত মনখানি খুলিয়া বসিতে, আমার কাছে তোমার সব ছোটখাটো অভিযোগ ও নিরাশার ব্যথা লইয়া আসিতে। আর আর ছেলে মেয়েরা যেমন সান্ত্বনার জন্য মায়ের কাছে যায়, তেমনি করিয়া তুমি আমার কাছে আসিতে। কিন্তু শেষ দিকে তোমার মন কঠিন হইয়া যাইতেছিল, তাই আমি তোমার মনের যাথা ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই শিশুটিকে উপায়স্বরূপে নিয়োগ করিয়াছি। তুমি এমন শুষ্ক কঠিন ও মনভাঙ্গা হইয়া যাইতেছিলে যে, তোমার মন পৃথিবীর দুঃখক্লিষ্ট ভাইবোনদের জন্য ক্লেশ অনুভব করিলেও সহানুভূতি প্রকাশে তুমি অক্ষম ছিলে। সহানুভূতির নির্ঝর প্রস্রবণ মৌনতার কঠিন আবরণে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। যদি এই শিশুকে দিয়া সেই আবরণ অপসারিত না করিতাম সে নির্ঝর একেবারেই শুষ্ক হইয়া যাইত।

'শিশুর মৃত্যুতে তুমি নিদারুণ শোক পাইয়াছ। কিন্তু আত্মা যে অমর। সে তো সত্যই মরে নাই, তাহার স্মৃতি নিরন্তর তোমার সঙ্গে থাকিবে। তাহার এখানকার জীবন সুখময় ছিল, তাহারই উদ্দেশে তুমি আর কোন শিশুকে সুখী করিতে চেষ্টা কর, তবেই

পৃথিবীর পক্ষে মৃত হইলাও সে তোমার অন্তরে কল্যাণ-রূপের অনুপ্রাবনা হইয়া থাকিবে।

'আমি জানি তুমি এই শিশুর চরিত্র গঠন করিবার জন্য কত উদার কল্পনা করিয়াছে। তোমার পরিমিত বুদ্ধিতে যতটা সম্ভব, তাহাকে তুমি নিখুঁত করিয়া গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়া ছিলে। তোমার ক্ষুদ্র কল্পনা ব্যর্থ হইল বলিয়া তোমার মন নিরাশায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তুমি কি বোঝ না, যে, আমি তোমার চেয়ে তাহার ভাল অভিভাবক। আমি যে তোমার দায়িত্বভার ঘুচাইয়া তাহাকে আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করিলাম সেজন্য আনন্দিত হও।

'তুমি তোমার সমস্ত মনের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি-পাত কর, দেখ, আমি তোমাকে কত যত্নে রাখিয়াছি, তোমাকে প্রত্যেক পাপপ্রলোভনের আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়াছি। তোমার ব্যক্তিগত জীবনে তুমি কোন সুখ পাও নাই বলিয়া অভিযোগ করিতেছ। তুমি বলিতেছ, এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু সুখ পায়; কিন্তু সুখ যে কি, সে বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ধারণা। তোমার যাহারা জানে, তাহারা তোমার বন্ধু, তাহারা প্রায় সকলেই বলিবে, তোমার জীবন অবিমিশ্র সুখের জীবন। যাহার যে বেদনা তাহা কেবল তাহার আপন হৃদয়ই জানে। তোমার ভিতরে সহানুভূতির জন্য যে ক্ষুধা ও তাহার অভাবে যে দুঃখ, তাহা অপরে কল্পনা করিতেও পারে না। তাহারা কল্পনা করিতে পারে না, এক একটি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ তোমার প্রাণে কি শূন্যতা, কি কঠিন বেদনা রাখিয়া যাইতেছে। হৃদয় যখন নিরানন্দ তখনও মানুষকে হাসিমুখে বেড়াইতে হয়, দেখাইতে হয়, যেন কিছুই হয় নাই। আমি ভিন্ন মানুষের হৃদয়ের বেদনা আর কেহ দেখিতে পায় না। তাই, অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া তোমার নিজেকে দুঃখী মনে করা একটা ভুল। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই। তুমি কি আমাকে তোমার সমস্ত হৃদয়খানি দিবে না?'

সুমিই রাগিণীর মত সেই সুর আমার মর্মে মর্মে প্রবেশ করিল, আমার হৃদয় বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল আমি কাঁপিতে লাগিলাম। তাহার পর সহসা এক অনির্বচনীয় শান্তি ও অপূর্ব বাৎসল্যরস আমাকে অভিষিক্ত করিল।

ঠিক এই সময়ে ষ্টীমলঞ্চ প্রত্যাগত যাত্রীদের লইয়া ঘাটের পার্শ্বে আসিয়া লাগিল। আগন্তুকদের কোলাহল-ধ্বনি, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া প্রথমতঃ আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না আমি কোথায় আছি। তাহার পর সকল কথা মনে হইল। কিন্তু অনুভব করিলাম আমার হৃদয় এক অপূর্ব শান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে।"

(ক্রমশঃ)

নেত্রকোণা

মহিলাদের সুসংবদ্ধভাবে সম্মেলন, স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, কুটীরশিল্পের বিস্তার, অসহায়া বিধবাদের সাহায্য, নীতি ও ধর্ম্মের আলোচনা, পরস্পর সহানুভূতি ও সেবা-শুশ্রূষাদি দ্বারা নারীসমাজের ও শিশুগণের কল্যাণ সাধন, এইরূপ কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য লইয়া বিগত ১৩৩৬ সনের ১৫ই বৈশাখ নেত্রকোণা নারীমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠা।

বর্ত্তমানে সমিতিতে পাঁচটি মাত্র তাঁত আছে এবং তাহাতেই পরস্পর সাহায্য প্রণালে অনেকে তোয়ালে, গামছা, লুঙ্গীর সলিতা প্রভৃতি প্রস্তুত শিক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁত তৈয়ার করাইয়া শিক্ষা করা সকলের সম্ভবপর হইবে না বুঝিয়া সমিতির তাঁত দিয়া যথাসম্ভব সাহায্য করা যাইতেছে।

এই সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যা শ্রীযুক্তা সরোজিনী সেন-রায় এক অত্যাবশ্যক ও গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতেছেন। আশা করি অনতিবিলম্বে উহার প্রতি সকলের সমুচিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ নারীমঙ্গল ও শিশুমঙ্গলের উহা এক প্রধান সোপান। তিনি সহরের বিভিন্ন স্থানে আলোচ্য কার্য্যে ৩৭ জন মহিলাকে তাঁহাদের গৃহে সাহায্য করিয়া স্থানীয় মহিলাসমাজের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য সমিতির পক্ষ হইতে অন্তরের সহিত তাঁহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শ্যামাসুন্দরী দেবীও সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া মহিলাদের প্রসবকার্য্যে সাহায্য এবং অসুখে সেবা-শুশ্রূষায় যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া স্থানীয় মহিলাসমাজে সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই উপকারের জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দিতেছি।

এতদঞ্চলে বন্যা ও অজন্মার ফলে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় গুরুতর অন্নবস্ত্র-সঙ্কট উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষের উপশম কল্পে এই সমিতির স্থাপিত তহবিল হইতে প্রায় এক শত পুরাতন কাপড় ও কয়েক মণ চাউল দান করা হইয়াছে। মফস্বলব্যাপী অভাব সুদীর্ঘ কাল থাকায় আমরা এই দুঃসময়ে প্রয়োজনমত ও আশানুরূপ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি নাই।

আমাদের সমিতির অন্যতমা সভ্যা নেত্রকোণার মোক্তার ৺ গোপীনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা নিত্যময়ী বিশ্বাস মহাশয়া তাঁহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি স্থানীয় ৺ শ্রীশ্রীকালীমাতার সেবায় উৎসর্গ করিয়া নারী-সমাজের বিশেষতঃ আমাদের সমিতির যে গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন, তজ্জন্য সমিতির পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি আমাদের নারীসমাজে এই দৃষ্টান্তের অনুকরণের অভাব হইবে না।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে পারি যে মহিলাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা, সদালাপ, সদ্গ্রন্থ পাঠ, সদনুষ্ঠান ও

সৎকার্য্যে যোগদান, বিপদে সাহায্য, অসুখে সেবা ইত্যাদির ফলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত যে ভক্তি, স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহা ভাবিলেও মন আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এই সমিতির মধ্য দিয়া মহিলাদের অবাধ মেলামেশা, সদালাপ-সদ্গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদির ফলে মহিলাদের মধ্যে একটা একতা ও প্রীতির যে ভাব হইয়াছে তাহাতে একে অন্যের প্রতি বিপদে সাহায্য, অসুখে সেবা-শুশ্রূষা করা বা সহানুভূতি দেখান বাস্তবিকই কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। উহাতে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, প্রাণে দয়া ও স্নেহের ভাব আসে, একতার বাঁধন শক্ত হয়, শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।

গত কয়েক বৎসর হইতে এই সমিতির একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে ইতিহাস, জীবনচরিত, শিক্ষা, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ের বই অনেকে দান করিয়াছেন। যাঁহারা এই পুস্তকালয়ে পুস্তক দান করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যথাসাধ্য সহায়তা বা সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সশ্রদ্ধচিত্তে ধন্যবাদ দিতেছি।

বর্ত্তমানে সমিতির সভ্যসংখ্যা ৯৬ জন। আলোচ্যবর্ষে সমিতির সাধারণ সভা ৮টি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৩টি সর্ব্বসমেত ১১টি সভার অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে নারীমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি পাঠ ও নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বীণাপাণি গুপ্তা ও কার্য্যকরী সমিতির সভ্যা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী সমিতির সভ্যাপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রমশীলতা ও একনিষ্ঠতার তুলনা নাই।

সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বীণাপাণি সেন গুপ্তা গত কয়বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সমিতিকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কার্য্যভার ত্যাগে সমিতি নিত্যান্তই ক্ষতিগ্রস্ত।

দেশের এই অর্থসঙ্কটের জন্য গত শ্রাবণ মাস হইতে কার্য্যকরী সমিতির সভ্যাদের চাঁদা মাসিক ১৲ স্থলে ।৹ আনা ও সাধারণ সভ্যাদের চাঁদা মাসিক ।৹ আনা স্থলে ৶৹ আনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মোট ১৮৫৸৩ জমা এবং ১১৮৸৬ খরচ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৩৩৭ সনের তহবিল মধ্যে ২০৮৸৶৬ পাই সভানেত্রী শ্রীযুক্তা ভানুসুন্দরী দেবী মহাশয়ার নামে নেত্রকোণা লোন আফিসে অস্থায়ী ভাবে আমানত আছে।

অবশেষে যাঁহার সাহায্যে ও অকান্ত পরিশ্রমে এই সমিতি চলিয়া আসিতেছে এবং যিনি নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন লোকনিন্দা উপেক্ষা করিয়াও এই দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার কার্য্য বৃদ্ধ বয়সে চালাইয়া আসিতেছেন, আমাদের সেই মাতৃস্থানীয়া সভানেত্রী শ্রীযুক্তা ভানুসুন্দরী দেবীকে সমিতির সকল হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রী শৈলরাণী মজুমদার,
সম্পাদিকা

ইতিনা (যশোহর)

গত ২৬শে মার্চ্চ তারিখে আমাদের মহিলাসমিতির তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে যশোহরের ডিঃ বোর্ডের সভাপতি মহাশয় বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিয়া আমাদের উৎসাহিত করেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতাও তিনি করেন। এজন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গত ১লা এপ্রিল হইতে আমাদের বালিকাবিদ্যালয়টি সরকার কর্ত্তৃক নিম্ন ইংরাজী বালিকাবিদ্যালয় রূপে গণ্য হইয়াছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এতদিনে গ্রামের বালিকাদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইল। এজন্য আমরা শ্রীযুক্তা মনীষা রায়ের নিকটে বিশেষ রূপে ঋণী। তিনি এখানে আসিয়া স্কুল ও মহিলাসমিতি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহারই যত্নে বিদ্যালয়টির এইরূপ উন্নতি সম্ভব হইল।

মহিলাসমিতির বসন্তোৎসব উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মহিলাসমিতির সভ্যবৃন্দ মহিলারা গ্রামের তথা সমগ্র দেশের মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং পরস্পরে আশীর্ব্বাদ ও প্রীতি বিনিময় করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

নববর্ষে প্রতি গৃহ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং মাল্য-গন্ধ উপচারে সোমাতা ভগবতীর অর্চ্চনা করা হইয়াছিল।

এখানে একটি সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হয়, মহিলাসমিতি হইতে প্রতিযোগীদের শঙ্খ মাল্য উলুধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

অল্পসময়ের মধ্যে ১৮ মাইল সন্তরণ করিয়া ১১ জন বালক বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

অর্থসমস্যা সমাধানের চেষ্টায় একটি শিল্প আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহিলারা নিয়মিত ভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। দর্জ্জীর কাজে সুদক্ষ একটি ছেলে ছাটকাট সেলাই শিক্ষা দিতেছে।

কালিয়া মহিলাসমিতির ভূতপূর্ব্ব শিল্প ও তাঁত শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী এখানে আসিয়াছেন। তিনি সম্পাদিকার বাড়ীতে থাকিয়া মহিলাদের তাঁত এবং শিল্প শিক্ষা দিতেছেন। শিল্পাশ্রম দুইটি বেশ ভাল ভাবে চলিতেছে।

বালিকা স্কুলগৃহ নির্ম্মাণের জন্য এখন অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থসঙ্কটের দিন সেই অর্থ সংগ্রহ করাই আমাদের একতম উদ্দেশ্য হইয়াছে এবং ইহার জন্য নানা-প্রকার চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রী কিরণশশী দেবী,
সম্পাদিকা

সাতঘরিয়া (টাটীবুনিয়া)

মহিলাসমিতির সাধারণ সভ্যাদের অধিবেশন সমিতির কোন সভ্যার নিমন্ত্রণে তাঁহার বাড়ীতে অথবা সেক্রেটারী মহাশয়ার বাড়ীতে হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে সমিতির মেম্বর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অন্যান্য নিকটবর্ত্তী গাঁয়ের মেয়েরা খুব আগ্রহের সহিত আমাদের সাধারণ সভায় যোগদান করিয়া থাকেন।

সাতঘরিয়া মহিলাসমিতির প্রত্যেক সভ্যার বাড়ীতে এক একটা তাঁত রাখা হইয়াছে। সে সব তাঁতে সভ্যারা প্রত্যহ তিন বুনি করিয়া চাউল রাখিয়া থাকেন। সেই চাউলগুলি মাসের শেষে একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়া মাসে ১/০ একমণ চাউল হইয়া থাকে। স্থানীয় অনেক চাউল ব্যবসায়ীর নিকট চাউল সুবিধা দরে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত আছে। ইহাতে মাসে ১৸০ অথবা ২৲ টাকা হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন সমিতির মেম্বরগণ প্রতিমাসে কমপে, আমা ইত্যাদি বুনিয়া সমিতির সাধারণ অধিবেশনে সমিতিকে উপহার দেন। সাধারণ অধিবেশনেই অন্যান্য সভ্যাগণ উহা আগ্রহের সহিত কিনিয়া থাকেন।

সম্পাদিকা

কল্যাণী-সঙ্ঘ (চক্রধরপুর)

সমাজের ও জাতির কল্যাণ নারীজাতির মধ্যে। আমাদের কল্যাণী ভগ্নীকুলের জীবন যতদিন বিধি-বিধানের সীমাহীন নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় নিরানন্দতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে—ততদিন সামাজিক উন্নতি ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সকল চেষ্টাই বৃথা। তাঁহারা স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শরীরপালন, সূচীশিল্প প্রভৃতি কল্যাণকর ও অর্থকর বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এইরূপ অবনত অবস্থা হইতে নারীজাতি সমুন্নত না হইলে আমাদের সমাজের কল্যাণ অসম্ভব। বাহিরের কোন শক্তিই তাঁহাদিগকে প্রকৃত কাজে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে না। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ও সমিতিবদ্ধ প্রণালীতে কার্য্য করিয়া নারীকে নিজেই সংসার ও সমাজে কল্যাণকর ও গৌরবময় অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই প্রয়োজন সফল করিতে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ সালে কল্যাণীসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে।—

(ক) এই সঙ্ঘের প্রধানতম উদ্দেশ্য নারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করা।

(খ) পরস্পরের সাহায্য ও আদান-প্রদানের দ্বারা ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেবাধর্ম্মের উৎকর্ষ করা।

(গ) পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান পুনঃপ্রবর্ত্তনের দ্বারা ধর্ম্মনৈতিক উৎকর্ষ করা।

(ঘ) পারিবারিক কার্য্যাবলী, রন্ধনবিদ্যা, সূচিবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন প্রভৃতির শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা গার্হস্থ্যধর্ম্ম এবং চারুশিল্পের উন্নতি করা।

(ঙ) উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও আদর্শকে কার্য্য করিয়া জাতি-নির্ব্বিশেষে যে কোন মহিলা ন্যূনকল্পে ৵০ এক আনা

হিসাবে মাসিক চাঁদা দিয়া এই সঙ্ঘের সভ্যা হইতে পারিবেন।

(২) একটি সভানেত্রী, একটি সম্পাদিকা ও সাত জন সভ্যা লইয়া সঙ্ঘ গঠিত হইবে। একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর এই সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রকার পরিচালন-ভার ন্যস্ত রহিবে।

(৩) বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নির্ব্বাচিত হইবে এবং বর্ষশেষের পূর্ব্বে সভ্যাপদ শূন্য হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিই মনোনয়ন দ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে পারিবেন।

(৪) সর্ব্বপ্রকার কার্য্যভার ও কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপরই রহিবে।

শ্রী পঙ্কজিনী দে,
সম্পাদিকা

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি (বগুড়া)

প্রায় ৪ বৎসর হইল বগুড়ার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, বি, দে মহাশয়ের পত্নী বগুড়া সহরে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সমিতির সভ্যা-সংখ্যা ৬০।৭০ ছিল। সভ্যাগণের সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত সমিতিতে একটি লাইব্রেরী ও সতরঞ্চি ও গামছা বয়নের তাঁত আছে। সভ্যাগণ উৎসাহ সহকারে শিল্পজাত নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিতেছিলেন। গত পূজার ছুটীর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত এ, বি, দে অবসর গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত এস, এন, রায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। মিসেস্ রায় নূতন এক মহিলাসমিতি স্থাপন করেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী মিস্ মণ্ডল নূতন সমিতির সেক্রেটারী হইয়াছেন। তিনি সরোজনলিনী সমিতির সভ্যাগণকে না জানাইয়া সরোজনলিনী সমিতির সঞ্চিত অর্থ নূতন সমিতিতে দান করিয়াছেন। সরোজনলিনী সমিতির সভ্যাগণ সেক্রেটারীর নিকট তাঁহাদের সমিতির সঞ্চিত অর্থ দাবী করিতেছেন কিন্তু সেক্রেটারী মহোদয়া এ পর্য্যন্ত উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করেন নাই। জেলা জজ শ্রীযুক্ত কে, দি, চন্দের পত্নী মহোদয়ার নিকট উক্ত গোলযোগের বিষয় উল্লিখিত হইলে তিনি সেক্রেটারীকে সরোজনলিনী সমিতির অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তথাপি সেক্রেটারী উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা না করায় সরোজনলিনী সমিতির সভ্যাগণ বগুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করার নিমিত্ত একখানি দরখাস্ত দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় উক্ত বিষয় মীমাংসা করিতে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এ বিষয়ে সুবিচার করিবেন।

শ্রী সরযূবালা রায়,
সম্পাদিকা

চিত্র-পরিচয়

কালীয়-দমন

এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একখানি প্রাচীন বাংলার "ক্রমপুষ্ট" পট হইতে "কালীয়-দমন" চিত্রখানি প্রকাশিত হইল। প্রাচীন কালের বাঙ্গালী পটুয়ারা দেবদেবীর লীলাচিত্র রচনায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহার নিদর্শন আমরা এই 'কালীয়-দমন' ছবিখানিতে পাইতেছি। এমন সুন্দর বর্ণসমাবেশ (colour composition), এমন সুন্দর ছন্দের সাহসিক প্রয়োগ (bold touch) ভারতীয় অন্য কোন চিত্রপদ্ধতিতে দেখা যায় না। সর্ব্বোপরি সর্পের শরীরসংস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের গতিভঙ্গীর যে রূপ দান করা হইয়াছে, তাহাতে বাংলার নিজস্ব কলাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। আজ ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলার প্রাচীন পটুয়ারা তাহাদের সুগভীর রসানুভূতির প্রকাশের ভঙ্গিমার দ্বারা, বাংলার জাতীয় সংস্কৃতিকে অবনত করে নাই, বরং বাংলাকে অন্যান্য প্রদেশের রসকলার আসরে একটি বিশেষ সম্মানজনক আসন দান করিয়াছে।

শ্রী সুধাংশুকুমার রায়

ক্ষীর ও নীর

শুকতারা—শ্রী সতীশচন্দ্র রায়। ৬১ এ, মেছুয়া-বাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—বারো আনা।

কবিতার বই। কবিতাগুলির মুগাত্মক স্বভাবশুচিশ্রী ইহার শুকতারা নাম সার্থক করিয়াছে। প্রকাশের সহজ ভঙ্গী অনেক ভাবগূঢ় মনোবৃত্তিকেও সরল ও হৃদ্য করিয়াছে। খণ্ডকবিতা রচনায় সতীশ বাবুর পটুতা অবশ্যই বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অসমাদৃত হইবে না।

কয়েকটি পদসন্নিবেশে সামান্য ত্রুটি লক্ষিত হইল। যথা—

"এস মোর মনবনে **তরুণী বাসন্তিকা!**
আমি দিব গলে তোর **মোহনিদ্রা মালিকা।**"

শেষপংক্তিতে একটি বর্ণ বিয়োগ বা নিম্নতঃ একটি বর্ণ যোগ করিলে এরূপ হইত না।

'বাসন্তী' নামক সুন্দর কবিতাটির প্রারম্ভেই এইরূপ ত্রুটি সবাই মনকে পীড়িত করে।—

" ...তুমি কি এই **ধরণীর বনে?**
বাহিরে এস, **রহিল না ত মনে।**"

এখানে 'এই ধরণীর বনে'র বর্ণবৃদ্ধি ছন্দের হৃদ্য বর্ণভঙ্গী ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

অন্যস্থলে, 'চন্দ্রকিরণ স্মরণ' 'জীবনেতে সান্ত্বনা' দিতে গিয়া অনুরূপ আহত হইয়াছে।

'প্রীতির আলো' কবিতাটিতে (হয় ত ছাপার ভুলে), "দুই কালো তীর, মাঝখানে চলে আলোর স্রোতস্বিনী"—ইহার পূরক পংক্তি হারাইয়া গিয়াছে।

ত্রুটি সামান্য। উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, সতীশ বাবু ছন্দশিল্পে অপটু নহেন; সামান্য ত্রুটিই বা থাকিবে কেন?

শেষের দিকের একাধিক অমিত্র-ছন্দের 'কাহিনী' আমাদের ভালো লাগিল।

অত্যধিক রবীন্দ্র-প্রভাব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইলেও শুকতারার নিজস্ব প্রভা সুপরিস্ফুট এবং তাহা আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছে।

কলরব—শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্। মূল্য—এক টাকা।

অতি-আধুনিক কথাসাহিত্যে প্রবোধ বাবু সুপরিচিত ও শক্তিমান বলিয়া স্বীকৃত। বর্ত্তমান উপন্যাসেও তাঁহার শিল্পশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের অভিনবত্ব প্রথমতঃ নূতন কিছু কর'র কারণ বলিয়া মনে হইয়াছিল; পরে দেখা গেল—আখ্যান-ব্যাখ্যানে এই নূতনত্বের প্রয়োজন ছিল। সহর-সমাজের একটি প্রধান অংশের চরিত্রচিত্রণ হিসাবে লেখকের পর্য্যবেক্ষণ কৃতিত্বপূর্ণ। বইখানি আমাদের ভালো লাগিয়াছে এবং অন্যান্যেরও ভালো লাগিবে, আশা করা যায়। অতি-আধুনিকত্বের আবিলতা ইহাতে নাই।

অমৃত—সম্পাদক শ্রী হরিদাস মজুমদার। বার্ষিক মূল্য—১৸০ টাকা; প্রতি সংখ্যা—৵১০ পয়সা। কার্য্যালয়—৬, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা।

হরিদাস বাবু প্রতিষ্ঠিত 'অমৃত-সমাজের' কথা বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠক-পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। এই সমাজের উদ্দেশ্য—পার্থিব কর্ম্ম-জীবনের মধ্য দিয়া অমৃতত্ব লাভের সাধনা। এই মাসিক পত্রিকাখানি উক্ত সমাজের মুখপত্র-রূপে গত বৈশাখ হইতে (১৩৩৯) প্রকাশিত হইতেছে। "আমাদের কথা"য় সম্পাদক বলিয়াছেন,—"যাহাতে দুঃখ দূর হয়, মনের প্রসাদ লাভ হয়, স্ত্রী, পুত্র, সমাজ, দেশ ও জগতের কল্যাণ সাধিত হয়—এরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নয় কি? এই কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা একটি পরম সেবার কার্য্য। এই সেবাধর্ম্মের পথে মানবমনকে পরিচালিত করিবার জন্য সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছায়—অমৃতবাণী প্রচারে উৎসাহিত হইয়াছি।"

বিশিষ্ট বাণীসেবকগণ নিয়মিত ভাবে অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। মুখ্যতঃ এই কয়েকজনের নাম সম্পাদক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার

সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায়, শ্রীযুক্ত মেঘচন্দ্র বাগ্‌চী, শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায়, শ্রীযুক্ত সন্তোষপ্রসাদ বসু—" ইত্যাদি।

অগ্রহায়ণের অমৃতপ্রচার ভগবৎকৃপায় সার্থক হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা!

মুকুল—শ্রী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য—২৲; প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—২৯৯, বর্ণা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা।

ইহা বালক-বালিকাদের জন্য প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্র। বৈশাখ সংখ্যা পড়িয়া দেখা গেল—মুকুল তাহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং ইহা শিশুমনের পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে ইহাতে লিখিয়া থাকেন।

আমরা মুকুলের বহুল প্রচার কামনা করি।

—বঃ সঃ

ভারত লক্ষ্মী—শ্রী মতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রী কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচসিকা।

গোঁড়ামিবর্জ্জিত রক্ষণশীলতা—যাহা স্বাদেশিকতা বা দেশানুরোধ, আত্মমর্য্যাদা বা অপরনির্ভরতা, অনুকরণ-প্রিয়তা ও অ-দাস মনোবৃত্তির প্রতীক—এই ভাব "ভারত-লক্ষ্মী" নামক সুমুদ্রিত পুস্তকখানির সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের সবল লেখনী-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকখানি তাঁহার অন্তরেরই আলোকচিত্র। বড় দরদ দিয়াই তিনি ইহা লিখিয়াছেন। আত্মস্বাতন্ত্র্য-রক্ষণাভিলাষী জাতির শক্তি-স্বরূপিণী প্রত্যেক নারী ও সেই শক্তির সংরক্ষক এবং সর্ব্ববিঘ্নহারিণী মহাশক্তির উপাসক প্রত্যেক পুরুষেরই এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় ধ্যানের উপযুক্ত।

"দময়ন্তী-কথা"-রচয়িত্রী

সিঙ্গারের জন্মকথা

শ্রী প্রমোদগোবিন্দ মজলানবিশ বি, এস্-সি, ডিপ-টেক্

পৃথিবীর গতিবেগ প্রমাণ করিয়াছিলেন প্রথমে আর্য্যভট্ট। তার ফলে, আর্য্যভট্টের অদৃষ্টে কোনরূপ লাঞ্ছনা-ভোগ ঘটিয়াছিল কি না সে কথা আমরা জানি না। বহু-কাল পরে প্রমাণিত সত্যকে বিস্মৃতির অতল হইতে উদ্ধার করিয়া মানবসমাজে পুনঃপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন ইতালীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ এবং গণিতজ্ঞ মহাত্মা গ্যালিলেও। ইতালীর সুধী-সমাজ গ্যালিলেও'র এই প্রামাণিক সত্যকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। ফলে, গ্যালিলেও'র অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল অশেষ লাঞ্ছনা। সত্য প্রমাণসাপেক্ষই হো'ক, বা প্রত্যক্ষই হো'ক, মানুষ সহজে স্বীকার করিয়া লইতে চায় না—এমনি মানুষের মনের ধারা। মানবমনের এই চিরন্তন ধারার আজিও কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না সন্দেহ!

যাঁদের কল্পনায় সীবনযন্ত্র প্রথম মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল এবং সীবনযন্ত্রের ক্রমবিকাশের যাঁরা অগ্রদূত, তাঁদের প্রত্যেকেই মানুষের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন প্রভূত-পরিমাণে। পৃথিবীর গতিবেগ গোচরীভূত নয়, প্রমাণ-সাপেক্ষ সত্য। অজ্ঞানের ঘন তিমিরচ্ছায়ায় যখন দেশ সমাচ্ছন্ন, রক্ষণশীল মানবমন তখন অতবড় একটা যুগান্ত-কারী সত্যের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কী! কিন্তু মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান 'সিঙ্গার' মেশিনের মত না হউক, ইহারই অনুরূপ একটা যন্ত্র লইয়া যখন সীবনযন্ত্রের একজন আবিষ্কর্ত্তা দর্জ্জিদের কাছে ইহার তৎপরতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, দর্জ্জিরা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। একটা চাক্ষুষ সত্যকে মানিয়া লইতে মানুষের কতখানি কুণ্ঠা! ইহা কি দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় নয়?

আজ ঘরে ঘরে 'সিঙ্গার' মেশিনের প্রচলন হইয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মীদের কাছে প্রতি অঙ্গ ইহার সুপরিচিত। প্রতি-দিনের সঙ্গী এই যন্ত্র। কিন্তু কি করিয়া, কাহার কল্পনায়

প্রথম ইহা আবিষ্কার করিল এবং কাহার কল্যাণস্পর্শেই বা রূপপরিগ্রহ করিয়া ক্রমবিকাশের ফলে বর্ত্তমান আকার লাভ করিয়াছে, তাহা কি জানিবার বিষয় নয়? কঠোর নিপীড়ন এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া যাঁহারা আমাদের দান করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমানের এই অমূল্য যন্ত্র, তাঁহাদের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন!

সূচিশিল্প মানবেতিহাসের সমসাময়িক। লোভের বশে ভগবানের আদেশ বিস্মরণ করিয়া আদিম মানবী 'ইভ' নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলেন। তখন জন্ম নিল তাঁহার মনে প্রবল লজ্জা। সঙ্কোচ তাঁহাকে ভয় করিল—লজ্জা-নিবারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া বৃক্ষপত্র গাঁথিয়া সৃষ্টি করিলেন তাঁহার অবাবরক। সূচি-কর্ম্মের ইতিহাসেরও হইল সূত্রপাত। মানুষের প্রথম লজ্জাবরক-জীবনে আদিমাতা কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তার সন্ধান আমরা পাই না। তার পর কত হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সীবনযন্ত্রের জন্ম-ইতিহাসে গভীর ভাবে রেখাপাত কেহ করে নাই। সূচি-ব্যবসায়ীরাই ছিল তৎকালের সীবনযন্ত্র। কিন্তু যতই লঘু হউক না তাদের করাঙ্গুলি আর যত দ্রুতই হউক না তার গতি, সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মানুষের প্রয়োজনকে নির্ব্বাক করিয়া রাখিতে তাহারা পারে নাই। শিল্পী-মনে জন্ম নিল তখন হইতেই এর একটা বাস্তিক রূপদানের চিন্তা।

১৭৯৫ খৃঃঅব্দে চার্লস ফ্রেডারিক ভিজেন্থল্ (Charles Frederick Weisenthal) নামে একজন জার্মেন ঘড়ির কল্পনায় প্রথম জন্ম নিল সূচিকর্ম্মের আগে দ্রুত সম্পাদনের চিন্তা। তার চিন্তার ফল বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল পঞ্চাশ বৎসর পরে জন্ ডান্কান্ (John Duncan) নামে গ্লাসগো'র একজন ঘড়িবিদের হাতে। ডান্কানের হাতে রূপ পাইয়া যাহার জন্ম হইল তাহাকে সত্যিকারের সীবনযন্ত্র বলা যাইতে পারে না। ভিজেন্থল্ এবং ডান্কানের মধ্যবর্ত্তী সময়ে টমাস্ সেন্ট (Thomas Saint) নামে লণ্ডনের একজন আস্বাব-নির্ম্মাতার মনে, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ভাবে উন্নত প্রণালীতে সীবন ব্যবস্থার চিন্তা জাগ্রত হয়। আস্বাব-নির্ম্মাতার মনে সীবন-ব্যবস্থার উন্নতি চিন্তা—আশ্চর্য্যের বিষয় বৈকি! কিন্তু ভগবান কাহার হাত দিয়া কখন্ কোন্ কাজ সম্পাদন করাইয়া লন, তাহা বুঝিবার সাধ্য আমাদের কোথায়? ১৭৯০ খৃঃ অব্দে টমাস চামড়া সেলাই করিবার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তাহার স্বত্বাধিকার সনন্দ গ্রহণ করেন। চামড়া-সম্পর্কিত অন্যান্য সনন্দের সঙ্গে ইহারও সনন্দ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে টমাস স্বয়ং ইহার দিকে আর দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। ফলে মানুষ ইহাকে ভুলিয়াই গিয়াছিল। এমন কি সনন্দ-কার্য্যালয়েও কেহ ইহার কোন খোঁজ রাখিত না। প্রায় ৮০ বৎসর পরে অভাবনীয় রূপে একদিন টমাসের এই সনন্দের কথা পুনরাবিষ্কৃত হয়। ১৯১০ খৃঃ অব্দে টমাস চামড়া সেলাই করিবার জন্য যে যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার মূলনীতি এবং বর্ত্তমান যুগের প্রচলিত সীবনযন্ত্রাদির মূলনীতি প্রায় একই। টমাসের এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা এত দীর্ঘকাল সাধারণের অজ্ঞাত থাকায়, তাঁহার পরবর্ত্তীরা বস্তুতঃ ইহা হইতে কোন সাহায্যই পান নাই। স্ব স্ব চিন্তাধারা নিয়া একান্ত নিরপেক্ষভাবে সকলকেই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সীবনযন্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই তীব্রতা গতি কতখানি ক্ষতির কারণ হইয়াছিল তাহার পরিমাণ করা আজ প্রায় দুঃসাধ্য।

টমাস সেন্টের পরে ৮০ খৃঃ অব্দে ফরাসী দেশে প্রথম সীবনযন্ত্র আবিষ্কার করেন বার্থেল্মী থিমোনীয়ে (Barthelmy Thimonnier)। থিমোনীয়ে তাঁহার যন্ত্র ব্যবহার করিতেন দস্তানা সেলাই'র কাজে। মানুষের তুলনায় অল্প সময়ে বেশী কাজ করিতে পারেন দেখিয়া একদল অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ফ্রান্সের দরজিরা থিমোনীয়ে'র এই শুভ প্রচেষ্টাকে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। একদিন এক ক্ষুব্ধ জনতা থিমোনীয়ে'র প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করিল। যন্ত্রপাতি লণ্ডভণ্ড করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হইল না—থিমোনীয়ে'কে দেশছাড়া করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহারা বাঁচিল। হতভাগ্য থিমোনীয়ে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। প্যারি'র বাইরে দীর্ঘ তিন বৎসর কাল নিজেকে

প্যারিস বাহিয়া ১৮৩৩ খৃঃঅব্দে সাহসে নির্ভর করিয়া আরো উন্নততর একটি সীবনযন্ত্র লইয়া থিমোনীয় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বেচারা থিমোনীয়ে! ভাগ্য তাহার প্রতি অপরিবর্তিত। এবারে পুরস্কার জুটিল—আরো কঠোর নিপীড়ন। প্যারিস হইতে পলাইয়া ফ্রান্সের সহরে সহরে তাঁহার এই অদ্ভুত যন্ত্র দেখাইয়া লোকের কৌতূহল এবং পেয়াল চরিতার্থ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর পরে তিনি মগ্রিনী (Mogrini) নামে এক ধনবান ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। চুক্তিপত্র লিখিয়া আর একবার দুইজনে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য থিমোনীয়েকে পরিত্যাগ করিল না। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সে বিপ্লব আরম্ভ হইল। থিমোনীয়ে এবং মগ্রিনী দুইজনেই ধ্বংসমুখে পতিত হইলেন। ১৮৫৭ খৃঃঅব্দে এক দরিদ্র-কুটীরে ভগ্নহৃদয় থিমোনীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। থিমোনীয়ে'র সাধনা এবং একাগ্রতার তুলনা আজ পাইব কোথায়!

থিমোনীয়ে'র প্রায় সমসাময়িক কালে, ১৮৩২ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্কে ওয়াল্টার হান্ট নামে এক ব্যক্তি একটি সীবন যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু হান্ট বা তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। হান্টের পরে, আমেরিকায় যাঁহারা সীবনযন্ত্রের আবিষ্কারে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন হাবে (Howe) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। হাবেই সর্ব্বপ্রথম 'বখেয়া'-নীতির (lock stitch) সেলাই কলের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। ফিলেডেলফিয়ে ১৮৩৪ সালে জোসেফ্ মাডার্সবর্গ (Joseph Madersberg) নামে একজন যন্ত্রবিদ আবিষ্কৃত 'বখেয়া'-নীতির সেলাই কলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জোসেফ্ বা হান্ট কেহই তাঁহাদের যন্ত্রের কোনরূপ সনন্দ গ্রহণ বা তাহার বহুল প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। ভাগ্যলক্ষ্মী হাবে'কেই আশ্রয় করিলেন। পরিপূর্ণ-খ্যাতি তাঁহার অদৃষ্ট মূলতুবী রহিল। কিন্তু প্রভূত অর্থ বা অপরিসীম খ্যাতি তাঁহার ভাগ্যে একদিনেই জুটিল না। হাবে'র ইতিহাস ফ্রান্সের থিমোনীয়ে'রই অনুরূপ। হাবে'র জীবন ছিল বৈচিত্র্যবহুল। জীবনযুদ্ধে বার বার পরাজিত হইয়া অবশেষে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় করিয়াছিলেন।

১৮১৯ সালে মেসাচুসাট্‌সের এক পণ্ডগ্রামে হাবে'র জন্ম হয়। কৈশোরাবসানে বোষ্টন সহরে যন্ত্রবিদ্‌রূপে জীবনযাত্রা সুরু করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল একখণ্ড বস্ত্রের ভিতর দিয়া সূত্রনালী প্রবেশ করাইয়া অপর দিক হইতে আর একটি সূত্র দিয়া আবদ্ধ করিয়া সীবনকার্য্য সম্পাদন করিবেন। 'বখেয়া'র জন্ম হইল হাবের অদ্ভুত খেয়ালে। গবেষণা এবং পরীক্ষা চলিতে লাগিল। কিন্তু অর্থাভাবে কাজ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। সাড়ে পাঁচ বৎসরকাল পরে ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী ফিস্‌'য়ের (Fisher) সাহায্যলব্ধ অর্থে হাবে তাঁহার প্রথম যন্ত্র তৈয়ার করিলেন। নিজের আবিষ্কারে আনন্দিত হইয়া হাবে তাঁহার যন্ত্রের বহুল প্রচারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের তৎপরতা দেখাইয়া সাধারণের সহানুভূতি এবং দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণের জন্য তিনি বোষ্টন সহরের নামজাদা পাঁচ জন দর্জ্জিকে কেদিন প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়া বসিলেন। যে স্বল্পকালে ইঁহারা পরিমিত একখণ্ড বস্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পুনরায় সেলাই করিতে পারিতেন সেই সময়ের মধ্যে হাবে তাঁহার যন্ত্র সাহায্যে অনুরূপ পাঁচখণ্ড বস্ত্র সেলাই করিয়া দেখাইবেন, ইহাই হইল প্রতিযোগিতার বিষয়। প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। যতক্ষণে তাঁহারা অর্দ্ধেক কার্য্য মাত্র সম্পন্ন করিলেন, ততক্ষণে হাবে তাঁহার পাঁচখণ্ড বস্ত্রই সেলাই করিয়া প্রতিযোগী এবং দর্শক সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বিজয়গৌরব এবং জয়োল্লাসের পরিবর্ত্তে মিলিল তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা। পরাজয়ের অগৌরবে ক্ষুব্ধ হইয়া দর্জ্জিরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অতি কষ্টে তাঁহার যন্ত্র লইয়া ক্রুদ্ধ জনতার হাত হইতে হাবে মুক্তি পাইলেন। দরিদ্র হাবে থিমোনীয়ে'র মত দেশে দেশে, মেলায় প্রদর্শনীতে তাঁহার যন্ত্র দেখাইয়া কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। আমেরিকায় ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে যন্ত্রসহ তাঁহার ভাইকে ভাগ্যান্বেষণে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। দৌভাগ্যক্রমে, লণ্ডনে উইলিয়াম টমাস (William Thomas) নামে একজন পোষাক-নির্ম্মাতার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উইলিয়ামের সহিত মাত্র দেড় শত পাউণ্ডে তাঁহার পেটেণ্ট বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া হাবে'কে লণ্ডন চলিয়া আসিবার জন্য তিনি পত্র লিখিলেন। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্ব্বে এক চুক্তি হইল, উইলিয়ামের নির্দ্দেশমত যন্ত্রের কতকাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা কার্য্যোপযোগী করিয়া দিতে হইবে। হাবে একনিষ্ঠ ভাবে ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর কাল উইলিয়ামের নির্দ্দেশানুযায়ী পরিবর্ত্তনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু উইলিয়ামের মনোমত জিনিষ তৈয়ার করিয়া দিতে পারিলেন না। এভাবে অযথা অর্থব্যয় করিয়া অবশেষে উইলিয়াম হাবের পেটেণ্ট ক্রয় করিবার বাসনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেন। হাবে পুনরায় লক্ষ্মীছাড়া হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার এই অমূল্য যন্ত্রটি বন্ধক রাখিয়া পাথেয় সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তখন কে জানিত কত লক্ষ মুদ্রা ইহার মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

ইতিমধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারে চার্লস্ মোরে (Charles Morey) নামে একব্যক্তি আর একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কোরা মোরে'র কাহিনী বড়ই করুণ, মর্মন্তুদ। উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন আশা করিয়া তাঁহার যন্ত্র লইয়া মোরে যাত্রা করিলেন ফ্রান্স। উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাঁহার যন্ত্র ক্রয় করিতে কেহ রাজী হইল না। ক্রমে মোরে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ হইয়া 'মাজা' (Mazas) বন্দিশালায় কারারুদ্ধ হইলেন। তথায় অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞানে কারাবাসের আইন লঙ্ঘন করিলেন। ফরাসী ভাষানভিজ্ঞ হতভাগ্য মোরে ফরাসী শাস্ত্রীর আহ্বানের কোন উত্তরদানে অসমর্থ হওয়ায় গুলীর আঘাতে নিহত হন।

স্বদেশে ফিরিয়া হাবে দেখিলেন ইতিমধ্যে অনেকেই সীবনযন্ত্র নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অনেকে তাঁহারই পেটেণ্ট অনুযায়ী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন। বহু পরিশ্রমে, যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া হাবে তাঁহার বন্ধকী যন্ত্র পুনরুদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার পেটেণ্ট অনুকরণে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া মোকর্দ্দমা আনয়ন করিলেন। সুদীর্ঘকাল মোকর্দ্দমা চলিল, অর্থব্যয় হইল অজস্র। অবশেষে ভাগ্য তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইল। হাবে'র স্বপক্ষে আদালতের ডিগ্রী হইল। তিনি সর্ব্বসমেত ক্ষতিপূরণ পাইলেন ২০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা।

সীবনযন্ত্রের এই অদ্ভুত ইতিহাস পৃথিবীর নানা স্থানে বহু মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দাগাকে লোকে একটা তামাসা বাজ মনে করিয়া আনন্দ পাইত, তাহারই মধ্যে বুদ্ধিমত্তার সন্ধান পাইয়া বাস্তব তাহার উৎকর্ষ সাধনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হাবে'র পরে সীবনযন্ত্রের অল্পবিস্তর উৎকর্ষ সাধন যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এলেন উইলসনের (Allen Wilson) নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পূর্ণাঙ্গতা দানের পরিপূর্ণ গৌরব মুলকুরী রহিল যাঁহার জন্য, তাঁহার নাম জগতের প্রতি ঘরে ঘরে আজ সুপরিচিত! আইজাক সিঙ্গার (Isaac Singer) ছিলেন নিউইয়র্কের একটা কারখানার একজন সামান্য মিস্ত্রী। কিন্তু বিধাতা যাঁহার কপালে রাজটীকা আঁকিয়া দেন, সেখানে-সেখানে তাঁহাকে মানাইবে কেন? দাঁড়ায় তাঁহাকে কতকাল নির্য্যাতিত করিবে?

একদিন নিউইয়র্কের কারখানায় মেরামতের জন্য একটি সীবনযন্ত্র সিঙ্গারের হাতে পড়িল। তাহার কলকৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া আরো সরল এবং উন্নততর যন্ত্র নির্ম্মাণের মতলব তাঁহার মনে স্থান পাইল। সিঙ্গারের কল্পনাকে লইয়া জগতে যাহা আত্মপ্রকাশ করিল তাহাই বর্ত্তমানের সুপরিচিত সিঙ্গার সিউইং মেশিন (Singer Sewing Machine)। ১৮৫০ সালে যিনি একজন সামান্য মিস্ত্রী ছিলেন মাত্র, মৃত্যুকালে ১৮৭৫ সালে—মাত্র ২৫ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে তিনি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

কত ক্ষুদ্র বস্তু, কিন্তু কত বিচিত্র ইহার ইতিহাস।

কেন্দ্রসমিতির কথা

বসিরহাট স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনী

এবারেও বসিরহাটে স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনী অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৭ই এপ্রিল হইতে ২১ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস এই প্রদর্শনী খোলা ছিল। প্রতিদিন প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বহু লোক এই প্রদর্শনী দেখিতে উপস্থিত হইত। এবার অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে হইয়াছিল বলিয়া কৃষি ও শিল্প-বিষয়ক প্রদর্শিত দ্রব্যের সংখ্যা কম হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভাগ অতি সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং বহু লোক এই বিভাগে উপস্থিত হইত। ১৭ই এপ্রিল মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস্. সি, মজুমদারের প্রস্তাবে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৩ই এপ্রিল তারিখে ডাক্তার মে.এন,ঘোষাল, এ,কে, রায়, এম্, এম্, ভট্টাচার্য্য এবং পি, দি, বসুর তত্ত্বাবধানে একটি ধাত্রীবিদ্যা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন গ্রাম হইতে স্থানীয় কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত ১৪ জন দাই এই পরীক্ষায় উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার—নগদ টাকা এবং প্রশংসাপত্র ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছিল।

১৯শে এপ্রিল তারিখে বিশেষ ভাবে মহিলাদিবস প্রতিপালিত হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শিশুপ্রদর্শনী আরম্ভ হয়। প্রায় ১০০ শত শিশু প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস্. সি, মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী মিসেস্ সুধা মজুমদার অন্যান্য মহিলাদের সাহায্যে শিশুদের প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করেন। ১২ জন শিশু পরীক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। ডাক্তার মে. এন, ঘোষাল, এ, কে, রায়, এবং এইচ, এম,

ভট্টাচার্য্য ধাত্রী বিদ্যের সাহায্যে কার্য্য পরিচালন করেন।

সন্ধ্যাকালে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন,বি-এ আলোকচিত্র সাহায্যে নারীমঙ্গল বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

কুমারী শোভা বিশ্বাসের পরিচালনায় বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকারা প্রদর্শনীর কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই প্রদর্শনীতে যাহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। মাননীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সুনা মজুমদার এই জনহিতকর কার্য্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি-এ গত সাত বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সমিতির প্রচারকের কার্য্য করিয়া বর্ত্তমান মে মাস হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারী প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রথম হইতে তিনি বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া মহিলাসমিতির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। সমিতির কার্য্য যে এইরূপ বহুব্যাপক এবং নারীসাধারণের গ্রহণীয় হইয়াছে তাহা অনেক পরিমাণে শৈলেশ বাবুর প্রচারক শ্রেষ্ঠের ফলে। আমাদের মফঃস্বল সমিতির মহিলাগণ তাঁহাকেই সমিতির প্রতিনিধি বলিয়া জানিতেন। এই কয় বৎসরে তিনি বহু মহিলা সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং অনেক নূতন মহিলাসমিতি গঠন করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগের জন্য সমিতির অনেক ক্ষতি হইল। আমরা প্রার্থনা করি তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হউক।

* গত বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত 'শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন' নামক যে চিত্রটি ভুলক্রমে '৪০০ শত বৎসরের পুরাতন'—লিখিত হইয়াছিল। উহার প্রাচীনতা ১০০ শত বৎসরের অধিক নহে। *

গ্রীষ্মে সৌন্দর্য্য রক্ষার উপায়

গ্রীষ্মকালেই সুন্দরীদের বড় অসুবিধা হয়। প্রখর রৌদ্রতাপে তাঁহাদের কমল কোরকের মত মুখখানি ম্লান হইয়া পড়ে—সমস্ত শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়—ফলে গাত্রে দুর্গন্ধ জন্মে ও সর্ব্বগাত্রে ঘামাচি কুষ্ঠড়ী ও ব্রণ প্রভৃতি আবির্ভাব হয়।

এই সমস্ত উপদ্রবের হাত হইতে নিজেকে ও নিজের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার উপায় প্রাতঃকালে স্নান করা—স্নানের সময় উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিবেন—উৎকৃষ্ট সাবান বলিলে বাঙ্গালার শিক্ষিতা সুন্দরীরা হিমানীর চন্দন সাবানই বুঝেন; কারণ ইহার মত মধুর গন্ধ ও তৃপ্তি অন্য সাবান দিতে পারে না—চন্দন সাবান অনেক রকম আছে কিন্তু 'হিমানী চন্দন' একই রকম—দোকানদারের প্ররোচনায় অন্য সাবান খরিদ করিবেন না। স্নানান্তে দেহের সর্ব্বস্থলে হিমানি টল্‌ক পাউডার ব্যবহার করিবেন—হিমানী টল্‌ক পাউডার অনেক রকম গন্ধের পাওয়া যায় তন্মধ্যে 'চন্দন' 'বস' ও হিমানী গ্রীষ্মকালের উপযোগী।

মুখে হিমানী স্নো বা হিমানী ভ্যানিসিং ক্রীম ব্যবহার করিলে সারাদিনের উত্তাপে মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে না।

সন্ধ্যায় বা শুইবার সময় হিমানীর খস্ খস্ সাবান ব্যবহার করিবেন ও মাখায় তৈলের পরিবর্ত্তে "ভেলভেট হেয়ার ক্রীম" ব্যবহার করিলে মস্তক (Scalp) পরিষ্কার থাকিবে ও পুরী বসামাদি প্রভৃতি জন্মিবে না।

যাঁহাদের মাথায় বড় বড় চুল বহু যত্ন করে তাঁহাদের উচিত "শালানী" নামক হিমানীর প্রস্তুত অভিনব শাম্পু (কেশ ধাবন) ব্যবহার করা।

যাঁহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় তাঁহাদের জন্য হিমানীর প্রস্তুত "আইওডিন ডেন্টাল ক্রীম" নিত্য ব্যবহার প্রশস্ত ইহা পাইওরিয়ার প্রতিষেধক ও নিত্য ব্যবহারের জন্য হিমানীর নিম ডেন্টাল ক্রীম বিশেষ প্রচলিত। আজে নিজের মাজন কিনিয়া ঠকিবেন না। হিমানীর জিনিষগুলি চিরদিন ই বিশুদ্ধ।

প্রচারক—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং ৪৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta. and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

বাংলার মেয়ের আল্‌পনা

[চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত গুরুদয় দত্ত আই-সি-এস্
মহাশয়ের সৌজন্যে]

শিল্পী—শ্রীসুধাংশুকুমার রায়

Printed by C. H. Aran & Co.

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৯ [৮ম সংখ্যা

কবি-সুভাষিত

আচার্য্য শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

স্মরণীয় বড় কবিদের নানা লক্ষণের মধ্যে এই একটি লক্ষণের কথা ইউরোপীয় বড় পণ্ডিতেরা আলোচন করিয়াছেন, যে তাঁহাদের রচনায় এমন অনেক উক্তি পাওয়া যায় যাহা লোকসাধারণে সর্ব্বদা মুখে মুখে দৃষ্টান্ত-বচনস্বরূপে ব্যবহার করে। এই সকল দৃষ্টান্ত-বাণী বা সুভাষিত যদি মনুষ্যত্ব-বিকাশের অনুকূল হয়, যদি সেই উক্তিগুলিতে জীবনের সাধু ব্যবহার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা উপদিষ্ট হয় অথচ সেগুলি শুষ্ক কাটা-ছাটা উপদেশ না হইয়া হৃদ্য ও মনোহর হয় তবেই সেই উক্তিগুলি ধরিয়া সুভাষিতের কবিদিগকে বড় কবি বলা চলে। বাঙ্গলার যে সকল কবি এখন জীবিত নাই তাঁহাদের রচনায় এই রকমের উক্তি কত পাওয়া যায়, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার মত। এইরূপ উক্তি আমার নিজের স্মরণে যত আছে তাহাই লিখিতেছি; কেবল স্মৃতি হইতে লিখিতেছি—বই দেখিয়া নয়।

আমাদের জীবিত কবিদের মধ্যে যিনি এযুগে সর্ব্বপ্রধান, সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী হইতে এইরূপ সুভাষিত আলাদা সংগ্রহ করিলে ভাল হয়। আমাদের অনেক ঘরোয়া কথা ও প্রবাদ-বচন আছে যেগুলি হয়ত এক সময়ে আদৃত কবিদের বাণী ছিল বলিয়া সমানে সারাদেশে প্রচলিত আছে। আমি সে দৃষ্টান্তগুলি ধরি নাই; কেবল মৃত কবিদের বচনই সংগ্রহ করিতেছি। কবিদের এমন অনেক বাণী আছে যাহা যুক্তি হইলেও তাহাতে moral suggestions নাই, অর্থাৎ শিবত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আমি সেগুলি অবশ্যই বাদ দিয়াছি। তবে ভারতচন্দ্রের মত কবিদের এমন অনেক উক্তি আছে যেগুলি অনেক ব্রীড়াব্যঞ্জক কথার সঙ্গে ব্যবহৃত হইলেও সে উক্তিগুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া গ্রহণ করিলে সুন্দর সুভাষিত হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত আবার উদাহরণে পাওয়া যাইবে।

আচ্ছা এই যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী খুব বড় কবি বলিয়া এদেশে আদৃত না হইলেও তাঁহার রচনায় হৃদ্য ও মনোহর সুভাষিত অধিক পাইয়াছি; কিন্তু অন্যদিকে

মাইকেল মধুসূদন বড় কবি হইলেও, তাঁহার রচনায় অনেক উপমা থাকিলেও এই শ্রেণীর উক্তি বড় পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তগুলিতে দেখিবেন যে উক্তিগুলি পূর্ণ পদের ছত্রে অনেকস্থলে তোলা হয় নাই,—কেবল উক্তিগুলির অংশ-বিশেষ বা টুকরা তোলা হইয়াছে। ইউরোপের জার্মান ও ফরাসী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত-বচনও বেশির ভাগ টুকরায় সংগৃহীত হইয়াছে।

সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত তুলিবার জন্য বর্ণমালাক্রমে প্রতিবর্ণে একটা বা দুইটার বেশি দৃষ্টান্ত তুলি নাই। আমি স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছি; আশা করি অন্য লেখকেরা এই সংগ্রহ বৃহত্তর করিবেন।

অলস শয্যায় মোহ-নিদ্রাগত, কে চায় কে চায়
থাকিতে নিয়ত? (শিবনাথ)

আশার ললিতা,—রাবণের চিতা।

ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা যার শাস, দেশের উদ্ধার,
তার কর্ম্ম নয়।

উন্নত আকাশে ধূমকেতু প্রকাশে; আপনার বেগে
সেকি সেথা যায়?

একই ঠাঁই চলেছি ভাই, ভিন্ন পথে যদি। (দ্বিজেন্দ্রলাল)

একে ভস্ম আরে ছার, দোষগুণ কব কার! (ভারতচন্দ্র)

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে;
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে রাখিলে। (কাশীরাম)

খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব, এই বড় আশা
পূর্ণ কর তাই। (শিবনাথ)

গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি, আর কি ভারত
সজীব আছে? (হেমচন্দ্র)

ঘুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথা? (শিবনাথ)

চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে;
ভারতসন্তান তারে বলি তারে।

জলেতে থাকিয়া মীন করে পিপাসায়। (নিধু)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিত
রমণী সমাজ। (চণ্ডীদাস)

দীন কি উজ্জ্বল রূপ শোভা করে,
ঘোর অমানিশা না থেকিলে তারে। (শিবনাথ)

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে। (রঙ্গলাল)

ধর্ম্ম যেথা সেদিকে থাক্, ঈশ্বরকে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্, আমার তোরা মানুষ হ'।
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

না চর পুতুল, হয় কি মানুষ, তুলনে উঁচু করে?
(হেমচন্দ্র)

নিদাঘ জ্বালায় তনু জ্বলে যায়, কি করে বরিষা কালে!
(ভারতচন্দ্র)

পরের পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি শত্রু দোষ্?
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

পড়িলে ভেড়ার মুণ্ডে ভাঙ্গে হীরার ধার।
(ভারতচন্দ্র)

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ভাঙ্গিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পাতন।
যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।
যার খরতর শরে জরজর তাহারই কল্যাণ অন্তরের
ধ্যান। (শিবনাথ)

রক্তবিন্দু যত পড়িল এবার শতপুত্র হবে বীর অবতার।
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না
ভেল। (চণ্ডীদাস)

বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে সকাশে সাধনে প্রবৃত্ত হও।
(হেমচন্দ্র)

শিরে বৈসে সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা? (চণ্ডীদাস)
সাধে কি বাবা বলি, শুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়। (রঙ্গলাল)
হেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়। (দ্বিজেন্দ্রলাল)
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধারে পথিকে
ধাঁধিতে। (মাইকেল)

বাংলার মেয়েদের আল্‌পনা ও প্রাচীর-চিত্র

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায়, সমাজে ও সভ্যতায় যে অনেকগুলি বিশেষ গলদ আছে, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কৃত্রিমতা, প্রাণহীনতা, নীরসতা, ও নির্ম্মল আনন্দের অভাব যে এই সকল গলদগুলির অন্যতম, ইহাও নিঃসন্দেহ।

শিশুর চরিত্রে ও প্রকৃতিতে যে স্বাভাবিক, সজীব প্রাণবান্, সরল ও নির্ম্মল আনন্দের ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহাই যে মানবজীবনের আদর্শ-স্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজ-কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) তাই তাঁহার গীতিকবিতায় গাহিয়াছেন :—

"My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky
So it was when my life began,
So is it now I am a man,
So be it when I shall grow old—
Or let me die!
The child is father of the man
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety."

অর্থাৎ :—"নেচে উঠে প্রাণ মোর, নেহারি যখন
ইন্দ্রধনু আকাশের পটে :
জীবনের প্রভাত-উষায় ছিল মন এই ভাবে গড়া,
আজিও তেমনি আছে মধ্যাহ্ন-লগনে,—
থাকে যেন সায়াহ্নেও এমনি অটুট—
নয় তো এখনি প্রাণ হ'য়ে যাক্ শেষ!
মানুষের প্রকৃতির মূল
শিশুর স্বভাব মাঝে থাকে বিনিহিত :—
কামনা আমার তাই মনে—
জীবনের দিনগুলি যেন
একে অপরের সনে হ'য়ে থাকে গাঁথা
প্রকৃতির স্বভাব-সরলতার ডোরে।"

এই শিশুসুলভ সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষের একটি বিশিষ্ট মাপকাঠি। অথচ আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর, ধর্ম্মের, সামাজিক রীতি-নীতির ও সভ্যতার আদর্শ এমনি অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে বর্ত্তমান যুগে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই শিশুসুলভ সহজ আনন্দের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে অপরিণতবুদ্ধির, অনুন্নতমনস্কতার ও অশিক্ষিতপটুতার লক্ষণ বলিয়া অবজ্ঞার ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। অতি-বস্তুতন্ত্রতার, অতি-বাস্তিকতার ও অতি-বাণিজ্য-তন্ত্রতার এই যুগে, কেবল ভারতবর্ষে ও বাংলা দেশে নয়, প্রায় সকল দেশেই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে আত্মার সহজ সরল শিশুসুলভ এই আনন্দ-ভাবের বিচ্ছেদ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিচ্ছেদের মাত্রা, অন্যান্য দেশের অপেক্ষা ভারতবর্ষে, ও বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, আজকাল বেশীদূর গড়াইয়াছে। আর তার ফলে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবন দিনের পর দিন অধিকতর কৃত্রিমতা, আড়ষ্টতা, প্রাণহীনতা, নীরসতা ও নিরানন্দতার পরিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

ইহার মূলে যে শিক্ষার, ধর্ম্মের ও সামাজিক রীতি-নীতির বিকৃতি, তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে, ধর্ম্মপ্রণালীকে ও সামাজিক রীতিনীতিকে কৃত্রিমতার ও নীরসতার কবল হইতে মুক্ত করিয়া যদি আমরা জাতীয় জীবনকে আবার সরস, সরল, প্রাণবান্ ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে না পারি, তবে প্রাণশক্তির উৎসের এই নিরুদ্ধতার ফলে জাতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান কালের সহরে সভ্যতা ও উচ্চশিক্ষার আদর্শের সঙ্গে যে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ-বিকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। দেশের উচ্চশিক্ষার মধ্যে যে একটা নীরসতা ও কেবলমাত্র

বৈজ্ঞানিকতার মননবৃত্তি-মূলক (intellectual) পরিধির উপর অতিনির্ভরতা ও তাহার ফলে জীবনের কল্পনালোকের ও ভাবরাজ্যের সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা প্রতিপদে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের দেশের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ও উচ্চ প্রতিষ্ঠানের মার্কামারা ছাপধারীরা যে রসহীন, আনন্দহীন ও অস্বাভাবিক একটা কিম্ভূতকিমাকার হয়ৎ পদার্থে পরিণত হইয়া পড়েন, ইহা কি দেশী, কি বিদেশী, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং কি করিয়া বর্তমান শিক্ষার এই গলদ নিরাকরণ করা যায় তাহা লইয়া অনেক কল্পনা, জল্পনা, তর্কবিতর্ক ও আলোচনা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি-কমিশন বসিবার বহুদিন পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার ফলে এখনও এমন কোন প্রণালীর উদ্ভাবন করা হয় নাই যাহাতে এই গলদের উৎপাটন হইতে পারে।

ইহার কারণ এই যে, মানুষের শিক্ষাপ্রণালী যদি বিশ্বপ্রকৃতির ও সৃষ্টির সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তভাব এবং বিশ্বের মূলীভূত আনন্দরসের প্রাবন হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, নীরস ও আনন্দহীন হইয়া পড়ে, এবং তাহার জীবন যদি বিশ্বের বিরাট ও সহজ সরল ছন্দের উপলব্ধি হইতে ও সেই ছন্দের সঙ্গে সমন্বয় হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র মননবৃত্তি-মূলক (intellectual) বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ অথবা বাহ্যিক সভ্যতামূলক বস্তুবাহুল্যের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা তাহার জীবনকে প্রাণবান, সজীব ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারে না।

ভারতের ও বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিতে যেমন একদিকে বাহ্যিক সভ্যতামূলক বস্তুবাহুল্যের উপর নির্ভরের মাত্রা কম ছিল, তেমনি অপরদিকে জীবনকে বিশ্বপ্রকৃতির সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত করিবার এবং বিশ্বপ্রকৃতির সহজ ও বিরাট ছন্দের সঙ্গে সমন্বয়মণ্ডিত করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। তাহার ফলে কবি Wordsworth যে জীবনব্যাপী শিশুসুলভ ও সহজ আনন্দময় ভাবের কামনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতিতে উচ্চশিক্ষার ও ধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ ছিল। কেবলমাত্র পরব্রহ্মের অথবা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত আনন্দ-রসের উপলব্ধির দ্বারাই এই শিশুসুলভ, সহজ ও সরল আনন্দময় ভাবের জীবনব্যাপী অধিকার লাভ করা যাইতে পারে। তাহার অভাব হইলে মানুষের জীবন মননবৃত্তির ও বিজ্ঞানের বহুমুখী উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও নীরস ও নিরানন্দময় হইয়া পড়িবে, ইহা অনিবার্য। তাই ঋষিগণ উপনিষদে বলিয়াছেন : "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।" (পরব্রহ্ম রসস্বরূপ। মানুষ সেই রসের অনুভূতি লাভ করিয়াই আনন্দ লাভ করে।) সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক অথবা জাতীয় জীবনে যদি শিক্ষা অথবা ধর্মের বিকৃতির ফলে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির শক্তি ও প্রবৃত্তির হ্রাস অথবা লোপ হয়, এবং বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দময় ছন্দের সঙ্গে জীবনের সমন্বয়ের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে মানুষের জীবন বস্তু-তান্ত্রিকতার ও বাহ্যিক সভ্যতার শত পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও নিরানন্দ, নীরস ও ছন্দছাড়া হইয়া পড়িবে। এবং আমাদের দেশে বর্তমান কালে আধুনিক সহুরে শিক্ষার ফলে ইহাই হইয়াছে।

কিন্তু ইহা আমাদের একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারতের ও বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিতে রসানুভূতির, রসগ্রাহিতার ও রসাভিব্যক্তির এবং বিশ্বপ্রকৃতির সহজ সরল আনন্দময় ছন্দের সহিত সমন্বয়ের যে ব্যাপক ব্যবস্থা জাতির ও ব্যক্তির জীবনে সাধিত করা হইয়াছিল, তাহা আমাদের সুদূর পল্লীর নিভৃত প্রদেশে যেখানে সহুরে শিক্ষার হাওয়া এখনও গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই—আজ পর্যন্তও কোনপ্রকারে অব্যাহতভাবে জাগিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। জীবনের এই সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-রসের ও আনন্দময় ছন্দের প্লাবনমূলক যে ভাগীরথী-ধারা এখনো বাংলার নিভৃত পল্লীর নিরক্ষর সরলপ্রাণ নরনারীর জীবনে বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহারই অভিসিঞ্চন দ্বারা আমাদের আধুনিক ও সহুরে শিক্ষার প্রাণহীন ক্ষেত্রকে পুনরায় সরস ও উর্বর করিয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু ইহা করিতে হইলে পল্লীগ্রামের প্রতি আমাদের বর্তমান যে মনোভাব, তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। সহুরে শিক্ষার গর্বে গর্বিত হইয়া আমরা মনে করিয়া থাকি যে আমাদের পল্লীগ্রামগুলি

সম্পূর্ণ প্রাণহীন, তাহাদিগকে সংস্কার করা এবং পল্লীবাসী-দিগকে শিক্ষা দেওয়াই আমাদের কর্তব্য। পল্লীর জীবন হইতে শিখিবার যে আমাদের কিছু আছে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় বড় ধুরন্ধরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা উপলক্ষে আমি এই আভাষই পাইয়াছি যে, বাংলার পল্লীতে ম্যালেরিয়া, মশা, পচাপুকুর ও বনজঙ্গল ছাড়া আর কিছুই আছে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ইউনিভার্সিটির মার্কামারা যুবক ও প্রৌঢ়দের একমাত্র কর্তব্য,—সহরের আলোক নিয়া পল্লীতে ফেলা এবং পল্লীর সংস্কার করা,—এই তাঁহাদের বিশ্বাস। পল্লীর জীবনে যে এমন কিছু গৌরবময় মূল্যবান জিনিস থাকিতে পারে, যাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরন্ধর-গণও মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত, এবং এইরূপ কথা বলিলে তাঁহারা তাহা অবিশ্বাসের হাসিতে উড়াইয়া দেন।

বাংলার অজ্ঞাত পল্লীর গভীর অন্তস্তলে আধুনিক শিক্ষার স্পর্শবিহীন সরলপ্রাণ নিরক্ষর নরনারীর জীবনে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিমূলক বহুমূল্যবান সম্পদের যে এখনও অনেক কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং এই সকল সম্পদের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া এবং তাহাদিগকে জাতীয় জীবনে পুনরায় বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে জাতীয় জীবনকে পুনরায় বিশুদ্ধ, সরল, আনন্দময়, সৌন্দর্যময় ও শক্তিময় করিয়া আমরা তুলিতে পারিব, বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির সাহায্যে নানা দিক দিয়া ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা আমি সম্প্রতি করিয়াছি এবং করিতেছি। কারণ, বাংলার জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃত সম্পদ যে কোথায়, তাহার আভাষ আমি পাইয়াছি—বাংলার সহরে ও আধুনিক শিক্ষালয়ে নয়—বাংলার নিভৃত পল্লীর সরলপ্রাণ সেকেলে নরনারীর জীবনে। তাহারাই আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দময়ের অনুভূতির ও অভিব্যক্তির দ্বারা এবং নিশ্চল নৃত্যগীতের চর্চ্চার দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে জীবনের সহজ সমন্বয়রক্ষার ধারা বহন করিয়া আসিতেছে। এই সহজ অনাবিল আনন্দময় ভাবের সঙ্গে যোগ স্থাপন এবং জীবনে ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমরা করিতে পারিব—বাংলার পল্লীর সরল ও বিশুদ্ধ লোকসঙ্গীতের ও লোকনৃত্যের প্রতিষ্ঠা শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে পুনরায় ব্যাপকভাবে সম্পাদন করিয়া। আর কেবল লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের ভিতর দিয়া নয়,—বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি-প্রসূত সাবতীয় রসকলার বিশুদ্ধ ধারাকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে পুনরায় ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা বাংলার জীবনকে আবার সরস, প্রাণবান্, আনন্দময় ও শক্তিময় করিয়া তুলিতে পারিব।

বাংলার পল্লীগ্রামে যে সকল প্রাণময় লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের বহুল প্রচলন এখনও আছে এবং যাহা আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় এতদিন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিশ্বপ্রকৃতির রসানুভূতির এবং রসাভিব্যক্তির যে কি বিশিষ্ট সহায়তা হইতে পারে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার কত বড় মূল্য, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্বপ্রকৃতির রসাত্মক ছন্দের সঙ্গে বিশুদ্ধ সঙ্গীত এবং বিশুদ্ধ নৃত্যের প্রচলন ও চর্চ্চা যেমন মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকে, তেমনি চিত্রকলার বিশুদ্ধ ছন্দাত্মক ও আনন্দমূলক চর্চ্চাও ইহাতে বিশেষ সাহায্য করে। আমাদের আধুনিক সহরে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার উপলব্ধির সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লীজীবনে ইহার নিবিড় ও গভীর উপলব্ধির জীবন্ত দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি এখনো রহিয়াছে। ছন্দাত্মক রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির যে ব্যাপকতা এখনও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অবশিষ্ট রহিয়াছে তেমনটি অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। ছন্দাত্মক রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির এই গভীর, ব্যাপক ও জীবন্ত ধারার একটি প্রমাণ আমরা বিশেষ ভাবে পাই—বাংলার পল্লীর সরলপ্রাণ নিরক্ষর ছোট বড় সেকেলে হিন্দুদের জীবনে। আধুনিক শিক্ষার গর্হিত ও কৃত্রিম রসস্ ইঁহারা এখনও পান নাই বলিয়াই এই ধারা ইঁহাদের মধ্যে এখনও বিশুষ্ক হইয়া যায় নাই।

বাংলার পল্লীগ্রামের মেয়েদের মধ্যে বিবাহ, ব্রত ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলিম্পনা অঙ্কন করিবার যে ব্যাপক প্রথা এখনও প্রচলিত আছে, ইহা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নরনারীরা হয়ত লক্ষ্যই করেন না,

অথবা লক্ষ্য করিলেও ইহাকে তাঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন ও একটি কুসংস্কারপ্রসূত সেকেলে অনাবশ্যক বাহুল্যমূলক প্রথা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইহা যে কত বড় জাতীয় সম্পদ তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আধুনিক সহরে "আর্টিষ্ট" অর্থাৎ রসশিল্পীদের বিজাতীয় প্রথামূলক অঙ্কনশিল্প-চাতুর্য্য দেখিয়া আমরা মূর্চ্ছা যাই, কিন্তু বাংলার পল্লীর মেয়েদের স্বভাবজাত শিল্পনৈপুণ্য যে আধুনিক সহরে শিল্পীদের আয়াসলব্ধ নৈপুণ্য হইতেও অনেক মূল্যবান একটি জাতীয় সম্পদ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

চিত্র রসকলার প্রথম এবং প্রধান উপাদান—লীলায়িত রেখার অঙ্কন। ইহাই চিত্র-রসকলার ভিত্তিস্থানীয়। বাংলার মেয়েদের আলিম্পন-শিল্প লীলায়িত রেখাঙ্কন-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সুদূর অবজ্ঞাত পল্লীজীবনে অবশিষ্ট এই রস-কলার শক্তি-সম্পদের ব্যাপক ধারাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহা বাংলার আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর মূঢ়তার পরিচায়ক। যেদিন আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইবে সেইদিন আমরা ইহার প্রকৃত সমাদর করিয়া আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইহার রীতিমত চর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়া জাতির ও ব্যক্তির জীবনে পুনরায় ব্যাপকভাবে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির শক্তির পুনরুদ্দীপনের সহায়তা করিতে আরম্ভ করিব।

বাঙ্গালী জাতি যে রসকলা-ক্ষেত্রে পারদর্শিতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অসাধারণ প্রতিভাবিশিষ্ট জাতি,বাংলার মেয়েদের এই আলিম্পনা অঙ্কন করিবার বহুব্যাপক স্বভাবজাত শক্তি তাহার একটি প্রমাণ স্বরূপ। ইহাদের পারদর্শিতা যে কত অদ্ভুত তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কিছুদিন হইল আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি সুদূর পল্লীগ্রাম দেখিতে যাই। আমার গ্রামে পৌঁছিবার পর গ্রামের মেয়েরা খবর পাইলেন যে আমি আল্পনা দেখিতে ভালবাসি। সেই খবর পাওয়া অমনি ঘরে ঘরে আল্পনা আঁকিবার ধুম পড়িয়া গেল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী, রান্নাঘর, ভিটে, আঙ্গিনা ও দ্বারদেশ আলিম্পনার অনুপম লীলায়িত শুভ্র রেখাবলীতে ও রূপাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দেখিয়া ত আমি অবাক। মেয়েদের আলিম্পনা আঁকিবার কি অবলীলাময় ও স্বভাবসিদ্ধ কৌশল! কোথাও ভুল-ত্রুটি নাই। একটি রেখা অঙ্কন করিয়া তাহাকে আবার মুছিয়া ফেলিয়া অন্য রেখা আঁকিবার প্রয়াস নাই। অভ্রান্ত প্রতিভার সহজ স্ফুরণের অটুট ছন্দে মেয়েদের অঙ্গুলিগুলি রেখা অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে। সেই লীলায়িত রেখার কোথাও এতটুকু ভুল-ত্রুটি বা আড়ষ্ট ভাব নাই যেন বিশ্বপ্রকৃতির গভীর প্রাণের আনন্দময় ছন্দ মূর্ত্তিমতী হইয়া আলিম্পনার রেখায় আপনার আত্মপ্রকাশ করিয়া দিতেছে। সেই ছন্দোবদ্ধ আলিম্পনা এত অনিন্দ্যসুন্দর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না, যদি এই সরলপ্রাণ নিরক্ষর মেয়েদের আত্মা বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দময় ছন্দের ও রসের অনুভূতিতে ভরপুর না থাকিত। আমাদের সহরে শিল্পীরা বহু চেষ্টা করিলেও যে লীলায়িত রেখাঙ্কনের এইরূপ অবলীলাময় কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিবেন না, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। আধুনিক যে শিক্ষাপ্রণালী আনন্দ-ছন্দের ও আনন্দ রসের এই জাতিগত স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভাকে দেশের নরনারীর জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছে,—তাহার মূঢ়তার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহা সত্য যে আমাদের আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির নীরস ও ছন্দছাড়া শিক্ষাপ্রণালীর ফলে শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে এই জাতিগত প্রতিভা দ্রুত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

এইত গেল মাটিতে ও পিঁড়িতে আলিম্পনা-কলার কথা। ইহা কি পূর্ব্ববঙ্গে, কি পশ্চিমবঙ্গে, সুদূর পল্লীগ্রাম মাত্রেই এখনও প্রচুর ভাবে অবশিষ্ট আছে এবং ইহারই সাহায্যে এখনও বাঙ্গালী জাতির জীবনে রসকলা-চর্চ্চার ব্যাপকভাবে পুনর্বিস্তার করা যাইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ব্রত উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলায় নানা রঙ্গের চাউলের গুঁড়ো দিয়া যে বিচিত্র রঙ্গীন আলিম্পন-কলার প্রথা এখনও অবশিষ্ট আছে, ইহাও অতি সুন্দর ও মনোরম রসানুভূতির, রসাভিব্যক্তির এবং শিল্প-কুশলতার পরিচায়ক। কিন্তু ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-গ্রামে মাটির প্রাচীরে তুলিকার সাহায্যে যে নানাবর্ণের পদ্ম

ও অন্যান্য প্রাচীর-চিত্র আঁকিবার প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা বড়ই মনোমুগ্ধকর ও উচ্চদরের শিল্পকুশলতার, রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির পরিচায়ক। এই প্রথা যে এখনও পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে প্রচলিত আছে তাহা আবিষ্কার করিবার সুযোগ বৎসরেক কাল পূর্ব্বে আমার কি করিয়া হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং এই প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই এখন করিব।

(ক্রমশঃ)

মধু ও গুঞ্জন

কবিশেখর শ্রী কালিদাস রায় বি-এ

মালতী ফুটেছে একা,—
তখনো চম্পা চামেলি বকুল বাতাবির নেই দেখা।
ভ্রমর আসিল—সে ছাড়া তখনো খোঁজ রাখেনাক কেহ;
মালতী বলিল—"রে কালো ভ্রমর, ছুঁস্‌নে আমার দেহ,
বহু পতঙ্গ আছে এই বনে রূপবান্, গুণবান্,
ভেবেছিস্ মূঢ়, তোরে করিব কি এই কৌমার দান?"

ভ্রমর যাইল চলি,
হাসত হাসিল,—কে বুঝিবে বল মূঢ় কি হাসিলে অলি?
তারপর ক্রমে ফুটিল কাননে হাজার হাজার ফুল,—
বাতাবি বকুল-তরুগুলি হলো পতঙ্গে সমাকুল।
অলি প্রজাপতি চলে দ্রুতগতি পাশ দিয়া মালতীর,
কেহ চাহিল না মালতীর পানে—সকলেই গম্ভীর।

শুনি' গুঞ্জন-তান
যত বেলা বাড়ে মালতীর প্রাণ করে' উঠে আনচান।
দুই-চারিবার ডাকিল ফুকে দিয়া মৃদু হাতছানি;
দিগনাক সাড়া মধুপ—সেও ত অই কম অভিমানী।
বাতাবির বনে যত চায় তত মালতীর ফাটে বুক,
আশে পাশে ঘুরি' শঠ মধুকর বুঝিছে কৌতুক।

এক পূজারীরে দেখে
মালতী কহিল বড় অভিমানে তাহারে নিকটে ডেকে,
'নিয়ে যাও মোরে সাজিতে তুলিয়া শ্যামের পূজার তরে।'
পূজারী তাহারে তুলিয়া লইল পরম শ্রদ্ধাভরে।
দেউলে উঠিতে দৈববাণীটি শুনিল মালতী ধনী—
"পূজারি, সাজির মালতী ফুলটি ফেলে দাও এক্ষণি।

যাহার মাধুরীকণা
অলিগুঞ্জনে ফুটে নাই তাতে হয়নাক উপাসনা।"
ত্রস্ত হস্তে পূজারী আগুনে ফেলে দিল মালতীরে;—
বোঁটাটি তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিল যত পিপীলিকা ঘিরে'।
হোক্ অভিমানী, তবু মালতীর ব্যথা বাজে কবি-মনে—
মালতীর মধু ফুটিল না পূজামন্ত্রে বা গুঞ্জনে!

সে-কালের কথা

রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর

হৈমবতী চিকিৎসা

পূর্ব্বে কবিরাজী ও এলোপ্যাথী চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার সেকালের অভিজ্ঞতার কথা বলেছি : এবার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বল্‌ব।

এই চিকিৎসা-বিদ্যার নাম আমি প্রথম শুনেছিলাম আমার পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে,এ কথা আগেই বলেছি। তিনি এই চিকিৎসার নাম বলেছিলেন হৈমবতী চিকিৎসা! এই নূতন চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা যখন দিদি বলেন, তখন ঐ 'হৈমবতী' কথাটা নিয়ে যে আলোচনা হয়, সে কথা এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার মনে আছে। দিদি যখন এই নামটি বলেন, তখন আমার পূজনীয়া পরলোকগতা মাতাঠাকুরাণী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেকেলে মানুষ হ'লেও আমার মাতাঠাকুরাণী সেকালের মত ছিলেন না; তিনি নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা লেখাপড়া বেশই শিখেছিলেন; চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি তিনি আগাগোড়া মুখস্থ বল্‌তে পারতেন; আর রামায়ণ মহাভারত ত পড়েই ছিলেন। দিদি বালিকা-বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া শেষ ক'রে, বিবাহ হওয়ায় পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন; সুতরাং অমন সুন্দর 'হৈমবতী' নামটা নিয়ে যে তাঁরা আলোচনা কর্‌তেন, সেকাল হ'লেও তা যে সাহিত্যালোচনা, সে কথা আমি নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি। আমিও তখন নিতান্তই ছেলে-মানুষ ছিলাম না—আমি তখন ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সাহিত্যাচার্য্য কাঙ্গাল হরিনাথের ছাত্র; সুতরাং মা ও দিদির আলোচনায় রসাস্বাদন কর্‌বার মত বয়স আমার তখন হয়েছিল; তাই সে আলোচনা এতকাল পরেও আমার মনে আছে।

দিদির মুখে ঐ সুন্দর নামটি শুনে মা বল্‌লেন, "এ চিকিৎসা-শাস্ত্র কি আমাদের দেশের কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বের করেছেন?"

দিদি হেসে বল্‌লেন, "মা যেন কি? আমাদের বামুন-পণ্ডিতের দাদিও নেই, ও-সব ধা'র করা। আমি শুনেছি, বিলেতের কোন্ সাহেব না কি এই নূতন চিকিৎসা বের করেছেন।"

মা বল্‌লেন, "তোমার কথা ত মান্‌তে পারিনে; হৈমবতী নামটা যে আমাদের দেশের নাম—মা-দুর্গার এক নাম। শোন নি, আমাদের আচার্য্যি মশাই যখন বৈশেখ মাসের গোড়ায় নূতন পঞ্জিকা শোনাতে আসেন, তখন প্রথমেই বলেন—

"হর প্রতি প্রিয়ভাবে কন হৈমবতী।"

এই হৈমবতী হচ্ছেন দুর্গার এক নাম। এ নামটা আমাদের বাঙ্গালা নাম। তোমার সাহেব এ নাম জান্‌বেন কেমন ক'রে! আর যদি তিনি জান্‌তেই পারেন ধ'রে নেওয়া যায়, তা হ'লে তাঁর এই নূতন চিকিৎসার বিলাতী নাম না রেখে আমাদের ঠাকুর-দেবতার নাম রাখ্‌তে যাবেন কেন?"

দিদি বল্‌লেন, "তা ত জানিনে মা! আমার ভাসুর হাইকোর্টের উকিল, তা ত শুনেছ। তিনি এই চিকিৎসা-বিদ্যা শিখেছেন। তিনিই ঐ নাম বলেছিলেন, আর তাঁর ঔষধের বাক্স সকলকে দেখিয়েছিলেন। আমি বৌ মানুষ; আড়াল থেকে নামটা শুনেছিলাম মাত্র। আর সে ঔষধ যে কেমন তা দেখ্‌তেও পেলাম না। তিনি যে সে বাক্স কত সাবধানে রাখেন, তা আর কি বল্‌ব। সেই ছোট বাক্সের চেহারাও আমি দেখ্‌তে পাইনি। তিনি বলে-ছিলেন, হাওয়া লাগ্‌লে ঔষধের গুণ থাকে না, তামাক কি সুগন্ধ জিনিসের একটু গন্ধ যদি কোন রকমে বাক্সের গায়ে লাগে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ—সব ঔষধ মাটী! আমরা শুনে ত ভয়েই সারা; দেখ্‌বার আর সাহস হোলো না। এমন যে আমার শাশুড়ী, যাঁর দাপটে অতবড় জমিদারীর প্রজারা পর্য্যন্ত একটুকু হ'য়ে যায়, তিনি পর্য্যন্ত সে ঔষধ

দেখ্‌বার কথা বল্‌তে পার্‌লেন না, আমরা ত বৌ-মানুষ। কাজেই তোমার কথার উত্তর দিতে পার্‌লাম না মা! তবে, এটা ত ভাদ্র মাস, আশ্বিন মাসের গোড়াতেই ত ওঁরা কল্‌কাতা থেকে বাড়ী যাওয়ার সময় এই পথে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, তখন ওঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো; তিনি সব কথা ব'লে দেবেন, চাই কি হৈমবতী ঔষধও তোমাদের ভাগ্যে দেখা হ'তে পারে।"

মা বল্‌লেন, "সে ত জিজ্ঞাসা কর্‌বই। কিন্তু, আমি ভাব্‌ছি, সাহেব হ'য়ে হৈমবতী নামটা পেলেন কোথায়, আর নিলেনই বা কেন? ও কথাই নয়: নিশ্চয়ই আমাদের কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত এই চিকিৎসা-বিদ্যা বা'র করেছেন। যাঁরা চৈতন্য-চরিতামৃতের মত গ্রন্থ লিখ্‌তে পারেন, ওঁদের অসাধ্য কাজ কি আছে? অমন গ্রন্থ ভূভারতে আর কেউ লিখ্‌তে পারে?"

দিদি বল্‌লেন, "মা, তোমার চরিতামৃতকে আমি কুচ্ছ কর্‌ছিনে, কিন্তু কত দেশে কত বিদ্বান পণ্ডিত আছেন, তাঁরা হয় ত ওর চাইতেও ভাল গ্রন্থ লিখেছেন, আমরা তার খবর জানিনে।"

মা বল্‌লেন, "পণ্ডিত হয় ত অনেক আছেন, কিন্তু চরিতামৃত লিখ্‌তে হ'লে তাঁর কৃপা চাই, পণ্ডিত হ'লেই হয় না!" এই ব'লে মা 'তাঁর' উদ্দেশে ভক্তিভরে হাত যোড় ক'রে প্রণাম কর্‌লেন; আমরাও তাঁর দেখাদেখি প্রণাম কর্‌লাম। হৈমবতী সেই প্রণামের অংশ পেলেন কিনা জানিনে, কিন্তু সাহিত্যালোচনা ও হৈমবতীর ইতিহাস তখনকার মত চাপা প'ড়ে গেল।

আশ্বিন মাসের অপেক্ষায় আমরা থাক্‌লাম; সাক্ষাৎ হৈমবতী দেখ্‌বার আগ্রহ আমাদের ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌ল; কিন্তু, হৈমবতীর আগমন হোলো না। তাঁরা আস্‌তে পার্‌লেন না। তখন যশোহরে যেতে হ'লে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল-পথে গাঙ্গুরে নেমে গো-যানে যশোহর যেতে হোতো; বর্ষাকালে আমাদের গ্রাম থেকে নৌকাপথে অনেক দূরে যাওয়া যেত। যশোর-খুলনার রেল তখন হয় নাই, পূর্ব্ববঙ্গের রেলের সীমা তখন কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত; ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে যেতে হ'লে কুষ্টিয়া থেকে নৌকায় যেতে হোত। যাত্রী বহিবার সীমার বা ষ্টীমারের ব্যবস্থাও তখন হয় নাই। দিদির ভাসুর এবং আমার ভগিনীপতি চাকরদের পথেই বাড়ী গেলেন; দিদিকে নিতে এলেন তাঁর এক দেবর। সে বেচারী অন্য কোন সন্ধানই দিতে পার্‌ল না, তবে তার দাদা যে হৈমবতী চিকিৎসা জানেন, এ কথা সে বল্‌ল; এবং সে যে খুব ছোট ছোট সিসিতে পিপ্‌ড়ের ডিমের মত সাদা হৈমবতী দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছে, এ কথা বিশেষ গৌরবের সঙ্গেই আমাদের কাছে গল্প কর্‌ল। এই হোল হৈমবতী নাম-প্রবণের প্রথম পালা। এর পর দ্বিতীয় পালা আছে এবং সেটা আমারই দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।

আমার বয়স যখন দশ-এগারো বছর, সেই সময় আমাকে একটা অতি উৎকট, মৃদু উৎকট কেন, উগ্র ব্যাধিতে আক্রমণ করেছিল। সামান্য বা অসামান্য জ্বর-জ্বালা হ'লে আমাদের ঘরোয়া ডাক্তার বাবু সিন্‌কোনা-বার্ক-সিদ্ধ জল এবং 'একোয়া পিউরা' অর্থাৎ খাঁটি কূয়ার জল মিশিয়ে ঔষধ দিলেই অনেক ক্ষেত্রে তা আরাম হ'য়ে যায়; যা-কোড়া হ'লে নরসুন্দর ডাক্তার তাঁর নৈত্রিক অস্ত্র ক্ষুর দিয়ে কেটে এবং দেবীর ঘরে প্রাপ্ত মলম লাগিয়েই তা সারিয়ে দেন। সে ক্ষুর, আর সে মলমের কাছে কার্ব্বংকলকেও সে সময় মাথা নোয়াতে দেখেছি। কিন্তু, বলেছি ত, আমার সে ব্যাধি উৎকট ও উগ্র রকমের। গ্রীষ্মের সময় আমি বেশ থাকৃতাম; কিন্তু, যেই শীত শুরুর আগমন সূচনা হোতো, অমনি ধীরে ধীরে আমি অন্ধ হ'য়ে যেতাম। আবার, শীতের অবসান হোলেই আমার দৃষ্টি-শক্তি ফিরে আস্‌ত। আমি বছরের ছয় মাস অন্ধ হ'য়ে থাকৃতাম। এই শোভাময় পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার হ'য়ে যেত; ছয় মাস পরে আবার আমি আলোকের মুখ দেখ্‌তে পেতাম, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহময় সজাগ বদন আমার দৃষ্টিগোচর হোতো। ছ-মাস আমার স্কুলের ছুটী, বাকী ছ-মাস পড়াশুনা; তাও অতি সন্তর্পণে; চোখের উপর বেশী অত্যাচার কর্‌তে নিষেধ ছিল। তার ফলে আমার বিদ্যা যা হয়েছে, তা দেখ্‌তেই পাচ্ছেন।

ব্যাপার হোতো কি জানেন, শীত আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লেই আমার দুই চোখের মণির উপর ধীরে ধীরে একটা পর্দ্দা পড়্‌তে থাকৃত। সেই পর্দ্দা আমার চক্ষের মণি একেবারে ঢেকে ফেল্‌ত; আমার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হ'য়ে

যেত। তার পর যেই গরম পড়তে আরম্ভ হোতো, অমনি, যেমন ধীরে ধীরে এসেছিল, তেমনই ধীরে ধীরে আপন খুসীতে পর্দা দুইখানি স'রে যেত; আমি তখন বেশ দেখতে পেতাম। আমাদের ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়দের ভাণ্ডারে এ রোগের ঔষধ ছিল না; তবুও কবিরাজ মহাশয় মহা-কজ্জলী ঘৃত, কি অমনি বিপুল নামধারী অনেক ঔষধ দিতে ত্রুটী করেন নাই, এবং তাতে কোন ফলই হয় নাই। ডাক্তার বাবু এবং গ্রামের হিতৈষীবৃন্দ আমাকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল চিকিৎসক দেখাবার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ ত অনেকেই দিতে পারেন, ব্যবস্থাও অনেক চিকিৎসক দিতে পারেন; কিন্তু, যে রোগী এ ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করবার অবস্থা বা সঙ্গতি তার থাকা চাই ত। আমরা চিরদিনই দরিদ্র; কোন রকমে কায়-ক্লেশে আমাদের দিন চলে—তখনও যে অবস্থা ছিল, এখনও তাই। সুতরাং কলিকাতায় এনে চিকিৎসা করানো আমার জ্যেঠা-মহাশয়ের সাধ্যের অতীত ছিল—পিতৃদেব ত আমাকে তিন বছরের আর আমার ছোট ভাইকে ছয় মাসের রেখেই স্বর্গে চ'লে গিয়েছিলেন। জ্যেঠামহাশয় দুঃখকষ্টকে ধিক্কার দিয়ে এই পিতৃহীন অন্ধ বালককে কোলে ক'রে অশ্রু-বিসর্জ্জন করতেন।

আমার পিসিমার বড় ছেলে তখন কলিকাতায় এক মহাজনের গোমস্তাগিরি চাকরী করতেন। তিনি এই সময় একবার দেশে গেলে জ্যেঠামহাশয় তাঁকে ধ'রে বসলেন আমাকে একবার কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল ডাক্তার দিয়ে আমার চোখদুটো দেখাবার জন্য। জ্যেঠামহাশয় এবং বাড়ীর সকলের অনুরোধে তিনি আমাকে কলিকাতায় আনতে সম্মত হলেন এবং তাঁর মনিব মহাজন বিনাভাড়ে তাঁর আড়তে আমাকে মাস-দুই রাখবার আদেশ দিলেন। তখন আমার চোখের পর্দা সাম্‌তে আরম্ভ করেছে, আমি দেখতে সুরু করেছি।

তখনও আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে রেলপথ যায় নাই। বাড়ী থেকে নৌকায় চ'ড়ে কুষ্টিয়া গিয়ে তবে রেলে চড়তে হোত। আমরা একটা শুভদিনে বেরিয়ে কুষ্টিয়া থেকে রেলে চ'ড়ে কলিকাতা গেলাম। আমার রেলে চড়াও সেই প্রথম, কলিকাতা দেখাও সেই প্রথম। কিন্তু সেই প্রথম রেলে চড়ার বর্ণনা এবং ষাট-বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতার বিবরণ যদি এখানে দিতে যাই, তা হ'লে হৈমবতীর কথা আর বলা হবে না; সুতরাং সে কথা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রেখে হৈমবতীর কথাই বলি।

কলিকাতায় সে সময় চক্ষুরোগের একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহেব চিকিৎসক ছিলেন; তেমন চিকিৎসক তখন আর কেহ ছিলেন না, এখনও কেহ তেমন হ'তে পারেন নাই। তাঁর নাম ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা। তাঁকে দিয়েই আমার চক্ষু পরীক্ষা করানো স্থির হোলো। মেডিকেল কলেজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সে সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক পরলোকগত ডাক্তার দুর্গাদাস কর মহাশয়—ডাক্তার আর, জি, করের পিতৃদেব. ডাক্তার দুর্গাদাস কর মহাশয় আমার দাদাকে খুব অনুগ্রহ করতেন। তাই তিনি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছিলেন। ডাক্তার করের সঙ্গে ম্যাক্‌নামারা সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সেই জন্য পর পর দুইদিন অনেকক্ষণ পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার সাহেব বল্‌লেন, অস্ত্রোপচারও করতে হবে না, ঔষধ ব্যবহারও করতে হবে না। চোক নষ্ট হবে না। একটু বয়স বাড়লেই এবং শরীর আরও সবল হোলেই পর্দা আর আক্রমণ করতে পারবে না।

সাহেবের কথাটা কিন্তু দাদার মনে ধরল না। তাই ত, এত কষ্ট ক'রে, এত অর্থব্যয় ক'রে ছেলেটাকে নিয়ে এলাম, আর ডাক্তার বল্‌লেন, ও কিছু নয়! বয়স হ'লেই সেরে যাবে। এখন কিছুকাল ছয় মাস অন্ধ হ'য়েই থাকতে হবে।

দাদা তখন এর-ওর পরামর্শ নিতে লাগ্‌লেন। একজন বন্ধু বল্‌লেন, প্রধান এলোপ্যাথকে ত দেখানো হোলো। এক কাজ কর—এই যে হোমিওপ্যাথী নামে নূতন এক চিকিৎসার কথা শোনা যাচ্ছে, ডাক্তার সাহার যে মতে চিকিৎসা করেন, তাঁকে একবার দেখাও না, তিনি কি বলেন, শোনা যাক্।

এই কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হোলো, তা আর বল্‌বার নয়। রোগ ভাল হোক্ আর নাই হোক্, যে হৈমবতী চিকিৎসার অদ্ভুত কথা দিদির কাছে শুনেছিলাম, সেই হৈমবতী চিকিৎসককে দেখতে পাব, হয় ত সেই বাতাসে-উড়ে-যাওয়া ভয়ানক ঔষধও দেখতে পাব,

ব্যবস্থারও করতে পারব, এরই জন্য আমার আনন্দ। দাদাও এই চিকিৎসা করানোই স্থির করলেন।

এক দিকে চিৎপুর রোডের মোড়, আর এক দিকে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, আর এক দিকে বহুবাজার ষ্ট্রীট, অপর দিকে নারকেলডাঙ্গার ষ্ট্রীট, এই চৌমাথার বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে যেখানে এখন মস্ত একটা বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে সেই সময় একটা একতলা বাড়ী ছিল। সেইটা ডাক্তার সাল্‌জারের হোমিওপ্যাথী ডাক্তারখানা ছিল। তিনি প্রতিদিন সেইখানে এসে প্রাতঃকালে রোগী দেখতেন। এখন যেমন অনেক ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে রোগী দেখালেও আধা-দর্শনী দিতে হয়, তখন সে প্রথা ছিল না। ডাক্তারেরা বিনা-দর্শনীতেই রোগী দেখতেন। ডাক্তার সাল্‌জার উপরি উপরি তিন দিন আমার চক্ষু পরীক্ষা করলেন, পরীক্ষার অপেক্ষা আমার কোঁকড়া-চিকুরের খোঁজই বেশী নিলেন। তিন দিন কত কথাই যে জিজ্ঞাসা করলেন, তার হিসাব নিকাশ নেই। তিন দিন অবানবন্দীর পর, তাঁর বসবার ঘরের পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা সিসি অতি সন্তর্পণে খুলে একটু সাদা কাগজের উপর সরিষার চার-ভাগের এক ভাগ পরিমাণ একটা বড়ি আমার মুখে ফেলে দিলেন। একটু মিষ্ট স্বাদও বোধ হোলো। তার পর আমাকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, আসছে পনর দিন আর ওষুধ খেতে হবে না। পনর দিন পরে এলে তখন পুনরায় পরীক্ষা ক'রে আবার ওষুধ খাওয়াতে হবে কি না, স্থির করবেন। তার পর ব'লে দিলেন, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার একেবারে বন্ধ, পান সুপারি মসলা বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। আহার দুবেলা ভাত, আর ছোট মাছের ঝোল; তাতে তেল লঙ্কা কি মসলার সংস্পর্শও থাকবে না; জল দিয়ে মাছ সিদ্ধ ক'রে লবণ মেখে খেতে হবে; নিতান্ত যদি ইচ্ছে হয় তা হ'লে একটু হলুদের গুঁড়া মাছের সঙ্গে মিশাতে পারা যাবে। জলখাবার রুটি, শুদ্ধ কি কোন-রকম মিষ্টদ্রব্য আহার একেবারে নিষেধ।

শুনেই ত আমার চক্ষুস্থির! আর এতকাল পরে বলতে লজ্জা বোধ করছিনে যে, আহারের এই ব্যবস্থা শুনে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম! বাবা, এই দিদির সেই হৈমবতী-চিকিৎসা!

বলব কি, তিন মাস এই কঠোর নিয়ম পালন করলাম। তিন মাসে বোধ হয় হৈমবতীর চারটা বড়ি খেয়েছিলাম। ফল কিছুই হোলো না। অবশেষে ডাক্তার ম্যাক্‌নামারার কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন ক'রে সর্ব্বমঙ্গলা হৈমবতীর পায়ে নমস্কার ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলাম।

তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের সময় আমার চোখের অসুখ কিন্তু একেবারে সেরে গিয়েছিল। সেটা ডাক্তার ম্যাক্‌নামারার ভবিষ্যদ্বাণী, কি ডাক্তার সাল্‌জারের হৈমবতীর ফল, অথবা একজন হাতুড়ে হিন্দুস্থানী-ব্রাহ্মণের অস্ত্রচিকিৎসার ফল, তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু, তিন মাস শ্রীমতী হৈমবতী যে আমাকে একপ্রকার অনাহারে রেখেছিলেন, সে কথা আমি ভুলি নাই, কোন-দিনও ভুলব না।

একটা কথা না বললে হৈমবতীর উপর বিশেষ অবিচার করা হবে। এখন কিন্তু হৈমবতী আর অসূর্য্যম্পশ্যা ও অবগুণ্ঠনবতী নেই; এখন, অত কেন, মোটেই সেই আগের মত অত কঠোরতা নেই; হৈমবতী এখন পৃথিবীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে বসেছেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের অনেক চিকিৎসক হৈমবতী মতে চিকিৎসা ক'রে অনেক কঠিন রোগ আরাম করছেন। আর সকলের চাইতে বড় কথা এই যে, আমাদের মত গরীব লোক একরকম বিনা-পয়সায় বললেই হয় হৈমবতী ঔষধ পান; দরিদ্র, রোগক্লিষ্ট লোকের পক্ষে হৈমবতী সত্য সত্যই সর্ব্বমঙ্গলা হৈমবতী।

গাঁয়ের ছবি

শ্রী সুনয়নী দেবী

(চিত্রণ)

এক

একটি ছোট মেয়ে, ছোট একটি শিউলের কলসী কাঁখে পুকুরে জল আন্‌তে যাচ্ছে। সেই সবে ভোর হয়েছে—আকাশের একদিকে লাল হ'য়ে সূর্য্য উদয় হচ্ছেন। মেয়েটির মুখে সেই আলোর আভা এসে পড়েছে। দু' একটা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে।

মেয়েটি একমনেই চলেছে। পায়ের মল চারগাছি ঝুনঝুন্ করে' বাজ্‌ছে। পরনে একখানি লাল পাড় কাপড়, শিউলি ফুলে ছোপান। হাতে দু'গাছি কাচের চুড়ি; কপালে ছোট্ট একটি পয়েরের টিপ কাটা; চুলগুলি টেনে খুব এঁটে-সেঁটে একটি 'বেনে' খোঁপা বাঁধা, তাতে একটি গাঁদা ফুল গোঁজা আছে। সে আপনার মনে কত কি বক্‌তে বক্‌তে যাচ্ছে।

এমন সময়ে একটি তের-চৌদ্দ বছরের ছেলে, একটি ছিপ হাতে করে' ছুটতে ছুটতে এসে বল্‌লে, "ওরে কমলা, এত ভোরে কোথায় যাচ্ছিস্ বল্ দেখি?" "আমি পিসিমার জন্যে পূজোর জল আন্‌তে যাচ্ছি, ভাই।" "তা বা, কিন্তু আর আমাদের সঙ্গে খেল্‌তে আসিস্‌নে কেন রে?" "দেখ্‌ছ না আমি এখন কত বড় হয়েছি। পিসিমা বারণ করেছেন ছুটোছুটি খেল্‌তে; কি করি বল' না, রমুদা?"

ছেলেটির নাম রমানাথ, সে বল্‌লে, "তাইতো রে, একদিনেই খুব বড় হয়েছিস্ যে!—আয় এই দিকে, দেখি, কত বড় হ'লি?"

কমলার বয়স এগার বছর। সে বল্‌লে, "না ভাই রমুদাদা, এখন আমাকে বাসি কাপড়ে ছুঁও' না ভাই। পূজোর জল আন্‌তে যাচ্ছি, বাসি-কাপড়ে ছুঁলে এখনি নেয়ে মর্‌তে হবে।"

"তবে আজ আমাদের সঙ্গে খেল্‌তে আস্‌বি বল্, না হ'লে এই দিলুম ছুঁয়ে—"

"কি করে' আসি বল' না ভাই? পিসিমা যদি টের পান, তাহ'লে আর রক্ষা রাখ্‌বেন না; মেরে হাড় গুঁড়ো করে' দেবেন।"

"তবে যা,—আর তোকে কখনো পেয়ারা পেড়ে দেব না।"

"না ভাই রমুদা, তুমি রাগ কোর' না, আজ পিসিমা যখন খেয়ে দেয়ে ঘুমোবেন—চুপি চুপি আমি আস্‌ব তখন।"

"আচ্ছা তাই আসিস্,—কুসুমকে ডেকে আনিস্ কিন্তু বুঝ্‌লি?" "আচ্ছা আন্‌ব। আর কে কে খেল্‌তে আস্‌বে?" "ফটিক, তিনু, বিনু, যিনি সবাই আস্‌বে। আজ খুব জোর লুকোচুরি খেলা হবে। আমাদের আমবাগানে খেলা হবে—সেইখানে যাস্।" "আচ্ছা যাব। এখন যাই, এইবার জল তুলি,—অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। পিসিমা কত বক্‌বেন!" "আচ্ছা, জল তুলে নে। আমিও ওদিকে তিনুকে ডাক্‌তে যাব, চল্ একসঙ্গেই যাই।" "তবে তুমি একটু দাঁড়াও ভাই। আমি কলসীটা মেজে জল তুলে নিই।"

এই বলে' কমলা ঘাটে বসে' বেশ চক্‌চকে করে' কলসীটি মেজে জল ভরে' নিয়ে উপরে এসে বল্‌লে, "এইবার চল। অনেক দেরি হয়েছে।"

পথে যেতে যেতে কমলা বল্‌লে, "দেখ ভাই রমুদা, আজ আমার মেয়ের (পুতুল) বিয়ে হবে বিনোদিনীর ছেলের সঙ্গে; তোমরা যেতে যেও ভাই।" (বিনোদিনী রমানাথেরই বোন্।)

রমানাথ বল্‌লে, "তা যাব এখন—ফটিক, বিনু ওদেরও

নিয়ে যাব। কি খেতে দিবি বল্ দেখি ?" "এই মুড়ি মুড়কি বাতাসা আন্‌ব। আর কোথায় কি পাব এখন ? আমার কি পয়সা আছে, যে ভাল ভাল খাবার কিন্‌ব। পিসিমা চারটে পয়সা দিয়েছেন, তাই দিয়ে ওই সব কিন্‌ব।" "আচ্ছা তাই কিনিস্ ; আর আমাদের গাছে অনেক পেয়ারা পেকেছে, গোটা কতক নিয়ে যাব—কি বলিস্ ?" "হ্যাঁ, সেই ভাল রমুদা, তাই নিয়ে যেও। তোমরা সবাই খেতে যেও কিন্তু, ভাই !" "যাব রে যাব, তোর মেয়ের বিয়েতে যাব না ?" "আচ্ছা ভাই এইবার তুমি যাও, ওই আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে আস্‌ছ দেখ্‌লেই পিসিমা বল্‌বেন যে এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গেই খেলা কর্‌ছিলেম।"

"তবে এখন আমি যাই—" বলে' রমু চলে' গেল।

বাড়ীটি মাধব গাঙ্গুলীর। কমলা তাঁরি মেয়ে। গ্রামের নাম কুসুমপুর। রমানাথ এঁদের প্রতিবেশী হরনাথ রায়ের ছেলে। পিসিমা বাল্যবিধবা, তাঁদের সংসারে থাকেন। কমলাকে আস্‌তে দেখে বল্লেন, "হ্যাঁ লা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি, বল্ দেখি ? জলের জন্যে কখন থেকে বসে আছি, এখনো পূজো হ'ল না। খেলা পেলে মেয়ে সব ভুলে যান ! রাখ্ ওইখানে জলের কলসী। যা, চারটি ফুল তুলে নিয়ে আয়।"

"আমি আর পারিনে বাপু ! সকাল থেকে খাটতে খাটতে আমার প্রাণ গেল —"

"আঃ, গেল যা—এক কলসী জল এনেছেন, তাতেই একেবারে গলে' গেলেন ! ও বৌ, তোমার মেয়ের রকম দেখে যাও !"

"যাই ঠাকুর ঝি, কি হয়েছে ?"—বলে' কমলার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লেন কমলা চোখে কাপড় চেপে কাঁদ্‌ছে।

"কিরে কমলা, কাঁদিস্ কেন ? ঠাকুরঝি, কি হয়েছে—" "হবে আবার কি ? কোন্ সকালে জল আন্‌তে গেছে, এত দেরী হলো কেন তাই জিজ্ঞেস করেছি, এই আর মেয়ে আছে কোথায় ! আর বলেছি চারটি ফুল তুলে আন্, এই তো কথা। তাতেই একবারে কেঁদে ভাসাচ্ছেন ! বাবা ! বাবা ! এমন বাপের-আদুরে মেয়েও দেখিনি কোথাও ! যা—তোকে ফুল আন্‌তে হবে না। কাল থেকে তুই জল আন্‌তে যাস্‌নে, আমি নিজেই জল আন্‌ব এখন।"

এমন সময় মাধব বাবু এসে কমলাকে কাঁদ্‌তে দেখে বল্লেন, "কি রে বুড়ি, কি হয়েছে, কাঁদ্‌ছিস কেন ?" "দেখ'না বাবা, পিসিমা খালি খালি আমায় বক্‌ছেন। আমি কিছু কাজ করি নে ?—বাবা, তুমিই বল' না।" "কাজ কর বই কি মা, তুমি যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে ! তা পিসিমার কথায় কি কাঁদ্‌তে হয় মা ? যাও এখন,—কুসুম এসেছে, খেলা কর গে'।"

কুসুম এসেছে শুনে কমলা খুসী হ'য়ে চলে' গেল। পিসিমা পূজো কর্‌তে কর্‌তে বল্লেন, "ও বৌ, মাধবকে কিছু জল খেতে দাও।"

কমলার মা ঘোমটা দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পিসিমার কথা শুনে খাবার আন্‌তে চলে' গেলেন।

মাধব বাবু বল্লেন, "দিদি, তোমার পূজো হলো ? তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—"

কথা আছে শুনে দিদি তাড়াতাড়ি পূজো সেরে উঠে এসে একখানা মাদুর পেতে দিয়ে ভাইকে বস্‌তে বল্লেন। মাধব বাবু গামছা দিয়ে পা মুছে' মাদুরে বসে', জল খাবার এলে খেতে লাগ্‌লেন, কমলার মা একটি চুমুকি ঘটি করে' জল দিয়ে গেলেন। খাওয়া হ'লে, দিদি বল্লেন, "এইবার কি বল্‌ছিলি, বল্।" "বল্‌ছিলেম কি জান, দিদি ! কমলার বিয়ের জন্যে তুমি তো ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ। কিন্তু ভাল ছেলে তেমন কোথাও তো দেখ্‌তে পাইনে। রমানাথ আমাদের জাতি, তা না হ'লে ওর সঙ্গেই দিতেম।" "আমি বলি কি মাধব, একবার হারাধন ঘটককে ডেকে, ছেলে খুঁজ্‌তে বলে' যে। ওর হাতে অনেক ছেলে আছে।" "তাই দেখি।"

এমন সময় ঝিনকড়ির সঙ্গে হারাধনকে যেতে দেখে দিদি বল্লেন, "ওরে, ওই যে হারাধন যাচ্ছে, ওকে ডাক্ না ?"

মাধব বাবু উঠে গিয়ে হারাধনকে ডেকে আন্‌লেন।

দিদি বল্লেন, "এই আমরা তোমারি নাম কর্‌ছিলেম হারাধন !" "কেন দিদি ঠাকুরুণ, সকাল বেলাতেই আমার

নাম করছিলেন? কিছু দরকার আছে কি?" "না ভাই, দরকার আছে বই কি। এই দেখ না, আমাদের কমলা বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে, এইবার তার বিয়ে দিতে হবে তো? তাই বলি, তোমাকে একবার বলে' দেখি যদি ছেলে টেলে থাকে তো কমলার জন্যে দেখ্‌বে।" "ছেলের আবার অভাব কি দিদি ঠাকরুণ। কত পাশ করা, ফেল করা ছেলে আমার হাতে আছে, যে রকম চান এনে দিতে পারি। তার জন্যে ভাবনা নেই; কিন্তু শুধু মেয়েটি তো নেবে না তার সঙ্গে রেন্ত-রসদ চাই, সেইটেই ভাববার বিষয়।" মাধব বাবু বল্‌লেন, "ঠিক বলেছ হারাধন, ওইটেই হয়েছে ভাবনার কথা। দিদি মেয়ে মানুষ, বোঝেন না তো কিছু? মনে করেন ছেলে পেলেই বিয়ে হবে!"

এমন সময় তিনকড়ির দিদিমা 'তারা দিদি' এসে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন, "ওলো থাকো, তোদের কি কথা হ'চ্ছে লা?"

ইনি পাড়ার সকলেরি 'তারা দিদি'—সকল ঘরের খবর রাখেন। তিনকড়ি আর কুসুমের মা মারা গেলে ইনিই তাদের মানুষ করেছেন মাধব বাবুর জমিতে ঘর বেঁধে আছেন।

পিসিমা বল্লেন, "কমলার বিয়ের কথা হ'চ্ছে, দিদি। মেয়েটা বড় হয়েছে, তাই হারাধনকে একটি ছেলের কথা বল্‌ছি।—ছেলে দেখ্‌তে হবে তো?" "তা তো দেখ্‌তে হবেই লো। এই আমাদের কুসুম, দেখ্‌লা কমলাতে তাতে একবয়সী হবে, কিন্তু কমলার চেয়ে বড় দেখায়—।"

মাধব বাবু বল্‌লেন, "দিদি তো সব বাড়ীতেই যাও, কোথাও ছেলে টেলে আছে বল্‌তে পার?" "তা থাকবে না কেন। এই কাল ও-পাড়ায় গিয়েছিলেম জমিদার মশাই ছেলের জন্যে একটি মেয়ের কথা বল্‌ছিলেন। এই মাস খানেক আগে বৌটি মারা গেছে কিনা।"

পিসিমা বল্‌লেন, "তবে হারাধন, একবার তুমি ভাক্তলাল বাবুকে বলে' দেখনা, যদি পছন্দ হয়? মেয়ে তো আমাদের কালো নয়।"

মাধব বাবু বল্‌লেন, "এ তোমার মিছে আশা করা, দিদি। ভাক্তলাল বাবু কি গরীবের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন?—না হারাধন, তাতে কাজ নেই। তুমি একটি গেরস্ত ঘরে, খাওয়া পরার কষ্ট না হয় এমনধারা ছেলে একটি দেখ, বুঝ্‌লে?"

দিদি বল্‌লেন, "তবে তুই যা ভাল বুঝিস্ তাই কর্, আমাকে কোন কথা বল্‌তে আসিস্ নে।" "এই দেখ হারাধন, দিদির রাগ হলো!"

হারাধন বল্‌লে, "তা বেশ তো, আমি একবার বলেই দেখি না তাঁদের কি মত হয়।" "তাই বলে' দেখ, কি বলেন।" "আচ্ছা আজ তা হ'লে উঠি, অনেক বেলা হয়েছে। কাল সকালে এসে জানিয়ে যাব।"—বলে,' হারাধন নমস্কার করে' উঠে গেল।

মাধব বাবু তারা দিদিকে বল্‌লেন,"দিদি আজ এইখানেই খেয়ে যাও না কেন?" "তা খেলেই হলো, তার জন্যে আর কি হয়েছে। তবে কুসুম আর তিনকড়ে কোথায় খাবে তাই ভাব্‌ছি।" "তাদের যে আজ এখানে কমলা খেতে বলেছে; কমলার পুকুলের বিয়ে কিনা, তাই।" "ভালই হয়েছে; তবে এইখানেই খেয়ে যাব এখন। তোদের আজ কি রান্না হ'চ্ছে লো?" "এই দিদি উচ্ছে দিয়ে পেসাদির ডাল, আর আলু পটল ভাজা, একটা শুক্ত, নিরামিষ, অম্বল, ডাঁটা চেচ্‌কি। আর গোবিন্দ মাছ আন্‌তে গেছে, এলে ওদের মাছের ঝোল হবে। তোমার জন্যে আর কিছু করব দিদি?" "না লো না, আবার কি করবি,এই তো যজ্ঞি-বাড়ীর রান্না হয়েছে। আবার কি খায় মানুষে? তবে একটু দুধ আমার জন্যে রাখিস্, আজিং খাই কি না, ওটি না হ'লে চলে না:—হ্যাঁ লা, বৌ কোথায়? তাকে যে দেখ্‌ছি না?" "এই, ঘাটে গেছে জল আন্‌তে। এলে দুধের কথা বলে' দেব এখন। রঘু আজ একটা কাঁঠাল দিয়ে গেছে। খন দুধ দিয়ে খেও এখন, দিদি।"

মাধব বাবু বল্‌লেন, "দিদি একটু তেল দাও, স্নান করে' আসি।"—তেল মেখে তিনি গেলেন স্নান কর্‌তে।

সন্ধ্যা বেলা কমলার মেয়ের (পুকুলের) বিয়ে হ'য়ে গেল। তিনু, বিনু, ফটুকে, রঘু সবাই এসে খেয়ে গেছে। রঘুনাথ একহাঁড়ি দই এনেছিল, চিড়ে মুড়কি খাওয়া হ'ল।

দুই

আজ বিনোদিনীর ছেলের বৌ (পুতুল) আস্‌বে, তাই ভোর বেলা উঠে ঘরের কোণে বরক'নের জন্যে সব গোছাচ্ছে. এমন সময় জ্যাঠাই মা স্নান করে' এসে উঠানে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "ওলো ও' বিনি, বলি আজ কি কুটনো কোটা হবে না, নাকি? বুড়ি করে' আনাজগুলো দিয়ে গেলুম, মনে কর্‌লুম কুটে রাখ্‌বে। ওমা, মেয়ে এখনো ঘরেই বসে' আছেন!"

বিনি ঘর থেকে একখানা বঁটি হাতে করে' তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "কি কুটব জ্যাঠাই মা, তুমি কিছু বলে' গেলে না, তাই আমি চুপ করে' বসে আছি। কি কি বল, কুটে দিই." "সব আমি বলে' দেব তবে তুমি করবে? কেন, জান'না রোজ কি হয়? নে এখন এই মোচাটা কোট্; আমি পুজো সেরে এসে রান্না চড়াই।"—বলে' জ্যাঠাই মা ঘরে চলে' গেলেন।

পুজো সেরে রান্নাঘরে গিয়ে ডালের হাঁড়িটা উনানে চাপয়ে, হাঁড়িতে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে জ্যাঠাই মা বিনিকে ডেকে বল্‌লেন, "ওলো, মোচাগুলো দিয়ে যা না, আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে, চাপিয়ে দিই।"

বিনি একটা কাঁসিতে করে' মোচাগুলো নিয়ে রান্নাঘরে দিয়ে এলো। এমন সময় রমানাথ এসে বল্লে, "জ্যাঠাই মা, কোথায় তুমি?" "এই যে আমি রান্নাঘরে. কি হয়েছে রে? ডাক্‌ছিস্ কেন?"—বলে' হাত ধুয়ে বেরিয়ে এলেন।

"ভালো জ্যাঠাই মা, আমি এইবার কল্‌কাতায় পড়্‌তে যাব, বাবা বলেছেন।" "ও, তাই সাত-তাড়াতাড়ি আমাকে বল্‌তে এসেছ? কেন রে, এখানে কি লেখাপড়া হয় না নাকি, তাই ঠাকুরপো তোকে কলকাতায় পাঠাচ্ছে? কলকাতায় গিয়ে ছেলে জজ হবে, না? আসুক্ বাড়ীতে, এখন শোনাব।" "রাগ কর্‌ছ কেন জ্যাঠাই মা, এখানে কি কলেজ আছে যে পড়্‌ব।" "তা যা না যেখানে খুসী, আমাকে বল্‌তে এসি কেন? এই সেদিন ভুতো একখানা বই এনে বিনিকে কত ইংরাজি পড়ে' শোনালে—বল্ না লো পোড়ারমুখী, শোনায় নি? মেয়ের যেন বাক্যি হরে' গেছে।"

রমানাথ হো-হো করে' হেসে উঠে বল্‌লে. "ও জ্যাঠাই মা, তুমি ভুতোর এ-সি-সি শুনেই মনে কর্‌লে, খুব ইংরাজী লেখাপড়া জানে? হা হা হা! জ্যাঠাই মা, তুমি কি যে বল তার ঠিক্ নেই!"

এমন সময় ফটিক এসে বল্‌লে, "কি রমুদা সকাল বেলা অত হাস্‌ছ কেন ভাই?"

"ওরে ফটিক শোন্ শোন্, জ্যাঠাই মা কি বল্‌ছেন! ভুতো নাকি খুব ইংরাজি পড়্‌তে পারে—" বলে' হা হা হা করে' রমানাথ আবার হেসে উঠ্‌ল।

"সর্, সর্, সকাল বেলা অত হাসি আমার ভাল লাগে না! তোর সঙ্গে বকে' বকে,' আমার কোন কাজই হলো না। আমি ঠাকুরপোকে বলে' কালই কাশী যাব। বেশি, তোদের সংসার কি করে' চলে—" বলে', গজ্ গজ্ কর্‌তে কর্‌তে রান্নাঘরে গিয়ে দুম্ করে' ভাতের হাঁড়ীটা উনানে বসিয়ে দিলেন।

বিনি তার পর গিয়ে বল্‌লে. "বড় মা, আর কিছু কাজ আছে কি?" "আর তোমাকে কাজ কর্‌তে হবে না—দূর হ'য়ে যা আমার সাম্‌নে থেকে। অত বড় মেয়ে যদি একটা কাজ পারে। আজ যার কাল শ্বশুর-বাড়ী যাবে, তখন খোঁটা খেতে খেতে যাবে আমার প্রাণ!"

ফটিক বল্‌লে, "জ্যাঠাই মা, বিনির যে আজ ছেলের বৌ (পুতুল) আস্‌বে। আমরা আন্‌তে যাচ্ছি। চল রমুদা, এইবার যাই।"

এমন সময় হরনাথ বাবু এসে বল্‌লেন, "বৌদি কই? একটা কথা আছে। বিনি,—তোর জ্যাঠাই মা কোথায় রে?" "এই যে বাবা, রান্নাঘরে—আমি বল্‌ছি। তুমি এইখানে বোস। কিন্তু বাবা, জ্যাঠাই মা বড় রেগে আছেন, দাদা কলকাতায় যাবে শুনে'—" "তাই না কি রে? তবে এখন আর কিছু বলে' কাজ নেই—আমি মাঠের ওখান থেকে ঘুরে আসি।"

বিনি বল্‌লে, "বাবা, আজ আমার ছেলের বৌ (পুতুল) আস্‌বে। বাতাসা কিন্‌বে, আমাকে চারটে পয়সা দাও না।"

"আচ্ছা এই নে"—বলে' চারটে পয়সা দিলেন। তার পর চাদর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তিন

তার পর জ্যেঠাই মা'র ঘোর অমত থাকাতেও রমানাথকে কলকাতায় যেতে হলো। এক বছর হ'য়ে গেছে রমানাথ কলকাতায় এসেছে। ভবানীপুরে একটা মেসে, দোতালার একটা ঘর নিয়ে আছে। দশ-বারটি ছেলে মেসে থাকে। সকলেই স্বভাবগুণে রমানাথকে ভালবাসে। হাইকোর্টের উকীল বেহারী বাবুর ছেলে বিনোদ, রমানাথের সঙ্গেই এক ঘরে থাকে। ঘরটি ছোট হলেও বেশ আলো-হাওয়া আসে। এক দিকে একখানি তক্তপোষ পাতা আছে, একটি তোষক আর দুটি বালিস। চাদর দিয়ে বিছানাটি ঢাকা দেওয়া। এক ধারে আলনায় দুটি সার্ট, দুখানা ধুতি, উড়ানী, দুখানা গামছা ঝুলছে। এক কোণে একটা তুঁতো, মুখে একটি কাঁসার গেলাস ঢাকা। ঘরটায় একটা ছিটের পর্দা দেওয়া। মাঝে একটা টেবিল, তার দুদিকে দুখানা চৌকিতে রমানাথ আর বিনোদ বসে' গল্প কর্‌তে কর্‌তে চা খাচ্ছে।

মেসের ঝি একটা রেকাবি করে' দুটি রসগোল্লা আর দু'খিলি পান দিয়ে গেল। বিনোদ চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে বল্লে, "ওরে রঘু, আজ বামুন বেটা এমন চা করেছে খেয়ে দেখ্‌,—কেবল গরম জল, আর চিনি। কাল থেকে আমি নিজেই কর্‌ব চা। বামুনটার সঙ্গে আর পারা যায় না।" "তা কোর' এখন, দাদা। কিন্তু এই চার-পাঁচ দিন ছুটিটা কি করে' কাটান যায় বল দেখি ভাই?" "তুই তো বল্‌ছিলি দেশে যাবি, তা চল্ না—তোর সঙ্গে আমিও যাই তোদের দেশটা দেখে আসি গে'।" "তা হ'লে সত্যি কিন্তু খুব ভাল হয় ভাই,—তাই চল। তুমি গেলে বাবা, জ্যেঠাই মা খুবই খুসী হবেন! আজ শনিবার, আজ চারটের ট্রেনেই যাই চল, সন্ধ্যে বেলা আমাদের গ্রামে পৌঁছব।" "তাই চল, খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ীতে মাকে বলে' আসি। পাড়া-গাঁয় কখনো যাইনি, অনেক দিন থেকে দেখ্‌বার ইচ্ছে আছে।" "আমাদের গ্রাম দেখ্‌লে তোমার আর এখানে ফিরে আস্‌তে মন হবে না। এখানে কি আছে ভাই?—কেবল লোকের ভীড়, কলের ভোঁ ভোঁ, ট্রেনের ঘড় ঘড়ানি। সেখানে কেমন খোলা মাঠ! জায়গায় জায়গায় গাছের ফোপর ভিতর দিয়ে কুঁড়ে-ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে। সরু-মোটা রাস্তাটি এঁকে বেঁকে চলে' গেছে—গ্রামের মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে পুকুরে জল আন্‌তে সকাল-সন্ধ্যায় যাচ্ছে। সন্ধ্যা বেলা আর সকালে কত রকম পাখী ডাকে, তার ঠিক নেই। এখানে তো কাকের ডাক ছাড়া আর কোন পাখীর ডাক শুন্‌তে পাই না। সারাদিন ছেলেরা ছুটোছুটি করে' খেলে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যে হ'লে গাছগুলি জোনাকী পোকায় আলো করেই থাকে। সে যে কি শোভা, না দেখলে বুঝ্‌তে পার্‌বে না, ভাই।"

বিনোদ বল্লে, "তোর বর্ণনা শুনে সেই গানটা মনে পড়ে গেল—'সারাদিন পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লী-বাটে'। গানটি একজন বিখ্যাত কবির রচনা।" "সে-দিন কতকগুলি ছেলে রাস্তা দিয়ে এই গানটা গেয়ে যাচ্ছিল বটে। গানটি আমার খুব ভাল লেগেছিল, বিনোদ দা। আমাদের গ্রামের বর্ণনাটি ঠিক মিলে গেছে!"

এমন সময় মেসের ঝি এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "বাবুরা কি আজ চান কর্‌বেক নি? বেলের জল গেলেক্ আমি জল তুল্‌তি পার্‌বক নি বাপু। আর-বাবুদের সব খাওয়া হ'য়ে গেলক্। ঠাকুর বক্‌তেছেক।"

"ঝি তুমি যাও, আমরা এখনি যাচ্ছি। চল্ রঘু, স্নান করে' খেয়ে নিয়ে কথা হবে এখন।" বলে' তারা নীচের নেমে গেল।

চার

বিনোদ দুপুর বেলা বাড়ী গেল। পটলডাঙ্গায় বেহারী মুখুয্যের বাড়ী। এঁর দুই ছেলে, ব্রজলাল আর বিনোদ-লাল। একটি মেয়ে—নাম সুরমা। ব্রজলালের বিয়ে হয়েছে, বৌ এখানেই আছে, নাম উমা। বাড়ীটি বেশ বড়; লোকজনে ভরা। বিনোদের মা আছেন। এক পিসি আছেন। বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ীতেই আছেন, স্বামীর কোন খোঁজ খবর নেই। বিনোদ বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লে পিসিমা ঘরে পা ছড়িয়ে বসে' পান-দোক্তা মুখে দিচ্ছেন, ঝিয়ারী ঝি হাত-মুখ নেড়ে সামনে বসে' গল্প কর্‌ছে। বিনোদকে দেখে, "ওমা দাদাবাবু যে" বলে' মাথায় কাপড়

দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনোদ বলে, "পিসিমা, মা কোথায়? ঘরে দেখ্‌তে পেলুম না।" "তোর মা যে তোর মাসীর ওখানে গেছেন। তুই এমন সময় বাড়ী এলি যে? আজ ছুটি আছে নাকি?" "না পিসিমা, আজ শনিবার—তাই সকাল সকাল কলেজ বন্ধ হয়েছে। বৌদিদি কি মায়ের সঙ্গে গেছেন?" "না রে, বৌমা আছে, তুই যা না সেখানে। এখনি চলে' যাস্‌নে যেন।"

"না পিসিমা, মায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌ে যাব যে।" বলে' বিনোদ বৌদি'র ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, উমা তখন পান সাজ্‌তে বসেছে। উমার ঘরটি বেশ সাজান। মেঝেটি সাদা কালো মাদ্‌রেল পাথরের। একদিকে একখানা জোড়া-খাট, তার পাশে একখানি কৌচ, মাঝে একটা পাথরের গোল টেবিল, তার উপর একটা ফুল দানী কতকগুলি টাট্‌কা গোলাপফুল দিয়ে সাজান। একদিকের দেয়ালে একটা ড্রেসিং টেবিল তার উপর সিঁদুর-কৌটা, চিরুণি, প্রভৃতি ছোটখাট এটা-ওটা সাজান রয়েছে। দেয়াল পেন্টিং করা। পান কতক অয়েল পেন্টিং, দেবদেবীর ছবি খাটান। খাটের সামনে একখানা কারপেট পাতা।

উমা একখানা আসন পেতে বসে' পান সাজ্‌ছিল, বিনোদকে দেখে মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে বল্‌লে, "এই যে ঠাকুরপো! কখন এলে ভাই?"

"এই আস্‌ছি বৌদি," বলে' মেজেতে বসে পড়্‌ল।

"ও কি ভাই ঠাকুরপো, মাটিতে বস্‌লে কেন? এই আসনটা পেতে বস' না ভাই, কাপড়ে ধুলো লাগ্‌বে যে।" "না বৌদি, আমি বেশ বসেছি—তুমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠো না, তোমার ঘরে একটুও ধুলো নেই।" "আমার ঘরে ধুলো থাকার যো কি! আমি যে ভাই নিজের হাতে সব ঝাড়ি, দাসী-চাকরের কাজ আমার পছন্দ হয় না ভাই।" "সে যাক্ বৌদি, এখন তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—" "কি কথা ভাই? কোথাও সুন্দর মেয়ে টেয়ে দেখেছ না কি? মাকে বল্‌তে হবে বুঝি?" "এই দেখ বৌদি, আমার কথাটা না শুনেই নিজের মনে যা-তা একটা ঠিক করে' নিলে? মেয়েদের মাথায় কেবল বিয়ে বিয়ে ঘুরছে! আমি এখন বিয়ে কর্‌ছি না, সে ভাবনা তোমায় কর্‌তে হবে না।" "তুমি বিয়ে কর্‌ব না বল্‌লেই তো হবে না ভাই। এই আজই ত' মা তোমার জন্যে মেয়ে দেখ্‌তে মাসী-মা'র ওখানে গেছেন। মাসী-মা'র ভাসুরঝি নাকি খুব সুন্দর!" "আমি এখন কিছুতেই বিয়ে কর্‌ছিনে, কিন্তু।"

এমন সময় সিঁড়িতে মলের শব্দ শুনে উমা বল্‌লে, "ওই সুষমা আস্‌ছে, কি রকম মেয়ে দেখ্‌লে—শোনা যাবে এখন। সুষমা," ভাই বৌদি" বলে', ঘরে ঢুকে বিনোদকে দেখে একটু অবাক্ হ'য়ে গিয়ে, তারপর "এই যে ছোড়্‌দা এসেছ? আজ আমরা তোমায় ক'নে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম যে—" বলে' খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠ্‌ল।

বিনোদ বল্‌লে, "ক'নে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, এদিকে মাষ্টার এসে ফিরে গেল, তার খোঁজ আছে? হাস্‌তে লজ্জা কর্‌ছে না? পড়াশোনা নেই, কেবল ঠোঁটামি শিখ্‌ছে! যা—পড়া কর্‌গে'।"

সুষমা ঝুনি খেয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এমন সময় হারাণী এসে বল্‌লে, "দাদাবাবু, মা তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

বিনোদ বল্‌লে, "বৌদি দুটো পান দাও দেখি, খাই। মেসের বি'র হাতের পান খেয়ে খেয়ে মুখ ভেজে গেছে!"

উমার তখন পান সাজা হ'য়ে গেছে, একটু গোলাপ-জল ছিটিয়ে দিয়ে বিনোদকে দুটি পান দিলে। বিনোদ দুটো পান মুখে পুরে' বল্‌লে, "আরও গোটা কতক পান আমাকে বাঁধার সময় দিও বৌদি, নিয়ে যাব।" "আচ্ছা দেব এখন।" "বেশ। আমি মায়ের ঘরে যাচ্ছি, তুমি ঠিক করে' রেখ। আর কিছু চা ও দিও, একটা সিগারেটের কৌটো করে'। আমি আজ হুমায়ুনের দেশে বেড়াতে যাচ্ছি, চা সঙ্গে নিয়ে যাব।" বলে' উঠে গেল।

মায়ের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, তিনি তখন একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কাত হ'য়ে শুয়ে আছেন, হারাণী পায়ে হাত বুলাচ্ছে। উঠে বসে' বল্‌লেন, "আয় এইখানে বোস্, ওকি রে, ওখানে বস্‌ছিস্ কেন? বিছানায় বোস্।"

বিনোদ বিছানায় উঠে বস্‌ল। মা বল্‌লেন, "আজ তো শনিবার, এখানে থাক্ না কেন? কাল তখন খেয়ে

যেয়ে সন্ধ্যাবেলা যাস্।" "না মা, আমি যে আজ রমানাথের সঙ্গে তার দেশে বেড়াতে যাচ্ছি, তাই তোমাকে বল্‌তে এসেছি।" "সে আবার কোথা রে?" "কুসুমপুর গ্রামে ওদের দেশ। পাড়াগাঁয়ে কখনো যাই নি, দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়েছে, মা। তুমি কিন্তু অমত কর্‌তে পার্‌বে না, তা বলে' রাখ্‌ছি।"

"এই দ্যাখ, পাগল ছেলে—পাড়াগাঁয়ে যাবি কিরে? নারে না গিয়ে কাজ নেই।" "কেন মা, পাড়াগাঁ শুনে অত ভয় পাচ্ছ? তোমার বাপের বাড়ীও তো পড়াগাঁয়ে? সেখানে যাব বল্লে তুমি যেতে দেবে কিনা বল?"

"তা সেখানে কি কখনো গেছিস্ যে? দাদা কতবার তোদের নিয়ে যেতে বলেছেন,—তোরাই ত যেতে চাস্‌নি। বলিস্ সেখানে গেলে ম্যালেরিয়া হবে।" 'না মা, আর বল্‌ব না, এইবার ফিরে এসে তোমাকে মামার বাড়ী নিয়ে যাব। আজ আমায় অনুমতি দাও মা—চারটার ট্রেনে আমরা যাব। এখন দুটো বেজে গেছে।"

"আচ্ছা একটু দেরী কর্।"—তার পর হারাণীকে বল্লেন, "ওরে বৌমার কাছ থেকে বিনোদের জন্যে খাবার নিয়ে আয় দেখি।"

হারাণী খাবার আন্‌তে গেল। মা তখন বিনোদকে বল্লেন, "যাবি যা, কিন্তু পুকুরের জল খাস্‌নি যেন।" "না মা, সে ভাবনা নেই—আমরা জল নিয়েই যাব।"

উমা একখানি রেকাবি করে' বিনোদের খাবার নিয়ে এল, হারাণী গেলাসে করে' জল দিলে। তারপর জল খেয়ে মাকে প্রণাম করে' বিনোদ বল্ল, "চল বৌদি, এইবার পাশ দেবে, আর চারটি চা দিও।" বলে' উমার সঙ্গে চলে গেল।

পাঁচ

রমানাথ আর বিনোদ যখন গ্রামে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।—শিবমন্দিরে আরতির শাঁখ-ঘণ্টা বাজ্‌ছে। চাঁদের আলোয় গ্রামটি একখানি ছবির মত দেখাচ্ছে। বিনোদ বল্লে, "সত্যি রে রমু, তোদের গ্রামটি ঠিক যেন একখানি ছবির মত দেখাচ্ছে! অবনী বাবু যদি এখানে আস্‌তেন তাহ'লে নিশ্চয় তোদের গ্রামের একখানি ছবি এঁকে নিতেন।"

রমানাথ বল্লে, "ভাই, তুমি হেঁটে যেতে পারবে কি? না একটা গরুর গাড়ীর চেষ্টা দেখব?" "না রে, গাড়ীর দরকার নেই, চাঁদের আলো আছে—হেঁটেই যাব এখন।"

"তবে চলো," বলে' রমানাথ সুট্‌কেস্‌টা হাতে করে' নিলে। তারা যখন বাড়ী পৌঁছল, জ্যেঠাইমা তখন তুলসী-তলায় প্রদীপ দেখিয়ে প্রণাম কর্‌ছিলেন। রমানাথকে দেখে বল্লেন, "কিরে, তুই যে হঠাৎ না বলে' এলি? তোর সঙ্গে ছেলেটি কে রে?"

"আমার বন্ধু বিনোদ-দা, জ্যেঠাইমা। চার-পাঁচ দিন ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছে—" বলে' তারা দুজনে প্রণাম করলে।

জ্যেঠাইমা আশীর্ব্বাদ করে' বল্লেন, "তা এসেছে বেশ হয়েছে বাবা, বড় সুখী হলেম। কিন্তু তোমার চন্দ্র তো বড় কষ্ট হবে, তাই ভাব্‌ছি।"

"না জ্যেঠাইমা, আমার কোন কষ্ট হবে না—আপনি কিছু ভাব্‌বেন না।" "ওরে রমু, বিনোদকে ঘরে বসা না, দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

রমানাথ বিনোদকে নিয়ে গেল।

"ওলো বিনি, এদিকে আয় না, বাড়ীতে লোক এলো, ছেলের যদি কোন খোঁজ-খবর আছে!" "দাদার সঙ্গে কে এসেছে জ্যেঠাইমা?"

"আহা এতক্ষণে হুঁস হলো, 'কে এসেছে জ্যেঠাইমা,' বল্‌তে এলেন। ওই জন্যেই তো দেখ্‌তে পাইনে। যা, ঘরে যে-খাবার আছে দুজনের মত গুছিয়ে আন্। একটা কাজও যদি তোর দ্বারা হয়।" বলে,' তিনি রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে কালীর-মা ঝি উনানে আঁচ দিচ্ছিল, তাকে বল্লেন, "ও কালীর মা, একবার এই হ'রে মুদির দোকানে যা তো বাছা, এক পো ময়দা আর আধ-পো ঘী নিয়ে আয় দেখি। বিনোদকে খানকতক লুচি ভেজে দেব।"

"আমি এখন এই আঁধারে একলা যেতে পারব না বাপু।" "আচ্ছা না পারিস্ বিনিকে নিয়ে যা। এই তো পুকুর-পারে দোকান। যা যা আর দেরী করিস্‌নে।"

এমন সময় হরনাথ বাবু এসে বৌদিকে ডেকে বল্লেন, "বৌদি, রমুর সঙ্গে বিনোদ এসেছে, তাকে ভাল করে'

খাওয়াতে হবে তো —। যাই দেখি যদি ভাল সন্দেশ পাই নিয়ে আসব এখন। আর কিছু আনতে হবে কি ?" "খী মরদা আনতে কালীর মাকে পাঠিয়েছি ঠাকুরঝো, আর কিছু দরকার নেই। ও-বেলার সেই বড় মাছটার খানকতক আছে, তারি ঝোল আর কাল কমুর এখন। সন্দেশ আর আনতে হবে না তোমাকে। আজ কমলার পাকা দেখা হলো কি না, তাই মাধব খাবার পাঠিয়েছে। বেশ ভাল রসগোল্লা আছে ; তাতেই হবে।"

"আচ্ছা আমি একটু ঘুরে এখনি আসছি", হরনাথ চলে গেলেন।

ন'টার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে, রমানাথ আর বিনোদ এক ঘরে শুয়ে পড়ল। সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে, বিনোদ বল্লে, "রমু, এইবার একটু চায়ের জোগাড় করতে হবে তো ?" "আচ্ছা আমি বিনিকে গরম জল আনতে বলছি ভাই। তুমি ততক্ষণ বের করে' রাখো—" তারপর বিনিকে ডেকে রমু গরম জল আনতে বললে।

বিনি একটা ঘটি করে' গরম জল,দুধ, চিনি দিয়ে গেল। রমানাথ ঘটির জলে চারটি চা দিয়ে একটি এনামেলের বাটি মুখে ঢাকা দিলে। বিনি একটা খালি করে' গরম মুড়ি, আর জ্যেঠাই মা তালের বড়া ভেজেছিলেন তাই একটা বাটি করে' দিয়ে গেল। বাসি লুচি ছিল তার খানকতক, আর বেগুন ভেজেও এনে দিলে। রমানাথ চা'টা ধোয়া রুমাল দিয়ে বাটিতে ছেঁকে দুধ-চিনি দিয়ে বিনোদের দিকে এগিয়ে দিলে। বিনোদ চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বললে, "ওরে রমু, চা খুব ভাল হয়েছে, খেয়ে দেখ্। রাতের গুণে ঘটিতেও চা ভাল হয় দেখ্‌ছি।" তার পর মুড়ি, ঘুগনি, লুচি, বেগুনভাজা খেয়ে বিনোদ বললে, "ওরে, সকালেই যা খাওয়া হলো তাতের দফা রফা, এখন চল্ একটু বেড়িয়ে আসি নইলে হজম হবে না।"

রমানাথ বললে, "চল ভাই তোমাকে মাধব কাকার ওখানে নিয়ে যাই।" এই বলে' তারা চাদর আর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে তিনকড়ি আর ঘটিক এসে জুটল, তখন চার জনে গল্প করতে করতে মাধব বাবুর বাড়ী উপস্থিত হলো। হরনাথ বাবু আগেই সেখানে এসেছিলেন। বিনোদকে দেখে, বল্লেন, "এই যে বিনোদ এসেছে ? মাধব, এটি রমুর বন্ধু বিনোদ।"

মাধব বাবু বল্লেন, "বোস' এইখানে, বড় খুসী হলেম তুমি এসেছ।"

বিনোদ আর রমানাথ প্রণাম করে' মাদুরের একদিকে বসল। মাধব বাবু বল্লেন, "সেখানে কেমন ছিলি রে রমু ?" "ভালই ছিলুম কাকা !" "কিন্তু অত রোগা হ'লি কেন রে ? উড়ে বামুনের রান্না খেতে পারিস্‌নে নয় ?" "রান্নার কথা আর মনে করিয়ে দিও না কাকা, তাহ'লে এখনি কান্না বেরিয়ে যাবে। পিসিমার সঙ্গে দেখা করে' আসি, কাকা।"

মাধব বাবু বল্লেন, "তা বিনোদকেও নিয়ে যা না ভিতরে।" "তবে এসো ভাই," বলে' বিনোদকে নিয়ে রমানাথ উঠে গেল।

তারা দেখ্‌লে পিসিমা তখন গোবিন্দর কাছে বাজারের হিসাব নিয়ে তারি গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছেন ! পিসিমা বলছেন, "যা পয়সা দিয়েছি তার চেয়ে বেশি কেন খরচ হলো ?" গোবিন্দ বলছে, "অত জিনিষ আন্‌তে হুকুমই করলে খরচ হবে না তো, আমি আসবে নাকি ? আমি কাল থেকে বাজার করতে পারব না।" "না পারিস্ দূর হ'য়ে যা। তারাবিদ্যি বাজার করে' রেখে এখন।" এমন সময় রমানাথকে দেখে চুপ করলেন। গোবিন্দ, "এই যে দাদা বাবু এসেছেন," বলে' উঠে প্রণাম করে' পায়ের ধুলো নিলে।

"কি রে কেমন আছিস ?" "আর দাদা বাবু এমনি আছি একরকম।"

কমলার মা ঘরে ছিলেন, বেরিয়ে এসে বিনোদকে দেখে মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। রমানাথ আর বিনোদ পিসিমা, খুড়ীমা দুজনকে প্রণাম করলে। পিসিমা বল্লেন, "এটি কে রে রমু ?" "সেই যে পিসিমা, সেবার এসে তোমার কাছে যার কথা গল্প করেছিলেম, সেই আমার বন্ধু।" তারপর খুড়ীমার দিকে চেয়ে বলে, "কমলা কোথায়, খুড়ীমা ?"

তিনি বল্লেন, "সে রান্নাঘরে, চাল ধুচ্ছে। ওরে

কমলা, তোর রমু দাদা এসেছে, এদিকে আয় না।" এর পর একখানি মাদুর দাওয়াতে পেতে দিতে গেলেন।

রমানাথ তাঁর হাত থেকে মাদুরখানি নিয়ে বল্লে, "ওকি খুড়ীমা, তুমি মাদুর পেতে দেবে—আমরা বস্‌ব?" বলে' মাদুরখানি পেতে বিনোদকে নিয়ে বসে পড়্‌ল।

পিসিমা বল্লেন, "বিনোদ, ক'দিন এখানে থাক্‌বে? যে ক'দিন এখানে থাক্‌বে একবার করে' এসো। গরিব বলে' ঘৃণা কোর' না বাবা।" "সেকি পিসিমা,—খুড়ী পিসিকে কি কেউ ঘৃণা করে? আপনি আমাকে পর মনে কর্‌ছেন তাই ওকথা বল্‌ছেন।" রমু বল্লে, "পিসিমা, কমলার বিয়ে কবে?"

এমন সময় কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পিসিমা বল্লেন, "যা না, রমুকে আর বিনোদকে প্রণাম কর্। বিনোদ ঘরের ছেলে—ওকে এত লজ্জা কি?"

কমলা দুজনকে প্রণাম করে' ঘরে চলে গেল। পিসিমা বলে' দিলেন, "ওরে, দুজনের জন্যে একটু মিষ্টি নিয়ে আয়, আর পাণ দিয়ে যা।"

বিনোদ বল্লে, "রক্ষা কর পিসিমা,আর এখন কিছু খেতে পার্‌ব না। জোঠাইমা চায়ের সঙ্গে অনেক খাইয়েছেন। খালি পাণ দিন।"

কমলা একটা ডিবে করে' পাণ দিয়ে গেল। কমলা এখন আর সেই ছোট্ট কমলা নেই, বেশ বড় হয়েছে। রং অনেক ফর্সা হয়েছে। বিনোদ কমলাকে দেখে মোহিত হয়েছিল। পাড়াগাঁয়ে যে এরকম সুন্দরী থাক্‌তে পারে, সে ধারণা তার ছিল না। কমলা বাপের কাছে বাঙলা লেখাপড়া শিখেছিল। মহাভারত পড়ে' পিসিমাকে রোজ শোনাতে হয়। ছোটখাট গল্পের বইও সে অনেক পড়েছে। কমলা পাণ দিয়ে ঘরের দরজার পাশ থেকে বিনোদকে দেখ ছিল, মাকে আস্‌তে দেখে সেখান থেকে সরে' দাঁড়াল। মা বল্লেন, "ওরে, যা দেখি চট্ করে' এক কলসী জল এনে দে, রান্নাঘরে জল নেই।" "আমি এখন ওখান দিয়ে জল আন্‌তে যেতে পার্‌ব না মা! ওখানে বিনোদ বাবু বসে আছেন যে? তুমি গোবিন্দকে বল, মা-লক্ষীটি।"

রমানাথ বল্লে, "আজ আমরা উঠি পিসিমা, বিনোদকে একবার সব পাড়াটা দেখিয়ে আনি।" "আচ্ছা, তবে ওরেলা একবার দু'জনে আসিস্। তখন কমলার বিয়ের সব কথা হবে বুঝ্‌লি রে?" "আচ্ছা আস্‌ব" বলে' তারা উঠে গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আলো ও ছায়া

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

কল্পনা পলায়ে যায়, স্বপ্ন ভরে বেদনায়,
স্মৃতি সেও অন্ধকারে হ'য়ে আসে ক্ষীণ;
দিন তাই দীর্ঘ লাগে, দিবাকর-অনুরাগে,
ঘর যে করিতে চাই আলোকে বিলীন।

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রী কামিনী রায় বি-এ

১৯১২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া কিছুদিন কলিকাতা থাকিয়া রাজারিবাগে আমার কাছে আসিলেন। এখানে মহিলা শিল্প-সমিতির সম্পাদিকার বিশেষ আগ্রহে তিনি স্বামীর মহিলাগণের নিকট তাঁহার ইয়োরোপ যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তাহাতে ইংরাজ নারীদের সান্ধ্য পরিচ্ছদ (evening dress) ও নৃত্যাদি তাঁহার ভাললাগে নাই, সুরুচিসঙ্গতও মনে হয় নাই। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে যে অত্যধিক ইংরাজানুকরণ-স্পৃহা দেখা দিয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমার অনুরোধে তিনি তাঁহার পথের ও প্রবাসের একটি ধারাবাহিক বিবরণ লিখিতে স্বীকৃত হন, এবং অল্প কিছু লিখিয়াছিলেন। বহু তো কেহও লিখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার কাগজপত্র সম্প্রতি যাহা পাইয়াছি তাহা অল্প এবং অসম্পূর্ণ। একটি ধূপ্তান মহিলার যে বিবরণ দিয়াছেন স্থানান্তরে তাহা উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

নবেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে আমি তাঁহাকে ও আমার পুত্রগণকে লইয়া সুবর্ণরেখা প্রপাত বা ঘড়্ ফল্স্ দেখিতে গিয়াছিলাম। এই যাত্রাটি আমার স্মৃতিতে গভীর রেখা-পাত করিয়া গিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে, ১৮৯০ সনের বড়-দিনের ছুটীতে যখন নর্ম্মদা-প্রপাত দেখিতে যাই, তখন যামিনীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। ১৯০৯ সনে স্বাস্থ্য-সোধনের জন্য উভয়ে একত্র পুরীধামে ছিলাম। তথা হইতে একসঙ্গে ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি এবং কন্যা হইতে চিল্কা হ্রদ দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রাচীন তীর্থস্থান, প্রকৃতির মহান্ ও সুন্দর দৃশ্য এবং মানবের সৌন্দর্য্যময় শিল্প-সৃষ্টি প্রিয়জনের সহিত একসঙ্গে দেখিবার আনন্দ যে কি, তাহা জানিয়াছি। এবার মনে উৎসাহ থাকিলেও আমার দেহে পূর্ব্বের বল ছিল না; প্রপাত দেখিয়া যামিনীও তেমন বিস্ময় ও আনন্দ-প্রকাশ করেন নাই, যেমন তেইশ বৎসর পূর্ব্বে নর্ম্মদা প্রপাত দেখিয়া করিয়াছিলেন। ইহার এক কারণ, ইতিমধ্যে নেপালের পথে তিনি অনেক ভীষণ ও সুন্দর প্রপাত দেখিয়াছেন। সে যাহা হউক, ছেলেদের এই দর্শনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইতে পারিলাম এবং যামিনীকেও সঙ্গে পাইলাম ইহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু এই আনন্দ সহসা আতঙ্ক ও বিষাদে পরিণত হইল। ঘড় হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আমার পুত্র অশোক পীড়িত হইল। যামিনী অতি অল্পক্ষণ দেখিয়াই রোগ Appendictis বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং তখনকার Civil Surgeon Major Stevensকে ডাকিতে বলিলেন। তিনিও যামিনীর সহিত একমত হইলেন। উভয়েই বলিলেন, এবারকার মত বাধা ভাল হইয়া গেলেই অবিলম্বে অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক। যামিনী আরও বলিলেন —দ্বিতীয়বারের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিবেন না, দ্বিতীয়-বারে এ রোগের আক্রমণ বিপদ্জনক হয়। যামিনী এবার ইহাকে সুস্থ দেখিবার পরই কলিকাতা গেলেন, মেজর ষ্টিভেন্সও তখন হইতে গয়া বদলী হইলেন। আমি বড়-দিনের ছুটিতে ছেলেদের লইয়া কলিকাতা আসিলাম এবং অস্ত্র করিবার জন্য কোন প্রবীণ বাঙ্গালী সার্জ্জনকে ডাকিয়া অশোককে পরীক্ষা করাইলাম। তিনি বলিলেন—আমি এপেণ্ডিসাইটিসের কোন চিহ্নই পাইতেছি না; কেন এত-বড় একটা অপারেশনের ঝুঁকি লইতেছেন?—যামিনী আমাকে একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"Rotunda Hospitalএ থাকিতে একবার একটি রোগিণী এই রোগ আছে কিনা পরীক্ষা করাইতে আসে। অধ্যাপক আমাকে বলিলেন—ইহাকে পরীক্ষা করুন।—আমি পরীক্ষা করিয়া

বলিলাম—হাতে তো কিছু ঠেকিতেছে না। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা Chloroform দেওয়াইয়া দেখুন দেখি?—Chloroform করাইবার পর পেট যখন শিথিল হইয়া পড়িল, তখন পেট টিপিয়া Appendix পাইলাম।"—এই কথা মনে থাকাতে আমি ডাক্তারকে বলিলাম—"যামিনী তো বলেছেন, কোন কোন সময়ে হাতে ধরা না পড়লেও, Chloroform দেবার পর Appendicitis হয়েছে কি না ধরা পড়ে।" প্রবীণ ডাক্তারটি বলিলেন—"আমি ওর প্রত্যেক স্নায়ু হাতে অনুভব করছি I can feel his every nerve' এখন তো কিছু নাই। যদি আবার হয় আমি এসে অস্ত্র করব।"—বয়সে ও অভিজ্ঞতায় জ্যেষ্ঠ (Senior) বলিয়া যামিনী তাঁহার মুখের উপর কিছু বলিলেন না। আমারও দ্বিরুক্তি করিবার পথ রহিল না। কিন্তু চারি মাস পরেই অশোক অসহ্য বেদনায় আক্রান্ত হইল। যামিনীকে সংবাদ দেওয়া হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ সার্জ্জনকে সঙ্গে লইয়া তিনি হাজারিবাগে আসিলেন বটে কিন্তু অস্ত্রপ্রয়োগের পর দেখা গেল বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে (It was too late); ইতিমধ্যে ভিতর এমন পাকিয়া গিয়াছে, আর কিছু করিবার সাধ্য হইল না। কর্ত্তিত অংশ সেলাই পর্য্যন্ত করা হইল না, কোনরকমে ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখা হইল। অস্ত্রপ্রয়োগের পর দুই রাত্র এক দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বালক প্রাণত্যাগ করিল।

যাঁহারা নিয়তি বা বিধিলিপি বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলিবেন যাহা হইবার ছিল হইয়াছে। কিন্তু যথাকালে অস্ত্রপ্রয়োগ হইলে হয়তো এ শোক-ঘটনা ঘটিত না, এই চিন্তা আমার মন হইতে আমি একেবারে দূর করিতে পারি নাই। এ বিষয়ে আরও একটি পুরুষ ডাক্তার দায়ী ছিলেন। তিনি হাজারিবাগের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন। প্রথম দিনে তাঁহাকে ডাকা হয়, কিন্তু সেদিন তিনি ও আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সহরের বাহিরে কোন 'কেসে' গিয়াছিলেন। সারা রাত্রি বালকের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া, অগত্যা ডাবলিন মিশনের মহিলা ডাক্তার কুমারী জেলেট এম. ডি'কে ডাকিলাম। তিনি বলিলেন—অবিলম্বে অপারেশন আবশ্যক। তিনি সেখানে থাকিতে থাকিতেই সিবিল সার্জ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রোগী দেখিয়া বলিলেন—"না, তত খারাপ নয়: বেশী বাড়াবাড়ি কেমন থাকে; বোধ হয় অপারেশন দরকার হবে না।" ডাক্তার জেলেট তাঁহার নিজের 'কেস্' নয় বলিয়া, ডাক্তারদের রীতি (etiquette) অনুসারে চুপ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা প্রথম দিনই কলিকাতায় রোগের সংবাদ দিয়া সার্জ্জন ঠিক করিয়া যামিনীকে প্রস্তুত থাকিতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, এদিন জানাইলাম, সিবিল সার্জ্জন মনে করেন operation অনাবশ্যক। একজন Sub-assistant Surgeonকে সর্ব্বক্ষণ কাছে রাখা হইল, অবস্থা বুঝিয়া Civil Surgeonকে খবর দিবার জন্য। সন্ধ্যার পর অবস্থা আরও খারাপ হইল, Civil Surgeon খবর পাইয়াও আসিলেন না, পূর্ব্বমত ঔষধ দিতে বলিয়া পাঠাইলেন—সেদিন নাকি ক্লাবে নাচ ছিল। পরদিন প্রত্যূষে, সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসককে লইয়া অবিলম্বে রওনা হইবার জন্য যামিনীকে তার করা হইল। ওখানকার খেতাঙ্গ সিবিল সার্জ্জনটি অস্ত্রব্যবহারে সুদক্ষ ছিলেন না, তাঁহার বাঙ্গালী এসিষ্টাণ্টটি তখনও ফেরেন নাই, সেই জন্যই অপারেশন অনাবশ্যক বলিয়াছিলেন। তিনি আপনার অযোগ্যতা স্বীকার করিলে একদিন আগেই কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনা যাইত, অথবা তিনি ডাক্তার কুমারী জেলেটকে সহকারিণী রূপেও পাইতে পারিতেন। অনেকেই পুরুষ ডাক্তার হইতে নারী ডাক্তারদের হীন মনে করেন। কিন্তু আমি হাজারিবাগের দুইটি নারী চিকিৎসক Miss Omeara M.D. এবং Miss Eva Jellet M.D. (ইনি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও গ্রন্থকার Dr. Jelletএর নিকট-সম্পর্কিতা) এবং আমার ভগিনী যামিনীকে অনেক পুরুষ ডাক্তার হইতে চিকিৎসায় এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি। ইহাদের দায়িত্বজ্ঞান ও করুণা ইহাদিগকে রোগীর সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হইতে দেয় নাই। অবান্তর কথা হইলেও নারী আমি, এই নারী চিকিৎসকত্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশের এই সুযোগ গ্রহণ করিলাম।

যামিনী অশোকের শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে যে 'অশোকস্মৃতি' পঠিত হয় তাহা তাঁহারি রচনা।

কিছুকাল স্বাধীনভাবে 'প্রাক্‌টিস' করিবার পর যামিনী Women's Indian Medical Service-এ চাকরী পাইয়া কলিকাতা Dufferin Hospital-এ অস্থায়ীভাবে কাজ করিতে লাগিলেন।

সমান যোগ্যতা সত্ত্বেও, এমন কি অধিকতর যোগ্যতা থাকিলেও, ইংরাজ বা ইয়ুরেশীয়ানদের সমান পদ, সমান সুখ-সুবিধা ও সম্মান ভারতীয়দের ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। অন্যদিকে দোষ-ত্রুটি ও অযোগ্যতা শ্বেতবর্ণের গুণে অনেক সময়েই মার্জ্জনা লাভ করে। তাই যখন ১৯১৪ সনের জুন মাসে কোন বিশেষ প্রতিকূল কারণে আগ্রার নারী হাসপাতালের তিনটি ইংরাজ নারী ডাক্তারকে বদলী করা নিতান্ত আবশ্যক হইল, শাস্তির বাপদেশে তাঁহাদের কেহবা সিমলা পাহাড়ে কেহবা অন্যত্র প্রেরিত হইলেন। আর সেই নিদারুণ গ্রীষ্মে যামিনীকে আগরা গিয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতে হইল। কিছুকাল একলাই তাঁহাকে তিনজনের কাজ সারিয়া লইতে হইতেছিল। কিন্তু মাস ছয় পরে যখন পূর্ব্বের গোলমাল মিটিয়া গেল, ডিসেম্বর মাসের দুঃসহ শীতে যামিনী সিমলায় প্রেরিত হইলেন; পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ কন্যারা আগরা ফিরিয়া বড়-দিনের উৎসব করিলেন।

আগরা বাসকালে দরিদ্র রোগিণীরা শতমুখে তাঁহার গুণ গাহিয়াছে এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। সহযোগিনী ইংরাজ মহিলা থাকিলেও সকলে 'শাড়ীওয়ালী ডাংদারিন সাহেবকে' চাহিত! কারণ, যতই ঘৃণাকর রোগ ও কষ্টকর চিকিৎসা হউক, এই শাড়ী-পরিহিতা তাহাদের স্বদেশিনী 'ডাংদারিন'কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না, তুচ্ছ করিতেন না, বরং রোগ যত অধিক কষ্টকর হইত দরদে তাঁহার হৃদয় তত অধিক আর্দ্র হইত। রাত্রে ঘুরে যাইতে হইলে, আগেই, কত টাকা দিবে বলিয়া দামদস্তুর করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। উপযুক্ত ফী দিতে অক্ষম জানিলে অনেকের কাছে তিনি টাকা লইতেন না, অন্য কিছু দিলে ফিরাইয়া দিতেন, কিছু লইতে কাতরে অনুরোধ করিলে, হাসপাতালের কোন আবশ্যকীয় আসবাব ক্রয়ের জন্য তাহা লইয়া হাসপাতালের নামে জমা করিতেন। এইরূপে একটি ভাল অপারেশন টেবিল ক্রয় করা হয়।

সিমলায় আসিয়া দেখিলেন রিপন হাসপাতালের নিকট তাঁহার বাসের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ হাসপাতালের নিকটেই তাঁহার থাকা আবশ্যক। ঐ হাসপাতালের নীচের তালায় দুইটি কামরা বহুকাল হইতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল. তিনি সেই দুইটীকে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। প্রায় নয় মাস কাল এইভাবে কাটিবার পর, কেন ঠিক বলা যায় না, তিনি Inspector General of Hospitals and Civil Surgeon-এর বিদৃষ্টিতে পড়িলেন। তাঁহার নামে এক বিদ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হইল, যে, তিনি বিনা অনুমতিতে হাসপাতালের অংশ বিশেষ অবথা অধিকার করিয়া হাসপাতালের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও কার্য্যের ক্ষতি করিয়াছেন। ইহার উত্তরে তিনি জানাইলেন যে তাঁহার পূর্ব্ব বর্ত্তিনীর আমল হইতে হাসপাতালের ঐ অংশ অব্যবহৃত পড়িয়াছিল। সেখানে কোন কাজ হইত না বলিয়া তিনি উহা নিজের ব্যবহারে লাগাইয়াছেন। তাঁহাকে ঐ প্রকোষ্ঠ দুটি ছাড়িয়া দিতে হইলে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিনীকে বাড়ী ভাড়া বাবত অতিরিক্ত ১০০৲ টাকা দেওয়া হইত, অতএব তাঁহাকেও অন্যত্র থাকিবার জন্য ১০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হউক, যদি তাহা না হয়, তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করা হউক। বস্তুতঃ তিনি যে রকম হীন আবাসে আছেন তাহা Women's Indian Medical Service-এর কোন মহিলার যোগ্য নহে।—বাড়ীভাড়া বাবত ১০০৲ টাকা মঞ্জুর হইল না। তাঁহার বদলীর ব্যবস্থা করা যাইবে এই আশ্বাস দেওয়া হইল। হাসপাতালের জন্য একজন মেট্রনের নিয়োগেরও আবশ্যক তাহা যামিনী জানাইয়াছিলেন, সেজন্য মেট্রন ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইল।

আসল কথা বোধ হয় এই, যে, একজন বাঙ্গালী নারী সিমলার মত বড় রাজপুরুষের বাসস্থানে, নারী হাসপাতালের অধ্যক্ষতা করেন, ইংরাজ মহলের উচ্চপদস্থ ও প্রভাব শালী কোন কোন ব্যক্তির তাহা মনঃপূত হয় নাই। যামিনীর অথবা বড়মানুষ খুঁজিয়া মেলা-মেশা ও প্রিয় হইবার চেষ্টা একেবারেই ছিল না; হাসপাতালের সুব্যবস্থা ও রোগীর চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য

জানিতেন। একবার লাডি পাঞ্জাবের ছোটলাট-পত্নী লেডী ওডোয়ার হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিবার পর, যামিনী হাসপাতালের কোন কোন অভাব জ্ঞাপন করেন ও সে সকলের সুব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। সিমলার সিবিল সার্জ্জন মহাশয় ইহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। তিনি মনে করিলেন তাঁহাকেই প্রথমে জানান উচিত ছিল। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া, এ যেন তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইল। এদিকে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী মহলে যামিনীর প্রতিপত্তি ও লোকপ্রিয়তাও তাঁহার বিশেষ ভাল লাগে নাই।

যাহা হউক, যামিনী অগত্যা অন্তর বাড়ীভাড়া করিয়া হাসপাতালের উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইলেন। চিকিৎসার্থীর সংখ্যার বৃদ্ধি বশতঃ স্ত্রীদের হাসপাতালের জন্য একটা নূতন ব্লক তৈয়ার হইল।

ডাক্তারের বাসস্থানেও নূতন হইল। কিন্তু সব রকমের যখন সুবিধা ও সুব্যবস্থা হইল,যখন সহরবাসীরা তাঁহার সুখ্যাতিতে মুখর, তখন শীতপ্রধান সিমলা শৈল হইতে তাঁহাকে সিন্ধুপ্রদেশের গ্রীষ্মপ্রধান শিকারপুর নামক স্থানে বদলী করা হইল এবং একজন ইংরাজ মহিলা তাঁহার স্থানে আনীত হইলেন। হাসপাতালের উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের প্রশংসাটা এই নবাগতাকে দিবার সুবিধা হইতেছিল, কিন্তু সমারোহ পূর্ব্বক নূতন ব্লক খুলিবার দিনে বড়লাট-পত্নীর ও সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, এই হাসপাতালের উন্নতিকল্পে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তিনীই ধন্যবাদের পাত্রী। বড়লাট-পত্নী (Lady Chelmsford) চুপি চুপি কোন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়াকে বলিতেছিলেন,—এতবড় হাসপাতালের পরিচালনের যোগ্যতা কিন্তু ভারতীয়াতে সম্ভব নহে। নবাগতা ডাক্তার মহিলা ও উক্ত সম্ভ্রান্ত ভারতমহিলা উভয়ের সহিতই আমার পরে আলাপ হইয়াছে, তাই এই সব সংবাদ পাইয়াছি। এই সময়ে আমি সিমলায় বাস করিতেছিলাম।

একবার যামিনীকে করাচি পাঠাইবার কথাও উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানে ডাক্তারের বাড়ির পশার খুব বেশী, সুতরাং ইংরাজ সমাজেরই সেখান প্রাধান্য। দিল্লীতে নারীদের জন্য যে মেডিকেল কলেজ খোলা হইল কলিকাতা ডাফরিণ হসপিটালের ভূতপূর্ব্ব লেডী ডাক্তার অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন; শিক্ষাদাত্রী (Lecturer) রূপেও যামিনীর সেখানে স্থান হইল না।

শিকারপুরের ভীষণ গরম যখন অসহ্য হইল এবং শরীরে অনেক ফোড়া হইয়া কষ্ট পাইতে লাগিলেন, তখন একবার ছুটী লইলেন এবং সেণ্ট্রাল কমিটিতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে আর ছয় মাসের মধ্যে বদলী না করিলে তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। তখন তাঁহাকে পুণা পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। ইতিপূর্ব্বে পুণার লেডী ডাক্তার ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার সেন তাঁহার স্থানে আসিতেছেন শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটীর আবেদন প্রত্যাহার করিলেন। এই বঙ্গনারীর চিকিৎসানৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তার কথা অনেকেই শুনিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি বেলার প্রদেশে বেতিয়ার হাসপাতালে প্রেরিত হইলেন। এখানে তিনি আরামেই ছিলেন, কিন্তু এখানে কাজ বেশী না থাকাতে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে যামিনী নিয়মিতরূপে তাঁহার দৈনিক চিন্তা বা কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার অবসরও বড় একটা মিলিত না। কিন্তু দেখিতেছি, শিকারপুর থাকিতে অনেক মিহা কাগজের একখানি প্রকাণ্ড খাতা করিয়া তাহাতে দৈনিক মন্তব্য লিখিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। খাতাখানির প্রথম পৃষ্ঠায় সর্ব্বোপরি লিখিত—**কেহ খুলিবেন না।** তাহার নীচে নিজের নাম এবং তাহারও নিম্নে Teach me to live শীর্ষক একটি ইংরাজী কবিতা উদ্ধৃত।

Teach me to live! 'T is far easier to die,
Gently and Silently pass away
On earth's long night, to close the heavy eye
And waken in the glorious realms of day,

Teach me the harder lesson—how to live,
To serve Thee in the darkest paths of life,

Arm me for conflict new, fresh vigour give
And make more than conqueror in the strife.

Teach me to live. Thy purpose to fulfil.
Bright for Thy glory let my taper shine.
Each day renew, remould this stubborn will,
Closer round Thee my heart's affections twine,

Teach me to live and find my life in Thee
Looking from earth and earthly thing away.
Let me not falter, but untiringly
Press on and gain new strength and power each day.

এই কবিতাটির মধ্যে তাঁহার অন্তরের নিভৃততম প্রার্থনার প্রতিধ্বনি ছিল, সেই জন্যই ইহাকে খাতার উপরে স্থান দিয়াছিলেন।

শিকারপুরে দুই দিন এবং বৎসরকাল পরে মেডিয়ায় মাত্র একদিন ইহাতে লিখিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন তাহাও জানাইয়াছেন। ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরের আর একটু ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম করিবার জন্য কেমন উন্মুখ হইয়া থাকিতেন, স্বদেশের অশিক্ষিতা রোগপীড়িতা নারীদের জন্য তাঁহার কত মমতা, কত দরদ ছিল, তাহাদের জন্য খাটিয়া কত আনন্দ পাইতেন, তাহাদের জন্য স্থানবিশেষে আরব্ধ কর্মের পূর্ণফল দেখিবার সুযোগ না পাইয়া কিরূপ মর্মাহত হইয়াছিলেন, সে সকলের আভাস ইহার ভিতরে আছে, তাই ইহা সমগ্র উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা সাহিত্য হিসাবে দেখিবার নয়, সে ভাবে লেখাও হয় নাই। ইহা অপরের দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহা তিনি ক্ষণেকের জন্যও মনে করেন নাই। তাই গোপনীয় না হইলেও ইহা উদ্ধৃত করিতে আমার মন এবং হস্ত একটু সঙ্কুচিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহাকে পরিচিত করিবার জন্যই এই অপূর্ণ বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, যদি এতৎসম্পর্কে আমার অপরাধ ঘটে একান্ত অন্তরে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করি।

শিকারপুর থাকাই কর্তব্য, কি না থাকা, এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই তিনি স্থির করিয়াছিলেন প্রতিদিন থাকার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত যুক্তি মনে উদয় হইবে সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অবশেষে গুণিয়া দেখিবেন কোন্ পক্ষে যুক্তি অধিকতর হইল এবং সেই অধিকতর যুক্তির অনুযায়ী কাজ করিবেন।

যামিনীর যে লেখাটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে হাসপাতালের উন্নতির উল্লেখ আছে। যামিনী ১৯১৬ সনের মে মাসে শিকারপুর যখনী হন। ঐ বৎসর জুলাই মাসে সেন্ট্রাল কমিটীর সেক্রেটারী শিকারপুরের কলেক্টর ও স্থানীয় কমিটীর প্রেসিডেন্টকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

"সিমলা, ১৫ই জুলাই, ১৯১৬

সেন্ট্রাল কমিটী শুনিয়া অতীব সুখী হইয়াছেন যে ডাক্তার সেনের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন সংখ্যা এত অধিক বাড়িয়া গিয়াছে যে স্থানীয় কমিটী বর্তমান হাসপাতালকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিবার অথবা সম্পূর্ণ নূতন একটি হাসপাতাল নির্মাণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। আপনাদের কমিটী যখন ডাক্তার সেনের কার্যে এত সন্তুষ্ট তখন হয়তো তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া ওখানে থাকিয়া যাইতে সম্মত করিতে পারিবেন। আপনারা তাঁহাকে রাখিতে চাহিলে সেন্ট্রাল কমিটী কোন আপত্তি করিবেন না।

যামিনীর স্মৃতিলিপি হইতে উদ্ধৃত :

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭। শিকারপুর।

এবার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে মার্চ মাসে কাজ ছাড়িয়া দিব। কাজ ছাড়িবার ইচ্ছা এত বলবতী ছিল যে আমার প্রয়োজনীয় অনেক instrument ও কাপড় ইত্যাদিও বাড়ীতে ফেলিয়া আসি। বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে কাজকর্ম এত ভাল চলিতে লাগিল এবং প্রীয়ও না থাকাতে একটু একটু করিয়া এ জায়গা ছাড়িবার ইচ্ছা আমার চলিয়া যাইতে লাগিল। এখানকার হাসপাতাল অনেকদিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু এই নয় মাসে যত কাজ হইয়াছে এত কাজ কখনও হয় নাই। হাসপাতাল আশ্চর্য-রকম popular হইয়াছে। গত মাসে paying patientদের নিকট হইতে ১৩৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। দিন ২৲ টাকা ভাড়া দিয়াও ভদ্রলোকের বাড়ীর

স্ত্রীলোকেরা ঘর ভাড়া লইতেছে। ১৯১৫ সালে indoor patientদের সংখ্যা ছিল ২১৩, ১৯১৬ সালে ৩৭৮। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে maternity case সম্বন্ধে। ৪৩ জন রোগী ১৯১৫ সালে এখানে প্রসব হইতে আসে, কিন্তু ১৯১৬ সালে ৯৬ জন।

এখানে প্রসবের পর অধিকাংশ স্ত্রীলোকই septic হয়। মৃত্যু-সংখ্যাও খুব বেশী। আমি এই অল্পদিনের মধ্যেই ইহাদিগকে মৃত্যুর কারণ বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি। শিকারপুরের হুমঈদের জন্য এই নয় মাস আমি যেমন খাটিয়াছি তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের বিশ্বাসভাজনও হইয়াছি। আরও কিছুদিন থাকিলে হয়তো ইহাদের আরও কিছু উপকার করিতে পারিব, এই বিশ্বাসে আমার থাকা প্রার্থনীয় একথা কখন কখন মনে হয়। এখানে থাকার দিক হইতে আরও এক কথা বলা যায়।—যেখানেই যাই না কেন, ইংরাজ থাকিবেই, এবং যেখানে ইংরাজ সেইখানেই অবিচার ও অন্যায় influence। শিকারপুরে ইংরাজ নাই সেটা একটা খুব বড় সুবিধা। এই তো গেল এখানে থাকার পক্ষে। সিমলার কথা মনে হইলেই bitterness আসে। থাকার বিপক্ষেও অনেক কথা বলা যায়—

(১) বাঙ্গলা দেশ হইতে এ জায়গা এত দূরে।

(২) ভাষা না জানাতে, কতটা কাজ করা উচিত (অর্থাৎ সভা ইত্যাদি করিয়া) তাহা হইয়া উঠে না। তর্জ্জমা ইত্যাদি করাইতে অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হয়। হয়তো অন্য জায়গায় ইহা অপেক্ষা বেশী কাজ হইত।

(৩) হাসপাতালটাকে আমি এত popular করিয়া দিয়াছি যে, আমি চলিয়া যাইবার পরেও লোকে হাসপাতালে আসিবে। সুতরাং আমার কাজ বিফল হইবে না।

(৪) হাসপাতাল ছোট থাকার দরুণ, আমি যাহা করিয়াছি ইহার চেয়ে বেশী কাজ আর আপাততঃ করিতে পারিব না। নূতন হাসপাতাল তৈয়ার হইতে অন্ততঃ এক বৎসর দেড় বৎসর লাগিবে।

(৫) গ্রীষ্মের সময়কার অসহ্য গ্রীষ্মে আমার শরীর টিকিবে কি না?

(৬) চাকর-বাকরের কষ্ট অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি নিজের মন গত পাঁচ মাসে তো ঠিক করিতে পারিলাম না, কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে ঠিক করাই চাই, সেই জন্য মনে মনে সংকল্প করিয়াছি যে এই এক মাস প্রতিদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া দিনের শেষে সেদিনকার মত এ স্থানে থাকা অথবা পরিত্যাগ করা ইহার মধ্যে যাহা উচিত মনে হইবে সেটা লিখিয়া রাখিব এবং পরে কতটা থাকার পক্ষে ও কতটা বিপক্ষে তাহা গণনা দ্বারা যাহার সংখ্যা বেশী হইবে সেই অনুসারেই কাজ করিব। যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছি তাহা ছাড়া আরও দুইটি কারণ আমাকে influence করিতেছে। একটা, মৌলবী সাহেবের অনুরোধ, লক্ষ্ণৌ গিয়া তাঁহার স্কুলের সাহায্য করা, দ্বিতীয়, ডাক্তার বসুর lecture যে আমি জীবনের যতটা উচিত ততটা সদ্ব্যবহার করিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন:—

You can do a lot of good if you want. You always keep yourself in the background. But India wants workers, specially women. If ladies like yourself come forward, we shall soon have things different from what it is at present. If you do not mind, I may tell you that you have no right to waste the gifts that have been given to you. Every one's gifts are public property to be utilised for the good of the public and the needy.

আমি তো জীবনের সদ্ব্যবহারই করিতে চাই, কিন্তু কি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইবে সেইটাই বুঝিতে পারিতেছি না।

আরও চাই—To feel myself directed pardoned and sustained by the Supreme Power, to feel myself in the right road, at the point where God would have me be in order with himself and the universe. This faith gives

strength and calm. I have not got it. All that is, seems to me arbitrary and fortuitous. It may as well be as not be. Nothing in my own circumstances seems to be providential. All appears to me left to my own responsibility and it is this thought that disgusts me with the government of my own life.

Amiel's Journal.

কোন্ পথ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত পথ তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

প্রভো, তোমার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। প্রতিদিনই পথের উদ্দেশে তোমার কাছে কাতর প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

আজ শিকারপুর ছাড়িবার দিকেই মনটা বেশী ঝুঁকিতেছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী। কাল রাত্রে এই খাতাতে মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিতে প্রায় সাড়ে দশটা বাজিয়া যায়। আমি ১১-টায় লিখিতে বসি।

ঘুম ভাল হয় নাই; ঘুমের ভিতরেও বোধহয় এখানে থাকা উচিত কি উচিত নয়, এই কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়াছে, কেন না, সকালে ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্রই মনে হইল যেন শিকারপুর ছাড়িবার সব বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এই-রূপ মন লইয়াই হাসপাতালে যাই। হাসপাতাল হইতে একটার পর ফিরি। ২ টার সময় Mr. Moyseyর চিঠি পাইলাম। তাহাতে হাসপাতালের জন্য তিনি চেষ্টিত আছেন শুনিয়া একটু ভাল লাগিল। শিকারপুরের স্ত্রীলোকদের জন্য দুঃখ হয়। আমি জানি যে আমি এখান হইতে চলিয়া গেলে কেহই আমার মত ইহাদের জন্য feel করিবে না। আমার স্বভাব একটু অনন্যসাধারণ, অন্য লোকেরা নানারকমে জীবন enjoy করে, আমার কিন্তু কাজের কথা ছাড়া আর কিছুতেই প্রবৃত্তি নাই। সেই-জন্যই আমি সফলকাম হই।

আজ সকালে সিমলার কথা খুব মনে হইতেছিল। এক বৎসর চারিমাস ক্রমাগত কেমন করিয়া হাসপাতালের উন্নতি করিব এই চিন্তা এই চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করি নাই, ফলে হাসপাতালকেও popular করিলাম। কিন্তু তাহার ফল কি হইল?

পরবর্ত্তী প্রায় এক বৎসর পরের লেখা—

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮, বেতিয়া।

একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমার আর বদলী সম্বন্ধে কিছুই করিতে হয় নাই! ২৮শে ফেব্রুয়ারী Dr. Balfour শিকারপুরে আসেন। তিনি আপনা হইতেই বেতিয়া বদলী হইবার সংবাদ দিলেন। এখানে বদলী হওয়াটা পরমেশ্বরেরই অভিপ্রেত ছিল। পথে মৌলবী সাহেবের মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। আসিবার অর্থাৎ শিকার-পুর ছাড়িবার পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া রওনা হইতে বলিয়াছিলেন। লাহোরেই তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার স্কুলের কাজে লাগিব এই কথা ছিল। কিন্তু তিনি তো ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন যাঁহাদের হাতে স্কুল আছে তাঁহারা কিছু না বলিলে আমি কি করিব? কাহার উপর স্কুলের ভার তাহাও জানি না। সেখানে যাওয়া কি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে? এক বৎসর এখনও বাকী আছে, দেখি কি হয়। U. P. তে বদলী হইবারও তো চেষ্টা করিয়াছি, কিছুই তো হইল না।

এখানে তো তেমন কিছু কাজ করিতে পারিতেছি না। বৃথাই সময় নষ্ট হইতেছে।

Those also serve who stand and wait. আমি ও কি হুকুমের জন্য অপেক্ষা করিতেছি? এখানে তেমন কিছু কাজ যে হইবে তাহাও মনে হয় না।

বেতিয়াতে বাসস্থানের, আরামের এবং বিশ্রামের সর্ব্ব-প্রকার সুব্যবস্থা ছিল। যাহা সাধারণের বিশেষ বাঞ্ছনীয় তাহাই একটা অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল।

উক্তাংশে 'মৌলবী সাহেবের' উল্লেখ আছে। ইনি ছিলেন একজন নারীহিতৈষী সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ইঁহার পুরা নাম সৈয়দ কেরামত হোসেন। যখন ভগিনী প্রেমকুসুম বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়া এলাহাবাদে Cross Thwaite Girls' Schoolএর প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন, এই প্রবীন মৌলবী সাহেব তখন ঐ স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। এবং বোধ হয় সেইখানেই একবার নেপাল যাইবার পথে যামিনীর সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ-পরিচয় হয়। ইনি পূর্ব্বে ব্যারিষ্টার ছিলেন পরে হাইকোর্টের জজ হন।

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারকে মৌলবী সাহেব তাঁহার নারীবিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য Women's Indian Medical Serviceএর চাকরী ছাড়িয়া আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং আহূত ব্যক্তিও যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, স্মৃতি-লিপিতে ইহা পাঠ করিয়া প্রথমতঃ আমার একটু বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলাম। স্বদেশের নারীজাতির কল্যাণার্থ নিবেদিত এই জীবন চিরদিনই জীবন-দেবতার অঙ্গুলি-সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় থাকিত। কোন্ পথে, কি ভাবে তাহার শিক্ষা, শক্তি ও সামর্থ্য সার্থক হইবে সে সকল নির্ণয়ের ভার এবারেও তাহার অধিকারপীড়িত ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত নিজের উপর রাখিতে চাহে নাই। বিশেষতঃ নারী-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও অধ্যাপনাদির সহিত চিকিৎসা কার্য্যের স্বভাবতঃ কোন বিরোধ নাই, কেবল অর্থাগমের সম্ভাবনাই ছিল কম।

(ক্রমশঃ)

সন্ধ্যামালতী

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পূরবী বায় লাগ্‌ল দোলা
ভোরের বেলা,—
শিউলী-বনে অম্‌নি সুরু
ভোরের খেলা।
শিশির-ধোয়া বোঁটার গায়ে
ফুট্‌ল কলি ডাইনে-বাঁয়ে,
ফুট্‌ল না সে—দেখ্‌ল নাক'
ভোরের মেলা!
শিউলী-বনে সাঙ্গ হ'ল
ভোরের খেলা।

দুপুর বেলা বস্‌ল সভা
কুঞ্জবনে,
শতেক মধুপ আস্‌ল ছুটে'
গুঞ্জরণে।
সভা ত' নয়—শোভার নগর।
অপ্‌রাজিতা, জবা, টগর
রাশি রাশি উঠ্‌ল হাসি'
যুঞ্জরণে!
দুপুর বেলায় ফুট্‌ল না সে
কুঞ্জবনে।

বিকেল বেলা নিশীথ-রোদের
রঙীন ছায়ায়
গোধূলিকা গানের সুরে
গহীন মায়ায়!
রঙের লিখায় আকাশ ঘিরা—
দোপাটি আর করবীরা
দলে দলে ফুট্‌ল সবাই
রঙ-রাঙ্গিণী;
ফুট্‌ল না সে—মেল্‌ল না চোখ
অভাগিনী।

সন্ধ্যাবাতি নিবিল বেণুর
ঘুমুচ্ছে
বনে বনে শিথিল কুসুম
ঘুমুচ্ছে তখন।
ভাঙল না ঘুম চাঁদ যে গেল আঁধার'—
সমর তখন ঘুমিয়ে পড়ায়,
শিওরিলায়ে,—সঙ্গিনী মোর
বন্ধ বিরলে
কহিল সে মোর সাঁঝের
গগন-তলে।

"ভুল শুনেছ,"—কয় সে চুপে
আমার কানে,
মোর আরতি
ভুবন পানে ঃ—
রূপ্ লালসায় চাইনি বিলাস,
মধুপ-মাতন নয় অভিলাষ
অন্ধকারের ধ্রুব অভিসার
আমার প্রাণে

রাশিয়ায় নারী-জাগরণ

শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি-এল্

প্রাচ্য দেশসমূহের সর্ব্বত্রই নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে পুরুষেরা অনিচ্ছুক—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" এই বুলি ভারতে, তুরস্কে ও রাশিয়াতে সর্ব্বত্রই এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। রাশিয়াতে ও তুরস্কে দেশের শাসক সম্প্রদায় আইন ও জনমতের সাহায্যে নারীকে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত পরিমাণে মুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু "ভারত কেবল স্বপনে রয়।"

পাঁচ-সনা প্রস্তাব (five-year plan) রাশিয়ার জীবনযাত্রা-প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। কৃষি ও শিল্প গত তিন বৎসর প্রস্তাবানুযায়ী কাজের ফলেই উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ১০ গুণেরও অধিক বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে নারীরা কৃষিক্ষেত্রে সকাল হইতে সন্ধ্যা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেন কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফসল হইত না। পাঁচ সনা প্রস্তাবের ফলে নারীরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইতেছেন।

রাশিয়াতে পূর্ব্বে আমাদের দেশেরই মত খণ্ড খণ্ড জমিতে চাষ হইত, এখন জমির একত্রীকরণের (collective farming) ফলে চাষের সুবিধা হইয়াছে। Turkmenia, Mery ও Bairam Ali প্রদেশে মেয়েরা কলের লাঙ্গল চালাইতেছেন। ইহাতে মেয়েদের কার্য্যকারিতা ও আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে,—পুরুষেরা আর তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় ভারস্বরূপ মনে করেন না। "At first the peasants treated them with mistrust and disdain, but sometime after having seen them with their own eyes that these women knew their work they have been filled with genuine respect for them."

আমাদের দেশেও যেদিন নারীরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিবেন, পুরুষের অপেক্ষা দৈহিক বলে কম বলীয়ান হইলেও তাঁহারা কৃষিক্ষেত্রে সেদিন প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

প্রাচ্যের সর্ব্বত্রই গৃহশিল্পে নারী পুরুষের সহায়তা করেন। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেও অধিকাংশ গৃহ-শিল্পে যথা বস্ত্রবয়ন, শাঁখা তৈরী করণ অথবা বাসনের নির্ম্মাণ কার্য্যে মেয়েরা অল্প-বিস্তর পুরুষের সাহায্য করেন। রাশিয়াতে মেয়েরা ফেল্ট টুপী (felt cloaks); কার্পেট ও বস্ত্রবয়ন বহুদিবস যাবৎ করিয়া আসিতেছেন। রাশিয়ার নারীদের নির্ম্মিত Pendin ও Tekin কার্পেটের কারুকার্য্য অতিশয় সূক্ষ্ম ও সুন্দর। Soviet সরকার এই স্বাভাবিক কর্ম্মপটুতা শিক্ষার সাহায্যে আরো বর্দ্ধিত করিয়াছেন। মেয়েরা স্কুলে ও ফ্যাক্টরীতে হাতে কলমে গৃহশিল্প শিক্ষা করিবার সুযোগ এখন পাইয়া থাকেন। Soviet Year Book হইতে নিম্নোদ্ধৃত সংখ্যাগুলি এই কথার প্রমাণ দিবে। "According to the approximate calculation, there are now over 3500 women working in factories in Middle Asia, 2000 in Azerbaidjan, 1000 in Kazakstan, 3200 in Tartar Republic and so forth."

বাঙ্গালা দেশে মেয়েদের গৃহশিল্প শিক্ষার সুযোগ "সরোজ-নলিনী স্মৃতি-সমিতি" অথবা "নারীশিক্ষা সমিতি" ভিন্ন অন্য কোথাও আছে কিনা আমার জানা নাই। সরকারী শিল্প বিভাগের অধীনে শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে মেয়েদের বয়ন শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়াছি। এ বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

রাশিয়াতে নারীদিগের হস্তপ্রস্তুত দ্রব্যসমূহের বাজারে যাহাতে কাটতি হয় সেজন্য সমবায়-প্রণালীতে পরিচালিত দোকানও খোলা হইয়াছে। কেবল Turkmenia ও Azerbaidjanএই ১৭০০০ ও ৬০০০ নারী, সমবায়-সমিতির সভ্যা হইয়াছেন। বাঙ্গালার দুই একটি মাত্র নারী-সমবায়

দোকান টানা ও কলিকাতায় আছে। কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে নারীর কার্য্যকারিতা ও আয় বাড়িয়া যাওয়াতে আর নারীকে তাচ্ছিল্য করিতে পুরুষ সাহসী হয় না। কবে বাঙ্গালার মেয়েরা বিধা মর্য্যাদার অভিমান ত্যাগ করিবেন ?

আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য নারীসমাজের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের শাসনকার্য্যে মেয়েদের কোন কর্তৃত্বই ছিল না। বর্ত্তমানে বহু নারী গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রধান কর্ণধারী হইয়াছেন। Village Soviets বা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গ্রামের যাবতীয় কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন। বর্ত্তমানে Bashkiriaতে ১৫ জন, Uzbekistanএ ৩১৯ জন, Kazakstanএ ২১৩ জন, Tartar Republicএ ৮৪ জন এবং Daghestanএ ২০ জন মহিলা পঞ্চায়েৎকর্ত্রী (Presidents) আছেন এবং সমস্ত দেশে ১৫৮০ মহিলা এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। শুধু গ্রামে নহে, কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদেও একটি নারী সংসভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। Kazakstanএ একটি মহিলা Supreme Court of Justice—হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছেন। এইরূপ আরো শত শত উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। গত নির্ব্বাচন ব্যাপারে নারীদের উৎসাহ পুরুষকেও অতিক্রম করিয়াছে—"In the last election campaigns the participation of women in the Soviets' election even surpassed the activity of the male part of the population".

রাশিয়ায় সমাজিক পাপের অন্ত ছিল না। পর্দ্দা, বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহের ফলে লক্ষ লক্ষ নারীর জীবন দিনের পর দিন পিষ্ট হইতেছিল। ভূতের মত কালো বোর্-কা পরিয়া মেয়েরা রাস্তাঘাটে বেড়াইতেন, কোন কোন প্রদেশে পর্দ্দার অত্যাচার বড় বেশী ছিল। "In Bokhara, the former sacred city of Moslem scolasticism, where still 6 years ago, it was impossible to see one woman with her face unveiled." বোখারা প্রদেশে কোন নারীই পর্দ্দার বাহিরে আসিতেন না।

গৃহপালিত অন্যান্য জীবের মত বিবাহের বাজারে মেয়েরা বেশী মূল্যে বিক্রীত হইতেন। পূর্ব্ব-প্রদেশগুলিতে চাষের জন্য মজুর বেশী দরকার, কাজেই গৃহস্বামী বহু বিবাহ করিয়া একাধিক নারীর সাহায্যে চাষবাস চালাইতেন। বালিকা-দের ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যেই বিবাহ হইয়া যাইত। "The parents tried so sell their daughters earlier and more profitably. Girls were married to middle-aged or even to old men owing to the temptation of a big *Kalym*". এইরূপে বাল্যবিবাহ, অসমবয়স্ক নরনারীর বিবাহ ও সাহচর্য্যে বাড়মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর অন্ত ছিল না এবং উপ-দংশ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিও নারীকে ভোগ করিতে হইত।

Soviet শাসনকর্ত্তাগণ প্রথমেই অবরোধপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন—মোল্লা ও প্রাচীনপন্থী পুরোহিতের দল হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। নূতন আইন করিয়া বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয় প্রথা রহিত করা হইল। গত ৪।৫ বৎসর ঐ আইন-উল্লঙ্ঘনকারীদিগকে কঠোর দণ্ড-বিধান করা হইল। প্রথম দিনকতক প্রাচীনপন্থীরা গোল করিলেন পরে সব শান্ত হইল। "জাতি গেল," "ধর্ম্ম গেল", "সতীত্ব গেল" রব দুই দিনেই স্তব্ধ হইয়া গেল। "In all the bazars and mosques, the mullas and the kuluks shouted at the top of their voices about the "immorality and the godlessness of the Bolsheviks", about the Soviet' Govt. destroying the family propagating delaunch and so forth".

কত স্বামীর দণ্ড হইল, বহু নারীবিক্রেতার কারাবাস হইল, পাদরী ও পুরোহিত দণ্ডিত হইল, আর সেই নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া প্রচার ও আইনের সাহায্যে নরনারীর সমান অধিকার স্থাপিত হইল—নারীও যে আলো ও বাতাসের এবং স্বাধীন জীবনের উপযুক্ত অধিকারী এই মহাসত্য প্রতি-ষ্ঠিত হইল। কি করিয়া রাশিয়ার নারী অতি অল্পকালের

মধ্যে এই বিপুল যোগ্যতা লাভ করিলেন তাহার মূল রাশিয়ার জনশিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কেবল স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাশিয়ার নিরক্ষরতা দূরীভূত হয় নাই। এজন্য দেশময় মহিলাসমিতি বা ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল ক্লাবে আলোকচিত্র সাহায্যে অথবা বক্তৃতার মধ্য দিয়া সহজ ও সরল উপায়ে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইখানে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে এবং শিশুরাও যাহাতে মায়ের নিকটে বসে থাকিতে পারে তাহার জন্য শিশুরক্ষণাগার (Creches for children) এই সকল ক্লাবের নিকটে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৩০০০ হাজার নারী এই সকল clubs and corners-এ সহর ও মফঃস্বলে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া দেশের ও দশের কাজের যোগ্য হইয়া উঠিতেছেন।

Nomads বা সর্ব্বদা যাযাবর পর্ব্বতে পর্ব্বতে সঞ্চরণশীল নরনারীর জন্য লাল তাঁবু ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষা সহজ ও সুলভ করা হইয়াছে। পর্ব্বতপার্শ্বে যখন কসাক (Cossacks) নরনারীরা মেষপাল সহ বিশ্রাম করে তখন যাযাবর প্রদর্শনী তাহাদের সম্মুখে খোলা হয়। এই প্রদর্শনী মোটর লরী ও গোযানে বহন করা হয়। লাল তাঁবু বা Red yourtaতে পাঠাগার ও চিকিৎসালয় আছে। একজন শিক্ষক, একজন আইনজ্ঞ ও একজন ধাত্রী এবং চিকিৎসক ঐ সকল তাঁবুতে মোতায়েন থাকিয়া পার্ব্বত্য জাতিদিগকে শিক্ষা দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং প্রয়োজন হইলে বিচারক মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া দেন। Mr. E. Steinberg বলেন, "Most interesting in this respect are the socalled Red yourtas and kibitkas (nomad carts). and travelling cultural institutions which are working in remote villages. The Red yourta with a librarian, an instructor and a midwife is moving from village to village, from nomad camp to nomad camp. Here women are taught to read and write and newspapers are read to them. Very often a special judge is attached to such Red yourta, who considers the complaints of women and the cases of different social crimes. The midwife helps childbirths and at different gynocological illness."

এইরূপ আনন্দের মধ্য দিয়া রাশিয়ার জনশিক্ষা বিস্তার করা হইতেছে এবং উহার ফলে এই নারী-আগরণ সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যাযাবর্ প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য ডাঃ ডি, এন্, মৈত্র মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আগামী শীতকালে এই প্রদর্শনী খোলা হইবার কথা। গ্রামে গ্রামে আলোকচিত্র, বক্তৃতা, সঙ্গীত ও শিল্পপ্রদর্শনী মোটর লরীতে বহন করা হইবে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এই প্রবন্ধলেখক সরকারী কার্য্যকালে একবার নদীয়া জেলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এইরূপ একটি যাযাবর্ গোযান সাহায্যে বাহিত প্রদর্শনীর স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হিসাবে থাকিয়া দেখিয়াছেন যে ইহাতে পল্লীতে লোকশিক্ষা সহজ ও সুন্দররূপে হয়।

সংযোজনশীলা মহিলাসমিতিগুলিকে আরো ব্যাপক ভাবে লোকশিক্ষার ভার লইতে হইবে। নিন্দুক ও সমালোচকেরা এখন যতই কেন অপ্রীতিকর আলোচনা করুন না কেন একদিন সকলকেই ইহার সার্থকতা স্বীকার করিতে হইবে। রাশিয়াতেও বিস্তর বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া এই আন্দোলন সফল হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধৈর্য্য-সহকারে একদল সেবাপরায়ণা নারীকে এই লোকশিক্ষার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। রুশিয়াতে "...years of persistent work, of supreme heroism and enormous strain were necessary on the part of active women workers to achieve such results."

বাংলার মহিলাকর্ম্মীরা এই মহাদত্ত ভুলিবেন না—হাসাহাসি দ্বারা মহৎ কার্য্য হয় না—শ্রম ও ত্যাগ চাই।

বার্গ্‌সঁ-দর্শনে আর্য্য-চিন্তার দেখাসাক্ষাৎ

শ্রী অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী

চোখে যা দর্শন করা যায় দার্শনিক জ্ঞান প্রায়ই তা' নয়। বৃক্ষমানের অন্তরালে বস্তুর রহস্য থাকে। তার সেই আসল রূপ দর্শন মানুষের পক্ষে কতদূর সম্ভব? চোখে-দেখা মায়া-রূপের ওপারে যাওয়া যায় কি?—এই প্রশ্ন অধ্যাত্মজ্ঞানের সন্ধানীদের চিত্ত ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। ভারতবর্ষ তাঁর বিশিষ্ট চিন্তার প্রতিভা অনুযায়ী এর জবাব দিয়েছেন। এ দেশের সকল দর্শনই আধ্যাত্মিক চৈতন্য দ্বারা প্রাকৃতিক দ্বান্দ্বিবিলোপের সাধনা করেছেন। বৈশেষিক দর্শন বলেন, তত্ত্বজ্ঞান হ'তেই পরম শ্রেয় লাভ হয়। সাংখ্যও বলেন, তত্ত্বজ্ঞান থেকেই মুক্তি; সাংখ্যের তত্ত্ব কৌমুদী জ্ঞান অর্থে বুঝেছেন, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য বিষয়ে বিবেক: যোগদর্শনের সাধনপাদেও 'বিবেকখ্যাতি'র কথাই বলা হয়েছে। ন্যায়দর্শনের কথাও বাৎসায়ন ভাষ্যে ঐ একই ভাবে বিবৃত করা হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞান দিয়েই মিথ্যা-জ্ঞান নাশ করবে। বেদান্তদর্শন অতি পরিষ্কার বলেছেন, 'বিদ্যৈব ঐকান্তিকী কৈবল্য সিদ্ধিঃ'—তত্ত্বজ্ঞানীদের একান্ত-ভাবে 'কেবল'-এর অর্থাৎ absolute-এর সিদ্ধি অর্থাৎ realisation হয়। এই আর্য্য-দর্শনের প্রভাব Pythagoras, Socrates, Plato প্রভৃতি সকলের উপরেই প্রচুর পরিমাণে ছিল। Lassen প্রমুখ সমালোচক-গণ স্বীকার করেন, Neo-Platonism মতের উপর সাংখ্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। খ্রীক্, খৃষ্টান্ মরমী (Christian Mystics—Eckhart, Tauler প্রভৃতি), জার্মান—সব দর্শনই কম-বেশী বেদান্তের যুক্তচিন্তার সুরভিত নির্ম্মল বায়ু সেবন করেছেন।

তবুও যে-যার প্রতিভা ও স্বাধীন চিন্তা অনুসারেই সৃষ্টি ও প্রাণের অন্তর্নিহিত সত্তা অনুসন্ধান করেছেন। পশ্চিম পুথিবী নিজস্ব চিন্তার বলে এর মীমাংসায় এগিয়েছেন। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক Knut, স্বরূপ (thing-in-itself) দর্শনের প্রয়োজন খুব বেশীই অনুভব করেছেন। দৈহিক ও মানসিক ইন্দ্রিয়ের ঘনঘটা রূপ ছাড়া সত্যের সাদা চেহারা জানতে পাওয়া যায় কি না সেই খোঁজে হয়রান হ'য়ে জার্মান অধি কাতর কণ্ঠে বলেছেন—পেলাম না, সত্যের দেখা পাওয়া যাবেও না। কিন্তু দেশ (space), কাল (time) ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ (perception) ছাড়া নিরপেক্ষ (absolute) জ্ঞান যদি না-ই হ'লো তবে তাকে ত' ঠিক জ্ঞান বলা যায় না। Kant-এর পরবর্ত্তী খ্যাত-নামা দার্শনিকগণ এই গলদ সংশোধনের বা অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে মূল সত্তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। সেই নিরবলম্ব (absolute) সৎ (Truth), Flechte-এর মতে 'অহম্' (Ego); Hegel-এর মতে সমস্ত বিচারবুদ্ধি; Scho-penhauer-এর মতে নির্জ্ঞান ইচ্ছাশক্তি (unconscious will)। এই ইচ্ছাশক্তির অন্য এক রূপের উপাসক Neitzche. কিন্তু এ সবেও বিষয় সরল হ'লো না। খুব দুরূহ কথা অদ্ভুত সোজাসুজি বলেছেন, ফরাসী চিন্তাবীর Henri Bergson.

আজি বার্গ্‌সঁ যেন ইউরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানের পার্থসারথি! তাঁর প্রথম গ্রন্থ, Time and Free-Will—সময় ও স্বাধীন ইচ্ছা। এই গ্রন্থেই অভিনব বার্গ্‌সঁ-দর্শন অতি স্বচ্ছ ভাষায় ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাকৌশলে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর এই বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালীর সব চেয়ে সুপরিচিত গ্রন্থ Creative Evolution—সৃষ্টিসাধক বিবর্ত্তন। তিনি বলছেন:—জড়ও নয়, মনও নয়, নব নব সৃষ্টির উচ্ছ্বসিত আবেগে সদা-গতিশীল বিশ্বপ্রাণই (*Elan Vital*) কেবল মাত্র সৎ। উপনিষদ্‌ও বহুভাবে প্রাণের মহিমা ঘোষণা করেছেন। ছান্দোগ্য বলছেন, 'প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ'—প্রাণ সকলের বড়, এই জেনে উপাসনা করবে। বৃহদারণ্যক বলছেন, 'ইদংখং প্রাণো হীদং সর্ব্বং উদ্ভাপয়তি'—এই প্রাণ সমস্ত জগৎ উত্তাপন করেন তাই প্রাণকেই উপাসনা করবে। বার্গ্‌সঁ আরো বলছেন, সত্যি জ্ঞান বলতে এই প্রাণের অনু-

ভূতিই (Intuition)। উপনিষদ্‌ও একেই বলেছেন, 'পর-বিদ্যা' ও তা' জানলে সবই জানা হয়। তবে উপনিষদে প্রাণ (Life Principle), আত্মা (Human Soul) অথবা ব্রহ্ম (Universal Soul) অপেক্ষা একস্তর নীচের তত্ত্ব হিসাবে উল্লিখিত হ'লেও অনেকাংশে ভাবার্থে সমশ্রেণী বলেও গ্রাহ্য হ'য়ে থাকে। আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে বার্গ্‌সঁ-কথিত প্রাণের অনেক সমগুণ আছে—যথা, স্বাধীনতা (freedom), চৈতন্য (consciousness), শৃঙ্খলা (order), ইত্যাদি ; তবুও সূক্ষ্ম বিচারে, বেদান্তের 'ব্রহ্ম' আর বার্গ্‌সঁ-র 'বিশ্বপ্রাণ' যে কত দূর পৃথক্ সে আলোচনা বারান্তরে করা যাবে। সংক্ষেপে এই বলা যায়, কোন্ দুর্জ্ঞেয় স্থান থেকে বেরিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে আত্মীয়তার চকিত-দৃষ্টি বিনিময়ে চল্‌তে চল্‌তে ক্রমে যেন একজন এগিয়েছেন উত্তরাপথে নবীনোন্ন হিমবানের নিবিড় অরণ্যে,—অন্যজন দক্ষিণাপথে ঊর্ম্মিমুখরিত মহাসমুদ্রের চঞ্চল উপকূলে।

প্রাণের সত্যতার দুটো দিক্—অগ্রসরের দিক্ আর বিরোধের দিক্। আগে হ'তে কোনো বন্দোবস্তে নয়, কিন্তু অগ্রসর হ'তে হ'তে প্রাণ যেমন যেমন বাধা পায় সেই ভাবে তাকে এড়াবার বুদ্ধিবৃত্তি (intellect) জাগ্‌তে থাকে। প্রত্যেক সাময়িক বাধার খণ্ড খণ্ড হিসাব-নিকাশ ক'রে প্রাণের এগোবার রাস্তা তৈরী করাতেই বুদ্ধির উদ্ভব। প্রাণের আদিম প্রেরণাই সকল কর্ম্ম-চেষ্টার উৎস আর এই কর্ম্মযোগের কৌশল—গীতা যাকে 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' বলেছেন—আবিষ্কারেই বুদ্ধির আবির্ভাব। অনেকটা বুদ্ধি-বৃত্তির মতই আরেকটি প্রবণতা (tendency) আছে যা' বুদ্ধির পাশাপাশি থাকলেও একে অন্যের অন্তরায়। এ হ'ল, সহজ প্রবৃত্তি (instinct) যা' বুদ্ধির চেয়ে অনেক সহজে, যেহেতু বিশ্লেষণাদির অপেক্ষা না ক'রে, প্রাণের বাধা অতি-ক্রম করে। এই বাধা-বোধের মূর্ত্তিকেই জড় (matter) বলা হয়। প্রাণের বাধা হিসেবেই জড়ের অস্তিত্ব ঘট্‌তে থাকে। সেও ঐ খণ্ড সাময়িক অস্তিত্ব। জড় প্রাণের সংস্রবেই সৎ হয় নতুবা জড়ের স্বাধীন সত্তা নেই। হিন্দু দর্শনে এমন বিশদ ভাবে জড়ের উদ্ভবকাহিনী বিচার হয়নি। প্রাণের পরিচয়ে বার্গ্‌সঁ বল্‌ছেন :—'সমগ্রভাবে এই প্রাণ, তার আত্মপ্রকাশের প্রথম প্রেরণার মুহূর্ত্ত থেকে, যেন একটি তরঙ্গ মাথা তুলে' আস্‌ছে আর জড়ের পতন-প্রণালী বিপরীত গতিবেগে বাধা পাচ্ছে। এই চঞ্চল জলরাশির বিভিন্ন উচ্চতার অধিকাংশের উপরিভাগ জুড়ে' জড়ের সংঘাতে স্রোতের বেগ একটা আবর্ত্তে পরিণত হ'চ্ছে। একটি মাত্র বিন্দুতে, যিনি যা কিছু ভেঙে দিয়ে, আদায় যা কিছু ক'রে নিয়ে, এই স্রোত রাস্তা ক'রে ছুটেছে—বাধার ভার এই স্রোতের উপর চেপে থাকবে কিন্তু তার গতিরোধ কর্‌তে পারবে না। এই বিন্দুতে রয়েছে মানুষ।' মানুষ এই সর্ব্বগত অনাদি অনন্ত প্রাণের একাংশের প্রকাশ—ব্রহ্ম-সূত্রে যেমন আত্মাকে ব্রহ্মের 'আভাস এব চ' বলা হয়েছে। এই একত্বের বাণী উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্য মনে করিয়ে দেয়। বার্গ্‌সঁ আরো বলেছেন, বিশ্বপ্রাণের (Universal Life) অনন্ত প্রেরণা-প্রসূত ব'লে ব্যক্তিগত প্রাণের (Human Soul) লীলা কোনোকালে ফুরোবার নয়। মাণ্ডুক্য-কারিকা বলেছেন, ব্রহ্ম আর জীবে যদি কোনো ভেদ হ'তো তা' হ'লে—'মর্ত্ত্যতাম্ অমৃতো ব্রজেৎ'—যিনি অমৃত তিনি মর্ত্ত্য হ'তেন যে।

প্রাণ নিয়ত চলেছে আর সৃষ্টি ক'রে চলেছে। প্রাণের গতি-ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হ'য়ে উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'কেনেষ প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ'—কে এই প্রাণে প্রথম গতি সঞ্চার কর্‌লেন? তবু উপনিষদের প্রাণে আর বার্গ্‌সঁর প্রাণে যেন একটি গুরুতর পার্থক্য রয়েছে, বরং ব্রহ্মের সঙ্গে তার চেয়ে অনেক বেশী মিল আছে। বার্গ্‌সঁ বলেন, এই যে অনন্ত চলা, এই চলা-ই প্রাণ। নিরন্তর চলিষ্ণুতাই প্রাণরূপী একমাত্র সৎ। গতি, পরিবর্ত্তন ও সৃষ্টি—এই ব্যাপারই সৎ নতুবা এমন নয় যে, কোনো বস্তু আছে যা' চলে বা বদলায় ইত্যাদি। তিনি আরো বলেন, প্রাণের এই গতি এমন এক সমগ্রতা যার ভাগ নেই বা কাল্পনিক ভাগ কর্‌লে অঙ্ক লাভ হ'লেও তার রসবোধ হয় না। প্রাণের অবিভাজ্য অবিরাম গতি (indivisible incessant movement) বার্গ্‌সঁ একটি সুন্দর রূপোপযোগী উপমায় বুঝিয়েছেন। চলচ্চিত্রের ছবিগুলি বন্ বন্ ক'রে ঘুর্‌তে থাকে তাই জীবন্ত লীলা দেখা যায়, কোথাও বিচ্ছেদ হ'লে সমগ্রতাও গেল, ও সেই সঙ্গে তার সত্যিকার রসও গেল, যদিচ কাজের বেলায় খণ্ড খণ্ড ছবিই তুল্‌তে হবে। অসীম

বিশ্বের সর্ব্বত্রই সকল অভিব্যক্তির মধ্যেই মহিমময় প্রাণের কী যে বিপুল স্পন্দন চলেছে তার অপূর্ব্ব রহস্য রবীন্দ্র-কাব্যে অতি চমৎকার রূপে প্রকাশ পেয়েছে :—

"মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিস্তলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দ-রেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা!
* * *
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
সূক্ষ্ম জলে স্থলে
অযুত পাখার শব্দ উদার চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে কাঁপিছে ডানা,
মাটির আঁধার নীচে, কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর দুরান্তরে।"

বিশ্ব একেবারে পূর্ণ ও পরিণত হ'য়ে সৃষ্ট হয় নি। কেবলই নতুন ক'রে হওয়ার আর বিরাম নেই—যে সৃষ্টির প্রেরণাতে এর সুরু সে প্রেরণার কোন শেষ নেই। এই অশেষ কর্ম-প্রবর্ত্তনার সদাপরিবর্ত্তনের মধ্যে সে বদলায় না কখনো, তার আনন্দকে বিচিত্র রূপে ও বিচিত্র ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করে। এই অবিরাম সৃষ্টিই (Creative Evoluion) প্রাণের ধর্ম আর অবিরাম অভিব্যক্তির অন্তঃপ্রকৃতি প্রাণকে সমগ্র এক রূপে জানাই চৈতন্যের (Consciousness) ধর্ম। এই নতুন নতুন হওয়া (becoming),আর এর সবটুকুই যে এক ও বর্ত্তমান সে তথ্য জানা (knowing), মূলতঃ ভিন্ন প্রেরণা নয়। বার্গ্‌সঁ-ব্যাখ্যাত এই 'হওয়া' ও 'জানা' উভয়ের অন্বয়ী সম্বন্ধ বেদান্তের ভাষায়—'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি', যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্মই হন ; আবার, 'ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি', ব্রহ্ম হ'য়েই তবে ব্রহ্ম জানেন।

সত্যিকারের জানা ব্যাপার, প্রাণে পরিপূর্ণ মর্ম্মগ্রহণ বুদ্ধির কর্ম নয়। প্রাণের সধর্ম্মী ও সাধাত্রী চেতনা (Intuition) দিয়েই অখণ্ড প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। অফুরান নব নব সৃষ্টি করছে এই প্রাণ আর নিয়ত এই সৃষ্টির রস অনুভব করছে চেতনা। উপনিষদ্‌ও বলেছেন, 'এষোঽনুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো'। সৃজনের পথ দিয়ে বেঁচে চলাই প্রাণ আর এই ভাবে বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ প্রাণের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই চেতনা। পরমসত্তার আত্মা সম্বন্ধে বলা যায় এই বিশেষ সর্ব্বাংশে প্রযোগ করা যায়—অজ্ঞেয় (unknowable) হ'লেও অপরোক্ষ (directly realisable) যেহেতু ইনি স্বপ্রকাশ self-revealing)। অপরোক্ষ চেতনা বহির্মুখী নয়। বাইরের যে বস্তুপুঞ্জের উপর দিয়ে প্রাণ অবিরাম নব নব রঙের 'সিনেমা' চালিয়ে যাচ্ছে সেই বস্তুপুঞ্জকে প্রাণের বিরোধী না মনে ক'রে তার প্রকাশের সহায়করূপে জানাই চেতনার কাজ। বুদ্ধির কাজ বহির্মুখী। ঘটনা ও বস্তুপুঞ্জকে বাইরের অস্তিত্ব হিসাবে সন্দেহ ক'রে চলাই বুদ্ধির স্বভাব। প্রাণের এক সমগ্র গতিকে অসংখ্য খণ্ড গতির সমষ্টি কল্পনা ক'রে বুদ্ধি বস্তুপুঞ্জের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ যথা প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে। কাউকে ছাড়া, কাউকে অপরের সঙ্গে মেলান, কাউকে অধীনে আনা ইত্যাদি আপেক্ষিক ও খণ্ডিত ব্যবহার একদিকে যেমন বস্তুর বাধা ভেঙে' প্রাণের সৃজনলীলার ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধিত হয় অপরদিকে প্রাণকে নিরপেক্ষ ও সমগ্ররূপে ধারণায় বাধা হয়। বুদ্ধি চেতনারই শক্তি কিন্তু তার ব্যাপক দৃষ্টিকে সাময়িক চাহিদা অনুযায়ী সংহত ক'রে বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর প্রযোগ। একই শক্তির শিল্পী ও কবিপ্রকৃতি হ'চ্ছে চেতনা, আর বৈজ্ঞানিক ও

সমালোচক হ'চ্ছে বুদ্ধি। বেদান্তও অতি সুন্দর ভাবে এই উভয় সার্থকতার কথা বলেছেন—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে'—অবিদ্যা (science intellect) দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ প্রাণের বাধা উত্তীর্ণ হ'য়ে বিদ্যা (metaphysic, consciousness) দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ প্রাণের চিরস্থায়ী রস আস্বাদন হয়।

প্রাণই একমাত্র 'সৎ' 'অসৎ' ব'লে কিছু নয়ই না। সেটি কল্পনার ভ্রম, অস্তির অভাব কল্পনা মাত্র। না-থাকাটা আছে এমন নয়, থাকাটা যেন নেই এই ভাব। নাস্তির সোজাসুজি ধারণা সম্ভবই নয়। বেদান্তসূত্রও বলেন, 'ভাবে চোপলব্ধেঃ'—'যা' আছে তারই উপলব্ধি হয়; 'ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ'—'যা' নেই তার উপলব্ধিও নেই। প্রাণের যত স্পন্দন ও যা' কিছু আছে সে এই প্রাণ। আবার বেদান্তের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, 'তদ্ধাস্ত প্রতিষেধতি', সেই এক ছাড়া আর কিছু নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুপুঞ্জ যা'কে অসৎ বলা হ'ল সেগুলি মায়া (appearance) হ'য়েও আমাদের লৌকিক জ্ঞানে এত অমোঘ মনে হয় কি ক'রে? আর, চেতনালব্ধ সত্যটি আপন সত্তা হ'য়েও অনুভব প্রায় হয় না-ই বা কেন? দুটি মৌলিক ও সুলভ ভ্রম এর কারণ। প্রথম, চলাই সৎ ও চলার নানা ভঙ্গী রূপ নিয়ে যেখা যের একথা ভুলে' আমরা ভাবি বস্তুই সৎ ও তা'ই চলাকেরা করছে। কিন্তু এ ভুলের পরম লাভ এই যে বস্তুকে সত্য মনে করাতেই সে প্রাণকে স্পন্দনের ক্রিয়াশীলতায় উত্তেজিত করে। দ্বিতীয়, মনে করি একটা অসৎ সত্তাই (real unreality) আছে। যা' এখনো পাইনি তাই সৃষ্টি করছে, সকল ক'জেই এই আকাঙ্ক্ষা, ফলে যা এখনো যেখানি তা' না-থাকারই অস্তিত্ব মনে করি। Einstein-এর আপেক্ষিক বাদ (Relativity Theory) ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানবিশারদ Eddington বলেছেন বস্তুর অন্তরে আমাদের মানসিক ব্যাপার স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। বৈদিক ঋষিও এমনি একটি নিগূঢ় যোগের খবর জানতেন বলেই গায়ত্রী মন্ত্রে বা শক্তি দ্বারা "ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ"-র মধ্যে আত্মাকে ব্যাপ্ত দেখতে উপদেশ করেছিলেন। দার্শনিক-প্রবর Hegel সৎ ও অসৎকে একই বলেছেন। হেরাক্লিটাস পদার্থ পরস্পরবিরোধী এই ধারণায় Descartes-প্রচারিত যে ধরনের দ্বৈতবাদ, বার্গসঁর নব্য দর্শন তার আলোচনা মীমাংসা করা অপ্রাসঙ্গিক মনে ক'রে মূল বিচারে এমন এক নিরুক্ষেপ সত্যে নিয়ে গেছেন যেখানে উক্ত বিরোধের আর সম্ভাবনা মাত্র উদয় হয় না। যোগ-বাসিষ্ঠের ভাষায় বার্গসঁর মত এই বলা যায়—যে, সৎ তা'ও নয়, আবার অসৎ তা'ও নয়, তাতে সকল দ্বৈতের একান্ত অবসান।

আরেক প্রশ্ন—এই জড় অচল-অপ্রাণ হ'য়েও এবং প্রাণের বিরুদ্ধাচরণ ক'রেও প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে নেহাৎ আবশ্যক কি ক'রে? অচলতা (appearance) বেদান্তের ভাষায় মায়া। দুটো ট্রেন সমানবেগে যখন একই দিকে যায় তখন মনে হয় না চল্‌ছে, বিপরীত দিকে চল্‌লে মনে হয় দুটোই দ্বিগুণবেগে চল্‌ছে। প্রাণ একটি সুবিশাল গতি। যখন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে কোনো সৃষ্টির সার্থকতার দিকে ছুট্‌ছে তখন মনে হয় অঙ্গ গতি-গুলি যেন তাদের কল্পিত নিশ্চলতার দ্বারা এই গতিকে অবরোধ করছে। এই ভাবে প্রাণের বিরুদ্ধ সব গতিই জড় ব'লে মনে হয়। যেটি মনে হয় দেশের (space) আয়তন মধ্যে নিরেট বস্তু, বাস্তবিক সেটি সময়ের (time) মধ্যে অজস্র অবস্থান্তরের সমষ্টি (system of events —Relativity)। অতি সূক্ষ্ম একফলক আলো রূপে যা দেখা দিচ্ছে তা ব্যোমের (nether) কোটি কোটি স্পন্দনপ্রবাহের সমষ্টি। সুতরাং বার্গসঁ মতে 'সময়' দারুণ সত্তা, কিন্তু সে সত্তা পরিবর্ত্তনশীল সময় নয়। প্রাণ ও বিশ্বচৈতন্যের মতই সময় এক বিশাল অবিভাজ্য সদা-বর্ত্তমান অস্তিত্ব যার মধ্যে সৃজনের অনন্ত পরিবর্ত্তন ঘটছে। প্রাণের অনুভবে পরিবর্ত্তনে লুপ্ত ভবিষ্যৎ কিছু নেই। অতীত বর্ত্তমানের সেই অংশ যা আছে অথচ তাতে প্রাণের সেই আকর্ষণ এখন আর নেই ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সেই অংশ যেটি প্রাণে এখনই রয়েছে অথচ এখনও প্রকাশের উত্তেজনায় আসেনি। যেমন একটি সুর নানা স্বরগ্রামের মধ্য দিয়ে গেলেও একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ অনুভূতি এবং কতক স্বরগ্রামের বিগত লীলা ও কতকের অনাগত লীলা সবটুকুই তার সমগ্র বর্ত্তমানতার মধ্যে নিত্য-

বিরাজিত, তেমনি প্রাণের প্রতি এক সমগ্রতা যার ভাগ নেই ও ভাগ করলে স্বরূপ জানা যায় না। উপনিষদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই ধরণের (অথচ আবার অন্য ধরণেরও) পূর্ণতা ঘোষণা করেছেন—'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে'—ওঁ। ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ, এই ব্রহ্ম পূর্ণ, একের মধ্যে আর একে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। চিরবর্ত্তমান অনন্ত সময়ের মধ্যে অনুরণন স্পন্দনের ফলেই একমাত্র সত্যস্বরূপ বিশ্বপ্রাণ—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এই নটরাজের নটীর আবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ 'ব্যক্তি-প্রাণের' আবির্ভাব। তারাও এই স্পন্দনের আত্মপ্রকাশে অস্থির। আর, এই ব্যক্তির (personality) বিকাশের অসমা আকিঞ্চনের উৎসে রয়েছে প্রাণের আত্মকর্তৃত্ব (free will) যেটি না থাকলে আত্ম-ব্যঞ্জনার চেষ্টা প্রবঞ্চনা মাত্র হ'ত। বুদ্ধি দ্বারা পারিপার্শ্বিকের উপর পার্থিব (material) প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে ক্রমবিকাশ-বাদ (evolution theory) কথিত জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার চেষ্টা স্বাধীন ইচ্ছার আসন পেতে নয়। প্রাণের স্পন্দনকার্য্যের মধ্যে ব্যক্তির প্রকাশ করতে পারাই আত্ম-কর্তৃত্ব; আর, এই পারমার্থিক (spiritual) ব্যাপারে সমগ্র প্রাণের পরিচয় লাভ হয়, অথবা, বেদান্তের ভাষায় 'স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে'—স্বরূপের বোধ হয়। বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নিরোধ ক'রে, প্রজ্ঞার (consciousness) সাহায্যে সমগ্র প্রাণের উপর দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রাণবন্ত প্রতিনিধিরূপে নিজেকে জানা যায়, অথবা, যোগদর্শনের ভাষায় 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং'—তখন নিজের স্বরূপে অবস্থান সাধিত হয়। এ খুব কদাচিৎ সাধিত হয়। তাই অপরিচিত জনসাধারণের ভাগ্যে প্রাণের নিজস্ব স্বাধীনতার রসাস্বাদন একরকম অজ্ঞাতই থেকে যায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ভগবান্ বা অমরত্ব কিছু দিক্ আর না দিক্, প্রাণের মহিমা জাগিয়ে তুলবার ভার সঞ্চিত রেখে যায়। বার্গ্‌সঁ-কথিত আত্মকর্তৃত্বের বাদের মর্ম্ম এই যে, যখন কেউ প্রাণরহস্যবিদ্ হন তখন তিনি প্রাণের মূল প্রেরণার অনুসন্ধানে নিজেকে কর্ম্মে ও চিন্তায় অন্ত নিহিত বন্ধন থেকে মুক্ত জানেন, তখন তিনি—'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ আপ্নোতি মনসস্পতিং'—স্বরাট হন, মনের অধিপতি হন। তুলনা ক'রেও, এই স্বাধীনতাই মানুষের বিশেষত্ব। Creative Evolution গ্রন্থে তিনি বলছেন:—'এই স্বাধীনতাই একান্ত ভাবে মানুষের রূপ নিয়ে জন্ম লাভ করেছে। মানুষ ছাড়া সৃষ্টিরাজ্যের আর কোথাও চিৎ-শক্তির এমন বিকাশ হয় নি। একমাত্র মানুষের মধ্যেই এর গতি বেগে প্রবহমান। প্রাণের সকল শক্তি চর্চ্চায় মানুষের দৃষ্টি থাকে না; কেবল আত্ম-উপলব্ধির দুরন্ত আবেগে নিরুদ্দেশ ভাবে কোথায় শেষ না মেনে সে চলেই চলেছে। ক্রমবিকাশের অন্য সকল ধারায় প্রাণধর্ম্মের পরিচায়ক অন্যান্য প্রবণতাগুলি ক্রিয়াশীল। তাদের কতকগুলি মানুষ অবশ্যই রেখেছে যেহেতু বিভিন্ন প্রবণতায় সকলেই প্রকৃতিগত ঐকান্তিক: পরস্পরের অন্তঃপ্রবিষ্ট। তবুও, সেগুলির অতি অল্প অংশই মানুষ অনুশীলন করে। যেন এক অনির্দ্দেশ্য দুর্ব্বোধ্য জীব, যাকে আমরা মানুষ বা অতিমানুষ বলতে পারি ও তাই বলছিও, নিজেকে উপলব্ধি করবার সাধনা করছিলেন এবং সাধনপথে স্বীয় বিশালতার কতক অংশ ত্যাগ ক'রেই তবে সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের সীমারেখায় সংহত বিশিষ্টরূপে বিকশিত হ'তে পেরেছেন।'

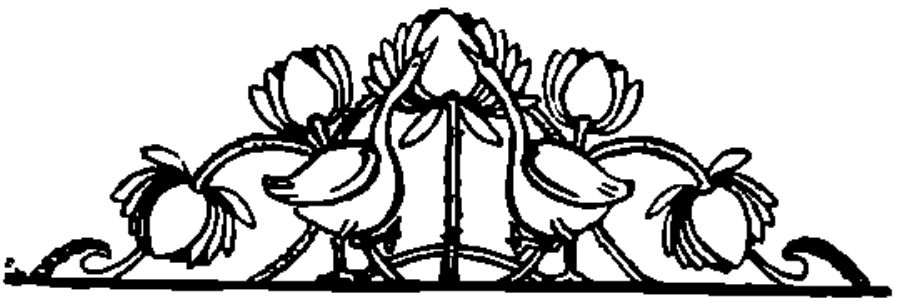

অগ্নিশিখা

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

(১০)

অরবিন্দ ঘরে অজ্ঞান, পরেশ ক'দিন ধরেই তার কাছে আছে, রঘুসিং রাতদিন সেবায় ব্যস্ত। যা-কিছু পথ্য পরেশের বাড়ী থেকে আসে, ডাক্তার এসে দেখেন। ঘরের ধরণ ও প্রলাপ দেখে টাইফয়েড বলেই স্থির হয়েছে। পরেশ একা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে; পাড়ার ছেলেরা দুই চার জন করে' এসে তাকে সাহায্য করে। জ্বর ১০৪।৫ পর্য্যন্ত ওঠে, ১০০ করে' নামে। বিকারের লক্ষণ কখনও কখনও দেখা যায়। যদি ভাল সেবা শুশ্রূষা না হয় তবে যে শেষ পর্য্যন্ত কি হবে তা কে বলতে পারে।

অরবিন্দ আজ চার পাঁচ দিন হ'ল এসেছে; সেই যে এসে শুয়েছে আর ওঠ বার শক্তি নেই। রঘুসিং কেঁদে বলে, "দাদা বাবু, আমার কপালে এই শাস্তি ছিল তাই আমি বেঁচে আছি—" পরেশ সান্ত্বনার সুরে বলে, "কেঁদ না রঘু, আমরা যা করার করি, কিন্তু ভগবান যা করবেন তার উপর হাত কি?—" বৃদ্ধ চোখ মুছে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

শরতের মাখামাখা রৌদ্র খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু চারদিকের শ্যামলতা রৌদ্রের প্রখরতাকে যেন সহনীয় করে' তুলে; তাই শরতের রৌদ্র—আলো এত সুন্দর। বাংলার ঘরে ঘরে শরতের সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দেখা দিয়েছে। এর পর কে কা'কে জল দেবে তার ঠিক থাকবে না। পরেশ আজ ক'দিন ক্রমাগত রাত জেগে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। সারাদিন সে একা এই প্রবল রোগী নিয়ে বসে' থাকে—আজও আছে। সামনে দূরের রাস্তা ধূ ধূ করছে, কচিৎ দু' একটি পথিক বা দু' একখানা গাড়ী চলছে। নিষ্ফল চেষ্টার ব্যথা নিয়ে পরেশ অরবিন্দর মাথায় বরফের ব্যাগ দিচ্ছে। অদূরে ছইএ ঢাকা একখানা গাড়ী আসছে না? পরেশ দেখল গাড়ীখানা গ্রামের মধ্যে না ঢুকে এই বাড়ীরই রাস্তা ধরল। সে ভাবল এ রাস্তায় কে আসে, এ রাস্তা তো এই পর্য্যন্তই শেষ। উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পরেশ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গাড়ী আস্তে আস্তে এসে তাকে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি করে' দিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকল। বিনু আগেই নেমেছিল, সে বেশ সহজভাবে রোয়াকের ধারে গাড়ী লাগাতে বলে। গাড়ীর পরদা সরিয়ে সহজ গলায় বলে, "নাম্ রে গোপাল নাম্, দিদি তোমরা নেমে পড়—" পরেশ অবাক চোখে তাকিয়ে আছে দেখে বিনু বলে, "এতদিন ভায়ার কোন খোঁজই নেলে নি, দিদিকে আনি কি করে', শেষে টেলিগ্রাফ পেয়ে আর দেরী করলাম না। অরবিন্দ বাবু কেমন আছেন এখন—"

অলকা গাড়ী থেকে নামতেই উৎসুক মুখে পরেশ বলে, "বউদি এসেছেন? আঃ বাঁচলাম! আসুন আসুন, দাদার বড় অসুখ,—আমি একা হায়রান হ'য়ে যাচ্ছি; আপনি এসেছেন, এঁরা এসেছেন, আর ভয় নেই—"

অলকা কোনমতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মঙ্গলা বলে, "চল ঠাকুরঝি, আগে ঠাকুর জামাইকে দেখে আসি—"

পরেশ দু' চারটা সামান্য জিনিষ যা ছিল নামিয়ে নিল। বৃদ্ধ রঘুসিং বালকের মত কাঁদছিল।—"মা লক্ষ্মী আমার, তুই গিয়ে এমন সোনার পুরী শ্মশান হয়েছে! এখন মা তুই সব ঠিক কর্ মা আবার—"

অলকা তখন এত কাঁপছে যে মঙ্গলা গিয়ে তাকে ধরল, বুঝি বা সে পড়ে' যাবে। এতদিন পরে তারই ঘরে এসে সে দাঁড়িয়েছে—এ কি শ্মশানমূর্ত্তি গৃহের! স্বামীর অসুখ, নিজের জীবনের অতীত, সব মিলে' তাকে বিহ্বল করে' তুলেছে। পরেশ রঘুসিংকে ধমক দিয়ে বলে, "কি কর রঘু, ওঁদের ঘরে নিয়ে যাও, পথ থেকে আসছেন। যান বৌদি হাত-পা ধুয়ে ঘরে আসুন—"

মঙ্গলা নিজেকে শক্ত করে' নিল—সে তো এই জন্যই

সঙ্গে এসেছে; অলকা যে এতদিনের পর এমনি ভেঙে পড়বে সে তো জানা কথাই। মঙ্গলা তাকে টেনে নিয়ে উপরে চল্ল। অলকার আঁচল ধরে' গোপাল বল্লে, "মা, বড় খিদে পেয়েছে—"

সন্তানের ক্ষুধার কথায় অলকার মুগ্ধ চেতনা ফিরে এল। সে তাড়াতাড়ি রঘুসিংকে বল্লে, "রঘুয়া, ঘরে তো কিছুই হয় না দেখ্‌ছি; গোপালের জন্য খাবারের যোগাড় কর, বাজার করে' আন।"

রঘুসিং দু' চার জন মজুর ধরে' এনে ভিতর-বাড়ীর কাজে লাগিয়ে দিয়ে বাজারে গেল জিনিষ আন্‌তে।

রঘুসিংএর ছেলের বউ দাঁড়িয়ে ছিল আদেশের অপেক্ষায়, অলকা বল্লে, "যাও বউ, দিদিমণিকে স্নানের ঘরে জল দাও।" আলমারী খুলে দু'খানা ধোয়া সাড়ী বা'র করে' তার হাতে দিয়ে মঙ্গলাকে বল্লে, "যাও মঙ্গলা বউএর সঙ্গে; এখনি আমি আস্‌ছি।"

চারদিকে সাড়া পড়ে' গেল। অলকা তার পরিত্যক্ত ঘরের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল...সেই ঘর যেমন সাজিয়ে রেখেছিল প্রায় তেমনই আছে পড়ে'—বস্ত্র, শয্যা, আলমারী, টেবিল, চেয়ার যেন তারই মুখের পানে চেয়ে আছে!

অলকাকে চম্‌কে দিয়ে পরেশ ঘরে এসে ডাক্‌ল, "বৌদি—"

অলকা বল্লে, "কি বল্‌ছ ঠাকুরপো?"

একটু দ্বিধা করে' পরেশ আস্তে আস্তে বল্‌লে, "বৌদি, আপনি অতীতকে ভুলে যান, সামনে যে কাজ পড়ে' আছে তাই তুলে নিন। আপনি ভেঙে পড়্‌লে দাদাকে ফিরিয়ে আনা শক্ত হবে। চলুন তাঁকে দেখে আস্‌বেন! রঘু বাহির থেকে এসে এসব ঠিক করে' দেবে।"

অলকা শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে বল্‌লে, "ডাক্তার কি বলেছে ভাই—"

"টাইফয়েড হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, তবে খুব অল্পেই ধরা পড়েছে। সেই ঘটনার পরে রাত্রে বাসায় যখন এলেন সে কি পাগলের মত চেহারা! সারা রাত গ্রাম তোলপাড় করে' খোঁজা হয়েছে...ক'দিন আশপাশের গ্রাম, পুকুর, খানা কিছুই বাদ যায়নি খোঁজা...শেষটা আমায় রেখে গেলেন এই মৃত পুরী পাহারা দিতে...দেশে দেশে ঘুরে দুর্ভিক্ষের সেবা করে' শেষে এই রোগ বাধিয়ে নিয়ে এখানে এলেন এই পাঁচদিন হ'ল। আপনার কোন খোঁজই না পেয়ে আমরা এত নিরাশ হয়েছিলাম যে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা মোটেই ভাব্‌তে পার্‌ছিলাম না।...এখন আপনার পুণ্যের জোরে আপনি সব ফিরিয়ে আনুন এই একমাত্র প্রার্থনা, বৌদি—"

পরেশ দেখ্‌ল অজস্র অশ্রুধারে অলকার মুখ ভেসে যাচ্ছে। তার ব্যথাকাতর মুখখানি পরেশকে বড়ই আঘাত দিল, বল্‌লে, "বৌদি, এখন হয়ত তোমায় অনেক আঘাত সইতে হবে... বিষ্ণু বাবুর কাছে কিছু কিছু শুন্‌লাম। কিন্তু তুমি যেমন ছিলে ঠিক তেমনি থাক্‌বে, কোনমতে নিজে সংকুচিত হবে না। আমি তোমার চেয়ে ছোট, তবু এই গ্রামেই মানুষ, আমি জানি, যে যত দুর্বল হয় তাকে সকলে চুঁটী চেপে ধরে বেশী করে'; কাজেই নিজে একটুও কিছু ছাড়্‌বে না—। চল এখন দাদাকে দেখে আস্‌বে।"

পরেশের সঙ্গে নীচের ঘরে গিয়ে অলকা দেখ্‌লে কঙ্কালসার দেহে অচৈতন্য অরবিন্দ শুয়ে আছে তার মাথার উপর বরফের ব্যাগ দিয়ে একটি ছেলে বসে' আছে। আরো দু'চারটি পাড়ার ছেলে অন্যান্য কাজ কর্‌ছে। স্তম্ভিত অলকা স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে আর যেন তাকাতে পার্‌ল না। পরেশকে বল্ল, "চল ঠাকুরপো, উপরের ঘরটা আগে ঠিক করি, সেখানে তুলে নিয়ে যেতে হবে। এ ঘরটা বাইরের ঘর, আমি সব সময় আস্‌তে পার্‌ব না, আর আলো-বাতাসও বেশী খেলে না, ঘরময় জিনিষে ভরা।

"হ্যাঁ ঐ রঘুসিং আস্‌ছে বাজার নিয়ে; ওরাই এখানের সব ঠিক করবে। তুমি চল দাদার ঘর ঠিক করে' দেবে।"

মঙ্গলাকে ডেকে আহারের ব্যবস্থার ভার দিয়ে, অলকা উপরের ঘরটির ব্যবস্থা কর্‌তে চলে' গেল।

সুগৃহিণী মঙ্গলা বউএর (রঘুয়ার ছেলের বউ) সাহায্যে রান্নাঘরটি গুছিয়ে নিয়ে লুচি আর মোহনভোগ তৈরী করে' সকলকে খেতে দিল।

সকলের খাওয়া হ'লে অলকার খোঁজে গিয়ে দেখে, অলকা কোমরে কাপড় জড়িয়ে সন্তর্পণে ঘরখানিকে মুছে পুঁছে সাফ্‌সো করছে, ডান্‌লা দিয়ে অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম আভা পরিশ্রান্ত অলকার মুখে পড়ে' তাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। মঙ্গলা কিছুক্ষণ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ডাকল, "দিদি—"

ম্লান মুখে অলকা একটু হাসি এনে বল্‌লে, "দিদি—"

"বল্‌তে সাহস হয় না, কিন্তু খাবে না তুমি? এই যে সারাদিন উপোসী আছ দিদি, ঐতো দেহ, কি করে' সেবা করবে—?"

"এই তো হ'ল বোন্! গা হাত ধুয়ে আসি, সবটা শুকোলে ওঁকে উপরে আনার ব্যবস্থা করে' তারপর—"

"না আগে এস। এই তো বৌ রয়েছে, ঝিও এসেছে, তুমি এস স্নান করবে; আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না?"

"সত্যি তো তুই খাসনি মঙ্গলি!—চল্, তুই বড় দুষ্টু।"

মঙ্গলা তাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চল্ল।

পরেশ, বিষ্ণু ও আরো চার পাঁচ জন ছেলেতে অতি সাবধানে অরবিন্দকে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বড় পালঙ্কে শুইয়ে দিল। সন্ধ্যার পর ডাক্তার এসে ঘরের পরিবর্ত্তন ও সুসজ্জিত পরিচ্ছন্নতা দেখে খুসী হ'য়ে বল্‌লেন, "হ্যাঁ এবার ঠিক হয়েছে, রোগীর উপযুক্ত ঘর হয়েছে। এখন এই রকম যদি সেবা যত্ন হয় তবে আর ভাবনা কিছু নেই—"

দ্বিতীয় সপ্তাহে খুব বিপদের ভয়; কোন্ দিকে গতি নেবে যে ব্যাধি তা এই সপ্তাহ না গেলে কেউ ঠিক করে' বল্‌তে পার্‌ছে না। বিষ্ণু দু'দিন থেকে পরেশকে বল্‌লে, "ভাই, আমার তো থাকার যো নেই আমি আজ চল্লাম, আপিসে যোগ দিয়ে আবার ছুটী নিয়ে আস্‌ব। যদি কলকাতা থেকে সেই ডাক্তারকে আন্‌তে পারি আন্‌ব —তিনি দিদির অসুখের সময় যা করেছেন তা বলার নয়, ওঁকে বাঁচিয়ে তুলেছেন তিনিই।"

পরেশ আগ্রহ সহকারে বল্‌লে, "তাই ভাল, আপনি ডাক্তার নিয়ে আসুন। দিদিমণি তো রইলেনই, আপনি সেবা কর্‌বেন না।"

অলকার কাছে বিদায় নিয়ে মঙ্গলাকে ডেকে বিষ্ণু বল্‌লে, "আমি আজই যাই, আপিস কামাই হ'লে গোলমাল হবে। তুমি সাবধানে সব দেখাশুনা ক'রো, তোমার উপরই সব রইল—"

"তুমি দেরী ক'রো না তা'লে, আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করে—যত শীঘ্র পার এস।"

সেবা! সেবা! রাত-দিন কেবল সেবাই চল্‌ছে—ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, সময়মত আহার নেই। সেই যে অলকা এসে বসেছে তাকে রোগীর কাছ থেকে একতিল কেউ সরাতে পারে না। কোনমতে দিনের দুটি আহার সে করে, না হ'লে মঙ্গলা খেতে চায় না; তা ছাড়া সংসারের সব ভার মঙ্গলার হাতে। গোপাল সারাদিন পরেশের বাড়ী থাকে, মাঝে মাঝে ঘরে এসে দেখে ধানবতা মা, অচেতন পিতা, তাকিয়ে দেখে ম্লান মুখে বা'র হ'য়ে যায়।

প্রলাপের ঘোরে অরবিন্দ কখন বকে, কখন পরেশকে ডেকে বলে, "পরেশ, সব রইল আমি চল্লাম, তুই দেখিস্—" কখন ডাকে, "অলকা অলকা, শোন, তুমি কই?"—চতুরালি স্বামীর বুকে মাথা লুটিয়ে অলকা কেঁদে বলে, "এই যে আমি, চোখ মেলে কি দেখ্‌বে না?"

ঔষধ-পথ্য সেবা-যত্নের গুণে, এবং সর্ব্বোপরি অলকার কপালগুণে অরবিন্দর অসুখ ভালোর দিক নিল। কলকাতার ডাক্তার দু'দিন এসে দেখে গেছেন, তাঁর মতে ঔষধ-পথ্য চল্‌ছে, বিষ্ণুও মাঝে মাঝে আসে যায়।

দ্বিতীয় সপ্তাহ কেটে যেতেই অরবিন্দর জ্ঞান হ'ল। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলকা তার সামনে থেকে সরে' গেল। প্রথম দেখার আবেগ তার সইবে কিনা এ ভয় সকলেরই আছে। আরো দু'চার দিন গেল, জ্বর ছেড়ে গেছে, অন্যান্য উপসর্গও কমে গেছে, আর বিশেষ ভয় নেই।

অরবিন্দ ক্ষীণ স্বরে বল্‌লে, "পরেশ, তাদের কি কোন খবর এল? আমার যেন কেবলি মনে হয়, আমি তাকে দেখেছি, সে যেন সারাক্ষণ আমার কাছেই ছিল—"

পরেশ বল্‌লে, "তা বৌদি এলে তোমার এখন খুব ভাল লাগে—অরু দাদা?"

"সত্যি পরেশ, মনে হয় এ ঘর যেন তারই হাতে গোছান, পথ্য যে পাই সে যেন সেই করে' দেয় বলে' মনে হয়···বল্ না সত্যি সে কি এসেছে?"

মহা সমস্যায় পড়ে' পরেশ বল্লে, "বউদি' খবর দিয়েছেন যে তিনি শীঘ্র আস্‌বেন। সেই টেলিগ্রামের উত্তরে ভদ্রলোকটি জানিয়েছেন যে তুমি বল্লেই বউদি'কে নিয়ে আস্‌বেন।"

"আমি বল্লে মানে?—সে কি কথা! বাড়ী কি তাঁর নয়? পরেশ, কেন তুই সেই চিঠি পেয়েই তাকে আন্‌লি না? যে, সে টেলি করে' যে—'এখনি নিয়ে আসুন'। গোপাল আছে তো, তার কথা কিছু লেখেনি?"

"হ্যাঁ সব ভাল আছে, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, আমি লিখে দিচ্ছি—সবাই আস্‌বে।"

বারান্দার পাশে রেলিংএ ভর দিয়ে অলকা দাঁড়িয়ে সব কথা শুন্‌ছে আর দুই চোখের জল ঝরে' পড়্‌ছে; মঙ্গলা এসে তার মাথাটা বুকের উপর চেপে নিয়ে বল্লে, "দিদি, তুই কাঁদ্‌ছিস কেন? তোর মেঘ তো কেটে এল দিদি—"

অলকা বল্লে, "এত আশা যদি সব বৃথা যায়! আশাও যে কর্‌তে পারি না—"

"বালাই! ভগবান করুন, এত দুঃখের পর তোমার সকল দুঃখের অবসান হোক্।"

বিনু অরবিন্দর ঘরে যেতেই পরেশ বল্লে, "এই যে বিনু বাবু এসেছেন, এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই বৌদি'র ভাই, এঁর কাছে বৌদি'রা আছেন, এঁরই কাছে সব খবর পাবে।"

অরবিন্দ বিনুর স্বাস্থ্যপূর্ণ সুগঠিত চেহারা ও প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "আপনিই আমায় টেলি করেছিলেন?—তাদের নিয়ে এলেন না কেন।"

বিনু বুঝ্‌ল অলকাদের এখানে আস্‌বার কথা এখনও বলা হয়নি, বল্‌লে, "হাঁ। আপনাকে দেখ্‌তে এলাম; আপনি এখন কিছু সুস্থ হয়েছেন, কালই তাদের আনা যেতে পারে···আপনার মত হলেই—"

"বলেন কি...আমার মত! হা ভগবান! সেকি মশাই তবে···বলুন না সে কোথায় ছিল···কোন ভয় নেই..."

বিনু বল্লে, "না, কোন পাপ, কোন দোষ ঐ নিষ্কলঙ্ক প্রতিমায় লাগ্‌তে পারে না। ভাগ্যবান আপনি, তাই দিদি সয়তানের ফাঁদ কেটে পালিয়ে এসে আমার কাছে ছিলেন। আপনার খোঁজ পাইনি, তাই তাঁকে এত দিন আন্‌তে পারিনি। আমার স্ত্রী, গোপাল ও দিদিকে নিয়ে আস্‌ব।"

পরেশ বল্লে, "শুন্‌লে তো দাদা, এখন আর ভেব'না, তুমি যদি বেশী অস্থির হও, তবে বৌদি'র আসা হবে না।"

"নারে পাগল, তোরা আমায় ভোলাবি! সে যে এখানেই আছে, তা আমি অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি। এই যে সুপ দিলি এ তারই হাতের তৈরী—"

পরেশ হেসে বল্লে, "তুমি কিছুই ভোল'নি দেখ্‌ছি। দেখি, বৌদি'কে কোথাও খুঁজে পাই কিনা।—"

গোপাল ঘরে এসে পরেশের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্লে, "মামাবাবু, বাবা কেমন আছেন?—"

"আমার গোপাল!—আয় আয়—একটু দেখি,—"

পিতার আহ্বানে পুলকিত হ'য়ে গোপাল কাছে গিয়ে বাবার হাতের উপর মাথা রাখ্‌ল। পুত্রের স্পর্শে অরবিন্দর চোখে জল এল। শুধু একবার ডাক্‌ল—"গোপাল!" ছেলে উত্তর দিল, "হুঁ—" অনেকক্ষণ নীরব থাকার পরে অরবিন্দ বল্লে, "যাও তো গোপাল, তোমার মাকে বল'ত একটু জল দিতে।" জল নিয়ে অলকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে, "জল এনেছি—পাবে?"

অবাক অরবিন্দ অপলক চোখে শুধু তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে অলকা একটু ভীত হ'য়ে কাছে বসে' গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে, "যা কর, আস্তে আস্তে জল দিই।" চমক ভেঙে অরবিন্দ মৃদু হেসে বল্লে, "যাও অলক্, প্রাণ ভরে' জল খাই, কতদিন যে তৃষ্ণায় এ বুকটা শুকিয়ে আছে, বল'ত!"

আস্তে আস্তে জল খেয়ে অরবিন্দ অলকার হাতখানি টেনে নিয়ে বল্লে, "এত দেরী কর্‌লে আস্‌তে! কেন,—ভয় কর্‌ছিল? ভয় কি!—আমায় কি চেন' না? তুমি যে কাছে এসেও দূরে ছিলে, এইটুকুই বাধা দিচ্ছে, কেন আস'নি।"

"কাছেই ত ছিলাম; তুমি ভাল আছ দেখে এই ক'দিনই ত' একটু দূরে ছিলাম।"

"একটু ভাল করে' কাছে এসে বস।"

স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে অলকা সযত্নে চুলের গোড়ায়

গোড়ায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে, "অনেকক্ষণ কথা বলেছ, একটু বিশ্রাম কর।"

"আমার সত্যি বড় আরাম লাগ্‌ছে,একটু বিশ্রাম করি। তুমি চলে' যেও না আর লুকিয়েও থেকো না—"

"তুমি ঘুমাও ; আমি আর লুকিয়ে রইব না।"

দুই হাত অলকার কোলের উপর দিয়ে শিশুর মত নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় অরবিন্দ ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

সন্ধ্যার শাঁখ দিকে দিকে বেজে উঠ্‌ল। মঙ্গলা সন্ধ্যাদীপ হাতে ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখিয়ে অলকার ঘরে এসে অলকাকে বসে' থাকতে দেখে প্রদীপ রেখে অলকাকে প্রণাম করে' মৃদু স্বরে বল্লে, "দিদি, আশীর্ব্বাদ কর।"

অলকা মৃদু হেসে বল্লে, "মঙ্গলি, সন্ধ্যার পঞ্চাটা রামের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, উনি এখনি উঠে খাবেন। আর তুমি ভাই, গোপালকে একটু পরেই খাইয়ে দাও, না হ'লে ঘুমিয়ে পড়্‌বে।"

মঙ্গলা বল্লে, "হাঁ। দেব, এই তো গোপাল তার মামার সঙ্গে বাইরে গেল, এতক্ষণ যে গল্প তার—"

মৃদু কথার আওয়াজে অরবিন্দ জেগে মঙ্গলাকে দেখে বল্লে, "উনি কে—"

"এই তো আমার বউদিদি—যদিও বউদি' বলি না। ভগবান দুঃখের আগুনে ফেলে এই সোনার খনির সন্ধান দিয়েছেন। এঁর নাম মঙ্গলা, সত্যিই ইনি মঙ্গলময়ী।"

"থাম, থাম" বলে' মঙ্গলা অলকার দিকে তাকিয়ে মৃদু তিরস্কার করল। অরবিন্দকে নমস্কার করে' বল্লে, "কেমন আছেন ঠাকুর জামাই, এখন অনেকটা ভাল নয়?" মৃদু হাসি মঙ্গলার চপলতাকে কিন্তু চাপা দিতে পারল না।

অরবিন্দও হেসে বল্লে, "হাঁ। নিশ্চয়। এমন অমৃত পেলে কেমন লাগে তা ঐ জ্ঞানক মশাইকে জিজ্ঞাসা করবেন।"

"যা পালা, আর ছুটমি করতে হবে না—অলকা মঙ্গলাকে একটু ঠেলা দিল।

"হাঁ, এই যে যাই গো—" মঙ্গলা চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

বর্ষা

শ্রী করুণাশঙ্কর বিশ্বাস

মনে হয়—
আজি এইখানে বরষার সাথে
মোর যেন হবে পরিচয়।
খেয়া-ঘাটে নেয়ে বন্ধ করিল পাখাপার,
কালো মেঘে পুন ছাইয়া আসিল চারিধার,
কূল ভেঙে ছোটে আষাঢ়ের নদী পাক খেয়ে,—
উন্মাদ-বেগে—নির্ভয়।
আজি এইখানে বরষা সনাথ—
তার সাথে হবে পরিচয়!

এই দেশ,—
সমুখে চলিতে হঠাৎ এ বাধা,
দুর্য্যোগ-দিন—বেলা শেষ।
যাত্রীরা সব ফিরে গেছে ঘরে তাড়াতাড়ি,
বাদল নামিবে রাত্রির মত—ঘটা ভারি!
ঝিঁঝিরে বাহিরে নীরব শান্ত ঘুম-ঘোরে
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে কত দেশ।
সমুখে চলিতে এ বাধা মধুর,
দুর্য্যোগ-দিন—বেলা শেষ।

বাড়ে জল ;

ধান ক্ষেত দিয়ে স্রোত ছুটিয়াছে—
মাছ সেথা করে খল-খল।
খপ্ খপ্ করে' সোয়াল চলেছে আল্-পথে,
ছেলে-বাবা আসে চুপি চুপি কোন্ বন্‌পথে,
নালার কাছের বড় ঘাসগুলি কচি কচি
দেখিতে দেখিতে হ'ল তল।
ধান-ক্ষেত দিয়ে বন্যা চলিছে
মাছ সেথা করে খল-খল!

কলা-বাড়

ঐ দেখা যায় কোন্ ও গ্রামের?—
দক্ষিণ দেশ, নদী-পার।
সুপারি গাছের ঘন সারিগুলি পটে আঁকা,—
স্বপ্নপুরীর কত রহস্য আছে ঢাকা,
ঘোলাটে হইয়া মেঘেছে বৃষ্টি ধোয়া দিয়া,—
সোঁ সোঁ সবটা ভরি তার।
ঐ দেখা যায় কোন্ মায়াময়
দক্ষিণ দেশ—নদী-পার।

নয়ে হীন ;

একখানি শুধু মুদির দোকান—
সুখেই উহার কাটে দিন।
এই স্থানটিতে নিরালায় বসে' বেচা-কেনা,
কত চাষী-ভাই, নেজেদের সাথে ওর চেনা ;
পাটকাঠি দিয়ে বেড়া বাঁধিয়াছে—তার 'পরে
ধান ছ'সাতেক দে'ছে টিন।
একখানি ছোট মুদির দোকান,
এইখানে ওর কাটে দিন!

নাচে প্রাণ,—

তেপান্তরের মাঠে আজ রাতে
কুঁড়ে ঘরে আমি পেনু স্থান।
ভাসিছে বিশ্ব—অবিরল ধারা ঝর' ঝর',
সমুখে আমার নিবিড় আঁধার কালী-সম,
প্রদীপের আলো কাঁপে থাকি থাকি—ঝীঁ ঝিং, —
আমি বর্ষার গাহি গান।
তেপান্তরের মাঠে আজ রাতে
কুঁড়ে ঘরটিতে পেনু স্থান।

জেগে নাই—

মধুর শান্তি,—শীতল স্পর্শ,—
তার পরশাদ পায় সবাই।
আমি মনে মনে নৌকা খুলিনু আঁধিয়ারে,
ঘাটগুলি এর দেখে যাব দুই পারে পারে,
আমার সাথে যে কথা হবে আজ—কত কথা,
উতলা হইয়া ছুটি তাই।
মধুর শান্তি,—শীতল স্পর্শ,—
ঘুমে অচেতন আর সবাই!

সর্ব্বনেশে মাছি

শ্রী রমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্

মাছি কি কি রোগ-বিকৃতি ঘটায়।—মাছিটি দেখিতে অতি ছোট, নিরীহ প্রাণী! তাহার উপরে, আহার, মশার মত মাছি কামড়ায় না, বা মৌমাছির মত হুল ফুটায় না! বরং গায়ের যেখানে বসে, সে যায়গায় সুড়সুড়ি লাগে! এমন মাছি যে নিরীহ না হইয়া, আমাদের সর্ব্বনাশকারী হইতে পারে, তাহা বোধ হয় কেহ ভাবিতেও পারেন না! কিন্তু, স্থির জানিবেন,—মাছির মত মানুষের শত্রু খুব কমই আছে! কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড্ জ্বর, চক্ষুরোগ, বসন্ত, কুষ্ঠ, Anthrax, কৃমি (এবং আফ্রিকার sleeping sickness ও দক্ষিণ আমেরিকার tropical sore) প্রভৃতি মারাত্মক ব্যারামগুলি মাছির সাহায্যেই ছড়াইয়া পড়ে!

মাছি অনেক জাতের আছে।—(১) ঘরোয়ানা ছ বা house fly (musca domestica), যাহারা সারাদিনই আমাদের বাড়ীর এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। (২) নীলমাছি (blue bottle, or meat, or blow fly)। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রখর; অনেক দূর হইতে খাদ্যের গন্ধ পাইয়া, অল্পক্ষণের মধ্যেই ইহারা তথায় উপস্থিত হয়। পাড়াগাঁয়ের পায়খানায়, এবং বিশেষ করিয়া আম-কাঁঠালের সময়ে, ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) মাংসীয়া মাছি।—ইহারা গরু-বাছুরের ক্ষতে ও নাকের মধ্যে ডিম পাড়ে। (৪) চিমড়া-মাছি (ficus)।—ইহারা বিড়াল কুকুর, ইঁদুর প্রভৃতির গায়ে বসিয়া, তাহাদেরই রক্ত পান করে। (৫) তেলিনী মাছি (beetle)।—স্পেনদেশীয় তেলিনী মাছির (cantharides) দেহরস গায়ে লাগিলে ফোস্কা পড়ে। (৬) পোদা-মাছি, বোধ হয় পার্থক্য মাছির বৃহৎ সংস্করণ, কাযেই বিরল। ইহাদের গঠন ও বর্ণ ঘরোয়া মাছিরই মত। (৭) শুদে-মাছি (fannia canicularis) আমেরিকায় পাওয়া যায়। [মৌমাছি, মাছি বর্গের মধ্যে গণ্য নহে।]

মাছিরা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের জীব—শীতকালে ইহাদিগকে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময়েই ইহারা ডিম পাড়ে।

জন্ম-কথা—যেখানে টাট্‌কা ও ভিজা ময়লা, সেখানেই মাছিরা থাকে; যেমন, তরকারী বা ফলের খোসা, পচা মাছ বা মাংস, গোবর, ভিজা আবর্জ্জনার স্তূপ, গোয়াল ঘর, আস্তাবল,—এই সব যায়গাতেই মাছির বেশী উৎপাত। মানুষের বাড়ীতে ও তাহার কাছে-কাছেই

সর্ব্বনেশে মাছি

মাছিরা বাস করে। আঁস্তাকুড়, জঞ্জাল, গোবর, মানুষের, পক্ষীর, শূকরের ও ঘোড়ার বিষ্ঠা, পচা মাংস বা খারাপ-ঘা, পচা শাকসব্জী—এই সকল যায়গাতেই মাছিরা ডিম পাড়ে।

(ক) প্রত্যেক স্ত্রী-মাছি, এক একবারে, আশী হইতে ষোল শত মুক্তার-মত-সাদা ধব্‌ধবে, স্বচ্ছ, নরম, ডিম পাড়ে। আবর্জ্জনা কোথাও পড়িয়া থাকিলে, আপনা-আপনিই তাহা হইতে ঈষৎ উত্তাপ উৎপন্ন হয়। সেই অল্প-তাপই মাছির ডিম ফোটাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

(খ) পাড়িবার আট হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, ডিম

ফুটিয়া, ছোট-ছোট, সুতার মত সরু, সাদা, কুল্‌কুলে নরম, "কীড়া"বা শূক-কীট (larva) বাহির হয়। ইহাদিগকে ইংরেজিতে maggot বলে। শুচু, বায়ুর আর্দ্রতা ও পচনশীল বস্তুর উত্তাপের তারতম্য বশতঃই, ডিম ফুটিবার সময়ের তারতম্য লক্ষিত হয়। এই কীড়াগুলি রাক্ষুসে ক্ষুধা লইয়া জন্মায়—বিশ্বগ্রাস করিলেও তাহাদের তৃপ্তি হয় না। ইহার অজীর্ণ রক্ত খাদ্যকণা থাকে;—আর, সেই খাইয়াই, কীড়া-গুলি বড় হয়;—তাহাদের মা ডিম প্রসব করিয়াই তাহা-দিগের সঙ্গে চির জন্মের মত সম্বন্ধ ফুরাইয়া উড়িয়া যায়। এই কীড়া-অবস্থাতে তাহারা ৯।১০ বার খোলস বদলায়। আট হইতে চৌদ্দ দিন এই কীড়া-অবস্থা ও অনবরত খাওয়া চলে; মতান্তরে, ৪।৫ দিন।

(গ) এত খাওয়ার ও খোলস বদলের ফলে, তাহাদের দেহের পূর্ণ-পরিণতি ঘটে, দেহের আবরণ কঠিন হয়, এবং গাত্রবর্ণ ঘোলাটে হইয়া উঠে। তখন তাহারা মিরিবিলি যায়গা খোঁজে—এমন কি, মাটির নীচেও যায়। ইহার পরে, প্রজাপতির ন্যায়, গুটি (cocoon) প্রস্তুত করিয়া, মাটির নীচে বা পাথরের ফাঁকে, চার পাঁচ দিন ইহারা থাকে। এই অবস্থাকে শূক-কীটাবস্থা (pupa বা পুত্তলি অবস্থা) বলে।

(ঘ) এই অবস্থার শেষ ভাগে, দেহচর্ম্ম ভেদ করিয়া পূর্ণাবয়ব-মাছি বাহির হয়। তখনো তাহার দেহ নরম থাকে ও পাখা খোলে না। কিয়ৎক্ষণ হাওয়া লাগিলে, সবই ঠিক হয়। পূর্ণাবয়ব-মাছি জন্মিবার ৪।৫ দিন পরেই, ডিম প্রসবে সমর্থ হয়। অনেক কীট একবার ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়; কিন্তু, মাছি সারা গ্রীষ্মের মধ্যে, পাঁচ-ছয় বার ডিম পাড়িতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একটা গ্রীষ্ম ঋতুতে, একটি মাত্র স্ত্রী মাছির পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা দাঁড়ায়—১৮,০০০,০০০,০০০ (এক হাজার আট শত কোটি)! আর ইহারা, প্রত্যেকটিই, এক-একটি মারাত্মক রোগের বাহন! জন্মস্থানের এক মাইল (কেহ, কেহ ৪।৫ মাইল) পরিধির মধ্যে মাছিরা অনায়াসে যাতায়াত করে।—তাহা হইলেই, লোকের বাসস্থানের কত দূরে ময়লা ফেলাইবার বা পুঁতিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

তিনটি উপায়ে মাছিরা রোগ-বিস্তৃতি ঘটায়; যথা:—

(১) মাছিদের পায়ে অসংখ্য লোম আছে [ছবি ২] কাযেই, যদি কলেরা-রোগীর বমন, কালাজ্বর-রোগীর পায়খানা বা কুষ্ঠ-রোগীর ক্ষতে বসিয়া, সেই মাছি কোনও খাবারে বসে, তবে, সেই খাবারে, মাছির

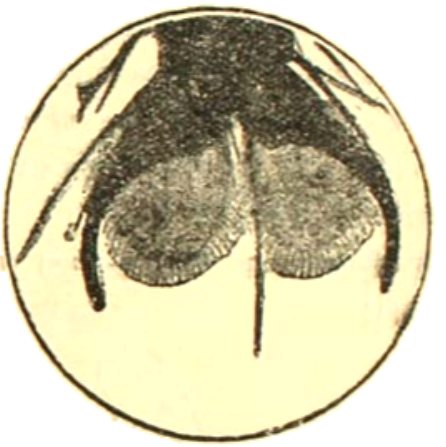

মাছির পা খুব বড় করিয়া দেখান

পায়ের লোম হইতে খসিয়া অসংখ্য ঐ ঐ রোগজীবাণু পড়ে! পরে, সেই খাবার যে যে ব্যবহার করে, তাহার তাহার ঐ ঐ রোগ ধরিবার কথা।

(২) মাছিরা দিনে ২০।৩০ বার মলত্যাগ করে। মাছিরা যে তরল খাবার তাহাদের শুঁড় দিয়া শোষিয়া খায়, সেই খাবারে যে যে রোগজীবাণু থাকে, সে রোগজীবাণুরা মাছির পেটের মধ্যে গিয়া মরিয়া যায় না—আট দিন পর্য্যন্ত তাহারা তথায় সতেজ থাকে। এক একটি মাছির পেটে দশলক্ষ ভাষ্য রোগ-জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। কাযেই মাছির মলের সঙ্গে ভাষ্য রোগ-জীবাণুগুলি বাহির হয়। আর মাছির এমনই কদভ্যাস যে, যে খাবার খাইতে থাকে, তাহারই উপরে মলত্যাগ করিয়া যায়। মাছির মল অতীব ক্ষুদ্র কালো বিন্দুর মত দেখায়। সেটি লক্ষ্য না করিয়া, মাছির মলদুষ্ট খাবার খাইলেও রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

(৩) মাছি যখন কোনও কঠিন খাবারে বসে, তখন সেই কঠিন খাদ্যটিকে নরম করিবার জন্য, তাহার উপরে এক ফোঁটা লালা বমন করে [ছবি ৩]। মাছি যে যে

নোংরা খাদ্যে বসিয়াছিল, লালার সঙ্গে সেই সেই নোংরা খাদ্যও উক্ত কঠিন মলে লাগিয়া যায়। সাধেই, সেই কঠিন খাদ্যটি খাইলে, অজ্ঞাতে মাছির লালা-স্থিত বহু রোগ-জীবাণুও ভক্ষণ করা হয়। কাযেই পীড়া জন্মায়।

মাছির নৈসর্গিক শত্রু কে?—পতঙ্গভুক্ পক্ষী, বিছা, টিকটিকি, ব্যাং, মাকড়সা, পাখী, • বোলতা, Robber fly, মোরগ, • পিঁপড়া। আমেরিকার House fly fungus (Empusa) seen in Aug. to Oct., enters the breathing organs of and kills flies (মহুক ঘটায়)। [• চিহ্নিত গুলি ধাড়ী মাছি খায় না, মাছির ডিম বা বাচ্চা খায়।]

মাছি নিবারণের উপায়—"মশা মারিতে কামান পাতা!"

খাদ্যের উপরে মাছি লালা বমন করিতেছে

(১) আবর্জনা ঢাকিয়া রাখিয়া, দিনান্তে পোড়াইবে; বা, গভীর গর্ত করিয়া, পুঁতিবে। কণিক আবর্জনা ভক্ষণের ও স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে যে পাত্র ব্যবহৃত হইবে, তাহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের গায়ে আলকাতরা মাখাইবে বা কিনাইল দিয়া ধুইবে। Dustbinগুলি ঢাকনীযুক্ত হওয়া চাই: এবং প্রত্যেকবার ময়লা ফেলিবার পরে, তাহার ঢাকনী চাপা দেওয়া চাই। মাঝে মাঝে, ডাষ্টবিনে সোহাগা বা ব্লীচিং পাউডার ছড়ান উচিত। এদেশে, গৃহস্থ যখন তখন যেখান-সেখান ময়লা রাস্তায় ছড়িয়া ফেলেন; এবং সরকারী dustbin, ময়লা-ফেলা গাড়ী ও মেথরের বালতির অধিকাংশে স্থলেই কোনও ঢাকনী থাকেই না! [সুহৃদ্বর,—বাড়ীর ময়লাগুলির উপরে উনানের ছাই ছড়াইয়া, পরে কাগজে মুড়িয়া, যদি রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে ফেলেন বা পুঁতিয়া বা পোড়াইয়া ফেলেন, ত খুবই ভাল হয়। ডাষ্টবিনে সরকারের ত্রুটি পাইলেই জানাইবেন।]

(ক) কলিকাতায়—dustbinগুলির প্রায়ই ঢাকনী থাকে না। যদিও থাকে, তাহা হইলে, কোনও গৃহস্থবাড়ীর লোক যদি একবার তাহা খোলে, তবে জাতি যাইবার ভয়ে, অপর কেহই তাহা বন্ধ করেন না। বন্ধ করা দূরের কথা—দূর হইতে ডাষ্টবিনে ময়লা ছুড়িয়া ফেলেন—পাছে জাতি যায়! তাহার ফলে, চারিদিকে ময়লা ছিটাইয়া পড়ে। মিউনিসিপ্যালিটিও এক একস্থানে এমন মাপে-ছোট বা কমসংখ্যায় dustbin বসান, যে ময়লা উপচাইয়া পড়া ছাড়া সেখানে উপায় থাকে না!!!

(খ) ময়লা-ফেলার ঘোড়ার, গোরুর ও লোকের গাড়ি, ও ময়লা বোঝাই করিবার platformগুলি যেমন সর্বদাই অনাবৃত তেমনি নোংরার আড়ৎ। ঐ গাড়ীগুলি ধোয়া বা কাড়া হয় না এবং বাজড়রা অবাধে ময়লার গাড়ী হইতে platformএ তাকড়া প্রভৃতি বাছে, তকায় ও জড় করিয়া রাখে। রেল গাড়ির উপরে ত্রিপল (tarpaulin) যোগান দিলেও উপিরা যায়!!!

(২) খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়—কখনো এক সেকেণ্ডের জন্য অনাবৃত রাখিবেন না। যে খাদ্যগুলি ধোয়া যায় না (যেমন মিষ্টান্ন, মিছরি, চিনি, গুড়, মুড়ি, বাতাসা, খৈ ইত্যাদি) সেগুলি পরিষ্কার কাচের বা জাল দেওয়া আলমারির মধ্যে রাখিতে হয়। এই খাদ্যগুলি ক্রয়-কালীন দেখিতে হইবে যে, পরিষ্কার অবস্থায় তাহারা প্রস্তুত ও রক্ষিত হয় কিনা; তাহা না হইলে, ঐ গুলি পরিত্যাজ্য—বিশেষ করিয়া ব্যামোর প্রকোপ সময়ে।

(৩) অপরিষ্কার বা কতমুক্ত শিশুদিগকে খোলা যায়গায় শোয়াইবেন না; কারণ, তাহাদের কাণে, নাকে ও ক্ষতে মাছিরা ডিম পাড়ে। ঘায়ের পোকাই মাছির কীড়া!

(৪) মাছি নির্মূল করিবার জন্য—

(ক) মাছি জন্মাইতে পারে—এমন এতটুকু আবর্জনা বাড়ীর ভিতরে বা বাহিরে রাখিবেন না।

(খ) যদি কোথাও আবর্জনা থাকে—তবে তাহা পোড়াইবেন, বা তদুপরি সোহাগা ছড়াইবেন। সোহাগা

যারা মাছির ডিম ও কীড়া নষ্ট হয়। (1 lb. borax to 1d cft. গোবর)

(গ) জাল-দেওয়া হাতার সাহায্যে মাছি ধরিবেন—কখনো হাতে করিয়া নহে।

(ঘ) চিটাগুড় বা রজনচূর্ণ ও রেড়ীর তৈল মাখান কাগজ রাখিলে, তাহাতে মাছিরা আটকাইয়া যায়।

(ঙ) সমান ভাগ কর্বলীন+দুধ+চিনি মিশাইয়া, তাহাতে ব্লটিং কাগজ ভিজাইলে, তাহাতে মাছি জড়াইয়া যায়।

(চ) Pyrethrum (আকরকরা রুট) পুড়াইলে মাছিরা মরে।

(ছ) কলা, চিনি, গুড়, দুধ, সির্কা, বা মাখন চটচটে কাগজে মাখাইলে, মাছি তাহাতে আটকাইয়া যায়।

(জ) Pot. cyanide Paris green, Aniline dyes, Sal. arsenite, Pyridine—ইহারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মাছি ধ্বংস করে। কিন্তু এগুলি তীব্র বিষ।

ফরাসী কথা-সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

গল্পই হ'চ্ছে ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, গৌরবের সামগ্রী। ছোট গল্পের পরিচয় বিশ্বের বুকে সর্ব্বাগ্রসুন্দর ক'রে দেবার গৌরব ফরাসী সাহিত্যই সর্ব্বপ্রথম অর্জ্জন করে। কল্টিনেন্টাল সাহিত্যে যখন ছোট গল্প ব'লে বিশেষ কিছুই ছিল না,—মধ্যযুগের ধর্ম্মপ্রবণতার নীতিকথা ও চারণ-কবিদের গাথাই যখন য়ুরোপের একমাত্র কথা-সাহিত্য ছিল, সে যুগে নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সর্ব্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল ফরাসী সাহিত্যই।

সেটা হ'চ্ছে দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর কথা। সারা য়ুরোপে তখন সাহিত্য বলতে "ফেব্‌লা" (নীতিকথা), 'লে' (গাথা) আর "এপিক্" কাব্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। সে যুগে চিঠিপত্র লেখা ও জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ রচনা ছাড়া গদ্য বা রোম্যান্স যে ভাষে লেখা যায় এ ধারণা য়ুরোপের শিক্ষিত জনসাধারণের ছিল না। সে যুগে কবিতারই মত অথচ কবিতা নয় এমনি এক ভঙ্গীতে গল্প লেখা সর্ব্বপ্রথম সুরু করলো ফরাসী লেখকেরা। সে রচনাগুলিকে ঠিক কবিতা বলা যায় না, গদ্যও সেগুলি নয়। কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে গল্পগুলি এমনি ভাবে বলা হোত যে কবিতার চেয়ে সেগুলি পাঠকদের কাছে আরো প্রিয়তর হ'য়ে উঠ্‌লো। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই ধরণের লেখা উত্তরোত্তর ফ্রান্সে অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌লো। এই ধরণের গল্প বা গদ্যকাব্যের সর্ব্বপ্রথম স্রষ্টা হচ্ছেন প্রতিভাশালী লেখক "বার্ণিয়ার" (Bernier)। তিনি আজও অমর হ'য়ে আছেন ফরাসী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম গল্পস্রষ্টা হিসাবে। এঁর Divided Horsecloth ফরাসী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প। 'বার্ণিয়ারের' রচনায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে সে যুগের খ্যাতনামা কবি "রুটেবাফ"ও (Rutebeuf) এই ধরণের গল্প-কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেন। কিন্তু বার্ণিয়ারের মত গল্প লিখবার প্রতিভা তাঁর ছিল না তাই তাঁর গল্প জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি,—কবি হিসাবেই ফরাসী সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি হল। তারপর আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও নাম ফরাসী গল্প-কবিতার মধ্যে পাওয়া যায় না।

তারপর একেবারে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা।

হঠাৎ গদ্য-কবিতার অস্তিত্ব ফরাসী সাহিত্য থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেলো একেবারে আকস্মিক ভাবে। চারণ-কবিরাই ফরাসী সাহিত্যের প্রাণ ছিল; অভিজাতগণের আনুকূল্যের অভাবে তাদের সংখ্যা এযুগে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হ'য়ে আসে, তারই ফলে গদ্য-কবিতার মধ্য দিয়ে যে সাহিত্য গ'ড়ে উঠ্‌

ছিল তাও লুপ্ত হ'য়ে গেলো পূর্ণবিকাশ লাভ করবার আগেই।

এই সময় একদল নবাগত চারণ-কবির আবির্ভাব হোল। ইটালি ও সিসিলি থেকে এরা এল ফ্রান্সে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায়। গান গাওয়ায় চেয়ে যাদুকর হিসাবেই এরা প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করলো। তা ব'লে গাথা এরা যে একেবারেই গাইতো না এমন নয়, তবে যে গাথা এরা গাইত তা একেবারেই গদ্য, কবিতার লেশটুকুও তার মধ্যে নেই। ফরাসী দেশে গদ্য গল্পের যে এরাই প্রথম প্রবর্ত্তন করল নিজেদের গদ্য-গাথাগুলির মধ্য দিয়ে। এরা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তেই এদের প্রভাব তদানীন্তন ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ-ভাবেই উপলব্ধ হ'তে লাগ্‌লো। তারই ফলে সেকালের বিখ্যাত লেখক "বোকাকসিও" (Boccaccio) এই নতুন ধরণে গল্প লিখ্‌তে সুরু করলেন। তাঁর দলভুক্ত যে ক'জন লেখক ছিলেন তাঁরাও তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করলেন। ফলে ফরাসী সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক সৃষ্টি হোল এবং তা বিকাশলাভের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হোল বোকাকসিওর দলবদ্ধ চেষ্টায়।

—এই ভাবেই সর্ব্বপ্রথম গদ্য কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি।

তারপর আর একদলের ঘট্‌লো অভ্যুত্থান। এটি ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী "রাবেলায়" এর (Rabelais) দল। মার্গারেট দ্য ন্যাভার্ (Marguerite de Navarre), অন্তইন দ্য সেন্তার্ (Antoine de Centre), নোল্ দু ফেল্ (Noel du Fail), বোনাভেন্তার্ দ্য পেরিয়ার (Bonaventure des Periers), বেরোল্ড্ দ্য ভারবিল্ (Beroalde de Verville) প্রভৃতি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ লেখকদের—এই দলভুক্তদের মধ্যে গণ্য করা যায়। আধুনিক লেখকদের মত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এঁদের না থাক্‌লেও সংস্কার-বর্জ্জিত সৃষ্টি এঁদের ছিল। রূপকথার আর রাজরাজড়ার কাহিনী ছাড়াও মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গৃহস্থ-সংসারের বিষয়বস্তু নিয়েও যে গল্প হয়—এই ভাব ফরাসী সাহিত্যে এঁরাই প্রথম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। শুধু এই নয়, কতকগুলি দুষ্টক্ষত রীতিনীতিকে শোধিত করবার জন্য এঁরা তদানীন্তন সমাজকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি। আচারে-ব্যবহারে শিক্ষাদীক্ষায় এঁদের উন্নত আদর্শবাদ এঁরা প্রচার করতে চেষ্টা করেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। আংশিক ভাবে সফলকামও হয়েছিলেন এঁরা এঁদের গল্পের অধিকতর জনপ্রিয়তায়।

তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর সুরু।

এযুগে দু'জন শ্রেষ্ঠ গাল্পিক জন্মগ্রহণ করেন—এঁরা হচ্ছেন "লা ফন্টেন্" (La Fontaine) ও "চার্লস্ পেরাল্ট্" (Charles Perrault)। 'রূপকথা' বল্‌তে যা বোঝায় এঁরা দু'জন সেই ধরণের লেখায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইতি-পূর্ব্বে এ ধরণের গল্প ফরাসী সাহিত্যে ছিল না। এঁদের পরবর্ত্তী যুগে এমন কি অতি-আধুনিক লেখকদের অল্পসংখ্যক ক'জন ছাড়া রূপকথা-সাহিত্যে এঁরা অতুলনীয়। কিন্তু এযুগে রূপকথা সাহিত্য বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি, কেননা রূপকথার সঙ্গে নাটকীয় সাহিত্যের সংঘাত ঘট্‌লো এই যুগেই। নাটকীয় সাহিত্যের রোমান্টিক প্রেমের উদ্দীপনা, রাজরাজড়াদের পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর—মধ্যবিত্তদের সুখদুঃখের কাহিনী থেকে দর্শকদের নাটকের দিকে আকৃষ্ট ক'রে তুল্‌লো। নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন কথাশিল্পী রূপকথা লেখা ছেড়ে দিয়ে নাটকের প্রতিই ঝুঁকে পড়্‌লেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—"দ্য এল্‌ক্রিপ্" (D' Alcripe), "তেল্লেমেন্ত" (Tallemont), "কামাস্" (Camus) ও "শোরেল" (Sorel)। নাটকীয় প্রতিকূলতার জন্যই সপ্তদশ শতাব্দীতে "ফন্টেন্" ও "পেরাল্ট" প্রবর্ত্তিত ছোট গল্পের ধারা বিশেষ-ভাবে বিকাশ লাভ ক'রে উঠ্‌তে পারেনি, এবং কখনো পারতও না যদি না অষ্টাদশ শতাব্দীতে "ভল্টেয়ারের" (Voltaire) মত লেখক লেখনী ধারণ না করতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নীতিকথা ও আধ্যাত্মিকতার বাহুল্য প্রকাশ পেল ছোট গল্পের মধ্যে। অল্টেয়ারই সেযুগে এই ধরণের লেখার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ছিলেন। আর শুধু স্রষ্টা বল্‌লেই হবে না, এই ধরণের নীতিমূলক গল্প সুচিন্তিত তীব্র ভাবধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়,—অন্যান্য লেখকের উপরও তাঁর প্রভাব ছিল অনতিক্রমণীয়। "মার্মোন্টেল"ও (Marmontel) যদিও ভল্টেয়ারের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে পারেননি তা হ'লেও

ভল্টেয়ার ও তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে অন্তর্বিস্তর পার্থক্য ছিল। ভল্টেয়ারের প্রকাশভঙ্গীতে ছিল শীর্ষ তীব্রতার বিকাশ আর মাঁতেস্কিউর রচনার মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা। তা হোক্, আসলে কিন্তু মাঁতেস্কিউ ভল্টেয়ার-প্রবর্তিত ধারাটিকেই ক্রমবিকাশের পথে প্রসারিত ক'রে দেন।

ভল্টেয়ারের ধারা কিন্তু স্থায়িত্ব লাভ করতে পারলো না, জার্মান ও ইংরাজ সাহিত্যের প্রভাব এসে পড়লো ফরাসী সাহিত্যের উপর। কোথা দিয়ে কি একটা যে পরিবর্তন ঘ'টে গেলো, এমনি আকস্মিক ভাবেই সেটা ঘটলো যে তখনকার লেখকেরা যখন সেটা অনুভব করতে পারলেন তখন সে পরিবর্তনের স্রোতে না ভেসে আর থাকা চলে না। দুটি লেখক এই পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন 'জেরার্ড দা নার্ভেল" (Gerard de Nerval) ও "আল্‌ফ্রেড দা মাস্যে" (Alfred de Musset)।

—এই পরিবর্তন ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

এই নতুন ধারার মূল কথা হ'চ্ছে গল্প শুধু গল্পই—তার মধ্যে নীতিকথা ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার না করলেও তার সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হয় না, পাঠককে একটুখানি আনন্দ যোগাতে সুখদুঃখের সাধারণ ছবি চিত্রিত ক'রেই গল্পের সার্থকতা। গল্পসাহিত্যের যে পারমার্থিক কিছু উদ্দেশ্য না থাকলেও চলে, দেহত্বের সঙ্গে চরিত্রের পশুত্বও যে গল্পসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করা ছাড়া হানি করে না একটুও—এই মতবাদ সাফল্যের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাল্‌জাকের (Balzac) সাহিত্যে। ইনি যে ছাঁচে গল্পসাহিত্যের ধারাকে মূর্ত্তি দিলেন তা'ই এঁর পরবর্ত্তী লেখকদের লেখনীতে—"আনাতোল্ ফ্রাঁস্" (Anatole France), "দোদে" (Daudet) "কপ্পি" (Coppee), মোপাসাঁ (Maupassant) প্রভৃতি প্রতিভা-শ্রেষ্ঠদের রচনা-গৌরবে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠে। এঁদের লেখনীর মুখে যে সকল গল্প রচিত হয়েছিল আজও তা বিশ্বসাহিত্যের বুকে ফ্রান্সের গৌরব বহন করে। এমন চমৎকার গল্প এত অধিকসংখ্যক অর্জ্জন করবার সৌভাগ্য অন্য কোন দেশের হয় নাই শুধু চমৎকার বললেই হয় না, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর এমনি একটা মিষ্টি ঢং আছে, যা সৌন্দর্য্যকে অতি-আধুনিক প্যাটনায়া পাল্কিকেরাও ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারেন নি,—তাঁরা তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য আজও পাঠকদের কাছে নতুন! মোপাসাঁ, ব্যালজাক্ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত ধারায় আজও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি ফরাসী সাহিত্যে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ধারাই চিত্তাচরিত্র প্রথার বহু পুষ্টিসাধন করছিল। তারপর একটা নব ভাবের আভাস পাওয়া গেছে বটে কিন্তু সে সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কোন আলোচনা করবার সুযোগ হবে না।

এবার কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।—

"বার্বিয়ার" সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় দেবার সুবিধা হোল না। এর নামটুকু শুধু জানা যায় কয়েকটি গল্পের নাম্নে এঁর নাম থাকতে দেখে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফরাসী গল্প-সাহিত্যে ইনি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তখনকার রচনার সঙ্গে এঁর গল্পের তুলনা করলেই। এঁর ষ্টাইল্ সরল ও স্বচ্ছ এবং অধিকাংশ গল্পের বিষয়বস্তু রাজপরিবার বা সভাসদ্‌গণের জীবনী হ'তে গৃহীত। এঁর বিখ্যাত গল্পের নাম আমরা পূর্ব্বেই করেছি।

৪

তারপরই "রাবেলাঁ"এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁর জন্মতারিখ ঠিক পাওয়া যায় না, চৌদ্দ-শো-নব্বই থেকে পনেরো-শোর মধ্যে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই জানা যায় শুধু। এঁর পিতামাতা এঁকে ডাক্তার ক'রে তোলবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন,এবং এঁকে 'মন্টপেলার'সহরে পাঠান ডাক্তারী শিক্ষার জন্য—তারপর পাঠান 'লিয়নে'। 'লিয়নে' ইনি ভবিষ্যতে ডাক্তারী প্র্যাক্‌টিস্ করতে সুরু করেন কিন্তু পসার বিশেষ ভাবে না জমায় অবসর-সময়ে সুরু করলেন লিখ্‌তে—যদিও জীবনের নানা বিপর্য্যয়ে ধারা-বাহিক ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করবার সুযোগ এঁর হয়নি। শেষজীবনে ইনি ধর্ম্মযাজক হন, কিন্তু সে কিছু দিনের জন্য মাত্র। পনেরো-শো-তিপ্পান্ন খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর রচনার মধ্যে পাণ্ডিত্যের আভাস আছে, আর জীবনের উপর

সংগঠনের চেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই আছে যথেষ্ট। ফরাসী কথা-সাহিত্যে ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন।

•

অগ্রগতি-সৃষ্টির দিক থেকে দেখতে গেলে ষোড়শ শতাব্দীতে "মার্গারেট্ অব ন্যাভার"এর লেখাই শ্রেষ্ঠ। ইনি 'ন্যাভার'-রাজের দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং পরাক্রান্ত ফরাসী নরপতি চতুর্থ হেন্‌রীর মাতামহী। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এঁর পাণ্ডিত্য তো ছিলই, তার চেয়েও বেশী ছিল এঁর রাজনৈতিক প্রতিভা। লেখিকা হিসাবেও ফরাসী সাহিত্যে এঁর বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। কবিতা ও গল্প—দুইই ইনি লিখতেন বটে কিন্তু এঁর গল্পই বিশেষ জনপ্রিয়,কেন না আচার-ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতিকে সংশোধিত করবার জন্য ইনি তদানীন্তন সমাজকে বিশেষ ভাবেই আক্রমণ করেছিলেন এঁর গল্পের মধ্যে। জীবনের উপর ছিল এঁর বিচক্ষণ অন্তর্দৃষ্টি আর প্রকৃতির উপর ছিল এঁর নিগূঢ় ভালোবাসা। আচার ব্যবহার শিক্ষা সম্বন্ধেও এঁর একখানি বই আছে, যেখানি ফরাসী জনসাধারণ আজও আগ্রহ সহকারে পড়ে।

•

চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে চার্লস্ পেরল্ট্ অন্যতম। শুধু লেখক হিসাবেই ইনি অগ্রণী ছিলেন না, পাণ্ডিত্যে ও সরকারী কাজকর্মেও ইনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। এঁরই সময়ে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থী লেখকদের মধ্যে একটা বিরোধ বাধে। নব্যপন্থীদের পক্ষ নিয়েই ইনি এ বিসম্বাদে যোগ দেন এবং শেষ পর্য্যন্ত নব্যপন্থীর অন্যতম হিসাবে নিজেকে পরিচিত করেন। রূপকথা রচনায় ছিল এঁর অসামান্য অধিকার, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রূপকথাই ইনি রচনা ক'রে গেছেন বিশেষ ভাবে। রূপ-কল্পনা ভরা এই ধরণীর বুক থেকে ইনি বিদায় নিয়েছেন সতেরো-শো-তিন খৃষ্টাব্দে পঁচাত্তর বছর বয়সে।

•

"থ্রি মাস্কেটিয়ার্স"ও পেরল্টের সমসাময়িক যুগের লোক। তাই খোরীতে ষোল-শো-একুশ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম। প্যারি'তে ইনি শিক্ষা লাভ করেন, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে শাসন সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু কাজ করা এঁর পক্ষে সুবিধাজনক হোল না; অর্থশালী বন্ধুদের অর্থানুকূল্যে ইনি কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সুরু করলেন লিখতে। নীতিকথা ইনি লেখেন অনেক, তবে রোম্যান্টিক নাটকের জন্যই এঁর খ্যাতি হয় বেশী। শেষ জীবনে ইনি ফরাসী বিদ্যাপীঠের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। জগতের বুক থেকে ইনি বিদায় নেন ষোল-শো পঁচানব্বই সালে।

•

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন "ভল্টেয়ার"। ষোল-শো চুরানব্বই সালে প্যারী'তে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকারই একটি স্কুলে এঁর পড়াশুনা সুরু হয়। কিশোর বয়স থেকেই ইনি কবিতা লেখেন। এঁর পিতা কিন্তু এসব পছন্দ করতেন না, তাঁর ইচ্ছা ছিল ভল্টেয়ার যেন আইনজীবী হন। কিন্তু ভল্টেয়ার ছাত্রাবস্থাতেই এমনি সব লিখতে সুরু করলেন যার জন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হোল বেশকবার। শেষে দেশান্তরে পলায়ন করেন। ফ্রান্সের বাইরেই এঁর জীবনের অধিকাংশ দিন কেটে যায়। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে ইনি শুধু ফরাসী নয় য়ুরোপীয় সাহিত্যের উপর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করেন। এঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী—নাটক, ইতিহাস, খণ্ডরচনা, ছোট গল্প ও বিদ্রূপাত্মক রচনা সব কিছুতেই ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এঁর বিদ্রূপাত্মক গল্প ও সুচিন্তিত প্রবন্ধের জন্যই ফরাসী-বিপ্লব বিশেষ ভাবে বিস্তৃতি-লাভ করেছিল—এঁর রচনা পড়লে 'বুর্জোয়া'রা ক্রুদ্ধ না হ'য়ে পারতো না। সতেরো-শো উনআশী খৃষ্টাব্দে পঁচাশী বছর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

•

খুব অল্প বয়সেই মার্মন্টেল জনসাধারণের কাছ থেকে খ্যাতিলাভ করেন—তখন ইনি বয়সে বালক মাত্র। কয়েকটি কবিতা-প্রতিযোগিতায় অতি অল্প বয়সেই ইনি জয়লাভ করেন। তার ফলে ভল্টেয়ারের দৃষ্টি পড়ে এঁর উপর এবং ভল্টেয়ারেরই চেষ্টায় প্যারি'তে উচ্চ পদে ইনি নিযুক্ত হন এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সেই পদেই সুখে কালাতি-পাত করেন। নাটক, কবিতা, রোম্যান্স, গল্প ও সাহিত্য-সমালোচনায় ছিল এঁর অসামান্য প্রতিভা। ধনীদের

অর্থাভাবের অর্থচিন্তার হাত থেকে ইনি পরিত্রাণ পান এবং নিছক সাহিত্যচর্চ্চার দিকে মনোনিবেশ করবার এঁর সুবিধা হয়। সে যুগের করুণ বিয়োগান্ত গল্প-সৃষ্টিতেই ছিল এঁর খ্যাতি। এঁর প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ লেখকেরা বিয়োগান্ত গল্প লিখতে সুরু করেন। সাতষট্টি-শো-নিরানব্বই সাল পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

•

জীবনের বিভিন্ন দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে বাল্‌জাকের পরিচয় ছিল বাল্যকাল থেকেই। একে জীবনধারণের চেষ্টায় এক কাজ থেকে অন্য কাজে ঘুরতে হয়—দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের পেছনে ইনি জীবনটিকে বিশেষ করুণভাবেই উপলব্ধি করেন। শেষে ইনি প্যারি'তে পুস্তক প্রকাশকের দোকান করেন কিন্তু তাও টিক্‌লো না। হাতে সম্বল কিছু না থাকায় লেখাই তখন থেকে এঁর জীবনধারণের একমাত্র পন্থা হোল। ফলে ইনি বিশেষ যত্ন সহকারে গল্প লিখতে সুরু করলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক হিসাবে জগতের বুকে এঁর খ্যাতি হয়। এঁর গল্পগুলির মধ্যে একটা নতুন চং ও ধারা ছিল, তার উপর ছিল সত্যিকারের ছোট গল্প বল্‌তে যা বোঝায় সেই গুণগুলি।—এঁর উপর এঁর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কোন লেখকের রচনার প্রভাব দেখা যায় না একটুও—এইটিই হ'চ্ছে এঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

•

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে "আলফন্‌স্ দোদে" শক্তিমান লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে স্বাভাবিকতা,—কল্পনাকে ইনি কখনো অবাস্তবের পর্য্যায়ে তুলে গল্পের অমর্য্যাদা করেননি। আঠারো বছর বয়স থেকে ইনি লিখতে সুরু করেন এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ফরাসী লেখকদের মত ইনি প্রথম যুগে কবিতাই লেখেন। তারপর লেখেন ছোটগল্প, শেষে উপন্যাস। অতি-করুণতার একটি ফল্গুধারা এঁর গল্পের অন্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়;—পাঠক-চিত্তের উপর এই জন্যই এঁর গল্পের একটি অন্তর্নিহিত প্রভাব আছে। আঠারো-শো-চল্লিশ খৃষ্টাব্দ থেকে আঠারো-শো-সাতানব্বই খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

এমিল জোলা-ও ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ লেখক। চমৎকার গল্প এবং কবিতা ইনি এত অধিক-সংখ্যক লিখেছেন যা অন্য কোনও ফরাসী লেখক লিখেছেন কিনা সন্দেহ। অবিশ্রান্তভাবে ইনি লিখতে পারতেন। 'দোদের' মত স্বাভাবিকতাই ছিল এঁর গল্পের প্রাণ—যা সাধারণতঃ ঘটে ও নিত্য যা ঘটছে তাই নিয়েই ইনি গল্প লিখতেন, কল্পনা সবসময়েই ছিল এর সংযত-বুদ্ধি। এঁর গল্পের অনুভূতি ছিল বিয়োগান্ত এবং ক্রম পরিণতি ছিল অনাড়ম্বর। অনেক সময় ইনি উপকথাও লিখতেন।

•

ফ্রাঙ্কো কবি দারিদ্র্যের পেষণে যারা সর্ব্বহারা তাদেরই কাব্য লিখে গাইছেন। সর্ব্বহারাদের রিক্ততাকে ইনি যেন প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেন, তাঁর কাব্যে তাই সেই ব্যথাবেদনা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু কাব্যের চেয়েও এঁর ছোট গল্পের স্থান অনেক উচ্চে। এঁর জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি।

•

গী দ মোপাসাঁ শত শত ছোট গল্প লিখেছেন। ইনি গল্প-সাহিত্যকে একটা নতুন ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন—যে রূপ বিংশ শতাব্দীর একটা বৈশিষ্ট্য। এঁর রচনার মধ্যে একটা অশ্লীলতার ইঙ্গিত পাওয়া কিন্তু গল্পের সৃষ্টিসৌষ্ঠবের দিক থেকে সে ত্রুটি সামান্যই। এঁর রচনার গল্পই এঁকে জগতে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। ইনি মাত্র বেয়াল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন; এঁর অকালমৃত্যু ফরাসী গল্পসাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছে।

•

আনাতোল ফ্রাঁস্‌এর জন্ম প্যারি'তে—আমরণ পর্য্যন্ত ইনি প্যারি'তেই ছিলেন। এঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য-গৌরব ছিল। এঁর লেখার মধ্যেকার কথা হ'চ্ছে মানবজীবনের নৈতিক অবনতি যা ফ্রান্সের বুকে বিশেষ ভাবেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাবে। উনিশ-শো-একুশ সালে ইনি পৃথিবীর অন্যতম সাহিত্য-পুরস্কার "নোবেল প্রাইজ" পান। উনিশ শো-চব্বিশ সালে ইনি ধরিত্রীর বুক থেকে বিদায় নেন।

এঁর পরবর্ত্তী লেখকদের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব হোল না, তা'ব'লে তাঁদের শক্তিকে আমরা অস্বীকার করছি না।

উদয়পুরের তিন দিন

শ্রী মৃণ্ময়ী রায়

মানুষের ভাগ্যবিধাতা অবোধ ভাষে কত-বিচার করেন! —তাই বাংলার অতি ক্ষীণ আশা যখন ফলপুষ্পে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, অরূপের অপূর্ব্ব রূপ যখন চোখের সামনে অল্পে অল্পে ফুটে উঠতে থাকে, চিরসঞ্চিত আশা যখন সফল হবার উপক্রম হয়, তখনও চোখের জলে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়—বেদনায় বুক ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে।

যাব, আমার মনে হ'ল এই ঠিক যাত্রা। সেই গৌরবময় রাজপুতভূমি—অতীতস্মৃতি বুকে ধ'রে যা' শ্মশানভূমি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে,—সেই জায়গাই ত আমার বেড়াবার উপযুক্ত স্থল।

মহাপঞ্চমীর স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় বোধন যখন শঙ্খরবে ঘরে ঘরে জেগে উঠে,—আমি তখন আমার পুত্র, দেবর ও

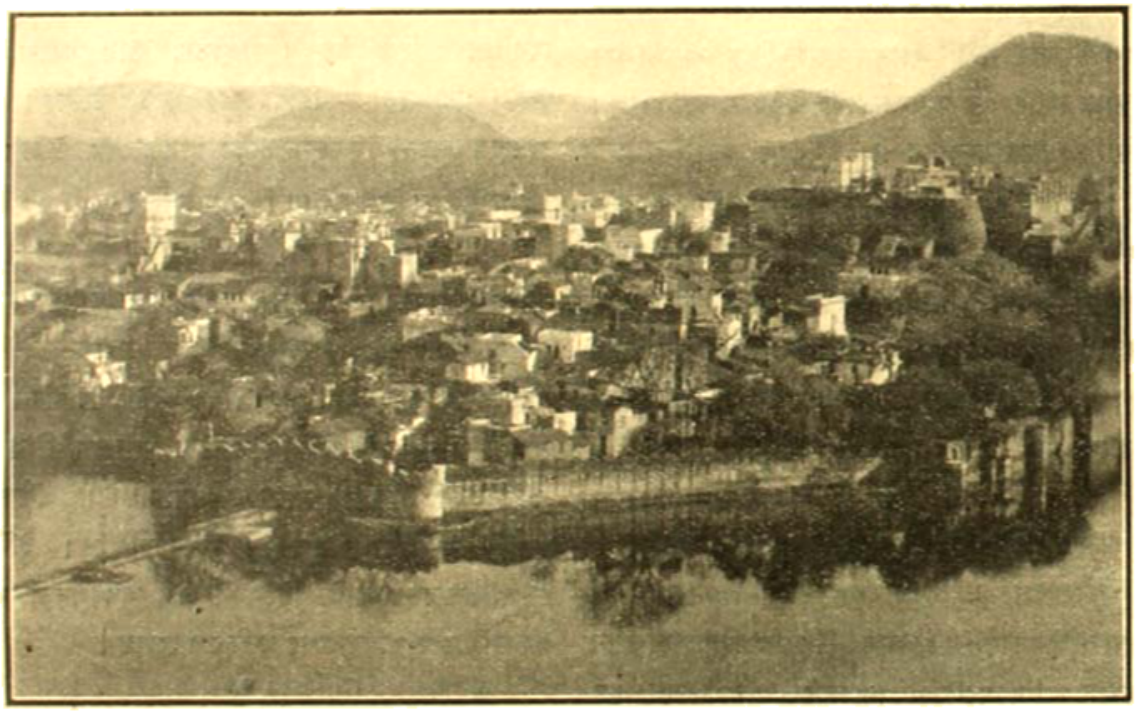

সাধারণ দৃশ্য—উদয়পুর

বেড়াবার সাধ মানুষের চিরদিনের,—কিন্তু এই সনাতন সাধ সময়-বিশেষে নেশার মত মানুষকে পেয়ে বসে। মৃত্যুর দূত যখন আমার ঘরের দ্বারে উপর্য্যুপরি ধাক্কা দিতে লাগল —আর সেই আঘাত পালন করতে আমার প্রিয়তম প্রাণের ধনেরা একে একে অসীমের পথে যাত্রা করলেন, তখন ঘরে টেকা দায় হ'য়ে উঠল,—ঘরের চাইতে বাইর আমাকে পাগল ক'রে তুলল। তাই শারদীয় পূজার ছুটী আসবার পূর্ব্বেই আমার পুত্র যখন বল্লেন এবার আমরা রাজপুতানা ভ্রমণে

মাতৃদেবীকে নিয়ে সজল নয়নে হাওড়া ষ্টেশন থেকে "আগ্রা দিল্লী এক্সপ্রেসে" রাজপুতানার দিকে রওনা হ'লাম। আমার ও মাতৃদেবীর জন্যে একটি প্রথম শ্রেণীর কুপ রিজার্ভ করে-ছিলাম,—অন্য আমার এক বন্ধুকন্যা ও পুত্র (তাঁরা কিষণগড়ে তাঁদের বাপের কাছে যাচ্ছিলেন), আমার দেবর ও পুত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা রিজার্ভ গাড়ীতে ছিলেন।

তারপর ক্রমান্বয়ে আগরা, জয়পুর ও আজমীর হ'য়ে আমার দেবর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন; আর

আমি—আমার ভ্রাতা (তিনি আজমীরে আমাদের সঙ্গে এসে মিশেছিলেন), মাতৃদেবী, পুত্র ও একটি ভৃত্য নিয়ে চিতোরগড় দেখে উদয়পুরে রওনা হ'লুম।

বেলা ন'টায় উদয়পুরের প্রসিদ্ধ গিরিপথ ঘোঘারী অতিক্রম কর্‌লুম। ঘোঘারীর পর হঠাৎ গাড়ী গেল থেমে,—আর যাত্রীরা "আও, আও" ক'রে চীৎকার কর্‌তে সুরু কর্‌লেন! নিকটস্থ পাহাড় থেকে অগণ্য বানর ও সন্তানকক্ষে বানরীরা নেমে আস্‌ছিল—যাত্রীরা লাল আটার মোটা মোটা "পুরী" তাদের দিকে

উদয়পুর চারদিকে প্রাচীরে ঘেরা,—তার পশ্চিমে পেশোলা হ্রদ আর রাজপ্রাসাদের শ্রেণী। প্রাচীরের বাইরে পূর্ব্বদিকের সমতলভূমিতে পোষ্টাপিস্ ও উদয়পুর হোটেল, উত্তরদিকে রেসিডেন্সি। এইখানে দাদারও বাড়ীখানি সুরম্য ছবির মতো। উদয়পুর যে অপূর্ব্ব-সুন্দর,—প্রকৃতি-শোভার সুন্দরতম নগরী, সে সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন মতভেদ নাই।

উদয়পুর সহরে অনেকটি "মিঠাপানি"র বড় কদর। কিন্তু দাদার বাড়ী জলের বড় স্বচ্ছলতা। উঁচু টিলার উপর

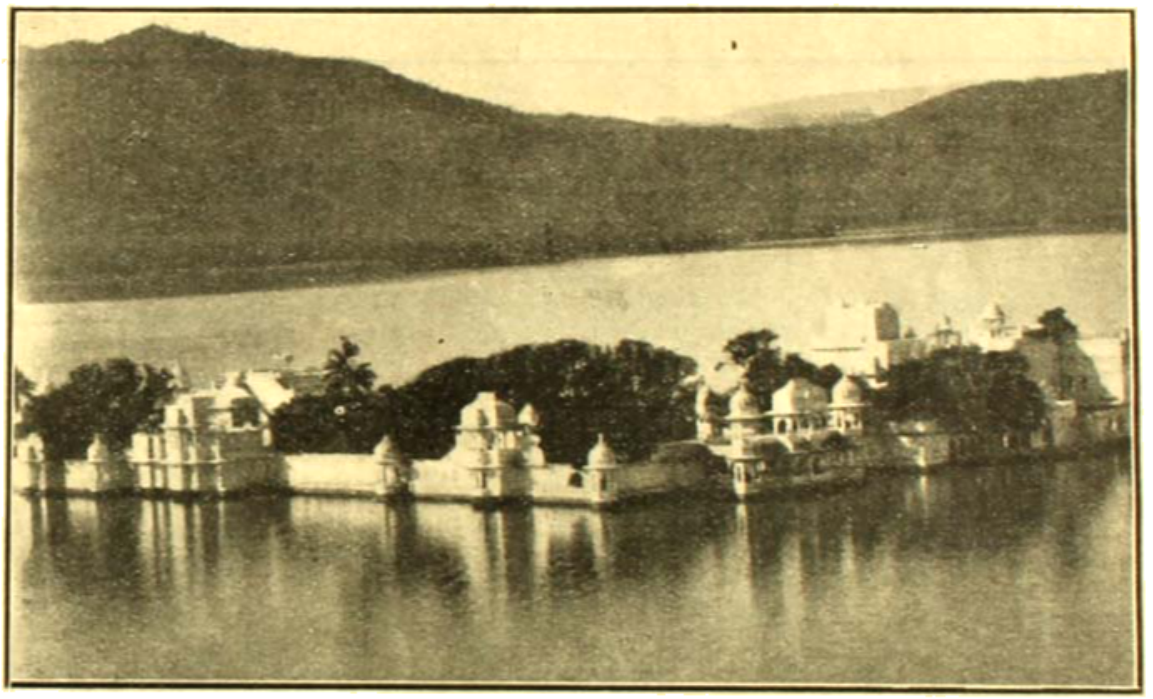

হ্রদ-প্রাসাদ—উদয়পুর

ছুড়ে দিতে লাগ্‌লেন। মিনিট পাঁচেক পরে পুনরায় ট্রেন চল্‌তে আরম্ভ করল। বেলা ১০॥ টা আন্দাজ আমরা উদয়পুর ষ্টেশনে পৌঁছলাম। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উদয়পুর রাজ্যের "দেওয়ান"। ষ্টেশনে তাঁর নিজস্ব মোটর গাড়ী নিয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেশ ও দাদার বাড়ীর সরকার দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখানে সাধারণ যাত্রীদের যে সব অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হয় সে-সবের কোন খবর বিশেষ দিতে পার্‌লাম না, কারণ আমি কোনই অসুবিধা বা জবা দিহির ভেতর পড়ি নি।

সহরের উঁচু নীচু রাজপথ দিয়ে মোটর ছুটল। প্রাচীন বাড়ী,—চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক আলো সংযুক্ত করা। নীরব-স্তব্ধ চতুর্দ্দিক—দূরে দূরে আরাবল্লী পর্ব্বতমালা যেন ধ্যান-মগ্ন ঋষির মতোই বসে' রয়েছে।

তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে আমরা নীলসলিলা পেশোলার তীরে উপস্থিত হ'লাম। পূর্ব্ব-তীর জুড়ে খুব একটা উঁচু জমির উপর প্রাসাদগুলি একেবারে হ্রদের ধার ঘেঁসে গাথা হ'য়েছে। প্রাসাদের তোরণ 'বড়ী-পোল'উত্তর দিকে। পূর্ব্ব দিকে আর একটি তোরণ আছে। বড়ী-পোলের পর ঘোড়াশালা ইত্যাদি। সেখান থেকে "বড়ী মহল" নামে প্রাচীন রাজপুরীতে গেলাম। প্রাসাদে

ঢুকবার পরই আমার পুর এবং ভাতুস্পুত্রের পদ বিনামা-শূন্য কর্‌তে ও মস্তকে একটি করে' উষ্ণীষ পর্‌তে হয়েছিল ;—এই নাকি সেখানকার রীতি। প্রাসাদ দেখ্‌তে হ'লে পাস লাগে, তাও সব কিছু দেখ্‌তে দেয় না। তবে আমাদের কোন পাস লাগেনি, আর একান্ত অন্দর মহল ছাড়া আমরা সবকিছুই দেখ্‌তে পেলাম।

বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ কয়েকটি মহলে ভাগ করা। তাতে অপর্য্যাপ্ত ভাবে যতকিছু বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। উদয়পুর মহারাণার বর্ত্তমানের ব্যবহার্য্য একটি ফটিক পাত্র দেখ্‌তে পেলাম।

এটির অন্দর-মহল পর্য্যন্ত দেখা গেল, কারণ মহারাণারা কেউ তখন সেখানে ছিলেন না।

তারপর 'ফতে সাগরের' পাশ দিয়ে গোলাপবাগ, উদয়পুরের চিড়িয়াখানা দেখে "খাসউকী" দেখ্‌তে গেলাম। পেশোলার পশ্চিম তীরে একটি ছোট অট্টালিকা পাহাড়ের উপর। দেখ্‌লাম সামনের পাহাড় থেকে পালে পালে শূকর নেমে আস্‌ছে,—অগণ্য, অসংখ্য। আর কিছু-ক্ষণ বাদে তাদের ভুট্টাদানা দেওয়া হ'তে লাগ্‌ল,—সে এক বিরাট ব্যাপার! বন্যবরাহের বিকট গর্জ্জন—তার কুটোপুটিতে দিক্‌সকল ধূম্রাকার হ'য়ে উঠ্‌ল। শুন্‌লাম ভূতপূর্ব্ব কোন

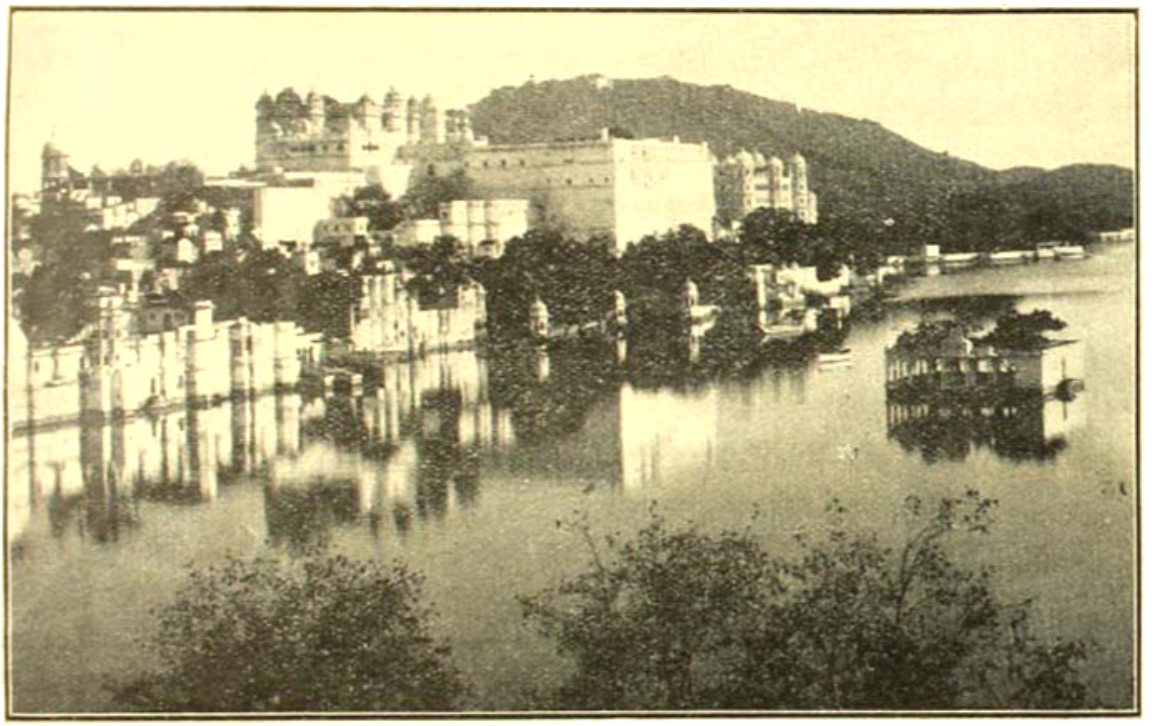

হ্রদ থেকে রাজপ্রাসাদের দৃশ্য—উদয়পুর

একটি মহল সম্পূর্ণরূপে কাঠের দেখা গেল। আর একটি মহলে ভূতপূর্ব্ব হ'তে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান মহারাণা পর্য্যন্ত বড় বড় অয়েল-পেন্টিং রয়েছে দেখ্‌লাম।

তারপর নৌকায় করে' পেশোলার মধ্যবর্ত্তী "জগ-মন্দির" প্রাসাদ দেখ্‌তে গেলাম। এই প্রাসাদে কিছুদিন সম্রাট সাজাহান যখন যুবরাজ খুরম ছিলেন তখন মেবার-রাজের অতিথি হ'য়ে বাস করেছিলেন। প্রাসাদের মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ উদ্যান। চতুর্দ্দিকে জল—মধ্যস্থলে এই মর্ম্মরগঠিত মন্দিরটি বেশ সুন্দর। এ প্রাসাদেও অনেক মহল আছে,—মহারাণা এইটি করিয়েছেন। এই খাবার বিতরণের সময় তিনি নাকি এই প্রাসাদের উপর থেকে শিকার খেল্‌তেন! এই অট্টালিকার ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বন্যবরাহ বাঁধা রয়েছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল, আর সারাদিন ঘোরা-ঘুরিতে শরীর বড়ই ক্লান্ত লাগ্‌ছিল কাজেই শূকর দর্শন খাওয়ার শেষ দেখ্‌বার জন্য অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না,—ফেরবার পথে 'ফতেসাগর' হ্রদের চারদিকে একবার ঘুরে বাড়ী ফিরে এলাম। ভাইপো ভাইঝিদের কাছে অনেক—অনেক অনুযোগ!—দুদিনের জন্য এসে একদিন

নাকি একেবারেই পোটা ঘুরে বেড়ালাম, পর করলাম না মোটেই।

তাদের সন্তুষ্ট করে' যখন শুতে গেলাম তখন রাত ১০টা। অতি প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি খোলা-ছাদে এসে দাঁড়ালাম। কি অপূর্ব্ব মহান্ দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ল, তা মানুষের ক্ষুদ্র ভাষায় বর্ণনা হয় না।—নিদ্রিত পুরী,—কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে সে যেন স্বপ্নের রাজ্য থেকে সদ্য সদ্য জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে নিয়ে সেদিন বেলা ৯টার সময় বাড়ীর মোটরে দাদার দুটি মেয়ে, মা, পুত্র এবং

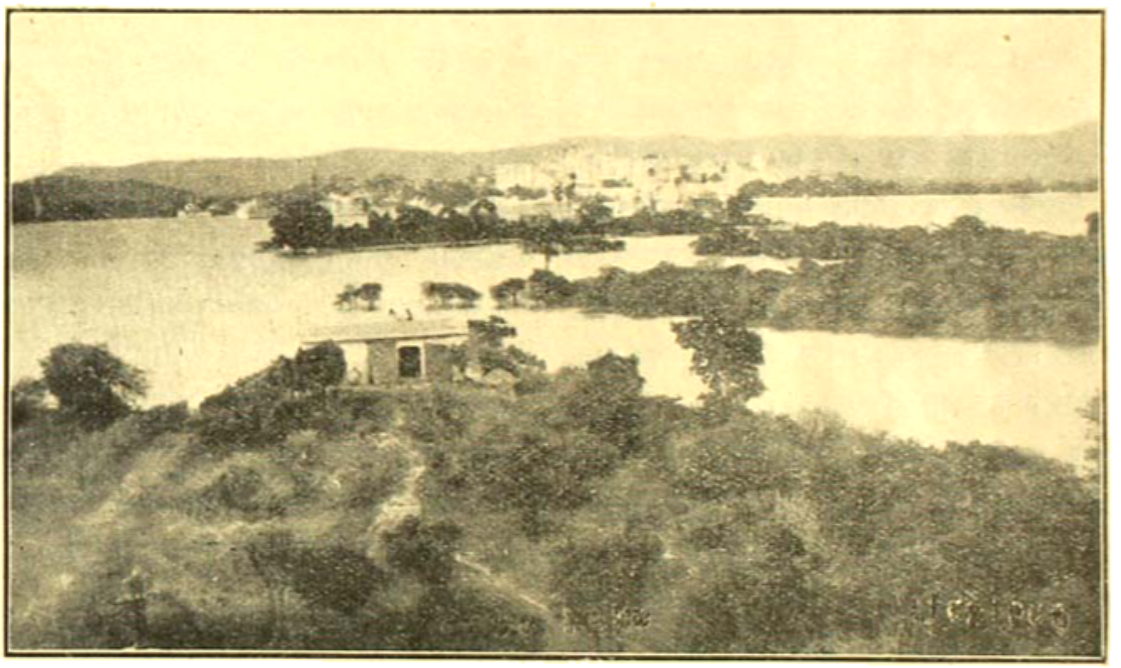

দৃশ্য-৪২—উদয়পুর

আমি জয়সমুদ্রের দিকে রওনা হ'লাম। জয়সমুদ্র উদয়পুর হ'তে ৩২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে; তার মধ্যে ১২।১৪ মাইল গভীর জঙ্গল,—মহারাণার "রিজার্ভ ফরেষ্ট"। প্রথম কয়েক মাইল কেবল সমতল ভূমি,—দুই পাশে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম,—আর অপর্ণা খেজুর গাছ। কয়েকটি থানা ছাড়িয়ে পেলাম বংশীমুড়া, হল্‌দুঘাটি—প্রভৃতি। হল্‌দুঘাটি থানার নিকট এসে আমাদের চাপরাসি "দেওয়ান জী" অর্থাৎ দেওয়ানের গাড়ী বলে' উচ্চৈঃস্বরে হাঁকল,—তৎক্ষণাৎ লোক এসে রাস্তার শিকল টেনে খুলে দিল। হল্‌দুঘাটি থানার পরই উর্দ্ধে পর্ব্বত ও বড় বড় বনস্পতির দল যেন সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে আজ পর্য্যন্ত একই ভাবে মৌন বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে। ১৩ মাইলের পর পাহাড়ের মধ্যে দোবারীর মতো একটা তোরণ দেখা গেল,—তার অন্যদিকে কেওড়া গ্রাম, তারপর ২২ মাইলের পর উংরাই শেষ হ'ল। এখানে একটি থানা আছে নাম কালোড়া,—২৮ মাইলের পর যে গ্রাম তার নাম পিথাবরা,—তারপর জয়সমুদ্রের পথ ধরা হ'ল। পথের দুই পাশে এভিনিউ এর মতো গাছ, ভারী সুন্দর!

জয়সমুদ্রের নিকটে এসে পৌঁছলাম। সৃষ্টি-কর্ত্তার হাতের মানব, কিন্তু তার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশল

দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'তে হ'ল। হ্রদের বিস্তৃত উঁচু বাঁধ হাত হাজার দিই লম্বা এবং দেড়শ' কিট উঁচু, বামদিকে মোটর উঠ্‌বার বেশ প্রশস্ত ঢালু রাস্তা—তবল স্পিড দিয়ে মোটর উঠাতে হ'ল। উপরে উঠে দেখ্‌লাম বেশ প্রশস্ত জায়গা আছে। মধ্য রাস্তা—নিকটের পর্ব্বতের উপরে জয়সিংহের শ্বেতবর্ণের প্রাসাদ। বামদিকে বিশ্রামাবাস,—ঠিক হ্রদের উপরে ঝুলে পড়েছে। বাঁধের দুই পাশে পাহাড়, আর সামনের দিকে মার্কেল পাথরে বাঁধান সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী-সংবলিত সুদীর্ঘ ঘাট, এক পাহাড়ের কোল থেকে আর এক পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আবার মোটরে নিয়ে বিশ্রামাবাসে বাখরা গেল। সেখানে ঠিক হ্রদের উপরেই একখানি ঘরে ছেলে মেয়েদের নিয়ে বসলাম। খানিকক্ষণ হ্রদের দিকে চেয়ে দেখ্‌বার পর ছেলেদের খাইয়ে নিয়ে হ্রদের তীরে এলাম। তখন বেলাও এসেছিল প'ড়ে' এইবার চোখের সামনে হ্রদের যে দৃশ্য ফুটে উঠ্‌ল, তাহার তা ব্যক্ত হয় না। এইসব পাহাড়ের নীচে বরাবরই জল সঞ্চিত থাকত। মহারাণা জয়সিংহ তার মুখে বাঁধ দিয়ে সেই বিশাল জলস্রোত রুদ্ধ করে' দিয়ে নিজের নাম অনুসারে তার নাম করেন—"জয়সমুদ্র"।

জয়সমুদ্র ত সমুদ্রই—বিশাল জলরাশি! হ্রদের বিরাট বক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য পর্ব্বত। এই পাহাড়গুলির অন্তরালে হ্রদের সীমারেখা দেখা যায় না, চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে পর্ব্বতমালা সাজান। সমস্ত হ্রদটির দৈর্ঘ্য শুনলাম ৯ মাইল এবং প্রস্থ ৫ মাইল। নৌকা করে' হ্রদের উপর ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে গেলাম। বাতাসে হ্রদের নীলাভ জল ঈষৎ কাঁপ ছিল। জল—শুধু জল! দূর দূরান্তে শ্যাম বৃক্ষলতাপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী,—এ কোন্ শিল্পীর অপূর্ব্ব পরিকল্পনা! প্রকৃতির এই লীলানিকেতনে মানুষের এই অপূর্ব্ব শিল্প—জয়সিংহের অপূর্ব্ব শিল্পী-মনের উদ্দেশ আমি সম্ভ্রমে মাথা নত করলাম।

খানিকক্ষণ ঘুরে আবার এলাম তীরে। এইবার ছেলে-মেয়েদের এবং ড্রাইভারের একান্ত অনুরোধে পর্ব্বতের উপরে মহারাণার প্রাসাদ দেখ্‌তে যেতে হ'ল। আমিও যত উঠ্‌ব না, ওরাও বলে, "এই বাকটুকু ঘুরলেই প্রাসাদ, এসো দিদীমা!"—তাদের সঙ্গে বাধ্য হ'য়ে উঠ্‌তে হ'ল। উঠ্‌লাম অতি অনিচ্ছাতেই। উপরে উঠে যে দৃশ্য চোখে পড়্‌ল, তা না দেখ্‌লে হয় ত উদয়পুর দেখা সম্পূর্ণ হ'ত না। স্তরে স্তরে ক্ষেত,—শস্যশ্যামলা সুন্দরী মেবার ভূমি!—অন্যদিকে হ্রদ, পর্ব্বতশ্রেণী,—সৃষ্টিকর্ত্তার লীলারহস্য দুই চোখ ভরে' দেখেও তৃপ্তি হচ্ছিল না। এইবার বাড়ী ফিরতে হবে,—সন্ধ্যা হ'লে পথে বাঘের ভয়, বাধ্য হ'য়ে নামতে হ'ল।

আবার সেই পথ, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মি-আভাস সমস্ত রাস্তা উদ্ভাসিত। কোথাও বা একটি কোথাও বা পালে পালে হরিণ নেমে আস্‌ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। মোটরের শব্দধ্বনি শুনে পথের মাঝে তাদের ভীত ত্রস্ত চোখের সা চাউনি!—তখনি আবার ছুটে পালাচ্ছে। এই সুগভীর পাতালপুরী থেকে উর্দ্ধে সমস্ত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন স্তিমিত নেত্রে স্তব্ধ বিস্ময়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যার একটু পরেই বাড়ী ফিরে এলাম। আহারাদি করে' সমস্ত দিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত মাসীমা ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সারাদিনের গল্প করে' তবে বিশ্রাম করতে গেলাম।

আবার স্নিগ্ধ প্রভাত—আবার সেই তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে যাত্রা। আজ প্রথমেই আমরা মহারাণার গোলাপবাগ দেখ্‌তে গেলাম। সেখান হ'তে "চিড়িয়াখানা"—কয়েকটা নূতন বাঘ আনা হয়েছে, দেখ্‌লাম।

তারপর মহারাণারা যেখানে জলক্রীড়া করতেন সেখানটা দেখ্‌তে গেলাম। বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে অগণিত ফোয়ারা, এই ফোয়ারার জল পেশোলা হ্রদ যোগান্ দেয়। কল টিপে দিলেই চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ফোয়ারা—উদ্যানের কৃত্রিম হাতি, পদ্ম প্রভৃতি হ'তে উচ্ছ্বসিত জলধারা নির্গত হ'য়ে যেন স্বপ্নময় পরীরাজ্য সৃষ্টি করে।

তারপর "একলিঙ্গজী"র পথে যাত্রা করা গেল, রেসিডেন্সির পাশ দিয়ে সহরের সীমানা ছাড়িয়ে।

প্রথম কিছু দূর সমতল রাস্তা। চার পাঁচ মাইলের পর এক গিরিশ্রেণী পথ রোধ করে' দাঁড়াল,—সেই পাহাড়ের গা বেয়ে পার্ব্বত্যপথ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। তিন মাইলের পর যেখানে এই চড়াই শেষ হয়েছে সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী এক বন্ধ-পথ। বন্ধের মুখে একটি তোরণ।

তোরণের নাম "চাঁর টরা কা দরওয়াজা"। চাঁর-টরা'র পরই পর্ব্বতের এক নিভৃত অংশে একলিঙ্গজীর মন্দির। ইনি মেবারের রাণাদের কুলদেবতা। মেবারের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এঁর যোগ আছে। তখন এখানকার নাম ছিল 'পরাশর মহাবন'। ক্ষুদ্র বালক বাপ্পা!—মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল স্কুলে "শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'রাজ-কাহিনী' একখানি পারিতোষিক পেয়ে কি আগ্রহের সঙ্গেই না মেবারের এই প্রাচীন কাহিনী পড়েছিলুম।

বাপ্পার শৈশবকালে ভীলেরা তাঁর রাজ্য কেড়ে নিলে তাঁর ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁকে নিয়ে এই বনে পালিয়ে আসেন। এইখানে একদিন গরু চরাতে চরাতে বাপ্পা-রাও দেবতার দর্শন পান। কথিত আছে তাঁর একটি গরু রোজ গভীরতম জঙ্গলে পালিয়ে যেত, তার অনুসরণ করে' একদিন তিনি দেখ্‌লেন যে লতাগুল্মের মধ্যে গাভী স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার স্তন হ'তে আপনিই দুগ্ধধারা উৎসারিত হ'চ্ছে। তিনি লতাগুল্মের অন্তরাল হ'তে একলিঙ্গজীর উদ্ধার করেন। তারপর এক শৈব সন্ন্যাসীর কাছ হ'তে রাজটিকা আর 'একলিঙ্গকা দেওয়ান' উপাধি লাভ করেন।—তারপরই তাঁর ভাগ্য ফির্‌ল ফিরে। তাই ইতিহাস-অনুসারে সমস্ত মেবার রাজাই একলিঙ্গের সম্পত্তি এবং মহারাণা তাঁর দেওয়ান।

কিন্তু রাজ্যেশ্বর উদাসীন সন্ন্যাসী—কয়েকটি মন্দির, কয়েকটি ধর্ম্মশালা, যাত্রীনিবাস এবং মহারাণার এক মহল, এই নিয়েই তাঁর গ্রাম।—তবে স্থানটি দেবাদিদেবের বাসের উপযুক্ত বটে। ঐশ্বর্য্যের সমারোহ নেই, কিন্তু বড় সুন্দর পবিত্রতায় পূর্ণ।

মন্দিরদ্বার দশটার পূর্ব্বে খোলে না, সামান্য একটু দেরী ছিল; ততক্ষণ উদ্যান, গ্রাম, একটি সুন্দর বাঁধান পুষ্করিণী ইত্যাদি দেখে সময় কাটান গেল।

মন্দিরটি নীচু,—মন্দিরপাত্রে নানারকম শ্বেত পাথরের কাজ। মন্দিরপথে অনেক ফুল বিক্রী হ'চ্ছে, কিনে কিছু নেওয়া গেল। মন্দিরের প্রাঙ্গণে খানি বিশাল শ্বেত-পাথরের বৃষমূর্ত্তি। একলিঙ্গজী কাল পাথরের—তাঁকে বেষ্টন করে' চারটি মুখ। তখন পূজা আরম্ভ হয়েছিল—স্তব, পূজা, তারী ভাল লাগ্‌ল।—প্রণামী প্রভৃতি নিয়ে কোন হাঙ্গামা নাই।—মন্দিরের চত্বরে আরও অনেক দেব-তার মূর্ত্তি দেখ্‌লাম।—তারপর বাড়ী ফিরে এলাম। একটু সময়ের মধ্যে ঘুরে দু'চারটে উদয়পুরী টেবিলক্লথ, গাউন প্রভৃতি কিনে উদয়পুর জেল দেখ্‌তে গেলাম।—জেলে বেশ ভাল সতরঞ্চি, গালিচা, প্রভৃতি বোনা হয়,—কয়েকখানা সতরঞ্চি, আসন প্রভৃতি কেনা গেল। সন্ধ্যাবেলা আর একবার ফতেসাগরের সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে গেলাম। দেখে যেন আর তৃপ্তি আস্‌ছিল না—।

পরদিন প্রত্যূষ হ'তেই বিজয়ার বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। সময়াভাবে অনেক কিছু দেখা হ'ল না। তাড়াতাড়ি মিলিয়ন-পত্র গোছান, আহার ইত্যাদি করে' ষ্টেশনে এলাম। প্রকৃতির লীলানিকেতনে প্রিয়জনের আদরে যে তিনটি দিন তিন মুহূর্ত্তের মতো কেটে গ্যাছে,—তারি মধুর স্মৃতি নিয়ে উদয়পুর ত্যাগ কর্‌লাম। চোখের জলে ভাল করে' দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না।—পাশের গাড়ীতে একটি বাঙ্গালী ছেলে ছিলেন,—পুরুকে বাঙ্গালী দেখে তিনি আলাপ কর্‌লেন। মন্থরগতিতে ট্রেন দোবারী গিরিপথ অতিক্রম করে' চিতোর-গড়ের দিকে রওনা হ'ল। আবার 'বানাস' নদী পার হ'য়ে (এই নদী চিতোর দুর্গকে বেষ্টন করে' আছে) চিতোর-গড় এসে পৌঁছলাম। আরও একটু আরাবল্লীর গিরিপথে ঘুরবার সাধ ছিল,—বারান্তরে চেষ্টা কর্‌ব। এবার এই যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ্‌লাম, তার জন্য বিশ্বস্রষ্টাকে বারংবার প্রণাম কর্‌তে কর্‌তে আজমীর ও আগ্রার এক একদিন থেকে কলিকাতার দিকে রওনা হ'য়ে নির্দ্ধারিত সময়ে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় এলাম।—যাঁর কৃপায় এই সুদীর্ঘ যাত্রা শেষ করে' নির্ব্বিঘ্নে এবং সুস্থ শরীরে ফিরে এলাম, সেই অপূর্ব্ব-সুন্দরকে, সেই করুণাময়কে প্রণাম করি বারংবার!

সন্তান-পালন—ঐ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী এম্‌-এস্‌ এস্‌। প্রাপ্তিস্থান—সরকার বিলাস এণ্ড কোং, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৵০ আনা।

নারীর সর্ব্বোত্তম রূপবিকাশ হয় মাতৃমূর্ত্তিতে—মা হওয়া নারীর পক্ষে পরম আকাঙ্ক্ষণীয়। কিন্তু জননীর কর্ত্তব্য নিঃশেষ হয় না শুধুই সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধদানে, স্তন্যপ্রদানে, বক্ষে আঁকড়াইয়া, বক্ষে জড়াইয়া, অথবা পরিচ্ছদে প্রসাধনে অতিভারাক্রান্ত করিয়া। কে না জানে, আত্যন্তিক মাতৃস্নেহ অনেক সময় সন্তানের দৈহিক পীড়ার এবং মানসিক অবনতিরও কারণ ঘটাইয়া থাকে। স্নেহ-গ্রন্থি সংযত করিয়া, বিচারিত খাদ্য-ব্যবস্থায় শিশুর দেহকে এক দিকে যেমন নিরাময়-স্বাস্থ্যে সবল ও পুষ্ট করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনি বিজ্ঞানানুমোদিত শিশুমনস্তত্ত্বের আনুশীলনিক প্রয়োগের সহিত প্রাণের প্রীতিধারা মিশাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে তাহাকে।

এই অনাগত-আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে এবং ইহা চিকিৎসক-রচিত নিছক চিকিৎসা-বিধানের নীরসতাকে অতিক্রম করিয়া সাহিত্য-পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আরও,—চিকিৎসাবিজ্ঞান-অনভিজ্ঞা সাধারণ-শিক্ষিতা জননীরাও ইহা দ্বারা সন্তানপালন-ব্রতে অনায়াসেই সিদ্ধকামা হইতে পারিবেন, কারণ ইহার বিষয়-বিবৃতি যেমন সরল তেমনি সরস।

বাংলা ভাষায় এইরূপ মূল্যবান গ্রন্থ বেশী আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বঙ্গলক্ষ্মীরা এই গ্রন্থপাঠে সমান উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন। গ্রন্থকারকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভিক্ষার ঝুলি—প্রণেতা 'সেই ভিখারী'। প্রকাশক—বিশ্বকোষ কার্য্যালয়, ৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

ইহা সাধনবিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীতের সমষ্টি। কাব্যের দিক দিয়া উপভোগের প্রয়াস করিলে প্রয়াসীকে ঠকিতে হইবে এবং অনেক স্থলে ইহাকে দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী মাত্র বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু সাধকের চক্ষে এই হেঁয়ালীগুলিই সাধনার সোপান নির্দ্দেশ করে।

নিশিপদ্ম—ঐ প্রবোধকুমার সান্যাল। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

যে আটটি গল্প লইয়া এই 'নিশিপদ্ম', আমার মনে হয়, প্রবোধ বাবুর সমস্ত রচনার মধ্যে সেগুলি বাছাই করা এবং ঐ দিক হইতে বইখানি আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। স্থান-বিভাগ করিলে গল্পগুলি যেরূপ দাঁড়ায়, নিম্নে আমি তাহার তালিকা দিলাম: ১। প্রসাধন, ২। গভীর, ৩। বাতাস দিল দোল, ৪। নিশিপদ্ম ৫। ছদ্মোপতন, ৬। মর্ম্মকামনা, ৭। নারায়ণ, ৮। কঙ্কাল।

'গভীর' ও 'বাতাস দিল দোল'—চমৎকার, কিন্তু

'প্রসাধন'কে আমি শ্রেষ্ঠ স্থান দিলাম এই জন্য, রচনা ও চরিত্রসৃষ্টির দিক হইতে ইহা একেবারে নিখুঁত! 'নিশি-পদ্মে' ছোট মাসীকে আমরা যত ভাল করিয়া চিনিলাম, এত আর কাহাকেও নয়। অস্পষ্টতা, ভাবের উচ্ছ্বাস, এ গল্পটিতে কোথাও স্পর্শ করে নাই। "সে অশ্রু কেবল অপমানের এবং উপেক্ষারই নয়, বিগত যৌবনের করুণ ব্যর্থতারই নয়, কিম্বা যে কলঙ্ক-রটনার জন্য সে কৌশল একটু আগে তার নির্মম ভাবে মিথ্যা হ'য়ে গেছে তার জন্যও নয়,—আপনার শূন্য জীবনের সকল দৈন্যকে তিনি আজ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছেন, এ অশ্রুতে তার বেদনাও হয় ত নিহিত ছিল!"—এতক্ষণ ধরিয়া ছোট মাসীর উপর আমাদের যে একটা ঘৃণা জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই ক'টি কথায় তাহা সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হইল। রাস্তার কলের লৌহদেহের উপর ভর দিয়া ছোট মাসী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এ দৃশ্য মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

'গভীর', 'বাতাস দিল দোল' কল্পিতের দিক হইতে আর একটুখানি সংযত হইলে, গল্প দু'টি একেবারে অনবদ্য হইত। কিন্তু ভাষা, বলিবার মধুর ভঙ্গীর গুণে এ সামান্য ত্রুটিটুকু যেন চোখে পড়িতে চায় না। বদ্‌রি ও মঙ্কা—সংসারের চিরদিনকার ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি! ইহাদের ফুটাইয়া তুলিতে লেখক যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বড় কম নয়। করুণ-রস পরিবেষণ করিতে প্রবোধ বাবু সিদ্ধহস্ত,—কিন্তু তারই সঙ্গে যদি সামান্য একটু অন্যমধুর হাস্যরস থাকে, তাহা হইলে করুণরস হইয়া উঠে সার্বক। এ দুটির মিশ্রণ আখ্যায়িকাকেও উপভোগ্যতর করে। 'গভীর' ও 'বাতাস দিল দোল'এ ইহার পরিচয় আছে—কিন্তু সব গল্পে নাই। এলোমেলো গল্পগুলির মধ্যে অন্যান্য গল্পগুলি প্রাণবন্ত নয়, তবু বলিব, প্রবোধ বাবু একজন নিপুণ শিল্পী—ইতিমধ্যেই সে বিশ্বাস আমাদের হইয়াছে।

ক.বি

চটকল—শ্রী নীহারকুমার পাল চৌধুরী। প্রাপ্তি স্থান—গুপ্ত ব্রেদার্স এণ্ড কোং, ১২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৭৫+১। দাম এক টাকা।

তিন অঙ্ক নাটক। ধনিক ও শ্রমিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই নাটকের ভিত্তি। অন্যান্য দেশে এই সমস্যা যেরূপ জটিল হইয়াছে আমাদের দেশে তেমন না হইলেও হানা দিতে সুরু করিয়াছে। এই হিসাবে নাটকটির প্রয়োজন আছে। ইতিপূর্বে নীহার বাবুর আর কোন নাটক বাজারে দেখি নাই, বোধ হয় ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। বই পড়িয়া বোঝা গেল, তিনি অনেক পড়িয়া শুনিয়া এবং হাত পাকাইয়া ক্ষেত্রে নামিয়াছেন। একটা জিনিষ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য হইল, লেখক effectটুকু সবটেই ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, কোথাও অতিভাষণের আবশ্যক হয় নাই। বাংলার নাট্য-সাহিত্য অতিশয় দরিদ্র। নীহার বাবুর মত শক্তিমান লেখকের অভ্যুদয়ে আমরা আশান্বিত হইলাম

শ্রী মনোজ বসু

স্বপ্নশেষ—শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী। ১৩সি লেক রোড, রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

চারটি গল্প—প্রথম গল্পের নামে বইএর নামকরণ। দ্বিতীয় গল্প 'পথের বাঁকে' আমাদের অতি চমৎকার লাগিল। একটি পতিতা মেয়ের পঙ্কিল অন্তরে মাতৃত্ব জাগা ও তার বিচিত্র কাহিনী। গল্পটি সত্যই রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশ্বপতি বাবুর সাহিত্যিক প্রতিভা আছে, আলোচ্য পুস্তকে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

কৃত্তিবাস

দীপা—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচ সিকা।

যাঁরা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাগুলির কবিতা লক্ষ্য করে' থাকেন তাঁদের কাছে কবি শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্তীর পরিচয় দিতে যাওয়া অবান্তর হবে। দীর্ঘকাল ধরে' বীণাপাণির বীণার একটি কোমল-করুণ তারে করস্পর্শ করে' তিনি চিত্তমধুর একটি চিরন্তন রাগিণীকে জীবন্ত করে' তুলেছেন এবং একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা বাংলা-কাব্যসাহিত্যে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সত্যকার অনুভূতিকে উজ্জ্বল করে' দেখিয়েছেন।

সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি চমৎকার প্রীতিকবিতাকে

গ্রন্থিত করে', কাব্যরসিক পাঠকদের তিনি এই গীতিকাব্য উপহার দিলেন।—রবীন্দ্রপরবর্ত্তী যুগের কবিদের কাব্যের সঙ্গে রাধাচরণ বাবুর কবিতার একটি বিশেষ ভেদ-রেখা সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর কবিতাগুলি ছোট ছোট—হরিণীর মতোই লীলায়িতা এবং চকিত-চঞ্চলা,—একটির পর একটি যেন অপরূপের ছবি অঙ্কিত করে' চলে। সহজ, সরল এবং সংক্ষিপ্ত কবিতার সেই স্বল্প, স্বচ্ছ, মনোহর অবকাশে এমন আন্তরিকতা নিয়ে একটি সুন্দর এবং সত্যকার কবিমন জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, যে, পাঠকের মনও ধীরে-ধীরে রসলোকের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করে।

রাধাচরণ বাবুর কবিতা যে গতানুগতিকতার বহু ঊর্দ্ধে বিরাজ করে, তা' তাঁর এই 'দীপা'ই প্রমাণ করছে। বর্ত্তমান বিংশ-শতাব্দীর মানুষের জীবনসংগ্রামের যে কঠোর রূপ,যে গভীর মর্ম্মন্তুদ হাহাকার বিদেশী কাব্য এবং আমাদের আধুনিক কাব্যকেও আশ্রয় করেছে,—রাধাচরণ বাবু সত্যকার কবি বলেই, নিজের অগোচরে, তাঁর কাব্যের অপরূপ চিত্রালির মধ্যেও একটি জীবনসংগ্রামে ক্ষিপ্ত মানুষের করুণ নিশ্বাস রেখে গেছেন। তাঁর এই কাব্যে জটিল দার্শনিক-তত্ত্ব নেই, তথাকথিত জীবনবিধাতার বিরুদ্ধে একটা cynic ব্যঙ্গ নেই—জীবনের স্বচ্ছ সরল অনুভূতি একটি মৃদুকরুণ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বেদনার।

'যার যৌবন,—হায়, যৌবন—দিনের তপন অস্ত যায়!
শুভ্র কেশে শীর্ণ কে-সে ধরছে এসে হস্ত হায়,—
উঠ্‌ছে মনে ভয় জেগে।'

'সাহিত্য-কারখানার শ্রমিক...'

—গীতিকবিতার এই সুরপ্রাণ ভাবোন্মেলতা 'দীপা'র প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। কিন্তু রাধাচরণ বাবুর সাধনা যে কম কঠিন নয়, তা' তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য 'আলেয়া' পড়্‌লেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে। 'আলেয়া'তে জীবন সম্বন্ধে গভীর ব্যঞ্জনা—ভাবের গাম্ভীর্য্যে এবং ভাষার উদার গঠনে একটি অখণ্ড রাগিণীর সৃষ্টি করেছে, এবং 'আলেয়া'র সেই কঠিন সাধনাকে অতিক্রম করে'ই তিনি 'দীপা'র এই সহজ সুরটিকে অধিগত করেছেন।

'দীপা'র কবিতাগুলি আগাগোড়া পড়্‌লে মনে হবে যেন একটি নীড়প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখী, সমস্ত দিনের প্রখর রৌদ্রের দাহনে পরিক্লান্ত হ'য়ে গোধূলির মুমূর্ষু আকাশে একটি ছায়াঘন নদীমেখলা গ্রামের দিকে দুটি কোমল, মধুর ডানা প্রসারিত করে' দিয়েছে!...সেখানে কোন মাটির ঘরে, একটি কল্যাণী নারী-লক্ষ্মী স্পন্দিতবক্ষে দুটি ব্যথিত পরিম্লান প্রত্যাশী-চক্ষু পথের দিকে নিবদ্ধ করে' দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর অঞ্জলিপুটের কম্পিত দীপশিখা কুটীরাঙ্গণে কপোতপাখার ছায়া বিস্তার করছে!

আধুনিক কাব্যের আর একটি প্রধান দিক্ তাঁর কাব্যে চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে—সে হ'চ্ছে সজীব নারীর প্রতি চিরন্তন পুরুষের উন্মুখ বাসনা, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা নয়।

রাধাচরণ বাবুর লিপিকুশলতা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে তাঁর চিত্র রূপণে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত, ঋজু রেখায় তাঁর কাব্যপ্রতিমা যেন একেবারে শরীরিণী হ'য়ে উঠেছেন!

'কে নারী টিয়ার পালকের পাখা ঘুরিয়ে
ফিরিছে বিজন তটিনীর তীরে তীরে;
কে গিরি-শিখরে আকুল অলক উড়িয়ে
খেলিয়া বেড়ায় ল'য়ে মায়া-শিখীটিরে।'

অন্যত্র—'কাজল-দীঘির তটতলে ভায় লঘু শৈবাল-লেখা...

—এ-রকম অপরূপ, স্বচ্ছ ভঙ্গীতে প্রকৃতির ও নারীর আনন্দরূপ-কে অঙ্কিত করা যথার্থ কবিশক্তির পরিচায়ক।

ত্রিদিবের শিশু,—প্রদীপকুমার তাঁর পথভ্রম হরণ করে' অমর্ত্যালোক থেকে অমৃত বহন করে' এনেছে; তাই তাঁর কাব্যে সমস্ত বেদনাকে আড়াল করে' দাঁড়িয়েছে একটি পরম সান্ত্বনা, যেখানে তাঁর কবিদৃষ্টি 'অপরূপ রহস্যতিমিরে' প্রবাল-দীপের 'বারুণী রূপসী'র প্রসাদ লাভ করেছে।

Pre-Raphaelites যুগের কবিদের কবিতার সঙ্গে তাঁর একটি অপূর্ব্ব আত্মীয়তা আছে।—
Roden Noelএর

'They are waiting for the boat
There is nothing left to do;
What was near them grows remote
Happy silence falls like dew;
Not the shadowy bark is come
And the weary may go home...'

অথবা Morriesএর

'Pray but one prayer twit
thy closed lips,
Think but one thought of up in the
stars.'

রাধাচরণ বাবুর—

'দূরে দূরেই রইনু দুজন, ব্যথার নদী বইছে উজান.
তুমি আমি দাঁড়িয়ে—বিজন
আঁধার দু'টি তীরে।'

কিম্বা—

'দেখি,—অমারাতের তিমির-কোলে
লক্ষ কোটি তারা দোলে,
রাঙা শিশু জড়ায় বাহু
কালো মায়ের গলে!'

•

—'দীপা' বাংলা-রসসাহিত্যে নিঃসন্দেহ একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। আশা করি, বাংলার রসিকসমাজে যথেষ্ট সমাদর হবে এর।

শ্রী তুষারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

(বাৎসরিক স্মৃতিসভা)

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

আজ আমরা যাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিতে উপস্থিত হইয়াছি, সেই স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী তাঁহার সহধর্ম্মী ভক্টর্ স্যর্ প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবাশ্রম'রূপ অন্তিম বাসনা কার্য্যে পরিণত করিয়া উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিয়াছেন।

শুনিয়াছি স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী বিধবাদের দুঃখে বিচলিত হইতেন। ঈশ্বরচন্দ্রিয়া ও উদারস্বভাবা মহিলার মনে এই উৎকৃষ্ট বৃত্তির উদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

আজ আর এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না যে বিধবাশ্রম বৈদিক কি অবৈদিক। প্রয়োজনের সত্য বৈদিক অনুশাসনেরও বাধ্য নহে। মহাভারতের আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় দৃষ্টান্তস্থল। শিক্ষা মনুষ্যজীবনে অন্ন-পানের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয়—শিক্ষাই স্পর্শমণি। উচ্চশিক্ষা বা সাধনা দ্বারাই মানুষ প্রকৃত জীবন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

বিধবাদিগকে শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ না দিয়া ব্রহ্মচারিণী বলিয়া আমরা যে শ্রদ্ধা করি তাহা যেন একটা বিদ্রূপ ও অভিশাপ। বহু অপরিণত-মনোবুদ্ধিবিশিষ্ট বালবিধবারই বৈধব্যব্রত স্বেচ্ছাকৃত নহে। ইহা অনুর ভবিষ্যতে ঘটিবে বলিয়াও তাঁহারা তখন কল্পনা করেন না, ইহা গ্রহণের জন্যও তাঁহারা তখন প্রস্তুত নহেন। পূর্ব্বদিনও যে বালিকা ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখিয়াছেন পরদিবস তাঁহার পক্ষে সমস্ত পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সহধর্ম্মীর অশরীরী আত্মার সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারণ অনৈসর্গিক ও অবৈদিক। আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী এই প্রথার বিষময় ফলের কথা ভূয়োভূয়ো ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

দেশের লোকেরা আইনের দ্বারা বিধবাদের একটা নির্দ্দিষ্ট অধিকার দিল বর্ত্তমান অবজাত অবস্থার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

কলম চালাইয়া, সভা-সমিতি করিয়া শুধু ভাষার দ্বারা বিধবাদের দুঃখের বর্ণনা করিলে বিধবাদের দুঃখ ঘুচিবে না। প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করিয়া যদি এক একটি বিধবাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইতে পারেন, তাহাতে কাজ বেশী দিবে। স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী

দেবী বিধবাদের দুঃখ বর্ণনা করিয়া যদি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইতেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইয়াছে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করায়। বিধবাদের স্বাধিকারের যুক্তি ও মনের বার্ত্তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিলেও অবশ্য অনেক উপকার হইবে। যে সব সমাজে বা গ্রামে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে বিধবারা অবজ্ঞাত সেই সব স্থানে তাঁহাদের অনুপস্থিতির দ্বারা আত্মার সম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বিধবাদের বেশ পরিবর্ত্তনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রাকৃতিক অধিকারের সুযোগ দানও সমাজের কর্ত্তব্য। বালিকা বিধবাদের বসনভূষণাদির প্রতি অযথা নিগ্রহ না করিয়া, এবিষয়েও তাঁহাদিগকে মানবমনের অনুযায়ী সহজ শোভন অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য।

অধিকাংশ মানুষ ন্যায়সঙ্গত ভাবে যাহা করে তাহাই লিপিবদ্ধ হইলে শাস্ত্র বা আইন হয়। অতীত ও ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্ত্তমানের মূল্য বেশী। অতীতের শাস্ত্র দিয়া বর্ত্তমানের সমাজকে সর্ব্বতোভাবে শাসন করার চিন্তা না করা ভাল। পুরাতন স্মৃতি নূতন স্মৃতিকে শাসন করিতে পারে না। দেশ কাল ও পাত্রানুসারে স্মৃতির ও আর্ত্তের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। বিশ্বকবির পরীক্ষণে, বালিকা বিধবা বর্ত্তমানে পিতামাতাদির ধর্ম-নিয়মাভাব কিংবা। পুত্র কন্যার বিবাহাদির অনুরোধে ও তথাকথিত সমাজ নিগ্রহের ভয়ে যাদবিধবাদের যেরূপ নির্য্যাতন ঘটিয়া থাকে তাহা পাপপূর্ণ ও ভয়াবহ। দেশের এই সব দুর্য্যোগ ও দুরবস্থার মধ্যে স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী এই বিধবাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতির ললাটে পুণ্য-প্রতিষ্ঠানের একটি উজ্জ্বল টিকা পরাইয়া দিয়াছেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ অক্ষম হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি'র হাতে দিয়া তিনি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আশা করি এই সমিতি সামাজিক গ্লানি উপেক্ষা করিয়া বিধবাদিগকে স্বাধিকার দানে সমর্থ হইবেন। বিধবাশ্রমের সহিত একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ইহার মধ্যে একটি নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। ভবিষ্যতে কুমারীরা বিধবাদের দুঃখ বুঝিবেন ও মোচনে সচেষ্ট হইবেন। নিজেদের সেই অবস্থা ঘটিলে কি করা কর্ত্তব্য তাহারও বিচার করিতে পারিবেন। 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি'র মুখপাত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর (বড়মা) যেরূপ সর্ব্বতোমুখী উন্নত-বুদ্ধিসম্পন্না ও তাঁহার যেরূপ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাহাতে আশা করি বিধবা ও কুমারীদিগের আত্মবিকাশের নানাবিধ পথ খুলিয়া দিয়া তিনি যুগ-মানবের কার্য্য করিবেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ বিধবাদের জন্য যে সামাজিক নিগ্রহাদি সহ্য করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য দুঃখিনী বিধবাদিগের অন্তরে তাঁহাদের পিতৃসিংহাসন চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যুগে যুগে যে সব মানব যুগোপযোগী বার্ত্তা বহন করেন, তাঁহারা তাপিতের ব্যথা ও আর্ত্তের অ-সান্ত্বনা দূর করিয়া জাতির অন্তরে একটা অক্ষতের অমোঘ স্পর্শ রাখিয়া যান।

উপসংহারে দুঃখের সহিত বলি—হে বাংলা, তুমি আ-সমুদ্র ক্ষিতীশ্বরী বটে, কিন্তু তুমি বিধবাদিগকে দুঃখরাশি দিয়া যে অশান্তি ও ঘোর কালিমা অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা ধৌত করিতে পারে এত জল তোমার সমুদ্রে নাই। ৺ বসন্তকুমারী দেবীর নাম ধন্য হউক, কীর্ত্তি অক্ষয় হউক!

চাকুদ মহিলাসমিতি

চাকুদ কবিরপুর জেলার অন্তর্গতী একটি বড় গ্রাম। এই গ্রাম বহু ভদ্রপরিবারের বাসস্থান হইলেও বহুদিন যাবৎ গ্রামের মহিলাদিগের শিক্ষার কোনই বন্দোবস্ত এখানে ছিল না। গত চার বৎসর যাবৎ কর্মী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ দাশ মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় এবং শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা-সুন্দরী বসু মহাশয়ার নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় এখানে একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৪০টি বালিকা এখানে সাধারণভাবে শিক্ষালাভ করিতেছে। ইতিমধ্যে এই বালিকাবিদ্যালয় হইতে একটি ছাত্রী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছে। কিছুদিন যাবৎ এই বালিকাবিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া জেলা বোর্ড অনুগ্রহপূর্ব্বক সামান্য সাহায্য করিতেছেন।

বর্ত্তমানে গ্রামের জনৈক শুভার্থী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসী মহিলাবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় এই গ্রামে একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া "সরোজনলিনী নারীশিক্ষা সমিতি"র সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। প্রায় ২০টি মহিলা এই সমিতির সভ্যা-শ্রেণীভুক্তা হইয়া গ্রামবাসী মহিলাদের নানাবিধ উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন।

গ্রামের শ্রীযুক্ত শুভসময় দত্ত মহাশয় ইহার "চাকুদ মহিলাসমিতি" নামকরণ করিয়াছেন এবং তিনি এই সমিতির উদ্দেশে একটি মঙ্গলময় বাণী প্রেরণ করিয়া সমিতির অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বরচিত দুইখানা পুস্তক উপহার দিয়াও সমিতিকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা তরঙ্গিণী রায় ও শ্রীযুক্তা নির্ম্মলাসুন্দরী বসু মহাশয়াদ্বয় এই সমিতির সম্পাদকতার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই সমিতি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পল্লীজননীর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করুক।

—যুক্ত সম্পাদিকা

লেক রোড মহিলাসমিতি

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মহিলাসমিতি স্থাপনের উদ্দেশে ১৯ নং লেক রোডস্থ বাটীতে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা হয়। সেই হইতে "লেক পল্লী মহিলা-সমিতি" স্থাপিত হয়।

লেক রোড অঞ্চলে মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল স্থাপনের উদ্দেশে মহিলাসমিতি গঠিত হয়।

আমাদের সভ্যাসংখ্যা মোট ১৯ জন, তন্মধ্যে ৩ জন বিধবা। বিধবা সভ্যাদের নিকট হইতে চাঁদা লেওয়া হয় না।

সমিতির মহিলা সভ্যাগণ একে অন্যের বাড়ী যাতায়াত করেন এবং প্রয়োজন হইলে পৃথুশিশু শিক্ষার বিষয় একে অন্যের সাহায্য করেন।

লেক পল্লীর মহিলাদিগের ভিতর স্বাস্থ্য-বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে কেন্দ্রসমিতির পক্ষ হইতে প্রচারকগণ আসিয়া ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দিয়া যাইয়া

থাকেন ইহাতে লেক পল্লীর মহিলাদিগের উৎসাহ খুব আছে। প্রতিবারেই বহু মহিলা সভাতে উপস্থিত হন।

প্রতি বৃহস্পতিবার ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ছাটকাট ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী আসিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে সেলাই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সকল সভ্যাই সেলাই ও ছাটকাট শিখেন। সভ্যাগণ সকলেই গৃহে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সভ্যাগণ নিজেরাই সমিতির প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া থাকেন।

জামা, সেমিজ, পাঞ্জাবী প্রভৃতি সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। সমিতি হইতে কাপড় ও সূতা প্রয়োজন হইলে সরবরাহ করা হয়। সমিতির সভ্যারা হাঁটিয়াই যাতায়াত করেন। সমিতির উন্নতিকল্পে অনেকে সৎপরামর্শ দিয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন। লেক অঞ্চলে সকলেরই সহানুভূতি আছে অদ্যাবধি ইঁহারা আমাদিগকে সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতেছেন :—

শ্রীযুক্ত জে, সি, ঘোষ।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ সেন।

শ্রীযুক্তা প্রমীলা রায়। ইঁহার বাটীতে আমাদের সমিতির কার্য্য কয়েকমাস করিতে দিয়া ইনি বিশেষ উপকৃত করিয়াছিলেন।

৪। শ্রীযুক্তা হেমময়ী দাস ৫৲

৫। " কমলা মিত্র ২৲।

৬। লালা হরিশচন্দ্র রাম ৫৲।

৭। বালিকরাম কিংগচাঁদ।

ইহা ব্যতীত সভ্যারাও এককালীন কিছু কিছু দিয়া সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন।

গত জানুয়ারী মাসে একবার রেড ক্রস সোসাইটীর লোক আসিয়া ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উক্ত দিবস কেন্দ্রসমিতি হইতে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী আসিয়াছিলেন এবং তিনি আমাদের উপদেশ দিয়াছিলেন ও বক্তৃতা করিয়া আমাদের বিশেষ প্রকারে উপকৃত করিয়াছিলেন।

শ্রী তারা রায়,
সম্পাদিকা

সিমলা—টুটীকান্তি আর্য্যনারী সমিতি

বর্ত্তমানে সমিতির সভ্যাসংখ্যা ২০ জন এবং এই সমিতির শাখা "বালক-বালিকা সমিতি"তে ২০টি বালক-বালিকা আছে। তাহারা কুমারী রেণু রায় ও কুমারী মণিকা বসুর তত্ত্বাবধানে প্রতি শনিবার একত্রিত হইয়া গান, ভজন, সেলাই, বোনা এবং পত্রিকাদি পাঠ করে।

২৫৲ টাকার খদ্দর কিনিয়া, ৪০টি জামা প্রস্তুত করিয়া এবং কিছু পশমের মোজা ও টুপী বুনিয়া, এবং নগদ ১০৲ টাকা সার পি, সি, রায়ের কাছে দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য পাঠান হইয়াছে। তিনি উহা বঙ্গীয় সঙ্কট-ত্রাণ সমিতিতে দান করিয়াছেন।

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও এখানে একটি শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল। সভ্যাগণের প্রস্তুত এম্‌ব্রয়ডারী, ফ্রক, ব্লাউজ, টেবিলক্লথ, কুশন প্রভৃতি এবং কার্পেটের কাজ, সুতলীর আসন, পাড়ের গদি ও বিছানার চাদরনী, এবং সন্দেশ, রসগোল্লা, নারিকেলের চিঁড়া প্রভৃতি প্রদর্শনীতে দেওয়া হইয়াছিল। অনেক জিনিষ বিক্রয় হইয়াছে। সভ্যাগণ নিম্নলিখিত ভাবে পুরস্কার পাইয়াছেন :—

১। শ্রীমতী নলিনীবালা সেন—এক্‌ব্রয়ডারীতে প্রথম পুরস্কার মেডেল ও একটি প্রশংসাপত্র।

২। শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী 'ড্রনথড্' এ মেডেল।

৩। শ্রীমতী ননী দেবী—ছাট্‌কাটে মেডেল ও একটি প্রশংসাপত্র।

৪। শ্রীমতী অমলা সেন—এম্‌ব্রয়ডারীতে মেডেল ও দুইটি প্রশংসাপত্র।

৫। কুমারী বিভা দেবী (পাঞ্জাবী) বয়স ১৫ বৎসর—কসিদার কাজে মেডেল ও সুতলীর আসনে প্রশংসাপত্র।

৬। শ্রীমতী সীতা দেবী (ওর্ধা)—কার্পেটের কাজে মেডেল ও প্রসংসাপত্র।

৭। শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্তা—ছাট্‌কাটে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার ২ টি মেডেল, এম্‌ব্রয়ডারীতে ২টি প্রশংসাপত্র।

৮। শ্রীমতী রাধারাণী বেরা—উলের কাজে প্রশংসাপত্র।

৯। শ্রীমতী নলিতা মজুমদার—এম্‌ব্রয়ডারীতে ২টি প্রশংসাপত্র।

১০। কুমারী রেণু রায় বয়স ১৪ বৎসর—ড্রয়িংএ প্রথম পুরস্কার মেডেল, ওয়াটার পেন্টিংএ মেডেল, এম্‌ব্রয়ডারীতে (বালিকা বিভাগে) মেডেল ও একটি প্রশংসাপত্র।

সরোজনলিনী শিল্পপ্রদর্শনী হইতে এ বৎসর আমরা সূচিশিল্পে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র পাইয়াছি। শ্রীমতী নলিনীবালা সেনের সূচিশিল্পে "প্রলোভন" নামক ছবিখানি ইণ্ডিয়ান রেডক্রস্ সোসাইটি কিনিয়া বিলাতে রেডক্রস্ নার্সিং হোমে পাঠাইয়াছেন।

পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি সোমবারে এক একজন সভ্যার বাড়ীতে অধিবেশন হইয়াছে। বর্ষাকালেও সমিতির অধিবেশন বন্ধ থাকে নাই। যদিও গাড়ীর বন্দোবস্ত নাই, তথাপি সভ্যাগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিতই যোগদান করিয়াছেন।

শ্রী নলিনীবালা সেন,
সম্পাদিকা।

স্মৃতি-অর্ঘ্য

শ্রী হেমলতা দেবী

বিফল জীবন সফল-করা স্মৃতির অর্ঘ্যদান,
তোমার অনুষ্ঠান সে মাতঃ তোমার অনুষ্ঠান।
মৌন যাদের মনের আশা
পায় না খুঁজে পথের ভাষা
মিলল তাদের পথের দিশা জাগল নূতন প্রাণ॥
বাণীর দিব্য আসনখানি
বিছান যায় বক্ষে আনি
কণ্ঠাকণ্ঠ তুলল বেধায় বিদ্যামুখর তান।
শিল্প-আগার অর্ঘ্য মিলায়
মুক্ত বাতাস স্বাস্থ্য বিলায়
হৃদয়-দোলায় সাগর দুলায় আনন্দ-সন্তান।
তোমার দেওয়া স্থান সে মাতঃ তোমার দেওয়া স্থান॥*

---

* ৺ বদরুকুমারী শ্রেণীর বাৎসরিক স্মৃতিসভায় পঠিত।

নারী-প্রতিভা

স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৺কুমারী তরু দত্ত

ইনি বিখ্যাত কবি। ১৩ বৎসর বয়সে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অরু দত্তের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ড গমন করেন। (১৮৬৯ খৃঃ) ইনি কলিকাতা রামবাগানের গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা। পিতামাতার নিকট তরু ও অরু খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তখনকার দিনে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা উচ্চ-ইংরাজীশিক্ষিত এক শ্রেণীর লোকেরা বড় গৌরবজনক মনে করিতেন। তরু দত্ত অতি অল্প-বয়সে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটে যশস্বিনী হইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফরাসী কবিতা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বহি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া (১৮ বৎসর বয়সে) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতাদি সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয় ২২ বৎসর বয়সে তিনি যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। অরু—তরুর পূর্ব্বেই ঐ রোগে লোকান্তরিত হন। ইঁহারা উভয়েই কুমারী ছিলেন ও পিতা-মাতার পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত "A sheaf gleaned from French Fields", "De journal de Midlle," "D. Auvers" রচনা করিয়া বিদ্বজ্জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

৺কর্ম্ম দেবী

চিতোরাধিপতি সমর সিংহের অন্যতমা অধিরাণী। সমর সিংহ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের অনুগামী হইয়া রণযজ্ঞ গ্রহণ করিলে—মহম্মদ ঘোরী কুতবুদ্দিনকে চিতোর অধিকার করিতে পাঠান (১১৯০ খৃঃ)। কর্ম্ম দেবী পুরুষ-বেশে রাজপুত সেনাগণের অধিনায়িকা রূপে ভীষণ যুদ্ধে কুতবুদ্দিনকে পরাজিত করিয়া স্বীয় অধিকার বজায় রাখেন।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী

ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। বাল্যে বাংলা ও সংস্কৃত, বিবাহের পর স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম উপন্যাস "দীপনির্ব্বাণ" রচনা করেন। পরে হুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ, ছিন্নমুকুল, বেহুলতা, কাহাকে, ফুলের মালা, বসন্ত-উৎসব, মিবাররাজ ইত্যাদি উপন্যাস, কবিতা-গ্রন্থ ও শিশুপাঠ্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি ১৩০২ সন পর্য্যন্ত "ভারতী" নামক প্রসিদ্ধ মাসিকের সম্পাদিকা ছিলেন। প্রায় ১২ বৎসর "ভারতী"র দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া উহার ভার কন্যা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী (চৌধুরাণী) বি-এ'র হাতে অর্পণ করেন। পুনরায় কন্যার নিকট হইতে উহার ভার গ্রহণ করেন। ইনি মহিলাদের সমাবেশ উদ্দেশ্যে "সখী-সমিতি" নামক একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং মেয়েদের শিল্পকলার উৎসাহ মানসে মহিলা-শিল্পমেলা নামক একটি মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার মধ্যে যেরূপ মনীষা ও নানাবিধ রমণীসুলভ গুণাবলী দৃষ্ট হয়, তাহা অন্যত্র বড়ই দুর্লভ।

মহারাণী বিন্দনকুমারী

পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিবাহিতা স্ত্রীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রিয়তমা মহিষী—মহারাজ দলিপ সিংহের জননী। "মহারাণী বিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত অটলতা, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলম্বিনী এবং অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্তি সঞ্চালনে সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং অদ্ভুত মনস্বিতায় অনেকে ইঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সমান

বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র মহান্ দোষ এই বীর-ললনাকে সাম্রাজ্যদণ্ড পরিচালনের অনুপযুক্ত করিয়াছিল। ইনি স্বীয় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই।" সুখদুঃখের অপূর্ব্ব সমাবেশ ইঁহার জীবনকে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য-ময় করিয়াছে। যে ঝিন্দনকে রণজিৎ "প্রিয় পতির প্রিয়তমা" বলিতেন, সেই ঝিন্দন দুঃখের সর্ব্বনিম্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইনি নানাস্থানে নানাভাবে বন্দিনী-জীবন যাপন করেন। পুত্রমুখ দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকা ইঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান দুঃখ। অবশেষে চুণার দুর্গ হইতে ঝিন্দন কৌশলক্রমে পলাইয়া নেপাল রাজ্যে গমন করেন এবং অতিকষ্টে নেপালের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া জংবাহাদুরের আশ্রয়প্রার্থিনী হন (১৮৪৯)। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই কথা শুনিয়া ঝিন্দনের সমস্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং মাসিক সহস্র টাকা বৃত্তি দিয়া নেপালেই বাসের আদেশ করেন। কিন্তু নেপালেও তাঁহার শান্তি হইল না। নেপালের কাছে, ঝিন্দন বার্ষিক ২০ হাজার টাকা পাইতেন, জংবাহাদুরের ইহা অসহ্য। এই সময় মহারাজ দলিপ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলিপ স্বীয় রাজ্যের বন্দোবস্ত, শিকার ও যাতার একটা বন্দোবস্তের জন্য ভারতে আগমন করেন। মহারাজ দলিপ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় গবর্ণর জেনারেল মহারাণী ঝিন্দনকে নেপাল হইতে আসিবার অনুমতি দেন এবং ঝিন্দনের অবশিষ্ট সম্পত্তি যাহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাহা ফেরৎ দেন। এই সময় পুত্রের সহিত মহারাণী ইংলণ্ড গমন করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পারীর ভাগ্যলক্ষ্মী রণজিৎবনিতা ভাগ্যচক্রের সকল আবর্ত্তনের মধ্যে পতিত হইয়া অবশেষে ইংলণ্ডে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃতদেহ বোম্বাইতে আনিয়া পুত্র মহারাজ দলিপ সিং সৎকার করিলেন এবং জননীর পবিত্র ভস্ম নর্ম্মদার জলে নিক্ষেপ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত অমৃতবাণ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

আগামী সংখ্যায় কথাসাহিত্যে অন্যতম স্থান গ্রহণ করিবেন উদীয়মান কথাশিল্পী—শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্ত।

৺চন্দ্রমাধব ঘোষ

আমরা গভীর শোকসন্তপ্তচিত্তে জানাইতেছি যে আমাদের পরম বন্ধু, সমিতির অন্যতম প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় আর ইহলোকে নাই। মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবগণকে অকূল শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিদারুণ ম্যালিগ্‌ন্যান্ট টিউমার রোগে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। পিতামাতার একমাত্র পুত্র, বিপন্নের বন্ধু, আর্ত্তের সহায়, শ্রমিকগণের সদয় নেতা, ছাত্রদের সখা, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অকৃত্রিম বন্ধু, চন্দ্রমাধব যে ইহলোকে নাই তাহা বিশ্বাস করিতেই ইচ্ছা করে না। আমরা যেন মানসচক্ষে দেখিতেছি তাঁহার সেই সদাহাস্য সৌম্য মূর্ত্তি ধীর পদক্ষেপে সমিতির গৃহে প্রবেশ করিতেছে। হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ দিয়া তিনি সমিতিকে ভাল বাসিয়াছিলেন—সমিতির কর্ম্মীগণও তাই তাঁহাকে সম্পূর্ণ আপনার জন বলিয়া জানিত। তাঁহার সরল অকপট ব্যবহার, হৃদয়ের ঔদার্য্য আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সমিতির প্রবীণ কর্ম্মীগণ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আশা পোষণ করিতেন। পিতামাতা স্নেহের পুত্তলীকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিলেন, পতিগতপ্রাণা পত্নীর বুকে শেলাঘাত হইল, সুকুমার শিশু সন্তানগণ স্নেহময় জনকের ক্রোড়চ্যুত হইল, আমরা একজন বহুগুণসম্পন্ন কর্ম্মী ও নেতাকে হারাইলাম। বিধাতার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল জানি না।

চন্দ্রমাধব বাবু ১৮৯৯ সালে তাঁহার মাতামহ রায়সাহেব জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কলিকাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহার নামানুসারে নন্দকুমার চৌধুরী লেন হইয়াছে সেই নন্দকুমার বাবু জ্ঞানচন্দ্রের পিতা ছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন হইতে ম্যাট্রিকুলেসন, শ্রীরামপুর কলেজ হইতে আই-এ ও বি-এ এবং রিপন কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মিঃ এন, সি, বসুর আফিসে কিছুদিন এটর্ণির কার্য্য শিক্ষা করেন। ১৯১৮ সালে মিঃ এন, সি, বসুর পৌত্রী শ্রীমতী লতিকা ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ কিছুদিন আলিপুরের জেলা ও সেসন জজের কার্য্য করিয়া ১৯২৯ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। পরে ১৯৩০ সালে দুর্গাপ্রসাদ বাবু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার স্পেশাল ট্রাইবুনালের কমিশনার নিযুক্ত হন। পুত্রের প্ররোচনায় পিতা এই কমিশনারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু একান্ত নীরবে প্রকৃত গঠনমূলক কার্য্য দ্বারা দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কোনপ্রকার বাহ্য-আড়ম্বর প্রকাশ তাঁহার অত্যন্ত স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অতি সাধারণ খদ্দরের পোষাক তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত পরিধান করিতেন এবং বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেকের জন্য সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার ভগ্নীপতি মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম, এল, সি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিহার সিমেণ্ট এবং লাইম কোম্পানীর অংশীদার রূপে সর্ব্বপ্রথম ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পরে ঘোষ-চৌধুরী কোম্পানী ও সিটি কার্পিসিং কোম্পানী নামক দুইটি ঘৌথ কারবার তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছিল। সাধুতা এবং সততায় ব্যবসায়-মহলে তিনি ক্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবুর হৃদয় অতিশয় কোমল ছিল। দুঃখীর দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়াছিল। কলেজে অধ্যয়ন কালে পিতার প্রদত্ত খরচ হইতে দুইটি দরিদ্র ছাত্রের বেতন প্রদান করিতেন। পরে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট নিয়মিত অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইত। এই সকল প্রতিষ্ঠানে তিনি কেবলমাত্র নিজে অর্থসাহায্য করিয়া কান্ত

থাকিতেন না, উপরন্তু অর্থশালী ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া দিতেন।

১৯১৭ সাল হইতে চন্দ্রমাধব বাবু শ্রমিকগণের দুঃখ দুর্দশা নিবারণের—তাহাদের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনেক শ্রমজীবী সমিতি যেমন ইউনিয়ন করিয়া অবৈতনিক লিগাল এড্‌ভাইজার নির্ব্বাচিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতার কেরাণী সমিতি এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন দুই মিল লেবার ইউনিয়ন তাঁহাকে সহঃ-সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। নিখিল ভারত ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাদেশিক সমিতির কার্য্যকরী সভার সদস্যরূপে ভারতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি যে সকল কার্য্য করেন তাহাতে শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ সুনাম হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে নাগপুর সহরে যে নিখিল ভারত ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে চন্দ্রমাধব বাবু বিশেষ যোগ্যতার সহিত কমিউনিষ্ট দলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

মিঃ কে. সি, রায় চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতিতে যোগদান করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে সমিতির নানা বিভাগের কর্তৃত্বভার করেন।
সালে কলিকাতার পোড়াবাজারে সমিতির সাহায্যের জন্য

প্রকাণ্ড প্রদর্শনী ও উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনী হইতে সমিতির যথেষ্ট আয় হইয়াছিল এবং এই অর্থ হইতেই সমিতির স্থায়ী তহবিলের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

তাঁহার বাসস্থান চন্দননগরের নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের কোষাধ্যক্ষরূপে তিনি দুইটি বিরোধীদলের বহুদিনের মনো-মালিন্য দূর করিয়া সামঞ্জস্য সাধন দ্বারা সকলের প্রশংসা-ভাজন হন। তাঁহার দ্বারা অনেক দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবার সাহায্য পাইয়াছে এবং অনেক বেকার যুবকের জীবিকা-উপার্জ্জনের পথ প্রস্তুত হইয়াছে।

গত দুই বৎসর তাঁহার সিটি ফার্নিসিং কোম্পানীতে অনেক মাল জমা হইয়া লোকসান হইতেছিল। মিঃ চৌধুরী তাঁহাকে এই কারবারটি বন্ধ করিতে বলেন। তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে তাহা হইলে দরিদ্র কর্ম্মচারী এবং তাহাদের পরিবারবর্গের কি দশা হইবে। আজকালকার দিনে তাহাদিগকে উপবাস করিয়া মরিতে হইবে?

ইদানিং মধ্যে মধ্যে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইতেছিল। অসুস্থতা সত্ত্বেও গত ১৭ই জুন মিস্ সোমের সহিত অসীম উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কোন্নগরের বাগান-বাড়ীতে অনুষ্ঠিত পার্টিতে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কর্ম্মী-গণের সহিত তিনি সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন। সরোজনলিনী সমিতির উৎসবে যোগদান করা।

যে মাসের মাঝামাঝি সময়ে একবার তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। আফিসে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি বাড়ের দিকে তীব্র বেদনা অনুভব করেন এবং এক-সপ্তাহ কাল শিরঃশূলে কাতর হইয়া পড়েন। দিনের মধ্যে আরোগ্য করিয়া তিনি পুনরায় কাজে যোগ তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহার মাথার মধ্যে বেদনা অনুভূত হইত। সেজন্য ডাক্তারের পরামর্শক্রমে কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরেই এই বেদনা অত্যন্ত তীব্র হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞা

চান করিয়া দেয়। কলিকাতা হইতে ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ ইউনান্ তাঁহার চিকিৎসার জন্য চন্দননগর গমন করেন। চিকিৎসকগণের বহু চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও গত ২৮শে জুন রাত্রি আড়াইটার সময় সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র চারিদিক হইতে বন্ধুলোক তাঁহার প্রতি শেষসম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হন।

কলিকাতা হইতে রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালিনী সোম তাঁহার মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিয়া আসেন। মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী নতিক যোগ নতজানু হইয়া করজোড়ে তাঁহার আরোগ্যকামনায় একাগ্রভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। মৃত্যুর পর তিনি মহাশোকের মধ্যে থাকিয়াও অবিচলিত ভাবে পঞ্চমেশ্বরের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন। চারিদিকে শোকের অশ্রু প্রবাহিত—কিন্তু সাধ্বী পত্নী চরম নিষ্ঠার সহিত ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

গত ২৯শে রবিবার চন্দননগরের জনসাধারণ নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে তাঁহার উদ্দেশে একটি শোকসভার অধিবেশন করেন। চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার মধ্যে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। স্পোর্টিং ক্লাব হাউসে আর একটি শোকসভার অনুষ্ঠান হয়। তথায় চন্দ্রমাধব বাবুর উপযুক্তরূপ স্মৃতি রক্ষা করিবার বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চন্দ্রমাধব বাবু পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা এখনও বর্ত্তমান। তিনি দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। বড় ছেলে অরুণেন্দুর বয়স ৯ বৎসর। কন্যা সীতা ৩ বৎসরের। তাঁহার পত্নীও পিতামাতার একমাত্র কন্যা।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতা পৌঁছিবা মাত্র সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সমস্ত বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সমিতির সব বড় কাজে চন্দ্রমাধব বাবুর ডাক পড়িত। রায় বাহাদুর, মিসেস্ সোম, মিঃ দত্ত তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কোন সভায় অথবা উৎসবে উপস্থিত না হইতে পারিলে রায় বাহাদুর উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। সমিতি তাঁহার অভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সমিতির পক্ষে তাঁহার স্থান পূর্ণ করা কঠিন হইবে।

এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল—সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী পরলোকগতা হইয়াছেন। ভগবান তাঁর পবিত্র আত্মার কল্যাণ করুন।

জাতির শক্তি ও আনন্দের উৎস

(কোন নব-মহিলাসমিতির প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে)

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

জীবন্ত জাতির দুইটি অপরিহার্য্য লক্ষণ—শক্তি ও আনন্দ। জীবন্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে আবার সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে শক্তিময় ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইবে।

জাতির শক্তি ও আনন্দের উৎস—নারী। বাংলা দেশে আজ নারী শক্তিহীনা ও আনন্দহীনা বলিয়াই বাঙ্গালীর শক্তিহীনতা ও আনন্দহীনতা তাহাকে আজ বিশ্বমানবের হাস্যাস্পদ ও কৃপার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। তাই বাংলার মানুষকে আবার সঞ্জীবিত ও প্রভাবান্বিত করিতে হইলে বাংলার নারীকে করিতে হইবে শক্তির ও আনন্দের সাধনা।

জ্ঞানেই শক্তি এবং মুক্তিতেই আনন্দ। সুতরাং বাংলার নারীর আজ চাই জ্ঞানের সাধনা ও মুক্তির সাধনা। একমাত্র এই জ্ঞানের ও মুক্তির ভীতিহীন সাধনার ভিতর দিয়াই বাংলার নারী আপন ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া বাঙ্গালীকে আবার বিশ্বমানবের আসরে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিবে।

বাংলার নারীকে এই সাধনা করিতে হইবে সঙ্ঘবদ্ধতার ভিতর দিয়া,—কারণ জাতিগত সাধনার সিদ্ধির একমাত্র পন্থা সঙ্ঘবদ্ধতা। তাই আমার নিজের জীবনের শক্তি ও আনন্দের উৎসরূপিণী সরোজনলিনী দেবী কামনা করিয়াছিলেন—বাংলার জেলায় জেলায় ও গ্রামে গ্রামে অচিরে অসংখ্য মহিলাসমিতি গড়িয়া উঠুক।

আপনাদের গ্রামের কল্যাণী মহিলাগণ সরোজনলিনী দেবীর অন্তরের এই আকুল কামনার সফলতা প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছেন জানিয়া আমার প্রাণ হর্ষে উৎফুল্ল হইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহাদের প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হোক্।

কেন্দ্রসমিতির কথা

শোক-সভা

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৩৩১) চক্রধরপুর কল্যাণী-সঙ্ঘের অন্যতম সভ্যা শ্যামমোহাগিনী বসু অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মারা যান। তাঁহার মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়া উক্ত সঙ্ঘের সভ্যারা যে মাসের শেষ সপ্তাহে একটি শোক-সভার অনুষ্ঠান করেন। কর্ম্মীর অভাবে কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান যে কত রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; বিশেষ যদি সেই কর্ম্মীর কর্ম্মে নিষ্ঠা থাকে, কর্ম্মে অগাধ শ্রদ্ধা থাকে, কর্ম্মই যদি তাঁহার জীবনের ব্রতস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কল্যাণী-সঙ্ঘের এই সভ্যার মৃত্যুতে সঙ্ঘ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, আমাদের মনে হয় যে, নারীমঙ্গলকামী সমস্ত প্রতিষ্ঠানই তাহার বেদনা অনুভব করিবেন। আমরা সঙ্ঘের সভ্যাদের সহিত সমবেদন জ্ঞাপন করিতেছি।

উক্ত শোক-সভায় নিম্নলিখিতমত দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

১। কল্যাণী-সঙ্ঘের এই সভা সঙ্ঘের সভ্যা শ্রীমতী শ্যামমোহাগিনী বসুর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যু হওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ও তাঁহার মাতৃহারা সন্তানদের জন্য আন্তরিক বেদনা অনুভব করিতেছে।

২। কল্যাণী-সঙ্ঘের এই সভা চক্রধরপুর রেলওয়ে উপনিবেশে গত সাত বৎসরের নানারূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায়

অল্পবয়স্কা নারীর মৃত্যুহার লক্ষ্য করিয়া অতিশয় উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন এবং এই সকল শোচনীয় অকালমৃত্যুর আশু প্রতিবিধানের জন্য জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

ডোমার মহিলাসমিতি

গত ১১ই জুন শনিবার, রংপুর জেলার ডোমার গ্রামে স্থানীয় মহিলাদের উদ্যোগে একটি মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। কেন্দ্রসমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রগোপাল গোস্বামী এম্-এ, "নারী-জাগরণ" বিষয়ে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরদিন ১২ই রবিবার সন্ধ্যার সময় স্থানীয় থিয়েটার হলে গ্রামের সমগ্র মহিলা ও পুরুষদের মিলিত একটি সভা হয়। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় এখন ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে "মহিলাসমিতির উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যপদ্ধতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় ৪০০ শত মহিলা যোগদান করেন। বক্তৃতা অত্যন্ত প্রাণগ্রাহী হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে উক্ত সমিতির সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী শৈবলিনী নিম্নোক্ত লিখিয়াছেন যে, "• • তিনি চিত্তাকর্ষকভাবে নারীদের কর্ত্তব্য ও সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে স্থানীয় ভদ্রলোক ও মহিলাদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়িয়াছে। আশা করি, মধ্যে মধ্যে আপনাদের উপদেশ ও উৎসাহ পাইলে আমরা কাজে আনন্দ ও উৎসাহ পাইব।"

এই সমিতিটি মাত্র কয়েকমাস গঠিত হইয়াছে; ইহার মধ্যেই স্থানীয় যুবক ও মহিলাদের অসীম কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মে উদ্দীপনা লক্ষিত হইতেছে; বিশেষভাবে সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী শৈবলিনী ও সভানেত্রী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী এবং যুবকদের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা বিশেষ প্রশংসার্হ।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার স্মৃতি-উদ্দেশে তাঁহার ভগ্নীপতি মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম, এস, সি "হিন্দু নারীর আদর্শ" সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখিকাকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। এই প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

গ্রীষ্মে সৌন্দর্য্য রক্ষার উপায়

গ্রীষ্মকালেই সুন্দরীদের বড় অসুবিধা হয়। প্রখর রৌদ্রতাপে তাঁহাদের কমল কোরকের মত মুখখানি ম্লান হইয়া পড়ে—সমস্ত শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়—ফলে গাত্রে দুর্গন্ধ জন্মে ও সর্ব্বগাত্রে ঘামাচি ফুস্কুড়ী ও ব্রণ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়।

এই সমস্ত উপদ্রবের হাত হইতে নিজেকে ও নিজের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার উপায় প্রাতঃকালে স্নান করা—স্নানের সময় উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিবেন—উৎকৃষ্ট সাবান বলিলে বাঙ্গালার শিক্ষিতা সুন্দরীরা হিমানীর চন্দন সাবানই বুঝেন; কারণ ইহার মত মধুর গন্ধ ও তৃপ্তি অন্য সাবান দিতে পারে না—চন্দন সাবান অনেক রকম আছে কিন্তু 'হিমানী চন্দন' একই রকম—দোকানদারের প্ররোচনায় অন্য সাবান পরিদ করিবেন না। স্নানান্তে দেহের সর্ব্বস্থলে হিমানি টাল্ক পাউডার ব্যবহার করিবেন—হিমানী টাল্ক পাউডার অনেক রকম গন্ধের পাওয়া যায় তন্মধ্যে 'চন্দন' 'বস' ও হিমানী গ্রীষ্মকালের উপযোগী।

মুখে হিমানী স্নো বা হিমানী ভ্যানিসিং ক্রীম ব্যবহার করিলে সারাদিনের উত্তাপে মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে না।

সন্ধ্যায় গা ধুইবার সময় হিমানীর বস্ বস্ সাবান ব্যবহার করিবেন ও মাথায় তৈলের পরিবর্ত্তে "তেলসেট হেয়ার ক্রীম" ব্যবহার করিলে মস্তক (Scalp) পরিষ্কার থাকিবে ও খুস্কী মহামারি প্রভৃতি জন্মিবে না।

যাহাদের মাথায় বড় শীঘ্র শীঘ্র ময়লা জমে তাঁহাদের উচিত "শাম্পানী" নামক হিমানীর প্রস্তুত অভিনব শাম্পু (কেশ ধাবন) ব্যবহার করা।

যাহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় তাঁহাদের জন্য হিমানীর প্রস্তুত "আইওডিন ডেন্টাল ক্রীম" নিত্য ব্যবহার প্রশস্ত ইহা পাইওরিয়ার প্রতিষেধক ও নিত্য ব্যবহারের জন্য হিমানীর নিম ডেন্টাল ক্রীম বিশেষ প্রচলিত। আজই নিজের মাথন কিনিয়া ঠকিবেন না। হিমানীর জিনিসগুলি চিরদিনই বিশুদ্ধ।

প্রচারক—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং ৪৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

"পঞ্চ বৈষ্ণব বা পঞ্চ তত্ত্ব"

(হরের কোলের চলচ্চিত্র)

শিল্পী—শ্রী প্রমদিনী দেবী

ময়ূরের পুলক মেঘমালা—
সুকেশিনীর

জবাকুসুম।

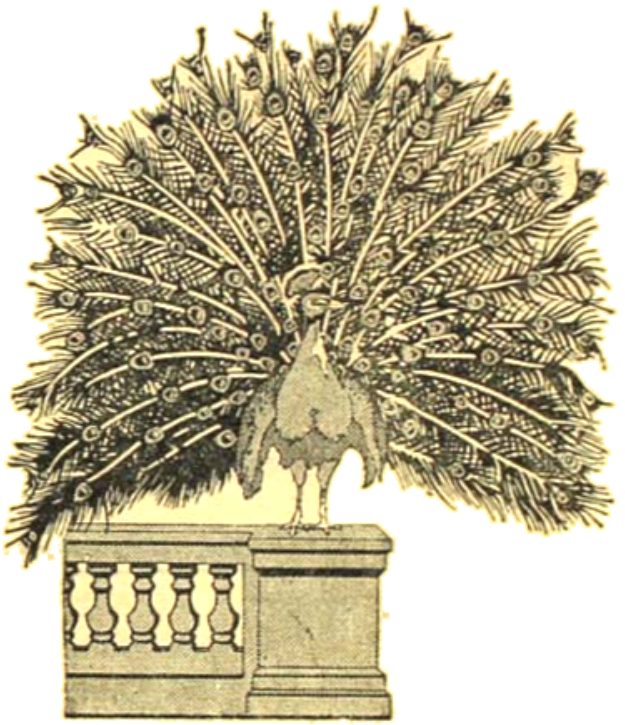

●

জবাকুসুম
সকল সম্ভ্রান্ত
দোকানে পাওয়া
যায়।

●

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,

২১ কলুটোলা কলিকাতা।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

অটুট রাখতে

পারিজাতের

জেসমিন ও চন্দন

শ্রেষ্ঠ।

ফ্যাক্টরী :—

টালিগঞ্জ

পারিজাত সোপ ওয়ার্কস

৪৩।৩ এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট।

কলিকাতা, ফোন : কলি ৪২০৬

উৎকৃষ্ট দ্রব্যই পরিণামে সুলভ

কারণ নকল জিনিষ ব্যবহারে অতিরিক্ত খরচ পড়ে, কিন্তু আসল জিনিষ অল্প ব্যবহারে অনেকদিন পাওয়া যায়। অনামা অখ্যাত জিনিষ ব্যবহার না করিয়া সকলের

—মার্কোজোন—

– ব্যবহার করা উচিত—

প্রাথমিক চিকিৎসায়, ক্ষত ধুইবার জন্য, অস্ত্রোপচারে, গলদেশের জন্য, কর্ণ প্রদাহে ও মুখমণ্ডল পরিষ্কারের জন্য

"মার্কোজোন" (MERCKOZONE)

– সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

সুতরাং ডাক্তারখানায় গিয়া সব প্রয়োজনে মার্কোজোনই চাহিবেন

৪ আউন্স, ১০ আউন্স এবং ২০ আউন্স পেটেন্ট বোতলে পাওয়া যায়।

সমস্ত ডাক্তারখানায় এবং দোকানে ইহা বিক্রয় হয়।

একমাত্র প্রস্তুতকারক

ই, মার্ক, ডার্মষ্টাট, জার্ম্মানী

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ করিয়া "বঙ্গশ্রী" নামোল্লেখ করিবেন

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৯ [৯ম সংখ্যা

চন্দনবালা

শ্রী পূরণচাঁদ নাহার এম-এ, বি-এল

আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ ভগবান্ মহাবীরের নামের সহিত পরিচিত আছেন। ইনি জৈনদিগের চতুর্থ তীর্থঙ্কর ছিলেন ও খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৭ বৎসরে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহারই সময় অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা-নগরে দধিবাহন নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল ধারিণী। দধিবাহন অতিশয় প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজারা সর্ব্বত্রই সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিল। দধি-বাহনের বসুমতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। বসুমতী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহার পিতা-মাতা তাহার শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বসুমতী ক্রমে গণিত ও সঙ্গীতাদি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষাও লাভ করিয়া-ছিল। এই সময়ে কৌশাম্বীতে শতানিক নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। একদিন দধিবাহন-রাজার নগরপ্রহরী গণ ত্রাসে উদ্‌ভ্রান্তে ছুটিতে ছুটিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ! রাজা শতানিক প্রবল সেনা লইয়া নগর আক্রমণ করিয়াছেন, এখনে সংবাদের আজ্ঞা।" এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যুদ্ধের নাকাড়া বাজিয়া উঠিল ও নগরের চারিদিক অসংখ্য সেনা ঘিরিয়া ফেলিল। কয়েক দিন ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষের বহু সেনা হতাহত হইল। ক্রমে শত্রুসেনা প্রবল বেগে দুর্গ আক্রমণ করিল ও বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দুর্গদ্বার ধ্বংস করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। নগরের সর্ব্বত্রই হাহাকার পড়িয়া গেল। শত্রুসেনা ইতস্ততঃ লুটপাট আরম্ভ করিল। রাজা দধিবাহন কোনরূপে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই বিপদের সময় রাণী ধারিণী বসুমতীকে সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে প্রাণসঙ্কট অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া অলক্ষ্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময় শতানিক-রাজার কোন এক উচ্চ-সেনা পতি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "অহো! ইহাদিগকে চম্পানগরীর কোন মান্য ও গণ্য ব্যক্তির

মনে হইতেছে ; ইহারা বাড়ীতে এখান হইতে লইয়া যাইবার আর কি মূল্যবান ঐশ্বর্য্য থাকিতে পারে ?" এই ভাবিয়াই সে ঐ মাতা ও কন্যা উভয়কে বন্ধন করিয়া উষ্ট্রের উপর তুলিল এবং উষ্ট্রকে দ্রুতবেগে চালাইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে অনেক নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া উষ্ট্র-সেনাপতি ধারিণী ও বসুমতীকে লইয়া একটি নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল। তখন ধারিণী ঐ দোষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছ ?" তদুত্তরে সেনাপতি বলিল, "তুমি ভাবিতেছ কেন ? আমি তোমাদিগকে উত্তম আহার্য্য, বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দিব—এবং তুমি আমার স্ত্রী হইয়া থাকিবে।" এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধারিণীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি চিন্তা করিলেন,—"হায় ! আমার এ কি দশা হইল ! কোথায় আমার অকলঙ্ক কুল, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর আজ কিনা আমাকে এই পাপবাক্য শুনিতে হইল ?—এরূপ জীবন সাধনে ধিক্ !" এই চিন্তা ধারিণীর হৃদয়ে এরূপ প্রবল আঘাত করিল যে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া উষ্ট্রের উপর হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন এবং ভূমিতে পতিত হইবা মাত্রই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তৎক্ষণাৎ বসুমতী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"এই বিজন বনে আমাকে যমের হস্তে ফেলিয়া মা তুমি কোথায় চলিয়া গেলে ! বাবা ত গিয়াছেই,—এই দুঃখময় জীবনে কেবলমাত্র তোমারই ভরসা ছিল, আজ তাহাও হারাইলাম !" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাজকন্যা বসুমতী মূর্চ্ছিতা হইল। এই সমস্ত ব্যাপার চোখের উপর ঘটিতে দেখিয়াও উষ্ট্র-সেনাপতি কোনরূপ বিচলিত না হইয়া ভাবিল,—"ইহাদিগকে এরূপ বাক্য বলা উচিত হয় নাই, যাহা হউক, এই কন্যাকে এখন আর কিছু বলিব না নতুবা এও মাতার ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে।" এই ভাবিয়া সে বসুমতীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ক্রমে বসুমতীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তৎপর সেনাপতি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কহিতে লাগিল, "কন্যা ! তুমি ধৈর্য্য ধর। যাহা হইবার হইয়াছে, বৃথা শোক করিয়া কোন ফল হইবে না। তুমি শান্তিতে থাক, তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।" এইরূপ প্রবোধ দিতে দিতে তাহারা কৌশম্বী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঐ সময়ে কৌশম্বী একটি জনাকীর্ণ নগর ছিল। দেশ-বিদেশের বণিকগণ আপনাপন শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া ঐ নগরের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিত। সে সময়ে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। সেনাপতি মনে করিল,—"এই কন্যাটি অতি সুন্দরী, ইহাকে বিক্রয় করিলে অনেক অর্থাগম হইবে।" এইরূপ স্থির করিয়া সেনাপতি অনতিবিলম্বে বাজারে উপস্থিত হইল। সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া চতুষ্পার্শ্বে বহু লোকের সমাগম হইল। সে সময় বসুমতীর হৃদয়ে যে কিরূপ দুঃখের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত ! সে অধোবদনে দণ্ডায়মানা থাকিয়া মনে মনে ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিল,—"হে জগদ্বন্ধু জগদীশ্বর ! তুমি ভিন্ন আমাকে এই বিপদ হইতে আর কে উদ্ধার করিবে ?" সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সৌভাগ্যক্রমে ধনাবহ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠি সেই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যাটিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দয়ার্দ্র হইল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"এই বালিকা নিশ্চয়ই কোন ভদ্রবংশের কন্যা হইবে। কোন বিপত্তিতে পড়িয়া এই পিশাচের হস্তগত হইয়াছে। কোন অসৎ লোকে ইহাকে ক্রয় করিলে নিশ্চয়ই ইহার চিরজীবন দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত হইবে। আমিই কেন ইহাকে ক্রয় করিয়া কন্যার ন্যায় পালন করি না ?" এই ভাবিয়া যথেষ্ট মূল্য দিয়া তিনি বসুমতীকে ক্রয় করিলেন।

শ্রেষ্ঠী ধনাবহ বসুমতীকে ক্রয় করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"ভগিনি ! তুমি কার কন্যা ?" ইহা শুনিয়া বসুমতী বিশেষ শোকাতুরা হইল। তাহার নেত্রপটে তাহার পিতা-মাতা যেন দৃষ্টিগোচর হইল। কোথায় সেই অঙ্গের রাজধানী চম্পা,—আর সেই চম্পার রাজকন্যা বসুমতী আজ কিনা কৌশম্বীর রাজপথে দাসীরূপে বিক্রীতা। সে শ্রেষ্ঠিকে কোন উত্তর দিতে পারিল না। ধনাবহ ভাবিলেন,—"কন্যাটি সম্ভবতঃ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের, সেই কারণ আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। কোন্ আমার প্রশ্নে অতিশয়

দুঃখিত হইয়াছে।" সুতরাং তিনি এ বিষয়ে আর বসুমতীকে কোন প্রশ্ন করিলেন না।

বাটী আসিয়া শ্রেষ্ঠী তাঁহার স্ত্রী মূলাকে বলিলেন, "প্রিয়ে! এটি আমাদের কন্যা, ইহাকে যত্নপূর্বক পালন কর।" মূলা তাহাকে নিজ কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিল। বসুমতীও তথায় নিজের গৃহের মত সকলের সহিত বাক্যালাপ ও শিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার প্রিয় বচনে শ্রেষ্ঠীগৃহের সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ধনাবহও তাহার সুমিষ্ট কথায় সন্তোষ লাভ করিতেন এবং বলিতেন যে কন্যাটির বচনে তিনি চন্দনের ন্যায় শান্তি পাইতেছেন।—তজ্জন্য তাহাকে 'চন্দনবালা' বলিয়া ডাকিতেন। চন্দনবালা ক্রমশঃ যৌবনে পদার্পণ করিল ও সঙ্গে সঙ্গে তার দৈহিক সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী-স্ত্রী মূলা ইহা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল,—"আমার স্বামী ইহাকে কন্যা বলিয়া পালন করিতেছেন কিন্তু কোন সময়ে যদি চন্দনবালার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন তাহা হইলে আমার আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।"

ইত্যবকাশে একদিন গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে আকুলিত হইয়া শ্রেষ্ঠী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হাত-পা ধুইবার জন্য দাস-দাসীকে ডাকাডাকি করিলেন; ঘটনাক্রমে সে-সময় কেহ উপস্থিত না হওয়ায় তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চন্দনবালা অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে শ্রেষ্ঠীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং জল আনিয়া শ্রেষ্ঠীর পা ধুইয়া দিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মস্তকের কবরী খুলিয়া যাওয়ায় সমস্ত কেশপাশ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। শ্রেষ্ঠী নিজহস্তে ভূমি হইতে তাহা তুলিয়া যত্নের সহিত চন্দনবালার মস্তকে বাঁধিয়া দিলেন। মূলা এই দৃশ্য আড়াল হইতে দেখিতেছিল; তাহার হৃদয়ের আশঙ্কা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গেল। সে আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইল। শ্রেষ্ঠী কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। পরক্ষণেই মূলা আপনার কার্য্য আরম্ভ করিল। সে প্রথমে নরমুন্দর ডাকাইয়া চন্দনবালার মস্তক মুণ্ডন করাইল, পরে তাহার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একটি কোণের কুঠরিতে লইয়া গিয়া খুব প্রহার করিল. তারপর কুঠরির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজ শিত্রাগারে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে বাড়ীর সমস্ত দাস-দাসীকে ডাকিয়া নিষেধ করিয়া গেল যেন কেহ এইসকল বিষয় শ্রেষ্ঠীকে ঘুণাক্ষরে না জানায়।

সন্ধ্যার সময় ধনাবহ গৃহে ফিরিয়া চন্দনবালাকে দেখিতে না পাইয়া দাস-দাসীগণকে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই কোন উত্তর না দেওয়ায় ভাবিলেন, বোধহয় বাড়ীতেই কোথাও খেলাধূলা করিতেছে। পর-দিবসও ঐরূপ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া খোঁজ করিলে পূর্ব্ববৎ সকলেই নীরব রহিল।

তৃতীয় দিবস চন্দনবালার বিষয় স্মরণ হওয়ায় শ্রেষ্ঠী দাস-দাসীগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "যদি সত্বর তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও, তাহা হইলে এইক্ষণেই তোমাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব।" ইহা শুনিয়া বাড়ীর একটি বৃদ্ধা দাসী শ্রেষ্ঠীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার জানাইল এবং সেই কুঠরিটি দেখাইয়া দিল। এই সমস্ত ব্যাপার জানিয়া ধনাবহের বিশেষ দুঃখ হইল। তিনি অবিলম্বে কুঠরির দ্বার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলেন- চন্দনবালা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার মস্তক মুণ্ডিত,মুখে অবিরাম ভগবানের নাম উচ্চারিত ও নেত্রে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত ও তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন। চন্দনবালার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া শ্রেষ্ঠীর চক্ষে জল আসিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রিয় কন্যা, আর দুঃখ করিও না. বাহিরে এস। তোমার এ দশা আর দেখিতে পারিতেছি না! তিন দিন হইতে উপবাসী আছ। হায়, সে দুষ্টা স্ত্রী কোথায়?" বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠী শীঘ্র রন্ধনশালার দিকে আহার্য্য সংগ্রহের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল এক কোণে একটি সূপে কলাইয়ের দা'ল-ভাজা পড়িয়া ছিল, তিনি তাহাই লইয়া চন্দনবালাকে দিলেন ও তাহার পায়ের শিকল কাটিবার জন্য স্বয়ং কর্ম্মকারকে ডাকিতে ছুটিলেন। চন্দনবালা ধীরে ধীরে কুঠরির দরজার নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল,—"হায়! মনুষ্যজীবনের কত পরিবর্ত্তন! কোথায়

আমি রাজকন্যা,—কোথায় আমার রাজপ্রাসাদ,—আর আজ আমার এই দুর্দশা! তিন দিন উপবাসের পর আজ কলাইসিদ্ধ আহার জুটিল। কিন্তু আমি কোন অতিথিকে ইহা না দিয়া মুখে দিব না।"

আজ পাঁচ মাস পঁচিশ দিন হইতে চলিল কৌশাম্বীতে এক মহাযোগী ভিক্ষার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। পুরবাসিগণ তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেছেন না,—ইহার কারণ কি? নিশ্চয়ই তাঁহার কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে, সেই কারণ তিনি ভিক্ষা লইতে পরাঙ্মুখ। নগরের সমস্ত লোক ভাবিতেছে এই যোগীরাজ পারণ করিলেই মঙ্গল। তিনি ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া যেস্থানে চন্দনবালা দরজার নিকট বসিয়া ভাবিতেছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ অবস্থায় কণমাত্র তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভিক্ষা না লইয়াই তিনি ফিরিতেছেন দেখিয়া চন্দনবালার হৃদয়ে দুঃখের অবধি রহিল না, তাহার নেত্রে অশ্রুস্রোত বহিতে লাগিল, সে বলিল,—"হে কৃপানাথ! আমি কি এতই অভাগা যে এ-সময় দর্শন দিয়াও আমার হস্ত হইতে একমুষ্টি ভিক্ষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না।" যোগীরাজের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, তিনি ফিরিয়া হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষা-গ্রহণকারী এই যোগীরাজ মহাপ্রভু ভগবান্ মহাবীর। যোগীরাজ চন্দনবালার হাত হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করা মাত্র চন্দনবালার হাত-পায়ের শৃঙ্খল মুক্ত হইল। মস্তকে পূর্ব্বের ন্যায় কেশপাশ দেখা দিল। সমস্ত প্রকৃতি যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিল! ধনাবহ কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। চন্দনবালাকে পূর্ব্ববৎ দেখিয়া তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না। চন্দনবালা পিতৃকুলা শ্রেষ্ঠীর চরণে প্রণাম করিল। ইতিমধ্যে মূলাও বাটী ফিরিল। সে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইল। চন্দনবালা তাহাকেও প্রণাম করিয়া বলিল, "মা! আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, আপনারই কৃপায় ত্রিলোকনাথ প্রভু মহাবীর আমার হস্তে পারণ গ্রহণ করিয়াছেন।—ইহা আপনারই অসীম দয়ার কথা!" নগরবাসিগণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দলে দলে তথায় আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজা ও রাণী পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠী-ভবনে উপস্থিত হইয়া চন্দনবালাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এমন সময়ে জনতার মধ্য হইতে হঠাৎ একটি সৈনিক পুরুষ অগ্রসর হইয়া চন্দনবালার চরণে প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুরবাসিগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তুমি এই আনন্দের দিনে এরূপভাবে কাঁদিতেছ কেন?" সে উত্তর করিল, "ভাইগণ! ইনি আমাদের রাজকুমারী বসুমতী, চম্পা-নৃপতি দধিবাহন ও রাজমহিষী ধারিণীর কন্যা। কোথায় ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন আর কোথায় আজ এই দাসীর দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি ইঁহাদেরই আশ্রিত ভৃত্য, যে সময়ে শতানিক-নৃপতি চম্পানগরী আক্রমণ করেন সেই সময় আমি বন্দী হইয়া এখানে আনীত হই। এখানে আমার অপেক্ষাও রাজকুমারীর দৈন্যাবস্থা দেখিয়া আমার বিশেষ কষ্ট হইতেছে।" রাজা-রাণীও এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। রাণী মৃগাবতী বলিলেন, "ধারিণী আমার ভগ্নী, তাঁহার কন্যা আমারই কন্যাতুল্যা। হে পুত্রী, আমার সঙ্গে চল।" এই বলিয়া রাণী চন্দনবালাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজপ্রাসাদে মৃগাবতী চন্দনবালাকে গর্ভজাতা কন্যার ন্যায় যত্নের সহিত রাখিলেন,—কিন্তু সংসারের প্রতি চন্দনবালার বীতরাগ জন্মিল। সে সর্ব্বদাই ভাবিত,—"রাজপ্রাসাদের সুখ ক্ষণিক প্রলোভন মাত্র, তাহাতে কিরূপে শান্তি হইতে পারে? একমাত্র জিনদেবের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। ভগবান্ জিনেশ্বর-দেব সর্ব্বশক্তিপুঞ্জ। তাঁহার স্মরণ মাত্র দুঃখসাগরেও শান্তি দেখা দেয়। সেই দুঃখতাপহারী নামের ধ্যানই আমার একমাত্র অবলম্বন।" চন্দনবালা দিবারাত্র রাজমহলে থাকিয়াও জিনদেবের ধ্যানে মগ্ন থাকিত। বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ, সাজসজ্জা চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়াদি কিছুতেই তাহার আসক্তি ছিল না, সে সর্ব্বদাই পুরুষোত্তম তীর্থঙ্করের স্তব ও গুণগান করিত। এইরূপে চন্দনবালা অতি পবিত্র জীবন যাপন করিতে লাগিল। এই সময়ে ভগবান্ মহাবীরও পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত

হইলেন। পূর্ণত্ব লাভের পর ভগবান্ মহাবীর পবিত্র জিনধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন অনেকেই তাঁহার কথিত সত্যাদর্শের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। অনেক স্ত্রী-পুরুষ সংসারের অসারতা বুঝিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। শ্রাবিকাগণের মধ্যে চন্দনবালাই তাঁহার প্রথমা শিষ্যা হইলেন এবং পরবর্তী কালে তীর্থঙ্কর মহাবীরের ছত্রিশ হাজার সাধ্বীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে মহাসতী চন্দনবালা নানারূপ যোগ ও তপস্যায় রত থাকিয়া জিনধর্ম সুচারুরূপে পালন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে নির্বাণ লাভ করিলেন। চন্দনবালার ব্রহ্মচর্য, তপস্যা ও ত্যাগ ধন্য। প্রত্যেক বঙ্গললনা তাঁহার জীবনমার্গ অনুসরণ করিয়া আত্মার কল্যাণ সাধন করুন,—ইহাই প্রার্থনা।

'মেঘৈর্মেদুরম্বরম্—'

শ্রী সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হে পৃথিবী, দেখো আঁখি মেলি,'
ঘনায়েছে কাজল-কুহেলি!
মেঘেরা ডানার ভরে
নেমেছে নীলাম্বরে,—
পরশে কাঁপিছে চামেলি!

হে ধরণী, খোল, খোল দ্বার—
দেখো কাঁদে আদিম আঁধার!
ঘন-ঘাদ্-গর্জনে
সুরভি জাগে মনে!—
ভ্রমরতে জাগে মল্লার!

বসুমতী, কি ভাবিছ মনে,
কালিন্দী-কল-ক্রন্দনে?
ঘিরিয়া কদম্ব-রেণু
ঝরিছে পুরানো বেণু!—
সুরভি কাঁপে কেয়া-বনে!

শোনো, শোনো—বাদল-নূপুর!
আঁধারে ভরিছে বেণু-সুর।
তমাল-বাণীর দোলে,
তমিস্রা-কলরোলে
তৃণদলে ফোটে অঙ্কুর!

বসুন্ধরা গো, ওঠো জেগে
বন্ধ বাহুরে ঘন মেঘে!
ওষধি-গন্ধ বাহি'
চন্দনে অবগাহি'
ছুটে চলো যৌবন-বেগে।

ওগো মূক, মৃত্তিকামৌ',
পূর্ণা তটিনী কাঁদে ঐ!
শোনো, স্রোতের টানে
সেই গান কহে কানে:
'কেমনে এমন ব্যথা সই'?'

যুমল জটার মোহ-ফাঁদ
পেতেছে সে চির-উন্মাদ!
অগুরু-ধূপের ধূম!—
ঘুমায় গভীর ঘুম
মহুয়া-মদির বাঁকা চাঁদ!

আদিম কালের বিরহিণী,
শুনিছ না বাঁশীর রাগিণী?
নওল-কিশোর আসে!
সুখ-ঘন-নিশ্বাসে,
কেঁপে ওঠে গৌর-কামিনী!

অতনু যৌবন বয় দেহে,
বিজয়ী জড়িত যেন 'মেহে'—
বহ্নি-পাখায় জ্বালা
ঘুমির প্রদীপ-মালা!
রোমাঞ্চ জাগে ফুল-গেহে!

অঞ্জনে টানা দুটি ভুরু—
অঙ্গ শিহরে দুরু-দুরু!
মানসের মন্দিরে
নূপুরের ধ্বনি ফিরে—
গগনে গভীর গুরু-গুরু!

ওগো রাধা, হে মোর পৃথিবী,
সম্বরি' রাখো তব নীবি।
কুঞ্জর বারবার
ধরে রূপ-সম্ভার,—
এখনো ফিরায়ে তা'রে দিবি?

হে মেদিনী, ঢাকিয়ো না মুখ!—
—কাঁপে তারি চীন-অংশুক!
প্রখর দাহন-শেষে
জনম-হরষ বেশে
এল সে অধীর,—উন্মুখ।

চেয়ে দেখো, হে অভিমানিনী,
নীপবনে মেঘেছে যামিনী!
উজল যমুনায়
যৌবন শিহরায়—
আঁধিয়ারে শিহরে দামিনী!

কহে কবি: 'হে মোর কিশোর,
পথ দেখায়ে চলো ও'র।
অম্বর ভরে মেঘে,
বর্ষণ ছোটে বেগে—
ধূল-রেণু করিছে অকোর!'

বৌদ্ধধর্ম্ম

কুমারী ছায়া দেবী

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬২৩ অব্দে শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলবাস্তু নগরে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। এই নগরটি রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ইহা বারাণসী-ধাম হইতে শতাধিক মাইল উত্তরে এবং অযোধ্যা হইতে পশ্চিম মাইল উত্তরপূর্ব্বে স্থিত একটি জনপদ। কবে এবং কি কারণে এই নগরী বিনষ্ট হইয়াছিল তাহার সঠিক ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। এই প্রাচীন নগরটি যে স্থানে বিদ্যমান ছিল উক্ত স্থান এখন ভুইলাগ্রাম নামে পরিচিত। কথিত আছে কপিল মুনির সাধনক্ষেত্র ছিল বলিয়া নগরটির নাম 'কপিল-বাস্তু' হইয়াছিল। শাক্যবংশীয়েরা ক্ষত্রিয় ছিল। তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে।

একই সময় ভারতবর্ষে দুই জন স্বনামধন্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; এবং প্রায় একই সময়ে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া দেহত্যাগ করেন। এই দুই জন মহাপুরুষ হইলেন গৌতম-বুদ্ধ ও বর্দ্ধমান-মহাবীর। বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন বৈশালী নগরের উপকণ্ঠে কুণ্ডগ্রামে খ্রীঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে বর্দ্ধমান-মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মজগতের চিন্তারাজ্যে এই দুই জন মহাপুরুষের যথেষ্ট প্রভাব আজও বর্ত্তমান আছে এবং ইঁহাদের শিষ্য-সংখ্যাও যথেষ্ট। দুই জনের ধর্ম্মমত অনেক বিষয়ে এক হইলেও প্রভেদও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

বৈদিক যুগ হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্য্যন্ত আর্য্যসভ্যতার গতি ও বিস্তৃতি একভাবে চলিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

কাশ্মীর ব্যতীত অন্যান্য বহু রাজা যোগদান করিয়াছিল। এই যুদ্ধে ভারতের বাহির হইতে সৈন্যসামন্ত আসিয়াছিল এবং ভারতস্থিত নিম্নজাতিরাও যোগদান করিয়াছিল। মহাভারতে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে অন্ন-বিস্তর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে এই যুদ্ধের পরিণাম দর্শন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই যুদ্ধের ফলে ভারতে নারী-সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাহির হইতে যাহারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কিছু লোক ভারতে চিরকালের মত বসবাস করে। যাহারা ফিরিল তাহারা ভারতের ভিতরের ধনদৌলত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গেল এবং স্বদেশে ভারতের রত্নভাণ্ডারের কথা বর্ণনা করিল। সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি,—কিছুকাল অরাজকতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যস্থাপনা,—অতিরিক্ত লোকক্ষয় জন্য হিংসার প্রতি ঘৃণা ও কিছুকালের জন্য ক্ষাত্রশক্তি লোপ;—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতে বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে চিন্তাশক্তির আর কোন নূতন প্রকাশ নাই।

বুদ্ধদেব যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখন উত্তর ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে বিভক্ত ছিল। দুই শ্রেণীর রাজত্ব তৎসময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর রাজত্ব হইল যথায় রাজা স্বয়ং সমস্ত রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন অর্থাৎ যেখানে রাজা স্বয়ং Judicial and executive function পরিচালনা করিতেন।—উত্তর-কোশল (অযোধ্যা), মগধ (দক্ষিণ-বিহার), বৎস (এলাহাবাদ) এবং অবন্তী (মালব) প্রভৃতি এই প্রকৃতির বড় বড় রাজ্য ছিল। আর এক রকম ছোট ছোট রাজত্ব ছিল যথায় সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।—লিচ্ছবী (মজঃফরপুর জেলা), মল্ল এবং শাক্যগণ (নেপাল তেরাই, বস্তি জেলার উত্তর) প্রভৃতি এই শ্রেণীর রাজ্য।

জগতে বৌদ্ধধর্ম্ম যত লোক মানে এত লোক আর কোন ধর্ম্ম মানে না। বর্ত্তমানে ১২,০০,০০০ কোটি লোক বৌদ্ধমতাবলম্বী; ইহা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি বহু পণ্ডিত ব্যক্তি প্রকাশ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের কোন ধারাবাহিক সঠিক ইতিহাস নাই। বৌদ্ধরা নিজে তাহাদের কোন ইতিহাস লিখিয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের উপর মুসলমানরা যে এতদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়া গেল তাহারাও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কিছু জানিত না। প্রথমতঃ তাহারা হিন্দুদের সহিত বৌদ্ধদের তফাৎ বুঝিতে পারিত না এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নিকট দুইই কাফের। হিন্দুরা বৌদ্ধদের ভালচক্ষে দেখিত না এবং সেজন্য কোন সহানুভূতিপূর্ণ বিবরণ রাখিয়া যায় নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত কিছু কিছু লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে যে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচিত হইতেছে তাহার মূলে একটি হাঙ্গেরিয়ান যুবক—আলেকজাণ্ডার সোমোস্‌ডি কোরোসি। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে মানবের আদিম নিবাস হইল মধ্য-এসিয়া। সেই আদিম নিবাস অন্বেষণ করিবার জন্য তিনি পদব্রজে ভ্রমণ আরম্ভ করেন এবং বহুদেশ ভ্রমণের পর তিনি সিমলায় উপস্থিত হন। ভ্রমণকালে তিনি বহুস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ধান পান এবং অনেক পুঁথিও যোগাড় করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তও পাঠ করিবার বস্তু। ভারতবর্ষেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

কিন্তু একদিন বৌদ্ধধর্ম্মের বিরাট বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়াছিল। এখনকার মত তখন যোগাযোগ সহজ ছিল না; পদব্রজই প্রধানতঃ অবলম্বন ছিল। ভারতবর্ষের আশপাশের দেশ প্রায়ই সব বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসাহরের লোক সবই বৌদ্ধ। নেপালের লোক অর্দ্ধেকের বেশী বৌদ্ধ। তুর্কীস্থান ও পারস্য এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের আকর ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, বর্ম্মা, শ্যাম, আনাম ও সিংহলবাসীদের অধিকাংশ বৌদ্ধ। একদিন ইজিপ্ট হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। আজও ভারতবর্ষের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্মের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর যে সমস্ত নব্য ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে তাহাদের ভিতরও বৌদ্ধভাব প্রচ্ছন্নভাবে অনেক-কিছু আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের প্রভাব অতি-বিস্তৃত।

এহেন প্রভাবশালী ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল কোথা হইতে? কোন্ ঘাত-প্রতিঘাতে আর্য্যভূমিতে এ বিপ্লবী ধর্ম্মের সৃষ্টি

হইল? বৌদ্ধধর্ম আর্য্যভূমিতে বিদেশীধর্ম—বৌদ্ধধর্মের সহিত আর্য্যধর্মের মত বিরোধ। বৌদ্ধধর্ম হইল গণতন্ত্রের ধর্ম—সর্ব্বনরনারীর ধর্ম। বৌদ্ধধর্মে জাতিবিচার নাই,—নরনারীর বিচার নাই,— ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কলহের স্থান নাই,—আভিজাত্যাভিমান নাই। আছে—মাত্র, সর্ব্বজীবের কল্যাণের পথ।

ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর ধর্মধারা সংস্থাপিত। বৈদিকধর্ম হইল জন-কয়েক ব্যক্তির অনুভূতি মাত্র। বৌদ্ধধর্মেরও মূল হইল বুদ্ধদেবের অনুভূতি মাত্র। এখন দেখা যাক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজের কি মত। বৌদ্ধধর্ম যে আর্য্যধর্মের শাখা ইহাই সাধারণের ধারণা। যদি বৌদ্ধধর্ম আর্য্যধর্মের শাখা হয় তাহা হইলে নিশ্চয় পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকিবে; কিন্তু এ স্থলে সে যোগ কোথায়? বৌদ্ধধর্মের আদি কি, এ বিষয় লইয়া বহুকাল হইতে বাদবিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে; এখনও কিছুই ঠিক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, "পশুহত্যা-নিবারণ জন্য বুদ্ধদেবের অহিংসাধর্ম্মের উদ্রেক হয়।" বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি যে অহিংসা সে বিষয় নিঃসন্দেহ। বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন যজ্ঞে যথেষ্ট পশুবধ প্রচলিত ছিল। কিন্তু পশুবধের জন্য যে বুদ্ধদেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এ কথা তো কোন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। পশুবধ দেখিয়া যে তাঁহার ধর্ম্মের উদ্রেক হয়, এ কথা তো বুদ্ধদেবের কোন জীবনচরিতে পাই না। ধারণার মূলে তবে কি কোন সত্য নাই? গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব-চরিতে' এই সাধারণ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাস ও জীবনী ইহার কোন সাক্ষ্য দেয় না। যজ্ঞে পশুবধ প্রচলিত থাকিলেও অহিংসা যে পরমধর্ম্ম সে কথা তখনকার লোকেরা অনেকেই জানিত। যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করিতেন তাঁহারা এই মত পোষণ করিতেন। তাহার পর জৈনরা বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্ব হইতে অহিংসাধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ বলেন, "বুদ্ধদেব উপনিষদ্-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উপনিষদে যে অদ্বৈতবাদ চলিয়া আসিতেছিল তিনি সেই মতই প্রচার করেন।" সেজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন-অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন। এ কথার মূলে সত্যতা কোথায়? উপনিষদের অদ্বৈতবাদ যে বুদ্ধদেবের সময় প্রচলিত ছিল তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? 'ব্রাহ্মণ'-গুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা হয়। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি যজ্ঞেই ব্যবহার হইত। যাজ্ঞিকেরা এখনও উহা যজ্ঞের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। উপনিষদ্-কথা সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রয়োগ হইত। উপনিষদ্ বলিয়া একটি বিশেষ দর্শনশাস্ত্রের মত তখন প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ বলেন, "বৌদ্ধধর্ম্ম সাংখ্য-মতের পরিণাম।" সাংখ্য-মত যে বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল সে বিষয় নিঃসন্দেহ। উভয় ধর্ম্মই যে ত্রিতাপনাশের জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল সে বিষয়ও সত্য। সাংখ্যগণ আত্মার স্বীকার করেন কিন্তু বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অশ্বঘোষ কিন্তু একরকম বলিয়া গিয়াছেন সাংখ্যযোগ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। এক দলের মত—ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ। ব্রাহ্মণদের উপর তাঁহার দ্বেষই ধর্ম্মপ্রচারের কারণ। ইহা হইতেই পারে না। দ্বেষভাব হইতে এতবড় বিরাট ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, "বুদ্ধদেব শক-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।" ইহাও গ্রাহ্য হয় না; কারণ শকেরা তো শুদ্ধ রাজাদের সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ভারতবর্ষে আসে। এইরূপ বহু মত আছে। বুদ্ধদেব আর্য্য কি না তাহাতেও কাহারও কাহারও সন্দেহ আছে। আমি কেবল সাধারণের জন্য কয়েকটি মত মাত্র এ স্থলে বিবৃত করিলাম।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে আর্য্যধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এ মত গ্রহণ করিবার আরও কয়েকটি অন্তরায় আছে। আর্য্যধর্ম্ম হইল আস্তিক ধর্ম্ম। আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে চারিটি আশ্রম মানিয়া চলিতে হইবে; বেদবাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বেদবিরোধী ধর্ম্ম অনার্য্য-ধর্ম্ম। যে বেদের বিপক্ষে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিপক্ষে, যাগ-যজ্ঞের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে সে আর্য্যধর্ম্মের লোক নহে। বেদের সত্যই হইল আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ্য। বুদ্ধদেব কিন্তু বেদের প্রমাণ্য স্বীকার করেন নাই, —ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই। বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি।

আর্য্যধর্ম্মে কেহ একেবারে সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না। সন্ন্যাসী হইতে হইলে প্রথমে তাহাকে তিনটি আশ্রমে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধদেব এ বিধি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মত ছিল যে, যখনি বৈরাগ্যের উদয় হইবে তখনি ভিক্ষু হইবে। এ মত বেদবিরুদ্ধ মত।

আচার-ব্যবহারের দিক্ হইতে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধের আর্য্যবিরোধী বেশভূষা। আর্য্যরা মাথায় পাগড়ী ও পায়ে জুতা ব্যবহার করিতেন। বৌদ্ধগণ কিন্তু খালি-মাথায় থাকিতেন ও জুতা ব্যবহার করিতেন না। আর্য্যধর্ম্মে সোমরস-পান একটা ধর্ম্ম। বৈদিক যজ্ঞে নরনারী সুরাপান করিতেন এবং তজ্জন্য সময় সময় কেলেঙ্কারি হওয়াও আশ্চর্য্য ছিল না। সুরাপানের বা সোমরস পানের যতই আধ্যাত্মিক বা রূপক ব্যাখ্যা হউক্ না কেন মোটকথা ইহা পান করিলে নেশা হইত। নেশা করা বা মদ খাওয়া বৌদ্ধধর্ম্মে একেবারে নিষেধ। আর্য্যধর্ম্মে শিখা রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদের ন্যায় অবমাননা আর নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে সকলেরি শিখাচ্ছেদন করিতে হইবে। আর্য্যধর্ম্ম স্থিতিশীল ধর্ম্ম। আর্য্যধর্ম্ম অন্যান্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থে লোক প্রেরণ করেন নাই। আর্য্যধর্ম্ম হইল non-missionary ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্ম হইল গতিশীল ধর্ম্ম—missionary ধর্ম্ম। নিজধর্ম্ম প্রচারার্থে ইঁহারা ভারতের বাহিরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আর্য্যধর্ম্মের মেরুদণ্ড হইল বেদের মন্ত্র কয়েক ঋষি। বৌদ্ধধর্ম্মের মেরুদণ্ড হইল বুদ্ধের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অনুভূতি (Realisation)। এইরূপ আর্য্যধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক বিরোধ দৃষ্ট হয়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সমাজ ও মানবজীবন অনেকটা নির্ভর করে। মানব যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার দেহ ও মনে কতকগুলি নিজস্ব সত্তা বা বৃত্তি থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, কালেরও কতকগুলি প্রভাব পড়ে। শিক্ষা ও কৃষ্টির (culture) দ্বারা সু-প্রবৃত্তিগুলির স্ফুরণ এবং কু-প্রবৃত্তিগুলির সংশোধন হয়। যত বড়ই চিন্তাশীল ব্যক্তি হউন ইহার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সেজন্য উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক, কবি ও চিত্রকরের সৃষ্টি হইতে তৎসাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকটা জানিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বুদ্ধদেব যে-সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষে খণ্ড খণ্ড রাজ্য ছিল এবং প্রত্যেক রাজত্বের স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুন ছিল; কাহারও শক্তি এত সবল ছিল না; বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাসে প্রজাশ্রেণী কখন কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে বা যুদ্ধে যোগদান করে নাই। রাজায় রাজায় লড়াই হইত; এবং লড়াইয়ের জন্য প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সৈন্য ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মানবপ্রকৃতির অহিংসাবাদ গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ এবং মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর। ইঁহাদের পূর্ব্বে ২৩ জন করিয়া বুদ্ধ ও তীর্থঙ্কর উক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিপক্ষে কেহ কেহ বলেন যে, ইঁহাদের ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এই বিদ্যা আয়োজন। মোটকথা শাক্যসিংহ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন উত্তর-ভারতের বাতাসে অহিংসাবাদমূলক ধর্ম্মই বিরাজ করিতেছিল; কোথায় এবং কিভাবে বিরাজ করিতেছিল, বলা বড়ই শক্ত।

সেই সময় কতকগুলি সম্প্রদায় ছিল যাহারা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বুদ্ধদেব বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দাঁড়ান নাই; তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই নিগ্রন্থ, আজীবক প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি ইহার বিপক্ষে মত প্রচার করিতেছিল। কতকগুলি সম্প্রদায় যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিপক্ষে মত প্রচার করিতেছিল সে বিষয় আমরা দেখিতে পাই।

বুদ্ধদেবের সময় সাংখ্যমত প্রবল ছিল। সাংখ্যমত আর্য্যমত—এ বিষয়েও মতভেদ আছে। কিন্তু বুদ্ধদেব সাংখ্যমতের উপর উপর গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন সে বিষয় নিঃসন্দেহ। এইরূপ নানা মত আছে। মোট কথা বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা করেন নাই এবং কেহই মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

আর্য্যধর্ম্ম principle বা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; বৌদ্ধধর্ম্ম personality বা ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্য্য-

ধর্ম্মের যে কোন ঋষিকে বাদ দিলে আর্য্যধর্ম্মের কোন অনিষ্ট হয় না; বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। বুদ্ধদেব হইলেন বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। এত-বড় personality ধর্ম্মজগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের আগমনের পর হইতে principle ও personalityর বিবাদ আরম্ভ হয়; এবং তৎফলে আর্য্য-ধর্ম্মের ভিতর personality বা অবতারবাদ আশ্রয় পায়।

বুদ্ধদেব রাজপুত্র ছিলেন। রাজধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য তাঁহার কতকগুলি সহজাত বৃত্তি ছিল। যে বৃত্তিগুলি তিনি রাজধর্ম্মে চালিত করিতে পারেন নাই সেইগুলি সন্ন্যাস-আশ্রমে পরিচালিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। বুদ্ধদেব বড় কড়া-মেজাজের লোক ছিলেন—সন্ন্যাস-আশ্রমের শৈথিল্য তিনি পছন্দ করিতেন না। কথিত আছে, বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার অনেক শিষ্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, কারণ সন্ন্যাস-আশ্রমের কড়া নিয়মের হাত হইতে তাহারা নিস্তার পাইল। আর্য্যধর্ম্মের সন্ন্যাস-আশ্রম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সন্ন্যাস-আশ্রম স্বতন্ত্র বস্তু। আর্য্যধর্ম্মের সন্ন্যাস-আশ্রমে জাতি বলবতী হয়। কেমন করিয়া হয় পরে তাহা দেখাইব।

প্রথম প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা পরিব্রাজক ছিলেন। দারুণ আঘাতে দুষ্ট হইয়া মানবের কল্যাণের নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। যখন ধনী ব্যক্তির সহিত সাধকদের সদ্ভাব হইল তখন ধর্ম্মের ভিতর আকর্ষণক আসিল। সাধারণকে আকৃষ্ট করিতে হইলে আকর্ষণকের প্রয়োজন। ইহা হইল unavoidable evils in our religious life। ইহার হস্ত হইতে কেহ নিস্তার পাইবে না। গৃহস্থ সাধক নষ্ট করে; গৃহস্থের উপর সাধক-জীবন নির্ভর করে। সকলে বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ, যীশু, বিবেকানন্দ হয় না। উহাদের থাক্ স্বতন্ত্র। উহাদের কার্য্যকলাপ অনুকরণ করা মানে নিজেকে নির্জ্জীব করা। সেজন্য কালক্রমে সাধক-জীবনে শৈথিল্য আসে। তখন ধর্ম্মের প্রাণবস্তু নষ্ট হইয়া যায়; গোসাই ধর্ম্মের নামে চলে। গৃহস্থ সংযমী হইলে সাধু-সন্ন্যাসী নষ্ট হইতে পারে না।

বুদ্ধদেবের জীবনী "হাঁ"র (Positive) উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বৌদ্ধনীতির ভিত্তি "না"র (Negative) উপর। বুদ্ধদেবের জীবনী আর্য্যসভ্যতার অবতারবাদ আনিয়া দিয়াছে। জাতকে বুদ্ধদেবের জীবনী আছে। জাতক সংখ্যায় যতই হোক্ মূল-সংখ্যা ৩০।৩৫ টির বেশী হইবে না; কারণ একটি আদর্শ বা principle সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে যদি ৫০টি গল্প সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে আদর্শ হিসাবে ১টি গল্পই বলিব। সেই বিচারে ৩০।৩৫টির বেশী জাতকে নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতক সৃষ্টির মূলে তিনটি উদ্দেশ্য ছিল: ১। পুনর্জ্জন্মবাদ প্রতিষ্ঠা করা; ২। বুদ্ধদেবের জীবনের positive ভাবটি প্রকাশ করা; ৩। অশিক্ষিত জনসাধারণকে সহজ সরল ভাষায় গল্পের ছলে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি প্রচার করা। ভক্তরা প্রভুর মহিমা বর্ণনা করিবার জন্য অনেক-কিছু অসত্যাশ্রিত অলৌকিক প্রয়াস করিয়া থাকে। সেজন্য কালক্রমে জাতকের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িল এবং তৎসঙ্গে যতকিছু সত্যমিথ্যা আশ্রয় পাইল। স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ করিয়া বলিতেন, "ভক্তিমান্ হবার চেষ্টা করিস্ বাবা! ভক্ত হবার চেষ্টা করিস্ নি।" জাতকের ভিতর হইতে সমসাময়িক কিছু কিছু দেশের অন্যান্য খবরও পাওয়া যায়।

প্রত্যেক সাধকের দুই শ্রেণীর শিষ্য থাকে—জ্ঞানমার্গী ও ভক্তিপন্থী। ভক্তিমান্ শিষ্যরা প্রভুর আদর্শ লইয়াই নিজের জীবন চালিত করে। নিজেরা মুক্ত হইলেই তাহারা জীবন সার্থক মনে করে। প্রভুর কথার একটিও নড়চড় তাহারা করিতে চাহে না। জ্ঞানমার্গীরা ইহাদের উল্টা। তাহারা প্রয়োজন হইলে প্রভুর কথা খণ্ডন করিতে দ্বিধা বোধ করে না; এবং স্বয়ং মুক্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হয় না। তৎসাথে অন্যান্য লোকও যাহাতে মুক্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করে। কালক্রমে প্রভুর আদর্শ বিকৃত হইয়া যায়। সাধারণ ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে উপদেশ পায় তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। ইহাই স্বাভাবিক। এই পদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্ম্মে হীনযান, মহাযান ও বজ্রযানের উৎপত্তি হইয়াছে।

"নির্ব্বাণ" লইয়া নানা মত আছে। আমাদের স্বভাবের মস্ত একটা দোষ যে বাক্যের দ্বারা বা ভাষার দ্বারা আমরা সব বস্তু বুঝিতে চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইবার জো নাই। আমরা তুলিয়া যাই যে উচ্চ বস্তু বা ভাব ভাষার দ্বারা

প্রকাশ করা যায় না। আজ পর্য্যন্ত কেহ পারে নাই। উচ্চ ভাবের সামান্য আভাস সাধকের দেহের, চোখ-মুখের আকৃতির দ্বারা প্রকাশ পায়। নির্ব্বাণ লাভ করা যায়; নির্ব্বাণের অবস্থা বোঝান যায় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস একটি উপমাদ্বারা এই অবস্থাটি চমৎকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেন, "কি রকম অবস্থা হয় জানিস্? যেমন নূনের পুতুলের সমুদ্র মাপা। নূনের পুতুল মনে করে সে সমুদ্র মাপ্‌বে; যেম্‌নি সমুদ্রে নাম্‌লে ওম্‌নি গ'লে গেল। এও সেই অবস্থা হয়।" ভাষার দ্বারা ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ভাবের দ্বারা ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত; তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ হয়। মানুষের বিবাদ হয় ভাষা লইয়া; ভাবের দ্বারা ভাব বুঝিবার চেষ্টা করাই মঙ্গলপ্রদ।

সংক্ষেপে আমি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি বর্ণনা করিলাম। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে অনেক-কিছু ভাল করিয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের যথা যে ক্ষতি করিয়া দিয়া গিয়াছে তাহার খবর কয়জন রাখেন? অনেকে বলেন ব্রাহ্মণ জাতির অত্যাচারের ফলে দুর্দ্দশা, কিন্তু নগদনগদ যা ক্ষতি করিয়া দিয়া গিয়াছে তাহার তুলনায় ব্রাহ্মণজাত কিছুই ক্ষতি করে নাই। ব্রাহ্মণজাতি নিরীহ হিন্দু সৃষ্টি করে নাই—এ সৃষ্টি করিয়াছে বৌদ্ধধর্ম্ম। পাঁঠা-কাটা দেখিলে কাঁদিয়া উঠে এ বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব—আর্য্য-জাতির ভাব নয়। ধর্ম্মের ভিতর যত সব বুজরুকির আম-দানি বৌদ্ধধর্ম্ম করিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের নামে নারীর সহিত গুপ্তরহস্য বৌদ্ধধর্ম্মেরই সৃষ্টি। বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু যে নিজে অধঃপাতে গিয়াছিল তাহা নয় সঙ্গে সঙ্গে জাতির নেকড়ও তাড়িয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর দল জাতির মঙ্গল করিতে পারে না। আর্য্যসভ্যতায় চিন্তা-শীল ব্যক্তিরা গৃহী ছিলেন এবং আজও আছেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আদর্শ জাতীর মুক্তির অন্তরায়। গৃহীই জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করিতে পারেন।

নিদয়া

শ্রী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

"সতীলক্ষ্মী" উপন্যাস দিয়া শান্তনু চারি আনা মূল্যের লটারির টিকিট একখানি নিল।

"সতীলক্ষ্মী" কথাটা মনে পড়াও কিন্তু খুব আশ্চর্য্যের বিষয়—উপন্যাস কি দেওয়া যাইতে পারে ভাবিতে যাইয়া দশ বিশটা শব্দ নয়, চিন্তার প্রথম মুহূর্ত্তেই 'সতী' আর 'লক্ষ্মী' দুটি শব্দ আপনি সংযুক্ত হইয়া বিনা চেষ্টায় পৌঁছিয়া গেল—অথচ ঐ দুটি শব্দ ইতিপূর্ব্বে ছিল বলিয়া শান্তনুর স্মরণ হয় না।

শান্তনুর মনে হইল, ইহা অতি শুভ লক্ষণ—হাজার হাজার ভালমন্দ শুভে-দোষে মাখামাখি ইষ্টানিষ্টসূচক শব্দ ভূতাগুতে থাকিতে ঐ শব্দদুটি পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া মনে পড়িয়া গেল কেন! নিশ্চয়ই ইহার পশ্চাতে রহস্যাবৃত অদৃষ্টের গূঢ় অভিসন্ধি আছে!···ভাবিতে গায়ে যেন কাঁটা দিয়া ওঠে।

···'সতীলক্ষ্মী' যুগ্ম শব্দটির অর্থ নয়, তার পবিত্রতা আর বিনয় শালীনতা সে বহুক্ষণ ধরিয়া সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া ধ্যান করিল। সতীর প্রতি জগতের তথা ভগবানের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ এবং পক্ষপাতিত্ব চিরকালের; আর, লক্ষ্মী মানে ঐশ্বর্য্য ইহা ত' জানা কথা। সুতরাং সুলক্ষণযুক্ত এত-দুভয়ের সম্মিলনে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া যাইতেও পারে!

ঠিকের অঙ্কের তুলটা বিরক্তির সহিত সংশোধন করিয়া শান্তনু মুখ তুলিয়া দেখিল, ও-টেবিলের অমরনাথ তাহার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া আছে—

"সতীলক্ষ্মী"র মহিমা তখন শান্তনুর প্রাণে জাগ্রত ছিল—তাহার হিতকারিতা সম্বন্ধেও সংশয় ছিল না—হাসিয়া বলিল, ওহে, মায় দিয়া!

কি ?

—অন্ততঃ পাঁচ হাজার···

উচ্চারণ করিতেই পাঁচ হাজার যেন অনিবার্য্য দাবী হইয়া উঠিল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—নিলে না কি ?

নিলামই ত' !

—আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি···সব 'বোগাস্'। যেন তোমার চার আনা সঙ্গে সঙ্গে···চারখানা চপ্ হ'ত দিবি গরম গরম !

উদয়সন্ধীর অবিশ্বাসীর 'কু-ডাকে' বিরক্তি বোধ করিয়া শান্তনু আর কথা কহিল না

কিন্তু সত্য কথা এই টিকিট কিনাইবার প্রস্তাব আসিলে শান্তনুর নিজেরও মনে হইয়াছিল সব 'বোগাস্'; পাওনাদী ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনা; কিন্তু এই সন্দেহ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে নাই

মৃতের আত্মা যেমন সূর্য্যরশ্মিকে অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে অন্তরলোকে প্রস্থান করে, পৃথিবী রহে নিম্নে, তেমনি একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রচণ্ড কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছিল তার মনোজগতে—

বিজ্ঞাপনের ভাষার এমনি মোহিনী শক্তি যে, সুরু হইতে শেষ অবধি পড়িয়া গেলে প্রাণে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আশারঞ্জিত সুখের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে মন সংসারের কাঠিন্য বিস্মৃত হইয়া কোথাকার একটি সুনির্দ্দিষ্ট স্বপ্ন লাভ করে, তারপর অন্য একটা জগতে উপনীত হইয়া তার নিজের উপর আর আধিপত্য থাকে না···

সুরুতে দুরু দুরু বুকে যেন অদৃষ্টকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে চায়—কি আছে সেখানে কে জানে! কিন্তু তাহাকে সুযোগ দিবে না কেন? সুযোগকে অবহেলা করিও না—কত সম্পদ তোমার দ্বারে আসিয়া তোমার দৃষ্টির অবহেলায় ফিরিয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান রাখ কি? ···এই তুচ্ছতম অর্ঘ্য দিয়া দেখিতে দোষ কি দেবতা প্রসন্ন হয় কি না!

তারপর বিজ্ঞাপনের শেষের দিকে চরম উদ্দীপনা, দারিদ্র্যের প্রতি নির্ম্মম ধিক্কার, দরিদ্রের অনবধানতার প্রতি অতোধিক নির্ম্মম ধিক্কার···সুখের ছবি, সুখের ছবি, টাকা, কত রাজ্যের জিনিষ তাহার ছবি··· মনোহর আর উল্লাসকর তারা সবগুলি—

উহাদেরই মনের তন্ত্রাবেশ, চিন্তার বিন্যাস ভাঙিয়া দিয়া কুবেরের ভাণ্ডারের ঝকমক্ ছটা সম্মুখে আসিয়া পড়ে—লক্ষ্মীর উজ্জ্বল কৃপাদৃষ্টি প্রতি নিমেষে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে।

সাধারণ লোকের যেমন হয় শান্তনুরও তেম্‌নি—অতীতের সঙ্গে বন্ধন অতি সামান্য··· মাঝে মাঝে দু' একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে; যথা: ছেলেরা হাসে বলিয়া ইস্কুলের সেকেণ্ডে পণ্ডিত পড়াইতে চাহিত না; 'শিল্ড্ ফাইন্যালের' দিনে অজস্র বৃষ্টিপাত হইয়া 'গেম্' পণ্ড হইয়াছিল ..অফিস-সংক্রান্ত কথা, গৃহ-সংক্রান্ত কথা—

তারা অতীতের কথাই, কিন্তু বন্ধনের ডোর নহে।

আশা আর আকাঙ্ক্ষার প্রফুল্লতা, উদ্বেগসহ উদ্যমের আর পৌরুষের আনন্দ যেখান হইতে দীপাধার হইতে আলোকের প্রবাহের মত নিঃসৃত হইয়া মানুষের গতিপথ আলোকিত করে আর প্রাণের গতিকে বৃদ্ধ রাখে, শান্তনুর অতীতের সে-স্থানটি অন্ধকার, নিষ্প্রাণ। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিস্পৃহতা থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়—ফুলের বীজ রোপণ করিলে তবেই ত' একদিন ফুল ফুটিবে! অতীতে সে সুযোগ তার আসে নাই···তার বর্ত্তমানের অবয়বে অতীতের আভা নাই, ভবিষ্যতের ছায়া পড়ে না; যাহা একদা ঘটিতে পারে তাহার অকৃত্রিম একটা রূপ দিয়া আশান্বিত হইয়া ওঠা তাহার অভ্যাসের বাহিরে; ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইয়া সহসা স্পষ্ট সত্য হইয়া উঠিবে, এই নিঃসন্দেহ ব্যাপার অনুভব করা ব্যতীত তাহাকে স্বহস্তে গঠিত করিয়া সম্মুখে আনয়ন করিবার সাধ্য কি সাধনা তাহার নাই—কাজেই ভবিষ্যতের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই···

তাবুক যারা, অতীতের মৌতাতার হইতে রসবস্তু আহরণ করিয়া নিরিবিলি সম্ভোগ করে, শান্তনু তাহাদেরও একজন নয়—

আজিকার দিনটা তালয় তালয় কাটিলেই মঙ্গল, আর কিছু চাহি না—এম্‌নি করিয়াই দিন চলিতেছিল; কিন্তু অভিশপ্ত শুভসূচক 'সতীলক্ষ্মী' উপনাম দিয়া চারি আনা মূল্যের লটারির টিকিট একখানি ক্রয় করিতেই তার

অতীতে ভবিষ্যতে একটু রং লাগিল।···ভবিষ্যতের চাত চইতে খসিত হইয়া যে মুহূর্তটি আসিয়াই পালাইত, ঘুমিয়ুক্তির অস্থিরতায় সে যেন চোখে পড়িত না—কেবল অজ্ঞাত একটা ছাপ্ সে লইয়া যাইত. তাদের কি পুলকের—

আজ সে দুটিয়া দেখা দিল—

শান্তনুর আরও মনে হইল, অতীতের টুক্‌রাগুলি জোড়া লাগিয়াছে, কিন্তু তার সর্ব্বাঙ্গের নমগ্র আকৃতিটা ভয়াবহ—দীনের সুতীক্ষ্ণ নিশ্বাসে তাহা কণ্টকিত...

কিন্তু পরক্ষণেই হিরোলিত হইয়া তাহা নিস্তেজ হইয়া গেল···বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের সঙ্কীর্ণ সন্ধিস্থল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া সুদূরের একটা সুপ্রসার স্বচ্ছ স্থানে সে বিচরণ করিতে লাগিল।

শান্তনুর বয়স এই তেইশ—

তার একান্ত আপনার যারা আছে তাদের প্রতিপালক সে-ই—বিধবা মা, ছোট দুটি ভাই, আর একটি ভগিনী। বিবাহ সে করে নাই; ভগিনীর বিবাহ না দিয়া সে বিবাহ করিবে না, এই ছিল তার সঙ্কল্প—

কিন্তু লটারির টাকার সূত্রে সঙ্কল্পবিরুদ্ধ বিবাহের কল্পনাও সে করিতে লাগিল·· একটি অত্যন্ত দরিদ্র পিতার দায়োদ্ধার সে করিবে—পণ বলিয়া একটি পয়সা লইবে না; স্ত্রী তাহাতে তাহার অধিকতর বশীভূত হইবে। কন্যার পিতাকে 'পথে বসাইয়া' যে বর শুভ-বিবাহ করিতে আসে সে ত' ঘোরতর অশুভ বাক্তি, সে অলক্ষ্মীর দূত, সে ডাকাত। পিতৃকুলের এই অশুভদ ব্যক্তিকে কন্যারা না চিনিয়া রাখে এমন নয়, কিন্তু তাহারা করিবে কি?···শান্তনু একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল।

লটারির টিকিট ক্রয়ের কথা শান্তনু বাড়ীতে কিছু বলিল না—সামান্য ব্যাপার···আর, সবাইকে বঞ্চিত করিয়া লাভ কি!···না পাইলে সবাই হতাশ হইবে···পাইলে তখন না হয় সবাই মিলিয়া আনন্দ করা যাইবে—

প্রতিবেশীরা আবার পরশ্রীকাতর...মানুষ কিছু আশা করিলেই তাহারা কঠিন কণ্ঠে বিদ্রূপ করে—যে কথা কেহই বলে নাই তাহারই সমালোচনা ক'রয়া তাহারা নাচিতে থাকে···

কিন্তু টিকিটের নম্বরটা সে বিবিধ ছন্দে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিল: দু'হাজার দু'শো তেইশ, অর্থাৎ দুই দুই ছয় তিন, অর্থাৎ বাইশ শো তেইশ।

লটারির এখনও দেরী আছে—এটা কেবল জুন মাস···সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে খেলা হইবে—বিশ তারিখের মধ্যে 'খবরাখবর' জানা যাইবে।

যদি কিছুই না পাওয়া যায়! না-ই বা গেল—তাহাতে বুক ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে না—

মনে এই সংসাহস জন্মিলেও হৃদ্‌পিণ্ডের একটু সঙ্কোচন ঘটিল···তবুতবু চিন্তায় একটু ব্যাঘাত জন্মিল··চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া নিশ্বাস একটা পড়িল কি পড়িল না তাহা বুঝা গেল না

মোটে ত' চার আনার টিকিট! কতদিকে কত পয়সা অনর্থক খরচ আর লোকসান হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই—সেদিনও মাতাঠাকুরাণী পয়সা ভ্রমে একটি অপরিচয়ার আধুলী ভিখারীকে দিয়া দিয়াছেন··টাকার তাড়ানির সঙ্গে একটি বৃহদাকার সিকি আসিয়াছে যারা কি-পাত্র দিয়া নির্ণীত তাহাই ঠাহর হয় না। তারাও ত' গেছে—এ সিকিটাও না হয় তেমনি কোনো কাজে লাগিল না! চারখানা চপ্···গোগ্রাসে গিলিয়াই অমরনাথ মাটি হইতেছে।

কিন্তু যদি লাগিয়া যায়!

লটারির মজাই ঐ—গেলে যায় চার আনা, কিন্তু এলে আসে...

ভাবিতে গা শিহরিয়া ওঠে।

মাঝে জুনের কয়েকটা দিন, জুলাই পূরা, আগষ্টও তা-ই তারপর সেপ্টেম্বরের ন' তারিখ পর্য্যন্ত কালপ্রবাহ অতীতের সঙ্গে একাকার আর নিস্তরঙ্গ···দশই তারিখে কি হয় বলা যায় না—নিস্তরঙ্গ প্রবাহবক্ষে একটিমাত্র তরঙ্গের উৎক্ষেপণ · এবং তারপরই নিরবচ্ছিন্ন নৃত্যশীলা প্রবাহিনীর বক্ষে জীবন-তরণী একান্ত সুখে ভাসিয়া চলিবে···

হঠাৎ তার মনে পড়ে পিতার শেষ পীড়ার কথাটা—

পয়সার অভাবে সে তাঁর যথোচিত চিকিৎসা করাইতে পারে নাই...অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ের সঙ্কুলান হইয়া সঙ্কটের অবধি ছিল না...

তারপর তার মনে হয়, এই পরম রমণীয় বিচিত্র জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ভোগের অশেষ উপকরণ জমজমা করিতেছে—সুখশিষ্ট বিলাসী মানুষের উদ্দেশে ভগবান তাহা ছড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাহা করতলগত করিবার সামর্থ্য তার আসে নাই—

কি ভাবে তাহা করা যাইতে পারে ইতাবসরে তাহাও কিছু কিছু শান্তনু ভাবিয়া লইল।

যথাসময়ে টেলিগ্রাম এবং তৎপরে পুরস্কারপ্রাপ্ত ভাগ্যবানদের নামের তালিকা আসিবার কথা আছে।

বৎসর দুই পূর্ব্বে শান্তনু আর একবার লটারির টিকিট কিনিয়াছিল কিন্তু কিছুটি পায় নাই। তখন এক বান্ধি মিথ্যা করিয়া অতর্কিতে বলিয়াছিল: "তুমি হাজার টাকা পাইয়াছ" শুনিয়া সে নিজে চমকিয়া আর তাহাতে সেই বান্ধি হাসিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু প্রাপ্য ছিল তাহাতে একটি হারমোনিয়াম, এক জোড়া খঞ্জনী, এক জোড়া বাঁয়া তবলা—অর্থাৎ গতায় থিয়েটার পার্টির সম্পত্তি।

চমকটার বিরুদ্ধে এবার সতর্ক থাকিতে হইবে।

কালপ্রবাহে সেই উত্তাল ঢেউটা উঠিবার বিলম্ব আছে···কিন্তু মুহূর্ত্তগুলি যেন চেতনার সূচাগ্রে আরোহণ করিয়া আলোকস্নেহীনীর মাঝে দেখা দিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল···

এমনি করিয়া বিবিধ সুরলহরির ভিতর দিয়া জুন গেল, জুলাই গেল, আগষ্ট গেল···

একদিন হঠাৎ মুখ ফসকাইয়া শান্তনু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—আমরা বড় দুঃখী-গরীব, নয়, মা?

রাত্রে আহারের পর শয্যায় পৌঁছিয়া, অতি দীন শয্যার দিকে চাহিয়া শয্যার আশ্রয়ে দিনের কথা ভুলিবার পূর্ব্বে সমস্ত দিনের দারিদ্র্য তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল—মনে হইয়াছিল, তাহারা যেন অতিসঙ্কীর্ণ কর্কশ একটা বিবরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিয়াছে—গায়ে চিরস্থায়ী চিহ্নগুলি অঙ্কিত হইতেছে···

মা সে প্রশ্নের জবাব দেন নাই—

দৈনন্দিন জীবনের প্রতি শান্তনুর এই বীতরাগ নয়, রুচিপরিবর্ত্তন আর দেখা দিয়াছে—বাঁধীর তানের আকর্ষণে মন উজান বহিয়া উত্তর তটে যে শ্রী বিকশিত দেখিয়াছে, মানুষের উচিত অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করিয়া সেখানে যাইয়া বাস করা।

দেখিতে দেখিতে ১৮ সেপ্টেম্বর আসিয়া পড়িল। ···অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শান্তনুর চোখে ঘুম আসিল না—

বহুদূর-দেশে সেই পাঞ্জাবের রাজধানীতে রাজ্যসম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়াছে···কোন্ ভাগ্যবানের পূর্ব্বজন্মের তপস্যা ছিল, বর পাওয়া ছিল..তাহাকে সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধোদ্যম করিতে হইবে না, আদালতে যাইয়া যুগযুগান্তরের জন্য মামলা রুজু করিতে হইবে না, এমন কি তর্ক তুলিতেও হইবে না - মন্ত্রিবর্গ ক্ষুদ্র সিলাখণ্ডে বিষ্ণুনাগের আবির্ভাবের মত ক্ষুদ্র একখানি কাগজের মারফত্ বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী অচলা হইয়া গৃহে উঠিবেন···

খুব আশ্চর্য্য কিন্তু!

টেলিগ্রাফ পিওন আসিয়া হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে: শান্তনু চৌধুরী কিস্‌কা নাম?

অমরনাথ হয়তো দেখাইয়া দিবে—ঐ যে, উস্‌কা নাম।

"তার হ্যায়।"—বলিয়া পিওন লেফাপা তার হাতে দিবে...খুলিয়া দেখা যাইবে···

শান্তনু এখানে ধড়ফড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল···হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, লক্ষ্মীর ললাট যেন আকাশে অর্দ্ধেন্দুরূপে উদিত হইয়াছে—তাহারই দিকে ফিরান—কাঁপিতে কাঁপিতে সে শুইয়া পড়িল।

আজ ১০ই সেপ্টেম্বর—

কয়েকবার দুর্গানাম জপ করিয়া শান্তনু শয্যাত্যাগ করিল...মাকে ডাকিয়া তাঁর পদধূলি লইল—

দিনের যাত্রায় ইহা শুভ।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও কি রে?

শান্তনু কথা কহিল না।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ধুক ধুক স্পন্দন যেন দেহের প্রত্যেক কোষে সঞ্চারিত হইয়া গেল···স্নায়ুজাল উৎপীড়িত হইয়া আহারে তার রুচি রহিল না—

আশা তেমন অটল নহে ··কিসের সম্ভাবনায় এই অসহ্য উদ্বেগ সে-ধারণাও যেন সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যাপ্ত একটা কুহেলিকার মাঝে সময় সময় অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।···

শান্তনু ঘণ্টার পর অফিসে আসিল—টেলিগ্রাফ অফিস্‌ও ঐ সময়েই খোলে···

তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাকে কেউ অনুসন্ধান করিতেছে, শব্দমাত্রেই এই ভ্রম জন্মিয়া শান্তনুর চকিত দৃষ্টি দুয়ারে দুয়ারে ছুটাছুটি করিতে লাগিল···যে কেহ কাছে আসে, পাশ দিয়া যায়, যার ছায়া সম্মুখে পড়ে, তাহাকেই বার্ত্তাবহ মনে করিয়া তার অস্থিরতার অন্ত রহিল না···

এমনি করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল, কিন্তু টেলিগ্রাফ আসিল না। "থাক্ গে" বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে যাইয়াও তার কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিল···পথ-চাওয়া থামিল না।

দু'দিন গেছে।

শান্তনু আশা ত্যাগ করিয়াছে—আশা অকস্মাৎ তাহাকে যত উর্দ্ধে ঠেলিয়া তুলিয়াছিল, বরাৎ ভাল যে, ভাঙিয়া পড়িবার সময় তাহাকে সে তত নিম্নে নামাইয়া লয় নাই, অর্থাৎ আঘাতটা সে স্বাভাবিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

ব্যাপারটা যে পাঞ্জাবী জুয়াচোরের জুয়াচুরি সে বিষয়ে তাহার এখন আর সন্দেহ নাই···সিকিটার জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে...

অমরনাথ বলে,—হ'ল ত'! তখনই বলেছিলাম··· চারখানা চপ হ'ত দিব্যি!

উদরসর্ব্বস্ব কথায় শান্তনু এখন অকপটে হাস্য করে।

কি ঘটিয়াছিল তাহা শান্তনুর মনেই নাই—

এমন সময় তাহা মনে করাইয়া দিয়া বুকপোষ্টে প্রাইজপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম-ধামের তালিকা হঠাৎ একদিন আসিয়া পড়িল। মোড়ক খুলিতে শান্তনুর হাত ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল—নির্ব্বাসিত আশার অন্তস্তলের ভিতর যেন খুশির রেখা দিল—কিন্তু নিমেষের জন্য।

একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখা গেল, দীর্ঘায়তন ফরিদ্রার্থের কাগজখানার দু'পিঠ্ নামে ঠাসা···

তারপরই যে খবর শান্তনুর চোখে পড়িল তাহারই উপর তার চক্ষুদুটি নির্নিমেষ হইয়া রহিল···এ খবর জীবনে একবার আসে—

প্রথম প্রাইজ বিশ হাজার পাইয়াছে কলম্বোর একটি লোক—টিকিট-নম্বর ২২২২।

বিস্তৃত আশার কথা হঠাৎ আলোড়িত হইয়া যে এত দ্রুত এত শক্তিশালী হইয়া ছিটিতে পারে তার ধারণায় আসে না ··নম্বরটির দিকে নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শান্তনু পাগুর হইয়া উঠিল··

তার নম্বর ২২২৩, ইহার ২২২২।

শান্তনুর অন্তরাত্মা হায় হায় করিতে লাগিল

ভাগ্যদেবীর এ কি নিষ্ঠুরতা—এ কি নিদারুণ দৈব!... তাহার নাম কোথাও নাই, কিন্তু তাহারই ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী নম্বরের উপরেই লক্ষ্মী তাঁহার স্বর্ণমুষ্টি অজস্রধারায় নিক্ষেপ করিয়াছেন!··· দুটির মধ্যে ব্যবধান কতটুকু! দশ নয় বিশ নয় কালের হিসাবে একনিমেষ নয়, স্থানের হিসাবে একচুল নয়!··· পাওয়া না পাওয়ার সীমানার শেষতম প্রান্তে আসিয়া, যে ব্যবধানের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে তাহারই সম্মুখে, লক্ষ্মীর সচল হস্ত থামিয়া গেছে! ··এই ক্ষুদ্রতম ব্যবধানটুকু উত্তীর্ণ হইতে ত' কোন বিঘ্নই ছিল না···অঙ্গুলির একটু হেলনেই ত' তিনি পার হইয়া যাইতে পারিতেন! কেন তাহা ঘটে নাই তাহার কারণ নাই—

শান্তনুর প্রাণপুত্তলী প্রাণাধিকার আক্ষেপে মুচ্‌ড়াইয়া উঠিতে লাগিল,···তার মনে হইতে লাগিল, আর বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা—ভাগ্য একেবারে বিমুখ।

লোকে দেখে, শান্তনু কৃশ হইয়া যাইতেছে।

ছুটি

শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

লাগ্‌ল না মন কাযে কি আর ?
বস্‌ল না মন এস্‌রাজে ?
কোন্ আক্কেলে চল্‌লি আজই ?
আজ কে সবে তেস্‌রা যে !
এক চম্পা ছুটির বাকী ;
ঐ যে পেলি 'নোটিস্,' তা কি
কেবল চুলে' রাগ্‌বি বলে'
না পড়ে' তোষ তোষ্কে ?
অমন 'নোটিস্' নাই বেরুতো—
কাজ কি ছিল ও-রঙ্গে ?

দুখে হাসি ? – নাই চোখে জল ?
ছুটিস্ কেন রাত্তাতে ?
সাম্‌লে চল্ আজ,
একে বোশেখ মাস তাতে !
চেষ্টা করে' বুপটারে আর
একটু মিছে করিস্‌নে তার,
থাক্‌না ও-ভাণ লোক দেখানো ;
দেখ্—কি কোথায় তুল্‌লি যে !
ক'বার চ'ল বিছ্‌না বাঁধা,—
ক'বার সেটা খুল্‌লি রে ?

শেষ করেছিস্ বিদায় নেওয়া
প্রণাম এবং নমস্কার ?
দু'মাস বলে' চল্‌লি এখন
হল দেরী দেখ্ ক'মাস কা'র।
শালের চারাও চল্‌ল দেখি,
পথের শেষে পৌঁছবে কি ?
পুঁটলিতে ও কি ভরেছিস্ ?
কুড়িয়ে রাখা আমনকী ?
সঙ্গীরা যে বেরিয়ে গেল,—
দোরে মোটর থাম্‌ল কি ?

এতদিন কি দুঃখ ছিলি ?
সেথা কি সুখ ধর্‌বে না ?
স্মৃতির বাথায় একটিবারও
মন কি কেমন ক'রবে না ?
বল্‌তে শুতে কোনও ক্ষণে,
পড়্‌বে না কি কারেও মনে ?
কালো মাটি বল্‌বে না কি
কোথায় মাটি লাল ছিল ?
এসা তোরে ক'মাস ধরে'
বৃথাই স্নেহ চাল্‌ছিল ?

বৃথাই তোরে শালশীখিকা
সুর দিল কি ফাল্গুনে ?
না, না, থাক্ আজ ও-সব কথা,
নে তুলে নে মাল গুনে'।
পাঁচিশ মিনিট সময় মোটে,
দেখ্ যদি ট্রেন ভাগ্যে জোটে ;
লট্‌বহরের বোঝাই নিয়ে
রাত্ত না কাটে রাস্তাতে !
ঘড়িকে ঠিক বিশ্বাস নেই,—
খারাপ আছে 'বাস্' তা'তে।

পাথেয়

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৯

অশোকের পুরা নাম অশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে একটি পরিচ্ছন্ন গৃহ ভাড়া করিয়া সে ওকালতী পড়ে। তাহার পিতা অভয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গিংপুর পরগণার চার আনার মালিক। অপর বারো আনা মামলা-মকর্দ্দমায় এবং উত্তরাধিকার অন্বেষণ আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রায় লয় পাইয়াছে। দৈবক্রমে অভয়নাথের চার আনা উপর্য্যুপরি কয় পুরুষ অবিচ্ছিন্ন চলিয়া আসায় বাৎসরিক তহশিল এখনো বাইশ হাজার টাকার নীচে নামে নাই। অশোকনাথও তাহার পিতার একমাত্র পুত্র,—সুতরাং পরবর্ত্তী পুরুষেও চার আনার চার আনাই থাকিবার সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা এই জন্য বলিলাম যে ভাগ-বাটোয়াই সম্পত্তির একমাত্র শত্রু নয়।

যৌবনকালে অভয়নাথের পত্নী-বিয়োগ হয়। তখন অশোকের বয়স মাত্র চার বৎসর এবং দুই কন্যার বয়স সাত এবং পাঁচ। পত্নীর মৃত্যুর পর অভয়নাথের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-আত্মীয়াগণ এবং অযাচিত শুভানুধ্যায়ীরা পুনরায় বিবাহ করিয়া লক্ষ্মীহীন গৃহে লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অভয়নাথকে কিছুদিন উপরোধ-অনুরোধ করিয়াছিল। অভয়নাথ সে সদুপদেশের প্রতি কিকিদধিক আস্থা না দেখাইয়া একান্ত আগ্রহের সহিত মাতৃহীন পুত্র-কন্যাদের পালন-পালন ও শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে। অগত্যা মিতভাষী গম্ভীরপ্রকৃতি অভয়নাথকে বারম্বার অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা উত্যক্ত করিতে সাহস না পাইয়া শুভানুধ্যায়ীর দল হাল ছাড়িয়া দেয়। সে আজ বিশ বাইশ বৎসরের কথা।

গ্রামের নিকটতম হাইস্কুল হইতে অশোক প্রবেশিকা পাশ করিলে অভয়নাথ তাহাকে লইয়া কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়া তিন বৎসর বাস করে। মহলে সেটেল্‌মেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। একজন অবিশ্বাসী আমলার যোগসাজসে দাড়ে সাত পাইয়ের ধূর্ত্ত স্বত্বাধিকারী কিছু কিছু সুবিধা করিয়া লইতেছিল সংবাদ পাইয়া অভয়নাথ অশোকের দেখাশুনার ভার একজন প্রবীণ গোমস্তার উপর দিয়া ব্যস্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। তখন অশোক প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়িতেছে। তাহার পর, আরও তিন বৎসর উক্ত গোমস্তার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় থাকিয়া অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া সে কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। অভয়নাথের ইচ্ছা ছিল অশোক আইন পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসা অবলম্বন করে। অশোকের কিন্তু সে-দিকে একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না, উপরোক্ত অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি এতই অসঙ্গত আসক্তি ছিল যে, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এম-এ পাশ করিবার পর তাহার নিকট চিরবিদায় না লইয়া সে সর্ব্বদাই কলিকাতা এবং লণ্ডন হইতে অঙ্কশাস্ত্রের বিষয়ে নূতন নূতন কঠিন কঠিন পুস্তক আনাইয়া তাহাদের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। গণিতশাস্ত্রের পরাবিদ্যার প্রতি পুত্রের এই অত্যুগ্র আকর্ষণ দেখিয়া অভয়নাথ সন্তুষ্ট হইল না; সে বুঝিল যে বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শুভঙ্করীর সাধারণ বিদ্যাই শুভঙ্কর, তাহার পক্ষে ইহা বলা বাহুল্য যে আর্য্যার মত শুধু নিষ্প্রয়োজনই হইবে না, ক্ষতিজনকও হয়ত হইবে। সুতরাং ইহা হইতে পুত্রের মনকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সে অশোকের নিকট দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল,—প্রথম, বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া-সুঝিয়া লওয়া, এবং দ্বিতীয়, বিবাহ করা। কারণ দেখাইল,—প্রধানত যে-দুইটি বিষয়ের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে, পিতার পরিণত বয়সের বুদ্ধি বিবেচনার সহায়তায় সেই ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করিতে এবং গৃহলক্ষ্মীকে লাভ করিতে বিলম্ব করা উচিত নয়, যে-হেতু মানুষের অনিশ্চিত আয়ু

সকাশের কাছাকাছি হইতে অতি-মাত্রায় অনিচ্ছিত।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটির বিষয়-বস্তুর মধ্যে এমন একটু জটিলতা ছিল যে, কেবল মাত্র পিতার পরিণত বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনাই তাহার সমস্যা মোচন করিতে সমর্থ নয়; সুতরাং সেটি হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশায় পিতার প্রথম প্রস্তাবটিকে উপেক্ষা করা অশোক সমীচীন মনে করিল না. সে ঐকান্তিক মনোযোগের সহিত বিষয় সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই জমা-ওয়াশীল, রোকড়, খতিয়ান, খেরা প্রভৃতির মর্ম সে বুঝিয়া লইল; সুযোগমত নায়েব ও গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত মহল পরিদর্শন করিয়া আসিল; পাস জমীর উৎপন্ন ফসল, বহুদ মাল ও বিক্রয়বাটা মোকাবিলা করিল এবং বিঘোরের সহিত বদাকতা যুক্ত করিয়া প্রজাদের জমি জমা সংক্রান্ত অভিযোগ-অনুযোগের উপরোধ-অনুরোধের নিষ্পত্তি আরম্ভ করিল।

অজয়নাথ দেখিল পুত্রের গণিতশাস্ত্রের পরাবিদ্যা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই,—অশিথিল নিয়মাবলীর সাধনায় সুগঠিত বুদ্ধি বিষয়-বুদ্ধিকে বাধিত না করিয়া বিশদই করিয়াছে। তখন সে তাহার প্রথম প্রস্তাবটির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অধিকতর স্পষ্টতার সহিত পুনরায় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিল;—একদিন অশোককে ডাকাইয়া বলিল, "মনে করচি এই আষাঢ় মাসেই তোমার বিয়ে দোবো। নিরঞ্জনপুরের জমিদার যাদব চক্রবর্তী তোমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে উৎসুক। মেয়েটি অপছন্দ না হ'লে আমি সেখানে কথা দোবো স্থির করেছি।" শুনিয়া অশোক বিষণ্ণ গণিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "মনে করছিলাম, ওকালতীটা প'ড়ে ফেলি।" অজয়নাথ বলিল, "বেশ ত, বিয়ে ক'রেও ত' ওকালতী পড়তে পার।" উত্তরে অশোক কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। আরও দুই একটা কথা বলিয়াও অজয়নাথ অশোকের নিকট হইতে কোন উত্তর পাইল না। এই সুনিবিড় মৌনকে কিন্তু সম্মতির লক্ষণ বলিয়া তাহার মনে হইল না,—বলিল, "আচ্ছা, এখন যাও, পরে ভেবে দেখা যাবে।" পরে একজন মধ্যস্থের মারফৎ পিতা-পুত্রের যে কথাবার্তা হইল, তাহার ফলে অজয়নাথ কলিকাতায় একজন কর্মচারী পাঠাইয়া সিমলা অঞ্চলে একটি বাসা স্থির করিল এবং পরে একটি শুভদিন দেখিয়া অশোককে আইন পড়িবার জন্য তথায় পাঠাইয়া দিল। এবার সঙ্গে গেল দেউড়ির একজন পাচক ব্রাহ্মণ এবং পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য বিনোদ। বিবাহ করিবার বিষয়ে পুত্রের আপত্তিতে মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইলেও ওকালতী পড়াটা হইবে বলিয়া অজয়নাথ মোটের উপর সন্তুষ্টই হইয়াছিল—বিশেষতঃ যাদব চক্রবর্তী বলিয়া পাঠানোয় যে অশোকনাথের আইন পরীক্ষা পাশ করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে তাহার কোনো আপত্তি হইবে না।

প্রথমবার কলিকাতা যাপনের সময় অশোকের বাসা-বাড়ি ছিল শক্তিদের বাড়ির ঠিক পাশেই। উভয় গৃহের গৃহস্বামীর মধ্যে কোনো পরিচয়ই ছিল না। হঠাৎ একদিন দুই বাড়ির চাকরদের মধ্যে সামান্য একটা কারণে বচসা হইতে হইতে মারামারি এবং রক্তপাত হইয়া যায়। ব্যাপারটার এইখানেই সমাপ্তি না হইয়া অশোকের তরাবধায়ক বহু গোমস্তার কৃপায় এক নম্বর ফৌজদারী পর্য্যন্ত যাইবার হয়। সে-সব কথার বিস্তারিত উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নাই কিন্তু এই বিরোধের সূত্র অবলম্বন করিয়াই অচিরে দুইটি গৃহ সুনিবিড় সৌহার্দ্যে আবদ্ধ হয় এবং সে সৌহার্দ্য যে একদিন সুমধুর আত্মীয়তায় পরিণত হইবে, এইরূপ একটা অকথিত কথা উভয় পক্ষেরই মনে মনে ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। তাই বছর দুই পরে হরিপদর মৃত্যুর পর কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময় অশোকের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিবালা যখন বলিয়াছিল, "বাবা অশোক, অভাগিনী শক্তিকে ভুলো না—তাকে তোমার পায়ে স্থান দিয়ো। তা নইলে সে ম'রে যাবে।" তখন অশোক সাময়িক উত্তেজনার প্রতিশ্রুতিই দিয়াছিল। সে ঘটনার পর চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। প্রথমে উভয় পক্ষের মধ্যে নিয়মিত চিঠিপত্র চলিত, কাল-ক্রমের সহিত ক্রমশঃ তাহা অনেক কমিয়া আসিয়াছে এবং অশোকের মনের মধ্যে তাহার প্রতিশ্রুতি উপস্থিত এইরূপ

আকার ধারণ করিয়া ছ,—শক্তিকে বিবাহ করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিব—কিন্তু একান্ত যদি তাহা না হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহার বিবাহের পূর্ব্বে কখনই নিজে বিবাহ করিব না।

অভয়নাথ যখন যাদব চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহের কথা পাড়িয়াছিল তখন অশোকের ইচ্ছা হইয়াছিল শক্তিদের কথা খুলিয়া বলে—কিন্তু সাহসে কুলায় নাই। ভয় প্রধানতঃ এই-ই হইয়াছিল যে, সে প্রসঙ্গ তুলিলে হয়ত' চিরকালের জন্য তাহার সমাপ্তি ঘটিবে। সে একটা শুভ অবসরের অপেক্ষায় ছিল—কিন্তু সে অবসর যে কোন্ ঘটনার মধ্য দিয়া কি মূর্ত্তিতে কবে উপস্থিত হইবে তাহার কোনো ধারণাই ছিল না।

সে-দিন ছিল শনিবার। বৈকালে অশোক মাঠে খেলা দেখিতে গিয়াছিল। মাঠ হইতে যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া সে ডাকিল, "বিনোদ!"

"দাদাবাবু?"

"চা দিয়ে যা।"

অশোক আসিবামাত্র বিনোদ চায়ের জল চড়াইয়া দিয়াছিল, অনতিবিলম্বে চা ও খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। টেবিলের উপর হাতের পাত্রগুলো রাখিয়া একটা বইয়ের নীচে হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া অশোকের হাতে দিয়া বলিল, "একটা চিঠি আছে দ দাবাবু।"

হাতের লেখা দেখিয়াই অশোক বুঝিতে পারিল শক্তির চিঠি। বলিল, "কখন এলো?"

বিনোদ বলিল, "আপনি বেরিয়ে যাবার আধ ঘণ্টাটাক্ পরে। কোথাকার চিঠি দাদাবাবু? বাড়ির?"

"না, অন্য লোকের।"

বিনোদ চলিয়া যাইতে যাইতে নিজমনেই বলিতে লাগিল, "বাড়ির চিঠি ত' সবে কাল এয়েছে—এর মধ্যে আবার আস্‌বে কেন? আমার জিজ্ঞেস করাই ভুল।"

চিঠি খুলিয়া পড়িয়া অশোকের মন প্রথমটা সমবেদনায় বিচলিত হইয়া উঠিল—তাহার পরই দ্রুতগতিতে একটা বিরক্তি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। এ কি উৎপাত! এ কি অত্যাচার! এই জন দুই কালা—তাহার মধ্য দিয়া মানুষের অগম্য সেই স্থানে যাইতে হইবে? এত বড় দায়িত্ব সে কোথায় লইয়াছিল যে, এত কঠিন কর্ত্তব্য করিতেই হইবে! সহসা মনে পড়িয়া গেল সে-দিনের কথা যে দিন গিরিবালাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে শক্তিকে বিবাহ করিবে। কিন্তু সে-কি একান্তই নিজের ইচ্ছায়? অমন করিয়া হাত ধরিয়া কাঁদিয়া যে কথা আদায় করা যায় তার মূল্য কতটুকু? কান্নাকাটি না করিয়া ছোরা-ছুরি দেখাইয়াও ত' ও-কথা আদায় করা যাইতে পারিত। তবে?—

আর একবার চিঠিখানা পড়িয়া অশোক চিঠিখানা টেবিলের উপর স্থাপন করিল। চিঠি পড়িলে কিন্তু যাইতে ইচ্ছা করে! সামান্য কথা, সরল ভাষা, কিন্তু এমনি তাহার আকর্ষণ!

দুই হাতে দুই কপাল টিপিয়া ধরিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অশোক চিঠিখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

পেয়ালার মধ্যে চা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

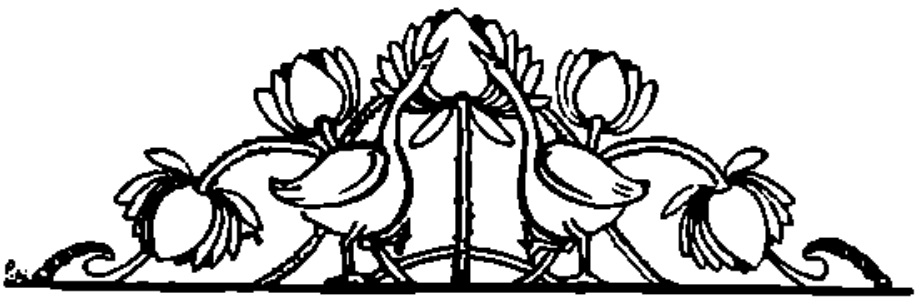

ভারত ও সূফী-মতবাদ

মুহম্মদ এনামুল হক এম এ

[প্রমাণ পঞ্জী :—

১। 'অ'ইন্-ই 'অক্‌বরী, তৃতীয় খণ্ড, ইংরেজী অনুবাদ, H. S. Jarrett.

২। তারীখ্-ই-ফিরিশ্‌তহ্, দ্বাদশ অধ্যায়, মূল ফারসী।

তহ্‌কিক্‌হ্-ই-ঔলিয়া'-ই-হিন্দ্, মূল উর্দু।

৩। ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন।

৪। 'ইশা'ত্-ই-খালিকীয়হ্—মুহম্মদ 'অব্দু-ল্ করীম্, (বাঙ্গালা)।

৫। দীবান্ ই-খ্বাজহ্ মু'ঈনু দ্দীন্ চিশ্‌তী।

নগ্‌নবী-ই-দু-'অলী হুসনদর্।

The Preaching of Islam—T.W. Arnold

Indian Islam—Dr. T. Titus.

The Mystics of Islam—R A. Nicholson.

Muhammad and Islam—Ignaz Goldziher.

Indian Literature—Weber.

Outline of the Religious Literature of India.

Kabir's Poem—Tagore-Introduction.

Islam—Article "India."

১০। Encyclopædia of Religion and Ethics—Vol. XI.]

অনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে সূফী-প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে ভারতের নানাস্থানে, ভ্রাম্যমান মুসলমান সাধকগণ আগমন করিতে থাকেন। তবে তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, অঙ্গুলিপৃষ্ঠে গণনা করা যায়। ভারতের সর্ব্বপ্রথম সূফী কে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা নিতান্ত কঠিন। এ যাবৎ এ বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা চলে নাই। সাধারণ ভাবে সন্ধান করিতে গিয়া, এ যাবৎ আমরা যে-কয়েকজন সূফীর নাম পাইয়াছি, তাঁহারা কেহই একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম করা যায় :

(অ) শাহ্ সুল্‌তান্ রুমী :—ইনি ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় গুরু সয়্যদ্ শাহ্ সুব্‌হ্ খুল্ অন্‌তীয়হ্ সহ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার (আঃ খিল') নেত্রকোণা সবডিভিশনের অন্তর্গত মদনপুরে এই সাধকের কবর (আঃ কবর্) ও দরগাহ্ বিদ্যমান আছে। (১)

(আ) সয়্যদ্ নথর্ শাহ্ :—দাক্ষিণাত্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম সূফী-মতবাদ লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইনিই অগ্রণী ও সর্ব্বপ্রাচীন ব্যক্তি। মাদ্রাজের ত্রিচিনপল্লীতে এখনও তাঁহার সমাধিটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সাধক দেহত্যাগ করেন। (২)

(ই) মখ্‌দূম্ সয়্যদ্ 'অলী 'উল্‌মুব্‌রী 'অল্ হুজ্‌বীরী ওরফে (আঃ 'উর্ফ্) দাতা গন্জ্ বখ্‌শ্ :—লাহোরে

---

(১) Bengal District Gazetteers—Mymensing (1917) —F.A. Sachse.

(২) i. Madras District Gazetteers—Trichinopoly (1907). P. 338. P. 152.

ii. The Preaching of Islam—P. 267.

তাঁহার দরগাহের দরজার শিলালিপি হইতে জানা যায়, ইনি ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে (৪৬৪ হিঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, তিনিই ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সূফী-মতবাদ আমদানী করিয়াছিলেন (১)। এই কথার সত্যতা যে নিতান্তই অল্প, তাহা বলা বাহুল্য। এই দরবেশের "কশ্‌ফু ল্-মহ্‌জূব্" গ্রন্থ সূফী-মতবাদের একটি প্রাচীন ও প্রামাণিক পুস্তক।

সে যাহা হউক, আরও প্রায় এক শতাব্দী পর, অর্থাৎ বারশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে, ভারতবর্ষে নিয়মিতভাবে সূফীদের প্রভাব পড়িতে থাকে। এই সময় হইতে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে বিখ্যাত বিখ্যাত সাধক ও সূফীদের কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। সূফী সম্প্রদায়ের পর সূফী-সম্প্রদায় ভারতে আগমন করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা ভারতের নানাস্থান ও জনপদে ছড়াইয়া পড়িতে থাকেন। অচিরকাল মধ্যেই আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সর্ব্বত্রই, সূফী প্রভাবের অবারিত স্রোত খরগতিতে প্রবাহিত হইয়া যায়। এই সময়ে যে-সকল সম্প্রদায় ভারতে আসেন তাঁহাদের মধ্যে চিশ্‌তীয়হ্‌ ও সুহ্‌রবর্‌দীয়হ্‌ সম্প্রদায়ই প্রধান। আজমীর বা অজমেরের (সং অজয়মেরু) ভারতবিখ্যাত সাধক খ্‌বাজহ্‌ মু'ঈনু-দ্-দীন্ চিশ্‌তী সাহেবই ভারতবর্ষে চিশ্‌তীয়হ্‌ সম্প্রদায়ের অগ্রদূত। ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দে সন্‌জিরদ্‌তান্ বা সীস্‌তান্ (আফ্‌গানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের একটি জিলা) নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়; সিদ্ধতা লাভের পর, ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে (২) একান্ন বৎসর বয়সে তিনি দিল্লী হইয়া অজমেরে গমন করেন ও তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। তখন অজমেরাধিপতি পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। কথিত আছে, এই বিবাদের ফলে, চিশ্‌তী সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, অচিরেই রাজা পৃথ্বীরাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। অনেকদিন হইতে রাজা পৃথ্বীরাজের সহিত সুল্‌তান্ মুহম্মদ ঘূরীর (১১৮৯-১২০৫) বিবাদ ও যুদ্ধ চলিতেছিল। সুল্‌তান্ কয়েকবার অজমেরাধিপতির নিকট পরাজিত হইয়া, স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চিশ্‌তী সাহেবের অজমের আগমনের পর, ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, সুল্‌তান্ মুহম্মদ ঘূরীর হস্তে রাজা পৃথ্বীরাজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তিরৌরীর সমরক্ষেত্রে পরাজিত, বন্দী ও নিহত হইলেন। সাধক প্রকৃতই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকিলে, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার ভারত-আগমনে হিন্দু স্বাধীনতা ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অধিকারের বীজ স্থায়ীভাবে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে তিরৌরীর সমরক্ষেত্র যদি প্রসিদ্ধিলাভ করে, চিশ্‌তী সাহেবের ভারত-আগমনও তদতোধিক প্রসিদ্ধ ব্যাপার। চিশ্‌তী সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূরণার্থে, অথবা দৈবদোষে ঘটনাক্রমে—যেরূপেই হউক চিশ্‌তী সাহেবের আগমনের পরই যখন তিরৌরীতে পৃথ্বীরাজের পতন হয়, তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়, চিশ্‌তী সাহেব ভারতে হিন্দু-স্বাধীনতা-অবসানের ও নবীন রাজশক্তির সহিত নূতন এক ভাবধারা-প্রবর্ত্তনের অগ্রদূত। সে যাহা হউক, চিশ্‌তী সাহেব, ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ অজমেরেই দেহত্যাগ করেন।

চিশ্‌তীয়হ্‌ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতে সুহ্‌রবর্‌দীয়হ্‌ সম্প্রদায় প্রবেশ করেন। শায়খ্‌ বহা'উ-দ্-দীন্ যকরিয়া মুল্‌তানীই এই সম্প্রদায়ের ভারতীয় আদিগুরু। ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুল্‌তানে তাঁহার জন্ম হয়, এবং তথায় ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য প্রশিষ্য ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন। ইঁহাদেরই প্রচেষ্টায়, চিশ্‌তীয়হ্‌ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি, সুহ্‌রবর্‌দীয়হ্‌ সম্প্রদায়ও ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

চিশ্‌তীয়হ্‌ ও সুহ্‌রবর্‌দীয়হ্‌ সম্প্রদায়ের আগমনের

১। ভারতীয় মতবাদে সাধনার ধারা—পৃষ্ঠা ৭।

২। চিশ্‌তী সাহেবের অজমের গমনের তারিখ সম্বন্ধে কোন কোন স্থানে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 'আ'ঈন-ই-'আকবরীতে, ১১৯৩ খ্রীঃ (৫৮৯ হিঃ); মিরিশ্‌তহ্‌, ১১৯৪ খ্রীঃ (৫৯১ হিঃ); হব্‌বিবহ্‌-উ-সিয়র-ই-খিন্দ্‌, ১১৯৫ খ্রীঃ (হিঃ ৫৯১); এতদ্ব্যতীত এ যাবৎ তাঁহার যতগুলি ইংরাজী জীবনী দেখিয়াছি, প্রত্যেকটিতে ১১৯৫ খৃঃ। কিন্তু আমরা পূর্ব্বোক্ত তারিখটি গ্রহণ করিতে পারি নাই, কারণ, চিশ্‌তী সাহেবের অজমের গমনের কিছুদিন পরেই, তিরৌরীর সমরক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের পতন (১১৯১ খৃঃ) একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ও ইতিহাসবিশ্রুত ব্যাপার। তাই আমরা প্রথম তারিখটি গ্রহণ করিলাম।—লেখক।

পর কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত, ভারতে আর কোন নূতন সূফী-সম্প্রদায় আগমন করিয়াছিল কি না, সে বিষয় আমরা এ পর্য্যন্ত সঠিক ভাবে জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে আর কোন নূতন সূফী-সম্প্রদায় আগমন করেন নাই। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে উপরোক্ত সম্প্রদায় দুইটি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমাদরলাভ করিয়া, ভারতের বুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে।

ঠিক এই সময়েই ভারতে অন্য একটি সূফী-সম্প্রদায়, কতিপয় নূতন বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাই কাদিরীয়হ্ সম্প্রদায়। বাগ্দাদের অন্তর্গত জীলান্ বা গীলান্ নামক স্থানের অধিবাসী মহাপণ্ডিত, সুবক্তা ও জগদ্বিখ্যাত সাধক সয়্যদ 'অব্দুল্ কাদির্ সাহেবই (জন্ম —১০৭৮ খ্রীঃ, মার্চ্চ; মৃত্যু—১১৬৬ খ্রীঃ, ফেব্রু) এই নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি জীবনে কখনও ভারতে আসেন নাই। তদ্বংশীয় সয়্যদ্ মুহম্মদ্ ঘৌথ্ গীলানী সাহেব ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন ও এই মতের বহুল প্রচার করেন। তিনি ভারতে আসিয়া উত্তর-রাজপুতানার উচ্ছ নগরে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন, এবং এখানেই ৯৩ বৎসর পর অর্থাৎ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ভারতে আর একটি সূফী-সম্প্রদায় প্রবেশ করে—তাহা নক্শবন্দীয়হ্-সম্প্রদায়। তুর্কীস্থানের অধিবাসী খব্জেহ্ বহা'উ দ্-দীন্ নক্শবন্দ্ (মৃঃ ১৩৮৯ খ্রীঃ) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। খব্জেহ্ মুহম্মদ্ বাকী বিল্লাহ্ এই সম্প্রদায়ের ভারতীয় আদি গুরু। তিনি তুর্কীস্থান হইতে এই সম্প্রদায়ের মতবাদ ভারতে আনয়ন করেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারতে সূফী-প্রভাবের মূল ঐতিহাসিক সূত্র এইরূপ। এই সূত্র হইতে, দাক্ষিণাত্যের সয়্যদ্ নথন্ শাহ্ (মৃঃ ১৩৩৯ খ্রীঃ), বঙ্গের শাহ্ সুল্তান্ রুমী (আগমন ১৩৫৩ খ্রীঃ) ও লাহোরের দাতা গন্জ্ বখ্শ্ (মৃঃ ১০৭২ খ্রীঃ) প্রভৃতি একাদশ শতাব্দীর সাধকগণকে বাদ দিলে ঐতিহাসিক সূত্র ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু ভারতে সূফী-প্রভাব বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। বসন্তের অগ্রদূত কোকিলের ন্যায়, তাঁহারা সূফী মতবাদের আনন্দময়ী আগমনী গান করিবার জন্যই ভারতে আসিয়াছিলেন; ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট স্থানে, তাঁহাদের সেই মধুময়ী কাকলী-লহরী কিছুকাল গুঞ্জন করিয়া বেড়াইয়া ফিরিলেও ব্যাপকত্ব ও স্থায়িত্বের দিক হইতে, তাহা অকালমৃত্যু বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহাদের বাসন্তী-আগমনী-গানে ভারতের উপবনে ফুল ফুটে নাই, শাখায় শাখায় মলয় দুলে নাই, কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জরী জাগে নাই। তাঁহারা অসময়ে আসিয়া মনের আনন্দে কেবল গান গাহিয়াই গেলেন,—ভারত তাহা শুনিল না, বা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত অতবড় শক্তি তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের প্রাথমিক চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহারা ভারতকে সজাগ ও সচকিত করিয়া দিয়া, অনুবর্ত্তীদিগের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, উত্তরকালে সেই বীজ হইতে ফলবান তরু উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বংশধরেরা তাহার সুস্বাদু ফল আস্বাদন করিয়া আপনাদিগকে, এমন কি, তাবৎ দেশবাসীকেও পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, যাঁহাদের শুভাগমনে ভারতীয় সাধনা-গঙ্গার কূলে কূলে বান ডাকিল, মরা-গাঙ্গের বুকে বুকে জোয়ার ছুটিল, তাঁহারা হইলেন খব্জেহ্ মু-'ইনু-দ্-দীন্ চিশ্তী ও বহা'উ-দ্-দীন্ জকরিয়া মুল্তানী। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয় সাধকদের যুগ যুগ ধরিয়া অবিরত প্রচার, অনাবিল সাধনা, অমানুষিক তপস্যা ও দেবোপম আত্মোৎসর্গের দ্বারাই, ভারতে সূফী-মতবাদ, তথা মুসলমানধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয়। দিগ্বিজয়ী তুর্কীদের কায়শক্তি ও অস্ত্রের দ্বারা যাহা সম্ভবপর হয় নাই, এই নিঃস্ব ও পার্থিব সহায়হীন সাধকগণের দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল,—ভারত ইস্লামকে সানন্দে গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ভারতের প্রাণে প্রাণে কেবল চিশ্তীয়হ্ ও সুহ্রবর্দীয়হ্ সম্প্রদায়-

ঘরের সাধনার কথা ও মর্ম্মের বাণী বহুল ভাবে লীলায়িত ও প্রতিমুহূর্ত্তে সঞ্চারিত হইতেছিল, তখন কাদিরীয়হ্-সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ করিল। তখন ভারতের নিজস্ব সাধনার সহিত মিলিত হইয়া উপরোক্ত সম্প্রদায় দুইটি এদেশে যে ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাকে সজোরে সরাইয়া দিয়া বা সমূলে উৎপাটিত করিয়া তৃতীয় সম্প্রদায়টি নিজের জন্য প্রশস্ত স্থান করিয়া লইতে পারিল না। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত দুই সম্প্রদায়ের সাধনা-সূত্রের মধ্যে ঐক্যের ভাগ যত বেশী, তৃতীয় সম্প্রদায়ের সাধনার সহিত প্রথমোক্ত সাধনা দুইটির অনৈক্য ততোধিক। এই ক্ষেত্রে তৃতীয় সম্প্রদায়ের সাধনার ভাগ্যে যাহা ঘটা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিল—অল্পদিনের মধ্যে ভারতে তাহার স্থান হইল না। নক্‌শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায় সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। অধুনা ভারতে, কাদিরীয়হ্ ও নক্‌শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায়ের লোক নিতান্ত অল্প নহে,—কিন্তু এ প্রভাব সমর হিসাবে অনেক পরের।

চিশ্‌তীয়হ্ ও সুহ্‌রবর্দীয়হ্ সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা, ভারতে আগমন করার পূর্ব্ব হইতেই, অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; ভারতে আগমনের পর, এ দেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল—ভারতের প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটিয়া গেল! ভারতবিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮-১৪৬৮খ্রী:) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় যোগসাধনা ও সূফীদের "অহ্‌ব্‌রূহ্" বা ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হইল। সূফীরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের, আর ভারতীয়েরাও সূফীদের প্রাণের সন্ধান পাইতে করিলেন। এই জন্যই, ভারতীয় সাধক ও সূফীদের ইতিহাসে কবীর চিরদিন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। কবীরকে সাধারণতঃ রামানন্দের শিষ্য বলিয়া সকলে অবগত আছেন; কিন্তু তিনি প্রধানতঃ চিশ্‌তীয়হ্ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ছিলেন (১)। একদিকে রামানন্দ যেমন তাঁহার গুরু ছিলেন, তেমনই শয়খ্ তকী সুহ্‌রবর্দীও তাঁহার "মুরশিদ" (গুরু) ছিলেন। তিনি রামানন্দের নিকট হইতে ভারতীয় সাধন-ধারার সহিত হিন্দির ভিতর দিয়া যেমন পরিচয়লাভ করেন, শয়খ্ তকীর নিকট হইতেও তেমনই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সূফী-মতবাদের বিষয় অবগত হন। ইহার পর, শয়খ্ তকী চিশ্‌তীয় নিকট হইতে "খিরকহ্-ই-খিলাফত্" বা আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ং নূতন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ হিন্দিতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সূফী-মতানুকূল আধ্যাত্মিক বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে ত্রিবেণীর সঙ্গম হইল, তাহাতে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী আসিয়া অবগাহন করিতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের দিক হইতে দেখিতে গেলে, কবীর বাস্তবিকই উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যতীর্থ! ভারতের এই মিলন-ক্ষেত্রে এ যাবৎ যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়া, পূজার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, কবীর তাঁহাদের সকলেরই আধ্যাত্মিক পূর্ব্বপুরুষ। ভারতের সর্ব্বত্র একদিন কবীরের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু কবীরের জীবনের স্বপ্ন ভারতের তীর্থক্ষেত্রে মহামানবতার স্বপ্ন,—হতভাগ্য ভারত এখনও তাহা স্বীয় জীবনে সফল করিতে পারে নাই। ভারতীয় ভক্তিবাদের নব সংস্করণে কবীরের উদাস ও উদার ভাব কতখানি ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী ভারতের চিন্তা-জগতের ইতিহাস। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকেরা বলিয়া থাকেন—

"ভক্তি দ্রাবিড়ি উপজী, লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ড॥" (২)

অর্থাৎ দ্রাবিড় দেশে (দাক্ষিণাত্যে) ভক্তির জন্ম হইল, রামানন্দ তাহাকে এদেশে আনিলেন। কবীর তাহাকে সপ্তদ্বীপ ও নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রকাশ করিলেন। কবীরের দিগন্ত-বিস্তারী ভাবস্রোত, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তকে বিপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল; বাঙ্গলা-দেশ তাহার প্রভাব এড়াইতে পারিয়াছিল কি? ষোড়শ

১। তজ্‌কিরহ্-ই-ঔলিয়া'-ই-হিন্দ্—দ্বিতীয়ভাগ; পৃষ্ঠা ৮২-৩০।
A History of Persian Language and Literature. Pt. I. Md. Abdul Ghoni. pp. 121-127.

২। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা।

শতাব্দীর চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩)ধর্মমতের মধ্যে, কবীরের মতবাদের কোন প্রতিধ্বনি কি নাই ?

ভারতে কতগুলি সূফী-সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। এদেশে সূফী-প্রভাব অনুভূত হইবার পূর্ব্বে হইতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে, ভারতের বাহিরের সূফীদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল। এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; কেননা সূফী-আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলন। প্রত্যেক প্রধান প্রধান সূফী স্বীয় বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন ; তৎপর তাঁহা লোকসমক্ষে প্রকাশ ও প্রচার করেন। সুতরাং প্রত্যেক সূফীর সাধনায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ অনুযায়ী কিছু না-কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। যে প্রসিদ্ধ সূফীকে কেন্দ্র করিয়া যে মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতার নাম স্মরণ করিয়াই তাহা পরিচিত হইয়াছে। এইরূপ অনেক সূফী-মণ্ডলী বা সম্প্রদায়ের প্রভাব ভারতে পড়িয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ভারতীয় সূফী-মতবাদের পুস্তক-পুস্তিকায়, আমরা অনেক সূফী-সম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কখন কাহার দ্বারা এই সম্প্রদায়গুলির মতবাদ ভারতে আমদানী করা হইয়াছিল, এবং কখন্ কিরূপভাবে সেগুলি ভারতবাসীদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, ইহাদের প্রভাব হইতে ভারত মুক্ত ছিল না। আমাদের মনে হয়, সে প্রভাব ধীরে ধীরে কতিপয় বিশিষ্ট ও উচ্চ সম্প্রদায়ের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়া কালক্রমে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষে যতগুলি বিদেশীয় সূফী-সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া জানা যায়, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক ভারতীয় সূফী-মতবাদের পুস্তক পুস্তিকায় এই চতুর্দ্দশ সম্প্রদায়ের নাম সাধারণ। তদুপরি কোন কোন পুস্তকে আরও অনেকগুলি সম্প্রদায়ের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। সকল পুস্তকে সাধারণতঃ এই চতুর্দ্দশ সম্প্রদায় খবাজ্-গাঁহ্ "বা মণ্ডলী" নামে পরিচিত। অতঃপর আমরা এই চতুর্দ্দশ সম্প্রদায়কে "চতুর্দ্দশ মণ্ডলী" নামে অভিহিত করিব। 'আ'ইন-ই- 'আকবরীতে প্রদত্ত ভারতীয় সূফীদের এই চতুর্দ্দশ মণ্ডলী ও তাহাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম এইরূপ—

১। হুবীবী—খবাজহ্ হুবীব্ 'আজমী [হুসন্ বস্‌রীর (মৃঃ ৭২৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক]

২। তয়ফূরী—শয়খ্ 'আবূ-ল্-বাজিদ্-বিন্ তয়ফূর (মৃঃ ৭৬৩ খ্রীঃ)।

৩। 'আদহমী—খবাজহ্ 'ইব্‌রাহীম্-বিন্-'আদহম্ বল্‌খী (মৃত্যু ৭৭৭ খ্রীঃ)।

৪। 'আয়াযী—খবাজহ্ ফুযয়ল্-বিন্-'আয়ায (মৃঃ ৮০৩ খ্রীঃ)।

৫। কর্‌খী—মা'রুফ্ কর্‌খী (মৃঃ ৮১৫ খৃঃ)।

৬। সক্‌তী—হুসন্ সক্‌তী (মৃঃ ৮৬৭ খৃঃ)।

৭। তয়ফূরী - বায়াজীদ্ বিস্তামী তয়ফূর শামী (মৃঃ ৮৭৪ খৃঃ)।

৮। তযযরী—খবাজহ্ হযয়ফহ্-ল্-যযরী (মৃঃ ৯০০ খৃঃ)।

৯। জুনয়দী—জুনয়দ যদ্‌দাদী (মৃঃ ৯১০ খৃঃ)।

১০। চিশ্‌তী—'আবূ 'ইস্‌হাক চিশ্‌তী (মৃঃ ৯৬১ খৃঃ)।

১১। গায়্‌রূনী—'আবূ 'ইস্‌হাক্ গায়্‌রূনী (মৃঃ ১০৩৪ খৃঃ)।

১২। সুহ্‌রয়ব্‌রূদী—শয়খ্ যিয়া'উ-দ্‌দীন 'আবূ নজীব্ সুহ্‌রয়ব্‌রূদী (মৃঃ ১১৬৭ খৃঃ)।

১৩। ফির্‌দূসী—শয়খ্ নজ্‌ম-দ্‌দীন্ কুব্‌রা ফির্‌দূসী (মৃঃ ১২২১ খৃঃ)।

১৪। শাযিলী—'আলা'উ-দ্‌দীন্ শাযিলী (নজ্‌ম-দ্‌-দীন্ কুব্‌রার সমসাময়িক)।

ভারতীয় সূফীরা এই চতুর্দ্দশ মণ্ডলী সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে, হুযয়ফহ্ মুহম্মদ তদীয় জামাতা হুযয়ফহ্ 'আলীকে "'ইলম্ই-মা'রফত্" বা মর্ম্মজ্ঞান দান করেন ; 'আলী সেই জ্ঞান, হুসন্, হুসয়ন্, খবাজহ্ কমীল্ ও হুসন্ বস্‌রী এই চারি ব্যক্তিকে দান করেন। এই অনুগ্রহলব্ধ ব্যক্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে, হুসন্ বস্‌রীই সূফীদের মূল উৎস। হুসন্ বস্‌রীর দুইজন প্রধান শিষ্য ছিলেন :—একজনের নাম খবাজহ্ হুবীব

'অহ্দী এবং অপর ব্যক্তির নাম 'অবদুল্-ওয়াহিদ্-বিন্-যমান্। উপরোক্ত চতুর্দশ মণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি মণ্ডলী, জনশ্রুতি 'অজমীকেই তাঁহাদের পরমার্থ জ্ঞানের মূল উৎস বলিয়া মানিয়া থাকেন। এই মণ্ডলীগুলির নাম,—(১) তৈফুরী, (২) বয়তুরী, (৩) কর্খী, (৪) সক্তী, (৫) জুনয়দী, ৬) গাজরুনী (৭) তূসী, (৮) ফিরদৌসী, (৯) সুহ্রবার্দী। অবশিষ্ট পঞ্চমণ্ডলী 'অবদুল্-ওয়াহিদ্-বিন্-যমান্কেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই "চতুর্দশ মণ্ডলীর" তালিকায় একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। উপরে আমরা যে সকল সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে তাহার সকলগুলির নির্দেশ নাই। এই তালিকা যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। "চতুর্দশ মণ্ডলীর" অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ 'আ'ইন-ই-'অকবরী ইহা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কি "চতুর্দশ মণ্ডলী"র মধ্যেই ভারতীয় সূফী-সম্প্রদায়ের পূর্ণ তালিকা পাওয়া গেল? না, তাহা কখনও নহে। 'আ'ইনে কেবল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সূফী মণ্ডলীগুলির নাম দেওয়া হইয়াছিল। 'আ'ইন রচিত হইবার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে কাদিরীয়হ্ সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ (১৪৪২ খৃঃ) করে। তথাপি, এই ইতিহাসে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে নক্শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায়েরও উল্লেখ নাই। শত্তারী (১) নামক আর এক সম্প্রদায়ের কথা আমরা জানি, 'আ'ইন রচিত হইবার অনেক পূর্বে তাহা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। 'অকবরের পিতা হুমায়ুন, এই শত্তারী সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সাধক মুহম্মদ ঘৌস-এর একজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে এই সাধকের মৃত্যু হইলে গোয়ালিয়রে সম্রাট 'অকবর তাঁহার এক সুরম্য সমাধি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ শত্তারী সম্প্রদায়ের ভারত-আগমনের বিষয়, 'আ'ইন ই-'অকবরীতে উল্লেখ নাই। এখন বেশ দেখা যাইতেছে 'আ'ইনের প্রদত্ত "চতুর্দশ মণ্ডলী"র তালিকা এবং যুক্তিদের বর্ণিত তালিকাও সম্পূর্ণ নহে। তাহাতে কত সম্প্রদায়ের সূফী যে আসিয়াছিলেন, তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই ভারতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সূফী-প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। অবশ্য যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতেই, সমুদ্রতরঙ্গবৎ একটির পর একটি করিয়া, এই সূফী-মণ্ডলীগুলি ভারতে প্রবেশ করিতেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর অন্যূন দুই শতাব্দী পূর্বে ভারতে আরও একটি প্রসিদ্ধ সূফী-সম্প্রদায় প্রবেশ করিয়াছিল; তাহা "মদারী" সম্প্রদায়। বদী'উদ্-দীন্ শাহ্ মদার নামক জনৈক চতুর্দশ শতাব্দীর সাধক, এই সাধনা ভারতে প্রচার করেন। এতদিন এই সাধকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ ছিল। সম্প্রতি "মিরাত্-ই মদারী" বা শাহ্-ই-মদারের জীবনী নামক একটি ফারসী হস্তলিখিত পুস্তক দেখিয়া আমাদের সমস্ত ভ্রম নিরাকৃত হইয়াছে (১)। এই পুস্তক (২) হইতে নিম্নে কয়েকটি কথা অতি সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিলাম :—

বদী'উদ্-দীন্ শাহ্ ই মদার্, শাম্ বা সিরিয়াদেশে, কর্দী 'ইস্রা'ঈল্ বংশে, 'অব্দ ইস্হাক শামীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন (হস্তলিপি, পৃঃ ৮)। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে (৭১৫ হিঃ) সিরিয়ায় তাঁহার জন্ম হয় (পৃঃ ১৪১) ও সুল্তান্ ইব্রাহীম্ শাহ্ শর্কীর রাজত্বকালে, হিন্দুস্থানে ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে (৮৪০ হিঃ) তিনি দেহত্যাগ করেন (পৃঃ ১৪১)। তিনি ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে গুজরাট, অযোধ্যা, কনোজ, কাল্পী, লক্ষ্ণৌ, কন্নৌজ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য। কানপুর হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী মাকনপুরে এই মহাত্মাদের সমাধি বিদ্যমান।

একদিন শাহ্-ই-মদারের প্রবর্তিত মণ্ডলী ভারতের নানা-

১। (i) Encyclopædia of Islam—Article "Shattari."

(ii) Encyclopædia of Religion and Ethics—Article "Saints."

(iii) Indian Islam. P. 121.

১। Vide, Catalogue Raisonne of the Buhar Library (Calcutta) Vol. I, Persian Manuscript No. 88., P. 63.

২। এই পুস্তকটি পাটনে রচিত হইয়াছিল।

স্থানে যে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অদ্যাপি এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের ভারতব্যাপী প্রভাব। উত্তর-ভারতীয় মদারী-মণ্ডলীভুক্ত সাধকেরা প্রতিবৎসর মাকনপুরে সমবেত হয়। বঙ্গদেশও এই মণ্ডলীর প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। ফরীদপুর জিলায় মদারীপুরে এই দরবেশের একটি কৃত্রিম সমাধি রহিয়াছে; স্থানীয় প্রবাদ, —শাহ্-ই মদারের নামানুসারেই মদারীপুরের নামকরণ করা হইয়াছে। ফরীদপুরের "বজ্র-ভাষী" সম্প্রদায়ের অত্যাচারে, মদার পীরের এই দৎগোহটি, এখন আর পূর্বের মত উন্নত অবস্থায় নাই। চট্টগ্রামের নানাস্থানের সহিতও মদার-পীরের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে; চট্টগ্রাম জিলার (আংশিক) মদারসা গ্রাম ও শহরের নিকটবর্তী মদারবাড়ী মদার-পীরের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জিলার হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত বালিয়াদীঘি গ্রামে, এখনও মদারী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের যাতায়াত আছে। মদারী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক শাহ্ সুলতান হুসন বুগীয়হ্ বহলিমহ্ সুলতান শাহ্ শুজা'র (১৬৫৯-১৬৬০) রাজত্বকালে, সনদ লাভ করেন। এই সনদের তারিখ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ (৩)। বঙ্গের নানাস্থানে এখনও প্রতিবৎসর "মাদারের বাণ" উৎসবের দ্বারা মুসলমান জনসাধারণ দরবেশের স্মৃতি স্মরণ করিয়া থাকে।

এই পর্যন্ত পাঠককে আমরা অনেকগুলি ভারতীয় সূফী-সম্প্রদায়ের সংবাদ দান করিয়াছি, এবং ইহাও জানাইয়াছি যে, তাহার সবগুলির সমান প্রভাব ভারতে কখনও ছিল না। কালক্রমে ভারতে মাত্র তিনটি সম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল,—তাহারা চিশ্তীয়হ্, সুহরবর্দীয়হ্, ও কাদিরীয়হ্। ভারতে নক্শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায়ের প্রভাবও আধুনিক; সুতরাং তাহার কথা উল্লেখ করিলাম না। এই তিন সম্প্রদায়ের উচ্চ প্রভাবের নীচে, ধীরে ধীরে ভারতীয় অপর সম্প্রদায়গুলি অস্তিত্ব পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিল। চিশ্তীয়হ্ ও সুহরবর্দীয়হ্ সম্প্রদায় প্রায় একসঙ্গেই ভারতে প্রবেশ করে এবং অচিরকাল মধ্যেই ভারতের বুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। কাদিরীয়হ্ সম্প্রদায়ের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৮২ খৃঃ) ইহা ভারতে প্রবেশ করিলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেই ইহার প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ও ব্যাপক হয়। নক্শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায়ও এই সময়েই ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। কিরূপে এই ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা পরে আরও একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিব।

বিদেশীয় বৃক্ষদের মধ্যে যেমন কালক্রমে অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল এবং তাহার কতকগুলি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, ভারতীয় বৃক্ষীদিগের মধ্যেও অচিরেই অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল এবং তাহারা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তব্কিরহ্-ই-ওলিয়া'-ই-হিন্দ্ পুস্তকের মতে (প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ২ হইতে ৪ দ্রষ্টব্য) চিশ্তীয়হ্ সম্প্রদায় হইতে চতুর্থশ, সুহরবর্দীয়হ্ হইতে তিন, সুহরবর্দীয়হ্ হইতে সপ্তদশ, বৃক্ষীয়হ্ হইতে একবিংশতি ইত্যাদি—প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে অসংখ্য শাখা বাহির হয়। তাহার তালিকা দিয়া প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিয়া কাজ নাই। আমাদের এইটুকু জানিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় বৃক্ষদের মধ্যে কালক্রমে অসংখ্য শাখা দেখা দিয়াছিল। আবার এই শাখাগুলির প্রত্যেকটিতে যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা নিতান্তই সত্য। ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইল তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। এইহেতু ভারতীয়গণ কর্তৃক নূতন ধর্ম গৃহীত হইলেও, তাহাতে তাহাদের মনের ছাপ না পড়িয়া যায় নাই। আমাদের মনে হয়, তাই ভারতীয় বৃক্ষী-মতবাদে এত মত ও সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল। শাখাসমূহগুলি সাধারণতঃ মূলসমূহগুলির প্রাধান্য ও অধীনতা স্বীকার করিলেও, মূলতঃ তাহা হইতে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া পড়িতেছিল।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশ শতাব্দীই, ভারতে বৃক্ষী-প্রভাব বিস্তৃতির কাল। এই সময়েই বৃক্ষী-প্রভাব ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে স্থানলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে বৃক্ষী-মতবাদের মূলধারা, পারস্য, সমরকন্দ, বুখারা প্রভৃতি দেশে কোন্ গতি ও পথ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছিল, তাহাও এস্থলে ভাবিবার বিষয়। এই দেশগুলিতে প্রচলিত

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII., Pt. III. No. 1. 1903. Pp. 61-65.

সূফী মতবাদ তখন বিশ্বব্রহ্মবাদে (Pantheism) ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। সূফী-মতবাদের যে ধারা ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা খাস আরব হইতে আসে নাই,—উপরোক্ত দেশগুলি হইতেই আসিয়াছিল। সুতরাং এখন সহজেই সঠিকভাবে অনুমান করা যাইতে পারে, ভারতের বহির্দেশস্থ বিশ্বব্রহ্মবাদকে সঙ্গে লইয়াই, সূফীরা এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, কেহ যেন মনে না করেন,—খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পারস্য ও আরবে একেশ্বরবাদী সূফী ছিলেন না; থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা বা তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা ভারতে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ কথাও সত্য যে, ভারতীয় সমস্ত মতগুলির বিস্তৃত মতবাদ জানিবার সৌভাগ্য, উপাদানাভাবে এ পর্য্যন্ত আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। সমস্ত মতগুলির মতবাদ জানিবার সৌভাগ্য আমাদের না হইলেও, যতগুলি মতগুলির বিষয় অবগত হইয়াছি, প্রত্যেকটিতেই বিশ্বব্রহ্মবাদের স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই। মোটের উপর, ভারতে যতগুলি সূফী-সম্প্রদায় প্রবেশ করিয়াছিল, বিদেশীয় বিশ্বব্রহ্মবাদকে সঙ্গে লইয়াই প্রবেশ করিয়াছিল, বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভারত প্রাচীনকাল হইতেও বেদান্তের দেশ, চিরদিনই মর্ম্মবাদী দার্শনিকের লীলাক্ষেত্র, এবং চিরদিনই নিগূঢ় অধ্যাত্মবাদের জন্মস্থান। আবার চিরদিনই পারস্য, সমরকন্দ ও বুখারা প্রভৃতি দেশের মর্ম্ম ভারতের মর্ম্মের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত। কাজে কাজেই, ঐ সকল দেশ হইতে বিশ্বব্রহ্মবাদের বাণী ও মর্ম্মবাদের গূঢ় রহস্য লইয়া সূফীরা যখন ভারতে প্রবেশ করিলেন, প্রথমতঃ বিদেশীয় ও "তুর্ক" ধর্ম্ম ও দর্শন বিধায়, ভারত তাহাকে গ্রহণ করিতে একটু দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করিলেও, কিছু দিনের মধ্যে, ভারত যখন তাহার সম্যক পরিচয় লাভ করিল, তখন তাহাকে দুইহাত বাড়াইয়া বুকে টানিয়া লইল। অচিরেই, ভারতবর্ষ, এই পারস্য সমরকন্দের নব মর্ম্মবাদের (Mysticism) মধ্যে, প্রাচীনকালের কোন বিস্মৃত আত্মীয়জনের মনোরম মূর্ত্তির সাক্ষাৎলাভ করিল; আর এই নব মর্ম্মবাদও ভারতের প্রাণে প্রাণে একটি প্রাচীন যোগসূত্রের আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাই অতি সহজেই, ইহা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। মাত্র একটি শতাব্দী অতীত না হইতেই, ইহা সমগ্র ভারতের প্রাণে একটি নূতন হাট ও নবীন আসর জমাইয়া তুলিল। মুসলমানদের রাজশক্তি যতখানি ভারতকে গ্রাস করিতে পারে নাই, তাহার এক-তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যেই, এই সূফী-মতবাদ ভারতের হৃদয় জয় করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ভারত-হৃদয়-বিজয় ব্যাপারে অগ্রেসরাগ্রণী হইলেন কবীর (১৩৯৮-১৪৪৮)। ভারতীয় সাধনার সহিত সূফী "তত্ত্ব-বৃক্ষের" বা ব্রহ্মবাদের মিলন ঘটিল, উভয়বিধ সাধনার মৈত্রী সংস্থাপিত হইল। এতদিন এই দুই সাধনা ভাবের আদান-প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতেছিল,—পরিশেষে কবীরের মধ্যে উভয়ের মিলন ঘটিল। এই জন্যই বলিতে হয়, যদি মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃতই কেহ ভারত-বিজয় করিয়া থাকেন,—তিনি কবীর;—আকবর কি ঔরঙ্গজীব নহেন। এই জন্যই, কবীরের অন্তর্দ্ধানের পরেও, ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্ব্বত্রই তাঁহার মতের প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপভাবে ভারতীয় সাধনা ও সূফী তত্ত্ব-বৃক্ষের মিলন ঘটায়, ফল হইল কি? ফল ভাল হইল, কি মন্দ হইল, সে বিচার পাঠকদের স্বীয় স্বীয় অভিরুচির উপরই নির্ভর করে। সাধারণতঃ দুই ব্যক্তির মিলন ঘটিলে, যে অবস্থা হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল:—সূফী তত্ত্ব-বৃক্ষ তাহার মৌলিক বিশুদ্ধতা হইতে কতকটা সরিয়া দাঁড়াইয়া, আর ভারতীয় সাধনা কতকটা অগ্রসর হইয়া মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। ফলে উভয় সাধনার রক্ষণশীল দিক ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িল। এই শিথিলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াই, ভারতীয় সূফীরা অসংখ্য শাখামণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলেন। ফলে ভারতের নানা স্থানে অসংখ্য মত দাঁড়াইয়া গেল,—ভারতের সূফী জগৎ নিত্য-নূতন মতের উদ্ভবে ধীরে ধীরে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এখন সূফী মতবাদের মৌলিক বিশুদ্ধতার কতকাংশ লোপ পাইল; আর ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্যও কতকাংশ হ্রাস পাইল। ফল কথা, ভারতের চিন্তা-জগৎ মিশ্রণ-দোষে বা মিশ্রণ-গুণে ভরপুর হইয়া গেল।

ভারতে অচিরেই এই ভাব-বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মুজাদ্দেদের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক হইলেন, শয়খ্ 'অহমদ্ সর্হিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪ খৃঃ)। তিনি "মুজাদ্দদ্-ই-'অল্ফ্-ই-থানী" অর্থাৎ দ্বিতীয় "সহস্রাব্দের সংস্কারক" নামে পরিচিত। তিনি প্রধানতঃ নক্শ্বন্দীয়হ্ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক এবং একজন মহাজ্ঞানী ও সুলেখক ব্যক্তি ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে তাঁহার মত মহাপণ্ডিত ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মুস্লিম ও ভারতবাসী মুসলমানের সংস্কারসাধনে মনোযোগ দিলেন। হিন্দুগণও তাঁহার প্রভাবের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে নাই। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ "মকতুবাত" (লিপিমালা) গ্রন্থ পাঠ করিলে, একদিকে যেমন তাঁহার সংস্কার-প্রচেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, তেমনই অন্যদিকে তাঁহার "তসব্বুফ্" (ব্রহ্মবাদ) জ্ঞানের অতুল গভীরতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এই "মকতুবাত" গ্রন্থের মধ্যেই তিনি কখনও ভ্রান্ত মুস্লিমকে সৎপথে পরিচালিত করিতেছেন, আবার কখনও হিন্দুকে ইস্লামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে সহজভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহার এইরূপ সংস্কারমূলক প্রচারের ফলে, চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়িয়া গেল:—শী'অহ্ সম্প্রদায় তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় স্বয়ং সম্রাট জহাঙ্গীরও বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সম্রাট নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিলেন এবং যুবরাজ খুর্রম্কে (শাহ্জাহান) তাঁহার হাতে দীক্ষাদান করাইলেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শয়খ্ 'অহমদ্ দ্বিগুণ উৎসাহ ও জোরে সংস্কারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার সংস্কারের ঢেউ ভারতের সর্ব্বত্র অনুভূত হয় এবং তাঁহার নিকট হাজার হাজার লোক দীক্ষাগ্রহণ করে। তিনি যে সংস্কারের ভিত্তি পত্তন করিলেন, পরবর্ত্তীকালে সম্রাট ঔরঙ্গযীব তাহাকে আরও ব্যাপক ও আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিলেন। খুজীদিগকে সংযত করিতে যাইয়া সম্রাট ঔরঙ্গযীব, ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সর্মদ্ নামক প্রসিদ্ধ সাধককেও হত্যা করিয়াছিলেন। মুজাদ্দদ্-ই-'অল্ফ্-ই-থানীর মর্ম্ম অনেক ক্ষেত্রে ঔরঙ্গযীবের মধ্যে অসিতে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ সংস্কারের ফলে ভারতে কাদিরীয়হ্ ও নক্শ্বন্দীয়হ্ সম্প্রদায় সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। জানিয়া রাখা আবশ্যক, কাদিরীয়হ্ সম্প্রদায় ভারতীয় মুসলমানদের নিকট অনেকখানি সংস্কারপন্থী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে—ইস্লামবিরুদ্ধ ভাব ও চিন্তা যেন এই সম্প্রদায়ে বড় বেশী নাই। আর নক্শ্বন্দীয়হ্ সম্প্রদায়, মুজাদ্দদ্-ই-'অল্ফ্-ই-থানীর নিজের সম্প্রদায়। সুতরাং এই সংস্কারের যুগে ইহাদের বেশ আদর হইল। এই সময় হইতেই সংস্কৃত নক্শ্বন্দীয়হ্ সম্প্রদায়, "মুজাদ্দীয়হ্" নামে পরিচিত হইতে লাগিল। ঔরঙ্গযীবের মৃত্যুর পর, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে ধীরে ধীরে ভারত হইতে সংস্কারের চেষ্টা মুছিয়া গেল। রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত মুসলমানদিগের ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল—ভারতীয় খুজী-সম্প্রদায়ের ধারাও ভিন্নপথে পরিচালিত হইল। সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে বাহুল্য।

(ক্রমশঃ)

ভিক্তর হুগো

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

প্রতিভার জন্ম সচরাচর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরেই। নিছক অর্থের প্রাচুর্য্যই জীবনকে প্রসাদগুণ ক'রে তোলে না; বিত্তের ভিত্তি যেখানে পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত,—দুঃখ ও দারিদ্র্যের পথে জীবনধারা গতিশীল যেখানে,—সেখানেই মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও পুরুষকারের স্পর্দ্ধা বিকাশ লাভ করে।

ভিক্তর হুগোও জন্মেছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে।

শীর্ণ, ক্ষীণকায় শিশু। যে কোন মুহূর্ত্তে জীবনের দীপ নিভে যাবার সম্ভাবনা।—সে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আত্মীয়-পরিজনের ভয় ও ভাবনার বিরাম নেই।

সেদিন আঠারো শো-দুই সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী। সন্ধ্যার অন্ধকার ধরিত্রীর বুকের উপর ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে। "ব্যাসিন্‌কোনের" পাহাড়ের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে অস্তিম সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি। স্পেনের বুকে তখন পরাধীনতার কলঙ্ক কুয়াসার আবছায়ায় আপনাকে আবৃত করতে ব্যস্ত। কেল্লার মধ্যে স্পোর্টসে মত্ত সৈনিকদের আনন্দ-কলরব এবার থেমে এল বুঝি। এমি মুহূর্ত্তে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো—শীর্ণ, ক্ষীণ, মৃত্যু-সম্ভাবিত।

পিতা জেনারেল হুগো ছিলেন রণকুশলী কোর্সা-দ্বীপে নেপোলিয়নের অন্যতম সহযোগী। অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর সাহস,—বাহুবলে তিনি বহু খণ্ড-যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। স্পেনের ব্যাসিন্‌কোন প্রদেশের কেল্লার কর্ত্তৃত্ব ছিল তখন তাঁর উপর। সেই সময় প্রবাসী সেনাপতির দুর্গগৃহে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে হুগোর জন্ম।

সেনাপতির পুত্র,—দুর্গের মধ্যে জন্ম,—কিন্তু জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বে।

সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি ভাই: ভিক্তরই কনিষ্ঠ।

আবেল্ হুগো বড়

য়্যুজিন্ মধ্যম।

স্পেনের বুক জন্মগ্রহণ করলেও স্পেনের আবহাওয়ার সঙ্গে তিনি পরিচিত হ'তে পারেন নি। জেনারেল হুগো সপরিবারে বন্দী হ'য়ে আসেন 'এল্‌বা' দ্বীপে—শিশু ভিক্তরের বয়স তখন সবেমাত্র দেড়মাস। কিন্তু 'এল্‌বা'কেও শিশু ভালো ক'রে চিন্‌লো না; তিনবছরের মধ্যেই এঁর পিতাকে এল্‌বা থেকে 'কর্সিকা' দ্বীপে আসতে হোল। বিজেতা সাম্রাজ্যের তিনি ছিলেন সেনাপতি—বিজিত দেশের বুকে সৈন্য-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখবার জন্য যখন যেখানে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন ঘটতো জেনারেল হুগো সেখানেই চ'লে আসতেন—তবে একা নয়, সপরিবারেই।

—প্রথমে ইটালি;

—তারপর প্যারীতে,

—শেষে আবার স্পেনে।

দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের সৈন্যাধ্যক্ষের জীবনে ভব-ঘুরেমির যে ছাপ পড়বে—এ একটুও বিস্ময়াবহ নয়।

—ম্যাড্রিড্ সহর।

সম্মিলিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, স্পেনের রাজধানী। তারি মাঝে তদানীন্তন আদর্শে গঠিত অভিজাত সন্তানদের জন্য নামকরা শিক্ষাগার—'কলেজ অফ্ নেয়স্'। আভিজাত্যের গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত হ'য়ে উঠবার এতবড় আদর্শ-বিদ্যালয় ম্যাড্রিড্ সহরের বুকে সে-যুগে ছিল না। সংশিক্ষার মধ্য দিয়ে পাণ্ডিত্য জন্মাক্ বা না-জন্মাক্, আচার-ব্যবহারের ত্রুটি শিক্ষকদের কাছে ছিল অমার্জ্জনীয়। এই শিক্ষাগারেই ভিক্তরের প্রথম পড়াশুনা সুরু হোল।

কিন্তু এখানকার পড়াশুনা বেশীদূর এগুলো না।

নেপোলিয়নের বিরাট সাম্রাজ্য তখন পরাধীনতার স্বর্ণ-শৃঙ্খল ছিন্ন করতে উৎসুক,—ফ্রান্সের বুকে একটি অনা-

গতের ভাবী আশঙ্কা ঘনাই ঘনাচ্ছে। চারিদিকের বিচ্ছিন্ন সেনা ও সেনাপতিদের সম্মিলিত কর্মধার জন্য ফরাসীরাজ তখন উৎসুক; তারই ফলে জেনারেল হুগোকেও চ'লে আসতে হ'ল প্যারীতে।

প্যারীতে এসে পিতৃপুরুষের ভিটা দখল ক'রে বসলেন তিনি।

বাড়ীটির নাম 'লা ফিলাটিন্স্'—ছবির মত। সামনেই বৃহৎসংসর উদ্যান,—ফুলের সৌরভ, পাতার মর্মর ভেসে আসে—কিশোর কবির মনে স্বপনপুরীর স্বপ্ন জাগে, নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে সে যেন কি শুনতে পায়, পত্রের মর্মরে আর পুষ্পের সৌন্দর্য্যে সে যেন কি খুঁজে পেতে চায়—

এদিকে পিতার বন্ধুর কাছে লাটীন পড়া চলতে থাকে।

'জেনারেল লাহোরী' ছিলেন সে যুগের একজন অন্যতম বিপ্লবী। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত থাকায় আত্মগোপন করবার তাঁর একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। জেনারেল হুগো ছিলেন তাঁর বাল্যসহপাঠী, ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী, বন্ধু—একাধারে সব। তাই তাঁরি গৃহে 'জেনারেল লাহোরী' আত্মগোপন করলেন। বিভিন্ন ভাষার লাহোরীর পাণ্ডিত্য ছিল অনন্যসাধারণ, তার উপর ছিল তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা। তাঁর কাছে শিক্ষালাভের ফলে ভিক্তর সাধারণ ছেলেদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে লাগলো —অবিনীত বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তখন তাঁর মনে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠছে।

রাজনীতি নিয়ে পিতা থাকতেন ব্যস্ত।—আর মায়ের মত ছিল উদার। তাই যখন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁর এই-সব উচ্ছৃঙ্খল মতবাদের জন্য মায়ের কাছে অভিযোগ জানাতেন তখন মায়ের স্নিগ্ধ সস্নেহ হাসির মুখে সে-সব কথা কোথায় যেন হারিয়ে যেত। মায়ের স্নেহজাত এই শাসন-অক্ষমতার ফলই হুগোর শিক্ষা পদ্ধতি-অনুযায়ী সুন্দর হ'য়ে ওঠে নি। লাটীন, স্পেনিশ, গ্রীক প্রভৃতি বারোটি ভাষা ইনি শিখেছিলেন, গণিত, রসায়ন, দর্শন প্রভৃতিও ইনি যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা ক'রে তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারেন নি—রচনার ক্রম-বিকাশের মুখে যেখানে তিনি সে-চেষ্টা করেছেন সেখানটিই সমালোচকের দৃষ্টিতে হ'য়ে পড়েছে শূন্যাশ্রয়ী উচ্ছ্বাস শুধু। শৈশবে একটু বিধিনিষেধের মধ্যে থাকলে, একটু শাসনশীলনের তীতি থাকলে, ভবিষ্যতে তিনি যে আরো অনেক-কিছুই ক'রে যেতে পারতেন এ কথা আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বয়স তখন সবে বারো—

পাখীর গান শুনে', প্রজাপতির পিছনে ছুটে', ফুলের রূপ দেখে জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে বালোর কলোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে। কিন্তু জীবনের এ ধারা হঠাৎ ছিন্ন হোল নেপোলিয়নের রাজ্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে।

প্রজাতন্ত্রের উদয়—

বিধ্বস্ত, রাজসেনাপতি জেনারেল হুগোরও ঘটলো পদচ্যুতি—সৈন্য হস্তান্তরিত হ'য়ে গ্যালো।—সেনাপতির পরিচ্ছদ পড়লো এই রাষ্ট্রবিপ্লবের চরম পৃষ্ঠপোষকের।

শুধু জেনারেল হুগো কেন, সারা ফ্রান্সের বুকেই একটা বিপ্লব ঘ'টে গ্যালো।

ভিক্তরের জীবনেও ঘটলো পরিবর্ত্তন—

পিতা জেনারেল হুগো সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত হবার পর ভিক্তরের লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ভিক্তর অবশ্য ব্যতিব্যস্ত হুই ছেলেকে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন লুই-লা-গ্রাঁদ কলেজে।

বোর্ডিংয়ের জীবন।

বাঁধা ধরা নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকতে ভিক্তরের মনে বিদ্রোহ জাগে। বন্দীর মত তার জীবনটা হ'য়ে ওঠে অধৈর্য্য।

তবু থাকতে হয়।

শেষে সে মনের গতি ফিরিয়ে দিলে অন্যদিকে। জীবনটার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্যে সে নিজেদের মধ্যে একটা থিয়েটারের দল গ'ড়ে তুললো।

এবং পদ্যলেখাও সুরু হোল।

প্রথম দিকে সুরু হোল বড় বড় বিদেশী কবিদের কবিতার অনুবাদ, তারপর নিজস্ব সৃষ্টি—খণ্ডকবিতা, গাথা, নীতিকবিতা, শোককবিতা, গান—সব-কিছুই।

চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যেই এই কিশোর কবি সবক'টি

সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়ে পাঠকমহলে বিশেষ ভাবেই পরিচিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু তখন শুধু নিজ স্বাতন্ত্র্যবৈশিষ্ট্যে কবি হিসাবে পরিচিতই হ'য়েই উঠ্‌ছিলেন—খ্যাতি হয়নি। সেই খ্যাতিলাভ হ'ল একদিন আকস্মিক ভাবে।

—বছর খানেক পরের কথা।—

'একাডেমী' থেকে একটি কবিতা-প্রতিযোগিতা হ'ল। ছোট কবিতার প্রেরক নিয়ে কবিদের মধ্যে চাঞ্চল্য প'ড়ে গ্যালো। নিজস্ব কল্পনাবৈশিষ্ট্য তখনীন্তন সকলেই লিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন অসীম উৎসাহে। কিন্তু যে পুরস্কারের সম্মান নিয়ে তরুণ যুবক প্রৌঢ় কবিদের উৎকণ্ঠা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ ছিল না, সেই পুরস্কারই লাভ কর্‌লো একটি কিশোর কবি—সে ভিক্তর হুগো।

খ্যাতির হোল এই প্রথম সূত্রপাত।

কিন্তু শুধু কি ওই একটি পুরস্কার?—বছর ঘুরতে হোল না, পরস্পর দুটো কবিতা-প্রতিযোগিতায়ই ভিক্তর প্রথম হ'লেন। কিশোর কবির নাম ছড়িয়ে পড়্‌লো চারিদিকে।

খ্যাতির মোহ ভিক্তরকে সম্মোহিত কর্‌লো। সাহিত্য-সেবাকেই তিনি জীবনের আদর্শ ক'রে তুল্‌লেন। ষোল বছর বয়সে স্কুলের পাঠ্য শেষ ক'রে যখন বেরোলেন, তখন কোথায় উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হবেন, তা নয় একখানি পত্রিকা বা'র কর্‌লেন—Le Conservateur Litteraire নামে।

দু'ভাই ছিলেন এই কাগজখানির প্রবর্ত্তক—আবেল ও ভিক্তর। নিজ নিজ সামর্থ্যের উপর ছিল দুজনেরই অসীম স্পর্দ্ধা—তাই তরুণ-বয়সেই পত্রিকা-সম্পাদনার দুঃসাহস তাঁদের হয়েছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকা হ'য়ে উঠ্‌ল।

সে-যুগের খ্যাতনামা তরুণেরা এই মাসিকে লিখ্‌তেন—এমিল্ বেল্‌চ্যাম্প, আলেক্‌জাণ্ডার দুমেৎ, আল্‌ফ্রেড্ দা ভিগ্‌নি, লামার্টিন—প্রভৃতি। সৈত্রই তরুণদের মুখপত্র হ'য়ে উঠ্‌লো এই কাগজখানি।

কিন্তু কাগজখানি শেষ পর্য্যন্ত টিক্‌লো না।

তবু এই কাগজখানির সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি থেকে ভিক্তরের মতবৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে। পত্রিকা-খানির সম্পাদক হিসাবে সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি ভিক্তর নিজেই লিখ্‌তেন, সেগুলি থেকে তাঁর তখনকার মতবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

বিপ্লবের রক্তপিচ্ছিল পথের উপর দিয়ে এগিয়ে এসে ফিরে যাবার দুঃস্বপ্ন দেশবাসীর হৃদ্‌কে তখন বিষিয়ে তুলেছিল, ফলে রক্ষণশীল আন্দোলন দু'ইয়ে উঠেছিল দেশের বুকে। তারপর যেদিন বন্দী নেপোলিয়ন বিজয়ী ফরাসী-সেনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বীপান্তরের জাহাজে উঠ্‌লেন তখন রক্ষণশীলদের চীৎকার উঠ্‌লো—পুরানো রাজবংশই আবার রাজা হোক্, বিপ্লবের রক্তপিচ্ছিল পথে চল্‌বার দুঃসাহস আর আমাদের নেই। তখনীন্তন বিখ্যাত প্রভাবশালী লেখক সাটুব্রাঁরও এই আদর্শের ছিলেন অন্যতম উৎসাহী। সাটুব্রাঁদের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভিক্তরও হ'য়ে উঠ্‌লেন রক্ষণশীল—তাঁর তখনীন্তন 'সম্পাদকীয়'তে রাজনীতির সেই দিকটাই বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে।

পত্রিকাখানি বন্ধ হ'য়ে যাবার কিছুদিন পরে ভিক্তরের একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হোল। পুস্তিকাকারে এই তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহ: নাম—Odes et Poesies Diverses

উনিশ-শো-বাইশ সালে বইখানি বেরোয়। সে বই-য়ের সবক'টি কবিতাকে দুই পর্য্যায়ে ফেলা চল্‌তে পারে—কতকগুলি কবিতা ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি ক'রে রচিত, অপরগুলি হ'চ্ছে গাথা ধরণের কবিতা। কবিতাগুলি প্রথম যুগের; কাজেই বিশেষ তেমন কিছু প্রত্যাশা করা চলে না সেগুলির মধ্যে। অতিরিক্ত শব্দবাহুল্যের আড়ম্বরে, কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য থাক্‌লেও, মানবচরিত্রের উপর তেমন রেখাপাত কর্‌বার মত ছিল না সেগুলি। কবি শুধু নিজের আকাঙ্ক্ষা নিজের অনুভূতিগুলোই প্রকাশ করেছেন এই কবিতাগুলির মধ্যে এবং কবির স্বকীয়তা বিশেষ ভাবেই প্রকাশ পায় এর বর্ণনার শ্রেষ্ঠতায়। অনেকে বলেন এই কবিতাগুলিতে বিখ্যাত লেখক সাটু-ব্রাঁদের প্রভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়।—অভিনব

ছন্দের মধ্য দিয়ে একখানি ছবি ফুটিয়ে তোলবার শক্তি সাটুর্নিয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল অধুনাতন যুগে।

একটি বড় ব'য়ে গেলো—

উনিশ বছর বয়সে কবির মাতৃবিয়োগ ঘটলো। মায়ের স্নেহাধিক্যের সুযোগ নিয়ে কবি ছিটগ্রস্ত কবি হ'য়ে উঠেছিলেন, তাঁর কবিখ্যাতির উপরে তাঁর মা'ই ছিলেন একান্ত স্নেহশীল। সেই মায়ের মৃত্যু কবির জীবনধারা ভিন্নমুখী ক'রে দিল—জীবনের যাত্রাপথে প্রথম আঘাত পেয়ে কবি মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন।

মায়ের মৃত্যুর অন্যতম কারণ ছিল মনোকষ্ট, যা তাঁর জীবনের মধ্যপথেই পূর্বচ্ছেদ টেনে দেয়—

পিতা ও মাতার মধ্যে গ'ড়ে উঠেছিল ব্যবধানের বিস্তৃতি। জেনারেল রণে এক তরুণীর প্রেমে পড়েছিলেন, মা তা জানতে পারেন এবং সেই জানতে পারাই সংসারের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করলো—স্বামী পৃথক হ'য়ে গেলেন, মাসিক একটা মাসোহারার মত ব্যবস্থা ক'রে। কিন্তু পিতৃসদয় সন্তানের জন্য স্নেহাকুল থাকে,তাই ছেলেদের তিনি একেবারে ত্যাগ করতে পারেন নি—হয়তো এটি একটি চক্ষুলজ্জার ব্যাপারও হ'তে পারে। মনোকষ্টে মা শীর্ণ হ'য়ে পড়লেন—শেষে স্বামী তাঁকে জ্যাঁভোর্স ক'রে তরুণী প্রিয়াটির পাণি-পীড়ন করছেন শুনে' তিনি হঠাৎ দুঃখক্লিষ্ট ধরণীর বুক থেকে বিদায় নিলেন।

কিশোর কবির দৃষ্টিতে কিন্তু সব-কিছুই ধরা পড়লো—পিতাকে তিনি ক্ষমা করতে পারলেন না।

পুত্রের এই বিদ্রূপ ব্যবহার পিতার চোখে পড়তে দেরী হোল না। ফলে, পিতা-পুত্রের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হোল একদিন তা অতি সামান্য কারণেই আত্মপ্রকাশ করলো: পিতা বললেন—এমনি ধারা পড়াশুনা বন্ধ ক'রে গল্প কবিতা লেখা চলবে না, কলেজে ভর্তি হ'য়ে পড়াশুনা সুরু ক'রে দাও—

লেখক হবার নেশা, নতুন কিছু সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা তখন তাঁর মাথার মধ্যে ব্যাধির মত সংক্রামিত হ'য়ে উঠেছে, তার উপর আবালোর অনভ্যাসে কলেজের বিধি-নিষেধের মাঝে ধরা দেওয়া তাঁর কাছে হ'য়ে উঠেছিল অসম্ভব, কাজেই ভিক্তর জানালেন পড়াশুনা আর তাঁর দ্বারা হবে না—

বৃদ্ধ পিতা রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—তোমার মত বেকার পুত্রের ব্যবভার বহন করা তাহ'লে আমার কাছে অসম্ভব।

—বেশ!

সেই থেকেই ভিক্তরের পিতৃদত্ত বৃত্তি বন্ধ হ'য়ে গেলো—প্রাচুর্যের আকাশ দারিদ্র্যের মেঘে ঢেকে ফেললো। অবস্থার বিপর্যয়ে ভিক্তরের কষ্টের আর সীমা রইলো না, অভাব-অনাটন তাঁর নিশ্বাসকে বিষিয়ে তুললো।

কিন্তু শেষে প্রচেষ্টা ও আত্মবিশ্বাসই জয়ী হোল। তাঁর কবিতার বইখানি এতখেনী জনপ্রিয় হ'য়ে উঠলো যে তার লাভাংশ থেকে তাঁর অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হ'য়ে উঠলো। শেষে তাঁর কবিপ্রতিভা দেশের গণ্যমান্য রাজ-কর্মচারীদের উপর এমনি ভাবে প্রভাব বিস্তার করলো, যার ফলে প্রতিভাশালী তরুণ কবির দুঃখপ্রপীড়িত জীবনের কথা ফরাসীরাজের কানেও উঠলো। স্বাধীন দেশ,—দেশীয় প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ করবার সুযোগ পায়, জগৎসভাকে জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার উৎসাহে। রাজকোষ থেকে দু'হাজার ফ্রাঁ বৃত্তি দেবার আদেশ হোল।—ভিক্তরের অবস্থার বিপর্যয় ঘটেছিল যেমন আকস্মিক ভাবে তার উত্থানও হলো তেমনি অতর্কিতে।

স্নেহের ছদ্মবেশে যে পুত্রস্নেহ এতদিন আত্মপ্রকাশ করেনি, তরুণীর রূপজ মোহ কিন্তু তাকে বিলুপ্ত ক'রে দিতে পারেনি জেনারেলের হৃদয় থেকে। তাই পুত্রের কবি-খ্যাতি হবার পর পিতা আবার তাঁর উপর স্নেহের ধারা বহিয়ে দিলেন, নিজের ভুল বুঝতে পেরে। পিতাপুত্রের মাঝে ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে গ্যালো মিলনের ঘনিষ্ঠতায়।

তারপর ভিক্তর বিবাহ করলেন।

'আজেলি কোচার' ছিল তাঁর আবাল্যের সাথী—একসাথে খেলা-ধূলা, একসাথে গাওয়া-বাওয়া তাঁদের উভয়ের শৈশবকে একান্ত ঘনিষ্ঠতম ক'রে তুলেছিল। বাল্যের সহচরী শেষে যৌবনের সঙ্গিনী হ'য়ে উঠলো—দুজনকে দুজনে একান্ত আপনার ক'রে পাবার উৎসুকে বাগ্‌দান করলেন। ভিক্তরের অভাব-অনাটন ও

চরম অর্থকষ্টের সময়ও বাগ্‌দেবী আমেলি তাঁকে ভুলে যাননি। আঠারো-শো-বাইশ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তাঁদের বাগ্‌দান সার্থক হোল পরিণয়ের মন্ত্রপূত বন্ধনে।

তরুণ কবির জীবনের যাত্রাপথ হ'য়ে উঠ্‌লো পূর্ব্বের চেয়েও স্বচ্ছন্দ সুগম—পিতার স্নেহে ও পত্নীর প্রেমে আপ্লুত হ'য়ে।

—একটি মানুষের জীবনের মধ্যে কত বিবর্ত্তনই না ঘ'টে যায়।

এইবার সুরু হোল গদ্য লেখা—কবিতা লেখাও চল্‌তে লাগ্‌লো তারই ফাঁকে ফাঁকে। গদ্য লেখার হাত পাকাবার জন্য প্রথমেই সুরু করেছিলেন সমালোচনা লিখ্‌তে, নিজের কাগজের "সম্পাদকীয়"টাও লিখ্‌তেন নিজেই। এখন সে-সব সুযোগ নেই দেখে সুরু কর্‌লেন—উপন্যাস।—দুখানি চমৎকার রোমান্স Han d' Islnnd ও Bug-Jargal, দুখানিই ধারাবাহিক ভাবে 'লা মিউজ ফ্রঁসেই' মাসিকে পর্য্যায়ক্রমে আঠারো-শো-তেইশ ও ছাব্বিশ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম উপন্যাসখানি বাজারে বেরুবামাত্রই বেশ একটু চাঞ্চল্য প'ড়ে গ্যালো পাঠকমহলে। সমালোচকেরাও লেখকের শক্তির প্রশংসা কর্‌লেন। কিন্তু বইখানির অন্তর্নিহিত সুর কারুরই ভালো লাগ্‌লো না এবং পরে বিরুদ্ধ-সমালোচনার ঝিঁঝে আকাশ বিঁঝিয়ে উঠ্‌লো যেন। উপন্যাসিক হিসাবে ভিক্তর সুপরিচিত হলেন কিন্তু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কর্‌তে পার্‌লেন না প্রথমতঃ।

চার্লস নদ্যার ছিলেন তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সমালোচক। হঠাৎ একদিন একেবারে অপ্রত্যাশিত সমালোচনা তিনি ছাপিয়ে ফেল্‌লেন তখনকার একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকে ভিক্তরের সুখ্যাতি ক'রে। পাঠকমহলে একটা চাঞ্চল্যের আভাস জাগ্‌লো। নদ্যারের সমালোচনা প'ড়ে সাহিত্যিক বৈঠকেও বেশ একটু সাড়া প'ড়ে গ্যালো।

প্রথম উপন্যাস থেকে ভিক্তর এতটা আশা করেন নি।

নদ্যারকে একদিন ইনি নিমন্ত্রণ কর্‌লেন আলাপ-পরিচয় কর্‌বার জন্য। তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন সমালোচনার এই সুখ্যাতির জন্য।

এই নিমন্ত্রণ থেকেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

তখনকার তরুণ লেখক ও চিত্রকরদের ছোট একটি দল রোজই জ'মে উঠ্‌তো নদ্যারের লাইব্রেরী ঘরে। সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনাও চল্‌তো সমবেত তরুণদের মতামতের কষ্টিপাথরে যাচাই কেটে। এই দলটির প্রতিষ্ঠা ছিল সে যুগে যথেষ্ট। নদ্যারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে ভিক্তরও এই দলটির মধ্যে একজন হ'য়ে পড়্‌লেন। সেখানে নিজস্ব মতবাদ প্রচারের চেয়ে, আলোচনার গতি ও মতামতের দৈর্ঘ্য দেখে তিনি নিজের মতবাদ গঠন কর্‌তেন।—ভবিষ্যতে এই লাইব্রেরীটির ম্যাগাজিক হয়েছিলেন তিনিই।

বেশীদিন পরের কথা নয়।

অষ্ট্রিয়ান দূত আস্‌ছিলেন ফ্রান্সে। কয়েকজন বড় বড় সেনাপতিকে ও রাজকর্ম্মচারীকে তাঁকে সসম্মানে বাপ্‌তিস্ম্ মানিয়ে নিয়ে আস্‌বার কথা জানানো হয়েছে। এই সব সেনাপতি ও রাজকর্ম্মচারীরা নেপোলিয়নের অধীনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তারই ফলে নেপোলিয়ন তাঁদের সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ান দূতকে অভ্যর্থনা কর্‌বার দিন তাঁদের নামের শেষে সে সব উপাধির উল্লেখ করা হয় নি, তাতে ধ্বনিত নেপোলিয়নের হাতে পরাজিত অষ্ট্রিয়ার অপমান হবে;—এই নিয়ে তখন খুব আন্দোলন চল্‌লো ক'দিন ধ'রে। সেই উত্তেজনার প্রেরণায় ভিক্তর একটি জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশ কর্‌লেন। এই কবিতাটির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত ক'রে তোলেন তিনি:

আবার দিন ফিরে আস্‌বে—
নেপোলিয়ন আজ নাই কিন্তু ফরাসী বেঁচে আছে!
দুর্দ্দিনতার সুযোগে যারা আজ দম্ভ দেখাচ্ছে
প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে তাদেরই—

—এমি ধারা ওজস্বিনী কবিতার মধ্য দিয়ে জাতের নর-নারীর মধ্যে তিনি একটা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেন। যদিও সে উচ্ছ্বাস আন্দোলনে প্রকাশ পায়নি, তাহ'লেও ভিক্তরের কাব্যপ্রতিভা বিশেষ জনপরিচিতি লাভ কর্‌লো সাময়িক এই উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বহু লোকের কাছেই।

হঠাৎ একদিন বিখ্যাত অভিনেতা 'তল্মে'র সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে গ্যালো।

একদিন তল্মে জিজ্ঞেস করলেন—খুব ভালো 'ট্রাজেডী' লিখতে পারবেন, একেবারে নতুন ধরণের?

ভিক্তর ভেবে চিন্তে কোন একটা উত্তর দেবার আগেই, আবার বললেন—আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন, তাই আপনাকেই বলছি। অভিনয় জগতে একটা নতুন ধারা নিয়ে আসবার ইচ্ছে হয়—

ক'দিন হ'য়ে ওই সম্বন্ধেই আলাপ আলোচনা চল্লো। শেষে ভিক্তর লিখতে সুরু করলেন 'ক্রমোয়েল্' নাটকখানি। কিন্তু নাটকখানি শেষ হবার আগেই তল্মের মৃত্যু—নাটকখানি অভিনীত হবার কোন আশাই আর রইল না।

তা না থাক্, তবু ইনি নাটকখানি শেষ করলেন, আঠারো শো সাতাশ সালের ডিসেম্বরে নাটকখানি প্রকাশিত হোল।

এই নাটকখানি সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলেই তখনকার ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে হয়:—

Romanticismএর আন্দোলন তখন ফরাসী সাহিত্যিকদের ভাবধারাকে প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা পাচ্ছে। রোমান্টিসিজ্‌ম্ বলতে প্রচলিত ভাবধারার বিরুদ্ধবাদ বোঝায় সাধারণতঃ—সাহিত্যের মধ্যে একটা বিপ্লবপ্রচেষ্টা। বিপ্লব যেমন রাজনীতি এবং সমাজনীতির প্রচলিত ধারাকে বিবর্ত্তিত করবার চেষ্টা পায়, রোমান্টিসিজ্‌ম্ও তেমনি প্রচলিত সাহিত্য-অনুভূতির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন তরঙ্গায়িত ক'রে তোলে। প্রচলিত সাহিত্যধারা, যার মধ্যে ছিল একটা আভিজাত্য-ভাব, নীতির বিধি-নিষেধ যার অনুভূতিকে সীমাবদ্ধ করেছে, তার প্রতিবাদই ছিল রোমান্টিসিজ্‌মের প্রাণ। কবিচিত্তের অনুভূতিকে নিয়ম-কানুনের গণ্ডীর মধ্যে রূপ দিতে গেলে তার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, তা শুধু সাহিত্যই হয় সত্যানুভূতির প্রকাশ হয় না। যে সাহিত্যে সত্যানুভূতির স্থান নেই শুধু সংযমের বাঁধনই আছে,—তা সত্যিকারের সাহিত্য নয়; রোমান্টিসিজ্‌মের এই প্রধান কথা। নীচে ফরাসী-সাহিত্য-ইতিহাস থেকে রোমান্টিসিজ্‌মের গোড়ার কথাটা তুলে দিলুম:

"Romanticism meant the substitution of sincerity and the genuine expression of real and fresh emotion for the stereotyped platitudes and conventional rhetoric of the decadent Classic School. a new age demands a new literature to express its spirit and to satisfy its needs." *

এইবার 'ক্রমোয়েল্' নাটকের কথায় ফিরে যাই। এই নাটকখানিতে ইনি ত্রিবাচবিত কোন নিয়মকানুন মানেন নি—সেইজন্য এই বইখানি তদানীন্তন রোমান্টিসিজ্‌মের প্রথম ও পরম বিকাশ হিসাবে উদাহরণস্বরূপ হ'য়ে উঠ্‌লো। সকল তরুণ নব্যপন্থী সমালোচকেরা স্বীকার করলেন ক্রমোয়েলই হ'চ্ছে রোমান্টিসিজ্‌মের সর্ব্বাঙ্গীন প্রথম নিদর্শন। তারই ফলে নব্যপন্থীদের মধ্যে ভিক্তরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হ'য়ে গ্যালো। ক্রমে ভিক্তরকে কেন্দ্র ক'রে তরুণ সাহিত্যিকদের একটি নব্যপন্থী দল গ'ড়ে উঠ্‌লো।

এই দলটি Cenacle of 1829 নামেই প্রসিদ্ধ। ভিক্তরই ছিলেন এই সমিতির প্রধান তাঁর গৃহই ছিল সমিতির প্রধান অধিবেশন-গৃহ।

সমিতির চেয়ে দল বললেই ভালো হয়।—

এই দলে ছিলেন আলফ্রেড্ ডি ভিগ্‌নি, সেরিসি, ডুমা, মাস্তেট, গটে প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকেরা, যাঁরা ভবিষ্যতে বিশেষ ভাবেই নাম করেন। এই তরুণ-দলের মধ্যে বিখ্যাত সমালোচক সাঁতেব্যুভও ছিলেন। এ মাঝেল গ'ড়ে এঁরা সকলেই ভিক্তরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিলেন অল্পবিস্তর পরিমাণে। কিন্তু—

কিছুদিন পরে এঁদের মনে দ্বিধা জাগ্‌লো ভিক্তরের প্রতিভা সম্বন্ধে—ভিক্তরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে। ঠিক সেই সময়েই এঁর Odes et Ballades নামক কাব্যগ্রন্থখানি বাজারে বেরুলো। যাঁরা এঁর প্রতিভার

* A Short History of French Literature, P. 179

এতদিন ছিলেন সন্দিহান তাঁরা নির্বাক হ'য়ে গেলেন বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কায়।

তারপরেই বেরুলো আরেকখানি অপূর্ব কবিতার বই Les Orientales. বইখানি এমনি অপূর্ব হয়েছিল, পাঠক ও সুধীজনদের এত্তিয়ারে আকৃষ্ট করেছিল, যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বইখানির তিনটি সংস্করণ ফুরিয়ে গেলো। এই বইখানির ভূমিকায় ভিক্তর বলেছিলেন—'শুধু ছন্দ ও নীতির মধ্যেই কাব্যের ধারা সীমা নির্দেশ করতে চান, তাঁদের মধ্যে আমি নই। কবিতা প্রাণের প্রেরণা, যা ভালো লাগে তাই সংযত ভাবে ভাষায় প্রকাশ করার নামই কাব্য —এর বস্তুনির্বাচন বিধিনিষেধের উপরই নির্ভর করে না, করে কবিচিত্তের অনুভূতির উপর।—শুধু ছাপমারা সৌন্দর্যের মধ্যেই কবিতা আছে এ কথা যারা মনে করেন তাঁরাও ভুল করেন; একখানি ইট-মারা করা বাড়ি, সন্ধ্যার সঙ্গ অন্ধকার একটা গলি, কয়েদের দীর্ঘশ্বাস ভরা হাসপাতাল, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ—সবেরই মধ্যে কবিতা আছে। জীবনের সবকিছুই কাব্য, যে তা অনুভব করতে পারে সেই কবি।'

নিজের এই কথার সত্যতা তিনি দেখিয়েছিলেন, নিজের পরবর্তী প্রতিটি কবিতায়। তাঁর এই অভিনবত্বের জন্যই তিনি পাঠকদের প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছিলেন অত শীঘ্র। তাঁর 'পাশা' তাঁর 'সুলতান'রা পাঠকদের দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠ্‌তো ছবির পর্দায় যেমন ভেসে ওঠে আলোছায়ার খেলা! প্রতীচ্যের চেয়ে প্রাচ্যের 'পাশা' ও 'সুলতান'দের সম্বন্ধে কবিতা লেখারই আগ্রহ ছিল তখন এঁর অত্যন্ত। তার উপর এ সব কবিতায় তিনি বাস্তবের ছায়াও গ্রহণ করতেন না—এ-জন্যই তাঁর অভিনবত্ব হোত অপরূপ।

নাটক লিখে অভিনয় না হ'লে আর কার ভালো লাগে?—ভিক্তরেরও খ্যাতি হোল বটে কিন্তু তৃপ্তি হোল না। ভিক্তর তাই অভিনয়ের চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন, একখানি নূতন নাটক লিখে।

নাটকখানির নাম Marion Delorme।

কিন্তু এবারও বাধা পড়লো—নাটকখানি অভিনীত হোল না। এমন কতকগুলি রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল সেই নাটকখানির কথাবস্তুর মধ্যে যে, কর্তৃপক্ষ থেকে নাটকখানির প্রকাশ্য অভিনয় বন্ধ হ'য়ে গেলো।

শক্তিশালী তরুণ নাট্যকারটির ক্ষোভ দূর করে ফরাসীরাজ দশম চার্লস্ ভিক্তরকে সন্তুষ্ট রাখ্‌বার জন্য আরো দু'হাজার ফ্রাঁ বৃত্তি বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভিক্তর তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন,—অর্থের চেয়ে আদর্শের সার্থকতাই তখন তাঁর কাছে হ'য়ে পড়লো বড়, তিনি দু'হাজার ফ্রাঁ বৃত্তি নিতে অস্বীকার জানালেন।

তারপর ইনি পূর্বোদ্যমে লিখ্‌তে সুরু করলেন আর একখানি নতুন নাটক—Hernani।

'থিয়েটার ফ্রাঁকে'তে নাটকখানি অভিনীত হোল।—

প্রথম রজনী—

নব্যপন্থীয় শ্রেষ্ঠ তরুণ লেখকের নাটক দেখ্‌বার জন্য ভীড়ের শেষ নেই—প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের অভাবিত সমাবেশ। প্রতি বৃত্তের সমাপ্তিতে প্রশংসা ও নিন্দার ঝড় ওঠে। ক্রমেই প্রাচীন ও নবীনপন্থী সমালোচকদের মধ্যে তর্কের চরম বিকাশ,—চীৎকারের পর মুষ্টিযুদ্ধেরও সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসে। শেষ দর্শকদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য নাটকখানির শেষাংশটুকু অভিনীত হবার পূর্বেই যবনিকা ফেল্‌তে হয়।

দ্বিতীয় রাত্রির অবস্থাও এমনি।

পরপর ক'টি দিন এমি ধারাই চল্‌লো।

শেষে রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধোযুদ্ধি হওয়ার চেয়ে পত্রিকায় মারহুৎ হওয়াই সুবিধাজনক মনে ক'রে, আর তাতে কোন পক্ষেরই আহত হ'বার সম্ভাবনা নেই দেখে,পত্রিকার সমালোচনাতেই যুদ্ধ চল্‌লো।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রাচীন-পন্থীদেরই চুপ করতে হোল, নব্যপন্থীদের জয়ের সূচনা ক'রে। ভিক্তরই হলেন সে জয়ের শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক—কেননা এঁর নাটকখানিতে রোমান্টিসিজমের ধারা ছিল আগাগোড়াই।

নব্যপন্থীদের মতবাদের পাকা ভিত্তি হোল এতদিনে।

ক'মাস পরের কথা।—

ফ্রান্সের বুকের উপর দিয়ে আর একটা রাজনৈতিক বিপ্লব ব'য়ে গ্যালো—দশম চার্লসের ঘট্‌লো সিংহাসনচ্যুতি, লুই-ফিলিপ সিংহাসনে বস্‌লেন।

এই বিপ্লবের ছায়া ফুটে উঠ্‌লো ভিক্তরের বিখ্যাত উপন্যাস Notre-Dame de Paris-এ। পাঠকেরা শুধু চমৎকৃত হোল না, বিস্মিত হোল এর অভিনবত্বে।

তারপর থেকে তিনি আবার সুরু কর্‌লেন নাটক লিখ্‌তে—ভবিষ্যতে বারো বছর ধ'রে এই নাটকই ইনি লিখেছিলেন শুধু।

নীচে নাটকগুলির একটা তালিকা দিচ্ছি

আঠারো-শো-বত্রিশ সালে লেখেন Le Roi S'amuse; আঠারো-শো-তেত্রিশ সালে লেখেন Lucrece Borgia, আর Marie Tudor 'পঁয়ত্রিশ সালে লেখেন Angelo; 'আটত্রিশ সালে Ruy Blas এবং 'তেতাল্লিশে Les Burgraves.

তারপর এঁর অন্যান্য লেখনী থেকে আবার তিনখানি কবিতার বই প্রসূত হোল আঠারো-শো-পঁয়ত্রিশে Les Chants du Crepuscule, আঠারো শো-সাঁইত্রিশে Les Voix Interieures এবং আঠারো-শো চল্লিশে Les Rayons et les Ombres. শেষের বইখানি সে যুগের প্রত্যেক চিন্তাশীল সুধী পাঠকের কাছে ভিক্তরের নামটি অক্ষয়তর ক'রে তুল্‌লো। ফরাসী বিদ্যাপীঠের সদস্য ক'রে নেওয়া হোল ভিক্তরকে। চল্লিশ বছর বয়সেই ভিক্তর ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে স্বনামধন্য হ'য়ে পড়্‌লেন। এত অল্প বয়সে এতটা সম্মান আর কোন ফরাসী লেখক পেয়েছেন ব'লে তো মনে হয় না।

জীবনধারাটা এতদিন শান্তিপূর্ণ ছিল—

যদিও একটা প্রচণ্ড দুঃখবোধ ছিল তার মধ্যে।

ছোটভাই য়ুজিন—সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর নিকটতম সহযোগী, হঠাৎ উন্মত্ত হ'য়ে যান আঠারো-শো-বাইশ সালে। কোন কিছুতেই যখন কিছু হোল না, উন্মত্ত ভাইটির সংস্পর্শে আসা যখন ক্রমেই ভয়াবহ হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন উপযুক্ত চিকিৎসার অধীনে রাখ্‌বার জন্য ভিক্তর তাঁকে উন্মত্তদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। তা হোক্, তবু তো ভাইটি বেঁচে ছিল!

তার পনেরো বছর পরে সাঁইত্রিশ খৃষ্টাব্দে ভাইটি মারা গ্যালো—ভিক্তর শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়্‌লেন।

কিন্তু আবছায়া—অন্ধকারেরই পূর্বাভাস। ভ্রাতৃশোকের বেগ প্রশমিত হ'তে না হ'তেই, নাট্যকার হিসাবে এঁর পতন ঘট্‌লো। এঁর প্রতিভার পতন নয়, নাট্যরসিক জনরুচির উপেক্ষা—যার ফলে এঁর শেষ নাটক Les Burgraves নাট্যগৃহকে দর্শকবহুল ক'রে তুল্‌তে পার্‌লো না। ফলে ইনি নাটক লেখা বন্ধ ক'রে দিলেন,—উপরন্তু কোন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষও আর তাঁর কাছ থেকে নাটক পাবার তাগিদও কর্‌লেন না। প্রতিভাশালী নাট্যকার মনের দুঃখে নাটক লেখাই ছেড়ে দিলেন।

নাট্যক্ষেত্রের এই বিফলতা এঁর মনের উপর কোন রেখাপাত করেনি, কর্‌তে পারেনি তার কারণ এঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ইনি তখন বিশেষ ভাবেই মনোযোগ দিয়েছিলেন—জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ইনি বিশেষ ভাবেই ভালোবাস্‌তেন, তার জীবনের সুখ-সুবিধার উপর ভিক্তরের এত আগ্রহ ছিল যে স্বপ্রতিভার উপেক্ষাও ইনি বিস্মৃত হলেন অনায়াসেই।

কিন্তু সেদিক থেকেও আঘাত এল:

বিবাহের বছর ঘুর্‌লো না, কন্যা জামাতা সিন নদীর উপর নৌকা-বিহার কর্‌ছিলেন, কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে নৌকা গ্যালো ডুবে—উভয়ের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘট্‌লো নদীর গর্ভেই। ভিক্তর প্রথমে কোন খবরই পেলেন না। তিনি তখন পিরেনিজ্ অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কখন কোথায় থাকেন তার কোন স্থিরতা ছিল না। কাজেই তাঁকে তখন খবর দেওয়া সম্ভব হোল না। ক'দিন পরে যখন তিনি ফির্‌লেন,—মর্মাহত হ'য়ে গেলেন একমাত্র প্রিয় কন্যার মৃত্যুতে।

জীবন-ধারাও ঘুরে গ্যালো ভিন্ন মুখে।

রাজনীতিক্ষেত্রে ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার জন্য ঝুঁকে পড়লেন। লুই ফিলিপের সঙ্গে এঁর ছিল পূর্বপরিচয়, রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দেবার পর থেকে সে ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বে নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌লো। ফলে, আঠারো-শো-পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দে লুই ফিলিপ এঁকে "ভিস্‌কাউন্ট্" উপাধি দান।

আবার আটচল্লিশ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহেতেও ইনি যোগ দিয়েছিলেন লুই ফিলিপের বিপক্ষে! প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইনি প্যারীস্যানদের পক্ষ থেকে প্রজাতন্ত্রের অন্যতম ডেপুটি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। যিনি একসময়ে লুই ফিলিপের সকল মতেরই পোষণ ক'রে ভিস্‌কাউন্ট উপাধি পান, তিনিই আবার প্রজাতন্ত্রের ডেপুটি নির্ব্বাচিত হলেন—এইখানেই রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর মতবিবর্ত্তন চোখে পড়ে। আসলে তিনি খুব বড় রাজনীতিবিদ্ বা বিচক্ষণ রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি—তাই তাঁর সব মতবাদই প'ড়ে উঠ্‌তো খুসীর খেয়ালমত,—ভাবের আতিশয্যে। সেইজন্যই ইনি প্রথমে প্রজাতন্ত্রের লুই বোনাপার্টকে বিশেষ ভাবেই সাহায্য করেন রাজনীতিক্ষেত্রে, আবার কিছুদিন পরে সেই তন্ত্রেরই উচ্ছেদ করবার জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়ে পড়েন! কিন্তু গুপ্তচরদের কৃতিত্বে এঁর বাইরের আবরণ খ'সে পড়্‌লো, আত্মরক্ষার জন্য ইনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু রাজ্যের সীমানার মধ্যে ধরা পড়্‌বার বিশেষ আশঙ্কা থাকায় এঁকে কুলি মিস্ত্রির ছদ্মবেশে আত্মগোপন করতে হোল। তারপর একদিন সুযোগমত এসে হাজির হলেন ব্রুসেল্‌সে।

এইবার তাঁর লেখক-জীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হোল।

রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ইনি আবার সুরু করলেন কবিতা লিখ্‌তে। এঁর কবিতার জনপ্রিয়তা এমন রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগেও বিশেষ প্রবলভাবেই দেখা গ্যালো। এই সময়কার কবিতার মধ্যে প্রকৃতি-প্রিয়তার বিশেষ প্রাবল্য দেখা যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (Wordsworth) মত ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সজীবতা ও সারল্যের ইনি অত্যন্ত পক্ষপাতী হ'য়ে পড়েন এই সময়ে। নিজের জীবনের দুঃখ কষ্ট এঁর তদানীন্তন কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষভাবেই ফুটে উঠেছে। যেমন এঁর দলিতচিত্ততা প্রকাশ পেয়েছে এই সময়কার কবিতাগুলির মধ্যে, আধ্যাত্মবাদের অস্থিরতাও বিশেষ ভাবেই ধরা পড়ে তার সঙ্গে।

ব্রুসেল্‌সে বেশীদিন থাকা চল্‌লো না।

তখন ইনি Nepoleon le Petit লিখে ফরাসীরাজকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, নেপোলিয়নের সকল ঘোষণাটির নির্ব্বিচারে সমালোচনা ক'রে।—পলাতক কবির চিত্তে এতদিন যে ঈর্ষ্যা জমা হয়েছিল তারই বিষোদ্গার!

বেল্‌জিয়ামের সঙ্গে ফরাসী রাষ্ট্রের সন্ধিসর্ত্ত ছিল, কাজেই ফরাসী রাষ্ট্রের আক্রমণকারীকে বেল্‌জিক্ শাসকেরা নির্ব্বিবাদে রাজ্যমধ্যে থাকতে দিতে পারলেন না। শেষে ভিক্তরকে চ'লে আস্‌তে হোল "জার্সি" সহরে।

অর্থের অনাটন তখন এতই বেশী যে প্যারীর বাড়িতে যে সব জিনিষপত্র ছিল বিক্রী ক'রে টাকাকড়ি সমেত পরিবারবর্গকে জার্সিতে আস্‌তে লিখে দিলেন।

টাকাকড়ি সমেত পরিবারবর্গ এল—জীবনের স্বচ্ছন্দতা আগের চেয়ে সরল হ'য়ে উঠ্‌লো।

সেই সময় থেকে ভিক্তরের একমাত্র চিন্তা হোল ফরাসী প্রজাদের দৃষ্টিতে নেপোলিয়নকে হীন ক'রে দেওয়া। সেই জন্যই, নেপোলিয়ন সিংহাসন আরোহণের সময় কোন্ এক কিশোর প্রতিদ্বন্দ্বীকে গোপনে হত্যা করেন না-কি, সেই কাহিনী অবলম্বন ক'রে ইনি একটি কবিতা লিখ্‌লেন। রাজালোভী নেপোলিয়নের নির্ম্মমতা সেই কবিতাটির মধ্যে চমৎকার ফুটে উঠেছিল। যত বড় সাম্রাজ্যবাদী হোক্ না কেন, কবিতাটি পড়্‌বার সময় নেপোলিয়নের উপর ঘৃণা জাগে বৈ।

আঠারো-শো পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দের কথা।—রাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সন্ধি

নেপোলিয়নের। সেই মর্মে অবিলম্বে ব্রিটিশ রাজপক্ষ থেকে ভিক্তরের উপর জার্সি ছেড়ে চ'লে যাবার আদেশ জারী করা হোল।

বৃটিশ রাজ্য ছেড়ে যাবার আদেশ হয়নি। তাই কবি জার্সি ছেড়ে ঘরবাড়ি জিনিষপত্র সব তুলে আন্‌লেন গার্ণসি দ্বীপে। তারপর যখন সে দ্বীপ ছেড়ে যাবার জন্য কোন আদেশ আর এল না, তখন তিনি সেখানে একখানি বাড়ি কিনলেন। এই বাড়িতেই তাঁর প্রবাসী দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছিল শান্তিপূর্ণ ভাবে। এখানে উঠে আসার পর থেকে তিনি আর রাজনৈতিক হাঙ্গামা নিয়ে গোলমাল করেন নি মোটেই, এখান থেকে বিতাড়িত হ'য়ে যাবার

ভিক্তর ব'সে ব'সে লিখে যেতেন—সামনের জানালা দিয়ে সুদূরপ্রসারী নীলসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গিমা চোখে পড়তো। কবিচিত্তের কল্পনা উঠতো উচ্ছল হ'য়ে। আবার সময় সময় সারারাত পর্যন্ত কবি চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন সমুদ্রবেলার উপর।

দীর্ঘদিনের এই একঘেয়েমি কবির জীবনকে ম্লান ক'রে দিতে পারেনি।

মাঝে একবার তিনি নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসেন "লাউসেনেতে", সেখানকার Peace Congressএ সভাপতিত্ব করবার জন্য।

এই সময় আঠারো শো-বাষট্টি সালে কয়েকখানি কবিতার বইয়ের সঙ্গে এঁর বিখ্যাত উপন্যাস "লা মিজারেব্‌ল্" বাইর হয়—একই দিনে বারোটি বিভিন্ন ভাষায় এই বইখানি প্রকাশিত হয়। অভাব-অনাটন আর দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষের কতটা অধঃপতি ঘটে তাই ফুটে উঠেছে 'জিন ভল্‌জিনের' চরিত্রের মধ্য দিয়ে। একখানি উপন্যাস লেখার ধরণ ও ভঙ্গী কত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠতে পারে তারই চরমত্ব ফুটে উঠেছে এই বইখানিতে। এত বড় সৃষ্টি তখনকার ফরাসী সাহিত্য কেন, এখনকার বিশ্বসাহিত্যেও খুব কমই আছে।

এর দু'বছর পরেই সেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে এঁর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ হোল।

তারপর কবি নিজের আত্মকাহিনী লেখেন পনেরো বছর ধ'রে। দু'ভাগে এই আত্মকাহিনী ভাগ করা—প্রথম ভাগ এঁর কন্যার মৃত্যু পর্যন্ত, দ্বিতীয়ভাগ তারপর থেকে। এই আত্মকাহিনীতে ইনি জীবনের কোন কথাই গোপন করতে চাননি—এইটুকু এঁর আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্য।

আঠারো-শো-উনসাট সালের ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিতদের দেশে আসবার অধিকার দিয়ে এক ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণাপত্র পেয়ে অনেক নির্ব্বাসিত ফরাসী প্রজা দেশে ফিরে এল—কিন্তু ভিক্তর ফিরলেন না। তিনি সেই ঘোষণাপত্রের একটি পাল্টা রাজোত্তর ছেপে তার জবাব দেন—যে মাতৃভূমির শাসকেরা তাঁর বাড়িঘর তৈজসপত্র বিক্রী ক'রে তাঁকে দেশ-ছাড়া করেছে, তাদেরই একটা দেওয়ানী ঘোষণাপত্রের ভরসায় আবার দেশে ফিরে যাবার কোন প্রয়োজনই নেই তাঁর, আবার নতুন ঘোষণা ক'রে তাড়িয়ে দিতেই বা কতক্ষণ!

তারপর একদিন ফরাসী-প্রুসিয়া যুদ্ধ সুরু হ'য়ে গেলো। দেশের এই দুর্দ্দিনে স্বদেশপ্রেমিক হৃদয়ের আর প্রবাসে ব'সে থাকা চললো না—কর্ত্তব্যও নয়।

ফ্রান্সে পৌঁছবার আগেই একটি স্বদেশী কবিতা লিখে পাঠিয়ে দান তিনি—জনসাধারণকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বেলিত ক'রে তোলবার জন্য।

মোসরা সেপ্টেম্বর সেদানের পরাজয় স্বীকার করেন, চৌঠা প্যারীতে বিপ্লব হয়।

সেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পাঁচই তারিখে ভিক্তর প্যারীতে প্রবেশ করলেন। সেদিন কবিকে নিয়ে "ক লাফায়েট্" রাজপথের উপর দিয়ে যে শোভাযাত্রা হয় তাতে সারা প্যারী যোগ দিয়েছিল। আল্‌ফন্স্ দোদে এই শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বলেন—"Never, never can I forget the sight as the carriage passed along the Rue Lafayette, Victor Hugo standing up and being literally borne along by the multitude."

আবার রাজনীতির চর্চ্চা সুরু হোল।

জাতীয় মহাসভায় ইনি সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন।

কিন্তু বেশীদিন সদস্য থাকা চল্‌লো না। ব্রুসেল্‌সে এঁর পুত্রের মৃত্যু ঘটায় সদস্য-পদ ত্যাগ ক'রে ইনি ব্রুসেল্‌সে চ'লে আস্‌তে বাধ্য হন। পুত্রের মৃত্যু সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটায় বেল্‌জিক কর্তৃপক্ষ এঁকে বেল্‌জিয়াম ত্যাগ করবার আদেশ দান।

প্যারীতে আবার ফিরলেন।

আবার জাতীয় মহাসভায় সদস্য হিসাবে নির্ব্বাচিত হবার চেষ্টা কর্‌লেন কিন্তু এবার হলেন পরাজিত। পুত্র-বিয়োগে মনেও শান্তি ছিল না, তার উপর পরাজয়ের ব্যথায় ইনি রাজনীতিক্ষেত্র থেকে চিরদিনের মতই অবসর গ্রহণ কর্‌লেন।

কবির রাজনীতিক জীবনের যবনিকা পড়্‌লো এখানেই—।

শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা।—

দিনের পর দিন ধ'রে অপূর্ব্ব চরিত্র সৃষ্টি ক'রে চল্‌লেন তিনি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে—মানবজীবনের অমর স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌বার আকাঙ্ক্ষায়।

কবিতা লেখাও চল্‌লো সমভাবেই।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'নাইন্‌টিথ্‌' এই সময়েরই লেখা। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মালমসলা নিয়ে এই উপন্যাস-টির সৃষ্টি। এই উপন্যাসখানি পড়লেই হুগোর অসামান্য সৃষ্টিপ্রতিভা চোখে পড়ে। কিন্তু ঐতিহাসিকের চেয়ে কবি হিসাবেই এঁর এই সৃষ্টির প্রাধান্য—ইনি কখনও ইতিহাসকে নিরপেক্ষ হিসাবে ধারণা কর্‌তে পারেননি। ক্ষমতাশালী স্পেন সম্রাট্‌ দ্বিতীয় ফিলিপের অপূর্ব্ব রণতরী "আর্মেডার" ইংরাজ-জয়ের প্রচেষ্টা যে স্বংসপরিণতি নিয়ে এসেছিল,—সে সম্বন্ধে যে দীর্ঘ কবিতাটি লেখেন ইনি তার মধ্যেও ইতিহাসের প্রতি এঁর অনাস্থা বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে।

এঁর সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে উৎপীড়িতের প্রতি সমবেদনার রক্তপ্রবাহ। প্রত্যেকটি মানব ও পশুর মধ্যে পরমাত্মা বিরাজমান—সেই আত্মার অবমাননা ক'রে চলেছে অহরহ যত প্রতাপান্বিতের দল। সেই দিক, পেশশ্চিত্তের প্রতি একটা করুণাধারা এঁর পরবর্ত্তী প্রতিটি রচনার মধ্যে প্রকাশমান।

পরবর্ত্তী যুগে ইনি লিখ্‌তে সুরু করেন যাযাবর জীবন অবলম্বন ক'রে। এঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলির সঙ্গে এঁর পরবর্ত্তী রচনাগুলির কোনও মিল পাওয়া যায় না দুটি ধারা একেবারে ভিন্ন।

নির্ব্বাসিত হুগো মাতৃভূমির বুকে ফিরে এসেও বিশেষ সুখী হ'তে পারেন নি। তাঁর জীবনের আকাশ ঘন কৃষ্ণটিকাচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে সাংসারিক দুর্ব্যাবহারের মধ্যে।—

আঠারো-শো-আটষট্টি সালে এঁর পত্নীবিয়োগ হয়।

আর দুটি ছেলে—চার্লস্‌ ও ফ্রাঙ্কো যবনীর স্নেহ মমতাকে ছিন্ন ক'রে বিদায় নেয় বছর তিনেক পরেই।

বছরের পর বছর যতই এগিয়ে চল্‌লো, এঁর নিকটতম বন্ধু ও আত্মীয়-পরিচিতেরা একে একে ধরিত্রীর বুক থেকে অপসারিত হ'তে লাগ্‌লেন। একটা সকরুণ ভাব এঁর জীবনের যাত্রাপথকে ব্যথাময় ক'রে তুল্‌লো। তার মধ্যেও জীবনের সব কিছু ব্যথা-বেদনাকে উপেক্ষা ক'রে জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ ক'রে নেবার স্পর্দ্ধা এঁর ছিল—আমরণ এঁর স্বাস্থ্য ছিল অটুট। অমন বৃদ্ধকালেও অতি প্রত্যূষে ইনি শয্যাত্যাগ কর্‌তেন, প্রাতঃস্নানেই ইনি ছিলেন অভ্যস্ত। প্রত্যহ ঘণ্টা দু'তিন মুক্ত বায়ুতে না ভ্রমণ কর্‌লে ইনি অস্বস্তি বোধ কর্‌তেন। প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক ক'রে পুরোদমে ব্যায়াম করাই ছিল এঁর নিত্যনৈমিত্তিক একটি প্রধান কাজ।

আঠারো-শো-আটাত্তর সালে ইনি প্রথম রোগাক্রান্ত হন দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর তবে স্বাস্থ্য ফিরে পান। তখনকার শারীরিক অবস্থা দেখে বন্ধুবান্ধবেরা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বার বার অনুরোধ করেন—কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভবপর হয়নি।

তারপর হোল এঁর জয়ন্তী-উৎসব।

সেটি আঠারো-শো একাশী সাল। অশীতি বার্ষিক জন্মতিথিতে প্যারীর বুকে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল তাতে সমস্ত প্যারীসিয়ানরা নির্দ্বিধায়ে যোগ দিয়েছিল—তা সে ধনীই হোক্ আর দরিদ্রই হোক্, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই।

এর দু'বছর বাদে আর একটি জয়োৎসব হয়।

এর পরেই হঠাৎ এঁর শরীর পড়ে ভেঙে। প্রতিদিন বিকেলে কয়েক মাইল ভ্রমণ করা এঁর অভ্যাস ছিল—অজস্র বৃষ্টির দিনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতো না, শীতের তুষারপাত তো দূরের কথা। শীতকালে উপযুক্ত শীতবস্ত্রের কোন বালাই থাকতো না, বর্ষাকালে বর্ষাতি না নিয়েই বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু এ বয়সে অত অত্যাচার সহ্য হবে কেন!

আঠারো-শো পঁচাশী সালের মে মাস।

ভিক্তরের বেড়িয়ে ফিরবার সময় কেমন যেন একটু শীত-শীত করতে লাগলো। ক'দিন পরে সেই শীতের ভাবটা নিউরোনিয়ার রূপান্তরিত হ'য়ে গ্যালো। এঁর বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ রোগের সে আক্রমণকে বেশীদিন প্রতিহত ক'রে রাখতে পারলো না—বাইশ তারিখে ইনি মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়লেন—মৃত্যুর অন্ধকার প্রতিভাকে বিলুপ্ত ক'রে দিল।—দিল কি?

বিরাট সমারোহে এঁর শবসৎকার হ'য়ে গ্যালো শাসক-পক্ষ থেকে। পথে জনতার অন্ত ছিল না।

একটি প্রশস্ত রাজপথ এঁর নামে উৎসর্গ ক'রে দেওয়া হোল।

এঁর রচনার মধ্যে বাস্তিকতার আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু সে বাস্তিকতা কোথাও আতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পায়নি। বিরু, শেষপর্যন্ত জনসাধারণের প্রতি একটা করুণ সহানুভূতির ভাবই এঁর রচনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অনেক সময় এই দুর্বলতাটুকুর জন্যই এঁর চরিত্রসৃষ্টি ব্যর্থ হ'য়ে গ্যাছে। অনুভূতির পরে রেখাপাত করলেও স্থানে স্থানে ভাষার আড়ম্বর এঁর রচনা অতিরিক্ত ক্লিষ্ট হ'য়ে পড়েছে। তা হোক্, এঁর অসামান্য সৃষ্টিশক্তির তুলনায় এ সব দোষত্রুটি একেবারেই নগণ্য। অপূর্ব্ব ভূয়োদর্শন, কল্পনার প্রসার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভঙ্গী, ভাষার উপর আশ্চর্য্য আধিপত্য—প্রভৃতি এঁর রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি আজ একে বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব দান করেছে।

এঁর আকৃতি ছিল এঁর রচনার মতই লৌষ্ঠবময়—প্রশস্ত কপাল, স্বাপ্নাবেশমাখা আয়ত দুই চোখ, উন্নত নাসা, দীর্ঘ বলিষ্ঠ পেশীবহুল আকৃতি—সুপুরুষ হ'তে গেলে যেটুকু দেহবৈশিষ্ট্যের দরকার, সবই এঁর ছিল। তাঁর ভাবুকত্বের পরিচয় পাওয়া যেত তাঁর চোখদুটির পানে তাকালেই। এ সব ছাড়া—

নম্রতা, বন্ধুপ্রীতি ও সরলতার জন্য তিনি সমসাময়িক অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির বিশেষ প্রিয় ছিলেন।—ভালো লোক আর ভালো লেখক হ'তে গেলে যে যে গুণ থাকা দরকার তা সবই তাঁর ছিল।

আজ প্রায় সাতচল্লিশ বছর তিনি ধরণীর কোল থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভাপ্রসূত দান চিরদিন জাগ্রতভাবে জনমণ্ডলীর বুকে তাঁকে অমর ক'রে রাখবে। ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন—এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা—।

অতি-সতর্ক সূর্য্য

শ্রী সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

"খর্জ্জুর নিলে মেঘরাই ভরি', 'বোটা'য় ভরিয়ে জল;
"টুকুস্ টুকুস্ চলন উটের, এ কি রেলগাড়ি কল?
"তিন তিন দল চ'লে গেল আগে, তোমাদের তাড়া নাই?
"হাত নেড়ে নেড়ে গল্প লো না হয় পরেতেই হ'ত ছাই!
"সূর্য্যি মামার তাতেনিক ঘুম, এই বেলা পাড়ি দেও।"
আধেক নয়ন মেলিয়া পুরবে সূর্য্য তাকিল,—"কে-ও!'

তীর্থপথে—শ্রী হেমেন্দ্র বাগ্‌চী। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

এই যাযাবরী দেহবাদের উচ্ছৃঙ্খল ধুলোটের মধ্যে, তীর্থপথ যাত্রীর উদাত্ত আশাবরী শুনিয়া সত্যই প্রাণে প্রশান্তির আশ্বাস আসে।

'উত্তরবায়ু' আসিলে তাহাকে দ্বার খুলিয়া বরণ করিয়া লইতেই হইবে। যখন—

"ঝরা পাতা, ম্লান ফুলদল,
শুধু ধূলি জমিছে কেবল…"

তখন নিষ্ঠুর উত্তরবায়ু আসিয়া দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত হানিয়া ফিরে। তরুণ কবি এই উত্তরবায়ুকে দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ধূলোটে মাতেন নাই। তিনি সুতীব্র চেতনা লাভ করিয়াছেন, এবং দেখিয়াছেন—

"…টুটে' যায় গ্লানি,
টুটে মোহ।"

কল্পনা ছিন্নদেহ হইলেও দেহকে আশ্রয় করিয়াই তাহা বিকশিত হইয়া উঠে। অতি-আধুনিক দেহবাদের উপর কবি মহিমময় দেহ দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন :—

"মোর দেহখানি
অনির্ব্বাণ হোমশিখা—ধীরে ধীরে পাসরিয়া গ্লানি
যুগের জড়িমা ভেদি' দিল মোরে আনি'
বিধাতৃমহিমাদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় জয়টিকাখানি।"

'গোপনচারী' কবিতাটির মধ্যে যেন ইহার মূল সুর খুঁজিয়া পাওয়া গেল। সে দিক্ দিয়া ইহাকে তীর্থপথের 'keynote'ও বলা যাইতে পারে।—

"গ্লানির মুহূর্ত্তে মোর ক্ষুব্ধতার জীবনের বীণ
বহা দৈন্যভরে
গাহে নাই পূর্ণ গান।…"

তাই—"আজি তব ধ্যানলোকে হে তপস্বী,
আসিয়াছি ফিরে'—
জীবন-সেতারখানি ঝঙ্কি' তুলি' একান্ত গম্ভীরে!"

কবি "প্রাণনাশী গাম্ভীর্য্যেরে ভাঙি' ভাঙি'" চপল করিতে চাহিয়াছেন—যে গাম্ভীর্য্য মৃত্যুর গাম্ভীর্য্য, জড়তার গাম্ভীর্য্য। কিন্তু প্রাণের গভীরতার গাম্ভীর্য্য তিনি হারান নাই; আমরা তাই তাঁহার কবিতার আখ্যা দিলাম—উদাত্ত আশাবরী।

ইহাই নিয়ম—শ্রী আশীষ গুপ্ত। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

বর্ত্তমান যুগে উচ্চ আদর্শকে আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধ ক্ষমতার যে নির্ম্মমতা এবং আত্মবঞ্চনার যে অন্যায় সমর্থন, মানুষের জ্ঞাননিষ্ঠার স্কন্ধে আরব্যরজনীর সেই বাপবাসী নিষ্ঠুর বৃদ্ধের মত চাপিয়া বসিয়া তাহাকে নতমস্তক করিতে চাহিতেছে,—তরুণ কথাগ্রন্থক তাহাকে "ইহাই নিয়ম" আখ্যা দান করিয়াছেন।

তীর বাঙ্গালার সহিত প্রেমের-সহানুভূতির অশ্রুবাষ্প মিশিয়া ইহাকে বিশ্বাবলম্ব জনগণের রূপ দান করিয়াছে এবং বিষয়বস্তুর সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ইহার ভাষা ও ভঙ্গীও মর্ম্মস্পর্শী এবং গতিবান্ হইয়াছে।

মানুষের হৃদয়ের দুয়ার আজ বন্ধ।—সহস্র প্রকারের ফন্দী-ফিকির, অসংখ্য রকমের চালবাজীতে আজ মানুষের মস্তিষ্ক ভরিয়া আছে। আদব-কায়দা এবং বাহিরের ভাঁকজমক অতিক্রম করিয়া কাহারও কাছে গিয়া পৌঁছানই এক বিরাট ব্যাপার—কিন্তু তাহার পরেও তাহার সাড়া মেলে না। বহু মিনতির শেষে যদি বা ঘরের দরজা পার হইয়া ঘরে ঢোকা যায়, তাহা হইলেও অন্তঃকরণের নিকটে গিয়া সভয়ে ফিরাইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই।"—গ্রন্থকার ইহাই বুথাতঃ বলিতে চাহিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে আলোচ্য কথাগ্রন্থখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই।

আব্রাহাম লিঙ্কলন্—শ্রী বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণ পাবলিশিং হাউস, ১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা।

নবজগৎ আমেরিকার, উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ-পুরুষ আব্রাহাম লিঙ্কলনের মহৎ কর্ম্মজীবন এই গ্রন্থে সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে—আত্মজীবনীর ভঙ্গীতে, অর্থাৎ লিঙ্কলন্‌কেই প্রথম-পুরুষ করিয়া। লিখনভঙ্গী প্রশংসনীয়। সত্যানুসরণ ও তথ্যসন্নিবেশের সহিত ইহার সাহিত্য-রসমিশ্রিত প্রকাশ প্রকৃতই মনোজ্ঞ ও মনোহর হইয়াছে—এবং কালোপযোগীও।

—বঃ সঃ—

পশ্চিম বাংলার মেয়েদের প্রাচীরচিত্র-শিল্প

শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত প্রদেশে রামনগর এবং সাহোড়া গ্রামে একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। সাহোড়া গ্রামের বাইরে থেকেই দূরে একটি আধভাঙ্গা পড়ের চালওয়ালা কুটীর নজরে পড়্‌ল। আশে পাশে আরও অনেক বাড়ীই ছিল, তার মধ্যে এই জীর্ণ-চাল কুটীরটি যে আমার নজরে পড়্‌ল তার কারণ, কুটীরের মাটির দেয়ালে উজ্জ্বল নীল, হলদে, সাদা ও সবুজ রঙে আঁকা দুটি পদ্মফুল;—এই দুইটি পদ্ম রেখা ও রঙের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের সমাবেশের সম্পদে কুটীরটিকে এমনই একটি গৌরবময় রূপ দিয়েছিল যে কুটীরটিকে লক্ষ্য না করে' থাকা অসম্ভব ছিল। কুটীরের দরজার দুই পাশে খড়ের চালের অল্প নীচে এই দুইটি পদ্ম আঁকা ছিল। নজরে পড়েছিল আমার অনেক দূর থেকেই; কিন্তু সেই দূর থেকেই আমাকে এই পদ্মদুটির সৌন্দর্য্য যেন চুম্বক পাথরের মত আকর্ষণ করে' সেই কুটীরের দোরে নিয়ে গেল। খবর নিয়ে জান্‌লাম কুটীরটির মালিক একটি "ভূমিজ" জাতীয় রমণী। ভূমিজ জাতটা বাগ্দী জাতের মত সমাজের চক্ষে অতি নীচস্থানীয়। যদিও এই জাতির নাম হ'তেই অনুমান করা যায় যে এরা একসময় ভূমিধারী প্রচণ্ড যোদ্ধার জাত ছিল আর আজকালও এদের মত নির্ভীক ও শক্তিশালী জাত বাংলাদেশে কম আছে; কিন্তু বাংলার আধুনিক সমাজের চোখে এরা দীনহীন ও অনশনে পীড়িত।

যাক্ সে কথা। ভূমিজ রমণীটি বিধবা, সে গ্রামের একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে। ঘরে গিয়ে দেখ্‌লাম সে সমস্তদিন দাসীবৃত্তি করে' খেটে' আসার পর খেতে বসেছে। তার বাড়ীতে তার আপনার জন আর কেউ নেই। অতি কষ্টে সৃষ্টে সে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাইরে আঁকা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় পদ্মদুটি যে তার হাতের আঁকা,—অর্থাৎ এ দুটি আঁকবার মত শিল্পকৌশল, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির প্রেরণা যে এই নীচজাতীয় দীন-

দুঃখী বিধবা রমণীর থাকতে পারে, তা সহজে কল্পনা করা যায় না ; কিন্তু তার কাছ থেকে জানা গেল যে পল্লীটি তারই আঁকা এবং প্রতি বৎসরই লক্ষ্মীপূজার সময় দুটি রঙীন পদ্ম কুটীরের দেয়ালে এঁকে সবৎসর কাল সে তার কুটীরকে সৌন্দর্য্যের আবর করে' রাখে।

জিজ্ঞাসা করে' জানলাম, যে খালি এই রমণীর নয়, এই সকল গ্রামের উচ্চ-নীচ সকল জাতীয় মেয়েরাই নিজেদের বাড়ীর মাটির দেয়ালে নানাপ্রকার রঙীন পদ্ম ও অন্যান্য সৌন্দর্য্যময় পরিকল্পনা লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর এঁকে থাকেন। তাই সেদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে এই রেখা ও রঙের বিচিত্র রূপাবলী দেখতে লাগ্‌লাম।

যা দেখ্‌লাম তাতে আবাক্ হ'য়ে গেলাম। ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের এক অজ্ঞাত কোণে যে পল্লী-রমণীর স্বতোৎজাত সৌন্দর্য্য-রস সৃষ্টির এত ছড়াছড়ি থাকতে পারে তা পূর্ব্বে কখনও কল্পনাও করি নি। গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই প্রত্যেক বাড়ীর দেয়ালে অনুপম সৌন্দর্য্যময় রঙীন রূপাবলী নজরে পড়ে। কি সুরুচিময় বর্ণ-সমাবেশ, কি অপূর্ব্ব কৌশলময় রেখা-বিন্যাস! সবই গ্রামের মেয়েদের হাতের কাজ। সহরে শিল্পীদের মত রঙের বাহুল্যের ব্যবহার নাই, অতি অল্প কয়েকটি প্রাথমিক রঙের সহজ অথচ উজ্জ্বল সমাবেশ। কি অনুপম ছন্দোবদ্ধ রেখা-বিন্যাস, কোথাও এতটুকু ভুল ত্রুটি নাই। অথচ প্রত্যেক চিত্রেই কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় সরলতা ও মাধুর্য্য যেন মাখা রয়েছে।

আমি এটা স্পষ্ট বুঝ্‌লাম যে যা দেখ্‌ছি এ শুধু চিত্র নয়, এই চিত্রগুলি গ্রামের যে সরলপ্রাণ মেয়েরা এঁকেছেন তাঁদের বিশুদ্ধ ও সহজ সরল মনের এক একটা প্রতিকৃতি। এই রাঢ় দেশেরই প্রাচীন কবি লোচনদাসের পদাবলীর একটি লাইন মনে পড়ে' গেল—

"লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত নিরমিল গো
অপরূপ রূপের বলনী!"

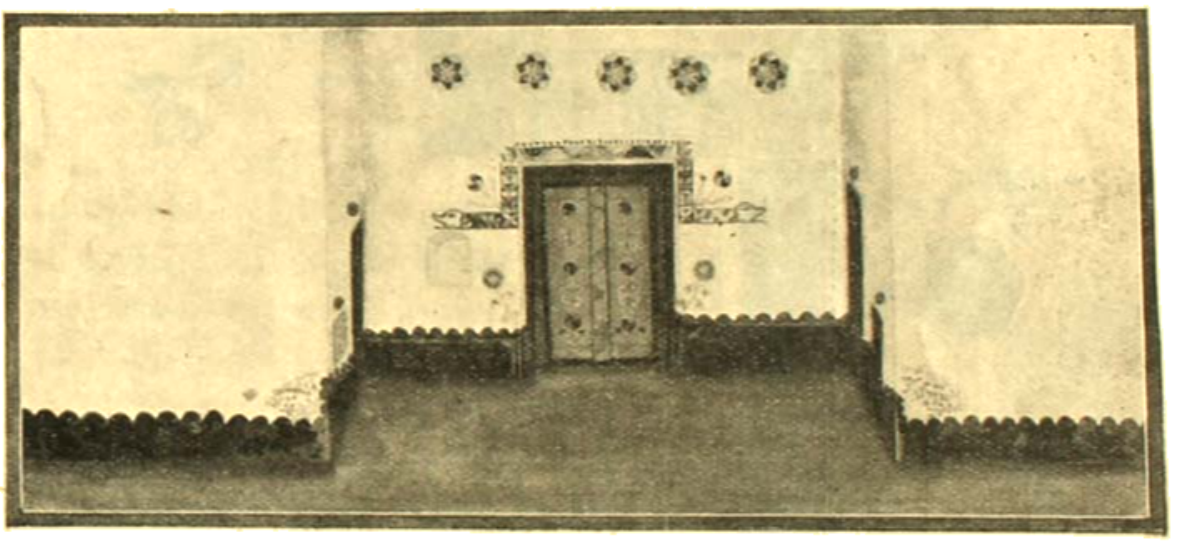

আল্‌পনা—গৃহের অলঙ্কার

(শ্রী অমলা দেবী অঙ্কিত)

আড়ম্বরহীন সহজ সরল অথচ মাধুর্য্যময় লীলায়িত রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশময় এই যে অনুপম রূপাবলী —এগুলি যাদের মনের পরিকল্পনা ও যাদের হাতের তুলির সৃষ্টি, তাদের মন নিশ্চয়ই "লাবণ্য বাটিয়া" গড়া তাতে সন্দেহ নেই ; নইলে এরূপ অপরূপ সহজ ও সুন্দর রসে-ভরপুর রূপসৃষ্টি অসম্ভব হ'তো। বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসাবশিষ্ট এই যে অপরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হ'ল, এতে জীবন ধন্য মনে কর্‌লাম।

দেয়ালে রঙীন প্রাচীরচিত্র আঁকার এই যে প্রথা, এটা মাটিতে ও পিঁড়িতে আল্‌পনা আঁকার প্রথা হ'তে অনেকটা

পৃথক ; কারণ আল্‌পনা সাধারণতঃ আঁকা হয় চালের পিঠুলি দিয়ে এবং মেয়েরা হাতের আঙ্গুল দিয়ে সেই পিঠুলি নানাপ্রকার নমুনায় এঁকে থাকেন, তাতে কোন তুলির দরকার হয় না কিন্তু এই প্রাচীরচিত্র আঁকার প্রথা অন্যরূপ। এতে তুলি ব্যবহার করতে হয়, এবং এতে একাধিক প্রাথমিক রঙের অর্থাৎ কাল, সাদা, সবুজ, লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদির ব্যবহার হয়। ইংরাজীতে যাকে Tempera painting বলে, এই প্রথাটি ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ রংগুলিকে জলে মিশিয়ে পাতলা করে' তুলি দিয়ে দেয়ালে লাগাতে হয়। মাটির দেয়ালে এইরূপ নানারঙের

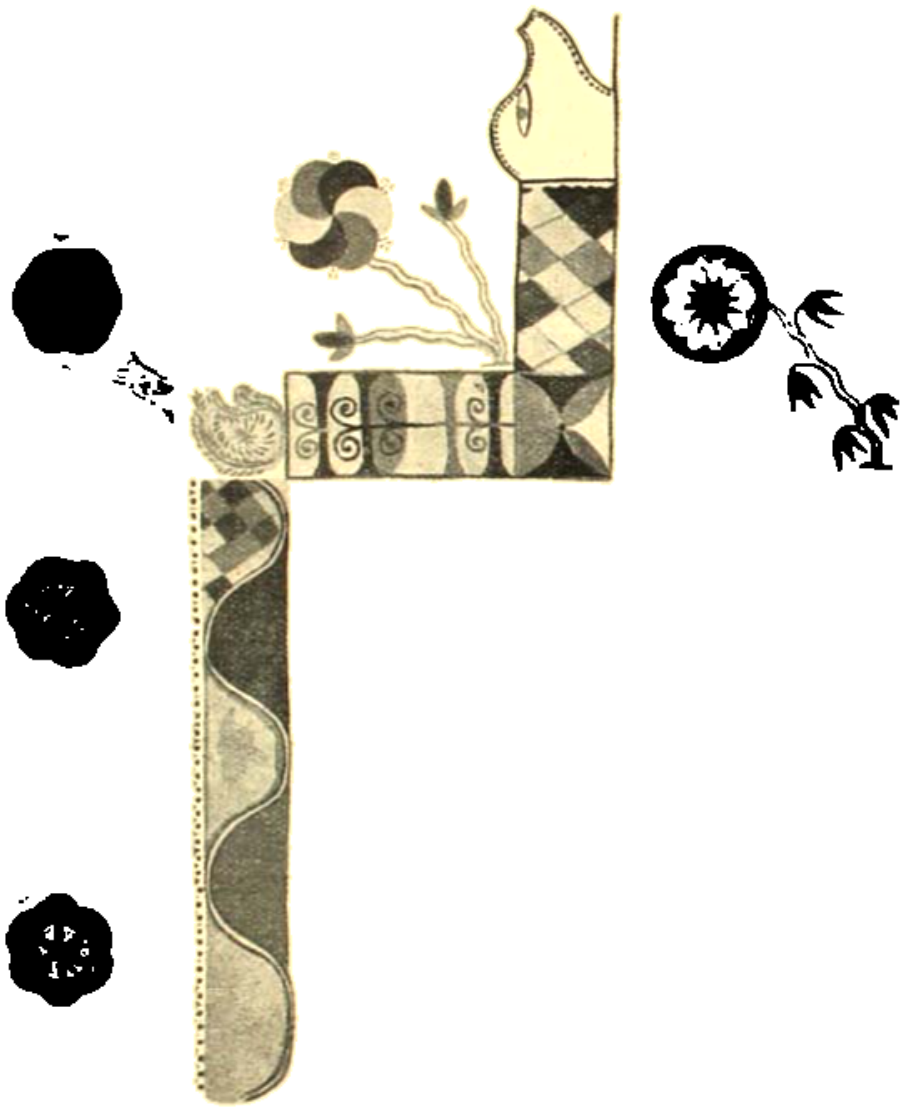

দুয়ারের মাথার আল্‌পনা

(শ্রী অপর্ণা দেবী অঙ্কিত)

পরিকল্পনা বড়ই সুন্দর দেখায় এবং গ্রামটিকে যেন একটা নন্দনলোক অথবা একটা জীবন্ত অজন্তার মত করে' তোলে। এই সাদোড়া গ্রামটির ঘরে ঘরে প্রাচীরচিত্রের সৌন্দর্য্যে আমার বাস্তবিকই একে একটি জীবন্ত অজন্তা বলে' মনে হয়েছিল। প্রতি বৎসর লক্ষ্মী-পূজার সময় মেয়েরা প্রত্যেক বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে নানাপ্রকার পদ্ম ও অন্যান্য চিত্র এঁকে বাড়ীগুলিকে সৌন্দর্য্যের আধার করে' রাখেন। গ্রামের পুরুষরা কিন্তু এগুলির দিকে বিশেষ নজর দেন না। পুরুষরা আধুনিক শিক্ষার একটুকু ছোঁয়াচ্ পেয়েছেন বলেই এই সকল প্রথাকে

মেয়েদের একটা কুসংস্কার-মূলক অভ্যাস মাত্র মনে করে' থাকেন। তাই আমি যখন ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে আগ্রহের সহিত এগুলি দেখ্‌তে লাগ্‌লাম তখন এক দিকে পুরুষরা যেমন অবাক হ'য়ে গেলেন, তেমনি অপর দিকে মেয়েরাও আশ্চর্য্য হ'য়ে পড়্‌লেন। পুরুষরা আমাকে একটা বাতিকগ্রস্ত লোক বলেই ধরে' নিলেন; আর মেয়েরা যে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন তার কারণ, এই সব চিত্রের যে বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে' কেউ মনে করে সে ধারণা তাঁদের নিজেদেরই ছিল না। এরূপ ধারণা না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রতি বৎসর তাঁদের এই আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি রক্ষণ করে' আস্‌ছেন। দেখ্‌লাম কেবল বাড়ীর বাইরের দেয়ালে নয় ধানের মরাইএর দেয়ালেও চিত্র আঁকা হয়েছে, আর ঘরের ভিতরে দেয়ালে বড় বড় এক একটি চমৎকার রঙীন চালচিত্র আঁকা হয়েছে।

একটি ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লাম, তাঁর ২০।২২ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা মেয়ে অপর্ণা দেবী বাড়ীটাকে মেঝে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার রঙীন পরিকল্পনার চিত্রে একটা অলকাপুরী করে' রেখেছেন। মাটির দেয়াল, কাঠের দোর, ধানের মরাই, কোনটাই বাদ যায় নি, চৌদোলান জলের পরিকল্পনা, পদ্মের ও লতাপাতার পরিকল্পনা, মকরের মুখের পরিকল্পনা ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিকল্পনার মৌলিকতাময় চিত্রে সমস্ত বাড়ীটি ভরা। স্থাপত্যের সঙ্গে চিত্রের এই চূড়ান্ত সমাবেশ দেখে মুগ্ধ ও অবাক হ'লাম। ধানের মরাইএর দেয়ালে দেখ্‌লাম মেয়েরা সাধারণতঃ এঁকে থাকেন লক্ষ্মীর পেঁচার পরিকল্পনা। এর একটা ভারি মানে আছে। পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন; তাই মরাইএর দেয়ালে পেঁচার পরিকল্পনা আঁকাতে লক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয়। আবার পেঁচা যে লক্ষ্মীর বাহন তারও একটা বিশেষ অর্থ আছে। ধানের মরাইতে যে সব ইঁদুর ইত্যাদি জীবগণ উপদ্রব করতে আসে, পেঁচা তাদের শত্রু স্বরূপ তাদের ধ্বংস করে এবং মরাই রক্ষণ করে। সুতরাং পেঁচার যেমন লক্ষ্মীর বাহন হওয়াতে সার্থকতা আছে, তেমনি মরাইএর দেয়ালে পেঁচার পরিকল্পনা আঁকাতেও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। দেখ্‌লাম প্রত্যেক বাড়ীতেই মেয়েরা এটাকে একটা পরম্পরাগত প্রথার মত পালন করে' আস্‌ছেন।

লীলায়িত রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশের অপূর্ব্ব বিন্যাসে সমস্ত বাড়ীটা যেন ঝক্‌ঝক্ করছে এবং একটা অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও পবিত্রতার ভাবে মাখা হ'য়ে রয়েছে। অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু পল্লীর মেয়েদের আত্মার নির্ম্মলতার সহজ

আল্‌পনা—শতদল-পদ্ম

(শ্রী অপর্ণা দেবী অঙ্কিত)

ভাবের এবং সৌন্দর্য্য-অনুভূতির ও সৌন্দর্য্য-অভিব্যক্তির এমন সুমধুর মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখি নি।

আর একটি বাড়ীতে গেলাম। সেখানে ব্রজগোপী দেবী নাম্নী একটি ৩২ বৎসর বয়স্কা রমণী বাড়ীর বাইরের ও ভিতরের দেয়ালগুলি নানাপ্রকার সুন্দর প্রাচীরচিত্রে শোভিত করে' রেখেছেন। কদম গাছের ডালে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, গাছে কদম ফুল ফুটে রয়েছে। নীচের রাস্তা দিয়ে রাধা কলসী কাঁখে নিয়ে জল আন্‌তে

যাচ্ছেন; এমন একটি সুন্দর সহজ পবিত্র ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন যা বর্ণনার অতীত। ইনি ঘরের ভিতরকার দেয়ালে যে চালচিত্রটি এঁকে রেখেছেন সেটি শিল্পক্ষেত্রে একটি উচ্চস্থানের অধিকারী। (এই ছবিটির একটি রঙীন প্রতিরূপ আগামী সংখ্যার বঙ্গলক্ষ্মীর প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া হবে।) নীচে জলের পরিকল্পনা; দু' দিকে দুটি মকরের মাথা। কেন্দ্রস্থলের নীচে একটি লীলায়িত পাপড়িওয়ালা পদ্মের মৌলিক পরিকল্পনা; তার উপরে একটি সিংহাসনে লক্ষ্মী ও নারায়ণের অতি সুন্দর পরিকল্পনা। দুই দিকে দুটি লক্ষ্মীর পেঁচা। এই পেঁচাগুলির চিত্র রস-সম্পদে ভরপুর। পেঁচাদুটির আশে পাশে ফুলফল-পূর্ণ বাগানের পরিকল্পনা এবং উপরে ও নীচে ধানের শীষের অতি সুন্দর মৌলিক পরিকল্পনা রয়েছে। ফুল লতাপাতার বিচিত্র পরিকল্পনার সমাবেশে এই চালচিত্রটি একটি অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করেছে। বাংলার পল্লীর লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সরল ও নির্মলপ্রাণ মেয়ে ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশের মেয়েদের দ্বারা যে এ পরিকল্পনা সম্ভব হ'ত তা স্থির নিশ্চয়।

রামনগর গ্রামের প্রবোধিনী দেবী নাম্নী একটি ৪২ বৎসরের বিধবা ব্রাহ্মণমহিলা তাঁর বাড়ীর ঘরের ভিতরে যে একটি চালচিত্র এঁকে রেখেছেন সেটি উপরোক্ত চালচিত্র হ'তে একটি বিভিন্ন প্রণালীর শিল্প। অতি অপরূপ রসে ও সৌন্দর্য্যে ভরপুর। (এই চালচিত্রটির একটি প্রতিরূপ এই সংখ্যার বঙ্গলক্ষ্মীর প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল।) এর নীচের দিকে মর্ত্যলোকের পরিকল্পনা এবং উপরের দিকে স্বর্গলোকের পরিকল্পনা। মর্ত্যলোকে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও তাঁদের তিন-জন সহচর, বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই পাঁচটি মহাপুরুষের অথবা "পঞ্চতত্ত্বের" চিত্র আঁকা হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই দুই হাত তুলে' ভক্তিরসে গদগদ হ'য়ে কীর্ত্তন নৃত্য করছেন। প্রত্যেকের পায়ের নীচে এক একটা পদ্মের পরিকল্পনা রয়েছে। দুই পাশে দুইটি বৈষ্ণবের চিত্র। উপরে স্বর্গলোকের মাঝখানে বিষ্ণু, তাঁর দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইটি পরিচারিকা চামর দিয়ে এঁদের বীজন করছেন। তাঁদের এক পাশে গণেশ ও শিব এবং অপর দিকে ব্রহ্মা ও নারদ। বিষ্ণুর নীচে তাঁর বাহন গরুড়, লক্ষ্মীর নীচে তাঁর বাহন পেঁচা এবং সরস্বতীর নীচে তাঁর বাহন হংস। একটা পবিত্রতাময় গার্হস্থ্য-রসে এই চিত্রটি ভরপুর। চালচিত্রের উপরে পদ্মের ও লতার দুইটি চমৎকার সারি রয়েছে—একটি হলদে ও একটি লাল। শিল্পচাতুর্য্যে এই দুটি চালচিত্র পেশাদার শিল্পীদের ঈর্ষার উদ্রেক করবে। কিন্তু এত অল্প চেষ্টায় এবং এত অবলীলাক্রমে এত সহজ সরল ও পবিত্র ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন এবং তাকে এত মাধুর্য্যরসে মাখিয়ে দিতে পারেন এ রকম সাধ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেরই যে নেই তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এক দিকে যেমন লীলায়িত রেখা আঁকবার চমৎকার কৌশল, অপর দিকে আবার মনোমুগ্ধকর বর্ণবিন্যাসের অপূর্ব্ব শক্তি, এই দুইটির সমাবেশে এই সকল প্রাচীরচিত্র-গুলি রসকলাক্ষেত্রে যে একটি অতি উচ্চ আসনের অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সকল মেয়েরা কারো কাছে চিত্রশিক্ষা লাভ করেন নি। তাঁরা শুধু মা, দিদিমা ও পাড়াপড়শী মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষানুক্রমিক পরম্পরায় ধারা অভ্যাস করে' আসছেন। এক সময়ে পশ্চিম-বাংলার ঘরে ঘরে এ রকম অনিন্দ্যসুন্দর রঙীন প্রাচীরচিত্রের ছড়াছড়ি ছিল। যেখানে রেল লাইন গিয়েছে, যেখানে সহর হয়েছে, যেখানে হাই স্কুল হয়েছে ও ব্যবসার আড়ত হয়েছে, সেখানে এই প্রথা ধ্বংস হয়েছে। সেখানকার মেয়েরা পুরুষদের মতন বাবু বনে' আজকালকার সহুরে সৌখিন বিলাস-শিল্প ব্যবহার ও শিক্ষা অভ্যাস করছেন। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি-মূলক এই যে পুরুষানুক্রমিক রসাভিব্যক্তির শক্তি এখনও দুই একটা গ্রামে অবশিষ্ট রয়েছে, তা এই সকল সহুরে ও অর্দ্ধসহুরে মেয়েরা হারিয়ে ফেলেছেন; এবং আমাদের এই মূঢ়তা যদি অবিলম্বে বিনাশ না হয়, তাহ'লে এখনও যা অল্প কিছু অবশিষ্ট আছে তাও দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। পল্লীর নিরক্ষর মেয়েদের হাতের কাজগুলি যে আমাদের শিক্ষিত সমাজ অবজ্ঞার চক্ষে দেখে থাকেন, এ-ই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার মূঢ়তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ এই যে, সহজ রেখা ও বর্ণের সমাবেশময় রসব্যঞ্জনায় ভরপুর বিশুদ্ধ চিত্রশিল্পের এই যে ধারা বাংলার

গ্রামে নিরক্ষর মেয়েরা ও বিশ্বকর্মার বংশধর বাংলার অবজ্ঞাত পটুয়াগণ যুগের পর যুগ চর্চ্চা করে' এখনও কিকিৎ রক্ষা করে' রাখ্‌তে সমর্থ হয়েছে, এ-ই চিত্র-রসকলায় বাঙ্গালীর মাতৃভাষাস্বরূপ; এবং বিদেশী শিল্প-কলার কথা বুঝে থাক্, অজন্তা, রাজপুত ও মোগল শিল্পের গর্ব্বিত প্রণালী হ'তেও আমাদের প্রাচীন বাংলার এই সহজ সরল আধ্যাত্মিকতাময় ও রসব্যঞ্জনাময় চিত্রধারা যে আরও অধিক উচ্চাঙ্গের রসকলা সেটা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের শিক্ষিত সমাজ একদিন বুঝ্‌তে পার্‌বে। আমাদের দেশের সহরে শিল্পীরা এখনও বাইরের রং-এর আড়ম্বরের চর্চ্চায় মত্ত। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের রূপকল্পনার বিলাসিতায় ঝোঁকে গা ঢেলে দিয়ে তাঁরা আধ্যাত্মিক রসব্যঞ্জনার সহজ সরল শক্তি ভুলে গিয়েছেন। পাশ্চাত্য জগতে যাঁরা আজকাল অগ্রণী চিত্রশিল্পী, তাঁরা এটা বুঝ্‌তে পেরেছেন যে বাহ্যিক রংচংএর ও রূপলাবণ্য-বাহুল্যের সমাবেশে চিত্রশিল্পের রসব্যঞ্জনা-শক্তি বিনষ্ট হয়। তাঁরা আজ বাইরের চাক-চিক্য ছেড়ে দিয়ে যে ধারা ধর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন, বাংলার মেয়েরা তাদের আল্‌পনা ও প্রাচীরচিত্রের এবং পল্লীগ্রামের দীন-দুঃখী পটুয়ারা তাদের জড়ানো পটে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা ইত্যাদির চিত্রাবলীতে সেই অনাবিল চিত্রধারারই চর্চ্চা যুগের পর যুগ করে' আস্‌ছে। ভগবান্ করুন, আমাদের আধুনিক শিক্ষার মূঢ়তার ফলে এগুলি সম্পূর্ণ লোপ পাবার আগে যেন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও আমাদের সহরে শিল্পীগণ আমাদের এই জাতীয় চিত্রশিল্পের অমূল্য গুণ চিন্‌বার শক্তিলাভ করেন এবং এই ধারার বহুব্যাপক চর্চ্চা করে' আমরা যেন আবার বাংলাদেশকে রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির শক্তিতে অনুপ্রাণিত করে' ঘরে ঘরে নর-নারীর চরিত্রকে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যরসের সহজ অনুভূতিতে মার্জ্জিত, পবিত্র ও আনন্দময় করে' তুল্‌তে পারি।

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী কামিনী রায় বি-এ

বেহার হইতে বেরার প্রদেশে আকোলায় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল। সেখানে নূতন হাসপাতাল নির্ম্মিত হইবে; তাহার দ্বারা কিরূপ ব্যবস্থা তিনিই নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার উপরে সমুদয় পরিদর্শনের ভার পড়িয়াছিল। আকোলায় তিনি স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে কাজ করিতেছিলেন, স্থানীয় কমিটীর সকলে তাঁহার কার্য্যে প্রীত এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এইখানে কাজ করিবার পর আমার কন্যা বুলবুলের পীড়া যখন গুরুতর হইয়া উঠিল, তখন তাহার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য করিবার জন্য যামিনী ছয় মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতা আসিলেন। আকোলায় তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতে লোক পাওয়া কঠিন হইল। নানা কারণে স্থানটি ইংরাজ ডাক্তারের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় ছিল। বিশেষ সেখানে বাহিরের প্রাক্‌টিস বেশী হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আয়াদ্যাদি ছিল দুর্ম্মূল্য। এই অবস্থায় ডাকরিণ সেণ্ট্রাল কমিটীর অনারারী সেক্রেটারী তাঁহাকে অবিলম্বে আকোলায় ফিরিয়া যাইতে লিখিলেন। যামিনী উত্তরে লিখিলেন—"আমার বোনঝিটির জীবনের মাত্র কয়েকটি দিন বাকী, সে আমাকে কাছে চাহে, আমি এ সময়ে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।" ইহার উপরে উক্ত সেক্রেটারী মহাশয়া লিখিলেন—"আমাদের নিজের স্বার্থ দেখিলে চলিবে না। এই রকম ব্যবহারের জন্য Women's Medical Serviceএর নিন্দা হইতেছে।" যামিনী প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"তুমি আমার কাজের সম্বন্ধে কি জান, যে লিখিতেছ যে আমার কাজের দ্বারা W.M.S.-

এর নিন্দা হইতেছে? তোমার এ রকম উক্তি করিবার কোন কারণ নাই। সে যাহা হউক, আমার এই পত্রই তুমি আমার পদত্যাগ-পত্রস্বরূপে গ্রহণ করিবে।"—৪০৲ টাকা বেতনের চাকরী—বৎসর বৎসর বৃদ্ধির কথা—একটা কথায় ছাড়িয়া দিলেন। আকোলার স্থানীয় কমিটী সংবাদ পাইয়া সেণ্ট্রাল কমিটীকে লম্বর লিখিয়া পাঠাইলেন, "ডাক্তার সেন ৬ দিন ছুটী চাহিয়াছেন, আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিব। কিন্তু তিনি যেন আমাদের না ছাড়েন।" যামিনী পদত্যাগ করেন সেণ্ট্রাল কমিটীরও সে ইচ্ছা ছিল না, তবে তিনি যে এতটা তেজ প্রকাশ করেন তাহাও তাঁহাদের ভাল লাগে নাই। স্বেচ্ছাসেবী সম্পাদিকার প্রতি তাঁহার চিঠিখানা কিছু অবিনীতভাবের পরিচয় দিয়াছে বলিয়া, তাঁহারা বলিলেন, ডাঃ সেন চিঠির জন্য ক্ষমা চাহিলেই তিনি থাকিয়া যেতে পারেন। যামিনী বলিলেন, "ক্ষমা চাহিবার মত কাজ আমি করি নাই, সেক্রেটারীরই আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।" তাঁহার অতীত কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করা হইল।

স্নেহের ভাগিনেয়ীর প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল, তিনি মুক্ত হইলেন।

বেতিয়ার এক হিন্দু মজুরণী হাসপাতালে আসিয়া কয়েক দিন পরে মারা যায়। তাহার দ্বাদশ বর্ষীয় এক পুত্র কোথায় যাইবে? যামিনী তাহাকে বালক ভৃত্য রূপে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। এক মুসলমানী ঐরূপ মরিয়া গেলে তাহার সপ্তম বর্ষীয় কন্যার পালন ও রক্ষণের ভারও লইয়াছিলেন। আকোলার হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ দুইটি মাতৃপরিত্যক্ত শিশু কন্যাকে ১০।১২ দিন বয়স হইতে তিনি নিজের গৃহে রাখিয়া মিসেস গুপ্তের সাহায্যে পালন করিতেছিলেন। স্বজনমধ্যে তাহাদের অনাদর হয়, বা কেহ তাহাদের দুর্ভার মনে করে, সেই জন্য এই বালক-বালিকা ও ৯ মাস বয়সের শিশুদ্বয় লইয়া পুরীতে চলিলেন। সেখানে ইতিপূর্ব্বেই 'বিশ্রামকুটীর' নামে একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এইগুলিকে লইয়া তিনি তথায় সংসার পাতিলেন।

তাঁহার শিশুবাৎসল্যের কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এক সময়ে আমি আমার স্বামীর পূর্ব্ব পক্ষের একটি পুত্রের পীড়ার মধ্যে নিজের আট নয় মাসের শিশুপুত্র অশোককে ভাল করিয়া দেখাশুনা করিতে পারিব না, এই আশঙ্কায়, যামিনীর কাছে রাখিয়াছিলাম, বলিয়াও ছিলাম —"এ ছেলে তোমারই হউক।" যামিনী তখন কলিকাতায় প্রাক্টিস্ করিতেছিলেন। বাহিরের কাজ সত্ত্বেও শিশুকে অপূর্ব্ব যত্নে নিজের কাছে রাখিয়া কিছুকাল লালন-পালন করিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় শিশুর পিতার অভিমত নাই জানিয়া যামিনীকে একদিন বলিলাম, বেশী মায়ায় জড়িত হইও না, পরের ছেলে, পরভৃৎ কোকিল-বাচ্চার মত। পাখা হইলেই নিজের দলে উড়িয়া আসিবে। এই কথায় তাঁহার কত ব্যথা লাগিয়াছিল, তাহা তাঁহার কলিকাতা ছাড়িয়া সোলাপুর চাকরী লইবার সময় জানিয়াছিলাম। যামিনী যেমন শিশুদের ভালবাসিতেন, শিশুরাও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইত। ভ্রাতা নিশীথচন্দ্রের প্রথম পুত্রটিও তিন বৎসর বয়সে তাহার মেজো পিসীমার সঙ্গে সিমলা চলিয়া গিয়াছিল, এবং স্নেহ-যত্নে পালিত হইতেছিল। কিন্তু তাহার মাতা সন্তানের অদর্শনে একান্ত অধীর হওয়াতে শিশুর অনিচ্ছাক্রমেই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইল। এই সকল ঘটনা হইতে যামিনীর মনে ধারণা হইয়াছিল যে, তাই কি ভগিনীর সন্তান সম্পূর্ণ আপনার হয় না; যাহাকে দাবী করিবার কেহ নাই, এমন কোন শিশুকে আপনার করিয়া এবং আপনার মনের মত করিয়া গড়িতে হইবে। হায়! সে আশাও ব্যর্থ জানিয়া গিয়াছেন, তবু স্নেহের এবং চেষ্টার অভাব ছিল না। পালিত সন্তানগুলির সুখ ও সুশিক্ষার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি বলদেওদাস-মাতৃ-ভবনের একটি মাতৃপরিত্যক্ত শিশু পুত্রকেও সন্তাননির্ব্বিশেষে পালন করিতেছিলেন। শেষ পীড়ার আরম্ভে, মিসেস গুপ্ত কলিকাতা থাকাতে, জয় লইয়া শিশুর পরিচর্য্যা করিয়াছেন। তাই এক এক সময়ে মনে হইয়াছে, অদৃষ্ট ইঁহাকে মাতা হইবার সুযোগ দেয় নাই বলিয়াই কি প্রকৃতি এই প্রতিশোধ লইতেছে? নিজেরা মাতা হইয়া যাহা করিতে পারি নাই, এই চিরকুমারী কিরূপে তাহা পারিতেছেন?

পিতামাতা, ভাইবহিনী এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও তো ভক্তি, প্রীতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কোন ত্রুটি কোন দিন দেখি নাই। ভ্রাতা ভবতারণমোহন হঠাৎ হইলে দণ্ডায়মান তাহাকে ও মাতৃদেবীকে নেপালে নিজের কাছে লইয়া গিয়া কত সেবাই না করিয়াছিলেন! অন্যের জন্য যখন প্রাণপণ খাটিয়াছেন, তখন মনে মনে বলিয়াছেন, "ভগবান, আমি এত লোকের জন্য এত খাটিতেছি, আমার ভাইটিকে তুমি বাঁচাইবে না?"

ভ্রাতার মৃত্যুর চারিমাস পরে পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক সংবাদ পাইয়াই নেপাল হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। যথেষ্ট সেবার সুযোগ পাইলেন না বলিয়া চিরকাল মনে দুঃখ ছিল। ইহার সাত বৎসর পরে যখন মাতৃদেবীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, যামিনী তখন সিমলায়। হঠাৎ সংবাদ পাইয়া অভিভূত হইবেন ভয়ে, তাঁহাকে টেলিগ্রামে মাতার পীড়ার অবস্থা বলা হয়, এবং কোন আত্মীয়াকে টেলিগ্রামে সত্য ঘটনা জানাইয়া অনুরোধ করা হয়, যেন তিনি নিজে গিয়া ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ করেন। কিন্তু যামিনী টেলিগ্রাম পাইবামাত্র সিবিল সার্জ্জনকে চিঠি লিখিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রেলযোগে গিয়া ট্রেণ ধরিলেন। সেটা কলিকাতা আসিবার ট্রেণ ছিল না। মাঝ-পথে নামিয়া অন্য গাড়ী ধরিয়া তিনি যে সময়ে কলিকাতা পৌঁছিলেন, সে সময়ে আসিয়া পড়িবেন, কেহ এমন কল্পনাও করেন নাই। তাঁহাকে যে ঘটনার কথা লেখা হইয়াছিল তাহাতে রোগীকে কখনো কখনো ৬৮ ঘণ্টা বাঁচিতে দেখা যায়। তাই প্রাণপণ করিয়া ১৮ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু আসিয়া মাকে দেখিতে পাইলেন না। সে দুঃখ চিরদিন তাঁহার ছিল। পরিবারের যে কোন ব্যক্তিরই হউক, রোগের সংবাদ পাইলে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারিতেন না। বাহির হইতেও যে কোন রোগীর জন্য যখন ডাক আসিত, আহার, নিদ্রা, পরিশ্রম অগ্রাহ্য করিয়া তাহার কাছে ছুটিতেন।

Women's Medical Service ছাড়িবার পর চিকিৎসাবিদ্যায় আরও নূতন তথ্য ও দক্ষতা লাভ করিবার জন্য ১৯২১ সনে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন। এইবার কেম্ব্রিজ হইতে Public Health সম্বন্ধে পরীক্ষা দিয়া ডিপ্লোমা লইয়া এবং লণ্ডন School of Tropical Medicine হইতে certificate লইয়া ১৯২৩সনের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে যখন দেশে ফিরিলেন, তখন Buldeodas Maternity Homeএর বাড়ী নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে গবর্ণর-পত্নী দ্বারা দ্বারোদ্ঘাটন হইবে, কিন্তু কে যে তৎপূর্ব্বে তাহাতে ভিতরকার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া তাহা দর্শনীয় করে, তাহা তখনও অনির্দ্দিষ্ট। এই অবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর ডাক্তার চরিধন দত্ত যামিনীকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। রায় বাহাদুর মেডিকেল কলেজে যামিনীর সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলিলেন, মিস সেনের গুণোচিত বেতন কর্পোরেশন দিতে পারিবে না, কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানের সূচনায় অর্থের দিকে না চাহিয়া, তিনি উহার ভিত্তি পত্তন করিয়া দিন। এই অনুরোধে তিনি অস্থায়ী ভাবে বলদেওদাস-প্রসূতি-নিকেতনের ভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মাস দুই পরেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মেয়র হইলেন এবং তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তিনি স্থায়ী ভাবেই রহিয়া গেলেন। বেতন তাঁহার দাবীর উপযুক্ত না হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল।

এই প্রতিষ্ঠা-টি তাঁহার হাতে গড়া জিনিষ। ইহার জন্য তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রসূতিদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা প্রধান কাজ হইলেও প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনের দায়িত্ব সম্পূর্ণতঃ তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। সে দায়িত্ব অতি সুন্দর ভাবে পালন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ক্লাস করিয়া বাচনিক শিক্ষা ও সঙ্গে রাখিয়া হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া, Nurse প্রস্তুত করাও তাঁহার আর এক কাজ ছিল। তিনি কয়েকটি সুনিপুণা সেবিকা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সেবিকার সংখ্যা কম, প্রসূতি ও প্রসূতের সংখ্যা তদনুপাতে বহুগুণ অধিক হইলেও, তিনি নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরিদর্শন-গুণে এই মাতৃভবনকে সুশৃঙ্খলা, যাতায়াত ও আরামের স্থান করিয়া তুলিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ইহার প্রতিপত্তি এমন বিস্তৃত হইল, যে, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতেও আত্ম-সম্ভানবতীরা এখানে আসিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে মনে করা গিয়াছিল

যে কেবল নিম্নশ্রেণীর এবং দরিদ্র পরিবারের নারীরাই এখানে আসিবে, কিন্তু দেখা গেল ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া ভদ্র মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের মহিলারা কঠিন কঠিন "কেস্" লইয়াও অসঙ্কোচে এখানে আশ্রয় লইতেন। ইহাতে এক সময়ে যে আর একদিকে এই প্রসূতি-নিকেতনের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয় নাই, তাহাও নহে। এত এত কঠিন abnormal case এখানে আসিবে এবং সহজে বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইয়া যাইবে, এমন ধারণা বঙ্গদেওদার-মাতৃভবনের প্রতিষ্ঠাতাদের ছিল না। যাঁহাদের বিশেষ চেষ্টায় ও ব্যক্তিগত প্রভাবে এই ভবনের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রধানতম এক প্রাচীন চিকিৎসক মহোদয়কে বলিতে শোনা গিয়াছে—"যদি জানিতাম এই Maternity Home করিলে ডাক্তারদের কড়ি মারা যাইবে তবে কি এমন কাজ করিতাম।" এখানে দরিদ্র নারীরা আসিবে, যাহাকে স্বাভাবিক কেস্ (normal case) বলে, তাহাই আসিবে; কেবী বেতনে খুব উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসক থাকেন ও নিপুণ চিকিৎসা হয়, অনেকের কাছেই তাহা অনাবশ্যক মনে হইয়াছে। সে যাহা হউক, এখানে যে সকল ভদ্রমহিলা আসিয়াছেন তাঁহারা ডাক্তার মিস সেনের সদয় ব্যবহার, কোমল হাতের সেবা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

আপনাকে বাঁচাইয়া কাজ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আবার তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুই একবার অল্প দিনের ছুটীতে উপকার হইতেছে না দেখিয়া, কর্ম্ম ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দীর্ঘ ছুটী লইলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, এবং পুরীতে বাস করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া পুরীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ সেনাপতি ও প্রবীণ কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু পুরীর হাসপাতালের নারী বিভাগের ভার গ্রহণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন পুরীর হাসপাতালে তাঁহাকে কলিকাতার মত অধিকতর পরিশ্রম করিতে হইবে না। এই আশ্বাস পাইয়া তিনি পুরী হাসপাতালের নারী বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই মিঃ সেনাপতি মহাশয় বদলী হইয়া গেলেন। তখন নারী হাসপাতাল সম্বন্ধে সহানুভূতিকারী কেহ রহিল না। ডাক্তারের বাসগৃহের চারিদিক অপরিচ্ছন্ন, একদিকে বাঁশবন। বায়ুর অভাব ও মশকের উৎপাতে রাত্রে তাঁহার নিদ্রা অসম্ভব হইল। তদ্ভিন্ন হাসপাতালের অবস্থা সম্বন্ধে উপরিতন ব্যক্তিদের ঔদাসীন্য ও নানা প্রকার অব্যবস্থা দেখিয়া তিনি বড় দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিলেন। যেন তেন প্রকারেণ কাজ সারা ও মাসান্তে বেতন গুণিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল, প্রত্যেকটি রোগীর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করিতেন। চিকিৎসকের কাজ একটি পবিত্র ব্রত বলিয়া তিনি অনুভব করিতেন। যাহা ভাল করিয়া করিতে পারিবেন না, নামরক্ষার জন্য তাহা করিতেন না; সেই জন্যই ও কাজে থাকিতে পারিলেন না। এ দিকে কলিকাতার "মেটারনিটি হোম" হইতে নানা বিশৃঙ্খলা ও রোগিণীদের কষ্টের সংবাদ তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার অধীনে কাজ করিতেন, তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও পূর্ব্বভার পুনরায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই গুরুতর পরিশ্রম আর কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না। তিনি ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আসন্ন বিচ্ছেদকাতর মেটারনিটি হোমের কর্ম্মিগণ তাঁহাকে যে বিদায় অভিনন্দন দিয়াছিলেন তাহার শেষ কথা কয়েকটি এই—"আপনার নিকট আমরা আর কোনও আশির্ব্বাদ কামনা করি না,—শুধু এইটুকু, যেন আমরা আপনার ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, আপনার সদাশ অনুসরণ ক'রে বল হ'তে পারি।"

বিশ্রামের জন্য আবার পুরী আসিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রাম লেখেন নাই। আবার পুরীর হাসপাতালের জন্য আহ্বান আসিল। নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার খ্যাভেনির বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে, নিজ ভবনে থাকিয়া দুই বেলা আসিয়া হাসপাতালের কাজ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবারও ইচ্ছামত হাসপাতালের উন্নতি করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং পরিশ্রমও যথেষ্ট

করিতে হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডাদের পত্নীরা হাসপাতালে আসিতেন না; যামিনীর চিকিৎসার খ্যাতিতে এখন কোন কোন পাণ্ডা পত্নী ও সম্পর্কিত মহিলাদের হাসপাতালে পাঠাইতে লাগিলেন। বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়েরাও আসিতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর যখন একান্ত অপটু হইয়া পড়িল, তখন বহু অনুরোধ সত্ত্বেও গত অক্টোবর মাসে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর হইতেই বিশ্রাম সত্ত্বেও আর আরাম লাভ হইল না। গত ১১ই ডিসেম্বর মাসে অত্যাক্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে কলিকাতা আনা হয়।

যিনি বহুলোকের রোগের উপশম করিয়াছেন, নিজ জীবনের শেষ কয়েক দিন অতি নীরবে দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৭ই মাঘ, ইংরাজি ১৯০২ সনের ২ শে জানুয়ারী শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজন এবং সকল পরিচিতজনের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি লইয়া অমর-লোকে প্রস্থান করিলেন।

এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছি তাহা দ্বারা তাঁহার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকিতে পারি নাই জানি। তাঁহার মহনীয় নারীত্বের সব দিক দেখান আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহার কর্ম্মজীবনের অনেক কথা আমার অপরিজ্ঞাত।

রোগের সময় আত্মীয়-স্বজনের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন বলিলেই পারিবারিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি আরও কিছু করিয়াছেন। আমি, যামিনী ও প্রেমকুসুম তিনজনই অন্য ভাইবোনদের অগ্রজা। পিতামাতা পুত্রের সমান যত্নে কিংবা অধিকতর যত্নে আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন, তাই আমাদেরও সংকল্প ছিল অন্য লোকের পুত্রেরা যাহা করে আমরা তাহা করিব। বৃদ্ধ পিতামাতাকে বিশ্রাম দিয়া কনিষ্ঠ ভাইবোনের শিক্ষার ভার আমরা বহন করিব। ঘটনাচক্রে আমি ও প্রেমকুসুম তাহা করিতে পারি নাই। যামিনীর দ্বারা এই কর্ত্তব্য পূর্ণ মাত্রায় সাধিত হইয়াছে। বিলাতে যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্তই পরিবারের কল্যাণে ব্যয় হইয়াছে। যখন ব্রজেন্দ্রমোহন চৌরঙ্গীতে দোকান দিলেন এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা বিলাতে গেলেন, তখন নিজের জন্য মাসে ২৫৲ টাকা মাত্র রাখিয়া সমুদয় অর্জ্জন বাড়ী পাঠাইতেন। দুই কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের ব্যয়ও তিনিই বহন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিলাতের শিক্ষার ব্যয়ও তিনিই দিয়াছেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও ভাইদের জন্মদিনে তাহাদের বস্ত্রাদি দিতেন, পরিবারের অন্য সকলের জন্মদিনেও উপহার দিতেন। সকলকে নিজের হাতে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। তিনি ভাল রাঁধিতে ও জলখাবার প্রস্তুত করিতে পারিতেন। মেসাল ছাড়িবার পর, একবার কলিকাতার বাড়ীতে যখন পাচক ছিল না, বা অসুস্থ ছিল, একাধিক্রমে বহুদিন যামিনীকে বাড়ীর সকলের জন্য একতালার পূবের বারান্দায় বসিয়া রাঁধিতে দেখিয়াছি। সব ভাইবোন সেখানে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে নানারকম গল্প জুড়িয়া দিত, বসিবার ঘর খালি থাকিত। যখন ম্যাটার্নিটি গোবে থাকিতেন, সেখানে কতবার সকলকে আহারে এবং চায়ে নিমন্ত্রণ করিতেন। পূর্বাহ্নে ছুটী উপলক্ষে সকলকে আসিতে অনুরোধ করিতেন। আসিলে কত সুখী হইতেন, কত যত্নে সকলকে খাওয়াইতেন। কোন কোনও nurseকেও তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আনাইতেন। এই প্রসঙ্গে nurseদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের একটা উদাহরণ মনে পড়িতেছে। একটি nurseএর Typhoid হয়। প্রসূতি ও শিশুদের কাছে তাঁহাকে যাইতেই হইত। সংক্রামক রোগের দ্বারা তাহাদের পাছে অনিষ্ট হয় সেই ভয়ে সকল সময়ে এই নার্সটির কাছে যাইতে পারিতেন না; তবু তাহার জন্য অনেক কিছু করিতেন, রাত জাগিতেন, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার অনুরোধে বড় বড় ডাক্তার আসিয়া বালিকাকে দেখিয়া যাইতেন। কিন্তু এত করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। বালিকার অকালমৃত্যুতে যামিনী অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। নিজের সম্পর্কিতের মত ব্রাহ্মমতে তাহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করাইলেন। তাহার দুইখানি বড় ছবি করাইয়া একখানি হাসপাতালে দিলেন, একখানি নিজের কাছে রাখিলেন।

তাঁহার হৃদয়খানি ছিল একটি স্নেহকরুণার নির্ঝর। তাই হাসপাতালে কোন রোগী মহিলে বড় ব্যথা পাইতেন। রোগীদের যখন হাসপাতাল হইতে দামী ঔষধ মিলিত না, নিজের ব্যয়ে তাহা কিনিয়া দিতেন। শিশু রোগীদের

কখনও ঔষধ কিনিয়া দিতেন, কখনো প্রফুল্ল রাখিবার জন্য খেলানা দিয়া আসিতেন।

বাল্য অতিক্রম করিবার পর হইতে তিনি নিজের বস্ত্রালঙ্কার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, কিন্তু অন্যথা সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। ফুল-ফলের বাগান করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার পুরীর বাগানের বালুময় ভূমিতে সবুজের প্রাচুর্য্য ও পুষ্পসম্ভার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন।

লোকে জানিতেন না যে তিনি অবসরকালে সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছেন। এক সময় আমার অনুরোধে Olive Schriener লিখিত Dreams গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পীড়ার সময় নিজের অনুবাদ লইয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। দুঃখের বিষয় কোন মাসিকের সম্পাদিকার অনবধানতায় ঐ অনুবাদগুলি হারাইয়া গিয়াছে। 'বদনেওদাস প্রভৃতি ভবনে' তিনি নার্সদের জন্য 'প্রসূতি-তত্ত্ব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

তাঁহার স্বদেশপ্রীতি এত বেশী ছিল যে উহা আমার কাছে একটু উগ্র বোধ হইত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত তর্ক করিতাম না। যাহা সরল ও অকৃত্রিম তাহা শ্রদ্ধা করিতাম। Statesman কাগজ তাঁহার অস্পৃশ্য ছিল, কারণ সে কাগজ এদেশের নিন্দা প্রচার করে।

দেশজ শিল্পদ্রব্য গ্রহণ কেবল বস্ত্র সম্বন্ধেই নয় সব বিষয়েই চেষ্টা করিতেন। কলিকাতা আসিলেই নানা দোকান খুঁজিয়া হরেকরকম দেশী দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইতেন।

এত স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম, এত জ্ঞান, এত কর্ম্মশক্তি, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার তাঁহাতে দেখি নাই। এই সুন্দর মহৎ জীবনখানি বিধাতা আরও কিছুদিন কেন সংসারে রাখিলেন না বুঝিতে পারি না। সারাজীবন বড় বেশী খাটিয়াছেন বলিয়াই বুঝি বিশ্রামের ব্যবস্থা হইল।

ভগবানের বাণী

শ্রী শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

শুনেছিলাম শ্রবণ পাতি'
শান্ত সে এক স্বর,
সবুজ তৃণের হাসির ভাষা
সিক্ত মাটির 'পর।
বল্লে তারা—"আমরা সবাই
ভগবানের বাণী…"
আপ্‌না হ'তেই নত হ'ল
আমার মাথাখানি।

সত্যি তারা বল্লে কি যে
মনের-কানের পাশে,—
উন্মুখ প্রাণ রইল জাগি'
সেই ধ্বনিটির আশে।

আশে-পাশে চতুর্দ্দিকে
পাষাণ-তৃণ-গিরি
পুলক-গানে দিল আমায়
সেই ধ্বনিটি ফিরি'।
পরাণ পুরে কাণায় কাণায়,
পূর্ণ জীবন খানি;
ছন্দে বলি—"সবাই মোরা
ভগবানের বাণী।" *

---

* James Stephens হইতে।

গাঁয়ের ছবি

(চিত্রণ

শ্রী সুনয়নী দেবী

সাত

ক্রমে কমলার বিয়ের দিন এগিয়ে এলো। শ্যামলাল বাবু বরপণ হাজার টাকা, ঘড়ী আংটি চেয়ে বসেছেন। মাধব বাবু অনেক কষ্টে ৮০০ টাকার যোগাড় করেছেন আর কোথাও টাকা পাওয়া যায় নি। পিসিমার কিছু জমান টাকা ছিল; তিনি তাই দিয়ে বরের ঘড়ী আংটি কিন্‌তে দিয়েছেন। কমলার মায়ের হার, মল আর বালা দেওয়া হবে। জ্যেঠাই-মা কমলাকে বড় ভালবাসেন, তিনি মাথার সোনার ফুল আর চিরুণী দেবেন ঠিক করেছেন। মাধব বাবু মনে করেছেন, এখন এই ৮০০ টাকা দিই পরে আর ২০০ যে করে' হয় দেব; শ্যামলাল বাবু ভদ্রলোক—বুঝিয়ে বল্লেই হবে। কিন্তু তিনি যে কি রকম কৃপণ তা জান্‌লে, অতটা ভরসা কর্‌তেন না।

যা'ই হোক্ বিয়ের সব ঠিক হয়েছে। বুধবার বিনোদ কলকাতায় যেতে চেয়েছিল কিন্তু মাধব বাবু ছাড়েন নি, বিয়ে অবধি তাকে থাকতে হয়েছে। বুধবারে বিয়ে, সেই দিনই সকালে গায়ে-হলুদ। আজ মঙ্গলবার। বাজার-হাট সব করা হ'চ্ছে; সেকরা গহনাগুলি এনেছে, মাধব বাবু সেগুলির ওজন দেখে নিচ্ছেন; রমানাথ কলকাতা থেকে আংটি আর ঘড়ি কিনে এনেছে। কমলার জন্য একখানি ফুল দেওয়া শাল বালুচরের চেলী কেনা হয়েছে।

উঠানে সামিয়ানা খাটিয়ে বরযাত্রীদের বস্‌বার জায়গা করা হয়েছে। এক দিকে রান্নার জন্য চালা বাঁধা হ'চ্ছে; গরুর গাড়ী করে' কাঠ এসেছে, কটিক দাঁড়িয়ে কাঠগুলি চালার মাথায় তুলছে; গোবিন্দ নূতন কাপড় প'রে' ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যে আস্‌ছে তাকেই বল্‌ছে, 'দিদির বিয়েতে পেয়েছি।' রমানাথ পাড়ার ছেলেদের নিয়ে কলাপাতা কাটাচ্ছে, কাল্ লোক খাবে—পাতাগুলি মুড়ে রাখ্‌তে হবে। তিনকড়ি মুটের মাথায় আলু, কুমড়া, দাউ, মোচা, শাক চালিয়ে বাজার করে' এল। রান্নার চালায় একধারে মেয়েরা বসে' আলু ছাড়াচ্ছিল; পিসিমা বল্লেন, 'ওই খানেই সব নামিয়ে দিতে বল তিনু, কতক কুটনো আজই কোটা হবে।' তিনকড়ি বুড়ি ঝুড়ি করে' সব সেইখানে ঢেলে দিয়ে মুটেকে পয়সা দিয়ে বিদায় করে' দিলে।

কমলার মা আর জ্যেঠাইমা ভাঁড়ার গোছাচ্ছেন। থামা থামা মুড়ি মুড়্‌কি বাতাসা এসে পড়েছে। জ্যেঠাইমা সেগুলি হাঁড়িতে ঢেলে সরা দিয়ে রাখ্‌ছেন। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা ভীড় করে' থামার চারধারে দাঁড়িয়ে আছে আর একটু সুবিধা পেলেই মুঠো মুঠো মুড়্‌কি নিয়ে চাবাচ্ছে। জ্যেঠাইমা চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলেছেন তবু কেউ শুন্‌ছে না। এমন সময় মাধব বাবুকে আস্‌তে দেখে ছেলেরা ছুটে পালিয়ে গেল। জ্যেঠাই-মাও ভাঁড়ার বন্ধ করে' দিয়ে মাধব বাবুর কি দরকার জান্‌তে চাইলেন।

মাধব বাবু বল্লেন, 'বৌদি, এদিকে যে গোল বেধেছে।' 'কেন ঠাকুরপো? কি হয়েছে আবার? কিসের গোল?' 'শ্যামলাল বাবু বলে' পাঠিয়েছেন গায়ে হলুদের তত্ত্বর দরুণ গোটা ৫০ টাকা দিতে হবে, ওটা নাকি ধরা হয় নি। এখন কি করি বল'ত। হারাধন বাইরে বসে' আছে। আমার হাতে যে ক'টি টাকা আছে, তা এই লোক খাওয়াতেই খরচ হবে।' 'ঠাকুরপো, তুমি যেমন ওখানে বিয়ে দিতে গেলে! আহা! দেখ দেখি এই বিনোদ ছেলেটিকে? দেখ্‌লে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। ওম্‌নি ধারা একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে কেমন হ'তো—' 'সে যা হবার হয়েছে আর এখন বল্‌লানো যায় না, বৌদি:—এখন হারাধনকে কি বলে' বিদায় করি তাই বল।'

জ্যেঠাইমা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি একটু ভেবে

বল্লেন, 'দেখ ঠাকুরপো, তুমি যতই নীচু হবে, ততই ওরা টাকার জন্যে তোমাকে চেপে ধরবে। আমি বলি কি, তুমি স্পষ্ট জবাব দাও যে আর এক পয়সাও দিতে পারবে না, এতে বিয়ে হয় হবে—না হয়ত কি করা যাবে। এখনো তো পাকে হলুদ হয় নি?' 'তাই বলে' দেখি,' বলে' বাইরে চলে' গেলেন।

এদিকে গোবিন্দ এক কোড়া কলাপাতা মাথায় করে' হেসে বল্লে, বড়দা—পাতাগুলো কোথায় রাখ্‌বে বলে' দাও না।' 'আমার মাথায় রাখ্‌ আর কোথায় রাখ্‌বি! এতদিনের পুরান লোক, দেখে শুনে যদি কিছু করতে পারিস্? পাতা ধোয়া হয়েছে?' 'ধোয়া আবার কখন হ'লো, এই তো কাটতে দেখেছে।' 'তবে যা, একেবারে পুকুরে ধুয়ে নিয়ে ওদিককার চালায় রাখ্‌ গে যা।' গোবিন্দ গজ্‌ গজ্‌ করে' বকতে বকতে চলে' গেল। এমন সময় রমানাথকে যেতে দেখে জ্যেঠাইমা ডেকে বল্লেন, 'ওরে, হারাধন চলে গেছে কি?' 'এই যাচ্ছে; কেন?—কিছু দরকার আছে কি?' 'নারে না, তেমন দরকার নেই।' 'হারাধন আবার টাকার জন্যে এসেছিল জ্যেঠাইমা, কাকা তাকে খুব শুনিয়ে দিয়েছেন! আচ্ছা জ্যেঠাইমা, জ্ঞানদাদ বাবু মরিবার নাম, পয়সার অভাব নেই, তবু টাকার লোভ ছাড়তে পারছেন না কেন, বল দেখি?' 'কি জানি বাছা, যার যত টাকা থাকে তার ততই লোভ হয় বোধ হয়। মেয়েটার বিয়ে এখন ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলে বাঁচা যায়!' 'যে রকম গতিক দেখ্‌ছি জ্যেঠাইমা!...এখনো ২০০ টাকার জোগাড় হয়নি। বাবা টাকার চেষ্টায় গিয়েছিলেন কিন্তু শুধু হাতে কেউ টাকা দিতে চায় না।' 'সেই তো ভাবনার কথা রে—' বলে' তিনি উঁড়ারে গেলেন। সে-দিনের মত কাজ সেরে যে যার ঘরে চলে' গেল।

আট

আজ বিয়ে। পাড়ার মেয়েরা সকাল থেকে এসে বিয়েবাড়ী জমিয়ে তুলেছে। হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, মেয়েদের গুণ্‌ গুণ্‌ কথা, ছোট ছেলের দাপাদাপি কলরবে বাড়ীতে কান পাত্‌বার জো নেই। বাড়ীর চারদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে বেড়ার উপর মাটি দিয়ে প্রাচীর তোলানো হ'চ্ছে, আলো দেওয়া হবে। একজন চুলী আর তার সঙ্গে কাঁসি নিয়ে একটি ছেলে বসে' বাজাচ্ছে। চালার রান্না চেপেছে, পিসিমা আর তারা-দিদি সেখানে আছেন। জ্যেঠাইমা উঁড়ারে বসে' জলখাবার বিলি কর্‌ছেন। ছেলেরা ওঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তিনি ছোট ছোট সরা করে' মুড়কি, মুড়্‌কি, বাতাসা তাদের হাতে হাতে দিচ্ছেন। কমলার মা ঘরে বসে' বরণডালা সাজাচ্ছে। কমলা একখানি লালপেড়ে শাড়ী পরে' কুসুম আর বিনির সঙ্গে ঘরে বসে' আছে। গোবিন্দ চুলীদের জন্যে জলখাবার নিতে এসেছে। জ্যেঠাইমা সরখানি সরা তার হাতে দিলেন। এমন সময় 'হলুদ এসেছে' বলে' একটা রব উঠ্‌ল। হলুদ এসেছে শুনে যে যেখানে ছিল হাতের কাজ ফেলে ছুটে দেখ্‌তে এল। আটজন লোক তত্ত্ব নিয়ে এসে থালা-গুলি দাওয়াতে নামিয়ে দিলে।

হরনাথ বাবু গোবিন্দকে বল্লেন, 'ওরে, কুটুমবাড়ীর লোকদের বসানো—, ওরা যে দাঁড়িয়ে রইল।' গোবিন্দ তাদের নিয়ে গিয়ে বসালে। জ্যেঠাইমা কমলার মাকে থালাগুলি আল্‌গে নিতে বলে', কুটুমবাড়ীর লোকদের জন্যে খাবার গোছাতে উঁড়ারে গেলেন।

বিনোদ আর রমানাথ এসে বল্লে, 'জ্যেঠাইমা, কুটুমবাড়ীর লোকদের কি খাবার দেবে দাও, তারা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে।' 'এই যে রে গোছাচ্ছি, নিয়ে যা না,' বলে' এক হাঁড়ী দই, মুড়ি, মুড়্‌কি, গোটাকতক মেঠাই আর পাঠিয়ে দিলেন। বল্লেন, 'ভাত এখনো হয় নি তো রে, এই খেতে দে।' রমানাথ আর বিনোদ খাবারগুলি নিয়ে চলে' গেল।

কুটুমবাড়ীর লোকরা একপেট খেয়ে বিদায় নিয়ে চলে' গেল। পিসিমা বল্লেন, 'দেখ্‌ছ দিদি কত বেলা হয়েছে, এখনো মেয়েটার গায়ে হলুদ ঠেকান হ'লো না। বৌয়ের যদি কোন কাজে গা আছে।—এমন গতরখুঁড়ে বৌ আর কোথাও দেখিনি।'

জ্যেঠাইমা বল্লেন, 'আজ আর ওকে কিছু বলিস্‌নে, থাকো! একটি মেয়ে, শ্বশুরবাড়ী চলে' যাবে, তাই ওর মন ভাল নেই।'

এমন সময় পাড়ার বড়-বৌ, মেজ-বৌ, খেঁদি, ঘুঁতি, টেপি, অমলা, বিমলা—এরা কমলাকে ঘিরে'

নিয়ে সেখানে এসে বলে, 'এইবার আমরা কমলার গায় হলুদ ঠেকিয়ে দিচ্ছি পিসিমা, তোমরা এস দেখবে।'

বিনোদিনী এসে বলে, 'ও জেঠাইমা, আমি কমলার গায়ে হলুদ ঠেকাব।' 'আচ্ছা, মেয়ের কথা শুনে বাঁচি নে! তোর কি বিয়ে হয়েছে তাই হলুদ দিবি? মেয়ের যদি কোন বুদ্ধি আছে।'

বিনি বকুনি খেয়ে মুখটি চুন করে' একধারে সরে গেল। তার পর শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে কমলার গায়ে হলুদ দেওয়া হ'লে, বৌ, মেয়েরা, এ ওর গায়ে হলুদ দিয়ে পুকুরে স্নান করতে গেল। এদিকে খাওয়া-দাওয়া চুকতেই বেলা চারটে বেজে গেল। গোধূলি লগনে বিয়ে। রমানাথ খেয়ে উঠেই বর আনতে গেছে। বিনোদ ছেলেদের দিয়ে বিছানা পাতাচ্ছে। ফটিক, তিনকড়ি, বিশু আলোর বন্দোবস্ত করছে। কতকগুলি তুবড়ি প্রভৃতি বাজি এনে রাখা হয়েছে: বর এলে বাজিপোড়ান হবে। তারা-দিদি পিসিমাকে বলেন, 'ও খাকো, ছাউনি নাড়া হবে কোথায়?' 'এই যে দিদি, এই দাওয়াতে হবে।' 'তা ওখানে চারটে কলাগাছ বসাতে হবে যে?' 'তাতো হবে দিদি, গোবিন্দ খেতে গেছে, খেয়ে এলেই বলছি।

গোবিন্দ এমন সময় খেয়ে উঠে পেটে হাত বুলাতে বুলাতে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল, পিসিমা ডেকে বলেন, 'ওরে ও গোবিন্দ, হাত ধুয়ে শীগ্‌গির চারটে কলাগাছ আন্ দেখি।' 'পিসিমা যেন কি! যা খেয়েছি আগে হজম করি তারপর কাজ করব। এখন আমি কোন কাজ করতে পারব না তা বলে' দিচ্ছি।' 'দেখ্‌লে দিদি, চাকরের রকমখানা! বলি, অত খেতে গিয়েছিলি কেন? জিনিষ না হয় পরের, পেটটা তো নিজের।' 'তা, দিদিমণির বিয়েতে খাব না? আমি বিশুকে বলছি কলাগাছ আনতে। আমি হাতটি ধুয়ে শুয়ে পড়ব আর এখন উঠছি না পিসিমা, রাগই কর আর যা'ই কর। সেই বর আসবে যখন, যদি বাজনা শুনতে পাই তো উঠব—' বলে' হাসতে হাসতে চলে' গেল।

বিশু চারটে কলাগাছ দাওয়াতে বসালে। জেঠাইমা বাপিতেলীকে ডেকে 'ঘুড়'র প্রদীপগুলি সাজাতে বলে' কমলার মাকে ছাউনি নাড়ার সব গুছিয়ে রাখতে বলেন। পাড়ার সেজবৌমা নাকি খুব ভাল চুল বাঁধতে আর ক'নে সাজাতে পারেন, তিনি কমলাকে সাজাতে এসেছেন। এঁটে সেঁটে জরী দিয়ে খোঁপা বেঁধে তাতে জেঠাইমা যে সোনার চিরুণী আর ফুল দিয়েছেন সেইগুলি খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে, ফুল দিয়ে খোঁপাটি ঘিরে দিলেন। তারপর তিন চারটি চাপড় দিয়ে খোঁপাটি বেঁধে দিলেন। কমলার নাপা তখন ঘন্ ঘন্ করছে, চোখে জল এসে পড়েছে, তবু সহ্য করে' চুপ করে' আছে। তার পর ভিজে গামছা দিয়ে ডোলে ডোলে মুখ মুছিয়ে পালের বেটা দিয়ে চন্দন পরিয়ে, সিঁদুরের টিপ দিয়ে দিলেন। তার পর মুখটি একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘুরিয়ে দেখে বলেন, 'এইবার কাপড় নিয়ে যা, ও ঘরে পরে' আয়।'

কমলা কাপড় নিয়ে উঠে গেল। কাপড় পরে' গলায় ফুলের মালা পরে' কমলা একখানি পিঁড়ের উপর বসল। সকলে বলে, 'সেজবৌমা বেশ সাজিয়েছে কিন্তু, এমন সাজানো এ পাড়ায় কেউ পারে না তা বলে' দিচ্ছি। দেখ দেখি, ঠিক যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত দেখাচ্ছে!'

সেজবৌমা একটু হেসে কমলার কোলে একখানি চণ্ডীর পুঁথি দিলেন। এমন সময় দূরে একটা বাজনার শব্দ হ'তে শুনে সকলে উঠে বলে,—'ঐরে বর আসছে, চল্ চল্ বর দেখিগে', বলে' ছুটে বেরিয়ে গেল।

'ওরে বর এসেছে, শাঁখ বাজা, উলু দে', বলে' পিসিমা চেঁচাতে লাগ্‌লেন। 'ওরে শাঁখ কোথায়?' 'বরণডালার উপর আছে নিয়ে আয় নারে—' চারদিকে গোলমাল, কেউ কারু কথা শুনতে পায় না। এদিকে বরের পাল্কী এসে পড়ল। মাধব বাবু বরের হাত ধরে' পাল্কী থেকে নামিয়ে নিলেন। শ্যামলাল বাবু মোটা মানুষ, পাল্কী থেকে অনেক কষ্টে বেরিয়ে হাঁপাতে লাগ্‌লেন। রমানাথ বাবু তাঁর হাত ধরে' সভায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। তার পর একটি ছেলের হাতে পাখা দিয়ে বাতাস করতে বলেন। ভিন্ন একখানা কাপাপাতায় করে' পান দিয়ে গেল, গোবিন্দ তামাক দিয়ে গেল। বিনোদ বরযাত্রীদের এনে বসালে।

পুরোহিত একধারে ঠাকুর নিয়ে বসেছিলেন। তিনি মাধব বাবুকে ডেকে বল্লেন, 'দেখুন লগ্নের সময় খুব কম, এইবেলা মেয়েদের যা হাঁড়-টিড় করবার আছে সেরে নিতে বলুন।' 'আচ্ছা আমি বল্‌ছি', বলে' মাধব বাবু 'রমু রমু' করে' ডাকতে লাগ্‌লেন।

রমু এসে বল্লে, 'কাকা ডাক্‌ছেন?' 'হাঁরে, বরকে ভিতরবাড়ীতে নিয়ে যা—ছাউনি নাড়া হবে।' 'আচ্ছা যাচ্ছি', বলে' রমু বর উঠাতে গেল।

শ্যামলাল বাবু হারাধনের সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা বল্‌ছিলেন, রমানাথকে দেখে বল্লেন, 'ওহে শোন দেখি একবার, তোমার কাকা কোথায়?' 'ওই যে ওখানে, আমি বরকে নিয়ে যাচ্ছি, ছাউনি নাড়া হবে।' 'সে পরে হবে; এখন হারাধন যাও, কথাটা বলে' এস।' হারাধন উঠে গেল। রমানাথ আর বর না উঠিয়ে, হারাধনের সঙ্গে গেল, কি বলে শুনতে। 'দেখুন বাবু', বলে' হারাধন মাধব বাবুর সামনে দাঁড়াল। তিনি এখন রমানাথের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ওকি রে, বর নিয়ে গেলিনে, চলে' এলি কেন?' 'শ্যামলাল বাবু এখন বর তুল্‌তে বারণ কর্‌লেন কাকা! তাঁর কি কথা আছে; আগে শুনুন।'

হারাধন বল্লে, 'না, কথা এমন কিছু নয় তবে সেই টাকাটা এখন দিয়ে দিলেই ভাল হয়, তাই বল্‌তে বল্লেন।' 'আচ্ছা তুমি যাও, আমি টাকা নিয়ে যাচ্ছি। রমু, তোর খুড়ীমার কাছে থেকে সেই থলিটা নিয়ে আয় তো রে।' রমানাথ টাকা আন্‌তে গেলে, পিসিমা বল্লেন, 'কইরে রমু, বরকে নিয়ে এলিনে? ছাউনি নাড়া কখন হবে?' 'দাঁড়াও পিসিমা, আগে দেনাপাওনা চুকুক!—খুড়ীমা কোথায়?'

রমু কমলার মাকে দেখ্‌তে পেয়ে কাছে গিয়ে টাকার থলেটি চেয়ে বল্লে, 'ছাউনি নাড়ার সব ওছিয়ে রাখ খুড়ীমা, আমি এখনি বর আন্‌ছি—' বলে' থলে নিয়ে মাধবের কাছে বাইরে গেল।

মাধব বাবু টাকাগুলি নিয়ে শ্যামলাল বাবুর কাছে গেয়ে বল্লেন, 'শ্যামলাল বাবু, এই থলেটিতে ৮০০ টাকা মজুত আছে, গুণে নিন।' 'আটশ টাকা গুণে নেব—সেকি কথা, মাধব বাবু? কত দেবার কথা ছিল আপনার—মনে নেই?' 'আমার খুব মনে আছে, কিন্তু শ্যামলাল বাবু, উপস্থিত আমি এর বেশি এখন কিছুতেই দিতে পার্‌ছি নে। আপনি বড়লোক, এখন এই টাকা নিয়ে বিয়ের অনুমতি দিন, পরে আমি দুশো টাকা যেমন করে' পারি দেব। এখন অনুমতি দিন—লগ্ন ব'য়ে যাচ্ছে।' 'লগ্ন ব'য়ে যাচ্ছে তাতে আমার কি? আমি আর দুশ টাকা হাতে না পেলে বিয়েতে অনুমতি দেব না', তা বলে' দিচ্ছি। আমি ওসব চালাকির কথা বুঝিনে বাপু, টাকা দেবে কিনা শুন্‌তে চাই।

হরনাথ বাবু এগিয়ে এসে বল্লেন, 'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশায়? মাধব যখন বলেছে পরে দেবে, তখন নিশ্চয় টাকা পাবেন। ভয় কি মশায়!' 'আহা ভয়ে তো আমি মরে' গেলুম, আমার আবার ভয় কিসের? ভয় তোমাদের! জান, আমি এখনি বিয়ে না দিয়ে ছেলে নিয়ে চলে' যেতে পারি। যেখানে কথার ঠিক নেই, সেখানে ছেলের বিয়ে দেব কি করে'?' বলে' রাগে ফুল্‌তে লাগ্‌লেন।

কাছেই বরের মামা বসে' ছিলেন, তিনি আস্তে আস্তে বল্লেন, 'ওহে আর কেন—যেতে দাও। ভদ্রলোক যখন বলেছেন দেবেন, তখন আর গোল না করাই ভাল। তোমার ছেলেও তো দোজবরে, ওই দিয়েছে সেই ঢের। আর তোমার ছেলের গুণে ত কেউ মেয়ে দিতেই চাইলে না, তাও তো জান ভাই?'

সেই রকম স্বরে শ্যামলাল বাবু বল্লেন, 'ওহে দেখ্‌ছ না টাকাটা হাতে রেখেছে, একটু চেপে ধর্‌লেই বের কর্‌বে।' 'তবে যা হয় কর—ভাল কথা তো শুন্‌বে না।' বলে' তিনি চুপ কর্‌লেন।

এদিকে পুরোহিত লগ্ন ব'য়ে গেল বলে' চীৎকার কর্‌তে লেগেছেন দেখে, বিনোদ বল্লে, 'মশায়, একটু চুপ করুন, লগ্ন ব'য়ে গেলেও এখন বিয়ে হ'চ্ছে না; দেখ্‌ছেন না ওদিকে টাকা নিয়ে কি গোল বেধেছে।' 'তবে আমার পাওনা দেবে কে!' বলে' উঠে দাঁড়ালেন।

ফটিক কি আন্‌তে ভিতরে গিয়েছিল, তার মুখে বিয়ের গোল বেধেছে শুনে' পিসিমা তুলসীতলায় মাথা দিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়্‌লেন। আর সবাই যে যেভাবে ছিল সেই ভাবেই

সব স্থির হ'য়ে ব'সে' রইল। কমলার মা কমলাকে কোলে নিয়ে চুপ করে' ব'সে',চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে' জলের ধারা ঝর্‌ছে—মুখে কথা নেই। তারা দিদি আর জ্যেঠাইমা গালে হাত দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে দাওয়ার উপর ব'সে' রইলেন। এত গোলমাল সব একেবারে চুপ হ'য়ে গেছে! এমন সময় রমানাথ ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে, 'পুঁটীমা, শীগ্‌গির উঠে ছাউনি নাড়ার জোগাড় কর, বর আস্‌ছে।' 'কি বল্লি রমু, বর আস্‌ছে?—আমার কমলার কি বিয়ে হবে রে! একি স্বপ্ন না সত্যি?' ব'লে' চীৎকার করে' রমানাথের পায়ের কাছে প'ড়ে' গেলেন কমলার মা।

কমলা 'ওগো মা গো' ব'লে' মায়ের গলা ধ'রে' কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, 'ও রমুদাদা, দেখ না গো মায়ের কি হ'লো, মা যে কথা কইছে না গো!' 'তাইকি' ব'লে' রমু তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল এনে মুখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল। তিনি একটা পাখা নিয়ে বাতাস দিতে লাগ্‌ল। তারা-দিদি গিয়ে পিদিমাকে উঠিয়ে বল্লেন, 'ওলো ওঠ্‌ ওঠ্‌ তোর ভাইঝির বিয়ে আর অমন করে' প'ড়ে' কেন?'

রমু বল্লে, 'বর আস্‌ছে।' 'সত্যি দিদির বর আস্‌ছে—' 'তবে যে ফটিক কি সব ব'লে' চ'লে' গেল!' 'তবে চল্‌ দেখি গে—'ব'লে' সকলে উঠ্‌লেন।

এদিকে কমলার মা একটু সাম্‌লেছে দেখে, জ্যেঠাইমা বল্লেন, 'ওরে রমু, টাকার গোলমাল কি করে' মিটল রে? মাধব কোথায় টাকা পেলে?' 'সে বর নয় জ্যেঠাইমা,আমাদের বিনোদ কমলাকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়েছে? 'এঁ্যা,—বলিস্‌ কিরে? কমলার এমন ভাগ্যের জোর তাতো জানিনে রে!'

কমলার মা উঠে ব'সে' বল্লে, 'ও ঠাকুরঝি, একি সত্যি কথা! বিনোদ আমার জামাই হবে?' 'হাঁলো হাঁ, এখন উঠে জামাই বরণ করে' নে।'

রমু বল্লে, 'যাই আমি বিনোদকে নিয়ে আসি', ব'লে' বাইরে গিয়ে দেখ্‌লে শ্যামলাল বাবুর হাতে ধ'রে' মাধব বাবু বল্‌ছেন, 'আমার এই শুভ কাজে, আপনাকে আমি না খাইয়ে ছাড়্‌ব না, শ্যামলাল বাবু। আপনার সঙ্গে এতগুলি লোক এসেছে সব কি উপোস করে' থাকবে? আমার এত আয়োজন সব পুকুরে ঢাল্‌ব এওকি একটা কথা!'

রমু বল্লে, 'কাকা, আমি বিনোদকে ভিতরে দিয়ে এখনি আস্‌ছি, আপনি জমিদার মশায়কে কিছুতেই যেতে দেবেন না।' 'কিন্তু মাধব বাবু, আমি তো বলেইছি আজ রাতেই মাণিকের বিয়ে না দিয়ে জলগ্রহণ কর্‌ব না, তার উপায়?' 'মেয়ের অভাব কি মশায়! আমার বাড়িতেই মেয়ে আছে, আপনি যেমন পছন্দ হয় বিয়ে দেবেন।'

এদিকে বিনোদের তখন ছাউনি নাড়া হ'য়ে গেছে। সভায় এসে ব'সে' বিয়ে হ'চ্ছে। রমানাথকে ডেকে মাধব বাবু কুসুমকে ডাক্‌তে বল্লেন। তার পর কুসুমকে শ্যামলাল বাবুর কাছে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'এই আমাদের কুসুম, যদি পছন্দ হয় তো করুন, কিন্তু,—' 'আর কিন্তু নয় মাধব বাবু, আমি বুঝেছি। এই মেয়েটিই নেব।'

মাধব বাবু বল্লেন, 'তা বেশ, আর ওই সঙ্গে সেই ৮০০৲ টাকা যা আপনাকে দিয়েছি তাও নিন।' ব'লে' রমুকে ডেকে মাণিককে নিয়ে যেতে বল্লেন।

শ্যামলাল বাবু বল্লেন, 'দেখ মাধব, তুমি মনে করেছ সকল বিষয়ে আমাকে জিত্‌বে? সে হ'চ্ছে না হে, আমি একপয়সা না নিয়ে বিয়ে দেব, বুঝ্‌লে।' 'কিন্তু আমি যে টাকাটা আপনার নামে সভার সামনে দিয়েছি, তার কি হবে?' 'বেশ টাকাটা আমি নেব; তার জন্য কি হয়েছে।'

এ দিকে তিনকড়ি গিয়ে দিদিমাকে বল্লে, 'ও দিদিমা, কুসুমেরও বিয়ে।' 'দূর ছোঁড়া, কুসুমের বিয়ে কোথায়?'

মাণিককে নিয়ে রমানাথ এসে বল্লে, 'ও পুঁটীমা এই কুসুমের বর এসেছে— বরণ কর'

সকলেই অবাক হ'য়ে গেল! কমলার মা তাড়াতাড়ি এসে মাণিককে বরণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কুসুমকে টেনে পিঁড়িয়ে ফুলের মালা চন্দন দিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে শুভদৃষ্টি করা হ'ল। তারপর তিনকড়ি বর-ক'নেকে বাইরে নিয়ে এল। ফটিক আর বিশু বরযাত্রীদের খাওয়াতে গেল।

এদিকে বিনোদ আর কমলার তখন বিয়ে হ'য়ে গেছে। তারা উঠে মাধব বাবুকে প্রণাম কর্‌লে। তিনি তখন মেয়ে-জামাইয়ের হাত ধ'রে' শ্যামলাল বাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, 'বাবা বিনোদ, মা কমলা, এস এই তোমাদের জ্যেঠা মশায়কে প্রণাম কর।'

বিনোদ আর কমলা প্রণাম করে' উঠ্‌তে, শ্যামলাল বাবু আশীর্ব্বাদ করে', সেই টাকার থলিটি কমলার হাতে দিয়ে বল্লেন, 'এই নাও মা, তোমার যৌতুক। তোমার বাবা আমাকে সকল বিষয়ে হারাতে চান, তা আর হ'চ্ছে না, মা।'

কমলা নীচু হ'য়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। 'যাও মা, তোমরা এখন ভিতরে যাও', বলে' শ্যামলাল বাবু তাদের নিয়ে যেতে বল্লেন।

মাণিকের বিয়ে হ'য়ে যেতে, বর-ক'নেকে বাসরে বসান হ'লো। তারা দিদি নাত্‌জামায়ের কাছে গিয়ে বস্‌লেন। বিনোদ বল্লে, 'দিদিমা, কুসুমের বিয়েটা কি রকম হ'লো বল দেখি?' 'ও ভাই নাত্‌জামাই, এ যেন ঠিক ওঠ্‌ ছুঁড়ি-তোর-বিয়ে—কেমন?' 'ঠিক বলেছ দিদিমা', বলে' বিনোদ খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল। শেষে মেয়েরা বিনোদকে গান ক'রিয়ে তবে ছাড়্‌লে। তারপর খাওয়া-দাওয়া চুক্‌তে ভোর হ'য়ে গেল। যে যেখানে পেলে শুয়ে পড়ে' ঘুমুতে লাগ্‌ল।

নয়

পরদিন সকালে, বেলা তখন ৭টা, বেহারী বাবু চা খাচ্ছেন; ভুতো তামাক দিয়ে এবং খবরের কাগজখানি তাঁর হাতে দিয়ে একটি প্রণাম করে' চলে' গেল। বেহারী বাবু এক চুমুক চা খেয়ে কাগজ পড়্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ এক জায়গায় চোখ পড়্‌তে চম্‌কে উঠে', 'ভুতো, এই ভুতো', বলে' ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। ভুতো এসে দাঁড়াতে, বল্লেন, 'এই শীগ্‌গির ব্রজকে ডাক্।' ভুতো ছুটতে ছুটতে চলে' গেল।

ব্রজলাল তখন ঘরে চা খাচ্ছিল, উমা কাছে বসে' চা ঢেলে তৈয়ী করে' ব্রজলালের হাতে সবে দিয়েছে। এমন সময় ভুতো এসে বল্লে, 'বাবু ডাক্‌ছেন, চলুন।' 'আচ্ছা আমি এখনি যাচ্ছি', বলে' তাড়াতাড়ি চা-টা ঠাণ্ডা করে' খেয়ে বাইরে গেল।

'আমাকে ডাক্‌ছেন, বাবা?' বলে' ব্রজ পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বেহারী বাবু একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'বোস, কাগজের এইখানটা পড়ে' দেখ', বলে' কাগজখানা ব্রজলালের হাতে দিয়ে বল্‌লেন, 'চেঁচিয়ে পড়।' ব্রজ পড়্‌তে লাগ্‌ল—

"বিবাহে গোলযোগ—গতকল্য কুসুমপুর গ্রামে, মাধব গাঙ্গুলীর কন্যা কমলা দেবীর বিবাহে বড়ই গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। বরপণের ২০০ টাকা কম হওয়াতে, বরকর্ত্তা মাধব বাবুর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে চাহেন নাই ও মাধব বাবুর অতিশয় অপমান করিয়া পুত্র লইয়া চলিয়া যাইতে চাহেন। বিবাহক্ষেত্রে বিনোদলাল নামে একটি যুবক উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভদ্রলোকের এই বিপদ দেখিয়া কমলা দেবীকে বিবাহ করিয়া, কন্যার পিতাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা যুবকের এই সৎসাহসের জন্য অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি।—ইত্যাদি।"

ব্রজলাল কাগজখানি পিতার হাতে দিয়ে বল্লে, 'তাইতো! কিছু বোঝা যাচ্ছে না।—বিনোদ তো আজ ক'দিন হ'লো কুসুমপুরে গেছে।'

এমন সময় ভুতো একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে এসে। 'এটা বিনোদের টেলিগ্রাম বোধ হ'চ্ছে, সেই করেছে নিশ্চয়', বলে' খামটা ছিঁড়ে ব্রজলাল পড়ে' বল্লে, 'বিনোদ কাল ৪টের সময় ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে লিখেছে, বাবা। আর লিখেছে চিঠি পরে আস্‌বে। আমার মনে হয়, ওরি বিয়ে হয়েছে; দেখা যাক্ চিঠিতে কি লেখে।' 'এদিকে তোমার মা যে অবিনাশ বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক করেছেন! তাঁকে এখন কি বলা যায়?' 'মাকে এখন কিছু বলে' কাজ নেই, কাল চিঠি এলে বলা যাবে তখন।' 'সেই ভাল; আচ্ছা তুমি এখন যাও।' 'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।' 'কি বল্‌বে বল।' 'দেখুন, সুরমার এইবার বিয়ে দিলে হয় না?' 'তা তো হয়, কিন্তু ছেলে কই?' 'একটি ছেলেকে আমি জানি, আপনার যদি মত হয় তো দিতে পারেন।' 'কে বল দেখি ছেলেটি?' 'বিনোদের বন্ধু রমানাথ। খুব ভাল ছেলে, বি-এ পড়্‌ছে। এখানে বিনোদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসে, তাই দেখেছি; দেখ্‌তেও বেশ সুন্দর। তার বিলেত যাবার ইচ্ছে আছে। সুরমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠালে ভাল হবে।' 'তা দেখো না চেষ্টা করে', ছেলে যদি ভাল হয় দিতে বাধা কি।' 'আচ্ছা, বিনোদ এলে ঠিক করা যাবে—' বলে' ব্রজ উঠে গেল।

দশ

পরদিন সকালে বিনোদের চিঠিখানি হাতে করে' বেহারী বাবু বাড়ীর ভিতর গিয়ে, সুরমাকে সামনে দেখে বল্লেন, 'ওরে তোর মা কোথা রে?' 'মা পূজো করছেন, বাবা।' 'আচ্ছা আমি ঘরে বস্‌ছি, পূজো হ'লে বলিস্।' 'আচ্ছা', বলে' সুরমা পূজো হয়েছে কিনা দেখ্‌তে গেল।

মায়ের তখন পূজো হ'য়ে গেছে, তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করে', বাইরে এসে সুরমাকে দেখে তার হাতে দুখানি বাতাসা দিলেন। বাতাসা দুখানি নিয়ে মাথায় হাত বুলে সুরমা বল্লে, 'মা, বাবা তোমাকে খুঁজ্‌ছিলেন।' 'কই রে? কোথায় তিনি?' 'ঘরে আছেন, মা।' 'আচ্ছা, তুই যা গে', আমি কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।'

কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে দেখ্‌লেন, বেহারী বাবু একখানি চিঠি পড়্‌ছেন। দেখে বল্লেন, 'আমাকে খুঁজ্‌ছিলে কেন গো?' 'খুঁজ্‌ছিলুম, বৌভাতের জোগাড় করবে, তাই।' 'কার বৌভাত?—তোমার নাকি?' 'আমার হ'লে কি তোমাকে বলি? তোমার বিনোদ—কুসুমপুরে বিয়ে করেছে যে!' 'আহা, সকাল বেলা আর কোন কথা পেলে না? মিছে-কথাগুলো বল্‌তে এলে কেন?' 'মিছে-কথা বল্‌ব কেন গো? বিশ্বাস না হয় এই চিঠিটা পড়ে' দেখ না,—আর এই খবরের কাগজ দেখ।' বলে' চিঠি দিলেন। কমলার মা চিঠিখানি মনে মনে পড়ে' বল্লেন, 'তাইতো! সত্যিই বিয়ে হয়েছে দেখ্‌ছি। আমি এখন দিদিকে কি বলি? দিদির ভাসুরের মেয়ের সঙ্গে কথা দিয়েছি, তার কি ভাববে?' 'তা' ছেলের মত না জেনে কথা দিয়েছিলে কেন? এখন আর ভাবলে কি হবে। বিনোদ চারটের ট্রেনে আস্‌ছে বৌ নিয়ে, বুঝেছ।' 'তাতো চিঠিতেই দেখেছি গো, তুমি আর বল্‌ছ কি। যাই বৌমাকে বলিগে', বৌ বরণ করে' তুলতে হবে তো? বরণের সব গোছাক।' বলে' ঘর থেকে চলে' গেলেন।

উমা বিনোদের বিয়ে হয়েছে শুনে খুব খুসী হ'য়ে সুরমাকে নিয়ে বরণের সব গোছাতে লাগ্‌ল।

চারটের সময় বিনোদ কমলাকে নিয়ে মোটরে ক'রে এসে উপস্থিত হ'ল। সকলেই বৌ দেখতে ছুটল। বিনোদের মা গিয়ে বৌয়ের মুখে একটু মধু দিয়ে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিলে। বৌ দেখে তিনি খুব খুসী হ'লেন। রমানাথ, বিশু, তিনকড়ি ফটিক সঙ্গে এসেছিল। উমা বৌয়ের হাত ধরে' উপরে নিয়ে গেল। সকলেই বল্লে, খুব সুন্দর বৌ হয়েছে। উমা একচোট ঠাট্টা ঠাকুরপোকে করে' নিলে।

তার পর—বেহারী বাবুর রমানাথকে দেখে পছন্দ হ'লো। হরনাথ বাবুর মত নিয়ে বিনোদের বিয়ের একমাস পরেই খুব ধুম করে' সুরমার সঙ্গে রমানাথের বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়েতে হরনাথ বাবু, মাধব বাবু, জ্ঞানলাল বাবু সকলেই এসেছিলেন। জোঠাইমা, পিসিমা, তারা-দিদি, কমলার শ্বশুরবাড়ী দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন। এত বড় বাড়ী—এত লোকজনে ভরা—কখনো দেখেন নি। তার উপর বিজলীবাতি যখন জ্বলে' উঠ্‌ল, তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না।

বিয়ের কিছুদিন পরে রমানাথ তিন বছরের জন্যে বিলেত চলে' গেল।

স্বর্ণকুমারী পৃষ্ঠা

স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবী তিরোহিতা হইয়াছেন—বঙ্গান্তঃপুরপ্রতিভার একটি পবিত্র রশ্মি পরম জ্যোতিঃপ্রবাহে মিশিয়া গেল। শোকের কোন কারণ নাই,—ভগবদ্ধ্যানে আত্মসমাহিত হওয়া প্রয়োজন। ভগবান্ তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন। আমরা শুধু বলি—

অমৃত-লোক, হে বিদেহ আত্মা,
তোমার সম্মুখে ;
বৈতরণী পার হ'য়ে যাও, যাও সুখে।

বিংশপূর্ব্ব শতাব্দীশেষার্দ্ধে যে উগ্র আলোক-রশ্মি সমুদ্রপারের আকাশ হইতে বাংলার গৃহাঙ্গনে পতিত হইয়াছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তপস্যার হোমশিখায় বিস্তৃত লাভ করিয়া সেই আলোক-রশ্মিরই একটি স্ফুলিঙ্গ এই অন্তঃপুরপ্রতিভার প্রাণের-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল।

বাংলার আদি মহিলা-ঔপন্যাসিকা, সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা সম্পাদিকা, সঙ্গীত, প্রহসন, আখ্যায়িকা প্রভৃতির বিশিষ্টা রচয়িত্রীরূপেই তিনি আমাদের স্মরণীয়া নহেন,—সমাজ-সংস্কারের পথে অগ্রবর্ত্তিনীরূপে তিনি যে সেই যুগে হাসিমুখে কত নিন্দা-দুঃখ-অপমান বরণ করিয়া লইয়া এ যুগের মহিলা-সমাজের জন্য চলিবার পথ সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে কথা সর্ব্বাগ্রে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। 'মহিলা শিল্প-মেলা', 'সখী-সমিতি' প্রভৃতি নারীকল্যাণ-সংঘের প্রবর্ত্তিকারূপেও তিনি আমাদের নমস্যা এবং পূজনীয়া।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সুবিখ্যাত জগত্তারিণী পদক প্রদান করিয়া সম্মান জ্ঞাপন করেন ; কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতে সাধারণভাবে তিনি কোন যশ-জয়ন্তী পর্ব্বে আমন্ত্রিত হইলেন না, ইহা দেশের ও সমাজের পক্ষে গভীর ক্ষোভের বিষয় বলিয়া মনে করি। যদিও আমরা জানি, তিনি এই সব পার্থিব সমারোহ ও সম্মানের বহু উর্দ্ধেই বিরাজ করিতেন।

তাঁর বিষয় বলিতে গেলে আরও অনেক কিছুই বলিতে হয়। কিন্তু এখন তাহা নিষ্প্রয়োজন।

ভগবান্ তাঁর অমৃতলোকবর্ত্তী উর্দ্ধ আত্মার কল্যাণ করুন।

—বঃ সঃ—

মহীয়সী স্বর্ণকুমারী

শ্রী সুরমাসুন্দরী ঘোষ

ভারত সাহিত্যাকাশে
হে জ্যোতিষ্করাণী,
সহসা পড়িলে খ'সে—
জননী! কল্যাণী!
কাব্য কথা-ব্রততীর
ছিন্ন সে মুকুল;

আর ফুটিবে না বেলা
সে সুরভি ফুল!
হ'য়ে গেল চিরতরে
প্রদীপ নির্ব্বাণ,—
ভরিবে না পূর্ণ কেহ
তব শূন্য স্থান।

মায়ের ছেলে

কুমারী প্রীতিলতা বসু

ছোট গ্রাম, গ্রামের ধারে পুকুর, পুকুরের পাশ দিয়ে একটি সরু মেঠো রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে' গেছে। রাস্তার ধারে একখানি কুটীর—তার প্রায় অর্দ্ধেক ভূমিসাৎ হ'য়ে গেছে। কুটীরে একটি দরিদ্র বিধবা তাঁর ছেলে কমলকে নিয়ে বাস করেন।

লোকের বাড়ীর ধান ভেনে মুড়ুনির কাজ করে' বিধবা কোনরকমে তাঁর সেই ছোট্ট সংসারখানি চালান।

কমল গ্রামের পাঠশালায় পড়ে। গুরু মহাশয় তাকে বড় ভালবাসেন। সে পাঠশালার সমস্ত ছেলেদের চেয়ে ভাল। আজ তার ভারী আনন্দ হয়েছে, সে বাড়ী ফিরে এসে মাকে বল্‌লে, "মা, আজ আমি সমস্ত ছেলেদের চেয়েও ভাল পড়া দিতে পেরেছি। তাই গুরুমহাশয় আমায় খুব প্রশংসা করেছেন আর বলেছেন, এই রকম মন দিয়ে পড়্‌লে আমি কয়দিনের মধ্যেই সহরের স্কুলে পড়্‌তে পাব্‌ব।" মা আনন্দে চোখের জলে ভেসে বল্‌লেন, "হাঁ বাবা, মন দিয়ে লেখাপড়া কর', মানুষ হ'তে পারবে। গুরুজনের কথা শুনো, ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।" এই রকম করে' সুখে দুঃখে তাঁদের দিন কাটতো।

একদিন সন্ধ্যা সন্ধ্যা কমল আনন্দে লাফাতে লাফাতে এসে তার মায়ের কাছে বল্‌লে, "মা গুরুমশায় বল্‌লেন আমার এখানকার পড়া শেষ হ'য়ে গেছে আমি এবারে সহরের স্কুলে পড়্‌তে যাব"

আজ তার বুকভরা আনন্দ,—মন দৃঢ়তা ও প্রফুল্লতায় পূর্ণ। কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে কতকগুলি ফুলের গাছ সে নিজের হাতে লাগিয়েছিল, সেগুলিতে ঘড়া ঘড়া জল দিলে। দাউ, কুমড়োর গাছে মাচা তুলে দিয়ে বল্‌লে, "মা, তুমি এই দাউ কুমড়ো বিক্রি করে' নিজের খরচ চালিও. আর পরের বাড়ীতে চাকরি কর্‌তে যেও না। আমি পড়া শেষ করে' যখন রোজগার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ব, তখন তোমায় একটু কষ্টও থাক্‌তে দেব না।" মা আনন্দে অধীর হ'য়ে বল্‌লেন, "সব সময়ে এই রকম ভাব অন্তঃকরণে নিয়ে, ভগবানে নির্ভর করে' কাজ করিস্—তোর কোন বিপদ হবে না।"

কয়েকদিন পরে কমল মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সহরের স্কুলে পড়্‌তে গেল। কমল পাড়াগাঁয়ের ছেলে; সহরের কৃত্রিমতা দেখে নিজের গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা, সেই খোড়ো বাড়ীর কথা, বাড়ীর পাশে মেঠো

রাস্তার ধারে ফুলের গাছগুলির কথা,—মায়ের কথা সবই সে ভুলে গেল। এখানে অনেক বন্ধুবান্ধব পেয়ে খুব উৎসাহের সহিত সে নিজের লেখাপড়া করতে লাগলো।

কিছুদিন পরে সে একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে যে, তাদের গ্রামের সেই কুঁড়ে ঘরখানি জরাজীর্ণ হ'য়ে গেছে, ঘরের মেঝেতে তার মা রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন, তাঁর মুখে একবিন্দু জল দেবারও কেউ নেই! চারিদিক অন্ধকার ঘরকে ছেয়ে গেছে। তারপর, তার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখলে ভোর হ'য়ে গেছে। স্বপ্নের কথা ভেবে তার মন খুবই খারাপ হ'য়ে গেছলো। মায়ের জন্যে তার মন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছিলো:—সে আর কোন দিকে না তাকিয়ে কাউকে কোন কথা না বলে'ই, গ্রামের রাস্তা ধরে' বেরিয়ে পড়লো।

সে সময় ট্রেন কিম্বা মোটর কিছুই ছিল না। কোথাও যাবার দরকার হ'লে হেঁটে কিম্বা গরুর গাড়ী করে' যেতে হ'ত। গরুর গাড়ী করে' গেলে তার আবার ভাড়া লাগবে। কমল গরীবের ছেলে, সে অত ভাড়া দিতে পারবে না,—তাই সে হেঁটেই যেতে লাগলো। ক্রমাগত দুই তিন দিন হাঁটবার পর সে তার পূর্ব্বপরিচিত কুঁড়ে ঘরের কাছে এসে পৌঁছলো। মায়ের জন্যে মন তার ভয়ানক ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলো। সে আর স্থির থাকতে পারলে না। যত শীঘ্র পারে পা চালিয়ে কুঁড়ে ঘরে এসে পৌঁছলো সারাপথ হেঁটে এসে তার শরীর খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। ঘরে ঢুকে দেখলে তার মা মেজেতে শুয়ে রয়েছেন, তাঁর চোখ, বুঝি তিনি ঘুমুচ্ছেন। সে একটু আশ্বস্ত হ'য়ে মুখহাত ধুয়ে এসে মায়ের মাথায় হাত বুলুতে লাগলো। কিন্তু গায়ে হাত দিয়েই সে চম্‌কে উঠ্‌লো,—নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলে, নিশ্বাস নাই। তখন তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, তার মা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন। কখন যে তিনি এই শোকদুঃখপূর্ণ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে সেই শান্তিধামে চলে' গেছেন, তা সে জানতেই পারে নি। শোকে অধীর হ'য়ে মা, মা বলে' কাঁদতে কাঁদতে কমল মায়ের শবের উপর লুটিয়ে পড়লো।*

* খুব ছোট একটি বালিকার রচনা।

কেন্দ্রসমিতির কথা

শোক-সভা

গত ১৭ই জুলাই রবিবার সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির কার্য্যালয়ে ৺চন্দ্রমাধব ঘোষের অকালে পরলোক গমনের জন্য একটি শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এম, এল, সি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী, এম, এল সি; মিঃ এইচ, কে, সে, বার এট্-ল; রায় বাহাদুর আই, এস, মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বক্সী; মিঃ ও মিসেস মোহা; ডাঃ এস, কে, বসু, ডি, ও; শ্রীযুক্ত সদয়কালী চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন; শ্রীযুক্ত মনোজ বসু; শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; মিঃ টি, সি,বসু; শ্রীযুক্ত হিমাদ্রিভূষণ রায়; শ্রীযুক্তা সুকুমারী চৌধুরী প্রমুখ ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ এবং স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা হেমনলিনী মল্লিক ও শ্রীযুক্তা অমিয়প্রভা বসুর নেত্রীত্বে সরোজনলিনী নারী-শিল্প-শিক্ষালয়ের কয়েকজন ছাত্রী "কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস" নামক সুন্দর সঙ্গীতটি গান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে একটি সুন্দর কীর্ত্তন গান করেন।

ইহার পর শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ৺চন্দ্রমাধব বাবুর স্বর্গীয় আত্মার প্রতি ও শান্তিকামনায় ভাবগম্ভীর ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় একটি সুন্দর প্রার্থনা করেন।

রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন—সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক এবং ইহার অকৃত্রিম হিতৈষী ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় অকালে পরলোক গমন করায় সমিতির যে ক্ষতি হইল তাহা পূর্ণ হইবার নয়।

তিনি সমিতির হিতের দিয়া নারীসমাজের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের হিতের দিয়া আপনার কর্মশক্তির প্রভাবে দেশের উন্নতির কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমিতির সভ্যগণের এই সভা তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, মহাশয় উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর অমায়িকতা, সৌজন্য, কর্মশক্তি প্রভৃতি গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম, বি, এ বি, টি, মহাশয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া হৃদয়গ্রাহী ভাষায় চন্দ্রমাধব বাবুর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

"৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ও তাহার নিম্নে একটি প্রস্তরফলক স্থাপন করা হউক এবং তাঁহার উপযুক্তরূপ স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ-সংগ্রহ করা হউক।

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে মূল কমিটি ইতিপূর্বেই সরোজনলিনী নারী-শিল্প-বিদ্যালয়ে চন্দ্রমাধব বাবুর স্মৃতি রক্ষার জন্য "চন্দ্রমাধব বৃত্তি" নাম দিয়া দুইটি বিধবা ছাত্রীকে বিনাখরচে পড়িবার ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন।

মিঃ টি, সি, বসু উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

তৎপরে সভাপতি মাননীয় রাজাবাহাদুর চন্দ্রমাধব বাবুর গুণাবলী, সমিতির কার্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁহার অকালে পরলোক গমন করায় সমিতির অপরিসীম ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করিয়া সুন্দর ও মর্মস্পর্শী ভাষায় শোক প্রকাশ করেন।

পরিশেষে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগময়ী ভাষায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে চন্দ্রমাধব বাবুর স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন করেন।—

বিশিষ্ট জনৈক বন্ধু	১০০৲
শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস	১০ ৲
মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী এম, এল, সি	১০০৲
চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ	১০০৲
মিঃ এন, বি, বক্সী, আই, সি, এস	৫০৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বক্সী	
রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও	
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম	
মিঃ এইচ, কে, দ, বার-এট্-ল	
রায় বাহাদুর আই, এস, মুখোপাধ্যায়	
ডাঃ এইচ, এন, রায়	
মিঃ টি, সি, বসু	
শ্রীযুক্ত মনোজ বসু	
শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী	
শ্রীযুক্ত বঙ্গনাথ সরকার	
মিসেস কাজিমুন্নেসা মোহা	
শ্রীমতী হেমনলিনী মল্লিক	
শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে	
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ	
শ্রীমতী প্রতিভা সেন, বি, এ	২৲
মিঃ এ, সি, গুপ্ত	২৲
শ্রীমতী মাতঙ্গিনী রায়	২৲
রায় বাহাদুর এস, সি, ব্রহ্মচারী	২৲
মিঃ বি, এম, দাস	২৲
শ্রীমতী সুহাসিনী চৌধুরী	১৲

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে মহাশয় একটি সুন্দর ও মর্মস্পর্শী ভগবদ্‌সঙ্গীত করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

কস্‌বা মহিলাসমিতি

গত ২রা জুলাই শনিবার—কস্‌বা মহিলাসমিতির উদ্যোগে সমিতির গৃহে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। কেন্দ্রসমিতি হইতে পণ্ডিত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, এম, এ, এবং শ্রীমতী সুষমা সরকার সভায় যোগদান করেন। সভায় ন্যূনাধিক দুইশত যোগে

বিভিন্ন মহিলাসমিতির কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়া সমিতি কিরূপে সুগঠিত করিতে হয় সে বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

আন্দুলে মহিলাসভা

আন্দুল মহিলাসমিতির উদ্যোগে গত ৩রা জুলাই রবিবার একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। গ্রামের বহু মহিলা ও ভদ্রমহোদয় সভায় যোগদান করেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, এম, এ, ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে মহিলাসমিতি গঠনের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন।

ডাফ্ স্কুলে সভা

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, এম, এ, গত ৬ই জুলাই কলিকাতার ডাফ্ বালিকাবিদ্যালয়ে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

মহিলাসমিতি পরিদর্শন

গত ১৭ই জুন কেন্দ্রসমিতির অন্যতমা সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী কলিকাতার শ্যামপুকুর মহিলা-সমিতি পরিদর্শন করেন। তিনি উপস্থিত মহিলাগণকে সমিতি কিরূপে সুপরিচালনা করিতে হয় সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

গ্রীষ্মে সৌন্দর্য্য রক্ষার উপায়

গ্রীষ্মকালেই সুন্দরীদের বড় অসুবিধা হয়। প্রখর রৌদ্রতাপে তাঁহাদের কমল কোরকের মত মুখখানি ম্লান হইয়া পড়ে—সমস্ত শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়—ফলে গাত্রে দুর্গন্ধ জন্মে ও সর্ব্বগাত্রে ঘামাচি সুড়সুড়ী ও ব্রণ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়।

এই সমস্ত উপদ্রবের হাত হইতে নিজেকে ও নিজের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার উপায় প্রাতঃকালে স্নান করা—স্নানের সময় উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিবেন—উৎকৃষ্ট সাবান বলিলে বাঙ্গালার শিক্ষিতা সুন্দরীরা হিমানীর চন্দন সাবানই বুঝেন; কারণ ইহার মত মধুর গন্ধ ও তৃপ্তি অন্য সাবান দিতে পারে না—চন্দন সাবান অনেক রকম আছে কিন্তু 'হিমানী চন্দন' একই রকম—দোকানদারের প্ররোচনায় অন্য সাবান খরিদ করিবেন না। স্নানান্তে দেহের সর্ব্বত্রে হিমানি টল্‌ক পাউডার ব্যবহার করিবেন—হিমানী টাল্‌ক পাউডার অনেক রকম গন্ধের পাওয়া যায় তন্মধ্যে 'চন্দন' 'খস' ও হিমানী গ্রীষ্মকালের উপযোগী।

মুখে হিমানী স্নো বা হিমানী ক্যামিসিং ক্রীম ব্যবহার করিলে সারাদিনের উত্তাপে মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে না।

সন্ধ্যায় গা ধুইবার সময় হিমানীর খস্ খস্ সাবান ব্যবহার করিবেন ও মাখার তৈলের পরিবর্ত্তে "ভেলভেট হেয়ার ক্রীম" ব্যবহার করিলে মস্তক (Scalp) পরিষ্কার থাকিবে ও খুস্কী ময়লাদি প্রভৃতি জন্মিবে না।

যাঁহাদের মাথায় বড় শীঘ্র শীঘ্র ময়লা জন্মে তাঁহাদের উচিত "শাপানী" নামক হিমানীর প্রস্তুত অভিনব শাম্পু (কেশ ধাবন) ব্যবহার করা।

যাঁহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় তাঁহাদের জন্য হিমানীর প্রস্তুত "আইওডিন ডেণ্টাল ক্রীম" নিত্য ব্যবহার প্রশস্ত ইহা পাইওরিয়ার প্রতিষেধক ও নিত্য ব্যবহারের জন্য হিমানীর নিম ডেণ্টাল ক্রীম বিশেষ প্রচলিত। বাজে নিমের মাজন কিনিয়া ঠকিবেন না। হিমানীর জিনিষগুলি চিরদিনই বিশুদ্ধ।

প্রচারক—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং ৪৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

Printed by A. C. Sirker at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

চন্দ্রাতপ-শোভা

(ঘরের চালের মধ্যে টাঙ্গান)

চিত্রশালা — ৯ (দ্বিতীয় তল)

না জাগিলে সব ভারত ললনা—

—এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা

—আজ—শিশির-সিক্ত, শিউলী-ঝরা সোণার বাংলার দ্বারে দ্বারে
চেতনা জাগাতে উপস্থিত

দেব সাহিত্য-কুটীর

অমূল্য ভাবসম্পদে
সমৃদ্ধ
আমাদের উপন্যাসের পরিচয়
অনাবশ্যক দেওয়া যায় না।

বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গালীর বৌ,
বাঙ্গালীর মা
যদি আমাদের উপন্যাস
না পড়ে থাকেন
তবে
করেছেন কি ?

১৲ সংস্করণের
কয়েকটির নাম শুনুন

কল্পনাদেবী
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
পথের মেয়ে
হেমেন্দ্রকুমার রায়
পরদেশী
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
ছায়াছবি
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
আরো অনেক অনেক।

(২য় সংস্করণ)
রবীন্দ্রনাথ যত সমস্ত আধুনিক
কবির রচনা-সংগ্রহ
১৷৹

ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন
রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হইতে আধুনিকতম
সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের গল্প সংগ্রহ
১৷৹

ছেলেমেয়েদের মনের
মত বই—
পেয়ে আনন্দ—উপহার নিয়ে
তৃপ্তি। পাতায় পাতায়
চোখ জুড়ানো ছবি।

সোণার বাংলার ছেলেমেয়েরা
আনন্দে মেতে উঠ্‌বে
এতই সুন্দর অপরূপ
আমাদের শিশু-সাহিত্য।
আমাদের বই না পড়লে
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ
রয়ে যাবে।

মাত্র কয়েকটির নাম শুনুন।

গুল্‌জার	।৵০
চিনের বিনুনী	॥০
চাঁদ কপালে	।০
তোলপাড়	॥০
দু'শো মজা	।৵০
বন্দীবীর	।৵০

কত আর নাম করব।

সচিত্র ও সম্পূর্ণ তালিকার জন্য আজই চিঠি লিখে দিন।

দেব সাহিত্য-কুটীর ২২।৫, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

অটুট রাখতে

পারিজাতের

জেসমিন ও চন্দন

শ্রেষ্ঠ।

ফ্যাক্টরী :—

টালিগঞ্জ।

ফোন, সাউথ: ১৫৫৪

পারিজাত সোপ ওয়ার্কস

৪৩।৩ এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট।

কলিকাতা, ফোন : কলি ৪২০৬

বিশুদ্ধ স্বদেশী সিল্কের
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

বিশুদ্ধ স্বদেশী রেশমী বস্ত্র

—প্রস্তুতকারক—

"সিল্ক ভাণ্ডার"

৮নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(ঠনঠনিয়া কালীতলা) ফোন নং বি: বি: ১১৪৯

এই স্বদেশী যুগের দিনে, আমরা রেশমী বস্ত্রের কারখানা করিয়াছি এবং এইবার পূজায় আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত মুর্শিদাবাদ সিল্কের আধুনিক ধরণের বিচিত্র পাড়ের নানা রকমের ছাপান সাড়ীর বিপুল আয়োজন করিয়াছি। অন্যত্র কাপড় ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদের প্রস্তুত কাপড়ের দর ও ডিজাইন দেখিয়া যাইতে আপনাদিগকে অনুরোধ করি।

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচ্‌লে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই যাচি।"

৭ম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৯ [দশম সংখ্যা

সমাজে নারী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

"হে গার্গবনী, প্রত্যেক স্ত্রীলোক তোমার মত ও প্রতিদ্বন্দ্বী।"—ঋক্।

যে সমাজে নারীর স্থান যত উচ্চে সেই সমাজ তত সভ্য ও উন্নত। বিভিন্ন সমাজের সহিত হিন্দু-সমাজের তুলনা করিয়া আমরা দেখিব—সমাজে নারী কোথায় কিরূপ সম্মান ও পূজা পাইতেছেন। এই নারী-জাগৃতির যুগে নারী-সমস্যা-সমাধানে উহা অনেক পরিমাণে সহায়ক হইবে মনে হয়।

ইংরাজ রমণী মনোনীতা হইলে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যা হইতে পারেন; ইহা বর্ত্তমানে আইন-সঙ্গত ও আইন-সম্মত হইয়াছে। অপরদিকে নব্য-আবিসিনিয়ার কৃষক লাঙ্গলের একদিকে নারী ও অন্যদিকে গরুকে জুড়িয়া ভূমিকর্ষণ করে। এই দুই উচ্চতম ও নিম্নতম স্তরের মধ্যে দেশ বিশেষে নানা তারতম্য দৃষ্ট হয়। ফরাসী-রমণী বিবাহিতা হইলে যথেষ্টরূপ উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিতা হন। হিন্দুরমণীর বিবাহিত বা অবিবাহিত কোন অবস্থাতেই পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার নাই। আবার আন্দামান-দ্বীপনিবাসী, স্ত্রীর অসম্মতিক্রমে কোন সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারে না। অপর দিকে মার্কিন-রমণী নাকি বিবাহিতা হইলেও সহোদরবৎ পৈতৃক ধনে বঞ্চিতা হন না।

বর্ত্তমান সমাজের কথা ছাড়িয়া, আমরা জগতের প্রাচীন সমাজের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাই—নারী তথায়ও সমাজে পুরুষের সহিত সমানাধিকার পাইবার জন্য বিদ্রোহিণী। প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত লেখক হেরোডোটসের পুস্তকে পাওয়া যায় নোবেল নাই জনৈকা রমণী নিজ ভাগ্যের উপর ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন, "পৃথিবীজাত সমস্ত বস্তুর মধ্যে নারী যেন একটি পদদলিতা বিচ্ছিন্না লতিকা।" প্রাচীন হিব্রু-জাতিতেও নারীর অতৃপ্তি দেখা যায়। ওল্ড টেষ্টামেণ্টেও দেখা যায় কোন নারী নিজ প্রতিভা ও শক্তির বলে সমাজে উচ্চাসন লাভ করিয়া মহীয়সী হইয়াছেন। গ্রীসের শাফো ও এস্‌পাশিয়া এবং প্যালেষ্টাইনের

ভেরোনা ও রোমান কনে'লিয়ার নাম উদাহরণ স্বরূপ করা যাইতে পারে। প্রাচীন সমাজের ইতিহাসের গতি সর্ব্বত্র এইরূপ। রমণী কোথায়ও শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারিণী, কোথায়ও দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছে। তবে প্রাচীনতম সমাজে মাতাই গৃহের কেন্দ্র—পিতা নহে; এইরূপ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যে অতীত যুগের দুইটি প্রধান সভ্যতাকেন্দ্র রোম ও গ্রীসেও আমরা আশাজনক সমাধান খুঁজিয়া পাই না। রোম-রমণী অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃআশ্রয়ের এবং বিবাহিতাবস্থায় স্বামীর আশ্রয়ের ভিখারিণী। আবার এথেন্সেও দেখা যায় নারী পর্দ্দার আড়ালে বাস করিতেন। গৃহের সীমানার মধ্যেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র নিবদ্ধ ছিল—সমাজে পুরুষই প্রধানতঃ কর্ম্মনিরত থাকিত। সমাজে আসা বা পুরুষের সহিত আলাপ করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ ও সভ্যতাবিরুদ্ধ উভয়ই ছিল। গ্রীসে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল; তাই বিবাহের দিন নারীর পক্ষে অতি আনন্দ ও স্বাধীনতার দিন ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে এই অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। পেরিক্লিস্ বলেন, "নারীর শক্তি ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যদি বিতর্কবাদের কিছু বলিতে হয়, আমি এককথায় এই বলিব যে, "তোমাদের স্বভাব কখনও অবনত করিও না। স্বভাবের শক্তিতে তোমরা মহাগৌরবের অধিকারিণী হইবে।"

আবার স্পার্টার নারীসমাজ সম্পূর্ণ অন্যরূপের ছিল। তথায় নারীগণের পুরুষের সহিত সম অধিকার ও সমাজে অবাধগতি ছিল। ব্যায়ামাগারে তাঁহারা কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধও করিতেন। স্পার্টানগণ ছিল যোদ্ধার জাতি, তাই স্ত্রী-পুরুষ সকলকে উপযুক্ত সেনানীরূপে গঠন করিতে সমাজে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিত। বেরি সাহেব বলেন যে, "স্পার্টানগণ রমণীদের যে তেমন সম্মানের চক্ষে দেখিত তাহা নহে; তাই তাঁহারা আদর্শরমণীর আসন গ্রহণ করিতে পারেন না।"

বর্ত্তমান যুগে নারীপ্রগতি আশাতীতরূপে প্রবল হইতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের নারীর অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা নিরাশ ছাড়া আশান্বিত হইতে পারি না। অথচ সমগ্র প্রাচ্য বিশেষতঃ ভারতরমণী আজ পাশ্চাত্য নারীর আদর্শ গ্রহণ করিতে ব্যগ্র! অবশ্য ভগ্নী নিবেদিতা যেমন বলিয়াছেন,—পাশ্চাত্যের দান যথেষ্ট; তবে পাশ্চাত্য ঐহিক নারীত্বের আদর্শ পূর্ণ করিয়াছেন—আর ভারত মাতৃত্বের তথা দেবীত্বের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে আমরা পাশ্চাত্যকেও অগ্রাহ্য করিতে পারি না বা প্রাচীন ভারতের নারীর আদর্শও ত্যাগ করিতে পারি না। তবে সুসমঞ্জস সমাধান কোন্ পথে?

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিনব সৃষ্টি—নগ্ন-সমিতি! জার্ম্মেনি, আমেরিকা প্রভৃতিতে এই নগ্ন-সমিতির সভ্যগণ আবার আদম-ইভের যুগে ফিরিয়া যাইতে চান!! আরও আশ্চর্য্য যে, তৎতৎদেশীয় নারীগণও উল্লিখিত সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন!!!

তুর্কী, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের মুসলমান নারীগণ এবং সিংহল, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ-নারীগণও পাশ্চাত্যের নারীআদর্শ গ্রহণের অর্দ্ধপথে। হিন্দু-জগতের জননীগণ যে পাশ্চাত্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বাহ্যিক। পশ্চিমের মুখে হাসি কিন্তু অন্তরে আগুন! হিন্দু-নারীগণকেই জগতের নারীসমস্যা সমাধানের মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু-নারীর আদর্শের এক গৌরবময় যুগ অতীত হইয়াছে—সেই আদর্শকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান সভ্যতা ও জ্ঞানালোকে তাহাকে সংস্কৃত করিলেই হইবে। সিংহলেও দেখিলাম দুইজন নারী-সদস্য ষ্টেট্ কাউন্সিলে জনসাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীতা হইয়াছেন। ভারতের নানাস্থানে গৃহের শান্তি-স্নেহ-মমতার রাজ্য ত্যাগ করিয়া নারী বহুস্থানে পুরুষের অনুকরণে সামাজিক জীবন গ্রহণ করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে লাভ হইল—কি? পাশ্চাত্য নারীগণ প্রায় গত একশতাব্দী যাবৎ এই সামাজিক জীবন যাপন করিয়া ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত কি উন্নতি সাধন করিয়াছেন?—সুতরাং সমাজে সমানাধিকার লাভ করিলেই যে, নারীসমস্যার সমাধান হইবে ইহা অমূলক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশসাধনের জন্য যে স্বাধীনতা ও সুযোগ চাই তাহা হিন্দুগণ নারীদিগকে অথাতীত যুগ হইতে অদ্যাবধি দিয়া আসিয়াছেন। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আদর্শ-নারী-দৃষ্টান্তে পূর্ণ। শঙ্করের মাতা, বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবী, ঈশার মাতা মেরী মাদোনা,

বিবেকানন্দের মাতা ভুবনেশ্বরী, চৈতন্যের মাতা শচীদেবী, রামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রাদেবী, অরবিন্দ-রবীন্দ্র-জননীগণ ত বাঙ্গিয়ের সমাজের মধ্যে না আসিয়াও জগৎপ্রসিদ্ধ সন্তানের জননী হইয়াছেন! বৈদিকযুগেও দেখিতে পাই বিদুষী গার্গী-মৈত্রেয়ী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দর্শনের গভীর তত্ত্বসমূহ আলাপ করিতেছেন। বেদীসূক্তের দ্রষ্ট্রী অপ্তন, অদিতি, লোপামুদ্রা শাশ্বতী, বিশ্ববরা, অপালা ও ঘোষা প্রভৃতি বিদুষীগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগেও শঙ্করাচার্য্য যখন মণ্ডনমিশ্রের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ করিতেছেন তখন মধ্যস্থ ছিলেন জনৈকা নারী—ভারতী! তাহা ছাড়া সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী মদালসা রন্তিদেবের দেশে হিন্দু-নারীগণের ত নিরাশ হইবার কিছুই দেখি না। বর্ত্তমান নারীগণের শিক্ষালাভের পূর্ণসুযোগ দেওয়ার পর তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারা নিজেরাই সমাধান করিবেন—অবশ্য অতীত আদর্শের ভিত্তিতে, তবে কালসমস্যা বর্ত্তমান জগতের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় হইতেই গ্রহণ করিয়া।

নারীদের পরিণতি মাতৃত্বে—এই বেদবাক্য যেন আমাদের দেশজননীগণ বিস্মৃত না হন। প্রকৃত মাতা হইয়াই তাঁহারা প্রকৃত দেশ গঠন করিতে পারিবেন! তাঁহারা গৃহের শান্তিময় রাজ্য ছাড়িয়া সমাজে আসার ফল হইয়াছে এই যে, তাঁহাদের শিশুগণ সমাজের উপযুক্ত সভ্য হইতে পারিতেছে না। আমরা—সন্ন্যাসীরা, স্ব স্ব জীবনে দেখি, পিতামাতা আমাদের সম্মুখে বাল্যকালে উচ্চাদর্শ রাখিয়া আমাদিগকে গঠন করেন নাই বলিয়া আমরা মধ্যজীবনে হৃদয়-মস্তিষ্কের বিকাশ পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্য যাহা প্রত্যেক হিন্দু-বালকের জন্মগত অধিকার ছিল—তাহা আমাদের নিকট সুদূরপরাহত হইয়াছে। তাই বলি, প্রকারান্তরে দেশে জননীগণই সমাজের প্রকৃত স্বত্বধারিণী।

রাবিন বলেন যে, "যে গৃহে মাতা রাজত্ব করেন তাহাই আদর্শ গৃহ। এইরূপ গৃহই প্রকৃত শান্তিনিকেতন—তথায় দ্বন্দ্ব, ভয় ও দুঃখের আক্রমণ নাই। লক্ষ্মীহীন গৃহ গৃহই নহে। আনন্দ পবিত্রতা শান্তি সত্য যে গৃহে যত বিরাজ করে সে গৃহ তত উন্নত। তদ্রূপ মধুময় গৃহই প্রকৃত স্বর্গ, প্রকৃত মন্দির, প্রকৃত তীর্থ। সে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রেমপূর্ণা আদর্শ জননী।—সে গৃহে দুঃখদারিদ্র্য থাকিলেও গৃহবাসী স্বর্গীয় শান্তি লাভ করেন। শুধু তাহাই নহে, গৃহহীনের আশ্রয়ও সেই গৃহ।"

সমাজে পুরুষ রাজত্ব করুন কিন্তু গৃহে যদি আদর্শ-জননী বিরাজ করেন সেই গৃহ মন্দিরে পরিণত হয়,—সেই গৃহে দেবতার বাস হয়, তথায় স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। পশ্চিমে এইরূপ গৃহের অভাব বলিয়া সমাজও অধঃপতিত। কারণ সমাজ ত এইরূপ গৃহের সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আজ হিন্দু-সমাজে এইরূপ গৃহের আধিক্য বলিয়া সমাজ এত উন্নত। হিন্দু-জননীগণ বোধ হয় জানেন না যে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আর কেহ নহে—তাঁহাদেরই সন্তান। কাজেই নারীদের সমাজসংস্কারের জন্য ব্যস্ত না হইয়া গৃহ-সংস্কার করিতে হইবে—তবেই সমাজ দেশ ও সমস্ত জগৎ উন্নত হইবে। আর তাহার জন্য হিন্দু-নারীগণই একমাত্র দায়ী। তাঁহারা এ ব্রত গ্রহণ না করিলে জগতে, দেশে, সমাজে গৃহে শান্তিরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, "বুদ্ধ যবে ঘরে জননীরূপে বিরাজ করেন।" কারণ জননী যদি ক্রোড়স্থ শিশুর কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মের আদর্শের বীজ বপন করিয়া দেন ও তাহা নিঃস্বার্থ স্নেহে অঙ্কুরিত, পল্লবিত হইয়া উঠে, তবে কালে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাহা মহামহীরুহে পরিণত হইবে।

মনু মহারাজ বলেন, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা—যত্র নার্য্যস্তু নিপূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্র ন দেবতা"। অর্থাৎ নারীকে সম্মান করিলেই দেবতার সম্মান করা হয়—নারীর অশ্রদ্ধা হইলে দেবতাগণ গৃহত্যাগ করেন। চণ্ডীতে আছে, "স্ত্রিয়া সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—অর্থাৎ নারীগণ জগজ্জননীর অংশ ও প্রতিমূর্ত্তি। রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন "জগন্মাতা মাতারূপে গৃহে বিরাজ করেন।"

বাংলা মাতৃপূজার সিদ্ধ পীঠ। কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র প্রভৃতি সাধকগণ মাতৃ-পূজায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তরুণবাংলাকে এই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতের অন্যত্র ত দূরের কথা, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই মাতৃভক্তি বা মাতৃপূজার প্রচলন নাই। গৃহে জীবন্ত মাতাকে জীবন্ত জগজ্জননীরূপে পূজা করিয়া মাতৃশক্তির আরাধনা করিতে হইবে—তবেই দেশ

আসিবে। ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী আমরা—পথীতে পথীতে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে মাতৃশক্তি পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু পূজক কই? মাতৃপূজার ঘোড়া ও উপাচার আজও অভাব দেখিতেছি। গৃহে গৃহে মাতৃ-পূজার আয়োজন ও মাতৃশক্তির উদ্বোধন হউক!

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সেই মাতৃপূজার পুরোহিত হইয়া দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে মাতৃরূপে আরাধনা করিলেন—নারীগুরু গ্রহণ করিলেন—এবং নিজের স্ত্রীকে প্রথম শিবরূপে গ্রহণ করিলেন। এবং সাধনার শেষে স্ত্রীকে জগজ্জননী জ্ঞানে পূজা করিয়া দেখাইলেন নারীতে মাতৃদৃষ্টি না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনও অপূর্ণ থাকে। ধর্মের অবিরুদ্ধ ভোগ সংসারে ত্যাগে পৌঁছিবার জন্যই হিন্দুর বিবাহ। বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার প্রথা উচ্ছেদ হওয়াতেই হিন্দুর বর্ত্তমান জাতীয় অবনতি। এই আদর্শ পূর্ণ-প্রচলনের জন্য এবং বিবাহিত জীবনে শিক্ষার জন্য স্ত্রীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ নারীর সম্বন্ধ-রহিতো এক অপূর্ব্ব জীবন যাপন করিলেন। এই আদর্শ অন্ততঃ আংশিকভাবে গ্রহণ না করিলে দেশের কল্যাণ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই সে দেশ সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিনকালে হইতেও পারিবে না। আমাদের জাতির অবনতির মূলে এই নারীশক্তির অবমাননা।" সুতরাং গৃহে গৃহে মাতৃপূজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হউক। কারণ শুধু ব্যষ্টি-জীবন নহে, সমষ্টি-জীবনের পাপতাপও সতীসাধ্বী নারীর আশীর্ব্বাদে নষ্ট হয়।

নারীগণ আত্মবিস্মৃত মহাশক্তির আকর। সেই শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে মাতৃমন্ত্রে মহামন্ত্র সাধনে দেশের যুবক-গণকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আর জননীগণও বৃথা বাহিরের সমাজে রাজত্ব করিবার বিফল-প্রয়াস ত্যাগ করিয়া গৃহের মধ্যে তাঁহাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে কেন্দ্রশক্তি নিবদ্ধ করুন। এই গৃহের মধ্য হইতেই তাঁহারা সমস্ত সমাজ গঠন ও চালনা করিতে পারিবেন। জননীগণের এই মহাদায়িত্ব যেন মনে থাকে যে, তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ যেন এক একটি বুদ্ধ, শঙ্কর, এক একটি গার্গী, মৈত্রেয়ী হইতে পারেন। গৃহ শুধু শান্তি স্নেহ পবিত্রতার আকর হইবে না,—শিশু কন্যাগণের—সমস্ত পরিবারবর্গের শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র হইবে। হৃদয়ের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে হইলে ধর্ম্ম ও বিদ্যা প্রথম হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। এবং মাতাই প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী—শুধু শিশুর নহে, সমাজের ও জগতেরও বটে। ভগ্নী নিবেদিতা বলেন যে, মাতাগণই এইরূপে জগতের আদর্শ সভ্যতা ও আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠন করিতে পারিবেন।

ভারত ও সূফী-মতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুহম্মদ এনামুল হক এম্-এ

ভারতীয় সূফীদিগকে বুঝিতে গেলে, তাঁহাদের ভাব-জগতের সম্যক্ পরিচয় আবশ্যক। এই ভাবজগতে কালক্রমে কিরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও বিবর্ত্তন (evolution সংঘটিত হয়, তাহার একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, বিদেশীয় সূফী-মতবাদের সহিত, ভারতীয় সূফী-মতবাদের তুলনামূলক সমালোচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আরবী, বিশেষতঃ ফারসী ভাষায় আমাদের সম্যক্ ও গভীর জ্ঞানের অভাবে, এ কাজ আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য—সন্দেহ নাই। তথাপি স্বীয় কৌতূহল নিবারণ করিতে গিয়া, এ বিষয়ে যে সামান্য অনুশীলন করিয়াছি, তাহার ফল সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

ইস্‌লামের মূলমন্ত্র হইল,—"তব্‌হীদ্" বা ভগবানের পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একত্ববাদ (pure and unmixed monotheism)। ভগবানের পূর্ণ ও বিশুদ্ধ একত্বকে মানিয়া লইয়াই, ইস্‌লাম ধর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। "ঐস্‌লামিক ভগবৎ-সত্তা পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ; সংখ্যাবাহুল্য ও ভাগ-বাটোয়ারা হইতে বিমুক্ত। ইহা ভগবৎ-সত্তায় বহুত্বকে এবং ঐহিক ব্যাপারে কোন জীবের অংশ গ্রহণকে স্বীকার করে না।" (১) ঐস্‌লামিক ভগবান, সৃষ্টির বহির্ভূত সর্ব্বগুণান্বিত এমন এক পূর্ণ সত্তা, যাঁহাকে মানুষ দেখিতে পায় না, ধারণা করিতে পারে; স্পর্শ করিতে পারে না, অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে পারে; তিনি সৃষ্টি হইতে বিমুক্ত ও ইহার স্বাভাবিক দোষগুণ হইতে পবিত্র; সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার লীলা মানুষের নিকট প্রকাশ পাইলেও, ইহার অবর্ত্তমানে অন্য কোন বিচিত্ররূপে তাঁহার এই অপরূপ লীলা প্রকাশ পাইত। এইজন্য সৃষ্টিকেই তাঁহার একমাত্র প্রকাশস্থল (মজ্‌হর্) এবং তাহার অবর্ত্তমানে ভগবানের অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ, প্রভৃতিতে বিশ্বাস করা একান্তই অনৈস্‌লামিক। ভগবৎ-সত্তাকে বর্ণনা করিতে গিয়া কোরাণ বলিতেছেন, "বল (মুহম্মদ্) 'আল্লাহ্ এক; 'আল্লাহ্ তিনিই, যাঁহার নিকট হইতে কিছুই স্বাধীন ও মুক্ত নহে; তিনি (কাহাকেও) জন্মদান করেন না, এবং তিনিও (কাহারও নিকট হইতে) জাত নহেন; এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই।" (১) তিনি অনাদি, অনন্ত ও স্বয়ম্ভূ—তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সমস্তই তাঁহার মুখাপেক্ষী।

অতি সংক্ষেপে ঐস্‌লামিক "তব্‌হীদের" মূলমন্ত্র হইল ইহাই। এখন দেখা যাক্ এই "তব্‌হীদ্" ভারতীয় সূফীদের হাতে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কোন্ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় সূফী মতে "তব্‌হীদ্" দ্বিবিধ; যথা "তব্‌হীদ্-ই-বুজূদী" অর্থাৎ "অস্তিত্ব-প্রধান একত্ব", এবং তব্‌হীদ্-ই-শুহূদী" অর্থাৎ "প্রমাণ-প্রধান একত্ব"। (২) প্রথমোক্ত "তব্‌হীদ্", একত্বসম্বন্ধীয় ধারণার প্রথমাবস্থা,এবং শেষোক্ত "তব্‌হীদ্" ইহার দ্বিতীয় বা পূর্ণ পরিণত অবস্থা। প্রথমোক্ত অবস্থায় সিদ্ধ হইলে, শেষোক্ত অবস্থায় পূর্ণত্বলাভ ঘটে। এই দ্বিবিধ তব্‌হীদের সংজ্ঞা এইরূপ :—

(১) তব্‌হীদ্-ই-বুজূদী (অস্তিত্ব-প্রধান একত্ব) :—"তব্‌হীদের" এই অবস্থায় ভগবানকে এক বলিয়া ধরিয়া লইয়া, তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন বলিয়া জানিতে হয়, এবং যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থকে এই একক ভগবানের "মজ্‌হর্" বা

১। "There is absolute Unity in Divine nature; it admits of no participation or manifoldness. It denies all plurality of persons in Godhead, and any participation of any being in the affairs of the world."

Quran, Muhammad Ali, Preface, p. viii.

১। কুল্ হুব্-ল্-লাহ্ 'আহদ; 'আল্লাহু-স্-স্বমদ; লম্ য়লিদ্ ও লম্ য়ূলদ্; ও লম্ য়কুন্-ল্-হু কুফুওয়ান্ 'আহদ্।

কুরআন, ১১২ অধ্যায়।

২। 'তব্‌হীদ্-ই-বুজূদী' শব্দের এবং ব্যবহার আমরা পাই ভারতীয় সূফী অকবরের লেখায় (ষোড়শ শতাব্দী)। ইংরেজ 'তব্‌হীদ্-ই-শুহূদী' শব্দ প্রয়োগ করেন শেখ আহমদ সরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪)।

অভিব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিতে হয় (১)। ইহার মূল কথা হইল,—ঈশ্বর ভিন্ন কোন বস্তু নাই, তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান, সর্ব্ব বস্তুতে তাঁহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। ঈশ্বর এক হইলেও পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানের-তৃণে বিদ্যমান আছেন বলিয়া, পৃথিবীর প্রত্যেক সজীব ও নির্জ্জীব পদার্থ তাঁহার প্রকাশস্বরূপ। পৃথক পৃথক স্থানে, পৃথক পৃথক কালে ও পৃথক পৃথক পাত্রে, তাঁহাকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখিতে হইবে। এই অবস্থায় কেবল অস্তিত্বই বৈশিষ্ট্য; এবং সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব দেখিতে হয়। একমাত্র অস্তিত্বের ভাবই প্রধান বলিয়া, ইহাকে "অস্তিত্ব প্রধান একত্ব" বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

(২) তৎহ্বীদ্-ই-শুহুদী (প্রমাণ-প্রধান একত্ব):—"তৎহ্বীদের" এই অবস্থায়, "সালিক্" (আধ্যাত্মিক পথযাত্রী) সৃষ্টিকে ভুলিয়া গিয়া কেবল এক স্রষ্টাকেই দর্শন করেন এক ঈশ্বর ভিন্ন তিনি আর কোন পদার্থই দেখিতে পান না—অথচ পদার্থগুলির অস্তিত্ব বিদ্যমান। ভগবান আধ্যাত্মিক পথযাত্রীর মন এমনই অধিকার করিয়া বসেন যে, তিনি সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব ভুলিয়া, কেবল এক ঈশ্বরকেই দর্শন করেন। আকাশে প্রকৃতপক্ষে সকল সময় তারকারাজি বিদ্যমান থাকিলেও সূর্য্যোদয়ে যেমন সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, এই প্রমাণ-প্রধান একত্বের অবস্থাও অনেকখানি সেরূপ। বাহ্যমান চাক্ষুষ প্রমাণই এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য; সুতরাং ইহাকে "প্রমাণ প্রধান একত্ব" বলা হইল। (২)

এই বিবিধ তৎহ্বীদের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য কোথায়, তাহাও একবার দেখা আবশ্যক। প্রথমোক্ত তৎহ্বীদে, বিভিন্ন সৃষ্টির ভিতর এক স্রষ্টা বর্ত্তমান আছেন বলিয়া কল্পনা করিতে হয়; আর শেষোক্ত তৎহ্বীদে সৃষ্টির কথা ভুলিয়া গিয়া, কেবল এক স্রষ্টাকেই দর্শন করিতে হয়। একটি কল্পনার লীলায় লীলায়িত ও ভাবপ্রবণতার ভাবে নিমীলিত; আর অপরটি জাজ্বল্যমান চাক্ষুষ প্রমাণের বিশ্বাসে ভরপুর। উভয়ের মধ্যে একত্ব বস্তুটি সাধারণ,—উভয়েই একত্বে বিশ্বাসপরায়ণ; তবে প্রথমোক্তটিতে বহু বিভিন্ন বস্তুর মিলনমূলক একত্ব (unification of many constituent elements into one whole); আর শেষোক্তটিতে অভাবজাত পূর্ণ একত্ব (absolute unity)।

আমাদের এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে "অস্তিত্ব-প্রধান একত্বের" পূর্ণ ও পরিণত অবস্থা হইল "প্রমাণ-প্রধান একত্ব।" ভারতীয় সূফীদের মতে যে পর্য্যন্ত "অস্তিত্ব-প্রধান একত্ববাদীরা" "প্রমাণ-প্রধান একত্ববাদীর" শ্রেণীতে উন্নীত না হন সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হয় না। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক সৃষ্টির ভিতর ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে করিতে, আধ্যাত্ম-প্রেম সৃষ্টিকে ভুলাইয়া, কেবল এক স্রষ্টাতেই আধ্যাত্মিক পথযাত্রীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেয়। তখন আধ্যাত্মিক পথযাত্রী (সালিক্) এক স্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। এই অবস্থার নামই "প্রমাণ-প্রধান একত্ব"। নক্‌শবন্দীয়হ্ সম্প্রদায় ভিন্ন, ভারতীয় অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ে অগ্রে "অস্তিত্ব-প্রধান একত্ব" সিদ্ধ হয় ও পরে "প্রমাণ-প্রধান একত্ব" সাধিত হয়। (১)

"তৎহ্বীদ্" সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকজন ভারতীয় সূফীর বাণী তাঁহাদের জীবনী বা কবিতা-সঙ্কলন হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। আশা করি, ইহা দ্বারা পাঠকের সহিত ভারতীয় সূফীদের চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবে। খাজাহ্ মুঈনু-দ্-দীন চিশ্‌তী (১১৪২-১২৩৬) সাহেব বলিতেছেন:—

"আমি মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের মধ্যে মূর্ত্তি-নির্ম্মাতার যখন দেখিয়াছি: (মূর্ত্তি ও তাহার নির্ম্মাতার মধ্যে) বিন্দুমাত্র একত্ব বিদ্যমান, (তাই) আমি এখন মূর্ত্তি-উপাসক।"

মন্ দর্ জমাল্-ই-খুত্ কখ্-ই-খুত্ পদীদহ্ আম্।
তৎহ্বীদ্ মন্ অজ্ঞত্ কনুন্ খুত্ পুরস্তিদম্।

"আমি যখন (খোদার) গুণ ও সত্তায় একত্বে অন্য হইতে পৃথক দেখিতেছি না, তখন যাহাই আমি দেখি, খোদা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না।"

বিকাত্ ব্ ঘাত্ হুঁ অব্ হম্ জুদানমী বীনম্।
ব হর্ চিহ্ মী নিগরম্ খুদ্-ই-খুদা নমী বীনম্।

"তুমি যদি তাহার (=খোদার) মুখ দেখিতে ইচ্ছা কর,

১। ইস্‌রার্-ই-খালিকীয়হ্, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২০২।
২। ঐ, পৃঃ ২০২।

১। ঐ—পৃঃ ১৮৭।

আমার চেহারার দিকে তাকাও : আমি তাহার দর্পণ ; সে আমা হইতে পৃথক নয়।"

পর্‌হী কিস্‌ কথদ্‌ বীনী দর্‌ চিস্‌রহ্‌-ই-মন্‌ ন-নিগর।
মন্‌ আ'ইনহ্‌-ই-উস্‌ত্‌ উ নীস্ত হুদা 'অজ্‌ মন্‌।

"যে দিকেই আমি মুখ ফিরাই, তোমার সৌন্দর্য দর্শন করি, কেননা আমার শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণু তোমার অভিব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছে।"

হর্‌ দা কিস্‌ কথ্‌ কতরহ্‌ হস্ত-ই-উ যী মযহর্‌।
হর্‌ যর্‌রহ্‌ 'অজ্‌ বহ্‌রহ্‌ চু গশ্‌ত্‌ মুর্‌তফা-ই-উ।

শয়খ্‌-ই-বীন্‌ ব্‌ 'অলী ফরগনী একজন ভারতবিখ্যাত ফর্‌ক্বীহ ছিলেন। পানিপথে ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি যে নূতন মতবাদ ভারতে প্রচার করেন, তাহা "ফরগনীয়হ্‌" মতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। তত্‌ত্বীদ্‌ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা (conception) কিরূপ তাহারও একটু নমুনা দেখুন :—

"প্রত্যেক দর্পণে (—সৃষ্টির ভিতর) খ্রিস্টমন্ত্রকে দেখিতে থাক ; প্রতি ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে তাঁহারই বিলাস ও আকৃতি বিরাজিত।"

হর্‌ জা'যী কী বু হর্‌ হর্‌ আ'ইনহ্‌।
হর্‌ ব্‌ সাফ-ই-উ-স্ত্‌ হর্‌ হর্‌ জুবনহ্‌ ঃ

"যাহা কিছু দেখিতে পাও, প্রকৃতপক্ষে তাহা সমস্তই তিনি—প্রদীপ, পুষ্প, পত্তর, বুলবুল সমস্তই তাঁহার কাছ হইতে (আসিয়াছে)।"

হর্‌ চিস্‌ বীনী হর্‌ হকীকত হুবহ্‌ উ-স্ত্‌
দর্‌'অ্‌ অজ্‌ পরবানহ্‌ বুলবুল হর্‌ 'অজ্‌ত্‌।

"তিনি তোমার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছেন, তুমি তোমার সম্বন্ধে বেখবর।"

উ স্ত্‌ দর্‌ দা হর্‌ কু কু 'অজ্‌ খবীশ্‌ গুম্‌।

ভারতীয় সুফীদের বাণী অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ অসংখ্য কথা পাওয়া যায়। তাঁহারা কিরূপে কোন্‌ পথে চলিয়াছিলেন তাহার আভাষ তাঁহাদের বাণীতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এসকল বিষয় দীর্ঘ আলোচনার স্থান এখানে নয়। সুতরাং আমরা আর তাঁহাদের বাণী আলোচনায় অধিকদূর অগ্রসর হইলাম না। পাঠকগণকে তত্‌ত্বীদ্‌ সম্বন্ধে ভারতীয় সুফীদের যে পক্তির প্রকৃত হইল, ইহার পরবর্তী প্রত্যেক মতবাদ এইরূপভাবে তাঁহাদের বাণীর সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

ভারতীয় সুফীদের বিশ্বাসের (ঈমান) দিক আলোচনার পর, তাঁহাদের কর্মের বা লৌকিক দিকটুকুও আলোচনা করা নিতান্তই আবশ্যক ; নহিলে তাঁহাদের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়। তাঁহাদের বিশ্বাসের দিক যেরূপই হউক, তাঁহারা ভারতবাসীর জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা চির-দিনই ভারতের আদর্শস্থানীয়। যুগে যুগে ভারতে বহু মহাপুরুষ ও ভগবান্‌ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যুগে যুগে তাঁহারা মূলবান বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নরের সেবা করিয়া নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিবার কথা মূলতঃ ভারতেরই বৈশিষ্ট্য। তাহার অনেক পরে পৃথিবীর নানাস্থানে, নানা মহাপুরুষের বাণীর ভিতর দিয়া, এই মধুময় বাণী প্রকাশ পাইয়াছিল। ভারতের যুগে যুগে নানা সংসারত্যাগী মহাপুরুষেরও আবির্ভাব হইয়াছিল, আগন্তুক সুখ, ঐশ্বর্য ও বিলাসের বিপক্ষে তাঁহারাও আজীবন সংগ্রাম করিয়া গেছেন। কিন্তু মুসলমান সুফীদের আগমনের পর হইতে, বিশেষতঃ ভারতে সুফীদের প্রভাব স্থায়ী হওয়ার পর হইতে, হিন্দু-মুসলমান যত সাধু ও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, ভারতেতিহাসের আর কোন অধ্যায়ে তেমনটি হয় নাই। মুসলমান সাধকদের আগমনের ফলে, ভারতের প্রাচীন সেবাধর্ম, ভারতের প্রাণের জিনিষ সংসার-নিস্পৃহতা ও বৈরাগ্য, এবং ভারতের অন্যান্য প্রাচীন সাধনা, যেরূপ নূতন প্রাণ, নবীন বল ও অভিনব শক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা স্বীকার না করিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়। নানা কারণে, ভারতের চলচ্ছক্তি যখন থামিয়া গিয়াছিল, ভারতের যৌবনতা যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন সুফীরা নব বল ও নূতন প্রেরণা লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কর্মের দিক আলোচনা করিতে গেলে, ভক্তিভরে মস্তক আপনিই অবনত হইয়া পড়ে। ইঁহারা একাধারে ভগবৎ-প্রেমিক (তাই বিশ্বপ্রেমিক) এবং বিশ্ববিজয়ী কর্মী ছিলেন। সংসারের সুখদুঃখ, আশানিরাশা হইতে দূরে নির্জনে অবস্থান করিয়া, তাঁহারা কর্ম ও সাধনার জন্য

আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই একটি শতাব্দী অতীত না হইতেই, ভারতের প্রতি পল্লী ও জনপদ, তাঁহাদের অক্লান্ত কর্মতৎপরতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নির্যাতিত, নিপীড়িত রুগ্ন ও ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখে, তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিরাশ ও মৃতপ্রায় প্রাণে সঞ্জীবনী সুধার সঞ্চারণ ও সংসারজ্বালা-দগ্ধ ব্যথা বাধিত হৃদয়ে সহানুভূতি বহন এবং তাহাদের বধির শ্রবণে মন্ত্রশক্তি দান প্রভৃতি অসংখ্য কাজ করিয়া তাঁহারা ভারতের প্রাণ-হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতির কথা চিন্তা করেন নাই, সমাজের কথা ভাবেন নাই, লৌকিক ধর্মের কথা স্মরণ রাখেন নাই,—যেখানেই মানুষের পতন ঘটিয়াছে, যেখানে মানুষের করুণ বিলাপ ও আর্তনাদ উঠিয়াছে, মানের কথা ভুলিয়া, অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়া, সেইখানেই স্বর্গীয় দূতের ন্যায় উদ্ধারের বাণী বহন করিয়া ছুটিয়া গিয়া, তাহাদিগকে আপন কোলে স্থান দান করিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষুধার্তকে আহার দিয়াছেন, নিরাশ্রয়কে ছায়া দিয়াছেন, পীড়িতকে শয্যাপার্শে দাঁড়াইয়া অথবা শুভাশীর্বাদ সাহায্যে শুশ্রূষা করিয়াছেন, মৃত্যুর পরে তাঁহে করিয়া পারলৌকিক কৃত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে বারাঙ্গনা মানুষ হইয়াছে, পাপী পাপাচরণ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, স্বার্থপরতা কর্পূরের মত বা হাতিনের ন্যায় দাতা হইয়াছে, ঘোর সংসারীও পরোপকারে আত্ম বিলাইয়া দিয়াছে। তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, ভোগ-বিলাস-বিমুখ ও সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া, মানুষ কখনও কখনও তাঁহাদিগকে অতিমানুষ বা দেবতা বলিয়াও ভ্রম করিয়াছে। তাঁহাদিগকে দেখিলে বাস্তবিকই মূর্ত নিস্পৃহতা বা শান্তির দূত বলিয়াই মনে হইত; তাই মানুষ আপনিই তাঁহাদের পাছে পাছে ছুটিয়া চলিত। মানুষের এই আতিশয্যের অত্যাচার হইতে তাঁহাদের কেহ কেহ দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কখনও মানুষকে ঘৃণা করেন নাই। তাঁহাদের কর্মময় নৈতিক দিক বাস্তবিকই ভারতবাসীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁহাদের এই দিকটি খাজা মুঈনুদ্দীন্ চিশ্‌তী সাহেবের এই কয়টি বাণীর ভিতর হইতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"যে ব্যক্তি খুদা তা'আলার বন্ধু ও তাঁহাকে বান্ধিত বলিয়া মনে করিবে, তাহার মধ্যে চারিটি বস্তু পাওয়া যাইবে, —ভদ্রতা, প্রেম, বদান্যতা ও সংসঙ্গ।"

"তিনটি বস্তু মানবহৃদয়ে মুক্তা স্বরূপ,—শত্রুর সহিত মিত্রতা করা, নিস্পৃহ ভাবে নিজের দারিদ্র্য গুপ্ত রাখা, স্বীয় দুঃখ কাহারও নিকট ব্যক্ত না করিয়া আত্মস্থ থাকা।"

"যিনি দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, পীড়িত ও মৃতের বন্ধু, 'আল্লাহ্' তাঁহার বন্ধু হন; খোদার আত্মসমর্পণ করা ও কাহারও মুখাপেক্ষী না হওয়া তাঁহার উচিত।" (তযকিরহ্-ই-ঔলিয়া-ই-হিন্দ্, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৮-১৯)

চিশ্‌তীয়হ্ মণ্ডলীর আরও কতকগুলি শিক্ষা আলোচনার যোগ্য। কেবল এই সম্প্রদায়ভুক্ত দরবেশেরাই এই উপদেশ ও শিক্ষাগুলি যে মানিয়া চলিয়া থাকেন তাহা নহে, ভারতে অধিকাংশ দরবেশরাই এই শিক্ষা অনুকরণ করিতেন। এই শিক্ষাগুলিতে এই মণ্ডলীর কৃচ্ছ্রসাধন ও সন্ন্যাসের দিকই অধিক পরিস্ফুট। সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে :—

"বিপদকে করুণা, বিষাদকে আনন্দ ও উপবাসকে গৌরব বলিয়া মনে করিবে; বেদনা ও আরামকে এক বলিয়া জ্ঞান করিবে; সৎলোকের সংসর্গ রাখিবে; দরিদ্রকে ভালবাসিবে; সাংসারিক ব্যক্তি হইতে দূরে থাকিবে; গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিবে না; ভগবদ্ভক্ত সাধুর বাণী অনুধাবন করিবে ও তাঁহাদের কাহিনী অপর্যাপ্তরূপে পাঠ করিবে।" (তযকিরহ্-ই-ঔলিয়া-ই-হিন্দ্, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৯)

আমাদের উপরোক্ত আলোচনা, বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ও অপ্রচুর হইলেও, আশা করি ভারতীয় সূফীদের মধ্যে কতটুকু ভারতীয় প্রভাব অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহার একটি মোটামুটি আভাস মিলিবে। পাঠকদিগকে কেবল চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর দেওয়া এবং তুলনা করিয়া বুঝিয়া লইবার সুযোগ দেওয়ার জন্যই ইহার পাশে বিশুদ্ধ ঐস্‌লামিক "তব্‌হীদ্"কেও অতি সংক্ষেপে আলোচনায় আনিয়াছি। ভারতীয় সূফীদের পরিবর্দ্ধিত "তব্‌হীদ্" হইতে ঐস্‌লামিক "তব্‌হীদ্"টুকুকে বাদ দিলেই দেখা

যাইবে, ইহার অধিকাংশ অবশিষ্টাংশ বিশুদ্ধ ভারতীয় উপাদান হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুদের "সর্বং খল্বিদং" ব্রহ্মবাদ ইহার গোড়ায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে রস-সিঞ্চন না করিলে, ভারতীয় সূফীদের এই "তত্ত্বজ্ঞান" বা ব্রহ্মবাদ অন্য পথ অবলম্বন করিত, তাহা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। কালক্রমে ভারতীয় সূফী-মতবাদের সহিত উপনিষদ প্রমুখ ভারতীয় দর্শনের চিন্তাধারা ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতেছিল; আর এদেশে সূফী-মতবাদও সেই চিন্তাধারার পরিপুষ্টি সাধন করিতে করিতে ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিতে লাগিল।

এ স্থলে, প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। ভারতে সূফী-প্রভাব পড়িবার পূর্ব্ব হইতে, সূফী-মতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে সূফী-মত প্রবেশ করে। কিন্তু তৎপূর্ব্ব সূফী-মতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার পরেও সূফী-মতবাদের মধ্যে যে ভারতীয় দর্শনের ছাপ রহিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। মুসলমানগণ এ কথা স্বীকার করুন বা না নাই করুন, কোন নিরপেক্ষ ও উদার ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না, যে ভারতীয় চিন্তার পরিপুষ্টি না হইলে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী-পূর্ব্ব সূফী মত বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় লাভ করিতেছি, এরূপ অবস্থায় কখনও লাভ করিতাম না। সে যাহা হউক, সূফী-মতবাদের প্রারম্ভিক কাল হইতে, ইহার উপর ভারতীয় প্রভাব পড়িতে থাকে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অন্তরাল হইতে সূফী-মতবাদের উপর ভারতীয় চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিলেও, ইহার ভারত-প্রবেশের পূর্ব্বে, ভারতীয় চিন্তা প্রকাশ্যভাবে সূফী-মতবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এত দিন ভারতীয় প্রভাব, অন্তরাল হইতেই, ভারতীয় পুস্তকের আরবী ও ফারসী অনুবাদ ও ভারতীয় (অর্থাৎ বৌদ্ধ) শ্রামাণ সাধু (অর্থাৎ ভিক্ষু) সন্ন্যাসী প্রভৃতির ভিতর দিয়া গোপনে গোপনে উহার সূফী-মতবাদের মূলে রস-সিঞ্চন করিতেছিল।

অনুবাদের দিক হইতে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, 'অব্বাসী খলীফাদের খলীফা 'আল-মন্‌সূর্' (৭৫৪-৭৭৫ খ্রীঃ) এবং হারূন্ 'অ'-রশীদ্' (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) প্রমুখ খলীফাদের পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের চেষ্টাই, প্রাথমিক যুগের সূফীদের সহিত ভারতীয় চিন্তাধারার পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছিল। এই সময় অনেকগুলি ভারতীয় পুস্তক, হয় সোজা সংস্কৃত হইতে, নতুবা সংস্কৃত হইতে পাহ্‌লবী (অর্থাৎ প্রাচীন ফারসী) ভাষায় অনূদিত পুস্তক হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই অনূদিত পুস্তকের মধ্য হইতে, এখনে, "বুদ্‌দ্" পুস্তক (এই পুস্তকে বুদ্ধদেবের মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে) এবং "বলোহর্ ব্ বুদাসাফ্" বা "বল্‌লাম্ ও যোসফত্" নামক পুস্তকের নাম করা যায় (১)। (এই পুস্তকে বল্‌লাম্ নামক সন্ন্যাসী কর্তৃক যোসফত্ বা বুদাসাফ্ অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থার কোনও ভারতীয় রাজপুত্রের দীক্ষাদানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।)

এই যে 'অব্বাসী খলীফাদের সময় হইতে মুসলমানদের বিদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা চলিল, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহা কখনও একেবারে থামিয়া যায় নাই। বিদ্যোৎসাহী খলীফাদের সময় জ্ঞান-আহরণের কাজ সুচারুরূপে চলিতেছিল। তাহা ব্যতীত বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা নানা দেশ-বিদেশের জ্ঞান-আহরণে জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিবার স্থান ইহা নহে। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধানতঃ নিজের প্রেরণায়, পরদেশের জ্ঞান-আহরণে নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে এস্থলে বিশ্ববিশ্রুত মহাপণ্ডিত 'আল-বিরূনী'র নাম উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তিনি পাতঞ্জল দর্শন ও সাঙ্খ্য সূত্রকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া, মুসলিম জগতের জন্য, রহস্যময় ভারতীয় ন্যাস ও যোগের দ্বার অবারিত করেন (২)। ভারতীয় সূফীদের পূর্ব্ববর্তীরা

১। (i) Muhammad and Islam—Goldziher. p. 172.
(ii) Indian Islam—Titus. p. 148.

২। History of Indian Literature—Weber. p. 239.

যে ইহার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয়েন নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে যাওয়া মূর্খতা বই আর কিছুই নহে।

বৌদ্ধদিগের সহিত দুই ভাবে প্রাচীন মুসলমানেরা পরিচিত হয়েন। প্রথমতঃ 'অব্বাসী বংশীয় খলীফাদের সময়ে প্রামাণ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আরবের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। জাহিযের (মৃঃ ৮৬৬খ্রীঃ) বিবরণ হইতে (৩) আমরা এহেন একদল ভারতীয় সাধুর সন্ধান লাভ করি। তাঁহাদিগকে জাহিয্ "শিন্দীক্" সাধু বলিয়া অভিহিত করিলেও, আমরা তাঁহাদিগকে কেবল 'মানী' সম্প্রদায়ভুক্ত (৪) বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি না। জাহিযের বিবরণ হইতে বুঝা যায়, ইঁহারা ভারতীয় সাধু—বিশেষতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু হউন বা না হউন, অন্ততঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ভাবাপন্ন সাধু ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মুসলমান রাজ্য যখন বুখারা ও সমরকন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন পূর্ব্ব-পারস্য ও ট্রান্সক্সানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। যে বল্খ্ সহর হইতে অসংখ্য মুসলমান সূফী জন্মলাভ করেন, তথায় বৌদ্ধ বিহার তখনও বেশ জাগ্রত ছিল। বল্খ্ অধিপতি ইব্রাহীম্ ইব্ন্-'অদ্হম্ (মৃঃ ৭৭৭খ্রী) রাজ্যত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের মতই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৫)

এ সকল বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, ভারত-প্রবেশের পূর্ব্ব হইতেই সূফী-মতবাদ নানাভাবে ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত হইতে থাকে। তারপর, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সূফী-মতবাদ নিঃসন্দিগ্ধভাবে ভারতে প্রবেশ করিলে, হিন্দু যোগ ও দর্শনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে। তাহা পুস্তকের সাহায্যে বহুদূর সাধিত হয় নাই, ভারত-আগত সূফীদের সহিত ভারতীয় হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্রব সাহায্যে তদ্ভোধিক সাধিত হয়। ভারতীয় ও ভারত-আগত সূফীদের বিস্তৃত জীবনী পাঠ করিলে, দেখা যায়, তাঁহারা নানা মতাবলম্বী ভারতীয় সাধুদিগকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষাদান করিয়াছেন, অথবা ভারতীয় সাধুদিগকে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কিরামত দ্বারা, কি তর্কের দ্বারা পরাজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খ্বাজাহ্ মু'ঈনু-দ্-দীন্ চিশ্তী (১১৪২-১২৩৬ খ্রীঃ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যেক সূফী হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্রবে আসিয়াছেন। এহেন সংস্রবের ফলে, উভয় শ্রেণীর সাধকের উপর উভয়ের প্রভাব বিস্তার নিতান্তই স্বাভাবিক।

উপরে, সূফী-মতবাদের মধ্যে ভারতীয় প্রভাব প্রবেশের যে সকল পথ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়, সূফী মতবাদ উহার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ভারতে প্রবেশের পর পর্য্যন্ত, ইহা ভারতীয় প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। সূফী-মতবাদ ভারতে প্রবেশ করিলে, তাহাতে ভারতীয় প্রভাব অসম্ভাবিতরূপে ক্রিয়া করিয়াছিল। নিম্নে আমরা এই ক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমরা স্থানান্তরে দেখিয়াছি, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব-সূফী-মতবাদে, কি প্রবলভাবে বিশ্বব্রহ্মবাদ (Pantheism) দেখা দিয়াছিল (৬)। তাহার মূলে ভারতীয় চিন্তাধারা যদি কোনই ক্রিয়া না করিয়া থাকে, তবে খৃষ্ট একেশ্বরবাদী মুসলমান ইহা কোথা হইতে লাভ করিয়াছিল? সত্যই পৃথিবীর সকল যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধকের মধ্যে, কোন কোন সময় এহেন মানসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে;—তাহাদের উপর ভারতীয় প্রভাব আরোপ করা যায় না। তথাপি, সূফী-মতবাদের ঐতিহাসিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার কথা স্মরণ রাখিলে, ইহার উপর ভারতীয় প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব। হয়ত অপরাপর দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

৩। Muhammad and Islam—pp 172 173.

৪। "শিন্দীক" কথার দ্বারা অবশ্যই প্রথমতঃ ধর্ম্মসংস্কারকদিগকে বুঝায়। যেমন-আবেস্তা ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ। ভারতের পার্শী সম্প্রদায় এখন কদাপি ধর্ম্মাবলম্বী। এই সকল সম্প্রদায় ইকবেতেনার (Ecbatana) অধিবাসী মানী নামক কোন সাধুপুরুষের শিষ্য। মানীর জীবনকাল ২১৫ হইতে ২৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বস্তু দুইটি মূল বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে,—আলোক ও অন্ধকার, অথবা ভাল ও মন্দ। ইংরাজীতে এই সম্প্রদায়ের নাম Manichaan. —লেখক।

৫। The Mystics of Islam—R. A. Nicholson. pp. 16—17.

৬। ১৩৩৮ বৈশাখের "বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রিকায় প্রকাশিত "সূফী-মতবাদের উদ্ভব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সাধকদের মধ্যে যেমন দেখা দিয়াছিল, তেমনই মুসলমান মর্ম্মবাদী সাধকদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে বিশ্বব্রহ্মবাদ দেখা দিয়াছিল। তথাপি স্বীকার করিতে হয়, এই স্বাভাবিক বিকাশটি ভারতীয় প্রভাবে সজাগ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব-সূফী-মতবাদে যে বিশ্বব্রহ্মবাদ দেখা দেয়, তাহা ইস্‌লামী আবছায়ায় আবৃত; তাহাকে ঠিক "সর্ব্বং খল্বিদং" ব্রহ্মবাদ বলা চলে না। ইহাকে সাবধানতার সহিত মর্ম্মবাদের অস্পষ্ট দিক বলিয়া উল্লেখ করা সমীচীন। এই চিন্তাধারায় শৃঙ্খলা নাই, যেন একটু অস্পষ্ট, যেন একটু বাতুলতাযুক্ত। ইহা যখন পারস্যে আসিয়া কিছুদিন বাস করিল, তখন যেন একটু শৃঙ্খলালাভ করিল, একটু স্পষ্ট হইল। এইরূপ হওয়ার কারণ, ভারতীয় বা আর্য্য-প্রভাব। চিরদিনই ভারত ও পারস্যের আত্মা সমত্বে গ্রথিত। ভারত পারস্যের মধ্যবর্ত্তিতায় হউক কি সোজাসুজিই হউক, সূফীদের উপর প্রভাব বিস্তার না করিলে, সূফী মত-বাদ পারস্যে আসিয়া স্পষ্টতর হইত কি না সন্দেহ। তারপর সূফী-মতবাদ যখন ভারতে প্রবেশ করে, তখন হইতে ইহা ভারতীয় প্রভাব-পরিপুষ্ট হইয়া বিশ্বব্রহ্মবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। পারস্যবাসী সূফীদের "হমহ্ উস্ত্"—সকল বস্তুই ভগবান—অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মবাদ, ভারতে আসিয়াই পূর্ণভাবে বিকাশ পায়, অর্থাৎ পারস্যের "হমহ্ উস্ত্" ভারতে আসিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং" ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়।

সূফীদের "ফণা" বা "অহংলোপ"-মতবাদের গোড়ায় ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। পারস্যের অন্তর্গত বিস্‌তামের মর্ম্মবাদী সাধক বায়িযীদ্ (মৃঃ ৮৭৪খ্রীঃ) এই মতের প্রতিষ্ঠা করেন। (১) বায়িযীদ্ বিস্‌তামীর গুরু 'অবু 'অলী সিন্ধুদেশবাসী ছিলেন (২)। সুতরাং বায়িযীদ্ এই মতবাদের ধারণাটি (conception) যে তাঁহার গুরুর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "ফণা"র মধ্যে ভারতীয় প্রভাব নিহিত আছে বলিয়াই, সর্ব্ববিষয়ে না হইলেও, ইহার সহিত অনেক বিষয়ে "নির্ব্বাণ"-মতবাদের মিল রহিয়াছে। জগৎ হইতে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, 'অল্লাহ্‌র সহিত মিশিয়া যাওয়ার অবস্থার নামই "ফণা"; আর, জগতের পাপ হইতে, কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া, ভগবদ্‌প্রাপ্তি ঘটিলে বৌদ্ধদর্শনবর্ণিত "নির্ব্বাণ" লাভ ঘটে।

ভগবদ্-লাভের নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে গিয়া নক্‌শবন্দীয়, মওলী মানবশরীরে পরমার্থ আলোকের ছয়টি বিশিষ্ট "লতীফহ্" বা আলোক-কেন্দ্র নির্দ্ধারিত করি-য়াছে। ভারতীয় অন্যান্য মওলীগুলি পরবর্ত্তী সময়ে এই "ষড়-আলোককেন্দ্রকে" স্বীকার করিয়া লইয়াছে। "লতীফহ্"-সাধনপ্রয়াসী ভারতীয় সূফীদের প্রধান উক্তেশ্য হইল,—কোন কোন বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া "লতীফহ্"-নির্গত বিবিধ বর্ণের আলোকমালার ধ্যান করিতে করিতে এক এক আলোককে এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা। এইরূপ ভাবে আলোক-মালা স্থানান্তরিত করিতে করিতে নাকি সূফীর সমগ্র শরীর আলোকিত হইয়া উঠে, এবং তিনি নিজেকে মৌলিক আলো-কের (Primal Light) সহিত এক বলিয়া মনে করিতে থাকেন এবং পরিশেষে তাহার সহিত একেবারে মিশিয়া এক হইয়া যান (১)। নক্‌শবন্দীয়হ্ মওলীর এহেন ভগবদ্‌লাভের পন্থা নির্দ্ধারণ, হিন্দু যোগশাস্ত্রের "কুণ্ডলিনী"-সাধনের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে (২)। এই উভয়-বিধ পদ্ধতির বিশেষ কোন বিরোধ নাই। ভারত হইতে ইহা লাভ না করিলে এ দেশীয় সূফীরা তাহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইল? প্রধান প্রধান প্রাচীন সূফীরা এবম্বিধ পন্থার বিশেষ কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। প্রকৃত-পক্ষে এরূপ পন্থার দ্বারা দিয়া ভগবদ্‌প্রাপ্তিকে অনৈসর্গিক পন্থা বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

ভারতীয় সূফীদের উপর এদেশীয় প্রভাবের স্বরূপ জানিবার পর, স্বতঃই মনে একটি কৌতূহল জাগে,—কিরূপে এই প্রভাব, সূফী-মতবাদের মত এতখানি বিদেশীয় একটি নূতন চিন্তাধারার প্রভাব বিস্তার করিল? এবং কখন

১। Encyclopædia of Islam—Article "Yasawul."

২। The Mystics of Islam—P. 17.

১। 'ইরশাদ্-উ-তালিবীন্- পৃঃ ১২৪-১৪২ (দ্বিঃ সং)

২। Development of Metaphysics in Persia—Dr. Iqbal. P. 110.

কি ভাবে তাহার ক্রিয়া চলিয়াছিল ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া বিপজ্জনক ও শক্ত ব্যাপার। সাধারণভাবে এইটুকু পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ইহার আরম্ভ হয় এবং কবীরের পর হইতে তাহা ক্রমশঃ চরমে উঠিতে থাকে। কিরূপে সূফী মতবাদে ভারতীয় প্রভাব প্রবেশ করিল, তাহার একটি ধারা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম :—

সূফীরা 'আল্লাহ্'র সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, "'আল্লাহ্' আকাশ ও পৃথিবীর আলোক স্বরূপ।" পরবর্ত্তী-কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া মতটিতে রং ধরিল, "সৃষ্টিই 'আল্লাহ্'র আলোক স্বরূপ।" অর্থাৎ যেহেতু 'আল্লাহ্' আলোক, এবং সৃষ্টি ইহার আলোক স্বরূপ, সেই হেতু সৃষ্টির বাহিরে তাঁহার অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টির ভিতর দিয়াই তাঁহাকে প্রকাশিত হইতে হয়, সুতরাং সৃষ্টি না হইলে তাঁহার প্রকাশ হয় না ;—ইত্যাকার মত দাঁড়াইয়া যাইতে লাগিল। আরও পরবর্ত্তীকালে ইহার সহিত উপনিষদের সৃষ্টিবাদ মিলিত হইয়া আরও একটু নূতন রং ধরিল। এই সৃষ্টি-বাদের মিলনের ফলে সূফীদের মধ্যে কত যে নূতন নূতন সৃষ্টিরহস্যের উদ্ভব হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সূফীরা বলিয়া থাকেন, ইসলামে "শরী'অত" বা কর্ম্মভাগের যেমন "কলিমহ্", "নমায্", "রোযহ" (রোজা), "হজ্জ্" ও "যকাত্" এই পাঁচটি সর্ব্বপ্রধান বিষয় রহিয়াছে, তেমনই "তরীকত" বা মর্ম্মভাগেরও "যিক্‌র্" (জপ), "রাবিতা" (সংযোগ-সূত্র) ও "মুরাকিবহ" (ধ্যান) এই তিনটি প্রধান বিষয় রহিয়াছে। কর্ম্মভাগের কর্ত্তব্য-পালনের কোন একটি পালন অথবা বিশ্বাস পর্য্যন্ত না করিলে যেমন প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না, ঠিক তেমনই মর্ম্মভাগের ত্রিকর্ত্তব্যের কোন একটি সম্পাদন না করিলেও নাকি প্রকৃত সাধক হওয়া যায় না।

যিক্‌র্ বা জপ :—খুদার পবিত্র নাম "'আল্লাহ্" শব্দকে সতত জপ করার নাম "যিক্‌র্"। মনকে সংসার-চিন্তা হইতে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া, কেবল ভগবদ্-চিন্তায় বিভোর রাখিবার জন্য, প্রাথমিক অনুষ্ঠান হইল "যিক্‌র্"। কোন মানসিক বিষয় সাধন করিতে হইলে, সে বিষয়ে গভীর একাগ্রতা নিতান্ত প্রয়োজন। ভগবানের চিন্তায় একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য, এই "যিক্‌র্" আবশ্যকীয়। ইহা যেন বীজ বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পন্থা। মনকে সমস্ত চিন্তা হইতে ফিরাইয়া লইয়া একমাত্র ভগবদ্-চিন্তায় পরিচালিত করিতে হইলে, ভগবানের নাম সতত ভক্তিভরে জপ করিতে হয় এবং তদ্বারা ভক্তের সমস্ত চিন্তা ভগবানময় হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে, ভগবদ্ চিন্তায় মানবহৃদয় ভরপুর হইয়া উঠিলে, মানব ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে সমর্থ হয়।

সূফীদের এই "যিক্‌র্" কালক্রমে ভারতীয় কৃচ্ছ্রসাধন-মূলক জপে পরিণত হইল। ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীরা যে প্রণালীর সাহায্যে ভগবানের নাম জপ করিতেন, ঠিক সেই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ভারতীয় সূফীরা পূর্ব্ব-সূফীদের "যিক্‌র্"কে বিশুদ্ধ ভারতীয় "প্রাণায়ামে" পরিণত করিতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সূফীদের সরল সহজ "যিক্‌র্"কে কতকগুলি বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকরণ, বিশেষ বিশেষ ভাব, নির্দ্দিষ্ট সময় এবং স্থিরীকৃত সংখ্যার গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া, নিরুদ্ধ নিশ্বাস ও দৈহিক কৃচ্ছ্রতার আমদানী করিয়া ভারতীয় সূফীরা ইহাকে সাধু-সন্ন্যাসীর জপ-জপ-প্রাণায়ামের পর্য্যায়ে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। সূফীরা যে ধীরে ধীরে মূল হইতে সরিয়া পড়িতেছিলেন, তাহা তখন প্রথমতঃ তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই,—কিন্তু তাঁহারা যে সরিয়া পড়িতেছিলেন, তাহা নিতান্তই সত্য।

রাবিতা বা সংযোগ-সূত্র :—"রাবিতা" শব্দের মৌলিক অর্থ হইল সংযোগ সূত্র। বাঞ্ছিতের সঙ্গে সংযোগ-সাধনের জন্য, পরমার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পরিপক্ক ব্যক্তির সদুপদেশ ও সাহায্য লইয়া, বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছাকারীর মধ্যে মিলন ঘটিলে, উপদেশদাতা ও বাঞ্ছাকারীর মধ্যে প্রধানতঃ ভক্তিবিমিশ্র কৃতজ্ঞতামূলক যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, তাহা বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছাকারীর মিলনে যে নৈতিক যোগসূত্র রচনা করে, তাহার নাম "রাবিতা"। পরমার্থ বিষয়ে উপদেশদাতার নাম "মুর্‌শিদ" (সৎপথে পরিচালক) বা গুরু। "রাবিতা"র কোথাও গুরুপূজার বা গুরুধ্যানের কথা নাই। গুরু পরমার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া শুধুকে উপদেশ দান করেন, আর শুধু তাঁহার উপদেশানুযায়ী কাজ করিয়া স্বীয় চেষ্টায় বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলিত হন। ইহা ঠিক জ্ঞানমার্গের পথে

শিক্ষকের কাজ। শিক্ষার্থী শিক্ষকের উপদেশমত কাজ করিয়া যে জ্ঞানার্জ্জন করে, তাহা তাহার নিজস্ব চেষ্টা, একাগ্রতা ও ঐকান্তিক আগ্রহের মধুময় ফল। অর্জ্জিত জ্ঞান ও শিক্ষার্থীর যোগসূত্রে শিক্ষকের একটি নৈতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইজন্য শিক্ষার্থীর নিকট হইতে শিক্ষক নৈতিক ভক্তি লাভ করিবার একান্তই যোগ্য, কিন্তু পূজার বা ধ্যানের পাত্র নহেন। অথবা এমনও নহে,—হৃদয়ের সমগ্র একাগ্রতা ও ভক্তি দিয়া অহোরাত্র কেবল শিক্ষকের পূজা করিলে, কিংবা শিক্ষকের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে থাকিলে আর শিক্ষার্থী স্বয়ং জ্ঞানার্জ্জনে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, জ্ঞান আপনিই শিক্ষার্থীর ভিতর প্রবেশ করিবে।

প্রাথমিক যুগের সূফীরা এমন পবিত্র "রাবিতা"র কথাই চিন্তা করিতেন। ইহাতে অনৈস্লামিক কোন কথা নাই। ধীরে ধীরে এই "রাবিতা" সরিয়া গিয়া "ফনা ফী-শ্-শয়খ্" বা "গুরুতে বিলীন" অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল। এই "ফনা ফী-শ্-শয়খ্" হইল, শিক্ষার্থী তাহার অভীপ্সিত আধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের কথা ভুলিয়া, নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও মুক্তবুদ্ধির ক্রিয়াকে, গুরুর ইচ্ছা ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লীন করিয়া দিয়া, স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা। আরও ভীষণ কথা হইল,—এই অবস্থায় শিক্ষকে, গুরুর বিদ্যমানতায় কি অবিদ্যমানতায় সকল ক্ষেত্রে ও সকল সময়ে, কেবল গুরুর মূর্ত্তিকেই হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া ভক্তি-শতদলে পূজা ও ত্রিমিতনেত্রে ধ্যান করিতে হয়। ভগবানের কথা দূরে রাখিয়া, বাস্তবের কথা ভুলিয়া কেবল গুরুর মূর্ত্তি ধ্যান করা কি ঐস্লামিক?

এই "রাবিতা" ভারতে আসিয়া কালক্রমে "ফনা ফী-শ-শয়খ্" হইতেও অনৈস্লামিকতার দিকে অগ্রসর হইয়া পড়িল। ভারতের মূর্ত্তিপূজা ও ভক্তিবাদ "ফনা ফী-শ্-শয়খ্"কে পূজার খেয়ালে এবং তদানুষঙ্গিক ভক্তির প্রাবল্যে ভরিয়া দিল। "রাবিতা" সর্ব্বপ্রথম নৈতিক যোগ সূত্র ছিল; পরে গুরুময় ভাবে পূর্ণ হইয়া উহাই উপাসের দ্বারা অভীষ্ট পশ্চাতে পড়িয়া গেল; আরও পরে ভারতে আসিয়া তাহা স্পষ্ট গুরুপূজা এবং দেবোপম ভক্তির আবেগে রঙ্গীন হইয়া উঠিল। ভারতীয় সূফীদের মতে আধ্যাত্মিক পথযাত্রী (সালিক্) নিরাকার ও নিরুপম ভগবানকে অন্তরে ধারণা করিতে পারেন না বলিয়াই নাকি সাকার ও উপাস্যোপযোগী গুরুর প্রতিমা অন্তরে ধ্যান করিবে, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, এবং তাঁহার কথাকে কোরাণের কথা হইতেও সমধিক জ্ঞান করিবে। ইহা যেন হিন্দু দার্শনিকের প্রতিমা-পূজার সাপক্ষে দর্শনসম্মত ব্যাখ্যা: নিরাকার ভগবানকে ধারণা করিতে সাধারণের পক্ষে কষ্ট হয় বলিয়া, কর্ম্মভেদে তাহার বিভিন্ন কাল্পনিক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া সেই নিরাকার ভগবানকে পূজা ও ভক্তি করার বিধান। "রাবিতা"র উপর এমন অসম্ভব ভারতীয় প্রভাবের ফলে, ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ সমগ্র বাঙ্গালাদেশে অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে আজ ভীষণভাবে পীরপূজা, তাঁহাদের প্রতি দেবোপম ভক্তির বহুল প্রচলন, এমন কি তাঁহাদের মৃত্যুর পর গোরপূজা প্রভৃতি অসংখ্য অনৈস্লামিক কুসংস্কারের প্রচলন হইয়া, তাহা একশ্রেণীর মুসলমানের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বস্তুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

মুরাক্বিবহ্ বা ধ্যান:—"যিক্‌র্" বা জপ দ্বারা হৃদয়কে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া, "রাবিতা" বা সংযোগসূত্রের দ্বারা অভিজ্ঞ গুরুর সদুপদেশ লাভ করার পর, ধীর, স্থির ও প্রশান্ত চিত্তে বসিয়া, সংসারের কথা ভুলিয়া গিয়া 'আল্লাহ্'র ধ্যান করার নাম "মুরাক্বিবহ্" এইরূপভাবে পবিত্র, উপদিষ্ট, ধীর ও প্রশান্তমনে 'আল্লাহ্'র ধ্যান করিতে করিতে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে জ্যোতির্ম্ময় 'আল্লাহ্'কে জ্যোতিষ্মান দেখিতে পান এবং সেই অপরূপ জ্যোতিতে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া মানুষ আপনার অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যান। ইহাই "ফনা ফীল্লাহ্" বা "পরমার্থে বিলীন" অবস্থা।

সূফী-মতবাদ ভারতে আসিবার পর হইতে, এই "মুরাক্বিবহ্"র মধ্যেও পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কালক্রমে ভারতীয় সূফীরা ইহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বৈঠক, বিশিষ্ট প্রকারের মনঃসংযোগের উপায় এবং বিশেষ বিশেষ ধ্যান-ধারণার নূতন নূতন প্রণালীর আমদানী করিয়া ফেলিলেন। এই আমদানীর ফলে, ইহা যে ভারতীয় যোগ-শাস্ত্রের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে

পারিয়াছিলেন কিনা জানি না। আদি সূফীদের সরল ও "মুয়াক্কিবহ্" ভারতে আসিয়া কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এইরূপে যোগশাস্ত্রের "আসন", "ধারণা" ও "সমাধি"র যোগে চতুর্ব্বেণীতে পরিণত হইয়া উঠিল। যোগ ও সূফী-মতবাদের সম্মিলনে, ভারতে যে চতুর্ব্বেণীর নবতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে কেবল যে ত্রিবেণীভক্ত ভারতবাসী হিন্দু অবগাহন করিয়া পরমার্থপথ উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল, তাহা নহে, পীরপূজক মুসলমানও তাহার মিশ্রিত সলিলে স্নান করিয়া 'আল্লাহ্'র সহিত সম্মিলনের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

উপরে, ভারতীয় সূফী-মতবাদের প্রবেশ, প্রতিষ্ঠা, বিস্তৃতি, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে গিয়া, শুধু যাঁর কৌতূহল নিরাকরণার্থে যে সামান্য অনুশীলন করিয়াছি, তাহার ফল সন্নিবেশিত হইল। বিষয়টি এত বিস্তৃত, বিশাল ও কৌতূহলজনক যে, অল্পকথায় বলিতে গেলে একরূপ মুস্কিল। তাই, বিষয়টিকে ক্ষুদ্র করিতে গিয়া অনেক আবশ্যকীয় কথাও বাধ্য হইয়া বাদ দিতে হইয়াছে। এই কারণে, বিশেষতঃ এত বিস্তৃত বিষয়ে আমার সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে, বিষয়টি অনেকস্থানে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। আশা করি, পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কাঁচা

আচার্য্য শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

মোহিয়া হিয়া উদয় তব রোদনে-ধোয়া রূপে ;
সহে না দেহে তোমার তব হাওয়ার ঘাও উপে।
কোমল, তবু কাঁকিয়া ধাও হাতের গড়া খাঁচা ;
গন্ধে রসে পরশি' ধাও ওগো ও কচি, কাঁচা।

তরুণ করি' পুরানো আশা করুণ চোখে চাহ ;
দীপিয়ে ধাও নিবানো হাসি, নিবিয়ে ধাও দাহ।
ধাঁধার পরে আনিয়ে ধাও, সাঁচার পরে সাঁচা ;
নিত্য নব নবীন ধাও ওগো ও কচি, কাঁচা।

প্রেমের ঢেউকে নোয়ানো মুখে প্রশান্ত-ধারা ঝরে ;
আলোকে-ভরা সলিলে কেঁপে তোমার ছায়া পড়ে
পুলকে হয় উচ্ছ্বসিত আমার মরা-বাঁচা ;
করুণ ধারে তরুণ কর ওগো ও কচি, কাঁচা।

শিশু-অপরাধী

শ্রী নীরজবাসিনী সোম বি-এ, বি-টি

আপনাদের কাছে আজ এখানে ছেলেমেয়েদের কথা কিছু বলব। এদের চেয়ে আনন্দদায়ক পৃথিবীতে আর কিছু নেই। তাই যীশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না, কারণ স্বর্গরাজ্য এইমত লোকদেরই।" শুধু স্বর্গরাজ্য নয়,—তারা গৃহের সম্পদ, রাষ্ট্রের সম্পদ, তাই প্রত্যেক নারীর কর্ত্তব্য সন্তানদের এই সকল মহামূল্য সম্পদের উত্তরাধিকারী হবার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তোলা। আজ আপনাদিকে যাদের কথা বলব তারা সুখময় গৃহের আবেষ্টনের মধ্যে পিতামাতার স্নেহযত্নে লালিত-পালিত সাধারণ ছেলে নয়; এদের ফুডেনাইল অফেণ্ডার বা শিশু-অপরাধী বলে।

যে সকল হতভাগ্য শিশু পিতামাতার অনবধানতায় বা অবহেলায় অসৎ সংসর্গে প'ড়ে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যায় এবং আইনভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হ'য়ে আদালতের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায়, আমি তাদেরই কথা বলতে যাচ্ছি। বয়ঃপ্রাপ্ত সাধারণ অপরাধীদের মত তাদের বিচার করা চলে না। বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট তাই এদের বিচারের পৃথক ব্যবস্থা ক'রে তার পরিচালনের জন্য নারীদের সাহায্য নিয়েছেন। বালক বালিকাদের কোন কাজে নারীকে বাদ দেওয়া চলে না। ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত দেশ তা মেনে নিয়েছে। বাঙ্গালী মায়ের মত ছেলে ভালবাসতে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের মেয়েরা পারে না। এই সকল শিশু-অপরাধীদের নৈতিক উন্নতি ও সংশোধনের ভার নেবার জন্য তাঁদেরই প্রস্তুত হ'তে হবে। তাদের মানুষ ক'রে দিতে মা'রা ছাড়া আর কেউ পারবে না।

ইংরাজি ১৮৯৭ সালে শিশু অপরাধীদের সংশোধন ও নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে ভারতের সব প্রদেশের জন্য রিফর্মেটারি স্কুলস্ এক্ট (Reformatory Schools Act) নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের মধ্যে শিশু-অপরাধীদের সংশোধনের জন্য নানাস্থানে স্কুল স্থাপন করবার প্রস্তাব আছে। কিন্তু সমস্ত ভারতের অভাবের পক্ষে এই আইন তাদৃশ কার্য্যকরী হয় নি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম শিশুরক্ষণ আইন হয়। তাহার বারো বৎসর পরে যথাক্রমে মাদ্রাজ, কলিকাতা এবং বোম্বাই ও তাদের সহরতলীগুলিকে শিশুরক্ষণ আইনের অধীনে আনা হয়।

আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত শিশুরক্ষণ আইনের একটা মস্ত গলদ হ'চ্ছে এই যে কেবল মাত্র মাদ্রাজ, কলিকাতা ও বোম্বাই সহর এই আইনের অধীন। এই প্রধান তিনটি সহরের বাইরে কোন জেলা এই আইনের অধীন নয়। এই সকল স্থানে শিশু-অপরাধিগণ প্রায় সাধারণ বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধিগণের মতই পরিগণিত হ'য়ে থাকে। আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন বালকবালিকাগণকে সাধারণ অপরাধীর দলে ফেলা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। এখন আমাদের উচিত যাতে এই আইন সমস্ত জেলায় কার্য্যকরী হয়, তার জন্য চেষ্টা করা। এইপ্রকারে শিশুরক্ষণ আইনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকা উচিত :—

১। বিচারাধীন সময়ে শিশু-অপরাধীদের জন্য পৃথক আটক-ঘরের ব্যবস্থা।

২। শিশুদের বিচারের জন্য পৃথক আদালত এবং সেই সকল আদালতে মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচারের ব্যবস্থা।

৩। অপরাধী ছেলেমেয়েদের জন্য সংশোধনাগার ও শিশু-বিদ্যালয়গুলি সরকারী শিক্ষা বিভাগের অধীনে রাখা। সংশোধনাগারে ছোট ও বড় ছেলেদের জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণীর ব্যবস্থা।

৪। অপরাধী বালক-বালিকাগণকে পরিদর্শন ও

স্নেহভালবাসার ভিতর দিয়া উপদেশ দিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ,—বিশেষভাবে মহিলাগণকে এই কাজে নিয়োগ (Probation Officer)।

বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা দেশে যে শিশুরক্ষণ আইন হয়েছে তাতে অনেক পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রচলিত আছে। প্রথম যে শিশু-অপরাধীদের সংশোধন আইন হয়েছিল তার চেয়ে পরের শিশুরক্ষণ আইনটি অনেক ভাল। কিন্তু দেশের অতি সামান্য অংশেই তা প্রবর্ত্তিত। আমাদের এখন বিশেষ দরকার যাতে ভারতের সর্ব্বত্রানে এই আইন জারী হয়। উক্ত আইনে আমরা কি কি চাই, আরও বিশদ ভাবে বল্‌ছি।—

(১) বিচারাধীন থাকবার সময় ছেলেদের জন্য পৃথক আটকঘর রাখ্‌তে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধিগণের নিকট হ'তে বালকদের পৃথক রাখা,—বিশেষ ভাবে তাদের শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা। কোন্‌দিকে তাদের ক্ষমতা এবং কোন্‌দিকে দুর্ব্বলতা এইগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই এইরূপ আটকঘর দরকার। অপরাধী বালক-বালিকাগণকে আলাদা আটকঘরে রেখে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা কর্‌লে আদালতও কার বিষয়ে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তা ভালরূপ বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

কলিকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোডে একটি দোতালা বাড়ীর উপরতালায় শিশু-অপরাধীদের জন্য এইপ্রকার আটকঘর (House of Detention) আছে। নীচের তালায় কোর্ট বসে। বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছেলেরা কাগজের ঠোঙা তৈরী কর্‌তে থাকে।

২। তারপর দ্বিতীয় কথা :—সব জায়গায় ছেলেদের বিচারের জন্য পৃথক আদালত স্থাপন কর্‌তে হবে। বিশেষ বিবেচনা ক'রে এই সকল আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। সহানুভূতি সম্পন্ন, দূরদর্শী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণকে শিশু আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট করা উচিত। শিশু-অপরাধীর সঙ্গে সাধারণ চোর-ডাকাতের মত ব্যবহার করা উচিত নয়। বিপথগামী শিশুকে সুপথে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য তা'দি'কে গভীর সহানুভূতির সহিত ভবিষ্যৎ ভালর দিকে লক্ষ্য রেখে শাসন কর্‌তে হবে। এই স্থানেই নারীহৃদয়ের স্নেহসলিল-সিঞ্চন অত্যাবশ্যক। সংসারে একমাত্র নারীই শিশুকে প্রকৃত ভালবাস্‌তে পারে, তাদের প্রকৃত অভাব অনুভব কর্‌তে পারে। ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত দেশ নারীর এই অধিকারকে মেনে নিয়েছে। তাই সেখানকার শিশু-আদালতগুলিতে মহিলারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করেন। বহুদিন পরে মাত্র কয়েক বৎসর হ'ল এদেশের বোম্বাই ও মাদ্রাজে শিশু-আদালতে মহিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রাখার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। কিন্তু কলিকাতায় এখনও হয় নি। শিশুদের বিচার মহিলাদের দ্বারাই হওয়া উচিত। সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে শিশু-আদালত হবে সব জায়গাতেই যাতে মহিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রাখা হয় তার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

৩। তারপর শিশু-অপরাধীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থায় তাদের সুশিক্ষা দিয়ে সংশোধন করার রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এজন্য সম্ভব হ'লে প্রথম অপরাধী—যাদের বাড়ীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল—তা'দি'কে পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। অথবা এমন যদি কোন লোক থাকে যে তাদেরকে ভালবেসে সংশোধন ক'রে দিতে পারে তবে তার কাছে রাখা উচিত। অপরাধী শিশুকে সৎশিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বার জন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন। এই সকল ব্যক্তিকে ইংরাজিতে Probation Officer (তত্ত্বাবধায়ক) বলে। ছেলেদের উপযুক্ত সৎশিক্ষা দেবার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই কেবল Probation Officer পদে নিযুক্ত করা উচিত। কারণ অপরাধী বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া আরও শক্ত। কেবল-মাত্র অপরাধী ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌লেই চল্‌বে না, উপরন্তু সেই সব ছেলেদের পিতামাতার ঘরের আবহাওয়াকে পরিবর্ত্তন ক'রে বন্ধুভাবে তাদের গৃহেও সদ্ভাবের বীজ বপন কর্‌তে হবে—যার দ্বারা পিতামাতার কাছে ফিরে গিয়ে শিশুর স্বভাব পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ভালর দিকে যায়। এখানেও শিশুকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য নারীর প্রকৃতি-সুলভ স্নেহের আবশ্যক। মাতৃস্নেহের সুশীতল আশ্রয় ভিন্ন শিশুদের মনে সদ্‌গুণের বিকাশ হয় না—জননী-হৃদয়ের সহজাত অনুরাগ ব্যতীত তাহাকে সুপথে চালনা করা যায় না। এই জন্য মহিলা Probation Officer (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করা

একান্ত আবশ্যক। উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌গণের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

বালকদের অবসরকালের প্রতি যাতে লক্ষ্য রাখা হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। অনেক পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত গৃহহীন বালক নিরুপায় হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। বাপ-মা তাদের খোঁজ-খবর নেয় না—কাজেই আস্তে আস্তে তারা কুসংসর্গে প'ড়ে যায়। চোর, বদমাস, কোকেন-খোরেরা এই সব ছেলেদের ভুলিয়ে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে চুরি করতে শেখায়। যখন বালকদের কোন কাজ থাকে না সেই সময়ে তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে নানারূপ খেলা, সিনেমা, যান্ত্রিক দর্শন প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা দরকার। যাঁরা Probation Officer বা সরকার-নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন তাঁদিকে রাস্তার ছেলেদের জন্যে বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশহিতব্রত প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত এই সব ছেলেদের পাপের পথ হ'তে দূরে রাখবার চেষ্টা করা. তাদের কাজ যোগাড় ক'রে দেওয়া এবং যাতে পিতামাতার সংসর্গে ভাল আবহাওয়ার ভিতর তারা জায়গা পায় তার ব্যবস্থা করা। পাশ্চাত্য দেশে প্রধানতঃ মেয়েদেরই চেষ্টাতে এই সকল সমাজসেবার কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমাদের দেশেও আজকাল মেয়েরা সমাজসেবার কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। প্রত্যেক নারী-প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য দেশের দরিদ্র, নিঃসম্বল, অবহেলিত এই বালকদের উন্নত স্তরে নিয়ে যাবার জন্যে কিছু করা।

তারপর যে সকল বালকদের উপযুক্ত অভিভাবক নাই তাদের জন্যে সংশোধনাগার (Reformatory, এবং শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। এই সকল স্কুলকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে এনে আজকাল গভর্ণমেণ্ট সুব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। তবে বর্তমানে শিশু-অপরাধীদের জন্যে স্কুল ও শিল্পবিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। দেশের সমস্ত অভাব দূর করতে হ'লে আরও অনেক হওয়ার দরকার। ১০ হ'তে ১৮ বছরের অপরাধী ছেলেদের এক বাড়ীতে রাখা উচিত নয়। একমাত্র মাদ্রাজে ছোট ও বড় ছেলেদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা আছে। মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত সর্বস্থানেই অনুসরণ করা উচিত।

তার পরে দেখা যায় অনেক ছেলের পাপপ্রবৃত্তির কারণ তাদের মানসিক বিকৃতি। এই মানসিক বিকৃতির উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাই ডাক্তার দিয়ে এই সকল বালকের পরীক্ষা করতে হবে। মনোবিজ্ঞানবিদেরাও এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। তা'হ'লে শিশু-আদালতের কর্তৃপক্ষেরা কোন্ বালকের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করতে হবে বুঝতে পারবেন। পাশ্চাত্য দেশে অপরাধীর মানসিক কারণগুলি সম্বন্ধে অনেক বড় বড় গবেষণা হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশ সে বিষয়ে বড়ই পশ্চাৎপদ। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য সম্প্রতি যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তার নাম Indian Association of Mental Hygiene। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ এখনো বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। কলিকাতায় ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য যে কলেজ আছে তাতে সম্প্রতি অপরাধী বালকদের মানসিক অবস্থা বিষয়ে গবেষণা করা হয়। কিন্তু দুর্বল ও বিকৃত মনের ছেলেদের চিকিৎসার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নাই। এই অভাবটি অচিরে দূরীভূত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পূর্বে বালকদের সম্বন্ধে যা বলেছি বালিকাদের সম্বন্ধেও তা' খাটে। বালক অপরাধীদের মতন বালিকাদের জন্য উপযুক্ত কোন বন্দোবস্ত নাই। তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা হওয়া একান্তই প্রয়োজন। বালিকাদের আলাদা আটকঘর বা "হাউস অফ ডিটেনশন" এবং রিফর্মেটারি স্কুল ও শিল্পবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

বালক-অপরাধীদের সমস্যা মোটেই অবহেলা করবার নয়। দেশের সমস্ত নারীপ্রতিষ্ঠান যাতে একযোগে কাজ ক'রে এই সমস্যা উত্তমরূপে সমাধান করতে পারেন তার জন্য বিপুল চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশের নারী-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে একটা সুসঙ্গত বিধি প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

প্রত্যেক শিশুর জীবন অতি মূল্যবান—তারাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা—তারাই সংসারে আনন্দের প্রতিরূপ। তাই কারও জীবন তুচ্ছ নগণ্য নয়। সুযোগ-সুবিধা দিলে তারাও সফল ও উন্নত হ'য়ে জাতির সম্পদ বাড়িয়ে দেবে।

একটি ছেলের জীবনও যদি সফল হয় তাহ'লে সমস্ত জগতের কল্যাণ হবে। আজ যে সাধারণ অপরাধী শিশু সেই হয়ত একদিন জাতির ভবিষ্যৎ নেতা হবে।

তাই আমি কবির ভাষায় জননীদের আহ্বান ক'রে বল্‌ছি :—

ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ,—
ধরায় উঠেছে ফুটি' শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সংবাদ।
কোলে তুলে' লও এরে এ যেন কেঁদে না ফেরে
হয়রেতে না ঘটে বিষাদ,
বুকের মাঝারে নিয়ে পবিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ।
এই হাসি-মুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি'
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ;
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা করো গো আশীর্ব্বাদ!

ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-সাহিত্য

শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্

সীলেটী কম্‌লাকে যদি সীলেটের পর্ব্বতময় ভূমি হ'তে কেউ বাংলার সমতল ক্ষেত্রে স্থাপন করেন, তা হ'তে আর তেমন উপাদেয় ফল পেতে আশা কর্‌তে পারেন না। চা ভাল হ'তে হ'লে দার্জ্জিলিংয়েই তাকে হ'তে হবে, দার্জ্জিলিংয়ের বাইরে তাকে টেনে আন্‌লে পরে তার ভালত্ব লোপ পেয়ে যাবে। স্থাননাহাত্ম্য ব'লে একটা জিনিষ আছে, সেটা যে দেশের জিনিষ সে দেশের মাটির সঙ্গে এমন ভাবে লিপ্ত যে সে মাটি ছাড়া হ'লে তার সে গুণ আর থাকে না। কোন কিছু বিষয়ে ভাল যদি কোন দেশ হয়, তা সে ভাল হবার অঙ্কুর সেই দেশের মাটিতেই আছে, সেই অঙ্কুরকেই ফুটিয়ে তুলে' বড় ক'রে ভাল হ'তে হবে, বিদেশের অঙ্কুর আমদানী ক'রে ভাল হওয়া যায় না। বিদেশী অঙ্কুর তার স্বদেশী মাটি ছাড়্‌লে একান্তই গুণহীন হ'য়ে পড়ে—তার একান্ত স্বদেশপ্রেমের জন্যেই হয় ত বা। ঠিক সেই ভাবে যাঁরা ব'লে থাকেন যে এক দেশের সাহিত্য আর এক দেশের সাহিত্যের কাছে ধার ক'রে বড় হয়েছে, তাঁরা একান্তই ভুল বলেন। রোনাল্ডসে তাঁর "হার্ট অব মিড্‌লথিয়ান" নামক বইতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের অভিনব জাগরণের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, যে ইংরাজি সাহিত্য চর্চ্চাই নাকি সেই জাগরণের মূল কারণ, এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সম্পর্কে এসেই তার এমন উৎকর্ষ লাভ হয়েছে। স্বদেশ-প্রেমিকতার দিক হ'তে কথাটি বেশ শুন্‌তে ভাল হ'য়ে থাক্‌লেও সত্যের খাতিরে একথা বল্‌তে হবে যে এ অতি ভুল ধারণা। স্বদেশ-প্রেমিকতার অনেক গুণ থাক্‌লেও এটার একটা মহা দোষ যে অন্যের গুণ গ্রহণে মনকে একান্ত পরাঙ্মুখ ক'রে তোলে। আমার যা কিছু সব ভাল এবং অন্যের যা কিছু সব খারাপ, আর যদি বা কিছু ভাল থাকে, সে আমাদের কাছ হ'তে ধার করা—এই হ'ল স্বদেশ-প্রেমিকতার একমাত্র বড় কুশিক্ষা। সন্তানবৎসলা মা পরের ছেলের গুণ গ্রহণে যতখানি অসমর্থ স্বদেশপ্রেমিক গবেষক বা লেখক অন্য দেশের গুণ গ্রহণে তার দশগুণ বেশী অসমর্থ, কারণ তাঁদের চোখে যে টুলি এঁটে যায় তার চামড়া সন্তানবৎসলা মায়ের টুলির চামড়া হ'তে দশগুণ বেশী শক্ত এবং তার জন্যে বুদ্ধিশক্তিকে দশগুণ বেশী খর্ব্ব করে। তার জন্যেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যখন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ কর্‌লেন তখনই দেখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন যে সংস্কৃতের যা কিছু সম্পদ সে সমস্তই গ্রীকদের কাছ হ'তে ধার করা বা তাদের প্রভাব হ'তে উৎপন্ন। ঋগ্‌বেদ যে খুব বেশী পুরানো নয় সে কথা প্রমাণ কর্‌তে তাঁদের কি প্রাণপণ চেষ্টা! যেহেতু সংস্কৃত

নাটকে 'যবনিকা' কথাটি ব্যবহার হয়েছে সেই হেতু তাঁরা আবিষ্কার ক'রে বসলেন যে সকল সংস্কৃত নাটকই গ্রীক নাটকের জাল. প্রমাণ—'যবন' অর্থে গ্রীক! অতি অকাট্য প্রমাণ সন্দেহ নাই! এমনি তুচ্ছ প্রমাণকে ভিত্তি করিয়ে তাঁরা অতি অদ্ভুত সব তথ্য দাঁড় করিয়ে তবু জগতের কাছে জাহির করলেন পরম সত্য ব'লে! যেহেতু এ সব ইউরোপের বাইরের জিনিষ এবং ভাল জিনিষ সেই হেতু তারা কখনই ভারতীয় জিনিষ নয়, এই মনোভাবই কি এই সকল তথ্যের পেছনে লুকানো নয়? এমনতর হ'লে পরে সত্যের পথ একান্ত জটিল হ'য়ে উঠে এবং তারি জন্যে সত্যকে পাওয়া একান্ত দুষ্কর হ'য়ে পড়ে, এবং যদিই বা কিছু পাওয়া যায় সে একান্ত বিকৃত সত্য এবং সকলের অবহেলার যোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর যে অত্যাচার চ'লে এসেছিল, তার সব থেকে গুরুতর কল্পাটির ওপরেও উত্তরাধিকারসূত্রে সে অত্যাচার বেশ খানিক বর্দ্ধিয়েছে। তার প্রথম প্রমাণ উপরের উক্তিটি এবং দ্বিতীয় প্রমাণ টমসন-লিখিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইংরাজিতে সমালোচনা।

অন্যদেশী সভ্যতা বা অন্যদেশী সাহিত্যের সম্পর্কে এসে দেশী সাহিত্য উন্নত বা সমৃদ্ধ হবে না কেন? হয়। কিন্তু সে অন্য ভাবে, ধার ক'রে নয়। একটি বলবান পালোয়ানের কাছ হ'তে অন্য লোক যেমন বল ধার ক'রে নিজে বলবান হ'তে পারে না, নিজের চেষ্টায় যে প্রকার ব্যায়াম তার শরীরকে উন্নত করবে, সেই ব্যায়াম অবলম্বন ক'রে তবে বল সঞ্চয় করে, এ ক্ষেত্রেও তেমন। তাকে দেখে বরং নিজের শরীরের উন্নতিসাধন বিষয়ে সে উৎসাহ পেতে পারে বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব হ'তে বল-সঞ্চয়ের ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। এই ভাবেই সাহায্য হ'তে পারে মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা শুনে বা ইংরাজি সাহিত্যের সম্পদ-ভাণ্ডার দেখে বাঙালীর সেই ভাবেই নিজের সাহিত্যকে গ'ড়ে তোল্‌বার ইচ্ছে হয়েছিল, সে-টুকু মাত্র সাহায্য ইংরেজি সভ্যতা আমাদের দিয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি যা কিছু হয়েছে সে সব সম্পূর্ণ নিজস্ব। যে ভাব কেবল বাংলাতেই জাগ্‌তে পারত, যে ভাষা কেবল বাঙালী কবির কাছেই ফুটতে পারত, সেই ভাব এবং সেই ভাষাই এই সমৃদ্ধির মূলে। এদের কোনটিই ইংরেজি বা ইউরোপীয় অপর কোন সাহিত্য হ'তে চুরি নয় বা ধার করা নয়—একান্তই এই দেশের মাটির এই দেশের হাওয়ার জিনিষ. এইটাই হ'ল আসল সত্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের দিকে চাইলে পরে, সব থেকে বড় ক'রে যার উপর চোখ পড়ে সে হ'চ্ছে বাংলা গদ্য সাহিত্যের দ্রুত ক্রমবিকাশ। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ—জগতের কোন সাহিত্যেই বুঝি এর তুলনা নেই। বাংলা গদ্য-সাহিত্য অতি অল্প-কালের জিনিষ. উনবিংশ শতাব্দীর আগে সে ছিল চিঠি-পত্তরে, নিতান্ত উপেক্ষার জিনিষ। প্রকৃতপক্ষে গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহন. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্র মিত্রের লেখায়। তার-পর বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত এবং তারপর বঙ্কিমচন্দ্র।

রামমোহন প্রভৃতির প্রথম পুস্তক প্রকাশের সময় ১৮১০ সাল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম নভেল দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশের তারিখ ১৮৬৫ সাল। মাত্র ৩০টি বছরের ব্যবধান অথচ সাহিত্যিক সমৃদ্ধির দিক হ'তে যে ব্যবধান আমরা দেখ্‌তে পাই তা সাধারণ কাল দিয়ে নির্দ্দেশ কর্‌তে হ'লে অন্ততঃ দুই পূর্ণ শতাব্দীর জিনিষ ব'লে ধর্‌তে হবে। কিন্তু একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের বয়স কম ক'রে কে হাজার বছর। গদ্য-সাহিত্যের এমন অগ্রচলনের একটা বিশেষ কারণ ছিল। যখন ছাপার ব্যবস্থা ছিল না তখন সাহিত্যিক স্থায়ী রকম যা কিছু রচনা সম্ভব তাদের কবিতায় আত্মপ্রকাশ কর্‌বার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। কারণ তখনকার যুগে পাঠকের মন আকর্ষণ কর্‌তে পদ্যের মত মনোহর জিনিষেরই প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, পদ্য যেমন সহজে মনে রাখা যায় বা কোন-রূপে মুখে মুখে তার যেমন বহুল প্রচারের সম্ভাবনা, গদ্যের তেমন নয়। সেই কারণেই পদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি প্রায় সকল দেশেই গদ্য-সাহিত্যের অনেক আগে হ'য়ে এসেছে। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি একটু বেশী দেরী ক'রে হয়েছে এইমাত্র তফাৎ। তার কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে সারা ভারত তথা বাংলা অবনতির চরম সীমায় গিয়ে ঠেকেছিল। ভারতের কিমালো সভ্যতা একান্তই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভারতবর্ষের সত্যই সেটা বড় আঁধারের যুগ। সেই আঁধার হাওয়ায় সাহিত্য একান্তই জন্মাতে পারে না। অবশ্য বিশেষভাবে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জন্মতারিখ তাই অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের সেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙানোর প্রথম চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টায় অগ্রণী হলেন রামমোহন রায়। দেশাত্মবোধ, নিজেদের সভ্যতার সম্পদে দৃষ্টিক্ষেপ এবং নিজেদের বড় ক'রে তোলবার চেষ্টা—সকল আন্দোলনগুলিরই অঙ্কুর তাঁর বাণীতে লুকানো ছিল। সেই নবজাগরণের উষার আলোয় অনুকূল হাওয়া পেয়ে বাংলা গদ্য-সাহিত্য জন্ম নিলে। ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ ভারতের সে মহানিদ্রা ভাঙানোর সাহায্য করেছিল—এই হ'ল ইউরোপের কাছে ভারতের ঋণ, আর কিছু নয়। এমন অনুকূল আলো হাওয়ায় জন্মলাভ করেছিল বলেই গদ্য-সাহিত্য কত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় হ'তে পেরেছিল। সেটি ছিল এতটুকুন চারা গাছ সেটি দুদিনে হ'য়ে পড়্‌ল এত বড় মহাবৃক্ষ! এমন আশ্চর্য উন্নতিলাভের এই হ'ল কারণ। সভ্যতা মানে আমরা বুঝি এক একটি বিশেষ দেশবাসীকে অবলম্বন ক'রে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি গ'ড়ে ওঠে তাই এবং সভ্যতা বল্‌তে আমরা যা বুঝি তার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ হ'চ্ছে সাহিত্য। সভ্যতা যেমন দেশ-বিশেষের জিনিষ, সাহিত্যও তেমনি। সেই জন্য সভ্যতার উৎকর্ষলাভ এবং সাহিত্যিক উন্নতিলাভ সম্ভব হ'তে হ'লে চাই দেশাত্মবোধভাবের উদ্বোধন। সাহিত্য যদি চারা গাছ হয় দেশাত্মবোধ হ'ল সেই চারা গাছের গোড়ায় সেচনের জল। সে জল না পেলে গাছ বাড়্‌তে পারে না। দেশাত্মবোধকে আমাদের জাতীয়তা ভাব হ'তে স্বতন্ত্র ব'লে বুঝতে হবে। এর মানে অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ নয়, নিছক নিজের জাতির প্রতি এবং জাতীয় যা কিছু তাদের প্রতি নিগূঢ় প্রীতি এবং তাদের উৎকর্ষ-কামনা। এমনি দেশাত্মবোধের উদ্বোধনের যুগে গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছিল বলেই তার এত অল্পকালের মধ্যে এমন উৎকর্ষলাভ এবং এমন সর্ব্বজন-মনোহারী শোভা।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু অন্য রকম। তার বয়স এক হাজার বছর এবং সেই একটি হাজার বছরের প্রতি শতাব্দীটিই ঘটনা-পরম্পরায় সন্নিবিষ্ট। বাংলা সাহিত্যে কবির অভাব কোন যুগেই হয় নি। গোড়াতেই আমরা পাই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে। বিদ্যাপতিকে অনেকে বাঙালী কবি ব'লে স্বীকার কর্‌তে চাইবেন না, কিন্তু আমি বল্‌ব তিনি নিশ্চয় বাঙালী কবি। পঞ্চগৌড় তখনকার যুগে বাংলা দেশের অন্তর্গত ছিল কিনা, কিম্বা বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন কি বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন সে কথার পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নেই। আমি বল্‌ব তিনি বাঙালী কবি, যেহেতু বাঙালী তাঁকে নিজের ব'লে গ্রহণ করেছে, বাঙালী তাঁর কবিতাকে ভালবেসেছে এবং একান্তই আপন ক'রে নিয়েছে। এই হ'ল এর বড় প্রমাণ যে তিনি বাঙালী কবি। যাক সে কথা। তারপর চৈতন্য যুগের কবিসম্প্রদায়; শৈব-কবির দল; তারপর মুকুন্দরাম; তারপর ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ—তারও পর উনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দ। কাব্য-সাহিত্যের এমন প্রাচীন কাল হ'তে প্রচারের একটা কারণ, কবিতার প্রচার মুদ্রণের ওপর তেমন ক'রে নির্ভর করে না যেমন করে গদ্য রচনা। কিন্তু আরও একটা বড় কারণ বোধ হয় বাঙালীর প্রকৃতিগত কোন বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর হৃদয়ে এমন কিছু আছে স্বভাবতঃই যাকে কবি ক'রে তুলে বা কবিতার উপভোগক্ষম ক'রে তুলে। তার হাওয়ায়, আলোয়, তার মাটিতে বা নদীর ধারায় হয়ত এমন কোন গুণ আছে যা তাকে এমনতর কবিতাপ্রিয় এবং কবি ক'রে গ'ড়ে তোলে। সেই জন্যই বাংলায় কবিরও যেমন অভাব হয় না কবিতার সমঝদারের সংখ্যাও তেমনি যথেষ্ট। একদিকে কবির যেমন ছড়াছড়ি, তাদের মধ্যে গুণী কবিরও তেমনি অভাব হয় না। এইজন্যই এ দেশ জয়দেবের মত কবি পেয়েছিলেন যিনি জলের সুর, হাওয়ার সুর, আলোর সুরকে ছন্দে বাঁধ্‌তে পারতেন, এবং চণ্ডীদাসের মত আত্মভোলা প্রেমিক পাগল এ দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের প্রশংসা বাংলা সাহিত্যের পায়ে দিগ্বিজয়ীর মত লুট ক'রে এনে দিয়েছেন।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-সাহিত্য। তার ধারা কোন্ পথে সেইটাই আমাদের অনুসন্ধান ক'রে বা'র কর্‌তে হবে। বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ

শতাব্দী হ'ল ভারতচন্দ্রের যুগ। সে যুগের কবিতাদেহের প্রধান জোড়া ভারতচন্দ্র, এবং সেই কারণে তাঁর গ্রন্থে আমরা সে যুগের বৈশিষ্ট্য সবই পাই। তাঁর গ্রন্থে কৃত্রিম উপায়ে কবিতায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কর্‌বার একটা বিশেষ চেষ্টা আমরা দেখি। ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পাদনে তিনি অনেকখানি সামর্থ্য ব্যয় করেছেন—তাঁর অনুপ্রাস, তাঁর যমকালঙ্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি ইত্যাদিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এই কৃত্রিমতার প্রতি লক্ষ্যটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তেও সমানই বর্ত্তমান আমরা দেখ্‌তে পাই। ঈশ্বরচন্দ্র এখানে ভারতচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি এক-হিসেবে ধর্‌তে গেলে বাংলার শেষ খাঁটি কবি। এই হিসেবে খাঁটি যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব হ'তে তিনি একেবারে মুক্ত ছিলেন। ঠিক এই কারণেই তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা কবিতা যে মুখে বলেছিল সেই মুখেই তাঁর কবিতার স্রোত চালিত করেছিলেন। পুরাতন যুগের শেষ কবি—ভারতচন্দ্রের মতই তিনিও অনুপ্রাস ও যমকালঙ্কৃত কথার ব্যবহার অত্যন্ত বেশী কর্‌তেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের যে কবিত্বশক্তি ছিল তাঁর তা ছিল না। ভারতচন্দ্র যেখানে বর্ণনার সৌন্দর্য্যে বা হৃদয়ের অনুভূতি জাগিয়ে পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন, সে স্থানে ঈশ্বর গুপ্ত গ্রাম্য রসিকতা দিয়ে প্রশংসা লুট কর্‌বার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ছাগল বিষয়ক রচনাই এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ হবে।

ঠিক বল্‌তে গেলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় বাংলা কাব্য-সাহিত্য অবনতির ধাপে চলেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা পদ্য-সাহিত্যের দুর্দ্দশার শেষ সেখানেই নয়, অবনতির চরম হয়েছিল তার নিধুবাবু প্রমুখ কবিওয়ালাদের হাতে। বাংলার কবিত্বশক্তি সে যুগে সুন্দর সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যবহার হ'ত না, ব্যবহার হ'ত গালাগালির বাহনরূপে এবং বেশীর ভাগ স্থানে অশ্লীলতার উপাদান রূপে। *

এই হ'ল বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অবনতির অঙ্কের শেষ দৃশ্য। তারপর যে অঙ্কের সূত্রপাত হ'ল, সে অঙ্কের নায়ক হলেন তিন জন মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। তাঁদের সাহিত্যকাল বাংলার উন্নতির যুগ নয়, অবনতিরও যুগ নয়—এক নূতন পথে চলার চেষ্টার যুগ, এক experimentএর যুগ; কিন্তু সে এক্সপেরিমেন্ট কোন-দিন সাফল্যমণ্ডিত হয় নি, ব্যর্থ হ'য়েই সাহিত্যসেবীদের পরিত্যাজ্য হয়েছিল। † এই যুগটা একটা বিক্ষিপ্তির (digression) যুগ। বাংলা কবিতার উন্নতির ধারা সে পথে নয়, অন্য পথে। তাঁরা তিন জনই প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত কবি। ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এঁদের সাহিত্যে অতি সহজেই চোখে পড়ে। এটি সত্যই ধারের যুগ। কিন্তু ধারের মূলধন দিয়ে যেমন ব্যবসা চলে না সেই রকম এই ধারকরা জিনিষে খাঁটি সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। নিজের মূলধন চাই তবেই ব্যবসা চল্‌বে, নিজের জাতীয় প্রতিভার উৎস যেখানে,সেই উৎসের জল সংগ্রহ করেই সাহিত্য-শক্তিকে পরিপুষ্ট কর্‌তে হবে, তবেই খাঁটি সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব। এই হ'ল সেই সাঁতেরী কল্পনাকে বাংলার সমতল ভূমিতে আনার চেষ্টা বা দার্জ্জিলিংয়ের চা'কে রাজপুতানার বুকে পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা। কেবল এই-সাহিত্যটুকু সম্পর্কেই ধার করা বা বিলাতী প্রভাব খুব ব'লে অপবাদ দেওয়া চলে। অন্য কোন সময়ের সাহিত্য সম্পর্কে নয়। এবং এই সাহিত্যটুকু বাঙালীর তেমন গৌরবের জিনিষও নয়। (—?) তার কারণ তা ধারকরা দোষে দুষ্ট।

মাইকেল যে গোড়া হতেই খাঁটি বিদেশী ভাবাপন্ন, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে অল্প বয়সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ এবং অল্পদিন পরে ইংরাজ-মহিলার পাণিগ্রহণ তার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রথম জীবনে তাঁর নাকি একান্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল এই যে তিনি ইংরেজি ভাষায় কথা বল্‌বেন, ভাব্‌বেন,এমন কি স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখ্‌বেন। তাঁর কবিকল্পনা ছিল, তাই তিনি ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখার মহড়া কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখ্‌লেন বটে কিন্তু তার তেমন

* লেখক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও নিধু বাবু সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত করেছেন তা তাঁর একদেশদর্শী অনোবৃত্তি-প্রসূত। ঈশ্বর গুপ্ত ও নিধু বাবুর কবিত্ব আদৌ উপেক্ষণীয় নয় এবং কাব্যরসজ্ঞ বাঙালী তা গৌরবসহ ব'লে এখনও মনে করেন। অশ্লীলতা-দোষে বিংশ শতাব্দীর কাব্য-সাহিত্যও সম্পূর্ণ মুক্ত নয় এবং সত্যই বা নিন্দনীয়ও বটে। অশ্লীলতা বাদ দিয়েই আমরা তাঁদের দেখ্‌তে বলছি। —ঃ সঃ

† প্রবন্ধ লেখকের সহিত আমরা একমত নই। —ঃ সঃ

সমাদর হ'ল না। তাঁর প্রতিভা বিকলে যেতে বসল। তার পর একদিন শুভমুহূর্তে তাঁর চেতনা ফুটল—যে 'মজিলেন বিফল হরষে অবরেণ্য কবি।' তাই তিনি নতুন ক'রে নিজের মাতৃভাষায় কবিতা লিখতে বসলেন কিন্তু তাঁর যে কবিতা ভাল হলেও, কবিত্বশক্তির পরিচায়ক হলেও একটা মস্ত বড় দোষ তাঁর ছিল, তা হ'ল তা ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাববিশিষ্ট। ইংরাজ কবি স্পেন্সার, মিল্টন, বা সেই সময়কার টেনিসন এঁরাই তাঁর আদর্শস্থানীয় হলেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রামচন্দ্রের নরক-গমন প্রভৃতির বর্ণনায় দান্তে'র 'ইনফার্নো'র যথেষ্ট ছায়াপাত হয়েছে। এই সাহিত্য বাস্তবিকই বিলাতি প্রভাববিশিষ্ট এবং সেই কারণে কোনক্রমেই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে না। (—?)

মাইকেল যে পথ দেখালেন, হেমচন্দ্র ও নবীন সেন সেই পথে তাঁকে অনুসরণ ক'রে বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং তাঁরা বাস্তবিকই তাঁর খাঁটি শিষ্য ছিলেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন এবং সেই ছন্দে কাব্য লেখেন; তাঁদেরও সাহিত্যিক সৃষ্টি প্রধানতঃ তাই। হেমচন্দ্রের প্রধান কাব্য-গ্রন্থ 'বৃত্রসংহার' অমিত্রাক্ষর ছন্দে হুবহু 'মেঘনাদবধ কাব্যের' অনুকরণে লিখিত। তাঁর 'আশা কাননেও' সেই নরকাদির বর্ণনা। তাঁর আর একটা কীর্তি ইংরেজী কবিতার বাংলা অনুবাদ। অনুবাদক-কবি হিসাবে তিনিই বাংলায় প্রথম। এ ছাড়া তাঁর গৌরবের বিষয় আর কিছু ছিল না।(—? নবীন সেনও এঁদেরই মত ইংরেজি-শিক্ষিত, এঁদেরই মত প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখে নাম ক'রে গেছেন। তাঁর রৈবতক,কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী; অমিতাভ—বুদ্ধের জীবন নিয়ে কাব্যগ্রন্থ। এমন কিছু সৌন্দর্য বা বিশিষ্টতা তাদের মধ্যে নাই। (—?) পলাশীর যুদ্ধই তাঁর একমাত্র কাব্য, যা তুলনায় অধিক সমাদর পেয়েছে। তার কারণ এটা নূতন-লেখা জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত তা ছাড়া নিছক কবিত্বশক্তির পরিচায়ক হিসাবে তা খুব বড় গ্রন্থ নয়।

এই তিন কবির মধ্যে মাইকেলের কবিত্বশক্তি সব থেকে বেশী ছিল, তারপর হেমচন্দ্র এবং তারপর নবীন সেন। ঠিক সেই কারণেই কবি হিসাবে তিনি এ তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন সম্মানের আসন পেয়ে আসছে, কিন্তু হেমচন্দ্র বা নবীন সেনের হয়ত আসবে না। কবি হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগে তাঁরা কম ছিলেন না। কিন্তু এখনকার মাপকাঠিতে তাঁদের হয় অনেক কমবে। তার খানিকটা কারণ কবিত্বশক্তির নিকৃষ্টতা বটে কিন্তু বড় কারণ আমি বলব তাঁরা পরের ধার করেছিলেন ব'লে।

সৌভাগ্যক্রমে এই ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা বেশীদিন আমাদের দেশে চলতে পারে নি। অল্পদিনের মধ্যেই এমন একটি কবি জন্ম নিলেন যিনি দেখিয়ে দিলেন বাঙালী কবির চলবার পথ মাইকেল প্রভৃতি যেদিকে গেছিয়েছিলেন সেদিকে নয়, অন্য দিকে। সেটা ভুল পথ, খাঁটি পথ খুঁজতে গেলে চলতে হবে অন্যদিকে। মাইকেলের ভাষায়ই বলি তিনি এবং তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়—'পরধন লোভে মত্ত করিল ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।' মাইকেলের কাছে কুললক্ষ্মী এসে পরে ব'লে গেলেন—'মাতৃকোষে রত্নের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি।' মাইকেলের ঘুম ভাঙল, চেতনা ফুটল, কিন্তু তিনি তার ভুল মানে ক'রে বসলেন। তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখতেন তাই ভাবলেন এ স্বপ্নের নির্দেশ হ'ল বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা। ভাষা তাঁর মাতৃভাষা হ'ল বটে, কিন্তু ভাব তাঁর বিজাতীয় হ'য়ে গেল, পরের হ'য়ে গেল। ভাবেতেও তিনি যদি খাঁটি স্বদেশী হ'তে পারতেন তা'হলে কবি হিসাবে তিনি আরও বড় হ'তে পারতেন। তবে যে তিনি একেবারেই কোথাও খাঁটি হন নি তা আমি বলি না। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তিনি সম্পূর্ণ বৈষ্ণব কবিদের ভাবে অনুপ্রাণিত। ঠিক সেই কারণেই বোধ হয় এই কবিতা-গুলি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই ভাবে স্বাধীনতা বা স্বদেশীয়ানা জাগানো বা দেখানোর কাজটা বিশেষ ভাবে ক'রে গিয়েছিলেন আর এক জন। সেখান হতেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের নূতন উন্নতির যুগের আরম্ভ এবং সেখান হতেই এই বিদেশ হ'তে ধারকরা বিভিন্নির যুগের শেষ।

এই নূতন যুগের প্রবর্তক হলেন কবি বিহারীলাল। তিনি ইংরাজি-শিক্ষিত যে ছিলেন না তা নয়, তবে আরও বেশী শিক্ষিত ছিলেন সংস্কৃতে। উপনিষদের বাণী তিনি পড়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন, ধ্যানের শক্তিও তাঁর ছিল। কবিতা তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে কলমের আগায় কোটাতেন না, নিভৃতে ধ্যানস্থ হতেন এবং পরে তৈরী জিনিস কলমের আগায় ঢেলে দিতেন। তাই জন্যে তিনি গীতি-কবিতাই প্রধানতঃ লিখতেন, কারণ কেবল হৃদয় দিয়ে লিখতে গেলে কাব্য লেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যের নূতন যুগে গীতিকবিতার প্রাধান্য তিনিই স্থাপন ক'রে গেছেন এবং পরে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাধান্যের গৌরব পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। পূর্ব্ববর্তী কবিদের লক্ষ্য ছিল তথাকথিত কাব্যপ্রণয়নে, কারণ তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ইংরেজি সপ্তদশ শতাব্দীর মীল্টনী পদ্যে। তাঁদের যদি দৃষ্টিশক্তি আর একটু প্রখর হ'ত তাহ'লে দেখতে পেতেন যে কাব্যের প্রাধান্যের যুগ কেটে গিয়েছে, নূতন যা যুগ প্রবর্তিত হবার তা গীতি-কবিতার যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা সমানেই খাটে। সেই শতাব্দীর গোড়ায় পাঁচটি খ্যাতনামা গীতিকবি ইংরেজি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁদের কেউই কাব্যপ্রণয়নের প্রতি তেমন নজর দেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে টেনিসন্ গিয়েছিলেন বটে কিন্তু আর্থারের গল্পসমষ্টি তাঁর প্রধান কীর্তি নয়। তাঁর 'ইন্ মেমোরিয়ম্'—গীতিকবিতার সমষ্টি। ব্রাউনিং ত অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি, তিনিও গীতিকবিতা-লেখক। বাংলা সাহিত্যে নূতন ক'রে কাব্যপ্রণয়নের একটা চেষ্টা এসেছিল এবং সেই চেষ্টার পথপ্রদর্শক হলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রণেতা মাইকেল। পরেও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথও 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য লিখে তাঁদের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থগুলির সাহিত্যের বাজারে আর তেমন দাম নেই, কারণ যে কালে তার দাম ছিল সে কাল এখন কেটে গিয়েছে। তখনকার যুগে মানুষের অবসর ছিল প্রচুর এবং কবিতা তারা উপভোগ করত পদ্যের মুখে আবৃত্তি শুনে শুনে, তাই লম্বা লম্বা গল্প নিয়ে কাব্যই ছিল সে যুগের ভোগের উপাদান। এখন মানুষের অবসরও যেমন কম, কবিতা সম্বন্ধে মনোভাবও তেমনি বদলেছে। এখন সে সভায় ব'সে দশজনের সঙ্গে আবৃত্তি শুনে কবিতা উপভোগ করে না, কবিতা পড়ে একা একা অবসর-সময়ে। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে তাই আর কাব্য রচিত হয় না, এখন গীতিকবিতার প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত।

বিহারীলালের আরও বড় মহত্ত্ব হ'ল তিনি ভাব এবং প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন বিদেশী সাহিত্য থেকে নয়, সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ আওড়াওয়া হ'তে। তাঁর সব থেকে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সারদা-মঙ্গলের' বিষয় —সরস্বতী দেবীর সঙ্গে কবির বিরহ ও মিলন। এ কবি সেকালের ঋষিদেরই মত ঐশ্বর্যসম্পদে বিরাগসম্পন্ন। তিনি যোগী, তাই সম্পদহীন তপোবনই তাঁর প্রিয়। তিনি লক্ষ্মীকে চান না; তাই তিনি বলছেন—

এস আদিকবি বাণী সমুখে আমার,
যাও লক্ষ্মী অলকায়
যাও লক্ষ্মী অমরায়
এস না এ যোগিজন-তপোবনে আর।

তারপর বাণীর বিরহে তিনি কাতর, তাই তাঁরই অন্বেষণে তিনি স্বর্গ-মর্ত্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণ—

তুমিই মনের তৃপ্তি
তুমি নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণহারা হই।

তাই তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হ'ল—

যে ক'দিন আছে প্রাণ
তোমায় করিব ধ্যান
আনন্দে ভাসিব তনু ও রাঙা চরণতলে—।

এই সম্পর্কে আমরা তাঁর হিমালয়ের বর্ণনা পাই। তেমন বর্ণনা এক কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে আছে, আর পাই তাঁরই সারদা-মঙ্গলে। তিনি সেই হিমালয়ের মধ্যেই অলকা অমরাবতী খুঁজে পেয়েছেন—

লুকানো লুকানো যেন রয়েছে ভিতরে
অলকা অমরাবতী রয়েছে ভিতরে।

বলতে ইচ্ছে করে তিনি মাইকেল বা হেমচন্দ্র হ'লে হয়ত অমরাবতীর পরিবর্তে ওলিম্পাস আবিষ্কার ক'রে বসতেন।

বিহারীলাল সম্বন্ধে যে কথা খাটে, আমাদের আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে কথা আরও বেশী ক'রে খাটে। তিনি আরও অনেক বড় কবি, লেখা তাঁর আরও অনেক বেশী, ভাব ও ভাষার স্বদেশীয়ানার প্রমাণ তাঁর বইতে তাই আমরা অনেক বেশী পাই। তাঁর লেখায় মণ্ডিত হ'য়ে বাংলা সাহিত্য আজ জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গুলির মধ্যে একটি ব'লে পরিগণিত হয়েছে। তাঁর লেখা, বাংলা সাহিত্য-জননীর চরণে বিশ্ববাণীর ভক্তিঅর্ঘ্য লুটে এনে দিয়েছে। আমাদের আধুনিক যুগের ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির মধ্যে সব থেকে গর্ব্ব করবার বিষয় হ'ল তাঁর কবিতাবলী। এবং তাঁর সে কবিতাবলী হ'ল ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পদ। তাঁর সে কবিতার মধ্যে আমরা পাই সেই পুরানো কবিদের উপনিষদের বাণী, সেই ভারতীয় জীবন এবং ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ও মাধুর্য্যের কীর্ত্তন। তাঁর কবিতায় পাই আমরা কালিদাসের গৌড়ী রীতিতে লেখা উপমাবহুল মনোরম বর্ণবিন্যাস, জয়দেবের চিত্তহারী শব্দসংযোগ এবং চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব কবিতার উন্মাদনা। এই কথাটা বড় ক'রে বোঝাবার এইটুকু প্রবন্ধে স্থান নেই, কেবল আভাসে একটুখানি পরিচয় দিয়েই তাই আমাদের ক্ষান্ত হ'তে হবে। যে কবিতা তাঁকে বিশ্ববরেণ্য ক'রে তুলেছে, তা' হ'ল গীতাঞ্জলির কবিতা। সেই ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন, মধুর রসের সম্বন্ধ স্থাপন আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ নয় কি? তাঁর বলাকার দার্শনিক মতবাদ আমাদের দেশের উপনিষদের কবিদেরই ভাব অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা-ব্যঞ্জক নয় কি? এই ত গেল বড় জিনিষের দিক দিয়ে। ছোট খাটো আমাদের দেশের কত জিনিষ—তাই নিয়ে তিনি কত মাধুর্য্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'বেলা যে প'ড়ে এলো জলকে চল্'এর কথা এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে। তাঁর 'বালিকা বধূ' নিতান্তই আমাদের দেশের জিনিষ এবং আজকালকার শিক্ষিত-সাধারণের মতবিরুদ্ধ, তবু তিনি তার মধ্যে কত সৌন্দর্য্য কত সহানুভূতি অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। এই ধরণের উদাহরণের সংখ্যা খুঁজলে অনেক মিলবে, বাড়িয়ে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব, তাই আমাদের সব থেকে বড় গৌরব। আমরা যেখানে সব থেকে বড় হয়েছি, আমরা যেখানে সত্যি বড় হয়েছি, সেখানে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই হয়েছি, কারও সাহায্য নিয়ে হইনি,—সে কথা সারা বিশ্বকে জোর-গলায় আমরা শুনিয়ে দিতে পারি।

বিজয়ী

শ্রী নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

কবি নয় পরে আজ দুপুরের বেলাতে,
ওরে বুক গগনের আলোকের মেলাতে।
এতদিন কত রণ, মেঘ-দল ও তপন,
যুঝেলাই থামে নাই, যুঝেলাই ক্রুদ্ধ,
যুঝেলায় শুধু কয়—দাও দাও যুদ্ধ।
ওরা সব কতজন, অগণন সৈন্য,
একা-বীর এ রবির শকতির ধন্য।
ওরা সব কালো রূপ, বলে "চুপ্, আলো চুপ্";
রবি কয়, "নয় নয়, কেন ভয় কহ—?
কিরণের ভরা তূণ গরবেই বহে।"

লুকোচুরি

শ্রী দীপ্তি দেবী বি-এ, বি-টি

লেলেচ্‌কার ঘরের সব জিনিষই চক্‌চকে, ঝুটঝুটে, সুন্দর। লেলেচ্‌কার মিষ্টি গলা যেন মধু ঢালত তার মার কানে। লেলেচ্‌কা মেয়েটি সত্যিই চমৎকার। অমন মেয়ে পূর্ব্বে কখনো জন্মায় নি, এখনও ওর জুড়ি নেই; অন্ততঃ ওর মা সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার এ বিষয় কোন সন্দেহ ছিল না।

লেলেচ্‌কার চোখ দুটো ছিল বড় বড় আর কালো কুচ্‌কুচে, গাল দু'খানা লাল টুক্‌টুকে, আর তার ঠোঁট দুটি যেন তৈরী হয়েছিল কেবল হাসি আর চুম্বনের জন্যে। কিন্তু শুধু এই সবের জন্যেই লেলেচ্‌কার মার মনে এত আনন্দ হ'ত না, লেলেচ্‌কা যে ছিল তার মার একটি মাত্র সন্তান।···এই জন্যে লেলেচ্‌কার প্রত্যেক ভঙ্গিটিই তার মাকে পাগল ক'রে তুলত। কোলে বসিয়ে লেলেচ্‌কাকে আদর করা, সেই ছুটুকুটে ছোট্ট পাখীর মত মেয়েটাকে নিজের বাহুর মধ্যে অনুভব করা,—এ যে এক স্বর্গীয় আনন্দ!

সত্য কথা বলতে কি সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার আনন্দের একমাত্র জায়গা ছিল লেলেচ্‌কার ঘর। স্বামীর সংস্রবে আস্‌লেই সে যেন বরফের মত জ'মে যেত। হয়ত তার কারণ হ'চ্ছে যে তার স্বামী সব জিনিষই ঠাণ্ডা ভালবাস্‌তেন—ঠাণ্ডা জল, ঠাণ্ডা বাতাস, এ সবই তাঁর বড় প্রিয়। নিজেও তিনি যেন সর্ব্বদা ঠাণ্ডা,—মুখের হাসিটুকুও যেন বরফের ছাঁচে তৈরী,—যেখান দিয়ে তিনি হেঁটে যেতেন সেখানকার বাতাসটুকুও যেন হিম হ'য়ে যেত।

অনুরাগ বা দেনা-পাওনার জন্যে সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্‌ আর সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার বিবাহ হয়নি। এদের দুজনের বিয়েটা যেন হবেই ব'লে সবাই ধ'রে নিয়েছিল। ছেলের বয়স ৩৫, মেয়ের ২৫; দুজনেই এক সমাজের লোক, ভালো ভাবে মানুষ। ছেলেকে বৌ আন্‌তে হবে, মেয়েরও বিয়ের দরকার। বিয়ের আগে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার ধারণা হয়েছিল যে সে তার ভাবী স্বামীকে বেশ ভালোই বাসে; এটা ভেবেও তার আনন্দ হ'ত। ভাবী স্বামী তার সুশিক্ষিত, সুপুরুষ। তাঁর দীপ্ত চোখে বেশ একটা গম্ভীর ভাব ছিল, আর ভাবী স্বামীর কর্ত্তব্য তিনি বেশ সুন্দর-ভাবেই পালন কর্‌তেন। ক'নেও সুন্দরী, বং বেশ কর্সা, লম্বা, মাথার চুল ও চোখের রং বেশ ঘন-কালো,—একটু লাজুক, তবে কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর্‌তে হয় সে বেশ ভালো করেই শিখেছিল। কেবল টাকার জন্যে ভদ্রলোক বিয়ে কর্‌তে সম্মত হননি, তবে মেয়ে যে কিছু পাবে জেনে মনে মনে সন্তুষ্টই হয়েছিলেন। তাঁর নিজের বংশ ভাল, ক'নেও নামজাদা ঘরের মেয়ে। দরকার হ'লে এ থেকে অনেক সুবিধার হ'তে পারে।

সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্‌ লেস্‌লেটিভিসের কাজের কোন খুঁত ধরা যেত না, আর সকলের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করার দরুণ ধীরে ধীরে তাঁর বেশ উন্নতিও হচ্ছিল, অবশ্য এমন কিছু নয় যাতে পাঁচজনের হিংসা হ'তে পারে, আবার এমন কিছু কমও নয় যাতে তাকেও অন্যের হিংসা কর্‌তে হয়। সবই তার আস্‌ত, সবই সে পেত ঠিকমত, আর ঠিক সময়ে।

কোথাও যে কিছু গোল আছে তা বিয়ের পর সার্জ্জি মডেষ্টোভিচের ব্যবহারে তার স্ত্রী টের পায় নি। পরে কিন্তু যখন তার স্ত্রীর সন্তানসম্ভাবনা হ'ল তখন সে অন্যত্র একটা হাল্‌কা রকমের সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল বটে। সেরেফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না এ বিষয় সন্ধান পায়, কিন্তু সে নিজেই অস্বস্তি হ'য়ে গেল যখন দেখ্‌ল যে এ খবরটা তাকে তেমন ক'রে আঘাত কর্‌তে পারে নি। সে তার সন্তানের আগমনের জন্যে এমন উৎসুক হয়েছিল যে অন্য সব বিষয় চাপা প'ড়ে গেল।

একটি ক্ষুদ্র কন্যা জন্মাল,—সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না নিজেকে মেয়ের কাজে ঢেলে দিল। প্রথম প্রথম

তার আদরের লেলেচ্‌কার খুঁটিনাটি সব কথাই সে তার স্বামীর কাছে বলতে বেশ আগ্রহ ক'রে, কিন্তু পরে দেখ্‌ল এ সবে তার স্বামীর সহানুভূতির কোন আনন্দ নেই, তিনি কেবল শুনে যেতেন অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ। ধীরে ধীরে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না স'রে গেল তার স্বামীর কাছ থেকে বেশ দূরেই।

অন্তরের ক্ষুধা মেটাবার খোরাক স্বামীর কাছ থেকে না পেলে কেউ কেউ যেমন নিজেকে বিলিয়ে দেয় যে কোন লোকের হাতে, সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নাও নিজেকে দিয়ে দিল তার ছোট্ট মেয়েটির হাতে।

"মাত্রি, উকোচুই খেলবে এস!" লেলেচ্‌কা এখনও 'র' কি 'ল' বলতে পারে না তাই লুকোচুরিকে 'উকোচুই' বলে। এই আধ-আধ কথা শুন্‌লেই সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার মুখে কেমন একটা স্নেহের হাসি ফুটে ওঠে। কথাগুলো বলেই লেলেচ্‌কা কার্পেটের উপর দুপ্‌দুপ্‌ ক'রে মোটা মোটা পা ফেলে দৌড়ে গিয়ে খাটের পাশের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়্‌ল। দুই দুই একটা চোখ বা'র ক'রে হাসিভরা স্বরে ডাক্‌ল—"টু-ই"। মাও অম্‌নি মিছামিছি এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি ক'রে বল্লেন—"আমার খুকীটা গেল কোথায় রে? এদিকে লেলেচ্‌কা তার লুকানো জায়গা থেকে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠে, একটু বেরিয়ে এল। তার মাও যেন তাকে তখুনি খুঁজে পেলেন এমনই ভাব ক'রে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বল্লেন—"ওমা, এই যে আমার লেলেচ্‌কাকে খুঁজে পেয়েছি!" লেলেচ্‌কা অম্‌নি মার কোলে মুখ গুঁজে সমস্ত শরীরটা মার বাহুর মধ্যে লুকিয়ে দিয়ে হাস্‌ল অনেকক্ষণ ধ'রে, তার মাও চোখ স্নেহের হাসিতে ভরা। অবশেষে হাসি থামিয়ে লেলেচ্‌কা বল্ল—"এবার,মাগো তুমি লুকোও!" মা আলমারির পাশে লুকিয়ে ডাক্‌লেন—"টু-ই, খুকুমণি!" মা যখন লুকোচ্ছিলেন, লেলেচ্‌কা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল বটে কিন্তু চুরি ক'রে দেখ্‌তেও ছাড়ে নি, এখন সে তার মার মতই এদিক ওদিক খুঁজতে সুরু কর্‌ল যদিও সে ভালো করেই জান্‌ত না কোথায় আছেন। "আমার মা কোথায় রে?" সে একবার এ কোণায় উঁকি মারে—"না, মা তো এখানে নেই।" আবার আর একটা কোণায় দেখে—"কৈ না, মা তো এখানেও নেই।" চুলগুলো উস্‌কখুস্‌, নিশ্বাস প্রায় বন্ধ ক'রে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে মা আছেন দাঁড়িয়ে। তাঁর লাল ঠোঁট দুটিতে পরম তৃপ্তির হাসি!

লেলেচ্‌কার ধাত্রী কিডোসিয়ার মেজাজটা বেশ ঠাণ্ডা, চেহারাও মন্দ নয় যদিও একটু বোকা বোকা দেখ্‌তে। মনিবের মুখের ভাব দেখে সে একটু হাস্‌ল, ভাবের অর্থ যেন এই:—"বড় ঘরের মেয়েরা যা খুসী করুক, তোমরা তাতে বাধা দিতে যেও না।" সে মনে মনে ভাব্‌ল —"মা-ঠাকরুন আমার যেন ঠিক একটি কচি মেয়ে··· কি রকম উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছেন!"

লেলেচ্‌কা তার মার লুকানো জায়গায় হঠাৎ এসে পড়েছে। তার মাও খেলতে খেলতে হ'য়ে গিয়েছিলেন তন্ময়, বুক তাঁর কাঁপ্‌ছে দুর্দুর্‌ ক'রে, তিনি আরও ঠেসে দাঁড়ালেন দেয়ালের গায়ে, চুলগুলো প্রায় খুলে এল। হঠাৎ লেলেচ্‌কা মার দিকে চেয়ে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"তোমায় পেয়েছি খুঁজে'!"—ভুলভাল উচ্চারণ ক'রে সে চেঁচাতে লাগ্‌ল আর সেই ভাঙাচোরা কথা শুনে তার মার কি আনন্দ!

হাত ধ'রে সে তার মাকে টেনে এনে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করাল, আহ্লাদে দুজনেই হেসে খুন। লেলেচ্‌কা আবার তার মুখ ঢাক্‌ল মার কোলে, আবো আবো আবার কত যে অর্থহীন বকে গেল,—শুনতে ভারি মিষ্টি।

সার্জি মডেস্টোভিচ্‌ ঠিক এই সময় মেয়ের ঘরের দিকে আস্‌ছিলেন। আধভেজান দরজা দিয়ে হাসি, চীৎকার, দৌড়ঝাঁপের আওয়াজ সবই কানে এল। ঘরে ঢুকে তিনি একটু হাস্‌লেন, সেই রকম কন্‌কনে হাসি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত, ঠাণ্ডা মোলায়েম চেহারা। তাঁর আশে পাশের সব জিনিষই যেন পরিষ্কার, টাট্‌কা, ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডা। তাদের হুড়োহুড়ির মধ্যে তিনি তাঁর শুকনো চক্‌চকে শীতলতা এনে সবলকেই বিব্রত ক'রে দিলেন। এমন কি কিডোসিয়াও নিজের ও মনিবের জন্যে লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌ল সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না মুহূর্ত্তের মধ্যে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন, তাঁর মনের ভাব যেন ছোট মেয়েটিকেও স্পর্শ কর্‌ল, সেও হাসি থামিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার বাপের দিকে।

সার্জি মডেস্টোভিচ্ চকিতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে নিলেন। এ ঘরে তাঁর আসতে ভালই লাগে। এ ঘরের সব জিনিষই কেমন সুন্দর ভাবে গোছান। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না ইচ্ছা ছিল যে শৈশব থেকেই যেন তাঁর ছোট মেয়েটি সৌন্দর্য্যের মাঝে মানুষ হয়, তাই এ ঘরের সব জিনিষ তিনি নিজের হাতেই সাজিয়েছিলেন, এমন কি তিনি নিজেও যে সুন্দর ভাবে সাজতেন সেও কেবল মেয়ের জন্যে। একটা বিষয় সার্জি মডেস্টোভিচের আজও অজানা রয় নি, সেটা হ'চ্ছে তাঁর স্ত্রীর এই অষ্টপ্রহর মেয়ের ঘরে আড্ডা জমানো।—"যা ভেবেছিলাম তাই, জানতাম তোমায় এ ঘরেই পাওয়া যাবে।"—মুখে তাঁর ক্রূর রক্ত হাসি।

দুজনে ঘর থেকে বেরুলেন। স্ত্রীর পিছন পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে, যেন বিশেষ কিছু নয় এমনি ভাবে সার্জি মডেস্টোভিচ্ বল্লেন—"আচ্ছা তোমার মনে হয় না, মেয়েটাকে এক একবার ছেড়ে দেওয়া ভাল?" স্ত্রীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে পুনরায় বল্লেন—"মেয়েটার নিজস্বটা যে আছে সেটা তো ওর বোঝবার দরকার?" সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না বল্লেন—"ও যে নেহাৎ বাচ্চা!" "তা'ই হোক্, ওটা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির সামান্য বিশ্বাস, আমি জোর করছি না, মেয়ের ঘরে তো তোমারই রাজত্ব!" "আচ্ছা আমি ভেবে দেখ্ব।"—তাঁর স্ত্রী হাসলেন, তাঁরই মত ফুরানো, ঠাণ্ডা হাসি। এর পর দুজনে অন্য কথা পাড়লেন।

ধাত্রী ফিডোসিয়া কি আর রাঁধুনীর সঙ্গে গল্প করছিল রান্নাঘরে ব'সে। কি দরিয়া বেজায় চুপ্‌চাপ্, কিন্তু য়াগাথা রাঁধুনীটি ঠিক তার উল্টো। বাড়ীর খুদে মনিবটির বিষয়ই গল্প হচ্ছিল, কেমন সে মার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ভালবাসে—"জান না, সে কি মজা ক'রে মুখখানা লুকিয়ে তাকে—'টু...ই'।" ফিডোসিয়া বলতে লাগল—"আর মা-ঠাকরুনও যেন ঠিক কচি ছেলে!" য়াগাথা কিন্তুর মত মাথা নেড়ে গম্ভীর অথচ বিরক্ত হয়েই বল্ল—"মা ঠাকরুন খেলেন সে আলাদা কথা, কিন্তু খুকী খেলে সেটা বাপু বড় খারাপ!" ফিডোসিয়া অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—"কেন?" জোরের সঙ্গে য়াগাথা বল্ল—"হাঁ খারাপ, ভীষণ খারাপ!" "বাঃ রে কেন?"—ফিডোসিয়া জিজ্ঞেস না ক'রে থাকতে পারল না।

সাবধানে দরজার দিকে চেয়ে চাপাগলায় য়াগাথা বল্ল—"ও অমন ক'রে লুকিয়ে একেবারেই লুকিয়ে যায়।" ভয়ে ভয়ে ফিডোসিয়া জিজ্ঞাসা করল—"কি বলছ তুমি?" সেই রকম গম্ভীর ভাবে চুপিচুপি য়াগাথা কের মাথা নেড়ে বল্ল—"আমি সত্যি বলছি, বেশ নিও আমার কথা, ওটা একটা নির্ঘাত খারাপ লক্ষণ।" বুড়ীটা লক্ষণটা তখুনি তখুনি তৈরী ক'রে বেশ গর্ব্ব অনুভব করতে লাগল।

লেলেচ্কা ঘুমুচ্ছে ঘরে, সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না নিজের ঘরে ব'সে ভাবছিল তারই কথা। তাকে একেবারে ছোট শিশুর মত মনে হ'ল, সে নেহাৎ বাচ্চা! আবার যেন মনে হ'ল সে তো বেশ ডাগরটি হয়েছে···কের মনে হ'ল, সে নেহাৎ বাচ্চা!—এমন ক'রে ঘুরে ফিরে শেষে কিন্তু সে র'য়ে গেল মায়ের ছোট্ট লেলেচ্কা। ফিডোসিয়া, সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্নার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ চোখ তার ভাবনায় ভরা। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না প্রথমে তাকে লক্ষ্য করেন নি পেরে যেমন সে—"মা-ঠাকরুন, ও মা-ঠাকরুন—" ব'লে ডাকল কাঁপা গলায়, তখন সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না চেয়ে দেখলেন চমকে। ফিডোসিয়ার মুখ দেখে তাঁর সত্যি ভয় হ'ল। ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে ফিডোসিয়া, লেলেচ্কার তো কিছু হয় নি?" হাত দিয়ে ইসারায় তাঁকে বসতে বলে ফিডোসিয়া বল্ল—"না মা-ঠাকরুন, লেলেচ্কা ঘুমুচ্ছে, ভগবান তাকে রক্ষা করুন! আমি কিন্তু একটা কথা বলতে চাই। লেলেচ্কা—বুঝেছেন কিনা? লেলেচ্কা কেবলই লুকোয়, ওটা ভাল নয়।" স্থির দৃষ্টিতে ফিডোসিয়া তার মনিবের দিকে চেয়ে রইল, ভয়ে তার চোখ দুটো হ'য়ে গিয়েছিল একেবারে সোল। মনটা তার দ'মে গেল, বিরক্ত হ'য়ে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না যখন বল্লেন—"কেন ভাল নয়?"

"আমি বলতে পারি না কত খারাপ" যেন জোরের সঙ্গেই কথাগুলো বলে সে। শুভ ভাবে সেরাফিমা বলল—"ভাল ক'রে গুছিয়ে বল, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।" লজ্জিত হ'য়ে চট্ ক'রে ফিডোসিয়া ব'লে ফেলল "ওটা যে একটা কুলক্ষণ!" "বাজে কথা—।" সেরাফিমা লক্ষণ উক্ষণ সম্বন্ধে আর কিছু শুনতে চাইল না। মেজাজটা তার বিগড়ে গেল. একটা বাজে কথায় যে তার সুখের স্বপ্ন এমন ক'রে নষ্ট হ'য়ে গেল তার জন্যে সে সত্যিই বিরক্ত হ'ল। এদিকে মনটাও তার ভ'রে গেল একটা আশঙ্কায়।

ফিডোসিয়া করুণ সুরে বলেই চল—"জানি ভদ্দর লোকে এসব লক্ষণ উক্ষণ মানে না, কিন্তু যা'ই বল মা, অমঙ্গল না ঘটে। ছোট মা-ঠাকরুনটি আমার লুকুতে লুকুতে, শেষে স্যাঁৎসেঁতে একটা কবরের মধ্যে আমার দেবশিশুটি লুকিয়ে যাবে।" কাপড় দিয়ে সে তার চোখ মুছল। শান্ত গম্ভীর স্বরে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তোমায় একথা বলেছে?" ফিডোসিয়া উত্তর দিল—"দ্যাগোথা বলেছে মা, ও সব জানে।" নিজেকে এই আসন্নতা বিপদ থেকে বাঁচাবার আশাতেই যেন বিরক্ত হ'য়ে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না বলেন—"জানে? সব বাজে কথা,—ভবিষ্যতে এ সব যা তা কথা নিয়ে আমার কাছে এস না। এখন তুমি যেতে পার।" ব্যথিত মনে ফিডোসিয়া সেখান থেকে চ'লে গেল।

লেলেচ্কার মৃত্যুর বিষয় ভাবতেই বুকখানা যেন ভেঙে পড়ল। নিজেকে এ চিন্তা থেকে মুক্ত করবার জন্যে সে মনে মনে বলে—"সব বাজে কথা, বাছা আমার মরতে যাবে কেন? কি-চাকরানীরা অমন ব'লে থাকে, মূর্খ ওরা, তাই ওসব লক্ষণ উক্ষণ মানে। ছোট ছেলেপেলের খেলার সঙ্গে তাদের জীবনের নাকি কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?" নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল কিন্তু সব কাজের ফাঁকে তার মনে হ'তে লাগল—"লেলেচ্কা লুকোতে ভালোবাসে।"

লেলেচ্কা যখন খুব ছোট, এই সবে তার মা আর সবাইকে চিনতে শিখেছে, তখনও মাঝে মাঝে দাইয়ের কোলে ব'সে মাকে দেখে মুখখানা বাঁকিয়ে ফস্ ক'রে সেটা লুকিয়ে ফেলত তার দাইয়ের কাঁধে। তারপর দুষ্টুমি-ভরা চোখে সে চেয়ে দেখত। সেবাশেষে ফিডোসিয়া যদি কখনো লেলেচ্কাকে একা পেত, তো ঐ রকম লুকোতে শেখাত। লেলেচ্কার মা ঘরে ঢুকে যখন দেখতেন যে লেলেচ্কাকে ও-রকম ক'রে মুখ লুকোলে কেমন সুন্দর দেখায় তিনি তখন তাঁর এই ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে সুরু করেন।

পরদিন লেলেচ্কাকে নেড়ে চেড়ে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না, ফিডোসিয়ার কথা প্রায় একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু খাবার দাবারের ব্যবস্থা ক'রে লেলেচ্কার ঘরে ঢুকতেই যখন লেলেচ্কা টেবিলের তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল—"টু·· ই", তখন হঠাৎ মনটা ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। যদিও তখুনি ভয়টাকে একটা কুসংস্কার ব'লে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, তেমন ক'রে লেলেচ্কার খেলাতেও যোগ দিতে পারলেন না। লেলেচ্কাকে অন্য খেলা শিখিয়ে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। লেলেচ্কা শুধু সুন্দর নয়, সে খুব বাধ্যও ছিল, সে তৎক্ষণাৎ মা যে নতুন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাতেই মেতে গেল। কিন্তু অভ্যাস বশতঃ মাঝে মাঝে সে ফস্ কোরে লুকিয়ে গিয়ে "টু...ই" ব'লে ডাক দিত।

সেরাফিমা প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন যাতে লেলেচ্কা লুকোচুরি খেলা ছেড়ে অন্য খেলায় আনন্দ পায়, কিন্তু নানা রকম দুশ্চিন্তায় নিজের মন খারাপ থাকার কাজটা হ'য়ে পড়েছিল শক্ত। "কেন যে লেলেচ্কা অমন 'টু·· ই' ব'লে সাড়া দেয়? একঘেয়ে খেলাটা কি ওর এতই ভালো লাগে? সেই দিনরাত ঐ চোখ বন্ধ করা আর মুখ লুকোনো।" সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্না ভাবলেন—"হয়ত অন্য ছেলে-মেয়েদের মত পৃথিবীর উপর ওর অত টান নেই, এতে কি বোঝায় ওর শারীরিক কোন দুর্বলতা আছে? হয়ত না বাঁচবার প্রবৃত্তির বীজ ওর শরীরের মধ্যে আছে কোথাও—।"

আশঙ্কায় মন তাঁর ভরা। লেলেচ্কার সঙ্গে লুকো-

চুরি খেলা বন্ধ করবার জন্যে মনে মনে লজ্জা হয় কিন্তু কোন উপায়ও যে নেই, প্রাণ চায় খেলতে কিন্তু মন ওঠে না। মাঝে মাঝে জোর ক'রে সে খেলত, কিন্তু তারাক্রান্ত মনে কেবলই মনে হ'ত জেনে শুনে সে যেন কি একটা অমঙ্গল টেনে আনছে।

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার দিনগুলো কাটছিল বড় দুঃখেই।

লেলেচ্‌কার চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে। রেলিং দেওয়া খেরা-খাটটিতে ঢুকতেই ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে এল। মা তাকে ঢেকে দিলেন একখানা নীল কম্বল দিয়ে। মাকে আদর করবার জন্যে লেলেচ্‌কা কম্বলের ভিতর থেকে তার ছোট ছোট হাত দুটি বের করতেই মা ঝুঁকে এলেন। ঘুমন্ত মুখে তার একটা শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়া, মাকে চুম্বন করতেই বালিশের উপর তার মাথাটা নুয়ে পড়ল। হাত দুটো কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে নিতে সে বলে—"টু···ই হাত!"

মার রক্তসঞ্চালন বন্ধ হ'য়ে যাবার যোগাড় হ'ল। লেলেচ্‌কা বিছানায় প'ড়ে আছে,—কি স্থির শান্ত ক্ষীণ মেয়েটা! লেলেচ্‌কা মৃদু হেসে চোখ বুজে আস্তে আস্তে বলে—"টু···ই চোখ!" তারপর আরও ক্ষীণ স্বরে বলে—"টু···ই লেলেচ্‌কা!" এই কথাগুলো ব'লে, বালিশে মাথাটি গুঁজে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কম্বল মুড়ি দিয়ে সে যখন ঘুমোচ্ছিল তখন তাকে কি রকম ছোট আর দুর্বল দেখাচ্ছিল। মা তার দিকে চেয়ে রইলেন বেদনাভরা ম্লান চোখে। নানা আশঙ্কায় যখন তাঁর মন ভ'রে এল তখন তিনি মনে মনে বল্লেন—"আমি মা, আমি কি আমার সন্তানকে সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষা করতে পারব না?" অনেক রাত পর্য্যন্ত সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না লেলেচ্‌কার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলেন। সারা রাত প্রার্থনা করেও মনের শুরুভার সরাতে পারলেন না।

অনেকগুলো দিন এমনি ভাবে কেটে গেল। ঠাণ্ডা লেগে লেলেচ্‌কার একদিন জ্বর এল। এক রাতে কিডোসিয়া, সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নাকে লেলেচ্‌কার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। লেলেচ্‌কার উত্তপ্ত গায়ে হাত দিয়ে, তাকে কষ্টে ছট্‌ফট্‌ করতে দেখে, সেই অমূলক কথাগুলো মনে প'ড়ে গেল সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার। সে একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়ল মোড়াতেই।

ডাক্তার এল,—এ অবস্থায় যা যা করবার সবই করা হ'ল কিন্তু বেঁচে থাকার সেটা কেউ বন্ধ করতে পারল না।

লেলেচ্‌কা আবার উঠে বসে, হাসবে, খেলবে এই সব ব'লে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না বৃথা মনকে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু লেলেচ্‌কা দিন দিন মিশিয়ে যেতে লাগল বিছানার সঙ্গে।

সে যাতে না ভয় পায় তাই সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নাকে দেখলে সকলে একটা শান্ত গাম্ভীর্য্যের ভাণ করত কিন্তু তাতে সে হ'য়ে পড়ত আরো উতলা।

সব চেয়ে কিন্তু তার খারাপ লাগত কিডোসিয়াকে দেখলে। সে যখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত আর বলত—"বাছা আমার নিজেকে কেবল লুকোতেই চায়—" তখন তার মন একেবারে ভেঙে পড়ত।

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার চিন্তাগুলো সব হ'য়ে পড়েছিল এলোমেলো। কি যে হ'চ্ছে সে যেন বুঝতে পারত না কিছুই।

এদিকে লেলেচ্‌কার জ্বর ছেড়েই চায়। বিকারের ঘোরে সে অচেতন হ'য়ে যা' তা' বকত, কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সে তার সব কষ্ট সব শ্রান্তি ভাল মনেই গ্রহণ করত। মা যাতে তার কষ্টটা টের না পান তাই সে তার মার দিকে চেয়ে চেষ্টা করত হাসবার।

একটা দুঃস্বপ্নের মত তিনটে দিন কেটে গেল। লেলেচ্‌কার শরীরে আর কিছু নেই, কিন্তু সে যে মরতে বসেছে তখনও সে টের পায়নি।

মার দিকে চায়, দেখতে পায় না স্পষ্ট ক'রে, তবু সে বলে—"মাগো, টু···ই!" গলার স্বর নিতান্ত ক্ষীণ। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না মুখখানা ঢেকে ফেল্লেন খাটের পাশের পর্দার আড়ালে।—কী ভীষণ!

"মাগো!"—লেলেচ্‌কার গলার স্বর প্রায় বন্ধ। মা ঝুঁকে পড়লেন একেবারে তার মুখের কাছে। লেলেচ্‌কার দৃষ্টি হ'য়ে এল আরও ক্ষীণ, সে তার মার কাঁকালে মুখ লুকোবার মতই দেখ্‌ল। "আমার ধব্‌ধবে শাদা মা!"—সে ধীরে ধীরে বল্ল। অবশেষে মার শাদা মুখখানাও মুছে যাবার জোগাড় হ'ল,—লেলেচ্‌কার চোখের সাম্‌নে সবই যেন হ'য়ে এল কালো। দুর্বল হস্তে সে গায়ের চাদরখানা চেপে ধ'রে চাপা গলায় বল্ল—"টু···ই!"

গলার মধ্যে একটা ঘড়্‌ঘড়্‌ আওয়াজ হ'ল, লেলেচ্‌কার ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো একবার নোড়ে উঠে তখুনি বন্ধ হ'য়ে গেল। সে ঘুমিয়ে পড়ল চিরদিনের জন্যে মরণের কোলে!...

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না বেরিয়ে গেল লেলেচ্‌কার ঘর থেকে। পথে দেখা হ'ল স্বামীর সঙ্গে। ধীর শান্ত গম্ভীর ভাবে সে বল্ল—"লেলেচ্‌কা আর নেই।" স্ত্রীর শাদা মুখ দেখে সার্জ্জি মডেষ্টোভিচের কেমন ভয় হ'ল—এমন চেহারা তো তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নি।—

লেলেচ্‌কাকে কল্পনা কাপড় পরিয়ে কফিনে শুইয়ে, নিয়ে গেল বস্‌বার ঘরে। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না কফিনের পাশে দৃষ্টিহীন চোখে তার মৃত সন্তানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্‌ স্ত্রীর কাছে গিয়ে একঘেয়ে ফাঁকা কথায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রে তাকে কফিনের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে গেলেন, সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না হাস্‌ল, আস্তে আস্তে সে বল্ল—"স'রে যাও—লেলেচ্‌কা খেলছে, এখুনি উঠে বস্‌বে।" চাপা গলায় সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ্‌ বল্ল—"সিমা, অমন ক'রে উতলা হ'ও না, যেটা ভবিতব্য সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।" মৃত সন্তানের দিকে চেয়ে জোরের সঙ্গে সে বল্ল—"দাঁড়াও না, ও এখুনি উঠ্‌বে।" দৃষ্টি তার পলকহীন।

সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ একবার সাবধানে এদিক ওদিক চেয়ে দেখ্‌লেন, কেউ ত নেই কাছে? এ সব অদ্ভুত হাস্যকর কথাবার্ত্তা তাঁকে কেমন লজ্জা দিচ্ছিল।—"সিমা, অমন কোরো না, এও কি সম্ভব? তা যদি হয় তো একটা মিরাকেল্‌ হবে বল? ও সা। কি উনিশশো শতাব্দীতে হয়?" কথাগুলো বলেই সার্জ্জি মডেষ্টোভিচের মনে হ'ল বলাটা সঙ্গত হয় নি।

তাঁর রাগ হ'ল। হাত ধ'রে স্ত্রীকে কফিনের কাছ থেকে সরিয়ে নিলেন, সে কোন আপত্তি করল না।

চোখ তার শুষ্ক, চেহারা শান্ত। লেলেচ্‌কার ঘরে গিয়ে সে যেখানে যেখানে লুকোত সে জায়গাগুলো দেখ্‌ল, মাঝে মাঝে টেবিল বা খাটের নীচেও উঁকি মেরে দেখ্‌ল আর কেবলই বলতে লাগ্‌ল—"আমার খুকী কৈ? লেলেচ্‌কা কোথায়?" একবার ঘর খোঁজা শেষ হয় তো সে আবার সুরু করে।

ঘরের একটা কোণে বিষণ্ণ ভাবে বসে ছিল ফিডোসিয়া, সে তার মনিবের কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেল, তারপর কেঁদে উঠে বল্ল—"সে নিজেকে লুকিয়ে ফেল, আমাদের লেলেচ্‌কা গো, আমাদের সোণামণি!"

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার সারা শরীরটা উঠ্‌ল কেঁপে, চুপ কোরে সে দাঁড়াল, তারপর অবাক হ'য়ে ফিডোসিয়ার দিকে চেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সার্জ্জি মডেষ্টোভিচ, লেলেচ্‌কার সৎকারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেল্‌তে চাইলেন। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না যে রকম আঘাত পেয়েছেন তাঁর ভয় হ'ল হয়ত বা তাঁর মাথার ঠিক থাক্‌বে না। লেলেচ্‌কার মৃতদেহ যত শীঘ্র কবরস্থ হয় তার মার পক্ষে ততই ভাল, সে তাহ'লে একটু সাম্‌লে নিতে পার্‌বে।

পরদিন লেলেচ্‌কারই জন্যে সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না সাজ্‌ল বেশ ভাল করেই। বস্‌বার ঘরে এসে দেখেন তাঁর ও লেলেচ্‌কার মাঝে অনেকগুলি লোক দাঁড়িয়ে। পাদ্রী সাহেব ঘরের সামনে পাইচারী ক'রে বেড়াচ্ছিলেন।

ধূপের ধোঁয়া ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছিল আকাশের দিকে। ঘরটা ভ'রে উঠেছিল ধূনোর গন্ধে।

সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার মাথা কেমন ভার ভার, সে আস্‌তে আস্‌তে লেলেচ্‌কার পাশে এসে দাঁড়াল। লেলেচ্‌কাকে অমন স্থির হ'য়ে শুয়ে থাক্‌তে দেখে সে একটু করুণ ভাবে হাস্‌ল। গালটা তার কব্জিনের উপর রেখে সে বল্ল—"টু···ই পুকী!"

পুকী কিন্তু কোন সাড়া দিল না· তারপর সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌নার পাশে কিসের একটা সাড়া পড়্‌ল। অচেনা, অপ্রয়োজনীয় কতকগুলো মুখ ঘিরে ফেল্ল তাকে। কে যেন তাকে ধম্‌কে চেপে, তারপর লেলেচ্‌কাকে কোথায় নিয়ে গেল। সেরাফিমা এলেক্সান ড্রোভ্‌না দাঁড়াল সোজা হ'য়ে,—একটি দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে ঠেলে বেরুল, সে ক্যালক্যাল ক'রে চেয়ে রইল, তারপর একটু হেসে সে ডাকল—"লেলেচ্‌কা!"

লেলেচ্‌কাকে তখন বা'র ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। মুখ পিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মা কব্জিনের উপর পড়্‌তে গেল কিন্তু তাকে যেতে দেওয়া হ'ল না। লেলেচ্‌কাকে যে দরজার পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারই পিছনে সে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়্‌ল। আর দরজার ফাঁক দিয়ে সে বাইরের দিকে চেয়ে ডাক্‌ল—"লেলেচ্‌কা টু···ই!"

তারপর দরজার থেকে মুখ বাড়িয়ে সে জোরে জোরে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

তাড়াতাড়ি লেলেচ্‌কাকে তার মার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল, যারা নিয়ে যাচ্ছিল তারা যেন না ছেঁটে দৌড়তেই লাগ্‌ল।

৯ শিয়ান গল্প থেকে।

বালুচর

শ্রী যতীন্দ্র সেনগুপ্ত

নদী-বুক চিরে' উঠিয়াছে জেগে একখানি বালুচর;
ধূসর ধূলায় উষর বেদনা রোদে কাঁপে ওর 'পর।
শ্যামল তৃণের কোমল বুকের মমতা আঁকেনি বুকে;
নীরবে কেবলি কেঁদে যায় ও যে না জানি সে কত দুখে!
ওরে ঘিরে হায় নেচে নেচে ফিরে ছোট ছোট ঢেউগুলা;
তবু বুকে শুধু ভাঙিয়া উঠে যে বেদনার ধূ ধূলা!
চারিদিকে জল ছল্ ছল্ করি' ছলনা কেবলি হানে,
আকুল নয়নে চাহে ও' কেবল দূরের গ্রামের পানে।

সোনালী কমল নদীর দু'ধারে ও'রে দেয় হাতছানি;
সুদূর-বিসারী প্রান্তর ডাকে উড়ায়ে আঁচলখানি।
সরিষা-শীষের শীষমহলের রূপসীরা ডাকে ও'রে;
আমি এ বিমনা অচেনা পথিক আমিকে ডাকিছি তোরে।
তরুরা কেহ যে মিটায়নি তোর মরুর পিপাসা হায়!
হাজার ফেনার বিষ-জ্বালা তোর গেজে উঠে কিনারায়

বালুচর,—বালুচর!
আমার দগ্ধ পরশ বুলাব তোর ও বুকের 'পর।
বুক ভরি' মোর পড়িয়াছে চর—দুখের রৌদ্রদাহ
দহিয়াছে মোরে; পাইনি ত কভু সুশীতল অবগাহ।
আমারে ঘেরিয়া করিছে নৃত্য ছলনার শত ছল;
তোরই মত মোর বেদনার বালু বুকে শুধু সম্বল।

বালুচর,—বালুচর!
আমার এ বুক মিশারে কাঁদিব তোর ও বুকের 'পর।

সম্মিলনীর সাম্মলনে

শ্রী অনুরূপা দেবী

আপনারা আমায় আপনাদের মধ্যে আহ্বান ক'রে এনে যে আনন্দ দিয়েছেন তার জন্যে আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এর আগে আর একদিন, যেদিন আমায় আপনারা ডেকে এনেছিলেন, সেদিনও আমার বেশ ভাল লেগেছিল এবং আর একদিন আসবার নিমন্ত্রণ সেদিনই আমি আপনাদের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে গেছলুম। একটু সাংসারিক অসুবিধা ঠেলেও সেই প্রতিশ্রুতি আজ পালন করতে এসেছি। শরীর মন তত সুস্থ নেই, ভাল ক'রে কিছু বলবার শক্তিতে কুলোবে না। সেদিক থেকে যদি কেউ কিছু আশা ক'রে এসে থাকেন, দুঃখের সঙ্গে বলছি, তাঁকে একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ফিরতে হবে। তবে আমার ইদানীংকার ভাঁটাপড়া-সাহিত্যসেবার গতি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা হয়ত আজও নূতন ক'রে বা বেশি ক'রে বিস্মিত হবার কিছু পাবেন না। ভগবান মানুষকে শক্তির হয়ত একটা সীমা বেঁধে দিয়েছেন, অনন্ত-সাধারণ ব্যক্তি-বিশেষের জন্য ছাড়া অধিকাংশ সাধারণদের এই সীমাবদ্ধ শক্তি একটা নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে মাপা আছে। আমার মনে হয় আমার ক্ষমতা মাপকাঠির শেষ পর্যন্ত উঠে এসেছে, ছাপাছাপি হ'য়ে উঠতে তার আর বেশি ক'রে বাকি নেই। তাই নিজের মনের এ দৈন্য-দুর্দশাকে আমি নিজে ক্ষমা করতে পারছি,—এবং হয়ত অন্যেও তা' পারেন। এমন এক সময় ছিল, মাসিকে ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের একটি মাসও বাদ পড়াকে আমি নিজেই নিজের পক্ষে অপরাধ ব'লে মনে করতুম। কেউ লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, আমার লেখার ইতিহাসে এ রকম ঘটনা অত্যন্তই বিরল ছিল। 'মা' উপন্যাস ভারতবর্ষে বেরুবার সময়ে একবার এক সংখ্যায় "চক্র" উপন্যাসে ঘটনা-চক্রে বিশেষ ভাবে এ অপরাধ আমায় করতে আমার ভাগ্য বাধ্য করেছিল। এখন কিন্তু জীর্ণহওয়া দেহ-মন আর একে অপরাধ ব'লে স্বীকার করতেই রাজী হয় না। তারস্বরে তারা বলে,তাদের শক্তির 'লীমিট' ফুরিয়েছে, এখন এই রকমই হবে। এই এখন তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এ এখন আর তাদের পক্ষে অপরাধ নেই। মনকে আঁখি-ঠারা ব'লে আমাদের দেশে একটা কথা আছে; হ'তে পারে ও হয় ত কতকটা তাই। জানি না,—কিন্তু আগেই তো বলেছি সবার জন্য শক্তির সকল অপর্যাপ্ত নয়। এখন আমার নেবার পালা, দেবার নয়। আবহমান কাল ধ'রে এই আবর্তমান, চির সংসরণশীল সংসারের সকল ক্ষেত্রে সকল স্তরে সমস্ত বিভাগেই এই নীতি সনাতন ভাবে চিরা চরিত হ'য়ে আসছে। বসন্তের আগমনে গাছের শাখায় পাতা ধরে, ফুল ফোটে,—ফল ফলে। রোদের তেজে শুকিয়ে আসে, শীতের হাওয়ায় আপনি ঝরা ক'রে পড়ে। কিন্তু তাই বলেই গাছ চিরদিনের জন্যে নিরাভরণ হ'য়ে থাকে না। আবার নূতন ক'রে বসন্ত এসে তাকে নবীন পত্র-মঞ্জরীতে ভরিয়ে তোলে, নবমুকুলের অভিনব সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে দেয় নব প্রস্ফুটিত কুসুমবাসে, নূতন রংয়ে বাগান আবার নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। জীর্ণ হ'য়ে খ'সে পড়া ঝরা পাতার জন্য শোক করবার অবসর কারুরই থাকে না, তার দরকারও হয় না। আমিও তাই আমার আজকের এই অক্ষমতার জন্যে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নই। আমাদের জীবনে এখন শীতের হাওয়া দেখা দিয়েছে, গাছের পাতা শুকনো হ'তে সুরু করেছে। এখন নূতন গজানো কচি পাতা, কোটা ফুল গাছের শোভা বর্দ্ধিত করুক, দেখে দৃষ্টি সার্থক হোক্, ঘ্রাণে অন্তর পুলকিত হ'য়ে উঠুক,—প্রাণ তৃপ্তিতে ভ'রে যাক্। তবে আপনাদের কাছে আমার এই একটি মাত্র নিবেদন ফুল যে গাছে ফুটছে, সে গাছ কি আগাছা, গোলাপ কি কুকুর-শোঁকা সেইটুকুর উপর আপনাদের সবলকারই লক্ষ্য রাখা দরকার। সাহিত্যের উপবনে বাগ্‌বাদিনীর পূজার মন্দির, তাঁর আরাধকুঞ্জ, বিরামের আসন। সাহিত্যের উপাসক যাঁরা, তাঁদের শুদ্ধশুচি ভাবে

দেবী বীণাপাণির চরণ-পূজার উপযোগী সুগন্ধি পুষ্পসম্ভারের আয়োজন রাখা প্রয়োজন। এখানে বিশেষ ভাবেই বাছা বাছা তাজা তাজা ফুলের ফসল ফলানো তাঁদের কাজ, কালকাসন্দা, সেয়ালকাঁটার জঙ্গল করার দরকার নেই। শুধু দরকার নেই তা নয়, সে যাঁরা করেন, —তাঁরা একটু অত্যাচার করেন,কারণ জগতে মন্দ জিনিষ আপনি গজায়, তাকে চেষ্টা ক'রে সৃষ্টি করতে হয় না। সে রকম সৃষ্টি করা অনাবশ্যক। অনেক সময় সে সব ফুলের বাহারও বড় মন্দ হয় না, কিন্তু প্রাণে কেবল শুধু দুর্গন্ধ, পরীর মনের বাস্থ্যের পক্ষে তা কখনই অনুকূল নয়।

পরিশেষে আমার আত্মীয় ও বন্ধু শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়, যাঁর মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি, তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মতন আপনাদের কাছে বিদায় নিলুম।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পুরাতন সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত)

রাণী রাসমণি

(সংবাদ প্রভাকর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫০। ৩ ফাল্গুন ১২৫৬)

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, জানবাজার নিবাসিনী [মৃত রাজচন্দ্র দাসের সহধর্ম্মিণী] পুণ্যশীলা সৎকীর্ত্তিকারিণী শ্রীমতী সুশীলা রাসমণি দাসী সম্প্রতি এক অতি সৎকার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। উক্তা শ্রীমতীর বাটীর নিকট হইতে মৌলালির দর্গা পর্য্যন্ত জলপ্রণালী না থাকাতে পথিক ও পল্লীস্থ লোকদিগের বিশেষ ক্লেশ হইতেছে, তালতলা নিবাসী সুচিকিৎসক বিচক্ষণবর বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কষ্ট দূরীকরণার্থ এক জলপ্রণালী নির্ম্মাণ নিমিত্ত চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করণে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীমতীর কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং ২৫০০ টাকা দান পূর্ব্বক একাকিনী তৎকার্য্য সম্পন্ন করণে সম্মতা হইয়াছেন। এই দান সাধারণ দান নহে এবং এই কীর্ত্তি সামান্য কীর্ত্তিও নহে, ইহা পৃথা মধ্যে বহুকাল ব্যাপনী হইয়া জনসমূহের মহোপকার করত কীর্ত্তিকারিণীকে চিরস্মরণীয়া করিবেক।

(সংবাদ প্রভাকর, ৩১ জুলাই ১৮৫৬। ১৭ শ্রাবণ ১২৬৩)

কুলীনদিগের বহুবিবাহ নিবারণ জন্য কলিকাতা হইতে দুইখানা, শান্তিপুর হইতে একখানা এবং শ্রীমতী রাসমণি দাসী একখানা, এই কয়েকখানা আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভাকে অর্পিত হইয়াছে, উক্ত সভার সভ্য শ্রীযুক্ত কালবিল সাহেব তাহা মুদ্রিত করণের অনুমতি করিয়াছেন।

ছাতু বাবুর মৃত্যু

(সংবাদ প্রভাকর, ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ ২০ মাঘ ১২৬২)

"আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগীধামে গমন করিয়াছেন। হে পাঠকগণ এই হৃদয় বিদীর্ণকর সংবাদ লিখিতে আমারদিগের লেখনী মসীছলে শোকাশ্রু নিক্ষেপ করিতেছে। আহা! কি অন্তভঙ্গে নিষ্ঠুর কতরোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল, ইংরাজ, বাঙ্গালি, ফরাসি, ইউনানি প্রভৃতি বহুগুণসম্পন্ন চিকিৎসকগণ বহু পরিশ্রম ও উপায়াবলম্বন করিয়াও তাহা আরোগ্য করিতে পারিলেন

না। ঐ সংঘাতিক নিদারুণ রোগ কয়েকমাস পর্য্যন্ত বাবুকে অসীম ক্লেশ দিয়া তাঁহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল, কি পরিতাপ! বাবু আশুতোষ দেব এ প্রকার উৎকট ও ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়া আমারদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিবেন আমরা তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই, এত দিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শব্দে পাষাণ-তুল্য কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন। হা পরমেশ্বর! আশুতোষ বাবু জীবিত থাকাতে আমারদিগের পূর্ব্বকার সকল শোক নিবারণ হইয়াছিল, অধুনা তাঁহাকেও কৃতান্তের করাল হস্তে নিক্ষেপ করাতে আমরা একেবারে অসীম শোকে অভিভূত হইয়াছি, কি লিখিতেছি কিছুই স্থির নাই। হে বন্ধুবর বাবু গিরীশচন্দ্র দেব কোথায়? তোমার পিতৃ বিয়োগ হইল, শীঘ্র আসিয়া আমারদিগের সহিত বিলাপ বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্ন হও। হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাত্মা ছিলে, ভ্রাতৃ বিয়োগের গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইল না।

আহা! বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না. তিনি করুণার সাগর ছিলেন. পরোপকার-গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দ্ধন লোক কেবল তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না, আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল স্বরূপ হইয়া তাঁহারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক। আহা! তাঁহারদিগের দশা কি হইবেক তাহা অনুভূত হয় না, যে নিষ্ঠুর কৃতান্ত এই সর্ব্বজনপ্রিয় বহুজনাশ্রয় বঙ্গ দেশের মহারত্ন স্বরূপ আশুতোষ দেব মহাশয়কে অপহরণ করিতে তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার হইল না. আহা! যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত বর্দ্ধন ও হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত বিদ্যানুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন. তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব রস, তাল, রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়, অদ্য আমরা তাঁহার মৃত্যু শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এই বঙ্গদেশের এক মহারত্ন কৃতান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল, এতৎ পাঠে সকল লোকেই শোকান্বিতভূত হইবেন।

জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা

(সংবাদ প্রভাকর, ৩রা জুলাই ১৮৫৬। ২১ আষাঢ় ১২৬৩)

জ্ঞান প্রদায়িনী সভা।—আগামি ১২ আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যা সপ্তঘটিকার সময়ে সিমুলিয়াস্থ ৺আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে উক্ত সভার প্রথম বাৎসরিক নিয়মিত সভা হইবেক বিদ্যানুরাগী মহাশয়েরা উক্ত সময়ে সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ। সহকারী সম্পাদক।

ছাতুবাবুর পিতা রামদুলাল দেব

(সংবাদ প্রভাকর, ২৮ অক্টোবর ১৮৫৬। ৬ কার্ত্তিক ১২৬৩)

কলিকাতা নগর বাসি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ৺প্রাপ্ত বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার

প্রথমাবস্থা কষ্টে কাটাইয়াছিল, পরে তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ে স্বহস্তে প্রায় এক কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমেরিকান ও ইউরোপীয় বণিকেরা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন, বিশেষতঃ আমেরিকান বণিকদিগের সহিত তাঁহার অধিক কারবার ছিল তাহাতে ফিলেডেলফিয়া নগরের কোন সম্ভ্রান্ত বণিক জেনরল ওয়াসিংটনের এক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, বাবু আশুতোষ দেব ঐ প্রতিমূর্ত্তি অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে তাঁহারদিগের অবিভক্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ঐ প্রতিমূর্ত্তি ২২০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে, শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র উক্ত প্রতিমূর্ত্তি ক্রয় করিয়াছেন।

'বেঙ্গলী'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের লিখিত রামদুলাল দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আছে। লোকনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার *Indian Chiefs, Rajas, Zemindars, etc* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সংক্ষেপে দে-পরিবারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহিত্য-সেবায় বঙ্গমহিলা

(সংবাদ প্রভাকর, ৩ ডিসেম্বর ১৮৬৩। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৭০)

হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা নামক এক খানি নূতন পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমারদিগের বন্ধুবর শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী এই পুস্তকখানি অতি সুললিত অথচ কোমল সাধু ভাষায় বিরচনা পূর্ব্বক গুপ্ত যন্ত্রে অতি পরিষ্কাররূপে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন, আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠে পরিতুষ্ট হইলাম, হিন্দু নারী প্রণীত কোন পুস্তক আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই, ললনাদিগের বিরচিত পদ্য পদ্য পূরিত প্রবন্ধ সকল আমরা সময়ে২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, অতএব এই বঙ্গদেশ মধ্যে বঙ্গভাষায় পুস্তক প্রকাশের প্রথা কৈলাসবাসিনীর দ্বারাই আরম্ভ হইল, ইহা সামান্য আনন্দজনক নহে, অন্যান্য গুণবতী ও বিদ্যাবতীগণ এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুগামিনী হইয়া আপনাপন মনোগত ভাব ও অভিপ্রায় সকল স্বদেশীয় ভাষায় লিখিয়া পুস্তক প্রকাশে অনুরাগিণী হয়েন, তবে রমণী মণ্ডল হইতে অজ্ঞানতা কেবল তিরোহিত হইবে এমত নহে, এই বঙ্গদেশও বিদ্যালোকে উজ্জ্বল হইতে পারে।

কৈলাসবাসিনী এই পুস্তকের প্রথম ভাগে আপনার বিদ্যা শিক্ষার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে বিস্ময়াপন্ন হইলাম যে, চেষ্টার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই, কৈলাসবাসিনী কোন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, এবং বাল্যকালে বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার মনোমধ্যে এপ্রকার সংস্কার ছিল যে, বিদ্যানুশীলন করিলে নারীর বৈধব্য প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত তিনি পুস্তকাদি পাঠ করেন নাই, বিবাহ হইলে কেবল স্বামীর অনুরোধে ও উপদেশের দ্বারা বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহারি নিকটে বিবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং সেই অধ্যয়নের ফলস্বরূপ এই পুস্তকখানি প্রকটিত হইয়াছে, ইহার উপদেশ ভাব অতি উত্তম,...।

(সোমপ্রকাশ, ১৭ কার্ত্তিক ১২৭০)

নূতন গ্রন্থ।—হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। এখানি শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুপ্ত প্রণীত।...আমরা একবার শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, স্ত্রীলোক প্রণীত এই আর একখানি নূতন গ্রন্থ পাইলাম।

আগ্রায় বালিকা-বিদ্যালয়

(সংবাদ প্রভাকর, ২৪ নভেম্বর ১৮৫৬। ১০ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

...কতিপয় মাসের মধ্যে আগ্রা জিলার মধ্যে শ্রীযুত গোপাল সিংহ পণ্ডিতের উদ্যোগে দুই শত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া তাহাতে প্রায় তিন সহস্র বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, স্ত্রী শিক্ষক অভাবে স্ত্রী বিদ্যালয়ের কমিটীর মেম্বরেরা বিদ্বাসী পুরুষ-শিক্ষক মনোনীত করিয়া বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন।...

(সংবাদ প্রভাকর, ২১ নভেম্বর ১৮৫৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

আমরা ইংরাজী পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে আগ্রানিবাসি গোপালচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় তথায় বালিকাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অনুরাগী হইয়া বিলক্ষণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই বঙ্গ দেশের ন্যায় উত্তর পশ্চিম রাজ্যেও ভদ্র পরিবারস্থ বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম প্রচলিত

ছিল না, ভদ্র পরিবারগণ বালাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অতিশয় অপমানজনক জ্ঞান করিতেন, কিন্তু পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্রের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সদুপদেশ দ্বারা তাঁহারদিগের সেই স্বভাবের ক্রমে অভাব হইয়া আসিতেছে।

(সংবাদ প্রভাকর, ২৬ নভেম্বর ১৮৫৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

আমরা ইংরাজ পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে আগ্রা-নিবাসি গোপালচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় তথায় বালিকাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অনুরাগী হইয়া বিলক্ষণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই বঙ্গ দেশের ন্যায় উত্তর পশ্চিম রাজ্যেও ভদ্র পরিবারস্থ বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম প্রচলিত ছিল না, এবং ভদ্র পরিবারগণ বালাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অতিশয় অপমানজনক জ্ঞান করিতেন, কিন্তু পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্রের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সদুপদেশ দ্বারা তাঁহারদিগের সেই স্বভাবের ক্রমে অভাব হইয়া আসিতেছে।

প্রথমতঃ উক্ত পণ্ডিত মহাশয় যে সময়ে আগ্রা রাজধানীতে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের অনুষ্ঠান করেন সেই সময়ে অনেকেই তাঁহার প্রতি আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতেও সন্দিহান বিষয়ে ভীত হয়েন নাই, স্বয়ং সকল ভদ্র লোকের ভবনে গমন করিয়াছেন, যুক্তি ও প্রমাণ এবং বিচার দ্বারা তাঁহারদিগের সকল আপত্তি নিবারণ পূর্ব্বক প্রবৃত্তি প্রদান করাতে উত্তর পশ্চিম দেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেবের অধিকারস্থ আগ্রা রাজধানী ও অপর কতিপয় স্থানে প্রায় দুই শত বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন, ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রায় দুই সহস্র ভদ্র বংশোদ্ভবা বালিকা স্বজাতীয় ভাষায় বিদ্যানুশীলন করিতেছে, এবং ক্রমে তাহারদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

লালা ও বণিক যাঁহারা এতদ্বিষয়ের প্রধান বিপক্ষ ছিলেন তাঁহারা সানুকূল বন্ধু হইয়া বিহিতরূপ সাহায্য প্রদানে উৎসাহি হইয়াছেন, স্ত্রী শিক্ষক প্রাপ্ত না হওয়াতে প্রথমতঃ পণ্ডিত গোপালচন্দ্র অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে আপনাপন সন্ততিদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের প্রতি শিক্ষক মনোনীত কর্ম্মের ভারার্পিত হওয়াতে কোন গোলযোগ হয় নাই, তাঁহারা যে সকল ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র বিজ্ঞ এবং বিদ্বান বিবেচনা করিয়াছেন তাঁহারাই শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের মনোনীত ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই।

এইরূপ রুচির নিয়মে ও পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্রের উৎসাহ পরিশ্রম এবং যত্ন দ্বারা উত্তর পশ্চিম রাজ্যের বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার উপায় হইয়াছে, অতএব উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের যথেষ্ট সাধুবাদ করিতে হইবেক। আহা! এই সময়ে যদ্যপি মৃত মহাত্মা বিটন সাহেব জীবিত থাকিতেন তবে তিনি পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্রকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া রাজভবনে তাঁহাকে সম্মানিত করিতেন। আমরা আরো অবগত হইলাম যে পণ্ডিত গোপালচন্দ্রের প্রতি শিক্ষাবিষয়ের অন্যান্য যে যে কার্য্যের ভার সমর্পিত আছে, তাহা আর কিছুই থাকিবেক না, তিনি কেবল স্ত্রী শিক্ষার প্রাচুর্য্য বিধানার্থ আপনার সমুদয় সময় ক্ষেপণ করিয়া বেতন গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গ-মহিলার কাব্যচর্চ্চা

(সংবাদ প্রভাকর, ২৮ নভেম্বর ১৮৫৬। ১৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

আমরা পরমানন্দ-সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে "চিত্তবিলাসিনী" নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, অবলাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এদেশে প্রচলিতা হইতেছে, তাহার ফল স্বরূপ এই গ্রন্থ, আমরা গত বুধবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছি যে পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পশ্চিম প্রদেশে স্ত্রী বিদ্যার প্রচার নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্নশীল হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ অবলাগণের বিরচিত কোন পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হই নাই, যদিও আমরা ঐ পণ্ডিতবরের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি তথাচ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগারের কামিনীগণের সুশিক্ষার ফল স্বরূপ কোন প্রবন্ধ আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অবনী-মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন ইহাই আমারদিগের প্রার্থনা, এ কারণ আমরা প্রাপ্তক্ত পুস্তক হইতে একটি বিষয় নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম এবং পাঠে পুস্তক লেখক শ্রীযুত কৃষ্ণ কামিনী দাসির কবিতাশক্তি বিবেচনা করিবেন।

"দয়া ছাড়া ধর্ম্ম নাই।

এক দিবস নিশীথ সময়ে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন যোগে দর্শন করিলাম, যে কোন সুবৃহৎ মহাশয় পুরুষের নাসিকারন্ধ্র হইতে প্রথমতঃ এক অসামান্য রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট ষোড়শ-বর্ষীয়া কামিনী এবং পরক্ষণেই এক তরুণ বয়স্ক তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট পুরুষ নিঃসৃত হইলেন, পরে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর যাদৃশ কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যাহা ঘটনা হইয়াছিল পশ্চাল্লিখিত পংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ করিতেছি।

পুরুষের উক্তি।

ঘোর রজনীতে তুমি কাহার কামিনী।
কিসের লাগিয়ে ভ্রমিতেছ একাকিনী॥
বয়েসে নবীন অতি রূপ মনোহর।
আছ রঙ্গে নাহি সঙ্গে সঙ্গিনী অপর॥
কি নাম কাহার কন্যা বল রসবতি।
অপ্সরী কিন্নরী কিম্বা হবে দেবজাতি॥

কামিনীর উক্তি।

লঘুত্রিপদী।

আমি যে রমণী, আছি একাকিনী,
কূলের কামিনী তাই।
তুমি যে এখানে, কিসের কারণে,
বল শুনে শুনিবারে॥
একি তব রীত, বেরি বিপরীত,
নাহি চিতে কিছু ভয়।
রমণীর পাশে, এলে অনায়াসে,
কিরূপেতে মহাশয়॥
আলাপ করিতে, বাসনা মনেতে,
নাহি ভাব তাহে লাজ।
আমি নারী জেতে, তোমার সহিতে,
পরিচয়ে কিবা কাজ॥
সর সর সর, কি কর কি কর,
যাও নিজ নিকেতনে।
দেখে যদি পরে, কি বলিবে পরে,
কিছু নাহি ভাব মনে॥

পুরুষের উক্তি।

শুনিয়ে তোমার রূপ গুলো রসবতি।
হয়েছে আমার অতি সচকিত মতি॥
অকপটে যদি নাহি দিবে পরিচয়।
নিতান্ত প্রাণান্ত হবে জানিবে নিশ্চয়॥
কেবলো বাড়াও জ্বালা ছলনা করিয়ে।
কি নাম কোথায় ধাম বল প্রকাশিয়ে॥

কামিনীর উক্তি।

ভাবে বোধ হয় তুমি হবে মহাজন।
ব্যবহারে কিছু তব না হয় তেমন॥
পরিচয় লবে যদি নিতান্ত আমার।
আগেতে উচিত হয় জানিতে তোমার॥
সত্য করে বল দেখি করিয়া প্রকাশ।
কি নাম ধরেছ তুমি কোথায় নিবাস॥

পুরুষের উক্তি।

দেবগণ মধ্যে হয় আমার বসতি।
ধর্ম্ম নামে খ্যাত আমি শুন রসবতি॥
সমাদরে যারা করে আমার সাধন।
তাদের শরীরে করি সতত ভ্রমণ॥
মর্ত্যলোকে সেই হেতু আমার বসতি।
আপন বৃত্তান্ত শুনি কহ লো সম্প্রতি॥

কামিনীর উক্তি।

প্রবৃত্তির কন্যা আমি দয়া নামে খ্যাত।
শ্রদ্ধা নামে ভগ্নী মম জগতে বিদিত॥
মর্ত্যলোকে মহাত্মাগণের অন্তরেতে।
নিবাস আমার তাই ভ্রমি হেনমতে॥
সুরগণ শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম মহামতি।
এরূপ ব্যভার কেন অবলার প্রতি॥
তোমার উচিত কভু না হয় এমন।
ছাড় ছাড় পথ করি স্বস্থানে গমন॥

পুরুষের উক্তি।

বল দেখি বিধুমুখি সে কেমন কথা।
আমারে ছাড়িয়ে তুমি যাবে বল কোথা॥
নিশ্চয় তোমায় হেরি হয়েছি মোহিত।
অনঙ্গ আমার অঙ্গ করিছে পীড়িত॥
দয়া নাম ধরে তুমি নির্দ্দয় হৈওনা।
দয়া হলে দয়া হীনে কি হবে বলনা॥
অতএব আমারে করহ পরিণয়।
নাহি কর যদি হবে জীবন সংশয়॥

কামিনীর উক্তি।

শুন শুন মহামতি আমার বচন।
বিবাহ করিতে মম নাহিক মনন॥
পুরুষের সঙ্গে দেখ মিলন হইলে।
সতত দহিতে হয় বিচ্ছেদ অনলে॥
তবে মাত্র আছে এক দৃঢ়তর পণ।
যদি কেহ পারে ইহা করিতে পালন॥
আমা ছাড়া তিলেক না হবে কদাচন।
তা হলে তাহারে পারি করিতে বরণ॥

পুরুষের উক্তি।

দয়া ছাড়া ধর্ম্ম বল আছে কোন খানে।
যেখানেতে দয়া দেখ ধর্ম্ম সেইখানে॥
অতএব কেন কর এমন ভাবনা।
দয়া ছাড়া ধর্ম্ম প্রিয় কখন হবে না॥
দয়া হীনে ধর্ম্মের নাহিক হয় গতি।
দয়া ধর্ম্ম দুয়ে হয় একাধারে স্থিতি॥

কামিনীর উক্তি।

শপথ করিতে যদি পার মহাশয়।
তবে সে আমার হৃদে হইবে প্রত্যয়॥
যেখানেতে রব আমি সেইখানে রবে।
তিলেক তিলার্দ্ধ নাহি ছাড়াছাড়ি হবে॥
তুমি ধর্ম্মরাজ হও সত্যের আশ্রয়।
জিজ্ঞাসা করিলে পরে ঘুচিবে সংশয়॥

পুরুষের উক্তি

শুন শুন শুন ওলো ও বিধুবদনি।
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী আর দিবস রজনী॥
আমি ধর্ম্ম আর করে নির্ভর আমাতে।
তোমা ছাড়া কখন না হব কোনমতে॥
অতএব বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
আলিঙ্গন দিয়ে প্রিয়ে যুড়াও জীবন॥

পরার

দুই জনে সত্য বদ্ধ করি হেন মতে।
পারিজাত হার ছিল দোঁহার সম্মুখে॥
আপন আপন করে লইয়ে আপন।
উভয়ে উভয় গলে করিল অর্পণ॥
হেন কালে আচম্বিতে নিদ্রা ভঙ্গ হলো।
কিছু নাহি জানিলাম পরে কি ঘটিল॥"

জীবনচরিত-রচনায় ঔদাসীন্য

সম্বাদ ভাস্কর, ২৭ মে ১৮৫১। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮)

বিলাতী ভাষায় লিখিত অদেশীয় লোকেদের জীবন বৃত্তান্ত যাহা বঙ্গভাষায় সংগৃহীত হইতেছে আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা ঐ সকল সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন দয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন, কেহ বাহুবলে রাজা হইয়াছিলেন, কেহ বিদ্যাদ্বারা স্বদেশস্থ সমুদায় মনুষ্যকে সদুপদেশ দিয়াছেন, কেহ বা পুণ্যবলে তাবৎকে পুণ্যাত্মা করিয়াছেন, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য এই সুফলকালেও আমারদিগের দেশস্থ মান্য লোকদিগের জীবন বৃত্তান্ত দেখাইয়া উত্তর প্রদান করিতে পারিলাম না, ব্রহ্মদেশ, জাবা, কাছাড়, মণিপুর, নেপাল, চীনাদি প্রদেশীয় রাজারাজাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি দেশীয় ভাষায় লিখিত আছে, এক খানী চিরকুটও নাই, কেও অদ্য ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচার কালে আমরা নবদ্বীপের মহারাজগোষ্ঠীর জীবনবৃত্তান্ত চাহিয়াছিলাম, রাজবাটী হইতে প্রত্যুত্তর আসিল আমরা যাহা জানি তাহাই লিখিয়া উত্তর দিব তাহাতেই অনুভব হইল রাজপরিবারেরা আমারদিগের

অপেক্ষা তাঁহারদিগের বংশাবলীর বিষয় অধিকানুসন্ধান করেন নাই, সুতরাং আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় মাত্রই লিখিতে হইল আমরা তাহাতেই কেও অক ইণ্ডীয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচারে জয়ী হইয়াছি, নাটোর পুঁটিয়া রাজবংশদিগের পূর্ব্ব পুরুষীয় কাণ্ড এই প্রকার গোল-যোগে রহিয়াছে, কলিকাতা নগরীয় রাজগণ ও ধনিগণ কেহ পূর্ব্ব পুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন নাই, কেবল শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষীয় কার্য্য চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, দ্বারকানাথ বাবুর বৈষয়িক বিষয় আমরা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই শেষ আর কেহ বিস্তারিত বিবরণ লেখেন নাই, কিন্তু প্রকৃত রূপে তাহা লিখিলে এক বৃহৎ পুস্তক হয় এবং সাধারণ লোকেরাও তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, গোপী-মোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, মোহিনীমোহন ঠাকুর, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা রাজবল্লভ রায় বাহাদুর, শান্তিরাম সিংহ, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামদুলাল দে, রামলোচন ঘোষ, নিমাইচরণ মল্লিক, গৌর-চরণ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর, অক্রূরচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান কালীনাথ মল্লিক, দেওয়ান রামসেবক মল্লিক ইত্যাদি মহামহিম ব্যক্তিগণ···ধনসঞ্চয়াদি প্রকাশের বিবিধ কর্ম্ম করিয়া পৃথিবী হইতে গিয়াছেন তাঁহার দিগের এক এক ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তে এক২ ইতিহাস পুস্তক হয় কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ সকল মহা-পুরুষগণের বংশাবলীর নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহারা এমত চতুরঙ্গুলীপরিমিত পত্রও দেখাইতে পারিবেন না তাহাতে কোন মহাজনের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

যেসকল মহামহিমেরা বর্ত্তমান আছেন, ইঁহারাও অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন ইঁহারদিগের জীবন বৃত্তান্তইবা কোথায় লিখিত হইল, আর এক শত বৎসর পরে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামানাথ ঠাকুর, গোপালদাস ঠাকুর, উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর,দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শিবনারায়ণ ঘোষ,রামনারায়ণ দত্ত, দুর্গাচরণ দত্ত দেবনারায়ণ দেব, আশুতোষ দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর, মতিলাল শীল, প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, ওকদাস দত্ত ইত্যাদি ধনিলোকেরা কিং সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন তবে এই সকল মহাশয়দিগের কর্ম্মের বিষয় কেহ বলিতে পারিবেন না, অথচ অনেকেই বলিয়া থাকেন,"মহাজনো যেন গতঃসপন্থা" এস্থলে মহাজন বাক্যার্থ-পূর্ব্বপুরুষগণ, তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন সেই পথই পথ, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষেরা কিং সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন কেহ তাহা বলিতে পারেন না, ভিন্নদেশীয় লোকেরা হিন্দু জাতির ভাষায় তাঁহারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন হিন্দু বালকেরা ঐ সকল লোকের জীবন বৃত্তান্ত দেখিয়া তাঁহারদিগের কার্য্যের অনুগমন করিবে,তাহাতেকেন, খ্রীষ্টীয়ান হইবেক না, অতএব আমরা পরামর্শ বলি ধনি হিন্দু মহাশয়েরা আপনারদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করুন, সেই টাকাতে পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত পুস্তক হউক, এবং আপনারদিগের জীবনের কার্য্যও লেখা হইতে থাকুক, এই সকল পুস্তক দেখিয়া উত্তর কালীন বংশাবলী সৈত্রিক পথে চলিবেন, এবং ধনি মহাশয়দিগের নাম কর্ম্ম লিখিত পুস্তক সকল পৃথিবীর ক্রোড়ে থাকিয়া সহস্র২ বৎসর পরেও তাঁহারদিগের পরিচয় দিবে, যাহার লক্ষ রাজত্বের মহীশ্বর "মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর" কত সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কিপ্রকার জ্ঞানমূঢ়া হয় কোন পুস্তকে তাহা লেখা নাই, কেবল মহারাজের মৃত্যুকালের একটা ভাষা গান যাহা তন্ত্রেতর সাধারণ লোক মুখে শুনিতে পাই এইস্থলে তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করি, ঐ মহারাজ গঙ্গাতীরে দেহ স্থাপন করিয়া গান স্বরে তাঁহার ভোলানাথ নামক ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন, "আমার মন বসিবে চলে, বালির শয্যায় কালীর নাম বলিও কর্ণমূলে" এই গান করিতে করিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়া-ছিল, অতএব অনিত্য ধনের ও দেহের অভিমান মিথ্যা, ধন দেহ সঙ্গে যায় না, জীবনে যিনি যাহা করেন তাহা লিখিবদ্ধ হইলে বহুকাল থাকে, এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা ইহা বিবেচনা করিবেন।

৺ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ প্রভাকর, ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৮

হালিসহর নিবাসি সনধন্য ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মহাশয় প্রাচীন কবিদিগের বিরচিত সংগীত সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের মাসিক প্রভাকরের সাহায্য করণে প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরা তাঁহার নিকট যে পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, আমরা যে অভিপ্রায়ে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা তিনি বিলক্ষণরূপেই জানিতেছেন, এদেশের অশিক্ষিত লোক সকল যখন অতি অপূর্ব্ব মনোহর ও লোভকর কবিতা সকল রচনা করিয়া সরস সংগীত শ্রোতের চিত্ত হরণ করিতেছেন তখন তাঁহারা সুশিক্ষিত হইলে তাঁহাদিগের কবিতা-শক্তি কত গুণে বৃদ্ধি হইত তাহার অনুমান করাও অসাধ্য, অতএব এই সময়ে ঐ কবিকুলের কবিতা সকল সংগ্রহ করা অতি আবশ্যক, কিন্তু আমরা এই প্রতিজ্ঞাকরত যেপর্য্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ও উপাসনা করিতেছি তাহার একমাত্র সাক্ষি সেই পরমেশ্বর আছেন, অধুনা শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে আমাদিগের সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার যেরূপ মহত্ব প্রকাশ হইল তাহা পাঠক বর্গই বিবেচনা করিবেন, অন্নদাপ্রসাদ বাবু 'রসের বস্তাগার' ও স্বয়ং অতি সুকবি এবং বিদ্যোৎসাহী,... প্রাচীন কবিদিগের কবিতা সকল সংগ্রহ করিয়া এই প্রকারে প্রকাশ পূর্ব্বক স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করা তাঁহার অতি কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়াছে,...

(ক্রমশঃ)

অতৃপ্তি

শ্রীইন্দিরা দেবী

তোমারে আমায়,
মনে পড়ে সেদিনের কথা ?
চোখে কি পুলকে ভরেছিল বুক—
অজানিত কোন্ মধিরতা।
মনে পড়ে সেদিনের শুভ্র নিশীথিনী
রূপ রস গন্ধ ভারে মদীনা ধরণী
আপনারে করেছিল দান,—
পাপিয়ার কলতানে, বাঁশীর ঝঙ্কারে
বেজেছিল মিলনের গান।
আজও আছে জোৎস্নাযামিনী, আজিও বাতাস
পরশিয়া ফিরিছে তেমনি ;
আজও আছি তুমি আমি,—শুধু নাকে নাই
সেদিনের সেই ধরণীনি।

সম্পাদিকার জল্পনা

ভগবানকে ডাকা কেন ?

পাঁচটা কথার প্রসঙ্গে একদিন হঠাৎ একটা প্রশ্ন উঠ্‌ল —"ভগবানকে ডাকা কেন ? অনর্থক সময় নষ্ট হয় ঢের ; দেশের কাজ এগোয় না তাতে একটুও। নূতন নূতন কারখানা স্থাপন, শিল্পশিক্ষালয় গঠন, ইস্কুল কলেজ গড়ে' তুলে' দেশে মানুষ তৈরি করে' তোলাই হ'চ্ছে আসল কাজ। যদি ভগবান থাকেন তবে তিনি তুষ্ট হবেন তাতেই।"

পাশের অন্য মানুষ বলে' উঠ্‌লেন—"তাই কি হয় হে! এতকাল ধরে' ভগবানকে মানুষ ডেকে এসেছে, সে কি খামোকা ? মানুষের মর্মগত অভ্যাস ভগবানকে ডাকা ; তোমার কথায় হঠাৎ সেটা মানুষ উঠিয়ে দেবে বুঝি ? আচ্ছা তোমার স্পর্দ্ধা দেখি !"

পূর্ব্বের লোক : "এতকাল ত ভগবানকে ডাক্‌লে, ফলটা পেলে কি ?—তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে,—দেশের যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা ! পৃথিবীর কাজে হেরে হেরে হয়রান হ'য়ে যাচ্ছ, মাথা তুলে' দাঁড়াতে পারছ কই ? ডাকাডাকি বন্ধ রেখে এখন কাজে লাগো দেখি, বাপু !"

তৃতীয় আর এক ব্যক্তির দিকে চেয়ে দ্বিতীয় মানুষ : "তুমি বাপু জ্ঞানীও বটে সাধকও বটে, বল ত হে ব্যাপারটা আসলে কি ? তোমার কাছ থেকে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর চাই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে তৃতীয় ব্যক্তি বল্‌লেন,—"নিজের শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্টতম প্রকৃতিটি ফুটিয়ে তোলার জন্যই ভগবানকে ডাকা, ভগবানকে বাড়িয়ে তোলার জন্য নয়। ডাকা না ডাকায় যিনি বাড়েন কমেন না তিনিই যে ভগবান একথা সকলেই জানেন। কিন্তু তেমন কোন কিছু না থাক্‌লে মানুষের শেষ বিশ্রাম বা শান্তির কোন পথ থাকে না—মানুষের কাছে নিজের অন্তরতম সত্তা বা আত্মার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় রূপটিও প্রত্যক্ষ হয় না। কাজেই এই প্রয়োজনটি সাধনের জন্য মানুষকে 'ভগবান', 'ভগবান' বলে' নিজের অন্তরতম সত্তাকে ডাক দিয়ে জাগিয়ে তুল্‌তে হয় নিজের অনুভূতির মধ্যে। জল, মাটি ও সূর্য্য-কিরণ থাকা সত্ত্বেও যেমন লাঙলের ফলা দিয়ে মাটি উপ্‌ড়িয়ে দিতে হয় ভালো করে' ফসল ফলাবার জন্য, তেমনি 'ভগবান' এই নামটুকুর সাহায্যে নিজের অন্তর-প্রকৃতির শক্ত আবরণটুকু উখ্‌ড়িয়ে দিতে হয় অন্তরতম সৌন্দর্য্যলোকে প্রাণটি অঙ্কুরিত করে' তোলার জন্য।"

প্রথম ব্যক্তি বলে' উঠ্‌লেন—"তবে' বল সৌন্দর্য্যলোক, খুঁজে' ফেরো আত্মার প্রেরণা দিনরাত, দেশের তাতে হবে কি ? দেশের মানুষগুলো কি দুর্গতি ভোগ কর্‌ছে, চোখে দেখ্‌ছ ত ? তাদের বাঁচাবে কি করে' ? দেশের উন্নতির পথ কোন্ দিক দিয়ে ? ডাকো ভগবানকে,—বাঁচুক তারা ! দেখি দেশ বড় হ'য়ে মাথা তুলে উঁচুক পৃথিবীর সামনে। আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন দেশের অনেক মানুষ, দেশটা তবু উদ্ধার হ'ল না কেন আজও ? পাঁকে পড়ে' মুখ থুব্‌ড়িয়ে পচ্‌ছে হাজার মানুষ ;—সুন্দর ও সুস্থ করে' তোল দেখি তাদের ? দেখি তোমার আত্মার সাধনবল। অন্তর স্বাধীন হ'লে বাইরের স্বাধীনতা পেতে বাকী থাকে কি আর এক মুহূর্ত্ত ? পৃথিবীর কাজ করা চাই সবাই মিলে',—তবেই উদ্ধার !—মনে মনে কোন কিছুকে ডাকাডাকির কর্ম্ম নয়।"

তৃতীয় ব্যক্তি শান্তভাবে বল্‌লেন—"পৃথিবীর কাজটা পাঁচজনে মিলে' কর্‌লে তবেই ত পৃথিবীর উন্নতি এগিয়ে চল্‌বে— একলা ত তুমি পারবে না, পাঁচজনকে ত চাই ? ভগবানকেও তেমনি পাঁচজনে মিলে' একযোগে ডেকে দেখ দেখি কি ফল হয়। পৃথিবী শুদ্ধ লোক মিলে' পৃথিবীর উন্নতির চেষ্টায় লাগ্‌লে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবী হাজার বছরের উন্নতির পথে এগিয়ে পড়্‌বে। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ যদি একযোগে এক মুহূর্ত্ত ভগবানকে এক জেনে ডাক্‌তে পারে, পৃথিবীর অন্তরতম সৌন্দর্য্যলোকের দ্বার এক মুহূর্ত্তে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যাবে সবার সামনে বাইরেও, এবং মানুষের

প্রতি কাজে পৃথিবী সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে গ্লানিমুক্ত হ'য়ে।"

প্রথম লোক : "খটা শক্ত।"

তৃতীয় ব্যক্তি : "অসম্ভব নয়।"

উপার্জ্জনক্ষেত্রে নারীর ভিড়

দলে দলে মেয়েরা এখন উপার্জ্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়্‌ছেন। এতদিন এ দেশে অসহায়া বিধবা ও স্বামি-পরিত্যক্তাদেরই উমেদারী দেখা যেত; এখন চাকরী খাওয়া ও মাইনে কমা বাবুদের স্ত্রীরাও কিছু না কিছু উপার্জ্জনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন।—এমন কি, মাসিক দশ টাকার জোগাড় হ'লেও তাঁরা অনেকখানি তৃপ্ত হন। কিন্তু উপার্জ্জন করেন কোথায়?—ক্ষেত্র কই? কাগজের ঠোঙা বানানো, বিড়ি পাকানো, দোকানওয়ালাদের জন্য সুপুরি কেটে দেওয়া প্রভৃতি ছোটদরের কাজ নিতে সঙ্কোচ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ঐ সকল কাজ গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হন। তবে একান্ত ভাবে চান যদি কোন উচুদরের শিল্প সাহায্যে কিছু সংগ্রহ কর্‌তে পারেন। তাতে মান থাকে আত্মীয়-কুটুম্বের কাছে। মানের দায়ে ঐ সকল কাজ তাঁরা লুকিয়ে করে' থাকেন। আমাদের কাছে চিঠি আসা ও লোক আনাগোনার অন্ত নেই। শিল্প সাহায্যে উপার্জ্জন ছাড়া শিক্ষাকার্য্যে উপার্জ্জন করার মনও নেই তাঁদের, সামর্থ্যও নেই। দেশের এই অবস্থার দিকে দেশবাসী নরনারী দৃষ্টিপাত করুন। সমিতি-ক্ষেত্রেই তাঁরা একত্র হ'য়ে একটুখানি পথ পেতে পারেন শিল্পচর্চ্চায়, কিন্তু স্থানীয় লোকের অর্থসাহায্যের অভাবে সমিতি চালানই দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। গৃহস্থ লোক কি অভাবে পড়েছে বলার নয়। প্রত্যেক ছোট ছোট পাড়ার ধনী ও শিক্ষিতা মহিলারা এক একজন মাথা হ'য়ে দাঁড়িয়ে এই গৃহস্থ পরিবারের পরিশ্রমী মেয়েদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন। বাইরে অনেক চাঁদা দিতে হয়, তা না দিয়েও যদি তাঁরা নিজ নিজ পাড়াকে কেন্দ্র করে' কতকগুলি মেয়ের উপার্জ্জনের সহায়তা কর্‌তে পারেন, তাতে ধর্ম্ম, পুণ্য ও কর্ত্তব্য তিনই একযোগে সাধন করা হবে। অনেকে কর্‌ছেন,—আরও অনেকের এ কাজে নাম্‌তে হবে। ধনী ও শিক্ষিতারা এই সকল ভদ্র দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হ'লে ও তাঁদের সহায়তা কর্‌তে পার্‌লে নিজেরা অনেকখানি সুখী হ'তে পার্‌বেন বলে' আমাদের বিশ্বাস এবং হৃদয় দিয়ে তাঁরাও তাঁদের প্রতিদান দেখেন অনেকখানি।

মাতৃপূজা

বাংলার সুসন্তান শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন অল্প কয়েকদিনের জন্য। উঠেছিলেন আমাদের বিধবাশ্রমের ঠিক পাশের একটি বাড়ীতে। তাঁর মেয়েরা যাতায়াত কর্‌তেন আশ্রমের মধ্যে প্রায়ই। ব্যবহার খুব সুন্দর ভদ্র, অমায়িক এবং সৌজন্যময়।

সমুদ্রপথে যেতে একদিন রাস্তায় উক্ত বসু মহাশয়ের সঙ্গে দে।। ক্ষণকালের জন্য আমার সঙ্গে পরিচিত হ'য়েই বল্‌লেন, "আমার মায়ের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা আজও কর্‌তে পারিনি একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, সুযোগ হয়নি। বড় কষ্টেই মা আমাদের মানুষ করেছিলেন। মায়ের নামে মাতৃপূজার একটি আয়োজন না করে' যাই কি করে'? বাবার জন্য একটা কিছু করেছি এক জায়গায়; মায়ের স্মরণে কিছু করা হয়নি। মনে হয়েছে, এইখানে এই বিধবাশ্রমের সঙ্গে যোগে কিছু কর্‌ব—মনের সঙ্গে মিল খেয়েছে এই জায়গাটির। সমুদ্রতীরের মাহাত্ম্যও আছে স্থানটিতে একটু।"

যে কথা সেই কাজ! পরদিন সকালে ইঞ্জিনিয়ার ডেকে হিসাবপত্র হ'য়ে গেল একদণ্ডে। বেলা তিনটার সময় এক হাজার টাকার চেক আমার হাতে এসে পৌঁছল—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর মাতৃদেবীর স্মরণার্থে আশ্রম ও বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি নূতন পাঠাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে। দ্বিধা নাই,—প্রশ্ন নাই,—সন্তানের শ্রেষ্ঠ ভক্তির সহজ দান মাতৃপূজায় নিয়োজিত হ'ল।

পাঠাগার নির্ম্মাণ সুরু হয়েছে যথাসময়ে।

স্বর্ণকুমারী স্মৃতি-সভা

গত ৩১শে জুলাই রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গৃহে সন্ধ্যা ৬॥০টার সময় পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিরক্ষার

জন্য একটি সভা আহূত হয়। বাংলার নারী-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর স্থান বঙ্কিমচন্দ্রের সমশ্রেণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন সাহিত্যসৃষ্টি ও বঙ্গদর্শন মাসিকের নূতন ধারা যেমন নবযুগে বাঙালীকে নূতন পথ দেখিয়েছে ও ধরিয়েছে, স্বর্ণকুমারীর নূতন নূতন উপন্যাস ও মাসিক ভারতীর নবকলেবর ও নূতন ধারা বাংলার নরনারী উভয় দলকেই তেমনি আনন্দ দিয়েছে কম নয় সেই যুগে। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেদিন সকলেই সে কথা স্মরণ করে' তাঁর আত্মার তর্পণ করেছিলেন সুন্দরভাবে।

"সখী-সমিতি" ও "মহিলা শিল্পমেলা" প্রবর্তিত করে' তিনি নব্যবঙ্গের মহিলাদের রুচি কোন শিল্পচর্চার দিকে ও "সখী-সমিতি"র সাহায্যে অভাবগ্রস্ত পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার ব্যয়বহনের ব্যবস্থা করে' সঙ্ঘবদ্ধভাবে নারীদের দ্বারাই যে নারীশিক্ষার উন্নতির চেষ্টা হওয়া উচিত তারও সূচনা করেন। উভয় বিষয়েই যে তিনি জাতির অগ্রবর্ত্তিনী সে কথাও সেখানে আলোচিত হয়েছিল সেদিন।

সাধারণের পক্ষ হ'তে এঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া জাতির পক্ষে গৌরবজনক।

দেশী ছাঁচে দেশের কাজ

বাংলার ইংরাজী-অনভিজ্ঞা ঘোরো মেয়েরা দুঃখ জানান, "ইংরাজী জানা বিদেশ-ঘোরা মেয়েরা যেমন ব্যাপক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেশের কাজ করতে সমর্থ হন, আমরা তা পারি না। বিদেশী ধরণের সঙ্গে আমরা অপরিচিতা—ভাষা না জানায় বোধগম্যও করতে পারি না বিদেশী ব্যাপারের সঙ্গে ভালো করে'। দেশী ছাঁচে দেশের কাজ করতে পারি যদি পথ দেখাতে পারেন।"

দেশী ছাঁচে দেশের কাজ করার দরকার আছে খুব বেশী, ও কথা ওঁদের জানাতে হবে। দেশী ছাঁচেই দেশের মানুষ গড়ে' উঠবে, বিদেশী ছাঁচে ঢালা দেশের ধাতে সইবে না পুরোপুরি,—সকলেই বুঝেছেন। অতএব দেশী মেয়েরা কেলা নন দেশের কাজের ক্ষেত্রে। অবশ্য পৃথিবীর সঙ্গে যোগে চলতে হ'লে নানা দেশের জ্ঞান ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়াও দরকার বটে,—কিন্তু ছাঁচ বদল হবে না একেবারে তা'ই বলে'। দেশের চিঁড়ে-মুড়ির আদর যাবে না কোন কালে বিদেশী বিস্কুট পেলেও। গরুর খাঁটি দুধটুকু প্রাণ বাঁচাবে চিরকাল—বিদেশী টিনের দুধ এসে তার জায়গা দখল করতে পারবে না কোনমতে। দেশের সোনামুগের দাল ও সরু চালের ভাতেই রোগী স্বাস্থ্য লাভ করবে সহজে স্বল্প-ব্যয়ে—বিদেশী হুলিক্স ও হুইস্কি ঢের বেশী দামী হলেও তার সমান গুণ ধরে না। দেশের টিনে পোরা ব্যবসায়ী পেটেন্ট খাদ্যের অভাব ঘুচবে না দেশের বাদুলের। দেশের খাঁটি জিনিষগুলি বাঁচাতে পারা ও সেগুলিকে উপাদেয় করে' তোলার ভার দেশের মেয়েদের হাতে। এটি বড় কম কাজ নয় দেশের মেয়েদের পক্ষে। ব্যাপক ক্ষেত্রের দিকে না তাকিয়ে পরিবার ও পাড়াটির প্রতি দৃষ্টি ফেলুন দেশের মেয়েরা। নিজ নিজ পরিবার ও পাড়াকে স্বাবলম্বী করে' তুলুন বহু-ব্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে'। সহায় রক্ষা করে' মিলতে শিখুন পরস্পরের মধ্যে ও এই ভাবে দেশের মেয়েরা স্বরাজ আনুন স্বঘরে। ঐ সকল সাধ্বী মেয়েদের নাম কাগজে কাগজে ধ্বনিত না হ'লেও "বঙ্গলক্ষ্মী" তাঁদের নাম লিখে রাখবে চিরস্মরণীয় করে' নিজের বুকে।

হাওয়ার গুণে স্বাস্থ্যলাভ

সুপথ্য ও সুখাদ্যের গুণে মানুষ স্বাস্থ্যলাভ করে, সকলেই জানেন। কিন্তু খোলা হাওয়ার গুণে স্বাস্থ্যের কতদূর উন্নতি হয়, এ দেশের সাধারণ লোকের মনে সে সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা এখনো জন্মায়নি। এঁদের মধ্যে যাঁরা কতকটা বোঝেনও, অর্থাভাবে নিজেদের রুগ্ন শীর্ণ দুর্ব্বল সন্তানদের জন্য তার কোন ব্যবস্থা করতে তাঁরা প্রায়ই অক্ষম। এই সকল অভাবগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের বৎসরে দুইবার—গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটির সময়—স্বাস্থ্যকর জায়গায় খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে আনবার একটি সুন্দর আয়োজন করেছেন দেশের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ মিলে'। এর উপকারিতা আমাদের স্বচক্ষে দেখা—কানে শোনা কথা মাত্র নয়। জাতির হিতকারিণী ও হিতকারী এই সকল মহিলা ও মহোদয়গণকে জাতির তরফ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানের নেত্রীস্থানীয়া ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম অতীব প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানটির প্রতি সাধারণের সহানুভূতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বাণী-ভবনের ভিত্তিস্থাপন

বহু চেষ্টা ও প্রয়াসের পরে গত ১৩ই আশ্বিন, শনিবার "বিদ্যাসাগর বাণীভবন" আশ্রমের নিজস্ব বাটীর ভিত্তি স্থাপন কার্য্য সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। মাননীয়া শ্রীযুক্তা যাদুমতী মুখার্জ্জি এই মঙ্গল অনুষ্ঠানের নেত্রীত্ব করেছেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

সাধ্বী অবলা বসুর ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতাই এই শুভানুষ্ঠানের মূল। তাঁর প্রতি নারীজাতির তরফ থেকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

স্মারিকা

চন্দ্রমাধব

শ্রী হেমলতা দেবী

অমর থাকিবে তুমি হে চন্দ্রমাধব,
জননীর সুসন্তান স্বদেশবান্ধব!
কি গভীর স্নেহ তব স্বদেশের প্রতি,
কি আগ্রহ ছিল প্রাণে দেশের সদ্গতি
হোক্ সর্ব্বদিকে,—দেশ হোক্ পুণ্যময়,
পৃথিবীর প্রাণ সাথে প্রাণ বিনিময়
করুক্ সে সারাক্ষণ,—পৃথিবীর ডাকে
সাড়া দিক্ নরনারী যে যেখানে থাকে।
তোমার নিঃস্বার্থ প্রেম নীরবে উথলে
শ্রমিকের শ্রমে আর নারীর মঙ্গলে।
পেয়েছি অনেক, দিতে না হ'ল সময়,—
উত্তপ্ত বেদনা তাই বক্ষ জুড়ি' রয়।
অকালে ঝরিলে তবু করি' গেলে দান
অসমাপ্ত কার্য্যসাথে অতৃপ্ত প্রাণ!

স্বর্ণকুমারী

শ্রী মমতা মিত্র

রমণী যখন বন্দিনী ছিল আপনার গৃহ-কোণে
নিজের মাঝারে লুকায়ে সঙ্গোপনে।
খোঁজেনি কেহই তাহার প্রাণেও শক্তি রয়েছে কি না,
বোঝেনি কেহই বাণীর দেউলে বাজিবে সোনার বীণা।
তুমিই প্রথম বাহিরি' আসিলে আলোরে কিরণ-শিখা,
তাহা জননীর ললাটে আঁকিলে দিব্য অরুণ টিকা।
মায়ের পূজার মন্দিরে এলে প্রথম তুমিই নারী
ল'য়ে মঙ্গল-থালি।
সাজালে মায়ের কাব্যে নাটকে গাথায় মধুর গানে,
ভরিল আঙিনা অফুরান তব দানে।
কাব্য-কাননে কুণ্ঠাবিহীন সুন্দর তব গতি
দিনে দিনে হ'ল সুন্দরতর, বাড়িল তাহার জ্যোতি।
তোমারি দেখানো পথটি ধরিয়া আজি যে গো কত নারী
বাণীর চরণে পূজা-উপচার আনিতেছে সারি সারি।
অগ্রণী তুমি, অগ্রজা তুমি বঙ্গরমণী কুলে,
পূজিলে মায়েরে মনোহর নানা ফুলে।
যে আলো জ্বেলেছ সেই আলো আজ নব বেশে উঠে জ্বলে'
যাত্রিণী সবে পথখানি দেয় বলে'।
অমর হইয়া রহিবে গো তুমি বাঙলার ঘরে ঘরে,
স্মরিবে তোমায় বাঙলার মেয়ে যুগে যুগে সমাদরে।
দেহের অতীত হয়েছ আজিকে, তবুও তোমার দান
চিরকাল ধরে' হরষে বিষাদে আকুল করিবে প্রাণ।
মৃত্যুর মাঝে হারায়ে তোমারে পাইব নিবিড় করে'—
নূতন রূপেতে সকল হৃদয় ভরে'।

আমাদের ছেলেমেয়েরা বিপথগামী হয় কেন ?

শ্রীমতী রায়

"বিপথ-গামী" অর্থ কি ?

বেতারের এই "মজলিশ" অদৃশ্য মহিলাদিগের মিলন ক্ষেত্র এবং তাঁহাদেরই নিজস্ব জিনিষ। মধ্যে মধ্যে এখানে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক কথার আলোচনা হওয়া খুব উচিত। এই ভেবে, আজ আমাদের একটা সামাজিক বিপ্লবের কথা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা কোর্ত্তে এলাম। আশা করি, আপনারা নিজ নিজ মত ব্যক্ত কোর্ত্তে কুণ্ঠিত হবেন না। এবং আপনাদের সকলের কাছে আমার করজোড়ে এই নিবেদন, যে, আমার এই বলার মধ্যে যা ভুল-ভ্রান্তি হবে, আপনারা সকলে নিজগুণে ক্ষমা কোরবেন ও সেই সব আমাকে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেবেন।

অনেকেই বলেন,—"আজ-কালকার ছেলে-মেয়েরা বিপথগামী হচ্ছেন।" এই কথাটা সত্য কিনা, এবং যদি সত্য হয়, তো তার কারণ কি, এইটুকুই আমি আজ বলবার চেষ্টা কোরবো। কতদূর কৃতকার্য্য হবো, তা ভগবানই জানেন।

"বি-পথ" বুঝতে গেলে, আগে "সু-পথ" বা "ন্যায়-পথটা" কি, সেটা আমাদের জানা চাই। আমরা হিন্দু; একই সঙ্গে "শাস্ত্র"ও মানি, এবং "অদৃষ্ট"ও মানি। কাযেই, আমাদের ছেলে-মেয়েদেরও শাস্ত্র মানা ও শাস্ত্রে অচলা ভক্তি থাকা, অতীব-প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু, তাই কি আজ তা'দের আছে? না! কেন নেই? কারণ, একে তো সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ক্রমশঃই দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে; তার উপর, সন্ধ্যাবন্দনাদি "নিত্য" সদনুষ্ঠানগুলির প্রতি শিক্ষিতদের অহেতুক অশ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে। কাযেই, মাত্র দু-চারটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় "নৈমিত্তিক" অনুষ্ঠানই আমাদের বালক-বালিকারা দেখে,—যেমন, বিবাহ, পৈতা, অন্নপ্রাশন, ইত্যাদি। "অনুষ্ঠান বা "আচার"-গুলি, প্রাণহীন বস্তু; অথচ, যেখানে প্রাণ আছে, রসও আছে, সে সকল সম্বন্ধে জ্ঞান, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত না হইলে, লাভ করার উপায় নেই বলেই, ছেলেমেয়েরা মনে করে যে, হিন্দু-ধর্ম্মের খোলসটাই বুঝি সব,—কাযেই ফুটা! এই ভাবে, তাদের শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা এসেছে। তাহার উপরে, বৈদেশীয় প্রোপাগ্যাণ্ডা এই ধারণার কম ইন্ধন যোগায় নাই।

তার পরে,—গুরুজনে ভক্তি। জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে, বয়সে বড় হ'লেই, এ দেশে তাঁ'কে "গুরুজন" ব'লে মানা হ'ত। যাঁ'র কাছে এতটুকু সেবা যে'ত, বা যাঁহার দ্বারা এতটুকু উপকার পাওয়া যে'ত, তাঁকে চিরকালই শ্রদ্ধা করা হোতো। তাই, এ দেশে, ধাইকে মাতা ব'লে; ও শিক্ষা-গুরু, দীক্ষা-গুরু ও জন্মদাতা গুরু সকলকেই, সমানে গুরু ব'লে মানার প্রথা ছিল। তুমি জজই হও আর ম্যাজিষ্ট্রেটই হও, তোমার বালক-কালের পাঠশালার গুরুমহাশয়ও চিরকালই তোমার শ্রদ্ধার পাত্র। আগে, শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ বড় মধুর বড় পবিত্র ছিল। কিন্তু, এখন?—এখনকার বেতনভোগী শিক্ষক, অশ্রদ্ধার পাত্র, কেন না, প্রথমতঃ তিনি বেতনভোগী, এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই জন্যই, ছাত্রের ইষ্ট অপেক্ষা, তাঁহার বেতনই তাঁহার পরম ইষ্ট!

আবার, এদিকে, ঘরে,—পিতামাতা নিজ-নিজ কায লইয়াই থাকেন; ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের বেতন যোগান; শিশুর খোঁজ-খবর বড় একটা রাখেন না; কাযেই, ধীরে ধীরে কতকটা ব্যবধান (কঠিনতা, ও অনাত্মীয়তা) উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে; তাহার ফলে, পিতা-মাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করা দূরে থাকুক, ছেলেমেয়েরা পিতামাতার অবাধ্যও হয়।

তৃতীয় কথা—পরিজন নিয়ে।—স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব লইয়াই চিরকাল হিন্দুর সংসার। এখন, সে সব তো দূরের

কথা, নিজের ভাই-বোনের মধ্যেও সম্প্রীতি, সব-বাড়ীতে দেখা যায় না—যে যা'র লইয়াই, কোটরে রাজত্ব করেন।

চতুর্থ কথা—স্বদেশীয়গণের প্রতি অনুরাগ।—এখন ছেলে-মেয়েদের চিত্রবী "দেশ"-মাতৃকার প্রতি অনুরাগ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, এই দেশের সকল শ্রেণীর মৃন্ময়ী "মানুষকে" মনুষ্যত্বের দাবী দিতে তাঁরা এখনো অস্বীকার কর্চ্ছেন কেন?

অভিভাবকদের দোষ কতটা?

তা'র ছাড়া,—ঘরে ঘরে অসংযমের শ্রীক্ষেত্র—অর্থাৎ, স্বেচ্ছা মত বেশ ভূষা, যথেচ্ছা আহার, বিলাস, ব্যসন প্রভৃতির কথা, শোনা ও দেখা যায়—বিশেষ করিয়া তথাকথিত শিক্ষিতদের সংসারে।

এই যে ছেলে-মেয়েদের ধর্ম্মশাস্ত্র, গুরুজন, পরিজন ও স্বদেশবাসী সম্পর্কিত অন্যায়-আচরণের কথা উল্লেখ করিলাম; এ'র অপর দিকে—অর্থাৎ, আমাদের অভিভাবকদের দিকে—একবার দেখা প্রয়োজন। বিচার করিতে হইবে,—আমাদের বালক-বালিকাদেরই বা কত দোষ, এবং অভিভাবকদেরই বা তাহাতে কত? এই সঙ্গে, আমরা কি ছিলাম, ও কি হইয়াছি,—তাহারও আলোচনা করিতে হইবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, এই বাঙ্গালাদেশে, রাজা-উজীর যতই বদল হউক না কেন, এদেশের পল্লীজীবন-ধারা অটুট থাকিত। সেই পূজা-পার্ব্বণ, সেই চণ্ডীমণ্ডপে সভা, সেই পাঠশালা-টোল, সেই যাত্রা-কথকতা-পালা-কীর্ত্তন-পাঁচালী, সেই অতিথি-সৎকার-সদাব্রত, সেই গো-সেবা ও সাধুসেবা—সকলই সমানে চলিত। দলাদলি থাকিলেও, তখন পরস্পর পরস্পরের অনুগত ছিলেন। তখনকার বাঙ্গালায় আনন্দ ছিল, প্রাণও ছিল, প্রীতির বন্ধনও ছিল। এখন সে বন্ধন ত' নাই—বরং আইন-আদালতের কল্যাণে, অর্থের অহঙ্কারে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতেছেন! এখনকার বাঙ্গালায় সকলেরই যেন মূলমন্ত্র দাঁড়াইয়াছে,—যে-যা'র, সে শুধু আপনারই!

তখন কিসের জোরে বাঙ্গালাদেশে এত ছিল, আর এখন কিসের অভাবে, তাহা নাই? ইহার উত্তর—প্রধান দুইটি কারণ তখন ছিল, একান্নবর্ত্তীতা ও পঞ্চায়তী প্রথা। এখন তাহার স্থানে ঢুকিয়াছে, নগদ টাকার গরম, ও আইন-আদালতের নেশা। কাযেই, একান্নবর্ত্তীতা ও পঞ্চায়ত, এই দুইটি বহুকালের বাঁধন শিথিল হইয়াছে। তখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবার বা "জয়েণ্ট ফ্যামিলি," এক একটি গণ-তন্ত্র (democracy) বিশেষ ছিল। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে, প্রত্যেকেই নিজ-নিজ সামর্থ্য অনুসারে অর্থ ও সামর্থ্য দিতেন; এবং নিজ নিজ আবশ্যকমত দ্রব্যাদি পাইতেন (*from* each man according to his *ability*, *to* each man according to his *need*); সমর্থ অসমর্থ, সকলেই, হাসিমুখে সমগ্র পরিবারের সুখ-স্বচ্ছন্দ সমানে ভোগ করিতেন। এবং এখন দেখা যায় যে, যথেষ্ট রোজগার না করিতে পাইলে, ছেলেরা বিবাহ করিতে চায় না—মানব জীবনের পরম ও চরম আকাঙ্ক্ষা—দাম্পত্য- সুখ—ভোগ করা অল্পবিত্ত যুবকদের পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তখন কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারে সকলেরই ভাগ্যে এই অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ ঘটা (অর্থাৎ, দাম্পত্য-জীবন) সম্ভবপর ছিল। শুধু তাহাই নহে; সাংসারিক শিক্ষার দিক দিয়া দেখিলে, প্রত্যেক একান্নবর্ত্তী পরিবারকে এক একটি ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা চলিত। সেই পরিবারে, কাহারো কোনরূপ সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভে বঞ্চিত হইবার কথা ছিল না—সকলেই, সাংসারিক সকল বিষয়ে, সমানে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন। এবং, কি রোগী-পরিচর্য্যা, কি অক্ষম-প্রতিপালন—সকল কিছুরই সুব্যবস্থা এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে সুন্দর ভাবেই বর্ত্তমান ছিল।

তার পর, গ্রাম্য পঞ্চায়তের কথা।—সকল মানুষই চায়, নিজ সমাজের কল্যাণ এবং স্ব-স্ব সমাজের মর্য্যাদা রক্ষণ। এবং আপনার স্বপক্ষ দ্বারাই মানুষ বিচার প্রার্থনা করে;—এ প্রথা ইংরাজদের "জুরী" দ্বারা বিচারের মধ্যেও বর্ত্তমান আছে। এ দেশের গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ, হয় ত, 'ইণ্ডিয়ান্ পিনাল্-কোড্' মত চুলচিরে বিচার কর্ত্তে পারতেন না—বড় জ' বা তাঁহারা অত্যাচার এবং অন্যায় বিচারও মধ্যে মধ্যে করিতেন;—কিন্তু তাহাতে কাহাকেও ডিটামাট্ট হিকির করিতে হইত না; কাহাকেও শমনলোক ঘুরে যাইয়া, তার-

বিচার 'শিক্ষা' করিতে হইত না; এবং গ্রামের মধ্যেই পঞ্চায়ত থাকার জন্য, গ্রামের লোকদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় বা উভয়ই থাকিত। এখন, তাহার বায়গায়, আইন-আদালত বসায়, গ্রামের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় ঘুচিয়াছে;—কাযেই, অনাচার ও অত্যাচারের পথ অবাধ হইয়াছে। তাহার উপরে, আদালতে ভ্রম ও ব্যয়-বাহুল্য ভয় থাকায়, এখন দুষ্টলোকদের মধ্যে সহজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বৈরাচার যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইতেছে। আজ, তাই, কেহ কাহাকেও মানে না; এবং চক্ষের সম্মুখে দেখে,—অনাচারের বিরুদ্ধে দীন ভীরু সমাজ নীরব। বস্তুতঃ, পঞ্চায়তী ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই, সমাজের মেরুদণ্ডও ভাঙিয়া গিয়াছে।

তাহা হইলেই, আমরা দেখিতেছি যে, আগেকার বহুকালের একান্নবর্ত্তী পরিবারেও পঞ্চায়ৎ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য গজাইয়াছে, যাহাকে সোজা বাঙ্গালায় বলে "কেহ কাহারো চাকর নয়," এই ভাব। ব্যক্তি-বিশেষের উপর বিশ্লেষাটক স্বরূপ, তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে,—নগদ টাকার অহঙ্কার! টাকায় কি না করা যায়? টাকার জোরে কি না ঢাকা যায়? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এতদিন জীবিত থাকিলে, বোধ হয় ত তাঁহার "সুবর্ণ-গোলক" নিবন্ধের উপরে, অনেক কিছু পালিশ ও রং চড়াইতে পারিতেন! এখন যাহার হাতে নগদ টাকা, সারা জগতের লোকের সেবা (service) তাঁহারই করায়ত্ত!

এই নগদ টাকা আমাদের মধ্যে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছে। একটু খুঁটিয়া খাইতে শিখিলেই,—অর্থাৎ, কিছু উপার্জ্জন করিতে শিখিলেই,—তা' সে যত সামান্যই হউক না কেন,—এখন স্ত্রী পুত্র লইয়া, আলাদা ভোগ করিবার বাসনা তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যেই প্রবল হয়; ষোল আনা রকম নিজের টাকা নিজে ভোগ করিবার আশায়, একান্নবর্ত্তী পরিবার হইতে তাঁহারা আলাদা হন। যেখানেই এরূপ ভিন্ন হইয়া সংসার পাতান হয়, সেখানে ভাগ সে রকম স্বার্থপর সংসারে, অলক্ষ্যে ছেলে-মেয়েরাও ঘোর স্বার্থপর ও ভোগবিলাসী হইতে থাকে। তাহাদের শিরায় শিরায় ভোগ-লোলুপতা ও স্বার্থপরতার স্রোতঃ বহে। ভোগ ও স্বার্থপরতা, মানুষকে সকল বিষয়ে অসংযত করে। কাযেই, এমন পৃথক সংসারে —আপনি ও কৌপ্রীর সংসারে —নিজ পিতা-মাতা ছাড়া, যে ছেলে-মেয়েরা "মানুষ" হয়, তাহারা অপর আত্মীয়কে চিনেও না, এবং চিনিতে চাহেও না,—পাছে, আত্মীয়তা স্বীকার করিলে, তাহাদের এতটুকুও ভাগ দিতে হয়! এই স্বার্থপরতা ও ভোগস্পৃহা, কালে, সেই সংসারে পালিত বালক-বালিকাদের অস্থি মজ্জায় এমন ভাবে বসিয়া যায় যে, প্রয়োজন স্থলে, সে নিজ পিতা-মাতারও অসম্মান করিতে বা তাঁহাদের অবাধ্য হইতে আদপে কুণ্ঠিত হয় না! ফলে, অসংযমের বাঁধ ভাঙিয়া, যে কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

যেখানে এখনো নামেমাত্র ও সুবিধাবাদের একান্নবর্ত্তীতা বজায় আছে—অর্থাৎ, দু-দশ টাকা খরচ বাঁচাইবার জন্য, সুবিধার খাতিরে, যেখানে পাঁচ-ভাই এক বাড়ীতে থাকেন,—সেখানে, মনের মিল যেমন দেখা যায় না। যে যা'র খরচ দিয়া, "মেসের" বাড়ীতে থাকার মতই, সে সব তথাকথিত একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকা হয়। বরং, মেসের বাসায়, অর্থগত পরস্পর সম্বন্ধ না থাকার জন্য, কাহারো সঙ্গে অপর কাহারো প্রতি শ্রদ্ধার বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে না; মেসের বাসার ধরণের,এই সব তথাকথিত অধিকাংশ একান্নবর্ত্তী পরিবারে, কেহ কাহারো আত্মীয় ত নয়ই, বরং তথায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। কাযেই, একই বাড়ীর ছেলে-মেয়ে হইলেও, পরস্পর অনাত্মীয় থাকিয়া যায়,—গুরুজনে শ্রদ্ধা, আত্মীয়ের প্রতি প্রীতি জন্মে না—কাযেই, তাঁহাদের সম্মুখে উচ্ছৃঙ্খলতা করিতেও বালক-বালিকাদের বাধেও না!

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালীর দোষ

এতক্ষণ,—আমাদের যাহা ছিল, তাহা ধ্বংসের ফল কি, তাহাই আলোচনা করিলাম। এইবারে, বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবের কথা আলোচনা করা যাউক। "বর্ত্তমান সভ্যতা" বলিলে, ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতাকেই বুঝায়; এবং পাশ্চাত্যশিক্ষার ভিতর দিয়াই, আমরা তাহার পরিচয় ও আস্বাদ পাই। অনেক বিষয়ে, এই পাশ্চাত্যশিক্ষা, আমাদের অনেকেরই

ভুলপ্রান্তি দেখাইয়াছে, অনুসন্ধিৎসা ও বিচারবুদ্ধি বাড়াইয়াছে, এবং দৃষ্টির প্রসার ও দেশাত্মবোধ আনিয়াছে। তজ্জন্য, আমরা অনেকটাই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার কয়েকটি কুফলও অত্যন্ত অনর্থ ঘটাইতেছে;—তাহার ফলে, আজ, আমাদের বালক বালিকারা বিপথগামী হইতেছে।

প্রথমতঃ, যে শিক্ষা, দেশের ও অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে, সে শিক্ষা, শ্রদ্ধার ও ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করে—অবিনয়ী, উদ্ধত করে। এখন দেখা যাউক, এদেশে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের মূল কোথায়? ইংরাজের নূতন অধিকৃত জমীদারী,—এই ভারতবর্ষে, অনেক রকম, ও অনেকগুলি, দক্ষ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হয়,—যেহেতু, এদেশীয়দের দ্বারা, অপেক্ষাকৃত সস্তায়, কার্য্য চালান সম্ভবপর হয়। প্রধানতঃ, ইংরাজের দপ্তরে কাজ করিবার মত, এবং ইংরাজের ব্যবসায়ে সহায়তা করিবার মত, লোক তৈয়ারি করিবার জন্যই, প্রথমে, এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ হয়। এখন, সে জাতীয় বহু সংখ্যক লোক সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং মেকলের স্বপ্ন ফলিয়া গিয়াছে—আমরা মনে ও প্রাণে পরদেশী হইয়া গিয়াছি;—কাযেই, দেশের লোকদের দরকার মত, এখন এই শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ অদল-বদল হইতেছে ও হয় ত হইবে। তাহার পরে, শিক্ষার পুরস্কার,—জ্ঞান লাভ ও মনের আনন্দ। শিক্ষার্থীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য, পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা ও বিদ্যাবিক্রয়,—এই দুইটি নূতন প্রথা, বিদ্যাদান করাকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের গণ্ডীতে আনিয়াছে। বিদ্যাদান-রূপ মহৎ কার্য্যের আদর্শকে এত খাটো করিয়া, আবার তাহার সঙ্গে, যদি, শৈশব হইতেই, আমাদের বালক-বালিকারা শোনে যে—বেশ হইল চাষার পান, ব্রাহ্মণরা নিজ হাতে ক্ষমতা পাইয়া, অপর সকল বর্ণের লোকদিগের মাথায় পা দিয়া চলিয়াছেন; পুরুষ চিরকালই নারীকে মথিত ও দলিত করিয়াছে; দেব-দেবীরা, প্রাণহীন নুড়ি ও মাটির ঢিপি; জাতি বর্ণ-বিভাগ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রথা; হিন্দুরা চিরকালই ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতেন, ব্যবসায় বাণিজ্য বুঝিতে পারিতেন না; এ দেশের কবিরাজিটা,হাতুড়েপনার নামান্তর মাত্র; সকল মানুষই মানুষ বৈ আর কিছু নয়, কাযেই দেব দ্বিজে ভক্তি করা ভুল;—ইত্যাদি ইত্যাদি,—তবে, কেমন করিয়া, তাহারা দেশের কোন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাবৃত্তি-সম্পন্ন হইতে পারে? এবং রামায়ণের আদর্শ চরিত্রগুলির কথা না শিখিয়া, রাবণের দশ মুণ্ডের ও বিশ হাতের কথা মাত্র শিখে, তবে কেমন করিয়া তাহারা ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে পারে? কাযেই দুপাতা ইংরাজী পড়িয়া,এ দেশের ছেলে-মেয়েরা—স্ব স্ব জাতি (caste) না হারাইলেও, (interests of the nation) নিজ জাতির স্বার্থ অতলতলে দেয়; তাহারা, নৈতিক অনুশীলন (বা, মরাল্ ডিসিপ্লিন্) হিসাবে, পূজাপাঠ করিতে লজ্জা বোধ করে; এবং কোনও গতিকে মেয়ে মহলে, পূজাপার্ব্বণ, ব্রতনিয়ম সাঙ্গ করা-টাকে, চোক গিলিয়া, চক্ষু বুজিয়া মনকে চোখ-ঠারা দিয়া, মানিয়া লয়। ধর্ম্মে আনাস্থা, কর্ম্মে,ভিতর-বাহির দুই রকম;—ইহাতে না ভগবানে ভক্তি জন্মায়, না দেশের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, না আত্মপ্রতিষ্ঠা জন্মে। এ শিক্ষায় মানুষ অমানুষ হয়।

বর্ত্তমান শিক্ষার দ্বিতীয় দোষ—এই শিক্ষা অর্থকরী,—সকল রকম পার্থিব সুখ ভোগ করিবার জন্যই যেন এই শিক্ষা। ভোগে, ভোগের ইচ্ছা, ভোগের আলা বাড়ায়—আরো ভোগের জন্য অধীর করিয়া তোলে! কাযেই, আরো ভোগের আয়োজনে, চিত্তবৃত্তিগুলি অত্যুগ্র হইয়া উঠে;—কাযেই, ভোগ মিটাইবার জন্য, অর্থের পিপাসা ক্রমাগতই বাড়ে। কাযেই, নিত্য নূতন-অভাব কল্পনা করিয়া, সেই কাল্পনিক অভাব মিটাইবার জন্য, মানুষ পাগল হইয়া বেড়ায়!—সেই জমীদারী যাহাদের, তাহাদের পক্ষে, এই অলীক পদমর্য্যাদাবোধের তাড়নে, অথবা দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ, খাওয়া পরার বাহুল্য, গৃহসজ্জার বাহুল্য, যানাদির বাহুল্য, দাস দাসীর বাহুল্য, ইত্যাদিতে ব্যয়-বাহুল্য ঘটান বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার ফলে, হয় কি? একদিকে যে হারে আপনার অহঙ্কারের অসীম প্রসার ঘটে; মনের তদনুরূপ সঙ্কোচ ঘটে। ফলে, একজনের সর্ব্বগ্রাসী, অসুরত্ব ও অন্যায় ক্ষুধা; অপরদিকে, শত-সহস্র, নিরন্ন দেশবাসীর জীবনের আবশ্যকীয় গ্রাসাচ্ছাদনেরও অভাব। বিদ্যা অর্থকরী হওয়ার মোট-ফল, তবে কি

দাঁড়াইল?—একদিকে, পর্ব্বত-প্রমাণ টাকার স্তূপে ছাতা পড়িতেছে; অপরদিকে, বুভুক্ষু দেশবাসীরা, ক্ষুধায় জ্বালায় পেটে হাত বুলাইতেছে!—অর্থাৎ, জাতি-বিড়ম্বিত দেশে, ধনী ও নির্ধন, দুইটি নূতন জাতির সৃষ্টি!

অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রলোকের এমনই মনোবৃত্তি দাঁড়াল যে, স্বয়ং ভোগেচ্ছা ও বিলাসিতা নিজ নিজ সন্তানদিগের মধ্যেও জোর করিয়া চালাইতে দ্বিধাবোধ করেন না! "আমার ছেলের এ রকম সুট, ও রকম কোট, সে রকম ঘাট" ইত্যাদি ইত্যাদি না হইলে, আমার পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে কেমন করিয়া,"—এই মনোবৃত্তির তাড়নায়, অনেকে, শৈশব হইতেই, নিজ নিজ সন্তানদিগের চাল-চলন চিরদিনের মত নষ্ট করিয়া দিতে ছাড়েন না! যে শিশু, নিত্য ভোগে ডুবে থাকে, সে ঘোরতর স্বার্থপর ও অসংযত না হইয়া, আর কি হইতে পারে? অথচ, ত্যাগে যতটা সুখ, ভোগে ততটা বা তাহার বেশী দুঃখ। শৈশব হইতে, স্বকীয় ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দ্বারা, অভিভাবক কর্তৃক শিশুদিগকে যতই ত্যাগের পথে চালান যায়, তাহারা ততই সংযমী ও "মানুষ" হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান শিক্ষার তৃতীয় দোষ,—দেহকে বাদ দিয়া, মাথার পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখা। অথচ, "দৈহিক" স্বাস্থ্য ভাল না হইলে, কখনোই, "মানসিক" স্বাস্থ্য ভাল হয় না, ও ভাল থাকে না। প্রথমেই বলিয়া রাখি, এ দেশে, যে শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে, তাহাকে কোনও ক্রমেই মানসিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণে সমর্থ (প্রকৃত education) বলা যায় না;— কতকগুলি বাধ্যগৎ শিখাবার কৌশল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, শিক্ষার এই হীন-আদর্শ গ্রাহ্য করিলেও, এদেশে, তাহারও পূরা কায হয় না, কারণ, এ দেশে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে,দৈহিক উন্নতির এতটুকুও চেষ্টা নাই।—বলিয়ার ভাল কি বল, তাহা না দেখিয়াই, তাহার উপরে যেমন-তেমন ইমারত এ দেশেই গড়া হয়! আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, এই কলিকাতা সহরের কোনও প্রবীণ ও দূরদর্শী বাঙ্গালী চিকিৎসক, কয়েক বৎসর আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কলিকাতা কর্পোরেশনের এবং তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত বাঙ্গালী মন্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করেন যে,—"বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে আপনাদের দায়িত্ব কতটুকু"—তখন প্রায় খোলাখুলি ভাবেই, সকল দিক থেকেই, ঐ দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়! তাহার পর থেকে, এখন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে, বৎসরে বৎসরে বহু সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, প্রতানুগতিকভাবে, শুধু ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষাই চলিয়াছে—যেন পরীক্ষা করাটাই আংহমান কাল চলিবে, এবং পরীক্ষা করাটাই পরম পুরুষার্থ—কিন্তু, ভগ্ন, বা ক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাইবার জন্য, না বিশ্ববিদ্যালয়, না বিউনিসিপালিটি, না গবর্ণমেণ্ট—কেহই বলিবার-মত কিছুই করেন নাই! "দেহ" ঠিকমত গড়িবার চেষ্টা নাই বলিয়া, কস্মিন্‌কালে, আমাদের বালক-বালিকাদের "মানসিক" স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না! অথচ, আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, খেলার (sports) সুযোগ না দিতে পারিলেও, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে, স্পোর্টস্ কি নামক টেক্স্ অজ্ঞাতরূপে আদায় করা হয়! এবং, প্রত্যেক বিদ্যালয় হইতে, ছাত্রের উন্নতি-সম্বন্ধে "প্রোগ্রেস-রিপোর্ট" পাঠাইবার বহর নিত্য বৃদ্ধি পাইলেও, না বিদ্যালয়ের তরফ হইতে, না অভিভাবকদের তরফ্ হইতে, এই রিপোর্টে ছাত্রের স্বাস্থ্য-কথার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ থাকে না—যেন এদেশের ছাত্রেরা সকলেই আদর্শ স্বাস্থ্যযুক্ত!

বর্ত্তমান শিক্ষার চতুর্থ দোষ—উহা একদেশদর্শী।—এই হিন্দুস্থানে, হিন্দুদের বিদ্যালয়ে, হিন্দু-ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোনও শিক্ষা দেওয়া হয় না—বা, সেরূপ শিক্ষার আবহাওয়াও সৃষ্টি করা হয় না। অথচ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিদ্যালয়ে—এমন কি সরকারী বিদ্যালয়েও—বাধ্যতামূলক ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া না হইলেও, ধর্ম্ম শিক্ষার যথেষ্ট আবহাওয়াও সৃষ্টি করা হয়, এবং ধর্ম্মশিক্ষার সবেষ্ট সুযোগও দেওয়া হয়। এই প্রাচীন হিন্দুস্থানের, যুগযুগান্তরের সাধনা ও সংস্কৃতির (বা কাল্‌চারের) মধ্যে, ব্রহ্ম-সাধনার সুর ওতঃপ্রোত-ভাবে বিদ্যমান আছে। তাই, ইতিপূর্ব্বে, ভারতবাসী কখনো বিদ্যা, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য-চর্চ্চাকে বিভিন্ন করিয়া দেখেন নাই।

এবং সেই জন্যই, ভারতের স্বাস্থ্য-শাস্ত্র বেদের পর্য্যায়ে উন্নিত; তাই, ভারতের ধর্ম "রিলিজান্" নহে;—যাহা কিছু সমগ্র মানুষটাকে তাহার সাধনাপূত সমাজের সহিত ধারণ করিয়া আছে, ভারতবাসীর চক্ষে, তাহাই ধর্ম। আলাদা, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, ভগবান; বা ব্রহ্ম-রূপ অতীন্দ্রিয়-পুরুষের সহিত সম্বন্ধ লইয়া, হিন্দুর "ধর্ম" নহে। আর আজ, সেই হিন্দুকে ধর্মজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিবর্জ্জিত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পাশ্চাত্যরা, সকল জিনিষকে নাম (label আঁটিয়া) দিয়া, আলাদা মোড়কে মুড়িয়া, কয়েক পেটিকাবদ্ধ করিয়া, (in separate water-tight compartments) দেখিতে ভালবাসেন; তাই, ইংরাজ-রাজত্বে, শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে স্বাস্থ্য-বিভাগের কোন যোগ-সূত্রটি পর্য্যন্ত নাই; তাই, আজ, আমাদের ছেলেরাও একটা জিনিষকে—ও মানুষকে—শত খণ্ড করিয়া, পৃথক্‌ পৃথক্‌ দিয়া দেখে,—একসঙ্গে সমগ্র-জিনিষটাকে দেখিতে চায় না, পায়ও না!

বর্ত্তমান শিক্ষার সকল দোষ—ইহার প্রাণহীনতা। বৎসরের পরে বৎসর ধরিয়া, অনবরতই, পরের-সিদ্ধান্ত মুখস্থই করান হয়, হাতে হাতিয়ারে এতটুকু কিছুই শিখান হয় না;—ইন্দ্রিয়কে সজাগ করা দূরের কথা, সহজাত বৃত্তি-গুলিরও (natural parts) স্ফুরণ হইবার সুযোগ এদেশে মিলে না। প্রাণহীন শিক্ষায়, হৃদয়হীনতা, মানসিক দীনতা, বুদ্ধির মলিনতাই ও ইন্দ্রিয়াদির জড়তা পরিস্ফুট হওয়া ছাড়া, আর কি আশা করা যায়?

বর্ত্তমান শিক্ষার যত দোষ বলিয়াই, আজকার মত ক্ষান্ত হইব। এই শিক্ষা, অলক্ষ্যে, একদিকে, বালক-বালিকা ও অপর পক্ষে, অভিভাবক এবং সমাজের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্বন্ধ তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। যে পল্লীবাসী ছাত্রের মন, তাহার সহরে প্রাসাদোপম হষ্টেলের বিজলীবাতির আলোর মত যা হাতে উদ্দীপিত হয় নাই,—সে দীন, অথচ শান্ত, সমাহিত তাহার পল্লীভবনে ফিরিতে চাহে কি? যে বালক-বালিকা দেখে যে, বিদ্যালয়ে কামাই করিলে, তাহার অভিভাবকের চিঠি অগ্রাহ্য হয়—পাশ্চাত্যমতে শিক্ষিত ডাক্তারের সার্টিফিকেটকে আদর দেওয়া হয়—সে কি কখনো অভিভাবককে ভক্তি করিবে? শুনিয়াছি যে, মহাত্মা গান্ধীর জীবন-চরিতে লিখিত আছে, একদিন তাঁহার পিতা পীড়িত ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায়, বেলার আন্দাজ না পাওয়ায়, দৈবাৎ একটু বিলম্বে তিনি বিদ্যালয়ে যান। প্রথম ভাগেই, ছিল হইত। আকস্মিক বিলম্বের সত্য কারণ—পিতার পীড়া বৃদ্ধি ও বেলার আন্দাজ না পাওয়া—বলা সত্ত্বেও, তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। সত্যনিষ্ঠ বালক, সেদিন বাটী ফিরিয়া, আহারও করিতে পারেন নাই এবং সারা রাত্রি নিদ্রা যাইতেও পারেন নাই। শাস্তির যন্ত্রণা তাহার কারণ নহে; তাহার কারণ, প্রথমতঃ, তাঁহাকে অবিশ্বাস করা হইয়াছিল বলিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, পীড়িত পিতার সেবার চেয়ে সময়মত স্কুলে যোগ দেওয়াটাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছিল, বলিয়া। গুরু-শিষ্যে ভালবাসা দূরের কথা, এখন উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসও নাই; বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে, পিতামাতার কথায় অবিশ্বাস;—এত বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ কি রকম অলক্ষ্যে গজাইতেছে! ঘরে বাহিরে এই আবহাওয়া আমাদের বালক বালিকাদিগকে কোন্ পথে লইয়া যাইতে পারে, আপনারা বিবেচনা করুন।

বালক-বালিকারা সুকোমল ও তরলমতি—তাহাদিগকে যেমন ইচ্ছে চালা যাইবে, তাহারা সেই রকমই হইবে। ইংরাজীতে দুইটা প্রবাদ-বচন আছে; একটা—যেমন বীজ পুতিবে, সেই জাতীয় গাছই জন্মাইবে; অপরটা—যদি তুমি হাওয়ার বীজ পোত, তবে ফসল তুলিবার সময়ে তোমার ভাগ্যে ঝড়ই প্রাপ্য।

এখন আপনারা—বুঝুন, ছেলে মেয়েরা বিপথগামী কেন হয়?

অপরাজিত

শ্রী মনোজ বসু

'পথের পাঁচালী'তে একটি দেবশিশুর মতো সুন্দর নিষ্পাপ ভাবপ্রবণ বালককে দেখিয়াছিলাম। এক উঠান লোকের সম্মুখে নিষ্ঠুর বিনাবিচারে মার খাইয়া তার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হয় নাই। তারপর নির্জন ঘরের জানলায় একেলা দাঁড়াইয়া আকুল উচ্ছ্বসিত চোখের জলে মনে মনে সে বলিয়াছিল—ভগবান, তুমি এই কোরো ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—মেলে বাঁচবো না—পায়ে পড়ি তোমার—

অবোধ অপু সেদিন ভুল ভাবিয়াছিল। মনে করিয়াছিল, বুঝি তার শৈশব-স্বপ্নোজ্জ্বল নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবন, মাঠ, ফুলেভরা বন-কোপ, ইচ্ছামতীর মায়াময় নির্জন চরই কেবল তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। হায় মূর্খ বালক! দুর্বার জীবন-ধারার কূলে কূলে কতবারই মানব-যাত্রীকে পিছনের শান্ত গ্রামান্তরাল এমনি হাতছানি দিয়া ডাকিয়া থাকে! কিন্তু নব নব অভিঘাতের মধ্য দিয়া যে অপরাজিত জীবন রহস্য তাহার মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিতে চায়, পিছন ফিরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইবার তাহার অবকাশ কোথায়?

তাই 'অপরাজিতে'র শেষভাগে সেদিনের সেই নিশ্চিন্দিপুর-পিপাসু অপু আবার যখন তাহার গ্রামে ফিরিয়া আসিল, একটা দিনও সেখানে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। মা-হারা কাজলকে পরম বিশ্বাসে এবং পরম কৃতজ্ঞতায় নিশ্চিন্দিপুরের হাতে সমর্পণ করিয়া অপু চলিয়া গেল। এবার মহত্তর যাত্রা আরম্ভ হইল সুদূর সমুদ্র-পারে।

এই সুদীর্ঘ উপাখ্যানটি পড়িতে পড়িতে 'পথের পাঁচালী'র পথের দেবতার সেই উক্তিটি বারবার মনে আসিতে থাকে। শিশু অপু একদা যখন একাগ্র কামনা জানাইতেছিল নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া যাইবার জন্য দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে পথ তাঁহার শেষ হয় নাই তাহাদের গ্রামের বাঁশের বনে···পথ চলিয়া গিয়াছে সামনে, সামনে, শুধুই সামনে···দেশ ছাড়িয়া বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছাড়িয়া সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়াইয়া অপরিচয়ের উদ্দেশে···অনির্বাণ তার বাণী শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ···

অপুর অশ্রান্ত জীবন-প্রবাহ এবং শেষকালে ফিজি-যাত্রা অক্ষরে অক্ষরে ঐ কথাগুলিই প্রমাণ করিয়া দেয়। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'কে জীবনের বহুবিস্তীর্ণ অপরূপ রহস্যময় পথের ধারাবাহিক ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ বিশাল পটভূমি লইয়া বাংলাদেশে আর কেহ উপন্যাস লেখেন নাই। যে জীবনধারা জীবজগতের উপর যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রতিনিয়ত প্রবহমান, যাহার পথের বাঁকে বাঁকে নানা রূপ রস ও সুবিপুল রহস্য গতির দুঃখ ও অবসাদকে আনন্দে রূপান্তরিত করিয়াছে, পুরাতন গতানুগতিকতাকে নব নব মহিমায় মনোহর করিয়া তুলিয়াছে তাহাই নানা ছন্দে ও ছবিতে এই বই দুটিতে বিচিত্র রূপ পাইয়াছে। 'অপরাজিত' যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে অপুর বয়স বোধ করি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ছবি আঁকিতে দু'খানা বইয়ে (৫২৭+৬১৯) ১০৪৬ পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইয়াছে। শুধু এই অঙ্কের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যাইবে জীবনকে কত পরিপূর্ণ ভাবে চিত্রিত করিতে বিভূতিবাবু প্রয়াস পাইয়াছেন। এই-রূপ সুপরিসর ক্ষেত্র নির্বাচন লেখকের পক্ষে অত্যন্ত সাহসের পরিচয়।

কোন সাধারণ পর্যায়ের লেখক নিশ্চয় এই সাহস করিতেন না। কারণ ইহাতে বিস্তর বিপদ আছে। জীবন-চিত্র বহুবিস্তীর্ণ ভাবে আঁকিতে গেলে দৈনন্দিন ব্যাপার

অপরাজিত—উপন্যাস। শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম খণ্ড ৩৷০, দ্বিতীয় খণ্ড ৪ টাকা। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ও মানসিক সামান্যতম বিবর্তনের ইতিহাস দিতে হয়। দশ বছরের ব্যবধানে একটা লোককে দেখিয়া তাহার জীবনে যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা ধরা সহজ। কিন্তু প্রতিদিনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে হইলে যে তীক্ষ্ণ সন্ধানী-দৃষ্টির আবশ্যক তাহা সকলের নাই। আমার আজিকার দিনের জীবন আপাতদৃষ্টিতে হয়ত কালকারই পুনরাবৃত্তি মনে হইবে কিন্তু সূক্ষ্মদ্রষ্টার কাছে প্রতি পলকের পরিবর্তন-টুকুও ধরা পড়িয়া যায়। এই পরিবর্তন আবার বিভিন্নরূপে চিত্রিত করিয়া চোখের সম্মুখে ধরা আরো কঠিন। বিভূতি-বাবু সেই অগ্নিপরীক্ষায় অদ্ভুতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যেখানে প্রতিমুহূর্তে পদে পদে পুনরাবৃত্তি ও একঘেয়েমি আসিবার শঙ্কা রহিয়াছে সেখানে নব নব রস ও রূপসৃষ্টির দ্বারা অভিনবতার সমাবেশ শিল্পচাতুর্য্য ও দৃষ্টিক্ষমতার প্রকৃষ্টতম পরিচয়। বিভূতি-সাহিত্যে যে পুনরাবৃত্তি আসে নাই তাহা বলিতেছি না কিন্তু তাহা এত সামান্য যে রস-সৃষ্টিকে ব্যাহত করে নাই।

নেপোলিয়নের মতো মহা দিগ্বিজয়ীর জীবনকথা প্রকাণ্ড করিয়া লেখা সহজ, কারণ বাহিরের ঘটনার বাহুল্যে উহা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া যাইতে পারে। অপুর জীবন সেরূপ নহে। অথচ পাঠক-চিত্তকে চমক দিবার জন্য প্রচুর রস না থাকিলে উপন্যাসের গতির সহিত পাঠক-চিত্তের সমতা থাকে না, পাঠক পথগতি হইয়া পিছাইয়া পড়েন, উপন্যাসের সহিত ছুটিতে চাহেন না। ঘটনার চমকে পাঠককে ভুলাইয়া লইবার মতো রোমাঞ্চকর উপন্যাস পৃথিবীর সর্ব্বদেশে অনেক লেখা হইয়াছে। উহা নিম্নশ্রেণীর কলমের পরিচয় দেয়। অপুর জীবনে সেরূপ ঘটনা সম্ভবও নহে। তাহার জীবন সবিস্তারে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পাঠকের বিরক্তির যে আশঙ্কা ছিল তাহা দূর হইয়াছে অপুর সচল ক্রিয়াশীল মনের গতিবেগে। গতিই জীবন—এবং অপুকে জীবন্ত করিয়া আঁকিয়া লেখক তাঁহার উপন্যাসকে অপূর্ব্ব গতিবান করিয়াছেন।

সেই যে বিজ্ঞাপনে লিখিয়া থাকে—ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড হইয়া গেলেও কাহার সাধ্য এ উপন্যাস শেষ না করিয়া উঠিতে পারে!—পথের পাঁচালী বা অপরাজিত সে ধরণের উপন্যাস নয়। বস্তুতঃ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা অথবা উপসংহারের অংশটি আগে-ভাগে দেখিয়া লইবার প্রয়োজন এই উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কাহারও মনে জাগিয়া উঠিবে না। আমি 'গতিবান' বলিতেছি এই অর্থে যে অপু ও অন্যান্য চরিত্র বইয়ের গোড়া হইতে সুরু হইয়া পাতায় পাতায় উপযুক্তরূপ অগ্রসর হইয়া সুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করিয়াছে, কোন চরিত্র একজায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। জীবনকে সুবিস্তৃত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার দৈনন্দিন নয়র গতি স্থূল দৃষ্টির সম্মুখে হয়ত ধরা পড়ে না; কিন্তু যদি আমরা বিবেচনা করি, আট-দশ বছরের অপুর কাছে একদিন নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিবার চেয়ে বড় কামনা কিছুই ছিল না আবার সেই অপুই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের সময় নিশ্চিন্দিপুরকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম দিয়া স্বচ্ছন্দে বিদায় লইল—দীর্ঘ কুড়ি-বাইশ বছরের এই ব্যবধান দিয়া দেখিলে অপু-চিত্ত এবং উপন্যাসের গতিশীলতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারিব।

অর্থাৎ বিভূতিবাবু যদি অপুর ত্রিশ বছরের জীবন-চিত্রণে হাজার পৃষ্ঠা ব্যয় না করিয়া পৃষ্ঠা পঞ্চাশের মধ্যে সারিতেন তাহা হইলে উপন্যাসের গতিশীলতা সম্বন্ধে অতি বড় অরসিকেরও সন্দেহ থাকিত না। এবং এইরূপে ঘটনার যে ঠাসবুনানি হইত তাহার ফলে পাঠকের কৌতূহল স্বতঃই জাগ্রত থাকিত, উচ্চতম কলাকৌশলের কিছুমাত্র প্রয়োজন হইত না। সুবিধা সকল দিকেই। আর ঐ সুবিধার আকর্ষণেই প্রত্যেক সাহিত্যে ঘটনাবহুল উপন্যাসের সংখ্যা শতকরা নিরানব্বই খানা।

কিন্তু গতানুগতিক হাইস্পীডের উপন্যাস-রাজ্যের মধ্যে যখন 'অপরাজিতে'র ন্যায় একখানা মন্থরগতি বই পড়িতে পাই তখন এমন একটি অপরূপ শান্ত তৃপ্তিরসে মন ভরিয়া যায়, যাহা ঘটনাবহুল উপন্যাসে মেলে না। মোটরে চড়িয়া দ্রুত পথ অতিক্রম করার কাজের লোকের সুবিধা ঘটে কিন্তু রসসন্ধানীর পক্ষে পদব্রজে চলিবার আবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ যে উপন্যাসে ঘটনা লঘুপক্ষ পাখীর মতো উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করিয়া ঘটনাই প্রধান হইয়া উঠে। দু'শ' মাইল বেগে গাড়ী হাঁকাইয়া কাশ্মীর যাওয়ার মধ্যে ঐ কাশ্মীর যাওয়াটাই একমাত্র লাভ, পথের প্রকৃতির কোন পরিচয় পাওয়া যায়

না। আমি পরস্রোতেই চলিব, তাহাতে শেষ পর্যন্ত কাশীর পৌঁছানো নাও ঘটিতে পারে কিন্তু যে পুকুরঘাটে নামিয়া আমি অঞ্জলি ভরিয়া জল খাইলাম, যে অশ্বত্থতলায় রাত্রি যাপন করিলাম এবং যে গ্রামবধূদের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল—ইহার স্মৃতিগুলি জীবনের পক্ষে ত কম মূল্যবান নহে।

অতএব এই ধরণের যাত্রাপথী উপন্যাসের বিশিষ্টরূপ প্রয়োজন আছে এবং সেই হিসাবে 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত' বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম। মহাকাব্যের সহিত এই জাতীয় উপন্যাসের স্পর্শ-সাদৃশ্য আছে। মহাকাব্যের কোন একটি সর্গের মধ্যে পাঠক-চিত্ত ডুবিয়া যায়, তাহার রসে আপ্লুত হইয়া চিত্ত সেই রস আকণ্ঠ পান করিতে থাকে, চলিবার মুখে তাড়াতাড়ি এক চোক গিলিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। বিভূতিবাবুর উপন্যাসের কোন একটি পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে সেইরূপ ডুবিয়া যাইতে হয়—'তারপর?' এই প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া যাই। বলিয়াছি যে যেখানে অপরাজিতের সমাপ্তি হইয়াছে সেখানে অপুর বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যেকার কোন একটা বয়স যদি পাঠক আর একবার ফিরিয়া উপভোগ করিতে চাহেন, আমার বিশ্বাস বিভূতিবাবুর বইয়ের সেইরকম জায়গা খুলিয়া পড়িলেই ক্ষণিকের জন্য পরম ঈপ্সিত বিগত কালের সেই দিনগুলি ফিরিয়া আসিবে। অপুর জীবন একেলা অপুর নহে—উহা অপূর্ব বিশ্বজনীনতা লাভ করিয়াছে—উহা এমনি পরিপূর্ণ সজীব ও সত্য! এইখানেই লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়।

বিভূতিবাবুর অন্তর্দৃষ্টি সত্য সত্যই বিস্ময়কর। নিকৃষ্ট শিল্পীর হাতে পড়িলে এইরকম বই জীবনের ঘটনাবলীর ক্যাটালগ হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ও রসজ্ঞানের ফলে দৈনন্দিন ঘটনাকে বাছাই করিয়া ও সাজাইয়া লেখক সাধারণ পরিবেষ্টনীর মধ্য হইতে অপরিমেয় রূপ ও সৌন্দর্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার মনের অলক্ষ্যে যে রস আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে—আমরা যার কিছুমাত্র খোঁজ-খবর রাখি না—বিভূতিবাবুর বই পড়িতে পড়িতে সহসা তৎসম্বন্ধে সচেতন হইয়া আমরা উহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। এই অজস্র দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যভাগ দিয়া চলিয়াছে অপুর জীবনধারা। কোন'দিকে কোন বন্ধতা নাই—যেন দিগন্তব্যাপ্ত সুবিপুল প্রসারের মধ্য দিয়া কলনাদিনী নদী বহিয়া চলিয়াছে।

'অপরাজিত' পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছিল, আমরা যেন আকাশের উপর দিয়া মন্থরভাবে নিম্নদেশের সুবিস্তীর্ণ দেশ দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। সেই দেশের উপরে নগর গ্রাম খাল বিল কত যে পড়িয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত নদী কত কতদূর হইতে আসিয়া পথের মধ্যে শেষ হইয়া গেল অথবা বাঁক ঘুরিয়া অন্য কোন্ দিকে বহিয়া গেল তাহা আমরা জানি না। তাহাদের জন্য ক্ষণেক মন উন্মনা হইয়া ওঠে, কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। সর্বজয়া অপর্ণা লীলা অনিল ইহাদের বিয়োগে বেদনা অনুভব করি, কখন বা দারুণ ঔৎসুক্যে ভাবিতে থাকি সেই হতভাগিনী পটেশ্বরীর পরিণাম কি হইয়াছিল?···এমনি করিয়া পথের মধ্যে বহুজনকে পাইয়া ভালবাসিয়া এবং হারাইয়াও আমরা কোথাও থামিতে পারি নাই—একটি দূরগামী বিপুল কল্লোলময় জীবনধারাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলি তাহার অনুগমন করিয়া ফিরিতেছি। সেই ধারাটির নাম অপু। এই সুদীর্ঘ যাত্রায় অপুর সহিত মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে অনেকের—তার মধ্যে প্রধানতম হইতেছে লীলা অপর্ণা এবং 'নিশ্চিন্দিপুর' নামক একটি অতিজীবন্ত রহস্যময় প্রাণী।

গুরুসদয়

(শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস্-এর উদ্দেশে)

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ

এত দিবস সমান সমান ছিনু,
এখন তোমার নাগাল পাওয়া ভার,
দেখে তোমায় অবাক হ'য়ে থাকি,
পল্লী-পাখল বন্ধু হে আমার!

নিরঞ্জনের অমৃত-অঞ্জনে
পেলে দিব্য দৃষ্টি চমৎকার,
পরশ-পাথর তুমিই পেলে বুঝি,
আনন্দেতে পাঠাই নমস্কার।

পল্লীমাতা সোহাগ ভরে কুলে'
তোমায় দিলেন ভাণ্ডারেরি চাবী,
হয় এত কোথায় ছিল ঢাকা,
আপন মনে আজকে আমি ভাবি।

'হাব-ভৌলে' ত অবজ্ঞাতেই ছিল
লক্ষ্যও কেউ করত নাক তাকে,
পার্থ ছিল বৃহন্নলা হ'য়ে
চিন্‌তো কে তা তুমি আসার আগে?

আলিম্পনের রঙিত-রেখা-দলে
কতই সোতার ঝঙ্কার ছিল ভাই,
ঘরে আঁকো পদ্মফুলের মাঝে
পারিজাতের গন্ধ এখন পাই।

পল্লীকে যায় এম্‌নি ভালোবাসো
ধূলার মুঠি স্বর্ণমুঠি করো,
সাধ্‌ভোবাতে পল্ল ছুটাও তুমি
দেখ্‌ছি তোমার সবই নূতনতর।

হে ধরণী, দেশের সুসন্তান,
তোমায় আমার প্রণতি ভাবি বোঝ,
আমি গাহি অশথ্‌তলার গান
তুমি রাখ কল্পতরুর খোঁজ।

আমি কেবল অজয়-কূলে বসে'
বালির বেলায় জলের রেখা টানি,
তুমি রচ অমিতাভের ছবি
বন্ধু আমার অমৃত-সন্ধানী! *

---

* 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে "পশ্চিম-বাংলার মোহনের প্রাচীরচিত্র-শিল্প" পাঠাবে।

হাওয়া-সমিতি

শ্রী করুণাবন্ধু মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কলকাতাকে "পাষাণকারা" বলেছেন। তাঁর মতে এখানে শুধু "ইঁটের পর ইঁট, মাঝে মানুষ কীট।" কত রাজপথ, কত রাজপ্রাসাদ, আমোদ-প্রমোদের কত শত উপকরণ, তবু কবিগুরুও এই বিশাল নগরীর এরূপ বর্ণনা কেন করলেন তা হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে হ'লে তাঁর মত হৃদয় নিয়ে ধনীগণকে নির্ধনদের হৃদয় স্পর্শ কর্ত্তে হবে। যাদের বড় বড় বাড়ী, মোটর গাড়ী আছে তাঁদের কাছে এই নগরী স্বর্গ এবং তাঁরা অনেকেই সহজে বুঝতে পারবেন না কত বড় বিরাট শ্মশান এই নগরী দীন হীন দরিদ্রদের কাছে। আর এই দরিদ্র লোকেদের সন্তানদের দুর্গতি কী ভীষণ তা আমরা অনেক সময় ভেবেও দেখি না। যে সব বাসায় বা বস্তীতে এরা থাকে, এক কথায় সে সবকে নরক বললেও বেশী মিথ্যা বলা হবে না। যখন ইস্কুলে এসে বড় লোকদের ছেলেদের সঙ্গে মেশে তখন এদের বিপদ আরও বেশী। ধনীর ঘরের দুলালদের সাথে এদের কত প্রভেদ। সব চেয়ে দুঃখ হয় যখন লম্বা ছুটীর পর এদের মুখ থেকে হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা দেশবিদেশের কথা শোনে অথবা মাষ্টার মহাশয়গণ যখন দার্জ্জিলিং, পুরী প্রভৃতি স্থানের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের কথা বর্ণনা করে' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের কাঙ্গালিনী মেয়ের মত এদের "ম্লান চোখে দুরাশার সুখের স্বপন" ভেসে যায়। আমরা ইস্কুলের মাষ্টার, তাই এই কথার সত্য অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি।

দু'বৎসর আগে একদিন যখন শুনলাম মাতৃস্থানীয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার কয়েকজন নিঃস্বার্থ সেবক-সেবিকা উল্লিখিত সমিতি স্থাপন করেছেন তখন বড়ই আনন্দিত হয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম যদি এই সমিতির কোনরূপ সেবা করার দুর্লভ সৌভাগ্য হয় তবে আপনাকে ধন্য মনে করবো।

বইতে পড়ি এবং লোকমুখে শুনি ইউরোপ প্রভৃতি দেশের যুবক-যুবতীগণ "নির্ব্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ঘুরে বেড়ায়।" অর্থাভাবে অবসন্ন, রোগে শোকে জরাপন্ন, অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন আমাদের এই দেশে বর্ত্তমানে তা অসম্ভব। তবু এই অল্পকালের মধ্যে এই সমিতি যা করেছেন তা নিতান্ত সামান্য নয়। বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে কলকাতার প্রায় চারিশত বালক-বালিকা বিনাখরচে কত পাহাড়-পর্ব্বত, নদনদী, সাগর-সরোবর, বনজঙ্গল, কত মনোরম দৃশ্য দেখে আসলো এই দুই বৎসরের মধ্যে। এই দেখা-শোনার ভিতর দিয়ে এরা যে সর্ব্বপ্রকারে উপকৃত হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা এই সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাদের কর্ম্মকুশলতা এবং ঐকান্তিকতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করি এবং আশা করি দেশের ধনশালী নরনারীবৃন্দ যথাসাধ্য সাহায্য করলে এই শিশু-অনুষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখতে। যদি এ স্বল্পায়ু না হয় তবে বাঙ্গালী আজ যা ভাবছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও কাল তা ভাববে এবং ধীরে ধীরে ভারতময় বালক বালিকা, যুবক-যুবতীদের দেহে মনে হৃদয়ে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। দেশের যারা ভবিষ্যতের আশা-ভরসা তাদের "প্রাণ ভরা শুধু বুকে" আশা, আনন্দ এবং বল সঞ্চার করার একটা পথ খুলে দিতে হবে। যতদিন সমাজের বর্ত্তমান উচ্চনীচ অবস্থা থাকবে ততদিন জনসাধারণ দেশের বড়লোকদের কাছে এইটুকু সাহায্য আশা করে—এ তাদের প্রার্থনা ও দাবী। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আজকাল অনেকেই চিন্তা করে' থাকেন। তাঁদের দৃষ্টি আমরা এই সমিতির দিকেও আকর্ষণ করি।

• "দি চীলড্রেন্‌স্ ফ্রেস এয়ার এণ্ড এডুকেশনাল সোসাইটি"র সহজ ভাষায় "হাওয়া-সমিতি" নাম দেওয়া গেল।—ক: ম:

প্রথম যুগের ফরাসী সাহিত্য

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

প্রথমেই ফরাসী ভাষার উদ্ভবের কথা —।

রোমক যুগে "গল্" হিসাবে যে জাতি ছিল জগতের বুকে পরিচিত, তারা ফরাসী জাতির নামান্তরিত পূর্ব্বপুরুষ। যুদ্ধপ্রীতি ও বাক্-পটুতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সে জাতির ছিল নিবিড়-পরিচয়। তাদের বংশধর হিসাবে জীবনধারার সেই বৈশিষ্ট্য বোধ প্রথম যুগের ফরাসী সাহিত্যে কম-বেশী হিসাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

শুধু তাই নয়, রোম্যানদের "গল্" বিজয়ের পর রোমক ভাষা—তদানীন্তন প্রাচ্যদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রাজভাষা হিসাবে এ দেশটির বুকে বিস্তৃতি লাভ করে। তাদের সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রভাবান্বিত হ'য়ে গল্‌দের মনে প্রথম জাগে নিজেদের সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা সার্থক হবার আগেই অসভ্য জার্ম্মেন বোর্গেণ্ডেরা ফ্রান্স দখল করে' ফেল্‌লো রোমক সাম্রাজ্যের শেষ যুগে। কিছুদিন পরে এই অসভ্যদের অত্যাচার ও অসংযমের উপর যখন খ্রীষ্টির ধর্ম্মনিকা নেমে এলো, তখন প্রথম একটা উন্নত ভাষা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা এদের মনে আবার জাগরূক হোল। তাদের সে প্রচেষ্টা সার্থক হয় ফরাসী ভাষার সৃষ্টিতে।

—লাটিন্ ও জার্ম্মেন অসভ্যদের ভাষার মিশ্রণে প্রথম ফরাসী ভাষার সৃষ্টি।

এই ভাষার প্রথম বই হোল Glossaries of Reichenau and Cassel—এইখানিই এই ভাষার প্রথম অভিধান।

ক্রমে ক্রমে এই ভাষাটিই সাধারণ ভাষা হিসাবে দেশের বুকে বিস্তৃতি লাভ কর্‌লো দুটি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হ'য়ে—Langue d'oc আর Langue d'oil। প্রথমটি দক্ষিণাংশের অধিবাসীদের কথিত ভাষা হোল ব্যাপক ভাবে আর শেষোক্তটি হোল উত্তরাংশের। শেষেরটিই পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে আধুনিক ফরাসী ভাষার জন্ম।

—এই গ্যালো ফরাসী ভাষার জন্মেতিহাস। যে কোন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে হ'লে সেই ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে ক'রে আমরা ফরাসী ভাষার জন্মেতিহাসের অবতারণা কর্‌লাম এখানে।

দশম শতাব্দীর কথা।—

দশম শতাব্দীর আগে ফরাসী সাহিত্য আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারেনি। সাহিত্য কি, তা তখনকার লোকের চিন্তাধারার গণ্ডীর মধ্যে ধরা দেয়নি, সেইজন্যই ফরাসী সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে পারে নি এর আগে।

দশম শতাব্দী থেকেই প্রথম ফরাসী সাহিত্যের সৃষ্টি।

মধ্যযুগের অপর সব দেশের মত এদেশেও ছিল চারণ-কবিদের আধিক্য। এদের মুখে মুখেই প্রথম গীতিকাব্য Chanson de Rolandএর সৃষ্টি। "সাগা" বা 'এপিক্' বল্‌তে যা বোঝায় এখানিকে তা বলা যেতে পারে। সে যুগের বিখ্যাত নৃপতি "শার্লেম্যাগ্‌নের শেষ যুদ্ধের কথা সরল অনাড়ম্বর সংযমের সঙ্গে এই বইখানিতে ছন্দোবদ্ধ। একঘেয়েমির একটা সুর থাক্‌লেও, এ বইখানি সে যুগের একটি বিশেষ সৃষ্টি। চারণ-কবিদের গীতিকাব্যের মধ্য দিয়েই এম্নিভাবে অনেকগুলি সাগার সৃষ্টি হয়—Chansons de Geste নামেই সেগুলি প্রসিদ্ধ।

চারণদের মুখে মুখে এই ধরণের গীতিকাব্য সৃষ্টি হ'তে থাকে দু'শতাব্দী ধরে'—বারশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত।

তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব ও মধ্যভাগে গীতি-কাব্যের ভিতর দিয়েই ইতিহাস লেখ্‌বার প্রচেষ্টা সুরু হোল। যে ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্তি মাত্রকেই আকৃষ্ট করে' মনোবিবর্ত্তন ও চিত্তক্ষোভ ঘটাবে, এম্নি ঘটনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে' ক্রুসেড্ (Crusade)এর ঘটনা নিয়েই রচনার আরম্ভ হোল। (সেরাসিন্ তুর্কীদের অধীনতা থেকে খ্রিষ্টের জন্মভূমি প্যালেষ্টাইন্‌কে মুক্ত কর্‌বার জন্য য়ুরোপের বিভিন্নদেশীয় সৈন্যদল একত্রে যে

যুদ্ধযাত্রা করতো—তাই ক্রুসেড্ নামে প্রসিদ্ধ।) সে যুগে দুটি লেখক এই রচনায় অসামান্য পারদর্শিতা দেখান, তাঁরা হচ্ছেন ভিলেহার্দুঁ ও জোঁভিল্। ভিলেহার্দুঁ লিখেন চতুর্থ ক্রুসেড্ সম্বন্ধে। এঁর রচনায় বিশেষ উৎকর্ষ না থাকলেও এঁর পরবর্তী লেখক জোঁভিল নবম ক্রুসেডের কথা বর্ণনা করেন ছবির মত সৌন্দর্যের চমৎকারিত্বে। এঁরা দুজনেই সম্ভবতঃ ক্রুসেডে সৈন্য হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন—অনেকের বিশ্বাস। না হ'লে ছবির মত ঘটনাগুলোকে অমনভাবে বর্ণনা করা শুধু শোনা কথার ওপর নির্ভর করে' চল্তো না।

তারপর দুজন তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ গীতিকবির রচনা-গৌরবে প্রথম যুগের ফরাসী সাহিত্য অলঙ্কৃত হয়। থিবাঁর্ড্ ক্যাম্পাগ্ন্ ও 'হুতেবাফ্' দু'জনেই সে যুগের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি ছিলেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না—নানা ছন্দের কবিতা লিখে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেযুগের 'জার্ণালিষ্ট' (journalist) বল্তেও ছিলেন তাঁরাই।

কাল্পলোকের কল্পনার মানসীকে ছেড়ে দিয়ে বাস্তব জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখ্তে সুরু কর্লেন "রোমান্স্-দা-রেনার্ড্"। এঁর কবিতা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল অভিনব বৈশিষ্ট্যের জন্য—প্রতিদিনকার সাধারণ ঘটনাকে ভিত্তি করে' ইনি কাব্য সৃষ্টি কর্তেন কাল্পনিক জন্তু-বিশেষের নাম দিয়ে। তাঁর কাব্যপ্রতিভার কথা না হয় বাদই দিলাম, সৃষ্টির মৌলিকত্ব হিসাবেও তিনি ছিলেন বিশিষ্ট অন্যতম।

তারপর হ'চ্ছে ফরাসী "ফেব্‌লা"র কথা।

সাধারণ মুর্জ্জোয়া-জীবনের কাহিনী বা ছোট গল্প সে যুগে 'ফেব্‌লা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও সে গীতিকাব্য-যুগে ছোটো গল্প বা কাহিনী বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ কর্তে পারেনি, তবু যে ক'জন প্রতিভাশালী লেখক ফেব্‌লার উৎকর্ষের চেষ্টা করেন "নিকোলেৎ"ই তাঁদের মধ্যে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। এঁর রচনার গতি ছিল দ্রুত, প্রকাশভঙ্গী ছিল মিষ্টি ও মাঝে মাঝে বিদ্রূপাত্মক। এঁর প্রতিভাপ্রসূত সৃষ্টিতে সাধারণতঃ সে যুগের লোকেরা তৃপ্তি ও আনন্দ পেতো; এজন্য তাঁর জনপ্রিয়তা বড় কম ছিল না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক ও উপদেশমূলক রচনারও সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হ'চ্ছে "রোমান্-দ্য-লা-রোজ্"। দুটি প্রতিভাশালী লেখক এই বইখানিকে কবিতার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা দেন—"গিলাম্-দ্য-লরিস্" লেখেন চল্লিশ হাজার লাইন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে; এর পঞ্চাশ বছর পরে "জিন্-দ্য-ম্যাঙ্" লেখেন আঠারো হাজার লাইন। গিলামের রচনা উদ্দেশ্যমূলক, আর জিনের রচনা আধ্যাত্মিক। এই রচনা দু'শো বছর ধরে' জনসাধারণের মুখে মুখে সজীব হ'য়ে থাকে।

তারপর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইতিহাস ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রচনার সৃষ্টি হয়। "ফ্রয়ভার্ত" লেখেন প্রকৃত ইতিহাস আর বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার গার্সন প্রথম ধর্ম্মসম্বন্ধে বই লেখেন—Imitation of Christ। আজও খৃষ্ট-ধর্ম্মীদের মধ্যে এ বইখানির বিশেষ আদর আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা—।

কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হয় "ফ্রাঁসোয় ভিলন্"এর প্রতিভাপ্রসূত সৃষ্টিতে। কবিতায় মধ্যে ব্যঙ্গ, রসিকতা, আবেগ, কারুণ্য ও বীরভাব সৃষ্টি কর্তে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এঁর জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ—একাধারে ইনি বন্দী, হত্যাকারী, তস্কর ও কবি ছিলেন। যখন ফাঁসীর সম্ভাবনা ঘটে, আসন্ন সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও সেই সময়ে এঁর বিখ্যাত কবিতা L'Epitaphe en forme de Balladটি লেখেন। এঁর এই দস্যু-জীবনের জন্যই বোধ হয় এর নামের শেষে 'ভিলন্' কথাটি যোগ করা আছে—এটি হয়তো villainএরই অপভ্রংশ।

এই শতাব্দীতে নাটক লেখ্বার চেষ্টাও চলে—বিয়োগান্ত মিলনান্ত, ব্যঙ্গাত্মক, জাতীয়, ঐতিহাসিক, রহস্যময়—সকল ভাবেরই নাটক সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে এই যুগে। এই নাট্য-সাহিত্যে পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেন—আংশিকভাবে কৃতকার্য্যও হন সে যুগের খ্যাতনামা নাট্যকার "ফিলিপ দ্য-কমিনস্"। শুধু নাট্যকার বল্লেই এঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না, ফরাসী-রাজ একাদশ লুইয়ের রাজত্বকালে ইনি ছিলেন রাজ-ঐতিহাসিক। রাজনীতিবিদ্ বল্তে যে চিন্তাশীলতা,

ধীরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি থাকা দরকার তা এঁর ছিল—সবার উপরে ছিল এঁর আভিজাত্যের গর্ব্ব। ইনি চৌষট্টি বছর জীবিত ছিলেন—চৌদ্দ-শো-সাতচল্লিশ থেকে পনেরো-শো-এগারো খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের যুগ ঘনিয়ে এল। নতুন ভাবধারার সংমিশ্রণে পুরাতনের সংস্কার-শুদ্ধি করতে হবে, বদ্ধমূল চিন্তাধারার সঙ্গেই সদ্যোজাত স্বভাবজ মনোমেষের স্থান হবে,—শাশ্বতের ভিত্তি শক্ত করতে হবে আধুনিকতার যুক্তিতর্কের সঙ্গে মিলিয়ে;—এই হ'চ্ছে রেনেসাঁসের মূল কথা। অতীত ভাবধারার মশালকে বর্ত্তমানের হাওয়ায় তুলে ধরা শুধু। এই যুগের সর্ব্বপ্রথম লেখক হিসাবে 'ক্লিমেন্ট্ মারো'এর নামই উল্লেখযোগ্য। এঁর পরেই বলতে হবে "সেন্ট্ গেলায়" আর "ক্লাডিয়স রাবেলায়"এর কথা। গেলায় খ্যাতিলাভ করেন বিশিষ্ট অনুবাদক হিসাবে; বহু ইতালীয়ান সনেটের ইনি অনুবাদ করেন। আর রাবেলায় দুখানি গদ্য-কাব্য লিখে খ্যাতিলাভ করেন—Gargantua ও Pantagruel। প্রথমখানি লেখেন পনেরো-শো-তেত্রিশ খৃষ্টাব্দে, আর দ্বিতীয়খানি তার দু'বছর বাদেই। এঁর বর্ণনাভঙ্গী ভালো হলেও ভাষা মাঝে মাঝে অত্যন্ত কূট। আরও, দর্শনবাদের শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও যুক্তিতর্ক ও খিওরীর শেষ নেই। এ সব দোষ-ত্রুটি থাকলেও চরিত্র সম্বন্ধে এঁর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও লিখন-পদ্ধতি সুন্দর। ফরাসী সমালোচকরা এঁকে সেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে তুলনা করেন, বলেন, মানব-জীবনকে দেখবার শক্তি ছিল এঁর সেক্‌স্‌পীয়রের মতই।

ষোড়শ শতাব্দীর এই প্রথমভাগেই একদল তরুণ কবি দলবদ্ধ হন নবভাবধারার প্রবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ নিয়ে—এঁদের মধ্যে রোঁসার্ড, বেলে, পন্তাস্-দ্য-ত্যার্ড, বোক্, জোডেল্, ডায়াৎ, লেবে—এই ক'জন ভবিষ্যতে খ্যাতিলাভ করেন। এঁদের লক্ষ্য ছিল ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে যে সব শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ আছে, আধুনিক সাহিত্যে সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি করা। গতানুগতিক তদানীন্তন রচনা-পদ্ধতিকে এঁরা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। এঁরা চেয়েছিলেন নূতনভাবে সৃষ্টি করতে, প্রকাশভঙ্গীকে ঝোরালো ও শুদ্ধ করতে। ফরাসী সাহিত্যের বুকে এঁরা বিপ্লব ঘটিয়ে তোলেন এবং ফরাসী সাহিত্যের সত্যিকারের নবযুগের সৃষ্টি করেন এঁরাই।

এই দলটির নাম প্যাড।

এই দলটির মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিল রোঁসার্ড, বেলে ও লেবের। প্রসিদ্ধ গ্রীক কবি পিণ্ডারের অনুকরণে রোঁসার্ড কবিতা লিখতে সুরু করেন—চমৎকার নির্দ্দোষ লিরিক্ কবিতা। বেলের কবিতায় যে লালিত্য পাওয়া যায় তা ফরাসী সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ভিন্ন সাহিত্যে অমন লালিত্য নেই। আর লেবের কবিতা সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—লেবে ষোড়শ শতাব্দীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীকবি ছিলেন।

রেনেসাঁসের যুগে গদ্যসাহিত্যেও নামকরা অনেকে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মনটেগন অন্যতম। 'এসে' (essay) বলতে যা বুঝি—তা এঁরই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি। জ্ঞান ছিল এঁর অনন্যসাধারণ, পাণ্ডিত্যের গর্ব্বও ছিল যথেষ্ট। উদাহরণ প্রয়োগ করতেন ইনি অক্লান্ত ভাবে অনবরতঃ, আর বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠাতেই অন্যের লেখা উদ্ধৃত না করলে এঁর লেখনী যেন অগ্রসর হ'তে চাইতো না। ছোট ছোট করে' সংক্ষেপে কিছু বলতে ইনি শেখেন নি—বড় বড় শব্দবিন্যাসে বড় বড় বাক্য না লিখলে, স্বপ্রতিভার উপযুক্ত স্ফুরণ হোল না বলে' ইনি মনে করতেন। আধুনিক বলতে আমরা এখন যা বুঝি ইনি তারই সূচনা করে' গ্যাছেন ফরাসী গদ্য-সাহিত্যে। লেখার যা নাম দিতেন তাতে রচনার মর্ম্মগত বিষয় সম্বন্ধে কোন ধারণাই হ'ত না। আধুনিকদের মতই রচনাকে ইনি সহজ ও ঝোরালো করতে চেয়েছিলেন—স্বতঃস্ফূর্ত্ত লেখনীর গতিকে সংযত করতে চেষ্টা করেন নি কোথাও। সরল গতিশীল ধারায় অনেক গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ ইনি ফরাসী ভাষায় পরিবেষণ ক'রে স্বদেশী সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইনিই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ লেখক, পনেরো-শো-তেত্রিশ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মান, পনেরো-শো-নিরানব্বই খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

এইখানেই এই প্রবন্ধের যবনিকা ফেললাম। এর পর সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

অগ্নিশিখা

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

(১)

দিন ক্রমে প্রসন্ন হ'য়ে এল, অরবিন্দ স্বাস্থ্য ফিরে পেতে লাগ্‌ল। কিন্তু অলকার মনের গভীর ক্ষেদ এখনও যায় নি, এখনও সে স্বামীর সঙ্গে সকল বিষয় খোলাখুলি কথা বল্‌তে পারেনি, অরবিন্দও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি; তাই তার মনের ভার নামেনি, বোঝা হয়েই আছে।

অরবিন্দের আরোগ্যলাভের পর দু' একজন গ্রামের মাতব্বর এসে "কেমন হে বাবাজি, কেমন আছ?" ব'লে আপ্যায়িত ক'রে গেল। প্রতিবেশী মেয়েরা বড় কেউ আসেই না। মঙ্গলা কিছুদিন হ'ল চ'লে গেছে। একা একা অলকা হাঁপিয়ে ওঠে, সে বোঝে যে গ্রামের কেউ আর তেমন ক'রে তার কাছে আসে না, আগের মত আত্মীয়ভাবে তাকে আর তারা গ্রহণ কর্‌ছে না। অলকা হারিয়ে গিয়ে আবার হঠাৎ ফিরে এসে স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর কর্‌ছে এটা সকলের চোখে বেশ আনন্দদায়ক হ'ল না।

পুরুষদের মহলে, তাদের আড্ডায়, ছেলেদের গ্রাবে, মেয়েদের ঘাটের মজ্‌লিসে এই সব বিষয় বেশ গরম গরম আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল। পাড়ার সমাজনেতারা এ অন্যায় নীরবে সহ্য কর্‌তে একেবারেই নারাজ; যুবকেরা সমাজসংস্কারের দিক দিয়ে তর্ক কর্‌তে লাগল যে এতে অন্যায় কিছু নেই। মেয়েরা অলকার বেহায়াপনার নিন্দা ক'রে পথ-ঘাট মুখর ক'রে তুল্ল।

দিনকতক যেতেই অলকার কানে এই সব কথা কিছু কিছু আস্‌তে লাগ্‌ল। কেউ বাড়ী এলে পান জল নেয় না, অলকা বুঝ্‌ল, তার অদৃষ্টে এই লাঞ্ছনা সুনিশ্চয়। কোন সামাজিক কাজে, বিবাহে কি জাতকর্ম্মে তাদের নিমন্ত্রণ হয় না। পাশের বাড়ীর প্রতিপাল মজুমদারের মেয়ে শৈলজা সর্ব্বদা তার কাছে আস্‌ত, এ পর্য্যন্ত সেও একবারও আসেনি, কিন্তু সে অলকাকে কি ভালই বাস্‌ত! সকলের অবজ্ঞা যে তাকে বইতে হবে একথা মনে ক'রে তার চোখ জলে ভ'রে আসে। নিজের মনে মনবলা হ'য়ে থাকে, অরবিন্দের সঙ্গেও প্রাণ খুলে মিশতে পারে না, কোথায় যেন কে কেটে তাদের আলাদা ক'রে দিয়েছে!

সেদিন রবিবার। পাড়ার পুরুষদের আপিস কাছারীর তাড়া নেই, সকলে একে একে অরবিন্দের বৈঠকখানায় এসে হাজির হ'তে লাগ্‌লেন। রামকিঙ্কর, ব্রজমাধব, গিরিশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গণ্যমান্য লোককে একত্রে ঘরে আস্‌তে দেখে অরবিন্দ বুঝ্‌ল তাঁরা আস্‌ছেন যুদ্ধ কর্‌তে! ঘরে আস্‌তেই অরবিন্দ বল্লে, "আসুন আসুন বসুন, বস্‌তে আজ্ঞা হউক—" ইত্যাদি ব'লে সকলের পায়ের ধূলা নিয়ে সম্ভ্রম সৌজন্যে একপাশে বস্‌ল। বৃদ্ধেরা বল্লেন, "এইতো বস্‌ছি, তুমি রোগা শরীরে ব্যস্ত হ'য়ো না। যে কাণ্ডকর্ম্ম—কতকার মনে করি আসি তা হ'য়ে উঠে না। বাবাজী এখন কেমন আছ?"

"আজ্ঞে আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখন অনেক ভাল আছি।"—অরবিন্দ রঘুকে ডাক দিয়ে বল্লে, "যা ভিতর থেকে পাণ এনে দে, আর তামাক দে এঁদের।"

রামকিঙ্কর বল্লেন, "না, না, পাণ তামাকের দরকার কি?"

রঘু পাণ এনে দিয়ে তামাক আন্‌তে গেল; কিন্তু পাণ কেউ নিলেন না দেখে অরবিন্দ কথার অবতারণা করে বল্লে, "আপনারা কি আমার বাড়ীতে পাণ জল গ্রহণ অন্যায় মনে কর্‌ছেন?"

গিরিশ শর্ম্মা হেসে বল্লেন, "হ্যাঁ, না না বাবাজী, কি জান শাস্ত্রে আছে চাতের জল শুদ্ধ না হ'লে ঐ কি বলে যেন—ঐ বউমা'ই তো পাণ জল যেন, তা দেখ এখন দরকার কি এ সব?"

"আপনারা বরাবর তাঁর হাতের জল পাণ এমন কি

অন্ন-ব্যঞ্জন খেয়েও তৃপ্ত হ'য়ে গেছেন, তাঁর এমন কি দুর্ভাগ্য হ'ল যে পাণটুকুও আপনারা গ্রহণ কর্লেন না ?"

ব্রজনাথ এগিয়ে বল্লেন,"যদি কি বাবাজি, রাগ ক'রোনা, এসব শাস্ত্রের বিধি ! আমরা হ'লাম গ্রামের মাথা. দশখানা গ্রাম আমাদের বিধি নিষে চলে। তোমরা বনিয়াদি ঘর তেমন কিছু বল্তে পারি না.না হ'লে কি এমন ক'রে গাঁয় বাস করা চল্ত ? ঐ সেবার পরাণ রক্ষিতের ছেলের বউকে ঘাট থেকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, তা কই পেলে সে বউ নিয়ে ঘর কর্তে ? ও যে শাস্ত্রে চবার যো নেই ; স্ত্রীজাতি বড় পবিত্র কিন্তু একবার হস্তান্তর হ'লেই তা আর গ্রহণযোগ্য থাকে না। তবে তুমি জ্ঞানী বিদ্বান ছেলে, তুমি কিছু না বুঝে' কর্বে না, এই আমাদের ভরসা।"

অরবিন্দ বল্লে, "হাঁ, বুঝ্লাম সবই। আপনাদের শাস্ত্রের দোহাই যে আজ সমাজের কত ক্ষতি কর্ছে তা আপনারা দেখেন না সেই জন্য আজ সোনার বাংলা শ্মশান হ'তে চলেছে। ওদের খুঁজ্তে বা'র হ'য়ে দেখেছি সমাজ কোথায় নেমেছে ! বহু সমাজ-পরিত্যক্তাদের পল্লীতে ঘুরেছি, দেখেছি এমনি ক'রে কত ঘরের লক্ষ্মী বিনা দোষে, সামান্য দোষে, এমন কি বউ রাগী, বউ অবাধ্য, বউএর ছেলে হয় না—এই সব দোষ ধরাতেও কত জন ঘরের আশ্রয় থেকে পথে দাঁড়িয়েছে। তাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন ক'রে ঘরে তুলে নেবার জন্য সমাজে মাতব্বর নেই কিন্তু অন্যায়ের পক্ষে সায় দিতে লোকের অভাব হয় নি। সমাজে আশ্রয় পায় নি তাই তাদের পেটের ভাত জোগাতে গিয়ে বসেছে পাপের পাঁকে ব্যবসা খুলে' ! কি বল্ব, আপনারা গুরুজন, আজ আমায় একঘরে করেছেন, কর্তে পারেন, বেশী উৎপাত হয় দেশ ছেড়ে চ'লে যাব, কিন্তু বিনা দোষে সন্তানের মা, স্বামীর স্ত্রী যে, তাকে ভিটেছাড়া ক'রে কোন পুণ্য আমি চাই না।"

অরবিন্দ দেখেনি অনেকগুলি নবীন ও প্রবীণ এর মধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছেন।

রামকিঙ্কর আরক্ত মুখে ব'লে উঠ্লেন, "এ তোমার অন্যায় আব্দার, সমাজে শাসন না কর্লে চলে ? আজ একজন অন্যায় ক'রে অবাধে ঘরে এলে, কাল আর একজন আস্বে, তা হ'লে ঘরের পবিত্রতা থাক্বে কি ক'রে ?"

বৃদ্ধেরা মাথা নেড়ে বল্লেন,"ঠিক বলেছেন, এ যে সংসারাশ্রম, বড় কঠিন ঠাঁই !"

অরবিন্দ হাত জোড় ক'রে বল্লে, "অপরাধ নেবেন না, আত্মপ্রসংকোচে আমার মনেও ঠিক এই ধারণা ছিল, কিন্তু প্রথার আগুনে পুড়ে' সংসারের যে চিত্র দেখে এসেছি তাতে বুঝেছি ধর্ম্ম কি কেবল স্ত্রীলোকের বেলায় ? যে দুরাচারেরা এমন অসহায় অবলাদের শত ছলে নির্য্যাতন কর্ছে তারা কি পাপী নয়, বাচস্পতি মশায় ? তারা তো পুরুষ, কোন্ বিধান তাদের জন্য সমাজ রেখেছে ? দুরন্ত পুরুষ শক্তির কবলে প'ড়ে যে অবলা ভীতা পল্লীমেয়েরা নিত্য চোখের জলে পৃথিবীর বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে তারা কি স্বেচ্ছায় এই পাপের পথে যায় ? ক'জন মেয়েকে আপনারা জানেন যে নিজের পতনের পথ নিজে তৈরী করেছে ? বলুন, সকলের ঘরেই এ বোধ আছে, সকলের ঘরেই স্ত্রীকন্যা আছেন, বলুন—তাঁদের দিয়ে কি কোন অন্যায় হ'তে পারে কেউ বিশ্বাস করেন ?"

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব'লে উঠ্লেন "এ তোমার কেমন কথা ভদ্রঘরের স্ত্রীকন্যাদের নিয়ে ?"

"কেন আমার স্ত্রী কি ভদ্রপরিবারের স্ত্রী—কন্যা নয় ? সে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে, গাঙ্গুলী বাড়ীর পুত্রবধূ, সে যদি চক্রান্তে প'ড়ে কোন দুর্গতি ভোগ ক'রে এসেই থাকে, তবে তাকে ত্যাগ করার কি আছে ? যদিও আমি জানি যে কোন আত্মীয় ভাইয়ের কাছে ছিল, আমার খোঁজ পায়নি তাই এখানে আস্তে পারে নি। কিন্তু সে কথা সমাজ বিশ্বাস কর্তে চাইবে না, আমি তার পক্ষে ওকালতীও কর্ব না, কেবল আমি চাই আমার মত যারা এমন বিপদে প'ড়ে অনায়াসে সমাজের ভয়ে পতিপ্রাণাকে, সন্তানের জননীকে বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করে, তারা নিজেরাই অনাচারাচারী, তাদের সঙ্গে কোন যোগ না থাক্লেও আমি দুঃখিত হব না।"

ব্রাহ্মণমণ্ডলী রাগে কাঁপ্তে কাঁপ্তে বল্লেন, "কি এত বড় অপমান !—আমাদের সঙ্গে কোন যোগ রাখ্বেন না ? আজ চৌদ্দ পুরুষ তোমাদের এখানে বাস, তোমার মুখে এতবড় কথা। বেটা ধরাকে,—লেখাপড়া শিখে বুলি শিখেছ, লঘু-গুরু জ্ঞান সব চ'লে গেছে। যত সব নাস্তিক পাষণ্ড

সমাজে তৈরী হ'চ্ছে! চল হে, ওর ছায়া মাড়ানও উচিত নয়। বল্‌তে এলাম ভাল কথা তা উল্টে অপমান?—একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লেই হ'ত তা নয় যত ইংরাজী চাল!"

প্রবীণ দল উঠে যায় দেখে অরবিন্দ বল্‌লে, "আপনাদের অপমান আমি করিনি কিন্তু আপনারা বৃদ্ধ হ'য়ে আবার ঘরের স্ত্রীকে যে অপমান কর্‌তে এসেছিলেন আমার জীবন থাক্‌তে তা হবে না এইটুকুই কেবল আপনাদের বুঝিয়ে দিলাম। পরাণ রক্ষিত গরীব, সপরিবারে খৃষ্টান হ'য়ে গেছে, সে খবর রাখেন তো? হারাণ মণ্ডলের বিধবা মেয়েকে মুসলমানে নিয়ে গিয়ে নিকে করেছিল তাই সমাজ তাদের নেয় না; তারা সমাজের বাইরে আছে। এই ক'রে ক'রে ক্রমে হিন্দুসমাজ ধ্বংস হ'য়ে আস্‌ছে। তা যদি আজ দেখ্‌তে পেতেন, তবে বুঝ্‌তেন যে আর কিছুদিন পরে পূজার নৈবেদ্য যোগান এমন হিন্দুও বাংলায় থাক্‌বে না।"

অরবিন্দের কথায় বৃদ্ধের দল কিছুমাত্র শান্ত না হ'য়ে ঘর ছেড়ে সব চ'লে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

কেন্দ্রসমিতির কথা

কল্যাণী-সঙ্ঘ

সিংভূম জেলান্তর্গত চক্রধরপুর গ্রামের প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলারা নিজেদের কল্যাণকামনায় "কল্যাণী-সঙ্ঘ" নামে একটি মহিলাসমিতি গঠন করিয়াছেন। উক্ত সঙ্ঘের নিমন্ত্রণে কেন্দ্র সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী গত ২০শে জুলাই সেখানে যান। ২১শে জুলাই স্থানীয় ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট হলে সঙ্ঘের উদ্যোগে মহিলাদের একটি সভা হয়। পণ্ডিত মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে শরীরপালন, ব্যায়াম, শিশুকল্যাণ ও ধাত্রীবিদ্যা এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে মাতৃত্বের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সঙ্ঘ একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং কেন্দ্র সমিতি তাঁহাদের শিল্পশিক্ষার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।

বেলতলা বালিকাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা

গত ২৩শে জুলাই বেলতলা বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের একটি সভা হয়। কেন্দ্র সমিতির প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী এম্‌-এ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে "নারীমঙ্গল প্রচেষ্টায় ছাত্রীদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রায় ৪০০ শতের বেশী ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

চাকুরিয়া মহিলাসমিতি

গত ১লা আগষ্ট চাকুরিয়া মহিলাসমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। স্থানীয় সভানেত্রীই সভানেত্রীত্ব করেন। কয়েকটি বালিকা উদ্বোধনসঙ্গীত করিয়া ব্যায়াম, ড্রিলিং, পোলষ্ট্রিল, আবৃত্তি, ছোরা খেলা ও লাঠি খেলা প্রদর্শন করে। বালিকাগণ খুব ছোট ছোট হইলেও ক্রীড়াকার্য্যে খুব নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছে। কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী এম্‌-এ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে মহিলাসমিতির উপকারিতা, শিশু-কল্যাণ ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীনিকেতন মহিলাসমিতি

শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের কর্তৃপক্ষ বাঁধগোড়া-গত মহিলাসমিতি নামে মহিলাদের শিল্প-শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। তাহার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা ননীবালা রায় উক্ত সমিতিকে কেন্দ্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

দেরাদুন মহিলাসমিতি

দেরাদুন-প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলারা পরস্পর মিলন-কেন্দ্র রূপে দেরাদুনে একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রতিমা রায় উক্ত সমিতিকে কেন্দ্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

সরোজনলিনী শিল্পবিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

কলিকাতা সহরে বহুগুলি শিল্পবিদ্যালয় আছে, বিশেষ করিয়া যে সকল বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র মহিলারা নানাবিধ শিল্প শিক্ষা করেন, তাহার কোনটিতেই চিত্রণ বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে না। ছাত্রীরা সেলাইয়ের কাজে বা আসন, কার্পেট প্রভৃতি বোনার কাজে, নূতন ঠাটের (design) জন্য মাথা খাটাইতে শেখে না। কেবলমাত্র পূর্ব্বাবিষ্কৃত ঠাটেরই (design) পুনরাবৃত্তি করে। চিত্রণ বিদ্যার জ্ঞান না থাকায় এবং গোড়া হইতে এইরূপ নকলনবিশিতে হাত পাকাইয়া ফেলায় চির জীবনের জন্য নূতন কিছু গ্রহণ বা প্রকাশের ক্ষমতা প্রত্যেক ছাত্রীর ভিতর হইতে অন্তর্ধান করে। শিক্ষাকাল (course) শেষ হইলে দেখা যায় যে ছাত্রীরা কেবল মাত্র পদ্ধতিটাই (technique) শিখিয়াছে, কিন্তু এই বহু সাধনালব্ধ পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা নূতন কিছু করিবার ক্ষমতা পায় নাই। হয় কোন পুস্তক হইতে না হয় কোনও 'ঠাট' হইতে নকল করিয়া কাজ চালাইতে শিখিয়াছে। এই শিক্ষার কুফল সমস্ত জীবন ধরিয়াই প্রত্যেক ছাত্রীরই বহন করিয়া চলিতে হয়। সরোজনলিনী শিল্পবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা একটি নূতন বিভাগ খুলিয়া যাহাতে প্রত্যেক ছাত্রী চিত্রবিদ্যার পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া, নিজেই প্রত্যেক জিনিষের 'ঠাট' (design) অঙ্কিত করিয়া লইতে শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধাংশু-কুমার রায় চিত্রণ বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার যেমন আধুনিক শিল্পে (modern art) গভীর পটুতা তেমনি বাংলার প্রাচীন লোকশিল্পের (folk art) জীবন্ত ধারার (living tradition) সহিতও পূর্ণ সংযোগ রহিয়াছে। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আল্পনা, দেয়াল-চিত্র (mural painting), বিভিন্ন পদ্ধতির বাংলার নিজস্ব লোককলা প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষাদান করিবেন।

সভাপতির সম্বর্দ্ধনা

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সভাপতি মাননীয় রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বর্ত্তমান বর্ষে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সর্ব্ববিধ জনসেবার কার্য্যে রাজা বাহাদুর বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইয়াছেন। গত ৮ই আগষ্ট তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের আনুকূল্যে গ্রাণ্ড হোটেলে একটি ভোজ-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রাজা বাহাদুরের এই নূতন সম্মানলাভে আমরা খুসী হইয়াছি।

কমিটির সদস্য

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে কেন্দ্র সমিতির পরিচালক-সভায় ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের স্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

পরিচালক-সভার সদস্য—কুমার শ্রীযুক্ত বিমলকুমার মিত্র।

স্কুল কমিটির সদস্য শ্রীযুক্তা মৃণালী রায়।

অভিনয় কমিটির সম্পাদক—মিঃ টি, সি, বোস।

বঙ্গলক্ষ্মী পরিচালন কমিটি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ "বঙ্গলক্ষ্মী" পরিচালন কমিটির সদস্য হইয়াছেন :—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (সভানেত্রী), শ্রীযুক্ত মনোজ বসু (সম্পাদক), ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস, শ্রীযুক্তা দীপ্তি দেবী, বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস।

চন্দ্রমাধব ঘোষ স্মৃতি তহবিল

চন্দ্রমাধব ঘোষ স্মৃতি-তহবিলে এ যাবৎ নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

মিঃ এন্, বক্সী
ডাঃ এইচ, এন, রায়
শ্রীযুক্ত মনোজ বসু
শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল
শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী রায়
৭। শ্রীযুক্তা সুহাসিনী চৌধুরী ১৲
৮। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র গুপ্ত ২৲

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে :—

১। জনৈক বন্ধু
২। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত
৩। মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী
৪। চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ
৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বক্সী
৬। রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। শ্রীযুক্তা নীরদবাসিনী সোম
৮। মিঃ এইচ, কে, দে, বার-এট্-ল
৯। রায় বাহাদুর আই, এস, মুখার্জ্জি
মিঃ টি, সি. বোস
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
মিসেস ফাজিতুন্নেসা মোহা
শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে
ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী পি, এইচ, ডি

বঙ্গলক্ষ্মীর বিজ্ঞাপন-দাতাদের প্রতি

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের বঙ্গলক্ষ্মী আগামী ১০ই আশ্বিন বাহির হইবে। অতএব বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁহাদের মেয় বঙ্গলক্ষ্মীর বিজ্ঞাপনের নূতন কপি আগামী ২রা আশ্বিনের পূর্ব্বে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের আফিসে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। প্রত্যেক নূতন কপির উপর লিখিয়া দিবেন আশ্বিন মাসের কপি, কার্ত্তিক মাসের কপি।

বিজ্ঞাপন-কার্য্যাধ্যক্ষ।

১৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
অনেক বন্ধু
শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য

চন্দ্রনাথ বাবুর অনেক পরিচিত বন্ধুবান্ধব আছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডারে কেহ কিছু দিবার ইচ্ছুক হইলে চন্দ্রনাথ স্মৃতি-তহবিলের সম্পাদক মিঃ টি, সি, ঘোষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২৲

স্থান পরিবর্ত্তন

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কার্য্যালয় ও নারী শিল্প শিক্ষালয় আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ৪৫নং বেনিয়া টোলা লেনের বাড়ী ছাড়িয়া ৬৷১ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে যাইবে। বর্ত্তমান গৃহে স্থানাভাব হওয়ায় কর্তৃপক্ষ কিছুদিন যাবৎ বৃহত্তর গৃহের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নূতন বাড়ীতে বর্ত্তমান বাড়ীর অপেক্ষা তিনগুণ স্থান আছে।

গ্রীষ্মে সৌন্দর্য্য রক্ষার উপায়

গ্রীষ্মকালেই সুন্দরীদের বড় অসুবিধা হয়। প্রখর রৌদ্রতাপে তাঁহাদের কমল কোরকের মত মুখখানি ম্লান হইয়া পড়ে—সমস্ত শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়—ফলে গাত্রে দুর্গন্ধ জন্মে ও সর্ব্বগাত্রে ঘামাচি কুষ্ঠুড়ী ও ব্রণ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়।

এই সমস্ত উপদ্রবের হাত হইতে নিজেকে ও নিজের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার উপায় প্রাতঃকালে স্নান করা—স্নানের সময় উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিবেন—উৎকৃষ্ট সাবান বলিলে বাঙ্গালার শিক্ষিতা সুন্দরীরা হিমানীর চন্দন সাবানই বুঝেন; কারণ ইহার মত মধুর গন্ধ ও তৃপ্তি অন্য সাবান দিতে পারে না—চন্দন সাবান অনেক রকম আছে কিন্তু 'হিমানী চন্দন' একই রকম—দোকানদারের প্ররোচনায় অন্য সাবান খরিদ করিবেন না। স্নানান্তে দেহের সর্ব্বত্রে হিমানি টাল্ক পাউডার ব্যবহার করিবেন—হিমানী টাল্ক পাউডার অনেক রকম গন্ধের পাওয়া যায় তন্মধ্যে 'চন্দন' 'বস' ও হিমানী গ্রীষ্মকালের উপযোগী।

মুখে হিমানী স্নো বা হিমানী ভ্যানিসিং ক্রীম ব্যবহার করিলে সারাদিনের উত্তাপে মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইবে না।

সন্ধ্যায় গা ধুইবার সময় হিমানীর খস্ খস্ সাবান ব্যবহার করিবেন ও মাথায় তৈলের পরিবর্ত্তে "ভেলভেট ফ্লেয়ার ক্রীম" ব্যবহার করিলে মস্তক (Scalp) পরিষ্কার থাকিবে ও খুস্কী মরামাস প্রভৃতি জন্মিবে না।

যাঁহাদের মাথায় বড় শীঘ্র শীঘ্র ময়লা জন্মে তাঁহাদের উচিত "শাম্পানী" নামক হিমানীর প্রস্তুত অভিনব শাম্পু (ফেণ যাবেন) ব্যবহার করা।

যাঁহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় তাঁহাদের জন্য হিমানীর প্রস্তুত "আইওডিন ডেণ্টাল ক্রীম" নিত্য ব্যবহার করিলে ইহা পাইওরিয়ার প্রতিষেধক ও নিত্য ব্যবহারের জন্য হিমানীর নিম ডেণ্টাল ক্রীম বিশেষ প্রচলিত। আজই নিম্নের ঠিকানায় কিনিয়া ঠকিবেন না। হিমানীর জিনিসগুলি চিরদিনই বিখ্যাত।

প্রচারক—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং ৪৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

"জাগরণী"

[চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয়ের সৌজন্যে]

শিল্পী—শ্রীঅচ্যুত চিত্তকর।

বঙ্গলক্ষ্মী

"বাঁচলে সবাই তবেই বাঁচি,—
সবার ভালো তাই ত' যাচি।"

৭ম বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৯ [১২শ সংখ্যা

মহাশুচি

এস হে আমার দেশের মানুষ
ভেদের কলুষ ফেলিবে ধুয়ে,—
শত প্রাণে প্রাণ মিলিছে যেথায়
মিলিবে সেথায় মাথাটি থুয়ে।
করেছিলে শুচি আপনার দেহ,
আপনার প্রাণ, আপনার গেহ,
সবাকারে ল'য়ে চল শুচি হ'য়ে
বিধাতার পায়ে পড়িবে নুয়ে।
আন সে তোমার আলোকের বাণী
সুপ্তি-ভাঙানি, আঁধার-নাশা,
মিলাইল যাহে দ্যুলোকে-ভূলোকে,
মানবের মুখে দিল যে ভাষা।
সবাকার সাথে যাও হে মিলায়ে,
নিজ সম্পদ দাও হে বিলায়ে,
মহাশুচিতার আলোক-পাথার
বারে বারে দ্বার গেল যে ছুঁয়ে।

বাঙলার ভাস্কর্য্যশিল্প

শ্রী মনমোহন নরসুন্দর

কোন জাতির শিক্ষা সভ্যতা ও সাধনার পরিচয় জানিতে হইলে তাহার সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির দিকে নজর দিতে হয়। সাহিত্য ও শিল্প উভয়েরই উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সাহিত্যে যাহা ভাষার বন্ধনে রসের সংমিশ্রণে সাহিত্যিকের লেখনী স্পর্শে সৌন্দর্য্যের প্রভাব প্রভাবিত হয় শিল্পী তাহাই তাঁহার তুলিকা ও কল্পনার সাহায্যে মানব মনের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য ও সুন্দরকে মূর্ত্তির মধ্যে প্রকাশ করেন।

জগতে প্রাচীন সভ্য দেশগুলির দিকে তাকাইলে নজর পড়ে এশিয়ার ভারতবর্ষ, আফ্রিকার ইজিপ্ট এবং ইউরোপে গ্রীসের দিকে গ্রীসের শিল্প-সভ্যতা অভিজাত্যের বার্ত্তা ইউরোপের দেশে দেশে যেমন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ভারতের সাধনার বার্ত্তাও তেমনি এশিয়ার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই সাধনার উপরে বাঙলার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা কাননকুন্তলা বাঙলার সঙ্গীত, তাহার শিল্পের ধারা, তাহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাব সকলের মধ্যেই একটা স্বতঃউৎসারিত সৌন্দর্য্যবৃত্তির পরিচয় ছিল। এমন ব্যাপকভাবে অনুশীলনের পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এদেশের বনে জঙ্গলে গ্রামে গ্রামে গাছতলায় গাছতলায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে পাহাড়ে পর্ব্বতে ভাস্কর্য্যের ছড়াছড়ি। সুন্দরের সাধনায় এরা যেমন করিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিল এমনটী আর কোথাও ঘটে নাই। এক একটা শিল্পী গোষ্ঠীই এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল আর আজও তাহার জের চলিয়া আসিতেছে।

এই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বাঙালীর একটা দরদ ছিল। দেশে যারা বিপদের অন্ত ছিল না। বিদেশীদের সঙ্ঘাতে, বিদেশীদের ধর্ম্ম-বিদ্বেষের প্রভাবে কত সুন্দর সুন্দর চিত্র, মূর্ত্তি ও মন্দির যে ধ্বংস হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তবুও তাহার নিজের সাধনাকে বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই সাধন প্রচেষ্টার ধারা বহন করিয়া আসিতেছে বাঙলার কুম্ভকার, পটুয়া ও ভাস্করের দল। ঢাকার পটুয়াটুলী, কালীঘাটের পটুয়াপাড়া, দাইহাট ও মুর্শিদাবাদের ভাস্করপল্লী, বীরভূমের পটুয়া ও চিত্রকর দল তাহারই শেষ নিদর্শন।

ভাস্কর্য্যের শেষ চিহ্ন ও ধ্বংসাবশিষ্ট মূর্ত্তিগুলিকে দেখিলে মনে হয় ঐ শিল্পচর্চ্চা পশ্চিম ও উত্তর বাঙলায় যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল পূর্ব্ব বাঙলায় তেমনভাবে হয় নাই।

ভারতবাসীর ভাস্কর্য্যবিদ্যার অনুশীলনের গোড়ার কথা আলোচনা করিতে গেলে কথা আসে ধর্ম্মভীরু ভারতবাসীর কোন ধর্ম্মগ্রন্থ তাহাকে মূর্ত্তিনির্ম্মাণে প্রেরণা দিয়াছিল। অনেকেই বেদকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। বেদে নানারূপ দেব দেবীর পরিকল্পনা আছে বটে কিন্তু বৈদিক যুগে মূর্ত্তি পূজার কোন প্রকার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বৈদিক যুগের পর উপনিষদের যুগ—তখন উন্নতিশীলতা ও রিভিশনিজম উভয়েরই প্রাধান্য ছিল, সেই হিসাবে উপনিষদ কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিল। বৌদ্ধ যুগেই ইহার প্রসার বাড়িয়াছিল। বৌদ্ধরা নিরাকারবাদী হইলেও অঙ্গোপাসনার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই। চিতাভস্মের উপর স্তূপ নির্ম্মাণই তাহার প্রমাণ। নির্ব্বাণ-কালে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে প্রভো, আমরা তথাগতের মৃতদেহের কিরূপে সংকার করিব?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন— 'হে আনন্দ! তথাগতের শরীর পূজা করিয়া নিজের মোক্ষের পথে বাধা উপস্থিত করিও না। নিজের মোক্ষের চেষ্টায় তুমি আত্মনিয়োগ কর। তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান অনেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং গৃহস্থ আছেন যাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।" ভারহুতের ও সাঁচীস্তূপের বেদীকার লিপিমালায় বোধিবৃক্ষরূপে চৈত্য-বৃক্ষের পূজা ও স্তূপ পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও পর্য্যন্ত কোন প্রকার মূর্ত্তির উদ্ভাবন হয় নাই। ভাস্কর্য্য কলার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুঙ্গ বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ইহা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে। সারনাথ, পাটলীপুত্র এবং বিদিসার ভগ্নাবশেষের মধ্যে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মথুরার শিল্পীরাই সর্ব্বপ্রথমে দেবদেবীর আকারের উদ্ভাবন করেন। বৌদ্ধমূর্ত্তি গান্ধারে গ্রীকমূর্ত্তি মথুরায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে শককুষাণ-প্রভাব আর্য্যাবর্ত্তে মূর্ত্তিপূজা প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা যাহাই করিয়াছিলেন কাল, গুপ্ত যুগের শিল্পীগণ করিয়াছিলেন তাহাতে সজীবতা ও অনুসন্ধিৎসুশক্তির সন্ধান।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর কালক্রমে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা বৌদ্ধমূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-কল্পে যে যে স্থানে বুদ্ধের চরণস্পর্শ হইয়াছিল সেই সকল স্থানে স্তূপ, মন্দির, চৈত্য বিহার প্রভৃতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের যতই প্রচার হইতে লাগিল ততই জনসাধারণের মনে বৌদ্ধপ্রভাব সজীব ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য বৌদ্ধ মূর্ত্তির প্রয়োজন হইল। সাকার উপাসনা বহুকাল হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। সেই হিসাবে মূর্ত্তিনির্ম্মাণের জন্য একদল শিল্পীশ্রেণীও এদেশে ছিল। বংশপরম্পরায় তাহারা ঐ কাজ করিত। যুগ-পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালার ঐ শিল্পীদের যে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের কাছে ডাক পড়ে নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে। অশিক্ষিত গতানুগতিক শিল্পী যে সব সময়ে নিজ পরিকল্পনায় ঐ সকল মূর্ত্তির রূপ দিয়াছিল তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহার জন্য ছিল সাধকের পরিকল্পনা। বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলির মধ্যে বাহিরের পরিণত দেহের সৌন্দর্য্য যেমন ফুটিয়াছে অন্তরের পবিত্র ধ্যানমগ্ন ভাবও তেমনি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালার সমস্ত মূর্ত্তির মধ্যেই এইভাব বিদ্যমান আছে। গ্রীসের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে মানুষের বহির্বাসকে ফুটাইয়া তুলিবার বাহাদুরী যথেষ্ট আছে কিন্তু অন্তরের সম্পদকে তাহারা ধরিতে পারে নাই। হিন্দুর দেবমূর্ত্তির মধ্যে উপাস্যের লক্ষণ বিদ্যমান; মুখমণ্ডলে ধ্যানমগ্ন উপাসকের ভাব। তখন ধার্ম্মিক যুগ মানবমনের অচল গুহার কোন গভীর অন্ধকারে সুপ্ত ছিল তাহা কল্পনা করা যায় না। অস্ত্রের সাহায্যে পাথর ও পর্ব্বতগাত্র খোদাই করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কত কঠিন তাহা এ যুগের পাশ্চাত্য শিল্পীরও ধারণার বাহিরে। রাজপুতের সোনার কাঠির পরশে রাজকন্যার মৃতসঞ্জীবে প্রাণসঞ্চারের মত সে যেন স্বপনপুরীর কাহিনী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"আমাদের দেশের ভাস্করেরা পাথরকে মোমের মত ব্যবহার করিতেন।"

মৃত্তিকা দ্বারা মূর্ত্তিনির্ম্মাণ আমার মনে হয় বহুকাল হইতেই দেশে প্রচলিত ছিল কিন্তু ভাস্কর্য্য বিদ্যার অনুশীলনে বৌদ্ধধর্ম্মই যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেশ বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে শিল্পীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল এবং ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পের অনুশীলন বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে ভাস্কর্য্য বিচিত্রভাবের পরিপোষক হইয়া সুন্দরতররূপে পারিপার্শ্বিক বিচিত্র ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া সাধারণের মনে নব নব ভোতনার উদ্রেক করিয়াছিল। ভাস্কর্য্যে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ গয়ার মন্দির, সারনাথের মন্দির, অজন্তার গুহা ও রান-গুহা তাহারি নিদর্শন। মিউজিয়ামে গেলে বৌদ্ধ ও বিষ্ণু-মূর্ত্তিই বেশী দেখা যায় উহা বৌদ্ধ ও সনাতন হিন্দুযুগের সুকুমার মনোবৃত্তি ও শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার পরিচয়।

মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত অন্যান্য বহু পদার্থের মধ্যে ভাস্কর্য্যগুলিও প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে ভাস্কর্য্য বিদ্যার অনুশীলনে ভারতীয়েরাই অগ্রণী। বাঙালী শিল্পীরও প্রভাব কম ছিল না। কবি জন্মভূমির এই শিল্প সাধনার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন—

> স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরোবুদুরের ভিত্তি
> শ্যাম কম্বোজে ওঁকার ধাম মোদের প্রাচীন কীর্ত্তি।
> খোমানের ধনে মূর্ত্তি দিয়াছে আমাদের ভাস্কর
> বীটপাল আর ধীমান যাদের নাম অবিনশ্বর।

ভাস্কর্য্যে বাঙালী শিল্পীর এই কৃতিত্বের কথা শুনিলে স্বভাবতঃ মনে আসে কেমন করিয়া বাঙলায় উহার প্রবাহ আসিয়া লাগিল এবং কিরূপেই বা তাহার প্রসার হইল। নদনদী মেখলা শ্যামা বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক অবস্থানই বাঙালীকে সত্যশিবসুন্দরের সাধনায় নিয়োজিত করিয়া-ছিল। বৌদ্ধযুগের সময়ে তক্ষশিলা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শীলভদ্র ও অতীশ উভয়েই বাঙালী

ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে ও প্রেরণায় বাঙালী শিল্পী যে বিভাবে গিয়া শিল্পসাধনায় মনোনিবেশ করে নাই তাহাই বোধ হয় বলিতে পারে। শিল্পপ্রাণ বাঙালীর সেখানে সর্ব্বাগ্রে ডাক পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পাথর খোদাই কাজে পঞ্চকালের মধ্যে যখন তাহারা কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল তখন একদিকে বৃহত্তর বাঙলার শিল্প ও অপর দিকে ভারতের সাধনা ও শিল্প লইয়া বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তীকালে যখন পালরাজারা বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন সারা বাঙলা বৌদ্ধ প্রভাবে ছাইয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে বহুপরিকর হন ও ভাস্কর্য্য অনুশীলনে বাঙালীকে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা নিজ রাজধানীর বড় বড় মন্দির ও বৌদ্ধমূর্ত্তিতে পরিশোভিত করিলেন। বীটপাল ও তৎপুত্র ধীমানের অমর তুলিকা স্পর্শে সারা বাঙলায় নূতন শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। বংশানুক্রমে তাঁহার অনুশীলনও কিছুদিন চলিল। পালরাজাদের পরে সেন রাজাদের সময়ে শৈবধর্ম্ম হিন্দুতান্ত্রিকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মও তাহার প্রাচীন আদর্শ হারাইয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হইল। একটি অপরটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কে কোনটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান সুরু হয়, পরে কালক্রমে তাহার প্রবল তরঙ্গাভিঘাত বৌদ্ধরা সহ্য করিতে পারিল না নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নিজেদের ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিল। কৃষ্ণানন্দ পূর্ণানন্দ প্রমুখ বাঙলার তান্ত্রিকগণ তখন বৌদ্ধ গৃহস্থদিগকে তান্ত্রিকতার দিকে টানিতেছিল। পূর্ণানন্দ প্রচার করিয়াই বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজার বিধি বিধানাদি রচনা করিতেছিল। শীতলা, ষষ্ঠী, বিশালাক্ষী, তারা এগুলি বৌদ্ধদেরই পরিকল্পিত। অনার্য্য দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বাহিরে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে কুমারী পূজা, পরকীয়া চর্চ্চা, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ইত্যাদি নানা ব্যভিচারের আকারে ধর্ম্মের ও সাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইল। এমনি বিপর্য্যয়ের সময়ে রামাই পণ্ডিত নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমন্বয় সাধনে ইচ্ছা করিয়া সহজের প্রচলন চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ সাক্ষাৎ বুদ্ধকে ধরিলেন, হিন্দু দেবদেবীকে অস্বীকার করিলেন না—

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি দেবগণে
এক মনে স্তব করে দেব নিরঞ্জনে।

শিব বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাকে এবং নিজকে আবরণ দেবতার আসনে বসাইলেন, স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

কলিযুগের পণ্ডিত রামাই
কলিযুগের ভাই শুনার উপায়।

এইরূপে পরোক্ষভাবে তিনি হিন্দুতান্ত্রিকতার সাহায্য করিলেন। তিনি ধর্ম্মঠাকুরের পুস্তক লিখিলেন, তাঁহার রচিত ছড়া সহযোগে ধর্ম্মপূজা চলিতে লাগিল। শিবের গাজন ধর্ম্মের গাজন সেই প্রচেষ্টা এখনও বহন করিয়া আসিতেছে। ক্রমে ধর্ম্মঠাকুরের পূজার স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার মানসে ধর্ম্মকে হিন্দু দেব দেবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা প্রচলিত হইতে লাগিল। এইরূপে বুদ্ধের বিলোপ সাধন করিয়া ধর্ম্মকে হিন্দুয়ানীতে নিমজ্জিত করিয়া দিবার চেষ্টা চলিল। ইহার ফলে কামনা মূলক নানা দেব দেবীর পূজা প্রচলন হইল। ধর্ম্মকলহের এই প্রবাহে মূর্ত্তি শিল্প বিচিত্ররূপে প্রকটিত হইল। ফলে ভাস্কর্য্য কলার উন্নতিই হইল; বিচিত্র সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন ভাবের মূর্ত্তিকে আমরা লাভ করিলাম। গত প্রীষ্মের ছুটিতে রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত তারা, উমামহেশ্বর, বরাহ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, মার্ত্তণ্ড, ভৈরব প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া ধর্ম্মকলহের লাভের কথা আমার মনে হইয়াছিল। উহাদের প্রত্যেকটিই উৎকৃষ্ট প্রস্তর শিল্পের পরিচায়ক। সংগ্রহ কম কিন্তু প্রত্যেকটিই খুব মূল্যবান। মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া মনে হয় শিল্পীরা বৌদ্ধ প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। অভ্যস্ত হাত নব নব পরিকল্পনায় নানারূপ বিচিত্র দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিলেও শিল্পীর অজ্ঞাতসারে তাহাতে বৌদ্ধমূর্ত্তির ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। পশ্চিম বাঙলার গ্রামে গ্রামে গাছ তলায় ও দেব মন্দিরে অবস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি ও অনেক মহাদেব মূর্ত্তিকেও হঠাৎ বৌদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়।

পশ্চিম ও উত্তর বাঙলার ভাস্কর্য্যের ছড়াছড়ি, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অনুমান হয় শেষ হিন্দু রাজা-

দের রাজধানী ও স্থায়ীভাবে বসবাস ছিল পশ্চিম ও উত্তর বাঙলায়। আর ঐ সকল নির্মাণের জন্য যে সকল পাথরের প্রয়োজন হইতে তাহা বোধ হয় বিহার প্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত। পশ্চিম ও উত্তর বাঙলার পক্ষে উহা যেমন সুবিধা ছিল পূর্ব্ব বাঙলায় তাহা ছিল না; কিরূপে যে উহা দূর দূরান্তর হইতে আনীত ও প্রেরিত হইত তাহা কল্পনা করা সহজ নহে। ঐ সকল কথা চিন্তা করিলে মনে হয় বাঙালীর শিল্প সাধনা কি দুর্দ্দমই না ছিল। স্বাধীন বাঙলার সেই শিল্প-প্রচেষ্টা আজ কোথায়?

মাটী নয়, মোম নয়, গালা নয়—কঠিন পাষাণফলক, ছাঁচে ঢালাই করিবার উপায় ছিল না, আঘাতে চটিয়া গিয়া যে কিরূপ অবয়ব প্রাপ্ত হইবে তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। সেই পাথর খোদাই করিয়া সুঠাম, সুগঠন, ভাব বৈচিত্র্যময় দেহ ভঙ্গিমা দান করাই যে কেবল তাহাদের কৃতিত্ব তাহা নহে। একই প্রকারের ছোট বড় মূ নির্ম্মাণ যে কতদূর সাধনা ও অনুশীলনসাধ্য তাহা আধুনিক কালের শিল্পী-মনের ও অগোচরে শুধু বিস্ময় উদ্রেক করে মাত্র। আমাদের বীরভূম জেলার বহুস্থানে যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহাদের সকলগুলিরই আকার একই প্রকারের। মনে হয় কে যেন একই ছাঁচে ঢালাই করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে; মুদ্রিত পদ্মের উপর ধ্যানস্তিমিত নেত্রে চতুর্ভুজ শিরোদেশে মুকুট শোভিত বিষ্ণু দণ্ডায়মান। হস্তে তার শঙ্খচক্র গদাপদ্ম। দুইদিকে দুইটী নারী এক হস্তে বীণা ও এক হস্তে চামর লইয়া দণ্ডায়মানা। সবস্তু মূর্ত্তিগুলি একখানি পাথরে খোদাই করা। মূর্ত্তির তলদেশে পাথরের যে বেদী কল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে গরুড় মূর্ত্তি ও বিরাজমান। এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে হইল। ছোটবেলায় এক সময়ে মার সঙ্গে বামাক্ষেপার সাধন-পীঠ তারাপীঠ দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দির প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটি শিবমন্দির ছিল। সেই সময়ে শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে গিয়া তাহারি পার্শ্বে দেওয়ালে লম্বমান চার ফুট লম্বা একটী পাথরের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। তারপর বহুবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে তবুও তাহার স্মৃতি মনের মধ্যে আবছায়ার মত ছিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে সেই কথা মনে হওয়ায় আর একবার তাল করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। তাহারি নিকটে ছোট একটী মন্দিরে যক্ষ বলিয়া পূজিত ঐ একই আকারের ছোট একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিলাম। সেখানে মনে হয় যেন ক্যামেরায় তোলা একই মানুষের একখানি full plate ও একখানি half plateএর ছবি।

হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার মেশামেশির ফলেই ঐ সকল মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রমাণ তান্ত্রিক দেবদেবী-গুলিতেই উহার অধিকা। নালান্দার হিন্দুদের কালীমূর্ত্তির মত একটী মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে—এক পুরুষ রমণীর বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া এবং সেই পুরুষের গলায় নরমুণ্ড-মালার পরিবর্ত্তে বুদ্ধমুণ্ডমালা। মনে হয় রমণীরূপ বিপুলত করিয়া পুরুষ তাহার বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে লাম্বিক সাধকবেশে এবং তাহার গলায় ঝুলিতেছে স্বাম্বিক-তার প্রতীকস্বরূপ বুদ্ধমুণ্ডমালা। কাঁদির (মুর্শিদাবাদ) রুদ্রদেবের মন্দিরে দেখিয়াছি রুদ্রদেবের মূর্ত্তিখানি ঠিক বুদ্ধের মত। শুনিয়াছি উহার গাজন-উৎসবে শূন্যপুরাণের ধর্ম্ম-পূজার মত উৎসব চলিয়া থাকে। শবদেহ লইয়াও মাতা মাতি হয়। বৌদ্ধযুগের সময়ে এইরূপে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের নানা দিক দিয়া সংমিশ্রণ হইয়াছিল; ঐ সকল মূর্ত্তিগুলিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

মন্দিরের সম্মুখভাগের শোভা ও বাঙালীর ভাস্কর্য্যের আর একটী নিদর্শন। ঐগুলি কোথাও লাল পাথরে কোথাও ইষ্টকফলকে প্রস্তুত। ঐ সকল মূর্ত্তি রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক আখ্যানমূলক ঘটনাসমূহকে কেন্দ্র করিয়া প্রস্তুত। মন্দির সম্মুখে উহার সমাবেশের মূলে বোধ হয় ধর্ম্মপ্রাণ বাঙালীর ধর্ম্মশাস্ত্র ও লোকশিক্ষার ইঙ্গিত আছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলী প্রভৃতি জেলার অসংখ্য দেবমন্দিরে ঐ একই প্রকারের বহুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোঠাসুরে (বীরভূম) একবার এক ভগ্ন মন্দিরপার্শ্বে স্তূপীকৃত কয়েকখণ্ড ঐ প্রকারের মূর্ত্তি আমার নাড়াচাড়া করিবার সুবিধা হইয়াছিল। দেখিয়াছি উহা অপেক্ষাকৃত আঘাতসহ ইষ্টক ব্যতীত আর কিছুই নয়, ছাঁচে নির্ম্মিত। ঐ সকল মূর্ত্তির ধারা আলোচনা করিলে মনে হয় মন্দির নির্ম্মাতারা বা ভাস্করেরা বংশপরম্পরায় উহা লাভ করিয়া আসিতেছে। কোথাও কোথাও কমবেশীরূপে ব্যবহৃত অন্য প্রকারের মূর্ত্তিও দেখা যায়। বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু

বাধাবিঘ্ন সহ্য করিয়া সংরক্ষিত প্রাচীন মন্দিরগুলি এখনও যে ভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আধুনিক কালের মন্দির এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহা বাঙালীর স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দান করে।

তারাপীঠের তারা মায়ের মন্দির বেশী দিনের নয়, মন্দিরগাত্রে প্রোথিত প্রস্তর ফলকের অস্পষ্ট লেখাগুলি উহার পরিচয় দান করে যে ১২০৪ সালে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের রাজমিস্ত্রীকর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। তাহাদের বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান। মন্দিরের সম্মুখভাগে শিল্প-কার্য্যের সুন্দর নমুনা আছে। উহা পূর্ব্বোক্ত একই ধারাতে প্রস্তর-ফলকে খোদিত। উক্ত রাজমিস্ত্রীর বংশধরগণ এখন হেয় গৃহনির্ম্মাণকৌশল অবগত তাহার স্থান অতি নিম্নে। কিন্তু দিক একশো বছরেই বাঙালীর এই অধঃপতন এই শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিলে লজ্জায়, ঘৃণায় অন্তর অভিভূত হইয়া আসে। অনেকে বলেন শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য বশতঃ পরবর্ত্তী কালে বাঙালী ভাস্করের নিপুণতা কেবল শিবলিঙ্গ গড়া থাকাও ভাস্কর্য্যের অবনতির একটা

এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালী তাহার শিল্প স্বাধীনতা আনন্দময় জীবনের সকল প্রকার আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। উর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ চারিদিকে কাননকুন্তলা শ্যামা জন্মভূমির মনোরম প্রাকৃতিক শোভা, দিগন্তবিস্তৃত নিবিড় নীল আকাশের কোলে ঘুমাচ্ছন্ন অতীতের আকুল আহ্বান আজ বাঙালীর শিল্পীমনকে উদ্বোধিত করে না। চারিদিকে অগণিত ধ্বংসাবশিষ্ট, ভগ্ন, শিল্পের শেষ নিদর্শন টুকু দেখিয়াও তাহার সুপ্ত বিভ্রান্ত মন পীড়িত হয় না। তবুও উদয়াচলে রাঙারবি তাহার ক্ষীণ রশ্মিটুকু লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; চারিদিকে নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে তাই দীনা হীনা মলিনা বিগত-শ্রী জননী তাহার আপন সন্তানের আত্মদৃষ্টির পানে চাহিয়া আছেন।

যতই এই সকল প্রাচীনশিল্পকলা লইয়া আলোচনা হইবে ততই বাঙালী তাহার সে গৌরবময় অতীতের শিল্পসম্পদ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিবে। ফলে বাঙালীর প্রাচীনশিল্প আবার নূতনরূপ পরিগ্রহ করিবে। নানা কারণে মূর্ত্তিগুলির ছবি দিতে পারিলাম না বলিয়া আমার এই আলোচনা কতকটা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করি। বারান্তরে সেই অভাব পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপদেশামৃত

শ্রীশিবরতন মিত্র

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে শুদ্ধ অভিজ্ঞতাপুষ্ট শাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত বিধির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু, যাঁহারা ভগবানের কৃপায় দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মর্ত্ত্য-জীবনের বিভেদ-ব্যবধান অতিক্রম পূর্ব্বক মহোচ্চগ্রামে অবস্থিত রহিয়া যে বিধি-বাণী প্রচারিত করেন, তাহা শাশ্বত ও চিরসত্য। আমরা এই প্রত্যক্ষদর্শী মহাজন কবিকুলের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হই এবং জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট ও নিয়মিত করিয়া পরম উপকৃত হইয়া থাকি। যে দেশে এইরূপ কবি আবির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য হয় যে ভাষায় তাঁহার অমর-বাণী প্রচারিত হয়, তাহা মহিমান্বিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আমাদের বঙ্গ ভাষার প্রাচীন মহাজন রচিত বাবতীয় কাব্য ও পদাবলী মধ্যে এইরূপ অসংখ্য উপদেশবাণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সকলের পক্ষে সেই সকল বাণীর অনুসন্ধান করিবার অবসর পাকা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান নিবন্ধে, আমরা সৌকর্য্যক্রমে মহাজন কবিকুলের রচনাবলী হইতে উপদেশামৃত সমাহরণ করিতে যত্নপর হইব। আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব—একই ভাব, একই কথা, বিভিন্ন কবি বিভিন্ন সময়ে কিরূপ বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহার করিয়া আমাদের বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং আমরা দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় তাঁহাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী, প্রবাদ বা প্রবচন রূপে ব্যবহার করিয়া আমাদের মনোভাব প্রকাশে কিরূপ উপকৃত হইয়া আসিতেছি।

চণ্ডীদাস

ভগবদ্ভক্ত অদ্বিতীয় প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর থানার অধীন নান্নুর গ্রামে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষাংশে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। ইনি স্থানীয় গ্রাম্য-দেবতা বাশুলী-দেবীর পূজকরূপে নিযুক্ত রহিয়া রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক বহু সংখ্যক সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচনা সম্বন্ধে, বৈষ্ণবকবি কালুদাস যথার্থই গাহিয়াছেন—

উজল কবিত্ব ভাষার লালিত্য বুঝনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ছুটে উতর অধীন যেন॥
সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা।
যেই পদে কানে সেই সাধে প্রাণে শুনামাত্র আত্মহারা॥

অধিক কি, শ্রীচৈতন্যদেবও, চণ্ডীদাস কবির গীতামৃত আস্বাদন করিয়া পরম আনন্দলাভ করিতেন।

এই স্থলে, চণ্ডীদাস কবির রচনাবলী হইতে উপদেশামৃত সংগৃহীত হইল।

অজ্ঞতা

সর্পের মস্তকে যদি রহে পদ্মমণি।
কীটের স্বভাব দোষে নহে তারে ঘৃণী॥
গোরচনা জন্মে যেন গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য জানিতে সে নারে॥

অদূরদর্শিতা

সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া
আইল আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইবে এতেক দুখে॥

অনুরাগ

চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।

অনুদাহ

(১)

চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।

দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিম্বা গোরা ॥

(২)

আর জ্বালা সইতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে মুখে খেলে সাপ ॥

আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।

অন্তরঙ্গ

(১)

বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥

অবলা

বচন থাকিতে না পারি বলিতে
তেই সে অবলা নাম ॥

অবিবেচনা

(১)

কহে বড়ু চণ্ডীদাস কি হইবে বল
গোড়া কাটি আগে জল দিয়া ॥

(২)

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।

অভাগিয়া

অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে সাধ বড় করে
বিহি করে অপবাদ ॥

অরণ্যে রোদন

পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে মনের ভিতর
কভু কি রোদন সাজে ॥

কাটা ঘায়ে নুন

চলিবার তরে দাও উপদেশ
পাথর চাপিয়া পিঠে।
বুকেতে মারিয়া চাকুষ ঘা
তাহাতে নুনের ছিটে ॥

দরদী

বিরহ বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভনে পর দরদের
দরদী হইলে হয় ॥

দান

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥

দুর্জ্জন

কহে চণ্ডীদাস কহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরী
দিয়া পর মনে দুঃখে ॥

ধর্ম্মকাহিনী

চোরের মুখেতে ধরম কাহিনী
শুনিয়া পায় যে হাসি ॥

নব অনুরাগ

নবীন পানির মীন মরম না জানে।
নব অনুরাগে চিত্ত ধৈরজ না মানে ॥

নিবৃত্তি

সোনা লোহা তামা পিতল কি আছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে।

নিরপেক্ষতা

যাবে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥

পন্থা

আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বন্ধু চণ্ডীদাস মিলিবে যেথাই॥

প্রীতি বা প্রেম (প্রীতি-চর্য্যা)

পিরীতি-পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে
সে কেন পিরীতি করয়ে সাধ॥

প্রীতি-দার্ঢ্য

চিত দৃঢ় করি থাকলো সুন্দরী
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায় কার কিবা হয়
বন্ধু চণ্ডীদাস বলে॥

(২)

চণ্ডীদাস কয় ধৈর্য্য ধরি রহ
কে কিবা করিবে কায়॥

প্রীতি-নির্দ্দেশ

দুই মন এক করিতে পারিলে
তবে সে পিরীতি হয়॥

প্রীতি পরীক্ষা

চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক আলা যার তার অধিক পিরীতি॥

প্রীতি-রস

চণ্ডীদাস কয় শুনলো সুন্দরী
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নাহিলে
কি ছার পরাণ তার॥

প্রীতি-রীতি

চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকধর্ম্ম নাহি মানে চিত॥

(২)

চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোক লজ্জা নাহি মানে চিত॥

প্রীতি-লাভ

(১)

পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তারে।

(২)

সদা আলা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরীতি ধন॥

প্রীতি-সংস্থান

নিশিদিন বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

প্রীতি স্বরূপ

(১)

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত

(২)

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে'॥

(৩)

পিরীতি সুখের সায়র দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥

(৪)

বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি অমনি হয়
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে।

(৫)

পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল কে॥

প্রীতি-স্বাতন্ত্র্য

নিরেখিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
দুহিত পিরীতি হয় স্বাতন্ত্র্য আচার॥

প্রীতি-সূত্র—দুর্জ্জন প্রীতি

দুজনের সনে আনের পিরীতি
করিতে পরাণ কাটে।
জিহ্বার সহিত দন্তের পিরীতি
সময় পাইলে কাটে॥

প্রীতিসূত্র—সুজন প্রীতি

১

শুন গো সজনি আমার বাত।
পিরীতি করবি সুজন সাথ॥
সুজন পিরীতি পাষাণ-রেখ।
পরিণামে কভু না যায় টোট।
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি-রীতি।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি॥

চণ্ডিদাস কয় সুজন যে হয়
এমনি না করে সে।
তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥

৩—কানু-প্রীতি

(ক)

কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে
পাঁজর কাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে॥

(খ)

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ার লইতে
বহন দ্বিগুণ হয়॥

(গ)

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু
শ্যামবঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে বলে
কোন্ অভাগিনী জানে।

(ঘ)

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস্ব ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥

(ঙ)

চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া

(চ)

চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিবা গোরা॥

(ছ)

না বল না বল সই, সে কানুর গুণ।
হাতের কালি পালে দিলাম যাখিলাম চুণ॥

(জ)

চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
যেন যজ্ঞিডুমুর ফুল।

৪। শ্যাম-প্রীতি

যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল
অধিক সৌরভ হয়।
শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

প্রীতি-সাধন

পিরীতি পিরীতি সবজনে কহে
পিরীতি সাধন কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধন যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

প্রেমের তন্ময়তা

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥

প্রেমের পরাকাষ্ঠা

ভানু কমলে বসে, দেহ হেন নহে।
হিয়ে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ বিনে সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা।
কুসুম মধুপ বিনে সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় কুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ তুল্য সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

বিধি-বিপর্য্যয়

(১)

চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপালক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয়॥

(২)

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি!
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি!
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালাম সাগর বান্ধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগি করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পিরীতি
মরমে রহল শেল॥

৩

নীর লোভে যদি পিয়াসে ধাইতে
বাধ পর দিল বুকে
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে॥

নবঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ বহল পবন
কুলিশ মিলল শেষে॥
নাথ হেম পাড়া যতনে বান্ধিতে
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপবিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

বিরহ

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর

২

চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥

বিরহ-ভোগ

বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয় এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ॥

২

তোমরা চলিয়া যাও আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাস বলে কেন হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা।

বিরহ-শান্তি

আনিয়া আনিয়া পানা ডুবে মিলাইয়া।
লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতিল দেহ মিঠ হবে কেন।
অনল অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্ব লোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ মেঘের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে॥

বিরহ-শান্তি

হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে
নিরিল যাপ যে যায়॥

২

সখি! কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পিঠে হৈল পার॥

বিষকুম্ভ পয়োমুখ

১

সোণার গাগরি যেন বিষে ভরি
দুধেতে পুরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া যেজন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥

সোণার গাগরি বিষ জলে ভরি
কেবা আনি দিল আগে
কহিছ আহার না করি বিচার
এ বধ কাহার লাগে॥

ভাগ্য দোষ

তোমারে ভাবিয়া নাথে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার॥

ভিক্ষা

চণ্ডীদাস কহে যদি দান নহে
কি জানি মাগিব তায়।
যে ধন মাগয়ে তাহা না পাইয়ে
অপযশ নারি যায়॥

ভুক্তভোগী

তাপিত হইলে তাপ সে জানয়ে
তাপ হয় যে কত

মিলন

দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা॥

রস-গ্রাহিতা

১

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
রসিক কেহত নয়।
ভাবিয়া শুনিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিকে গোটিক হয়

২

অভাগিয়া কাকে স্বাদ নাহি জানে
মজয়ে বিষের ফলে।
রসিকা কোকিলা জানের প্রভাবে
মজয়ে চূত মুকুলে॥

৩

রসজ্ঞ যে জন সে রসয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥

৪ ৫

হংস চক্রবাক ছাড়িয়া পঙ্ক
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।
তেমনি নহিলে কোথা প্রেম মিলে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

রসাস্বাদ

মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
মুকারি কান্দিতে নারে।

রূপ

চণ্ডীদাস কয় দুজনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যেমন দেখিল সেমন তুলিল
কি তার রূপ-বিচার

লজ্জা

চারি দিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ না থুইলে ঘুচে॥

শ্যাম নাম

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়

শ্যামের বাঁশী

১

শ্যামের বাঁশীটি দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি লৈল।

২

যে কাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥

সমবেদনা

বিরহ বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে পর দরদের
দরদী হইলে হয়॥

সমাধি বা শেষ

চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি নয়
দেখিয়া হইনু ভোর।

সঙ্গ-দোষ

মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়
শিখিয়ে হে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গ দোষে কি না
হয় মুখে শশী মসী লাভ॥

সুখ দুঃখ

সই, জানি দু-দিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুহিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

সুজন

গড়ন ভাঙিতে সই, আছে কত জন।
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় সুজন॥

২

গড়ন ভাঙিতে সই আছে কত খল।
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥

স্বভাব

কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা॥

হটকারিতা

না বুঝিয়ে করে কাজ তায় মুণ্ডে পড়ে বাজ
দুঃখ রহে জনম অবধি॥

হাসি

চণ্ডীদাস কহে হাসির কাছে।
আর কি জগতে অমৃত আছে॥

মহাকবি গেটে

শ্রী অবনীনাথ রায়

একটা ছোট টক্‌সোপের এক কোনে টিনের একটা বাক্স ছিল—বাবাকে লুকিয়ে ছোটবেলায় যে বইগুলি ঐ টিনের বাক্সের ভিতর থেকে নিয়ে পড়তুম তাদের নাম আজো মনে পড়ে। সেগুলি হচ্ছে ভবানী ঠাকুর, পাঁচ কড়ি দের নীলবসনা সুন্দরী, হত্যাকারী কে, গোবিন্দলাল, আর ফাউষ্টের বাংলা তরজমা। শেষের বইখানিতে শয়তানের রোমাঞ্চকর কীর্ত্তিকাহিনী পড়ে' সেই বয়সে মনে যে একটা অসম্ভাবনীয় সঞ্চার হত সেটা এখনো অনুভব করতে পারি।

তখন জানতুম না যে ফাউষ্টের রচয়িতা কে। পরবর্ত্তী জীবনে সেটা জেনেছি। আরো সম্প্রতি সেই মহাকবির কথা স্মরণ করার একটা কারণ ঘটলো। তাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে করে' দেশে বিদেশে তাঁর স্মৃতিপূজা হ'ল। এর থেকে একটা সত্য বিশেষ ক'রে আমাদের মনে জাগে—সেটা হচ্ছে এই যে যাঁরা স্রষ্টা যাঁরা কবি অতএব দ্রষ্টা তাঁরা মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকেন। আর তাঁদের সার্ব্বভৌমিক চিন্তাধারা দেশ কালকে অতিক্রম ক'রে মানুষের জীবন প্রভাবিত করে।

জোহান উলফ্‌গাঙ্গ গায়টে Johann Wolfgang Goethe) ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখে জার্ম্মাণীর ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরে (Frankfort-on-the Main) জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ তারিখে উইমার (Weimar) সহরে তিনি দেহ

ত্যাগ করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মরবার সময় তাঁর বয়স ৮৩ বৎসর হয়েছিল এবং এই ১৯৩২ সালের ২২শে মার্চ তারিখে তাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে।

কিন্তু একশত বৎসর পরেও লোকে তাঁকে ভুলতে পারে নি কেন এ খবর জান্‌বার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এর একমাত্র কারণ এইটুকু বলা যেতে পারে যে মহাকবি গেটে কেবলমাত্র কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র প্রতীচ্যদেশের অন্তরাত্মা, সমস্ত প্রতীচ্য ভূখণ্ড তাঁর মধ্যে ভাষা পেয়েছিল, প্রতীচ্য ভূমণ্ডলীর বাণী তিনি মানব সমাজে প্রকাশ করেছিলেন। এ রকম যুগপ্রকাশক বেশী জন্মগ্রহণ করে না। গেটের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে নাম করা যায় এমন লোক বেশি নেই—সেক্‌স্‌পীয়র, ভিক্টর হিউগো, দান্তে এই রকম কয়েক জনের নামই মনে পড়্‌চে।

গেটের মৃত্যু সম্বন্ধে একটা কথা কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না। সেটা হচ্চে তাঁর ভাইমার সহরটীর প্রতি একটা নিবিড় অনুরক্তি। এখানে তিনি ২০ বছর বয়সে বাস করতে এসেছিলেন—আর ৮৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হ'লে তবে ঐ সহরটির সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এই সহরটি গেটের স্মৃতিতে বোঝাই। এমনকি যে ঘরে তিনি দেহত্যাগ করেন সে ঘরখানি সেদিন যেমন সাজান ছিল আজো তেমনি আছে। যে আরাম কেদারায় বসে-থাকা অবস্থায় তাঁর প্রাণ দেহ ছেড়ে বেরিয়েছিল সে চেয়ারখানি আজো রক্ষিত আছে। মরার তিন দিন আগে থাকতে এই চেয়ার খানির উপর তিনি বসে কাটিয়েছিলেন। তাঁর রোগের যন্ত্রণা এত অসহ্য হয়েছিল যে তিনি বিছানায় শুতে পারেন নি।

গেটে যখন লিখতে সুরু করেন তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং যখন লেখা শেষ করেন তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফাউষ্ট সুরু হয় ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে এবং তার দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে অর্থাৎ মরার মাস সাতেক আগে। তাঁর রচনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিসিজ্‌ম্‌ ও নেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ ও নেই, অপর পক্ষে দু'য়ের মিলন আছে। তাঁর প্রতিভা কোন বাঁধাধরা নিয়মের আনুগত্য করতে চায় নি। কেননা তিনি যে কেবলি সাহিত্য পড়েছিলেন তা' নয়, তিনি বিজ্ঞানেরও চর্চ্চা করেছিলেন যথেষ্ট। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। একাধারে গীতি কবি এবং বৈজ্ঞানিক, এমন সমন্বয় বেশি দেখা যায় না। তাই মনস্বী এমার্সন বলেছিলেন যে গেটে হচ্চেন ঊনবিংশ শতকের জনগণের দার্শনিক,—শতবাহু, সহস্রলোচন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বজয়ী সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে গেটের সাক্ষাৎ হয়। নেপোলিয়ন বলেছিলেন যে গেটে হচ্চেন একজন পূর্ণ মানুষ। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। তিনি ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শকুনতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে চর্চ্চা করেছিলেন। অথচ এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলি তাঁর মস্তিষ্কে একসঙ্গে মিশে তাল গোল পাকিয়ে যায় নি। তাল গোল পাকিয়ে অনেকে পাগল হ'য়ে গেছেন এরও প্রমাণ আছে, যেমন ফরাসী লেখক জেরার্ড দ নের্ভাল, গেটেরই স্বদেশীয় নীট্‌শে। এই কারণে গেটের প্রতিভার অসাধারণত্ব দেখে অনেকে বিস্ময় অনুভব করেন। গেটে বাস্তবিকই বিরাট সংস্কৃতির একটা ধারা রেখে গেছেন—সমালোচকেরা তাঁর শিক্ষাকে বলেন creed of culture বা কালচারের দৃঢ় ভিত্তিতে বিশ্বাসিত নীতি। তিনি একাধারে গ্রীক ও লাতিন সভ্যতা ও কৃষ্টির উত্তরাধিকারী, আবার বিশ্বদেববাদী আর্য্যাণ ঐতিহ্যেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন। আমরা আধুনিক কালে মূলত ঐ কালচারেরই উত্তরাধিকারী হয়েছি।

তাঁর সমস্ত নাটক, উপন্যাস, কবিতার বইএর নাম করা অসম্ভব, ফাউষ্ট ব্যতীত এগমণ্ট, টাসো, ইফিজেনীয়া উইদ্‌ হেলম্‌ মেইষ্টার প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তিনি জনক। তবু এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে তাঁর সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে ১৪২ ভলুমে। আর এ ছাড়া তাঁর জীবনচরিত, ডায়েরী, পত্রাবলী, কথাবার্ত্তা প্রভৃতিও আছে।

বলা বাহুল্য গেটের চারিপাশে তৎকালে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠি গঠিত হয়ে উঠেছিল এঁদের মধ্যে তরুণ কবি শিলারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা দু'জনে বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং পরস্পরের প্রভাবে বহু সুন্দর সুন্দর

গাথা রচনা করে গেছেন। মৃত্যুশয়নেও এঁদের ছাড়াছাড়ি হয় নি। গেটে এবং শিলার উইমারের ডিউকদের গোরস্থানে পাশাপাশি শায়িত আছেন।

গেটের লেখার মাঝ থেকে একটা সত্য ধরা পড়ে, তিনি যেন কখনই বর্ত্তমানকে একমাত্র বলে গণ্য করেন নি, কারবার করেছেন সুদূর অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্গে। তাই ওঁর লেখা চিরন্তন হ'তে পেরেছে। নীট্‌শের বহু আগে গেটে বলেছিলেন যে সুখের প্রদর্শিত যে পথ অর্থাৎ যে পথে কেবলমাত্র দুঃখভোগ, অবমাননা আর নীতি স্বীকারই হচ্ছে একমাত্র করণীয়, সে পথ মানুষের পক্ষে প্রশস্ত নয়। তিনি চেয়েছিলেন সুন্দর বিজয়ী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু শেষ নাগাদ তিনি জীবনে এবং লেখায় ঐ ত্যাগেরই মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। মৃত্যুর অল্প আগেই তিনি "আরো আলো, আরো আলো" বলে চিৎকার করেছিলেন। এ উপনিষদের বাণী "তমসো মা জ্যোতির্গময়" এর প্রতিধ্বনি। উপনিষদের এ বাণী গেটের জীবনে ব্যর্থ হয় নি।

অগ্নিশিখা

শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী

১৩)

অলকার মন মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত আনন্দে ঝলমল্ করছে, সে নিজে হাতে মায়ের পূজার যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মঙ্গলাকে আগে চিঠি লিখতে বসল—

"আদরের বোনটি, তোমরা চলে যাবার পর বাড়ীটা আমার বড়ই খালি হয়ে গেছে। তবু তোমায় ধরে রেখে তাই কে কষ্ট দেবার পাপ আর সকল করতে ভরসা হলনি, কিন্তু এখন তো শীঘ্র করে আসতে হচ্ছে,এবার মায়ের পূজার ভার পড়েছে মায়ের এই অযোগ্য সন্তানের উপর, আর সে ভার দিয়েছেন আমার মহাদেব স্বয়ং, কাজেই অমান্য করবার সাধ্য নেই। আমরা একঘরে, কেন না সমাজ থেকে ধোপা নাপিত বন্ধ। কষ্ট কিছু হচ্ছে না, তবে অসুবিধা একটু হচ্ছে : ঝি, চাকর, ঠাকুর সবই পেয়েছি। পুরাণ লোক সব সমাজের ভয়ে মমতা ছাড়তে পারে নি। যেমন তোমার ঠাকুই জামাই, কত স্নান, কেন ধোপা নাপিত বন্ধ হয়ে থাকবে, না হয় তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তা কোন আরজিই মঞ্জুর হল না। সমাজের সঙ্গে ঝগড়া করেই থাকতে হবে। সব তো রেখে আগুন! এখন মায়ের কি ইচ্ছা মা দুর্গাই জানেন। তিনি এবার এই তাঁর এক ঘরে সন্তানের ঘরে আসন পাতেন কিনা তাই একবার দেখব। এবার পূজারী হবে আমার ভাইটী, উপযুক্ত দর্শনী মিলবে, আর নিমন্ত্রিত হবে দরিদ্র-নারায়ণ; যাদের কাছে প্রতি অন্নকণা নারায়ণ, তাদের মুখেই আবার হাতের ভোগ মায়ের প্রসাদী হয়ে উঠবে। তোমরা তো আসবেই আর যদি মেয়ের বিয়ে দিতে ভয় হয়, তবে আমার গোপাল আছে; কাজেই নির্ভয়ে চলে আসবে,বোধনের দুদিন বাকী, এর মধ্যে এসে পড়বে; ঝুমুসিং গাড়ী নিয়ে বসে থাকবে। প্রাণের আদর নাও, ইতি।

"তোমার দিদি না বেয়ান?"

পল্লীগ্রামে কথা ছড়াতে দেরী হয় না, সেই দিনই ঘাটে, মাঠে, বাটে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল যে অরবিন্দ তার গৃহত্যাগী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে না, এমন কি প্রায়শ্চিত্তও সে করবে না। বাড়ীর মেয়েরা সকলে মিলে অলকার নানা দোষ গুণের আলোচনা করে', পুরুষরা ধর্ম্ম নামের আশঙ্কায় গলা বাজি করে' সারা পাড়া গরম করে তুল্ল।—

সেদিন বোধনের ভোর, শরতের আকাশ অল্প মেঘাচ্ছন্ন, একটু একটু বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে; অরবিন্দর গেটের পাশের শিউলি গাছ দুটোয় অজস্র ফুল ফুটতে আরম্ভ করে' সারা পথ ফুলে ফুলে ঢেকে ফেলেছে, যেন তাদের শুভ কোমল পথ দিয়ে শারদ-লক্ষ্মীকে বরণ করে নিচ্ছে। ভোরের

আলোর সঙ্গে সঙ্গে আগমনীর বাঁশী বেজে উঠল, পথে বৈষ্ণব ভিখারী খঞ্জনী বাজিয়ে গেয়ে গেল—

"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা আমার বড়ই কেঁদেছে,—"

আলো ঘুম-ঘোরে অনেক মায়ের প্রাণে এই করুণ সুর করুণতর হ'য়ে বাজতে লাগল; যার দাদো কুলিগেছে এই সময় মেয়ে বাড়ী এনেছে, কত দীন দুঃখী শুধু হাতে মেয়ে আনতে গিয়ে ফিরে এসেছে; তাদের কত 'উমা' ঘরে ঘরে আজ মা-বাপের কোলের জন্য চোখের জল ফেলছে; তাদের মায়ের প্রাণে আজ বাঁশীর সুর করুণ কান্নার মত বাজছে।

সারা গ্রাম আনন্দের হাসি নিয়ে জেগে উঠল। পূজা বাড়ীতে বাজনা বাজছে।

ক্ষীণ মেঘ মৈত্র স্পর্শে পালিয়ে গেছে, সোণার আলো শিশির ভেজা ঘাসে গাছের পাতায় আপায় চক চক্ করে উঠল। অরবিন্দ অলকাকে ডেকে বল্লে, "দেখ, মেঘ দেখে মনটা আমার কেমন ভার হ'য়ে গিয়েছিল, এখন এই প্রভাত হাসি দেখে প্রাণটা আমার আনন্দে ভরে উঠছে, মনে হচ্ছে আমাদের জীবনের পথে যে ঝঞ্ঝাট এসেছে, তাও এই ক্ষণিকের মেঘের মত, প্রেমের তেজে দূরে চলে যাবে, নয় কি?"

অলকা স্বামীকে প্রণাম করে বল্লে, "তাই যেন চলে যায়, আর যেন দুঃখ পেতে না হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।"

একটু বেলা হ'তেই দলে দলে গরীব চাষা-ভুষারা এসে হাজির হ'তে লাগল, "বাবু, কি করতে হবে"।

অরবিন্দ দেখলে বাগ্দীপাড়া, ডুলেপাড়া, নিকিরিপাড়া থেকে সব অনেক লোক এসেছে, পরাণ এসেছে এদের নিয়ে কাজ করতে; অরবিন্দ তাদের চারিদিকে কাজে লাগিয়ে দিল, কতক গেল আটচালা বাঁধতে, কতক লাগল মাঠ সাফ করতে, কতক লাগল বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার করতে। অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, "হ্যারে পরাণ, কে তোদের কাজে পাঠাল রে?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা, মায়ের পূজা তা আর পাঠাবে কে? যেই শুনলাম গাঁয়ের ঠাকুররা তোমাকে একঘরে করেছে, অমনি বল্লুম, তবে আর কি, দা'ঠাকুর তো তাহ'লে আমাদের রে, তাই শুনে সবাই এল: ঠাকুর, তুমি কিছু ভাবেন না, আমরা সব ঠিক করে নেব, আমার গাঁয়ের ধান কেটে দিয়েছে বলে বড় দুঃখ হয়েছিল; ঠাকুর, তারপর বেশলান ভালই করেছে, না হ'লে আমার মেয়ে ফেরে যেত, মায়ের কোল তো কেউ কেড়ে নেবে না। কর্ত্তা, আমরা পূজোয় আসব।" অরবিন্দ স্কুল পরেশদের ঘর সকলকে ডেকে আনবে।

মঙ্গলা বিন্দু এল। পরেশ তো আছেই, আরো দুচার জন করে বাড়ীতে ঢুকে গেল। ষষ্ঠীর দিন থেকে সকলে দলে দলে পূজো বাড়ীতে ভিড় করতে লাগল। পরেশের মা এতদিন আসতে সাহস করেন নি, শেষটায় পরেশের তর্কে অনেকটা বুঝে তিনি এসে দাঁড়ালেন, "কি গো বৌমা, বলি যোগাড় কতদূর হ'ল?" অলকা তাড়াতাড়ি এসে পায়ের ধূলা নিয়ে বল্লে, "এই যে মাসীমা এসেছেন, বাঁচলাম, আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না একা কি করব, তাই সকাল থেকে মনে হচ্ছিল এবার বুঝি মা দুর্গা আমায় লজ্জায় ফেল্লেন, তা আপনি যখন এসেছেন, তখন সে ভয় আমার গেল।"

"তোমার বাড়ীর কাজ, একি পরের কাজ যা সে না এসে পারব, তবে নেহাৎ পেয়ে উঠি না এই যা—"

"তা মাসীমা, আর কি কেউ এবার আমাদের বাড়ী আসবেন না? জেঠিমা, গুরুমা তাঁরা কি কেউ আসবেন না?" "না না আসবে না কেন? সবাই আসবে, তোমরা এত বড় বড় পণ্ডিত সব এনেছ কলকাতা থেকে, এত আয়োজন করেছ, গ্রামের সবাই আসবে; তবে কিনা একটু চক্ষুলজ্জা আছে তো, এত সজ্জন করল সব—"

"তবে কি মাসীমা বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ করবার জন্যে লোক পাঠাবে?"

"হ্যাঁ বাছা, তোমাদের কাজ তোমরা করে যাবে না কেন? তাতে যার রুচি সে আসবে না আসবে, তাতে আর কি করা—"

অরবিন্দ যথারীতি সকলকে নিমন্ত্রণ পাঠাল, বাড়ীর গাড়ীও মেয়েদের আনতে সকলের বাড়ীই গেল।

অষ্টমী, নবমী, দশমী তিন দিন সারা গ্রামের নিমন্ত্রণ, মস্ত বড় বড় আটচালায় রান্নার আয়োজন, কলকাতা থেকে

পঁচিশ জন বামুন এসেছে রাঁধতে ও মিষ্টি করতে, বড় বড় তিনখানা বসেছে।

অন্য গ্রামের সব কামার, কুমোর, কলু, মালি, বাড়ি সব দলে দলে এসেছে ঠাকুর দেখতে আর প্রসাদ নিতে, প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে তারা বসে গেছে।

একদিকে জগৎ জননী মা দুর্গা তাঁর অন্তর কোল পেতে বসে আছেন, অন্যদিকে পাড়ার মাতব্বর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা নিষ্ফল আক্রোশে রাগ করে গর্জ্জন করে শেষটায় চুপ করে গেছেন। তাঁদের বাড়ীর কোন মেয়েরাই আসতে সাহস করেনি। দু'চার ঘর থেকে যে সব মেয়েরা এসেছেন, তাঁরা শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে। মেয়েরা ও পুরুষরা যাঁরা দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা ঠিক করেছিলেন কোন প্রসাদ গ্রহণ করবেন না।

নবমীর দিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত হয়েছিল; একটী পরিষ্কার প্রাঙ্গণ নিকিয়ে ঝকঝকে করা, তার ভিতর এক এক সারি করে পাঁচশত ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসবার স্থান করা হয়েছে; অন্য অন্য সামিয়ানার তলে সকলেরই আহারের ব্যবস্থা রয়েছে—বহু লোক আসছে পেতে পাচ্ছে। ছেলেদের কোলাহলে, বাদ্যের শব্দে, ধূপ ধুনা চন্দনে নির্ম্মাল্যে চারিদিক একটা আনন্দের মোহে যেন সকলকে আবেষ্টন করে রেখেছে। যে দুচার জন প্রধান নায়ক নিষ্ফল ক্রোধে বাড়ির কেবল গর্জ্জন করেই গায়ের ঝাল মিটাতে লাগলেন, তাতে অম্লান শারদ-লক্ষ্মীর আসন ম্লান হ'ল না।

অরবিন্দর বাবার বন্ধু ভুবনেশ্বর ন্যায়রত্ন খুব বড় পণ্ডিত। তাঁর ঋষিতুল্য সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘ গৌর তনুর উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত সকলের মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলছে। তিনি সকল দিকে দেখা-শুনা করছেন। মায়ের পূজা ষোড়শোপচারে সাঙ্গ হ'ল, ভোগ দেওয়া, অঞ্জলী দেওয়া শেষ হ'ল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের হাত ধরে ন্যায়রত্ন মশাই বল্লেন, "অরুর বাবা আর আমি ছিলাম দুই সহোদরের মত, আপনারা মনে করুন আজ আমার বাড়ীর উৎসবে এসেছেন। মায়ের মুখ দেখে সব ভুলে, সব তুচ্ছ করে তাঁর প্রসাদ নিয়ে আমাদের আনন্দ দান করুন।"

যাঁরা আহার বর্জ্জন দিয়ে শুধু পূজা দেখার ইচ্ছায় এসেছিলেন, তাঁরা শেষটায় প্রচুর আয়োজন দেখে এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরোধে চোখ বুজে আহারে বসে পড়লেন; সবাই ভাবল, মায়ের ভোগ ব্রাহ্মণের রান্না আর দোষ কি? আর ন্যায়রত্ন মশাইএর মত লোক যখন এখানে আছেন, তিনি নিশ্চয় না বুঝে কিছু করছেন না। আগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থে পাঁচশত স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। সকলে প্রচুর পরিমাণে বসে বসে খাচ্ছেন এবং কলকাতার ঠাকুররা এমন সুন্দর রাঁধে যাদের ধারণা ছিল না, তাঁরা তাদের প্রশংসা করছেন; ন্যায়রত্ন ডাক দিলেন, "কই গো মা লক্ষ্মী, তোমার পরমান্ন আন, আজ মায়ের প্রসাদে সকলে ধন্য হ'ন।"

একটা ঝকঝকে রূপার বড় বাটীতে রূপার হাতা ডুবিয়ে মাথায় ঘোমটা ঈষৎ টেনে দিয়ে অলকা অলক্তচরণে বৃদ্ধের নির্দ্দেশমত সভায় এসে দাঁড়াল! হতবাক্ ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিমুগ্ধনয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইল, একজন কে যেন বলে উঠল, "ন্যায়রত্ন মশাই, মা জগদ্ধাত্রী কি স্বয়ং নেবে এলেন?"

"হা, মা আমার জগদ্ধাত্রীই বটে; দাও মা, দিয়ে যাও পাতে পাতে অরু, দে মা আরো দুখানা ভাল সন্দেশ আর ধনবেশ গাঙ্গুলী তায়ার পাতে।"

সকল ব্রাহ্মণ হাত তুলে মুখ চাওয়া-চাওই করছে, কেউ এতটা আশা করেনি। সকলের ইতস্ততঃ ভাব দেখে বৃদ্ধ হেঁকে বলেন, "বন্ধুগণ, ভাল করে চেয়ে চিন্তে খাবেন, মা আমার উপবাসী থেকে ব্রাহ্মণের ভোগ ও মায়ের ভোগ রান্না করেছেন আপনাদের অতৃপ্তিতে তাঁর ক্লেশ দ্বিগুণ হবে, নিন নিন্, আরো নিন, দাও, দাও মা, তুমি সকলের পাতে দিয়ে যাও।" সকলে পায়েসের মন মাতান গন্ধে ও অলকার হাতের পরিবেশনের লোভ সামলাতে না পেরে একে একে পায়েসের এমন সদ্ব্যবহার আরম্ভ করলেন যে একা অলকা দিয়ে ওঠে সাধ্য কি! শেষটা অরবিন্দ ও অন্য ছেলেরা সকলে দিতে আরম্ভ করলেন।

আহার শেষ হ'ল; ওধারেও অলকা গিয়ে আয়োজন ভুবনেশ্বর বাবুর কথামত হাতে করে দুচার জনকে পরিবেশন করে এল। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গেল।

অরবিন্দ অলকা স্নান করে একটী ঘরে বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন

ধমাইয়ের স্থান করে তাঁকে ডেকে বল্ল, "আপনি এবার প্রসাদ গ্রহণ করে আমাদের প্রসাদী দিন, তবেই আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন হবে।"

"হাঁ, নিশ্চয় দেব, আগে আর সব ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ নিয়ে যা তোরা, বাইরে সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অরবিন্দ আর অলকা বাইরে পূজার বেদীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পুরোহিত পূজার নির্ম্মাল্য নিয়ে তাদের মাথায় দিলেন। উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণ তাদের মাথায় নির্ম্মাল্য দান করল, তারা মাকে প্রণাম করে উদ্দেশে সকল ব্রাহ্মণকে প্রণাম করল।

সন্ধ্যা-আগমনীর সঙ্গে বাঁশির তানে কাঁসর ঘণ্টার বাজনে ক্ষীণ চন্দ্রালোকে উৎসব-প্রাঙ্গণ মঙ্গলশ্রীতে পরিপূর্ণ। আশীর্ব্বাদ অন্তে সকলের প্রণতা লাভ করে আজ সকল গ্লানি মুক্ত হয়ে অলকার মনে তারা একটা তৃপ্তি বোধ হচ্ছে।

সকল ভবাবধান শেষ করে অরবিন্দ শ্রান্তদেহে শুভ্র শয্যায় গা ঢেলে দিয়ে শুয়ে পড়েছে, অলকা মৃদু পদক্ষেপে ঘরে এসে অরবিন্দের কপালের উপর হাত রাখল, অরবিন্দ তার হাত দুখানা টেনে নিয়ে বল্লে, "অলকা, তুমি কখন আসবে তাই ভাবছিলাম, আজ আমার মনটা এত প্রসন্ন আর পরিষ্কার হয়ে গেছে যে তোমাকে তা বোঝে বোঝাতে পারব না, তোমার কেমন লাগছে অলক?" পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত স্বামীর দুই হাতের উপর মুখ রেখে অলকা বল্ল, "চল, মাকে প্রণাম করে আসি; ঐ আরতি সুরু হয়েছে, চিরদিন মা যেন আমাদের অন্তরে বাহিরে এমনি করেই বিরাজ করেন—"

গোপাল এসে আনন্দ কোলাহলে বাবা মার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল।

"মা, বাবা, তোমরা আরতি দেখতে যাবে না? ঐ শোন শানাই বাজছে—"

এক হাতে পুত্রকে অপর হাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে অরবিন্দ উঠে বসে, "এইতো মায়ের আরতি, চল গোপাল দেখে আসি। তোমার মামীমা কোথায়?"

তারা বার হ'তেই মঙ্গলা এসে দুজনকে প্রণাম করল; অলকা মঙ্গলাকে বুকে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমু দিয়ে বল্ল, "চল মঙ্গলি, মায়ের আরতি দেখে আসি—"

চণ্ডীমণ্ডপে উচ্চধ্বনিতে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং। **শেষ**

শিউলী

শ্রী জগৎ ঘটক

কত প্রেম কত আশা
হৃদয়েতে সঙ্গোপনে ধরি';
ফুটেছিল ধরা 'পরে
শিউলী-সে স্বপনের পরী।
ব্যথাভরা অন্তরে
শুভ্রতায় ঢাকি' সারা'খন—
আপনার অভিমানে
আপনাতে সদা নিমগন।
জেগে রয় সারারাতি—
আসিবে যে প্রিয়তম তার—
পথ পানে নিরালায়,—
আঁখি বাহি' ঝরে অশ্রুধার।
নিশি শেষে চাঁদিনী-সে
ব্যথা ভরা নয়নে চাহিয়া
শিউলীর পানে,—শেষে
চলি' যায় অন্তপথ দিয়া।
ভোরের বাতাস আসি'
কাণে কাণে ক'রে যায় তায়—
'যার লাগি' রও জেগে
সে-ত আজ আসিবে না আর।'
ব্যর্থ প্রেম, ব্যর্থ আশা!—
অশ্রু সাথে নীরবে ঝরিয়া
নিরালা পথের পরে
শিউলী যে রহিল পড়িয়া।

বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম

শ্রীসুখলতা রাও বি, এ,

নারীজাতির দুঃখ-মোচনের জন্য ভারতে যে সকল মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। সেকালের রক্ষণশীল ব্রাহ্মপরিবারের কন্যা ও বধূ হইয়াও পরজীবনে তাঁহার ভিতরে যে সংস্কৃতির ভাব আসিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার স্বামী ৺ স্যার প্রফুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন পঞ্জাব কোর্টে জজিয়তি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন বসন্তকুমারীর সহৃদয়তা ও উদারতা গুণে পঞ্জাবের নারীগণ তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত। স্বজাতি ও স্বদেশী নহে বলিয়া পাঞ্জাবী ললনাদের প্রতি তিনি কখনও বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করিতেন না।

তিনি অনেক সময় নারীজাতির কল্যাণের জন্য চিন্তা করিতেন। এই সময় হইতেই নারীজাতির বৈধব্যদুঃখ তাঁহার কোমল প্রাণকে ব্যথিত ও বিচলিত করিয়াছিল। আমাদের দেশে জ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষাবিহীনা বিধবাগণ ভ্রাতৃ-গৃহে কিংবা স্বতন্ত্রগৃহে একমুঠো হবিষ্যের জন্য যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া থাকে, আত্মনির্ভরতার সম্পূর্ণ অক্ষম সেই সকল বিধবাদের দুঃখনিবারণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

তাঁহার নিজের বৈধব্য ঘটিবার পর তিনি শেষজীবন শ্রীক্ষেত্রেই ধর্মকর্মের ভিতর কাটাইতেছিলেন। ১৯২৯ সালে তাঁহার অনেকদিনের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল। পুরীতে অবস্থিত তাঁহার নিজস্ব বাড়ীটী তিনি একটী বিধবাশ্রমরূপে গড়িয়া তুলিলেন ও বিশেষ সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে "সরোজনলিনী নারীকল্যাণ সমিতির" অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন। এই বাড়ীটী ও তৎসঙ্গে যথেষ্ট অর্থ তিনি এই আশ্রমকে দান করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমটী ও ইহারই সংলগ্ন একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার অব্যবহিতকাল পরেই তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠাকার্য্যে বসন্তকুমারী যাঁহার সাহায্য পাইয়াছিলেন সেই উদারহৃদয়া নারী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তাঁহার আরব্ধকার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে ইহা পরিচালিত করিতেছেন। আশ্রম-সংলগ্ন বোর্ডিংএ কয়েকজন বিধবা মেয়ে থাকেন, এতদ্ব্যতীত অনেক বিধবা ও কুমারী মেয়েরা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থে আসিয়া থাকেন। লেখাপড়া, সেলাই, ছাঁটকাট, গালিচা ও আসন বুনন, সুতা কাটা, তাঁত বোনা ইত্যাদি অনেক কার্য্যকরী বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্কুলের মেয়েরা গীতবাদ্যও শেখে। অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্যেও এই বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ে যে পারিতোষিক বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ছাত্রীদের নৃত্যগীত ও আবৃত্তি পাঠ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল।

বিশেষরূপে লক্ষিত হয় এই যে, এখানে বিধবাবেদনা, সর্ব্বসুখবঞ্চিতা, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালনে নিরতা বিধবা নারী ও বালিকাগণ এক আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন। তাঁহাদের মুখের যে দ্যোতিঃ ও হাসি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা আবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। সংসারে সকলের ঘৃণার পাত্রী হইয়া না থাকিয়া তাঁহারা জগতে আপনাদের উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছেন, চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে সচেষ্ট হইতেছেন। এই মহৎ কার্য্যের মূলে যে সদাশয়া নারীর অক্লান্ত চেষ্টা নিহিত ছিল, স্বর্গগতা সেই নারীর পুণ্যস্মৃতি সকলের মনে চিরদিন জাজ্বল্যমান রহিবে। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন,

"নশ্বর জগতে সবই স্বপ্নসম মিলাইয়া যায়
শুধু মহতের কীর্ত্তিকথা মানবের প্রাণে আঁকা রয়।"

"যেদিন তুমি রবে না আর কাছে"

শ্রী মমতা মিত্র

যে দিন তুমি রবে না আর কাছে,
পরের ঘরে হ'বে পরের সম,
চোখের আড়াল হ'লেও জেনো মনে
জীবনে মোর তুমিই প্রিয়তম।
তোমার কথা নিত্য স্মরণ করি'
কাটবে দিবা, কাটবে বিভাবরী,
আমার মনের মণিকোঠার মাঝে
রবে তোমার মূর্ত্তি অনুপম।

আজ কে সখি এলেম তব কাছে
একটি কথা শুধাই শুধু তোরে,
শপথ আমার, মিথ্যা বলিস্ নে গো
সত্যি ক'রে বলগো রাখি মোরে,—
পরের ঘরে থাক্‌বে যখন কাজে
আমায় কি তোর পড়বে মনো মাঝে?
স্মরণ ক'রে আমায় ক্ষণে ক্ষণে
অশ্রু কি তোর আসবে আঁখি ভরে'?

আমায় যদি ভাব তুমি কভু
সেকথা ঠিক্ জান্‌বে বসে দূরে,
সান্ত্বনার স্নিগ্ধ-রস-ধারে
হৃদয়খানি উঠ্‌বে ভরে পূরে:
অন্তরে সেই স্মৃতি রয়ে রয়ে
উজান ঠেলে চল্‌বে বয়ে বয়ে,
লক্ষ্যহারার সন্ধ্যা সকাল বেলা
উঠ্‌বে ভরে স্মৃতি-মধুর সুরে।

শেষের বিচার

শ্রী দীপ্তি দেবী, বি-এ, বি-টি,

ম্যাডমার সহরে থাকত এক ব্যবসাদার, নাম তার আইভন্ মিচ্‌টচ এফিমভ্। তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একখানা বসতবাটী আর খান দুই দোকান।

এফিমভের চেহারা ছিল ভালই, মাথা-ভর্ত্তি কোঁকড়া চুল, সোনার মত রং। মনখানা তার সদা প্রফুল্ল, কণ্ঠে তার গানের অভাব ছিল না। অল্প বয়সে সে নেশা-টেশা করত বটে, তার মাত্রা বেশী হয়ে গেলে দোষ যে কখনও না তাও নয়, তবে বিয়ের পর থেকে সে এসব প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, কদাচ কখন একটু-আধটু মদ খেত এই যা।

গ্রীষ্মকাল, নিজ্‌নি সহরে এক মস্ত মেলা বসেছে। আইভন্ মেলায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে স্ত্রী পুত্রকন্যাদের কাছে বিদায় নিতে যেতেই তার স্ত্রী বলে—"ওগো, আজ তুমি কোথাও যেয়িও না, আমি তোমার বিষয় একটা বড় বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।" আইভন্ হেসে বলে—"বুঝেছি; আসল কথা, তোমার ভয় হয়েছে যে আমি বোধ হয় মেলায় গিয়ে খুব হৈ হৈ করব—" স্ত্রী তার উত্তর দিল—"কিসের ভয় তা জানি না, তবে এই জানি যে আমি একটা বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে দেখ্‌লাম যে তুমি ফিরেছ, আর মাথার চুলিটা তুলতেই দেখি চুলগুলি তোমার সব শাদা।" আইভন্ হেসে বলে—"বাঃ, ও তো বেশ ভাল লক্ষণ! তুমি দেখে নিও, সব মালপত্র বেচে আমি তোমার জন্য কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ নিয়ে আসব মেলা থেকে।"

সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আইভন্ বেরিয়ে

গড়ল গাড়ী হাঁকিয়ে। রাস্তে পথে আইভনের দেখা হ'ল এক পরিচিত ব্যবসাদারের সঙ্গে। রাতটা কাটাবার জন্য দুজনে আশ্রয় নিল একই পান্থশালায়। দুই বন্ধুতে চা-টা খেয়ে শুতে গেল পাশাপাশি দুটো ঘরে। বেলা অবধি ঘুমানো আইভনের অভ্যাস নয়, তা ছাড়া ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেরিয়ে পড়বার আশায় রাত থাকতেই সে উঠে গাড়ী প্রস্তুত করবার আদেশ দিল তার গাড়োয়ানকে। পান্থশালার মালিক থাকত শিছনদিকের একটা ছোট বাড়ীতে; আইভন্ তাঁর কাছে গিয়ে দেনা-পাওনা চুকিয়ে পুনরায় যাত্রা সুরু করল।

মাইল পঁচিশেক গিয়ে তাকে থামতে হ'ল ঘোড়াকে খাওয়াবার জন্য। নিকটবর্ত্তী পান্থশালার ঢাকা বারান্দায় বসে চা খাবার হুকুম দিয়ে, "পাইপ" খানা বের করে আইভন্ ধরাতে সুরু করেছে এমন সময় টিং টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে একখানা গাড়ী এসে থামল। আর তার থেকে নামল এক ব্যক্তি, দুজন সৈনিক পুরুষ সঙ্গে নিয়ে। লোকটা আইভনের কাছে এসেই সে কে, কোথা থেকে, এই সব অনেক রকম প্রশ্ন করতে লাগল। সব খবরই তাকে দিয়ে আইভন্ বলল—"এক পেয়ালা চা খাবে কি?" কিন্তু লোকটার তখনও প্রশ্ন করা শেষ হয় নি, সে জিজ্ঞাসা করেই চল্ল—"কালকের রাতটা কোথায় কাটিয়েছিলে? তুমি একা ছিলে না সঙ্গে আর একজন ব্যবসাদার ছিল? সকালে কি সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? রাত থাকতেই পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলে কেন?"—এই লোকটা যে কেন এত প্রশ্ন করছে আইভন্ কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারল না, তবুও সে গত রাত্রের ঘটনা সব খুলে বলে জিজ্ঞাসা করল—"কেন মশায় আপনি আমায় এত জেরা করছেন? আমি চোরও নই ডাকাতও নই, আমি আমার নিজের কাজে বেরিয়েছি, আমার অত প্রশ্ন করবার প্রয়োজন নেই।" তখন লোকটি সৈনিক দুজনকে ডেকে বল্লেন—"আমি এই ডিষ্ট্রিক্টের পুলিশ অফিসার, আর আমি যে তোমায় এত প্রশ্ন করছি তার কারণ হচ্ছে যে তুমি যে ব্যবসাদারের সঙ্গে কাল রাত কাটিয়েছ, আজ সকালে দেখা গেল যে তার গলায় ছুরি বসান। এই জন্য তোমার জিনিষ পত্র আমরা তল্লাস করব।" ঘরে ঢুকে পুলিশ অফিসার ও তার সহচর দুজন আইভনের জিনিষ পত্র নেড়ে চেড়ে দেখ্‌ছে এমন সময় হঠাৎ অফিসারটি একটি ব্যাগের মধ্যে থেকে একখানা ছুরি টেনে বের করে বল্লেন:—"এটা কার ছুরি?" আইভন্ চেয়ে দেখ্‌ল; বুকটা তার কেঁপে উঠ্‌ল রক্তমাখা ছুরিখানা দেখে। "এই ছুরিতে রক্তের দাগ লাগল কি করে?" আইভন্ উত্তর দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু স্বর যেন তার গলা দিয়ে বেরুতেই চায় না, সে অতি কষ্টে বল্ল—"আমি জানি না; আমার নয়।" তখন অফিসারটি বল্লেন—"আজ সকালে সেই ব্যবসাদারকে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়, তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতেই পারে না। বাড়ীটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, আর সে বাড়ীতে অন্য কোন লোকও ছিল না। তোমার ব্যাগ থেকে এই রক্তমাখা ছুরি বেরুল, আর তোমার চেহারা দেখেও তাই মনে হচ্ছে, এখন সব কথা আমায় খুলে বলতো? কেমন করে তাকে মারলে আর কত টাকাই বা লোপাট করেছ?"

আইভন্ যে এ কাজ করে নি, সে সেই যে লোকটার সঙ্গে চা খেয়েছিল তারপর আর তার সঙ্গে মোটে ওর দেখাই হয় নি, তার কাছে তার নিজের আট হাজার রুবল ছাড়া একটি কপর্দ্দকও নেই, ছুরিটাও তার নয়, এ সবই আইভন শপথ করে বল, কিন্তু বলে কি হয়? কণ্ঠস্বর তার ভগ্ন, মুখ ফ্যাকাশে, হাত পাগুলো এমন কাঁপছিল যেন সত্যিই সে দোষী।

পুলিশের অফিসারের আজ্ঞানুসারে সৈনিক দুজন আইভনকে বেঁধে তুলল গাড়ীতে। হাত পা বেঁধে যখন তাকে গাড়ীতে ছুড়ে দিল তখন তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আইভনের টাকাকড়ি জিনিষপত্র সব কেড়ে নিয়ে তাকে বন্ধ করে রাখল নিকটবর্ত্তী কোন শহরের কারাগারে। তারপর ব্রাডমার শহরে আইভনের চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া হল। সেখানকার ব্যবসাদারেরা ও অন্যান্য ভদ্রলোকের কাছ থেকে জানা গেল যে আইভন ছোট-বেলায় বদ্-খেয়ালি করে সময় নষ্ট করত বটে কিন্তু আসলে লোকটা ভাল।

তারপর বিচারের দিন এল। আইজানের এক ব্যবসাদারকে হত্যা করে তার বিশ হাজার রুবল চুরি করার অভিযোগ আনা হল আইভনের বিরুদ্ধে।

খবর পেয়ে আইভনের স্ত্রী একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। কি যে সে বিশ্বাস করবে ভেবে পেল না। ছেলেমেয়েরা তার ছোট ছোট, একটি তো নেহাৎ কচি। সন্তানগুলিকে সঙ্গে নিয়ে গেল সে সেই সহরে যেখানে তার স্বামী ছিলেন কারাগারে। প্রথমে তার স্বামীকে দেখবার অনুমতি সে পায় নি, পরে জেলের কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সম্মতি পায়

স্বামীকে কয়েদীর পোষাকে, শিকলে বাঁধা অবস্থায়, আর চোর ডাকাত খুনীদের সঙ্গে বন্ধ দেখে সে সেই যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, অনেকক্ষণ তার আর জ্ঞান হয় নি অবশেষে সে তার ছেলেমেয়েদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গিয়ে বসল তার স্বামীর পাশে। আইভন্ তাকে সব কথাই খুলে বলল। স্ত্রী তখন জিজ্ঞাসা করল—"এখন তবে আমরা কি করব?" "সম্রাটের কাছে খবর পাঠাতে হবে, এমন করে কি তিনি নির্দোষীকে মরতে দেবেন?" তখন আইভনের স্ত্রী বলল যে সে এর আগেই সম্রাটের কাছে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিল কিন্তু তা মঞ্জুর হয় নি। আইভন চোখ নীচু করে বসে রইল, মুখ দিয়ে তার একটিও কথা বেরুল না। আইভনের স্ত্রী তখন বলল—"দেখ, শুধু শুধু আমি স্বপ্ন দেখি নি যে তোমার চুল সব পাকা হয়ে গেছে। মনে পড়ে? তোমার উচিত হয় নি সেদিন বাড়ী থেকে বেরুনো।" তারপর আইভনের চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে সে বলল—"ওগো আমি তোমার স্ত্রী, সত্যি করে বল এ কাজ কি তুমি করেছ?" দু'হাতে মুখখানা ঢেকে ফেলল আইভন্, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল টস্‌টস্ করে। ঠিক সেই সময় জেলার এসে জানাল যে আইভনের স্ত্রীকে এবার যেতে হবে ছেলে পিলে নিয়ে।

শেষবারের মত আইভন্ তার স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের কাছে বিদায় নিল। তারা চলে গেল। তাদের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল তা সব মনে পড়ল আইভনের। তার স্ত্রীও যে তাকে সন্দেহ করেছে একথা ভেবে সে নিজের মনে মনেই বলে—"ভগবানই একা সত্যটা জানেন, তাঁর কাছে ছাড়া আর কার কাছে নিবেদন করা বৃথা। বরং প্রত্যাশা করা যায় এক তাঁরই কাছে।"

এর পর থেকে সে আর কার কাছে কোন আবেদন জানাল না, সব আশা ছেড়ে দিয়ে কেবল স্মরণ করতে লাগল ভগবানকে।

বেত্রাঘাত ও পরে সাইবিরিয়ার খনিতে কাজ করাই হ'ল আইভনের শাস্তির বিধান। পড়িতে গিয়ে বেধে তাই দিয়ে তাকে চাবুক মারা হ'ল, তারপর যা শুরুল তাকে চালান করে দিল সাইবিরিয়াতে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে।

ছাব্বিশ বৎসর ধরে আইভন সাইবিরিয়াতে কাটাল কয়েদীদের মধ্যে। মাথার চুলগুলো তার হয়ে গিয়েছিল একেবারে পাকা তুষারের মত। মনের আনন্দ হারিয়ে, কুঁজো হয়ে সে চলত অতি ধীরে ধীরে। মুখের হাসি তার গিয়েছিল মিলিয়ে, সে কেবলই ডাকত ভগবানকে এক মনে।

জেলে থাকতে আইভন জুতো সেলাই করতে শেখে। জুতো বিক্রি করে সে কিছু পয়সাও জমিয়েছিল, তাই দিয়ে একখানা সাধু ব্যক্তিদের জীবন চরিত কিনে পড়ত সে কারাগারের ক্ষীণ আলোতে বসে। জেলের অধ্যক্ষরা আইভনকে তার নম্র স্বভাবের জন্যে বেশ স্নেহের চোখেই দেখত। আর অন্যান্য কয়েদীরা তাকে খুবই সম্মান করত। আইভনকে "ঠাকুর্দা", "পরমহংসদেব" এই সব বলে ডাকত তারা। কয়েদীদের কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু জানাবার থাকলে আইভনকেই দেওয়া হ'ত তার ভার। নিজেদের মধ্যে যদি কোন গোলযোগ বাধত তো আইভনই সব মিটমাট করে দিত। বাড়ীর কোন খবরই আইভন পায় না, এমন কি তারা বেঁচে আছে কি নেই, তাও তার জানা ছিল না।

একদিন এসে ঢুকল নূতন এক কয়েদীর দল। সন্ধ্যে বেলা পুরাণ কয়েদীরা এই নবাগতদের ঘিরে বসে তারা কোন গ্রামের লোক, কি দোষে এখানে এসেছে, এই সব প্রশ্ন করতে লাগল। আইভনও কাছে বসে এদের কথা-বার্তা শুনছিল।

এই নূতন কয়েদীদের মধ্যেই একজন, বয়স হবে তার

ঘাট, লম্বা শক্তিশালী চেহারা, আধ পাকা দাড়ি গোঁফ বেশ ছোট কোরেই ছাঁটা। সেই এবার শোনাচ্ছিল তার নিজের ইতিহাস—"জানিস্ ভাই, একটা ঠিকে গাড়ীর ঘোড়া নিয়েছিলুম বলেই চুরির দায়ে ধরা পড়ি। আমি তাদের কত বোঝালুম যে কোন চটপট বাড়ী পৌঁছাব বলেই ঘোড়াটা নিয়েছিলুম, আর তা' ছাড়া গাড়ীর চালক আমার জানা লোক, তার কাজ হয়ে গেলেই আমি ঘোড়াটা ছেড়ে দিই, কিন্তু তা বল্লে কি হয়? ওরা কেউ আমার কথা শুনল না। এদিকে আমি একবার সত্যিই একটা অন্যায় করেছিলুম যার জন্যে আমার এর আগেই এখানে আসা উচিত ছিল, কিন্তু তখন কেউ আমায় ধরতে পারেনি; অথচ এখন আমি বল্তে গেলে বিনাদোষেই এসেছি—আরে না, না, আমি মিথ্যা বল্ছি, এর আগে সাইবিরিয়াতে এসেছিলাম বটে, তবে বেশীদিন এখানে থাকি নি।" একজন জিজ্ঞাসা করল—"তোমার দেশ কোথায়?" "স্মলেন্স্ক থেকে আমি আস্ছি, আমার পরিবারের সকলেরই ঐ দেশে বাস। আমার নাম মাকার, ওরা আমাকে সেভিওনভও বলে। আইভন এন্ড্রিওনিভ্ নামটা তুলে জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা চাউনির সহরের এন্ড্রিওনিভ্ বলে ব্যবসাদারদের সম্বন্ধে জান কিছু?" "কী! তাদের আবার জানি না? তাদের ত এখন বেশ ভাল অবস্থা। তাদের এক ব্যক্তি এখানে সাইবিরিয়াতেই আছে, আমাদেরই মত বোধ হয় পাপী সে! এখন বলত ঠাকুর্দা, কি দোষে তুমি এখানে এসেছ?" আইভন তার দুঃখের বিষয় বেশী আলোচনা করতে ভালবাসত না। সে কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল—"আমার পাপের জন্য আমি এই ছাব্বিশ বছর কারাগারে আবদ্ধ আছি।" মাকার জিজ্ঞাসা করল—"কি পাপের জন্য?" কিন্তু আইভন্ কেবল বল্ল—"কি জানি, নিশ্চয় এটা আমার প্রাপ্য শাস্তি!" এর বেশী তার আর কিছু বল্বার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তার সহচরেরা আইভন যে কি দোষে সাইবিরিয়াতে এসেছে তা এদের কাছে ব্যক্ত করে দিল। কেমন করে কে একজন এক ব্যবসাদারকে খুন করে ছুরিটা আইভনের ব্যাগের মধ্যে দিয়েছিল, আর তারই ফলে কেমন করে বিনা দোষে আইভন্ সাইবিরিয়াতে প্রেরিত হয় এই সবই তারা খুলে বল্ল। এই সব ব্যাপার শুনে মাকার একবার আইভনের দিকে চাইল, তারপর নিজের হাঁটু চাপ্ড়াতে চাপ্ড়াতে বল্ল—"হয়েছে, হয়েছে, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সত্যিই আশ্চর্য্য! কিন্তু তুমি কী ভীষণ বুড় হয়ে পড়েছ ঠাকুর্দা?" সবাই তার আশ্চর্য্য হবার কারণ জান্তে চাইল, আর এর পূর্ব্বে সে আইভন্‌কে যে কোথায় দেখেছে তাও তারা জিজ্ঞাসা করল। মাকার কিন্তু কেবল বল্ল—"আমাদের যে এখানে দেখা হ'ল, এটা একটা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নেই।" এ সব কথা শুনে আইভনের মনে হ'ল যে হয়ত এ লোকটা জানে কে সেই ব্যবসাদারকে হত্যা করেছে; তাই সে বল্ল—"মাকার, তুমি হয়ত এ বিষয় আগে থেকেই জান, আমায় এর পূর্ব্বে কোথায় দেখেছ বলতো?"

"এ বিষয় না শোনাই আশ্চর্য্য। পৃথিবীতে তো গুজবের অভাব নেই। কিন্তু ওটা এত পুরাণ কথা যে আমি কি শুনেছি তা' সব প্রায় ভুলেই গেছি।" "সে যাই হোক্, কে সে ব্যবসাদারকে খুন করেছিল তা হয়ত তুমি শুনেছ?" মাকার হেসে উত্তর দিল—"যার কাছ থেকে ছুরি পাওয়া গেছে সেই হয়ত খুন করেছে! যদিই বা কেউ ছুরিটা লুকিয়ে থাকে তা' হলেও যতক্ষণ না চোর ধরা পড়ে ততক্ষণ তো তাকে চোর বলা যায় না, জান ত? আর কেমন করেই বা কেউ তোমার ব্যাগে ছুরি ঢোকাবে? ব্যাগ তো তোমার মাথার নীচে ছিল, রাখ্তে গেলে কি তোমার ঘুম ভেঙ্গে যেত না?"

এর কথা শুনে আইভনের বুঝতে বাকি রইল না যে এই লোকটাই সেই ব্যবসাদারকে হত্যা করেছিল।

আইভন সেখান থেকে উঠে গেল।

সারা রাত তার জেগেই কাটল। মন তার ভরে গেল অসীম দুঃখে, কত ছবিই না তার মনের মধ্যে ফুটে উঠ্ল। বেলায় যাবার দিন বিদায় নিতে গিয়ে তার স্ত্রীকে যেমন দেখেছিল সেই ছবিটা মনে পড়ে গেল। মনে হ'ল সে যেন সাম্নেই দাঁড়িয়ে আছে। তার রূপ চোখ আইভনের চোখের উপর ভেসে উঠ্ল। তার গলার স্বর, হাসির আওয়াজ সে যেন স্পষ্টই শুনতে পেল। তারপর সে যেন তার ছেলে মেয়েদেরও দেখ্তে পেল। যেমন ছোটটি

তাদের দেখে এসেছিল ঠিক তেমনটি। একটির পরণে ছিল একটা ছোট কোট, আর একটি ছিল তার মায়ের কোলে। তারপর তার নিজেকে মনে পড়ল, যেমনটি সে আগে ছিল—একটি চিন্তাশূন্য যুবক। পাদ্রীসাহেব ঢাকা বারান্দায় বসে সে কেমন নিশ্চিন্ত মনে "সীটার" বাজাচ্ছিল আর ঠিক সেই সময় পুলিশের লোক এসে তাকে কেমন করে গ্রেপ্তার করেছিল এ সব তার মনে পড়ে গেল। মনের চোখে সে দেখতে পেলে সে জায়গাটা, যেখানে দাঁড় করিয়ে তাকে চাবুক মারা হয়েছিল, যে তাকে মেরেছিল তাকেও দেখতে পেল, কত লোকই না সেখানে জড় হয়েছিল। শিকল, কয়েদী, এই ছাব্বিশ বছরের কয়দীর জীবন, আর তার এই অকাল বার্দ্ধক্য, সবই তার সামনে ছবির মত ফুটে উঠল। মনটা তার এত খারাপ হয়ে পড়ল যে সে হয়ত আত্মহত্যা করতেও দ্বিধা করত না। "এ সব ঐ বদমাইসটার কাজ" আইভন্ মনে মনে ভাবল। মাকারের উপর তার এমন রাগ হ'ল যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রতিশোধের জন্য। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি তার নিজের মৃত্যুও হয় তাতেও তার আপত্তি ছিল না। সারা রাত সে ভগবানকে ডাকল কিন্তু শান্তি পেল না। দিনের বেলা সে মাকারের কাছদিয়েও গেল না, চোখ তুলে সে তার দিকে চাইলও না।

রাত দুই এমন করে কাটল। রাতে আইভনের কিছুতেই ঘুম হয় না। মনের অবস্থা এত খারাপ যে সে কি করবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না।

কয়েদীদের শোবার জন্য একটা করে সেল্‌কের মত জায়গা আছে। একদিন রাতে আইভন্ যখন কারাগারের ভিতর পাইচারি করে বেড়াচ্ছে, এমন সময় সে দেখে যে একটা সেল্‌কের নীচের মাটি ঝুরঝুর্ করে ঝরে পড়ছে। নীচু হয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে যে মাটির নীচথেকে বেরুচ্ছে মাকার। ভীতিপূর্ণ চোখে সে চাইল আইভনের দিকে। আইভন্ তার দিকে না চেয়েই চলে যেতে উদ্যত দেখে মাকার তার হাতটা চেপে ধরে বলে যে সে এই দেয়ালে একটা গর্ত করেছে। প্রতিদিন কয়েদীদের যখন রান্না দিয়ে কাজের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময় সে কাটা মাটিগুলো তার কুটের মধ্যে ভরে নিয়ে রাস্তায় ফেলে আসে।—"দেখ যে, চুপচাপ্ থাক, তুমিও পালাতে পারবে। আর যদি তুমি আমায় ধরিয়ে দাও তা' হ'লে আমায় ত' ওরা চাবুকে মারবেই কিন্তু তার আগে আমি তোমায় শেষ করব।" মাকার দিকে চেয়ে রাগে কাঁপতে লাগল আইভন্। সে তার হাতখানা টেনে নিয়ে বলল—"আমার পালাবার কোন ইচ্ছা নেই, তুমি আমায় মৃত্যুর কি ভয় দেখাচ্ছ, তুমি ত' আমায় অনেক কাল আগেই মেরে ফেলেছ—আর তোমায় ধরিয়ে দেওয়া? সে বিষয় আমার হাত নেই, ভগবান আমায় যা বুদ্ধি দেবেন আমি তাই করব।"

পরদিন যখন কয়দীদের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দলের প্রহরীরা দেখে একজন কয়েদী নিজের কুটের মধ্যে থেকে খানিকটা মাটি ফেলে ফেলছে। তৎক্ষণাৎ কারাগারের ভিতর তল্লাস সুরু হ'ল। আর দেখতে দেখতে দেয়ালের ভিতর একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়ে পড়ল।

জেলের গভর্ণর এসে সকলকে এ বিষয় জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু কেউ কিছুই স্বীকার করল না। যারা জানত মাকারই এ কাজ করেছে তারা ভয়ে কিছু বলতে সাহস করলে না পাছে মাকারকে তারা চাবুকে মেরে ফেলে। অবশেষে গভর্ণর আইভনকে সত্যবাদী জেনে তারদিকে চেয়ে বলেন—"তুমি তো কখন মিথ্যা বল না আইভন্। ভগবানের সাক্ষী করে বল তো কে ঐ গর্ত খুঁড়েছে দেয়ালে?" মাকার এমন ভাবে গভর্ণরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যেন তার কিছুই যায় আসে না। সে একবারও আইভনের দিকে ফিরে চাইল না। আইভনের ঠোঁট আর হাত কাঁপতে লাগল। সে কিছুই বলতে পারল না অনেকক্ষণ ধরে। একবার ভাবল—"যে আমার জীবনটা একেবারে নষ্ট করে দিল তাকে আমি বাঁচাতে যাব কেন? ওর হাতে যে কষ্ট পেয়েছি তার শাস্তিও এবার ভোগ করুক একটু। কিন্তু ওকে যদি ধরিয়ে দিই তাহলে এরা ওকে আস্ত রাখবে না, চাবুকে শেষ করবে। আর এমনও তো হ'তে পারে যে ওকে আমি অন্যায় করে সন্দেহ করছি?" গভর্ণর পুনরায় বলেন—"সত্যি করে বল ত বাপু, কে দেয়াল খুঁড়েছে?" আইভন্ চকিতে মাকারের দিকে চেয়ে বলে—"আমি বলতে পারলাম না মশায়!

ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আমি কিছু বলি! আপনার যা ইচ্ছে হয় আমায় নিয়ে করুন, আমি এখন সম্পূর্ণ আপনার হাতে।"

গভর্ণর অনেক চেষ্টা করেও আইভনের কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারলেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে সব ছেড়ে দিতে হ'ল।

সেইদিন রাতে আইভন শুয়েছিল বিছানায়, একটু তন্দ্রাও এসেছিল এমন সময় কে যেন এসে বসল তার পাশে। অন্ধকারে সে মাকারকে চিনতে পারল। আইভন বল্ল—"আমার কাছ থেকে তুমি আর কি চাও? কেন এখানে এসেছ?" মাকার কথা কয় না দেখে আইভন্ শয্যা থেকে উঠে বসে বল্ল—"কেন এখানে এসেছ? চলে যাও এখনি, তা' না হ'লে আমি এখুনি গার্ডকে ডাকব।" ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় মাকার বল্ল—"আইভন, আমায় ক্ষমা কর।" "কিসের জন্যে" আইভন্ জিজ্ঞাসা করল। "আমিই সেই বাবদাদাথকে খুন করে ছুরিটা তোমার জিনিষের সঙ্গে রেখে দিয়েছিলাম। তোমাকেও আমার মারবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাইরে গোলমাল শুনে আমি তাড়াতাড়ি ছুরিখানা লুকিয়ে রেখে জানলা টোপকে পালাই।" আইভন চুপ করে রইল, কি যে সে বলবে ভেবে পেল না। মাকার বিছানা থেকে নেমে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বল্ল—"আইভন্, আমায় ক্ষমা কর! আমি সব কথা স্বীকার করব, তোমাকে তা' হ'লে এরা ছেড়ে দেবে তুমি তোমার নিজের বাড়ী ফিরে যেতে পারবে।" আইভন বল্ল—"তোমার পক্ষে বলা সহজ। তোমারই জন্যে এই ছাব্বিশ বছর ধরে আমি যন্ত্রণা পেয়েছি। এখন আমার আমি কোথায় যাব? আমার স্ত্রী আর নেই, ছেলে মেয়েরা আমায় ভুলে গেছে—আমার স্থান কোথায়?—" মাকার উঠ্‌ল না, মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে সে বল্ল—"আইভন্ আমায় ক্ষমা কর! চাবুকের ঘায়ে অত কষ্ট হয় নি, যা এখন হচ্ছে তোমার দিকে চেয়ে। তবুও তো তুমি আমায় ধরা করেছিলে, আমায় ধরিয়ে দাও নি। ভগবানের দোহাই, আমি যেমনই হই তুমি আমায় ক্ষমা কর।" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগ্‌ল; তার কান্না দেখে আইভনেরও চোখে জল এল; সে বল্ল—"ভগবান তোমায় মাপ করবেন। হয়ত আমি তোমার চেয়ে শতগুণ খারাপ।" এই কথা শুনে বল্তেই আইভনের মনটা কেমন হাল্কা হয়ে গেল, বাড়ী ফিরে যাবার ইচ্ছাও তার বড় রইল না। কারাগার ছেড়ে যেতেও ইচ্ছা হ'ল না। সে কেবল বসে রইল শেষ দিনের আশায়।

আইভন যাই বলুক, মাকার তার নিজের সব দোষই স্বীকার করল।

মুক্তির আজ্ঞা এল, কিন্তু তার আগেই মৃত্যু এসে আইভনকে নিয়ে যায়।

(টল্‌ষ্টয় হইতে)

চিত্রকর — শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী

কাঠ খোদাই (wood-cut) চিত্রে শ্রীমান্ সুধাংশু কুমার রা.

বাংলার শিল্প (সকল শিল্প
বিভাগের দ্বারা আধুনিক ভারতীয় শিল্প
তুলিয়াছেন শ্রীমান সুধাংশু
একজন।

ঠাকুর,
বসুমদার ও চক্রবর্তী
প্রভৃতির সংস্পর্শে
আসেন এবং তাঁহাদের ভাবধারার
সহিত ও তাঁহার পরিচয় ঘটে।

বর্ত্তমান সুধাংশু কুমার
কাঠ খোদাই

কলিকাতার সরকারি শিল্প শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায় তথাপি শিল্পীর
বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক, নিপুন কাঠ খোদাইয়ের
খোদাই (wood-cut শিল্পী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র নাথ পদ্ধতিতে গভীর নৈপুণ্যের পরিচয় পাই

[illegible]

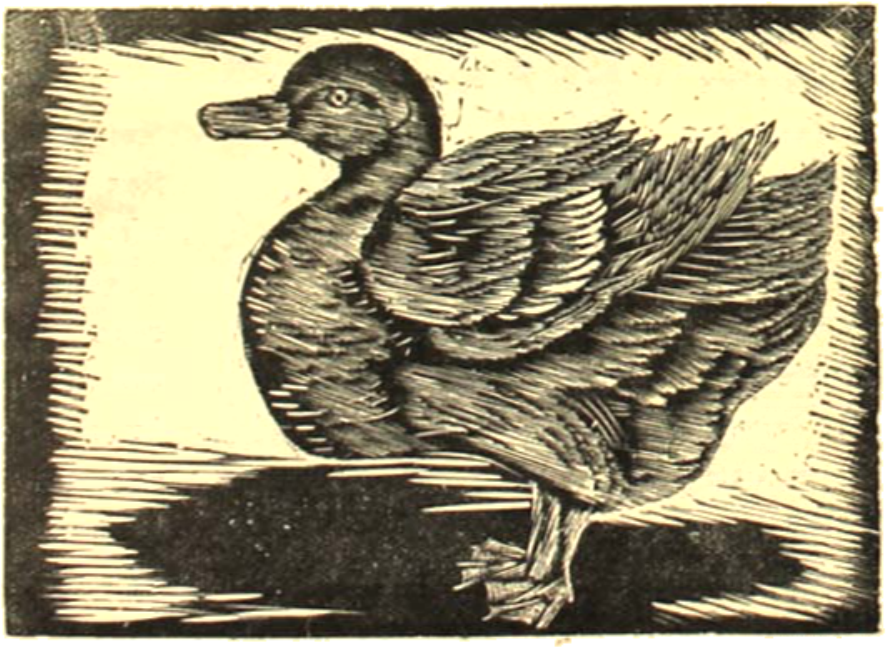

শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করিতে পারি।

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের গত শিল্প প্রদর্শনীতে ইহার একখানি কাঠখোদাই (wood cut) 'Best picture in the exhibition (any medium)' বিবেচিত হয় এবং তাঁহাকে এক

পাইয়াছে। প্রত্যেকটী প্রতিকৃতিতেই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অপূর্ব্ব-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুদূর আশা করা যায় এই সকল সুন্দর প্রতিকৃতিগুলির প্রত্যেকটিই প্রাণবান ও পূর্ণ শক্তি-শালী করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু শিল্পী কোথাও তাঁহার শক্তির অপচয় ঘটিতে দেন নাই।

প্রাকৃতিক দৃশ্য বৃক্ষ ইত্যাদির অঙ্কনেও শিল্পী

ছাত্রের মেরে। শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায় কর্ত্তৃক লিনলিয়মের উপর খোদিত একখানি প্রতিকৃতি।

খানি সুবর্ণ পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অন্যান্য বড় বড় সহরের শিল্প প্রদর্শনীতেও ইহার কাঠ খোদাই (wood-cut) চিত্র, কলা-রসিকদিগের নিকট বহু সমাদর ও পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

লিনলিয়মের (Linolium) উপর খোদাই করিয়া ইনি অনেকগুলি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া এই সকল প্রতিকৃতি অঙ্কনেই শিল্পীর প্রকৃত শক্তির প্রকাশ

প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষেত্রেই গভীর দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। সাধারণতঃ আলঙ্কারিক (Decorative) পদ্ধতিই এই সমস্ত চিত্রে অনুসৃত হইয়াছে।

আশাকরি আমাদের দেশের কলা রসিকেরা তরুণ শিল্পী শ্রীমান সুধাংশু কুমার রায়ের কাঠ খোদাই (wood-cut) জেলা এই প্রথম প্রচেষ্টাগুলিকে আদর ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিবেন।*

* শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায় মহাশয় তাঁহার কাঠ খোদাই (wood cut) চিত্রের শৈলী একটি 'Album' বাহির করিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহার ইংরেজি ভূমিকার অনুবাদ। [ঃ বঃ

ত্রিস্রোতা-তীরে

শ্রী যতীন্দ্র সেনগুপ্ত

ফিরে যাব ঘরে আজিকার মত তীরে মাই তরী বাঁধা ;
সার হ'ল শুধু সারাদিন ঘোর আঁধি-নীরে শুধু কাঁদা।
নদী কূলে আজ কাটায়েছি বেলা একা একা ঢেউ গণি',
আজি অশ্রান্ত শুনেছি কেবল কল-কল্লোল ধ্বনি।
বাতাসের মুখে কাণ পেতে শুধু শুনেছি বাউরের বাঁশী,
মেঘল আকাশে তপনের মুখে হেরেছি মলিন হাসি।
পথের দু'পাশে দেখেছি কুমুদ নয়ন রয়েছে মুদি',
লজ্জাবতী সে গুটন টানি' দুয়ার দিয়েছে রুধি'।
ঘরে যাব আজ ফিরে,—
আর বাজাবনা এমন করিয়া বুকভাঙা বাঁশীটিরে।

কাঁকণ বাজারে আজিকার সাঁঝে নামিল না কেহ ঘাটে ;
নয়ন বৃথাই খুঁজিয়া ফিরিছে তা'রে এ সুদূর বাটে।
ওই দূর মাঠে ঘনায়ে আসিছে কাজল আঁধার রাতি ;
একলা যামিনী যাপিতে যে হ'বে নাহিক বাসর-সাথী !
ঘর তরী আজ এসেছিল বেয়ে, চলে গেল তারা দূরে ;
কিনারে কেহ ত ভিড়াল না তরী মোর বাঁশরীর সুরে।
কোন তরীতে কবে সে আসিবে, জানি না কে প্রিয়া মোর,
তরী বেঁধে রেখা নদী পানে চেয়ে কাঁদিব জীবন ভোর।

সমাজের গলদ

শ্রী সুরমা সুন্দরী ঘোষ

বহুদিন হইতেই সমাজ সংস্কার, সংস্কার বলিয়া জোর গলায় চীৎকারধ্বনি শুনিয়া আসিতেছি, তার ফলে ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে সমাজের উন্নতি হইয়াছে অনেক কিছু তন্মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষাই আরোহণ করিয়াছে সর্ব্বোচ্চ স্তরে। এটা খুবই সুলক্ষণ বটে। কিন্তু কতকগুলি মহদ্‌গুণ যে সমাজের স্কন্ধে সিন্দবাদ নাবিকের মত চাপিয়া বসিয়া আছে তাহা কিছুতেই নাবিতেছে না কেন? আমরা যত গলাবাজি করি সেটা হইতেছে সাময়িক, তার গোড়ায় রহিয়াছে শক্ত সার মাটি, কাজেই মূল উৎপাটন হয় না, দুদিনের আলোচনা আন্দোলনের টানাটানিতে ডালপালা ছিঁড়িয়া যায়, আবার আস্তে আস্তে দুদিন পরেই অঙ্কুর গজাইয়া উঠে। আলোচ্য বিষয়ের প্রধান একটি অঙ্গে যখন যা পূরণ বিক্রয়। যাহারা অর্থের-মদে মত্ত-বাবী তাহারাই আবার বিবাহ ক্ষেত্রে বিলাতি বসনভূষণের দান সামগ্রী ও পাঁচ হাজার দশ হাজারের দাবী করিতে কুণ্ঠিত হন না।

"যেমনতার" আত্মবিসর্জ্জনের পর যে আন্দোলন হইয়াছিল খুবই প্রবল বেগে, কাজেই পণপ্রথাও কমিয়া আসিয়াছিল, সে সময় অনেক ছেলেরাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, পণ নিয়া বিবাহ করিবে না ; সেজন্য ছেলের পিতারাও বাধ্য হইয়াছিলেন রজতখণ্ডের আশায় জলাঞ্জলি দিতে। ফলতঃ পণ প্রথাটা ছিল ধামা চাপা এখন আবার আস্তে আস্তে ধামা খোলা হইতেছে।

পূর্ব্বে বৈবাহিক ব্যাপারে ছিল প্রচলিত কৌলিন্য প্রথা। কুলিনের ছেলে ও মেয়েকে কুলমর্য্যাদা স্বরূপ পণ দিতে হইত। তখন কুল ছিল বংশগত, এখন হইয়াছে তাহা বিদ্যাগত কিন্তু সেটা মেয়ের বেলা নয়, শুধু ছেলের

বেলা। আধুনিক মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বিদুষী কম না, তারাও বি.এ, এম.এ, পাশ করে কিন্তু বিয়ের বাজারে সেজন্য দাম বাড়ে না, বরং হয়তো দাম আছে বলিয়াও কেহ গ্রাহ্য করে না, কিন্তু পুরুষের বিদ্যার মূল্য দিগুণ। আই,সি,এস,আই,এম, এস, হইলে তো চতুর্গুণ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বড়ই আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয়, উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাত প্রত্যাগত যুবকেরাও সুশিক্ষিতা মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করেন টাকার বস্তার আকর্ষণে। যে দেশে নারীর গুণের আদর নাই সে দেশের পতন অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষেত্রে কন্যার পিতারা প্রতিজ্ঞা করুন বরপণ দিয়া কন্যাদান করিবেন না; আর কন্যারা তাঁহাদের গুণের মূল্য আছে কিনা দেখাইতে চেষ্টা করুন নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া,—বিবাহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত থাকিয়া।

—যে রুমাল খানা হারিয়ে গেল—

শ্রী অমিয় জীবন মুখোপাধ্যায়

যে রুমাল খানি আমার হারিয়ে গেল, সেখানি ছিল তোমারি দেওয়া।

অপরের কাছে এই রুমাল খানির কোনোই মূল্য ছিল না—কারণ রুমাল খানা ছিল অত্যন্তই সাধারণ। এবং এতো সাধারণ যে কোনো মেয়েই তা'র প্রিয় কাউকে এরকম রুমাল উপহার দেবার জন্যে তৈরি ক'রেছে বলে দেখা যায় নি! একটি লতা নেই, একটি পাতা নেই, একটি ফুল নেই,—লাল নেই,নীল নেই, সবুজ রঙ্গে নেই, বেগুনে নেই, গোলাপী নেই,—শুধু সাদা একখানি অতি সাধারণ রুমাল। তোমার দেয়া রুমাল খানিকে আমি বেলি ফুলের সাথে তুলনা করেছিনু—বাইরে থেকে তার কিছুই নেই, অথচ সে আপনার অন্তরের সম্পদে আপনি পূর্ণ। মানুষের মন ভোলাবার তার কোনো আয়োজনই নেই, আর ঠিক সেই কারণেই যেন সে মানুষের মন এক মুহূর্ত্তে হরণ করে।

তুমি যেদিন আমায় রুমালখানি দাও সেদিনটির কথা আমার মনে পড়ে। দশদিন ধরে অনবরত বৃষ্টি, বাসা থেকে এক পা কোথাও বেরুতে পারি নি। ঘর দোর রাস্তা ঘাটের সাথে সাথে পরীর মনও ঠিক একই রকম সাঁতসেঁতে হ'য়ে উঠেছিল—বিকেলের দিকটাতে আবারো আকাশের মুখপাত করলুম। দিদি তো ভীষণ খিঁচড়ে গিয়ে এমন কথাই বলে বস্‌লো যে, আজকে যদি রাত্রির ভেতরেই বিষ্টি না থামে, তা হলে—

আমার মন ভীত হয়ে উঠলো, দিদি বুঝি আকাশটাকে একেবারে রসাতলে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু ঐ 'তা' হলে' পর্য্যন্ত বলেই দিদি গজ্‌গজ্ করতে লাগ্‌লো, আর কিছু বল্‌তে পার্‌লো না। জানি না মনে মনে আকাশকে সে কোনো অভিশাপ দিল কি না।

আকাশ কিন্তু দিদির ক্রোধে বাস্তবিকই ভয় পেয়ে গিয়েছিল—রাত্রির আর লাগলো না, সন্ধ্যের পর থেকেই তার মুখ-ভার কেটে যেতে লাগলো!

দশটা দিনের পর!

এমন তো আমি কিছুতেই আশা করতে পারি নি...! জ্যোস্না কি এমন সুন্দরও হয়? আমার এই অল্প দিনের যৌবনেও আমি অনেক পূর্ণিমার রাত্রির দেখিছি, কিন্তু সেদিন যেমন দেখ্‌লুম, এমন তো আর দেখিনি! এই ক'টা দিন কি একটা গভীর দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়েই কাট্‌লো—উঃ কি বিশ্রী ক'রেই উঠেছিলুম! প্রথম দিনটি ভালো লেগেছিল—বেশ ভালো লেগেছিল। বাইরে বিষ্টির ঝিমি-ঝিমি—আর একলা শুয়ে শুয়ে তোমাকে নিঃশেষে ক'রে মনের ভেতর অনুভব ক'রবার চেষ্টা—এ দু'য়ে মিলে আমাকে যেন নিয়ে গিয়েছিল এক গানের রাজ্যে—কোন্ সুদূরে

এক বাগানেকে! রাতের শয়ন এতো মধুর আর কখনো আমার হয়নি।

কিন্তু স্বপ্ন টুটে সহসা এলো এক দুঃস্বপ্ন। উঃ, বয়গুলি ভিজে উঠ্‌লো। রৌদ্রের অভাবে কাপড় গুলি শুকোনো গেল না—সেগুলি উঠ্‌লো পচে। বাজারে যাওয়ার জো নেই, দোকান যাওয়ার যো নেই, পথ ঘাট মাঠ সব গেল ভেসে। ঠাণ্ডা লেগে দিদির হ'ল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, আমার হ'ল পুপ্, খুপে কাশির মতন্। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জো নেই—গাড়ী বন্ধ, ঘোড়া বন্ধ, সব বন্ধ! সুতো গুলো ভিজে—পা ঢোকাতে গায়ের ভিতর শির্ শির্ ক'রে ওঠে; বামুন ঠাকুর দু' দুবার দারুণ আছাড় খেয়ে উঠ্‌লো রান্না ঘরের সামের বারান্দায় পিছ্‌লে পড়ে!

এমনি ঘপনা কতটা দিনের পরমুহূর্ত্তের এমন সুন্দর পূর্ণিমা!

হাজার বছর ধ'রে পাথর হ'য়ে ছিলো রাজপুত্তুর রাজকন্যারা যেন হাজার বছর ধ'রে পাথর হ'য়ে ছিলো। কোথাকার এক অজানা দেশের অচেনা কে যেন এসে একটি সোণার কাটির ছোঁয়ায় সবাইকে বাঁচিয়ে দিলো। দৈত্য যে মায়ার বলে সবাইকে এমনি ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল তা' যেন ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে গেল। চারিদিকে সাড়া প'ড়ল।

দিদি বল্‌লো—আঃ বাঁচলুম!

যে যৌবন এমন আশ্চর্য্য, এমন সুন্দর, এমন মোহন ক'রে আমার চোখের সামে এই জোয়ারকে তুলে ধর্‌লো, তা'র প্রতি শ্রদ্ধায় আর আমার অন্ত রইলো না।

কেমন যেন একটু ইচ্ছে হ'ল তোমাদের বাসা থেকে বেড়িয়ে আসি। এই সুন্দর ক্ষণটিতে তোমার দিদিমার কথা আমার ভুল হ'য়ে গেল, তোমার যে পড়াশোনার ব্যাঘাত হতে পারে সে কথা ভুল হয়ে গেল, তোমার সাথে একটু নিরালায় এমন আদৌ সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব কিনা এটা হওয়া হবার পূর্ব্বে একটু ভাববার কথাও ভুল হয়ে গেল!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বর কি এই মুহূর্ত্তটিকে আমারি জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন?

তোমাদের বাসায় ঢুকতেই তোমাকে দেখতে পেলুম বাইরের ঘরেই—কি একখানা কাগজ নাড়াচাড়া করছিলে।

আমাকে এমন সময়ে হঠাৎ দেখে আনন্দে একেবারে তেড়ে পড়বার মতন হয়ে জিজ্ঞেস করছিলে,—একি স্বপ্ন দেখছি নাকি?

আমি যখন হেসে বলেছিলুম—ভেতরে যাবে না? বাবা কোথায়?

তুমি বল্লে, বাবা এই বেরিয়ে গেলেন, কোথায় তাঁর একটা কাজে, আসতে দেরি হবে। আর দিদিমা ওপরে, শুয়ে শুয়ে মহাভারত পড়ছেন। ভেতরে যাবে? চলো,—আর গিয়েই বা কি হবে, এখানেই বোসো না। দিদিমা আবার কটমটিয়ে চাইবেন।

কি দুষ্টুই ছিলে তুমি! সত্যি, তোমার বাবাকে ক'রে আমার সঙ্কোচ ছিল না—তিনি যে আমায় স্নেহ করতেন খানিকটা রেখে করতেন না, সবটুকুই করতেন। তোমাকে করে সেদিন প্রথম আমি সঙ্কোচ করি, তা'তে সেদিন তিনিই আমাকে তিরস্কার ক'রেছিলেন। মনে পড়ে,...., সেই প্রথম পরিচয়ের পরে ভাই ফোঁটার দিনকার কথাটা? আমি তোমার ভাই, তুমি আমার বোন্—দিদিমার এতো সাবধানে আমাদের দুজনকে এ যেন নিরাপদ জায়গায় দাঁড় করানটাও এমন মারাত্মক হ'য়ে উঠ্‌লো কেমন ক'রে? তাঁরি অমন সতর্ক দৃষ্টির সামেও আমার কপালে ফোঁটা দেবার সময়েই বা তোমার ক'নে আঙুলটি অমন কেঁপে উঠ্‌লো কেন। আর তোমার হাত থেকে মিষ্টির থালা খানি নেবার সময়েই বা আমার কান দুটো অত লাল হ'য়ে উঠেছিল কেন? সেই লালের পরম দিদিমা অনুভব করতে পারলেন না? ঠাট্টা ক'রে একবার কাণে একটু হাতও তো দিয়েছিলেন!

সত্যি...,কেবলি ভাবি, তোমার বাবা কি ভালো মানুষই ছিলেন! লক্ষ মানুষের মাঝে ছিলেন তিনি একলা একটি মানুষ!

আর তোমার দিদিমাটি! উঃ, যমের মার মতো তার ক'রতে ইচ্ছে হ'ত আমার তাঁকে। তোমাদের বাড়ীতে একটু বেড়াতে এলেই তাঁর ঘন ঘন নিষ্ঠুর উগ্র, রুক্ষ কটাক্ষ, আমাকে যেন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুল্‌তো। প্রথম প্রথম তো এমনতর ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মনের ওপর কালো ছায়া ঘনিয়ে যে এলো কবে থেকে,—হ্যাঁ, মনে

আছে; তুমি আর আমি ঘরে ব'সে গল্প ক'রছিলুম একদিন, —সে গল্প যেন আর ফুরোচ্ছিলই না—সে গল্প থেকে দুনিয়ার কোনো কিছুর বিষয়ই বাদ যাচ্ছিল না,ঠিক! কিন্তু বেচারি দিদিমা! সইতে আর কতো পারবেন—বুড়ো মানুষ! বারে বারে ডাক দিতে লাগ্‌লেন, বাইরে ব'সে তাঁর সাথে একটু গল্প করার জন্যে। যাচ্ছি, যাচ্ছি, করেও যখন নিতান্তই অনাবশ্যক দেরী কর্‌ছিলুম, তখন হুড়মুড় ক'রে নিজেই ঢুকে পড়্‌লেন ঘরে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তটিতেই কি একটা কথার পৃষ্ঠে তুমি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিল খিল ক'রে হাস্‌ছিলে।

আমার সাথে তোমার একটু মুচ্‌কি হাসি, তোমার যৌবন নন্দিত দেহের একটু গতি চাঞ্চল্য, বিশাল খোঁপাটির বারে বারে খুলে যাওয়া রূপ অবাধ্যতা। এ সবের সাথে, আর আমার তোমাদের বাড়ীতে একটু বেড়াতে যাবার সাথে কি অদৃশ্য সম্বন্ধ ছিলো, তা' দিদিমাই জানতেন। দিদিমার কাণ্ড দেখে অনেক সময়ে আমার হাসি পেত, কৌতুক বোধ হ'ত!

তবুও ভাবতুম, আর তোমাদের বাসায় যাবো না—বাস্তবিকই দিদিমা কি মনে করেন, কি বিশ্রী! এক সপ্তা' কাল যেতুম না;—অমি আসতো তোমার একখানা চিঠি —একখানি গন্ধভরা গোলাপী খাম! দিদি একদিন তোমার একখানি চিঠি খুলে ফেলেছিল আর কি!

অত ক'রে আমাকে তোমার কাছে অবিশ্যি অবিশ্যি যাওয়ার জন্যে তোমার অনুরোধটুকু—আমি গেলে তোমার ভালো লাগে—এই কথাটুকু—কি মিষ্টিই যে লাগ্‌তো!

সেদিনের সেই জ্যোৎস্না রাত্রে অনেকক্ষণ তুমি আর আমি পাশাপাশি ব'সে ছিলুম, আকাশ সেদিন তা'র সমস্ত সৌন্দর্য্য-সম্পদ দিয়ে আমাদের দু'জনকে একসাথে আশীর্ব্বাদ ক'রেছিল।

সেই সময়টুকুর কথা আমার এতো মনে আছে!

আমি ব'লেছিলুম, দিদিমার মতো বয়েস হ'লে তুমিও ঠিক ওই রকমই হবে। তোমার নাতী নাতনীকে সর্ব্বদা তুমি স্নেহে ক'রবে—আর পদে পদে চালাবে তা'দের ওপর উৎকট শাসন।

হেসে উত্তর ক'রেছিলে আঁ্যা, কি ব'লে? কেন বলতো?

তারপরে বলেছিলে, দ্যাখো তিরিশ বছরের,—আচ্ছা, পঁয়ত্রিশ বছরের ওধারে (ত্রিশেও তেমন নয়, কিন্তু পঁয়ত্রিশের পরের বয়সকে আর যৌবন কাল বলা চলে না—এই বোধ হয় তুমি ভেবেছিলে) আমার আর বাঁচ্‌বার ইচ্ছে নেই। আমার দিন তো আসতে ফুরিয়ে। যা'রা নবীন হ'য়ে দেখা দেবে, তা'দের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকানোর চিন্তাও আমার কাছে লজ্জা। একটি ছেলে বা মেয়ে পরস্পরকে ভালোবাস্‌লো—তা'দের এই মধুর অপরাধ যে বয়েসে আমি ক্ষমার চোখে দেখ্‌তে না পারবো—সে বয়স আস্‌বার আগেই যেন আমার মাথায় বজ্রপাত হয়।

আমি হাসতে হাস্‌তে ব'লেছিলুম, তা' একটু দিবারেল্ হ'য়েই না হয় বুড়ো বয়েস পর্য্যন্তই বেঁচে থেকো! পঁয়ত্রিশ বছর তো এমন একটা—

বাধা দিয়ে তুমি ব'লে, না. দিবারেল হ'য়ে বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকা যায় না। যৌবন এমনি কাল যে শৈশব বল, কৈশোর বল, প্রৌঢ়ত্ব বল, বার্দ্ধক্য বল—জীবনের সমস্ত কালই তা'কে ঈর্ষ্যার চোখে দেখে। এ দেখ্‌বেই— না দেখে পারে না। আর একটা মজার জিনিষ কি জানো, বুড়ো হ'য়ে যে লোক যৌবনের কোনো আতিশয্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করে, সে তা'র মঙ্গল কামনার জন্যে সেটা করে না, সে শুধু করে তার নিজেরি অক্ষমতার জন্যে। যৌবনের আনন্দ লোকের অধিবাসীদের সে হিংসার চোখে দেখে, তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে সে মনে মনে মুষড়ে শুকিয়ে যায়। যৌবনের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসের দায়ে তা'রা ট্যাক্টা-লাসের মতো!

আমার জীবনে কোনোদিন আমার এতোটা অধঃপতন আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবোনা—কিছুতেই না।—

আমি তোমার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে মৃদু হেসে ব'লে ছিলুম,। আচ্ছা মনস্তত্ত্ববিৎ, এখন ওসব থাক্। তারপরে একটু পরে আবার জিজ্ঞেস ক'রে ছিলুম, আচ্ছা, এখন কি করতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমার।

তুমি আস্তে আমার কাঁধের ওপর মাথাটি এলিয়ে দিয়ে বলেছিলে, বলব, কি ইচ্ছে হ'চ্ছে? শোনো তা'হলে।

আকাশ ভরা এমন আলোর উৎসব। আমার যেন কেমন লাগ্‌ছে, আমার এমি ভাবে ম'রে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। সত্যি আমার মর্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে—

সেদিন আমি হেসে ছিলুম, কিন্তু আজ আমার কান্না আসে। চাঁদের আলোয় অংশ ছিলে তুমি, তোমাকে কি ধ'রে রাখা যায়! স্বর্গের কোনো দেবকুমার হয়তো তোমার আকাঙ্ক্ষা ক'রেছিলো, তাই তুমি সেদিনকার মতনই আরেক চাঁদিনী রাতে আকাশের অনন্ত আলোর মাঝে মিলিয়ে গেলে! ত্রিশ বছরের বা পঁয়ত্রিশ বছরের পরের বয়সে বাঁচ্‌বার অগৌরব তোমার হইতে হ'লো না, পার্থিব দেহ মন নিয়ে আমাকে ভুল ক'রে ভালোবেসে আমার স্পর্শ হয়তো তোমার অশুচি ক'রেছিল, তা'হো অপমান তোমায় আর অধিক দিন সইতে হ'লো না।

অনেকক্ষণ তোমার কাছে কাটিয়ে উঠে আস্‌বার সময়ে তুমি আমার এই রুমালখানি দিয়েছিলে। ব'লেছিলে, চাঁদের শুভ্র আলোর সাথে রুমালখানা যেন মিলে গেছে—না? আজকের রাত্রিরের স্মৃতি ব'লে রেখে দিয়ো।

আমি বেরিয়ে এলুম, তোমার দিদিমা তখনো মহাভারত পড়্‌ছিলেন। তুমি দু'খানা মোটা মোটা বই খামখা হাতে করে নিয়ে যেন কতো গম্ভীরমুখে ওপরে উঠে গেলে—কি ছুই!

আরম্ভেই পরিসমাপ্তি ঘট্‌তে পারে—যে কোনো জিনিষের সম্বন্ধেই আমার এমন ধারণা ছিল না, তোমার সম্বন্ধে তো একেবারেই না! তুমি ছিলে সুন্দর, তোমার আবার সমাপ্তি কোথায়? চিরদিনই তো তোমার আরম্ভ! আরম্ভই যে শেষ হবার কথা নয়।

তাই আমি কেবল প্রতীক্ষাই ক'রে চলেছিলুম—নিজের ব্যস্ততায়, তোমার সফলতের পরম মুহূর্তগুলির মাধুরীকে হত্যা ক'রে ফেল্‌তে মন সরেনি। তাই তোমার কাছ থেকে কোনোদিনই কিছু চেয়ে নিইনি।

সেদিনকার রাত্রিকে স্মরণ ক'রে রাখ্‌বার জন্যে তুমি আমায় এই রুমালখানি দিয়েছিলে, সেদিন ওই রুমাল-খানার কোনো দামই আমি দিই নি তেমন ক'রে! কত শত পূর্ণিমার স্মৃতি আমাদের দু'জনের জীবনের অক্ষয় সম্পদ হ'য়ে থাক্‌বে, ওই রাত্রিটা যতো সুন্দরই হোক, ওটাই তো একমাত্র নয়।

তখন কি ভেবেছিলুম, ওই রুমালখানি আমার কাছে এতো গিরিগির এমন নিষ্ঠুরভাবে অমূল্য হ'য়ে দাঁড়াবে?

তোমার একখানি ফটো আমার কাছে নেই,—কিছুই নেই! শুধু ওই রুমালখানা! সকলের অবহেলার যত কেবলমাত্র ওই সাদা, অত্যন্ত সাধারণ রুমালখানা!

কলেজ থেকে ফিরে এসে কি একটা জিনিষ বে'র ক'র্‌বার জন্যে সুটকেশটা খুল্‌লুম। অভ্যাসমতো তোমার রুমালখানা খুলে দেখ্‌তে চাইলুম।

কিন্তু রুমাল? রুমাল তো নেই! তোয়ালেখানার নীচেই তো ছিলো রুমালখানা! তোমার রুমাল নেই? আমার সেই স্মরণীয় রাত্রিরের চাঁদের আলোটুকু নেই? আমার বিশ্বাস ক'র্‌তে প্রবৃত্তি হ'লো না।

ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি জিনিষ নাবাতে সুরু ক'র্‌লুম। তোয়ালেখানা নাবালুম, সদ্য ধোবাবাড়ী থেকে আসা ফুটো সার্ট, তিন খানা ধুতি নাবালুম। তার দিকেই ছিল মেরি ষ্টোপ্‌স্ ও ডাক্তার রবিন্সনের দু'খানি বই, এক বন্ধুর কাছ থেকে প'ড়তে এনেছিলুম। বই দু'খানা নাবালুম। এক খানা রাইটিং প্যাড ও কতগুলি কাগজ পত্তর তা'র পাশে ছিলো, সেগুলি নাবালুম! একে একে সুটকেশের প্রত্যেকটি জিনিষ নাবিয়ে ফেল্‌লুম, কিন্তু তোমার রুমাল নেই!

সহসা মনে হ'ল রুমালখানা কাপড়, জামার ভাঁজগুলির ভেতরে গিয়ে ঢোকেনি তো? ওগুলো খুলে ফেলে বেশ ক'রে ঝেড়ে দেখ্‌লুম—নেই!

সযত্নে বিছানাটি একটি একটি ক'রে তুলে ফেলেছি—তার নীচে যদি ভুল ক'রে কখনো রেখে থাকি।

খাটের নীচ দেখেছি, আলমারীর পেছনটা দেখেছি—টেব্‌লের ওপরকার বইখাতা সব সাফিয়ে দেখেছি—আমার ছোট ঘরটির আনাচ কানাচ তন্ন তন্ন করে দেখেছি; কিন্তু বৃথা!

সেলুকের ওপর আমার সখের ক্যামেরাটি র'য়েছে; কতগুলি বোর্ড, কয়েক ডজন নেগেটিভ প্লেট, ফ্রেম, কাঁচের গেলাশ, ডিশ, লণ্ঠন, ওষুধ পত্তর—ইত্যাদি দিয়ে

সেল্‌ফ্‌টি একেবারে ভর্ত্তি। সেখানটায় রুমালখানির ধাবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার অবুঝ মন! একে একে সেগুলিও পরীক্ষা করলুম, নেড়ে চেড়ে দেখ লুম। যোডিক্লোনের শিশিটার কর্ক বুঝি ভালো করে আঁটা ছিলো না—হাতের ঠেলা লেগে কা'ত হ'য়ে প'ড়ে এক বিশ্রী কাণ্ড ঘ'টলো!

দিদি অনেক সময়ে আমার অনেক জিনিষ আমায় না ব'লে নিয়ে থাকে। মনে হ'ল, দিদি তো নেয় নি? তৎক্ষণাৎ দিদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কিন্তু দিদি রুমাল-খানার কথা কিছুই বল্‌তে পার্‌লো না। কতবার বলুম, লক্ষ্মী দিদি, নিয়ে থাকিস্ তো দিয়ে দে, এই রুমাল নিয়ে কিই বা করবি তুই বল্‌তো!

দিদি বল্‌লো, আমা, বল্‌চি যে নিইনি—রুমাল আমার কাছে নেই কিনা! আর গেছে একটা রুমাল তো গেছেই। চাস্ তো আমি তোকে এখুনি একটা, একটা কেন দুটোই দেচ্ছি 'খন। রুমাল এমন কিছু মহামূল্য সামগ্রী নয়।—

আমি চ'লে এলুম। রুমাল মহামূল্য সামগ্রী নয়—দিদি ব'ললো, কিন্তু আমার মনই জান্‌লো শুধু যে সে কথা কতদূর সত্যি। তোমার রুমাল আমার কাছে মহামূল্য নয় একথা পার্ট ইকোয়াল টু দি হোল্ এর চাইতেও অনেক—অনেক বেশী অ্যাব্‌সার্ড। দিদি হয়তো সেই রুমালখানা দিয়ে অনায়াসে চাহিদেরও সাফ করতে পারতো, কিন্তু আমি সেখানায় একটি চুমু দিতেও একটু কুণ্ঠিত হ'তুম।

দিদি দুপুরবেলা ঘুমিয়েচে। আমি তা'র চাবিটা কলে কৌশলে হাত করলুম। চুপি চুপি গিয়ে তার বাক্সটা খুল্‌লুম। কোনো ভাবে যদি তা'র বাক্সের ভেতরে থেকে থাকে—হয়তো আমি রুমালখানা এক সময়ে দেখ্‌তে গিয়ে ভুল ক'রে বাইরে ফেলে রেখেছিলুম, আর তুলিনি। দিদির কাপড় চোপড় বা কোনো কিছুর সাথে যদিই তা'র বাক্সের ভেতরে চ'লে গিয়ে থাকে!

দিদির ট্রাঙ্কটা যে কি দিয়ে ভর্ত্তি নয় তাই ভাবি। উঃ, একজন মানুষের এতো কাপড়ও প'রতে লাগে। কাপড়-গুলোর নামও আমি জানিনে। কাপড়গুলো বাদ্, তা'র বাক্সের ভেতর আরো যে কতো সব সৌখীন জিনিষ র'য়েচে—তার বেশীর ভাগেরই নাম আমি জানি না! দিদির এমন চমৎকার ক'রে গোছানো জিনিষ পত্র এমন ক'রে ওল্টাতে ভয় ক'রতে লাগলো, তবুও যথা সম্ভব দেখলুম।

দিদির ডজন খানেক রুমাল দেখা হ'য়ে গেছে, আরো তৈরি ক'রতে—সবগুলি দেখা হ'লে আমাদের সবাইকে দু' দুখানা—আর যা'র আবার বেশী তাকে তিন খানা ক'রে উপহার দেবার তা'র ইচ্ছে। দিদির হাতের কাজগুলি কি চমৎকার! প্রত্যেকখানা রুমাল সযত্নে ভাঁজ ক'রে এক কোণে রেখে দিয়েছে, তার এক খানাও এদিক ওদিক হয় নি।

আমি কি তোমার রুমাল খানা এর চাইতে এতটুকুও কম যত্নে রেখেছিলুম? আর তা তো কারুরি নেবার কথা নয়, অন্যের কাছে এর তো কোনো দামই নেই, সকলের যা' দিয়ে কোনোই প্রয়োজন নেই—এমন এই জিনিষটুকু সবাইকে আড়াল ক'রে আমি এমন সাবধানে রেখেছিলুম, তাই আমার হারিয়ে গেল! এমনি সাধারণ যে অন্য কারু হয়তো ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রবারও সময় হ'তো না; কিন্তু আমার কাছে তা'র এতখানি অর্থ ছিল। আমাকে এই ভাবে রিক্ত ক'রে পৃথিবীর কতটুকু লাভ বাড়লো, তাই ভাবি।

একদিন শ্যামবাজারের দিকে কি একটা কাজে বাসে চড়ে যাচ্ছি। ওয়েলেস্‌লীর মোড় থেকে একটি মহিলা উঠলেন, ব'সলেন এসে ঠিক আমার পেছনের বেঞ্চে।

বেথুন কলেজের কাছে এসে গেটটা পার হ'তেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাস্‌টা বেশ জোরে চ'লছিল, ড্রাইভারটা ঐ গতির উপরেই হঠাৎ ব্রেক চেপে দিলো। সেযে দেখলুম একটি রিক্সাওয়ালা চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে), আর সঙ্গে সঙ্গেই টাল সাম্‌লাতে না পেরে মহিলাটি হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলেন আমার ঘাড়ের ওপরে। আমার কাঁধটা তিনি জোরে চেপে ধ'রেছিলেন, নইলে হয়তো একেবারেই প'ড়ে যেতেন!

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে লজ্জিত মুখে বল্‌লেন, কিছু মনে ক'রবেন না ভাই, হঠাৎ—

আমি ব্যস্ত ভাবে বললুম, না, না, এতে আর—

জড়িত পায়ে তিনি নেবে গেলেন—বীডন্ ষ্ট্রীট ধ'রে।

শ্যামবাজার থেকে ঘুরে বাসায় ফিরে এসে দিদির কাছে

গল্পটা কর্‌লুম। কথায় কথায় দিদি ব'ল্লো, আমিও কাল কি পরশুর দিকে যাবো ভাবচি বীডন্ ষ্ট্রীটে একটু লীলাদের বাড়ী। বেচারীর অসুখ হ'য়েছে, দু'বার যাওয়ার জন্যে লিখেছে।

লীলা বলে মহিলাটি দিদির বন্ধু।

পরের দিনই দিদি লীলাদেবীর বাড়ী বেড়াতে গেল!

ফিরে এসে দিদি কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ব'ললো, আরে,-- বেশ মজা হয়েচে। সেদিন যে মেয়েটির সাথে তোর ঠোকাঠুকি হয়েছিল না, সে লীলার বিশেষ বন্ধু। সেও লীলাকে দেখতে এসেছিল। নানা কথাবার্ত্তা হ'তে হ'তে মেয়েটি তা'র সেদিনকার এই ঘটনার কথা গল্প কর্‌তে ক'রতে বল্‌ছিল, সত্যি ভাই, যা' লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলুম—

আমি তো চট ক'রে বুঝে ফেল্‌লুম, তোর কথা বল্‌লুম। খুব তো খানিক হাসাহাসি হ'ল। মেয়েটির নাম হ'চ্চে অরুণা—ভারি চমৎকার মেয়ে। আমার সাথে ওই টুকু সময়ের ভেতরেই বেশ ভাব হ'য়ে গেচে। দু'একদিনের ভেতরেই আমাদের বাসায় আস্‌বে বেড়াতে। বার বার ক'রে আস্‌তে বলে দিয়েচি। এলেই তোর সাথে আলাপ করিয়ে দেব।

দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ! আজ অরুণাদির মতো দিদি আমার আর একটিও নেই।

অরুণাদিও নিজের ইচ্ছামত আমার জিনিষ পত্র ঘাঁটা ঘাঁটি করেন, তিনি যদি রুমাল খানা দেখে টেখে থাকেন, এই জন্যে সেদিন তিনি বেড়াতে আসবামাত্র তাঁকে রুমাল খানার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লুম।

তিনি বল্‌তে পার্‌লেন না; আর দিদির মতনই শুধু ব'ল্‌লেন, ওর জন্য আর এতো মাথা ঘামাচ্চো কেন, তুমি কখানা রুমাল চাও বল, আমি তৈরি ক'রে দেব!

অরুণাদি, তুমিও আমার মনের ব্যথা জানতে পার্‌লে না।

দিদির একখানা মরচে ধরা কাঁচি—যা' নাকি হাজার বার টান মেরে মেরে এদিক ওদিক ফেলেচি কতদিন, সে খানা তো কিছুতেই হারায় না! আমার জুতো তুলবার সরঞ্জামের ভেতরকার এক খানা ভাঙা লাল কাঁচের টুক্‌রো—কত দিন যে এখানে ওখানে পড়ে থাক্‌তে দেখেচি, কিন্তু তাও তো হারায় নি! কবে আমার এক বন্ধু আমায় কাছে চিঠি লিখেছিল, চিঠিখানা পড়া হ'য়ে গেলে ছিঁড়ে ফেলেছিলুম। একটি টুক্‌রো দিয়ে কোন বইয়ের ভেতর কার এক খানা পাতা ঠিক ক'রে রেখেছিলুম। এই সামান্য টুক্‌রোটি আজ পর্য্যন্ত সেই বইখানার ভেতরে ঠিক আছে, একটুও নড়েনি; আর তোমার হাতের একমাত্র চিহ্ন, আমার পরম আদরের এই রুমাল খানা এতো সহজে হারিয়ে গেল!

দশ টাকার সেই পাঁচ খানি নোটের কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। দোকান থেকে জিনিষ কিনে বাসায় এলুম, এসেই পকেটে হাত দিয়ে দেখি, দশটাকার নোট্ পাঁচ খানি নেই! উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আবার দোকানে ফিরে গেলুম—একটু খুঁজ্‌তেই বেঞ্চির তলা থেকে ভাঁজ করা নোট্ গুলি বেরিয়ে পড়ল। এই সময়টার ভেতরে এত লোক যাতায়াত করেচে, অথচ এটা কারুর চোখে পড়েনি, কেউ তুলে নেয় নি!

দিদির দামি সেপ্‌টিপিন্‌টি হারিয়ে গেল—খুঁজ্‌তে গিয়ে কি চৌকাচ্চার পাশের নর্দ্দমাটার ভেতরে সেটি কুড়িয়ে পেল—আধঘণ্টার ভেতরেই। শুধু কুড়িয়ে পাওয়া নয়—সে তক্ষুনি তা' দিদির হাতে এনে দিলো, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারও পৃথিবীতে ঘট্‌লো! বাবার মতো গরীব কি একটা দামী সোনার জিনিষ পেয়ে তা' অনায়াসে দিয়ে দিলো—কল্‌কাতার বাজারে এটা আশ্চর্য্য ছাড়া আর কি?

এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারও ঘ'টে থাকে, কিন্তু এই তুচ্ছ জিনিষ টুকু আমি ফিরে পাবো, এমন সহজ ব্যাপার টুকুই শুধু ঘট্‌তে পারে না! কিছুই হারায় না—তোমার দেওয়া রুমাল খানিই কেবল হারিয়ে যায়। সবি পাওয়া যায়, তোমার দেওয়া রুমাল খানির খালি খোঁজ মেলে না।

• • •

খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি,...! বাসায় আর এমন একটি স্থান নাই, যেখানে দেখা আমি বাকি রেখেচি, কিন্তু তোমার দেওয়া রুমাল খানি আমি পাইনি। এ যে ঠিকই হারিয়ে গেচে, এ বিশ্বাস এখন আমার সত্যি সত্যিই কর্‌তে হবে।

সেদিনকার রাতে তোমার সুন্দর হাত থেকে লাভ করা ওই শুধু, অনাড়ম্বর কমাল খানি যে আমার বড়ো গোপন পাওয়ার ধন ছিল! আমার এই গর্বটুকু সমস্ত দুনিয়ার অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল, তাই এমন করে সে তাকে চূর্ণ করল।

আমি কাউকে তোমার কথা বলিনি, কারুর কাছে কোন দিন তোমার গল্প ক'রে বেড়াই নি! আমার অন্তরের নিভৃতের মন্দিরে যে তোমারি প্রতিষ্ঠা ক'রে ছিলুম, আমার কামনার পূর্ণাঘ্য যে তোমারি করে তুলে দিয়ে ছিলুম, সে কথা আর কাউকেই জানাইনি। তুমি যে আমায় ভালো বেসেছিলে, এই অতি সামান্য জিনিসটুকুই আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ছিলো। তোমার পূজার বেদীমূল আমি সম্পূর্ণ নির্জন করেই রেখেছিলুম—বাইরের কোলাহল আমার এই মধুর ধ্যান পাছে ভাঙিয়ে দেয়!

বিকেলের দিকটায় মোটেই ভালো লাগছিল না, বাসায় আর মন টিকছিল না, তাই লেকের ধারে এসে একটু বসেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমার জ্বর এসেছে। দুপুর থেকেই গাটার ভেতরে কেমন করছিল, তখনো বুঝতে পারিনি! তাইতো, কপালটাতো খুবই গরম দেখতে পাচ্ছি, মাথার ভেতরে কেমন যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আসছে।

লেকের ধারের লোকগুলো অমন তাড়াতাড়ি ক'রে চ'লেছে কেন? লেকের জলগুলো এমন কালো হ'য়ে উঠল কেন? ওঃ, আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেছে দেখছি! কিন্তু আমি যে উঠতে পারছি না!

ওই কালো মেঘের ওপারেই তুমি আছ, তাই না'...? তোমার রাত্রির আর কি তোমার ভালো লাগে?... লাগেনা, নিশ্চয়ই লাগেনা। কারণ, আমারো যে ভাল লাগে না! আমি যখন তোমার কাছে যেতে পারবো,... তখন পূর্ণিমা আবার আমাদের কাছে সুন্দর হ'য়ে উঠবে। তুমি আমায় ভালোবাসতে, একথা মিথ্যা নয়, না,...? হাঁা, তুমি আমার প্রতীক্ষায় থেকো। তুমি জোৎস্নার আলোয় গিয়েছিলে। আমি এমনি এক দুর্দিনে, অন্ধ-মেঘ ভেদ করে তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছব।

একি! আমার হাতের ওপর এক ফোঁটা জল পড়ল কোত্থেকে? তুমি কি এসেছো—একি তোমারি চোখের জল! আমার কথা তুমি শুনতে পেয়েছো বুঝি?

আজকেই আমার সেই মুহূর্ত্ত এলো বুঝি? আমার ..., চাও, চাও, আমায় আরো নিবিড় করে চাও—

আরো এক ফোঁটা জল আবার এসে পড়লো। তোমার চোখের জল আর আমার চোখের জল আমার বাহুর ওপরে মিশে একাকার হ'য়ে গেল!

সম্পাদিকার জল্পনা

প্রেরণার বেগ

পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ প্রেরণার বেগে ছুটে চলেছে,—থামানো যাবে না তা'দি'কে আজ কোন উপায়ে। প্রেরণা এক ধরণের নয়; তার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে নানা ভাবের। অনুকরণ অনুসরণে সামলে চলার ভাবটি লুকোতে গেলেও ধরা পড়ে। প্রেরণার বেগটি তা থেকে স্বতন্ত্র জিনিষ। সে ঝড়-বাধল মানে না, কাঁটা-খোঁচার ভয়ে না,—ঠেলার বেগে এগিয়ে চলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। মানুষ তার বশে চলে;—বশ মানাতে পারে না তাকে নিজের কোঠায় এনে। একেই বলে ঐশ্বরিক শক্তির বেগ বা প্রেরণা। 'খোদার উপর খোদ্‌গিরি' অর্থাৎ নিজের বাহাদুরি চল্‌বে না এর গতির মুখে। ভবিষ্যৎ দেখা যায় না চোখের গোড়ায়, তবু অদৃশ্য লোক থেকে চোখে যেন আলো এসে পড়ে এর চলার পথে। পৃথিবীর নূতন ভবিষ্যতের আভাষ এসে পড়েছে মানুষ-রাজ্যে;—তারই আশায় ছুটেছে মানুষ ঊর্দ্ধ মুখে,—নূতন হবে, নূতন করে' তুল্‌বে সবকিছুকে। কে জানে সে কেমনতর ভবিষ্যৎ! অনুমানে আভাষ দেয়, যেন জড়-চেতনে জড়ানো মানুষ জড়-স্তরের মায়া ছাড়িয়ে কতকটা চেতন-স্তরে উঠে পড়্‌বে সুন্দরতর হ'য়ে। তার গতি হবে স্বচ্ছন্দ, কাজ হবে অপর্য্যাপ্ত অথচ সহজ। জড়ত্বের জের করে' যাবার সময় কতকটা কষ্ট ত হবেই; সকলকে তার জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। এদেশের তাগো যে ঐক্যের প্রেরণা নেমেছে, তার রূপটি চোখে দেখ্‌তে ও রসটি ভোগ কর্‌তে হবে বোল আনা এদেশের সবাইকে—বাঁচো মরো যে পথ ধরে' যেমন খুসী। বিধাতা কাজ হাসিল করে' নেবেন নিজের পছন্দে।

মানব-ঐক্যের বর্ত্তমান রূপ

সকল মানুষকে সমান করে' তুল্‌তে ও সমান অধিকার দিতে যুগযুগ বহু মহাপুরুষ চেষ্টা করে' গেছেন বহু প্রকারে। তাঁদের ছড়ানো বীজ পৃথিবীতে অঙ্কুরিত হ'তে আরম্ভ করেছে বহু দিন থেকে। দুর্গম পথঘাট অতিক্রম করে দুঃসহ তপঃক্লেশ সহন করে', দেশ-বিদেশে মানব-ঐক্যের বাণী প্রচার কর্‌তে তাঁরা প্রাণপাত করেছেন। আজ এই মানব ঐক্যের শ্রেষ্ঠতম যুগে তাঁরা একান্তভাবে স্মরণীয়। প্রত্যেক মানুষ নিজের বুকে সেই মহাপুরুষদের চরণধ্বনি শুন্‌তে পাবে ক্ষণকাল স্থিরভাবে মন দিলেই। বিজ্ঞানের দৌলতে আজ রেলরোড, টেলিগ্রাফ, ডাকবিভাগ, ছাপাখানা—আরও শত সহস্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী-উদ্ভূত কার্য্যকরী শক্তির প্রভাবে মানব-ঐক্যের সেই বড় কথাটি ছোট-বড় সকলের দ্বারে এসে পৌঁছেছে সহজে,—এক মুহূর্ত্তে এক যুগের কাজ সাধন করে' তুলছে মানবজাতির সৌভাগ্যের খবর নিয়ে। সে আজ ধনী-দরিদ্রকে সমান কর্‌বে, নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট কর্‌বে' তুল্‌বে,—বাধা ভাঙ্‌বে সকল মানুষের সব দিকের উন্নতি-পথের। এ সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর লোকগুলি কি পড়ে' থাক্‌বে ভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূলে? হিন্দুর উচ্চবর্ণের লোকদের এতে ভয়ের কি আছে? তাঁদের সদভ্যাস, সুরুচি, শুচিতা, বিদ্যাচর্চ্চা, উঁচুদরের ব্যবসাদির—ওকালতি, ডাক্তারি—ব্যাঘাত না ঘটিয়ে যদি নিম্নবর্ণের লোকেরা সেগুলি আয়ত্ত করে, তবে নিম্নবর্ণের সেই উন্নতিটি জাতির মহা সম্পদে পরিণত হবে। এ থেকে জাতিকে বঞ্চিত কর্‌বে এমন নির্ব্বোধ কে আছে? বহু শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কার ছিঁড়্‌তে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু মেয়েদের অনেকের প্রাণে বাজ্‌ছে—শুন্‌তেও পাচ্ছি, দেখ্‌ছিও। তাঁদের কাছে এই নিবেদন, মায়ের হৃদয় পেতে এই সকল অনুন্নত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের তাঁরা নিজের বুকে ধারণ করুন। এরা তাঁদের সংস্কার-ছেঁড়া ধন হ'য়ে দেশের বুকে জেগে থাক্‌বে।

সমাজ-বিপ্লব

মানুষ জাতটির মধ্যে বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে' থাকেন কতকগুলি মানুষ প্রায়ই। নিজের স্বাভাবিক

পাওয়া শক্তিটির চর্চ্চা করে' ধীরে ধীরে তাঁরা সাধারণ মানুষের স্তর থেকে অ-সাধারণের স্তরে উঠে পড়েন। আশপাশের ছোটকে বড় করা, অক্ষমকে সক্ষম করা তাঁদের কাজ। নিঃস্বার্থ ভাবে সেটুকু করে' গেলে, পৃথিবীর, অন্য কথায় নিজ নিজ দেশ বা জাতির যথেষ্ট কল্যাণ হয় তাঁদের দ্বারা। ঐ ব্যক্তিগত প্রভাবটুকুকে গণ্ডীবদ্ধ করে' সম্প্রদায় বেঁধে ফেল্‌লে তাঁদের জীবনের পরে সেটুকু বিশেষ অনিষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ায় জাতির পক্ষে, দেখা যাচ্ছে। দল বাঁধার গোল বাধে ঐখানে। আজ খোলা পথের দিন এসেছে,—দেওয়া-নেওয়া বাকিছু সব খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে করে' চল্‌তে হবে, তবেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌বে মানুষ জাত। পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে মানুষের যা আছে সব কিছু। সমাজ-শক্তির বেড়া দিয়ে, শাসন মানিয়ে চেপে রাখা হয়েছে মানুষের এতকাল, পৃথিবীর খোলা পথের হাওয়া এসে ঢুকেছে তাদের ঘরে,—সাড়া পৌঁছেছে তাদের প্রাণে। ছাড়তে হবে তাদের অনেক কিছু,—দিতে হবে তা'দি'কে অনেক অধিকার। কে জানে তাদের মধ্যে কত মহাপুরুষ মহানারী জন্মাতে না পারে সুযোগ পেলে! ঐ শ্রেণীর মধ্যে বিশিষ্ট মানুষের উদ্ভব ইতিহাসের পাতায় অনেকবার দেখা গেছে। সচেতন হ'য়ে সজ্ঞে এটুকু মিলিয়ে নিলে গোল চুকে; নতুবা সমাজের বুকে মহা-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। ছোট বড় হবে, অধীন স্বাধীন হবে সুনিশ্চিত; মানে মানেই এটি করে' ফেলা ভালো।

মিলন-ক্ষেত্র

উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে পংক্তি-ভোজের খবর পাওয়া যাচ্ছে চারিদিক থেকে। স্কুল কলেজগুলি অগ্রণী—দেবমন্দিরেও এ সম্বন্ধে উদ্যোগ-আয়োজন চল্‌ছে কিছু কম নয়। হৃদয়-বান হিন্দু আজ হৃদয় পেয়েছে আহ্বান ও আদরের জন্য সমান ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমিতি, বালিকাবিদ্যালয় ও কলিকাতা সহরের কর্পোরেশন স্থাপিত নিম্ন প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয়গুলিতে অচিরাৎ দলে দলে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা শিক্ষার জন্য ঢুকে পড়্‌ছে দেখা যাবে, আশা করা যায়। ছেলেদের ব্যবস্থা ত আগে হ'তেই সুরু হয়েছে।

শিক্ষায় সমান হ'লে কে কাকে চেপে রাখে?

অনেকে বল্‌বেন, "সব জাতের মেয়ে-পুরুষ শিক্ষিত হ'য়ে উঠ্‌লে দেশের জাতব্যবসাগুলি লোপ পেতে বস্‌বে সমূলে। জেলেনী মাছ বেচ্‌তে, গয়লানী দুধের মাখন তুল্‌তে, তাঁতিনী তুলা পিঁজ্‌তে ও সুতায় মাজা দিতে ভুলে যাবে জন্মের মত। ফলে দেশে ছোটঘরের অর্থকরী বিদ্যা যাও বা দু'চারটা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাও খুচে গিয়ে ছোট বড় সবাই 'হা অন্ন, হা অন্ন,' করে' ঘুরে বেড়াবে দুয়ারে দুয়ারে। ভালো করে' ভেবে দেখ্‌তে গেলে দেখা যাবে, এ কথাটির ভিত্তি তেমন পাকা নয়। ব্যবসায় বুদ্ধি একটি স্বতন্ত্র জিনিষ—যার থাকে সেই কৃতকার্য্য হয়। পাকা ব্যবসাদারের ছেলে বাপের আঁট্‌সাঁট্‌ গোছানো ব্যবসাটি ব্যর্থ করেছে, দেখা গেছে অনেক সময়। অতএব কোন বিশেষ ব্যবসায় কোন শ্রেণীর বা পরিবারের একচেটে হবে, এমন বলা যায় না। অন্নের অভাব হ'লে 'রোজগারের পথ দেখে' বলে' দিতে হবে না কাউকে। প্রাণের দায়ে সবাই তখন রোজগার কর্‌তে ছুটবে ও নিজের শক্তি, রুচি অনুযায়ী একটি পথ ধরে' নেবে—যেটি পারে। বুদ্ধি মার্জ্জিত হ'লে ও জাতি সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়্‌লে জাতির মঙ্গল বুঝ্‌তে শিখ্‌বে প্রত্যেক মানুষ, সেটি সব চেয়ে বড় কথা। অর্থাগমের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে গড়্‌তে হবে। তাতেই দেশের মানুষ শিক্ষা লাভ কর্‌বে রকম রকম বিষয়ে। মূল কথা, কর্ম্ম বর্ণগত না হ'য়ে বুদ্ধি, শক্তি ও রুচিগত হবে, এটিই স্বাভাবিক।

সমিতির দুর্য্যোগ

সহর অঞ্চলে যে জিনিষ যতটা চোখে না পড়ে, সহর ছেড়ে গ্রামের দিকে এক পা বাড়ালেই সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে সেগুলি ধরা পড়ে' যায়। অদূরবর্ত্তী গ্রামে ঢুক্‌লেই চোখে ঠেকে—মানুষ দল বেঁধে পথে চল্‌ছে না, অনেকগুলি মানুষ একত্র বস্‌তেও আতঙ্কিত হ'চ্ছে। এ অবস্থায় মেয়েদের সমিতিতে জড় হ'তে পারা আরোই বিঘ্নসঙ্কুল। বাড়ীর বাবুরাও ভয় পান,—মেয়েদের বলেন, "তোমাদের দল বেঁধে কোথাও গিয়ে জুটতে হবে না। যেমন আছ থাকো বাপু চুপচাপ, ঘরের কোণে। দেশকাল খারাপ। সন্ধ্যায়

বেড়াতে নিয়ে যাব বরং কাঁকা জায়গায়,সেটা অনেকটা সহজ আছে ;—কাজ নেই সমিতির বালাইয়ে।" এমনতর বাধা ঠেলেও মেয়েরা আঁকুবাঁকু করছে সমিতিতে গিয়ে কিছু শেখ্‌বার জন্যে। এক জায়গায় দেখ্‌লুম—পনের টাকা বেতনে একটি মহিলা রেখে সমিতির কল্যাণে মেয়েরা কাট-ছাট শিখ্‌ছেন মাথাপিছু মাসিক দু' আনা চাঁদা দিয়ে।—সুন্দর ব্যবস্থা, গৃহস্থ মেয়েদের সুন্দর সুযোগ। বিপত্তির সময় বাধা ঠেলে এগোতে হবে,—উপায় নাই। অর্থ-সমস্যায় দেশ হাহাকার করছে। মেয়েরা পরিশ্রমে দু' পাঁচ টাকা যা বাঁচাতে পারে তা'ই কম দাম নয় এখনকার দিনে। চোখে দেখেছি, একটি মেয়ে কারো কাছে না শিখেও তৈরি জামার মাপ মিলিয়ে জামা ফ্রক ইত্যাদি তৈরি করে' মাসে ১৫।২০৲ উপার্জ্জন করছে অনায়াসে। দুপুরবেলা রাস্তায় যখন মানুষ চলে কম, বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে তৈরি জামা বেচে আসে। নিজে কাঁচা সাবু-বিছানো খেয়ে দিন কাটায়—খরচ বেশী নাই ; এতেই সে বেশ স্বাবলম্বী। বুদ্ধি খাটাতে শিখ্‌লে খুব অল্পেও অনেক কিছু করা যায়। এই বিষম দুর্দ্দিনে সেই পথই আমাদের ধর্‌তে হবে।

সমিতিতে কুমারীর ভীড়

নিম্ন কলিকাতার আশপাশের মহল্লাগুলিতে সমিতি ফাঁদ্‌তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে দলে দলে কুমারী মেয়ে এসে সমিতিতে ভর্ত্তি হ'তে চায়। এরা স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছে। এখন কিণ্ডার উচ্চশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষায় তাদের প্রয়োজন। বাড়ীর অভিভাবকরাও ঐটুকুর জন্য সমিতিতে কুমারী মেয়ে ভর্ত্তি করা সম্বন্ধে খুব ব্যগ্র। সমিতির কাজটি প্রথম সুরু হয় বিধবা ও অন্তঃপুরের বৌদের শেখানোর উদ্দেশ্যে। তাদের দলে এখন কুমারীদের ভিড় দেখে সমিতি অন্তঃপুরশিক্ষালয়ে পরিণত হ'তে চলেছে। মহল্লাগুলীর কুমারী মেয়েদের কলিকাতার শিক্ষালয়ে যাওয়া-আসা সম্ভবপর নয়। কাজেই পাড়ায় পাড়ায় সমিতি-কেন্দ্রে শিখ্‌তে যাওয়া ছাড়া তাদের উপায় কি? কলিকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে শেখা তাদের পক্ষে আরও অসম্ভব। গৃহস্থের অত টাকা সঙ্কুলান হয় কোথায় থেকে? সম্প্রতি এক সমিতি পরিদর্শন কর্‌তে গিয়ে সেটি যে এই ভাবের একটি অন্তঃপুরশিক্ষালয় গড়ে' উঠ্‌ছে, চোখে দেখে এলুম। যখন প্রয়োজন আছে তখন এরূপ শিক্ষালয়কে সমিতির অন্তর্গত করে' নিতে হবে, বুঝ্‌লুম। কলিকাতার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে উদ্যোগ ও আয়োজন অতীব প্রশংসনীয়। এই সাধু চেষ্টার জন্য তাঁকে আমরা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কর্পোরেশনের সাহায্য পেলে এরূপ শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা আরও উন্নত হ'তে পারে।

দেশের মেয়ে সরোজিনী দত্ত

খাঁটি বাঙালী পরিবারের নিরন্ন খাঁচায় গড়া মেয়ে শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্ত বৈধব্যের পর পিতার আজ্ঞায় স্কুলে ভর্ত্তি হন ও ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ক্রমে এম-এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা শেষ করে' বেথুন কলেজে ইতিহাস বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দশ বৎসর যোগ্যতার সহিত কাজ করার পর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় উন্নততর যোগ্যতা লাভের জন্য তিনি Study leave নিয়ে বিলাতে যান। সেখানে দু' বৎসর অধ্যয়নের পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস-সি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছেন গত আগষ্ট মাসে ও এখানকার কাজে যোগ দিয়াছেন ১লা সেপ্টেম্বর থেকে।

বাঙালীর মেয়ের উচ্চশিক্ষালাভ ও উচ্চতর ডিগ্রি পাওয়া কম গৌরবের কথা নয় জাতির দিক থেকে। এত গেল এক তরফ। অন্যদিকে ফেরার পর দেখা হওয়ায় দেখ্‌লুম, মানুষটির খাঁচা বদল হয়নি এতটুকু, যেমন ছিলেন তেমনিটি ফিরেছেন হুবহু। কোথায় কাঁটা-চামচ, টেবিল চেয়ার সোফায় গোরা-বসার বিশিষ্ট আয়োজন?—ফিরেই রান্না ঘোনের সেবায় লেগেছেন ও তাঁর ঘর করার কাজ দেখ্‌তে সুরু করেছেন দেশের মাটিতে পা ফেলা মাত্র। নিজের ঘর-সংসার নাই তবু বোনের সংসার বজায় রাখায় হাত পোয়াতে হবে তিনি জানেন, কারণ তিনি বাঙালী মেয়ে।

দেশী ধরণ ধারণ রেখে বিদেশী জ্ঞান ও শিক্ষা আয়ত্ত করা কত সুন্দর ও দেশী সমাজের পক্ষে সেটি কত কল্যাণকর ভেবে দেখা খুব দরকার। বিদেশী মাটিতে দেশী প্রাণের শিকড় বদাতে যাওয়া কতখানি বিপদজনক চোখ খুলে দেখার সময় এসেছে। সারাদিন বাইরে ঘুরে সন্ধ্যায় নিজের ঘরে এসে বিশ্রামের সুখটুকুর দর যাঁরা বোঝেন ও সকল অবস্থার মধ্যে শান্তির স্বাদ যাঁরা পেতে চান, দেশের বুকে মাথা রাখার সুবুদ্ধিটুকু তাঁরা কখনও খোয়াবেন না, আমাদের স্থির বিশ্বাস।

৺ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, আই, সি, এস,

১৮৪২ খৃঃ অব্দের ২৩শে ডিসেম্বর ৺ব্রজেন্দ্রনাথ দে, কলিকাতার সিমলা পল্লীস্থ তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীপুরনিবাসী ৺দুর্গা চরণ দে তাঁহার পিতা এবং তৎকালিক শিক্ষিত সমাজের অগ্রণী স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের ভাগিনেয়ী তাঁহার মাতা। তাঁহার যখন জন্ম হয়, তখন তাঁহার মাতার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। তাঁহার নয়টী ভাই ভগিনীর অন্য সকলেই অতি শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতেন বলিয়াই এত দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও বাধ্য ছিলেন এবং বয়সের অনুপাতে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন; তখন হইতেই তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখা যাইত!

শৈশবে ভবানীপুরের দুইটী স্কুল ও চোরবাগানের একটী স্কুলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়; তাহার পর ১৮৬২ খৃঃ অব্দে, যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১০ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা কার্য্যোপলক্ষে লক্ষ্ণৌ চলিয়া যান; কিন্তু, ঐ দশ বৎসরের শিশু ব্রজেন্দ্রনাথ তখনই তাঁহার বৃহৎ পরিবারের বহু কার্য্যে সহায়তা করিতেন। এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বর্ত্তমান হেয়ার স্কুলে তাঁহাকে ভর্ত্তি করান হয়। অতঃপর ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মাতার সহিত তিনি লক্ষ্ণৌ চলিয়া যান এবং সেখানে ৪র্থ শ্রেণীর পরিবর্ত্তে সেখানকার ক্যানিং কলেজের ২য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন; আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি উক্ত কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় উক্ত ক্লাসে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পরে যে ৩।৪ বৎসর ঐ কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন, প্রতিবৎসরই তিনি তাঁহার ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগের ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃঅব্দে তিনি এফ, এ, পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগের ৪র্থ স্থান লাভ করেন। ১৮৭১ খ্রীঃঅব্দে পিতামাতার সহিত তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন এবং বহুবাজারে প্রসিদ্ধ বসুবংশের ৺বাবু রাধালদাস বসু মহাশয়ের ৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা নগেন্দ্রনন্দিনীকে বিবাহ করেন। অতঃপর লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া তিনি বি, এ, পড়িতে থাকেন। এই সময় স্থানীয় ইংরাজী কাগজে তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে বাহির হইত। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থান ও এম, এ, পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন।

১৮৭২ খৃঃ ২৬শে জুলাই আই, সি, এস, পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি বিলাত যাত্রা করেন। এজন্য তাঁহার কলেজ হইতে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে ৬ মাস কাল তাঁহাকে একটী বৃত্তি দেওয়া হয়। বিলাতে অবস্থান কালে আনন্দমোহন বসু, শ্রীনাথ দত্ত, লালমোহন ঘোষ, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, পি, কে, রায়, সার কে, জি, গুপ্ত প্রভৃতির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়।

১৮৭২ খৃঃ আই, সি, এস পরীক্ষায় তিনিই একমাত্র ভারতীয় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অতঃপর দুই বৎসর তাঁহাকে বিলাতে শিক্ষানবীশ থাকিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃতে "বোডেন বৃত্তি"র জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ও গোল্‌ষ্টুকিন প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। যথাসময়ে তিনি এই "বোডেন বৃত্তি" লাভ করেন।

সর্ব্বপ্রথমে তিনি বিহারের আরা জেলার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার নিযুক্ত হন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর, তিনি যখন কলিকাতায় পূজার ছুটীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ৪৭ বৎসর বয়সে মারা যান। বিহার প্রদেশের বিভিন্ন মহকুমা ও জিলায় তিনি যখন প্রধান কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিতেন, তখন তৎতৎস্থানীয় রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র—সকলশ্রেণীর লোকেরই তিনি বিশেষ সৌজন্য আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সে সব স্থানে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে রাণীগঞ্জ মহকুমায় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। রাণীগঞ্জ থাকাকালীন তিনি রাণীগঞ্জ "পটারী

ওয়ার্কসের" কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এইরূপ একটী অভিযোগ অবগত হন যে, কলিয়ারীর একজন কর্ম্মচারী পত্তনী-মহলের রায়তদের উক্ত ওয়ার্কসের কার্য্যে যোগ দিতে দিতেছে না ; তিনি অনুসন্ধান করিয়া ব্যাপারটীর সত্যতা জানিতে পারেন এবং তাহাকে জানাইয়া দেন যে, যদি পরে আর কখনও এইরূপ অভিযোগ শোনা যায়, তবে তিনি আইনানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। ইহার পর আবার স্থানীয় বহুলোকের স্বাক্ষরিত একখানি অভিযোগ-পত্র প্রাপ্ত হন যে, স্থানীয় কলিয়ারীর ম্যানেজারেরা সাধারণ লোকদের গাড়ী জোর করিয়া লইয়া যায় ; তিনি তখনই আদেশ জারি করেন যে, আর কখন যেন মালিকের বিনা অনুমতিতে তাহাদের গাড়ী না নেওয়া হয়। এই সব ঘটনায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তাঁহার প্রতি একটু বিরক্ত হন এবং তাহার জন্য তাঁহার কর্ম্মজীবনে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তৎপর তাঁহাকে বাঁকুড়ার সহযোগী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বদলী করা হয় এবং তাহার পর হুগলীতেও সহযোগী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে তাঁহাকে বদলী করা হয়। হুগলীতে তিনি প্রায় ছয় বৎসর ছিলেন। হুগলী থাকাকালীন তিনি হুগলী ও চুঁচুড়া সহরে কলের জল সরবরাহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে "ইলবার্ট বিল" লইয়া খুব একটা গোলযোগ চলিতেছিল ; গবর্ণমেণ্ট সকলকার মত মিঃ দে'র নিকটও তাঁহার মন্তব্য চাহিয়া পাঠান ; কিন্তু মিঃ দে, অতি দৃঢ়তার সহিত স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বিচারক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের কোন প্রভেদ না রাখিয়া একই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সময়ে মিঃ দে, সংস্কৃত, পারসিয়ান ও অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১১০০৲ টাকা আর্থিক পুরস্কার লাভ করেন। ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন তিনি, আত্মীয়-স্বজনের আপত্তি সত্ত্বেও বহুদিনের রক্ষিত প্রাচীন-পন্থা ও পর্দ্দানশীনতা দূর করিয়া তাঁহার পত্নীকে আধুনিক-ভাবে ও শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে মিঃ দে, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। এই বৎসর অক্টোবর মাসে পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসেন।

একবার বাঁকুড়ার কতকাংশ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা হয় ; এই সময়েও মিঃ দে, বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহারই চেষ্টায় ঐ প্রস্তাব রহিত হইয়া যায়।

মিঃ দে-ই ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন, হুগলী, খুলনা, মালদহ প্রভৃতি বাংলার বহু জেলায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

১৯১০ খৃঃ অব্দে ৩৪ বৎসর চাকরী করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাহার অবসর গ্রহণের পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার অজস্র প্রশংসা প্রকাশিত হয়।

বিখ্যাত ইংরাজী পত্রিকা "পাইওনিয়ার" লিখিয়াছিলেন যে, মিঃ দের মত ম্যাজিষ্ট্রেট যদি বাংলার সর্ব্বত্র থাকিত, তবে আর বাংলায় রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হইত না।

অবসর প্রাপ্তির পর তিনি কলিকাতাতেই বসবাস করিতে থাকেন।

তিনি "এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গলের" সদস্য ছিলেন এবং এই সময় তিনি সম্রাট আকবরের জনৈক কর্ম্মচারী নাজিমুদ্দিন আহমেদ রচিত একখানি পার্শি পুস্তকের অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করেন ; তাঁহার লেখা প্রায় শেষ হইয়াছে, মাত্র শেষখণ্ডের সূচীপত্র লেখার ভার সোসাইটীর কর্তৃপক্ষের উপর রহিয়াছে।

১৯২৫ খৃঃ ১২শে জানুয়ারী তাঁহার চতুর্থ কন্যা ধনামধন্যা স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত দেহ ত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত দে ১৯৩২ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পল্লীকর্ম্মীর অভিজ্ঞতা

পল্লীগ্রামে কোন কাজ করা খুবই শক্ত মামলত্। কথাটা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এর জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা শরৎবাবুর "পল্লীসমাজে"র মধ্যেই পাই। এ যে শুধু উপন্যাসের কাল্পনিক চিত্র তা নয়, নিছক্ সত্য। রমেশ তার পল্লীর জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করিল—কিন্তু তার মাথায় পড়িল লাঠি, গেল জেলে। বেণী ঘোষাল বা গোবিন্দ গুঙ্গোর মত পল্লীদেবতার অভাব নাই। কিন্তু যে প্রকৃত কাজ করিতে চায় তাকে হইতে হইবে প্রচণ্ড সহিষ্ণু। রমেশ যখন অভিমান করিয়া জেঠাইমাকে বলিল—"জেঠাইমা, আমি আর এখানে থাকব না,এরা আমাকে চায় না।" তখন জেঠাইমা বলিলেন—"বাবা, যেহেতু ওরা তোমায় চায় না সেহেতু তোমারই এখানে থাকা দরকার,ওরা যে কী অজ্ঞান তা কি বুঝছ না?"

শরৎবাবুর আরেকটা খুব সুন্দর কথা আছে যার ভাবটা এই যে আমাদের সব চাইতে বড় অভিসম্পাত এই যে সব কাজেই বিদেশীর চাইতে দেশী লোকের সঙ্গে লড়াই করিতে হয় অনেক।

কিন্তু দেশী লোকের "অজ্ঞানতাটা" কিসের এবং "লড়াইটা" হয় কেন—তার কারণ খুঁজিলে দেখা যায় বহু পরিমাণ আমাদের নিজেদের চরিত্রের। পল্লীগ্রামে কোন কাজ করিতে গিয়া আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছে আজ সে অভিজ্ঞতাগুলির কথা এখানে কহিব। আশা করি পল্লী কর্ম্মীদের মধ্যে কেউ কেউ আমার কথায় সায় দিবেন।

(১) কতকগুলি লোক আছে যারা চায় যে কোন পাব্লিক্ কাজেই তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা পূর্ব্ব হইতেই আবশ্যক। হয়ত তাদের মধ্যে "চুনোপুঁটি" বা অতি সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির লোকই অনেক; তবু তারা চায়। যদি একেবারে গোড়াতে তাদের Consult না করা হয় তবে তারা এমন বাঁকা হয় যে শেষে একটা প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিবার চেষ্টায় থাকে। একটা জিনিষ গড়া কঠিন, ভাঙ্গা সহজ। সুতরাং ঐ সব লোকদেরও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সুতরাং নিরাপদ প্রণালী বা Safe procedure এই যে, পল্লীতে কোন প্রতিষ্ঠান করিতে হইলে তার পূর্ব্বে সকলকেই আহ্বান করিয়া তাদের Consult করিয়া তবে কাজে অগ্রসর হওয়া ভাল অর্থাৎ wise।

(২) আবার কতকগুলি লোক আছে যারা খুঁটিনাটি লইয়া গোল করে। যেমন—কোন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদি নির্ব্বাচন বা কার্য্যকরী সমিতি গঠন বা কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক "ন্যাকড়া"—Technicalities নিয়া হৈচৈ করে। যদিও প্রকৃত দেশ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ওসব করা উচিত নয়,কারণ Spirit টা থাকা উচিত অন্য রকমের। তবু যেহেতু এরূপ গোলমাল বাধে, সুতরাং উল্লিখিত বিষয়গুলিও পল্লীর সাধারণ সভাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্পন্ন হওয়া দরকার।

(৩) আবার আরেক প্রকারের কতকগুলি লোক আছে যারা নামটা বড় বেশী চায় নামের কাঙ্গাল। খবরের কাগজে "অমুকের" নাম দেওয়া হইল কিন্তু অমুকের দেওয়া হইল না, এ নিয়াও বাধে গোল। সুতরাং যারা ওরকম নামের কাঙ্গাল তাদের নামটা প্রচার করাও এক রকম নিরাপদ।

(৪) চতুর্থ প্রকারের আবার একজাতীয় আদমি আছে যারা হয়ত গোসা করে এজন্য যে অমুক বাবুর কাছে প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে পরামর্শ লইতে যাওয়া হয় কিন্তু আমাদের কাছে কেন আস না ইত্যাদি। এসব বিষয়েও যিনি কর্ম্মী, যিনি কোন কাজে lead নিবেন তাঁহার সকলকে আহ্বান করিয়াই যতটা সম্ভব সকলের পরামর্শ নেওয়া

উচিত। অবশ্য যদিও সব প্রতিষ্ঠানেরই "পরামর্শ সমিতি" বা "কার্য্যকরী সমিতি" থাকে তবু অনেক সময় কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে কর্ম্মীকে পরামর্শ বা উপদেশের জন্য ঘন ঘন যাতায়াত করিতে হয়। কিন্তু তাতে ঐ হয় বিপদ।

অনেক শ্রেণীর লোক আছে যারা শুধু করে হিংসা। অর্থাৎ অমুকে একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন, তিনি একটা সুনাম অর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন—এটা তাদের সহ্য হয় না। সুতরাং এসব কারণের জন্য যিনি কর্ম্মী হইবেন তাঁকে খুব সাবধান হইতে হইবে। তাঁকে হইতে হইবে অতিরিক্ত বিনয়ী এবং যাতে তাঁর নাম কাগজে পত্রে বেশী না থাকে বা আদৌ না থাকে—সেটা তাঁর দেখা উচিত।

যদিও এটা সত্য কথা যে যেই কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে বা কোন ব্যাপারে lead নেয় তাকেই সব চাইতে সে বিষয়ে বেশী স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেকে যে তা বুঝে না ঐ ত হয় মুস্কিল! পল্লীগ্রামে একটা কথা এই যে কোন ভালমন্দ প্রতিষ্ঠান যদি কেউ না গড়ে—তবে আপদবালাই কিছুই নাই। যে তিমিরে সেই তিমিরেই তারা থাকিবে, সেই বেশ। কিন্তু যদি একটা কিছু কেউ করে তবেই বাদ্,—ওটাই হয় আন্দোলন, সমালোচনা ও দলাদলির নামলত্ হইয়া দাঁড়ায়। ইংরেজীতে যাকে বলে Bone of contention।

আমার মনে হয় আমাদের মত যারা "সাধারণ লোক"-তারা যদি গ্রামের কোন কাজ করিতে চায় তবে 'শনি পূজা'র পূজারীর মত হওয়া দরকার- অর্থাৎ সবাইকে যথাসম্ভব খুসী রাখিয়া।

আমার একথাগুলিই যে সত্য এবং সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়—সাধারণ কর্ম্মীদের পক্ষে ও-পথ। তবে যাদের অসীম মনো বল, ধন-বল বা জনবল আছে তাদের কথা আলাদা। তারা নিজেরা কারো পানে না তাকাইয়াই অনেক কাজ করিতে পারেন; তবে জনবল বা জনবল যাদের আছে তাঁরা যেমন একটা কাজ প্রগতির সঙ্গে সাধন করিতে পারিবেন—মনোবল লইয়া কাজ করিলে অত সহজে হইবে না, তবে হয়ত একদিন, হয়ত কেন, একদিন সকল মানুষকেই মনোবলের কাছে মাথা নোয়াইতে হয়।

প্রেরণা

শ্রী গুরুসদয় দত্ত

কেন নেচে' উঠে দেহ মন আনন্দে?
কার মিলন-আশায়
সুখ দুখ বেদনায়
বাজে তান হৃদয়ের স্পন্দে?
চলেছে জগৎ নেচে'
যুগে যুগে অবিরত
সেই প্রলয়ে কার ছন্দে?—
জীবনে মরণে তার
সীমাহীন প্রেরণার
সুধাময় দান দিয়া বন্দে?

শালিখা মহিলাসমিতি

এই শিশু সমিতির পক্ষ হইতে আমি ইহার ছয় বর্ষের বিবরণী আপনাদের অবগতির জন্য নিবেদন সকল সদনুষ্ঠানের উন্নতির দিকে অন্যান্য অর্থেষ্ট যেমন চিরদিন অন্তরায়, আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতির পক্ষে তাহা অধিকতর প্রযুজ্য। তাহা সত্ত্বেও আমরা এই ছয় প্রতিযোগিতার দিনে যে আরও এক বৎসর কাল যথাসাধ্য কার্য্য করিয়া কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহা কেবল বিধাতার আশীর্ব্বাদ ও কর্ম্মিদের একনিষ্ঠা, শিক্ষার্থিনীদের আন্তরিক অধ্যবসায় ও সাধারণের শুভেচ্ছার জন্যই হইয়াছে।

সীবন শিল্পের প্রচার ও তাহার উন্নতি, দুঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ও অনাথা বিধবাদিগের মধ্যে এই শিক্ষার বিস্তার ও তাহাদের কথঞ্চিৎ আর্থিক কষ্টের লাঘব, সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। গত ছয় বৎসরকাল সমিতি নীরবে এই কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রথম বৎসর ছাত্রীসংখ্যা ৮ জন হইতে অদ্য ২২ জন ছাত্রী প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শিক্ষাগারে থাকিয়া সীবন শিল্পের নানাপ্রকার কারুকার্য্যের শিক্ষালাভ করিতেছে।

গত ২ বৎসরে ২ জন ছাত্রী সমিতি হইতে শিক্ষালাভ করিয়া স্বাধীনভাবে এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া নিজের ও সন্তান সন্ততিদিগের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতেছেন। নিতান্ত আলস্যে ও ঔদাসীন্যে সময়ক্ষেপ না করিয়া বিধবাগণ দ্বিপ্রহরে এই শিক্ষাগারে নিয়মিত উপস্থিত হইয়া শিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক আর্থিক কষ্ট দূরীকরণ ও তৎসহ নিজেদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হন।

গত ৫ বৎসর কাল বিনা অর্থে এই সমিতি ২১ নং রামলাল মুখার্জ্জি লেনে অবস্থাপিত ছিল। উপরোক্ত বাড়ীর মালিকের এই অকৃত্রিম কৃপার জন্য সমিতি চিরদিন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে। এই বৎসর শ্রাবণ মাসের ১৫ই তারিখে সমিতির শিক্ষাগার ১৫ নম্বর রামলাল মুখার্জ্জি লেনে মাসিক ২০৲ টাকা ভাড়াতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

গত বৎসরের কার্য্যবিবরণীতে উল্লিখিত শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী সমিতি গৃহে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষার্থিনীদিগকে যত্নপূর্ব্বক শিল্পশিক্ষা দেন। সংবাদপত্র পাঠ ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা করা হয়।

এই লোকহিতকর অনুষ্ঠানে সাধারণের উৎসাহ ও যথাসাধ্য সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়। অর্থদ্বারা সব সময় সাহায্য সকলকার পক্ষে সম্ভব নয়; আমাদের একান্ত অনুরোধ যদি তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য, যথা, সেমিজ, বডি, পেটিকোট, কতুয়া, সার্ট, পিরাণ, ব্লাউজ প্রভৃতি জামা তৈয়ারীর ভার আমাদের হস্তে করেন তাহাতেই সমিতি তাঁদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইবে।

পরিশেষে সমিতির একান্ত অভাবের কথা সংক্ষেপে আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি। বিবরণীর প্রথম অংশে উল্লিখিত আছে যে এবৎসর শ্রাবণ মাস হইতে সমিতিকে মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে বাড়ী ভাড়া দিতে

হইয়াছে সুতরাং মাসিক খরচ সমিতির সাধ্যাতীত বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার উপর সমিতির দুইটি সেলাই কলের বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, জনসাধারণ এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানের এই অভাবটি পূরণ করেন। সামান্য সামান্য আর্থিক সাহায্য করিলেই আমাদের এই অভাব অচিরে মোচন হইবে।

সমিতির সুচারুরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। তাহার জন্য বর্ত্তমান সভ্যাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া একান্ত আবশ্যক। উপস্থিত সভ্যাগণের কাছে আমাদের নিবেদন যেন তাঁহারা স্ব স্ব আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে এই সমিতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অনুরোধ করেন। আন্তরিক চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে।

আলোচ্য বর্ষে সমিতির আয় মোট ২০৮৪৶৫, এবং ব্যয় ১৪৪১।৶০, নগদ মজুত ৬৪৩৶৫ আনা আছে।

সম্পাদিকা
শ্রীভানুমতী দেবী

বাগেরহাট মহিলাসমিতি

প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে বাগেরহাটে প্রথম মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময় আমাদের একান্ত দিবালোকে এই সহরের এক পল্লী হইতে অপর পল্লীতে যাতায়াত করা পরম অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু সেই সময় বাগেরহাট ও বাসাবাটীর কয়েকজন দৃঢ়চিত্ত উৎসাহী রমণী বহু দিনের সেই জীর্ণ সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মহিলা সমিতির সভ্যা হন এবং অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করিয়া স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়-গৃহে মেলামেশা, সংবাদপত্র ও গীতা পাঠ এবং নানাবিধ সৎপুস্তকাদি পাঠে নিজেদের অবস্থা অনেকটা উন্নত করিয়া তুলেন। এই সাত বৎসরে বাগেরহাট মহিলাসমিতির তত্ত্বাবধানে সরোজনলিনী কেন্দ্র-সমিতির অনুগ্রহে তিনবার সেলাই ক্লাস হয়; প্রতিবার চারিমাস করিয়া ক্লাস হয়। সরোজনলিনী কেন্দ্রসমিতি প্রথমবার শ্রীমতী শিবরাণী ঘোষকে শিক্ষয়িত্রীরূপে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁহার বেতন প্রতিমাসে ৩০৲ টাকা হিসাবে ১২০৲ টাকা কেন্দ্রসমিতিই দেন। পরে অতি দুইবারে ৮ মাস শ্রীমতী নলিনী দত্ত বাগেরহাটে মহিলা সমিতির সেলাই ক্লাসে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। তাঁহার বেতনের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১২০৲ টাকা কেন্দ্রসমিতি দেন অপর অর্দ্ধেক আমরা মহিলাসমিতি হইতে দিই। পরে একবার স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুত অরুণচন্দ্র নাগ এম্. বি, মহাশয়ের পরিচালনায় কেন্দ্রসমিতির প্রদত্ত ১২০৲ টাকা গ্রাণ্ট পাইয়া স্থানীয় ভদ্রমহিলা এবং পেশাদার ধাই সর্ব্ব-সমেত ১৫ জন ছাত্রী লইয়া একটী ধাই-ট্রেণিং ক্লাস হয়। পর বৎসর ডাঃ শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি এম, বি, মহাশয়ের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় দশ জন ছাত্রী লইয়া আর একটী ধাই ট্রেণিং ক্লাস খোলা হয়; কিন্তু সে সময় দেশে রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন ও তীব্র আন্দোলনের মধ্যে পড়ায় সে ক্লাসটী শেষ হয় নাই। আশা আছে, শীঘ্রই ধাই-ট্রেণিং ক্লাসটী শেষ হইবে। বলাবাহুল্য এ ক্লাসটীর জন্যও কেন্দ্রসমিতি দেড় শত টাকা গ্রাণ্ট দেন। এ পর্য্যন্ত বাগেরহাট মহিলা সমিতির পরিচালনায় দুইবার শিল্পপ্রদর্শনী, দুইবার শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিবারই মহিলা সমিতি এ জন্য প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বাংলার ভিতর প্রথম মহিলা সম্মেলন বাগেরহাটই ডাকেন; তৎসঙ্গে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হয়। এ কাজের সাফল্যেও বাগেরহাটবাসী যথেষ্ট গর্ব্বিত। ইহা ব্যতীত বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে সাহায্য দান, স্থানীয় হরিসভিবের রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানারূপ সৎকার্য্যও মহিলা সমিতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। সরোজনলিনী কেন্দ্র সমিতি হইতে সমিতি স্থাপনার প্রথম বৎসর হইতে সুন্দর শিল্পকার্য্যের জন্য, মহিলা সমিতির কার্য্যের সাফল্যের জন্য, প্রতি বৎসরই পুরস্কার পাইয়া থাকেন। সুন্দর কাঁথার জন্য সমিতির জনৈকা সভ্যা কেন্দ্র সমিতি হইতে সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন প্রভৃতিকে সমিতি হইতে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আমরা বিশেষ করিয়া গত এক বৎসরের কার্য্যাবলীই আলোচনা করিব। গত বৎসর মে মাসের শেষভাগে সমিতির চেষ্টায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য লইয়া স্থানীয় মহিলা ও বালিকাগণকে অল্প সময়ের মধ্যে কিছু অর্থকরী এবং সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয়

শিল্পশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গত জুন মাসে এখানে একটী অন্তঃপুর-শিল্প শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। উক্ত শিক্ষালয়টী বর্ত্তমানে স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা বর্ত্তমানে ৬। গত জুন মাসে স্কুল আরম্ভ করার সময়ে সরোজ নলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়ের সার্টিফিকেট প্রাপ্তা মহিলা হাওড়া জেলার বালুটী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা আশালতা দাসগুপ্তা এই স্কুলে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহার শিক্ষাদান কৌশলে স্কুলটীর উপর স্থানীয় ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণের সুদৃষ্টি পতিত হয়। তৎপরে জুলাই মাসের শেষে তাঁহার পারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্কুলের কাজ তিনি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য-কালের মধ্যে শ্রীযুক্ত শুকলাল নাগ, এম, এল, সি, খলিলর রহমান, রসিকলাল চক্রবর্ত্তী, রায় সাহেব ও আবদুলগণি পরিদর্শনে আসেন এবং স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রীদের হাতের নানারূপ সুন্দর সুন্দর ছাঁটকাট সমন্বিত জামা সেলাই দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেলি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাবি ও সার্ট পর্য্যন্ত এবং সুন্দর সূচীকার্য্য সমন্বিত রুমাল ও টেবিল ক্লথ, টিপয় কভার প্রভৃতি দেখান হয়; এবং তাঁহারা, এই স্কুলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্রীগণই সমান যত্নে শিক্ষা পাইবার অধিকারিণী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পরিদর্শনে তাঁহারা স্কুল ঘরটীর আয়তন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেন এবং বলেন যে ঘরটী আরও বড় না হইলে ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব, তবে ইহাও বলেন যে, স্কুলটী চলিতে থাকিলে জেলাবোর্ড স্কুলের স্থায়ী ঘরের জন্য সাহায্য করিবেন। বলা বাহুল্য, স্কুলটী প্রধানতঃ জেলাবোর্ডের সাহায্য ও সহানুভূতিতে লালিত পালিত হইতেছে। এজন্য জেলাবোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুরকে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য দান ব্যতিরেকে এই প্রতিষ্ঠানটী কোনরূপেই যে চলিত না ইহাও নিঃসন্দেহ।

পরে গত আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির কর্ত্তৃপক্ষদের অনুগ্রহে আমরা আর একজন ঐ স্থানের সার্টিফিকেট প্রাপ্তা মহিলা শ্রীযুক্তা হরিদাসী প্রামানিককে শিক্ষয়িত্রীরূপে আনিতে সক্ষম হই। তাঁহারও শিক্ষাদান কৌশল প্রশংসনীয় এবং তাঁহার মিষ্ট ব্যবহার ছাত্রীগণকে মুগ্ধ করিয়াছে।

গত ২৭।৮ তারিখে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর স্বয়ং শিল্প শিক্ষালয়টী পরিদর্শনে আসেন। স্কুলের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাদান প্রভৃতি দেখিয়া ও জানিয়া তিনি বিশেষ পরিতুষ্ট হন এবং অবিলম্বে স্কুলের নিজস্ব একটী সেলাই কলের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন। স্কুল গৃহটী ছোট, ইহা তিনিও লক্ষ্য করেন। স্কুলের মাসিক ব্যয় বর্ত্তমানে ৫০৲ টাকা কিন্তু জিলাবোর্ড হইতে বর্ত্তমানে মাসিক ৩০৲ টাকা হারে আমরা সাহায্য পাইতেছি এবং আর ২০৲ কুড়ি টাকা বর্ত্তমানে স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করিয়া ও মহিলা-কর্ম্মী-সংসদের তহবিল হইতে পূরণ করা হইতেছে। চেয়ারম্যান বাহাদুর বলিয়াছেন—"প্রতিষ্ঠানটী বিশেষ সহানুভূতির যোগ্য।" শিক্ষালয়ে মণিপুরী তাঁত বসান হইয়াছে।

স্থানীয় বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে লইয়া স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে।

স্থানীয় বিজ্ঞ প্রবীণ ভদ্রমহোদয়গণ সময় মত উপদেশ ও পরামর্শদানে আমাদিগকে উপকৃত করিয়া থাকেন। এক্ষণে সাধারণের সহানুভূতি এই প্রতিষ্ঠানটীর স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করিয়া আমরা প্রার্থনা করিতেছি। আশাকরি এই প্রতিষ্ঠানটী কখনই সাধারণের স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে না।

গত ২৫শে এপ্রিল ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় শিল্প-শিক্ষালয় পরিদর্শনে আসেন এবং স্কুলের কাজ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন, তবে তিনি স্কুলের জন্য শীঘ্রই একটী নিজের বাটী নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া অনতিবিলম্বে অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিতে বলেন। এজন্য আমরা জন সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করি।

জেলা বোর্ডের সাহায্যে স্থানীয় মহিলাদের লইয়া খুলনা জেলার প্রতি গ্রামে মাতৃ-মঙ্গল, শিশু-মঙ্গল ও সাধারণ

স্বাস্থ্য বিষয়ে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য একটী প্রচারিকা সঙ্ঘ আমরা খুলিতেছি। এই সঙ্ঘের প্রচারিকাগণ অবস্থা এবং ইচ্ছা অনুসারে পাথেয় এবং পারিশ্রমিকও পাইতে পারিবেন। আমরা খুলনা জেলার যে কোন শ্রেণীর ভদ্র মহিলাগণকে এই প্রচারিকা সঙ্ঘভুক্ত হইবার জন্য নিবেদন করিতেছি। জাতির স্বাস্থ্য প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ মায়েদের হাতে, তাই আজ জাতির উন্নতি কামনায় এই প্রচারিকা সঙ্ঘ গঠন করিতে অভিলাষী হইয়া জননী ও ভগিনীগণকে আহ্বান করিতেছি। বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য "সম্পাদিকা মহিলা কর্ম্মী সংসদ, বাগেরহাট" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। প্রচারিকা সঙ্ঘের জন্য জেলা বোর্ড ১২৫৲ টাকা মূল্যের স্লাইড দিয়া আমাদের অসীম উপকার করিয়াছেন; এজন্য জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর ও হেল্‌থ্ অফিসার মহোদয়ের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। একটী ল্যাণ্টার্ণও কিছুদিনের জন্য জেলাবোর্ড দিবেন।

এই ব্যতীত শিশু মঙ্গল, মাতৃ-মঙ্গল ও বিভিন্ন দেশের ও কালের নারী-প্রগতি এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটী মিউজিয়মও আমরা শীঘ্রই খুলিব স্থির করিয়াছি। এজন্যও আমরা জেলাবোর্ডের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বাংলার গৌরব ও খুলনার মুকুটমণি আচার্য্য দেবের কৃপায় মহিলাগণের জন্য একটী পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য ৫০ টাকা মূল্যের পুস্তক পাইয়াছি।

খুলনার অন্যতম দেশ-প্রেমিক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র কমলা বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী মহাশয় অত্র পাঠাগারের জন্য ২০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক দান করিয়া আমাদের উপকার করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোম্পানীর সত্বাধিকারী সুরেশ চাটার্জ্জী মহাশয় আমাদের এই পাঠাগারের জন্য ১০।১২৲ মূল্যের পুস্তক প্রদান করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আমরা অবিলম্বে "কল্যাণী পাঠাগার" নাম দিয়া একটী পাঠাগার সাধারণের গোচরে আনিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। এজন্য চাই সমগ্র খুলনাবাসী নর নারীর ঐকান্তিকতা, সহৃদয়তা বর্ত্তমানে আমরা যে কয়টী গঠনমূলক কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহা কখনও ২।৩ জনের চেষ্টায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে না—তাই বাগেরহাট ও খুলনার সমস্ত সহৃদয় ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য সহানুভূতি ও আন্তরিকতার দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন। পরিশেষে ইহাও জ্ঞাতব্য যে জেলা বোর্ড হইতে মাসিক পনর টাকা অর্থ সাহায্য লইয়া বাগেরহাট মহকুমার তিনটী বিধবা মহিলা কলিকাতায় অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার্থে গিয়াছেন। সমগ্র খুলনা জেলায় নয়টী মহিলা এই বৎসর এই অর্থ সাহায্য পাইলেন, তন্মধ্যে একজন মুসলমান মহিলা, একজন নমঃশূদ্র মহিলা। জেলা বোর্ডের নির্দ্দেশ পাইয়া মহিলা কর্ম্মী-সংসদ কতিপয় মহিলাকে টীকাদান কার্য্যের জন্য ট্রেণিং দিবার আয়োজন করিয়াছেন। শীঘ্রই মহিলা টীকাদারের ট্রেণিং ক্লাস আরম্ভ হইবে। যে সমস্ত মহিলা উপরোক্ত কাজ করিতে এবং শিখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য অবিলম্বে মহিলা কর্ম্মী-সংসদের সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র ব্যবহার করুন। বর্ত্তমান বর্ষে মহিলা সমিতির সুপরিচালনার দক্ষতার পুরস্কার-রূপে শ্রীযুত বাবু গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস, প্রদত্ত ৫০৲ টাকা মূল্যের একটী সুবর্ণপদক সমিতির অন্যতমা সম্পাদিকা লীলা মিত্র পাইয়াছেন। এজন্য সমিতির প্রত্যেকেই বিশেষরূপে আনন্দিত। খুলনা জেলা বোর্ডের এইরূপ সৎকার্য্য প্রতি জেলা বোর্ডের অনুকরণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্যবর্ষে এই সমিতির আয় ৬০০৲ এবং ব্যয় ৫৮৯৲ টাকা, নগদ জমা ১১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীউষাসতী দেবী
শ্রীলীলা মিত্র
সম্পাদিকাদ্বয়

কার্ত্তিকপুর মহিলাসমিতি

বহুদিন পূর্ব্বে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির তৎকালীন প্রচারক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সেন বি, এ, কার্ত্তিকপুরে একটী মহিলাসমিতি স্থাপন করেন। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত সমিতিটী সুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক

নাস হইল, কার্ত্তিকপুরের কতিপয় উৎসাহী ও কর্ম্মঠ মহিলার প্রচেষ্টায় সমিতিটী পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত হইয়াছে। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক আত্মোন্নতির বিধান করা। এতদুদ্দেশ্যে (১) প্রতি রবিবার স্থানীয় বিভিন্ন বাটীতে সমিতির সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন হয় ও তাহাতে মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হয়। উক্ত সাপ্তাহিক সভাগুলিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক চার্ট ঝুলাইয়া ম্যাজিক লণ্ঠনের মত স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যগুলি সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। (২) সোমবার সঙ্গীতের ক্লাস হয় এবং বালিকারা সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন। (৩) মঙ্গলবার ধাত্রীবিদ্যা ক্লাস হয় এবং বন্ধ্যা, বিবাহিতা, বিধবা ও প্রায় ধাত্রীগণ তাহাতে শিক্ষা লাভ করেন। সম্প্রতি ধাত্রীবিদ্যা ক্লাসটি ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে। (৪) বুধবার শিল্পের ক্লাস হয় এবং মহিলাগণ ছাট, কাট, সেলাই ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য শিক্ষা করেন। উল্লিখিত কার্য্যসূচী রীতিমতভাবে অনুসরণ করা হইতেছে।

এবার পূজার ছুটীতে মহিলাসমিতির এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে কার্ত্তিকপুরের আগন্তুক প্রবাসী সকল ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণই উপস্থিত ছিলেন। মিসেস্ শ্রীমতকুমার দাসগুপ্ত সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সভাতে মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত কুমার দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন চৌধুরী, এডভোকেট শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন চৌধুরী, আই, এস্, এস্, প্রভৃতি সমিতির কার্য্যে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন।

আগামী বড় দিনে মহিলাসমিতির পক্ষ হইতে একটি স্বাস্থ্য, শিল্প ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। ফরিদপুরের হেল্‌থ অফিসার, সংযোজনিনী নারী সমিতির প্রচারক, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রদর্শনীতে যোগদান করিবেন। কলিকাতা রেডক্রস সোসাইটীর মিসেস এ. কটন্, এবন্ধ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য ও কতক সুন্দর চার্ট পাঠাইয়া দিয়াছেন। কার্ত্তিকপুরের প্রবাসী ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র-মহিলাগণ এই প্রদর্শনীর জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীনলিনী দাস
সম্পাদিকা

বিদায়-বরণ

কল্যাণী সঙ্ঘ ; চক্রধরপুর

গত ২৪শে জুলাই ১৯৩২ উক্ত কল্যাণী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদিকা শ্রীমতী পঙ্কজিনা বের স্থানান্তর গমন উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। চক্রধরপুর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে স্থানীয় কল্যাণী সঙ্ঘের মহিলারা বিদায় বরণ অনুষ্ঠানটী, বাংলা দেশের পল্লী সমাজে যেরূপ ধান্য দুর্ব্বা শঙ্খ ও উলুধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হয়, ঠিক্ সেই ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন। সভার প্রারম্ভে সঙ্ঘের অন্যতম সহকারী সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্ত প্রহরাজ একটী সুসজ্জিত মোটরে সম্পাদিকা শ্রীমতী দে ও সভানেত্রী শ্রীমতী পঙ্কজ লতা কাকতিকে লইয়া আইসেন। তাঁহারা সভায় প্রবেশ মাত্র সমবেত প্রায় শতাধিক মহিলা শঙ্খ ও উলুধ্বনি দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। কুমারী শুকলতা চট্টোপাধ্যায়, কুমারী হিরণ্ময়ী সান্যাল ও কুমারী মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় নাম্নী তিনটী বালিকা দ্বারা বিদায় সঙ্গীত গীত হওয়া মাত্র শ্রীমতী দেকে শঙ্খ, সিন্দুর, আলতা, ফুল, মালা, ধান্য, দুর্ব্বা, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা বরণ করা হয়, এবং সঙ্ঘ হইতে একটী সিন্দুর পূর্ণ রূপার সিন্দুর কৌটা ও এক জোড়া শাখা উপহার দেওয়া হয়। এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন করিবার পর, সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সহঃ সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমন্ত প্রহরাজ সঙ্ঘের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ ও প্রদান করেন। অন্যতম সহঃ সম্পাদিকা শ্রীমতী সুবর্ণ সান্যাল, শ্রীমতী অমলা সেন প্রভৃতি মহিলারা সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন; এবং কিশুবাসিনী বন্দ্যোপাধ্যায় একটী সুমধুর কবিতা পাঠ করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী দে অভিনন্দনের উত্তর দেন। সমবেত মহিলাগণ ও বালক বালিকাগণ জলযোগ করেন, এবং সমবেত মহিলাগণের ফটো গ্রহণান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

রবীন্দ্র শিল্প

শ্রীপরিমল গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেদিন বাংলাদেশে প্রথম আবির্ভূত হইল, সেদিন এদেশের পক্ষে ছিল পরম দুর্দিন। অসাধারণ ছন্দে এবং অবোধ্য ভাষায় তিনি যে আবর্জনা সৃষ্টি করিতেছিলেন তাহার ওজন এবং বিস্তৃতির পরিমাণ দেখিয়া দেশের লোক ভীত হইয়াছিল।

এই রচনা শুধু কবিতায় আবদ্ধ ছিল না। প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে লোকে পাগল হইবার উপক্রম করিল। দেশ সুদ্ধ লোক নিরাশায় দমিয়া গেল তবু লেখক দমিলেন না। ইহার একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন জমিদার পুত্র, প্রচুর অর্থ তাঁহার হাতে ছিল—এবং এরূপ অর্থ অন্য লোকের হাতে থাকিলে সেও ঐরূপ রাশীকৃত জঞ্জাল সৃষ্টিতে পরাঙ্মুখ হইত না, একথা জোর গলায় প্রচারিত হইল।

সংবাদ পত্র পদ্যে পদ্যে কবিকে আক্রমণ করিল। এমন দেখা গেল চতুর লোক মোসাহেবির পরিবর্তে রবিবাবুর নিন্দা করিয়া ধনী লোকের নিকট হইতে প্রার্থিত বস্তু লাভ করিতেছে।—যে হতভাগ্য রবিবাবুর লেখার মধ্যে কোনো অর্থ দেখিতে পাইত তাহার আর নাকালের অন্ত থাকিত না।

হিতৈষীরা কবিকে সদুপদেশ দিলেন—বাপুহে এ সবের মধ্যে কেন?—দিব্য আরামে খাও দাও, ঘুমাও এবং জমিদারীর কাজ দেখ।—লক্ষ্মীর ক্রোড়ে যাহার স্থান হইয়াছে সরস্বতীর বীণা লইয়া খেলা করা তাহার পক্ষে শোভন নহে।

এ খুব বেশি দিনের কথা নহে, তবু এই অল্পদিনের মধ্যেই দেশে হঠাৎ সুদিন কেমন করিয়া আসিল তাহা বলা শক্ত। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বিনিদ্র দেশের মুখর সমালোচকগণ সহসা চুপ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে বিস্মিত নেত্রে কবির প্রতি চাহিয়া বিশ্বের প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিলেন—তাইত লেখাগুলি ত মন্দ নয়।

ইহার পরেই শুনা গেল,—লেখাগুলি তুলনহীন। রবিবাবুও রবীন্দ্রনাথরূপে নবীন পাঠকের চিত্ত অধিকার করিলেন। নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। পূর্বে যাঁহারা বিদ্রূপ করিতেছিলেন তাঁহারা লজ্জিত হইলেন। ধর্মপ্রাণ আর্য বলিয়া গর্বিত থাকার দরুণ অনেক টীকাকারের ভিতরে প্রথমে কেবল নাস্তিকতাই দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহাদের আর্য ভাব শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুই আর অসঙ্গত থাকিল না।

ইহার পর সকলে স্বীকার করিলেন যে বর্তমান যুগ রবীন্দ্র যুগ। বাজারে দুর্বোধ্যতা এবং মিস্‌টিসিজ্‌ম্ লইয়া খুব আন্দোলন হইয়াছিল এবং অনেকেই বলিতেছিলেন যে কবিতার অর্থ এরূপ সরল হওয়া উচিত যে দাশুরায়ের পাঁচালীর সঙ্গে তাহাকে যেন সব সময়েই তুলনা করা যায়, এবং মিস্‌টিসিজ্‌ম্ বলিয়া কোনো কথা যেন কবিতার সম্বন্ধে কখনো না উঠে।

অবশেষে অনেক বিতণ্ডার পর দেখা গেল যে মিস্‌টিসিজ্‌ম্ আমাদের দেশের সাধকেরই চিন্তার এক রীতি—উহা ফ্রান্সাডের বিদ্যুৎ প্রবাহ হইতে ধার করা নহে।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার লেখার দ্বারা তিনি স্বদেশের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন—আজ আবার তেমনি তাঁহার চিত্র প্রকাশ করিয়া দেশের ল' অ্যাণ্ড-অর্ডার ভঙ্গ করিতেছেন।

লোকে বলিতেছে আবার এ সবের মধ্যে কেন?—দিব্য আরামে খাও, দাও, ঘুমাও এবং কবিতা লেখ। সরস্বতীর ক্রোড়ে স্থান পাইলে বড় জোর চিত্তরঞ্জনের মত কাব্য রচনা করা যায়—চিত্রাঙ্কন করা যায় না।

বন্ধুগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, তাই কবির উপরে আর ভক্তি রাখিতে পারিতেছি না,—তিনি ছবি আঁকা ধরিলেন কেন?

বলা গেল—এটা অদ্ভুত সন্দেহ নাই, তবে যাহাই হউক, চুপ করিয়া মানিয়া যাও।

প্রশ্ন হইল—এটা অন্যায় কথা, যে জিনিষ আনন্দ দেয় না তাহাকে মানিব কেন?

উত্তর দেওয়া গেল—আর কিছুই না, ভবিষ্যৎ লজ্জার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য।—রবীন্দ্রনাথের কবিতা কবিতা নয় বলিয়া যাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা আজ লজ্জা পাইতেছে।

—এটা অন্ধ ভক্তির কথা, আমরা অন্ধ হইতে পারিব

—নূতন করিয়া হইবার দরকার করে না—আমরা ভক্তি করিবার জিনিষ মাত্রেই অন্ধভাবে ভক্তি করি। রবীন্দ্রনাথ যদি কবিতায় সত্যকার আনন্দ দিয়া থাকেন তবে তাঁহার চিত্রকে ভাল বাসিয়া গ্রহণ করিতে এত আপত্তি কেন? আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার আনন্দের দান গ্রহণ করিতে উকিলের পরামর্শ লই না।

আইনস্টাইন থিওরি-অব-রিলেটিভিটি প্রচার করিয়াছেন, জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের বোধ শক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। আমরা সাধারণ লোক উহা কিছুই না বুঝিয়া শুধু শুনিয়াই মানিয়া লইয়াছি। মানিয়া লইয়াছি কেন?

কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ মানিয়া লইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মানাকে অনুসরণ করিয়া মানিয়াছি। অথচ এই মানার মধ্যে লেশমাত্র কৃপা মিশ্রিত নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবি—

রবীন্দ্রনাথের ছবিও যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র সমালোচকগণ মানিয়া লইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মানিয়া লওয়াকে না হয় অনুসরণ করিলাম। আমাদের বাংলাদেশের শিল্পী যদি নূতন সৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমঝদারদিগকে পুলকিত করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমাদের ঈর্ষা করিবার হেতু দেখি না।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র যে দেখা যায়, বুঝা যায়, অন্তত তাহা হইতে হাতে হাতে যে ফল পাওয়া যায়, তাহাকে ওজন করা যায়, তাহার মূল্যাবধারণ করা চলে।

সে কথা ঠিক। সাহিত্যে, শিল্পে হাতে হাতে কোনো ফল পাওয়া যায় না,—তাহার লক্ষ্যই যে আনন্দ দেওয়া। এই আনন্দ যন্ত্রে মাপিবার কোনো উপায় নাই, এবং নাই বলিয়াই শিল্প যে বিজ্ঞান নহে ইহা প্রমাণ করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হয় না।

এক ভাবে দেখিতে গেলে সাহিত্য, শিল্পকে মাপিবার কোনো মানদণ্ড নাই বলিয়া বিশ্বের সমস্ত শিল্প সৃষ্টিকে কিছু-না বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া খুব সহজ।

ইহা যাচাই করিবার যে মাপকাঠি আছে তাহা কোনো দোকানে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় গুণীদের মনে। সাহিত্যের মূল্যপাত করিবার মানদণ্ড শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচকগণ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রচনা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। শিল্পের মানদণ্ড শ্রেষ্ঠ শিল্পসমালোচকগণ ঠিক ঐরূপেই শ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। আগে সৃষ্টি হইয়াছে—আদর্শ স্থির হইয়াছে পরে। কিন্তু এই আদর্শ চির-স্থির নহে। নব নব প্রতিভার কাছে চির-দিন আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং ছন্দ পূর্ব্বের আদর্শকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, একথা চীৎকার করিয়া অস্বীকার করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত চীৎকার থামাইয়া স্বীকার করিয়াছি। তাঁহার গীতি কবিতার অনুযোগ ছিল, তাহার স্পষ্ট কোনো অর্থ নাই। তারপর বহু গবেষণা করিয়া ইহা দেখা গেল,—আমাদের অনুভূতি এরূপ সূক্ষ্ম, এবং হৃদয়ের ইথো-স্থান এরূপ প্রবল, এবং হাজার রকম অনুভূতি একই সঙ্গে প্রকাশ লাভের জন্য এরূপ ব্যগ্র যে তাহাকে পাখী সব করে রবের মূর্ত্তিতে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। তবু এই ব্যগ্রতাই যদি একটা রূপ পায়, তবে তাহাকেই আমরা কবিতা বলিয়া শেষ পর্য্যন্তও স্বীকার করিলাম।

এতদিন রেখা বা বর্ণশিল্পের দিকে আমরা তাকাই নাই, সুতরাং ওদিকেও যে গীতি চিত্র বলিয়া কোনো কিছুর সম্ভাবনা থাকিতে পারে তাহা মনেই আসে নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এই ক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করে। তিনি আজ পর্য্যন্ত সমালোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। লোকে বিকৃত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বলে

এটা অবনীন্দ্রনাথের ছবি। দেশের এমন বিমুখ এবং অজ্ঞতার অবস্থার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ আর এক নূতন টেক্‌নিক্ লইয়া আসরে নামিলেন। সুতরাং এখানে দাঁতের পরিবর্তে নখ বাহির হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে।

কোনো কিছুকে মানিব না বলিয়া বক্রভাবে দণ্ডায়মান হইলে উপায় নাই। সাহিত্য, শিল্প, নীতি, বিজ্ঞান ইহার কোনোটার আদর্শ ই চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া চলে না, সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া যায়। আবার যে আদর্শই যখন বলবৎ থাক, তখনকার মানিয়া লওয়া জিনিসগুলি সেই সব আদর্শের সঙ্গে পূর্ণরূপে মেলে না। সুতরাং কবিয়া সমালোচনা করিলে সব জিনিষকেই ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া যায়।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে যে-জিনিসটিকে আমরা মানিয়া লই, অর্থাৎ যাহাকে আমরা প্রশংসা করি, তাহাকে একমাত্র ভালবাসিয়াই করি বে একমাত্র শ্রদ্ধা ভালবাসার অভাবেই কোনো জিনিসের মূল্য দিতে আমরা কৃপণতা করি। এই ভালবাসা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং বিশ্বাস করিতে গেলেই সম্ভ্রম হওয়া আবশ্যক।

যদি প্রশ্ন উঠে বিচার না করিয়া কোনো কিছু মানিব কেন? সে ভাল কথা, কিন্তু এখানেও বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা না থাকিলে উপায় নাই। উদার ভাবে সত্যকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মধ্যে আছে কি, যাহারা রবীন্দ্র-শিল্প দেখিয়া চীৎকার করিয়াছেন?—কোন্ আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া বিচার করা হইয়াছে?—Creative art এর আদর্শ কি? কাব্য রচনার প্রচলিত কোন্ আদর্শ মানাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আমরা কবিতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি?

যদি এরূপ কোনো বিধি থাকে যে এতকাল ধরিয়া শিল্পীরা যে পথে চলিয়াছেন উহাই আদর্শ—তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কোন্ দেশের শিল্পীকে আদর্শ ধরা যাইবে? ভারতবর্ষের শিল্পীকে? যদি ভারতের প্রাচীন শিল্পীই আদর্শ হয়, তাহা হইলে অবনীন্দ্রনাথকে লোকে বুঝিতেছে না কেন? —যদি বর্তমানের কোনো শিল্পী হয় তবে সে কে?

য়ুরোপের শিল্পই যদি আদর্শ হয়, তবে সেখানকার কোন্ যুগের চিত্র শিল্প আদর্শ হওয়া উচিত?—এরও প্রশ্নের উত্তর নাই।

যদি কথা উঠে প্রকৃতির বহিরাবরণ নকল করাই শিল্পের আদর্শ, তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে শব-শিল্পে ইহার ব্যতিক্রম করিয়াই রবীন্দ্রনাথ স্বত্ব শিল্পী হিসাবে খ্যাত হইয়াছেন।

আসল কথা, আমাদের কেন যেন মনে হয় আর্ট সম্বন্ধে মতা ত প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। যেন ওদিকে সাধনা থাকিবার কোন দরকারই করে না। কিছুদিন আগে দেখিয়াছিলাম, এক হাসপাতাল ডাক্তার সমবেত অর্ধশিক্ষিত রোগীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিতেছিল যাহা শুনিয়া চট করিয়া তাহারা বুঝিয়া গেল—রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছেঁদো কবিতা। অথচ এই ডাক্তার কোনো দিন অণুবীক্ষণ যন্ত্র না বুঝিয়াও তাহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিতে সাহস করে না। এই ঘটনাটিতে আমরা ইহাই বুঝি যে সাহিত্য এবং শিল্প সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করিতে কাহারো মনে কোনো দ্বিধা নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে যে-য়ুরোপ প্রকৃতিকে নকল করিবার বিদ্যায় চূড়ান্তভাবে হাত পাকাইয়াছে, এবং যাহাদিগকে বারবার নকল করিবার চেষ্টা করিয়াও আজ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলাম না, সেই য়ুরোপ তাহার কৌতূহলী মন লইয়া, তাহার নূতনকে গ্রহণ করিবার চিরন্তনী ক্ষমতা লইয়া রবীন্দ্র-শিল্পকে গ্রহণ করিয়াছে, আর আমরা সমস্ত পাঁজিপুঁথি চোখ বুঁজিয়া মানিবার বিদ্যায় পাকা হইয়াও উহাকে মানিতে পারিতেছি না।

সমস্ত জিনিষেরই দুইটি দিক আছে—একটি অস্তির দিক, অন্যটা নাস্তির দিক। যিনি কেবল মাত্র নাস্তির দিকটাই আবিষ্কার করিয়াছেন, আর যিনি কেবল মাত্র অস্তির দিকটাই দেখিতেছেন, উভয়ের মধ্যে হয়ত কোনো বিরোধ নাই। অতএব যাহার যেমন ইচ্ছা প্রাণ খুলিয়া চীৎকার করা যাক।

তবে ঐ একমাত্র আশঙ্কা—শেষ পর্যন্ত লজ্জায় পড়িতে না হয়।

কৃপাকণা—ইন্দিরা দেবী প্রণীত; মূল্য ছয় আনা।

শ্রীগুরুর কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা লেখিকাকে এই পুস্তকখানি রচনায় প্রেরণা দিয়াছে। স্থানে স্থানে সরল প্রাণের কথাগুলি হৃদয়গ্রাহী।

"খেলা সাঙ্গিবার খেলাটি খেলিতে
বড় যে বাসনা জাগিছে, মা, চিতে"

—কথাগুলি পড়িয়া লেখিকার আধ্যাত্মিক রস-পিপাসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় গীতার সেই মহদ্বাণী

"মামেকং শরণং ব্রজ"

ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের নিকট পুস্তকখানি আদরণীয় হইবে।

রহস্যধারা—শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা।

বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করায় জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ।

প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, বোধোদয় ব্যাকরণ ইত্যাদি যে সব পুস্তকের সহিত বাঙালী বাল্যাবধি পরিচিত তাহারই মধ্যে যে এমন সরস রহস্যধারা বহমান ছিল তাহা জানিতাম না। বাল্যকালে পড়িবার সময় ঐ সমস্ত বইয়ের উৎকট শব্দের বানান মুখস্থ করা কারা যন্ত্রণার মতই মনে হইত। লেখক সেই সমস্ত শব্দগুলিকে প্রবন্ধের মধ্যে এমন সরস ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করিয়াছেন যে পড়িয়া প্রচুর আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শিক্ষা লাভ হয়। প্রত্যেক যুবকের এই বইখানি পাঠ করা উচিত।

চন্দ্রশেখর ও বঙ্কিমচন্দ্র—লেখক, মৌলভী একরামুদ্দীন্। মূল্য ।৵ আনা।

চন্দ্রশেখর বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পর লেখক ছাত্রদের উপকারার্থে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ ছাড়া সাধারণ পাঠকও চন্দ্রশেখরের সহিত এই বইখানি পড়িলে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্রকে ও তৎসহ তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে বুঝিবার পক্ষে বইখানি যথেষ্ট সাহায্য করে।

—ভারতী

১। বিপ্লব ও বিভীষিকা
২। স্বদেশী ও বয়কট
৩। সাম্প্রদায়িক সমস্যার নির্দ্ধারণ

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত এই তিনখানি বই আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে যে যে বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত সবই তাঁহারা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ের বিশেষ তথ্য জানিতে চাহেন তাঁহারা বইগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন। নরহত্যা ও গুপ্ত আঘাতাদির দ্বারা জাতির গঠনকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের বৃদ্ধি আদৌ কল্যাণকর নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—বঃ সঃ

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় বঙ্গলক্ষ্মী আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে ৮ম বর্ষে পদার্পণ করিবে। নূতন বৎসর হইতে যাহাতে বঙ্গলক্ষ্মীর প্রবন্ধ গৌরব ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য আমরা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করিতেছি। বর্ষ শেষে আমাদের গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন এই যে, যাঁহারা এখন বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক আছেন, তাঁহারা আগামী বৎসরের জন্য ও গ্রাহক থাকিয়া নারীজাতীর উন্নতিকর কার্য্যে সাহায্য করিবেন। যাঁহাদের গত ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রদত্ত বঙ্গলক্ষ্মীর বার্ষিক মূল্য বর্ত্তমান সংখ্যায় শেষ হইয়া গেল তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় বার্ষিক চাঁদা ৩।০ আগামী ১০ই অগ্রহায়ণের মধ্যে মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের পক্ষে আগামী বর্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব হইবে না, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহারা ৩০শে কার্ত্তিকের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করিবেন। মনিঅর্ডার যোগে টাকা অথবা নিষেধাজ্ঞা না পাইলে ১০ই অগ্রহায়ণের পর অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভিঃপিঃ খরচ সহ বার্ষিক মোট ৩৸৵০ আনা চার্জ্জ করিয়া ভিঃ পিঃ প্রেরণ করিব। ভিঃপিঃতে মূল্য আদায় করিতে গেলে ৩৸৵০ লাগিবে। আর একটি বিষয় গ্রাহকগণকে স্মরণ করাইতেছি যে ডাকঘরের নূতন আইন অনুযায়ী ভিঃপিঃ প্যাকেট তিনদিনের অধিক পোষ্টাফিসে জমা রাখা হয় না; তিন দিনের মধ্যে ভিঃপিঃ গ্রহণ না করিলে উহা আমাদের নিকট ফেরৎ আসিবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, যাহাতে তাঁহাদের অবহেলা বশতঃ কোন ভিঃপিঃ ফেরৎ আসিয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ

"বঙ্গলক্ষ্মী"

মধু চায় মধু

শ্রী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

'মধু চাই, মধু' মধুর কণ্ঠ, আমার দ্বারের কাছে—
বিষে ভরা এই গ্রীষ্ম দুপুর, মধু এ'র কোথা আছে ?
বাতাসের মুখে অগ্নি-কণিকা, উড়িছে ঘূর্ণী ধূলি,
প্রলিত পাতের বক্ষ দলিয়া ছুটিছে শকটগুলি ;
উদ্দাম বেগে জীবন চ'লেছে মরণের অভিসারে,
তারি চরণের তুমুল নিনাদ কানে লাগে বারে বারে।
ভরা দু'পহরে ঘরে শুয়ে আছি, বন্ধ করিয়া খিল্
বসি' চিলে ছাদে একটানা সুরে ফুকারে তৃষিত চিল্ ;
হাতে কাজ নাই, ঘুম নাহি আসে, জ্বালাপালা
লাগে বড় ;
হঠাৎ দুয়ারে 'মধু চাই, মধু'— কণ্ঠ কলস্বতর !

মনে হ'ল, যেন ঐ ক্ষীণ স্বর আকাশের তীর হ'তে,
মরণের লিপি ব'য়ে নিয়ে এল' গ্রীষ্মের বায়ু স্রোতে !
ধরণা পুলিয়া নীচে নেমে আসি, ভালো ক'রে
দেখি চেয়ে,
মধু-পসারিণী মোর দ্বারে এক রূপসী ইরাণী মেয়ে।
পৃষ্ঠে এলান' কবরীসম বেণী, চল চল দেহলতা—
রঙীন ঘাঘ্‌রা লুটায়ে দু'লায়ে যেন কহে কত কথা ;
বক্ষে দুলিছে তীক্ষ্ণ ছুরিকা রোদে জ্বলে ঝক্‌ঝকে,
তারি অনুরূপ দীপ্ত চাহনি দু'টি ঘন কালো চোখে।
ওর রবি-করে রাঙা মুখ তার, মধুর পসরা শিরে,
স্বর্গের মধু এনেছে কি ব'য়ে এ বিষ বারিধি তীরে !

কেন্দ্র সমিতির কথা

রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, সার হরিশঙ্কর পাল, ডাঃ শ্রীযুত বামনদাস মুখোপাধ্যায়,শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি পরহিতব্রতী ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে ১০৪ নং বকুলবাগান রোড,ভবানীপুরে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গর্ভিণীর তত্ত্বাবধান করা ও শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা প্রসবকালীন সাহায্য ও সেবা করা এবং অন্ততঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত নবজাত শিশুর পর্য্যবেক্ষণ করাই হইবে ঐ "শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান" টির কার্য্য। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গর্ভবতী মাতা ও শিশুদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, ও শিক্ষাদান করিতে হইবে। এদেশে এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নূতন। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যতদূর সম্ভব বিনা খরচায় তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের সেবা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

দেশে গর্ভিণী ও শিশুর অকাল মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার কারণ যে আমাদের দেশের অজ্ঞতা ও অন্ধ কুসংস্কার তাহা অবিসংবাদিত সত্য। ইহার প্রতিকারার্থে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যে কিরূপ তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই অনুভব করেন। যাঁহারা এইরূপে জাতীর মঙ্গলকার্য্যে হস্তপরিচালন করিতেছেন আমরা সেই ত্যাগব্রতী মহাজনদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি ও এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শোক-সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কেন্দ্র-সমিতির পৃষ্ঠপোষক এবং কেন্দ্রসমিতির কার্য্যের প্রতি বিশেষ উৎসাহশীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে মহাশয় আর ইহলোকে নাই। গত ১২ই আশ্বিন বুধবার তিনি তাঁহার থিয়েটার রোডস্থ বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্যত্র প্রকাশ করিলাম। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

হিন্দু অবলা আশ্রম

হিন্দু অবলা আশ্রমের পরিচালকগণ আশ্রমের বালিকাদের নৈতিক উন্নতির মানসে সাপ্তাহিক নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারকগণ তাহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা তিনটী বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রথম গত ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে "ধ্রুবচরিত্র" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী "শিশুমঙ্গল" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং তৃতীয় ২১শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত মহাশয় ও ননীবাবু শিক্ষা ও শিল্পকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

চাকুরিয়া মহিলা সমিতি পরিদর্শন

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্র সমিতির সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী প্রচারকগণকে সঙ্গে করিয়া চাকুরিয়া মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। উক্ত সমিতির সভ্যা সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও সভ্যাদের এবং সাহায্যকারী উৎসাহশীল কয়েকটী যুবকের আগ্রহাতিশয্যে সমিতির কার্য্য দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে আশা করা যায়। তথায় কেন্দ্র সমিতির একজন শিক্ষয়িত্রী নিয়মিত শিল্প-শিক্ষা দিতেছেন। সভ্যারা চিকনের কাজ এবং সাধারণ শিক্ষাও কিছু কিছু লাভ করিতেছেন।

শালিখা মহিলা সমিতি

ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর শালিখা মহিলা সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্র সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী উৎসবে যোগদান করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্তা নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিলে সম্পাদিকা শ্রীমতী ভানুমতী দেবী ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। উক্ত সমিতির বাহিরের বিশেষ কোনও হৈ-চৈ না থাকিলেও কার্য্যোন্নতির দিকে সবিশেষ লক্ষ্য আছে। কার্য্যবিবরণী পাঠে বোঝা যায় যে, সমিতি দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। শিল্প-কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি কিনিতেই ২১৮ টাকার বেশী ব্যয় হইয়াছে। শুধু শালিখা কেন, বিভিন্ন স্থানের বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা এই সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন।

ভারত শিউইং কর্ড

আমাদের সরোজনলিনী স্কুলের ছাত্রীগণ সকলেই ভারত ট্রেডিং কোম্পানীর "শিউইং কর্ড" ব্যবহার করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছেন। সেলাইএর কলে যে গুলি সূতা ব্যবহার হয় তাহা আমরা এতদিন বিদেশ হইতেই কিনিতাম। এখন এই সম্পূর্ণ দেশী কোম্পানীটি "ভারত শিউইং কর্ড" নামে যে গুলি সূতা বাহির করিয়াছেন, তাহা বিদেশী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। সেলাইএর জন্য গুলি সূতা প্রচুর ব্যবহার হয়। বিদেশী সূতার পরিবর্ত্তে এই সম্পূর্ণ স্বদেশী সূতা ব্যবহার করিলে দেশের অর্থ তো বাঁচিবেই, দেশী কোম্পানীটিকে সাহায্য করিয়া আরও উন্নতত্তর অন্যান্য সূতা প্রস্তুতেরও সুযোগ দেওয়া হইবে। এই সূতা বেশ শক্ত এবং সেলাইএর কলে স্বচ্ছন্দে চালিত হয়। সরোজনলিনী স্কুলের ছাত্রীগণ এখন এই সূতাই ব্যবহার করিতেছেন।

মহিলা সমিতির প্রতি নিবেদন

(১)

প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে কেন্দ্র-সমিতির উৎসব সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলা সমিতির উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যের একটী বিরাট প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির কর্তৃপক্ষ আগামী জানুয়ারী মাসের ১২ই তারিখ হইতে এইরূপ একটী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে ঐ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। সেই জন্যই এই অনুষ্ঠানসম্পর্কে কি করা প্রয়োজন তাহা নিবেদন করিবার জন্যই আপনাদিগকে এই পত্র দিতেছি। কেন্দ্র-সমিতির শিল্পবিদ্যা-মন্দিরে ঐ প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমিতিতে যে সকল শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করা হয় তাহা প্রদর্শনার্থ এবং বিক্রয়ের জন্য আমাদের নিকট ৬০বি, নিকাপুর ষ্ট্রীটে পাঠাইয়া দিবেন। প্রেরিত দ্রব্যের একটী তালিকা আপনারা রাখিবেন এবং একটী আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটিতে নম্বর দিয়া দিবেন। যেগুলি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার উপরে "বিক্রয়ার্থ" এই কথা লিখিয়া মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং অপরগুলির উপরে "বিক্রয়ার্থ নহে" শুধু এই কথা লিখিবেন। তালিকাসহ দ্রব্যগুলি রেলওয়ে পার্শেলে ষ্ট্রীট ডেলিভারী (৬০বি নিকাপুর ষ্ট্রীট) দিবার কথা লিখিয়া এমন সময় পাঠাইবেন, যেন ৭ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে আমাদের অফিসে পৌঁছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেলে আপনাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আপনাদের সমিতি হইতে যে সকল প্রতিনিধি বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা প্রদর্শনী পরিচালনে আমাদিগকে সাহায্য করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কোন সময়ের মধ্যে আপনাদের দ্রব্যাদি আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন। কলিকাতার প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিই বিশেষভাবে বিক্রয় হইয়া থাকে :—কাঁথা, সতরঞ্চ, টেবিল ক্লথ, সুপার কাভার করা টিপয় কাভার, উলের জামা, টুপী, মোজা, গলবন্ধ (কন্ফর্টার), আলোয়ান প্রভৃতি ; বিভিন্ন প্রকারের কাপড় ও পুঁতির ব্যাগ, ফুলের সাজি, ছেলেদের কাপড়, সতরঞ্চ, সতরঞ্চের আসন, গালিচার আসন, কাগজ বা মাটীর খেলনা, বাঁশী, সাবান, সেণ্ট, জ্যাম জেলি, আচার, মোরব্বা, বিভিন্ন প্রকারের চটের আসন, পাপোষ, বাঁশের ঝাঁপের সাজি, এম্ব্রয়ডারী, নারিকেলের ঝাঁপের বা চুলের ঘড়ির চেন্, কাপড়ের পাড়ের পর্দ্দা, বালিশের চাকনা, বিভিন্ন প্রকারের চিত্র, বিনুকের বোতাম, পেপার ওয়েট, কাঠের পুতুল, মাটীর এবং কাঠের ছাঁচ, নারিকেলের মালার বাটী, চায়ের পেয়ালা, ফুলদানী, তাজা পাথরের সন্দেশের ছাঁচ, ঘড়ি বা শোনের সিকা, খেজুর এবং নারিকেলের পাতার টুপী, পাখা, ব্যাগ, কাগজের পাখা, বেতের ঝুড়ি, ঝাঁকা বাস্কেট, সাজি বিভিন্ন প্রকারের নারিকেলের খাবার (বোতলে পুরিয়া ছিপ আঁটা)।

কেন্দ্র সমিতির এই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত করিবার বিষয়ে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

(২)

আগামী পৌষ মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি ৯ম বর্ষে পদার্পণ করিবে। আগামী বর্ষে উপযুক্তভাবে ইহার কার্য্য পরিচালন করিবার জন্য সমগ্র মহিলা সমিতির সভ্যাগণের মঙ্গলেচ্ছা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, সভ্যাগণ সমিতির ভিতর দিয়া নারীজাতির মঙ্গলকার্য্যসাধনে সাহায্য করিবেন। কেন্দ্র সমিতির কার্য্যের সফলতা মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহিলা সমিতির উপর নির্ভর করে। নানাস্থানে ছোট ছোট মহিলা সমিতিসমূহের সমষ্টিগত কার্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়া জাতিগঠনের সোপান নির্ম্মাণ করিতেছে। আশা করি, ক্রমে ক্রমে সমস্ত মহিলা সমিতি সুপরিচালিত, সুগঠিত এবং প্রকৃত উন্নতিমূলক কার্য্যের প্রতিষ্ঠানস্বরূপে পরিগণিত হইবে।

৮ম বৎসর পূর্ণ হওয়ার বিলম্ব না থাকায় অনতিবিলম্বে কেন্দ্র সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী লিখিত হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্য সমস্ত মহিলা সমিতির কার্য্যবিবরণী

আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে কেন্দ্র সমিতির কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। যে সকল মহিলা সমিতির এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তাহাদিগকে যে ফরমাস স্থাপিত হইয়াছে, তাহারই কার্য্যবিবরণী প্রদান করিতে হইবে। কি কি বিষয়ে মহিলা সমিতির বিবরণী প্রদান করিতে হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল :—(১) মহিলা সমিতি স্থাপনের ইতিহাস, (২) সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য, (৩) সমিতির বর্ত্তমান সভ্যাসংখ্যা এবং বিশিষ্ট পরিচালিকা-গণের নাম ও ঠিকানা, (৪) সমিতির দ্বারা জনসেবার কার্য্য, (৫) পরস্পর ভাবের আদান প্রদান ও মেলামেশার বিষয়ে চেষ্টা, (৬) মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্যোন্নতি প্রচার, (৭) মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কার্য্য, শিশু ও প্রসূতি পরিচর্য্যাগার স্থাপন, (৮) গৃহশিল্প শিক্ষা :—(ক) গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ, (খ) কোন শিক্ষয়িত্রী আছেন কি না, (গ) কি কি বিষয়ে গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, (ঘ) কতজন মহিলা কি কি প্রকার গৃহশিল্পের শিক্ষা করিয়াছেন, (ঙ) গৃহশিল্প শিক্ষা করিয়া কতজন মহিলা মাসিক কি পরিমাণ উপার্জ্জন করিতেছেন, (চ) আপন আপন গৃহের ব্যবহারোপযোগী যে সকল দ্রব্য সমিতির সভ্যারা প্রস্তুত করেন, তাহার মূল্য মাসিক কি পরিমাণ হইতে পারে, (ছ) প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা কিরূপ আছে, (জ) কোন শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল কিনা, হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ, (ঝ) নিম্নলিখিত শিল্প ও চারুকলার কোন্‌গুলি সমিতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন :—সেলাই, জামা, সেমিজ প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদের সেলাই ও কাট ছাট, রিপুকর্ম্ম, সূচি-শিল্প, চিকণের কাজ, লেস, আসন, কাঁথা, বেত ও বাঁশের কাজ, সূতা কাটা, বস্ত্র বয়ন, মণিপুরী তাঁতে তোয়ালে বোনা, পাটের ও শোলের ঘড়ি প্রস্তুত, নানা প্রকার মিঠাই ও সন্দেশ প্রস্তুত, মুড়ি ভাজা, বড়ি দেওয়া, লিখিবার কালী তৈয়ারী, সাবান প্রস্তুত, কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করিবার প্রণালী, রন্ধন, কাপড় ও কাগজের ফুল তোলা, তালের পাখা, পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হইতে নানাপ্রকার জিনিষ প্রস্তুত, ফুলারী কাটা, পালোর, নানাপ্রকার উলের কাজ, রেশমের সূতা তৈয়ারী, কার্পেট প্রস্তুত, চিত্রাঙ্কন, আলিপনা, মাটির, কাপড়ের ও কাঠের পুতুল ও খেলনা তৈয়ারী, সূতা ও কাপড়ে রং করা প্রভৃতি ; (ঞ) দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য সমিতি হইতে জিনিস সরবরাহ করা হয় কিনা ? (ট) মহিলা সমিতির সভার অধিবেশনে কি কি বিষয়ে আলোচনা হয়, (ঠ) সমিতির দ্বারা গৃহ আছে কিনা, (ড) সমিতির সভায় যাতায়াতের উপায়, (ঢ) সমিতি সম্বন্ধে সাধারণের সহানুভূতি কিরূপ, (ণ) যে সকল ভদ্রমহোদয় ও মহিলা সমিতিকে বিশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা, (ত) কেন্দ্র সমিতি ১টি মহিলা সমিতিকে ৫০৲ টাকা, ১০টি সমিতিকে ২০৲ টাকা এবং ৫টি মহিলা সমিতিকে ১৫৲ টাকা করিয়া পুরস্কার দিবেন। উক্ত পুরস্কারের সমপরিমাণ টাকা কোন প্রকার উন্নতিমূলক কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে। কোন্ সমিতি এই পুরস্কার পাইলে কি ভাবে ব্যয় করিবেন ? (থ) সঙ্গীতশিক্ষণে এবং উদ্যান-রচনায় মহিলা সমিতির কার্য্য, (দ) গো-পালন, কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে সভ্যাগণের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং সমিতির সহায়তায় তাহার আলোচনা, (ধ) বয়স্থা মেয়েদের শিক্ষা বিধান বিষয়ে সমিতির কার্য্য, (ন) পারিবারিক জীবনে অধিকতর নৈপুণ্যলাভের জন্য সমিতির সভ্যাগণের চেষ্টা, (প) বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরিচালনে সাহায্য, (ফ) পল্লীসংগঠনে মহিলা সমিতির কার্য্য, (ব) বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির মধ্যে একত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাগণকে সমিতিতে যোগদান করাইবার চেষ্টা, (ভ) ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা, রোগীর সেবা, আকস্মিক বিপদে সাহায্যদান, টোটকা চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষাদান বিষয়ে মহিলা সমিতির সভ্যাগণের সমবেত চেষ্টা, (ম) স্থানীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিধবাদের জন্য সমিতির কর্ম্ম-চেষ্টা, (য) সমিতির বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ, (র) বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব।

বিনীতা

শ্রী হেমলতা দেবী

সম্পাদিকা,

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

সিন্ধুতীরে

উদয়াচলে তব নবীন ওষা
জানিনে কেন যে দেখিতে আসি।
তিমির তোমার বক্ষের 'পরে
শুক্ল-দৃষ্টি আত্মহারা—
তোমার হিল্লোল গান
সৃষ্টির এক সৃষ্টি-ছাড়া!
নিষ্পন্দ তব নীল বক্ষে
দেখেছ যেথায় নীলাম্বরে
আমার দৃষ্টি চক্র সেথায়
জানিনে কেন যে মূর্চ্ছি' পড়ে!
ঐখানে, ঐ নীল মায়া-লোকে
মনখানি মোর রাখিয়া নিত্য
তোমার চরণপান্থে সিন্ধু,
চলিলাম আজি বিদায় নিয়া।—

অর্ঘ্যদান

শ্রী হেমলতা দেবী

হে সখি, তোমায় প্রতি ভক্তি-উপহার
দিতেছি কৃতজ্ঞচিতে। আমা সবাকার
কল্যাণের লাগি' তুমি অসাধ্য সাধিলে;
একান্ত স্নেহের ভরে যে নীড় বাঁধিলে,
তাহার আশ্রয়ে থাকি' মোরা চিরদিন
অর্জ্জিব আপন অন্ন,—স্বার্থ, পরাধীন,
পরাশ্রিত জীবনের গ্লানি বিসর্জ্জিব,
মানবের অধিকারে বাঁচিতে শিখিব।
ছিল মাতা, ছিল পিতা, ছিল বন্ধুজন,
পারিল না দিতে কেহ এ হেন আশ্রয়।
তোমার আগ্রহ আর তোমার উদ্যোগ,
আনি' দিল আমাদের এ-মহা সুযোগ।
এ-ঋণ পুণ্যের থাপা না হইবে শেষ,
রহিবে অক্ষয় কীর্ত্তি ব্যাপি' বঙ্গদেশ।

* বিদ্যাসাগর বাণীভবনের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক মাননীয়া লেডী বসুকে অর্ঘ্যদান।

স্থান পরিবর্ত্তন

গত ১লা অক্টোবর হইতে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির সমস্ত বিভাগ ৪৪ নং বেনিয়াটোলা লেন হইতে ৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ বহুদিন হইতে ইহার সমস্ত বিভাগের উপযুক্ত স্থান সঙ্কুলানের জন্য সুপ্রশস্ত আবাসের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এখন নূতন বাড়ীতে বর্ত্তমান বাড়ীর অপেক্ষা তিনগুণ স্থান আছে। অতঃপর সমিতির ও ইহার শিল্পশিক্ষালয় এবং বয়নশালা-সংক্রান্ত সমস্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি ৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে স্মৃতিসভা

শ্রী আনন্দিতা দেবী

গত ৬ষ্ঠা আষাঢ় পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবীর দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিধবাশ্রমের চাতালটী এই উপলক্ষে পত্রপুষ্পে সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল; এবং সম্মুখেই ৺বসন্তকুমারী দেবীর একখানি আলেখ্য পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া বিরাজিত ছিল। আশ্রমের এবং তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ ও স্থানীয় ভদ্রজন ও মহিলাগণে চাতালটী পরিপূর্ণ হইয়া উহার সম্মুখস্থ চেয়ার দ্বারা বসিবার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। মহিলারা অনেকে আশ্রম-গৃহের মধ্যেও আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে সকলের যোগদানে আশ্রমটী কতটা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ওড়িয়া, বাঙ্গালী সকলেই এই সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে আশ্রমের বালিকাদের স্তব পাঠ হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বালিকাদের এই স্তবপাঠটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। অন্যদিনেও সন্ধ্যার সময় যে নিয়মিত স্তব গান হইয়া থাকে তাহা শুনিলে অভিভূত হইতে হয়। ইহার পর সম্পাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় আশ্রমের বিবরণ জানাইলেন। পরে আরও অনেকে স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া তাহাতে সবিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মনিষ্ঠার সাধুবীলা বসন্তকুমারী দেবীর সৎসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়া ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে, সেই মহদাশয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীকেও সকলেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইহার মধ্যে স্বামী কৃপানন্দ সরস্বতী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার প্রবন্ধটী অন্যে পাঠ করিলেন। পরে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ হইল। স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবীর পরিবারের বিশেষতঃ তাঁহার স্বামী প্রখ্যাতনামা বিচারপতি স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকায় তিনি তাঁহাদের পারিবারিক জীবন এবং সুদূর পাঞ্জাবে ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন আচার ব্যবহারের জন সাধারণ সকলের মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব এবং অন্তরঙ্গতার বিষয় জানাইলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এ বিষয়ে সকলেই নূতন জ্ঞান লাভ করিলেন এবং ৺বসন্ত কুমারী দেবীর জীবন বুঝিবার পক্ষেও ইহা নূতন আলোক দান করিল। এইরূপ মহৎ পরিবেশের মধ্যে গঠিত হইয়াই যে তাঁহার জীবন বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিয়া শেষে তাঁহাকে এই বিধবাশ্রমের পুণ্যকীর্ত্তি স্থাপনে সমর্থ করিয়াছিল ইহা জানিবার সুযোগ দিয়া তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। ইহার পর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লোকনাথ মিশ্র সভাপতি মহাশয়কে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন। পরে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রচিত একটী গান আশ্রম সংলগ্ন বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সভার সমস্ত কার্য্যই যথাসময়ে (দুঃখের বিষয় পুরীধামে যাহা বড়ই দুর্লভ) এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় এবং সমাগত সকলেই বিশেষভাবে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহোদয়ার অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। সামাজিকতার অনুষ্ঠানে পানের আয়োজনেরও ত্রুটি হয় নাই।

এই আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কার্য্যের বিষয় অন্য অনেক স্থলেই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে অতএব সে বিষয়ে এখানে আর কিছু বলা হইল না। ইহাই মাত্র বলা যায়, এই আশ্রম ও বিদ্যালয় ক্রমেই পুরীর একটী গৌরবের বস্তু হইয়া উঠিতেছে।

কালো মেয়ে

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

তুলনা তুলিয়ে পুঞ্জিত ভাব-প্রবলতায়
নব-বর্ষার ঘন শ্যামল মেঘের সঙ্গে,
তরল প্রাণের আবেগ ভাসিয়ে
যমুনা নদীর কাজল-ধারায়,
কল্পনায় মোহমুগ্ধ রূপের রচনা কোরে—
কোরে পরাজিত অপরাজিতার উজল সৌন্দর্য্য,—
আমি তোমার কালো রূপের জয়-গান
গাইতে পারবো না· ওগো, কালো মেয়ে।

তুমিতো আমাকে চেনো।
আমি অভিরঞ্জিত চিত্রের
চিত্রকর নই,
নই আমি রূপ স্রষ্টা ভাস্কর,
আমি কবি।

যে সময়ে মিশেছে এক সঙ্গে
আলোকের অগাধ পাথারে
অন্ধকারের অতল-গভীর,
যে মধু মাসের মধু লোভে এলো
রঙীন প্রজাপতি, কালো ভ্রমর ;
যে পথে থাকে চেয়ে
রাজ পুত্রের রূপের দিকে তারা দুটি বোন—
'সুরূপা, মলিনা ;
যেখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই
মণিমালায়, মুকুল মালায়,—
নেই প্রভেদ ধনীতে নির্ধনে,
স্বর্গের দেবীতে আর মর্ত্ত্যের মানবীতে ;
যেখানে সুখের গলা জড়িয়ে থাকে দুঃখ,
—হয় মিলনের রাখিবন্ধন
জীবনের প্রতি অনুভূতির উপলব্ধিতে,
সেখানে আমি বোসে আছি হাতে নিয়ে বাঁশি।

ওগো কালো মেয়ে,
এসো তুমি।
বলো তোমার মনের কথা।
পূর্ণিমার বাসরে
যে মেয়েটি আমায় বেসে ছিল ভালো,
অমাবস্যার অভিসারে—তারই সুর
ভেসে আসুক তোমার সাথে ;
গান ধরো তোমার,
তারই তালে তালে মুখরিত হোক
আমার বাঁশির প্রাণ।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষায় হিমানীর প্রসাধন দ্রব্যগুলি কাঁড়ায় সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া বঙ্গমহিলাদের নিকট সুপরিচিত ও সমাদৃত। ইহার কারণ এই যে, হিমানী উপকরণগুলির প্রত্যেকটিই নিজস্ব রসায়নাগারে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়; ইহাদের মূল উপাদানগুলিও যত্নের সহিত বাছাই করা হয় বলিয়া বাজারের সস্তা অনুকরণগুলি অপেক্ষা হিমানীর উপকরণগুলি এত উৎকৃষ্ট। "হিমানী স্নো" বঙ্গলক্ষ্মীদিগের নিজস্ব প্রসাধন। রূপ ও সৌন্দর্য্য অর্জ্জনে হিমানীর মত অন্য কিছু নাই ইহা বুদ্ধিমতী রমণীমাত্রেই জানেন এবং সেই জন্যই দুই এক পয়সা সস্তার মোহে পড়িয়া হিমানীর মত কিছু কিনিবার ভুল করেন না। শীতের হাওয়া সুরু হইতেই যখন চর্ম্ম মলিন ও কর্কশ হয় তখন হইতেই নিয়মমত হিমানী মাখিলে যৌবনের রূপ ও লাবণ্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

শীত চর্চ্চার আর একটি উৎকৃষ্ট আবশ্যকীয় উপকরণ—হিমানী ক্রিমারীন সাবান। ইহা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ এবং ক্রিমারীনযুক্ত বলিয়া চর্ম্মের কোমলতা সংরক্ষণে অনুপম। অধিকন্তু ইহা অতি স্নিগ্ধ সুগন্ধে ভরপুর। শীত জনিত চর্ম্মবিকার, খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি উপসর্গে হিমানীর নিম ও গন্ধক যুক্ত 'সার্গোসল' সাবানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চর্ম্ম রোগের বীজাণুনাশ করিতে নিম ও গন্ধকের গুণ সুপরিচিত। হিমানীর সেবাই করা (milled) সাবানের সহিত এই দুইয়ের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত। প্রতিদিনের প্রসাধনে হিমানীর নিম ডেন্টাল ক্রীম ব্যবহার করুন। ইহা আধুনিক দন্তচিকিৎসা বিধান অনুযায়ী নূতন ধরণে প্রস্তুত ও সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ মুক্ত করিয়া দাঁত সুদৃঢ় ও শুভ্রোজ্জ্বল করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পাইওরিয়া প্রতিষেধার্থ আইওডিন যুক্ত হিমানী ডেন্টাল ক্রীমও পাওয়া যায়।

হিমানী প্রসাধনগুলি ভারতের সর্ব্বত্র ভাল দোকানে পাওয়া যায়।

Printed by A. C. Sirkar at the Classic Press. 9-3 Ramanath Majumdar Street Calcutta.
and published by him, at 45 Beniatola Lane, Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী

শ্রীহেমলতা দেবী সম্পাদিত

১৩৩৮ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত

কার্য্যালয়
সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল-সমিতি
৬০ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

বঙ্গলক্ষ্মীর সূচী

১৩৩৮ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত

অ

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
অগ্নি শিখা (উপন্যাস)	শ্রীকাত্যায়নী দেবী	২১১,৩৩৮,৪২১, ৫৪৮,৭০৭,৭৪০,৭৯২
অর্ঘ্যদান (কবিতা)	শ্রীহেমলতা দেবী	৮৩৭
অঞ্জলি (কবিতা)	শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৬
অনুভূতি (কবিতা)	শ্রীমতী দেবী	৩৪৮
অস্তি সহর্ক সূর্য্য (কবিতা)	শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই, সি, এস	৬২৪
অতৃপ্তি (কবিতা)	শ্রীইন্দিরা দেবী	৬৬৮
অপরাজিত (সমালোচনা)	শ্রীমনোজ বসু বি, এ	৬৯১

আ

আপনার কাজ আপনি করতে পারা (প্রবন্ধ)	শ্রীশিবাপ্রসন্ন বসু	২৬৮
আমেরিকার স্ত্রী শিক্ষা (প্রবন্ধ)	শ্রীসুখলতা রাও বি,এ	৪৫৩
আলো ও ছায়া (কবিতা)	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	৫৪০
আহরণ (বিবিধ)		৬৪,১৪৫,২৯৩,৩৯১
আহ্নিকী (প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	৭১৩

ঈ

ঈদিশ সাহিত্য	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	

উ

উৎকলী "খণ্ড কবিতা"	শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা	৩৮৫
উৎকলী সঙ্গীত	ঐ	৪৭৭
উদয়পুরে তিন দিন (ভ্রমণ)	শ্রীসরযূ রায়	৫৭২
উপদেশামৃত	শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র	৭৮৩

উ

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য সাহিত্য (প্রবন্ধ)	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই,সি,এস	৬৬৬
উর্ব্বশী (প্রবন্ধ)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৭
উষা (কবিতা)	শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী	২৪৬

ঐ

ঐক্যের একটি পথ (প্রবন্ধ)	শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৩৭৭

ও

ওলট পালট (গল্প)	শ্রীদীপ্তি দেবী বি, এ, বি, টি	

ক

কঙ্কাল (কবিতা)	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	৩৭৩
কল্যাণী (কবিতা)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বি এ	৭৪২
কবি-সুভাষিত (প্রবন্ধ)	আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	
কয়েকটি আলোচনা	শ্রীমনোজ বসু বি, এ	
কাক জ্যোৎস্নায় (কবিতা)	রবে আলি	
কাঁচা (কবিতা)	আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল	
কাঠ খোদাই শিল্পে শ্রীমান্ সুধান্ত রায়	ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম,এ, ডি, লিট	৮০৩
কালো মেয়ে (কবিতা)	শ্রীনিশিকান্ত চৌধুরী	৮৩৯
কুমারসম্ভব (কবিতা)	৺বিদ্যাবীনাপাণি গোস্বামী	২২
কেন্দ্র সমিতির কথা		৭৭, ১৫৭, ২৩২, ২৯৯, ৩৭৩, ৪৪৫, ৫১৯, ৫৯১ ৬৪৬, ৭০২, ৭৭৫, ৮৫২

খ

খেয়ালী (গল্প)—শ্রীঅদিৎকুমার কাঞ্জিলাল
খোলো দ্বার (প্রবন্ধ)—শ্রীজগদীনাথ রায়

গ

গত রাত্রের রজনীগন্ধা (কবিতা)—
শ্রীঅজাত চট্টোপাধ্যায়
গার্হস্থ্যে আনন্দোৎসব ও ধর্ম্মমন্দিরের প্রভাব—
শ্রীঅনমোহন নন্দসুন্দর ৪৪৭
গায়ত্রীর ধ্যান . প্রবন্ধ)—৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৩
গুরুসদয় (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ ৭০২
গ্রাম (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৩৪
গাঁয়ের ছবি (চিত্রন)—শ্রীসুরমাদেবী ৪৩২,৬৩৭
গৃহস্থালী বনাম গৃহিণীর পরিচালন—মিসেস ম্যাকনাব ২২৭

ঘরে বাইরে (বিবিধ)—

চ

চিত্রকলায় বাংলার স্থান—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই,সি,এস ৪২৭
চন্দনধারা (জীবনী) শ্রীসুরেশচাঁদ নাহার
এম, এ বি, এল ৪৮৫
৺চন্দ্রমাধব ঘোষ ৫৮৮
চির-সুন্দর (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি এ ৩
চোখের জল (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ২২৬

ছ

ছুটির দিনে (কবিতা)—শ্রীনীলিমা সিংহ ২৩০
ছুটি (কবিতা)- শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০০
ছেলে মেয়েরা বিপথগামী হয় কেন ?—শ্রীসতী রায় ৬৯৩

জ

জাতির শক্তি ও আনন্দের উৎস (প্রবন্ধ)—
শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস ৫২১
জাতীয় জীবনে নারী
(প্রবন্ধ)—শ্রীসুধাময়ী দেবী বি, এ ৩০৬
জাতীয় প্রতিষ্ঠান (প্রবন্ধ)—স্বামী রূপানন্দ সরস্বতী ৫৮১
জেকোস্লোভাক সাহিত্য (প্রবন্ধ)—
শ্রীবীরেন্দ্রলাল ধর বি, এ

ক

কামেলা (কবিতা)—শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা ৩৬৭
কয়ার বেলায় (গল্প)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৭২১

ট

টমাস এ্যাল্ভা এডিসন(প্রবন্ধ)—
শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

ড

ডাবলিনে বড় দিন (প্রথম কাহিনী)—
ডাঃ ইন্দ্রেন্দ্রকুমার পাল ডি,এস,সি
ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন (জীবনী)—
শ্রীকামিনী রায় বি-এ

ত

তুমি (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ
তোমার আলো (কবিতা)
তোমায় করি গো নমস্কার (প্রবন্ধ)—
শ্রীপরিমল গোস্বামী
তোমার কথা (কবিতা)—
শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস
ত্রিস্রোতা তীরে (কবিতা)—শ্রীসতীন্দ্র সেনগুপ্ত

দ

দূর ও নিকট (কবিতা)—
শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
দুঃস্বপ্ন (কবিতা)—শ্রীঅজাত চট্টোপাধ্যায়

ন

নরনারী (প্রবন্ধ)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নবপত্রিকার উৎসব (প্রবন্ধ)—
কুমারী ছায়া দেবী
নিধরা (গল্প)—শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নারী-প্রতিভা (জীবনী)—স্বামী রূপানন্দ ২১৯,৪৮৩,৩৪৯
নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—
কাজিরুন্ নেসা জোহা এম, এ ২৩৪

প

পটুয়া (কবিতা)—শ্রীশুকসদয় দত্ত আই, সি, এস ৫২৮
পল্লী-কর্ম্মীর অভিজ্ঞতা ৮১০
পাগ্‌লামির কথা (প্রবন্ধ)—
শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই, সি, এস ১৬৭
পাপের (উপন্যাস)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল
২৪, ১৩৮, ৩৪২, ৬০১
প্রাচীন বাংলার নারী-জীবনে আনন্দের স্থান (প্রবন্ধ)
—শ্রীশুকসদয় দত্ত আই, সি, এস
প্রথম যুগের করাসী সাহিত্য—
শ্রীগীরেন্দ্রলাল ধর বি, এ
প্রকৃতি বর্ণনায় চণ্ডীদাস
(প্রবন্ধ)—শ্রীকালীপদ জানা ৮৫
প্রভাতে ও সন্ধ্যায় (কবিতা)—শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী
৩২৮
প্রাচ্যে নারীপ্রগতি (প্রবন্ধ)—শ্রীবিমলেন্দু সরকার বি-এ
২৮০
প্রতিভা (কবিতা)—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৪১৫
পুরী বসন্ত কুমারী বিধবাশ্রম (প্রবন্ধ)
শ্রীঅনিন্দিতা দেবী ৮৩৮
প্রেমরূপ (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৭৬১

ফ

ফরাসী কথা সাহিত্য (প্রবন্ধ)—
শ্রীগীরেন্দ্র লাল ধর বি-এ ৫৬৭
ফাঁকি (গল্প)—শ্রীআশীষ গুপ্ত ৬৬
ফিরিওয়ালা (কবিতা)—জসীমউদ্দীন এম, এ ৪২০

ভ

ভগবানের বাণী (কবিতা) —শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী ৬৩৬
ভজন (গান)—নজরুল ইস্‌লাম ৩১
ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রবাদ (প্রবন্ধ)—
মহম্মদ এনামুল হক্ এম, এ ৬০৪, ৬৪৩
ভিক্টর হুগো (প্রবন্ধ)—শ্রীগীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ ৬১৩
ভূত ভারতী (উপন্যাস)—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী বি,এ
২১৩, ২৫৩, ৪০৮

ম

মধু ও গুঞ্জন (কবিতা)—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মহাশুচি (কবিতা)—শ্রীহেমলতা দেবী
মহাকবি গেটে (প্রবন্ধ)—শ্রীঅবনীনাথ রায়
মধু চায় মধু (কবিতা)—শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্ত
মন্ধারণ দীপশিখা (কবিতা)—
শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই, সি,এস, ৩২২
মহিলা সমিতির কথা ৭১, ১৪২, ২২২, ২৯৫, ৩৩৮, ৪৩৮,
৫১১, ৫৮৩, ৭৬৭, ৮২২
মহিয়সী স্বর্ণকুমারী—শ্রীসুরবালাসুন্দরী ঘোষ ৬৪০
মাটির প্রদীপ (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৪২
মানুষের একজোট হওয়া (প্রবন্ধ)—শ্রীহেমলতা দেবী ২০৭
মালয়ের নরনারী (প্রবন্ধ)—শ্রীসুবিমল সরকার ২৩
মানতী (কবিতা)—শ্রীকণকভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৭০
মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন
(প্রবন্ধ)—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১০০
মায়া মোহিনী (কবিতা)—শ্রীকালীপদ ঘটক ১৫৬
মায়ের ছেলে (গল্প)—কুমারী শ্রীতিলতা বসু ৬৪৫
মিলন-মঙ্গল (কবিতা)—শ্রীশুকসদয় দত্ত আই,সি, এস ৪৯১
মৃত্যু (কবিতা)—বনফুল ৫৬
মেকী গল্প—শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় ৭৭২
মুক্তি দেখা (কবিতা)—শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩৪৩
যৌবনের স্বপ্নময়ত্বম্ (কবিতা)—শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৮৯
মৈমনসিংহ গীতিকা (প্রবন্ধ)—
মহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম, এ

য

যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি (প্রবন্ধ)—
শ্রীপরিমল গোস্বামী এম,এ

যেদিন তুমি রহেনা আর কাছে (কবিতা)—
শ্রীমমতা মিত্র
যে কমলাপানা হারিয়ে গেল (গল্প)—
শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

ঘর রসিক (কবিতা)—শ্রীহৈমবতী দেবী ২৮৪
রবীন্দ্র-শিল্প (প্রবন্ধ)—শ্রীপরিমল গোস্বামী এম এ ৮২৭
রবীন্দ্র জয়ন্তী (প্রবন্ধ) ২০২
রায়-বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (প্রবন্ধ)—
শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস
রাশিয়ার নারী জাগরণ (প্রবন্ধ)—
শ্রীশশিচন্দ্র গোস্বামী বি, এল
রুশ সাহিত্য (প্রবন্ধ)—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর বি, এ,
রুমান সাহিত্য (প্রবন্ধ)— ঐ

ল

লিপি (কবিতা)—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
লুকোচুরী (গল্প)—শ্রীদীপ্তি দেবী বি, এ, বি, টি

ব

বঙ্গে বিধবা সম্প্রদায় (প্রবন্ধ)—
মহম্মদ এবাদুল হক এম, এ
বন্দিনী (গল্প)—শ্রীউষারাণী দেবী
বর্ষা (কবিতা)—শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস
বঙ্গলক্ষ্মীর রবীন্দ্র-জয়ন্তী (কবিতা)—
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ
বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম (প্রবন্ধ)—
শ্রীসুবলতা রাও বি, এ ১৯৬
বসন্ত ও শরৎ (গল্প)—করুণা ৩২৬
বড় ধীরে ধীরে কথা কয় (কবিতা)—
শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস ১০৯
বঙ্গে স্ত্রী প্রভাব (প্রবন্ধ)—মহম্মদ এবাদুল হক এম,এ ৭৩০
বাসনা আমার (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ ৩৮০
বাংলার জীবনে নৃত্য ও
ক্রীড়ার স্থান (প্রবন্ধ)—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই,সি,এস ১২০
বাংলা মেয়ের চিঠি(কবিতা)–শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ১২৮
বাংলার সেকাল ও একাল
(প্রবন্ধ)—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস
বাংলার পল্লী সম্পদ (প্রবন্ধ)— ঐ
বাংলার মেয়েদের আলপনা ও প্রাচীর চিত্র (প্রবন্ধ)
—শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই সি এস
বাদুচর (কবিতা —শ্রীযতীন্দ্র সেনগুপ্ত
বাঙলার ভাস্কর্য্য শিল্প
(প্রবন্ধ)—শ্রীমনমোহন নরসুন্দর এম, এ
বার্গসঁ দর্শনে আর্য্যচিন্তার ধেয়া সাক্ষাৎ
শ্রীমঙ্গলানন্দ চক্রবর্ত্তী
বাংলার সামরিক ক্রীড়া
(প্রবন্ধ)—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস
বাংলার ফুল (গল্প)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাহিরের পথে (প্রবন্ধ)—শ্রীহিমাংশুবালা ভাদুড়ী
৩৩,২৯৬,২৫১,৩১৮,৩৯৯
বাংলার হাট (প্রবন্ধ)
—ডাঃ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি, লিট
বাংলার শিশু মরে কেন ?
(প্রবন্ধ)—শ্রীআমোদিনী ঘোষ
বাংলার নিজস্ব কলা
(প্রবন্ধ)—শ্রীসুদর্শন মিত্র এম, এ
ব্রাহ্মণ (কবিতা)—শ্রীপ্রভাতমোহন বান্দ্যোপাধ্যায় ৩৮২
বিরাটের কুক্ষতা (কবিতা)—শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার ৭০
বিশ্বব্যাপী (গান)—৺রজনীকান্ত সেন ৩১৫
বিজয়ী (কবিতা)—শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী ৬৭২
বিধবাশ্রম (প্রবন্ধ)—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
পি, এইচ, ডি
বেলজিয়ম সাহিত্য (প্রবন্ধ)—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
বেথুন সাহেবের অভিভাষণ
—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ
বৌদ্ধধর্ম্ম (প্রবন্ধ)—কুমারী ছায়া দেবী

বৃত্তাকার আলপনার
প্রাণবস্তু (প্রবন্ধ)—শ্রীসুধাংশু রায়
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্র-স্বাধীনতা
শ্রীবনাই দেবশর্ম্মা ৮২
৺ব্রজেন্দ্রনাথ দে (জীবনী)— ৮১৮

সিটলি—শ্রীজগৎ ঘটক ৭২৫
শিশু অপরাধী—শ্রীনীরজবাসিনী সোম বি, এ, বি, টি ৬৬৩
শ্রীনিবাসের চিঠা (আলোচনা)—শ্রীঅবনীনাথ রায় ৪০১
শেষের বিচার (গল্প)—শ্রীদীপ্তি দেবী ৭৯৭

স

সম্পাদিকার জল্পনা ৩৯,১৬৩,৩৪৪,৪১৮,৬৬৮,৭৫৩ ৮১৫
সন্ধ্যা-মালতী (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৫৪৮
সর্ব্বনেশে মাছি (স্বাস্থ্য)—ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল, এম, এস
সপ্তদশ শতাব্দীর করাসী কথা (প্রবন্ধ)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫৭
সবাজের গলদ (প্রবন্ধ)—শ্রীসুষমাসুন্দরী ঘোষ ৮০৭
সমাজে নারী (প্রবন্ধ)—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ৬৪৯
সংখ্যা (গল্প)—রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী ১৭২
সম্মিলনীর সম্মিলনে (প্রবন্ধ)—শ্রীঅনুরূপা দেবী ৬৮০
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রবন্ধ)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮১,৭৫৭
স্মৃতি অর্ঘ্য (গান)—শ্রীহেমলতা দেবী ৫৮৫
স্মৃতিকণা (কবিতা)—শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায় ৭৭৫

স্মারিকা (কবিতা)—
শ্রীহেমলতা দেবী ও শ্রীমমতা মিত্র ৬৯২
সাধুর পরিচয় (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৪৪২
সেকালের কথা (প্রবন্ধ)—রায় বাহাদুর জলধর সেন ৩৮১, ৫২৮, ৭১৫
সে (কবিতা)—শ্রীহৈমবতী দেবী ৪৩৭
সেল্মা লেগার্লোফ—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ৪৭
সিন্ধুতীরে (কবিতা)—শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায় ৮০৬
স্বরলিপি ১২৭
স্বরবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি (প্রবন্ধ)—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত ১
স্বর্গীয়া ডাঃ কুমারী যামিনী সেন—শ্রীহেমলতা সরকার ২৮৩
স্বর্ণকুমারী ৬৪৪
স্মৃতির সৌরভ (প্রবন্ধ)—শ্রীগীতা দেবী ২১১

হ

হাফেজ ও রবীন্দ্রনাথ(প্রবন্ধ) কাজের নওয়াজ বি, এ ১২৩
হেথা ইউসুফ কাঁদে (গল্প)—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
হাল ফ্যাসান (গল্প)—শ্রীদীপ্তি দেবী বি,এ, বি টি
হাসি (প্রবন্ধ)—শ্রীললিতা সেন
হাওয়া সমিতি—শ্রীকরুণাবন্ধু মুখোপাধ্যায়
হুগলী জেলার ছেলে ভুলান ছড়া—শ্রীবনমোহন নরসুন্দর ২৩৮
ক্ষীর ও নীর ৫৩,১১১,২২১,৪১৬,৪১৮, ৬২৫, ৭৪৭,৮৩০

পল্লী-শ্রী

চিত্রাঙ্কণ—শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।